প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সপ্তদশ ভাগ—প্রথম খণ্ড

১৩২৪ সাল, বৈশাখ—আশ্বিন

প্রবাসী-কার্য্যালয়
[illegible] কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিষয়-সূচী

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র।

...ঠাকুর ... এম-এ, ...পক শ্রীসতীশ...
...া দেবী, বি-এ
...বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র-সূচী

লেখক ও তাঁহাদের রচনা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

১৭শ ভাগ ১ম খণ্ড	বৈশাখ, ১৩২৪	১ম সংখ্যা

চির-আমি

(বাউলের সুর)

যখন   পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন
এই বাটে,
বাইব না মোর খেয়া তবী
এই ঘাটে;
চুকিয়ে দেব বেচাকেনা,
মিটিয়ে দেব লেনাদেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা
এই হাটে।
আমায় তখন নাইবা মনে বাথলে।
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাকলে!

যখন   জমবে ধুলা তানপুবাটাব
তারগুলায়,
কাঁটালতা উঠবে ঘরেব
দ্বারগুলায়,
ফুলের বাগান, ঘন ঘাসের
পরবে সজ্জা বনবাসের,
শ্যাওলা এসে ঘিরবে দিঘির
ধারগুলায়,
আমায় তখন নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাকলে!

তখন   এমনি করেই বাজবে বাঁশী
এই নাটে,
কাটবে গো দিন, যেমন আজো
দিন কাটে।
ঘাটে ঘাটে খেয়াব তরী
এমনি সেদিন উঠবে ভবি,
চববে গোরু, খেলবে বাথাল,
এই মাঠে।
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে।
তারাব পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাকলে।

তখন   কে বলে গো সেই প্রভাতে
নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা
এই-আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসব যাব চিরদিনেব
সেই-আমি।
আমায় তখন নাইবা মনে রাখলে!
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাকলে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শান্তির সর্ত্ত।

[illegible] মানুষের মধ্যে কোন ঝগড়া বিবাদ হইলে তাহা নিষ্পত্তি করিবার বৈধ উপায় আছে। আমাদের দেশে পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া মীমাংসা করা যাইতে পারে, সালিসী দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন হইতে পারে, কিম্বা আদালতের সাহায্যে ঝগড়া মিটাইয়া লইতে পারা যায়। আমাদের দেশে এবং অন্যান্য সভ্য দেশে এই-সকল উপায় অবলম্বন না করিয়া কেহ-কেহ পরস্পর মারামারি করিয়া কিম্বা লাঠিয়ালের সাহায্য লইয়াও নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এ-সব অবৈধ ও অসভ্য উপায়।

জাতিতে জাতিতে মতভেদ হইলে, ঝগড়া হইলে, তাহাদের স্বার্থের সংঘর্ষ ঘটিলে এখনও অধিকাংশ স্থলে অসভ্য উপায়েই বিবাদ ভঞ্জনের চেষ্টা করা হয়; যদিও কোন-কোন স্থলে নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক ও আলোচনা দ্বারা এবং কোন-কোন স্থলে নিরপেক্ষ কোন জাতিকে মধ্যস্থ মানিয়াও ঝগড়া মিটান হইয়াছে।

মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য, যে-সব জাতির তদ্রূপ স্বার্থে আঘাত লাগে, তাহাদিগকেও যুদ্ধরূপ অসভ্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সভ্যতার পক্ষপাতীরা আশা করেন যে এমন সময় আসিবে যখন দেশে-দেশে জাতিতে-জাতিতে মতান্তর, মনান্তর, বা স্বার্থের বিরোধ উপস্থিত হইলে, মারামারি কাটাকাটি না করিয়া অন্তর্জাতিক আদালতের সাহায্যে বিবদমান দেশ বা জাতি-সকলের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে। তাহার জন্য তাঁহারা চেষ্টাও করিতেছেন। কিন্তু আপাততঃ ন্যায়কে, কল্যাণকে, মানবের স্বাধীনতাকে পদদলিত হইতে দেখা অপেক্ষা তাঁহারা অনেকে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া ন্যায় সত্য ও স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধেরই সমর্থন করিতেছেন। কেহ-কেহ মনে করেন যে যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে বিনাযুদ্ধে বিবাদ ভঞ্জনের জন্য যতদূর চেষ্টা করা উচিত ছিল, তাহা করা হয় নাই। এ-সব কথার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিবার মত খাঁটি সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছে নাই। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহা আলোচনার [illegible] আমাদের অভিপ্রায় নহে।

আমরা আপাততঃ ধরিয়া লইলাম যে [illegible] ও স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় যুদ্ধরূপ অসভ্য উপায় অবলম্বন করা কোন-কোন স্থলে আবশ্যক। কিন্তু যাঁহারা যুদ্ধ করেন বা যুদ্ধের সমর্থন করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, যে, যুদ্ধে জয়ী হওয়াটা দ্বারাই ইহা প্রমাণ হয় না যে, জয়ী যে, ন্যায় তাহারই দিকে। হইতে পারে যে কোন জাতি ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই যুদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যে ন্যায়ের জন্যই লড়িতেছেন, জয়পরাজয়ের দ্বারা তাহার বিচার হইতে পারে না। যাঁহারা ন্যায়ের জন্য লড়িতেছেন, তাঁহাদের জয় বা পরাজয় দুই-ই হইতে পারে। যদি তাঁহারা পরাজিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা অন্যায়ের জন্য লড়িতেছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ হইবে না। যাঁহারা জয়ী হইবেন, ন্যায় তাঁহাদেরই পক্ষে, এরূপ মনে করিবারও কোন কারণ হইবে না।

আর একটি কথা আরও ভাল করিয়া মনে রাখিতে হইবে। মনে করুন, যাঁহারা ন্যায়ের ও মানবের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদের জিত হইল; তাহা হইলেও, তাঁহারা জয়ী হইবার জন্য যাহা কিছু করিয়াছেন বা করিবেন, সমস্তই ধর্ম্মসঙ্গত, ইহা প্রমাণিত হইবে না। ইহাও প্রমাণিত হইবে না, যে, বিজয়ীরা জয়ী হইবার পর যাহা কিছু দাবী করিবেন, সন্ধির যে কোন সর্ত্ত অবশ্যপালনীয় বলিবেন, তাহাই ধর্ম্মানুমোদিত।

কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা ঠিক নয়, কোন্ সর্ত্ত [illegible] কোন্ সর্ত্ত ধর্ম্মসঙ্গত নয়, তাহা স্থির করিতে [illegible] বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য বহু জাতির মধ্যে বর্ত্তমান যুদ্ধে [illegible] বলিতেছেন যে তাঁহারা ন্যায় সত্য ও মানুষের [illegible] জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে উভয় পক্ষের এই [illegible] বিচার করা অনাবশ্যক। কিন্তু এই একটা কথা বেশ জোর করিয়া বলা যাইতে পারে, যে, যুদ্ধের শেষে যখন [illegible] শান্তির সর্ত্ত আসিবে, তখন, কোন্ পক্ষ [illegible] শান্তি স্থাপনের অভিলাষী [illegible]

[illegible] প্রবাহিত হইতে থাকিবে। যে, প্রকৃতই জয়ী হইয়া প্রবলতর হইয়া তাহাদিগকে দেখাইতে হইবে, যে, তাহারা প্রকৃত, সত্যই ন্যায় সত্য ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছিল। ইহা কেমন করিয়া দেখান যাইতে পারে?

দেখাইবার একটা উপায় এই, যে, যুদ্ধের আগে যে-সব দেশ ও জাতি স্বাধীন ছিল, যুদ্ধের পরে জয়ী পক্ষ তাহাদের কাহারও স্বাধীনতা নষ্ট করিবেন না। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে গিয়া বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোন জাতির স্বাধীনতা অপহরণ করিলে তাহা অতি বিকট প্রহসন হইবে। জয়ী পক্ষ যে ভণ্ড নহে, তাহা দেখাইবার আর-একটা উপায়, কোন দেশ বা জাতি ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত যাহাতে না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা। এক জাতি যদি যুদ্ধের অনেক পূর্ব্বেও অন্য জাতির কোন প্রদেশ বা জেলা অপহরণ করিয়া থাকে, তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে। যেমন জার্ম্মেনী ফ্রান্সের কিয়দংশ প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া দখল করিয়া আছে; তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে। ইহা একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। এই নিয়ম জেতা ও বিজিত সকল দেশ ও জাতিকে মানিতে হইবে। ইহা বলিলে চলিবে না, "তুমি হারিয়া গিয়াছ; অতএব ন্যায়ের কাঁঠাল তোমার মাথাতেই ভাঙিব। কাঁঠালের কোষ ও বীজ উদরের কার্য্যটা আমরা অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে নির্ব্বাহ করিতে পারিব।

এই নিয়ম শুধু ইউরোপে নয়, এশিয়া ও আফ্রিকাতেও পালন করিতে হইবে। চীনের কিয়দংশ জার্ম্মেনী দখল করিয়াছিল বলিয়া, যুদ্ধের পরেও তাহা জার্ম্মেনীর বা অপর কোন জাতির অধীন থাকিবে, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত নয়। চীনের অংশ চীনকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। চীন স্বাধীন দেশ; আপনাদের রাষ্ট্রীয় কার্য্য চীনারা বহু কাল [illegible] করিয়া আসিতেছে। অতএব সামান্য এক-[illegible] চালাইতে পারিবে না, ইহা বলিলে [illegible] না।

যুদ্ধের আগে হইতে যে-সব দেশ স্বাধীন ছিল, তাহাদের [illegible] বলিতেছি, যে-সব জাতি যুদ্ধের [illegible] পরাধীন আছে, তাহাদের সম্বন্ধে [illegible] জাতির [illegible] জাতিদের স্বতন্ত্রতা যদি উচ্চতম সোপানে অধিষ্ঠিত [illegible] যদি তাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি খুব প্রবল হইত, তাহা হইলে [illegible] বিজয়ী পক্ষকে সকল জাতির সম্বন্ধে সমদর্শী হইতে [illegible] পারিতাম। কিন্তু সভ্যতা ও জাতীয় ধর্ম্মবুদ্ধির [illegible] অবস্থায় সর্ব্বত্র সমদর্শী হইতে বলা চলে না। [illegible] প্রবল জাতি ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় [illegible] অধীন [illegible] দেশকে, স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ না করিয়াই, স্বাধীন করিয়া দিলে, উহা কোন দস্যু জাতি দ্বারা কবলিত হইতে পারে। এই জন্য আমরা যুদ্ধের পর, স্বাধীন ও পরাধীন জাতিদের সম্বন্ধে কিছু পৃথক্ ব্যবস্থা করিতে বলিতে বাধ্য হইতেছি। যদিও উভয়-প্রকার ব্যবস্থারই চরম লক্ষ্য হইবে এক,—মানুষকে নিজের শক্তি সামর্থ্য দ্বারা নিজের মঙ্গলসাধন করিবার অবাধ ও সম্পূর্ণ অধিকার ও অবসর প্রদান। কোন-কোন স্থলে মাঝামাঝি ব্যবস্থাও হইতে পারে; যদিও ঠিক্ কি হইবে বলা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইউরোপে পোল্যাণ্ডের কথা ধরা যাক। যুদ্ধের বহু বৎসর পূর্ব্বে এই দেশকে তিন টুকরা করিয়া জার্ম্মেনী রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়া গ্রাস করে। এখনও সেই অবস্থা আছে। যুদ্ধের মধ্যেই জার্ম্মেনী ও রুশিয়ার সম্রাট্ উভয়েই পোলদিগকে স্বশাসন-ক্ষমতা দিবার অঙ্গীকার করেন। অঙ্গীকার করিবার সময় তাঁহাদের অভিপ্রায় বাস্তবিক কিরূপ ছিল বলা যায় না। তাঁহাদের আন্তরিক উদ্দেশ্য ভাল ছিল ধরিয়া লইলে, সম্ভবতঃ তাঁহাদের অভিপ্রায় এই ছিল যে, পোলরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে না, কিন্তু আপনাদের দেশের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা সমস্ত নিজেরাই করিবার অধিকার পাইবে; হয় ত বা রুশিয়ার সম্রাট্-পরিবারের, কিম্বা জার্ম্মানীর সম্রাট্-পরিবারের, কাহাকেও পোলদের রাজা করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাঁহার উপর রুশিয়ার জার বা জার্ম্মেনীর কৈসর অধিরাজ থাকিবেন, এরূপ সঙ্কল্পও ছিল। রুশিয়ায় বিপ্লব হওয়ায় রাজতন্ত্র উঠিয়া গিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। রুশিয়ার বর্ত্তমান নেতারা বলিয়াছেন যে পোল্যাণ্ডে কিরূপ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা নিজেই স্থির করিবার অধিকার পোলদিগকে দেওয়া হইবে। তাহা যদি হয়, সম্ভবতঃ পোলরা সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী হইবে।

যুদ্ধের আগে হইতে যে-সকল দেশ ইউরোপের প্রবল জাতিদের অধীন ছিল, তাহাদের কোন-কোনটি পূর্ব্বপ্রভুদের অধীন থাকিবে, কোনকোনটির নূতন প্রভু জুটিবে। এই প্রভুজাতিগণ যে-পক্ষেরই হউন, তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহারা মানবস্বাধীনতা ও ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং পরাধীন জাতিদের বর্ত্তমান প্রভুরাই অভিভাবক থাকুন বা নূতন প্রভুরা অভিভাবক হউন, তাহারা মানবের অধিকার কতকটা দাবী করিতে পারিবে। অবশ্য, সব জাতিকে স্বাধীন করিয়া দিলেই ঠিক্ যুক্তিসঙ্গত কাজ হয়, কিন্তু পরাধীন জাতিদের সকলের আভ্যন্তরীন শান্তিরক্ষা এবং বহিঃশত্রু হইতে আত্মরক্ষার ক্ষমতা না থাকিতে পারে। এই হেতু তাহাদের জন্য মানবের অধিকার কিয়ৎপরিমাণে চাহিতেছি, সম্পূর্ণ চাহিতেছি না। আফ্রিকা ও এশিয়ার পরাধীন জাতিদের নিজ নিজ দেশের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা পাওয়া দরকার। অসভ্য, অর্দ্ধ সভ্য, ও সভ্য, সকল জাতিই এই ক্ষমতা লাভের ও পরিচালনের অধিকারী। প্রভুজাতিদের স্বার্থ অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখায় তাহারা পরাধীন জাতিদের শক্তি বুঝিতে পারেন না, কখন কখন বুঝিয়াও স্বীকার করিতে চান না। ভারতবর্ষ অনেকদিনের সভ্যদেশ। অথচ ভারতবাসীরা যে স্বশাসন ক্ষমতা লাভের উপযুক্ত তাহা অধিকাংশ ইংরেজ স্বীকার করিতে চান না। কিন্তু তাঁহাদেরই ব্রিটিশসাম্রাজ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জের অসভ্য অধিবাসীরা স্বরাজ (Home Rule) ভোগ করিতেছে। ইহারা এতদূর অসভ্য যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নরখাদক ছিল বলিয়া ইহাদের অপবাদ ছিল, যদিও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইহারা এখনও নগ্ন থাকে, মাথায় কেবল একটা পাতার টুপি পরে। ইহাদের স্বরাজের বৃত্তান্ত পাঠকেরা ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ন রিভিউ কাগজে দেখিতে পাইবেন।

সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য এই, যে, (১) যুদ্ধের সময় যে সব স্বাধীন জাতিদের দেশ অধিকৃত হইয়াছে, যুদ্ধান্তে তাহা তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে হইবে, এবং তাহাদের স্বাধীন অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে; (২) যুদ্ধের সময় বা তৎপূর্ব্বে যে-সব স্বাধীন জাতিদের দেশের কোন অংশ কেহ দখল করিয়াছে, তাহা তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে হইবে; (৩) যুদ্ধের আগে হইতে এখন পর্য্যন্ত যাহারা পরাধীন আছে তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় দেশের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থা করিবার অধিকার দিতে হইবে।

ইহা না করিলে সংগ্রামে যে পক্ষই জয়ী হউন, কাহারও সত্যবাদিতায় মানুষের আস্থা থাকিবে না। শুধু তাহাই নয়, সন্ধির সর্ত্তগুলি ন্যায়সঙ্গত ও মানবজাতির স্বাধীনতার অনুকূল না হইলে শান্তি স্থায়ী হইবে না।

বলা বাহুল্য, আমরা বুঝিতেছি যে ইংরেজ ও তাঁহাদের মিত্রপক্ষেরই জয় হইবে। সুতরাং ন্যায়ানুমোদিত ও স্বাধীনতাসঙ্গত ব্যবস্থা তাঁহাদিগকেই করিতে হইবে।

ভারতশাসকদের কয়েকটি উক্তি।

নানা দেশ হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় তারে খবর পাঠাইবার জন্য একটি কোম্পানী আছে, তাহার নাম অষ্ট্রেলিয়ান য়ুনাইটেড কেব্‌ল্ সার্ভিস্। প্রায় চারি মাস পূর্ব্বে ইহার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন:—"We stand at this moment on the verge of the greatest liberation the world has seen since the French revolution." "ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের পর জগতে মহত্তম অধীনতা-পাশ মোচনের প্রাক্কালে আমরা এখন দণ্ডায়মান।" সম্প্রতি রুশিয়ায় রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবার পর তিনি পার্লেমেন্টে একটি বক্তৃতায় বলেন:—

The Imperial Government was confident that the Russian people would find that liberty was compatible with order even in revolutionary times, and that a free people were the best defenders of their own honour.

তিনি আরও বলেন:—

The Imperial Government is confident that the events, marking the world epoch and the first great triumph of the principles for which we entered the War will not result in confusion or slackening in the conduct of the War, but in a closer and more effective co-operation between the Russian people and the Allies in the cause of human freedom.

তাঁহার এইসব কথার কয়েকটি মত প্রকাশ পাইয়াছে।

বিপ্লবের সময়েও স্বাধীনতার সহিত শৃঙ্খলার সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে; স্বাধীন লোকেরাই আপনাদের মান-ইজ্জতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ষক; ইংরেজ জাতি যে-সকল রাষ্ট্রীয় মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, রুশিয়ার বিপ্লব সেই-সকল নীতির প্রথম জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছে; এবং রুশিয়ার লোকেরা ও ইংলণ্ডের অন্যান্য মিত্র-জাতিরা মানবের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন।

গত ৬ই এপ্রিল ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রমণ্ডলের (U. S. A.) অধিবাসী-দিগকে যে সন্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতেও পূর্ব্বোল্লিখিত মতগুলির মত তাঁহার কতকগুলি মত ব্যক্ত হইয়াছে। ঐ তারিখে তিনি আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিকে ডাকাইয়া নিম্নমুদ্রিত সন্দেশ (message) আমেরিকার জনসাধারণকে প্রেরণ করিতে বলেন:—

"America at one bound has become a world power in a sense she never was before. She waited until she found the cause was worthy of her traditions, and the American people held back until they were fully convinced that the fight was not a sordid scrimmage for power or possessions, but an unselfish struggle to overthrow a sinister conspiracy against human liberty and human right. Once that conviction was reached the great republic of the west leapt into the arena and she stands now side by side with the European democracies, who, bruised and bleeding after three years of grim conflict, are still fighting most savagely for the ever-menaced freedom of the world. The glowing phrases of the President's noble deliverance illumine the horizon and make clearer than ever the goal we are striving to reach. There are three phrases which will stand out for ever more in the story of this crusade. The first is: The world must be safe for democracy. The next is: The menace to the power of freedom lies in the existence of autocratic Governments, backed by organised force which is controlled by their will and not by the will of their people. The crowning phrase is that in which the President declares: A steadfast concert for peace can never be maintained except by a partnership of democratic nations. These words represent the faith which inspires and sustains our people in the tremendous sacrifices they have made and are still making. They also believe that the unity and peace of mankind can only rest upon democracy, upon the right of those who submit to authority to have a voice in their own Government, upon respect for the rights and liberties of nations both great and small, and upon the universal dominion of public right. To all these Prussian military autocracy is an implacable foe. The Imperial War Cabinet, representative of all the peoples of the British Empire, wish me on their behalf to recognise the chivalry and courage which calls the people of the United States to dedicate their whole resources to the service of the greatest cause which ever engaged human endeavour.

ইহাতেও বলা হইতেছে যে, বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ ক্ষমতা বা রাজ্যের জন্য জঘন্য কাড়াকাড়ি নয়, কিন্তু মানব-স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারের বিরুদ্ধে একটা দুষ্ট ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিবার জন্য ইহা নিঃস্বার্থ সংগ্রাম; ইউরোপের প্রজাতন্ত্র দেশসকল পৃথিবীর স্বাধীনতাকে আসন্ন বিপদ হইতে বাঁচাইবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। আমেরিকার দেশপতির যে-সকল কথা মিঃ লয়েড জর্জ বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করেন, তাহার তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্রথম কথা এই, যে, পৃথিবী প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর নিরাপদ প্রতিষ্ঠাভূমি হওয়া চাই; দ্বিতীয়—যে-সব গবর্ণমেণ্টে যদৃচ্ছাচারী এক-একটি ব্যক্তির প্রভুত্ব, এবং এই প্রভুত্বের সমর্থন জন্য তাহাদের আজ্ঞাধীন দলবদ্ধ সুশৃঙ্খল সৈন্যবল আছে, এবং যেখানে সৈনিক শক্তির উপর জনসাধারণের কোন কর্তৃত্ব নাই, সেই সব একতন্ত্র গবর্ণমেণ্টই স্বাধীনতার শক্তির আশঙ্কার কারণ; আমেরিকার দেশনায়কের সকলের সেরা কথা এই, যে, জগতের শান্তিরক্ষার জন্য নানা জাতির মধ্যে দৃঢ় সন্ধিবন্ধন, প্রজাতন্ত্র দেশ-সকলের সম্মিলিত শক্তি ব্যতীত সম্ভবপর নহে।

মিঃ লয়েড জর্জ বলেন, যে, মানবজাতির একত্বের ও মানবসমাজে শান্তির ভিত্তি প্রজাতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রত্যেক জাতির নিজের দেশের কাজ করিবার অধিকার ও ক্ষমতার উপর উহা প্রতিষ্ঠিত, ছোটবড় সকল জাতির অধিকার ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছা ও চেষ্টার উপর উহা প্রতিষ্ঠিত, এবং সার্ব্বজনিক ন্যায়ের বিশ্বব্যাপী প্রভুত্বের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্তর্গত, ভারতবাসীরা মানবজাতির একটি অংশ। মিঃ লয়েড জর্জ যে-সব কথা বলিয়াছেন

তাহার কোথাও একথা বলেন নাই, যে, ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদিগকে ব্যতিক্রমস্থল বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি; ফরাসী বিপ্লবের পর যে মহত্তম স্বাধীনতাপাশ-মোচনের আভাসের প্রতি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, এশিয়া আফ্রিকা মুক্তি না পাইলে, ভারতবর্ষ স্বরাজ (home rule) না পাইলে, তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, আমাদের পক্ষে তাহা মরীচিকার মত হইবে। রুশিয়া স্বাধীন দেশ ছিল, উহার সম্রাটের খুব প্রভুত্ব থাকিলেও ডুমা-নামক উহার ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাদের প্রতিনিধিদের দেশের কাজ নিয়মিত করিবার যতটা ক্ষমতা ছিল, তাহা নিতান্ত কম নয়। রুশিয়ায় আংশিক ভাবে নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। অথচ রুশিয়ার লোকেরা রাষ্ট্রবিপ্লবদ্বারা সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্রপ্রণালী স্থাপন করিবার চেষ্টা করায় তবে মিঃ লয়েড জর্জ তাহাদিগকে স্বাধীন বলিতেছেন, এবং এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে স্বাধীন লোকেরাই আপনাদের মান-ইজ্জৎ রক্ষা করিতে পারে, এবং বিপ্লবের সময়ও স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। ভারতবর্ষে আমরা একটা কিছু অধিকার, একটা কিছু অসুবিধার প্রতিকার চাহিলেই কর্ত্তারা বলিতেছেন, এখন যুদ্ধের সময় গোলমাল করিও না। বিপ্লবের সময়ও যদি রুশিয়ায় স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা উভয়ই রক্ষিত হইতে পারে, যুদ্ধের মধ্যেই যদি ফ্রান্সে বার বার মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন হইতে পারে, যুদ্ধের সময়ই ইংলণ্ডে যদি দুইবার মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন হইতে পারে, আয়র্লাণ্ডকে স্বরাজ দিবার আলোচনা চলিতে পারে, শিক্ষার ব্যবস্থা, কৃষির ব্যবস্থা, বাণিজ্যের ব্যবস্থা ও শিল্পের ব্যবস্থা উন্নততর ও অধিকতর কার্য্যকর করিবার চেষ্টা চলিতে পারে, তাহা হইলে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সুদূরে স্থিত ভারতবর্ষে আমাদিগকেই কেন মড়ার মত নিশ্চেষ্ট থাকিতে বলা হইতেছে? স্বাধীন রুশিয়া বিপ্লবের দ্বারা প্রজাতন্ত্র হওয়ার পর রুশরা স্বাধীন বলিয়া বিবেচিত হইল, তাহা আনন্দের কারণ বলিয়া ঘোষিত হইল, তাহারা দেশের ও জাতির মান-ইজ্জৎ রক্ষার উপযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইল। আমরা কি মানবসমাজের এতই বাহিরে পড়িয়া আছি যে, আমাদের উনিশ জন প্রধান লোক, স্বাধীনতা নয়, অল্প কিছু অধিকার চাওয়ার জন্য, সরকারী, অর্দ্ধ-সরকারী, বেসরকারী, নানা-রকমের ইংরেজের দ্বারা উপহসিত ও তীব্রভাবে সমালোচিত হইবেন? আমাদের অনুরোধ, ইংরেজ ন্যায়পরায়ণ হউন, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের বাহিরে ও ভিতরে সমদর্শী হইয়া একই রাষ্ট্রীয় নীতি প্রচলনে যত্নবান্ হউন। এই তাড়িতালোকের দিনে, প্রদীপের নীচে অন্ধকার থাকিবেই, এমন কোন কথা নাই। আমাদিগকেও এমন ক্ষমতা দেওয়া হউক, যাহাতে আমরা আমাদের দেশের সম্মান বজায় রাখিতে পারি। ইংরেজজাতি যে মানবের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্রপ্রণালীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত সংগ্রাম করিতেছেন, দেশ-শাসনে দেশবাসীর মতই যে বলবৎ হওয়া উচিত, মিঃ লয়েড জর্জের এই-সব কথা অনুসারে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করা ইংরেজ-জাতির একান্ত কর্ত্তব্য।

মিঃ চেম্বারলেন এখন ভারত-সচিব। ৩রা এপ্রিল একটি সভা লণ্ডনে বিকানীরের মহারাজা, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও সার্ জেম্‌স্ মেষ্টনকে ভোজ দেয়। তদুপলক্ষে চেম্বারলেন যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে ভারতবর্ষের উল্লেখ করিয়া বলেন, "She would be the great storehouse of Empire, but she must not remain a mere hewer of wood and drawer of water," "ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের বৃহৎ ভাণ্ডার হইবে, কিন্তু তাহাকে কাঠ চেলাইবার ও জল তুলিবার নিমিত্ত নিযুক্ত চাকরের মত থাকিতে হইবে না।" ইহা হইতে দুটি সিদ্ধান্ত করা যায়; (১) বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভৃত্য মাত্র, তিনি নিজের গৃহস্থালির কর্ত্রী নিজে নহেন, কাঠ কাটা ও জল তুলা প্রভৃতি দাসীপনা এখন তাঁহাকে করিতে হয়; (২) তাঁহার এই দশা থাকিবে না। মিঃ চেম্বারলেনের কথা স্তোকবাক্য, না সত্য, তাহা বুঝিবার জন্য বহু বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে না। যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে না হউক, পরে, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের সময়, বুঝা যাইবে, ভারতবর্ষের অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন ব্রিটিশজাতি তাঁহাদের নেতাদের ঘোষিত নীতির সহিত সঙ্গত মনে করেন।

আমাদের অধিকার আমরা কাহারও কোন কৃপার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করি না। [illegible]

অধিকার আমাদেরও সেই অধিকার। সকল মানুষের যে-সব অধিকার আছে বলিয়া ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞেরা ঘোষণা করিতেছেন, সর্ব্বদেশে যে সকল রাষ্ট্রীয় মূলনীতি প্রযুক্ত্য বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন এবং তৎসমুদয়কে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন বলিতেছেন, ব্রিটিশ জাতির মতে সেই-সব সার্ব্বজনিক অধিকার আমাদেরও আছে কি না, সেই-সব মূল রাষ্ট্রীয়নীতির প্রয়োগক্ষেত্র ভারতবর্ষও বটে কি না, আমরা তাহা জানিতে চাই; কথায় জানিতে চাই, কাজে জানিতে চাই।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকেরা আমাদের শাসনকর্ত্তা নহে, যদিও তাহাদের কেহ কেহ প্রভু হইতে চাহে বটে। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালী যখন নূতন রকমে গঠিত হইবে, তখন বহুপরিমাণে তাহাদের মত অনুসারে কাজ হইবে। এইজন্য তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রধান প্রধান লোকদের মত আলোচনার যোগ্য। ২রা এপ্রিল লণ্ডনে হাউস্ অব্ কমন্স্ উপনিবেশসমূহের প্রতিনিধিদিগকে যে ভোজ দেন, তদুপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি জেনারেল স্মাট্‌স্ অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন:— "After all, the Empire is founded on the principles of equality and freedom, unlike Germany who stands for might is right." জেনারেল স্মাট্‌স্ যে বলিতেছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সাম্য ও স্বাধীনতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা শ্বেতকায়দের জন্য সত্য হইতে পারে, কিন্তু অশ্বেতদের পক্ষে তাহা সত্য নহে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি। দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ ব্যবস্থা হইতেই আমাদের কথা প্রমাণ করিতেছি। তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশের কিছু বেশী শ্বেতকায় ঔপনিবেশিক, বাকী কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবস্থাপক সভার দুই কক্ষের কোন কক্ষেই কৃষ্ণকায় প্রতিনিধি নাই, তাহাদের প্রতিনিধি হইবার অধিকারও নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা চারিটি প্রদেশে বিভক্ত। তন্মধ্যে ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেটে কৃষ্ণকায়গণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পর্য্যন্ত অধিকারী নহে। নেটালে অশ্বেত অধিবাসীদিগকে নামে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় নাই বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাদিগকে বাদ দেওয়া হয়। কেবল মাত্র কেপ প্রদেশে ১,৫২,১৩৫ নির্ব্বাচকের মধ্যে ২০,০০০ অশ্বেত; কিন্তু এখানেও মনে রাখিতে হইবে যে এই প্রদেশের শ্বেত অধিবাসীর সংখ্যা ৫,৮২,৩৭৭, এবং অশ্বেত অধিবাসীদের সংখ্যা ২৫,৬৪,৯৬৫। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবর্ষীয় লোকদের প্রতি কিরূপ অবিচার অত্যাচার হইয়াছে, এবং এখনও যে তাহারা তথায় রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত, তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা অনাবশ্যক।

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতকায়দের চেয়ে কৃষ্ণকায়দের সংখ্যা কত বেশী তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তা ছাড়া এই কৃষ্ণকায়রাই দেশের আদিম অধিবাসী, সুতরাং দেশের জমীর মালিক তাহারাই ছিল। কিন্তু শ্বেতকায়রা এরূপ আইন করিয়াছে যে দেশের সমুদয় জমীর পনের ভাগের চৌদ্দ ভাগ তাহাদের হাতে আসিয়াছে, এবং আইন অনুসারে কৃষ্ণকায়দিগকে নিজের জমীতেই দাস হইয়া খাটিতে হইতেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বাহিরেও কোন ব্রিটিশ উপনিবেশে শ্বেতকায়দের সহিত ভারতবাসীদের সমান অধিকার নাই। তাহারা কোন উপনিবেশে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করিতেই পায় না। আমাদের নিজের দেশেও আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার অতি সামান্য। কোন কোন বিষয়ে আইন শ্বেতকায়দের জন্য যেরূপ সুবিধাজনক, আমাদের জন্য তেমন নহে। তা ছাড়া, আমরা নিজের দেশেই সরকারী আফিসে, রেলে, ষ্টীমারে, বাজারে, সর্ব্বত্র, আমাদিগকে নিকৃষ্টতা অনুভব করাইবার মত ব্যবস্থা ও ব্যবহার প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য যে সাম্য ও স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা বর্ত্তমানে সত্য নহে, ভবিষ্যতে সত্য হইতে পারে। তজ্জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। সাম্রাজ্যের শ্বেতকায়েরাও সেই চেষ্টা করুন। কেবল শূন্যগর্ভ বক্তৃতা করিয়া বড়াই করিলে হইবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা ৪৩ কোটির উপর। তাহার মধ্যে কেবল ৬ কোটি শ্বেতবর্ণ, বাকী ৩৭ কোটি অশ্বেত। যে সাম্রাজ্যে এক-সপ্তমাংশের কম লোক স্বাধীন ও প্রভু, এবং ছয়-সপ্তমাংশ নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত ও রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে

বঞ্চিত, তাহার বর্ত্তমান ভিত্তি সাম্য ও স্বাধীনতা, কোন সত্যবাদী লোকের একথা বলা উচিত নয়।

জেনারেল স্মাট্‌স্ বক্তৃতার শেষে বলেন :—After all we built on freedom, and no one outside a lunatic asylum wants to use force with the Nations in the Empire"। "আমরা স্বাধীনতার ভিত্তির উপর সাম্রাজ্যের ইমারত খাড়া করিয়াছি; পাগলা-গারদের বাহিরে কেহ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জাতিসকলের (নেশন্‌-সমূহের) উপর জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগ করিতে চায় না।" অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নেশন-সকল যাহা চাহে না, জোর করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে সেরূপ ব্যবস্থা করা হইবে না, এবং তাহারা যাহা চায়, জোর করিয়া তাহাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে না; তাহাদের সম্মতি অনুসারে কাজ হইবে।

আমরা ঔপনিবেশিকদিগের অধীন হইতে চাই না; অধীন করা হইবে কি না দেখিব। আমরা ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কর্তৃত্ব চাই; তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত রাখা হইবে কি না তাহাও দেখিতে পাওয়া যাইবে। রাজনীতিবিশারদেরা বলিতে পারেন, "তোমরা ত নেশন নও, কতকগুলা দ্বিপদ জীবের সমষ্টি মাত্র; নেশনদের সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহারের কথা বলিয়াছি, তাহাতে তোমরা দাবী কর কেন?" এরূপ চাতুরী অবলম্বিত হইবে কি না, তাহাও জানিতে বেশী বিলম্ব হইবে না। যিনি যাহাই বলুন, ইহা ধ্রুব সত্য যে, যে সাম্রাজ্য সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কেবল তাহাই স্থায়ী হইতে পারে। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে সাম্রাজ্যের কার্য্যনির্ব্বাহপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পর সম্পর্ক বদলাইবে ও সুস্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হইবে। ইহা অনিবার্য্য। সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূত মূলনীতি, ও প্রধান প্রধান ব্যবস্থার আলোচনা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। এখন যাঁহাদের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা সাম্রাজ্যকে বাস্তবিক স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করুন। কেহ বোকা বুঝাইবার বা ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিবেন না; করিলে তাহা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার দেখা গিয়াছে যে, অধীন দুর্ব্বল লোকদিগকে তাহাদের প্রভুরা অসহায় ভাবিয়াছে কিন্তু বিশ্বশক্তি সহায় হওয়ায় দুর্ব্বলের দুর্ব্বলতা দূর হইয়াছে এবং তাহারা মনুষ্যোচিত অধিকার ও ক্ষমতা পাইয়াছে। যাহা অনিবার্য্য, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া, তাহা যাহাতে মৈত্রীর সহিত শান্তিতে সুশৃঙ্খলা সুসম্পন্ন হয় তাহা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সাম্রাজ্যে আদর্শ যাহা হওয়া উচিত, তাহা যে শ্বেতবর্ণ রাজনীতিজ্ঞের জানেন, তাহা তাঁহাদের কথা হইতেই বুঝা যাইতেছে তাঁহাদের কথায় ও কাজে মিল হয়, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও অনুরোধ।

বিংশ শতাব্দীতে গণশক্তির প্রসার।

খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম সতের বৎসরে অনেক দেশের ও জাতির স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে, অনেকে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। মোটের উপর মানবের স্বাধীনতা বাড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

১৯১০ সালে কোরিয়া জাপানসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১২তে ট্রিপলি ইটালীর অধিকারে আসে। ১৯১২ সালে একটা সন্ধি অনুসারে মরক্কোর সুলতানকে ফ্রান্সের রক্ষকতা স্বীকার করিতে হয়, এবং ঐ বৎসরই মরক্কোর কিয়দংশের উপর স্পেনের অভিভাবকত্ব স্বীকৃত হয়; ইহাও একপ্রকার অধীনতা। ১৮৯৯ হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত নানাপ্রকারে রুশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডের নানা রাষ্ট্রীয় অধিকার খর্ব্ব করে। এখন রুশিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ফিন্‌ল্যাণ্ড সম্ভবতঃ অপহৃত অধিকারসকল ফিরিয়া পাইবে।

যুদ্ধশেষে কি-কি সর্ত্তে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা না জানা পর্য্যন্ত বলা যায় না, বেলজিয়ম, মণ্টিনিগ্রো, সার্বিয়া, প্রভৃতি দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে। এখন তাহারা পরাধিকৃত।

এখন দেখা যাক্ স্বাধীনতার প্রসার কোথায়-কোথায় হইয়াছে।

আমেরিকার কিউবা দ্বীপ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়। ১৯০৫এর পূর্ব্বে নরওয়ে সুইডেনের সহিত একরাজ্যভুক্ত ছিল; ঐ সালে তাহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়,

এবং নরওয়ে স্বতন্ত্র রাজার নেতৃত্বে স্বাধীন হইয়া উঠে। বিনা যুদ্ধে, বিনা বলপ্রয়োগে, এবং বিদেশী কোনও শক্তিশালী জাতির সাহায্য ব্যতিরেকে কোন একটি দেশের স্বাধীন হওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বোধ হয় ইহাই প্রথম ও অদ্বিতীয়। ১৯০৫ সাল হইতে সেদিন পর্য্যন্ত রুশিয়ায় নিয়মাধীন রাজতন্ত্র-শাসনপ্রণালী আংশিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন রাষ্ট্রবিপ্লব দ্বারা রুশীয় সাম্রাজ্যের লোকেরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছে, এবং সেখানে সম্ভবতঃ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ১৯০৫ সালে মণ্টিনিগ্রোতে তথাকার রাজা নিয়মতন্ত্র-শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, এবং প্রজাদের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন ঐ দেশ জার্ম্মেনী ও অষ্ট্রীয়া দখল করিয়া রহিয়াছে। ১৯০৬ সালে পারস্যদেশে রাজাকে নিয়মাধীন হইতে হয়, এবং মজলিস্-নামে পার্লেমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু এপর্য্যন্ত ঐদেশের অবস্থা ভাল হয় নাই। উহার বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য কি পরিমাণে পারসীকেরা ও কি পরিমাণে কোন-কোন বিদেশী জাতি দায়ী, তাহা এস্থলে আলোচ্য নহে। ১৮৭৬ সালে মিধাৎ পাশা তুরস্কের জন্য নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রণয়ন করেন। কাজে কিন্তু তুর্কেরা তখন কিছু অধিকার লাভে সমর্থ হয় নাই। ১৯০৮ সালে মিধাৎ পাশার রাষ্ট্রীয় বিধি আবার প্রবর্ত্তিত হয়। তদনুসারে তুরস্কের কিছু উন্নতিও হইতেছিল। কিন্তু অন্তর্বিবাদে, দুইবারের বল্কান যুদ্ধে এবং বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে উহার সঙ্কট-অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ১৯০৮ সালের ৫ই অক্টোবর বুলগেরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। দক্ষিণ আফ্রিকার চারিটি প্রদেশ ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি স্বশাসক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আগে হইতেই নেটাল ও কেপ কলোনী স্বশাসক ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল বটে; কিন্তু বুঅরদের উপনিবেশ ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট্ ইংরেজেরা জয় করিয়াও অধীন না রাখিয়া তাহাদিগকে স্বশাসক করিয়া দেওয়ায়, ইহাও স্বাধীনতার প্রসারের একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হইল। এই স্বশাসন-ক্ষমতা অবশ্য শ্বেত ঔপনিবেশিকেরাই পাইয়াছে, কৃষ্ণবর্ণেরা পরাধীনই আছে। তাহা উপরে অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি। ১৯১০ সালে পোর্টুগালে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পোর্টুগালের অধীন ভারতবর্ষীয় স্থানগুলি সম্প্রতি আভ্যন্তরীন ব্যাপারে কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আলবেনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষিত হয়; কিন্তু এখন অষ্ট্রীয়া উহা দখল করিয়া বসিয়া আছে। ১৯১২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী পৃথিবীর প্রাচীনতম সাম্রাজ্য চীন সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ১৮ বৎসর পূর্ব্বে স্পেনের নিকট হইতে আমেরিকা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ কাড়িয়া লয়। তাহার পর ফিলিপিনোদের নেতা এগুইন্যাল্ডো আমেরিকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কিন্তু প্রথম হইতেই আমেরিকার লোকদের এই উদ্দেশ্য ছিল যে ফিলিপিনোদিগকে স্বশাসনক্ষম ও আত্মরক্ষায় সমর্থ করিয়া স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। এইজন্য আমেরিকার শাসনকালের আরম্ভ হইতেই ফিলিপিনোরা অনেক অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি তাহারা দেশের আভ্যন্তরীন সমুদয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বশাসনক্ষমতা লাভ করিয়াছে। আরবদেশের অনেক অংশ তুরস্কের অধীন ছিল। সম্প্রতি মেক্কার শেরিফ হেজাজে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া স্বাধীন রাজা হইয়াছেন।

স্বাধীনতার স্রোত পৃথিবীর সমুদয় মহাদেশ ও দেশে সমান তেজে প্রবাহিত হয় নাই। কোথাও জোয়ার কোথাও বা ভাঁটা লক্ষিত হইয়াছে, আবার কোথাও-কোথাও উহার চিহ্নমাত্রও লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর স্বাধীনতার জয়ই হইতেছে। যত ঘটনায় এই জয় সূচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শেষ ঘটনা রুশিয়ার বিপ্লব; সকল দেশে মানুষের বন্ধুরা ইহাতে আনন্দিত হইয়াছেন। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ হইতে আরম্ভ করিয়া বহুসংখ্যক ব্রিটিশ নেতা ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

রুশিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের আনন্দ।

মানুষের নিজের দুর্দ্দশা দূর না হইলেও অপরের আনন্দ দেখিয়া যে সে সুখী হয়, ইহা মানবপ্রকৃতির একটি মহৎ গুণ। বাঙালীর ও ভারতবাসীর শিরোমণি রাজা রামমোহন রায়ের চরিত্রে এই মহৎগুণ খুব বেশী ছিল। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত তাঁহার জীবনচরিতে লিখিত আছে:—

"রামমোহন রায়ের চিত্ত কেবল স্বদেশের রাজনৈতিক মঙ্গল চিন্তাতেই বদ্ধ ছিল না। সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে তাঁহার একান্ত সহানুভূতি ছিল। যত্নপূর্ব্বক ইয়োরোপীয় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া তিনি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় অবগত হইতেন। কোন স্থানে ন্যায় ও সত্যের জয় হইয়াছে শুনিলে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে স্পেন দেশে নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপনের সংবাদ কলিকাতায় আসিলে, তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তজ্জন্য কলিকাতার টাউন হলে নিজব্যয়ে একটি প্রকাশ্য ভোজ (public dinner) দিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু আডাম সাহেব বলিয়াছিলেন যে পর্টুগাল দেশে উক্তরূপ নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে শুনিয়াও তাঁহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে বিবাদের সংবাদ লইতেন। যাহাতে গ্রীকেরা তুরস্কবাসীদিগের অধীনতা ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হয়, ইহা তিনি একান্ত হৃদয়ে কামনা করিতেন। যখন নেপলস্‌বাসীগণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে, স্বাধীনতা-পক্ষাবলম্বীরা পরাজিত হইতেছেন। রামমোহন রায়ের চিত্ত সে সংবাদ শুনিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। মিঃ বক্‌ন্যাও নামক একজন ইংরেজের সহিত তাঁহার সেদিন সন্ধ্যার সময় সাক্ষাতের কথা ছিল। তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিবার এই কারণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, অপরাহ্নে বিশেষ পরিশ্রমের কার্য্যে তাঁহার শ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ নেপল্‌সের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া মন বিষাদে পূর্ণ হওয়াতে সেদিন তিনি দেখা করিতে যাইতে অক্ষম।

"১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসিবিপ্লবেও তিনি যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডযাত্রাকালে আফ্রিকার দক্ষিণাংশে নেটাল বন্দরে একখানি ফরাসি জাহাজে স্বাধীনতার নিশান উড়িতেছে শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া উহাকে অভিবাদন প্রদান করিতে গিয়া তাঁহার চরণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল।"

এই বিশ্ববন্ধু, ভারতে জাতীয়তার জনক, এবং জগতে বিশ্বজনীনতার কায়মনোবাক্যে সমর্থক বাঙালী-শিরোমণির মত মহত্ত্ব, তাঁহার মত স্বাধীনতাপ্রিয়তা, অতি দুর্লভ। কিন্তু যে বাঙালী-রক্ত তাঁহার দেহে প্রবাহিত হইত, আমাদেরও শরীরে সেই বাঙালীশোণিত প্রবাহিত হইতেছে; তিনি যে বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ুর গুণে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা এখনও রহিয়াছে; আমরা অযোগ্য হইলেও তাঁহারই আধ্যাত্মিক বংশধর। পৃথিবীর কোথাও কোন মানুষ মানুষ হইবার সুযোগ পাইলে আমাদের আনন্দ আপনা-আপনিই উথলিয়া উঠে। রুশীয় সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা দেশের কাজে সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়ায় কত কত জাতির অধীনতাপাশ ছিন্ন হইল। ইহাতে আমাদের কোনও স্বার্থসিদ্ধি না হইলেও আমরা যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি।

রুশিয়ায় রাষ্ট্রবিপ্লব।

রুশীয় রাষ্ট্রবিপ্লবের মত এত বড় একটা পরিবর্ত্তন কখনও কোন দেশে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অল্প রক্তপাতে সাধিত হয় নাই। কিন্তু, আপাতদৃষ্টিতে ইহা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইলেও, বাস্তবিক রুশিয়ার নেতৃবর্গ পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া ইহার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কত জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, কত জন চির-জীবনের জন্য সাইবীরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, কতজন বহুবৎসরব্যাপী কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, কতজন বেত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়াছেন, কতজন রুশীয় পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, কতজন জীবনে যাহা কিছু প্রিয় ও মূল্যবান্ তাহা দেশের মঙ্গলার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন, কতজন দরিদ্র মজুরের বেশে গরীব মজুর ও চাষাদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, কতজন স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? একজন রুশ লেখক বলিয়াছেন, রুশিয়ায় এমন পরিবার কম আছে যাহা হইতে কেহ না কেহ মাতৃভূমির কল্যাণকামনায় আত্মোৎসর্গ করে নাই।

রুশিয়ার অধিবাসীগণের প্রতিনিধিদিগের দ্বারা অতঃপর দেশের সমুদয় কাজ সম্পন্ন হইবে। সম্রাট ও তাঁহার পরিবারের সকলে এবং উৎপীড়ক রাজপুরুষেরা বন্দীদশায় কালযাপন করিতেছেন। প্রতিনিধিনির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার স্ত্রীপুরুষ জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরই থাকিবে। নারীগণ সর্ব্বোচ্চ মন্ত্রীপদ পর্য্যন্ত পাইতে পারিবেন। প্রাণদণ্ড ও বেত্রাঘাত দণ্ড রহিত হইয়াছে। সাইবীরিয়ায় নির্ব্বাসিত স্বদেশপ্রেমিকগণকে মুক্ত করিয়া রুশিয়ায় আনা হইয়াছে।

রুশীয় সাম্রাজ্যে নানা ইউরোপীয় ও এশিয়াজাত জাতির বাস। তাহারা সকলে সমান উন্নত নহে। কিন্তু তাহারা সভ্যতার যে স্তরেই থাকুক না কেন, এখন তাহাদের উন্নতি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুততর বেগে হইতে থাকিবে। এই-সকল জাতির সকলের নাম জানি না। যাহাদের নাম ইংরেজীতে

পড়িয়াছি, তাহাদের নামের ঠিক উচ্চারণও জানি না। এইজন্য কতকগুলি জাতির নাম ইংরেজীতে লিখিতেছি :—

Poles, Bulgarians, Bohemians, and other Slavs; Lithuanians, Letts, Latins, Rumanians, Greeks, Swedes, Norwegians, Danes, Germans, Iranians, Armenians, and other Aryans; Jews, Finns, Esthonians, Lapps, Mordvinians, Karelians, Cheremisses, Syryenians, Permiaks, Votyaks, Samoyeds, Turko-Tatars, Tunguzes, Chuvashes, Bashkirs, Turkomans, Kirghizes, Sarts, Uzbegs, Yakuts, Karakalpaks, Kalmuks, Buriats, Mongols, Circassians, Mingrelians, Imeretians, Lazes, Svanetians, Georgians, and other Caucasians; Chinese, Japanese, and Koreans; Yukaghirs, Koriaks, Chukchis, Eskimos, Ghilaks, Kamchadals, Ainus, and others.

এতগুলি জাতির লোকের ভাগ্যপরিবর্ত্তনের প্রভাব জগতে নিশ্চয়ই অনুভূত হইবে।

রুশীয় বিপ্লবের সম্ভাবিত পরোক্ষ ফল।

রুশীয়দিগের অনেক নেতা বলিয়াছেন, যে, তাঁহারা পররাজ্য অধিকারের বিরোধী। বাস্তবিকও যাহারা সদ্যসদ্য স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং অধীনতার দুঃখ এখনও বিস্মৃত হয় নাই, তাহাদের অপরকে শৃঙ্খলিত করিবার ইচ্ছা না হওয়াই স্বাভাবিক। এইজন্য আমাদের মনে হয়, রুশীয় সাম্রাজ্য যে-সকল জাতির ভয়ের কারণ ছিল, রুশীয় সাধারণতন্ত্র আর তাহাদের আশঙ্কার কারণ না হওয়াই সম্ভব। অনেক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের উপর রুশিয়ার লোলুপ দৃষ্টি আছে মনে করিয়া ইংরেজদের মধ্যে একটা রুশ-আতঙ্ক ছিল। তাহার পর রুশদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সন্ধি হওয়ায় কয়েক বৎসর হইতে সে আতঙ্কের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছিল না। এখন বোধ হয় আর কোন ভয় থাকিবে না।

রুশিয়ার রাজ্যবৃদ্ধির অভিসন্ধির সহিত তুরস্ক, পারস্য ও চীনের ভবিষ্যৎ জড়িত ছিল। এই তিন দেশের এখন আর কোন ভয় নাই বলিতে পারা যায় কি না, স্থির করা কঠিন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে সম্রাটের-অধীন-রুশিয়া দ্বারা তুর্ক, চীন, ও পারসীকদিগের যেরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল, রুশীয়-সাধারণতন্ত্র সেরূপ অনিষ্টের কারণ হইবে না।

রুশিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, উপরে ইহার অধিবাসী যে-সমুদয় জাতির নাম করা হইয়াছে, সকলের মধ্যেই ক্রমে ক্রমে নবজীবন সঞ্চারিত হইবে। এশিয়ার যে-সকল দেশ রুশীয় সাধারণতন্ত্রের সন্নিহিত এবং যাহাদের মধ্যে কোন অত্যুচ্চ পর্ব্বত বা তদ্বিধ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই, সেই-সকল দেশের লোকদিগের মধ্যেও রুশিয়ার নূতন আলোক বিকীর্ণ হইবে।

ইউরোপে যে-সকল দেশে এখনও প্রজাশক্তি সম্পূর্ণ প্রবল হয় নাই, তথায় প্রজাদের প্রভুত্ব সত্বর প্রতিষ্ঠিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। জার্ম্মেনীতে প্রজারা উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়াছে; সম্রাটও মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে ক্ষমতা দিবার আশা দিতেছেন।

রুশিয়া ও ভারতবর্ষ।

পৃথিবীর কোনও দেশ জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতায় উন্নত হইলে অন্য সকল দেশও শীঘ্র বা বিলম্বে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ-ভাবে উপকৃত হয়। এই উপকার ছাড়া রুশীয় বিপ্লবে ভারতবর্ষের কোন লাভ নাই। হয়ত রুশিয়া ও ভারত-বর্ষের মধ্যে বাণিজ্য বিস্তৃতি লাভ করিবে, কিন্তু তাহাতে ভারতের ইষ্ট বা অনিষ্ট হইবে, বলা যায় না। যদি রুশিয়ার শিল্পজাত দ্রব্য ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের স্থান অধিক পরিমাণে অধিকার করে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ক্ষতি হইবে। রুশিয়া হইতে এখন কি কি শিল্পদ্রব্য ভারতে আসে, এবং ভবিষ্যতে আরও কি কি আসিতে পারে, বিশেষজ্ঞেরা যদি তাহা জানেন, তাহা হইলে সে বিষয়ে কিছু লিখিলে ভারতবাসীদের জ্ঞান জন্মিতে পারে।

ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ বিপ্লবপ্রয়াসীদের একটি ক্ষুদ্র দল আছে। চীনে দুই-দুইবার রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছে। এখন রুশিয়াতেও হইল। ইহাতে তাহাদের মনের ভাব কিরূপ হইবে বলিতে পারি না। প্রধান-প্রধান রাষ্ট্রীয়-বিষয়ে ভারতবর্ষের সকল রকম অবস্থা চীন বা রুশিয়ার মত নহে। এইজন্য আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষে চীন বা রুশিয়ার মত বিপ্লব হইতে পারে না, এবং কেহ তাহা ঘটাইবার চেষ্টা করিলে তাহা ব্যর্থ হইবে। অবশ্য ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে। তাহা শীঘ্র হওয়াও দরকার। এই পরিবর্ত্তন শান্তিতে সত্বর সাধিত হয়, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

ভারতবাসীদিগকে অধিকতর রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রদান করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। সাধারণলোকদিগের বিশ্বাস, কাশীতে ভূমিকম্প হয় না, কেননা উহা শিবের ত্রিশূলের

উপর অবস্থিত। কোনও দেশের মানুষের মনের মধ্যে যখন উচ্চাকাঙ্ক্ষাজনিত ভূকম্প হয়, তখন তাহার কাঁপুনি, তাহার ধাক্কা সেই দেশের সীমায় আসিয়াই থামিয়া যায় না। সমস্ত পৃথিবীতে তাহা অল্পাধিক পরিমাণে অনুভূত হয়। এইজন্য দেখিতেছি, জার্মেনীর প্রবল-প্রতাপান্বিত, এক-নায়কত্বের একান্ত পক্ষপাতী সম্রাট্ও প্রজাদিগকে অধিকতর অধিকার দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা জার্মেনী, রুশিয়া প্রভৃতির মত স্বাধীন দেশের অধিবাসী না হইলেও, ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর অন্তর্গত, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা শিবত্রিশূলাগ্রে অবস্থিত কাশীর ন্যায়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত সম্বন্ধরহিত নহে। অন্য সবদেশের চিন্তা, ভাব, আকাঙ্ক্ষা ও কৃতিত্বের উল্লাসের তরঙ্গ এখানেও আসিয়া পৌঁছে। আমাদের ন্যায়-সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া দরকার। ইহা সত্য যে জার্মেনীর মত দেশে কৈসর প্রজাদের দাবীতে কর্ণপাত না করিলে তাহাদের অসন্তোষ যে আকার ধারণ করিতে পারে, ভারতবর্ষে তাহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রজাদের দাবী উপেক্ষিত হইলে গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারতবাসীদের সহযোগিতার ভাব যে কমিয়া যাইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অথচ ভারতবর্ষের উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য এবং ব্রিটিশসাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য, ভারতবাসী ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, ভারতবাসী ও ইংরেজ, এই উভয় পক্ষের আন্তরিক সহযোগিতা আবশ্যক। প্রভুত্ব যাঁহাদের আছে, শক্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা অনেক কঠিন কাজও করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা কেবলমাত্র শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা একটি কাজ করিতে পারেন না,—শাসিতদের আন্তরিক অনুরাগপ্রসূত সহযোগিতা লাভ করিতে পারেন না। এই-হেতু, আমরা মনে করি, ভারতবাসীদিগকে দেশের আভ্যন্তরিক সমুদয় কাজে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের স্বশাসক সমুদয় দেশের মত ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

নূতন কর বসাইবার আভাস।

ভারতবর্ষের রাজস্বসচিব সার্ উইলিয়ম মেয়ার ১৯১৭-১৮ সালের সরকারী আয়ব্যয়ের বজেট ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবার সময় বলেন, যে, তিনি আয়বৃদ্ধির জন্য লবণের উপর শুল্ক বাড়াইলেন না, কৃষিলব্ধ আয়ের উপরও ট্যাক্স বসাইলেন না, কিন্তু প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে লবণের উপর কর বাড়িতে পারে, কৃষির আয়ের উপরও ট্যাক্স বসিতে পারে। ভারতবর্ষকে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, শক্তিতে, শিল্পে, বাণিজ্যে, অন্য সব সভ্যদেশের সমান করিতে হইলে যে নানা বিভাগে আরও ব্যয় করা উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পুরাতন ট্যাক্সের হার বাড়াইয়া বা নূতন ট্যাক্স বসাইয়া আয় বাড়াইয়া তাহা ব্যয় করিতে হইলে, দেখা দরকার যে লোকের ট্যাক্স দিবার ক্ষমতা বাড়িতেছে কি না। মানুষের আয় যদি বাড়ে, তাহা হইলে বেশী করিয়া ট্যাক্স দিবার সামর্থ্যও জন্মে। কিন্তু আমাদের আয় ত বাড়িতেছে না। কৃষি শিল্প আদি দ্বারা আয় বাড়াইবার চেষ্টা আমাদিগকেই করিতে হইবে বটে; কিন্তু এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য এবং উৎসাহও চাই। জার্মেনী, জাপান, প্রভৃতি নানা সভ্যদেশের ইতিহাস হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে সরকারী চেষ্টা এবং দেশের লোকের চেষ্টা উভয়ের ফলে লোকের আয় বাড়িয়াছে। আমাদের দেশেও এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা সরকারের সাহায্য ও উৎসাহের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে বেকুবী হইবে; আমাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে আমাদের আয় বাড়াইবার জন্য সম্যক্ আন্তরিক চেষ্টা করিবার আগেই ট্যাক্স বাড়াইবার কথা বলিতেছেন, ইহা সঙ্গত বোধ হইতেছে না।

যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য, যুদ্ধঋণের জন্য এবং অন্যান্য কারণে ভারতবর্ষের সরকারী ব্যয় বাড়িয়াছে। সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য শিক্ষা প্রভৃতি বিভাগে ব্যয় সংক্ষেপ করা হইয়াছে এবং নূতন ট্যাক্সও বসান হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ হইতেছে বলিয়াই ত আমাদের দেশে অজ্ঞতা কমে নাই, রোগ কমে নাই, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় নাই, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ও বিস্তৃতি হয় নাই। এই-সকল দিকে মন দেওয়ার প্রয়োজন পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। সেইজন্য দেশের প্রতিনিধিরা গবর্ণমেণ্টকে শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য বেশী করিয়া খরচ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। তাহার উত্তরে বঙ্গের গবর্ণর লর্ড রোনাল্ডশে বলিয়াছেন, "ব্যবস্থাপক সভার এখন ছুটি হইল, এখন নির্ব্বাচিত মহাশয়েরা ভাবুন যে ট্যাক্স বাড়াইয়া

কিরূপে আর বাড়িতে পারে; এবং দেশের লোককে আরও ট্যাক্স দিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে বলুন ও রাজী করুন।”

গবর্ণর-মহাশয় তামাসা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু আমরা বলি, আমাদের আয় কি বাড়িয়াছে যে আমরা আরও ট্যাক্স দিতে পারিব? তা ছাড়া, বঙ্গের যে সরকারী আয় আছে, তাহার কি ঠিক্ যথাযথ ব্যয় হয়? যে-সব মোটা-মোটা বেতনের কাজে ইংরেজ কর্ম্মচারীরা নিযুক্ত আছেন, তাহার অধিকাংশেই অনেক কম বেতনে দেশী যোগ্য লোক নিযুক্ত করিয়া দেশের কাজ চালাইতে পারা যায়। ইংরেজ-দিগকে অত্যন্ত বেশী বেতন দেওয়া হয় বলিয়া ঐ উচ্চ হারের সহিত কতকটা সঙ্গতি রক্ষার জন্য দেশী অনেক কর্ম্মচারীকেও বেশী বেতন দেওয়া হয়; অথচ শিক্ষক, কেরানী, পুলিশ কনষ্টেবল, পেয়াদা, প্রভৃতিকে অত্যন্ত কম বেতন দেওয়া হয়। ইংরেজ নিয়োগের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল যোগ্যতার বিচার করিয়া কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলে খুব ব্যয়-সংক্ষেপ হইতে পারে। পুলিশবিভাগের ব্যয়ও অত্যন্ত বাড়িয়াছে। ইহাও কমান যাইতে পারে। এইরূপে যে টাকা বাঁচিবে, তাহাদ্বারা দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করা যাইতে পারে। তাহাতে লোকদের উপার্জ্জন করিবার শক্তি এবং আয় বাড়িবে। তখন ট্যাক্স বাড়াইয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া দেশকে আরও উন্নত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বেশী করিয়া খরচ করিতে পারিবেন। ইহাই ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক পন্থা। গবর্ণমেণ্ট যে বলিতেছেন, আরও ট্যাক্স দাও, তাহা হইলে তোমাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য আদির বন্দোবস্ত করিব, ইহা ঠিক্ পথ নয়।

লর্ড রোনাল্ডশে বেশী ট্যাক্স চাহিতেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতির ইতিহাসে "No taxation without representation" বলিয়া যে কথা বার বার শুনা গিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষেও প্রযুজ্য মনে করি। আমরা ট্যাক্সও দিব, এবং কি ভাবে কি কাজের জন্য তাহা ব্যয়িত হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতাও আমাদের থাকিবে, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ ব্যবস্থা করুন। আমরা জানি দেশের করভার আরও বৃদ্ধি পাইলে দেশের লোকের আহার কমিবে, রোগ বাড়িবে; তথাপি যদি গবর্ণমেণ্ট আমাদের নিকট হইতে সংগৃহীত রাজস্ব কিরূপে ব্যয়িত হইবে তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা আমাদিগকে দেন, তাহা হইলে প্রয়োজন-মত ট্যাক্স বৃদ্ধিতে আমরা সম্মতি দিতে পারি।

গত শতাব্দীতে যখন জমীর উপর রোড-সেস্ বসে, তখন দেশের লোক আপত্তি করিয়াছিল। তখন ভারতসচিবের কৌন্সিলের অর্দ্ধেক সভ্য (সবাই ইংরেজ) আপত্তি করিয়া-ছিলেন। ভারতসচিব রোড্‌সেস্ বসানই স্থির করেন, এবং এই অঙ্গীকার করেন যে ইহার টাকা করদাতাদের অভিপ্রায় অনুসারে গ্রাম্য রাস্তা, গ্রাম হইতে জলনিঃসারণ এবং গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য ব্যয়িত হইবে। সম্পূর্ণরূপে করদাতাদের অভিপ্রায় অনুসারে ব্যয়ের ব্যবস্থা লর্ড রোনাল্ডশে করিতে পারিলে চিরস্মরণীয় হইবেন। লর্ড কার-মাইকেলের শাসনকালে, রোড্‌সেস্ যে-জন্য স্থাপিত হয়, তজ্জন্য ব্যয় করিবার আদেশ হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে বহু বহু বৎসর ধরিয়া রোড্‌সেসের লক্ষ লক্ষ টাকা উহা যাহার জন্য অভিপ্রেত কেবল তাহাতে ব্যয়িত না হইয়া অন্য কাজেও ব্যয় হইত। নূতন ট্যাক্স না বসাইয়া গবর্ণমেণ্ট এই-সব অন্যকাজে ব্যয়িত টাকা সুদসমেত গ্রামসমূহের উন্নতির জন্য ব্যয় করিলে প্রভূত কল্যাণ হয়।

বঙ্গে পুলিশের ব্যয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাবু ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় দেখাইয়া-ছেন যে ১৯১২-১৩ সাল হইতে শিক্ষা-ও-স্বাস্থ্য-ব্যয়ের তুলনায় পুলিসের ব্যয় কিরূপ বাড়িয়াছে। ১৯১২-১৩ সালে পুলিসের ব্যয় ছিল ৮৪ লক্ষ টাকা। তাহা বাড়িয়া গত বজেটে ১ কোটি ৩৪ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে ৫০ লক্ষ বা শতকরা ৬০ টাকা বাড়িয়াছে। ১৯১২-১৩তে শিক্ষার ব্যয় ছিল ৭৫ লক্ষ টাকা, গত বজেটে হইয়াছে ৯৮ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ ৫ বৎসরে ২৩ লক্ষ বা শতকরা ৩০ টাকা বাড়িয়াছে। ১৯১২-১৩তে স্বাস্থ্যবিভাগের ব্যয় ছিল ৭ লক্ষ ৬৪ হাজার, গত বজেটে হইয়াছে ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার; অর্থাৎ ৫ বৎসরে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার বা শতকরা ২২ টাকা কমিয়াছে।

১৯১২-১৩তে বঙ্গের মোট প্রাদেশিক ব্যয় ছিল ৫ কোটি ৭০ লক্ষ, গত বজেটে হইয়াছে ৬ কোটি ৭৭ লক্ষ; অর্থাৎ মোটব্যয় শতকরা ১৯ টাকা বাড়িয়াছে। পুলিশের ব্যয় কিন্তু বাড়িয়াছে শতকরা ৬০ টাকা। ১৯১২-১৩ সালে

পুলিস-ব্যয় মোট ব্যয়ের ১/৭, শিক্ষা-ব্যয় ১/৮ এবং স্বাস্থ্যোন্নতি-ব্যয় ১/৮০ ছিল। গত বজেটে পুলিস-ব্যয় হইয়াছে মোট-ব্যয়ের ১/৫এর অধিক, শিক্ষাব্যয় ১/৯ এবং স্বাস্থ্যোন্নতি-ব্যয় ১/১৬০রও কম।

ব্যবস্থাপক সভায় বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় বলেন যে যুদ্ধের ওজুহাতে প্রাথমিক ও তদূর্দ্ধ স্তরের শিক্ষার উন্নতি, স্বাস্থ্যোন্নতি, পানীয় জল, প্রভৃতির জন্য ব্যয় স্থগিত করা হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধের মধ্যেই পুলিস-ব্যয় শতকরা ৩৩ টাকা এবং গত পাঁচ বৎসরে শতকরা ৬০ টাকা বাড়িয়াছে।

পুলিস-ব্যয় বৃদ্ধির কারণ।

পুলিস ব্যয় বৃদ্ধির কারণ দেখাইয়া গবর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন, দেশে সাধারণ অপরাধ এবং রাজনৈতিক অপরাধ বাড়িতেছে; উহা দমন করিবার জন্য পুলিসের ব্যয় বাড়ান দরকার। আমরাও ইহা চাই না যে আমাদের সর্ব্বস্ব চুরি যায়, আমাদের মানইজ্জৎ নষ্ট হয়, আমাদের হাত পা কেহ ভাঙ্গিয়া দেয়, কেহ আমাদের প্রাণবধ করে। কিন্তু দেশে অপরাধের সংখ্যা কমাইতে হইলে তাহার উৎপত্তি নির্ণয় করিয়া অপরাধ হইতে না দেওয়াই শ্রেষ্ঠ পন্থা। রোগ হইলে তাহা ধরিতে পারা এবং তাহার চিকিৎসা করান অপেক্ষা, রোগ যাহাতে না হয় এরূপ বন্দোবস্ত করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

দেখা যাক্, রাজদ্বারে দণ্ডনীয়-অপরাধ প্রধানতঃ কি কি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, এবং তাহাদের উৎপত্তি কোথায়। এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা নামক সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক ইংরেজী বিশ্বকোষ এবম্বিধ অপরাধসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং ইংলণ্ডে একশত অপরাধের মধ্যে কোন্ রকমের অপরাধ কত অংশ তাহাও উহাতে লিখিত হইয়াছে। যথা—(ক) হিংসাদ্বেষ-জাত শতকরা ১৫, (খ) পরধনে-লোভ-জাত ৭৫, এবং (গ) কামুকতা-জাত ১০। ইংলণ্ড প্রজাতন্ত্র স্বাধীন দেশ বলিয়া তথায় রাজনৈতিক অপরাধ বিদ্যমান না থাকায়, তালিকায় তাহার উল্লেখ নাই। দেখা যাইতেছে, যে, ইংলণ্ডে লোকে দারিদ্র্য-ও-লোভ-বশতঃ চুরি আদি সম্পত্তিঘটিত অপরাধই বেশী করে। এরূপ অপরাধ ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে আরও অধিক হয়। সুতরাং দারিদ্র্য-নিবারণ অপরাধ-প্রতিষেধের একটি প্রধান উপায়। দারিদ্র্য কমাইবার প্রধান উপায়—সাধারণ শিক্ষা কৃষিশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষা দ্বারা মানুষকে বেশী উপার্জনক্ষম করা। অতএব শিক্ষাবিভাগের ব্যয় বাড়াইলে পরোক্ষভাবে পুলিসের ব্যয় কমাইতে পারা যায়। রাজনৈতিক অপরাধের অস্তিত্বই ইংলণ্ডের তালিকায় নাই। সুতরাং রাজনৈতিক অপরাধ নির্ম্মূল করার প্রকৃষ্ট উপায়, দেশকে ইংলণ্ডের মত করা; অর্থাৎ ইংলণ্ডে প্রজাদের মত-অনুসারে যেমন কাজ হয়, এখানেও তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়া ভারতবর্ষকে স্বশাসক করা। বাকী দুই শ্রেণীর অপরাধ এবং সর্ব্ববিধ অপরাধ কমাইতে পারা যায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি দ্বারা। সুশিক্ষা ও সৎসংসর্গ দ্বারা বাল্যকাল হইতে মানুষের নৈতিক সুস্থতা রক্ষিত না হইলে, দেশের স্বাস্থ্য খারাপ হইলে, এবং লোকে ভাল করিয়া খাইতে না পাইলে যে অপরাধীর সংখ্যা বাড়ে সে বিষয়ে এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার মত উদ্ধৃত করিতেছি:—

> "The growth of criminals is greatly stimulated where people are badly fed, morally and physically unhealthy, infected with any forms of disease and vice. In such circumstances, moreover, there is too often the evil influence of heredity and example." *Encyclopaedia Britannica*, Vol. VII, p. 448.

অতএব অপরাধী ধরিয়া শাস্তি দিবার জন্য এবং অপরাধ নিবারণের জন্য, গবর্ণমেণ্ট কেবল ক্রমাগত পুলিশের ব্যয় না বাড়াইয়া, সুশিক্ষা দিতে, কৃষিশিল্পের উন্নতি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে এবং প্রজাদিগকে স্বশাসন-ক্ষমতা প্রদান করিতে মনোযোগী হউন। তাহা হইলে পুলিশের ব্যয় অনেক কমিবে, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত পুলিস কর্ম্মচারীর অত্যাচার কমিবে, দেশে সন্তোষ বৃদ্ধি হইবে, এবং সকল বিষয়ে দেশের উন্নতি হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নচুরি।

ইহা সাতিশয় দুঃখের বিষয় যে প্রথমবারের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি যাওয়ার পর দ্বিতীয় বার পরীক্ষা গৃহীত হইবার পূর্ব্বে তাহার প্রশ্নও চুরি যাওয়ায় ঐ পরীক্ষা নাকচ হইয়াছে, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে, এই মের পূর্ব্বে আর পরীক্ষা গৃহীত হইবে না। ছাত্রদিগকে অনিশ্চয়ের যন্ত্রণার মধ্যে না রাখিয়া

কবে পরীক্ষা হইবে, তাহাও শীঘ্র জানান উচিত। যাহারা এই বিভ্রাট ঘটাইতেছে, তাহারা অতি দুর্বৃত্ত এবং সমাজের শত্রু। তাহাদিগকে ধরাইয়া দিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সকলে সাহায্য প্রদান করুন। বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহারা এক চুরির অনুসন্ধান শেষ করিতে না করিতে আরও, একবার নয়, তিনবার চুরি হইয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যেরা খুব বিদ্বান্ হইলেও চোর-ধরা বিদ্যায় তাঁহাদের হাতেখড়ি পর্য্যন্তও যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বা লজ্জার বিষয় না হইতে পারে। শুনিতেছি তাঁহারা খুব চেষ্টা করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে উৎকোচগ্রাহী একজনকেও বাঁচাইবার চেষ্টা যেন না হয়। ফল কি হয় দেখা যাক্। উচ্চশিক্ষাকে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করা আবশ্যক।

বার বার প্রশ্ন চুরি যাওয়া কাহার কাহার পক্ষে লজ্জার বিষয় তাহাও বুঝিয়া দেখা দরকার। আমরা গত মাসের প্রবাসীতে লিখিয়াছি, কি কি রূপে কোন্ কোন্ স্থান হইতে প্রশ্ন চুরি যাইতে পারে। অবশ্য প্রধান অপরাধী—চোরেরা ও উৎকোচগ্রাহীরা। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যদি চুরি গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য ফেলোরাও দায়ী নহেন, সীণ্ডিকেটের সভ্যেরাও দায়ী নহেন, ভাইস্‌চ্যান্সেলারও সাক্ষাৎ ভাবে দায়ী নহেন; বিভ্রাটের জন্য সাক্ষাৎ ভাবে দায়ী রেজিষ্ট্রার, এবং দায়ী তাঁহার সেই-সব সহকারী যাঁহারা ছাপাখানা হইতে প্রশ্ন আনয়ন করেন ও নানা স্থানে তাহা প্রেরণ করেন। অবশ্য যদি ফেলোগণ, সীণ্ডিকেটের সভ্যগণ ও ভাইস্‌চ্যান্সেলার চোর ধরিবার ও ধরাইবার জন্য যতদূর সম্ভব ততদূর চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নামেও কলঙ্ক স্পর্শিবে। আগে আগে এইরূপ ব্যাপারে সংসৃষ্ট লোকদিগকে শাস্তি দিবার জন্য যদি তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান বিভ্রাটের জন্যও তাঁহারা কতকটা দায়ী।

যে-সকল খবরের কাগজ পরীক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে চুরি-করা প্রশ্ন ছাপিয়াছেন, তাঁহাদেরও চোর ধরাইয়া দিতে যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা কি সূত্রে কাহার নিকট হইতে প্রশ্ন পাইলেন, ঠিকানাসহ [illegible] বৃত্তান্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে জানান উচিত। তাঁহারা পরীক্ষার দিনের ২।৩ দিন আগেও প্রশ্ন জানিতে পারিয়া থাকিলে উহা কাগজে না ছাপিয়া ভাইস্‌চ্যান্সেলারকে জানাইলে ভাল হইত। বিশ্ববিদ্যালয়কে অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া, ছাত্রদিগকে দুই তিনবার করিয়া পরীক্ষা দেওয়াইয়া লাভ কি? যে-সব ছাত্র ও শিক্ষক প্রশ্ন জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও এ বিষয়ে গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। অন্য প্রদেশে বা অন্য দেশেও কখন কখন এইরূপ চুরি ঘটিয়াছে, বা অনেক সভ্য স্বাধীন দেশে খুব গোপনীয় রাজকার্য্যসম্বন্ধীয় কথা প্রকাশিত হইয়া যায় বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নচুরি ব্যাপারটা বাঙালীর পক্ষে গৌরবের বিষয় হইতে পারে না। এরূপ ব্যাপার যাহাদের মধ্যেই ঘটুক না, ইহা লজ্জার কথা, সুতরাং আমাদেরও ইহা কলঙ্ক। এই কলঙ্ককালিমা মুছিয়া ফেলিবার জন্য এবং উচ্চশিক্ষার সমুদয় বিঘ্ন বিনাশ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টিত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি যায়, দ্বিতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি যায়, আই-এ এবং আই-এস্‌সী পরীক্ষারও কোন কোন প্রশ্ন চুরি গিয়াছিল শুনা যায়, এবং সর্ব্বশেষে বি-এ ও বি-এস্‌সী পরীক্ষার গণিতের একটি প্রশ্নপত্র বাহির হইয়া পড়ায়, গণিতের যে-যে বিষয়ের প্রশ্ন তাহাতে ছিল, তাহার পরীক্ষা পুনর্ব্বার গৃহীত হইবে। আমরা জানি না আই-এ, আই-এস্‌সী, বি-এ, ও বি-এস্‌সী পরীক্ষার যে-সকল প্রশ্নপত্র চুরি হইয়াছে, সেগুলি কলিকাতার ছাপা, না বিলাতের ছাপা। শুনিয়াছি বি-এ, বি-এস্‌সীর গণিতের যে প্রশ্নপত্র চুরি হইয়াছিল, তাহা কলিকাতার একটি গবর্ণমেণ্ট প্রেসে ছাপা। সেখান হইতে প্রশ্ন বাহির হইয়া থাকিতে পারে।

আমরা বাহিরের লোক, খাঁটি-খবর আমাদের পাইবার সম্ভাবনা কম। তথাপি যাহা গুজব রটিয়াছে, তাহা লিখিতেছি; যেহেতু ইহাতে কিছু সত্য থাকিলে অনুসন্ধান সাহায্য হইবে। গুজব এই যে—

দ্বিতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের দুটি ছাপাখানায় ছাপা হইয়াছিল। এই দুই ছাপাখানার কর্ত্তৃপক্ষ. প্রশ্ন গোপনে থাকিবেই, এরূপ কোন দায়িত্ব গ্রহণ

করেন নাই। [খুব গোপনীয় সরকারী জিনিষ এখানে ছাপা হয়। তাহার দায়িত্ব প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন। তবে এস্থলে তাঁহারা রাজী হইলেন না কেন?] তাঁহারা দায়িত্ব না লওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় তত্ত্বাব- ধানের ভার লয়েন।

নিম্নলিখিত বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক্ তথ্য নির্দ্ধারণ করুন;—(১) দুটি প্রেসের যে-যে কামরায় প্রশ্ন কম্পোজ হইয়াছিল, তাহাতে সর্ব্বক্ষণ এক এক জন সম্পূর্ণ বিশ্বাসী তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন কি না। (২) যে-যে কামরায় প্রশ্নপত্র ছাপা হইয়াছিল, তাহাতে ছাপার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন কি না। (৩) ছাপা শেষ হইবার পর প্রেসের বেড্ হইতে কম্পোজ-করা ম্যাটার তত্ত্বাবধায়কের সম্মুখে ডিষ্ট্রিবিউট্ করান হইয়াছিল কি না। (৪) কেবলমাত্র অক্ষর-পরিচয় আছে এরূপ কম্পোজিটর নিযুক্ত হইয়াছিল, না লেখা-পড়া-জানা কম্পোজিটর নিযুক্ত হইয়াছিল? (৫) একজন কম্পোজিটর গণিতের একটি প্রশ্নের ভুল ধরিয়াছিল কি না?

বার বার পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের অর্থনাশ হইতেছে; তাহা সহ্য করিবার মত অবস্থা অনেকের নাই। থাকিলেই বা অপব্যয় কেন হইবে? তদপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি তাহাদের স্বাস্থ্যহানি, এবং দুইতিনমাসব্যাপী উদ্বেগ ও আশঙ্কা। বার বার পরীক্ষা দেওয়া ও অনিশ্চয়ের মধ্যে কাল কাটান বড়ই কষ্টকর। শীঘ্র তাহাদের যন্ত্রণার নিবৃত্তি হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা লঘুচিত্তে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দোষ দিতে চাই না। আমরা জানি তাঁহাদের কাজ কত কঠিন। কিন্তু কাজ কঠিন হইলেও, দায়িত্ববোধ যথেষ্ট থাকা চাই। যেমন কঠিন কাজ, যেমন দায়িত্ব, তেমনি সম্মান ও যশও আছে। সম্মান ও যশের উপযুক্ত যোগ্যতা, কর্ম্মিষ্ঠতা, দৃঢ়চিত্ততা এবং যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের ক্ষমতা থাকা চাই।

একটা গুজব রটিয়াছে যে প্রবেশিকা পরীক্ষা আর এবৎসর হইবে না। তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীরা কি এবৎসর কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারিবে না? তাহাদের জীবনের এক বৎসর সময় বিনা দোষে নষ্ট হইবে? একথা বিশ্বাস-যোগ্য বোধ হয় না। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে এবার ছাত্র ভর্ত্তি না হইলে বেসরকারী কলেজগুলি চলিবে কিরূপে, এবং অন্যান্য কলেজে যে-সব অধ্যাপক ঐ শ্রেণীতে পড়ান, তাঁহাদিগকে কি জোর করিয়া এক বৎসরের ছুটি দেওয়া হইবে, না তাঁহারা বিনা পরিশ্রমে বেতন পাইতে থাকিবেন?

শুনিতেছি বিশ্ববিদ্যালয় সমুদয় স্কুলের টেষ্ট পরীক্ষায় ছাত্রদের নম্বর জানিতে চাহিয়াছেন। সব স্কুলের টেষ্টের প্রশ্ন এক ছিল না, সমান কঠিন ছিল না, পরীক্ষকেরাও সমান কড়া ছিলেন না। তথাপি, যাহারা টেষ্টে পাস হইয়াছিল, তাহাদিগকে, শ্রেণীবিভক্ত না করিয়া, কেবল পাস্ করিয়া দিলে, অযোগ্য কেহ সহজে, ফাঁকি দিয়া, পাস্ হইল এরূপ বলা যাইবে না। কিন্তু টেষ্টের ফল অনুসারে কাহাকেও বৃত্তি দেওয়া চলিতেই পারে না; তাহার উপায় কি হইবে? যাহারা টেষ্টে পাস্ হইয়াছে, কেবল তাহাদিগকে পাস্ করিয়া দিলে, কতকগুলি যোগ্য ছেলের প্রতি অবিচার হইবে। অনেক ছেলে টেষ্টে ফেল্ হয়, কিন্তু প্রবেশিকায়, এমন কি প্রথম বিভাগে, পাস্ হয়। তাহাদের প্রতি অবিচার হইবে। কোন স্কুলের টেষ্টের প্রশ্ন সহজ, কাহারও শক্ত হয়। এক স্কুলের পরীক্ষা শক্ত বলিয়া একজন ফেল্ হইল, অন্যস্কুলের পরীক্ষা সহজ বলিয়া তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট আর-একজন পাস্ হইল। টেষ্ট পরীক্ষার ফল অনুসারে পাস্ ফেল করিলে, প্রথমোক্ত ছাত্রের প্রতি অবিচার হইবে। ইহাও শুনিতেছি, এক এক কেন্দ্রে এক এক রকম প্রশ্নাবলীর দ্বারা প্রবেশিকা পরীক্ষা আবার গৃহীত হইবে। ইহা মন্দের ভাল বটে, কিন্তু এরূপ হইলে, সকল ছেলের জন্য যোগ্যতার মাপকাটি এক হইবে না, এবং এতদনুসারে বৃত্তি দিলে সুবিচার হইবে না।—যাহা হউক, শীঘ্র কিছু সমীচীন ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা যে-সব বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহার প্রায় সমস্তই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের উপর নির্ভর করে। নূতন নূতন বৃত্তি ও ব্যবসা, নূতন নূতন উপার্জ্জনের পথ খুলিয়া দিলে, পাসের দাম কমে, এবং চুরি করিয়া পাস্ করিবার প্রলোভনও কম হয়। এদিকে গবর্ণমেণ্টের ও দেশনায়কদের অধিকতর দৃষ্টি দরকার। সর্ব্বোপরি দরকার, সেই শিক্ষা, যাহা সাধুতা ও জ্ঞানকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া মানুষের দৃঢ় ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারে।



বাথিতা।

প্রাচীন চিত্র হইতে

চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের সৌজন্যে।

চৈতন্যদেবের ভাব ও প্রভাব

কোনও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের প্রভাবের কথা চিন্তা করিতে গেলে প্রথমেই তাঁহার ধর্ম্মমতের দিকে ও তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের রীতিনীতি ও গঠনপ্রণালীর দিকে দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু নূতন মত ও নূতন সমাজরীতির প্রবর্ত্তনে সে প্রভাবের প্রকৃত পরিচয় অতি সামান্যই লাভ করা যায়। মানুষের চিন্তা, আশা, ভাব, স্বভাব, এ-সকল তাহার মতামত ও সামাজিক রীতিনীতি অপেক্ষা অনেক অধিক অন্তরের বস্তু। চৈতন্যদেবের প্রভাব এদেশে মানুষের জীবনের ঐ অন্তরতম অংশ পর্য্যন্ত গিয়া পৌছিয়াছিল।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে একদিন আলমারী হইতে কতকগুলি পুরাতন পোকায়-কাটা বই বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতেছিলাম। তার মধ্যে একখানি বটতলার ছাপা বই হাতে লইয়া দু-এক পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। কদর্য্য মলাট, কর্কশ কাগজ, অপকৃষ্ট ছাপা, কিম্ভূতকিমাকার নাম 'হাটপত্তন'! চোখে এইগুলি দেখিয়া লইতে ও মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে এক মুহূর্ত্তও লাগিল না। কিন্তু বইয়ের প্রথম দুই পংক্তির উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র মন স্তম্ভিত হইয়া গেল।

'প্রণমিহ কলিযুগ সর্ব্বযুগসার।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রচার॥'

কি আশ্চর্য্য কথা! হাজার বৎসর ধরিয়া যে কলিযুগ প্রতি-শাস্ত্রে, প্রতি-গ্রন্থে নিন্দিত, সেই কলিযুগ নমস্য! যে জাতির মানুষ চিরকাল বলিয়া আসিয়াছে স্বর্ণযুগ, সত্যযুগ পশ্চাতে, তাহার মুখে এ কি কথা! এ কি আশাশীলতা! এ কি বর্ত্তমানে শ্রদ্ধা! চারিশত বৎসর পূর্ব্বে আমার দেশবাসী একজন তাঁর যুগকে, তাঁর সময়কে এমন শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন, আর আমাদের সমসাময়িক বাঙ্গালীরা কেন সে শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিলেন? কোনও জাতির জীবনে নিরাশার ভাবের মত এমন গুরুভার বুঝি আর কিছু নাই; আর এই নিরাশার বোঝা যে তুলিয়া ফেলিতে পারে, সে-শক্তির সমান কোনও শক্তিও বুঝি আর নাই। পর্ব্বতের গায়ে যেখানে দেখা যায় যে পাথরের স্তরের রেখাগুলি আর সমতল নয়, ক্রমে উদ্ধমুখে উঠিয়াছে, সেখানে দাঁড়াইয়া যেমন মন অনুভব করে, অতীতের কোনও এক যুগে ভূগর্ভের কি এক বিপুল শক্তি এই স্থানে উপরের গুরুভার শিলার স্তরগুলিকে উত্তোলন করিয়াছিল, সেই পুস্তকখানি হাতে লইয়া মন তেমনি অনুভব করিতে লাগিল, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যদেবের প্রভাব বাংলাদেশে মানুষের হৃদয়ে কি বিপুল শক্তি প্রয়োগ করিয়া, যুগাযুগান্তরের সঞ্চিত এই নিরাশার ও বর্ত্তমানে অবজ্ঞার ভারকে এমন করিয়া ঠেলিয়া ফেলিতে পারিয়াছিল।

স্বীয় যুগকে যাহারা শ্রদ্ধা করে না, এমন মানুষের হাতে দেশের ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিবার ভার বিধাতা কখনও দেন না। চৈতন্যদেবের প্রভাবের মধ্যে যাঁহারা পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা স্বীয় যুগকে শ্রদ্ধা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই দেশের জীবনে নিজেদের ছাপ এমন করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন।

এই বর্ত্তমানে শ্রদ্ধার ফলে তখনকার বাংলা সাহিত্যে জীবনচরিত লেখার রীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল। ইহার পূর্ব্বে হরগৌরী, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, প্রভৃতি পুরাণে বর্ণিত দেবতা, রাজা ও অসাধারণ মানুষের চরিতকাহিনীই বাংলা কবিতায় বর্ণিত হইত; জীবিত কোনও মানুষের চরিতবর্ণনা বোধ হয় কবির লেখনীর অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব লেখকগণের কৃপায় আমরা তাঁহাদের সমসাময়িক ভক্তগণের জীবনের সুন্দর চিত্রাবলী দেখিতে পাইতেছি। কল্পিত সত্য, ত্রেতা, ও দ্বাপর যুগ; দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস; অমরাবতী, কৈলাস পর্ব্বত, অযোধ্যা, হস্তিনাপুর; অতিপ্রাকৃত যুদ্ধবিগ্রহ, অযুতবর্ষব্যাপী তপস্যা, আকাশে ও পাতালে বিচরণ; ক্ষত্রিয়গণের আসূর্য্যচন্দ্রবিলম্বিত দীর্ঘ বংশাবলী,—এসকলের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ক্লান্ত পাঠকের মন এই সরল বিনীত লেখকগণের গ্রন্থে বাংলার পল্লীচিত্র, বাঙ্গালীর ঘরের সুখদুঃখের ছবি, সত্যকার দেশ-ভ্রমণের বিবরণ, ভক্তগণের সামান্য কুলের সত্য বর্ণনা, দেখিতে পাইয়া যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাচে।

তারপর দেখিতে পাই, চৈতন্যদেবের প্রভাব মানুষকে মানুষ বলিয়াই শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দিয়াছে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে জাতিভেদ এ সময় অপেক্ষা কত

অধিক প্রখর ছিল। অনেকে বলেন, ভারতের যে যে অংশ অনার্য্যপ্রধান সেই-সেই অংশেই প্রাচীনকালে জাতিভেদের প্রখরতা অধিক হইয়াছিল; আর্য্যগণ প্রথমতঃ অনার্য্যসংস্রব হইতে ঘৃণায় আপনাদিগকে দূরে রাখিয়াছেন, পরে সমাজের প্রতি-স্তরের মানুষ সেই দূরতা রক্ষার ভাব শিক্ষা করিয়া ও অনুকরণ করিয়া জাতিবৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্যের উল্লেখ করেন। সে যাহা হউক, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে বঙ্গদেশে জাতিভেদের প্রখরতা অধিক হইবার আরও কয়েকটি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। তখনও বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বিকৃত বৌদ্ধপূজা নানা আকারে বিদ্যমান থাকিয়া ব্রাহ্মণসমাজের ঘৃণা উৎপাদন করিতেছিল; তিন শতাব্দীর মুসলমানশাসনে ক্রমাগত বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আত্মপ্রাধান্য রক্ষার প্রয়াস অতি তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল; তিন শত বৎসর ধরিয়া বল্লাল-প্রবর্ত্তিত কৌলীন্যপ্রথা সমাজের নানাভাগে-বিভক্ত দেহকে আরও খণ্ডবিখণ্ড করিতেছিল। যখন এই ভেদবুদ্ধিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্মৃতির ব্যবহার দ্বারা চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা চলিতেছিল, এমন সময়ে চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মান্দোলন ইহাকে অস্বীকার করিয়া, উচ্চ নীচ সকল মানুষকে মানুষ বলিয়া বুকে টানিয়া লইতে অগ্রসর হইল। সে যুগের পক্ষে এ প্রয়াস কি সাহসের ব্যাপার, সে যুগের পক্ষে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, হিন্দু ও 'যবন' সকলকে লইয়া এক ধর্ম্মমণ্ডলীগঠনের সঙ্কল্প কিরূপ আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণ নরহরি চক্রবর্ত্তী যখন শূদ্র নরোত্তম দাসকে গুরু বলিয়া বরণ করিলেন, ও স্বীয় গ্রন্থে তাঁহাকে অসংখ্যবার প্রণাম করিলেন, সে যুগের পক্ষে তাহা কত বড় পরিবর্ত্তন!

এই মানবে শ্রদ্ধার পরিচয় আমরা সে যুগের আরও একটি বিষয় হইতে প্রাপ্ত হই। তখনকার বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ কিরূপ গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্বীয় সঙ্গিগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আধুনিক কালের পাঠকগণের বিস্ময় উৎপন্ন হয়। একমণ্ডলীভুক্ত ও একক্রিয় লোকেদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা কত কঠিন, আমরা তাহা জানি। দীর্ঘকাল নিকটে বাস করিতে করিতে, পরস্পরের দোষ দুর্ব্বলতা দেখিতে দেখিতে, শেষে আর পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধার যোগ্য কিছু আছে বলিয়া বিশ্বাস থাকে না। ক্রমশঃ হয়তো পরস্পরের সংঘর্ষণ ও তজ্জনিত বিবাদবিসংবাদই প্রবল হইয়া উঠে, ও সে মণ্ডলীর শক্তিকে খর্ব্ব করে। সমসাময়িক মানুষকে শ্রদ্ধা দিতে পারা, সঙ্গীদের দোষগুলি ভুলিয়া ও গুণগুলি মনে রাখিতে পারা—সজীব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একটি লক্ষণ। বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ স্বীয় গ্রন্থে সঙ্গীদিগকে এই শ্রদ্ধা দিয়াছেন; তাঁহাদের গ্রন্থারম্ভে শুধু মহাপুরুষ চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের নয়, সকল বন্ধুগণের নাম শ্রদ্ধা ও নমস্কার সহযোগে উচ্চারিত হইয়াছে।

মানবে শ্রদ্ধা সে সময়কার বাংলা সাহিত্যে আরও একটি নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছিল। পূর্ব্বে কোনও কবি স্বীয় কাব্যরচনার হেতু নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতেন, কোনও দেবতার আদেশ, দেবতার বর বা দেবতার স্বপ্ন তাঁহাকে সে-কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছে। শ্রদ্ধেয় দীনেশ-বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পাঠ করিলে ইহার অজস্র দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কৃত্তিবাস সরস্বতীর বরে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। মালাধর বসু ব্যাসদেবের স্বপ্নাদেশে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য লিখিয়াছিলেন। পদ্মাপুরাণের কবি বিজয়গুপ্তকে মনসাদেবী স্বপ্নে দেখা দিয়া শুধু কাব্যরচনা করিতে আদেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; পূর্ব্বতন এক কবির ঐ বিষয়ের কবিতাকে অসংলগ্ন উক্তির আধার ও মূর্খের রচনা বলিয়া সমালোচনাও করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ভারতচন্দ্রও এই স্বপ্নলব্ধ দৈবী সমালোচনার সুযোগ গ্রহণ করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার বেলায় সমালোচনাটি অগ্রিম হইয়াছিল; ভগবতী আগেই বলিয়া দিয়াছিলেন, যে, ভারতচন্দ্রের কাব্যখানি অতি চমৎকার হইবে, ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'রায় গুণাকর' উপাধি প্রদান করিবেন। কিন্তু এই স্বপ্নদর্শনব্যাপারে কৃষ্ণরাম নামে এক কবি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্বপ্রদর্শন করিয়াছেন। তখনকার দিনে বাংলাদেশে কি রকম বাঘের ভয় ছিল, আমরা সকলেই জানি। এ হেন যুগে বাঘের দেবতা 'দক্ষিণ রায়' কবি কৃষ্ণরামকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কাব্যরচনা করিতে আদেশ করিলেন, যথোচিত পূর্ব্বতন কবি মাধবাচার্য্যের কবিতার

নিন্দা করিলেন, এবং উপরে কৃষ্ণরামের কবিতা সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন,—

'তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে,
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে।'

ইহার পর আর পাঠকের সাধ্য কি যে কাব্যখানি 'ভাল লাগিল না' বলিবেন। এই-সকল কবির দেবাদেশের ও স্বপ্নদর্শনের কৃত্রিমতা ছাড়িয়া আসিয়া নরোত্তমদাসের, বৃন্দাবনদাসের, কৃষ্ণদাস কবিরাজের সরল ও নম্রতাপূর্ণ কথাগুলি, যেমন 'বৈষ্ণবাজ্ঞা বলি করি এতেক সাহস', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ জান, বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে ধ্যান' প্রভৃতি কত মিষ্ট লাগে। মানুষের অনুরোধে কাব্য-রচনা করিতেছি, এ কথা বলিতে তাঁহারা কখনও সঙ্কুচিত হন নাই; মানুষের স্মরণে তাঁহাদের চিত্ত অনুপ্রাণিত হইয়াছে, এ কথা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। দেবমুখে উচ্চারিত আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দাও তাঁহাদের রচনাকে কলুষিত করে নাই; বরং পাঠকের সম্মুখে তাঁহারা আপনাদিগকে অতি অকিঞ্চন ও অযোগ্য বলিয়া অনুভব করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর মনোরাজ্যের উপর চৈতন্যদেবের প্রভাব কত দিক দিয়া পড়িয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাহার সামান্য নিদর্শন-স্বরূপ বর্ত্তমানে শ্রদ্ধা ও মানবে শ্রদ্ধা, এই দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা গেল। বাঙ্গালীর ভাবরাজ্যে তাঁহার প্রভাব আরও অধিক।

ভারতবর্ষে ধর্ম্ম বলিলে দুই বিভিন্ন বস্তু বুঝায়; প্রথম,—সংস্কার, অনুষ্ঠান, ও সামাজিক নিয়ম প্রভৃতি; দ্বিতীয়,—উপাস্য দেবতার পূজা ও তৎপ্রতি ভক্তি। সংস্কার-অনুষ্ঠানাদি বেদবিধি, স্মৃতি, দেশাচার ও কৌলিক রীতি প্রভৃতির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, এ-সকলের মধ্যে ভাবের কোনও সংস্রব নাই, ব্যক্তিগত কোনও স্বাধীনতা নাই; এ-সকল একেবারে নিয়মে বাঁধা। ধর্ম্মের যে দ্বিতীয় অঙ্গ,—উপাস্য-দেবতার পূজা ও তৎপ্রতি ভক্তি, তাহার মধ্যেও পূজার অংশ শাস্ত্র ও বিধি দ্বারা একেবারে নির্দ্দিষ্ট; এখানেও ভাবের বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোনও অবসর নাই। যতদিন ব্রাহ্মণগণ সমাজের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান যত্নের বিষয় ছিল আচার-অনুষ্ঠানের শুদ্ধতা ও বৈধতা রক্ষা করা; ও তাহার পর, (গুরুত্ব হিসাবে তাহার বহু পশ্চাতে) দেবপূজার পদ্ধতির বিশুদ্ধি রক্ষা। ধর্ম্মের শেষ অংশ যে উপাস্য দেবতার প্রতি ভক্তি, তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা উদাসীন ছিলেন। ভক্তি, পূজা, ও সংস্কারাদি,—ধর্ম্মের এই তিন অঙ্গের মধ্যে তাঁহাদের বিচারে সংস্কারের স্থান প্রথম, পূজার স্থান দ্বিতীয়, ও ভক্তির স্থান তৃতীয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব-সময়ে বঙ্গদেশে যে ভক্তি ছিল না, এমন নয়। কিন্তু যাঁহারা সমাজের নেতৃস্থানীয়, তাঁহারা মানুষের হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার অথবা বিকাশ করিতে কিছুই সাহায্য করিতেন না, বরং ভক্তি-বস্তুকে তাঁহারা কিয়ৎ-পরিমাণে অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতেন।

কিন্তু মানুষের ধর্ম্মপিপাসা শুধু নিয়ম পালন করিয়া অথবা বাঁধা কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কখনও তৃপ্ত হয় না। মানুষের হৃদয় আছে বলিয়া সে আরও কিছু চায়। হৃদয় চায়, দেবতার কাছে নিজে আসিতে, ও স্বাধীনভাবে দেবতাকে ভক্তি দিতে। হৃদয় চায়, যা বিশেষ-ভাবে নিজের, এমন কথাটি দেবতাকে বলিতে; হৃদয় চায়, আত্মপ্রকাশের পথ নিজেই করিয়া লইতে। ভক্তি হৃদয়ের বস্তু, তাই ভক্তি স্বাধীনতা চায়, শাস্ত্রের বন্ধনের অতীত হইতে চায়। তাই ইহাকে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে, ও নিয়ম, নিষ্ঠা, শাস্ত্রীয় আচার, প্রভৃতির ঊর্দ্ধে স্থান দিতে সমাজপতিগণ শঙ্কিত হইতেন। চৈতন্যদেবের যে-প্রভাব ধর্ম্মে এই ভক্তিবস্তুকে প্রাধান্য দিয়াছিল, তাহার বল অনুভব করিতে হইলে, তাহাকে সেই চারিশত বৎসর পূর্ব্বকার সমাজের ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপত্তির সহিত তুলনা করিতে হইবে। ধর্ম্মের তৌলদণ্ড তাঁহাদের সে প্রতিপত্তির ভারে এতকাল নিয়ম-অনুষ্ঠানাদির দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছিল; চৈতন্যদেবের প্রভাব তাহাকে আবার বিপরীত দিকে টানিয়া আনিল।

তিনি যে কেবল ভক্তিকে প্রকৃত মূল্য দিতে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা নয়। তাঁহার জীবনের মধ্য দিয়া ভক্তির আদর্শ কত উন্নত, কত বিকশিত, কত উজ্জ্বল হইয়াছে! এদেশের প্রাচীন শাস্ত্রসকলে 'ভক্তি' কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হইত। প্রথম,—ঈশ্বরের ভজনা ও তুষ্টিসাধন। এটি প্রাচীন অর্থ: গীতার কোনও কোনও স্থানে 'ভক্তি' শব্দ

এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অর্থ, ভগবানের ঐশ্বর্য্য মহিমা প্রভৃতির ও আপনার দীনতা নিকৃষ্টতা প্রভৃতির অনুভব, তিনি ভিন্ন আমার গতি নাই এই বিশ্বাস, এবং তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ,—এই-সকল লক্ষণযুক্ত একান্ত অনুরাগ। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে 'ভক্তি' কথাটি প্রধানতঃ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ও বর্ত্তমান বাংলা-ভাষাতেও এই অর্থই প্রচলিত।

এই একান্ত অনুরাগ যখন সাধকের আত্মদানের ব্যাকুলতা ও ভগবানের স্পর্শলাভের জন্য কাতরতার আকারে আপনাকে প্রকাশ করে, তখন ইহা মানবহৃদয়ের নিকটে কি স্বর্গীয়, কি পূজ্য বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হয়! ভক্ত কবিগণের যে-সকল উক্তিতে এই কাতরতার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, পাঠকের চিত্তকে তাহা মথিত, উদ্বেলিত করিয়া তোলে।

'বঁধু, কি আর বলিব আমি ?
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিব প্রেমের ফাঁসি,
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হৈলাম দাসী।
ভাবিয়াছিলাম এতিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে :
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে ?'

চণ্ডীদাসের এই উক্তির মধ্যে আত্মদানের ব্যাকুলতা কি গভীর! আবার গোবিন্দদাসের একটি পদে

'যাঁহা পঁহু অরুণচরণ চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মঝু গাত ॥
যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ।
হম ভরি সলিল হোই তথি‌মাহ ॥'

প্রভুর অরুণ-রাঙা চরণ ধরণীর যে যে স্থান স্পর্শ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, আমার দেহ সেই সেই স্থানের মৃত্তিকায় পরিণত হউক ; যে সরোবরে প্রভু প্রতিদিন স্নান করেন, আমি সলিল হইয়া তাহা পূর্ণ করি; ও তাঁহার চরণ ধৌত করি—প্রভুর স্পর্শলাভের কাতরতা কি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে!

এত যে ব্যাকুলতা, এত যে কাতরতা, ইহাও ভক্তির সাধককে তৃপ্ত করিতে পারিল না! শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সঙ্গিগণ ভক্তির সাধনায় ইহার অতিরিক্ত আরও কিছু চাহিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভক্তির পরিণতি প্রেমে। ভক্তিতে শুধু উপাসক ব্যাকুল, প্রেমেতে উপাসক ও উপাস্য উভয়ে পরস্পরের জন্য ব্যাকুল। ভক্তি আপনাকে দিয়াই তৃপ্তিলাভ করে; কিন্তু প্রেমের স্বভাব এই, যে, সে বুঝিতে চায়, সে তার প্রেমাস্পদের জন্য যত আকুল, তার প্রেমাস্পদও তার জন্য ততই আকুল। প্রেম যদি বুঝিতে পারে, যে, তার প্রেমাস্পদের তাহাকে না হইলেও চলে, তবে সে ক্ষুণ্ণ হয়; কিন্তু ভক্তি তাহার আরাধ্যকে না পাইলে অভিমান করে না, পুনরায় তপস্যায় নিযুক্ত হয়। বাংলার আধুনিক কবিদের মধ্যে একজন দেখাইয়াছেন, আসক্তি-বিহীন সংযত বিশুদ্ধ মানবীয় প্রেম ভক্তির আকার ধারণ করে, ও জীবনকে দেবপূজায় পরিণত করে—

'পবিত্র পরশে যার, মলিন হৃদয়
আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবালয়,
ভকতি-বিহ্বল, প্রিয় দেব-প্রতিমারে
প্রণমিয়া দূরে রহে, নারে ছুঁইবারে।'
[আলো ও ছায়া]

আবার পূর্ণবিকশিত ভগবদ্ভক্তি অনুভব করে, যে, অসীম ঈশ্বরও ক্ষুদ্র মানুষের প্রেম পাইবার জন্য ব্যাকুল। এই তত্ত্বটি কবি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলির' অনেক সঙ্গীতেই সুর দিয়াছে,—

'তাই ত তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরচ কত মনোহরণ বেশে,
প্রভু নিত্য আছ জাগি।'

ভক্তিকে এই প্রেমের পদবীতে পৌছিয়া দিবার জন্যই বৈষ্ণবশাস্ত্রে নারী ও পুরুষের প্রীতির রূপক ব্যবহার করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে উভয়ে উভয়ের জন্য সমান আকুল। শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তির এই আদর্শই গ্রহণ ও সাধন করিয়াছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেব ও রায় রামানন্দের কথোপকথনে ভক্তিসাধনের আদর্শের ক্রম-পরিণতি অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। চৈতন্যদেব রায় রামানন্দকে বলিলেন, কি সাধনীয়, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ;—

প্রভু কহে, পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয় ;
রায় কহে,স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।

এখানে রায় রামানন্দ বলিলেন, বর্ণাশ্রম-ধর্মানুযায়ী নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া গেলেই বিষ্ণুভক্তি অর্থাৎ ভগবানের সন্তোষসাধন হয়। এ আদর্শ বিষ্ণুপুরাণ ও গীতা উভয় গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব বলিলেন, এ বড় বাহিরের কথা বলা হইল, ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু বল :—

প্রভু কহে, এহ বাহ্য, আগে কহ আর ;
রায় কহে, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্যসার।

এখানে বলা হইল, বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম করিয়াই চল ; কিন্তু গীতার উপদেশ অনুসরণ করিয়া সকল কর্ম্ম ভগবান্‌কে অর্পণ কর। চৈতন্যদেব এই আদর্শেও তৃপ্ত হইলেন না :—

প্রভু কহে, এহ বাহ্য, আগে কহ আর ;
রায় কহে, স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্যসার।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, শাস্ত্রাদিতে তোমার জন্য ধর্ম্ম বলিয়া যাহা যাহা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সে-সকলের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শুধু আমার শরণ লও ; সে-সকল পরিত্যাগ করার যে পাপ, তাহা হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব, তুমি পরিতাপ করিও না। রায় রামানন্দ এ স্থলে স্বধর্ম্মত্যাগ শব্দটির দ্বারা চৈতন্যদেবের সম্মুখে সেই আদর্শ ধরিলেন। ইহার পূর্ব্বে যে দুই সাধ্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবানের শরণ লওয়াও ছিল না ; তাই ঐ দুই অপেক্ষা এই আদর্শ উচ্চ। কিন্তু ইহাতেও অন্য উদ্দেশ্য রহিয়াছে, সে উদ্দেশ্য পাপমুক্তি, অর্থাৎ বেদবিহিত ও বর্ণাশ্রমবিহিত স্বধর্ম্ম ত্যাগ করার অপরাধ হইতে মুক্তি। অহৈতুক অনুরাগ এখনও অনেক দূরে। তাই চৈতন্যদেব বলিলেন, এখনও বাহিরের কথাই বলিতেছ :—

প্রভু কহে, এহ বাহ্য, আগে কহ আর ;
রায় কহে, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার।

এখানে জ্ঞান অর্থে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই জ্ঞান বুঝিতে হইবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, জ্ঞানের দ্বারা, অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম অনুভবের দ্বারা, সাধক আকাঙ্ক্ষা ও শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়, ও আমাতে পরা ভক্তি লাভ করে। এ সাধনার লক্ষ্যস্থানে পাপমুক্তি না থাকিলেও রাগদ্বেষাদির অতীত হইবার জন্য যত্ন রহিয়াছে ; ইহাও অহৈতুক নয়। তাই চৈতন্যদেব বলিলেন, ইহাও বাহিরের কথা হইল :—

প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর ;
রায় কহে, জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার।

এই আদর্শটি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গৃহীত। জ্ঞান যাহার লক্ষ্য নয়, যে শুধু শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যের প্রণতি দ্বারা ভগবান্‌কে চায়, সে নিশ্চয়ই তাঁহাকে লাভ করে। এ সাধনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই, এ সাধনা অহৈতুকী ; তাই এবার চৈতন্যদেব বলিলেন, ইহাকে সাধ্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, কিন্তু এ বিষয়ে আরও বল :—

প্রভু কহে, এহ হয়, আগে কহ আর ;
রায় কহে, প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার।

প্রেমভক্তি অর্থাৎ অনুরাগপূর্ব্বক ভজনা। রায় রামানন্দ নিজেই স্বরচিত একটি শ্লোকে এ আদর্শকে আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'ভগবদ্ভক্তিরসে সরস চিত্ত ক্রয় কর, যদি পার। তাহা ক্রয় করিবার পক্ষে একমাত্র প্রেমই মূল্য।'

এবারকার উত্তরে রায় রামানন্দ অনুরাগের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। এ সাধনে অন্য কোনও লক্ষ্য নাই, অহৈতুক অনুরাগই সাধন। কিন্তু অহৈতুক বলিলে প্রেমের একটি অভাবাত্মক লক্ষণমাত্র নির্দ্দেশ করা হয়। প্রেমের লক্ষণ আরও শুনিতে চান বলিয়া চৈতন্যদেব রামানন্দকে বলিতেছেন, আরো কিছু বল :—

প্রভু কহে, এহো হয়, আগে কহ আর ;
রায় কহে, দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

প্রেমের একটি লক্ষণ এই যে সে প্রেমাস্পদের সহিত সম্বন্ধের মধ্য দিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিতে চায়। রামানন্দ রায় তাই বলিলেন, ভগবানকে প্রভুরূপে ও আপনাকে ভৃত্যরূপে দেখিয়া ভগবানে যে প্রীতি তাহাই সাধন। কিন্তু প্রেমের আর-একটি লক্ষণ এই যে সে নিত্য সঙ্গ চায় ; দাসের তাহা দুষ্প্রাপ্য। তাই চৈতন্যদেব বলিতেছেন, আরো গভীর স্থানের কথা বল :—

প্রভু কহে, এহো হয়, আগে কহ আর ;
রায় কহে, সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

সখ্যে প্রেমের আরও একটি লক্ষণ পাওয়া গেল, তাহা নিত্য সঙ্গ। কিন্তু ভক্ত শুধু ভগবানের সঙ্গই চাহে না, তিনি তদ্গতপ্রাণ, তদর্পিতজীবন হইতে চাহেন। ভগবান্ ভিন্ন তাঁহার জীবনের লক্ষ্যবস্তু অন্য কিছু নাই। এই ভাবটির

প্রতীক্ষা করিয়া চৈতন্যদেব বলিলেন, এ বেশ কথা হইতেছে, কিন্তু আরো আগের কথা বল :—

প্রভু কহে, এহোত্তম, আগে কহ আর ;
রায় কহে, বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

বাৎসল্যপ্রেম বুঝিতে হইলে, পিতামাতার স্থান উচ্চে, সন্তানের স্থান নিম্নে, এ কথা ভাবিলে চলিবে না। সে উচ্চতা নিম্নতা এ সম্বন্ধের বাহিরের আকার মাত্র। ইহার স্বরূপটিকে ভাবিতে হইবে। সন্তানের জন্য মানুষের প্রাণ কিরূপ আকুল হয়! সন্তান নয়নের পুতলি, হৃদয়ের আনন্দ। সন্তানের জন্মের পর হইতে সে-ই যেন পিতামাতার জীবনের লক্ষ্যবস্তু, কেন্দ্রস্থান হইয়া দাঁড়ায়। তখন হইতে সন্তানের জন্যই পিতামাতা জীবনধারণ করেন। * ভগবান্ তেমনি ভক্তের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ; ভক্ত তাঁহারই জন্য জীবনধারণ করেন।

এই ব্যাকুলতা ও অনন্যতাই কি ভগবৎভক্তির চরম লক্ষণ নয়? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চৈতন্যদেব ইহাতেও তৃপ্ত হন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন এমন প্রেমের সম্বন্ধ, যাহাতে ভগবান্ ও ভক্ত উভয়ে উভয়ের জন্য সমান আকুল, তাই তিনি রামানন্দকে বলিলেন, আরো গভীর কথা বল :—

প্রভু কহে, এহোত্তম, আগে কহ আর ;
রায় কহে, কান্তভাব সর্ব্বসাধ্যসার।

কান্তা ও কান্ত উভয়ে যেমন উভয়ের জন্য সমান ব্যাকুল, তেমনি ভগবান্ ও ভক্ত উভয়ে উভয়ের জন্য ব্যাকুল। এ অনুভব ব্যতীত ভক্তির পূর্ণতা হয় না।

অতঃপর রায় রামানন্দ বলিলেন, কান্তাপ্রেম শুধু যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই নয়; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও কান্ত বা মধুর, অনুরাগের এই যে পাঁচটি আকার, ইহার প্রত্যেকটিতে পূর্ব্ববর্ত্তীগুলির সকল লক্ষণ বিদ্যমান। মধুরে সকল রসের পরিসমাপ্তি। রাধা ও কৃষ্ণের লীলায় এই মধুরভাব কিরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, রামানন্দ রায় তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুললিত ব্যাখ্যা করিলেন। চৈতন্যদেব বলিলেন, তোমার মুখ হইতে অমৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে ; কিন্তু ইহার পর আরও কিছু শুনিতে চাই। রামানন্দ বলিলেন, 'ইহা বই বুদ্ধি নাই আর।' এই বলিয়া স্বরচিত একটি পদ গাহিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—রাধা বলিতেছেন, "প্রেমের জন্ম কিরূপে হয়, কি জানি! প্রথম দর্শনমাত্র অনুরাগের সঞ্চার হইল ; তাহা দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে, সীমা পাইতেছি না। এ প্রেমে দূত নাই; মধ্যবর্ত্তী নাই। **আমিও নারী নহি, তিনিও পুরুষ নহেন ;** শুধু জানি প্রেম উভয়ের চিত্তকে আকুল করিয়াছে।" এই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া চৈতন্যদেব প্রেমাবেশে স্বহস্তে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

রায় রামানন্দের সঙ্গে এই কথোপকথন চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যে সত্যই এক অমৃতখনি। স্বয়ং গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন—

তাঁমা, কাঁসা, রূপা, সোনা, রত্নচিন্তামণি,
কেহ যদি কাঁহা পোতা পায় এক খনি,
ক্রমে উঠাইতে যেমন উত্তম বস্তু পায়,
তৈছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রামরায়।

মানুষের হৃদয়ে মানবীয় প্রেম যত আকারে উদিত ও বিকশিত হয়, মানুষকে সে-সকলেরই মধ্য দিয়া ভগবান তাঁহাকেই ভালবাসিতে শিক্ষা দেন। পিতামাতার বুকে রাখিয়া, সখার প্রণয়ডোরে বাঁধিয়া, সন্তানকে ভালবাসিতে দিয়া, তাঁহাকেই নব নব রূপে ভালবাসিতে শিখান। চৈতন্যদেব তাঁহার সমগ্র হৃদয়ের সকল প্রীতি তাঁহার শ্রীহরিকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। রায় রামানন্দ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে কান্তাপ্রেমের আদর্শ রাধা। চৈতন্যদেব সেই রাধাভাবের আদর্শে নিজ দেহ মন প্রাণ সকলি অনুরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন ; তিনি রাধা-মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ রাধার প্রেম, রাধার বিরহ, রাধার আকুলতা বর্ণনা করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে চৈতন্যদেবের মূর্ত্তির ও লীলারই বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বাঙ্গালী কবিকে রাধার ছবি কেবল কল্পনা করিয়া আঁকিতে হয় নাই ; বাঙ্গালী জীবন্ত রাধার মূর্ত্তি দেখিয়াছে। ভক্তের জীবনের ছবি ভাবিতে হইলে বাঙ্গালীকে কেবল কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না ; বাঙ্গালীর কাছে ভক্তি মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে তিনি ভক্তির এই পূর্ণ, সুন্দর ও মহান্ আদর্শ

* কিণ্ডারগার্টেনের উদ্ভাবক মহাত্মা ফ্রবেল বলিয়াছেন, শিক্ষাদানু কার্য্যের মূলমন্ত্র—Let us *live* for our children.

দেখাইবার জন্যই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অধিক কথা কহেন নাই; তিনি আপনাকে দেখাইয়াই এই ভক্তি প্রচার করিয়াছেন। যেখানে যেখানে গিয়াছেন, তাঁহার গৌরসুন্দর দেহ প্রেমাবেগে কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইয়াছে, আবেশে টলমল করিয়াছে; দুইটি আনত কমল-আঁখি হইতে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়াছে;—ইহা দেখিয়াই মানুষ মুগ্ধ হইয়াছে। যে দিকে তিনি তাঁহার সেই আকুল চক্ষু ফিরাইয়াছেন, সেদিকেই লোকে পদ্মফুল বর্ষণ করিয়াছে; যেখানে যেখানে তাঁহার চরণ পতিত হইয়াছে, মানুষ সেখানকার মৃত্তিকা পবিত্রজ্ঞানে তুলিয়া লইয়াছে। মানুষ 'ভক্তি'কে যেমন ভক্তি করে, এমন আর কোনও বস্তুকে করিতে পারে না।

তাঁহার প্রাণের সেই প্রেমাগ্নির উত্তাপ বঙ্গদেশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত মানুষের কঠিন প্রাণের উপর পড়িয়া প্রাণগুলিকে গলাইয়াছে, নমনীয় করিয়াছে। বাঙ্গালী যে ভাল ভাব ও উচ্চ চিন্তা সহজে গ্রহণ করিতে পারে, জগতের মহান্ প্রয়াস-সকল যে বাঙ্গালীর প্রাণকে উচ্ছ্বসিত করে, ইহার মধ্যে তাঁহার সেই প্রেমাগ্নির সংস্পর্শের ফল আছে বলিয়া বিশ্বাস করি। কারণ মানুষের প্রাণ যখন গলে, সকল দিক দিয়াই গলে; সে তখন ঈশ্বর-সম্বন্ধে ভক্ত, মানুষ-সম্বন্ধে প্রেমিক, জগৎ-সম্বন্ধে কবি হয়।

কেহ কেহ মনে করেন, হৃদয়ের কোমলতা ও নমনীয়তা ও ভাবের উচ্ছ্বাস বাঙ্গালীর চিত্তকে দুর্ব্বল করিয়াছে। আমি তাহা বিশ্বাস করি না। বাঙ্গালী যদি সত্য-সত্যই ভীরু ও দৃঢ়তায় হীন হয়, তবে তাহার কারণ অন্য কোথাও অন্বেষণ করিতে হইবে। যে হৃদয়ের গুণে বাঙ্গালী এমন ভাবগ্রাহী, যাহার গুণে শত শত বাঙ্গালী বর্ত্তমান যুগে সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সর্ব্বস্ব পণ করিতে পারিয়াছে, সে হৃদয়ই, বাঙ্গালীর জীবনে যে বীরত্বটুকু আছে, তাহার জন্মদাতা। ভাবের উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে মানুষ নিস্তেজ হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু তা বলিয়া উচ্ছ্বাসমাত্রই নিন্দনীয় নয়। যে হৃদয়ে উচ্ছ্বাস নাই, তাহা কখনও সুস্থ হৃদয় নহে। যার প্রেমে কোনও দিন উচ্ছ্বাস আসে না, তার প্রেমে কড়া পড়িয়া গিয়াছে। চৈতন্যদেব দেখাইয়া দিয়াছেন, ভগবানের নামে, ভগবানের প্রসঙ্গে ভক্তের হৃদয় কিরূপ উচ্ছ্বসিত হয়। তিনি শ্রীবাসের ঘরে সারারাত্রি শুধু বিদ্যাপতির এই দুই পংক্তি গাহিয়া গাহিয়া নাচিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন -

> কি কহব রে আজি আনন্দ-ওর,
> চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।

আর আমাদের এখনকার সঙ্গীতে কত সুললিত রচনা, কত মাধুর্য্য, কত কবিত্ব; গায়কের মন মাতাইবার অভিপ্রায়ে তাহাতে কত 'আখর' যোজনা করি; তবু আমাদের মন মাতে না। এটাই কি সুস্থ প্রাণের লক্ষণ? তিনি কদম্বফুল দেখিয়া, তমাল-গাছ দেখিয়া, নীলজল দেখিয়া, অস্থির হইতেন; আর আমরা প্রভাতে সন্ধ্যায় কত উদ্যানে উপবনে বিচরণ করি, আকাশে পৃথিবীতে কত শোভা দেখি,—কোনও দিন আমাদের মন একটুও আকুল হয় না। আমরা সভ্যবেশে দারজিলিং বেড়াইতে যাই, হিমালয়ের সে অনন্ত শোভারাশির মধ্য দিয়া ট্রেনে বসিয়া আমোদ করিতে-করিতে চলিয়া যাই; আমোদে আহ্লাদে সেখানে কয়েক দিন যাপন করি, আবার আমোদ করিতে-করিতে হাসিতে-হাসিতে ট্রেনে ফিরিয়া আসি। একদিনও চোখে জল আসে না; মনে উচ্ছ্বাস আসে না; অনন্তসুন্দরের প্রেমের আকুলতার জীবন্ত ছবির মত সে শোভা আমাদের কঠিন প্রাণকে একটুও চঞ্চল করিয়া তোলে না। হায়, কি নিষ্ফলতা, কি দরিদ্রতা! আমাদের সভ্যতা আমাদের কিরূপ কৃপাপাত্র করিয়া ফেলিয়াছে! হয়তো উচ্ছ্বাস আসিতে চায়, কিন্তু চাপিয়া রাখি, পাছে সঙ্গীরা কেহ হাসে। কি দুর্গতি! আমরা এমন সভ্য হইয়াছি যে ঈশ্বরের ভক্তি, মানবে প্রেম, অথবা জীবে দয়ার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করাকে অবজ্ঞা করি; কিন্তু ক্রোধ, দলাদলির উত্তেজনা, কিংবা পরনিন্দাতে উচ্ছ্বসিত হওয়াকে লজ্জার কারণ মনে করি না। আমাদের পরিবারে পিতা পুত্রকে দেখাইয়া ভাল ভাবের উচ্ছ্বাসে চোখের জল ফেলিতে পারেন না, স্বামী স্ত্রীকে দেখাইয়া অনুতাপের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারেন না, ভাই ভাইকে চোখের জল দেখাইতে লজ্জা পান; কি অস্বাভাবিক অবস্থা আসিয়া পড়িতেছে! আমাদের দারুণ সভ্যতা আমাদের হৃদয়ের ভাল উচ্ছ্বাসগুলিকে চাপিয়া মারিতেছে, আমাদের মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিতেছে!

চৈতন্যদেবের প্রভাব বাঙ্গালীর প্রাণে ভক্তিকে জাগাইয়া

বাঙালীর সমগ্র প্রাণকেই জাগাইয়াছিল। এখনও আমরা আমাদের জাতীয় চরিত্রে তাহার সুফল সম্ভোগ করিতেছি।

আর-একদিক দিয়া তাঁহার প্রভাব আমরা দেখিতে পাই। মানুষের জীবনে চিন্তা ও ভাব অপেক্ষা গভীর স্থানে থাকে স্বভাব। চিন্তা ভাব ও অভ্যস্ত কার্য্যের ফলে প্রকৃতির যে স্থায়ী আকার হয়, তাহাই স্বভাব। চৈতন্যদেবের প্রভাবে যে শুধু কতকগুলি নূতন ভাব আসিয়াছিল তাহা নয়, নূতন একটি স্বভাবও বাংলাদেশে আসিয়াছিল, সেটি বৈষ্ণবের স্বভাব। 'তৃণাদপি সুনীচেন' এই শ্লোকটির দ্বারা যে-স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্বভাব। নম্রতায়, অভিমান-শূন্যতায়, অদ্রোহে, ঈশ্বরনির্ভরে, প্রফুল্লতায় সুন্দর মিষ্ট এক স্বভাব। সে সময়কার ভক্তগণও স্বভাবের উপর জোর দিয়া গিয়াছেন; বলিয়াছেন, যাঁহাকে দেখিলে আপনা-আপনি মুখে ভগবানের নাম আসিয়া পড়ে, তিনিই বৈষ্ণব। বাস্তবিক যে-পরিবর্ত্তন স্বভাব পর্য্যন্ত গিয়া না পৌছায়, তাহা যতই বিশাল হউক, তাহা অপূর্ণ। অতি সুন্দর ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে কত জীবনে অতি কদর্য্য স্বভাব মিশিয়া থাকে। এজন্য মনে হয়, চৈতন্যদেবের প্রভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় এই, যে, সে-সময়ে দেশে এমন একদল মানুষের আবির্ভাব হইল, যাহারা মারিলেও রাগ করে না, যাহারা প্রসন্নতা ও ক্ষমায় মূর্ত্তিমান্। চরিত্রের এই আদর্শ তখন দেশের লোকের কাছে নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

এখনও আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দেশ হইতে বৈষ্ণব-স্বভাব বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও এমন মানুষ আমরা দেখিতে পাই। সঙ্গীরা বিদ্রূপ করিতেছে, বিষাক্ত বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, হাসিমুখে তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন; তাহাদের তীব্র কথার উত্তরে 'কি বল্‌চ ভাই?' বলিয়া আদর করিয়া কথা কহিতেছেন। দুঃখে শোকে ক্ষতিতেও মুখ এমন প্রসন্ন, যে, সে-মুখের দিকে চাহিয়া-থাকিতে ইচ্ছা করে। ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার 'যুগান্তর' উপন্যাসে শ্রীধর ঘোষ নামে এইরূপ একটি চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। "মুখটি সদ্ভাবে ও ভক্তিতে যেন গদগদ, সে মুখ দেখিলেই, কেমন হৃদয় স্বভাবতঃ তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত। * * গোবিন্দের প্রতি নির্ভরের ভাব তাঁহার এমন স্বাভাবিক ছিল, যে, ৮ বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রটির কাল হইলে, তাহারই তিন চারিদিন পরে আপীসের একজন লোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি ঘোষজা মশাই, ছেলে দুটো মানুষ হচ্চে ত?' ঘোষজা উত্তর করিলেন, 'আজ্ঞে, দুটো আর কৈ? এখন ত একটি; কেবল বড়টিই আছে।' প্রশ্নকর্ত্তা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'সে কি? ছোটটির কি হলো?' ঘোষজা উত্তর করিলেন, 'আজ্ঞে, গোবিন্দ সেটিকে নিয়েছেন।'" আমি একবার গ্রন্থকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যে, পুত্রবিয়োগে 'গোবিন্দ নিয়েছেন' বলিয়া প্রসন্নমুখে উত্তর দেওয়ার কথাটি কি কল্পিত, না কোনও সত্য ঘটনা হইতে গৃহীত? আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, যে, সত্যকার মানুষ হইলে একবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিব। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "একদিন আমি শেয়ারের গাড়ীতে কলিকাতার একস্থান হইতে অন্য এক স্থানে যাইতেছিলাম। সেই গাড়ীর অপর আরোহিগণ সকলেই আমার অপরিচিত; তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে ঐরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল। যিনি বলিয়াছিলেন, 'গোবিন্দ নিয়েছেন', তিনি এক গলির মোড়ে নামিয়া গেলেন। আমিও তাঁহাকে আর-একবার দেখিব বলিয়া অনেকদিন সেই গলিতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু আর তাঁহার দেখা পাই নাই।"

এই অমানী, অদ্রোহী, সদাপ্রসন্ন, বিনম্র, ঈশ্বরে নির্ভরশীল, সুন্দর চরিত্র চৈতন্যদেবের প্রধান কীর্ত্তি। সে-সময়কার প্রেমভক্তির সকল তত্ত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু যতদিন দেশে বৈষ্ণবচরিত্রসম্পন্ন একজন লোকও থাকিবে, ততদিন শ্রীচৈতন্যদেবের চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে না।

তবে তাঁহার প্রভাব আমরা এই সকল বিষয়ে দেখি। তিনি এই নিরাশা-প্রবণ জাতিকে আশাশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন, মানুষকে শ্রদ্ধা করিতে ও সমসাময়িক ঘটনাবলীর মূল্য দিতে শিখাইয়াছিলেন। তিনি উন্নত, সুন্দর ভাবসকল বিকাশ করিয়া জাতির হৃদয়কে কোমল ও উন্নত করিয়াছেন; ধর্ম্মকে ক্রিয়াকর্ম্ম যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান হইতে টানিয়া আনিয়া সহজ নির্ম্মল ভক্তির পথে ধাবিত হইতে শিখাইয়াছেন; সর্ব্বোপরি নম্র মধুর ভগবানে নির্ভরশীল স্বভাবের আদর্শ এ জাতির সম্মুখে স্থাপন করিয়া, ধর্ম্মজীবন যে চরিত্রের বস্তু,

এই মহৎ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। দেশে এই-সকল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল বলিয়াই আমরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মান্দোলনকে 'ধর্ম্মবিধান' বলি। ধর্ম্মবিধানের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয়, নূতন চিন্তা, নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন স্বভাব, ও স্বীয় যুগের ও সমসাময়িক মানুষের উপর গভীর আশা। এ-সকলের সঙ্গে নূতন ধর্ম্মমতের ও নূতন সমাজরীতির প্রবর্ত্তন থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বাহ্য লক্ষণমাত্র। মানুষের হৃদয়ের ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তনেই ধর্ম্মবিধানের প্রকৃত পরিচয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।



উদয়পুরের জগমন্দির প্রাসাদ।

উদয়পুর

ভারতবর্ষ একটি বিচিত্র দেশ—শিল্পে, সাহিত্যে, সৌন্দর্য্যে, দৃশ্যে, মনুষ্যসমাজে এত বৈচিত্র্য আর কোনও দেশে আছে কিনা সন্দেহ। শিল্পের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় কত বিভিন্ন প্রকারের আদর্শের সমাবেশ তাহার মধ্যে হইয়াছে। কোথায়ও দেখা যায় শত্রুর আক্রমণ রোধ করিবার বিশাল দুর্গ, কোথায়ও মর্ম্মরনির্ম্মিত বিচিত্র-সূক্ষ্ম-কারুকার্য্যমণ্ডিত মনোরম হর্ম্ম্য, কোথায়ও অনিন্দিত মসজেদ, আবার কোথায়ও পর্ব্বতখোদিত বিশালমন্দির, চৈত্য ইত্যাদি। এই-সকল বিভিন্ন হর্ম্ম্যের নির্ম্মাণ ও সৌন্দর্য্য-সমাবেশের প্রণালীতেও বা কত প্রভেদ। ভারতের এক নগরেই হয়তো উক্তরূপ নানাপ্রকার বৈচিত্র্যের সমাবেশ। কিন্তু প্রাচীন নগর উদয়পুরে ঐরূপ বৈচিত্র্যের মিশ্রণ নাই বলিলেই হয়। চারিদিকে পর্ব্বতবেষ্টিত একটি হ্রদের মধ্যে মর্ম্মর-হর্ম্ম্যের শিল্পধারা জলপ্রপাতের ন্যায় পর্ব্বত হইতে হ্রদের অঙ্গে যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। এইটি দেখিলে মনে হয় যেন ইহা বাল্যকালের চিন্তাপ্রসূত পরীরাজ্যের প্রাসাদ। উদয়পুরে আসিলে মনে হয় যেন এক অবাস্তব পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি - ভারতবর্ষের আর কোথায়ও এরূপ মনে হয় কিনা জানি না। উদয়পুরের প্রকৃতিদত্ত দ্রব্য-সম্ভারের ব্যবহারে যে মুসলমান নৃপতিগণ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহাতে দুঃখিত হইবার কারণ নাই, বরং সুখের বিষয়ই বলিতে হইবে, কারণ তাহা হইলে আজ উদয়পুরের এই সৌন্দর্য্য থাকিত না—হৃতরাজ্য নৃপতির মতই নিঃস্ব প্রতীয়মান হইত। শত শত বৎসর পূর্ব্বেও উদয়পুরের যে সৌন্দর্য্য যে গরিমা ছিল এখনও তাহাই আছে। সামান্য এক-আধটুকু যে পরিবর্ত্তন হয় নাই তাহা বলিলে মিথ্যা বলা হয়, কিন্তু মনে হয় উদয়পুরে আসিবার পূর্ব্বে যিনি সবচেয়ে পরিবর্ত্তন পছন্দ করেন তিনিও এখানে আসিয়া



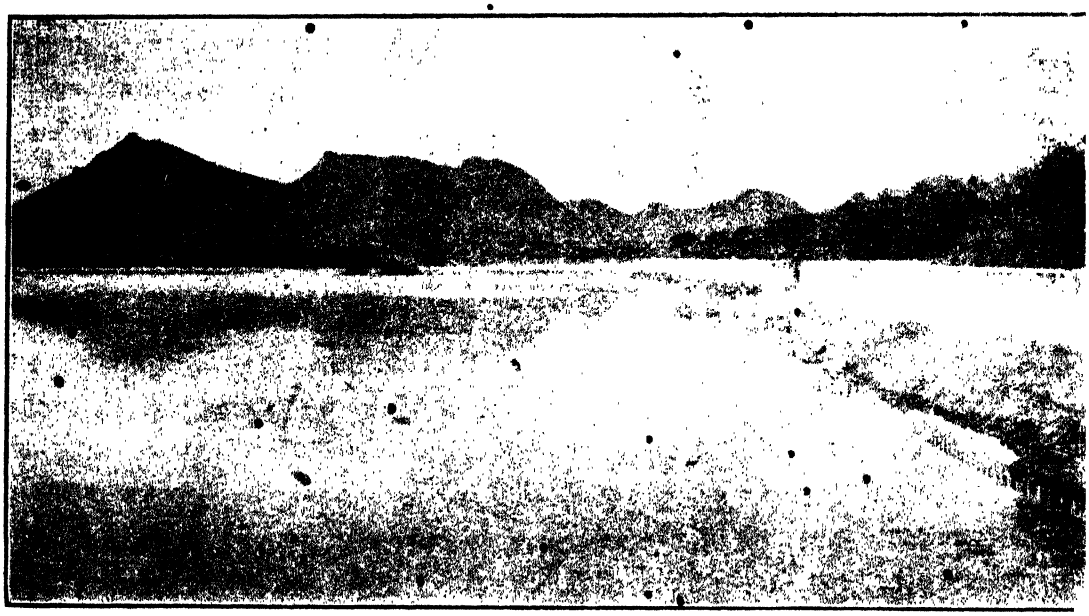
উদয়পুরের হ্রদ ও নগরের দৃশ্য।

দেখার পর আর ইহার পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করিবেন না। এখানে প্রকৃতির ও মানবশিল্পের যে অপরূপ ও অভিনব সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহা বোধ হয় বিশ্বে দুর্লভ। যেখানে যা সাজে তাই দিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে—ইহার কিছু একটু পরিবর্ত্তন করিলেই সমস্তটি যেন নষ্ট হইয়া যাইবে। উদয়পুরের পথ সুগম নহে, খুব সম্ভব সেই হেতু দর্শকের তেমন প্রাদুর্ভাব নাই। কিন্তু চিতোর হইতে ব্রাঞ্চলাইনটি খোলার পর হইতে পথ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে সুগম হইয়াছে।

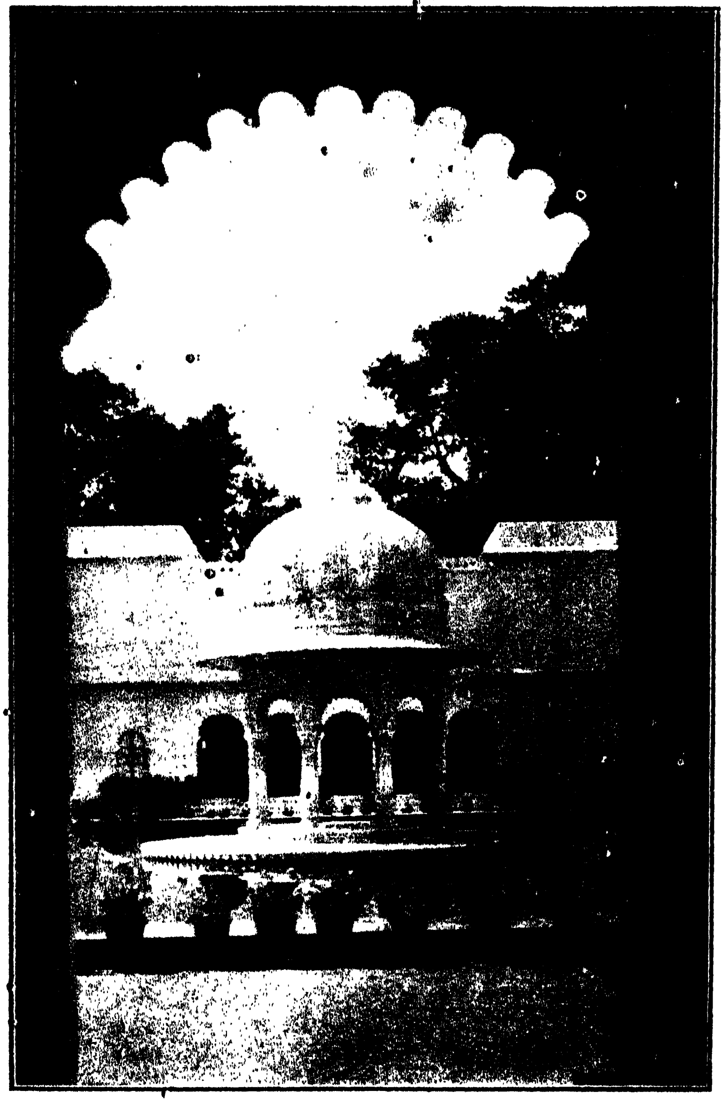
পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সহরের সংস্থিতি ইহার অপেক্ষা সুন্দর হইতেই পারে না। বিশাল মরুভূমির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে কচিৎ মনসা-গাছের বেড়া চক্ষুর তৃপ্তিসাধন করে এবং একটু দূর হইতে নগরের সুদৃশ্য বিশাল হ্রদ ও তাহার মধ্য-স্থিত সৌরকরোজ্জ্বল শুভ্রপ্রাসাদ-সমন্বিত ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপগুলি দর্শকের মন মোহিত করিয়া দেয়। পোলা নামক হ্রদটি সবচেয়ে সুন্দর, হ্রদটি যেমন সুন্দর তাহার চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যও তেমনি সুন্দর। এ কথা ঠিক যে এই হ্রদের পাশে পাশে যদি প্রাসাদগুলি না থাকিত তাহা হইলে চতুর্দ্দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য থাকা সত্ত্বেও ইহা এত সৌন্দর্য্যশালী হইতে পারিত না। দ্বীপগুলির মধ্যে দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর জগমন্দির ও জগনিবাস। এই দুই দ্বীপে তুষারশুভ্র মার্ব্বেল পাথরের প্রাসাদ দুইটি দেখিলে বোধ হয় যেন শ্বেতপক্ষবিশিষ্ট হংস-দম্পতি পক্ষ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তাল ও বটগাছের ছায়া দিয়া প্রাসাদগুলি ঢাকা পড়িয়াছে ও দ্বিপ্রহরের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইতেছে। এই-সকল দ্বীপে কেন, হ্রদেই যাইতে হইলে রাজ-অনুমতির প্রয়োজন; কিন্তু সুহৃদয় রাণা কাহাকেও অনুমতি দানে বিমুখ নহেন, এমন কি সরকারী নৌকাও ব্যবহার করিতে দেন। এইসকল প্রাসাদের একটিতে বিদ্রোহের পর পলায়ন-তৎপর কুমার শা-জাহান পিতৃরোষ হইতে আত্মরক্ষার্থ আশ্রয় লইয়াছিলেন; আর একটিতে সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে কতকগুলি ইংরেজ রাণার আতিথ্যে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন; এবং



উদয়পুরের দ্বীপ-প্রাসাদ।



উদয়পুরের শহরে যে হ্রদ হইতে জল সরবরাহ করা হয়।

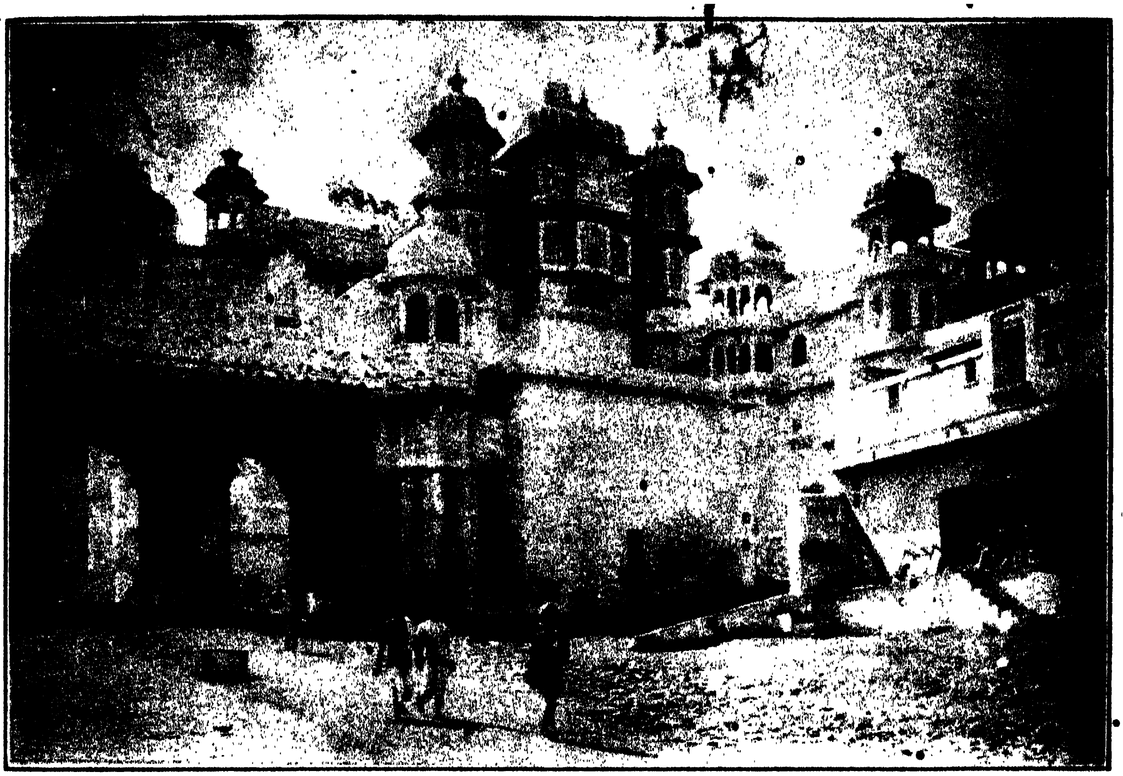


উদয়পুরের অন্তঃপুরিকা উদ্যান।

বলিয়াছেন যে, "তুষারশুভ্র মর্ম্মর-প্রাসাদের প্রতিবিম্বগুলি বাত্যাতাড়িত বীচিবিক্ষুব্ধ হ্রদের জলের মধ্যে পড়িয়া সমস্ত জলকে একটা অপরূপ শুভ্রতায় মণ্ডিত করিয়া তোলে। এই-সকল প্রাসাদের প্রত্যেকটির সংলগ্ন এক একটি উদ্যান আছে। এই-সকল উদ্যানের বৃহৎ বৃহৎ বট প্রভৃতি গাছের সবুজরঙ একঘেয়ে শুভ্রতার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনিয়া দেয়। রৌদ্র-ছায়ার অপূর্ব্ব সমাবেশ প্রাসাদের প্রাচীর-গাত্রে, গম্বুজে, ছাদে প্রতিফলিত হইয়া অভিনব দৃশ্যের সৃজন করে। সুউচ্চ প্রাসাদচূড়া কোনও কোনও স্থানে আকাশের নীলিমায় যাইয়া ঠেকিয়াছে বোধ হয় ও চারিদিকে আকাশে জলে স্থলে কেবল শুভ্রতার মেলা লাগিয়া গিয়াছে দেখা যায়।"

হ্রদের বাহার সেই সময় খুব বেশী খুলিয়া যায় যখন মৌন রজনীতে রাজ প্রতিনিধি অথবা রাজপরিবারের কাহারও শুভাগমনে সারি সারি প্রদীপমালায় হ্রদ আলোকিত হইয়া উঠে। মনে হয় যেন গর্ব্বিনী সুন্দরী প্রদীপরাণীরা মুকুরে মুখপ্রতিবিম্ব দেখিয়া আনন্দোজ্জ্বল হাস্যে মাতিয়া নৃত্য করিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। চারি মাইল দীর্ঘ বিশাল মর্ম্মর-প্রাচীরের গায়ে গায়ে দীপাবলী ঝুলাইয়া দেওয়া হয় ও নির্ম্মল স্থির শান্ত স্বচ্ছ জলে তাহার প্রতিবিম্ব জ্বলিয়া উঠে। তারপর বাজী পোড়ান হয়। নানারূপ বাজীর নানারূপ নৃত্যভঙ্গী, বিচিত্র বর্ণ-মাধুর্য্য প্রাচ্য ঐশ্বর্য্যের পরিচয় ব্যক্ত করিয়া তুলে। অনেকে হ্রদে জলবিহার করিয়া বেড়ান; বিহারক্লান্ত দেহ প্রাসাদগুলির ছায়া-সুশীতল উদ্যান-বাটিকায় প্রসারিত করিয়া বেশ আরাম পাওয়া যায়—প্রসারিত দেহে বিশ্রামের সময় নয়নসম্মুখে

একটি হইতে রাণার বিদ্রূপে উত্যক্ত হইয়া জেনারেল আউটরাম অসংখ্য কুম্ভীরপরিপূর্ণ হ্রদে লাফাইয়া পড়িয়া সাঁতরাইয়া পার হইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ বহু কাহিনীর কতবিধ স্মৃতি এই হ্রদের সঙ্গে বিজড়িত আছে। কিন্তু এই রম্য দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়াইলে সুখ স্মৃতি ছাড়া দুঃখকরুণ কোনও স্মৃতিই মনে উদিত হয় না—একটা ভাবের নেশায় বিভোর হইয়া উঠিতে হয়। হ্রদমধ্যস্থিত মর্ম্মরপ্রাসাদগুলির কথা বলিতে যাইয়া পার্শিভাল ল্যান্ডন



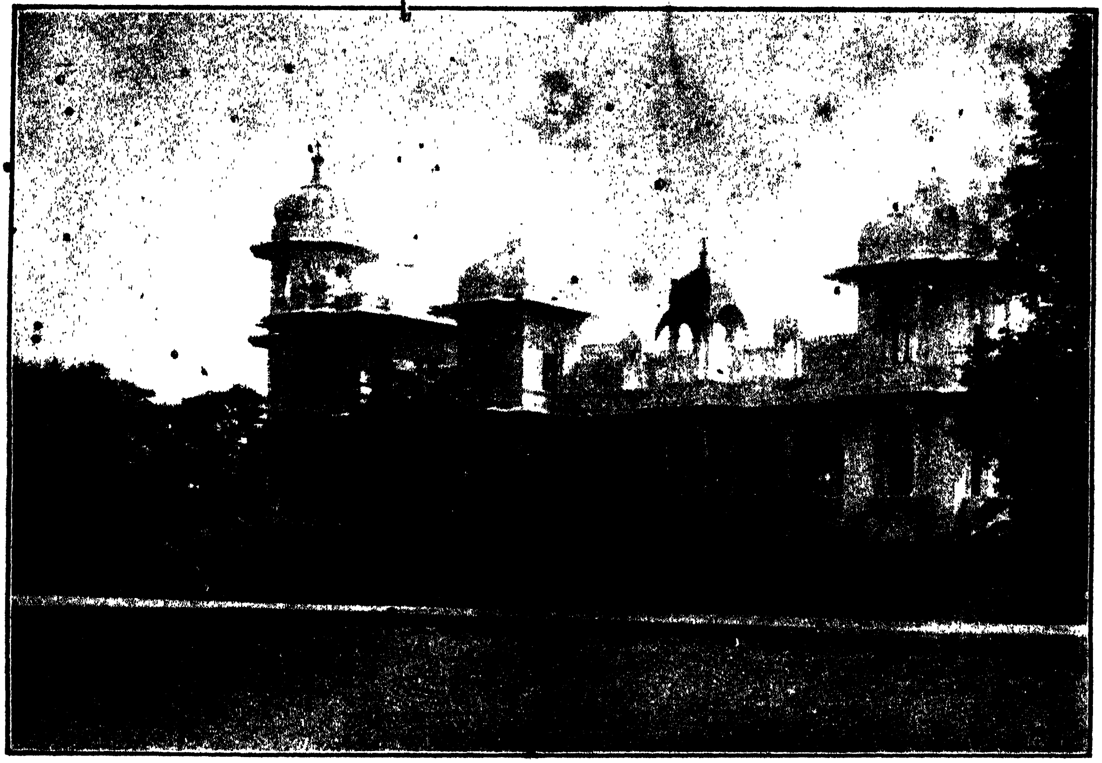
উদয়পুরের মিউজিয়াম।

চারিদিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিশ্রেণী ও সুশুভ্র প্রাসাদশ্রেণীর দৃশ্য ভাসিয়া উঠে। মনে হয় যেন কোন কল্পরাজ্যে গিয়া পড়িয়াছি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাসাদের অভ্যন্তরের সাজসজ্জা একেবারে আধুনিক ইউরোপীয়। এই দোষ শুধু উদয়পুরের নহে, দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা পরিলক্ষিত হয়। কদাচিৎ আধুনিক ভারতীয় প্রাসাদ প্রাচ্যপ্রথানুযায়ী নির্ম্মিত হয়। প্রায় সকল আধুনিক প্রাসাদই প্রতীচ্যের অন্ধ অনুকরণে নির্ম্মিত। কিন্তু যাঁহারা প্রাসাদ, অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করান তাঁহারা ভুলিয়া যান যে প্রতীচ্য প্রথায় নির্ম্মিত ইমারতের সঙ্গে চাকচিক্য কারুকার্য্য ও বাহারে জাঁকজমক খাপ খায় না। প্রাচ্য প্রাসাদ দেখিলেই মনে হয় ইহা শিল্পীর একটি বহু সাধনার ধন। যাহা হউক তাই বলিয়া এই-সকল প্রাসাদ দেখিবার উপযুক্ত নয় একথাও বলা যায় না। দ্রষ্টব্য বহু জিনিসও এখানে আছে। হ্রদের দক্ষিণতীরস্থ রাজপ্রাসাদটির বৃহৎ বৃহৎ মর্ম্মরপ্রস্তর বিস্ময় উৎপাদন করে। চৌকোঠামিলান এই প্রাসাদটি শতাধিক ফুট উচ্চ। প্রাসাদের কোণে কোণে এক একটি মিনার আছে। প্রত্যেকটি মিনারের মাথায় গম্বুজাকৃতি এক একটি ছাদ আছে। প্রাসাদের বিস্তৃতায়তন উন্মুক্ত ছাদে উঠিলে সমগ্র সহর উপত্যকা ও পর্ব্বতশ্রেণী সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় যেন একটি ধূসর জমির উপর কয়েকটি রেখাসম্পাতে কে একটি সুন্দর ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে।

হ্রদের উত্তরদিকের স্নানের ঘাট দেখিতে চমৎকার। এখানে প্রত্যহ সকাল বেলায় শত শত লোক স্নান করিতে আসে ও স্নানান্তে নিজ নিজ ধর্ম্মানুযায়ী সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া থাকে। ছেলেমেয়ে সকলই এখানে দৃষ্ট হয়। মেয়েরা কাপড় কাচিতে ও গৃহদেবতাকে স্নান করাইতে ও ছেলের দল স্বল্পগভীর জলে খেলা করিতে আসে। দর্শকরা এই সব সুন্দর দৃশ্য নৌকায় করিয়া দেখিয়া বেড়ান।

প্রত্যহ রাণার আদেশানুযায়ী বহু বন্যবরাহকে খাওয়ান



উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ।

হয়। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই বিভাগের কর্ম্মচারীরা বরাহদিগকে ডাক দেয়; ডাক শুনিবামাত্র শত শত দুর্দ্ধর্ষ বন্যবরাহ চারিদিকের জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া প্রাসাদের নিম্নে উন্মুক্ত প্রান্তরে জমা হয়। এই প্রান্তরে প্রাসাদের উপর হইতে খাদ্য ফেলিয়া দেওয়া হয়। সে এক ভীষণ মহামারী ব্যাপার। খাদ্যলাভার্থ বরাহগণের মারামারি বাধে, ও তাহাদের চীৎকারে সে স্থান মুখরিত হইয়া উঠে। সে সময় যদি কেহ যুদ্ধে রত বরাহগণের মধ্যে গিয়া পড়ে তবে তাহার জীবনের কোনও সম্ভাবনাই থাকে না।

সহরে বিশেষ করিয়া বহুদিন ধরিয়া দেখিবার মতন জিনিষ বিশেষ কিছু নাই বলিলেই চলে, কিন্তু ইহার জন সাধারণ একেবারে উপেক্ষার বিষয় নহে। হ্রদ হইতে কিছু দূরে একটি জেনানা-উদ্যান আছে। দর্শকরা এখানে আসিয়া দেখিতে পারেন। ভিতরের অন্তঃপুরিকা-উদ্যানে বাহিরের পুরুষের প্রবেশের হুকুম নাই, কিন্তু বাহিরের অন্তঃপুরিকা-উদ্যানে সকলে যাইতে পারেন। উদ্যানটি প্রকৃত ভারতীয় রীত্যনুযায়ী সজ্জিত। উদ্যানে একটি পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীর পাড়ে পাড়ে সুন্দর সুন্দর গাছ আছে ও কোথায় কোথায় খরতাপের সময় বসিবার জন্য ছোট ছোট ছায়াশীতল কুঞ্জ আছে। কিন্তু দর্শক যেখানেই যাউন না কেন তাঁহার মন সেই হ্রদেই পড়িয়া থাকিবে ও শান্ত স্বচ্ছ হ্রদে বিহার করিতে করিতে হ্রদজলে ও প্রাসাদগুলিতে প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মির বিচিত্র লীলা দেখিবার জন্য মন সর্ব্বদা উৎসুক রহিবে। উদয়পুর যেন একটা কল্পলোকের স্বপ্নরাজ্য, সে যেন বাস্তবের সীমার বাহিরে।

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী।

দাঁতের ওঝা

(আণ্টন চেখভের গল্প হইতে)

জমীদার-বাবুর দাঁতে বিষম ব্যথা। তিনি ধেনো মদে মুখ ধুইয়াছেন; দাঁতে চুরোটের ছাই, আফিম, টার্পিন, কেরোসিন তেল লাগাইয়াছেন; গালের উপরে আয়োডিন ঘসিয়াছেন; স্পিরিটে তুলো ভিজাইয়া কানে গুঁজিয়াছেন; যত-কিছু করিবার তা করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পাইতেছেন না। দাঁতের ডাক্তারকে ডাকানো হইয়াছিল, তিনি আসিয়া দাঁতের গোড়ায় একটা খোঁচা দিয়া কুইনীনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; বাবু কিন্তু তাহাতেও ভালো বোধ করিতেছেন না। দাঁতটা তুলিয়া ফেলিতেও তাঁর যথেষ্ট আপত্তি। বাড়ীতে প্রত্যেকেই একটা-না একটা প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতেছে—গিন্নি, ছেলে-মেয়েরা, চাকর-দাসী, এমন কি আস্তাবলের ছোঁড়াটা পর্য্যন্ত। অবশেষে জমীদার-বাবুর সদ্দার রাঁধুনী নিধু-ঠাকুর আসিয়া তাঁকে ওঝার আশ্রয় লইতে উপদেশ দিল।

সে বলিল—"হুজুর, দশ বছর আগে এখানে একটা লোক ছিল, দাঁত-ব্যথা সারাবার অমন ওঝা আর দুটি নেই। অদ্ভুত তার শক্তি! সে কেবল জানলার দিকে ফিরে একবার থুক্ করে' থুতু ফেলতো আর সঙ্গে-সঙ্গে ফস্ করে' ব্যথা সেরে যেত!"

"এখন সে কোথায়?"

"আজ্ঞে সে ষ্টাম্পো-আপিসে কাজ করতো। সে-কাজে জবাব পেয়ে সে তার শ্বশুরবাড়ী চলে গিয়েছিল। এখন শুনেছি সেখানেই থাকে। যা কিছু উপায় করে তা ঐ দাঁত থেকেই। কারুর দাঁতে ব্যথা হয়েছে কি অমনি তার ডাক পড়ে। কাছাকাছি যারা থাকে তারা অবিশ্যি তাকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যায়, কিন্তু দূরের রুগীদের টেলিগেরাপে সে চিকিচ্ছে করে। হুজুর, তাকে একটা টেলিগেরাপ পাঠিয়ে দিন, লিখে দিন—'ভগবানের দাস, আমার দাঁতে বড় ব্যথা, তুমি আমায় ভালো কর'। তার ভিজিটটা আপনি ঐ টেলিগেরাপেই পাঠিয়ে দিতে পারেন।"

"যা-যাঃ আহাম্মক কোথাকার!"

"আজ্ঞে হুজুর, একবার দেখুনই না! অবিশ্যি তার একটু পান-দোষ আছে, অন্য অন্য দোষও যে একটু-আধটু নেই তা নয়, কথাবার্ত্তায়ও বিশেষ মোলায়েম নয়, কিন্তু দাঁতের ব্যথা সারানোতে সে একেবারে ওস্তাদ! ওস্তাদ!"

জমীদার-পত্নী বলিলেন, "তা নয় দাওই না একটা তার করে'। অবিশ্যি ঝাড়-ফুঁকে তোমার বিশ্বাস নেই তা আমি জানি, কিন্তু তার পাঠালে তো আর তোমার কোনো ক্ষেতি হবে না! তারটা পাঠিয়ে দাও।"

জমীদার-বাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, দরকার হলে আমি যমদূতকেও তার করতে রাজী আছি। উঃ! আর ত সহ্য হয় না! আচ্ছা, বল্, তোর ওঝার নাম কি? কোথায় থাকে সে?"

বাবু কলমটা হাতে লইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বসিলেন।

"আজ্ঞে সেখানে তাকে সকলেই চেনে, রাস্তার কুকুরটা পর্য্যন্ত। তারটা পাঠান শ্রীগক্ত—"

"শ্রীগক্ত—কি?"

"আজ্ঞে শ্রীগক্ত— নামটা ঠিক মনে পড়চে না, এখানে আসতে আসতে এখুনি মনে পড়েছিল, দাঁড়ান একটু, বলচি।"

নিধু-ঠাকুর কড়ি-বরগার দিকে চোখ তুলিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল। জমীদার ও তাঁহার পত্নী অসহিষ্ণুভাবে তার উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

"কিরে কি হল? ভাব ভাব।"

"এই বলচি বলে'—নামটা তো অতি সাধারণ—ঘোড়া সম্বন্ধে একটা কি নাম।..."

"অশ্ব?"

"না অশ্ব নয় ত! দাঁড়ান..."

"অশ্বিনী?"

"না অশ্বিনীও নয়, নামটা যে ঘোড়া-সম্বন্ধীয় তা আমার বেশ মনে আছে, কিন্তু নামটা একদম ভুলে গেছি।"

" 'ঘোটক' নয়?"

"উঁহু, দাঁড়ান মনে করচি। 'ক্ষেত্র'—'ঘাস'—উঁহু:—কোনটাই নয়।"

"কুকুর-জাতীয় নাম নয় তো?"

"আজ্ঞে না, তা আর আমার মনে নেই—? ঘোড়া-জাতীয়, আমার ঠিক মনে আছে।"

জমীদার-পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা 'হয়' নয় ?"

নিধু মাথা নাড়িতে লাগিল, বলিল—"না, মনে পড়চে না।"

জমীদার-বাবুর অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি টেবিলের উপর একটা বিরাট ঘুসি মারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "নামই যদি তোর মনে নেই তবে আমায় জ্বালাতে এসেছিলি কেন রে ব্যাটা ? দূর হ! বেরো আমার সামনে থেকে !"

নিধু-ঠাকুর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। জমীদার-বাবু দুই হাতে দুই গাল চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন,—"উঃ ভগবান! প্রাণ গেল! মাগো! চোখে আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না!"

রাঁধুনীর সর্দ্দার বাগানে গিয়া আকাশের পানে মুখ তুলিয়া ষ্টাম্পো-বিক্রেতার নাম স্মরণ করিবার অক্ষম চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিড় বিড় করিয়া সে বলিতে লাগিল—"'বাজী'—'লাগাম'—'ঘাস'। ওঃ! কিছুতেই মনে পড়ে না।"

কিছুক্ষণ পরে বাবুর কাছে আবার তলব পড়িল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মনে পড়েছে কি ?"

নিধু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"আজ্ঞে ভাবছি।"

বাড়ীর সকলে যে যেখানে ছিল নামটা কি হইতে পারে ভাবিতে বসিল। ছোট বড় মাঝারি নানান রকমের ঘোড়া; নানা জাতের ঘোড়া; তাহাদের সাজ ও পোষাকের নাম—এক কথায় ঘোড়া সম্বন্ধে যাহা কিছু হইতে পারে সকলে ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হইয়া গেল। ঘরের মধ্যে, বাগানের মাঝে, চাকরবাকরের আস্তানায়, রন্ধনশালায়—সকলেই মাথা চুলকাইতেছে আর ভাবিতেছে, নামটা কি হইতে পারে।

ভৃত্যবর্গের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল—"ওহে, 'আস্তাবল' নয় তো ?"

নিধু বিরক্ত হইয়া বলিল—"না-না !"

অপর একজন জিজ্ঞাসা করিল—"'কোচমান' নয় ? 'ভাড়াটে গাড়ী' ?"

নিধু বলিল—"না হে না।"

তখন সকলে হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"তবে আর টেলিগেরাপ করবে কাকে ?"

জমীদারের শিশুকন্যা দ্বিতীয় ভাগের বানান মুখস্থ করিতেছিল, সে উৎসাহিত হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"বাবা! অ বাবা! 'হ্রেষা' নয় ত ?"

সেকথা শুনিয়া বড় দুঃখেও জমীদার-বাবুর হাসি পাইল। যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া বাবু প্রচার করিলেন, ঠিক নাম যে বলিতে পারিবে তাহাকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিবেন।

তখন পুরস্কারের লোভে বাড়ীসুদ্ধ চাকরবাকর নিধু-ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা-প্রকার নাম প্রস্তাব করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইল, তখনো নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। রাত্রি গভীর হইল, ঢুলিয়া ঢুলিয়া অবশেষে সকলে শুইতে গেল, তার আর পাঠানো হইল না।

বাবুর চোখে ঘুম নাই, তিনি সারারাত পাচারি করিয়া ফিরিলেন। ভোর তিনটের সময় পাচক-সর্দ্দারের শয়ন-কক্ষের দ্বারে আঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে নামটা মনে পড়ল ? 'তুরঙ্গ' নয় ত ?" বাবুর তখন কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

নিধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আজ্ঞে না হুজুর।"

"আচ্ছা স্মরণশক্তি যা হোক! আমি মরতে বসেছি, নাম আর তোর মনেই পড়ে না।"

পরদিন প্রভাতে দাঁতের ডাক্তারের আবার ডাক পড়িল। বাবু বলিলেন—"নিন, তুলে ফেলুন, আর তো সহ্য হয় না।"

ডাক্তার বেদনাদায়ক দাঁতটা তুলিয়া ফেলিলেন। অল্প-কালের মধ্যেই ব্যথা কমিয়া গেল, বাবুও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ফি লইয়া ডাক্তার গাড়ী চড়িয়া রওনা হইলেন। ফটক পার হইয়া মাঠে নিধুর সঙ্গে দ্যাখা। সে রাস্তার ধারে মাটির দিকে চাহিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল।

ডাক্তার নিকটে আসিয়া বলিলেন—"ওহে ঠাকুর, তোমার সন্ধানে কোথাও খড় আছে ? ইদানী চাষীদের কাছ থেকে কিনছিলুম, দেখলুম কোনো কাজের নয়।"

নিধু কথা কহিল না, ডাক্তারের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল, তারপর অদ্ভুত রকমে একটুখানি হাসিল। তারপর সহসা হাত দুখানা উপর দিকে তুলিয়া ধরিয়া সে ভোঁ ভোঁ করিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। সে কী ছুট! যেন তাহাকে পাগলা কুকুরে তাড়া করিয়াছে।

"নামটা মনে পড়েছে হুজুর, মনে পড়েছে"—বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিতে করিতে নিধু-ঠাকুর হুড়মুড় করিয়া বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া হাজির। "ডাক্তারের কল্যাণে নামটা মনে পড়েছে! নামটা হচ্চে খোড়োরাম! খোড়োরাম সর্দ্দারের নামে এখুনি টেলিগেরাপ পাঠিয়ে দিন, এক্ষুনি দাঁতের ব্যথা সেরে যাবে।"

বাবু তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন—"থাম্ থাম্ বোকারাম সর্দ্দার কোথাকার! দাঁতই নেই তা আবার দাঁতের ব্যথা!"

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতসম্বন্ধীয় মতবাদের সমালোচনা

(Emile Senart এর ফরাসী হইতে)

সাধারণ জাতিতত্ত্বের মতামত নেস্‌ফিল্‌ডের উপর বিলক্ষণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে; যে সময়ে তিনি সমস্ত গোঁড়ামি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, ঠিক সেই সময়েই তিনি আবার এরূপ অবিচলিত ভাবে কতকগুলি স্থিরনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন যে তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। অন্তত তিনি যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ ও সুস্পষ্ট;—যদিও তিনি এইরূপ সুস্পষ্টতা বরাবর রক্ষা করিয়া চলেন নাই। কিন্তু তাঁহার গন্তব্যস্থান যে কোথায় তাহা তিনি ঠিক্ বুঝিয়াছেন।

তাঁহার বিবেচনায়, বৃত্তি-সাম্যই জাতের মূল-ভিত্তি; ইহাই সেই কেন্দ্র যাহার চারিদিকে জাতটা গড়িয়া উঠিয়াছে। উৎপত্তির আর কোন কারণ তিনি স্বীকার করেন না। তিনি ইচ্ছা করিয়াই, বংশের প্রভাব, ধর্ম্মের প্রভাব, উহা হইতে বর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—ভারতে, আর্য্য ও আদিম-নিবাসী প্রভৃতি লোক-প্রবাহের পার্থক্য নির্দ্দেশ করা একটা নিছক বিভ্রম মাত্র। বহুপূর্ব্বেই দেশাক্রমণের বন্যায় লোকসাধারণ নিমজ্জিত হইয়াছিল। খুব শীঘ্রই সমস্ত একাকার হইয়া গিয়াছিল; খৃষ্টীয় যুগের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে, একতা অর্জ্জিত হইয়াছিল। কেবল, বৃত্তিগত বিশেষত্বের কৃপায়, জাতের ব্যবস্থাটা উহার মধ্যে ভেদের বীজ নিঃক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তা ছাড়া জাতগুলা একটা সুনির্দ্দিষ্ট ও অকাট্য শৃঙ্খলা অনুসারে পরিপুষ্ট হইয়াছিল; সেই একই শৃঙ্খলা যে শৃঙ্খলা অনুসারে কি কৃষি, কি শ্রম-শিল্প, তাবৎ বিভাগেই মানব-জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হয়; এই-সকল পর্য্যায়ের মধ্যে যে পর্য্যায়ের যে-পদগৌরব নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অবলম্বিত ব্যবসায় বা বৃত্তিও ঠিক্ সেই পদগৌরব লাভ করে। এই-প্রকারেই কারিগর-শ্রেণীয় জাতদিগের মধ্যে নেস্‌ফিল্‌ড্ দুটি বড় রকমের বিভাগ দেখিতে পাইয়াছেন:—প্রথম-বিভাগটি, ধাতুশোধন-শিল্পের পূর্ব্ববর্ত্তী যে-সকল শিল্প সেই-সকল শিল্পের অনুরূপ,—ইহাই নিম্নতম বিভাগ; দ্বিতীয় বিভাগটি অপেক্ষাকৃত সমুন্নত—উহা ধাতুশোধন-শিল্পসমূহের বিভাগ, কিংবা যে-সময় ঐ-সকল শিল্প বিকাশ লাভ করে সেই সময়ের বিভাগ। সাদৃশ্য-আভাস-মূলক ভিত্তির উপর ভর দিয়া তিনি এক অদ্ভুত-রকমের নৈপুণ্য খরচ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রত্যেক জাতের আপেক্ষিক অগ্রগণ্যত্ব—যেমনটি এখন আছে—উহা হিন্দুপ্রথা পূর্ব্ব হইতেই স্থিরনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। এইরূপে—শীকার, মাছধরা, গো-মহিষ চরানো, ভূম্যধিকার রাখা, হস্তসাধ্য ব্যবসায়, বাণিজ্য, দাস্যবৃত্তি, পৌরোহিত্য—এই-সকল কর্ম্ম অনুসারে এক জাত আর-এক জাতের উপরে অধিষ্ঠিত। তাঁহার নিজের ব্যবহৃত বাক্যগুলি এই:—"কেবল ভারতে নয়, সমস্ত জগতে, মানবজাতির শ্রমশিল্পে যে ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়, প্রত্যেক জাত সেই ক্রমোন্নতির এক এক ধাপ অধিকার করিয়া আছে।" জাত-সোপানের নিম্ন ও উচ্চ ধাপে শ্রমশিল্পের যেরূপ উন্নত অবস্থা বা অনুন্নত আদিম অবস্থা তদনুসারে প্রত্যেক শিল্পব্যবসায়ী-জাতের পদমর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হয়। এইরূপে, মানব-শ্রমশিল্পের প্রাকৃতিক ইতিহাস হইতেই পদমর্য্যাদার সোপান-দ্বারের চাবি পাওয়া যায় এবং

ছিন্দুজাতগুলা কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাও অবগত হওয়া যায়।"

ঐখান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া নেস্‌ফিল্‌ড্‌ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন যে, এক-এক শাখা-জাতি হইতে বিভিন্ন ব্যবসায় নিঃসৃত হইয়া আংশিকরূপে এক-একটা একতা গড়িয়া তুলিয়াছে এবং ব্যবসায়ের বিশেষত্ব অনুসারে, সামাজিক সোপানে, ঐ ঐক্যবদ্ধ জনপুঞ্জগুলির আপেক্ষিক পদমর্যাদা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঐ শাখাজাতি হইতে উৎপন্ন খণ্ডাংশগুলি, এক অভিনব মূলসূত্র অনুসারে, যেরূপে আবার পুনর্গঠিত হয়, জাত সেই উৎপত্তির স্মৃতিটি বরাবরই রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বিবাহ সম্বন্ধে সংকীর্ণ নিয়মাদি, ও সমতুল্য ভিন্ন দলের সহিত সংস্রব রাখা সম্বন্ধে কঠোর নিষেধ—এই সমস্ত—জাত, প্রাচীন শাখা-জাতির আদর্শ হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

অতএব, তাঁহার মতে সামাজিক জীবনের নিম্নতম ভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া এবং পরে উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সামাজিক জীবনের যে ক্রমবিকাশ হইয়াছে সেই ক্রমবিকাশ হইতেই জাত নিঃসৃত হইয়াছে। কিন্তু তিনি জাত-গঠন-সময়কার যে আপেক্ষিক বিলম্ব-কাল ধরিয়াছেন, তাহার সহিত এই কথাকে কিরূপে মিলাইবেন, তাহা আমি ত বুঝিতে পারি না। খৃষ্টীয় যুগের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, হিন্দুরা সভ্যতার মূলীভূত অতীব সামান্য উপাদান হইতেও বঞ্চিত ছিল, অর্থাৎ তখনও বর্ব্বর ছিল,—ইহার কি কোন নিদর্শন আছে?

আরও আমি এই কথা বুঝিতে পারি না, এই দৃষ্টিভূমি হইতে, শ্রীযুক্ত নেস্‌ফিল্‌ড্‌ জাতের উৎপত্তিক্ষেত্রে, কেমন করিয়া ব্রাহ্মণের জন্য একটা সুনির্দ্দিষ্ট স্থান রাখিয়া দিয়াছেন। ফলত তিনি বলেন যে, "কালের ক্রম হিসাবে ব্রাহ্মণ জাতই সর্ব্বপ্রথম: অন্য জাতগুলা এই আদর্শে গঠিত হয়।' উহারা রাজা বা যোদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া শিকারী ও মাছ-ধরা প্রভৃতি' নিতান্ত অসভ্য শাখা-জাতি পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে।" স্বীয় দৃষ্টান্তের প্রভাবে ও আত্মরক্ষার প্রয়োজন-বশত ব্রাহ্মণেরাই অন্য জাতের মধ্যে রুদ্ধদ্বারিতার ভাবটা অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণই জাত-প্রণালীর সংস্থাপক। যে-একমাত্র নিয়ম ব্রাহ্মণ-জাতের গঠনটাকে বজায় রাখিয়াছে, সেই নিয়মটি স্বার্থের উদ্দেশে ব্রাহ্মণের দ্বারাই উদ্‌ভাবিত হইয়াছিল। সেই নিয়মটি কি?—না অন্য জাতের নারীকে বিবাহ না করা। তিনি এই যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শাখাজাতি হইতে জাতের চিরাগত প্রথাসকল উৎপন্ন হইয়াছে এই সিদ্ধান্তের সহিত এই বিবাহ সম্বন্ধীয় নিয়মের আশ্চর্য্য অসঙ্গতি।

শাস্ত্রীয় গ্রন্থের গোঁড়ামিতে তিনি যে প্রতারিত হইবেন, এরূপ হইতে পারে না। তাঁহার মতে "আজিকার দিনে ভারতে চারি জাতের যেরূপ অস্তিত্ব, কস্মিনকালেও তাহার অন্যথা হয় নাই—চিরাগত প্রথাই উহাদের একমাত্র প্রমাণ।" অতীতকালের হিন্দ-য়ুরোপীয় জাতি হইতে গ্রহণ করিয়া,—ভারত কেবল জাতের বৈচিত্র্যকে ব্যবসায়-ভেদের সহিত জুড়িয়া দিয়াছে এইমাত্র। এইটুকুই ভারতের কৃতিত্ব। বৈশ্য ও শূদ্রেরা একপ্রকার আবরণের মতো ছিল—তাহার ভিতর যত-রকমের মিশ্র পদার্থ ঢাকা-চাপা থাকিত। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে নেস্‌ফিল্‌ড্‌ বেশ বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার মতবাদের মধ্যে একটা সংশোধনোক্তি (Corrective) না থাকা প্রযুক্ত অর্থাৎ দোষটা কাটিয়া যায় এরূপ কোন কথা না থাকা প্রযুক্ত প্রমাণের পরিসরটা অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়িয়াছে;—উহা সকল দেশের পক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে। তাঁহার স্বাভাবিক স্বাধীন বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও, তিনি চিরাগত প্রথার মাহাত্ম্য-প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন। সে যাহাই হউক, চিরাগত প্রথার নিকট তিনি যে একটু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন সে ত্যাগের ভাবটি তাঁহার সমস্ত পদ্ধতির অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ভাব নহে—তবে কি না, উহার দ্বারা তাঁহার সমস্ত যুক্তিবিন্যাসটা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মতবাদের মৌলিকতা অন্যত্র লক্ষিত হয়। যদিও তাঁহার পূর্ব্বে, অন্য লেখকেরা জাতের উৎপত্তি-নির্ণয়ে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের কার্য্যকারিতা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক সমস্ত ক্রমবিকাশকে আলোচনার মধ্যে আনেন নাই। শাখাজাতির স্মৃতিসম্বন্ধীয় বিশেষত্বসূচক খুঁটি-নাটিগুলিও তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই স্বকীয় রচনার মধ্যে জুড়িয়া দেন নাই। নৃ-বংশতত্ত্বরূপ অভিনব ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, তিনি পরিপ্রেক্ষিতকে—অর্থাৎ দূরত্ব বৃদ্ধ-

[পা]রিসরকে (perspective) আরও সম্প্রসারিত করিয়াছেন [এ]বং তথ্যব্যাখ্যার আরো প্রশস্ততর ভিত্তি প্রস্তুত [ক]রিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি যে-সকল মতামতের বীজ ছড়াইয়াছেন [তা]হা অন্তর্হিত হইলেও কোন একটা ফাঁক থাকিয়া যায় না। [তাঁ]হার মতে, অতি পুরাকালে জনসংঘের বিবিধ উপাদান [এ]কত্র মিশ্রিত হইয়া, সমস্তটা প্রাচীন যুগ হইতেই সম্পূর্ণ [এ]কাকারে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস যতই [স]লম্ভ হউক না, উহা হইতে অনেকগুলি আপত্তি ও [ব্য]তিরেক উত্থাপিত হইবার কথা। কিন্তু জাতের ব্যবসায়-[মূ]লক উৎপত্তিসম্বন্ধে তাঁহার যে মত, সেই একটি মাত্র মতের [ব]ন্ধনে তিনি নিরবচ্ছিন্নরূপে আবদ্ধ নহেন। জাতের [ব্য]বসায়মূলক উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি যতটা বলিয়াছেন, [শ]ব্দব্যুৎপত্তিমূলক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে, পৌরাণিক কাহিনীমূলক [ত]থ্য সম্বন্ধেও ততটা বলিয়াছেন। গোড়া হইতে আরম্ভ [ক]রিয়া,—মূল-শাখা জাতি হইতে জাতগুলা দলে দলে ঠিক্ [যে] সময়ে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল সেই সময় পর্যান্ত, অনেকগুলি [জা]তের ইতিহাস, তিনি ঐ-সকল সিদ্ধান্ত ও তথ্য হইতে [ক]রিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। এ ক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি [যা]র-পর-নাই বিচিত্র, তাহাদের যোগাযোগ খুবই চমৎকার, যদিও আলোচনা-প্রণালীটা তেমন কড়াক্কড় নহে।

নেস্‌ফিল্‌ড্‌ বোধ হয় বাহিরের দিক্‌ ও বর্ত্তমান [অ]বস্থার দিক্‌ দিয়াই এ বিষয়ের বেশী আলোচনা করিয়াছেন। [দৈ]নন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে তিনি আলোচনা আরম্ভ করিয়া[ছে]ন। ইহাতে যেমন সুবিধাও আছে, তেমনি বিপদও [আ]ছে।

তাঁহার মতবাদটা তাঁহার মনকে এরূপ অধিকার [ক]রিয়া বসিয়াছে, যে, তিনি স্বভাবতই আমাদের সম্মুখে [এ]কটা আনুমানিক ব্যাখ্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন,—[প্র]তি-পদে প্রমাণ অনুসরণ করিয়া চলেন নাই। যে [বি]ষয়টা ঐতিহাসিক ব্যাপার হইতে সমুৎপন্ন, তাহা যদি [সা]ধারণ ভাবের মন-গড়া সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে সেটা [কে] লোকে গ্রহণ করিবে?

এক অংশে ব্যবসায়কে এবং অপর অংশে শাখাজাতির [স]মাজ-গঠনকে প্রধান আসনে স্থাপন করিয়া, অন্তত তিনি এমন একটা [ধা]রণা মনোমধ্যে পোষণ করিয়াছেন যে-ধারণা সমসাময়িক জীবনের অধিকাংশ পর্য্যবেক্ষকের মনে আবির্ভূত হইয়া থাকে। নৃজাতিতত্ত্বমূলক জনমণ্ডলীসমূহ ন্যূনাধিক প্রসারিত একই রজ্জুতে আবদ্ধ দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে কতকটা আভাস দিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে আমি চেষ্টা করিয়াছি। যতই জটিল হউক, এই বিষয়টাকে দৃষ্টির বাহিরে রাখিলে চলিবে না। তাঁহারা দেখিতে পান, অশেষ প্রকার অবনতি প্রাপ্ত হইয়া, ঐ-সকল জনমণ্ডলী অল্প-বিস্তর জাতের আদর্শের কাছাকাছি আসিয়াছে; এতটা কাছাকাছি আসিয়াছে যে গোড়ার উৎপত্তির বন্ধনের স্থানটা ব্যবসায়-সাম্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে। সুতরাং স্বভাবতই তাঁহাদের আনুমানিক সিদ্ধান্তগুলি, এই দ্বিবিধ উল্লেখের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া থাকে।

ইবেট্‌সনের মতবাদ, নেস্‌ফিল্‌ডের মতবাদ অপেক্ষা কম সম্পূর্ণ, কম "ঠেলিয়া চলা" (এইরূপ বাক্য যদি সাহস করিয়া প্রয়োগ করিতে পারি) হইলেও ইবেট্‌সনের মতবাদ একই (data) স্বীকৃত-তথ্যের উপর স্থাপিত। তিনি ততটা পদ্ধতি-প্রিয় নহেন, একই জিনিসের পরিবর্ত্তন-শীল বিচিত্র রঙের আভা তাঁহার চোখে পড়ে; সুতরাং তিনি সহসা কোন কিছুকে সমান-শ্রেণীর ভিতর আনিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন না—তিনি কিছু কিছু "হাতে রাখিয়া দেন"।

তথাপি, জাতের ইতিহাসের কতকগুলি ধাপ তিনি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন, যথা:—১। শাখাজাতির সমাজগঠনের ব্যবস্থা;—যাহা সমস্ত আদিম সমাজেই সমাজ-রূপে পরিলক্ষিত হয়। ২। ব্যবসায়ের মৌলিকতার উপর ব্যবসায়ী শ্রেণীগুলি প্রতিষ্ঠিত। ৩। পৌরোহিত্যের উচ্চ-পদমর্য্যাদা ভারতের বিশেষত্ব। ৪। যাজক-শোণিতের মাহাত্ম্য কুলক্রমিকতার উপর আরোপিত হইয়া থাকে। ৫। হিন্দুর বিশ্বাসাদি হইতে কতকগুলি কৃত্রিম নিয়ম বাহির করিয়া, এবং তাহাই খুব ফলাও করিয়া তুলিয়া একটা মূলসূত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। হিন্দুবিশ্বাসের উপর স্থাপিত ঐ-সকল নিয়মানুসারে বিবাহ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, বিবাহের গণ্ডি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কোন্‌ ব্যবসায়

গুলি, কোন্ খাদ্যগুলি অশুচি এবং জাতগুলি পরস্পরের মধ্যে কিরূপ ব্যবহার ও সম্বন্ধ রক্ষা করা আবশ্যক তাহাও নির্ণীত হইয়াছে।

এখানেও শাখা-জাতির ব্যবসায় ও সমাজপদ্ধতি কোন্ স্থান অধিকার করে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল এক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট কাজটা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ইবেট্‌সনের মতে, প্রথমে ব্রাহ্মণদের যে-প্রভুত্ব ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পরে তাহার ভিত্তিটা অতীব ক্ষণভঙ্গুর হইয়া পড়ায় সেই প্রভুত্বকে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ব্রাহ্মণেরা শাখাজাতি-বিভাগের মধ্যে, সেই-সকল বিভাগের মূলীভূত ব্যবসায়িক কৌলিকতার মধ্যে, একটা বহুমূল্য ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইল। তাহারা সেই ইঙ্গিত হইতে নিজের সুবিধা ও লভ্য করিয়া লইল। সেই ইঙ্গিত হইতে তাহারা,—জন্মাবধি হিন্দু যে-সকল নিয়ম-সংযমের জালে, যে-সকল নিষেধের জালে বিজড়িত, সেই-সকল নিয়ম-সংযম ও নিষেধ বাহির করিল। এইরূপে, ব্রাহ্মণেরা দেশের স্বতঃ-প্রাদুর্ভূত সমাজগঠনের একটি শাখারূপে বর্ণিত হইয়াছে।

নেস্‌ফিল্‌ডের মতবাদ অপেক্ষা এই মতবাদটি বেশী যুক্তি-নিয়মানুযায়ী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু ইহা বোধ হয় আরো বেশী প্রমাণ-বর্জ্জিত কপোল-কল্পিত অনুমান হইতে সমুদ্ভূত। কিন্তু এই সকল নিয়ম-সংক্রান্ত যে ধারনা, তাহা কি জাতের পক্ষে অত্যাবশ্যক, জাতের খুবই লক্ষণ-পরিচায়ক? এই যে সব কড়াক্কড় নিয়ম হিন্দুর ধর্ম্ম-বুদ্ধির উপর অব্যভিচারী আধিপত্য বিস্তার করে, উহা কি একটা কৃত্রিম উদ্ভাবিত বস্তু নহে? বিলম্বে আবির্ভূত নহে?—এক পক্ষের স্বার্থ-দৃষ্টি হইতে প্রসূত নহে? ইবেট্‌সন ব্যবসায়-সাম্যের উপর যেরূপ অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়াছেন (এই বিষয়ে নেস্‌ফিল্ড এক-মত) তাহাতে তাঁহার মতবাদের অট্টালিকাটা ভিত্তি হইতেই দোষাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যদি সত্যসত্যই আদিম বন্ধনটা ব্যবসায়-সাম্যেই আবদ্ধ ছিল এরূপ হয়, তাহা হইলে জাতের ভিতর অতটা খণ্ডবিভাগের প্রবণতা, ভাঙ্গাচোরার প্রবণতা প্রকাশ পাইত না। যে জিনিসটা গোড়ায় সমস্তকে একীভূত করিয়াছিল, তাহা সেই ঐক্যকে পরেও রক্ষা করিতে পারিত।

ইহার বিপরীতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিতে পাই,—একস্থাননিবাসী একই ব্যবসায়ের লোকের মধ্যে নৈকট্য স্থাপিত হওয়া দূরে থাক্, জাত তাহাদের মধ্যে একটা ব্যবধান আনিয়া দেয়। দেখা যায়, এক জাতের অন্তর্ভূত লোক কত বিভিন্ন ব্যবসায়ের দ্বারা পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। এ কেবল, নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে নহে, খুব উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। প্রচলিত মুখ্য ব্যবসায়ের পরিত্যাগমাত্রই কুত্রাপি জাত হইতে বহিষ্কৃত হইবার যথেষ্ট কারণ বলিয়া পরিগণিত হয় না। ব্যবসায়-গুলা সম্মানের সোপানে ধাপে ধাপে উঠিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শুচিতার ধারণা অনুসারে ধাপগুলি স্থাপিত হইয়াছে। যে-সকল ব্যবসায়ে অশুচিতা নাই বা অতিমাত্র অপবিত্রতার স্পর্শ নাই, সেই-সকল ব্যবসায় সকল-জাতের নিকটেই উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে। নেস্‌ফিল্‌ড্ নিজেই বলেন, "যে-সকল ব্যবসায়ে ক্রিয়াকর্ম্ম দূষিত হয় ও তাহার দরুণ জাত-চ্যুত হইতে হয় সেই-সকল ব্যবসায় ব্যতীত" আর সকল-রকম ব্যবসায়ই ব্রাহ্মণদিগকে অবলম্বন করিতে দেখা যায়। যদি খুব ঘৃণিত জাত, এমন কতকগুলি নূতন বিভাগে আবার বিভক্ত হয় যাহাদিগকে মূলজাতের লোকেরাও ঘৃণা করে, তবে সে শুধু পৃথক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া নহে, সে শুধু তাহাদের কৌলিক ব্যবসায়ের অমুক খুঁটিনাটি ত্যাগ করিয়াছে বলিয়াই প্রচলিত বদ্ধমূল ধারণা অনুসারে তাহারা অশুচি বলিয়া পরিগণিত হয়। ঝাড়ু-বর্দ্দারদিগের অন্তর্ভূত কতকগুলি মণ্ডলী ইহার দৃষ্টান্ত।

এ কথা সত্য যে, অনেকগুলি জাত তাহাদের ব্যবসায়-সংক্রান্ত হাতিয়ারকে পূজা করে। ধীবর তাহার নূতন নৌকার নিকট একটা ছাগল বলি দেয়; রাখাল তাহার গোমহিষের শিং-এ গেরি-মাটি লাগাইয়া দেয়। চাষা, লাঙ্গল দিয়া যে স্থানে মাটির প্রথম চাপ্‌ড়া উঠায়, সেইখানে চিনি ঘি ও চাউল একত্র মিশাইয়া নৈবেদ্য-স্বরূপ অর্পণ করে; কারিগর তাহাদের হাতিয়ার দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করে; যোদ্ধা স্বকীয় অস্ত্রাদির পূজা করে, লিপিকর তাহার কলম ও দোয়াতকে পূজা করে। যতই কৌতূহলজনক হউক না কেন, এইরূপ আচার-অনুষ্ঠানে কি সপ্রমাণ হয়?—বিভিন্ন-প্রকারের ব্যবসায়ে ব্যাপৃত একই জাতের লোকেরা এইরূপ

বভিন্ন বিগ্রহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ইহাই প্রমাণ হয়।

অনেকগুলি জাত নিজের মুখ্য ব্যবসায়ের নাম হইতে কীয় নাম গ্রহণ করে; কিন্তু উহা কেবল শ্রেণীসাধারণের নামের সম্বন্ধেই, এ কথা বলা যাইতে পারে। উহাকে সারিত করিয়া জোর করিয়া জাতের নাম পর্য্যন্ত আনা য় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ন্যায়, "বণিয়া" বণিক সংজ্ঞাটিকে তের নামের হিসাবে দেখা নিতান্তই অনুচিত। একই দেশের মধ্যে, এই "বণিয়া" অনেকগুলি উপবিভাগের ন্তর্ভূত, ঐ সমস্তের একীভূত হইবার কোন অধিকার াই; উহারা একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতেও পারে না। হারাই প্রকৃত "জাত"। একই জিলায় ১০।১২ করিয়া ষি-জাতের সংখ্যা গণনা করা যায়; এবং বাঙ্গলার কায়স্থেরা, ধারণ ব্যবসায়িক নাম সত্ত্বেও, প্রকৃতপক্ষে, অনেকগুলি াতে বিভক্ত; ভৌগোলিক বা গোত্রীয় নাম-অনুসারে াহাদের বিভিন্ন নাম। তাহাদের মধ্যে বিশেষ-আচার-নুষ্ঠানবিশিষ্ট ও বিশেষ-এলাকা-ভুক্ত যতগুলি দল, ততগুলি াত। এইরূপ সর্ব্বত্র।

এমন হইতে পারে, কোন কোন স্থলে, একটা স্থানীয় বসায়িক উপাধির অন্তর্ভুক্ত হইয়া, একটা সমস্ত মণ্ডলী ক জাতভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ব্যতিক্রমস্থল। বসায়ের বন্ধনটি অতীব ক্ষণভঙ্গুর, দৈবক্রমে একটা কোন াঘাত লাগিলেই উহার একতা ভাঙ্গিয়া যায়। জাতের অক্ষ-কীলকটি ব্যবসায়ের ভিতর অবস্থিত নহে।

ব্যবসায়ের বিশেষত্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উহা কেবল রোপীয় মধ্যযুগের অথবা রোমীয় জগতের (guild) ব্যবসায়-য়ী মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। এই দুই প্রতিষ্ঠানকে এক লিয়া কে প্রতিপাদন করিবে? তন্মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান বল কারিগরদিগের মধ্যেই বদ্ধ, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ঠানের মধ্যে আবদ্ধ; প্রয়োজন ও স্বার্থের তাড়নায় যে কল আর্থিক অবস্থা উৎপন্ন হয়, ঐ প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়া বল তাহারই উপর প্রকটিত হইয়া থাকে। অপর তিষ্ঠানটি সমগ্র সামাজিক অবস্থার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, কলের কর্ত্তব্যকে নিয়ন্ত্রিত করে, সকল স্থানেই তাহার র্য্য, ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত উহা নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। জাত ও প্রাচীনকালের বণিকশ্রেণীসমূহ (guild) কোন কোন অংশে পরস্পরকে যে স্পর্শ করিবে—ইহা অপেক্ষা সহজ কথা আর কিছুই নাই। উভয়ই দলবদ্ধ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি (Corporation)। ইহা কেহই অস্বীকার করে না যে, শ্রমজীবী বা কারিগরদিগকে পরস্পরের সমীপবর্ত্তী করিবার জন্য বা উহাদিগকে গণ্ডীবদ্ধ করিবার জন্য ব্যবসায়-সাম্য কতকটা সাহায্য করিয়াছে। কখন কখন দেখা যায়, ব্যবসায়ের প্রভাবাধীনে কতকগুলি ব্যক্তি কোন এক নূতন জাতের অক্ষ-পথে আকৃষ্ট হইয়াছে, কতকগুলি নূতন উপবিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার অনুরূপ ক্রিয়া আরও কত প্রকরণে প্রকটিত হইয়াছে!

কোন কোন দেশে গোলাম আছে, যথা রুস্ দেশে ও অন্যত্র—অন্তত কিছুকাল পূর্ব্বেও সাধারণ-অধিকার-সমন্বিত গ্রাম্যসমবায়-মণ্ডলী (Village Community) ছিল; তাহাদের একমাত্র ব্যবসায়। চামারদিগের গ্রাম, কামারদিগের গ্রাম, ছুতোর ও কুমোরদিগের মণ্ডলী, এমন-কি ব্যাধ ও ভিক্ষুকদিগেরও মণ্ডলী। এই-সকল গ্রাম, এক-সমাজরূপে প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি কারিগর-সম্মিলনী নহে, পরন্তু ইহারা একই ব্যবসায়-অবলম্বী কতকগুলি সমাজ। কোন-এক ব্যবসায় দলবন্ধনে পর্য্যবসিত হয় নাই, পরন্তু দলবন্ধনই ব্যবসায়-সাম্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে, ব্যবসায়-সাম্যের কথা মনে করাইয়া দিয়াছে। তবে ভারতেও এইরূপ হইবে না কেন? জাতের অদৃষ্টের উপর যে-সকল প্রবর্ত্তক-হেতু কাজ করিয়াছে তাহার মধ্যে ব্যবসায়-সাম্যকেও স্থাপন করা, আর ব্যবসায়-সাম্যকে সমস্ত জাত-পদ্ধতিটার মূল-উৎসরূপে প্রতিপাদন করা,—এই দুইটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। প্রথমোক্ত ব্যাপারটি যেরূপ সম্ভবপর, দ্বিতীয়োক্ত ব্যাপারটি তেমনি অগ্রাহ্য।

একজন হিন্দু—একজন বিচারক, সমস্ত অবস্থাটা সম্বন্ধে যাঁহার বাস্তব অনুভূতি ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আছে (গুরুপ্রসাদ সেন)—জাতের স্থায়ী লক্ষণগুলি বিবৃত করিতে গিয়া, তিনি ব্যবসায়কে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন। কতকগুলি নিয়মের মধ্যেই জাতের স্বরূপগত লক্ষণ বিদ্যমান;—তাহা ছাড়া আর কোথাও নাই। সম্পূর্ণরূপে সেই-সকল নিয়মপালনের উপরেই জাতের

স্থায়িত্ব নির্ভর করে—উহার লেশমাত্র লঙ্ঘনে কোন ব্যক্তির পক্ষে জাত্যপাত ও সমস্ত জাতের পক্ষে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ব্যবসায়ের সহিত এই-সকল নিয়মের কোন সম্বন্ধ নাই; অথবা, কেবল শুদ্ধাশুদ্ধ-বিচারের মধ্যবর্ত্তিতা-যোগে পরোক্ষভাবে একটা সম্বন্ধ আছে এইমাত্র। জাতের অন্তরাত্মাটা অন্যত্র অবস্থিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফুলের ভাষা

(আদল্ফ্ রিবো'র মূল ফরাসী গল্প হইতে)

সেবার পারীতে গরমটা বড় সকাল-সকাল পড়েছিল। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহটায় যেমন ঝাঁঝ তেমনি ধূলো। রাজবাগানের লিলি ফুলগুলি এরি মধ্যে শুকিয়ে উঠেছে, কফির দোকান অনেকগুলিই বন্ধ। সারা শীতকালটা শহরে বসে বসে খেটে হায়রান হয়ে উঠেছিলাম, এইবার আমি আর আমার বন্ধু ত্রেভিস্ শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। সে ছবি আঁকত, আর আমার কাজ ছিল কবিতা লেখা। দুজনে ব্রেতাঞ্‌এর এক গাঁয়ে এসে হাজির হলাম, আশা ছিল যে এখানকার নীল আকাশের কোল থেকে ছবির আর কবিতার কিছু খোরাক জোটাতে পারব।

তখন মে মাসের মাঝামাঝি; ত্রেভিস্ পারীর ছবির প্রদর্শনীতে একখানা ছবি পাঠিয়ে এসেছে, আর আমারও একখানা বই সবে বেরিয়েছে, নাম সেটার "প্রাণের গান"। দুজনের সমালোচনা যা কাগজপত্রে বেরচ্ছে, তা বেশ আশাজনক, কাজেই মাস কয়েকের মত বিনয় মিতব্যয়িতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলোকে বিদায় দিয়ে বসে আরাম করতে পারব, এই আশায় আমরা খুবই খুসী হয়ে উঠেছিলাম।

এক-একটা পুঁটলী কাঁধে করে পায়ে হেঁটেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পনেরো দিন ধরে পথই চলছি, হাস্‌তে-হাস্‌তে আর শিশ্ দিতে দিতে। পথের বিপদ-আপদের দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। মনের সুখে বেড়িয়ে নিয়ে, আমরা থামলাম এসে একেবারে দেশের এক টেরে, এক নিরালা কোণে। সাগরের তীরে একটি ছোট্ট গ্রাম, তখন বসন্তের স্পর্শ পেয়ে ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়েছে। জাঁকজমকওয়ালা হোটেল সেখানে একটিও নেই, আছে কেবল নেহাৎই ঘরোয়া ধরণের সাদাসিধে একটি সরাই। সাদাসিধে হলেও সব বেশ পরিষ্কার ঝরঝরে, রান্নাবান্না চমৎকার, বিছানার চাদরগুলোতে যেন টাট্‌কা ফুলের গন্ধ, আর জান্‌লা খুল্‌লেই চোখে পড়ে সাগরের নীল জলের খেলা।

আমাদের আগমনে গাঁয়ে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। লোকজন এখানে প্রায়ই আসে না, কাজেই আমরা দেখবার জিনিস হয়ে উঠেছিলাম। সরাইটার বাঁধা খদ্দের সব এই-দেশী লোক, প্রাণখোলা, স্নেহশীল, সোনার মত খাঁটি মানুষ। সবাইকারই দেশের চালচলনের প্রতি অচলা ভক্তি।

সবাই মিলে আদর দিয়ে আমাদের মাথায় তুলেছিল। ক'দিনের মধ্যেই আমরা যেন সকলেরই বাড়ীর লোক হয়ে উঠলাম।

চারিদিকে তখন যেন উৎসব লেগে গিয়েছে! আকাশ নীল, সাগরও নীল, রোদটিও বেশ মিঠে রকমের গরম, আর গাছে গাছে ফুলের হাট। ভোর হতেই আমরা দুজনে ছবির আর কবিতার মাল-মশলা খুঁজতে বেরিয়ে পড়তাম। ত্রেভিসের হাতে তার ছবি আঁকবার খাতা আর পেন্সিলের গোছা, আর আমার হাতে হয় একখানা শুধু খাতা, নয় একখানা বই। এই-সব সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আমরা তরুণী বসন্ত-লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করতে বেরতাম।

এ দেশটার সৌন্দর্য্যের উপর কেউ সভ্যতার প্রলেপ লাগিয়ে দেয়নি, দেখে দেখে আমার আর চোখের পলক পড়ত না। গ্রামটিতে মোটে বারটি কি চোদ্দটি খড়ের ঘর, এক সার ওক্‌গাছের ছায়ায়, মায়ের কোলে শিশুর মত চুপ করে পড়ে রয়েছে। চারধারে মাঠ, গমের ক্ষেতগুলি সাদা ফুলে ছেয়ে গিয়েছে, কোথাও বা ঘাসের বনে ঢেউ উঠছে, বেগুনি ফুল তাদের চারধার ঘিরে ফুটে রয়েছে। গাঁয়ের ভিতর দিকে আরও খানিক এগিয়ে গেলে দেখা যায় মাঠভরা নানা রঙের বনফুল, সোনালি, লাল, নীল, কত তাদের বিচিত্র সাজ। সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে জলরাশির দিকে তাকিয়ে হরেক রকমের নৌকোর পাল চোখে পড়ে, আরও দেখা যায় যে ঐ জলতরঙ্গগুলির চূড়ায় বেগে ফেনা উঠে' ক্ষণে

রূপে জলধির শ্যাম বুকে সাদা ফুলের মালা দুলিয়ে দিচ্ছে। বেড়িয়ে-চেড়িয়ে যখন ফিরে আস্তাম তখন দেখা যেত ব্রেভিসের খাতায় অনেকগুলি ছবির নক্সা জড়ো হয়ে উঠেছে, আর আমিও কবিতা লিখবার উপযুক্ত অনেক-কিছু টুকে নিয়েছি।

ফিরতেও দেরি হত ঢের, এক পা করে এগোচ্ছি আর এমন একটা কিছু ছবির মত সুন্দর জিনিষ চোখে পড়ছে যে সেইখানেই থেমে যাচ্ছি;—কোথাও একটা মস্ত পাথরের স্তূপ, কবে থেকে সে একজায়গায় দাঁড়িয়ে নীরবে যেন কোন অতীত রহস্যে ঢাকা যুগের কথা বলে চলেছে; আবার কোথাও বা একটা মাটির ঢিপির উপরে, অনন্ত শূন্যে তার ব্যাকুল দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়ে শোকের প্রতি-মূর্ত্তির মত একটা কাঠের ক্রুশ দাঁড়িয়ে আছে।

একদিন একটা আধভাঙা খোড়ো বাড়ী দেখতে পেলাম, তার চালটা রং-বেরঙের শ্যাওলায় আর ঝুমকো-লতায় ছেয়ে গিয়েছে, তার ছোট ছোট কাঁচের জানলায় সূর্য্যের আলো পড়ে বিচিত্র রামধনুর সৃষ্টি করেছে। সেখানে একটি বুড়ীকে দেখলাম, সে চরকা কেটে খায়, বাতে হাত আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে, কাজেই তাড়াতাড়ি কাজ এগোয় না, চরকা ঘুরোতে কষ্ট হয়। তার কাছে বসে অনেক কথা হল। সে আমাদের ঐদেশী সব পুরানো কাহিনী শোনাচ্ছিল। তার গল্প শুন্তে শুন্তে অনাদি অতীতের গৌরব-মণ্ডিত মূর্ত্তি আমাদের সামনে জেগে উঠছিল; বনের ভায়লেট ফুলের মৃদু গন্ধের মত, কত গত-দিনের স্মৃতি যেন হাওয়ায় ভেসে আস্‌ছিল।

আমরা ছাড়া কাছাকাছির মধ্যে ভিন্নদেশী লোক আর কেউ ছিল না। এই নিরালা কোণটিতে কেই বা আর আস্‌তে যাবে? একমাত্র আস্‌তে পারে সেই চিত্রকর আর সমালোচকের দল, শহুরে আমোদে যাদের জ্বালাতন ধরে গিয়েছে; প্রকৃতি মায়ের কোলে একবার ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাঁর শান্তির উৎসে একবার ডুব দিয়ে যারা শরীর মন জুড়িয়ে নিতে চায়।

দিনগুলো যদিও একধরণেই কাটছিল, কিন্তু তার জন্য স্বপ্নেও আমাদের কোনো দুঃখ হয়নি। এই নির্জ্জনতা আর এই শান্তি খুঁজবার জন্যেই ত আমরা বেরিয়েছিলাম।

সরাইয়ে কাজকর্ম্মের জন্য গাঁয়ের একটি মেয়ে ছিল, তার নাম মারী। ভারি চমৎকার দেখতে সে, পাকা ধানের শীষে সকাল বেলার আলো পড়লে যেমন দেখায়, তেমনি টকটকে তার গায়ের রং, মুখখানি যেন কে যত্নে কুঁদে তৈরি করেছে, চোখ দুটি নীল পদ্মের মত হাস্‌ছে। তাকে দেখলেই মনে হত যেন তরুণী বনলক্ষ্মীটি। সে তার দেশী ভাষা ছাড়া আর কিছু বল্‌তে পারত না, ভাষাটা অন্যের মুখে বড্ডই চাষাড়ে আর কর্কশ শোনাত, কিন্তু তার মুখের কথা পাখীর কাকলীরই মত মিষ্টি। ঐ ছোট্টখাট্ট মেয়েটি আমাদের মুগ্ধ করে দিয়েছিল। যখন ঘুরঘুর করে সারা বাড়ীময় সে ঘুরে বেড়াত, তখন আমার তাকে দেখ্‌তে ভারি ভাল লাগ্‌ত। সারাদিনই সে কাজ নিয়ে আছে, আর আমরা কিসে আরামে থাকি, তা নিয়ে ত সে মহা ব্যস্ত।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে আমরা দুজন প্রায়ই চাঁদের আলোতে বেড়াতে বেরতাম। তখন দেখতাম বাড়ীর সামনের পাথরের বেঞ্চিতে মারী একজন যুবকের সঙ্গে বসে আছে। সে যে খাঁটী ব্রেতাঞ্-এর ছোক্‌রা তা তার মুখ আর পোষাক দেখলেই বোঝা যায়। তারা দুটিতে বসে কথা কইত, তাদের চোখের চাউনিতে যেন পরস্পরের প্রতি ভালবাসা উছ্‌লে পড়ত।

আমাদের হোটেলওয়ালা জিগ্‌গেষ করাতে সে সব-কথা খুলে বল্‌ল। ইয়াঁ আর মারীর ছেলে-বেলা থেকেই খুব ভাব, অনেকদিন হল তাদের বিয়ের ঠিক হয়ে আছে। দেশের সবাই যেমন করে, ইয়াঁও প্রথমে তেমনি নাবিকের কাজ করবে ঠিক করেছিল, আরও ত পাঁচজনের কনে ঠিক করা থাকে? কিন্তু অত দূরে যাওয়া, কোথায় না যেতে হবে? মারীর কাছে ইয়াঁই ছিল সর্ব্বস্ব, ইয়াঁরও দশা তাই,—ছাড়া-ছাড়ি হবার মত সাহস তাদের হয়ে উঠল না। সে এখন কাছেই এক চাষার বাড়ী মজুরের কাজ করে। বিয়ে করবার ক্ষমতা যখন তার হবে, তখনই বিয়ে করবে।

এই দুটি তরুণ তরুণী পরস্পরকে কি ভালই বাসত! কাজকর্ম্ম সারা হয়ে গেলেই দুটিতে মিলে সেই শ্যাওলা-ঢাকা পাথরের বেঞ্চিটিতে এসে বস্‌ত, হাওয়ায় তখন চারিদিকের ফুলের গন্ধ ভেসে আস্‌ত। রবিবারে ছুটি, দুজনে হাত-ধরাধরি করে বেড়াতে বেরুতো, কি গর্ব্বের সঙ্গেই ইয়াঁ

মারীর হাতখানি বুকে চেপে ধরত! রাস্তা জুড়ে সেদিন কেবল সাদা টুপীর আর চটক্‌দার গাউনের মেলা। তার-পর ক্রমে ক্রমে যুগল মূর্ত্তিগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত, তাদের গলার স্বর আস্তে আস্তে ওকবনের ভিতর মিলিয়ে যেত। কিন্তু ইয়ঁর চোখে সারা দেশ খুঁজলেও মারীর জুড়ী মিল্‌ত না। মাঝে মাঝে নিজের হীন জীবনের কথা মনে করে ইয়ঁর মন খারাপ হয়ে যেত। ছোট একখানি জাহাজে চড়ে কত সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হয়ে বেড়ান—সে কি সুখের জীবন! সে লুব্ধ ভাবে তাই বসে বসে ভাব্‌ত। কিন্তু তার তরুণী সঙ্গিনীর তারার মত উজল চোখ আর ফুলের মত মিঠে হাসি একবার দেখলেই, সে-সব সুখের ছবি কোন্ শূন্যে মিলিয়ে যেত তার ঠিক নেই।

এক রবিবারে, ভোর বেলা উঠে খুব ছুটোছুটি করে, একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দুই বন্ধুতে গিয়ে তখন সেই ঘন ওক-গাছের ঝাড়ের ভিতর ঢুকে বস্‌লুম। সেখানটি বেশ ঠাণ্ডা। গ্রামের গির্জ্জার ঘণ্টার ধ্বনি দূর থেকে বেশ মৃদু হয়ে কানে এসে পৌঁছচ্ছিল। আকাশে একটুকরোও মেঘ নেই, ফুরফুরে বাতাস বইছে, সে একেবারে ফুল পাতার গন্ধে ভরা। আমাদের সামনেই একটি বেড়া, ছোট ছোট গাছ সার দিয়ে লাগিয়ে সেটা তৈরি করা হয়েছে, তার গায়ে অজস্র সোনালি ফুল ফুটে উঠেছে। বেড়ার পর একটি ছোট সরু রাস্তা গাঁ থেকে আরম্ভ হয়ে একটা পাথরের ঢিপিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। ঢিপিটা প্রথমে বোধহয় কালোই ছিল, এখন কিন্তু জল-বাতাসের গুণে অসংখ্য গাছপালা তার বুকে গজিয়ে উঠেছে, সে এখন সবুজে সবুজ। ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে-বসে আমাদের বেশ ঘুম ধরে আস্‌ছিল, এমন সময় সামনের রাস্তায় কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল।

আমরা চট্ করে উঠে বস্‌লাম। ডালপালাগুলো একটু ফাঁক করে দেখলাম, ক'হাত দূরেই ইয়ঁ আর মারী দাঁড়িয়ে ফুল তুল্‌ছে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুজনের হাতে দুটি বিচিত্র রঙের তোড়া গড়ে উঠল।

রাস্তার দুধার জুড়ে তখন কেবল ফুলেরই মেলা! কোথাও সরু মন্দিরের চূড়ার মত হয়ে ফুল বাতাসে দুলছে, কোথায় বা অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফুটে উঠে মাঠে মকমলের গালিচা পেতে দিয়েছে। যতদূর চোখ যায়, জংলী-গাছ-গাছড়া-ভরা মাঠ চলে গিয়েছে, তার মাঝে মাঝে নীল ফুলের বুটি ঝিক্‌ঝিক্ করছে। চারিদিকেই একটা আনন্দের আর প্রাণের হিল্লোল, সকালবেলার আলো আর হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে সবাইকারই হাসিমুখ!

মারী আর ইয়ঁ ফুলের তোড়া হাতে এগিয়ে আস্‌তে লাগল। আমরা তখন বুঝলাম যে তারা কি কর্ত্তে এসেছে। ব্রেতাঞ্‌এ একটা দস্তুর আছে যে বাগ্‌দত্ত তরুণতরুণী সকাল বেলায় এসে পাথরের ঢিপির উপর দুই তোড়া ফুল রেখে যায়। সন্ধ্যের সময় ফিরে এসে যদি দেখে যে ফুল তখনও শুকিয়ে যায়নি তা হলে সেটা খুবই সুলক্ষণ, শুকিয়ে গেলে বড়ই অমঙ্গলের কথা। সেই চরকা-কাটুনী বুড়ীই আমাদের এই পুরানো আচারটির কথা বলেছিল।

ওরা দুজন সেই পাথরের ঢিপির কাছে এসে ফুলের গুচ্ছ দুটি তার উপর রেখে দিল। তারপর বেড়ার পাশে শ্যাওলা-ঢাকা পাথরখানার উপর গিয়ে বসল, আমরা গাছের আড়ালে ছিলাম, আমাদের আর দেখতে পেল না।

তারা কথা বল্‌ছিল। তাদের কথা আর কিসের? নিজেদের ভালবাসা, আশা-ভরসা, সুখদুঃখের কথা ছাড়া প্রণয়ীপ্রণয়িনীতে আর কি কথা হয়?

মারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল "আহা, আমরা যদি বড়-লোক হতাম!"

"বড়লোক হওয়া ত সহজেই যায়। কিন্তু যে কম রোজগার, তাতে কি করে টাকা জমাব বল? এখান থেকে ক্রোশখানেক দূরে ইভ কার্দ্দেকের খামারবাড়ীখানা দেখেছ ত? সে ওটা ভাড়া দিচ্ছে, দুশ ফ্রাঙ্ক খাজনা * বছরে। জমিটাত খুবই ভাল। আমি হাতে পেলে, এক বছর আচ্ছা করে খেটেই তার পরের বছরের খাজনার জোগাড় করে নি।"

"আমাদের দুজনের ত ওর অর্দ্ধেক টাকা দেবারও ক্ষমতা নেই। এমন কিছু নয় যে বাজে খরচ করি। তোমাকে গেল বছরের মাঝামাঝি অবধি বাপমাকে খাওয়াতে হয়েছে, আমাকে ত এখনও মাকে খাওয়াতে হচ্ছে। আমাদের আরও দেরি করতে হবে।"

"আমাদের বেলা খালি দেরি! অন্যরা কেমন বিয়ে করে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছে। এখন মাঝেমাঝে

আমি জাহাজে খালাসীর কাজ না নেওয়ার জন্যে পস্তাই। আমি যদি পনেরো কি ষোল বছর বয়েসে কাজ সুরু করতাম তা হলে ত এত দিনে টাকাকড়ি গুছিয়ে ফিরে আস্‌তে পারতাম।"

"কিন্তু ইয়ঁা, কত লোক যে একেবারেই ফেরেনি!"

এই কথার পরই তারা উঠে পড়ল। দুপুর হয়ে এসেছিল, তারা আবার গাঁয়ের রাস্তা ধরে ফিরে চলল। তাদের ওঠবার শব্দে চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল, পাখীরা তাদের বৈতালিক গান ধরে দিল, গাছের ফুলগুলির মাথা নুয়ে পড়ল, যেন তারা ঐ বিদায়গ্রহণোন্মুখ যুবকযুবতী দুটিকে নমস্কার করছে।

* * *

আমরাও এই প্রেমকাহিনীটির গল্প করতে-করতে বাড়ী ফিরলাম। বিকেল হয়ে আস্‌তেই কে যেন আমাদের কলের মত চালিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই পাথরের ঢিপির কাছে হাজির করে দিল।

দেখতে-দেখতে ওক-গাছের সারের মাথার উপর শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠে পড়ল। গলানো রূপোর ধারার মত তার আলো মাঠে বনে আর সাগরের ঢেউয়ের উপর ঝরে পড়তে লাগল, এ যেন হঠাৎ কোন্ অজানা অচেনা পরীর দেশে এসে পড়েছি। ওক-গাছের ঝাড়ের আর সামনের ঐ ফুলগাছের বেড়ার ভিতর দিয়ে মাঝে-মাঝে একটা মৃদু কম্পন ঢেউয়ের মত খেলে যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় অভিষিক্ত পাথরের ঢিপিটা তার মস্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে; তাকেও যেন এখন আর চেনা যাচ্ছে না, সে যেন এ পৃথিবীর জিনিষ নয়। আমাদের মনে হচ্ছিল যেন এখুনি সবুজ পাতার আড়াল থেকে দলে দলে তরুণী পরী-বালিকারা বেরিয়ে এসে এই ফুলের গালিচার উপর লঘু পায়ে তাদের আশ্চর্য্য নাচ সুরু করে দেবে।

কিন্তু ইয়ঁা আর মারীর সেই ফুলের তোড়া দুটির কি হল! আহা! তারা যে মাথা নুইয়ে একেবারে ঝরে পড়েছে, তাদের মধুর সুগন্ধটুকুও বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

ত্রেভিস্ আস্তে-আস্তে বল্‌তে লাগ্‌ল "আহা, বেচারারা কি দুঃখই পাবে! কত আশা করে না-জানি আসবে! আজকে রোদের যা তেজ গিয়েছে, ফুল না শুকবেই বা কেন? কিন্তু ওরা এটা একটা ভারী অমঙ্গলের চিহ্ন বলে ভাব্‌বে। আঃ, ক'টা টাকার অভাবে এত কাণ্ড! আমারও যে ছাই, বেশী টাকাকড়ি নেই!"

হঠাৎ একই-সঙ্গে আমাদের দুজনের মাথায় একটা খেয়াল এসে হাজির হল। আমরা ঐ বেড়া থেকে কতগুলি তাজা ফুল তুলে দুটি তোড়া বানিয়ে ফেল্‌লাম। দুটোই ঠিক এক-রকম দেখতে, ফুলগুলির পাপ্‌ড়িতে পাপ্‌ড়িতে শিশির-কণা তখনও মুক্তোর মত টল্‌টল্ করছে। শুকনো ফুলের গুচ্ছ দুটি তুলে নিয়ে আমরা এই দুটি ঠিক সেই জায়গায় রেখে দিলাম।

ত্রেভিস্ হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্‌ল "নিয়তি-ঠাক্‌রুণকে একটু সান্ত্বনা করা গেল। মন্দ কাজ ত আর কিছু করছি না।"

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে সে আবার হঠাৎ বলে উঠ্‌ল, "আচ্ছা, দেখ ভাল্‌বার, এক কাজ করলে হয় না? একটা কাণ্ড যখন করছি, তখন সেটা শেষ অবধি করা যাক্। আমাদের টাকার গেঁজে অবিশ্যি খুব বেশী ভারী নয়, তা হলেও ঐ কটা টাকা দুজনে মিলে দিলে এমন কিছু কাবু হয়ে পড়ব না! আসছে শীতকালে তুমি না হয় গোটা-কতক বেশী গল্প লিখ, আর আমিও কাগজে বার-কয়েক বেশী করে পেন্সিল চালাব এখন, তা হলেই পুষিয়ে যাবে। কি, বল?"

"হ্যাঁ হাঁ নিশ্চয়, আমি যে এতক্ষণ ও-কথা ভাবিনি সেই আমার বোকামি। ওদের দুজনের সুখ যাতে হয় তা করতেই হবে, তাতে আমাদের একটু ক্ষতি হয় হবে। আমরা যে একটা সুন্দর গল্পের শেষটাও সুন্দর করে গেলাম, এই স্মৃতি নিয়ে ব্রেতাঞ্ ছেড়ে যেতে পারব।"

বল্‌বামাত্রই কাজটাও করা হয়ে গেল। দুজনে পকেট থেকে গোটা দশ মোহর বের করে ফুলগুলোর পাশে রেখে দিলাম।

এমন সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল, আমরা তাড়াতাড়ি গাছের আড়ালে সরে গেলাম। এক মিনিট পরেই সেখানে মারী আর ইয়ঁা এসে দাঁড়াল।

"ইয়ঁা, আমার এমনি ভয় করছে, যদি কোন্ অমঙ্গলের চিহ্ন দেখি," মারীর গলা কেঁপে গেল।

ইয়ঁা কোনো উত্তর দিল না। দুজনে পাথরের ঢিপির

ছে এগিয়ে এল, তক্ষুনি তাদের মুখ থেকে একটা নন্দের ধ্বনি বেরিয়ে পড়ল।

"ফুলগুলো একেবারে তাজা রয়েছে, একটুও শুকোয়নি!" রীর গলা আনন্দে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

"ওমা, একি? মারী দেখ এখানে আবার মোহর পড়ে য়েছে! দুটো, পাঁচটা, দশটা মোহর! ইভ্ কার্দ্দিকের মারবাড়ী ভাড়া করতে যত টাকা চেয়েছিলাম, এ যে ধি ঠিক ততই!"

সে আনন্দে তার তরুণী সঙ্গিনীকে বুকে চেপে ধরল। ই কত অতীত যুগের সাক্ষী পাথরের স্তূপের নীচে দাঁড়িয়ে নে চুম্বন বিনিময় করল, দুটি তরুণ দেহের উপরে চাঁদের লো দেবতার আশীর্ব্বাদের মত ঝরতে লাগ্ল।

* * *

আনন্দের উচ্ছ্বাসে মারী আর ইয়ঁা এতক্ষণ ভেবেই থেনি যে টাকাগুলো কোথা থেকে আসতে পারে। কটু প্রকৃতিস্থ হয়েই তাদের হুঁস হল যে এ কার টাকা ার ঠিক নেই। এ নেওয়া কি তাদের উচিত হবে? দু- ন সপ্তাহ ধরে সারা গ্রাম জুড়ে ঐ আলোচনাই চল্তে াগল। কারুর মুখে আর অন্য কোনও কথা নেই। বল "টাকা কে রেখে গেল?"

একবার সবাই আমাদেরও সন্দেহ করেছিল, কিন্তু খানে এসে অবধি আমরা টাকাকড়ি খুব কমই খরচ রেছিলাম, সকলে আমাদের গরীব মানুষই ভাবত, তার ার আমরা এমন অবাক হয়ে যাওয়ার ভান করলাম যে রা আমাদের নিয়ে আর বেশী উচ্চবাচ্য করলে না।

ইয়ঁা এই অজ্ঞাত দাতাকে আবিষ্কার করবার জন্যে থিমতে চেষ্টা করল, থানায় খবর দিল, খবরের কাগজেও বাদ দিল। কিন্তু বিশেষ লাভ হল না, আর না হবারই থা। মাস দুই পরে গাঁয়ের সবাই একমত হয়ে টাকা টা ইয়ঁা আর মারীকেই দিয়ে দিল।

কাজের তাড়ায় আমায় প্যারীতে ফিরতে হল। ব্রেভিসের মামাতো ভাই তাকে দেশে বেতে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। ার আগে আমরা ওদের বিয়েতে যোগ দিয়ে গেলাম।

হাঁ, ব্রেতাঞ-এর লোকগুলো ফূর্ত্তিবাজ বটে! সারা দিন সেদিন তারা মাতিয়ে দিল!

সকাল বেলাই গির্জ্জার ঘণ্টা আনন্দের রোল তুলে বাজতে সুরু করল, বরযাত্রী কন্যাযাত্রীর দলও গির্জ্জার দিকে এগিয়ে চল্ল।

ইয়ঁা আর মারী সেদিন মস্ত লোক! তাঁদের দেখতে আর মানুষ ধরে না! দুইজনেরই বন্ধুর দল একেবারে গাঁ ভেঙে আমোদ করতে এসে জুটেছে। রূপসীদের যত গয়না-গাঁটি আর ভাল পোষাক বাক্স ছেড়ে অঙ্গে চড়ে বেরিয়ে পড়েছে। কনের পোষাকে মারীকে যা মানিয়েছে! তার সারা অঙ্গে রূপের ঢেউ উঠেছে। ইয়ঁার মুখ চোখ দিয়ে আনন্দ উছ্লে পড়ছে। রাস্তার ধারে এত ফুলও বোধ হয় আর কখনও ফোটেনি। ঘণ্টার ধ্বনি যেন আনন্দসঙ্গীত। ডাঙা আর সাগর দুজনেই নিজেদের সব শোভা ফুটিয়ে তুলে বিবাহ-উৎসবটি জমিয়ে তুলেছিল।

দুটিতে এক হয়ে গেল। জীবনের পথে একসঙ্গে চলবে, সুখের দিন দুখের দিন একসঙ্গেই কাটাবে।

তাদের ছোট্ট বাড়ীখানি বছর-কয়েকের মধ্যেই সোনালী-আর-কালো-কোঁকড়া-চুলে-ঘেরা অনেকগুলি ছোট ছোট মুখে ভরে গেল। তাদের নিজেদের মনে আর তাদের ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনিদের মনে চিরকাল একটি কাহিনী মুদ্রিত হয়ে রইল—সেই দুটি ফুলের তোড়া আর সোনার মোহরের কাহিনী।

শ্রীসীতা দেবী।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের অরুণোদয়

প্রাচীন ভারতে পরাবিদ্যার তো কথাই নাই, তা ছাড়া—অপরাপর যত কিছু বিদ্যা আছে সমস্তেরই গোড়া পত্তন করা হইয়াছিল এরূপ অসামান্য পারদর্শিতার সহিত যে,—অত পুরাতন কালে পৃথিবীর আর কোন প্রদেশেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন ইংরাজ সুপণ্ডিত, Barclay Lewis Day, বলিতেছেন—

"From very early times the subtle minds of the Aryan thinkers delighted in contemplation, and in

solving various problems of astronomy, geometry, and mathematics. They invented numerical signs, among others the zero, as well as the decimal system. According to Lassen, there is authentic record of thirteen early Hindu astronomers, and in the fourth century A. D. the Hindu mathematician Aryabhatta, not only discovered that the earth rotates, but calculated the length of the orbits of the nearer planets and even the precession of the equinoxes"

আর এক স্থানে বলিতেছেন—

"Our modern theory of atoms was anticipated in India, in the fifth century B. C. by Kanada, who, in the Vaiseshika Sutras, says that the homogeneous Akasa is composed of atoms so small that six of them are not equal in size to a mote in sunbeam. When at the dawn of a cycle of manifestation, motion begins among these atoms, they first unite in couples, and as the evolutionary process continues, these double atoms cohere in gradually increasing groups until forms are produced. Another suggestion of our western thinkers is that differentiation may have commenced by the whirling motion of innumerable minute vortices or centres of motion in the ether. But how these vortices are set in motion is not suggested. As yet no bridge has been found to span the gulf between organic and inorganic; the appearance of the first germ of life is, so far, unaccounted for. The Vedanta avoids this immense difficulty by boldly asserting that life is latent everywhere, even in what we call inorganic substance. 'There is no such thing as dead matter,' says the Vedantist: 'the whole universe is one life, is one thought, is Brahman."

তৃতীয় আর-এক স্থানে বলিতেছেন—

"Burnouf points out that the thinkers of ancint India knew perfectly well that heat manifests itself, not only as fire, but as electricity and wind: they knew that were Agni not already imprisoned in the wood, there would be no combustion: they knew that motion, which puts life into nature, is the result of sun-heat, sun-fire, fire-heat, Agni. They saw that the vital energy of animals is in proportion to their participation of heat.

আশ্চর্য্যের এটা পরাকাষ্ঠা যে পণ্ডিত-চূড়ামণি Hector Macpherson তাঁহার প্রণীত "A Century of Intellectual Development" নামক পুস্তকে ভৌতিক জগতের যে-একটি গোড়া'র তত্ত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নব্যতম সার-সিদ্ধান্ত বলিয়া পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সেই সার সিদ্ধান্তটি আমাদের দেশের পণ্ডিত-সমাজে মান্ধাতার আমল হইতে এখনকার এই ইংরাজ মহাপ্রভুদিগের আমল পর্য্যন্ত হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় স্থির-প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সে সিদ্ধান্তটি এই:—

Philosophy cannot rest in the atomic conception of the Cosmos. It reduces the atoms to centres of force and energy. Thus we come to the view that matter is but the phenomenal appearance of an Infinite Energy [of ঐশী শক্তি] which, though unseen, is the real basis of matter [of তমোগুণ], the source of life [of রজোগুণ], the inspirer of law and order [of সত্ত্বগুণ— উপনিষদে আছে "সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ" "পরমাত্মা সত্ত্বের প্রবর্ত্তক" অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক—law and order-এর প্রবর্ত্তক]।

পুরাকালে আমাদের দেশে বিদ্যা-সমুদ্রের পার-যাত্রীরা কিরূপ অনন্য-পরায়ণ নির্ভীক চিত্তে সত্যের সেবা করিতেন— পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ যদি তাহা বুঝিতে পারিয়া থাকেন, তবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহা বেদবিজ্ঞ উদার-চেতা Max Muller। তাঁহার অকৃত্রিম মনের কথাটি তাই তিনি প্রাণ খুলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন এইরূপ:—

Hindu philosophers never equivocate, or try to hide their opinions, where they are likely to be unpopular...They never try to deceive us as to their principles and the consequences of their theories. If they are idealists, even to the verge of nihilism, they say so...because their reverence for truth is stronger than their reverence for anything else. Whatever we may think of such views of the world as they put forward, there is one thing we cannot help admiring, and that is the straightforwardness and perfect freedom with which they are elaborated.

Max Muller এই যে বলিয়াছেন "reverence for truth" "সত্যের প্রতি অকৃত্রিম এবং অনন্য-ভাজন শ্রদ্ধাভক্তি" এইটিই ছিল আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের সমস্ত উদ্যম এবং অধ্যবসায়ের মূল উৎস। প্রাচীন ভারতের এই-সকল—গীতাকার যেমন বলিয়াছেন "ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ" "দ্বৈধশূন্য সংযতচিত্ত সর্ব্বভূতহিত-রত" জ্ঞানী মহাত্মারা একদিকে যেমন মুমুক্ষু সাধকদিগের হিতার্থে গার্হস্থ্য এবং সামাজিক ধর্ম্মের নিয়মভূমি

হইতে মোক্ষধর্ম্মের হিমালয়-শিখর পর্য্যন্ত পরাবিদ্যার সোপান-পংক্তি পরিপাটি শৃঙ্খলাক্রমে থাকে থাকে সাজাইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, আর-এক দিকে, তেম্নি, অপর-সাধারণ ব্যক্তিদিগের কুশল-কামনায় বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী-দিগের বিভিন্ন কার্য্যের উপযোগী করিয়া অপরাবিদ্যার প্রণালীপদ্ধতি ঐরূপই পরিপাটী শৃঙ্খলাক্রমে বাঁধিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু হইলে হইবে কি—ভারতের প্রতি দৈব এমনি বিরূপ যে, অকস্মাৎ হিমালয়ের ওপিঠ হইতে বিদেশীয় দলবলের আক্রমণের পর আক্রমণ তাহার উপরে আসিয়া পড়া'তে, তাহার ধাক্কা সাম্লাইতে না পারিয়া, অপরাবিদ্যার সরস্বতী নদী অভীষ্টসিদ্ধির সাগরে পৌঁছিতে-না-পৌঁছিতে মধ্যপথে বিষাদের বালুকাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা দিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। কিন্তু তবুও তাহার বিষাদাশ্রু সেই তপ্ত বালুকা-বস্ত্র চুঁইয়া চুঁইয়া উপ্‌চিয়া পড়িয়া কয়েকটি লোকালয়-বহির্ভূত বিজন কোণে বাপী তড়াগাদি'র আকার ধারণ করা'তে সেই পুরাতন জলাশয় দুইচারিটির কল্যাণে আমাদের দেশে এখনো পর্য্যন্ত যে, পঞ্জিকা-প্রণয়ন, আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়নাদি প্রস্তুত করণ, মন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি কতকগুলি প্রয়োজনীয় কার্য্য খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছে—এই ঢের! কিন্তু কাল পড়িয়াছে এম্নি কঠিন যে, আর চলে না! অযোধ্যাপুরী এক্ষণে দণ্ডকারণ্যে রোদন করিতেছে;—লঙ্কাপুরী আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া বিংশতি-নেত্রে জল-স্থল আকাশের নাড়ী নক্ষত্র পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে বাকি রাখিতেছে না। অধুনাতন কালে, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, বিদ্যুচ্চয়নী (electric battery), কালমান (chronometer), বায়ুমান, তাপমান, এবং সেই সঙ্গে কামান প্রভৃতি যন্ত্রতন্ত্রের অমোঘ সাহায্যে দ্রব্য-বিজ্ঞান'কে মহাজ্ঞান করিয়া ফুলাইয়া তোলা হইয়াছে বেজায় মাত্রা। এটাও কিন্তু বলি যে, আপনার আটঘাট-বাঁধা জায়গাটুকুর নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে চতুর্ব্বর্গ ফলের কল্পতরুই হো'ন্, আর, অষ্টসিদ্ধি এবং নব-নিধির কামধেনুই হো'ন্—এ বিজ্ঞান, অর্থাৎ যাহার চর্ম্ম মণি-মাণিক্যে খচিত, যাহার মর্ম্ম খড়কাষ্ঠে রচিত, আর, যাহার কর্ম্ম পুরবাসিগণকে পরমার্থ হইতে বঞ্চিত করা, এই কমনীয় মায়ামৃগ, সত্য-সত্যই কিছু আর বিজ্ঞান নহে। বিজ্ঞানের অরুণোদয় যদি কোথাও কখনও দেখা দিয়া থাকে, তবে দেখা দিয়াছিল তাহা প্রাচীন ভারতের উদয়-গিরিতে। বিজ্ঞানের সুপরিস্ফুট দিবা-লোকের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে, সত্য কথা যদি বলিতে হয়—সসাগরা পৃথিবীর কোনো প্রদেশেই এখনো পর্য্যন্ত তাহা আপনার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৈবমূর্ত্তি প্রকাশ করে নাই। আজিকের কালের এই যে বহিঃশোভন অন্তঃসার-শূন্য জড়-বিজ্ঞান, আর, সেই জড়-বিজ্ঞানের উপরে জোর করিয়া উঠাইয়া দাঁড় করানো একপ্রকার কৃত্রিম ধাঁচার মোহান্ধ আধ্যাত্মবিজ্ঞান—এ বিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটা বিকলাঙ্গ অপভ্রংশ। সত্য কি মিথ্যা—Herbert Spencer কী বলিতেছেন—বেশী না মিনিট্ পাঁচেক, ধৈর্য্য ধরিয়া একটিবার শ্রবণ কর;—

Herbert Spencerএর খেদোক্তি।

[পণ্ডিতবর Barclay Lewis Day'র প্রণীত ""Our Heritage of Thought" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত]

What do we understand by matter? Newton's theory is that matter consists of solid atoms not in contact, which act upon each other by attraction and repulsion as they float in a medium called the "luminiferous ether." Leibnitz advanced the theory that matter consists of unextended monad, whilst Boscovich defined matter as an aggregate of centres of forces, or points without dimension, which attract and repel in suchwise as to be kept at specified distances apart. But can we imagine such a thing as a centre of force which exists in a point, having position only? And must we not admit that in its ultimate nature, we are as ignorant of matter as of motion, space, or time? Again, what *is* motion? We may say, perhaps, that motion is change of place, forgetting that, in unlimited space place cannot be conceived. Or, what is meant by transference of motion? surely neither a thing nor an attribute is transferred to the body struck. Then, what is consciousness? What is it that thinks? If we say that the successive impressions and ideas which constitute consciousness are affections of that something which we call mind, we infer that the mind is the real eye, and therefore an entity: in other words, we make the admission that the conscious self exists as a permanent conscious being. How do we know that it does? We analyse our mental actions and we find that they are based on our sensations, but we cannot give any account either

of the sensations themselves, or of that which is conscious of sensations. We ask, we cannot help asking, what is life? And we may answer that life is the continuous adjustment of internal conditions to external conditions, and the definition holds good, whether we consider life in its physical or in its psychical aspect because as intelligence progresses, it merely establishes more varied, more complete, or more involved adjustments. [প্রাণের প্রতি প্রাণীদিগের টানই যে, প্রাণের psychical aspect, এই সোজা কথাটি এখানে Spenser-এর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান-চক্ষু এড়াইয়াছে—ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে] But nevertheless, we can form no approach to a conception of what underlies the phenomena of life—of the noumenal nature of life we know absolutely nothing. [এই দীর্ঘনিশ্বাসে খেদোক্তি সমাপ্ত]।

তাহাই যদি হইল—বিজ্ঞান যদি অজ্ঞানের সোপান হইল, তবে সেই অজ্ঞান-মুখো বিজ্ঞান'কে প্রকৃত বিজ্ঞানের পরিচ্ছদ পরাইয়া অনভিজ্ঞ লোকের চক্ষে ধূলি প্রদান করা কি উচিত কার্য্য? হোল্‌দে রঙের পাথর-বাটিতে দোকান সাজাইয়া দ্বারের মাথায় "এখানে সাঁচা সোণার পাথর-বাটি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে" এইরূপ একটা লোভানিয়া বিজ্ঞাপন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দেওয়া কি উচিত কার্য্য? Max Muller ঠিকই বলিয়াছেন যে, "Indian philosophers are honest in their reasoning, and never use empty words." আর, সেইজন্য আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা অপরা-বিদ্যা'কে অপরা বিদ্যা বলিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তা বই, অপরাবিদ্যা'কে বিজ্ঞান-নামের জাঁকালো পরিচ্ছদে সাজাইয়া দাঁড় করাইবার জন্য তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও মাথা ব্যথা ছিল না। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের বিদ্যাব্যবসায়ীরা কিন্তু **সত্য** তত চা'ন্ না—যত **কাজ** চা'ন্; তাঁহারা তাই বায়ুস্ফীত মুখের জোরে বিজ্ঞান-ধ্বনি-কারী ভেরী বাজাইয়া অপরাবিদ্যাকে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দিয়া—এত দিনের পরে **এখন** পস্তাইতেছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে অপরা-বিদ্যার দাঁড়ি-মাঝি'রা রহিয়া রহিয়া মুখ ভার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন **"হালে পানী পাইতেছে না।"** আমি তো বলিয়াইছি যে, "বিজ্ঞানের অরুণোদয় যদি কোথাও কখনও দেখা দিয়া থাকে তবে দেখা দিয়াছিল তাহা প্রাচীন ভারতের উদয়গিরি'তে।" কিন্তু কেহ যদি বলেন "বিজ্ঞানের আবার অরুণোদয় না-জানি কেমন ধারা!" তবে পণ্ডিতবর Barclay Lewis Day সাংখ্য-মতের মোট সিদ্ধান্তগুলি অল্পের মধ্যে বাগাইয়া আনিয়া তাঁহার প্রণীত "Our Heritage of Thought" নামক রত্ন-ভাণ্ডারে কেমন সুন্দর প্রণালীতে গুছাইয়া রাখিয়াছেন তাহা একবার, তাঁহার, চক্ষু মেলিয়া দেখা উচিত; তাহা দেখিলে আর তিনি একথা মুখে উচ্চারণ করিবেন না যে, "বিজ্ঞানের আবার অরুণোদয় না জানি কেমন ধারা!" অতএব নিম্নে প্রণিধান করা হো'ক্ :—

The universe evolves from prakriti, the primordial substance, which, in its initial state, is homogeneous, undifferentiated, and invisible, and holds within itself, in perfect equipoise, its three constituent gunas (qualities or conditions), called sattva, rajas, tamas. "I am bound to confess," says Max Muller, "that the nature of the three gunas is by no means clear to me whilst unfortunately to Indian philosophers they seem to be so clear as to require no explanation at all." And he adds: "Indian philosophers are honest in their reasoning, and never use empty words." On the whole, he thinks that the three gunas may be best explained by the general idea of two opposites, and the middle between them, these being manifested in nature by light, darkness, and mist, and in morals by good, bad, and indifferent." *

The word prakriti literally means producer, being derived from "kri" (to produce) and "pra" (forth). It is best explained as an undifferentiated cosmic substance, containing within itself the potentiality, not only of the physical, but also of the psychical, evolution. Prakriti is the Hindu attempt to account for the mysterious inter-mingling of our unconscious and conscious powers, which prevents us from recognising the true relation of body to mind. Kapila advances the theory that, under the stimulus of purusha, prakriti evolves not only into the objective and material world, but also into the subjective and intelligent world. The starting of the evolutionary

* Max Muller ঠিকই আঁচিয়াছেন। সত্ত্ব রজ এবং তমোগুণের স্থূল তাৎপর্য্যার্থ উহা অপেক্ষা বিশুদ্ধ আর কিছুই হইতে পারে না; এতদ্ব্যতীত উহার সূক্ষ্ম দার্শনিক অর্থ কাহারো যদি জানিবার প্রয়োজন হয়, তবে আমার নবপ্রণীত গীতাপাঠ নামক গ্রন্থে তাহা আমি যেরূপ খুলিয়া-খালিয়া দেখাইয়াছি, তাহা হয় 'তো তাঁহার কাজে লাগিতে পারে।

process is due, he says, to the disturbance of the equipoise in which, during pralaya, three gunas rest, and which disturbance results in the evolution of Buddhi. "*Buddhi*," says *Kapila*, "*is the most wonderful phase of prakriti.*" The word has its root in the verb "budh" (to awake), and therefore may be translated as "perception". It is, in fact, the very first phase of being, for to perceive is to be. In the awakening of the dormant prakriti, "manas" is evolved. Manas may be translated as "mind", and appears to be analogous to the Greek "nous". Purusha is eternal, but manas is only relatively eternal ending in the manifestation of the universe. Kapila calls manas "the mediator," or intermediary between perception and volition. It is due to the presence of manas that individual action is possible to any kind of entity or being. The Sankhya theory is that when once human being has evolved buddhi and manas, it is capable of attracting to itself some purusha which happens to have reached a stage of upward evolution towards ultimate spirituality which is as it were, on a level with its own. Thus manas, "the mediator," unites volition, which belongs to purusha, with perception which has been evolved by the human entity. No sooner has this union taken place, than the three gunas—sattva, rajas, and tamas—come into action. Kapila takes great pain to make it clear that the gunas are not attributes of the soul itself but are qualities inherent in matter, and that man's soul is therefore, by its nature, outside of, and if the man so wills, independent of, these blind forces. The action of the gunas is threefold, and by their influence the soul may be drawn by the sattva upwards towards spirituality, downwards by tamas, or may remain in what we may call the mean level of animal activity or passion (rajas). The basic thought is that unless it is associated with prakriti, purusha is quite powerless to act in any way, and therefore can evolve neither upward towards pure spirit, nor downwards towards gross matter. On the other hand, prakriti must remain in pralaya (dormant) until it is awakened by the impulse of purusha. The united action of purusha and prakriti is picturesquely compared to the progress of a lame man (purusha), who is borne along on the shoulders of a blind man (prakriti). Kapila distinctly teaches that the whole end and aim of the soul's progress through life is liberation, that is, liberation from the tyranny of the three gunas. He nowhere suggests the idea of the soul's ultimate annihilation, as some critics imagine. He explains that the phrase "Neither I am nor is aught mine, has no other meaning than that the soul, *per se*, experiences neither pain nor pleasure." He however does not suggest the nature of the soul's existence after liberation, but contents himself with the idea that the state of the liberated soul is incomprehensible to human mind.

ইহাকেই আমি বলিয়াছি **বিজ্ঞানের অরুণোদয়।**

হার্বার্ট স্পেন্সর্ যদিচ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, বিজ্ঞানের গোড়ার তত্ত্ব একেবারেই অবিজ্ঞেয়, কিন্তু তথাপি তিনি এইরূপ স্পর্দ্ধা রাখেন যে তাঁহার প্রকল্পিত নূতন সিদ্ধান্তটি সমস্ত বিজ্ঞানের মথিত সারাংশ। আর-কেহ দেখিতে পাইয়াছেন কিনা জানিনা—আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, স্পেন্সর বিজ্ঞানের দুগ্ধ মন্থন করিয়া ঘৃত এই যে বাহির করিয়াছেন, ইহা ভারতীয় সাংখ্য-দর্শনের একপ্রকার ইংরাজী ভাষ্য। স্পেন্সরের নূতন সিদ্ধান্ত সেটি কী যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে পূর্ব্বোল্লিখিত পণ্ডিতবর B. L. Day তাহার একটি চুম্বক নিষ্কর্ষ প্রজ্ঞাপন করিয়াছেন এইরূপ :—

Herbert Spencer defines philosophy as completely unified knowledge, and in his Synthetic System of Philosophy, he shows that the evolution of the universe is caused by the instability of the homogeneous [by প্রকৃতির স্বরূপ-গত গুণসাম্যের বৈষম্যপ্রবণতা], which brings about the unceasing redistribution of matter and motion [of তমোগুণ(জড়ত্ব) and রজোগুণ (চলত্ব)]. At the beginning evolution is simplicity itself, but the process soon becomes complicated by the differences in the circumstances of the different parts of the aggregates [সাংখ্যমতে—by differences in the circumstance of the different গুণs which constitute the aggregates কিনা দ্রব্যs or সামগ্রীs *] so that as these differences increase [as (অনুলোম পদ্ধতির টানে পড়িয়া) গুণ-বৈষম্য বাড়িতে থাকে] what began as homogeneous, become more and more heterogeneous [প্রকৃতির মূল-ঘ্যাঁসা গুণ-সাম্য ক্রমশ অধিকাধিক পরিমাণে ফল-ঘ্যাঁসা গুণ-বৈষম্যে পরিণত হইতে থাকে]. Of this we see evidences everywhere—in the evolution of the far-off nebulae, in the stars, in the organic mass of the earth [এক কথায়—in বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড]. The process of evolution thus set in motion by the instability of the homogeneous

* Aggregate = গোটবাঁধা বস্তু = সমগ্রীভূত বস্তু = সামগ্রী।

[by বৈষম্য-প্রবণতা of গুণ-সাম্য] goes on until the action of outside forces, to which all parts of any aggregates are exposed, becomes ballanced by the forces within [until দ্রব্যগণের বাহির হইতে ভিতরে এবং ভিতর হইতে বাহিরে মুহুর্মুহু প্রধাবিত রজস্তমোগুণের জোয়ার-ভাঁটা পরস্পর কর্ত্তৃক প্রত্যাহত হইয়া থম্‌থমে অবস্থায় উপনীত না হয়]. This state once reached, the process is reversed [গুণ-সংঘর্ষের এইরূপ স্তম্ভিত অবস্থা ঘটিয়া দাঁড়ায়, তখন অনুলোম পদ্ধতির পালা সাঙ্গ হইয়া গিয়া প্রতিলোম পদ্ধতির পালা আরম্ভ হয়], and evolution passes into dissolution [সাংখ্য মতে—স্থূল-ভূত সূক্ষ্ম-ভূতে লয় প্রাপ্ত হয়, সূক্ষ্মভূত এবং ইন্দ্রিয়-মন অহঙ্কারে লয় প্রাপ্ত হয়, অহঙ্কার বুদ্ধিতে লয় প্রাপ্ত হয়—এই তরো প্রতিলোম-ক্রমে স্থূলজগৎ সূক্ষ্ম জগতে এবং সূক্ষ্মজগৎ অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায়] by the increase of its own contained motion [by the কার্য্যকারিতা of রজোগুণ]. Each aggregate, be it vast or infinitely minute, must undergo this alternate process of integration and disintegration [this অভিব্যক্তি এবং লয়ের ওলোট্‌পালোট্‌] and it is to the action of this rythmic process [of this গুণ-চক্রের ঘূর্ণন] set going by an unknown and unknowable power [by অব্যক্ত এবং অবিজ্ঞেয় মূলপ্রকৃতি] which we are obliged to recognise as without limit in space and without beginning and end in time, that are due all the phenomena of the universe. All things emerge from the imperceptible to the perceptible [from অব্যক্ত to ব্যক্ত] and then again disappear into the imperceptible [into অব্যক্ত].

নিখিলবিদ্যাসমুদ্রের সার মন্থন করিয়া স্পেন্‌সর্‌ কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—এই তো তাহা দেখিলাম! এ যদি সাংখ্য নহে, তবে সাংখ্য যে কি তাহা আমি জানি না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে :—কপিল-মুনির সাংখ্য উদয়াচল-প্রদেশীয়, স্পেনসরের সাংখ্য অস্তাচল-প্রদেশীয়; কপিল-মুনির সাংখ্য-তরু রসাকর্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে ব্রহ্মপরায়ণ ঋষি-মনীষীদিগের ধ্যানার্জ্জিত পরা বিদ্যার সরস ভূমি হইতে, স্পেন্‌সরের সাংখ্যতরু রসাকর্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীয় মহোপাধ্যায়দিগের পরীক্ষার্জ্জিত অপরা বিদ্যার শুষ্ক ভূমি হইতে। দুয়ের মধ্যে এইরূপ যখন মূলের প্রভেদ, তখন সেই মূলের প্রভেদ যে, ফলে সংক্রামিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? হইয়াছেও তাই! বিশেষতঃ এক স্থানে প্রভেদ এম্নি স্পষ্টাকারে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে যে, তাহা ঢাকা-ঢুকি দেওয়া চলে না। স্পেন্‌সর্‌ তাঁহার ইংরাজি সাংখ্যের গোড়াতেই বলিয়াছেন that the evolution of the universe is caused by the instability of the homogeneous, which brings about the unceasing redistribution of matter and motion, অথবা, যাহা একই কথা, of তমোগুণ (জড়ত্ব) and রজোগুণ (চলত্ব)। তা যেন হইল—কিন্তু **সত্ত্বগুণ** গেল কোথায়? **প্রকাশ** গেল কোথায়? Intelligence গেল কোথায়? স্পেন্‌সর্‌ আপনিই এই যে বলিয়াছেন "we see evolution become still more complex in mind and society"—এই যে Mind and Society—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই যে দুইটি শিরস্থানীয় ফলাভিব্যক্তি—ইহা শুধুই কি কেবল matter and motionএর ব্যাপার—রজস্তমোগুণের ব্যাপার? তাহার চতুঃসীমার মধ্যে Intelligenceএর—সত্ত্বগুণের—নাম-গন্ধও কি নাই? কেবল, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা ভূতগত-শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক, তাঁহাদেরই মুখে এ কথা শোভা পায় যে, নিখিল জগৎ-সংসারের মধ্যে বনিয়াদী পদার্থ যদি কিছু থাকে তবে তাহা matter and motion, তা বই—intelligence নিতান্তই একটা ভুঁইফোঁড় পদার্থ! ইঁহাদের এইরূপ অচলা ধারণা যে, পৃথিবীর জন্মকালে পৃথিবীস্থ matter এবং motionএর সহিত intelligence-এর আদবেই কোন সম্পর্ক ছিল না—ঘুণাক্ষরেও না! তাহার অনেক কাল পরে আদিম বীজরসের (protoplasmএর) অন্তর্নিগূঢ় matter এবং motionএর সংঘর্ষ-ক্ষেত্রে—intelligenceকে কেহ ডাকে নাই **যদৃচ্ছে**—কিন্তু তবুও সে-পামর যন্ত্র-বিজ্ঞানের চোক-রাঙানির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া matter and motionএর মাঝ-খানে উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া-বসিল **হঠাৎ করিয়া অকস্মাৎ**! হার্বার্ট স্পেন্‌সর্‌ ইঁহাদের মতো এ-রকম **ভূতগত** বৈজ্ঞানিক নহেন যদিচ, কিন্তু তথাপি তাঁহার গায়ে উঁহাদের বাতাস লাগিয়াছিল বিলক্ষণই—তা নহিলে তিনি গুণত্রয়ের মধ্যগত সেরা গুণটিকে অপর দুইটির সংস্রব হইতে নির্ব্বাসিত করিতে—ফণীর মস্তক হইতে মণি নির্ব্বাসিত করিতে—কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হইতেন না। পরে কিন্তু তিনি পস্তাইয়াছেন :—শেষে, এমন কি,

ফণীটাকে মণি ফিরাইয়া দিয়া তবে মানে মানে রক্ষা পাইয়াছেন। পণ্ডিতবর Hector Macpherson বলিতেছেন

"Anxious as Spencer is to unify matter and mind, he is driven to the admission that 'what we know as consciousness cannot be identified with waves of molecular motion propagated through nerves and nerve centres: a unit of feeling has nothing in common with a unit of motion."

আসল সাংখ্যে, কিনা কপিলমুনির সাংখ্যে, তিন গুণের কোনোটিকেই সর্ব্বজননী প্রকৃতির ক্রোড় হইতে নির্ব্বাসিত করা হয় নাই। এ-সাংখ্যের মতে—ব্রহ্মার রাত্রি প্রভাত হইলে তিনগুণই প্রকৃতিমাতার ক্রোড় হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কার্য্যে বাহির হয়; আবার ব্রহ্মার রাত্রি আগমন করিলে তিনগুণই সেই আরাম-নীড়ে নিলীন হয়। এই জায়গাটিতে—পণ্ডিতবর Day মহোদয়ের পরিকল্পিত সারস্বত রত্ন-ভাণ্ডার হইতে সাংখ্য-মতের সারাংশ যাহা আমি কিয়ৎ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি তাহার মাঝখানের কয়েকটি ছত্র আর-একবার উদ্ধৃত করা শ্রেয় বোধ করিতেছি। সে কয়েকটি ছত্র এই :—

Prakriti is the Hindu attempt to account for the mysterious intermingling of our unconscious and conscious powers [শাঙ্কর ভাষায়—of বোধাবোধাত্মিকা শক্তি], which prevents us from recognising the true relation of body to mind. Kapila advances the theory that, under the stimulus of purusha, prakriti evolves not only into the objective and material world, but also into the subjective and intelligent world. The starting of the evolutionary powers is due, he says, to disturbance of the equipoise in which, during pralaya, the three gunas rest and which disturbance result in the evolution of Buddhi. Buddhi, says Kapila, is "the most wonderful phase of prakriti.' The word has its root in the verb "budh" (to awake), and therefore may be translated as "perception." It is, in fact, the very first phase of being, for to perceive is to be.

স্পেন্‌সরের সাংখ্যে লেখে শুধু এই that 'the universe is caused by the instability of the homogeneous which brings about the unceasing redistribution of matter and motion"; কিন্তু Homogenousএর মধ্যে instability আসিল যে, কোথা হইতে কেমন করিয়া, তাহার যদি কেহ সন্ধান জানিতে চা'ন, তবে তাহা জ্ঞাপন করা হইয়াছে কপিল-মুনির সাংখ্যে অর্থাৎ গোড়া'র সাংখ্যে, বা আসল সাংখ্যে। এ সাংখ্যে লেখে যে, পুরুষের সান্নিধ্যবশত রজোগুণ চঞ্চল হইয়া উঠিলে প্রকৃতির stability ভঙ্গ হইয়া যায়—সাম্য ভঙ্গ হইয়া যায়; আর, তাহা যখন হয়, তখন, অরণীর ঘর্ষণ হইতে যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে—প্রকৃতির গুণ-ক্ষোভ হইতে তেমি সত্ত্বগুণপ্রধান মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি-তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। পণ্ডিতবর Day ঠিকই বলিয়াছেন যে, "It (কিনা বুদ্ধিতত্ত্ব) is in fact the very first phase of being, for to perceive is to be." স্পেন্‌সর এই যে বলিয়াছেন "All things emerge from the imperceptible to the perceptible and then again disappear into the imperceptible"—তাহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, "All things" বলিতে কি বুঝিব? perception বাদে all things বুঝিব—না perception সুদ্ধ ধরিয়া all things বুঝিব? "all things" বলিতে সেরেফ্ ভৌতিক জগৎ বুঝিব—না সর্ব্বজগৎ বুঝিব? স্পেন্‌সরের ভিতরের কথা যদিচ এই যে, "all things" matter and motionএরই ব্যাপার, সুতরাং all things=ভৌতিক জগৎ, কিন্তু তথাপি তিনি perceptionকে all thingsএর মধ্য হইতে আটকাইয়া রাখিতে না পারিয়া আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়া গিয়াছেন। তিনি all thingsএর কোটার মধ্য হইতে—matter and motionএর সংস্রব হইতে—perceptionকে এক দরজা দিয়া যে মাত্র বাহির করিয়া দিলেন, সেইমাত্র perceptible এবং imperceptible বিশেষণ দুটাকে কায়-রক্ষক, কিনা bodyguard, করিয়া perception-দেবতা all thingsএর কৌটার মধ্যিখানে আর-এক দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া আপনার ন্যায্য অধিকার সমর্থন করিলেন। All thingsএর কোটার মধ্য হইতে perceptionকে আটকানো ভার আরো এইজন্য যেহেতু All thingsএর মধ্যস্থিত matter and motionও যেমন, perceptionও তেমি, পালাক্রমে perceptible হইতে imperceptibleএ নিমজ্জন করে (submerges), এবং imperceptible হইতে perceptibleএ উন্মজ্জন

করে (emerges)। এ তো সকলেরই দেখা কথা যে, রাত্রি-কালে শয়ন-ঘরের প্রদীপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে—একদিকে যেমন গৃহচর বিড়াল-মুষিকের matter and motion অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া imperceptible হইয়া যায়, 'আর একদিকে তেম্নি শয়নকর্ত্তার perception সুপ্তিতে নিমগ্ন হইয়া imperceptible হইয়া যায়;—আবার রাত্রি প্রভাত হইলে একদিকে যেমন বায়স-গণের matter and motion বহিরালোকে perceptible হইয়া উঠে, আর একদিকে তেম্নি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান-কর্ত্তার perception নিজে অন্তরালোকে perceptible হইয়া উঠে। তাই বলি যে, স্পেন্সর বড়ই একটা গলদ্ করিয়াছেন—matter and motionএর সংস্রব হইতে intelligenceকে নির্ব্বাসিত করিয়া—রজস্তমোগুণের সংস্রব হইতে সত্ত্বগুণকে নির্ব্বাসিত করিয়া। কপিলমুনির কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে পণ্ডিতবর Day মহোদয় কি বলিতেছেন শ্রবণ কর:—

Buddhi, says, Kapila, is "the most wonderful phase of prakriti."

কপিলমুনির মোট সিদ্ধান্তটি এই:—

"প্রকৃতে র্মহান্ মহতোঽহঙ্কার স্তস্মাদ্ গণশ্চ ষোড়শকঃ। তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি॥" [ইহার বাংলা] প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মন-সুদ্ধ ধরিয়া একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, পঞ্চ সূক্ষ্মভূত হইতে পঞ্চ স্থূলভূত, পরে পরে অভিব্যক্ত হয়।

প্রশ্নোত্তর॥

স্পেন্সরের চেলা॥ "প্রকৃতি হইতে সর্ব্ব-প্রথমে সত্ত্বগুণ-প্রধান বুদ্ধি আবির্ভূত হইয়াছিল" এটা কপিলমুনি কোথা হইতে পাইলেন? হর্ষেল্ প্রভৃতি জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা ব্যোমবিজয়ী দূর্বীনের সাহায্যে আকাশের দূরাতিদূর প্রদেশ-সকল তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রকৃতি হইতে সর্ব্বপ্রথমে নীহার-নিভ সূক্ষ্মতম ভূত (nebulus matter) আবির্ভূত হইয়াছিল।

কপিলমুনির চেলা॥ দূর্বীনের যতদূর সাধ্য তাহার সে ত্রুটি করে নাই, এ কথা আমি খুবই মানি; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমি বলিতেছি যে, প্রকৃতি হইতে সর্ব্বপ্রথমে কী আবির্ভূত হইয়াছিল তাহার সন্ধান জ্ঞাপন করা দূর্বীনের চূড়াস্থানীয় মহা-দূর্বীনেরও সাধ্যায়ত্ত নহে।

স্পেন্সরের চেলা॥ দূর্বীনের যদি তাহা সাধ্যায়ত্ত না হয়, তবে তাহা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে।

কপিলমুনির চেলা॥ আমি কিন্তু বলি ঠিক্ তাহার বিপরীত। আমি বলি যে, তাহা তোমরাও সাধ্যায়ত্ত, আমারও সাধ্যায়ত্ত এবং আপামর-সাধারণ সকল লোকেরই সাধ্যায়ত্ত।

স্পেন্সরের চেলা॥ যা-তা একটা কথা বলিলেই তো হয় না—প্রমাণ করা চাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তোমার ঐ কথাটির একটা যুক্তিযুক্ত প্রমাণ তুমি আমাকে দেখাইতে পারিতেছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কাছে উহা একটা ফাঁকা আওয়াজ বই আর কিছুই নহে।

কপিলমুনির চেলা॥ প্রমাণ যদি দেখিতে চাও, তবে তাহা তোমাকে আমি দেখাইতে পিছপাও নহি। বলি তবে শোনো:—

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ-কালে যে-কোনো পুরুষ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতে গাত্রোত্থান করেন—তাঁহার নবোন্মেষিত বোধে সর্ব্ব-প্রথমেই ব্যক্ত জগতের বাস্তবিক সত্তা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বাস্তবিক সত্তার এই যে বোধোদয়, ইহারই নাম বুদ্ধির অভিব্যক্তি। কপিলমুনি তাই বলেন যে, অব্যক্তের (কিনা মূলপ্রকৃতির) যখন সাম্যভঙ্গ হয়, তখন অব্যক্ত হইতে সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধি আবির্ভূত হয়।

স্পেন্সরের চেলা॥ ইহাকে প্রমাণ বলে না। তোমার আমার মতো ক্ষুদ্র জীবের দৈনিক বোধোদয়ের মোচা'র খোলায় ভর করিয়া নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গোড়ার কথার অকূল রহস্য-সাগরের কূলে পৌঁছিবার তোমার এই যে বৃথা চেষ্টা, ইহাতে প্রমাণ হইবার মধ্যে—এক আধ্যা প্রমাণ হইতেছে—তোমার অপরিমেয় বিশ্বাসের বল, আর-আধ্যা প্রমাণ হইতেছে—কপিলমুনির প্রতি তোমার অপরিসীম গুরুভক্তি; ইহা ব্যতীত আর যে, কী প্রমাণ হইল, তাহা তুমিই জানো, আর, তোমার কপিলমুনিই জানেন; আমার তাহা জ্ঞানের অগোচর।

কপিলমুনির চেলা॥ তোমাকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলে কোনো কিছুই তোমার জ্ঞানের গোচর হইবে না। অতএব প্রণিধান কর :—

নিউটনের শাস্ত্রে যেমন পৃথিবীর কলাকর্ষণ-কার্য্য এবং সূর্য্যের গ্রহাকর্ষণ-কার্য্য একেরই সামিল, আর, সেইজন্য দুয়েরই সাধারণ-নাম মাধ্যাকর্ষণ; বল্টার (Volta's) শাস্ত্রে একটা ধাতুস্পৃষ্ট মৃত ভেকের পদস্পন্দনের গোড়ার ব্যাপার, এবং আকাশবিহারী বিদ্যুৎস্পন্দনের গোড়ার ব্যাপার, যেমন একেরই সামিল, আর, সেইজন্য দুয়েরই সাধারণ-নাম তড়িৎ (electricity); কপিলমুনির শাস্ত্রে তেমি ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের সুষুপ্তি এবং বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় একেরই সামিল, আর, সেইজন্য দুয়েরই সাধারণ নাম **অব্যক্ত**; ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের—সুপ্তি হইতে পুনরুত্থান, এবং বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের—প্রলয় হইতে পুনরুত্থান, একেরই সামিল, আর, সেইজন্য দুয়েরই সাধারণ নাম প্রবোধন বা বোধোদয়। তা ছাড়া, কপিলমুনির শাস্ত্রে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালোক এবং বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের বহিরালোক একেরই সামিল, আর সেইজন্য দুয়েরই সাধারণ-নাম সত্ত্বগুণ; ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের অন্তরন্ধকার এবং বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের বহিরন্ধকার একেরই সামিল, আর, সেইজন্য দুয়েরই সাধারণ-নাম তমোগুণ; ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃক্ষোভ এবং বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃক্ষোভ একেরই সামিল, আর, সেইজন্য দুয়েরই সাধারণ-নাম রজোগুণ। এইখানে ইতি করা যা'ক্। যা হো'ক্ একটা বিষয় আজ আমি তোমার নিকট হইতে শিক্ষা পাইলাম মন্দ না; তাহা এইঃ—জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানি-মহাপুরুষদিগের সমদর্শিতা যেমন লোক-সমাজের সকল রোগের মহৌষধ—তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যদিগের পক্ষপাতদূষিত ভেদদর্শিতা তেমি লোক-সমাজের সকল রোগের মূল॥ ইতি প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত॥

প্রশ্নোত্তর শেষ হইল বাঁচা গেল—এখন প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্।

আমরা কথায় বলি "অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির উপরে গুণ করিয়াছে।" দার্শনিক পণ্ডিতেরা, আবার, অধিকন্তু বলেন এই যে, জ্ঞেয় বিষয় মাত্রই জ্ঞানের উপরে গুণ করিয়া জ্ঞানকে বন্ধন করে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় পরে পরে দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

ঘটপটাদি আর আর বস্তুর ন্যায় বাস্তবিক সত্তাও জ্ঞেয় বিষয়; আর সেইজন্য, বাস্তবিক সত্তাও জ্ঞানকে বন্ধন করে; জ্ঞানকে অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া ব্যক্ত ক্ষেত্রে আটক করিয়া রাখে—এইরূপে বন্ধন করে। বাস্তবিক সত্তা তাই দুই অর্থে গুণের কোটায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। (১) বাস্তবিক সত্তা জ্ঞানের উপরে গুণ করে অর্থাৎ প্রভাব সঞ্চার করে; তথৈব (২) জ্ঞানকে বন্ধন করে অর্থাৎ আপনাতে আটক করিয়া রাখে; এই দুই অর্থে বাস্তবিক সত্তা সত্ত্বগুণ-শব্দের বাচ্য।

☞ যেমন, লঘুতা = লঘুত্ব = লঘুত্বগুণ; তেমনি, সত্তা = সত্ত্ব = সত্ত্বগুণ।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

সাংখ্য-শাস্ত্রে বলে যে, চুম্বকের সান্নিধ্যগুণে লৌহ যেমন চুম্বকরূপে পরিণত হয়, তেমনি, জ্ঞানের সান্নিধ্যগুণে সত্ত্বগুণ বুদ্ধি-রূপে পরিণত হয়। সাংখ্যেরই বা কি, আর, বেদান্তেরই বা কি—এই-রকমের রূপকগুলি বড্ড কাজের জিনিষ; তাহা অভিনবব্রতী দর্শন-কাঙ্ক্ষীদিগের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা। কিন্তু তথাপি এটা ভুলিলে চলিবে না যে, সাংখ্যের উপদিষ্ট এই লৌহ-চুম্বকের কথাটি রূপক ছাড়া (figure of speech ছাড়া) আর কিছুই নহে। আসল কথাটা অর্থাৎ ঐ রূপকের যবনিকার আড়ালের ভিতরের কথাটা আমাদের প্রতিজনের নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বিষয়। তাহাতে পিছপাও হইলে চলিবে না। অতএব সাংখ্যের ঐ বচনটিকে পরীক্ষার কষ্টিপাথরে ঘসিয়া দেখা যাক্!

এটা আমাদের সকলেরই দেখা কথা যে, প্রতিজনেই আমরা প্রত্যূষে নিদ্রার মাতৃক্রোড় হইতে জাগিয়া উঠিবার সময় সদ্যঃপ্রতিভাত বাহ্য জগতের বাস্তবিক সত্তায় বিশ্বাস নিবদ্ধ না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। আমাদের সদ্যঃপ্রসূত বোধের এই যে একটা ক্রোড়-ঘ্যাঁসা বিষয় যাহাকে আমরা বলি বাস্তবিক সত্তা, তাহা পদার্থটা কি? তাহা ঘটীবাটির বাস্তবিক সত্তা—অথচ তাহা ঘটীবাটি নহে; তাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়ের বাস্তবিক সত্তা—অথচ তাহা কোনো ইন্দ্রিয়েরই গোচর নহে। তাহা

প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধির একটা গোড়া-ঘ্যাঁসা স্থির-সিদ্ধান্ত। এমন কি, **বুদ্ধি** বুদ্ধিই হয় না, যদি বাস্তবিক বলিয়া কোনো কিছুই তাহার নিকটে প্রতীয়মান না হয়। স্বপ্ন দেখা মনের কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির কার্য্য স্বতন্ত্র। বাস্তবিক সত্তা অবধারণ করাই বুদ্ধির একমাত্র কার্য্য। লৌহ-চুম্বকের উপমাটির যবনিকার আড়ালের **ভিতরের কথাটার** সন্ধান পাইতে এখন আর কাহারো বিলম্ব হইবে না। কথাটা আর কিছু না—তাহা এই :—

বাস্তবিক সত্তা কিছু আর **জ্ঞান** নহে। ঘটীবাটিও যেমন—বাস্তবিক সত্তাও তেম্নি—দুইই—জ্ঞানের **বিষয়** **মাত্র**। কিন্তু তাহার মধ্যে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, বাস্তবিক সত্তা জ্ঞানের এন্নিতরো একটা **ক্রোড়-ঘ্যাঁসা বিষয়** যে সন্নিধানবর্ত্তী চুম্বকের **বাতাস** গায়ে লাগিয়া লৌহ যেমন চুম্বকরূপে পরিণত হয়, অধিষ্ঠাতৃজ্ঞানের বাতাস গায়ে লাগিয়া সত্ত্বগুণ তেম্নি বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়। সাংখ্যের এই স্থানটির সঙ্গে Kantএর মতের ঐক্যানৈক্য সংক্ষেপে এইরূপ :—Kant বলেন "Synthetic unity of consciousness" বুদ্ধির সর্ব্বপ্রধান মূলতত্ত্ব। Kantএর synthetic unity of consciousnessকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আমরা পাইতেছি—(১) Synthetic unity of the manifold এবং (২) consciousness. এখন দেখিতে হইবে এই যে, Synthetic unity of the manifold = বস্তু-সকলের জ্ঞান-মুখো একত্ব = বাস্তবিক সত্তা = সত্ত্বগুণ; আর, consciousness = সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতৃ চৈতন্য। সাংখ্যে বলে "অধিষ্ঠাতৃ চৈতন্যের সান্নিধ্য-গুণে সত্ত্বগুন বুদ্ধিতে পরিণত হয়"; কাণ্ট্‌ বলেন 'Consciousnessএর সান্নিধ্যগুণে Synthetic unity of the manifold—categories of the understandingএ পরিণত হয়। Kant কিন্তু Synthetic unity of the manifold-এ বস্তু-সকলের বাস্তবিক সত্তায়—সন্তুষ্ট না হইয়া—বুদ্ধির খোন্তা দিয়া ঘটপটাদি বহির্ব্বস্তুর মধ্য হইতে স্বরূপ সত্তা (thing-in-itself) খুঁড়িয়া বাহির করিবার চেষ্টায় পণ্ডশ্রম করিয়াছেন বিস্তর; শেষে যখন দেখিলেন যে, তাহা নিতান্তই একটা অসাধ্য ব্যাপার, তখন তাঁহার মনোমধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি অনাস্থা জন্মিল আত্যন্তিক। আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যদিগের মতে ঘটপটাদি বহির্বিষয়ে স্বরূপ-সত্তার অন্বেষণ করিতে যাওয়া নিতান্তই বৃথা চেষ্টা; তাহা আত্মাতেই অন্বেষণীয়; তাও আবার বুদ্ধি দ্বারা নহে, পরন্তু প্রকৃষ্টরূপ সাধনভজন দ্বারা; কেননা স্বরূপ সত্তা বুদ্ধিমনের অগম্য।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

ঐ-রকম রূপক-শ্রেণীর আর-একটি কথা সাংখ্যে আছে এই যে, অধিষ্ঠাতৃ জ্ঞানকে আপনার সহিত জড়াইয়া একীভূত করিয়া তাহার ভোগ-সাধন করা সত্ত্বগুণের পরার্থ; আর সত্ত্বগুণের স্বচ্ছ দর্পণে আপনার স্বরূপের প্রতিরূপ দর্শন করিয়া আত্ম-পরিচয় লাভ করা অধিষ্ঠাতৃ জ্ঞানের স্বার্থ। সত্ত্বগুণ চায় অধিষ্ঠাতৃ জ্ঞানকে আপনাতে আটক করিয়া রাখিয়া সুখাদি ভোগ করাইতে; অধিষ্ঠাতৃ জ্ঞান সত্ত্বগুণে আপনার প্রতিবিম্ব দৃষ্টে আপনাকে চিনিতে পারিয়া তাহার যখন চক্ষু ফোটে, তখন **সে চায়** ত্রিগুণের বন্ধন টুটিয়া আপনার স্বধামে বা স্বরূপ ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে। এ-যাহা আমি সরল করিয়া সাজাইয়া বলিলাম ইহার মূলের সমাচার অবগত হইবার জন্য যদি কাহারো ঔৎসুক্য জন্মে, তবে তিনি পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতি-পাদের ৩৫শ সূত্র এবং তাহার ভোজরাজকৃত টীকার ভিতরে প্রণিধান-পূর্ব্বক তলাইয়া দেখিলেই লব্ধমনোরথ হইবেন সন্দেহ নাই।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য।

সত্ত্বগুণ অথবা, যাহা একই কথা, বাস্তবিক সত্তা অধিষ্ঠাতৃ জ্ঞানকে বন্ধন করিয়া আপনাতে আটক করিয়া রাখে যদিচ, কিন্তু তা' বলিয়া তাহা ঘটীবাটির ন্যায় জ্ঞানের সংকীর্ণ বিচরণক্ষেত্রও নহে, আর দেহাদির ন্যায় জ্ঞানের ক্ষুদ্রায়তন পিঞ্জরও নহে, পরন্তু তাহা মহাকাশের ন্যায় বিশাল বিশ্ব-কোষ; আর, নিখিল বাহ্য জগৎকে ক্রোড়ে করিয়া সেই সূক্ষ্ম এবং বৃহদায়তন সত্ত্বগুণই (বাস্তবিক সত্তাই) যেহেতু অধিষ্ঠাতৃ জ্ঞানের সান্নিধ্য-গুণে বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়, এইজন্য সাংখ্যাদি শাস্ত্রে প্রকৃতির প্রথমজা কন্যা, কিনা বুদ্ধি, মহান্‌ নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে॥ [দ্রষ্টব্য সমাপ্ত]॥

প্রকৃতির প্রথম ধাপের, কিনা মহত্তত্ত্বের, পর্য্যালোচনা-কার্য্য আমার যতদূর সাধ্যায়ত্ত তাহা কথঞ্চিৎপ্রকারে করিয়া চুকিলাম। আগামী বারে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ধাপগুলির রীতিমত পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।　　শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুই তার

"জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে,
জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে।"

(১)

সন্ধ্যা হব-হব। উজাড়-পড়া নীলমহানি গ্রামের পোড়ো নীলকুঠির উপর যে ঘন জঙ্গল গজাইয়াছিল সেই বনের ধারে একজন লোক অতি সন্তর্পণে চারিদিকে উঁকি মারিতে-মারিতে বকের মতন পা ফেলিয়া-ফেলিয়া কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। সে অল্প অগ্রসর হইতেছিল আর থমকিয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিতেছিল কোথাও কিছু শব্দ শোনা যাইতেছে কি না; চকিত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল কোথাও কিছু দেখা যাইতেছে কি না। বনের প্রান্তে একটা বড় উঁচু কামরাঙা গাছ মাথায় অস্ত-সূর্য্যের সোনালি আভার পাগড়ি পরিয়া দাঁড়াইয়া ঘন পল্লব-পুঞ্জ কাঁপাইতেছিল। সেই লোকটি এই গাছের তলায় আসিয়া একবার সন্তর্পণে চারিদিকে চাহিল, তারপর ক্ষিপ্রতার সহিত গাছে চড়িতে লাগিল। কিছুদূর উঠে আর চারিদিকে তাকায়। ক্রমে ক্রমে গাছের আগডালে উঠিয়া ঘন পল্লবপুঞ্জের মধ্যে আপনাকে গোপন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

লোকটির অসীম ধৈর্য্য। সূর্য্য অস্ত গেল; কামরাঙা গাছের চূড়া হইতে সোনালি আভা মুছিয়া গেল; বনের মাথার আকাশের লালিমা ঘুচিয়া ধূসর হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহা কালো হইয়া উঠিল, সমস্ত গাছপালার স্বতন্ত্র রূপ লুপ্ত হইয়া সমস্ত বন একটি বড় ঝোপের মতন দেখাইতে লাগিল; কুঠির কামরা ছাড়িয়া বাদুড় চামচিকা ফরফর ফরফর করিয়া অন্ধকারের জমাট টুকরার মতন ছিটকাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল; কয়েকটা বাদুড় ফলের লোভে কামরাঙা গাছের উপর ঝপ্-ঝপ্ করিয়া আসিয়া পড়িল; নীলকুঠির অসংখ্য নর্দ্দমা হইতে শেয়ালের দল বাহির হইয়া আকাশের দিকে মুখ উঁচু করিয়া লেজ ফুলাইয়া গলা ছাড়িয়া রাত্রির আরত্রিক-আবাহন গান করিল; ঝাঁকে-ঝাঁকে মশা উড়িয়া প্রবল গুঞ্জনে অন্ধকার যেন জমাট করিয়া তুলিল; সেই লোকটি তবু নিশ্চল, ঠায় বনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়াই আছে।

এই নীলমহানি গ্রামে এখন আর একঘর লোকেরও বাস নাই। এক কালে ইহা বেশ শ্রীসম্পন্ন ছিল। এখানে হাতীকান্দা ও ঘোড়ামারা পরগণার বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার গুণময় চৌধুরীর নীলকুঠি ছিল; একজন ইংরেজ ছিল কুঠিয়াল। সুতরাং পরিষ্কার পথঘাটে ও সুবিন্যস্ত বাগান-বাগিচায় গ্রামখানি সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল। নীলের কাজে খাটিবার জন্য বহু ভিন্নদেশী মজুর আসিয়া গ্রামখানিকে জনবহুল করিয়া তুলিয়াছিল। তারপর বিলাতী কৃত্রিম নীলের প্রতিযোগিতায় যখন নীলের ব্যবসায়ে লোকসান হইতে লাগিল তখন গুণময়-বাবু নীলের কারবার তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন; ইংরেজ বিদায় হইল, ভিন্নদেশী মজুরেরা অন্যত্র কর্ম্মের সন্ধানে সরিয়া পড়িল; ছবির মতো সুশ্রী গ্রামখানি সুন্দরী বিধবার মতন শূন্য নিরর্থক হইয়া গেল।

ক্রমে ফুলবাগানে আগাছার জঙ্গল ভরিয়া উঠিল; সাহেবের কুঠিতে বাদুড়-চামচিকার বাসা হইল; নীলকুঠির অসংখ্য হাউজ নালী সুড়ঙ্গ সুঁড়িপথের গোলকধাঁধায় শেয়াল শুওর ও বাঘের লুকাচুরি হুড়াহুড়ির আড্ডা হইল; অশ্বত্থ-বটের চারা কুঠির টুঁটি মুঠিতে চাপিয়া তাহার অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহিতেছিল; রোদ বাতাস উই ইঁদুরে মিলিয়া দরজা-জানলাগুলি কঙ্কালের পঞ্জরের ন্যায় জীর্ণ জর্জ্জর করিয়া তুলিয়াছিল।

লোকটি গাছের ডগায় বসিয়া-বসিয়া ভগ্ন নীলকুঠির জীর্ণ দরজা-জানলার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখিতেছিল। দেখাও ত আর চলিল না; অন্ধকার ঘন হইয়া বনকে গহন করিয়া তুলিল। তবু তাহার নড়িবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

অকস্মাৎ বনের মধ্য হইতে মৃদু আলোর ক্ষীণ রেখা অন্ধকার আকাশের গায়ে ফুটিয়া উঠিল, যেন কষ্টিপাথরে সোনার কষ, যেন নীলাম্বরী শাড়ীতে জরির ডোরা।

তখন সেই লোকটি গাছের ডগা হইতে নিঃশব্দে নামিয়া পড়িল। আলোক লক্ষ্য করিয়া বনজঙ্গল দুহাতে সরাইয়া-সরাইয়া সে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিল। বন পার হইয়া নীলকুঠির পাকা নালীর গোলকধাঁধার ভিতর দিয়া

ঘুরিয়া-ঘুরিয়া একটা ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল; সেই ঘরের দ্বার জানলা সব বন্ধ, তাহাদেরই জীর্ণ পঞ্জর দিয়া আলোর সোনালি ঝারা বাহির হইয়া আসিতেছিল। লোকটি কপাটের ফাঁকে-ফাঁকে চোখ দিয়া অনেকক্ষণ উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া ভিতরে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু বুঝিতে পারিল না ভিতরে কোনো লোক আছে কি না; কোথাও মানুষের এতটুকু সাড়াশব্দও নাই।

তখন সে দরজায় জোরে আঘাত করিয়া হাঁকিল—ঘরে কে আছ দরজা খোলো।

অমনি ফস করিয়া ঘরের আলো নিভিয়া গেল—নিবিড় অন্ধকার।

লোকটি তখন সর্ব্বাঙ্গের চাপ ও জোর দিয়া দরজায় আঘাত করিয়া ঠেলা মারিল; জীর্ণ দরজার পল্কা হুড়কা মড়াৎ করিয়া ভাঙিয়া দরজা খুলিয়া গেল; লোকটিও অমনি দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই একটি বিদ্যুৎ-মশালের চাবি টিপিয়া ধরিল আর অমনি সমস্ত ঘর বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোকে প্লাবিত হইয়া গেল; লোকটি চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই! পড়িয়া আছে একটা জীর্ণ শয্যা, একখানা কাপড়, গোটাকতক হাঁড়িকুঁড়ি, আর একটা সদ্য-নির্ব্বাপিত তেল-ভরা প্রদীপ, তাহার সলিতার মুখ হইতে তখনো ধোঁয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া উঠিতেছিল। সেই লোকটি মশালের উজ্জ্বল আলোক সামনে ছড়াইয়া পাশের একটা খোলা দরজা দিয়া ছুটিয়া যাইতেই দেখিতে পাইল একজন যুবতী স্ত্রীলোক একজন তরুণ কান্তিমান্ পুরুষকে জড়াইয়া ধরিয়া লইয়া সেই কামরা পার হইয়া পলাইতেছে—পুরুষটি এক হাতে স্ত্রীলোকটির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার উপর সর্ব্বাঙ্গের ভর রাখিয়া অতি কষ্টে দ্রুত চলিবার চেষ্টা করিতেছে। আগন্তুক লোকটি দেখিয়াই বুঝিল যে, তরুণী স্ত্রীলোকটি যাহাকে লইয়া পলাইতেছে সে পীড়িত ও দুর্ব্বল।

আগন্তুক লোকটি চকিতে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া উহাদের দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া হাঁকিয়া বলিল—দাঁড়াও বলছি, নইলে এই গুলি করলাম!

স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল আর বিদ্যুৎ-মশালের সমস্ত আলোটা তাহার সুন্দর মুখের উপর গিয়া পড়িল।

লোকটি তরুণীর মুখ দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত! তাহার হাতের পিস্তল নামিয়া পড়িল, তাহার বিদ্যুতের মশাল কাঁপিতে লাগিল; তাহার মুখে বিস্ময় বিরক্তি সন্দেহ ক্রোধ পর পর ফুটিয়া উঠিল; সে গর্জ্জন করিতে গিয়া গোঙানি স্বরে বলিয়া উঠিল—রাজু! তুমি এখানে!

রাজবালা যেমন দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া ছিল নীরবে তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

পীড়িত লোকটি রাজবালার গলা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—নমস্কার দারোগা-বাবু! আপনি আমার এই নতুন বাসার ঠিকানা জানতে পেরে সদলবলে নিমন্ত্রণ করতে আসছেন, সেই খবরটি আপনার স্ত্রী অনুগ্রহ করে আমাকে আগেই দিতে এসেছিলেন!

দারোগা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঢোক গিলিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—খোকা কই?

রাজবালা দিব্য সহজ ভাবে বলিল - সে তার দিদি-মায়ের সঙ্গে আমার বাড়ী বেড়াতে গেছে।

দারোগা এতক্ষণে আপনার বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারিল। রুক্ষ স্বরে বলিল—স্বামী পুত্র ফেলে এই বিজন বনে রাত্রিকালে পলাতক আসামীর কাছে আসা দারোগার স্ত্রীর উপযুক্ত বটে!

রাজবালা স্বামীর শ্লেষপূর্ণ তিরস্কারে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত না হইয়া তেমনি দৃপ্তভাবেই বলিল—তুমিই ত আমাকে আসতে বাধ্য করেছ! একজন নির্দ্দোষী লোককে দশ বচ্ছর দ্বীপান্তরে পাঠিয়েও তোমার তৃপ্তি হয়নি; সে দ্বীপান্তর থেকে ফিরে এসে তোমার ছেলেকে যমের মুখ থেকে কেড়ে এনে দিল, তার পুরস্কারে তোমরা তাকে ঠেঙিয়ে আধমরা করে ফেললে; তাকে আবার জেল-খাটাতে হবে বলে তাকে তোমরা শিকারের মতন বনে বনে তাড়া করে বেড়াচ্ছ! নির্দ্দোষীকে নির্য্যাতন করলে আমার স্বামীপুত্রের অকল্যাণ হবার ভয়েই আমাকে এমন জায়গায় আসতে হয়েছে। এঁকে রক্ষা করে আমি আমার স্বামীকে অধর্ম্ম থেকে রক্ষা করব।

দারোগা দারুণ ক্রোধ দমন করিয়া বলিল—তুমি ওকে কি করে রক্ষা করবে? এই বন কনষ্টেবল চৌকীদার ঘেরাও

করে আছে। জমাদার কুঠির বাইরে হাজির আছে; আমার বাঁশীর সঙ্কেত শুনলেই তারা ছুটে এসে ওকে গেরেপ্তার করবে। তুমি ওকে বাঁচাবে কি করে?

রাজবালা সহজ ভাবেই বলিল—তুমি বাঁশী বাজাতে পারবে না; বাঁশী বাজালে তোমার লোকেরা এসে দেখবে দারোগা-বাবুর স্ত্রী আসামীকে দুই হাত দিয়ে আগ্‌লে রয়েছে। তারা আমার গায়ে হাত না দিয়ে এঁর গায়ে হাত দিতে কিছুতেই পারবে না। তুমি যদি তোমার সে অপমান দেখতে চাও বাজাও তবে তোমার বাঁশী!

দারোগা বিব্রত হইয়া বলিল—আঃ রাজু! কী ছেলেমানুষী কর? খুনী মামলায় গভর্মেণ্ট ফরিয়াদী! গভর্মেণ্ট ত তোমার আবদার শুনবে না। সে বড় শক্ত ঠাঁই!... তুমি একবার পাশের ঘরে যাও, জমাদার একে নিয়ে থানায় চলে যাক, তারপর আমি তোমায় নিয়ে যাব।

রাজবালা স্বামীর কথার উত্তর দিল না, তাহার দিকে আর তাকাইলও না। সে নত হইয়া ভূমিতে পতিত পীড়িত লোকটিকে দুই হাতে ধরিয়া মমতা-ভরা স্বরে বলিল—চল, তুমি বিছানায় শোবে।

সে একবার রাজবালার মুখের দিকে, একবার তাহার স্বামীর মুখের পানে চাহিল। রাজবালা আবার বলিল—ওঠ।

দারোগা আসামীর দৃষ্টিতে দ্বিধা দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিল—বীরেন-বাবু, আপনি রাজুকে বুঝিয়ে বলুন।

বীরেন্দ্রের মুখে ক্লান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে কি বলিতে যাইতেছিল। রাজবালা তাহাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়া তাহার বাম হাত লইয়া আপনার গ্রীবার উপর রাখিল এবং দুই হাতে তাহাকে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া স্বামীকে আদেশ করিল—আলো দেখাও!

দারোগা অবাক হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আলো দেখাইয়া আগে আগে চলিল। প্রথম ঘরে আসিয়া রাজবালা বীরেন্দ্রকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল এবং দেশলাই জ্বালিয়া প্রদীপটি জ্বালিল; তারপর একটা ভাঁড় হইতে একটা খুরিতে একটু দুধ ঢালিয়া বীরেন্দ্রকে খাওয়াইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

দারোগা অবাক হইয়া কিছুক্ষণ স্ত্রীর কাণ্ড দেখিল। তারপরে ডাকিল—রাজু!

রাজবালা মুখ তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিল।

"আসামীকে আশ্রয় দিচ্ছ, এতে তুমি বিপদে পড়বে জানো।"

"তোমার স্ত্রীকে বিপদে ফেলা না-ফেলা ত তোমার হাত। তুমি এঁকে আসামী না করলেই ত সকল গোল মিটে যায়—আরো যখন জানো যে ইনি নির্দোষ।"

"জানলেই বা কি করছি বল? জমিদার গুণময়-বাবু এঁর ওপর জাতক্রোধ; নায়েব-মশায় বলছে শশী-জেলে এঁরই প্ররোচনায় তার কান কেটে ছেড়ে দিয়েছে! এঁকে না গেরেপ্তার করলে তারা আমার শত্রু হবে; শেষে আমার চাকরিটি যাবে।"

রাজবালা দৃপ্তভাবে বলিয়া উঠিল—যে চাকরীতে নির্দ্দোষকে বিপদে ফেলতে হয় এমন চাকরী যাওয়াই ভালো!

দারোগা বলিল—নির্দ্দোষ যদি তবে তার আর ভয় কি? বিচারে খালাস পেয়ে যাবে।

রাজবালা ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—হাঁ, যেমন খালাস পেয়েছিলেন সেবার!

দারোগা অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি তবে একে ছেড়ে বাড়ী যাবে না?

—যতদিন তুমি খোকার দিব্যি করে না বলছ যে এঁকে আসামীর দলে টানবে না, ততদিন আমি এঁকে ছেড়ে যেতে পারব না।

দারোগা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল—এরপর যদি তোমায় আমি ঘরে ঠাঁই না দিই?

রাজবালা শান্ত অবিচলিত স্বরে বলিল—কাৎলামারি বিলের কোলে আমার ঠাঁই মিলবে।

বীরেন্দ্র ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—ওকি রাজু! তুমি বাড়ী যাও। স্বামীর প্রতিকূলতা করা তোমার উচিত হচ্ছে না।

রাজবালা তেজের সহিত বলিল—স্বামীর অনুকূল হয়ে ধর্ম্মের প্রতিকূলতা করাই কি উচিত হবে?

দারোগা স্ত্রীর দৃপ্ত ভাব দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিল—তবে এঁকে সুদ্ধ নিয়ে বাড়ী চল।

রাজবালা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—

যেখানে যেতে বলছ, সেটা আমাদের বাড়ী বটে, কিন্তু এঁর কাছে সে জায়গা খানা—হাজত।

তাহার এই অসাময়িক হাসি ও ব্যঙ্গ দেখিয়া দারোগার অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তথাপি সে ক্রোধ দমন করিয়াই বলিল—আচ্ছা, আমি এঁকে আসামীর দল থেকে খারিজ করে দেবো।

রাজবালার সুন্দর চোখ দুটি উৎসুক আগ্রহে উজ্জল হইয়া উঠিল, সে স্বামীকে বলিল—তুমি দারোগা, তোমার কথায় বিশ্বাস কি ?

দারোগা মর্ম্মাহত হইয়া বলিল—দারোগাকে তার স্ত্রীও কি বিশ্বাস করতে পারে না রাজু ? তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ, কিন্তু তুমি আমায় ভাঁড়িয়ে এই বিজন বনে এসে আছ, আমি ত তার জন্যে তোমায় অবিশ্বাস করিনি।

রাজবালার মনে পড়িল স্বামীর ক্রুদ্ধ অবিশ্বাসের নিষ্ঠুর কথা—"এরপর যদি তোমায় আমি ঘরে ঠাঁই না দিই ?" কিন্তু সে তাহার ইঙ্গিতমাত্র না করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—আমি দারোগার সহধর্ম্মিণী হলেও আমি ত আর দারোগা নই।

দারোগা স্ত্রীর শ্লেষ আর ব্যঙ্গে বিব্রত ও বিরক্ত হইয়া বলিল—ধর্ম্ম সাক্ষী, ভগবান জানেন,……

রাজবালা বাধা দিয়া বলিল—থামো। ধর্ম্ম কিংবা ভগবান তোমার নেই, থাকলে তুমি এত অন্যায় অধর্ম্ম করে-বেড়াতে পারতে না।

দারোগা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—আচ্ছা, তবে তোমার দিব্যি……

রাজবালা গম্ভীর হইয়া বলিল—এতদিন বিশ্বাস ছিল যে তুমি আমায় খুবই ভালো বাস ; কিন্তু এই মাত্র তুমি আমায় ঘরে ঠাঁই দেবে না বলে ভয় দেখাতে পেরেছ—তুমি আমায় ভালো বাসলে অমন কথা বলতে পারতে না। বল—খোকার দিব্যি……

দারোগা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—রাজু, তুমি তার আপন মা হলে এমন কথা বলতে পারতে না ! তুমি তার সৎ-মা কিনা, তাই তার অকল্যাণে তোমার ভয় নেই ?

—ভয় আছে বলেই ত তার বাবাকে অধর্ম্ম থেকে বাঁচাতে চাচ্ছি। আমার ছেলেকে বসন্ত-রোগের গ্রাস থেকে যে বাঁচিয়েছে তাকে সেই ছেলের বাপ যে বধ করবে এ আমি দেখতে পারব না। তাই খোকার দিব্যি করতে হবে তোমায়।

—না না, আমি ছেলের দিব্যি করতে পারব না। আর যে দিব্যি বল করছি।

রাজবালা স্বামীর দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া বীরেন্দ্রকে বাতাস করিতে লাগিল।

ঘর নিস্তব্ধ। ক্ষণেক পরে একদল শেয়াল কোলাহল করিয়া উঠিল ; একটা পেচা চ্যাঁ চ্যাঁ করিতে-করিতে কুঠির উপর দিয়া উড়িয়া গেল ; কয়েকটা ঝিঁঝিঁ কঠিন শব্দে অন্ধকার যেন চিরিয়া ফেলিতে লাগিল।

কাতর স্বরে বীরেন্দ্র বলিয়া উঠিল—হংসেশ্বর-বাবু আমি স্বেচ্ছায় পালিয়ে আসিনি ; আমি দুপক্ষের দাঙ্গার মধ্যে পড়ে জখম হয়ে পড়েছিলাম, জেলেরা আমার নিষেধ না শুনে আমাকে এখানে এনে ফেলেছে। আমি একটু উঠে চলতে পারলেই আপনি গিয়ে ধরা দিতাম। আমার জন্যে আপনাদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটছে মিছামিছি। আপনি আমাকে গেরেপ্তার করে নিয়ে চলুন।

রাজবালা দৃঢ়স্বরে বলিল—তোমাকে গেরেপ্তার করতে হলে আমাকেও গেরেপ্তার করতে হবে ; আমি ফেরারী আসামীকে লুকিয়ে রেখেছি !

দারোগা হংসেশ্বর স্ত্রীর দৃঢ়তা দেখিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—আচ্ছা, খোকার দিব্যি করেই বলছি।

রাজবালা উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার সুন্দর মুখ সফলতার আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে।

দারোগা বলিল—এখন একখানা গোরুর গাড়ী দেখতে হয়, নইলে তোমরা যাবে কি করে ?

রাজবালা হাসিয়া বলিল—তোমায় কিছু করতে হবে না, আমি সব ঠিক করছি।

দারোগা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তুমি এই অন্ধকারে বন জঙ্গল ভেঙে কোথায় গাড়ী ঠিক করতে যাবে ?

রাজবালা সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া ডাকিল—শশী !

একটা বড় নালির সুড়ঙ্গ হইতে ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা একটা প্রকাণ্ড মাথা উঠিয়া বলিল—আজ্ঞে, মাঠাকুরুণ !

দারোগা ত অবাক আশ্চর্য্য! এই শশে-জেলেটা দাঙ্গার প্রধান আসামী, পলাতক ফেরারী। আর যে-দারোগা তাহাদিগকে গেরেপ্তার করিবার জন্য খুঁজিয়া-খুঁজিয়া হয়রান তাহার স্ত্রী তাহাদের হাটহদ্দ সব জানে, সে তাহাদের সর্দ্দারণী আশ্রয়দাত্রী!

ঘরের মধ্যে সুড়ঙ্গ হইতে শশী-জেলের মাথার আকস্মিক আবির্ভাবে দারোগা-স্বামীর মুখের ভাব কটাক্ষে একবার দেখিয়া লইয়া রাজবালা বলিল—একখানা গরুর গাড়ী আনতে হবে যে শশী!

শশী একবার তাহার প্রকাণ্ড কালো মুখের ছোট ছোট লাল লাল চোখ দুটা পাকাইয়া দারোগা-বাবুর দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া লইয়া বলিল - আমরা পঞ্চাশ-জন জেলে লাঠি শড়কী নিয়ে হাজির আছি; পুলিশ যদি ঠাকুরের গায়ে হাত দিত ত আমরা ওদের জান নিতাম! আপনি যে-পাল্কীতে এসেছিলেন সেই পাল্কী আর একখানা ডুলিও হাজির আছে, আপনাকে আর ঠাকুরকে নিয়ে আমরা পালাতাম।.........

দারোগার মুখে কথা সরিতেছিল না। সে আড়ষ্ট স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল।

রাজবালা শশীকে বলিল—তবে ডুলি পাল্কী নিয়ে আয়। পাল্কীতে তোদের ঠাকুর যাবেন, আমি ডুলিতে যাব।

শশীর ঝাঁকড়া-চুলো মাথা সুড়ঙ্গে ডুব মারিল।

তখন দারোগা স্ত্রীকে বলিল—এই খুনেটাকেও ছেড়ে দিতে হবে নাকি?

রাজবালা বলিল—দেখ, ওরা নিরীহ গরিব মানুষ; বড় অত্যাচার না হলে ওরা জমিদারের বিপক্ষে দাঁড়ায়নি। তবু ওরা দোষ করেছে; ওদের আমি একেবারে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করব না.........

দারোগার পশ্চাৎ হইতে শশী বলিয়া উঠিল—আমাদের ভাবনা ছিল ঠাকুরের জন্যে। তাঁনার ভার মাঠাকরুণ নেলেন, আমরা আপনা হতেই থানায় যেয়ে ধরা দেবো দারোগা-বাবু। তারপর আপনার ধর্ম্ম আর আমাদের কপাল।

দারোগা হংসেশ্বর ভয় পাইয়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল আটজন সাজোয়ান লোক দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহাদের আগে শশী। দারোগার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

দারোগাকে ভয় পাইতে দেখিয়া শশী হাসিয়া বলিল—এজ্ঞে, ওরা বেহারা।

শশী আর বেহারারা ধরাধরি করিয়া বীরেন্দ্রকে পাল্কীতে শোয়াইয়া দিল। রাজবালা ডুলিতে উঠিল। বিনা দাঙ্গায় আসামী গেরেপ্তার করিয়া জমাদার নির্ভরোসা সিং দুইবার কসিয়া গোঁফে চাড়া দিল। কিন্তু হংসেশ্বরের মুখে হর্ষ কি বিষাদ প্রবল তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছিল না।

পুলিশ-পাহারায় ঘেরাও হইয়া হাজতে যাইতে-যাইতে একজন জেলে গলা ছাড়িয়া গাহিয়া উঠিল—

পেঁচার পরামর্শ শুনে হংস বেচারা
প্রাণে বুঝি যায় মারা রে যায় মারা!......

শশী তাড়াতাড়ি তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—এই, চুপ কর্, মাঠাকরুণ শুনতে পাবে!

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুড়-ব্যবসায়

(Sugar Industry)

ভূমিকা

ইয়ুরোপের বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে পৃথিবীর শান্তি ভঙ্গ হইয়াছে। আমরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহু দূরে আছি, রাজ-শক্তি আমাদের আট দিক রক্ষা করিতেছে। তথাপি নানা বিষয়ে আমাদের কষ্ট হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে চোখও ফুটিয়াছে।

পিতৃ-পুরুষের পুণ্যে আমাদের দেশটি সর্ব্বোত্তম ছিল। ক্ষেতে গম ধান প্রচুর জন্মিত, গাছে তুলা ফলিত, বন-জঙ্গল খুঁজিলে ঔষধ মিলিত। অন্ন-বস্ত্র-ঔষধ, এই তিন নইলে প্রাণধারণ অসম্ভব। যে দেশ অন্ততঃ এই তিনের তরে পরের প্রীতি-ভিখারী নহে, সে দেশ ধন্য বই কি।

কিন্তু কাল-বশে বিপরীত ঘটিয়াছে। অন্ন-পূর্ণারও স্থালী অন্ন-শূন্য হয়।

অভক্তের দৃষ্টিতে অন্ন অদৃশ্য হয়। ভক্তিপূর্ব্বক লক্ষী-

পূজা কর, অন্নপূর্ণা বিমুখ হইবেন না। ঋীয়ের সন্ধানে মায়ের চিত্ত বিগলিত হয়। অন্নই লক্ষ্মী, সম্পদ; ভূমি ধাত্রী।

ইহা যে কথার কথা নয়, তাহা একটা অন্ন—গুড় লইয়া দেখাইতে বসিয়াছি। দেশে প্রথমে গুড়, পরে গুড় হইতে চীনি মিছরী হয়। প্রবন্ধ-পঞ্চকে গুড়-ব্যবসায় বলিব। প্রথমে গুড়াদির লক্ষণ, দ্বিতীয়ে গুড়ের বিধান, তৃতীয়ে চীনি, চতুর্থে উদ্ভব, এবং পঞ্চমে প্রাচীন কালের গুড়।

কিন্তু গুড় করা আমার ব্যবসায় নহে; ব্যাপারও নহে। এই হেতু আমার জ্ঞান যৎসামান্য। মধুর রস হইতে গুড় ও চীনি করা একটা কলা; কেবল কলা নহে, একটা বিদ্যা; কেবল বিদ্যাও নহে, একটা ব্যবসায়; ছোট-খাট ব্যবসায় নহে, বিপুল ব্যবসায়। কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও ত চলে না।

আমি মনে করি, দেশের ব্যবসায় ও বার্তা লইয়া মাসিক পত্রাদিতে আলোচনা করিলে সে বিষয়ের একটা স্থূল জ্ঞান দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে; সুক্ষেত্রে পড়িতে পারে, এবং পড়িলে সুফল ফলিতেও পারে। নানা স্থানের নানাবিধ গুড় পরীক্ষা করিয়া বারম্বার মনে হইয়াছে, (১) অনেকে গুড় করিতে না শিখিয়া গুড় করে, (২) কেহ কেহ উত্তম শিখিয়াছে, করিতে পারে, কিন্তু তেমন করে না।

প্রথম কথাটা নূতন নহে। কর্ম যে শিখিয়াছে সে শিক্ষিত, যে না শিখিয়াছে সে অ-শিক্ষিত। অ-শিক্ষিত লোক দ্বারা দেশ ভরিয়া আছে। আমরা নিশ্চিন্ত মনে স্থির হইয়া বসিয়া আছি; দেখিয়াও দেখি না যে সে কাল চলিয়া গিয়াছে, ফিরিবে না, যে কালে দেশের ভালমন্দের বিচার দেশের প্রমাণে (standard) করিতে পারা যাইত। একালে সে প্রমাণ নিষ্ফল হইয়াছে, দেশের প্রমাণ দেশ না হইয়া বিদেশ হইয়াছে।

'জীবন-সংগ্রাম' কথাটা কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, জানি না। এই একটা কথার অন্তরালে গুড়-ব্যবসায়ও আছে। একস্থানে বহু জনের সমাগম হইলে সংগ্রাম বলা যায়। সমাগমে তত অনিষ্ট হইত না যদি 'কলহ' না হইত, এবং কলহও তত হইত না যদি সকলের ব্যবসায় এক না হইত। ব্যবসায় অর্থে উদ্যম, অনুষ্ঠান, অভিপ্রায়। বস্তুতঃ ঘটিয়াছে ব্যবসায়ের সংগ্রাম। এ-দেশের সে-দেশের গুড়-ব্যবসায়ীর সংগ্রাম হেতু উত্তমের জয় হইতেছে। আমরা দশজন সংগ্রামের বাহিরে; আমরা আপাততঃ লাভবান্ হইতেছি, সস্তায় গুড় পাইতেছি। কিন্তু একটু ভিতরে গেলে দেখি, ব্যবসায়-সংগ্রাম নহে, বার্তা-সংগ্রাম। যাহা করিয়া, যাহা দ্বারা, বাঁচিয়া আছি, বর্তমান আছি, তাহা বার্তা, জীবিকা। এই কৃষি-বার্তার দেশে যে-কোন কৃষিতে বিদেশী শিক্ষিতের সংগ্রাম ঘটিলে এদেশের লোকে বার্তা-হীন হইয়া পড়ে; তাহার সংসার-যাত্রার সম্বল ফুরাইয়া যায়।

যে অ-শিক্ষিত, যে সংগ্রাম করিতে অ-শিক্ষিত, তাহার অকাল-মরণ অনিবার্য। প্রতিকার একটি বই দুইটা নাই। প্রতিযোগী যে মন্ত্রে যে অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে, তদপেক্ষা সিদ্ধিকর মন্ত্র ও অস্ত্র চাই; অন্ততঃ তুল্য মন্ত্র ও অস্ত্র চাই। অ-শিক্ষিতকে সংগ্রাম-কৌশল শিখাইতে হইবে।

কিন্তু দেখা যাইবে, এইখানে বহু বাধা আছে। দেশে যে আখ চাষ করে, সে গুড়ও করে। অর্থাৎ আখকে এমন অবস্থায় আনিয়া দেয়, যে অবস্থায় তাহার ক্রয়-বিক্রয় হইতে পারে। কৃষক ও গুড়-কার এক। ইহাই স্বাভাবিক। ইহাতে কৃষককে এক গুড়-ব্যবসায়ীর দ্বারস্থ হইতে হয় না, তাহার স্বাধীনতা লুপ্ত হয় না। কৃষক গুড় বিক্রয় করে, জনসাধারণকে করে, গুড়ের বহু প্রার্থী থাকে। নিজে গুড় না করিয়া গুড়-কারকে আখ বিক্রয় করিতে হইলে কৃষককে গুড়-কারের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, কৃপা-প্রার্থী হইতে হয়। আমাদের দেশে মানুষের নিকট কৃপা-প্রার্থনা নাই। প্রথম সমাজে জনমাত্রেই স্বাধীন। ব্যবসায়ের কর্ম-বিভাগে জন-মাত্রেই পরাধীন। দেশের কৃষক পরাধীন হইতে চাহিবে কি? কেহ কেহ কাপাসের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে পারেন কৃষক কাপাস চাষ করে, কিন্তু কাপড় বোনে না। এমন কি সূতাও পাকায় না। কিন্তু এ দৃষ্টান্ত ঠিক নহে। কাপাস ঘরে রাখা চলে, ফলিবা-মাত্র বেচিতে হয় না। আখ রাখা চলে না, পাকিবা-মাত্র গুড় করিতে হয়, নতুবা আখে গুড় কম হয়, ক্ষতি হয়। এমন দশায় কৃষক গুড়-কারের সহযোগী হইতে পারে কি? উভয়ের সম্বন্ধ রক্ষিত-রক্ষকের সম্বন্ধ, নীল-কৃষক ও নীলকরের সম্বন্ধ। নিষ্ঠুর-ভাষী বলেন, সে সম্বন্ধ খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধে দাঁড়াইতে অধিক দিন লাগে না।

গুড়-কুঠীর মন্ত্রণা করিলে বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা সহজ হয়, কিন্তু কৃষকের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। কুঠী-মাত্রেই কর্ম-বিভাগ, কর্ম-বিভাগ-মাত্রেই পর-বশ্যতা, পর-বশ্যতা-মাত্রেই দ্বন্দ্ব ও কলহ। ইয়ুরোপে এইরূপ কলহ লাগিয়াই আছে। যখন সে দেশে কুঠী নির্বিবাদে চলিবে তখন এ দেশেও তাহার অনুকরণ বাঞ্ছনীয় হইতে পারিবে। তা ছাড়া, ইচ্ছা করিলেই সমাজ-ব্যবস্থা ওলট-পালট করিতে পারা যায় না। অন্য প্রতিকার কি আছে, তাহাও দেখা কর্তব্য। দেখা যাইবে, অনেক গুড়-কার উত্তম গুড় করিতে জানে না। ইহাদিগকে শিখাইতে হইবে। কারণ ইহারা শিখিলে গুড়ের কিছু উপচয় হইবে। ইহাদিগকে এবং কৃষককে বুঝাইতে হইবে আজিকালি অধম অপেক্ষা উত্তমের দর অধিক। দ্বিতীয়তঃ, গুণে হীন করিয়া পরিমাণে বৃদ্ধি দ্বারা লাভ নাও হইতে পারে। অপরকে ঠকাইতে পারিলে সহজে ধনবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু, "সাধুর দশ দিন চোরের একদিন মাত্র।" ইহার সহিত স্মরণ রাখিতে হইবে এ প্রদেশের সে প্রদেশের, এ দেশের সে দেশের মধ্যে পূর্বকালের ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে; যে গুড় দিয়া পূর্বকালের লোককে তৃপ্ত করিতে পারা যাইত, তাহা দিয়া এ-কালের লোককে পারা যাইবে না। একটা বিষম কথা এই যে আমাদের দেশ দরিদ্র; দরিদ্রে পরিমাণ চায়, গুণ চায় না; গুণ চাইলেও গুণানুসারে দর দিতে পারে না। শুনিয়াছি বিদেশী ব্যবসায়ী এদেশের নিমিত্ত দরিদ্রের ক্রয়-শক্য করিয়া পণ্য নির্মাণ করে। এই যে অর্থনীতির ব্যাপার তাহার কূল পাওয়া কঠিন।

সে-দিন কলিকাতায় "স্বদেশী ব্যবসায়"-বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে এক সমিতি হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ জানি না। কিন্তু একটা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রে 'স্বদেশী ব্যবসায়' (Home Industries) স্থলে 'গৃহ-শিল্প' নামকরণ দেখিয়া চক্ষুঃস্থির হইয়াছে। যে দেশের ভাবুকদিগের মনে ব্যবসায় ও বার্তা, বাণিজ্য ও ব্যাপার, শিল্প ও কলা, কলা ও বিদ্যা, প্রভৃতি সম্বন্ধে আব-ছায়ার জাল বিস্তৃত রহিয়াছে, সে-দেশের বন্ধন-মোচন শীঘ্র হইবে না। গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত চিন্তা না করিলে কিরূপে বাঁচিব; আমরা না করিলে কে করিবে; কোন বিদেশী দয়াশীল আমাদের নিমিত্ত চিন্তা করিলে তাঁহার উদ্ভাবিত উপায় আমাদের সাধ্য নাও হইতে পারে বরং এক-কথায় বলিতে গেলে সে উপায় আমাদের উপ যোগী হইবে না। কারণ বিদেশী বিদেশী; তাঁহার বিদ্যা-বু দয়া প্রভৃতি হইলেও তিনি দেশী মর্ম স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই বিষম অসুবিধা সত্ত্বেও যে কেহ কেহ ঠিক প্রতিবিধা বলিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদের ধৈর্য ও সূক্ষ্ম জ্ঞানে প্রশংসা করিতে হয়। গুড় ও চীনি সম্বন্ধে অনেক পুস্ত ও পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে; সে-সবে অনেক জ্ঞাত নিশ্চয় আছে। আমি দুই-একখানা মাত্র পড়িবার অবস পাইয়াছি। কিন্তু এদেশের নিমিত্ত অত্যল্প লিখিত হইয়াছে দুই-একখানার গতিক দেখিয়া বুঝিয়াছি সে-সব দ্বারা আমা বক্তব্য স্পষ্ট হইবে না।* একটা কথা স্মরণ করিতে হইবে যে আমরা গুড় খাই, চীনি তত খাই না। সুতরাং চী চীনি রব না তুলিয়া গুড় বাড়াইবার চিন্তা দ্বারা দেশের অধি হিত হইবে। গুড়ের দোষ আছে সত্য; সম্বৎসর রাখি গেলে গুড় দুর্গন্ধ হয়। তথাপি দরিদ্র দেশের পক্ষে গুড়

* এটা অতিশয়োক্তি বোধ হইতে পারে। না জানিয়া উ অতিশয়োক্তি বা মিথ্যা উক্তি হবারই কথা। তবে বলিতে দোষ ন যে আমাদের দেশের অনেক বিষয় আমরা বিনা চেষ্টায় জানিতে পা যাহা জানিতে বিদেশীর বহুকাল লাগে। দুই-একটা উদাহরণ দি-ই বঙ্গদেশে আখের ডগা রুইয়া নূতন গাছ করা হয়। ভারতবর্ষের ব স্থানে গোটা আখ কাটিয়া কাটিয়া রোআ হয়। কোন্ প্রকারে গু অপচয় অধিক হয়, ইহাও জ্ঞাতব্য হইয়াছিল। অবশ্য বিজ্ঞা শালায় প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে ডগায় রস কম, গুড় কম। সা দাঁতে ছাড়াইয়া কোন দিন আখ চাখিয়াছিলেন কি না, প্রকাশ নাই এটা বিশ বছর আগের কথা বটে, কিন্তু বছরের কমবেশীতে এ একটা জানা কথা জানিতে হয় না। অন্য একটা উদাহরণ দি-ই সে বৎসর কলিকাতায় বেরি-বেরি রোগের উপদ্রব হইলে এক ডাক্ত সাহেব স্থির করিয়াছিলেন যে বাঙ্গালী কাঁড়া চাল খায় বলিয়া রোগে আক্রান্ত হইতেছিল। কারণ কাঁড়িলে চালের ফস্‌ফরস কমি যায়। কিন্তু যদি তিনি জানিতেন যে বাঙ্গালী, বিশেষতঃ ধনবান্ বাঙ্গা শুধু-ভাত খায় না, ডাল মাছ দুধ খায় যাহাতে চালের কুঁড়ায় অপে অনেক অধিক ফস্‌ফরস আছে, তাহা হইলে ফস্‌ফরসের অভ বলিতেন না। ইদানী শুনিতেছি কাঁড়িলে চালের অন্য একটা দ্র 'ভাইটামীন,' কমিয়া যায়, এবং সেহেতু বেরি-বেরি রোগ হইতে পার কিন্তু একথা স্বতন্ত্র; এবং ইহাও প্রমাণ করিতে হইবে যে সে-দ্র ডালেই আছে আমাদের অন্য ভোজ্যে নাই।

উপাদেয়। চীনি লইয়া বিদেশের প্রতিযোগিতা, গুড় লইয়া নহে।*

(১) গুড়াদির লক্ষণ।

মধু, গুড়, চীনি, মিছরী প্রভৃতি মিষ্টক সবাই জানি। মধু স্বভাবতঃ জন্মে। গুড় চীনি মিছরী স্বভাবতঃ পাই না, ইক্ষু প্রভৃতির মধুর রস পাক করিয়া পাই। নানা আকারে পাই; তন্মধ্যে গুড়ের আকারে সর্বাধিক। ইহাতে খানিক দ্রব (liquid), খানিক ঘন (solid) থাকে। ঘনভাগে সরু বালি কিংবা তদপেক্ষা মোটা বালির আকারে 'দানা' থাকে। এক এক গুড়ে আরও বড় বড় 'দানা' থাকে। 'দানা' শব্দ ফার্সী; ইহার অর্থ শস্য (grain)। শস্যের আকার-সাদৃশ্য-হেতু গুড়ের 'দানা,' মিছরীর 'দানা' বলা হয়। সংস্কৃতে ইহাকে 'শর্করা' বলা হইত। আমরা 'দানা' শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃত 'কেলাস' (crystal) শব্দ বলিব। এই 'কেলাস' শব্দ হইতে 'কৈলাস' নামের উৎপত্তি।

অতএব গুড়ের কিয়দংশ কেলাসিত (crystallised), কিয়দংশ নহে। কেলাসিত অংশ ঘন (solid)। ইহাকে চলিত ভাষায় 'সার' ও 'খাঁড়' বলে। অ-কেলাসিত অংশ দ্রব (liquid)। ইহাকে 'মাৎ' বলে। গুড়ে কত খাঁড় কত মাৎ থাকিবে, তাহার প্রায় ইয়ত্তা নাই। এমন গুড় আছে, যাহাতে খাঁড় অল্প, ভিতর দিয়া শলা অনায়াসে চলিয়া যায়। অপর গুড় এত ঘন যে শলা প্রবেশ করে না। এক এক গুড় পাণ্ডুর বর্ণ, খড়-বর্ণ; এক এক গুড় কৃষ্ণ-রক্ত বর্ণ। 'গুড়-বর্ণ' বলিলে আপীত রক্ত বর্ণ বুঝায়।

নূতন গুড়ের সুরভি আছে। আখের গুড় অপেক্ষা খেজুরা গুড়ের সুরভি অধিক। কিন্তু কিছু দিন পরে নূতন গুড়ের সুরভি থাকে না। একটা গন্ধ থাকে, যাহাকে গুড়-গন্ধ বলা যায়। বর্ষা-কালে গুড়-গন্ধ বিকৃত হয়। যে গুড় নূতন বেলায় কৃষ্ণবর্ণ ও অধিক দ্রব, সে গুড় শীঘ্র বিকৃত হয়। সুরভি চলিয়া যায়; গুড়-গন্ধ এক-প্রকার পচা গন্ধে ঢাকা পড়ে, বুদ্বুদ বা ফুট উঠিতে থাকে। সে গুড় গাঁজিয়া উঠিতে পারে, মাদক হইতে পারে; অম্লও হইতে পারে। এই-প্রকার ক্রিয়াকে সংস্কৃতে 'সন্ধান' (fermentation) বলা হইত। বায়ুতে ধুলা আছে। সে ধুলার মধ্যে সূক্ষ্ম চক্ষুর অগোচর অণুবৎ জীবিত দ্রব্য থাকে। নাম অণু-জীব (microbes)। অণু-জীব অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শুধু চোখে নহে। ইহাদের সংখ্যা নাই; এমন বায়ু নাই, যাহাতে অণুজীব নাই। পুনঃ পুনঃ দেখা গিয়াছে গুড়ে অণুবীজ পড়িলে গুড় সন্ধিত (fermented) হয়, নতুবা হয় না। গুড়ের কলশীর মুখ খোলা থাকিলে, গুড়ে বাতাস লাগিলে, অণুজীবও লাগে। অণুজীব এত সূক্ষ্ম যে কেশ-সঞ্চার ছিদ্রও তাহার পক্ষে বৃহৎ দ্বার। অতএব বায়ুরোধ করিয়া গুড় রাখা কঠিন। কখন গুড়ে 'ছাতা' (moulds) পড়ে। প্রথম প্রথম দেখিতে তুল-র মতন দেখায়। একারণ এই 'ছাতা'কে 'তুল-ছাতা' (filamentous mould) বলে।

গুড়ে মাতের ভাগ বেশী হইলে উক্ত বিকার শীঘ্র উপস্থিত হয়। একারণ সম্বৎসরের গুড় রাখিবার সময় লোকে খাঁড়-গুড় কেনে। খাঁড়-গুড় শীঘ্র বিকৃত হয় না। গুড়ের কলশীর তলায় ছিদ্র করিয়া দিলে মাৎ ঝরিয়া যায়, খাঁড় পৃথক হয়। মাৎ শীঘ্র বিকৃত হয়, সন্ধিত (fermented) হয়। নূতন গুড় উঠিবার সময় 'ঝলা' বা 'ঝোলা' গুড় পাওয়া যায়। ইহাতে কিছুমাত্র ঘন কিংবা কেলাস থাকে না; সবটাই দ্রব, গাঢ় ও শ্যান (চট্‌-চটা viscous) দ্রব। দেখিতে গুড়ের মাতের তুল্য, কিন্তু অন্য বিষয়ে ভিন্ন। মাৎ যত মলিন, ঝোলা গুড় তত নহে। ঝোলা গুড় সদ্য-সদ্য খাইয়া ফেলা হয়। কিছুদিন রাখিয়া দিলে মাতের তুল্য বিকৃত হয়।

মাৎ-ঝরানা খাঁড়ও কয়েকমাস পরে দুর্গন্ধ হয়। খাঁড়ের কেলাসের মাঝে মাঝে ও গায়ে কিছু মাৎ লাগিয়া থাকে।

---

* এই প্রবন্ধে পরিভাষা আবশ্যক হইবে। বহুস্থলে চলিত শব্দ লইব; কোন্ কোন্ স্থলে শব্দের ব্যুৎপত্তি বলিয়া পরিভাষাটি দৃঢ় করিব, কোন্ কোন্ স্থলে নূতন শব্দ রচনা করিব। ইংরেজী অক্ষরে ইংরেজী শব্দ যোগ করিলে কোকিলের মাঝে কাকের সমাবেশ-তুল্য শোভিত বোধ হয়। কিন্তু আমাদের অনেকে কোকিল চেনেন না; কাজেই পাশে কাক দেখাইতে হইবে। আশা করি, পাঠক শব্দ ও পরিভাষার বিচার দেখিয়া 'গুড়-ব্যবসায়'কে বিদ্যা-ব্যবসায় মনে করিবেন না।

জলে দ্রুত ধুইয়া ফেলিয়া রোদে শুকাইলে যে খাঁড় হয়, তাহা অনেকদিন অ-বিকৃত থাকে। যে ধোআনি হয়, তাহা মাৎ অপেক্ষা অধম। ইহাকে 'শোঠ' বলে। মাৎ-ধোআ খাঁড় শুখাইয়া দলিয়া রোদ লাগাইয়া 'দলুয়া' বা 'দ'লো' হয়। শুষ্ক দ'লো শীঘ্র দুর্গন্ধ হয় না। রসা থাকিলে হয়। দলুয়া কিংবা উত্তম খাঁড় জলে মিশাইয়া জ্বাল দিলে রসের উপরে কাদা উঠে। ইক্ষু-রস পাক করিবার সময় এইরূপ কাদা বিস্তর উঠে। ইহাকে 'গাদ' (scum) বলে। দলুয়ার গাদ তুলিয়া ফেলিয়া রস গাঢ় করিলে শুষ্ক মিহি বালির মতন 'ভুরা' হয়। আবার গুড়ের মতন করিলে যে খাঁড় জন্মে, তাহা মিছরী। যে দ্রব ঝরে, তাহা মাৎ বটে, কিন্তু গুড়ের মাৎ অপেক্ষা সু-বর্ণ ও সু-স্বাদু। দলুয়া ও ভুরা, দুই-ই চীনি।

অতএব কেবল আকার দেখিয়া গুড় চীনি মিছরী প্রভৃতি নাম হয় নাই। দ্রব ঘন তরল কঠিন প্রভৃতি গুণ দেখিয়াও নহে। ভিঁড়া, পাটালী, নবাৎ প্রভৃতি শুষ্ক; কিন্তু সে-সব, চীনি নহে। দেখা যাইতেছে, দ্রব গুড় দ্বিবিধ উপায়ে পাওয়া যায়। আখের রস পাকে গাঢ় করিয়া, এবং গুড় ও মিছরীর মাৎ পৃথক্ করিয়া। মাৎ খাওয়া যাইতে পারে, শোঠ নহে। গুড়ের নিকৃষ্ট অবশিষ্ট—শোঠ। বস্তুতঃ 'অবশিষ্ট' শব্দের শিষ্ট হইতে শিঠা; শিঠা হইতে শোঠ শব্দ হইয়াছে। পাকে গাঢ় রস—ঝোলা। 'জলা' শব্দের অপভ্রংশে 'ঝোলা' শব্দ। পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানে 'ঝলা' বলে। ওড়িয়াতে বলে 'পাণী-গুড়'। জল বলা যেমন, পানী বলা তেমন। উভয়ের অর্থ, জল-যুক্ত। ইহার সংস্কৃত, 'ফাণি' বা 'ফাণিত'। গুড় ঝরাইলে যে দ্রব পাওয়া যায়, যে মাৎ পাওয়া যায়, তাহা 'ঝরা'; এবং 'ঝরা' শব্দের পরিবর্তনে 'ঝলা'। ইহার প্রমাণ হিন্দী নাম 'ছোরা' শব্দে পাওয়া যায়। 'ছোরা' বাস্তবিক 'চোরা', অর্থাৎ চোআইয়া, চ্যুত করিয়া যে চুআ পাওয়া যায়। ইহা 'ঝলা'। মরাঠীতে বলে 'কাকরী'। ইহার ব্যুৎপত্তি জানি না। ঝোলা গুড় ইংরেজীতে molasses। ইংরেজী শব্দটির মূলার্থ 'মধু'। ঝোলা গুড় মধুতুল্য বটে। ঝলা গুড় ইংরেজীতে treacle। ইদানী ইংরেজী শব্দটি তত চলিত নাই।

গুড়কে ওড়িয়াতেও বলে গুড়। কিন্তু হিন্দীতে বলে 'রাব'। সংস্কৃত 'দ্রব' শব্দ হইতে 'রাব' মনে করি। দ লোপে রব-রাব। অতএব রাব পূর্বে দ্রব গুড় বা ঝোলা, এবং চোবা পূর্বে ঝলা বা মাৎ ও শোঠ বুঝাইত।*

মরাঠী ও দক্ষিণের অন্যান্য ভাষায় গুড়কে 'গুল' বলে। বাস্তবিক 'গুড়' নহে, 'গুল'ও নহে, দুইএর মাঝামাঝি। এ বিষয়ে অনেক কথা পরে বলিতে হইবে। এখন শুধু নাম নির্ণয় করি। গুড়কে রাব—দ্রব মনে করিয়া ইংরেজীতে বলে molasses। মান্দ্রাজের তালের গুড়ের নাম jaggery। সে গুড়ের সাদৃশ্যে বঙ্গের গুড়ও jaggery নাম পাইয়াছে। এই নামটা সংস্কৃত 'শর্করা' শব্দের তামিল অপভ্রংশের পর্তুগীজ অপভ্রংশ। আমাদের গুড়ের বাস্তবিক নাম Bastards। এই নাম তত চলিত নাই; সকলে জানেও না।

আমাদের অনেকে 'ভিঁড়া গুড়' দেখেন নাই, চেনেন না। পরে দেখা যাইবে, সংস্কৃত ভাষায় ইহাকেই গুড় বলা হইত। বিহারে ও পশ্চিমে 'গুড়' নামই চলিত আছে। ইহা শুষ্ক। এই 'গুড়' রাখিতে কলশী আবশ্যক হয় না, ছালায় ভরিয়া চীনির মতন গ্রাম-গ্রামান্তরে লইয়া যাইতে পারা যায়। বিহারে চলিত নাম 'চক্কীগুড়', কারণ তাহা জাঁতার পাথরের মতন পুরু ও চেপটা। বঙ্গের 'পাটালী' এইরূপ। প্রভেদ এই, পাটালী অল্প হয়, 'চক্কী-গুড়' অধিক। 'গুড়' ও 'গুল' শব্দ একই। দুই-ই সংস্কৃত। 'গুল' অর্থে গোলক, গোল-পিণ্ড। পূর্বকালে এই গুড় পট্টাকার হইত না, গোলাকার হইত। পশ্চিমভারতে ও উত্তরবঙ্গে অদ্যাপি তালের মতন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের 'ভিঁড়া' এইরূপ। হিন্দীতে বলে 'ভেলী'। সংস্কৃত 'ভের,' 'ভেরী' শব্দ হইতে 'ভেলী'। ভেরী বাদ্য-বিশেষ, নাগরার তুল্য। এই আকারের মৃৎভাণ্ডে পক্ক ইক্ষুরস ঢালিলে যে শুষ্ক তাল হয়, তাহা 'ভেলী'। 'নাগরী' (গুড়) নামের উৎপত্তিও তাই। নাগরা-মৃৎভাণ্ডে জাত কঠিন গুড়ের নাম 'নাগরী'। 'ভিঁড়া' শব্দ ভাণ্ড—ভাণ্ডী—ভাঁড়ী শব্দের অপভ্রংশ বোধ হয়। বাল্যকালে দেখিয়াছি, ভাঁড়ে ভিঁড়া

* দ্রব শব্দের অপভ্রংশ ওড়িয়াতেও পাই। ওড়িয়াতেও আখের কাঁচা ও পাকা দুই রসকে 'দরুয়া' বা 'দরো' বলে। 'দ্রব' রূপান্তরে দর :দর+উআ 'দরুয়া'।

করা হইত। ভিঁড়া, ভেলী, চক্কীগুড়, পাটালী, সব প্রায় এক। উহা শুষ্ক গুড় বটে, কিন্তু প্রায়ই কেলাস-হীন। কেলাস থাকিলেও তাহা অতি ক্ষুদ্র, এবং অ-কেলাসিত অংশের তুলনায় অল্প। আখের রস দ্রুত শুখাইয়া ফেলিয়া ভিঁড়া, ভেলীর উৎপত্তি। ইহাতে কেলাস জন্মিতে সুযোগ দেওয়া হয় না। ইংরেজীতে ভিঁড়া ও ভেলীর নাম Concrete।

আমরা যাহাকে গুড় বলি সংস্কৃতে তাহার নাম মৎস্যণ্ডী ছিল। এ বিষয় পরে দেখা যাইবে। মৎস্যণ্ডী শব্দের 'মৎ' হইতে বাঙ্গালা মাৎ শব্দ। 'মৎ' শব্দটুকুর মূল সংস্কৃত 'মদ'। মধুবৎ দ্রবের নাম 'মদ'। আমাদের গুড় হইতে এই 'মদ' ঝরে। সংস্কৃত 'খণ্ড' শব্দ হইতে 'খাঁড়'। কিন্তু সংস্কৃত 'খণ্ড' দ্বারা গুড়ের মিছরী বুঝাইত। যেমন 'শর্করা' নাম থাকিতে বঙ্গদেশে চীনি নাম চলিত হইয়াছে, তেমনই 'খণ্ড' থাকিতে মিছরী। পূর্বকালে মিছরী নাম ছিল না। তখন 'ক্ষীর-খণ্ড'—মিছরী দেওয়া দুধ—সুরস পেয় হইত। অদ্যাপি গ্রামের মোদক 'খণ্ড' করে; তাহা কিন্তু মিছরী নামে বেচা কেনা হয়। কিন্তু ওড়িয়াতে 'কন্দ', মরাঠীতে 'খণ্ডী' নাম অপ্রচলিত হয় নাই। আরবীতে কন্দ, ইংরেজীতে candy। কেহ কেহ মনে করেন, মিশ্রদেশ—মিসর দেশ হইতে নাম মিশ্রী—মিস্রী—মিছরী। কিন্তু বোধ হয় আরবী মিসরী—মিস্রী নাম হইতে 'মিশ্রী' নামের উৎপত্তি। খণ্ডের বা মিছরীর কেলাস বড় বড় এবং পরস্পর সংহত। গুড়ের কেলাসও বড় বড় হইতে পারে। একারণ গুড়ের সার-ভাগ বাঙ্গালা ও হিন্দীতে খাঁড়।

চীনির কেলাস ছোট ছোট, এবং অসংহত। চীনি, সংস্কৃতে শর্করা। শর্করা শব্দের প্রাচীন অর্থ বালুকা। শর্করা শব্দ হইতে মরাঠীতে সাখর, হিন্দীতে সক্কর, আরবীতে সুক্কর, ইংরেজীতে sugar। বোধ হয় চীনি নাম সিন্নী হইতে আসিয়াছে। সিন্নী নাম, ফার্সী শীরনী হইতে উৎপন্ন। কেহ কেহ মনে করেন, চীন দেশ নাম হইতে চীনি। অন্ততঃ আট শত বৎসর পূর্বের বহিতে চীনি নাম না পাইলে চীন দেশ হইতে চীনি অনুমান সিদ্ধ হইবে না। বিদেশী নাম বলিয়া এমন বুঝায় না বিদেশ হইতে 'চীনি' করার জ্ঞান জন্মিয়াছিল। কারণ শর্করা শব্দ প্রাচীন। কবিকঙ্কণের সময়ে "চিনির কারখানা" ছিল। চৈতন্য-চরিতামৃতে "পদ্ম-চিনি" নাম আছে। ইহা আজিকালির ভুরা।* একালের বিলাতী ধব্-ধবা চীনি সেকালে অবশ্য ছিল না। বোধ হয় লোকে চীনি অপেক্ষা মিছরী খুঁজিত। বঙ্গে মিছরীর পানা যেমন, ওড়িস্যায় কন্দের পানা তেমন প্রসিদ্ধ। গুড়ের দল—ডেলা ভাঙ্গিয়া 'দলুয়া'। আর ধুলার মতন করিয়া ধুলা—ধুরা—'ভুরা' নাম হইয়াছে। হিন্দীতেও এই দুই নাম আছে। কিন্তু কোন্‌টা দলুয়া, কোন্‌টা ভুরা, তাহা, দেখিয়া চিনিতে পারা যায় না। 'কাশীর চীনি' নামে যাহা বিক্রয় হয়, তাহা 'ভুরা'। দলুয়া অপেক্ষা ভুরা নির্মল, এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে। ইংরেজীতে দুই-ই muscovado, or Brown sugar।

এখন গুড়াদির একটা বিভাগ করা চলে।

দ্রব (liquid)	পাকে দ্রব			ঝোলা গুড়
	ঘন হইতে পৃথক দ্রব			মাৎ, শোঠ
দ্রব-সহিত ঘন (mixed)				গুড়
ঘন (solid)	অ-কেলাসী			ভিড়াঁ, ভেলী
	কেলাসী	গুড় হইতে প্রাপ্ত		খাঁড়
		পাকে জাত	কু-কেলাসী, অসংহত	চীনি
			সু-কেলাসী, সংহত	মিছরী

এই বিভাগের মূল সংস্কৃত হইতে লইলাম। পরে দেখা যাইবে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত নামে প্রভেদ না থাকিলে বিভাগটি সংস্কৃতের হইত।

গুড়াদির আকার বর্ণ, দ্রবত্ব ঘনত্ব, লঘুত্ব গুরুত্ব, প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া যে বিভাগ হয়, তাহা লোকে অক্লেশে বুঝিতে পারে। এই হেতু সে বিভাগ চলিত হয়। বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া আমরা দ্রব্য নিশ্চয় করি বটে, সময়ে সময়ে ভুলও করি। আভ্যন্তর লক্ষণ জানিতে পারিলে ভুল কম হয়। অণুর সমষ্টিতে দ্রব্য। অণু চক্ষুগোচর

* বাঙ্গালাতে 'চিনি' লেখা হয়। কিন্তু বোধ হয় 'চীনি' বানানে সুবিধা আছে। এই বানান উচ্চারণ ও ব্যুৎপত্তির কাছে যায় এবং ক্রিয়াপদ 'চিনি' হইতেও ভিন্ন হয়। বঙ্গদেশে চীনি নাম যত প্রচলিত, অন্য দেশে তত নহে।

নহে, কিন্তু বহুর সন্নিবেশে চক্ষুগোচর হয়। কিন্তু সে-সব অণু সজাতীয় কি বিজাতীয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ঝোলা গুড় দেখিয়া কে বলিতে পারে যে উহাতে জল আছে গুড় আছে; কিংবা গুড় দেখিয়া কে বলিতে পারে যে উহার সব অণু সজাতীয় নহে। বাহ্য লক্ষণ দ্বারা দ্রব্যের জাতি নির্ণীত হয়, অণুর জাতি হয় না। না হউক; কোন কোন স্থলে বাহ্য লক্ষণ দ্বারাও অণুর সজাতীয়ত্বে সন্দেহ জন্মে। যখন গুড় হইতে চীনির জন্ম, যখন চীনি পচে না, গুড় পচে, তখন চীনি ও গুড়ের অণু সজাতীয় বলিতে পারি না। অণুর পরস্পর-সন্নিবেশ-হেতু যে-সব লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা বাহ্যলক্ষণ। অন্য কথায়, 'উপাধান' (physical properties)। আর, অণুর জাতি-হেতু, অন্য কথায়, 'উপাদান' (ingredients) হেতু যে-সব লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা আভ্যন্তর লক্ষণ (chemical properties)।*

গুড়াদির উপাধানের পর উপাদান নির্ণয় করা যাউক। কিন্তু উপাদানেরও উপাধান জানিতে হইবে। ইহারও নাম চাই, লক্ষণ চাই। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। আজিকালি অনেক-প্রকার মিষ্ট দ্রব্যের বিধান অর্থাৎ ভিয়ান হইতেছে। মুড়কী হইতে আরম্ভ করিয়া সন্দেশ, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন প্রভৃতি কত নামে কত কত দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে। 'দ্রব্য' (object) অনেক-প্রকার বটে, কিন্তু 'বস্তু' (substance) তত প্রকার নহে। সন্দেশে ছেনা ও চীনি, রসগোল্লাতেও সে দুই 'বস্তু'। ক্ষীরমোহনে আর এক 'বস্তু' থাকে, সেটা ক্ষীর। জল একটা বস্তু; কিন্তু নদীর কাদা-জল একটা বস্তু নহে। কাদা-জল স্থির থাকিলে জল হইতে কাদা পৃথক হয়, অন্ততঃ জল ও কাদা, দুইটা বস্তু পাওয়া যায়। সমুদয় কাদা পৃথক হইলে জল 'নি-র্মল' (clear) হয়। কাদা-জলের মল, কাদা। কিন্তু সে নি-র্মল জল 'বি-মল' (pure) নহে। কারণ সে জল শুখাইয়া ফেলিলে পাত্রে অন্য মল পড়িয়া থাকে। এইরূপ, পুকুরের জল, কুআর জল নির্মল দেখাইলেই বি-মল বলিতে পারা যায় না। ভাসা মল যাহা সহজে নির্গত হয়, সে মল দূর হইলে বলি দ্রব্যটি নি-র্মল। আর, যে মল অণুর আকারে মিশিয়া থাকে যাহা সহজে বহিষ্কৃত হয় না, সে মল দূর হইলে বলি দ্রব্যটি বি-মল।* কিট্ট অর্থাৎ কাইট না গেলে তেল নির্মল হয় না। কিন্তু সে তেলে অন্য নির্মল তেল মিশিয়া থাকিতে পারে। ইহা 'মিশাল' (adulterated) তেল। সে তেল 'শুদ্ধ' (unadulterated or pure) বলিতে পারা যায় না। এইরূপ, আখের গুড়, খেজুরা গুড়, তালের গুড়, কি বিলাতী বীট-পালং শাগের শিকড়ের গুড়; যে গুড়ই ধরি না, এ-সকলের মিষ্টতার কারণ-বস্তু দুইটি নামে ব্যক্ত করিতে পারা যায়। দুই-ই 'শর্করা', কারণ দুই-ই মিষ্ট। একটা 'ইক্ষু-শর্করা' (cane-sugar), অন্যটা 'উন-শর্করা' (invert sugar)। দেখা যাইবে শাদা ধব্-ধবা চীনির প্রায় সমুদয়টা ইক্ষু-শর্করা। ইহা কেলাস্য (crystallizable)। গুড়ে ইক্ষু-শর্করা ব্যতীত উন শর্করা থাকে। ইহাকে কেলাসিত করিতে পারা যায় না। ইহা দ্রব অবস্থায় থাকে, শুখাইয়া ফেলিলেও ভিজা বাতাসে দ্রব হয়। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে শর্করা বলে না; কারণ মিষ্ট রসের কেলাসের নাম শর্করা। উন-শর্করা কেলাস্য নহে, কিন্তু মিষ্ট; ইক্ষু-শর্করার তুল্য মিষ্টতম নহে, উন-মিষ্ট। এই কারণে উন-শর্করা নাম দেওয়া গেল। মধুতে উন-শর্করা আছে। এমন কি, মধুর শতকে (in 100 parts) উন-শর্করা ৭৫ ভাগ (parts)। তদ্ভিন্ন জল ১৮ ভাগ। অবশিষ্ট অন্য অন্য বস্তু থাকে। তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ ইক্ষু-শর্করা (প্রায় ৪ ভাগ) থাকে। মধুতে উন-শর্করার আধিক্যহেতু মধুর ধর্ম (nature, character) লক্ষ্য করিলে উন-শর্করার ধর্ম কতকটা জানিতে পারা যায়। ইক্ষু-শর্করা শুষ্ক রাখিতে পারা যায়, জল পাইলেই, কিংবা বর্ষাকালের ভিজা বাতাসে থাকিলেও, সহজে গাঁজিয়া উঠে না। মধু সাবধানে না রাখিলে গাঁজিয়া উঠে, মাদক হয়, অম্লও হয়। জল মিশাইলে ত কথাই নাই। চূন, সাজি,

* 'উপাধি' ও 'উপাধান' শব্দের অর্থ একই। প্রয়োগ-প্রভেদহেতু 'উপাধান' শব্দ আবশ্যক হইল। আভ্যন্তর লক্ষণের এইরূপ একটা শব্দ আবশ্যক হইলে 'পরাধান' বলা যাইতে পারে। উপ—আসন্নে, পুরা—প্রাধান্যে

* সংস্কৃতে 'মল' বাঙ্গালাতে 'মলা' শব্দে ঘন দ্রব্য বুঝায়। প্রথমে দ্রব হইলেও পরে সেটা ঘন আকারে পৃথক্ হয়। মল অর্থে দ্রব মলও বুঝিতে হইবে। ঘর্ম ও মূত্র দেহের মল বটে।

সোডা (soda) প্রভৃতি ক্ষার (alkali) যোগে ফুটাইলে ইক্ষু-শর্করা বর্ণান্তর হয় না, মধু কৃষ্ণবর্ণ হয়।

জীবিতের দেহ যে যে উপাদানে নির্মিত, তাহা জৈব (organic) বস্তু। আখ গাছে বহুবিধ জৈব বস্তু আছে। উহার রসে ইক্ষু-শর্করা ও ঊন-শর্করা আছে। দুই-ই জৈব। এই দুই ছাড়া অন্য বহু জৈব (organic substance) আছে। কেবল জৈব নহে, পার্থিব (mineral) বস্তুও আছে। গুড় দগ্ধ করিলে যে ভস্ম অবশিষ্ট থাকে, তাহা মাটির মতন দ্রব্য, পার্থিব দ্রব্য। বস্তুতঃ মাটি হইতে জলের সহিত গাছে শোষিত হয়।

আখের রসে ঊন-শর্করা অত্যল্প, এবং ইক্ষু-শর্করা অধিক থাকে। কিন্তু জলযুক্ত ইক্ষু-শর্করা স্থায়ী নহে। অণুজীব বিশেষের ক্রিয়ায়, অম্লযোগে, নানা জৈববস্তুর ও ভস্মের যোগে, ইক্ষু-শর্করা ঊন-শর্করায় পরিণত হয়। এমন কি, জল দিয়া ইক্ষু-শর্করা কিছুক্ষণ ফুটাইলে ঊন-শর্করা জন্মে। তখন কৃত্রিম মধু হয়, এবং প্রবঞ্চক মধু-ব্যাপারী অকৃত্রিম মধুর সহিত মিশাইয়া মধু নামে বিক্রয় করে।

এখন গুড়, চীনি প্রভৃতির জ্ঞাতব্য উপাদান বোঝা সহজ হইবে। আমরা প্রথমে মিষ্ট বস্তু, ইক্ষু-শর্করা ও ঊন-শর্করা চাই; অন্য জৈব কিংবা পার্থিব চাই না। অতএব শেষোক্ত দুইই মল (impurities) বলা যাইতে পারে। যখন জল না চাই, তখন জলও মলের মধ্যে গণ্য হয়। যখন কেবল ইক্ষু-শর্করা চাই (যেমন বি-মল শুক্ল চীনি), তখন ঊন-শর্করা মল হইয়া দাঁড়ায়। কে কি চায়, কার কি প্রয়োজন, তাহা বুঝিয়া একই দ্রব্য কখন মল গণ্য হয়, কখনও হয় না। কিন্তু মল দূষ্য; গুড়ের 'অন্য জৈব' ও 'পার্থিব' দূষ্য হইতে পারে, কিন্তু জলকে দূষ্য বলিতে পারা যায় না। তিল পিষিলে তেল ও খইল পাওয়া যায়। তেলের কাইট, মল; কিন্তু সে মল খইলে থাকিলে দূষ্য হয় না। অতএব যখন দূষ্যতা লক্ষ্য না হয়, তখন মল না বলিয়া 'খন্দ' (foreign matter) বলা যায়।

ঝোলা গুড়ের নামেই প্রকাশ যে উহাতে জল অধিক থাকে। কত থাকিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে অত্যন্ত জলুয়া হইলে গুড় নাম পায় না; রস (juice) নামেই বলিতে হয়। নূতন গুড় উঠিবার সময় ঝোলা গুড় হয়; লোকে অবিলম্বে খাইয়া ফেলে, সমল নির্মল প্রায়ই বিচার করিতে হয় না। কিন্তু উত্তম ঝোলা মধু-বর্ণ, মধু-গাঢ়, মধুর ও সুরভি। ইহাতে ভাগ এইরূপ থাকে,—

	ইক্ষু-শর্করা	...	৭০—৮০
(১)	ঊন-শর্করা	...	৫—৭
	অন্য জৈব	...	১—৩
	ভস্ম (পার্থিব)	...	১—২
	জল	...	অবশিষ্ট
			১০০

এমন ঝোলাও হয়, যাহাতে ইক্ষু-শর্করা আরও অল্প, ঊন-শর্করাদি ও জল অধিক। খেজুর-রসের 'পয়ড়া' ঝোলা গুড়-বিশেষ। পয়ঃ—জল হেতু 'পয়ড়া' নাম।* কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ পয়ড়া কেবল বহু-জল নহে, বহু-মলও বটে। গুড়ের মাতে ইক্ষু-শর্করা থাকে, কিন্তু সে শর্করা পৃথক করা কঠিন। ঊন-শর্করাদির আধিক্য হেতু ইক্ষু-শর্করা অ-কেলাস্য হইয়া পড়ে। পুনর্বার পাক করিয়া গাদ কাটাইয়া খাদ্যের যোগ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু রাখা চলে না। শোঠেও ইক্ষু-শর্করা থাকে, কিন্তু ঊন-শর্করা ও মল আরও অধিক। শোঠ ফুটাইয়া তামুক-মাখা 'চিটা' করা হয়। তা ছাড়া, আগ-শালে গুড় করিবার সময় যে গাদ জমে, তাহাতেও 'চিটা' হয়। চিটাতে ইক্ষু-শর্করা ও ঊন-শর্করা ভাগে প্রায় সমান সমান দাঁড়ায়। তামুক করিবার পক্ষে চিটাই উত্তম। কারণ উহার সমল ঊন-শর্করা তামুককে শীঘ্র সঙ্কিত করে।

এখন এক এক প্রকার গুড়ের উপাদান-ভাগ দেখাইতেছি। বলা বাহুল্য এক এক প্রকারের বহু ভেদ হয় না, ভাগে অল্প-স্বল্প ঊনাধিক হয়। বঙ্গের এক এক স্থানে উত্তম গুড় হয়। সে গুড় আনাইতে পারি নাই। কটকের সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রের নূতন গুড় দেখিয়াছি। ইহা খড়-বর্ণ বালিয়া গুড়, 'মুঙ্গা' আখের গুড়। ভাগ এই,—

* তুলনা কর, ওড়িয়া পইড়ু। ঢাবকে পইড় বলে। পয়ঃ+ড়= পয়ড়—পইড়ু।

(২)	ইক্ষু-শর্করা ...	৭৬·৩
	উন-শর্করা ...	৭·২
	অন্য জৈব ...	১·২
	ভস্ম (পার্থিব) ...	১·৮
	জল ...	১৩·০
		১০০·০

কটকে যে গুড় হয়, তাহা প্রায়ই কাল। পাকের দোষে গুড়ের দোষ। কিন্তু ভাল নূতন গুড়ে

(৩)	ইক্ষু-শর্করা ...	৬৫·৩
	উন-শর্করা ...	১৩·৯
	অন্য জৈব ...	১·৪
	ভস্ম ...	০·৪
	জল ...	১৯·০
		১০০·০

পাইয়াছি। উন-শর্করা ও জলের ভাগ বেশী, কিন্তু কেলাস বড় বড়। যশোরের খেজুরা গুড়ও এইরূপ কাল। সব গুড় অবশ্য সমান নহে। এমন কি, এক কলশীর সব স্থানের গুড়ও এক নহে। তথাপি ভাগের একটা স্থূল আভাস পাওয়া যায়। যশোরের খেজুরা গুড়ের পাটালী কৃষ্ণরক্তবর্ণ, শুষ্ক, কিন্তু কু-কেলাসী (minutely crystalline)। একটাতে পাইয়াছি

(৪)	ইক্ষু-শর্করা ...	৮৪·০
	উন-শর্করা ...	৯·২

উত্তম খাঁড়-গুড়ের মাৎ ঝরাইয়া ফেলিলে যে সার থাকে, তাহা ওড়িষ্যায় 'কন্দ' নামে খ্যাত। ইহার ভাগ প্রায় এই,---

(৫)	ইক্ষু-শর্করা ...	৮৮·৪
	উন-শর্করা ...	৯·৫
	অন্য জৈব ...	০·১
	ভস্ম ...	০·৮
	জল ...	১·২
		১০০·০

উন-শর্করার ভাগ অত্যল্প হইলে কন্দকে মিছরী বলা চলিত। এক এক কন্দে 'অন্য জৈব' প্রায় থাকে না, কিন্তু সকলেই ভস্ম অধিক। যে গুড় হইতে কন্দ হয়, সে গুড় নির্মল নহে বলিয়া কন্দও নির্মল হয় না। কয়েক বৎসর হইতে বিদেশী চীনির সহিত গুড় কিছু মিশাইয়া প্রবঞ্চকেরা কন্দ করিতেছে। লোকে তাহা পবিত্র বলিয়া নির্বিচারে খাইতেছে, দেবদেবীর নিকট নিবেদন করিতেছে। বঙ্গদেশের ভাল খাঁড় মিছরীর তুল্য। যশোরের খেজুরা খাঁড় কৃষ্ণপিঙ্গল, কিন্তু কেলাস বড় বড় ও উজ্জ্বল। ইহাতে পাইয়াছি

(৬)	ইক্ষু-শর্করা প্রায় ...	৯৭·
	উন-শর্করা ...	২·৪

এখন ভিঁড়া দেখা যাউক। হুগলী জেলা হইতে ভিঁড়া আনাইয়াছিলাম। গয়া ও গঞ্জাম জেলা হইতে কটকে ভেলী আসে। তিন একই; খড়-বর্ণ, গুড়-গন্ধ, শুষ্ক পিণ্ড, 'প্রস্থ' (plastic); উদ-গ্রাহী (hygroscopic), কাজেই ভিজা ভিজা দেখায়। হুগলীর ভিঁড়া পরিষ্কৃত। ইহাতে শুধু চোখে কেলাস দেখিতে পাই নাই। অনুবীক্ষণেও কয়েকটা মাত্র দেখিতে পাইয়াছি। ইহাতে

(৭)	ইক্ষু-শর্করা ...	৭৮·
	উন-শর্করা ...	১৬·
	অন্য জৈব ...	০·৮
	ভস্ম ...	১·৮
	জল ...	৩·৪
		১০০·০

কলিকাতা হইতে উত্তম নূতন ভেলী আনাইয়াছি। ইহা পশ্চিম (শ্রীতারামপুর?) হইতে আসে, ভাল গুড়ের চেয়ে দরে বিক্রী হয়। কু-কেলাসী কিন্তু বহু-কেলাসী। ইহাতে ছিল,

(৮)	ইক্ষু-শর্করা ...	৭৯·০
	উন-শর্করা ...	১১·৪

গয়ার ভেলী অপরিষ্কৃত। কুটা, আখের খোআ ও বালি ছিল। ভাগে

	ইক্ষু-শর্করা	...	৬৫·০
(৯)	উন-শর্করা	...	২৪·০
	অন্য জৈব	...	১·০
	ভস্ম	...	২·২
	বালি	...	০·৪
	জল	...	৭·৫
			১০০·০

আর একটা ভেলীতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেলাস ছিল। ইহাতে

(১০)	ইক্ষু-শর্করা	...	৮৩·৮
	উন-শর্করা	...	২২·২

গঞ্জাম জেলার ভেলী গয়ার তুল্য। ইহাতে

	ইক্ষু-শর্করা	...	৬২·০
(১১)	উন-শর্করা	...	১৮·০

অতএব দেখা যাইতেছে, সামান্য ভিঁড়া ও ভেলীতে উন-শর্করার ভাগ অধিক, গুড়ের দ্বিগুণ ত্রিগুণ বলা যাইতে পারে। বহুক্ষণ ধরিয়া খর পাক হয়, এবং গাদ কাটানা হয় না বলিয়া উন-শর্করার ভাগ বৃদ্ধি হয়। ইহার আধিক্য-হেতু ভিঁড়া ও ভেলী ভিজা বাতাসে ভিজা-ভিজা হয়। ভেলীর রস নির্মল না করাতে ভস্মের ভাগ বাড়িয়া থাকিবে। ইক্ষু-শর্করা প্রায়ই অ-কেলাসিত। কিন্তু তাহাকে কেলাসিত করিতে পারি নাই।

কটকের বাজারে দলুয়া পাই নাই। এই হেতু নিজে কিছু করিয়া লইয়াছিলাম। (১২) ইহাতে ৯৭ ভাগ ইক্ষু-শর্করা, এবং ১ ভাগ উন-শর্করা ছিল।

মিছরী ও চীনি বাজারে পাওয়া যায়। মান্দ্রাজের তালের মিছরী পিঙ্গল বর্ণ। রাঢ়দেশের গুড়ের মিছরী গুড়বর্ণ। বিদেশী মিছরী শাদা। ইহাদের সহিত কাশীর পাণ্ডুবর্ণ চীনি, এবং বিদেশী শাদা চীনি (বোধ হয় জাবা দ্বীপের) তুলনা করা গিয়াছিল। (১৩) দেশী মিছরীতে উন-শর্করা ০·৫—০·৬, কাশীর চীনিতে ০·৩—০·৫। ভস্ম প্রায় ০·২ জল ০·৫—১·০। অবশিষ্ট প্রায় ৯৯ ভাগ ইক্ষু-শর্করা। শাদা চীনি ও মিছরীতে উন-শর্করা প্রায় নাই, ইক্ষু-শর্করা প্রায় ৯৯·৫ ভাগ। বস্তুতঃ ভাল খাঁড় নইলে দলুয়া, ভুরা, মিছরী হয় না। খাঁড়ে যে ইক্ষু-শর্করা থাকে, তাহারই অধিকাংশ চীনি ও মিছরী হয়। এ কথা পরে হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

কষ্টিপাথর

স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা।

অবরুদ্ধ অবস্থার দুর্গতি।

যে-সমস্ত গুরুতর কারণ-পরম্পরায় ভুবনবিজয়ী মহাপরাক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিশারদ সৌভাগ্যশালী মুসলমান জাতির আজ এই নিদারুণ ও দুঃসহ শোচনীয় দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত করিয়া, অতি সংকীর্ণ গৃহকোণে আবদ্ধ করিয়া রাখা,—তাহার অন্যতম প্রধান কারণ।

পৃথিবীতে মানুষের স্বাধীনতা হরণের ন্যায় পাপ-কার্য্য আর কিছুই নাই। যেরূপ পরাধীনতা মানুষকে নির্ব্বোধ এবং অজ্ঞ করিয়া রাখে, যে পরাধীনতা পরম করুণাময় খোদাওন্দতাআলা-প্রদত্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে জ্ঞান ও শিক্ষার অমৃতরসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে, সেরূপ পরাধীনতা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়। আততায়ী ব্যতীত কাহাকেও বধ করা যদি ভীষণ পাপ হয়, তাহা হইলে অকারণে নারী-জাতিকে সদাসর্ব্বদা অন্তঃপুরে বদ্ধ রাখা কিরূপ ভীষণ ও ভয়াবহ পাপ, তাহা একবার চিন্তা করিলেও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে! যে দেশের ও যে জাতির লোক,—কল্যাণ ও মঙ্গলের উৎস এবং প্রীতির ও সালসাবিলের অমৃত-প্রবাহ স্বরূপ,—মাতৃজাতিকে অন্ধ-অন্তঃপুরের দূষিত বায়ুতে আবদ্ধ করিয়া রাখা গৌরব ও ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করে, সভ্যতা এবং মনুষ্যত্ব হইতে তাহারা যে এখনও বহুদূরে পতিত রহিয়াছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর এই বিষয়ে আমরা এমন অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এবং কোরআন-ও-হাদিসজ্ঞ আলেমগণও এই অতি জঘন্য—অতি বীভৎস এবং জাতীয় জীবনের ভীষণ মহামারী-সূচক অবরোধ-প্রথাকে শিথিল করিবার জন্য একটি বাক্য উচ্চারণ করিতেও কুণ্ঠিত ও ভীত! এই অস্বাস্থ্যকর পাপপ্রথা কেমন করিয়া আমাদের সমাজ-দেহকে পচাইয়া তুলিতেছে এবং স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার পথে কিরূপ নিদারুণ কণ্টকারোপণ করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে!

আমাদের সমাজে এই মারাত্মক প্রথা আবার ভদ্রতার একটি প্রধান লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছে! অনেক স্থলে ৭।৮ বৎসরের বালিকা-দিগকে পর্য্যন্ত ঘরের বাহির হইতে দেওয়া হয় না। যে শিশু দেখিলে পাপাত্মার মনেও স্বর্গের নিরাবিল আনন্দ এবং প্রীতির ধারা প্রবাহিত হয়, হায়! তাহাদিগকে পর্য্যন্ত বাহিরের মুক্ত বায়ু হইতে বঞ্চিত করা হয়!

অবরোধ-প্রথার দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের যে-সমস্ত গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে আমরা ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করিতেছি।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ক্ষতি।

বিশুদ্ধ বায়ু জীবন ধারণের পক্ষে যেরূপ হিতকর ও স্বাস্থ্যজনক, এরূপ আর কিছুই নহে। আমাদের মহিলাবৃন্দ এই বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার জন্য কখনও সুবিধা পান কি? তাঁহারা যদি কখনও পাল্কী বা যানে কোনও স্থানে গমন করেন, তাহা হইলে তাহার উপরে এমন করিয়া পর্দ্দা আঁটিয়া দেওয়া হয় যে, বায়ু পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না! এই বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং ভ্রমণ জনিত শারীরিক অঙ্গ-সঞ্চালনের অভাবে, আমাদের মহিলারা দিন দিন দুর্ব্বল ক্ষীণ এবং শ্রীশূন্য হইয়া উঠিতেছেন! দুই একটি সন্তান প্রসবের পরেই তাঁহারা রুগ্না এবং বৃদ্ধা হইয়া পড়েন! আর এইরূপ দুর্ব্বল ও শক্তিহীনা মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণের দরুণ সমাজে দুর্ব্বল ক্ষীণাঙ্গ হীনসাহস কাপুরুষ ও শ্রীহীন লোকেরই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে!

দরিদ্রতা, খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য, স্ফূর্ত্তিহীনতা, নির্ম্মল আমোদ-প্রমোদের অভাব, ব্যায়াম চর্চ্চার অভাব ও সামরিক পরিচর্য্যা-হীনতা এবং চিত্তের কুটিলতার জন্য আমাদের স্বাস্থ্যনাশ এবং পরমায়ু হ্রাস হইতেছে; তাহার উপর মাতৃজাতি পুরুষাপেক্ষা অত্যধিক দুর্ব্বল হওয়াতে সন্তানগণ আরও স্বাস্থ্যহীন এবং দুর্ব্বল হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে! শারীরিক সুস্থতা এবং দীর্ঘ জীবন লাভ ব্যতীত কোনও জাতি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে না।

করুণাময় আল্লাহতাআলা মানুষকে শতবর্ষজীবী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কদর্য্য আহার এবং কদর্য্য বাসস্থান, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, ব্যভিচার, দুর্ব্বল স্ত্রী গ্রহণ, দুর্ব্বল স্বামী গ্রহণ, ব্যায়াম চর্চ্চার অভাব, মাদকসেবন, ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, প্রভৃতি নানা কারণে আমরা নিতান্তই স্বল্পজীবী হইয়া পড়িতেছি। স্ত্রীজাতির অবরোধ-প্রথা, এই স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষার ভীষণ প্রতিকূল, সুতরাং সাক্ষাৎ ঈশ্বরদ্রোহিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং যাঁহারা যথার্থ মোসলমান বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন, তাঁহারা এই অনিষ্টকর অবরোধপ্রথা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। প্রত্যেক সহরে এবং পল্লীতে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য স্ত্রীলোকদিগের সুবিধাজনক উদ্যান, প্রান্তর বা পার্ক স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। স্ত্রীলোকেরা সেখানে একত্র হইয়া দেশের জাতির সমাজের এবং ধর্ম্মের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য সভাসমিতি এবং আন্দোলন আলোচনা অনায়াসে করিতে পারিবেন।

শিক্ষা-সম্বন্ধে ক্ষতি।

অধুনা বাংলাদেশের নানাস্থানে কয়েকশত নিম্নশিক্ষার বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মুসলমান বালিকাদের জন্য একটি করিয়া মাইনর স্কুলও এক-একটি জেলায় স্থাপিত হয় নাই। আমাদের গোঁড়া ও মূর্খদলের লোকেরা ত এখনও মেয়েদিগের লেখা-পড়া শিক্ষার নামে ভয়ে কম্পিত। ইহারা ৭।৮ বর্ষ বয়স্ক মেয়েদিগকেও ঘরের বাহিরে যাইতে দিতে নারাজ। ইহারা এমনি কুসংস্কারান্ধ যে, ৭।৮ বৎসরের শিশুদিগের প্রতি কিম্বা তাহাদের দর্শকদিগের প্রতি অতি জঘন্যভাব পোষণ করে। যাঁহারা কন্যাদিগকে নিম্নপাঠশালায় প্রেরণ করেন, তাঁহারাও এমন অদূরদর্শী যে, মেয়েরা ভালরূপে কিছু লেখাপড়া শিক্ষা না করিতেই যেই ৮।৯ বৎসর বয়স হয়, অমনি পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করেন। এজন্য আমাদের সমাজে কন্যাদিগের উচ্চ শিক্ষার পথ একেবারেই রুদ্ধ। অনেক পণ্ডিত-মূর্খ তর্ক করিয়া বলেন যে স্ত্রীলোকদিগের জন্য অন্তঃপুরে উচ্চশিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। কিন্তু এদেশে এমন কয়টি লোক আছেন যে, যিনি নিজের বাড়ীতে ৩।৪ জন মাষ্টার বা প্রফেসার রাখিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে নিজেরা আগে বাটীতে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত ও তাহ সুফল প্রদর্শন করেন। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা স্ত্রীজাতি শিক্ষার বিরোধী। বহু বালিকা একত্র অধ্যয়ন না করিলে, পরস্প প্রতিযোগিতা চলিবে কিরূপে? প্রতিযোগিতা না থাকিলে কোন কার্য্যে উৎসাহ এবং অনুরাগ থাকে কি?

অভিজ্ঞতার ক্ষতি।

বাহিরে না গেলে, মানুষের অভিজ্ঞতা কি গৃহকোণেই জন্মিবে প্রকৃতির মহাগ্রন্থ যে পাঠ করে নাই, প্রকৃতির ভিতরে যে-ব্যা আল্লাহকে দর্শন করে নাই, প্রকৃতির মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লার কারিগিরি মহিমা ও কুদরত দেখিল না, বুঝিল না, সে যে কিরূপে খোদাভক্ত খোদাপ্রেমিক হইতে পারে তাহা বুদ্ধির অগম্য! খোদাকে দেখ খোদাকে জানা, ইহার অর্থই হইতেছে, তাঁহার বিশাল সৃষ্টির বৈচিত্র নৈপুণ্য, হেকমত, নিয়ম ও কার্য্য পরিদর্শন এবং উপলব্ধি করা। এ জন্যই মহাপয়গম্বর বলিয়াছেন যে, "এক মুহূর্ত্তের বিজ্ঞানচিন্তা, স হাজার বৎসরের উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" অন্যত্র বলিয়াছে "তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের নিদ্রা, মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" ফল পৃথিবীতে মূর্খতা অপেক্ষা পাপ নাই এবং জ্ঞান অপেক্ষা পুণ্য নাই এই জ্ঞান আমরা এই প্রত্যক্ষীভূত জগৎ হইতেই লাভ করি। আম এই জগৎসংসারের প্রাকৃতিক এবং মানসিক সর্ব্বপ্রকার দৃশ্য হইতে বৈচিত্র্য হইতে, কার্য্য হইতে নারীজাতিকে বঞ্চিত করিয়া সর্ব্বদা গৃ কোণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি; ইহার ফলে তাঁহারা যারপরন অনভিজ্ঞ এবং মূর্খ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্ত আলোক-এব বায়ুবিহীন অন্ধকার গর্ত্তের ন্যায়ই সঙ্কীর্ণ এবং ভয়াবহ! হায়! জাতির নারীগণ এইরূপ শিক্ষাহীন স্বাধীনতাহীন মূর্খ এবং অনভিজ্ঞ সে জাতির দুরবস্থায় নিবারণ করে কাহার সাধ্য? এই নিদারুণ অনি কর পাপ অবরোধপ্রথা দূর না করিলে উচ্চশিক্ষার কোনও আ ভরসা নাই। আর উচ্চশিক্ষা না হইলে বুদ্ধি মার্জ্জিত এবং জ্ঞানে বিকাশ কিছুই হয় না। যেখানে জ্ঞান নাই—সেখানে ধর্ম্ম নাই যতদিন পর্য্যন্ত আমরা স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে গমনাগমনের—বিশেষত স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মক্তবে এবং শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের অনুকূ স্থানগুলিতে যাইবার জন্য তাহাদিগকে স্বাধীনতা না দিতেছি এ প্রবৃত্ত না করিতেছি, ততদিন আমাদের আর কল্যাণ নাই। জাতির নারীগণ স্বাস্থ্য হইতে, জ্ঞান হইতে, অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত সে জাতির সন্তানগণ যে পৃথিবীতে অতি নগণ্য অপদার্থ এবং অকর্ম্মণ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পৃথিবীর কোনও মুসলমান দেশে কোনও কালে এই অবরো প্রথা প্রচলিত ছিল না এবং এখনও নাই।

এস্‌লাম স্ত্রীলোকদিগের অবরোধের বিরোধী ও স্বাধীনত পক্ষপাতী। স্ত্রীলোকেরা কার্য্যের জন্য শিক্ষার জন্য প্রয়োজনের জ হাত পা এবং মুখ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ ঢাকিয়া সর্ব্বত্রই গমন গমন করিতে পারেন। হজরতের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরবের স্ত্রীলোক গণের পরিচ্ছদের বিশেষ পারিপাট্য ছিল না। আমাদের দেশী হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তাহারা 'বেআবরু' অবস্থায় বাহির হইত মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন। তিনি মুসলমান স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে যাইবার সময় একখানি চাদরে দ্বারা শরীর উত্তমরূপে ঢাকিয়া যাইতে আদেশ করেন। ইহারই ন পর্দ্দা। কালে এই পর্দ্দা হইতে আব্বাস-বংশীয় খলিফাদের সম স্ত্রীলোকদিগের বাহিরে যাইবার জন্য বোর্কার সৃষ্টি হয়।

(আল্‌-এসলাম, মাঘ) সিরাজী।

বঙ্গে কৃষির সামগ্রী

(মৃত্যগোপাল প্রবাসী-পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধাংশ)

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, এবং ভারতের অঙ্গ, বঙ্গও তাহাই। এই যে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড, ইহার অধিবাসীগণ বাণিজ্যব্যবসা কিরূপে হয় জানে না, শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চ্চাও বড় করে না, কিম্বা শিল্পবাণিজ্যময় বৃহৎ নগরে বাস করে না। ইহার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে এবং তদুপযোগী ছোট-ছোট গ্রামে বাস করে। বাঙ্গলার ৮৪,০৯২ বর্গমাইল বিস্তৃত (তন্মধ্যে করদ-রাজ্য ৫,৩৯৩ বর্গমাইল) ভূমিখণ্ডে প্রধানতঃ চাষ হইয়া থাকে এবং যাহারা ঐ কার্য্য করে তাহাদিগকে চাষা বা চাষী বলে। অনেকেই জানেন যে ভারতের এই চাষী-সম্প্রদায় পৃথিবীর যাবতীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ও অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্র কুটীরময় পল্লীর অধিবাসী ও কষ্ট-সহিষ্ণু জাতি। এই চাষীর চাষের সফলতার দিকে সমস্ত দেশের মুখ উদ্‌গ্রীব হইয়া তাকাইয়া থাকে। তাহারই ফসলের উপর রাজা তাঁহার করের প্রত্যাশা করেন, জমিদার তাহার খাজনার হিসাব করেন, ব্যবসায়ী তাঁহার লাভালাভ গণনা করেন এবং জন-মজুরেরা তাহাদের সচ্ছলতার আশা পোষণ করে।

পাশ্চাত্যদেশ-সমূহের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তথাকার অধিবাসীবর্গ একমাত্র কৃষির উপরই তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য নির্ভর করে না। পাশ্চাত্যে, দেশবিশেষে কৃষিকার্য্যের অল্পবিস্তর প্রচলন আছে বটে, কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্য ও ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের শিল্প লইয়া তথাকার অধিবাসীগণ অর্থ উপায়ের চেষ্টা করে। যদি একবৎসর কোন কারণে অজন্মা হয়,—দেশের লোকেরা অনশনে মৃত্যুমুখে কখনও পতিত হয় না, তাহাদের সঞ্চিত অথবা অন্য উপায়ে অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা খাদ্যদ্রব্য অন্য দেশ হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া থাকে ; দেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইলেও অর্থের তত অভাব থাকে না। কিন্তু ভারতবর্ষে একবৎসর অজন্মা হইলেই খাদ্যদ্রব্য এবং অর্থ উভয়েরই এককালীন অভাব হইয়া পড়ে। শস্যই আমাদের খাদ্য, শস্যই আমাদের অর্থাগমের প্রধান সামগ্রী।

অতএব দেখা যাইতেছে যখন আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান, এবং কৃষির উপরই আমাদের সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি নির্ভর করিতেছে, তখন কি উপায়ে আমাদের কৃষির উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে, এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতি স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও চাষের এবং চাষীর পক্ষে সফলতার একপ্রকার নিশ্চয়তা আনয়ন করা যাইতে পারে তাহা বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গলার মাটি।

সমস্ত ভারতবর্ষের চাষোপযোগী মাটি মোটামুটি তিন প্রকারের বলা যাইতে পারে।

(১) Alluvial tracts—পলিমাটি, (২) Crystalline tracts—দানাদার মাটি, (৩) Trap soil। এই তৃতীয় প্রকারের মাটি বাঙ্গলার কোথাও দেখা যায় না বলিয়া উহার কোন পরিচয় এখানে দিবার আবশ্যক নাই।

পলিমাটি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উভয় পার্শ্বে সাগর পর্য্যন্ত এবং নদীর মোহানার নিকটস্থ অথবা সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহে কোথাও অল্প, কোথাও বা অধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। পলিমাটিই বাঙ্গলার মাটির প্রধান অংশ, সাধারণ বেলে এবং এঁটেল মাটি পলিমাটির অন্তর্ভূত। বাঙ্গলার পলিমাটি ভারতের অন্য স্থানের পলিমাটি অপেক্ষা ঘনসন্নিবিষ্ট এবং লঘুবর্ণ, ইহাতে বরং একটু বালির ভাগ আছে, কিন্তু কাঁকরের ভাগ মোটে নাই। মাটি খুঁড়িলে সাধারণতঃ উপর্য্যুপরি বালি কাদা ও পাঁকের স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। পলিমাটি অল্প খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায় এবং অতি সহজে খোঁড়া যায়। সেইজন্য এইরূপ মাটিতে জল নিষ্কাশন এবং জলপ্লাবন উভয় কার্য্যই অতি সহজে এবং অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে পারে। পলিমাটিতে নাইট্রোজেন এবং জৈব organic পদার্থের অভাব, পটাশ ও ফস্ফরিক এসিডের পরিমাণ চলনসই, চুন এবং ম্যাগ্নেসিয়া যথেষ্ট এবং লৌহ ও এলুমিনিয়ামের অংশ বেশ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে।

Crystalline Soil অথবা দানাদার মৃত্তিকা বাঙ্গলার পার্ব্বত্যপ্রদেশেই সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।—উড়িষ্যা ও সাঁওতালপরগণা বাঙ্গলার বাহিরে চলিয়া যাওয়ায়—এখন

কেবলমাত্র প্রধানতঃ বীরভূম জেলায় এই মাটি আছে। এই মাটি জল পাইলেই কর্দ্দমাক্ত হয়, এবং দেখিতে লালচে। মাটির রং যতই গাঢ়, জমি ততই উর্ব্বরা জানিতে হইবে। এই মাটিতেও ফস্ফরিক এসিড নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থের অভাব সত্ত্বেও, উত্তমরূপে জল পাইলে ইহার উর্ব্বরতা পলিমাটি অপেক্ষা কোন অংশে হীন বলিয়া মনে হয় না।'

বাঙ্গলার মাটির সম্বন্ধে যাহা বলা গেল তাহা অত্যন্ত মোটামুটি রকমের। ভিন্ন জেলার মাটির অবস্থা বিশেষরূপে বিভিন্ন। কোথাকার মাটি বেলে, কোথাও বা এঁটেল, কোথাও মাটিতে চুনের ভাগ অধিক, কোথাও বা অল্প, কোথাও লোনা। প্রতি-জেলার Bengal District Gazetteer খুলিলেই এ বিষয়ে কতক সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। উত্তমরূপে চাষ আবাদ করিতে হইলে মাটির অবস্থা পূর্ব্বে জানা বিশেষ আবশ্যক।

উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা অথবা ব্যবহারের অভিপ্রায় অনুযায়ী সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপে জমির নাম দেওয়া হয়। — (১ম) বাস্তু,—সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, বৃক্ষাদি-পরিবেষ্টিত জমি, যেখানে কৃষক তাহার বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। (২য়) উদ্‌বাস্তু,—অথবা বাস্তুর চতুষ্পার্শ্বস্থ সীমানার অন্তর্গত জমি। (৩য়) শুনা,—উৎকৃষ্ট উঁচু জমি, যেখানে উত্তম ধান্য পাট তামাক ইক্ষু প্রভৃতি জন্মায়; এই জমি কৃষকগণ প্রায় পড়িয়া থাকিতে দেয় না। (৪র্থ) শালি,—নীচু জমি, যেখানে অল্প বৃষ্টি হইলেই জল জমে এবং একমাত্র ধান্য ভিন্ন আর কিছু জন্মিবার প্রায় অনুপযুক্ত। শালি জমি প্রায় তিন চারি বৎসর অন্তর একবার করিয়া পতিত রাখা হয়।

বাঙ্গলার ফসল এবং শস্য সংগ্রহের কাল।

সমগ্র বাঙ্গলায় ৫,০৪,৭৯,৯৮৪ একার মোট জমি আছে। তাহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক ভূমিতে অর্থাৎ ২,৫২,-০৮,১০০ একার জমিতে চাষ আবাদ হইয়া থাকে। অবশিষ্টের মধ্যে ৪২,৫৮,১০৬ একার জমি বনভূমি; ৪৫,৭১,৩৭৩ একার ভূমি বর্ত্তমানে পতিত ও ১,১২,-২৭,৩৪১ একার ভূমি চাষের অনুপযোগী, অবশিষ্ট ৫২,১৫,০৬৪ একার পতিত অথচ চাষোপযোগী ভূমি। সুতরাং বাঙ্গলার বাস্তবিক কৃষিব্যবহার্য্য ভূমি ২,৫২,০৮,-১০০ একার। সম্বৎসরের মধ্যে এই ২,৫২,০৮,১০০ একার ভূমি একবার চাষ হইয়া থাকে, এবং ইহার মধ্য হইতে ৪৪,৩১,৫০০ একার জমি একাধিক বার চাষ হইয়া থাকে। অতএব মোট ২,৯৬,৩৯,৬০০ একার ভূমি প্রতি-বৎসর এখন বাঙ্গলায় চাষ হইতেছে।

এই ২,৯৬,৩৯,৬০০ একারের মধ্যে ২,০৪,৪৯,৯০০ একার জমিতে ধান চাষ হইয়া থাকে; অবশিষ্ট ৯১,৮৯,৭০০ একার ভূমিতে গম, যব, বালি, ডাউল, পাট, তুলা, চা, এবং ইক্ষু ইত্যাদি জন্মাইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে সমগ্র বঙ্গদেশের দুই-পঞ্চমাংশ ভূমিতে চাউল জন্মায়, এক-পঞ্চমাংশ ভূমিতে অন্যান্য শস্য ফসলাদি জন্মায়, অবশিষ্ট প্রায় অর্দ্ধেক জমিতে কিছুই জন্মায় না।*

বাঙ্গলার ফসলাদি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথম, হৈমন্তিক বা "খারিফ" শস্য—প্রধানতঃ আমন ধান্য ও পাট; ইহার বপন-কাল সাধারণতঃ আষাঢ় মাস হইতে আরম্ভ হয়, এবং শস্য কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে গৃহজাত হয়। দ্বিতীয়, রবিশস্য—গম, যব, ইত্যাদি; ইহার বপন-কার্য্য পৌষ-মাঘ মাসে আরম্ভ হয় এবং চৈত্র মাসে শস্য গৃহজাত হয়।

ধান্য।

বাঙ্গলার শস্যের মধ্যে ধান্যই প্রধান। ধান্য প্রধানতঃ তিন-প্রকার। ১। আমন বা হৈমন্তিক ধান্য—ইহা খুব নীচু জমিতে, যেখানে ২।৩ ফুট জল আটকাইয়া থাকিতে পারে এমত স্থানে, রোপন করা হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে একখণ্ড জমি বার বার লাঙ্গল দিয়া উত্তমরূপে প্রস্তুত হইলে, বৈশাখ মাসে একটু বৃষ্টি পড়িলেই বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। আষাঢ়ের বৃষ্টিতে ক্ষেত্রে জল জমিলে, বার বার লাঙ্গল দিয়া ক্ষেত্রকে কর্দ্দমাক্ত করিয়া তুলিতে হয়। ইতিমধ্যে উল্লিখিত বীজগুলি হইতে চারা ধানগাছগুলি প্রায় এক ফুট আন্দাজ হইয়া জন্মায়। সেগুলিকে মাটি হইতে উপ্‌ড়াইয়া, গোছা বাঁধিয়া, জলে উহার মূলের মাটিগুলি

* Agricultural Statistics of Bengal 1914-15, পৃঃ ৬, দ্রষ্টব্য।

ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয় এবং একদিন পরে উক্ত কর্দ্দমাক্ত ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধান্য রোপণ করিবার পদ্ধতি বিভিন্ন।—কোথাও প্রতি গর্ত্তে দুইটি করিয়া, কোথাও বা চারিটি করিয়া, কোথাও ৮ ইঞ্চি, কোথাও বা একফুট অন্তর রোপণ করা হয়। আমন ধান্য বহুপ্রকারের আছে। সুগন্ধি, সুস্বাদু, ক্ষুদ্র, শুভ্র চাউল অধিক মূল্যবান এবং ধনীগণই তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন; লালচে বৃহৎ কর্কশ চাউলগুলি দরিদ্রের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। অনেকের বিশ্বাস সুগন্ধি সুস্বাদু চাউল অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে জন্মে এবং বিলম্বে বর্ষা আরম্ভ হইলে অথবা অল্প বৃষ্টি হইলে ঐরূপ চাউলের আবাদ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সরকারি পরীক্ষাক্ষেত্র-সকলে আজকাল ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বাদশাহ-ভোগ, সমুদ্রবালি, কাটারি-ভোগ প্রভৃতি কয়েক-প্রকার উৎকৃষ্ট সুগন্ধি ধান্য বিলম্ব-বর্ষা এবং অল্প-বৃষ্টি, অন্য সাধারণ প্রকারের ধান্য অপেক্ষা, উত্তমরূপে সহ্য করিতে পারে।*

২। আউশ ধান্য—অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে রোপণ করা হয়। সাধারণতঃ আশুধান্যের উপরই কৃষক ও শ্রমজীবীগণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। এক পশলা বৃষ্টি পড়িলেই জমিতে খুব উত্তমরূপে লাঙ্গল দিয়া, মৃত্তিকা ধুলার মত প্রস্তুত হইলে বৈশাখ মাসে প্রথম বৃষ্টি পড়িলে বীজ বপন বা রোপণ করা হয়। চারাগাছগুলি অর্দ্ধহাত পরিমাণ হইলেই জমিতে মই দিয়া আগাছাগুলি তুলিয়া ফেলা হয় এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ধান কাটিয়া ফেলা হয়। শীতকালে কোথাও কোথাও ডাউল অথবা তিল-সর্ষপাদি তৈল-শস্য, এই জমি হইতেই উঠাইয়া লওয়া হয়। আউশ-বীজ হস্ত দ্বারা ছড়াইয়া অথবা লাঙ্গলে আবদ্ধ একটি যন্ত্রের মধ্য দিয়া বপন করা হয়। অভিজ্ঞগণ শেষোক্ত উপায়টি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; ইহাতে অধিক বীজ নষ্ট হয় না, সমানভাবে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং বীজ আপনি মাটি-চাপা পড়িয়া যায়।

৩। বোরো ধান্য—অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। শীতকালে জলাজমির জল শুকাইলেই, সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ মাসে এই ধান্য বপন করা হয়, এবং বর্ষার পূর্ব্বেই চৈত্র-বৈশাখ মাসে ইহা কাটিয়া ফেলা হয়। আশু ধান্য বপন করিবার পদ্ধতি বোরো বীজ বপনে অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

উল্লিখিত কয়-প্রকার ব্যতীত উড়িধান্য নামে আর-একপ্রকার ধান্য আছে। ঐ ধান্য জলাভূমিতে জন্মায় এবং পাকিলেই ধান্য জলে পড়িয়া যায় বলিয়া ইহা সংগ্রহ করা অতি কষ্টসাধ্য। এই ধান্যের চাউলের ভাতি খুব লাল হয়।

ধান্যই বাঙ্গলার প্রধান শস্য এবং দার্জ্জিলিং ব্যতীত বাঙ্গলার প্রতি জেলায় অতি অধিক পরিমাণে ধান্য জন্মে; ধান্য উৎপন্নের পরিমাণ হিসাবে বাঙ্গলার প্রধান জেলাগুলির বিন্যাস এইরূপ—মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, দিনাজপুর, বর্দ্ধমান, ও ২৪ পরগণা।

ডাউল ও যবাদি।

যবাদি অন্য শস্য, এবং মটর মুগ মসুর খেঁসারি কড়াই ইত্যাদি ডাউল-শস্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে জন্মে। এই-সকল শস্য আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে বপন করিয়া ফাল্গুন মাসে সংগ্রহ করা হয়। বাঙ্গলা দেশে যবাদি শস্য অধিক পরিমাণে আবাদ করিতে দেখা যায় না। মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, মালদহ, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় ডাউল ও যবাদি শস্য অধিক পরিমাণে জন্মায়।*

পাট।

শোনা আছে মহাভারতের দিনেও ভারতবর্ষে পাট চাষের প্রচলন ছিল। স্মরণাতীত কাল হইতে যে বাঙ্গলায় পাট চাষ চলিয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু পাট হইতে শিল্পদ্রব্যাদি নির্ম্মাণ অধিক দিন আরম্ভ হয় নাই। খৃষ্টাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইয়ুরোপীয় ব্যবসায়ীগণ ভারতবর্ষের পাট হইতে ক্যাম্বিশ, দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতেন। ফ্রান্সিস ভ্যালেণ্টাইন নামক একজন ওলন্দাজ লেখক মান্দ্রাজ, পাঞ্জাবের নিকট-বর্ত্তী স্থানে, এবং উড়িষ্যায় ঐরূপ কারখানার উল্লেখ করিয়াছেন। ওড়িয়াগণ পাটকে "ঝট", সংস্কৃতে "ঝাট", বলেন। সকলে অনুমান করেন যে ঐরূপ শব্দ হইতে ইংরাজি "জুট" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে পাট হইতে রজ্জু, বস্ত্রাদি এবং কাগজ প্রস্তুত হইত। রজ্জুর মধ্যে খুব

* Annual Report of the Expert Officers of the Department of Agriculture, Bengal, June 1915, দ্রষ্টব্য।

সরু দড়ি হইতে বৃহৎ কাছি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইত এবং বস্ত্রের মধ্যে চট, নৌকার পাল, পরিধেয় মোটা বস্ত্র ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে, পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি ব্যক্তি তাহার অবসরে পাট হইতে চরকার দ্বারা সূতা কাটিত, এবং সেই সূতা হইতে দড়ি বা কাপড় তৈয়ার হইত। সমগ্র পৃথিবীর বাজারে ভারত হইতে আমদানি চিনি, চাউল, বীজ ইত্যাদি সকল দ্রব্য বাঙ্গলায় নির্ম্মিত চটে মুড়িয়া যাইত। ডাঃ রয়েল (Dr. Royle)-লিখিত Fibrous Plants in India নামক গ্রন্থে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় চট প্রস্তুত করিবার একটি সুন্দর বিবরণ আছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার পাট চাষের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশনের বিবরণী হইতে দেখা যায় যে সে সময়ে রজ্জু-বস্ত্র-নির্ম্মাণকারী বাঙ্গালীগণ ঢাকা জেলায় ৯০ হাজার, রংপুরে ৫০ হাজার মুর্শিদাবাদে ৩৮ হাজার, মালদহে ২৫ হাজার, ময়মনসিংহে ১২ হাজার ও হুগলিতে ১২০ হাজার মণ পাট লইয়া কারবার করিত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাঙ্গলায় কলের তাঁত, স্থাপিত হইতে লাগিল এবং তখন হইতেই বাঙ্গলার গৃহশিল্প ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছে। ১৮৭২ সালে বাঙ্গলায় ৯,২৫,৮৯৯ একার জমিতে পাট চাষ হইত, ১৯১৫ সালে ২৮,৭২,৬০০ একার জমিতে পাট জন্মিয়াছে। গত ৪০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলায় পাট চাষ কিরূপ বাড়িয়াছে তাহা ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। প্রতি একার জমিতে প্রায় ১৬ মণ পাট সাধারণতঃ জন্মে এবং প্রতি মণ পাটের দাম ৮৲ হইতে ১০৲ টাকা। আজকাল দেখা যায় বাঙ্গলার ডাঙ্গা জমি মাত্রেই লোকে যতদূর সম্ভব আউস ধান্য না বপন করিয়া পাটগাছ রোপণ করিতেছে। পাট চাষের সময় আউস ধান্যেরই মত। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে পাট কাটিয়া গোছা বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া পচিতে দেওয়া হয়। ১৫।২০ দিনের মধ্যে বেশ পচিয়া উঠিলে, পাটের ছালের হড়হড়ে পদার্থটা আছড়াইয়া কিম্বা ধুইয়া দূর করিয়া ফেলা হয়। পাটের ছাল যত মসৃণ, সবুজ, পাতলা হইবে পাট ততই উৎকৃষ্ট হইবে। গঙ্গার দক্ষিণ অপেক্ষা উত্তরেই ভাল পাট জন্মিয়া থাকে। ১৩১৬ সালের নবম ভাগ প্রবাসীতে বাঙ্গলায় পাট চাষ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত বিশেষ তথ্যপূর্ণ যে এক সারি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা বই হইয়াছে, প্রতি কৃষি-অনুরাগী ব্যক্তির পাঠ্য।

ইক্ষু এবং খেজুর।

বর্দ্ধমান, রাজসাহী, বাঁকুড়া, বগুড়া, ঢাকা, যশোহর ও হুগলি জেলায় অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ইক্ষু জন্মে। ইক্ষু চাষ কিঞ্চিৎ কষ্ট-ও-ব্যয়সাধ্য, সময়-সাপেক্ষ ও জমির উর্ব্বরতানাশক। সেই জন্য ইক্ষুচাষের পরবর্ত্তী বর্ষায় সেই জমিতে ধান কিংবা পাট এবং শীতকালে আলু অথবা ডাউল উৎপন্ন করা হয়। পৌষ-মাঘ মাসে ইক্ষু রোপণ করিয়া প্রায় একবৎসর কাল পরে গাছ কাটা হয়। ইক্ষু অনেক-প্রকারের আছে। অধুনা সরকারি কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ইক্ষুবীজ আনাইয়া চাষ করা হইতেছে এবং পরীক্ষালব্ধ ফল কৃষকগণকে জানাইয়া কোন্ জাতির রস তরল, কোন্ জাতির রস গাঢ়, কোন্ জাতিকে সহজে বন্যপশু খাইতে পারে না এবং কোন্ জাতি লোকে সহজে ছাড়াইয়া খাইতে পারে, কোন্ জাতি অল্প জলপ্লাবন আবশ্যক করে এবং কোন্ জাতিই বা অধিক পরিমাণে চিনি প্রদান করে তাহা শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বাঙ্গলাদেশের গত সেন্সস্ রিপোর্টে দেখা যায় যে আজকাল ইক্ষু এবং খেজুর চাষ পাটের তুল্য পরিমাণ জমিতে হইতেছে। যশোহর, খুলনা, হুগলি, ২৪-পরগণায় খেজুর চাষ বেশীর ভাগ হইয়া থাকে। প্রায় ১০।১২ ফুট অন্তর গাছগুলি রোপণ করা উচিত। আর দশ বৎসরের মধ্যে গাছগুলি রস মোক্ষণে সমর্থ হয়। এ সময় উপস্থিত হইলে গাছের গোড়ার শক্ত ডাল ও ডাঁটাগুলি কাটিয়া ফেলিয়া গাছের 'মাজ' প্রায় বাহির করিয়া ফেলা হয়। শীতের প্রারম্ভেই কার্ত্তিক মাসে সেই স্থানের কোমল ত্বক্ কিঞ্চিৎ গভীর করিয়া কাটিয়া একটি কঞ্চির চোঙ্গের সাহায্যে সেই ক্ষত স্থান হইতে নির্গত পরিষ্কার মিষ্টরস একটি ভাঁড়ে জমা করা হয়। তিনদিন রস ধরিয়া দুইদিন 'জিরেন' দেওয়া হয়; তৎপরে ঐরূপে আবার রস সংগ্রহ করা হয়। এই সংগৃহীত রস অতি প্রত্যুষে বৃহৎ কটাহে উত্তপ্ত করা হয়। তরল রস এইরূপে গাঢ় গুড়ে পরিণত হইলে তাহা মাটির কলসীতে বন্ধ করিয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়।

ইক্ষুর গুড় হইতে ও খেজুরের গুড় হইতে অতি উত্তম

চিনি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এক সময়ে ভারতে এত চিনি প্রস্তুত হইত যে ভারতের বাহিরে তাহা রপ্তানি হইত; আজকাল জর্ম্মানি যাবা প্রভৃতি স্থান হইতে চিনি ভারতবর্ষে আমদানি হইতেছে। যশোহর জেলায় কোটচাঁদপুর নামক স্থানে চিনি প্রস্তুত করিবার হস্তচালিত কল অনেকগুলি আছে এবং এখান হইতে, প্রচুর পরিমাণে, খেজুর-গুড়ের চিনি রপ্তানি হয়। কোটচাঁদপুরের সন্নিকটে তারপুর নামক স্থানে Tarpur Sugar Factory নামে চিনি প্রস্তুত করিবার একটি বৃহৎ এঞ্জিন-চালিত কল আছে।

তামাক।

বাঙ্গলায় জলপাইগুড়ি ও রঙ্গপুর জেলায় তামাক অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে জন্মায়। এক্ষণে তামাক কিয়ৎ পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে, কিন্তু অধুনা, পাশ্চাত্য দেশসমূহে, বিশেষতঃ আমেরিকায়, তামাক চাষের এত উন্নতি ঘটিয়াছে, যে, শীঘ্রই আমাদের দেশে তামাক চাষের বিশেষ উন্নতি না করিলে দেশী তামাক বিক্রয় হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না এবং আমাদের দেশের তামাকের ব্যবসাটি একেবারে লোপ পাইবে। তামাকের পাতাগুলি একই প্রকারের না হইলে মূল্য অধিক পাওয়া যায় না, নানা প্রকারের পাতা একত্রে কোন খরিদদার লইতে চাহে না। অতএব একই ক্ষেত্রের পাতাগুলি এক প্রকারের করিয়া তোলা তামাক চাষের একটি বিশেষ অঙ্গ।

চা।

কেবলমাত্র দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি প্রদেশে চা অধিক পরিমাণে জন্মায়, কিঞ্চিৎ চট্টগ্রামেও জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গলার চা চাষ সমস্তই ধনী ইয়ুরোপীয়গণের করকবলিত। এই-সকল চা-ক্ষেত্রে দেশী লোক কুলীর বা মজুরের কাজ করিয়া যাহা কিছু অর্থ উপার্জ্জন করে মাত্র।

চা এবং তামাকের চাষ এবং ব্যবসা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য, ব্যয়-সাপেক্ষ ও কৌতূহলোদ্দীপক।

তিল সর্ষপাদি অন্যান্য শস্য।

তিলসর্ষপাদি শস্য বাঙ্গলায় তেমন অধিক জন্মায় না। সমগ্র বাঙ্গলাদেশে মাত্র ১৮,২৮,৩০০ একার ভূমিতে উক্ত প্রকার শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। ইহার মধ্যে তিসি—নদীয়া ও নোয়াখালি জেলায়; তিল—ময়মনসিংহ ও পাবনা জেলায়; এবং সর্ষপ—ময়মনসিংহ, রাজসাহি, ত্রিপুরা ও নোয়াখালিতে অধিক পরিমাণে জন্মে। চিনে-বাদাম বাঙ্গলার কুত্রাপি জন্মায় না।

তুলা বা কার্পাস চাষ।

পাট হইতে গুনচট এবং দড়া প্রভৃতি প্রস্তুত করা বাঙ্গলাদেশের এক সময়ে যেমন একটি প্রধান শিল্প ছিল, তেমনি তুলা হইতে সূতা এবং সূতা হইতে কাপড় প্রস্তুত করা বাঙ্গলার বিশাল তাঁতি-সম্প্রদায়ের একমাত্র ব্যবসায় ছিল। বাঙ্গলার প্রস্তুত কাপড় যে একদিন জগতের সৌখিন বিপণীতে ধনীদিগের আদরের সামগ্রী ছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গলায় বস্ত্রবয়নশিল্পের অত্যধিক প্রচলন থাকিলেও এখানে তুলার চাষ অধিক পরিমাণে কোন কালে হয় নাই। বাঙ্গলার জল-হাওয়া তুলা চাষের অনুকূল নহে। বিলাতে বাষ্পচালিত তাঁতের প্রচলন এবং অবাধ-বাণিজ্যপ্রথা বাঙ্গলার বস্ত্রবয়নশিল্পের লোপের কারণ হইয়াছে।

রেশমের চাষ।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলাই প্রধান রেশম-প্রসবকারী প্রদেশ। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী এবং বর্দ্ধমানে প্রধানতঃ তুঁতগাছে রেশম পালন করা হয়। রংপুর, জলপাইগুড়ি এবং বগুড়া এড়ি সিল্কের উৎপত্তিস্থান। আজ কএক বৎসর বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের Sericulture Department এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন। অধুনা বাঙ্গলায়, গিয়াসবাড়ি, মিরগঞ্জ, বহরমপুর, কুমরপুর, চন্দন-পুর, কলিগা ও বগুড়ায় এক-একটি Central Nursery স্থাপিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত রাজসাহীতে একটি Sericultural school আছে। এই সকল স্থান কর্তৃপক্ষগণ বিশেষ ভাবে পরিদর্শন করেন। গুটি হইতে সূতা প্রস্তুত করিবার Filature ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গলা দেশে অবস্থিত। ১৯০৩ সালে এইরূপ Filature বাঙ্গলায় ৩৩টি ছিল এবং তাহাতে প্রায় নয় হাজার লোক খাটিত। কলিকাতায় একটি বাষ্পচালিত রেশমের কলও আছে, আর দুইটি কল বোম্বাই নগরে।

নীল চাষ।

এক সময়ে বাঙ্গলা দেশে নীল চাষ অতিরিক্ত হইত।

এখন নীলের চাষ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শুনা যায় জার্ম্মানির নীল রং ভারতবর্ষে আর আমদানি করিতে দেওয়া হইবে না এবং সেইজন্য বাঙ্গলায় পুনরায় নীলচাষের প্রবর্ত্তন হইবে। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র নদীয়া জেলায় অল্প পরিমাণে নীল চাষ হইয়া থাকে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র।

স্মৃতির সৌরভ

একের পরিচ্ছেদ।

শেপার্টন গ্রামের বুড়ো পুরোহিত মিঃ গিলফিল মারা গিয়াছেন ত্রিশবৎসর আগে। তাঁহার মৃত্যুর সময় শেপার্টনের সারা গ্রামে শোকের ছাপ পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল একটি ভাগিনেয়। গির্জ্জার বেদীর চারিদিকে কালো কাপড় টাঙাইয়া দিবার বন্দোবস্তটা সেই করিয়াছিল। না করিলেই যে শ্রাদ্ধের দিনের এই শ্রদ্ধার নিদর্শনটুকু বাদ পড়িত, তাহা নয়। গ্রামের লোকে নিজেদের পকেট হইতে চাঁদা তুলিয়াই সে কাজটা নিশ্চয়ই চালাইয়া দিত। চাষীদের বাড়ীর বৌঝিরা পর্য্যন্ত সকলেই সেবার নিজেদের শোকচিহ্ন কালো রঙের কাপড়গুলো বাক্সের বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছিল। মিঃ গিলফিল মারা যাইবার পরের রবিবারেই জেনিংস-গিন্নী যখন গোলাপী ফিতে আর সবুজ শালের বাহার দিয়া গির্জ্জায় আসিয়া হাজির হইলেন তখন ত সারাগ্রামে ছিছি পড়িয়া গেল। জেনিংস-গিন্নী অবশ্য এ গ্রামে অল্পদিনই বাস করিতেছেন, তিনি শহুরে মেয়ে, তাঁর যে ভালমন্দ জ্ঞান কম হইবে সে ত জানা কথা। তবে হিগিন্স-গৃহিণী প্যারট-গিন্নীর কানে-কানে যে-কথাটা বলিলেন সেটা নেহাৎ ফেলনা নয়। তিনি বলিয়াছিলেন, "কর্ত্তাটির ত বাপু এই গাঁয়েই জন্ম, তিনি একটু বুদ্ধি দিলেই ত পারতেন।" শোকচিহ্ন ধারণ করিতে যাহারা ইতস্ততঃ করে, যেন খুলিয়া ফেলিতে পারিলেই বাঁচে, হিগিন্স-গৃহিণীর মতে তাহারা বড়ই ছ্যাবলা, লোকগুলোর যেন কি রকম ধরণ; কিসে যে কি করিতে হয় সে বুদ্ধি বিবেচনাটুকু মোটেই নাই।

তিনি বলিলেন "কতকগুলো যে লোক আছে, রং-চং পরে বাহার না দিলে যেন তাদের পেটের ভাত হজম হয় না। আমাদের গুষ্টিতে বাপু ওরকম ঢং কোনোদিন দেখিনি। এই বলি শোন, প্যারট-গিন্নী, আমার বিয়ের বছর থেকে আর এই ন' বছর হল কর্ত্তার কাল হয়েছে, এই এত দিনের মধ্যে একটানা তুবছরও আমি কালো পোষাক তুলে রাখতে পাইনি।"

প্যারট-গিন্নী মনে-মনে জানিতেন যে এবিষয়ে তাঁহাকে হার মানিতেই হইবে, কাজেই তিনি বলিলেন, "তোমাদের বাড়ীর মত এত মরণও কিন্তু আর কোনো বাড়ীতে দেখি না।"

হিগিন্স-গিন্নীর বয়স হইয়াছে, বিধবা হইলেও টাকাকড়ির সংস্থান আছে। প্যারট-গিন্নীর কথাটা তাঁহার খাঁটি বলিয়াই বোধ হইল। তিনি একটু খুসী হইয়াই উঠিয়াছিলেন। প্যারট-গিন্নীর আত্মীয়কুটুম্বদের বাড়ীতে মুখ বড় করিয়া বলিবার মতন ঘটার শ্রাদ্ধ বোধহয় কোন পুরুষেই হয় নাই, তা' ওকথা না বলিয়া আর উপায় কি?

ক্রিপ-বুড়ীকে দেখিলে মনে হইত যেন একটি সচল আঁস্তাকুড়। সে কোনোদিনই গির্জ্জার ধার ধারিত না। সেদিন কিন্তু সেও হ্যাকিট-গৃহিণীর কাছে একটুকরা কালো কাপড় চাহিয়া টুপিতে গাঁথিয়া বেদীর সামনে একটা প্রণাম ঠুকিয়া আসিয়াছিল। মিঃ গিলফিলের প্রতি ক্রিপ-বুড়ীর এত সম্মান দেখানর যে কোন আধ্যাত্মিক কারণ ছিল তাহা নয়। কয়েক বৎসর আগের একটা কোনো বিশেষ ঘটনাকে স্মরণ করিয়াই সে এই শ্রদ্ধাটুকু দান করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই ঘটনাটি ঘটিবার পরেও বুড়ীর ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রতি কোনো টান দেখা যায় নাই। ক্রিপ-বুড়ী জোঁকের ব্যবসায় করিত; তাহার জোঁকগুলির ক্ষুধার বড়ই কম্‌তি দেখা যাইত বলিয়া সেগুলির বিশেষ কাট্‌তি না থাকিলেও বুড়ীর রোজগারের অন্য উপায় ছিল। গ্রামের লোকে বলিত জোঁক ধরাইতে বুড়ী খুব ওস্তাদ। নিতান্ত বেয়াড়া নারাজ জোঁকগুলোকেও সে ঠিক ধরাইয়া দিতে পারিত। কাজেই বেতোরোগীরা মিঃ পিলগ্রিমের ডাক্তারখানা হইতে তাজা-তাজা জোঁক আনিলেও গায়ে ধরাইয়া দিবার কাজটা ক্রিপ-বুড়ীরই মৌরসি পাট্টা করা

ছিল। সুতরাং তাহার বিষয়-সম্পত্তি হইতে যে দুই চার পয়সা আয় হইত, তাহার উপর ইহাও কিঞ্চিৎ যোগ দিত। লোকে বলিত, এই ব্যবসায়ে বুড়ী বেশ দশটাকা ঘরে আনে। ইহার উপর তাহার আর-এক কাজ পাড়ার উদর-সর্ব্বস্ব উড়ুন্দুড়ে ছেলেদের দুনো দামে চিনির মিঠাই যোগান দেওয়া। এত-রকমে দু'হাতে টাকা লুঠিয়াও বেহায়া বুড়ী লোকের কাছে দুঃখের কাঁদুনি গাহিতে ছাড়িত না; হ্যাকিট-গিন্নির কাছে কাপড়ের টুক্‌রা চাহিতে তাহার একবিন্দু চক্ষুলজ্জাও হইল না। হ্যাকিট-গৃহিণী বলিতেন "বুড়ীর মত মিথ্যাবাদী দুনিয়ায় আর দুটি মেলে না, কৃপণের ত একশেষ, ধর্ম্মকর্ম্মের সঙ্গেও খোঁজ নেই।" তবে কিনা হাজার হউক পাড়া-পড়শী ত বটে, কাজেই একটু টান থাকে।

তাহার নামে বলিতেও তিনি কিছু কসুর করিতেন না। "চায়ের শিটে পাতাগুলো চাইতে বেহায়া বুড়ীর মুখে একটু বাধেও না। আমি তাই, দিয়ে মরি। এদিকে ত ঘরের মেজে মুছতে ঝি রোজই চায়ের শিটে চাইছে।"

একদিন রবিবার সন্ধ্যার পর মিষ্টার গিল্‌ফিল ঘোড়ায় চড়িয়া নেবলির গির্জ্জা হইতে ফিরিতেছিলেন। সেদিন বেশ গরম। আসিতে-আসিতে পথে দেখিলেন ফ্রিপবুড়ী তাহার কুঁড়ের কাছে একটা শুক্‌নো ডোবার ধারে বসিয়া আছে। তাহার পাশে একটা মস্ত বড় শূয়োর। সেটা বুড়ীর কোলের উপর মাথা রাখিয়া এমন নিশ্চিন্ত মনে আরামে পড়িয়া আছে যেন কতকালের প্রাণের বন্ধু। আনন্দটা জানাইবার জন্য থাকিয়া-থাকিয়া ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করিতেছে।

পাদ্রী-সাহেব বলিলেন, "কিগো ফ্রিপগিন্নি, খাসা শূয়োরটি ত তোমার। বড়দিনের সময় দিব্যি ভোজ হবে এখন।"

"ওমা গো, সে কি কথা! জন্মেও যদি আর মাংস না খাই তবু আমি ওকে প্রাণ ধরে মারতে পারব না। দুবছর আগে আমার বাছা যেদিন ওকে এনে দিল, সে দিন থেকে আজ অবধি ও আমার সঙ্গে-সঙ্গে রয়েছে।"

"ওকে পুষতে গিয়ে যে তুমি সর্ব্ব খোয়াবে। চিরকাল ধরে শুধু-শুধু একটা শূয়োরের পেছনে টাকা ঢালবে কি বলে?"

"না, না, বুনো গাছগাছড়া উপড়ে ও নিজেই নিজের খাবার কিছু-কিছু জুটিয়ে নেয়। আর ওর জন্যে একটু-আধটু খরচ করতে আমার গায়ে লাগে না। তা ছাড়া ও আমার সঙ্গে-সঙ্গে সারাক্ষণ ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়, কথা কইলে সাড়া দেয়, ঠিক যেন মানুষটি।"

মিঃ গিলফিল হাসিলেন। ফ্রিপবুড়ীর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা না করিয়াই পাদ্রী-সাহেব বিদায় লইলেন। এবং তাহার বদলে পরদিন চাকরের হাতে তাহাকে এক-টুক্‌রা শূয়োরের মাংস পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন ফ্রিপগিন্নিকে তিনি ভবিষ্যতে আবার শূয়োরের মাংস চাহিতে দিবেন। সেই কথা মনে করিয়াই মিঃ গিলফিলের মৃত্যুতে বুড়ী ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের উপর শোকচিহ্ন পরিয়া তাঁহাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দিয়া আসিল।

পাঠকেরা বোধ হয় ইতিমধ্যেই পাদ্রী-সাহেবের পাদ্রী গিরির খুঁৎ ধরিতে সুরু করিয়াছেন। এসম্বন্ধে একটা কথা ঠিক বলা যায় যে তিনি পাদ্রীগিরির কাজটা যথাসম্ভব অল্পসময়ের মধ্যে যথাসাধ্য সংক্ষেপে সারিতেই চিরকাল চেষ্টা করিতেন। তাঁহার কতকগুলি ছোট ছোট লিখিত উপদেশ ছিল। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের রং হলদে হইয়া আসিয়াছিল, ধারগুলিও জীর্ণ হইয়া ছিঁড়িয়া আসিতেছিল। এইগুলির ভিতর যে-দুটা হাতের কাছে আসিত নির্ব্বিচারে সেই দুইটা লইয়া তিনি প্রতি রবিবার সকালে শেপার্টনের গির্জ্জায় একটা পড়িয়া দিয়া আসিতেন, এবং অন্যটা পকেটে করিয়া নেবলির পথে ঘোড়ার পিঠে যাত্রা করিতেন। সেখানকার গির্জ্জাটি সেকেলে ধরণের। তাহার চৌখুপি-কাটা সানের মেজের উপর দিয়া পুরাকালে কত যোদ্ধা পুরোহিত বীরদর্পে দিক কাঁপাইয়া ঘুরিয়াছেন। গির্জ্জাঘরের দেয়ালের গায়ে উপদেশমালা হাতে খ্রীষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের ছবি আঁকা। ঘরের ভিতর অনেকখানি জায়গাই যোদ্ধাদের ও তাঁহাদের স্ত্রীদের মার্বল-পাথরের মূর্ত্তিতে আটক হইয়া আছে। মিঃ গিলফিল এই ছোট গির্জ্জাটিতে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় কাজ করিতে আসিতেন। তাঁহার ভোলা মন ছিল। কতদিন ঘোড়-সোয়ারের জুতার কাঁটা খুলিবার আগেই তিনি পুরোহিতের পোষাক পরিয়া

বসিতেন। বেদীতে উঠিতে গিয়া পোষাকে টান পড়িলে মনে পড়িত জুতার কাঁটা খোলা হয় নাই। নেবলির চাষীরা তাহাদের পুরোহিত-মহাশয়কে চন্দ্রসূর্য্যের সামিল বলিয়াই জানিত। কাজেই তাঁহার সমালোচনা করিবার স্পর্দ্ধা তাহাদের কোনোদিন হয় নাই। জগতে দোকান বাজার, টাকা পয়সা যেমন না হইলেই নয়, নেবলিতে মিঃ গিলফিলকেও না হইলেই নয়। গরীব চাষাদের সামান্য অর্থের উপর লুব্ধ দৃষ্টি দিতে গিয়া তিনি পৌরোহিত্যের প্রাপ্য ভক্তিটুকু খোয়ান নাই। গ্রামের যে-সকল লোকের স্প্রিংহীন গাড়ীর ঐশ্বর্য্য ছিল না, তাহারা পথের কাদা ভাঙিয়া পায়ে হাঁটিয়া যথাসময়ে গির্জ্জায় পৌঁছিবার জন্য রবিবার-দিন দুই ঘণ্টা আগেই খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লইত। আর ধনী ও ধনী-গৃহিণীরা গাড়ী চড়িয়া আসিয়া গির্জ্জার দরজায় দুইধারের কৃষক ও কৃষকবধূদের নমস্কার কুড়াইতে কুড়াইতে ভারতীয় আতর গোলাপের গন্ধ ছড়াইয়া নিজেদের নির্দ্দিষ্ট সুন্দর আসনগুলিতে গিয়া বসিতেন।

চাষীদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের আসন ছিল ওক কাঠের কালো কালো বেঞ্চি। বাড়ীর কর্ত্তারা কিন্তু এক খ্রীষ্ট-শিষ্যের ছবির নীচের আসনে গিয়া বসাটাই বেশী সম্মান-জনক মনে করিতেন। প্রার্থনা প্রভৃতি হইয়া গেলে যখন একটানা উপদেশের পালা আসিত তখন এই কর্ত্তাদের প্রতি নিদ্রাদেবীর কৃপাটা অন্য লোকের চোখে ও কানে বেশ ধরা পড়িত। শেষের বন্দনা-গানের কাজ ছিল তাহাদের এই ঘুমটুকু ভাঙিয়া দেওয়া। তাহার পর আবার সেই কাদাভরা গলি দিয়া বাড়ী ফিরিবার পালা। আজকালকার জাগ্রত ও সমালোচনাপ্রিয় উপাসক-মণ্ডলী সাপ্তাহিক উপাসনা হইতে যেটুকু লাভ করিয়া আসেন, এই সরল কৃষকেরা যাহা কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিত তাহার প্রতি এই শ্রদ্ধাটুকু দিয়া বোধ হয় তাঁহাদের চাইতে কিছু কম লাভ করিত না।

পাদ্রী গিলফিল কিন্তু বাড়ী ফিরিতেন নেবলির মঠে রাত্রের আহার সারিয়া। কিন্তু শেষ বয়সে মিঃ গিলফিলও এই সময়েই বাড়ী ফিরিতেন। একবার গ্রামের ধনী মিঃ ওল্ডিনপোর্টের সঙ্গে কলহে তিনি এত কষ্ট পাইয়াছিলেন যে রবিবার রাত্রে নেবলির মঠে আহারের পাট তুলিয়াই দিয়াছিলেন। এই ঝগড়াটা বড়ই কষ্টকর। এককালে ইহারা দুই বন্ধু কতদিন একসঙ্গে শিকারে গিয়াছেন। তখন ইঁহাদের দলে এমন লোক খুব কম ছিল যে পাদ্রী-সাহেবের ও ওল্ডিনপোর্টের এত প্রীতির হিংসা না করিত। পাদ্রীদের হাত করার মত আরাম আর কিসে আছে? স্যর জ্যাস্পার ত বলিয়াই ছিলেন "তোমারই জমিদারীতে বসে তোমাকেই এমন অসহ্য হয়রানি করতে এক তোমার স্ত্রী ছাড়া আর যদি কেউ পারে ত সে হচ্ছে ওই পাদ্রী।" কারণ পুরোহিতের দক্ষিণা আদায়ের জ্বালা ত কম নয়।

যে মতভেদ লইয়া এই ঝগড়ার সূত্রপাত হয় সেটা নেহাৎ সামান্য, কিন্তু মিঃ গিলফিল লোককে বড় আঁতে ঘা দিয়া কথা বলিতেন বলিয়া পরিণামটা বড়-রকমেরই হইল। তাঁহার বিদ্রূপের মধ্যে এই যে বিশেষত্বটি ছিল, তাঁহার উপদেশে তাহার কোনো চিহ্নমাত্র ছিল না। মিঃ ওল্ডিনপোর্টের বিশ্বাস ছিল তিনি একজন মস্ত বড় সাধু। কিন্তু এই সাধুত্বের বর্ম্মের ফাঁকে যে দুই-একটি বড়-রকম ছিদ্র ছিল মিঃ গিলফিলের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের বাণ তাহাতে বড় বিষম খোঁচাই দিত। সে অপমান ভোলা বোধ হয় তাঁহার পক্ষে বড় সহজ নয়। কথাটা সত্য কি মিথ্যা জানি না, তবে মিঃ হ্যাকিট অন্ততঃ এই-রকমই বলেন। ঝগড়ার ঠিক পরের সপ্তাহেই কোনো সভার বাৎসরিক ভোজে সভাপতির আসনে বসিয়া সমাগত বন্ধুদের এই খবরটি দিয়া তিনি সভা আরও সরগরম করিয়া তুলিয়াছিলেন। "পাদ্রী-সাহেব জমিদার-মশায়কে যা দুটি-চারটি মিষ্টি জুতো দিয়েছেন!" খবরটা শুনিয়া শেপার্টনের প্রজাদের খুসীর আর সীমা নাই। মিঃ প্যারটের ঘোড়া-চোর ধরা পড়িলেও বোধ হয় ইহারা এত খুসী হইত না। প্রজাদের কাছে মিঃ ওল্ডিনপোর্টের খুবই দুর্নাম ছিল। বাজার-দর হাজার নামিয়া যাইলেও তিনি এক পয়সা খাজনা কমাইতেন না। খবরের কাগজে রোজই দয়ালু জমিদারদের খাজনা-মাপের কাহিনী বাহির হইত, কিন্তু এই জমিদার-মহাশয়ের তাঁহাদের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করিবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখা যাইত না। মোট কথা মিঃ ওল্ডিনপোর্টের পার্ল্যামেণ্টের প্রতি টান এক বিন্দুও ছিল না, কিন্তু জমিদারী বাড়াইবার ইচ্ছাটা একটু বেশী-রকমই

ছিল। কাজেই জমিদার-মহাশয়ের দয়া-দাক্ষিণ্যকে পাদ্রী-সাহেব "গরু মেরে জুতো দান" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার অনুগত প্রজারা আনন্দে দিশাহারা। নেবলির তুলনায় শেপ্পার্টন খুবই উঁচুদরের গ্রাম। এখানে বাঁধা রাস্তা কি লোকমত, কিছুরই অভাব ছিল না। নেবলির দশা কিন্তু উল্টা। সেখানে গাড়ী চলিত মেঠো রাস্তার চাকার দাগ দেখিয়া আর মানুষগুলিও ঘাড় পাতিয়া জমিদারের অত্যাচার সহিয়া যাইত, মনে মনে গুমরান ছাড়া তাহাদের আর গতি ছিল না।

জমিদার ওল্ডিনপোর্টের সঙ্গে মনান্তরের পর শেপার্টনের ছেলে বুড়ো সকলের সঙ্গেই পাদ্রী-সাহেবের ভাবটা আরও বাড়িয়া গেল। টমি বণ্ড সবে সেদিন ফ্রক ছাড়িয়া ঝকঝকে-বোতাম-দেওয়া পুরুষের পোষাক পরিতে আরম্ভ করিয়াছে; সেও পাদ্রী-মহাশয়ের বন্ধু, আর পঁচিশ বৎসর আগে যাহারা ছেলেপিলের জাতকর্ম্মে তাঁহাকে পুরোহিত করিয়াছিল তাহারাও তাঁহার বন্ধু। টমি বড় বেয়াদব ছেলে। ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে খোঁজ নাই, লাট্টু আর মার্ব্বেলের উপরই তাহার যত ঝোঁক। সেইগুলি বোঝাই করিতে-করিতে পকেট-গুলিকে বড় বেশী রকম বড় করিয়া ফেলিয়াছে। একদিন বাগানের রাস্তায় টমি লাট্টু ঘুরাইতেছিল; লাট্টু যখন এক জায়গায় স্থির হইয়া নিঃশব্দে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, ঠিক সেই সময় মিঃ গিলফিল সেই পথে আসিয়া হাজির। তাঁহাকে ওই দিকে আসিতে দেখিয়া টমি গায়ের সমস্ত জোর দিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল, "আরে থামো, থামো, এখন আমার লাট্টুর উপর এসে পড়ো না।" সেই দিন থেকে খোকাবাবুর সঙ্গে পাদ্রী-মহাশয়ের বেজায় ভাব জমিয়া উঠিল। টমিকে যত অদ্ভুত প্রশ্ন করিতে তাঁহার বড়ই আনন্দ। টমি কিন্তু তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া বড়ই অবাক হইত, এবং পাদ্রী-মহাশয়ের বুদ্ধি সম্বন্ধেও তাহার বড় হীন ধারণা হইত।—খোকাবাবুর অবজ্ঞা আরও বাড়াইয়া তুলিতে তাঁহারও উৎসাহটা বেশী হইয়াই চলিতেছিল।

"আচ্ছা খোকাবাবু, আজ হাঁস দোয়ানো হয়েছে ত?"

"হাঁস দোয়ানো! অবাক্ করলে যাহোক, আচ্ছা বোকা ত তুমি, হাঁস আবার দুধ দেয় নাকি?"

"অ্যাঁ! দুধ দেয় না? তবে হাঁসের ছানাগুলো বাঁচে কি করে?"

প্রাণীবিজ্ঞানে টমির যেটুকু জ্ঞান ছিল, তাহাতে হাঁসের ছানার খাদ্যের কথা বিশেষ কিছু লেখে না, কাজেই বন্ধুর কথাটা প্রশ্ন বলিয়া সে বুঝিতেই পারিল না, এবং লাট্টুতে সূতা জড়াইতে একেবারে তন্ময় হইয়া গেল।

"ওঃ! হাঁসের ছানা কি খায় তা দেখছি তুমি জান না। হ্যাঁ, আজ কেমন মিছরী বৃষ্টি হয়েছিল দেখেছিলে কি? (এইবার টমির কানটা খাড়া হইয়া উঠিল।) জানো, আমি রাস্তা দিয়ে আসছিলাম আর সেগুলো টপাটপ এসে আমার পকেটে পড়তে লাগল। পকেটের ভিতর খুঁজে দেখই না, সত্যি কি না।"

ওসম্বন্ধে তর্ক করিবার টমির কোনই উৎসাহ দেখা গেল না। টপ করিয়া একেবারে পকেটের ভিতর হাত পুরিয়াই সে সত্যনির্ণয় করিয়া লইল। পাদ্রী-সাহেবের পকেটে হাত দেওয়ায় যে বিশেষ লাভ আছে, সে কথার প্রমাণ সে অনেকবারই পাইয়াছে। মিঃ গিলফিলের পাড়ার ক্ষুদ্র দস্যুদল ও তাহাদের সহচরীরা বলিতেন যে তাঁহার পকেটটা বড়ই তাজ্জব; পয়সা রাখিলেই মিছরি কি মিঠাই কি আর কিছু একটা হইয়া বসিবে। প্যারটদের মোটা-সোটা ধপধপে ফর্সা খুকী বেসি'র একমাথা কোঁকড়া চুল। মিঃ গিলফিলকে দেখিলেই সে মাথা নাড়িয়া আধ-আধ সুরে "তোমার পটেটে টি?" বলিয়া সপ্রতিভভাবে গিয়া উপস্থিত হইত।

ছেলেমেয়ের জাতকর্ম্মের উৎসবে বাড়ীতে পুরোহিতকে ডাকাতে আমোদ-আহ্লাদের যে কিছু কমতি হইত না তাহা ত বলাই বাহুল্য। মিঃ গিলফিল গ্রাম্য প্রজাদের সঙ্গে বসিয়া তামাক খাইতেন, গ্রামের কোনো নূতন খবর থাকিলে তাহার উপর রং ফলাইয়া নানা ছড়া কাটিয়া দুটো চারিটা চোখা-চোখা বিদ্রূপ করিয়া বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে পারিতেন। আবার মিঃ বণ্ড বলিত যে পুরোহিত-মহাশয়ের মত গরু-ঘোড়ার খবর আর দুটি লোককে জানিতে দেখা যায় না। কাজেই তাঁহার সঙ্গটা চাষাদের বিশেষ-রকম ভাল লাগিত। মাইল পাঁচেক দূরে তাঁহার নিজের খানিকটা ঘাসের জমি ছিল। এক প্রজা

তাহার কাজ করিত। বৃদ্ধ বয়সে শিকারের আনন্দ যখন ফুরাইয়া গিয়াছিল, তখন ঘোড়ায় চড়িয়া এই জমির দেখা শুনা-করিতে যাওয়া এবং ফসল কেনা-বেচার খোঁজ করাই তাঁহার অবসর-কালের আনন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাহিরের লোকে তাঁহাকে গরু বাছুরের গুণাগুণ বিচার ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের মোকদ্দমার হাস্যকর নিষ্পত্তির আলোচনা করিতে শুনিলে পুরোহিত ও শিষ্যের মধ্যে এক বুদ্ধির তারতম্য ছাড়া আর বিশেষ কিছু প্রভেদ দেখিতে পাইত না। কারণ তিনি চাষাদের সঙ্গে গ্রাম্য ভাষাতেই কথা বলিতেন। যাহারা অসাধু ভাষাতে কথা বলে তাহাদের সঙ্গে সাধুভাষায় কথা বলা ভাষার উদ্দেশ্য বিফল করা ছাড়া আর কিছু বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। তথাপি গ্রামের চাষারা তাহাদের গুরুর মাহাত্ম্যটা খুবই বুঝিত। তিনি তাহাদের সঙ্গে অমন সহজভাবে মিশিতেন এবং গ্রাম্য ভাষায় কথা বলিতেন বলিয়া তাহারা কোনোদিন তাঁহার উচ্চবংশ কিম্বা পৌরোহিত্যে বিশ্বাস হারায় নাই। প্যারট গিন্নি পুরোহিত-ঠাকুরকে আসিতে দেখিলেই ফর্সা কাপড় চোপড় পরিয়া মহাআগ্রহে ভক্তিভরে নমস্কার করিত; তাহার উপর আবার প্রতি বৎসর বড়দিনের সময় ভেট পাঠাইয়া প্রণাম জানাইত। নেহাৎ বাজে গল্প করিবার সময়ও ইহারা নিজেদের কথার উপর নজর রাখিত এবং তিনি কোন্‌টাকে ভাল আর কোন্‌টাকে মন্দ মনে করেন তাহা ভুলিত না।

খাঁটি পৌরোহিত্যের ব্যাপারেও তাঁহার প্রতি তাহাদের ভক্তি অচলা। জাতকর্মের গুণটা তাহারা তাহাদের প্রিয় পুরোহিতের মাহাত্ম্য বলিয়াই মনে করিত। শেপার্টন গির্জ্জার সাধাসিধা উপাসকেরা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও পদের মধ্যের সূক্ষ্ম রেখাটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। পুরোহিত মাত্রই যে পুরোহিত হিসাবে মিঃ গিলফিলের সমান একথা কোনো কালাপাহাড় বলিতে সাহস করিত না। মিঃ গিল ফিলের বাতের অসুখ হওয়াতে প্যারট-দুহিতা সেলিনার বিবাহের দিনই একমাস পিছাইয়া গেল। মিল্‌বির পুরোহিতকে দিয়া যেমন-তেমন করিয়া কাজ সারাইয়া লইতে কনে একেবারেই নারাজ।

হল্‌দে রঙের উপদেশের খাতাগুলি কুড়িবার পড়িবার পরও শ্রোতাদের মুখে লাগিয়াই আছে—"আজকের উপদেশটা বড় চমৎকার হয়েছে।" এককথা বারবার শুনাতেই তাহাদের বেশী আনন্দ। শেপার্টনের অধিবাসী-দের মনে নূতন কথার চাইতে পুরাণো কথাতেই বেশী ফল হইত। গানের সুরের মতন উপদেশের এক-একটি কথা অনেক দিন ধরিয়া তাহাদের মগজে বসিয়া থাকিত।

মিঃ গিল্‌ফিলের উপদেশে যে তত্ত্বকথা কি মতবাদের বিশেষ ছড়াছড়ি ছিল না সে কথা বলাই বাহুল্য। মানুষের বিবেকেও যে তিনি বিশেষ ঘা দিতেন তাও বলা চলে না। একটানা ত্রিশ বৎসর তাহার উপদেশ শুনিয়াও ত প্যাটেন-গিন্নি নিজেকে পাপী বলাটা অধর্ম্ম মনে করিতেন। তাহার উপদেশ বুঝিতে শেপার্টনের উপাসক-মণ্ডলীর বুদ্ধিরও বিশেষ কসরৎ করিতে হইত না। অন্যায় করিলে মন্দ হয় আর ভাল করিলে ভাল হয়, এই সব নিতান্ত মামুলি কথাই ছিল তাঁহার উপদেশের বিষয়। মিথ্যাচরণ, পরনিন্দা, রাগ প্রভৃতির বেশী আর কোনো কথা তাঁহার মন্দের কোঠায় ছিল-না বলিলেই চলে। আর ভালর কোঠায় পড়িত দয়া দাক্ষিণ্য, সততা সত্যাচরণ প্রভৃতি। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারের অপেক্ষা গভীর বিষয়ে তিনি কথা বলিতেন না। প্যাটেন-গিন্নি সোজাসুজি বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন দই-ছানায় ভেজাল দিলে পরলোকে শাস্তি হয়; তবে পরনিন্দা-বিষয়ক উপদেশটার বেলায় তিনি অত চুল-চেরা বিচার করিতেন না। হাকিট-গিন্নির একদিন কোনো এক দোকানীর সঙ্গে দাঁড়িপাল্লার জুয়াচুরি লইয়া একচোট বচসা হইয়াছিল, কাজেই সততা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া পাদ্রীসাহেব যখন ওজনে ঠকানর কথা তুলিলেন তখন পাদ্রীর কথাটা তাঁহার খুব মনে লাগিয়াছিল। তবে রাগ দমনের কথা শুনিয়া তাঁহার বিশেষ মনে লাগিয়াছিল বলিয়া কেনও শুনি নাই।

মিঃ গিলফিল যে খাঁটি শাস্ত্রকথা ছাড়া আর কিছু বলিতে কি বুঝাইতে পারেন এ সন্দেহ সেকালের শেপার্টনের লোকের মাথায় কোনোদিন আসে নাই। দশ বৎসর পরে ইহারাই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া মিঃ বার্টনের কড়া সমালোচনা করিত। সে যুগে পাদ্রীর খুঁৎ ধরা আর

ধর্ম্মের খুঁৎ ধরা একই গণ্ডিতে পড়িত। মিঃ হ্যাকিটের এক শহুরে বাচাল ভাগিনেয় এক রবিবার বলিয়া বসিল কিনা মিঃ গিলফিলের মতন উপদেশ সেও লিখিতে পারে! দাম্ভিক ছোকরার কথা শুনিয়া মামা মামী ত একেবারে কানে হাত দিয়া বলিলেন—কি সর্ব্বনাশ, ছেলেটা বলে কি! ছেলের মুখ বন্ধ করিবার জন্য মামা বলিলেন "তুই যদি পারিস ত তোকে আমি একগিনি দেবো।" তাহার পর উপদেশ-লেখাও হইয়াছিল বটে। তবে লোকে বলিল, "হ্যাঃ, মিঃ গিলিফিলের পাশ দিয়েও ঘেঁসে না।" যাহা হউক, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে লেখাটা ঠিক উপদেশের ধরণেরই। তাহাতে শাস্ত্রবাক্যও উদ্ধৃত ছিল, আবার শেষকালে "হে ভ্রাতৃগণ" বলিয়া দুই-চারিটা কথাও বলা হইয়াছিল। কাজেই পুরস্কাররূপে প্রকাশ্য ভাবে মোহর-খানা না পাইলেও তাহার আশ্চর্য্য বুদ্ধির দৌড়ের জন্য সেখানা গোপনে দাম্ভিক ছোকরাটাই পাইল। টমের আড়ালে লোকে বলিল, "আশ্চর্য্য লিখেছে যা হোক বাপু।"

শুধু যে চাষা-ভূষোরাই পাদ্রী-সাহেবের সঙ্গ পাইলে খুসী হইত তা নয়। গ্রামের বনিয়াদী ঘরের লোকেও বাড়ীতে তাঁহার পায়ের ধূলা পড়িলে নিজেদের ধন্য মনে করিত। হপ্তায় একবার তাঁহার দর্শন পাইলে বৃদ্ধ স্যর জ্যাস্পার কৃতার্থ হইয়া যাইতেন। পাদ্রী-সাহেব যখন জ্যাস্পার-গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ করিতেন, কি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া খাবার ঘরে লইয়া যাইতেন তখন তাঁহার ভদ্র ব্যবহার, শিষ্টাচার ও সুশোভন আদব-কায়দা দেখিলে কে বলিবে যে এই সেই গ্রাম্য পুরোহিত গিলফিল। প্রথম জীবনে তিনি যে-দলের লোকের সঙ্গে দিন কাটাইয়াছেন, সারা শেপার্টন গ্রাম খুঁজিলেও বোধহয় তেমন বনিয়াদী বড়লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পুরানো মার্বল-পাথরের উপর দিয়া অনেক ঝড়বৃষ্টি বহিয়া যাইবার পরও যেমন তাহার আসলরূপ মাঝে মাঝে উঁকি দিতে থাকে, মিঃ গিলফিলের রোজকার সাদাসিধা চাল-চলন ও গ্রাম্য বন্ধুদের সঙ্গে সহজ আলাপের মধ্যেও তেমনি তাঁহার আসল রূপটি এইসব জায়গায় ধরা পড়িত। শেষাশেষি বুড়াবয়সে তিনি বড়লোকের বাড়ী যাওয়া-আসার পাট প্রায় তুলিয়াই দিয়াছিলেন। ও-সব বড় হাঙ্গাম! এ সময় সন্ধ্যাবেলায় নিজ এলাকার বাহিরে বড় তাঁহাকে দেখা যাইত না। নিজের বসিবার ঘরে তামাকের নলটা মুখে দিয়া আগুন পোহানই ছিল তাঁহার কাজ।

এই-রকম নেহাৎ সেকেলে বৃদ্ধের কথা শুনিয়া হয়ত অনেকে হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। পাঠিকারা হয়ত বলিলেন, "দূর হোক গে ছাই, এক তামাকখেকো বুড়োর গল্প জুড়ে দিয়েছে, এর আবার প্রণয়-কাহিনী! তার চাইতে রাজ্যের দোক্তাখোর তেলী-মুদীর উপন্যাস লিখলেই ত হয়। একগাল করে দোক্তা খাচ্ছে আর অমনি মানস-নয়নে প্রিয়ার মোহিনী মূর্ত্তি ভেসে উঠ্‌ছে! বাঃ খাসা হয়।"

আহা অত রাগ কেন? বুড়া বয়সে তামাক দোক্তা খাইলে কি আর যৌবনকালে প্রণয়ের কিছু কমতি হয়। কত বুড়ারই ত বয়স হইলে মাথায় টাক পড়ে, পায়ে বাত ধরে, তাই বলিয়া কি তাহাদের বয়স-কালের প্রণয়কাহিনী-গুলা পঙ্গু বা অসুন্দর ছিল? সুন্দরী পাঠিকারও ত একদিন মাথার চুলের অভাবে লোকের চুল ধার করিতে হইতে পারে, তাই বলিয়া কি তিনি তখন তাঁহার বর্ত্তমান আজানু-লম্বিত কেশের কথাও আর তুলিবেন না। হায়রে হতভাগ্য মর মানুষ! তোমার দশাও কাঠের আসবাবের মত;—কে বলিবে এককালে ইহারই অঙ্গে-অঙ্গে কত কিশলয়ের মাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছিল; ইহারই ফুলের রঙে পথ রাঙা হইয়া গিয়াছিল; তাহার একটি চিহ্নও যে এখন খুঁজিয়া মিলে না। বার্দ্ধক্যের ভারে যে বৃদ্ধের শরীর মাটির সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে চায় আর কালের কঠোর হস্ত যে বৃদ্ধার সর্ব্ব অঙ্গের লাবণ্য চুরি করিয়া শুধু শুক্‌নো খোলাটুকু ফেলিয়া রাখিয়া দিয়াছে তাঁহাদের দিকে চোখ দিবা মাত্রই কিন্তু আমার মানস-চক্ষে তাহাদের অতীতের রূপ ফুটিয়া উঠে। যাহাদের জীবন-নাট্যে আশা ও প্রেমের গুঞ্জন ফুরাইয়া গিয়া নাট্য-শেষে শুধু ধূলিময় অন্ধকার রঙ্গমঞ্চটিতে মনোহর কুঞ্জকাননগুলি চোখের আড়াল হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের কাছে গোলাপী গণ্ড ও চঞ্চল চোখের অসমাপ্ত প্রণয়-কথা মাঝে-মাঝে নিতান্তই তুচ্ছ মনে হয়।

তাহা ছাড়া মিঃ গিলফিলের চেহারাটা নেহাৎ তামাক-

খোরের মত মোটেই ছিল না। বরং তাঁহার ধপ্‌ধপে শাদা চুলে ঘেরা মলিন বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইলে হৃদয় ভক্তিতে নত হইয়া আসিত। তাঁহার আর-একটা দুর্ব্বলতার কথাও এখানে না বলিয়া পারিতেছি না। খাঁটি চিত্র না আঁকিয়া আদর্শ চিত্র আঁকিবার ইচ্ছা থাকিলে পুরোহিত-মহাশয়ের ও-দোষটা ঢাকিয়াই যাইতাম। মিঃ হ্যাকিটের ভাষায় বলিতে গেলে পাদ্রী-সাহেবের বৃদ্ধ বয়সে বড়ই 'হাত-টান' হইয়া উঠিতেছিল; অবশ্য দুঃখী-দরিদ্রের বেলা যত না হউক তাঁহার নিজের বেলাই এ প্রবৃত্তিটি বেশী প্রকাশ পাইত। তিনি বলিতেন এ জগতে একজন ছাড়া তাঁহার বোনটিকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। সেই বোনের ছেলেকে কিছু দিয়া যাইবার জন্যই তাঁহার এই চেষ্টা। তিনি মনে করিতেন, "ছেলেটা বেশ দু'পয়সা নিয়েই সংসার পাতবে। তারপর বিয়ে হ'লে রাঙা বউটি নিয়ে মামার শেষ শয্যা দেখ্‌তেও একদিন হয়ত আস্‌বে। আমার শূন্য গৃহের সঞ্চিত ধন তার গৃহটি আরও মধুর করেই তুলবে।"

তবে বুঝি মিঃ গিলফিল্‌ চিরকুমার ছিলেন?

তাঁহার বসিবার ঘরের খোলা টেবিল, সেকেলে চেয়ার ও তামাকের গন্ধে আমোদিত জীর্ণ কার্পেট দেখিলে তাহাই মনে হয় বটে। ঘরে কোনো ছবি তাঁহার বিবাহিত জীবনের সাক্ষ্য দিত না। চম্পক-অঙ্গুলি স্মরণ করাইয়া দিবার মতন কোনো সূচিশিল্প কি সৌখীন গৃহসজ্জা সাজান ছিল না। মিঃ গিলফিলের সন্ধ্যাগুলি কাটিত এইখানেই। তাঁহার সাথের সাথী ছিল বুড়ো কুকুর পোন্টো। সাম্‌নের থাবা দুইটার মধ্যে নাকটা ঢুকাইয়া দিয়া সে কম্বলের উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকিত। মাঝে-মাঝে ভ্রূ কুঁচকাইয়া প্রভুর মুখের দিকে তাকাইত, যেন কত সুখ-দুঃখের কথা হইয়া গেল। শেপাটনের পাদ্রীর বাড়ীর অন্দরে একটি নিরালা ঘর ছিল, তাহার সাক্ষ্য কিন্তু এই নিরানন্দ শূন্য ঘরের উল্টা। সে-ঘরে পাদ্রী-সাহেব ও তাঁহার বুড়ী-ঝি মার্থা ছাড়া আর কেহ কোনোদিন ঢোকে নাই। মার্থা ও মার্থার স্বামী ডেভিড মালীকে লইয়াই তাঁহার সংসার। ডেভিড একাধারে সহিস ও মালী দুই। বৎসরের মধ্যে চারিদিন ছাড়া আর কখনও সেই অন্দরের ঘরের জানলার পরদা সরিত না। সেই চারিদিন ছিল মার্থার ঘর পরিষ্কার করিবার দিন। সূর্য্যদেব ও পবনদেবেরও সেই সময়ে একবার উঁকি দিবার সুযোগ ঘটিত। ঘরের চাবি থাকিত মিঃ গিলফিলের দেরাজে তালার মধ্যে। মার্থা তাঁহার কাছে চাবি চাহিয়া লইয়া ঘর ঝাড়-পোঁছ করিয়া আবার তাঁহাকেই ফিরাইয়া দিত।

মার্থা দরজা-জানলার পরদাগুলা সরাইয়া দিলে দিনের আলো ঘরখানিকে ভাসাইয়া দিত। ঘরের সজ্জা দেখিলে চোখে জল আসে। ছোট একটি টেবিলের উপর সোনালি-নক্‌সা-করা ফ্রেমে বাধানো সৌখীন আয়না। টেবিলের দু পাশের বাতিদানের মধ্যে আজও মোমবাতির টুক্‌রা লাগিয়া আছে। বাতিদানের হাতলের উপর একটি ছোট কালো লেসের রুমাল টাঙানো, মরচেপড়া-পিন-গাঁথা একটি ম্লান সাটিনের পিন-রক্ষণী, একটা এসেন্সের শিশি ও একটা সবুজ রঙের বড় হাতপাখা টেবিলে পড়িয়া। আয়নার পাশে পোষাকের বাক্সের উপর একটা সেলাইয়ের বাক্স; তাহার মধ্যে একটি অসমাপ্ত ছোট-ছেলেদের টুপি, এতকাল পড়িয়া থাকায় হল্‌দে রং ধরিয়া গিয়াছে। দরজার গায়ে পেরেকে দুটি মেয়েদের পোষাক ঝুলিতেছে, সে-রকম পোষাকের চলন বহুকাল নাই। একজোড়া ছোট চটি খাটের ঠিক পায়ের কাছে সাজানো, তাহার গায়ের রূপালি জরির কাজটা এখন একেবারেই ম্লান। দেওয়ালের গায়ে দুই-তিনখানা হাতে-আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিও ছিল। চিমনীর তাকের উপর কয়েকটা পুরাণো দুষ্প্রাপ্য চীনা মাটির বাসন। তাহারই উপরে দুটি গোল ফ্রেমের মধ্যে দুখানি ছবি। একটি ছবি সাতাশ বৎসর আন্দাজ বয়সের এক যুবার; তাহার রং টক্‌টকে, পুরু পুরু ঠোঁট, ও উজ্জ্বল সরল দৃষ্টি। দ্বিতীয় ছবিখানি একটি মেয়ের; মেয়েটির বয়স আঠার বৎসরের বেশী হইবে না, মুখখানির মধ্যে সবই ছোটখাট, গাল দুটি বিশেষ পুরন্ত নয়, রংও একটু শ্যাম, কিন্তু চোখ দুটি বড় বড়, তাহাদের দৃষ্টি গভীর। যুবার চুলে পাউডার দেওয়া। মেয়েটির কালো চুলগুলি পিছন দিকে জড়ো করিয়া বাঁধা, মাথার উপর গোলাপী রঙের ফিতার ফুল বসানো একটি টুপি। টুপির ধরণ দেখিলে তাহাকে খুব রসিকা মনে হয়, কিন্তু তাহার চোখে বিষাদ মাখানো।

কুড়ি বৎসর বয়সে ফুল্ল যৌবন লইয়া মার্থা পাদ্রী-সাহেবের সংসারে আসিয়াছিল। আর আজ তাঁহার জীবনের এই সন্ধ্যা বেলায় তাহারও বয়স পঞ্চাশের, বেশী বই কিছু কম হয় নাই। এই এতদিন ধরিয়া প্রতি-বৎসর চারিবার করিয়া সে ওই জিনিসগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া রোদে দিয়া আসিয়াছে। মিঃ গিলফিলের অন্দরের রুদ্ধদ্বার ঘরখানি ছিল এই-রকম, তাঁহারই অন্তরের নিভৃত কোণের যেন একখানি দৃশ্যহীন ছবি। সে আজ অনেক দিনের কথা; সেদিন হইতেই তাঁহার যৌবনের যত আশা ও নিরাশা হৃদয়ের এই গোপন কক্ষে সমাধিলাভ করিয়াছে। তাঁহার জীবনের প্রেমগান ও অনুরাগের পালা ওই লুকানো কোণটিতে চিরদিনের মত লুক্কায়িত।

পাদ্রী-সাহেবের স্ত্রীর কথা পরিষ্কার মনে আছে—এমন লোক সে-গ্রামে এক মার্থা ছাড়া আর কেহ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। আর মনে রাখা ত দূরের কথা, গির্জ্জার ভিতর পাদ্রী-পরিবারের বসিবার জায়গাটিতে যে ল্যাটিন-শ্লোক-লেখা-মার্ব্বল-পাথরটি আছে তাহা তাঁহারই স্মৃতিতে স্থাপন করা হইয়াছিল, ইহার বেশী অন্য খবর জানিতই বা কয়জন? গ্রামের যে দুই-চারিজন বুড়াবুড়ী সেই নববধূর আগমনের কথা আজও মনে রাখিয়াছে ভগবান তাঁহাদের বর্ণনা-শক্তিটা দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা হইতে যে-টুকু কষ্টেসৃষ্টে আদায় করা যায়, তাহাতে মনে হয় গিলফিল-বধু ছিলেন বিদেশিনী। "আহা! আর তাঁর চোখ দুটি যে ছিল সে, আর কি বলব!" "গলাও ছিল তেমনি মিষ্টি, গির্জ্জায় তাঁর গান শুন্‌লে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ত!"

এক প্যাটেন-গিন্নিরই গ্রামে কইয়ে-বলিয়ে বলিয়া নাম ছিল। তার কারণ তাঁর স্মৃতিশক্তিটা গল্প-গুজব মনে রাখিতে খুব দুরন্ত আর রাজ্যের লোকের ঘরোয়া কথা-গুলা তাঁহার লাগিতও ভাল। গিলফিল-গৃহিণীর মৃত্যুর দশ বৎসর পরে মিঃ হ্যাকিট এই গ্রামে আসেন। তাঁহার এক কাজ ছিল প্যাটেন-গৃহিণীর কাছে যত সেকালের খবর নেওয়া। সেই পুরাতন প্রশ্ন ও তাঁহার পুরাতন উত্তরগুলি যে কতবার নাড়াচাড়া হইত তাহার ঠিকানা নাই। অনেক শিক্ষিত লোকের যেমন প্রিয় পুস্তকের কথা হাজার বার পড়িয়াও তৃপ্তি হয় না, এই অ-শিক্ষিত লোকটিরও তেমনি ঐ পুরাতন কথা শতবার শুনিয়াও তৃপ্তি হইত না।

"আচ্ছা, প্যাটেন-গিন্নি, পাদ্রী-সাহেবের কনে যেদিন প্রথম গির্জ্জায় এলেন, সেদিনকার রবিবারটা তোমার বেশ মনে পড়ে, না?"

"হ্যাঁ, তা পড়ে বই কি! শরৎকালের প্রথম দিকে যেমন পরিষ্কার দিনগুলি হয়, সেদিনটাও ছিল তেমনি। সেদিন গির্জ্জায় পাদ্রী ছিলেন মিঃ টার্বেট, মিঃ গিলফিল বউ নিয়ে তাঁর পরিবারের বসবার আসনে বসে-ছিলেন। আজও যেন সেই চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভাসছে। বউকে সঙ্গে করে তিনি বারাণ্ডা দিয়ে নিয়ে আস্‌ছিলেন, কনের মাথাটা বরের কনুই ছাড়িয়ে বড় বেশী উঁচুতে ওঠেনি। মেয়েটি ছোট্টখাট্ট দেখতে, একটু ময়লা ধরণের রংটা। কালো কুচ্‌কুচে চোখ দুটি, কেমন উদাস-পারা চাউনি, যেন কিছু দেখ্‌তেই পায় না।"

মিঃ হ্যাকিট বলিল, "কনের গায়ে নিশ্চয় বিয়ের পোষাকটাই ছিল।"

"ওঃ সে এমন বিশেষ কিছু চটকদার নয়। একটা শাদা টুপি আর একটা শাদা মসলিনের পোষাক। কিন্তু মিঃ গিলফিলের তখন যা চেহারা ছিল, সে আর তোমায় কি বল্‌ব! তুমি যখন এগাঁয়ে এলে তার আগে তাঁর চেহারাই ছিল সে আর-একরকম। রং ছিল টক্‌টকে, চোখের চাউনি ছিল ঝক্‌ঝকে, দেখে মনে সুখ হ'ত। সেই রবিবার-দিন যেন তাঁর সুখের বান ডেকে যাচ্ছিল। কিন্তু আমার এমন পোড়া মন, মনে হ'ল এত সুখ ওঁর কপালে সইবে না। বল্‌তে কি, মিঃ হ্যাকিট, এই বিদেশী লোক-গুলোর কোনো মুরোদ নেই। আমিও বয়সকালে আমাদের মা-ঠাকরুণের সঙ্গে ওইসব দেশে ঘুরেছি ত, সবই জানি ওদের খাওয়া-দাওয়া আর বিদিকিচ্ছি সব ধরণ-ধারণের কথা।"

"গিলফিল-গিন্নির দেশ ইটালীতে, না?"

"তাই হবে বোধহয়, তবে আমি ঠিক কথা জানি না। মিঃ গিলফিলের কাছে ত আর ওঁর কথা বলবার জোটি ছিলনা, আর অন্য লোকে ত কিছু জানেই না। তা খুব ছেলে-বয়েসেই বোধ হয় এদেশে এসেছিলেন, ইংরিজীতে

কথা কইতেন ঠিক তোমার-আমারই মত। ইটালীয়ানদের যা হোক গলা বল্‌তে হবে। পাদ্রীর বউ যা গাইত, অমন তুমি জন্মে শোননি। একদিন আমাদের এখানে স্বামীর সঙ্গে চা খেতে এসেছিলেন। মিঃ গিলফিল হেসে বল্লেন 'দেখ প্যাটেন-গিন্নি, আমি আমার স্ত্রীকে শেপার্টনের সব, চাইতে সাজানো-গোছানো বাড়ী দেখাতে আর সকলের সেরা চা খাওয়াতে নিয়ে এসেছি। তোমার গোয়াল ঘর, ভাঁড়ার ঘর সব ওঁকে দেখাও, তারপর উনি তোমায় একটা গান শোনাবেন এখন।' তা গান তিনি শুনিয়েছিলেন বটে! তাঁর গলার ওই আওয়াজে ঘরটা যেন গমগম কচ্ছিল; আবার খানিক পরেই এমন নরম হয়ে নেমে আসছিল যেন বুকের কাছে এসে কে গুনগুনিয়ে গাইছে।"

"তারপর আর কখনো শোননি বোধহয়।"

"না; তখনই তাঁর শরীর ভাল ছিল না; আর ক'মাস পরেই ত মারা গেলেন। মোটের উপর এগারো ছমাস ছিলেন কিনা সন্দেহ। সেদিন সন্ধ্যেতেই কেমন যেন মনমরা মতন দেখাচ্ছিল। অত যে গোয়াল-ঘর দই ছানা দেখালাম তা খেয়াল কল্লেন বলে ত মনে হ'ল না। স্বামীকে খুসী করবার জন্যে ওই এক-রকম ওপর ওপর দেখলেন। আর পাদ্রী-সাহেবের কথা আর কি বলব? মেয়েমানুষকে অমন করে সর্ব্বস্ব করে তুলতে আর আমি কোনো পুরুষমানুষকে দেখিনি। তাঁর দিকে যে চাইতেন যেন ঠাকুরের পূজো কচ্ছেন, আর পথে হেঁটে যেতে তাঁর পায়ে ব্যথা লাগবার ভয়ে নিজের বুকখানা পেতে দিতেও যেন এক পা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আহা বেচারা! বউ যখন মরে গেল তখন মনে হ'ত তাঁরও প্রাণটা বুঝি ওই-সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। একদিনও কিন্তু ভেঙে পড়েননি; সেই ঘোড়ায় চড়ে গির্জ্জেয়-গির্জ্জেয় আপনার কাজ নিয়ম-মতই করে বেড়াতেন। কিন্তু চেহারা যা' হয়েছিল, মানুষ কি ছায়া বুঝবার জো নেই। চোখ দুটো যেন মড়ার মতন। কার সাধ্যি তাঁকে চেনে।"

"বিয়ে করে কিছু টাকাকড়ি পেয়েছিলেন নাকি?"

"আরে আমার কপাল! বিষয়-সম্পত্তি ও-সবই মিঃ গিলফিলের মায়ের। তাঁর টাকাও ছিল, বনিয়াদী বংশও ছিল। অমন মানুষ যে কেন অমন বিয়ে কল্লেন তা' ভগবানই জানেন। ইচ্ছে কল্লেই ত দেশের সেরা মেয়েটিকে ঘরে আনতে পারতেন। আর এতদিনে নাতি-নাতনীতে ঘর ছেয়ে যেত। আর মনে করে দেখ, ছেলেপিলের উপর ওঁর কিরকম টান।"

প্যাটেন-গিন্নি পাদ্রীসাহেবের গৃহলক্ষ্মীর বিষয়ে যা দুটি-একটি কথা জানিতেন ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া তাহা তিনি প্রায়ই এমনি করিয়া গল্প করিতেন। অবশ্য তাঁহার জ্ঞানটা নেহাৎ অল্পই ছিল তাহা ত দেখাই যাইতেছে। গিলফিল-গৃহিণীর শেপার্টনে আসিবার আগেকার কথা এই গল্পামোদী রমণীর জানা ছিল না, মিঃ গিলফিলের প্রণয়-কাহিনীও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল।

কিন্তু প্যাটেন-গৃহিণীর মত আমিও গল্প বলিতে ভালবাসি। পাঠক যদি পাদ্রী-সাহেবের প্রণয়-নিবেদন ও বিবাহ সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে চাহেন তবে তাঁহার কল্পনা-শক্তিটুকুকে একটু পিছাইয়া গত শতাব্দীর শেষভাগে লইয়া চলুন, আর মনোযোগটা পরের পরিচ্ছেদে আগাইয়া দিন।—

(ক্রমশঃ)

শ্রীশান্তা দেবী।

ডাক দিয়ে

ডাক দিয়ে ঐ উদার আকাশ বলছে যে আমায়,
একটা প্রাণে কত ধরে, কতই যে না রয় সেথায়!—
লক্ষ তপন শশী ধরে,
লক্ষ তারায় আলোক ঝরে
অক্ষৌহিণী বসুন্ধরা স্রোতে ভেসে যায়।

আছে আলো আছে আঁধার,
শ্রাবণ-রাতে বারির ধার
পাগল-করা গন্ধে-ভরা বসন্তের মলয়-বায়।

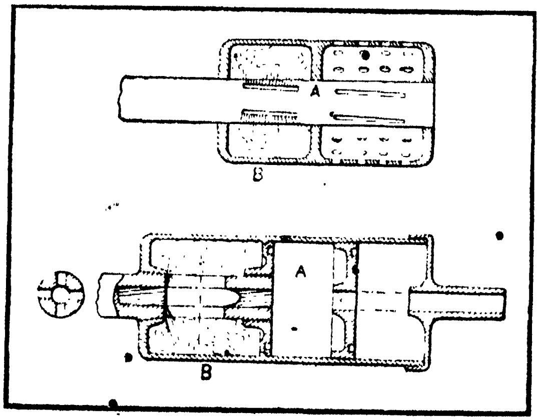
আছে শীতের কুহেলিকা,
বিদ্যুতেরই প্রলয়-শিখা,
ঊর্দ্ধে তবু ধ্রুবতারা, দিশাহারায় পথ দেখায়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পঞ্চশস্য

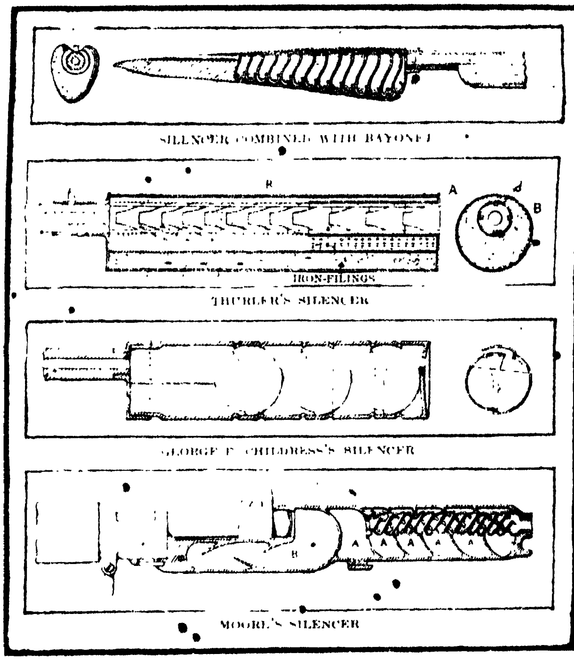
নিঃশব্দ অদৃশ্য কামান—

শত্রুর অদৃশ্য থাকিয়া শত্রুকে দেখিতে পাই, শত্রুর কামানের শব্দ শুনিতে পাই অথচ নিজেদের কামানের শব্দ নাই—অবস্থা এরূপ ঘটিলে যুদ্ধে জয়লাভ করা সহজ হইয়া আসে। যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র কামান; কিন্তু কামানের শব্দও ঢাকা যায় না এবং কামানকে অদৃশ্যও করা যায় না, একেবারে নিঃশব্দ ও অদৃশ্য কামান তৈরি করিতে পারিলে যুদ্ধজয়ের অনেক ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যায়। আজকাল ধূমহীন বারুদ প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু কেবল ধূমহীন হইলেই চলিবে না। বারুদে আগুন লাগিলে বন্দুক বা কামানের মুখে আগুন ঝিলিক মারে, সেইটি নিবারণ করা চাই। কারণ রাত্রে এই আগুনের ঝিলিক দেখিয়াই কামান কোথায় আছে টের পাওয়া যায়। জার্ম্মানেরা কামানের মুখের আগুনের ঝিলিক কমাইয়াছে যদিও, একেবারে বন্ধ করিতে পারে নাই। বারুদের সঙ্গে ক্ষার জাতীয় নুন (alkaline salts) মিশাইয়া এই ফল পাওয়া গিয়াছে; আরও ভালো ফল পাইবার জন্য নানারকম জিনিস পরীক্ষা করা হইয়াছে—ভ্যাসালিন, ক্ষার, সাবান, রজন-জাতীয় জিনিস প্রভৃতি। কিন্তু দ্যাখা গিয়াছে আগুনের ঝিলিক কমাইলে ধোঁয়ার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। সেইজন্য এই উপায়ে আগুনের ঝিলিক কমাইলেও বিশেষ ফল হইবে না। গোলা ছুঁড়িবার সময় কামানের গোলার পশ্চাতে যে দাহ্য গ্যাস বাহির হয় তাহাকে কোন-প্রকারে পাতলা বা ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারিলে ভালো ফল



কামানের শব্দ নিবারণের আধুনিক যন্ত্র।

পাওয়ার সম্ভাবনা। এক সেকেণ্ডের একশত ভাগের মধ্যে এরূপ করা দরকার। একজন বৈজ্ঞানিকের মতে যথাসময়ে কার্ব্বনিক-গ্যাস-ভরা কাঁচের পাত্র ভাঙিয়া এরূপ করা সম্ভব। পনের বৎসর পূর্ব্বে এক ফরাসী একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন যাহা দ্বারা ধোঁয়া অগ্নিশিখা ও শব্দ একসঙ্গে বন্ধ করা যাইতে পারে। কামানের মুখ হইতে যে গ্যাস বাহির হয় তাহা কামানের মুখসংলগ্ন লোহার নলের কয়েকটি কুঠরির মধ্যে ধরিবার প্রস্তাব তিনি করেন। তাঁর প্রস্তাবিত উপায় ম্যাক্সিম-



কামানের শব্দ নিবারণের যন্ত্র।

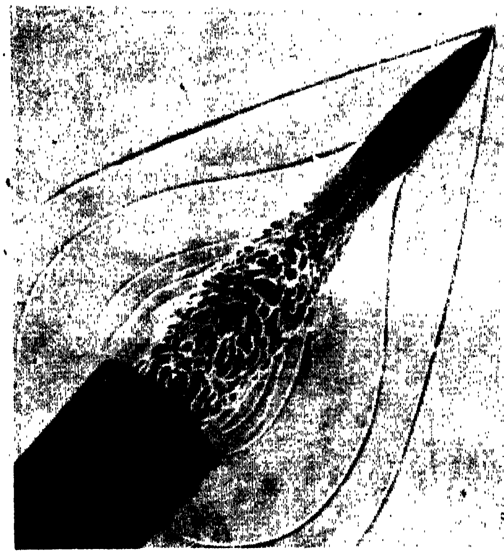
কামানের শব্দনিবারণের কাজে লাগানো হইয়াছে। চার হইতে ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং দেড় ইঞ্চি ব্যাস মাপের একটি নল আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে লাগাইয়া দেওয়া হয়। ছবি দেখিলে নলের ভিতরকার ব্যবস্থা বোঝা যাইবে। গ্যাস বাহির হইবার সময় এই নলের গোলক-ধাঁধার মধ্যে পাক খাইয়া উহা ক্রমশ ধীরগামী হইয়া আসে, এবং অবশেষে যখন বাহির হয় তখন চারিদিকের বাতাসকে অতি অল্পই আন্দোলিত করে, তাহাতে শব্দ কম হয়। এই কলটির নানারকম সংস্করণ হইয়াছে। কয়েকটিতে শব্দ এবং অগ্নিশিখা দুই-ই বন্ধ করা যায়। কতকগুলি কল ছাক্কা ধরণের কামানে বা 'মেসিন গানে' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বড় জাতের কলগুলি বিশেষ কাজের হয় নাই।

কামানের শব্দ কমানো বিশেষ প্রয়োজন। মাঝে মাঝে অবশ্য কামানের গভীর শব্দে সৈনিকের মনে সাহস আসে, কিন্তু অনবরত ঐ শব্দ শুনিতে শুনিতে অধিকাংশ স্থলে সৈনিকের স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। স্বপক্ষের কামানগুলি অদৃশ্য এবং নিঃশব্দ হইবে এবং শত্রুপক্ষে গোলাগুলি নিক্ষেপ করিয়া প্রচুর ধূম এবং মৃত্যুর বিভীষিকা সৃষ্টি করিবে, নিজেদের দিকে সব শান্ত থাকিবে কিন্তু শত্রু-শ্রেণীতে কামানের গোলা ফাটিয়া ভীষণ কোলাহল ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবে,—এরূপ হইলেই ঠিকটি হয়। তাহারই চেষ্টা চলিতেছে। সু।

ছোট গল্প রচনা—

লণ্ডনের Nash's Magazineএর সহকারী সম্পাদক ছোটগল্প রচনা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তিনি ষোলজন নামজাদা ঔপন্যাসিকের ছোটগল্প রচনা সম্বন্ধে মত সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ মতও পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার বলেন—রচনাকৌশল, শব্দসম্পদ, কল্পনা, মৌলিক ভাব এবং তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি থাকিলে যে-কেহ ছোটগল্প রচনায় হাত



শব্দ নিবারণের যন্ত্রসংযুক্ত কামানের মুখ হইতে শেল ছুটিবার ফটোগ্রাফ।

দিতে পারেন। যিনি একখানি সরস পত্র লিখিতে পারেন কিম্বা কোনো একটি ঘটনার সুবিন্যস্ত বিবরণ লিখিতে পারেন, ছোটগল্প-লেখকের আসল গুণগুলি তাঁহাতে বর্ত্তমান। তিনি বলেন, ছোটগল্প রচনায় প্রত্যেক পংক্তিতে রিভলভারের আওয়াজ বা প্রত্যেক প্যারাগ্রাফে লোমহর্ষণ চীৎকার বা ওরূপ কোনো ভয়ানক বীভৎস ব্যাপার আমদানি করিবার প্রয়োজন নাই। গল্পের আরম্ভে আভাসে বা ইঙ্গিতে প্রকাশ, কাজের চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয়। সমস্ত প্লটটি ভাবিয়া না লইয়া গল্প যেন আরম্ভ করা না হয়। ইহাই মোটামুটি গ্রন্থকারের মত।

গ্রন্থকারের মতের সঙ্গে সকলেই একমত হইবেন এমন আশা করা অন্যায়। ছোটগল্প রচনার শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ রবীন্দ্রনাথ বলেন, কোনো একটা তুচ্ছ ঘটনা দেখিয়াই তিনি গল্প রচনা আরম্ভ করিয়া দেন, সমস্ত প্লটটি ভাবিয়া লইবার জন্য গোড়াতেই মাথা ঘামাইতে বসেন না। গল্প লেখা যেমন অগ্রসর হয়, গল্পের প্লটটিও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পরিণতি লাভ করে।

যে-সমস্ত বড় বড় লেখকের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেগুলি পরস্পর যথেষ্ট বিভিন্ন। আমরা নীচে সেগুলির সার সংকলন করিয়া দিলাম।

সার আর্থার কোনান ডয়েল—"শ্রান্ত মস্তিষ্ককে খাটাইও না। তোমার যথাসাধ্য ভালো করিয়া লিখিবার চেষ্টা কর।"

উইলিআম জে লক—"ব্যক্তি হইতে চরিত্র সংগ্রহ না করিয়া এক এক রকম (type) ধরণের লোকের চিত্র অঙ্কিত কর।"

রবার্ট ডব্লিউ চেম্বার্স—"গ্রন্থকারের সকলের চেয়ে বড় বিপদ আত্মতুষ্টি। যদি অবসর সময়েও অন্য আমোদের চেয়ে লেখাটাই ভালো লাগে তবেই লেখার ব্যবসা গ্রহণ করিতে পার।"

জন গাল্‌স্‌ওয়ার্দি—"সত্যদৃষ্টি এবং শব্দাড়ম্বরহীনতা প্রয়োজন।"

ই ফিলিপ্‌স্‌ ওপেনহাইম—"সংক্ষেপে প্রকাশ কর, বেশীক্ষণ ধরিয়া একটা অবস্থা লইয়া নাড়াচাড়া করিও না। নিজে খুব কম গল্পের বই পড়িবে। অন্যান্য লেখকের রচনা-প্রণালী আয়ত্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া অবসরকাল চোখ কান খুলিয়া সচেতন অবস্থায় যাপন কর।"

উইলিআম লা কু—"খুব অভ্যাসের দরকার। এপ্রেণ্টিসগিরির কাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে লেখা ছাপাইও না।"

মরিস হিউলেট—"স্নায়বিক শক্তি এবং হৃদয়াবেগ ব্যয় করিয়া তবে লিখিতে শেখা যায়। লেখার আর্টের সঙ্গে অন্যান্য আর্টের এইখানেই প্রভেদ।"

এলিনর গ্লিন—"সংযত বিশেষণ। বাজে কথা মোটেই না।"

বিয়াট্রিস হ্যারাডেন—"অল্পের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা কর, সকল ব্যাপারের শেষ দাখাও।"

"রিটা"—"আর্টকে সংস্কারের কাছে বলি দিও না।"

জে কে জেরোম—"মানুষের সঙ্গে সকলপ্রকারে পরিচিত হও, মদ এবং বন্ধুর প্রশংসা ত্যাগ কর।"

ইসরেল জাঙ্গুইল—"গল্প লেখায় প্রকৃত সার্থকতা জীবনের নিখুঁত প্রকাশে। ইহার অর্থ এ নয় যে গল্পের চরিত্র ও ঘটনা জীবন হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। চরিত্রগুলিকে প্রাণবান করিয়া তুলিতে হইবে।"

ডব্লিউ এল জর্জ—"পঁচিশ হইতে আটাশ বৎসর বয়সের আগে খুব অল্প ইংরেজই গদ্য লেখার উপযুক্ত হয়। তাড়াতাড়ি জীবনস্মৃতি লিখিতে বসিলে তাহা খারাপ হইতে বাধ্য।"

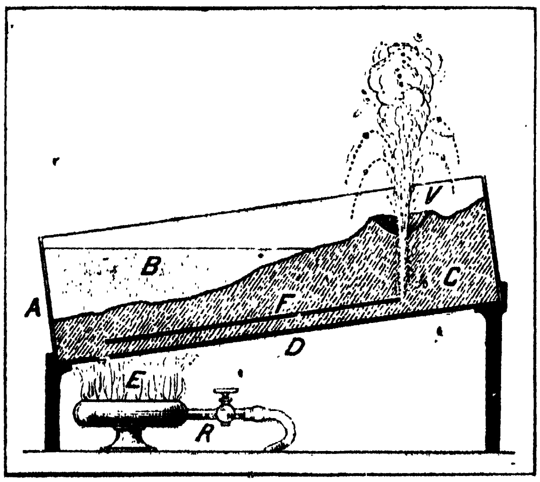
ই ভি লুকাস—"গল্প বলার স্বাভাবিক প্রতিভা যাহার নাই তাহাকে কোনো উপায়ে গল্প রচনা করিতে শেখানো যায় না।"

জি কে চেষ্টারটন—"কোনো এক ব্যাপারের নিশ্চিত ও নির্দ্দিষ্ট ধারণা লইয়া লিখিয়া যাইতে হইবে যতক্ষণ না উহা ভাঙিয়া পড়ে। এরূপ করিলে লেখক সঙ্কীর্ণমনা না হইয়া খুব উদার হইতে পারিবেন। সকল ব্যাপারে প্রয়োগ করা যায় এমন কিছুতে যদি তাহার বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে তাঁর কখনো বলিবার কথার অভাব হইবে না।"

ঙ।

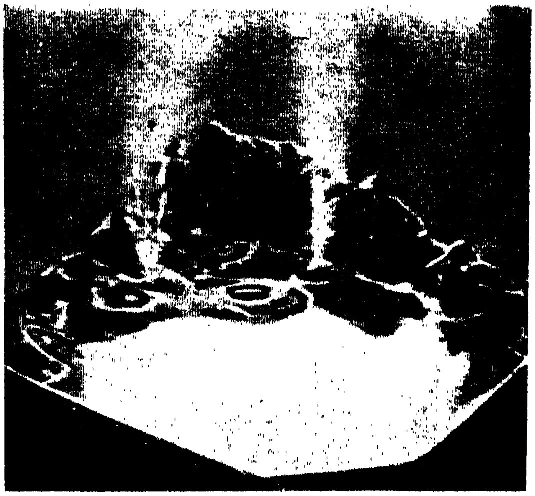
কৃত্রিম আগ্নেয়গিরি

অনেকদিন হইতে অনেক ভূতত্ত্ববিদ বলিয়া আসিতেছেন আগ্নেয়গিরির উৎপাত প্রধানত উত্তপ্ত সমুদ্রজলের বাষ্পের উপর নির্ভর করে। কথাটা কিন্তু এতদিন সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই।



কৃত্রিম আগ্নেয়গিরির নক্সা।

সম্প্রতি Emile Belot নামক এক ফরাসী কেবলমাত্র বাষ্পের সাহায্যে প্রাকৃতিক আগ্নেয়গিরির হুবহু নকল করিয়াছেন, অবশ্য অল্প স্থানের মধ্যে।



কৃত্রিম আগ্নেয়গিরি

মধ্যে আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বরে হ্রদ ; ডাইনে অগ্নি উচ্ছ্বাসের আরম্ভ ; বামে অগ্নি উচ্ছ্বাসের অবসান ; তাহার বামে নির্ব্বাপিত মুখগহ্বর।

প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে দুই ফুট একটি অগভীর পাত্রের মধ্যে খানিকটা ভিজা বালি এবং কাদা মিশাইয়া এমন ভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে I চিহ্নিত ধারটি সমুদ্র এবং C চিহ্নিত ধারটি মহাদেশকে বুঝায়। তলদেশ D মহাদেশের চারিদিকে ঢালু হইয়া গেছে। ঢালুর তলদেশ যথাসম্ভব সমান ভাবে গরম করা হয়। পাত্রের তলদেশটি ধাতু-নির্ম্মিত বলিয়া ইহার উপরিভাগ সর্ব্বত্র সমান গরম হইয়া উঠে। মিনিট দশেক পরে V চিহ্নিত স্থান হইতে অগ্ন্যুৎপাতের মত মিশ্রিত বালি ও কাদা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। উৎক্ষিপ্ত পদার্থ বৃত্তাকারে পড়িয়া ক্রেটার বা আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বর সৃষ্টি করে। V চিহ্নিত 'আগ্নেয়গিরি'র অবস্থান সর্ব্বদাই ঢালুর মাথার দিকে। এবং এ স্থানে যখন "অগ্ন্যুৎপাত" চলিতে থাকে তখন ঠিক আগুনের উপর অবস্থিত B চিহ্নিত "সমুদ্র" একেবারে ঠাণ্ডা থাকে।

প্রকৃতিতে দেখা যায় মাটির মধ্যে একটা স্তর উত্তাপকে ভিতরে গ্রহণ করে এবং তার পরের স্তরটির মধ্য দিয়া উত্তাপ একেবারে প্রবেশ করিতে পারে না। পাত্রের তলদেশ D হইতে কিছু দূরে একখানি শ্লেট রাখিয়া প্রকৃতির এই অবস্থার নকল করা যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রে শ্লেটের উপরকার প্রান্তের সমশ্রেণীতে অনেকগুলি 'আগ্নেয়গিরি'র উদ্ভব হইবে। এবং উত্তাপের উৎপত্তিস্থান R হইতে অনেক দূরে 'অগ্ন্যুৎপাত' হইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় প্রকৃতিতে কেমন করিয়া সমশ্রেণীতে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরির উদ্ভব হয়। এবং সমুদ্র হইতে অনেক দূরে কেমন করিয়া কোনো কোনো আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব সম্ভব হয়।

শ্লেটের অবস্থান এবং শ্লেটের সংস্থার পার্থক্য বা কমবেশী হইতে পারে, কিন্তু 'অগ্ন্যুৎপাত' তবুও ঢালুর মাথার দিকেই হইবে। ঢাল যে পরিমাণে খাড়া হয় এবং যে-পরিমাণে উহা সমুদ্রের দিকে ন্যুব্জ ভাবে থাকে (convexity) সেই পরিমাণে ঐরূপ স্থানে আগ্নেয়গিরির উদ্ভব সম্ভব হয়। এই কারণেই খোলা সমুদ্রে যে-সমস্ত দ্বীপ আছে সেগুলি প্রায়ই আগ্নেয়গিরিতে ভরা, এবং আটলাণ্টিকের তীরভূমি প্রশান্ত মহাসাগরের তীরভূমি অপেক্ষা অনেক কম খাড়া হওয়ায় সেখানে আগ্নেয়গিরির সংখ্যাও অনেক কম।

মার্সিয় বেলো শ্লেটখানির উপরের ধার পাত্রের তলদেশে ঠেকাইয়া রাখিয়া বাষ্পকে "সমুদ্রের" তলার দিকে পাতিত করিয়া জোয়ার ভাঁটার সৃষ্টির নকল করিয়াছেন। কয়েক ইঞ্চি চওড়া ক্রেটার তৈরি করিয়া পাত্রের তলদেশ হইতে আগুন সরাইয়া লইয়া তিনি ক্রেটারের হ্রদ সৃষ্টি করিয়াছেন। যথার্থ আগ্নেয়গিরিতে যেমন লাভার বোমা তৈরি হয় তিনিও তেমনি তাঁর নকল আগ্নেয়গিরি হইতে কাদার বোমা উৎপন্ন করিয়াছেন। তাঁর কৃত্রিম ক্রেটারের মাথার উপর দিয়া শায়িত ভাবে গরম বাষ্প ছুটিয়া চলায় মঁ পেলে নামক পাহাড় হইতে নির্গত "জ্বলন্ত মেঘ" যেমন সাঁ পিয়েরের ধ্বংস করিয়াছিল সেইরূপ ব্যাপার ঘটে। পাত্রের উপরিভাগ জলে ভরিয়া দিয়া তিনি অন্তর্জলি আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করেন। উহা জলের মধ্য হইতে আলাস্কার তীরবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জের মত দ্বীপ ঠেলিয়া তুলে। পাত্র-মধ্যস্থ জল নুনে জর্জ্জর করিয়া আগ্নেয়গিরি সুলভ অন্যান্য ব্যাপারও তিনি ঘটাইয়াছেন।

স্ব।

জাপানের সাইন-বোর্ড—

জাপানে সাইন বোর্ডের প্রচলন কবে হইতে আরম্ভ হয় তাহা জানা নাই। জাপানী ইতিহাসে উল্লেখ আছে সম্রাট গোদাইগোর (১৩১৯—১৩৩৮) রাজত্বকালে প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারী বাড়ীর দ্বারে নিজ নিজ নাম ও পেশা উল্লেখ করিয়া এক একখানি তক্তা ঝুলাইয়া রাখিতেন। সম্ভবত এই সময় হইতে সাইন বোর্ডের প্রচলন আরম্ভ হয়। আশিকাগা যুগে মদ্যব্যবসায়ীরা দোকানের সামনে সেডারগাছের পাতা টাঙাইয়া দিতেন। আজকাল জাপানী সহরে রাস্তায় চলিতে চলিতে অসংখ্য বিচিত্র সাইন বোর্ড চোখে পড়ে। খোলা মাঠ এবং পাহাড়ের গায়েতেও বড় বড় ব্যবসায়ীর সাইন বোর্ড বসানো থাকে।

তোকুগাওয়া যুগে বিজ্ঞাপন দিবার প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত হয়। বিজ্ঞাপনের বৈচিত্র্য বাড়িয়া উঠে। সাইন বোর্ডের উপর আজকাল যেরূপ ভাঙা-ভাঙা অদ্ভুত এবং অসম্ভব ইংরেজি লেখা থাকে তাহা দেখিয়া বিদেশীরা অবাক হইয়া যায়। অনেক সময়ে তার অর্থও বুঝিতে পারে না। জাপানীরা কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত নয়। ইংরেজি হরফে বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহারা ভাবে দোকানে উচুদরের বিদেশী জিনিস বিক্রয় হয় ; দোকানের উপর তাহাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়া যায়।

খাঁটি জাপানী সাইন বোর্ডে, দোকানে যে জিনিস বিক্রয় হয় সেই জিনিসেরই প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকে। শণের দড়ি বিক্রেতা দোকানের দ্বারে একগোছা শণ ঝুলাইয়া রাখে। এইরূপ খড়ের-টুপি-বিক্রেতা কয়েকটা টুপি এবং ছাতা-বিক্রেতা কয়েকটা ছাতা ঝুলাইয়া দায়। ঘড়ির দোকানের সম্মুখে হয় একটা যথার্থ বড় ঘড়ি থাকে, নয় ঘড়ির একখানি ছবি আঁকা থাকে। ঔষধের দোকানের সামনে একটা খুব বড় কাগজের খামের ছবি থাকে, কারণ অধিকাংশ জাপানী ঔষধ কাগজের খামে করিয়াই বিক্রয় হয়। জাপানী মোজা বা তাবি বিক্রেতা, তাবি সেলাই করিবার আগে যেমন করিয়া কাপড় ছাঁটা হয় সেই আকারে উহা দোকানের সামনে টাঙাইয়া রাখে। পাখা-বিক্রেতারা একখানি অসমাপ্ত পাখা দ্বারা দোকানের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে।

এইসব ছবি দোকানের ঝুড়কানিয়া ঠেলা দরজার উপর সাধারণত আঁকা থাকে। মোমবাতি বিক্রেতা মোমবাতি এবং তামাক বিক্রেতা দোক্তার রঙে দোক্তা আঁকিয়া রাখে। অনেক স্থলে ব্যবসায়ের ট্রেডমার্ক মাত্র আঁকা থাকে, পূর্ব্বে যেমন উল্লেখ করা হইয়াছে

সেডার-পাতা মদের ব্যবসায়ের ট্রেডমার্ক। পুরাকাল হইতে মদের মধ্যে সেডার-পাতা চুবাইয়া রাখিয়া সুগন্ধি মদ প্রস্তুত করা হয়। নানান আকারে এই সেডার-পাতা দোকানের সম্মুখে সাজানো থাকে। পাতা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িলে পুনরায় টাটকা পাতা দ্বারা স্থান পূর্ণ করা হয়। কোনো দোকানের সামনে একটা কাগজের লণ্ঠনের উপর পেওনগাছের ছবি দেখিলে বুঝিতে হইবে ঐ দোকানে বন্য বরাহের মাংস বিক্রয় হয়। কোথাও কাগজের লণ্ঠনের উপর মেপল্-পাতার ছবি দেখিলে বুঝিতে হইবে সেখানে হরিণের মাংস বিক্রয় হয়। ... ভালো ভালো হরিণ পাওয়া যায়।

দোকানের সম্মুখে একটি কোনো বিশেষ-রকম চিহ্ন স্থাপন করা পল্লীগ্রামে প্রচলিত আছে। স্নানাগারের সম্মুখে পর্দ্দার উপর উড়ন্ত তীরের ছবি আঁকা থাকে। তীর ছোড়ার জাপানী কথা হইতেছে "উইরু"। এবং এই শব্দের আর একটা অর্থ, গরম জলে স্নান করা। এরূপ ধরণের ধাঁধার বিজ্ঞাপন অনেক আছে।

সাইনবোর্ডগুলি কখনো কখনো দ্বারের উপর আড়া-আড়ি ভাবে টাঙানো থাকে, কখনো বা দ্বারের সম্মুখে দাঁড় করানো থাকে। কোনো-কোনোটি দ্বারের উপরে বা পাশে ঝুলানো থাকে। মেয়েদের প্রসাধনের জন্য পাউডার এবং গোলাপী রঙের দোকান অনেক আছে। এই দোকানগুলির সম্মুখে ছোটো ছোটো লাল পতাকা উড়িতে থাকে। ইহার অর্থ দোকানের পাউডার ও রং ব্যবহার করিলে সুন্দরীদের কপোল ঐ পতাকার ন্যায় রক্তিম ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে। চৌকা একখণ্ড তক্তার উপর নানান রঙের কতকগুলি গোলক আঁকা থাকিলে বুঝিতে হইবে সেটি রংয়ের দোকান।

কতকগুলি ইংরেজি বিজ্ঞাপনের নমুনা নীচে দেওয়া গেল, এইগুলিকে ধাঁধা বলিলেও চলে।

Tailor of resistant Wet, coat. অর্থ—এই দোকানে ওয়াটারপ্রুফ জামা বিক্রয় হয়।

Coat made from any hides, yours or ours—এ বিজ্ঞাপন পড়িলে বিদেশীর বুকটা ছাঁত করিয়া উঠিবে, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ মোটেই ভয়ানক নয়। খরিদ্দার বাড়ী হইতে চামড়া আনিয়া দোকান হইতে জামা করাইতে পারেন কিংবা তিনি ইচ্ছা করিলে দোকানদারই কোটের চামড়া যোগাইবে।

Ladies furnished in the upper story। অর্থ—সেইস্থানে মেয়েদের ব্লাউস চড়াইয়া রাখিবার জন্য নারী-দেহের কৃত্রিম ছাঁচ পাওয়া যায়।

সু।



জাপানের সাইন-বোর্ড।

(১) ছাতার দোকানে, (২) মেঠাইয়ের দোকানে, (৩) চিনির দোকানে, (৪) গড়মের দোকানে, (৫) মদের দোকানে, (৬) শামুকের দোকানে।

নিমজ্জিত সাবমেরিন হইতে উদ্ধারের উপায়—

সাবমেরিন দিয়া শত্রুপক্ষের প্রাণনাশ এবং আর্থিক ক্ষতি কিরূপ করা যায় তাহা বর্ত্তমান যুদ্ধে আমরা বেশ দেখিতেছি। কিন্তু এই ধ্বংসের যন্ত্রটি সময়ে সময়ে নিজ চালকদেরও মৃত্যু ঘটাইয়া বসে। অনেক সময় সাবমেরিন সমুদ্রতলে পড়িয়া যাইয়া আর উঠিতে পারে না। নাবিকগণ শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়। এরূপ বিপদ হইতে উদ্ধারের কয়েকটি উপায় সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রথম উপায়, সাবমেরিনের দর্শন-মঞ্চটি (Conning tower) এরূপ ভাবে তৈরী করা যেন যে-কোনো সময়ে উহা মূল জাহাজখানি হইতে আলগা করিয়া ফেলা যায়। এই মঞ্চে যে জিনিসগুলি থাকা দরকার



নিমজ্জিত সাবমেরিন হইতে উদ্ধারের উপায়—বিযুক্ত দর্শন-মঞ্চ।

তা' সবই থাকে, তবে বিশেষত্বের মধ্যে এই যে হাল ও এঞ্জিন চালাইবার দণ্ডগুলি (levers) মঞ্চের মেঝের নিকটে এরূপভাবে জোড়া থাকে যে ইচ্ছা করিলেই উহাদের নীচের অংশ হইতে উপরের অংশ খুলিয়া লওয়া যায়, মঞ্চের দুইদিকে দুইটি চরকী-কলে (windlass) তারের দড়ি জড়ানো থাকে এবং দড়ির এক প্রান্ত চরকী-কলের গায়ে ও অপর প্রান্ত মূলে সাবমেরিনের গায়ে আঁটা থাকে। খুব বড় বড় চারিটি স্ক্রু দিয়া মঞ্চটি সাবমেরিনের গায়ে বসানো থাকে, কোনো বিপদ ঘটিলে সাবমেরিনের নাবিকেরা সকলেই দর্শন-মঞ্চে উঠিয়া আসে এবং নীচের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। তখন অক্সিজেন-ভাণ্ডারের মুখ খুলিয়া দেওয়া হয়।

এইবারে স্ক্রু চারিটি খুলিয়া দিলেই মঞ্চটি ভাসিয়া উঠিবার চেষ্টা করে, তখন নাবিকেরা চরকী-কল ঘুরাইয়া আস্তে আস্তে উপরে ওঠে। এই চরকী-কল না থাকিলে মঞ্চটি ভীষণ বেগে জলের মধ্য দিয়া যাইয়া একেবারে লাফাইয়া শূন্যে উঠিত এবং আবার জলের উপর পড়িয়া ভাসিয়া যাইত, অথবা ভিতরের লোকগুলি পরস্পরের গায়ে এবং মঞ্চটির দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া মরিয়া যাইত। নাবিকেরা আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া জানালা খুলিয়া বৈদ্যুতিক আলোক দেখাইয়া সঙ্কেত করে, এবং অন্য জাহাজ আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করে।

যদি সাবমেরিনখানি ৩০০ ফুট পর্য্যন্ত গভীর জলে থাকে, তবেই এইভাবে উদ্ধার সম্ভবপর। ইহার বেশী নীচে জলের চাপ এত বেশী যে সাবমেরিনের লৌহ-নির্ম্মিত আবরণের মধ্য দিয়াই জল চোয়াইয়া যাইবে, এবং খিলগুলিকে নরম করিয়া অবশেষে সমস্ত জাহাজখানিকে ডিমের খোলার মত ভাঙ্গিয়া ফেলিবে!

দ্বিতীয় উপায়, সাবমেরিনে দুটি ঘর এরূপ ভাবে তৈরী করা হয়, যে, নাবিকগণ ঐ ঘর হইতে জাহাজের উপরে উঠিতে পারে। দরজাগুলি খুলিতে হইলে ঘর দুটি জলপূর্ণ করা দরকার, নতুবা দরজার বাইরে জলের চাপে উহা খোলা যায় না। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে নাবিকগণ অক্সিজেনপূর্ণ কাম্বা ডুবুরীর পোষাক পরিয়া ফেলে, এই অক্সিজেন যে শুধু শরীরকে বায়ু যোগায় তাহা নহে, জলের ভীষণ চাপ হইতেও শরীরটাকে বাঁচায়। সমুদ্র-পৃষ্ঠের ২২৫ ফুট পর্য্যন্ত নীচে এই উপায় খাটে। সমুদ্রের এই গভীরতায় জলের চাপ প্রতি-বর্গফুটে ৮½ টন অর্থাৎ প্রায় ২৩১ মণ। প্রত্যেকের পিঠে অক্সিজেন-গ্যাসের একটা চোঙ (cylinder) বাঁধা থাকে। চোঙটির ভিতর-কার গ্যাসের চাপ প্রতি-ফুটে প্রায় ১৫০ টন। এটি একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। নিঃশ্বাস লইবার সঙ্গে-সঙ্গে এই যন্ত্র ঠিক এই পরিমাণে অক্সিজেন বাহির করিয়া দেয় যেন পোষাকের ভিতরে গ্যাসের চাপ বাহিরের জলের চাপের সমান হয়। প্রত্যেক লোক শ্বাস লইয়া প্রশ্বাস-বায়ু রাসায়নিক দ্রব্যপূর্ণ একটা ছোট নলে ছাড়িয়া দেয়, অঙ্গারক গ্যাস ঐ নলে শোষিত হয় ও যবক্ষার জান (Nitrogen) নূতন অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়া আবার নিঃশ্বাস গ্রহণোপযোগী বায়ু প্রস্তুত করে।

যাহা হউক, বিপদ উপস্থিত হইলে নাবিকেরা এই পোষাক পরিয়া প্রত্যেক ঘরে ৪।৫ জন করিয়া ঢোকে এবং পিছনের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। একটা নল খুলিয়া দিয়া সমুদ্রজল ঘরের মধ্যে আনে। ঘরটি জলপূর্ণ হইয়া গেলে ভিতরের ও বাইরের চাপ সমান হয়, তখন সহজেই দরজা খুলিয়া তাহারা সাবমেরিনের উপরে যায় ও দরজা আবার বন্ধ করিয়া দেয়। সাবমেরিনের ভিতরকার লোকেরা ঐ ঘরের বাইরে থেকেই পাম্প করিয়া ঘরের জল বাহির করিয়া ফেলে। আবার ৪।৫ জন ঢোকে এবং ঘরটি জলপূর্ণ করিয়া উপরে ওঠে। এমনি করিয়া সব লোক উপরে উঠিলে একটি বড় বয়া একগাছি তারের দড়িতে বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এবং নাবিকগণ সেই দড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া যায়। উঠিতে বেশী পরিশ্রম নাই, কারণ পোষাকের ওজন ঠিক এমনি থাকে যে জলের যেখানে লোকটিকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় চেষ্টা না করিলে সে সেখানেই থাকিবে।

তৃতীয় উপায়, নাবিকেরা আদৌ সবমেরিন ছাড়িয়া বাহিরে যায় না। সাবমেরিনের উপরে দুইপ্রান্তে দুইটি বয়া থাকে। প্রত্যেক বয়ার গায়ে একটি তারের দড়ি ও একটি নমনীয় নল লাগানো থাকে, এবং উহার ঠিক নীচে একটি জল-প্রতিরোধক (water tight) ঘর থাকে। সাবমেরিনখানি কোনো কারণে জল হইতে উঠিতে না পারিলে, নাবিকেরা সেই দুটি ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পিছনের দরজা বেশ ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। তারপর বয়াটি আস্তে আস্তে ছাড়িয়া দেয়, তার সঙ্গে সঙ্গে নলটিও উঠিতে থাকে। এমনি করিয়া বয়াটি সমুদ্রপৃষ্ঠে ভাসিয়া উঠিলে নাবিকেরা পাম্প করিয়া ঐ নল দিয়া যত ইচ্ছা বায়ু আনিতে পারে। বয়ার-গায়ে-লাগানো বৈদ্যুতিক আলোক দিয়া বিপদ-বার্ত্তা জানানো হয়, এবং অন্য কোনো জাহাজ আসিয়া সাবমেরিনখানিকে ভাসাইয়া তোলে!

কৃত্রিম উপায়ে অকালে পুষ্পের হঠাৎ বিকাশ—

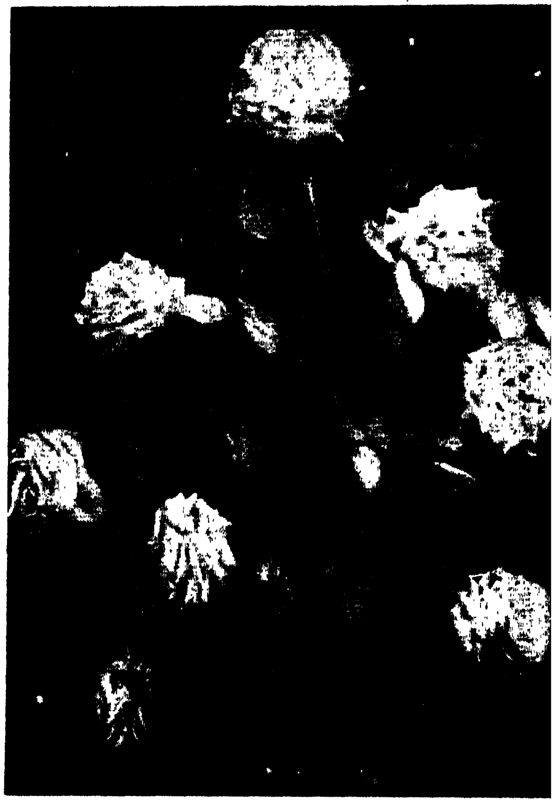
কবি বলিয়াছেন,

"তোমরা কেউ পারবে না গো
পারবে না ফুল ফোটাতে,
যতই বল, যতই কর
যতই তারে তুলে ধর
ব্যগ্র হয়ে রজনী-দিন
আঘাত কর বোঁটাতে!'

দশ-মিনিট আগে



দশ-মিনিট পরে।



কৃত্রিম উপায়ে হঠাৎ পুষ্পবিকাশ।

কবির উক্তি মন-ফুলের বিষয়ে যতই সত্য হউক, বন ফুলের বিষয়ে তত নয়, কয়েক বৎসর পূর্বে একজন ফরাসী পরীক্ষক ইহা দেখাইয়াছেন। তিনি বেশ খোলা-মেলা ভাবেই পরীক্ষা দেখাইয়াছিলেন, ও জিনিসগুলি পরীক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। সুতরাং পরীক্ষা দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন যে ইহার মধ্যে বাজীকরের চালাকী কিছুই নাই।

টবে লাগানো একটি গোলাপের চারা সকলকে দেখানো হইল। চারাটিতে কুঁড়ি ছিল মেলাই, কিন্তু ফোটা ফুল একটিও ছিল না। পরীক্ষক বলিলেন যে দশ মিনিটের মধ্যেই চারাটি ফোটা ফুলে ভরিয়া যাইবে। ইহা বলিয়া তিনি গাছের গোড়ায় একটু জল ঢালিলেন। গাছের গোড়ার মাটি ভিজিয়া উঠিতেই তিনি একটি ঢাকনি দিয়া গাছটি ঢাকিয়া দিলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে ঢাকনিটি সরানো হইলে সকলে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে গাছটি চমৎকার ফোটা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকে ফুলগুলি দেখিলেন, কেহ কেহ দু'-একটা তুলিয়াও লইলেন, এবং তাঁদের মধ্যে সকলের চেয়ে কড়া সমজদারও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে ফুলগুলিতে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা বা প্রবঞ্চনা নাই।

সম্প্রতি এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ পরীক্ষক এমন একটি গাছ লইয়াছিলেন যাহার কুঁড়িগুলি ফোটা না হইলেও ফুটিবার বেশী দেরী ছিল না। পরীক্ষা দেখাইবার অল্প সময় পূর্ব্বে গাছের গোড়ার চারিদিকের মাটিতে একটি ছোট আইল কাটিয়া দিয়া ঢাকিয়া বেশ সমান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই অবস্থায় গাছটি দর্শকদিগকে দেখানো হয়।

এইবার জল ঢালিবার পালা। কেহ কেহ ভাবিয়াছিলেন যে জলটা হয়ত খাটি জল নয়, কোনো প্রকার ঔষধ বা আর কিছু। কিন্তু জিনিসটা খাটি জলই বটে। মাটি ভিজিয়া উঠিতেই নীচের চূনে জল লাগে, চূন ফুটিতে আরম্ভ করে, তাপ উৎপন্ন হয়, এবং কতকটা জল বাষ্প হইয়া যায়; এই অবস্থায় গাছটি ঢাকিয়া দেওয়ায় ঐ গরম বাষ্প বাহির না হইয়া গাছের কুঁড়িগুলির গায়ে লাগিতে থাকে। ইহাতেই ফুলগুলি অকালে হঠাৎ ফুটিয়া ওঠে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত।

অকৃতজ্ঞ

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,—
ধ্বনি-কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে!

(কণিকা) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চড়ক

প্রতি-বৎসর দুইটি বিষুব সংক্রান্তি হয়, অর্থাৎ সূর্য্য বিষুব-রেখা দুইবার অতিক্রম করেন। একবার উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইবার সময়ে আশ্বিন মাসের শেষ দিনে, (অয়ন-গতি দ্বারা এ বৎসর ৭ই আশ্বিন—২৩ সেপ্টেম্বর), ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাইবার সময় চৈত্র মাসের শেষ দিনে (এ বৎসর ৮ই চৈত্র—২১ মার্চ্চ)। এই চৈত্র মাসের শেষ দিনে কেবল বঙ্গদেশে চড়ক পূজা হইয়া থাকে। চড়ক-পূজায় বাস্তবতঃ শিবের পূজা হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে অন্যান্য শিব-পূজার উৎসব সমারোহের সহিত হইয়া থাকে, কিন্তু চড়ক-পূজার নামও কোথাও শুনি নাই। আবার অন্য শৈব উৎসবগুলি তিথি ধরিয়া হইয়া থাকে, কিন্তু চড়ক-পূজায় তিথি-বিচার নাই। কেবল বঙ্গদেশে চড়ক পূজা কবে ও কিরূপে প্রচলিত হইল খুঁজিয়া পাই নাই। প্রবাসীর পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক সন্ধান করিতে পারেন বাধিত হইব।

আমার নিজের মতে চড়ক শব্দটি পার্শি "চর্খ্" শব্দের বিকৃত রূপ। পার্শিতে "চর্খ্" শব্দের অর্থ "যে বস্তু ঘোরে"। "চর্খ্" হইতে "চর্খা" শব্দ। পার্শি সাহিত্যে গগন-মণ্ডলের জন্যও "চর্খ্" শব্দ ব্যবহৃত হয়। পার্শিয়া বা ইরান খাঁটি আর্য্যদেশ। ইরানের পৌরাণিক রাজা জমশেদ দেশে সভ্যতা বিস্তার করেন। তিনি দেশবাসীকে চারি বর্ণে বিভক্ত করেন (১) পুরোহিত (২) যোদ্ধা (৩) ব্যবসায়ী ও (৪) কৃষক। তিনি দৈত্যদিগের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া তাহাদের দ্বারা ইট প্রস্তুত করিয়া পাকা ঘর বাঁধিবার ব্যবস্থা করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে লৌহের ব্যবহার প্রচলিত করেন। কার্পাস, উন ও রেশমের বস্ত্র বয়ন প্রচলিত করেন। (এই-সকল উন্নতি একই রাজার রাজত্বকালে হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না, তবে পুরাণে এইরূপ আছে বলিয়া লিখিলাম)। এই রাজা জমশেদই "নৌরোজ" (বা "নূতন দিন" New Year's Day) উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা। "নৌরোজ" বৎসরের প্রথম দিন অর্থাৎ যে-দিন সূর্য্য দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাইবার পথে বিষুব-রেখা অতিক্রম করে। এ উৎসবটি ইরানিদের জাতীয় উৎসব, ইহার সহিত ধর্ম্মের সংস্রব নাই। ইরানে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচলিত হইবার পরও ইরানিরা এই জাতীয় উৎসব ত্যাগ করে নাই। রাজা জমশেদের বৃদ্ধাবস্থায় পশ্চিম দেশীয় অসুরেরা (Assyrians) রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজবংশ নির্ম্মূল করে। কেবল একটি রাজপৌত্র-বধূ গর্ভাবস্থায় উত্তর দেশীয় গো-পালকদের সাহায্যে লুকাইয়া থাকেন। এই গর্ভে জমশেদের প্রপৌত্র ফরিদুনের জন্ম হয়। ফরিদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অত্যাচারী বিদেশীদের তাড়াইয়া আবার রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্য তিনি তিন পুত্রকে ভাগ করিয়া দেন। দ্বিতীয় পুত্র তূরকে উত্তর-পূর্ব্ব অংশ দিয়াছিলেন। তূরের বংশধরেরা তূরানি নামে খ্যাত। ভারতের মসলমান নরপতিরা হয় ইরানি, নয় তূরানি, বা মিশ্রবংশসম্ভূত। ইরানি ও তূরানি উভয়ের জাতীয় উৎসব "নৌরোজ", তাহাদের সহিত ভারতে আসিয়াছে। এই জাতীয় উৎসবে ইরানে একটি বড় বাঁশ পোতা হয়। তাহাকে পাতা ও ফুল দিয়া সাজাইয়া তাহার চারিদিকে নাচগান করা হয়। ইউরোপে এইটিই "মে পোল" May Pole রূপ ধারণ করিয়াছে। বঙ্গদেশের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরা দেবতার পূজা না করিয়া কেবল আমোদ করা উচিত বিবেচনা করিলেন না, তাঁহারা শিব-পূজা করিয়া "চর্খ্" বা চড়ক উৎসব করিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য এটি আমার অনুমান মাত্র, কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। ইরানের পুরাণ-সকল এখন লুপ্ত। ইসলাম ধর্ম্ম প্রচলিত হইবার পর এই-সকল পুস্তক নষ্ট হইয়াছে, কেবল পার্সীরা অল্প কয়েকখানি অতি যত্নে গোপনে রক্ষা করিয়াছেন। মহম্মদ গজনবীর রাজত্ব-কালে হয়ত আরও পুরাণ ছিল, কেননা সেই সময়ের প্রসিদ্ধ কবি ফিরদৌসী তাহার শাহনামাতে পূর্ব্ব পুরাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। এই শাহনামায় "নৌরোজ" প্রতিষ্ঠার কথা পড়িয়া আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে। তবে মুসলমানেরা ভারতের সকলদেশেই বাস করিয়াছে কিন্তু চড়ক উৎসব কেবল বঙ্গদেশেই প্রচলিত, ইহার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রী অমৃতলাল শীল।

———

পাগল

কোথা হতে আসিয়াছে কোথা তার ঘর
কেহ না জানে!
পাগল রয়েছে মাতি দিবস প্রহর
আপন গানে!
নগরে প্রান্তরে বনে গাহে শুধু সে
—'পেয়ালা মুঝে ভর দে'!

প্রভাতে প্রফুল্ল রবি ঢালে আকাশে
কনক-ধারা!
পূর্ণিমার পূর্ণাকাশ শশীর রসে
পীযূষ পারা!
ঊর্দ্ধে চাহি দেখি তাহে গাহে শুধু সে
—পেয়ালা মুঝে ভর দে!

ভ্রমর করিছে পান মধুর ফুলে
ফুলের মধু!
কলসী ভরিছে রূপে রূপের কূলে
কুলের বধূ!
সম্মুখে নেহারি তাহে গাহে শুধু সে
—পেয়ালা মুঝে ভর দে!

আকাশে বাগানে বনে আপন সুখে
পাখীরা ডাকে!
যুবতীরা গৃহে গান, শিশু মার বুকে
মায়েরে ডাকে!
মুগ্ধ নেত্রে শুনি তাহে গাহে শুধু সে
—পেয়ালা মুঝে ভর দে!

সপুষ্প পাদপতলে করে সে শয়ন
আলস ভরে!
নিশি-শেষে চ্যুত পুষ্প করে সে চয়ন
বুকের পরে!
সুরভি-পরশে মাতি গাহে শুধু সে
—পেয়ালা মুঝে ভর দে!

একদিন শেষবার গেয়ে গেল সে
নিশা-আঁধারে!
নগর, প্রান্তর, বন জাগি আবেশে
ডাকিল তারে;
দূর হতে প্রতিধ্বনি আসিল ভেসে
—পেয়ালা মুঝে ভর দে!

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

দেশের কথা

ময়মনসিংহের মুখপত্র "চারুমিহির" সত্যই বলিয়াছেন—

> বাহুবল, বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল, ধনবল এবং চরিত্রবল এই পঞ্চবল সম্পদে যে জাতি যদনুরূপ সমৃদ্ধ, জগতে সে জাতির প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারও তদনুরূপ। এই পঞ্চ সম্পদের কোন একটিতে হীন হইলে, সংসারে কেহ প্রতিপত্তি লাভ ত দূরের কথা, আত্মরক্ষা করিবারও অনধিকারী। সুতরাং সেই জাতি আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার, এমন কি আত্মরক্ষার, আশাও করিতে পারে না।

এখন দেখা যাক এই পঞ্চসম্পদ লাভের পথে বাঙালী জাতি গত এক মাসে কোন্ দিকে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে।

বাহুবল।

দুঃখের ও লজ্জার সহিত জানাইতে হইতেছে যে বাহুবল-সঞ্চয়ের কোনো বিশেষ সংবাদ আমরা পাই নাই। বাঙালী-পল্টনে যোগ দিয়া দেশের যুবকেরা যে বাহুবল অর্জ্জনে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন তাহারও কোনো আভাস আমরা পাইতেছি না। অথচ এই পরম সুযোগ অবহেলা করিলে আমাদের আর বাঁচিবার আশা একেবারেই থাকিবে না। প্রত্যেক গ্রামেই এমন অনেক নিষ্কর্ম্মা যুবক আছে যাহারা নিজের বা পরের খাইয়া বেকার বসিয়া বা অকাজে দিন কাটায়; এমন অনেক দুঃস্থ যুবক আছে যাহারা দশ-বিশ টাকার কেরাণীগিরির উমেদার; তাহাদের উচিত সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়া নিজেদের ও স্বজাতির ও স্বদেশের উপকার করা। আমরা মরা জাত বলিয়া মরিতে আমাদের বড় ভয়। প্লেগ, ওলাওঠা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, ক্ষয়রোগ প্রভৃতিতে ও অসহায় দুর্ব্বল বলিয়া হিংস্র জন্তুর মুখে আমরা

বৎসরে যত মরে, একটা যুদ্ধে তত মারা পড়ে না। কিন্তু বাঙালী-পল্টনে ভর্ত্তি হইলে মরণের ভয়ই বা কোথায়? স্বদেশরক্ষক সেনাদল ত কেবল যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বদেশ রক্ষার পাহারায় নিযুক্ত থাকিবে এবং আমাদের দেশে এখন বা আসন্ন যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনাই ত নাই। বাহুবলে হীন হইলে মানুষ আত্মমর্য্যাদা ও মাতা-কন্যা-ভগিনী-স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করিতে পারে না। কয়েক সপ্তাহ হইতে "নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু" স্বাক্ষর করিয়া একজন ভদ্রলোক কিরূপ ব্যাকুল হইয়া নিজেদের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের আততায়ীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার অসামর্থ্য জানাইয়া "চারুমিহির" পত্রিকায় পত্র লিখিতেছেন তাহা পাঠ করিলে ক্রোধে লজ্জায় দুঃখে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। আমরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া আছি বলিয়া আমরা সমগ্র জাতি জগতের সমাজে "নিম্নশ্রেণীর হিন্দু" হইয়া আছি। সেই "নিম্নশ্রেণীর হিন্দু" ভদ্রলোক সম্প্রতি সংবাদ দিয়াছেন মুক্তাগাছার নিকটে এক মেলা দেখিতে গিয়া কয়েকটি মেয়ে দুর্বৃত্তের আক্রমণে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে। তাহার পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

আজ কাতরকণ্ঠে ব্যাকুল প্রাণে সবিনয়ে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু আমি সমাজকে জিজ্ঞাসা করি, এই অশিক্ষিতা, অপরিণত বয়স্কা, অত্যাচারিতা, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু মেয়ে কোথায় দাঁড়াইবে? সমাজ তাঁহার জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবে না, পিতামাতা স্বামী তাঁহাকে একটু স্নেহ ভালবাসা দিতে পারিবে না। তদবস্থায় মা যদি আশ্রয় পাইবার আশায়, স্নেহভালবাসা পাইবার আশায় অন্য সমাজের সাদর সহানুভূতি পাইয়া সেই সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করে তবে তজ্জন্য কে দায়ী?—চারুমিহির।

তাহার জন্য দায়ী কাপুরুষ আমরা—যাহাদের শক্তি নাই অবলাকে রক্ষা করিবার অথচ অবলার উপর অত্যাচার করিবার শক্তি বিলক্ষণ আছে। যে অপমানের জন্য আমার স্ত্রী কন্যা ভগিনী দায়ী নহেন, তাহার জন্য তাঁহাদের ত্যাগ করার মতন কাপুরুষতা ক্লীবতা আর কিছু নহে। অথচ আমাদের দেশেরই শিক্ষা—

শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে পঞ্চকন্যার নাম স্মরণ করিতে হইবে। শাস্ত্রকার বলিতেছেন—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥

যে ভারত সতীর জন্মভূমি, সেই ভারতের নরনারী, সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর নাম ছাড়িয়া পাঁচজন দ্বিচারিণীর নাম লইয়া শয্যাত্যাগ করিবে। বাস্তবিক—এই পঞ্চ কন্যার নাম-স্মরণ আমাদের মহাপাতক-নাশন। ইহাঁদের কথা মনে পড়িলে আমাদের মনে ভরসা হয়—পাপী তাপী দুষ্কৃতকারীকেও সেই বিপদভঞ্জন অনাথশরণ নারায়ণ ঘৃণা করেন না। পঞ্চ কন্যা আমাদিগকে আশান্বিত করেন, তাই তাঁহারা আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া। প্রাতঃকাল উদয়ের কাল, আশার কাল, উৎসাহ উদ্যম আকাঙ্ক্ষার কাল,—এই কালে তাঁহাদেরই নাম স্মরণ করিতে হয় যাঁহারা মহাপাপী হইলেও আশার উদ্দামে একনিষ্ঠার সাধনায় জীবনে পাপ ক্ষয় করিয়াছিলেন। প্রথম প্রভাতে, দিনের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, কর্ম্মক্ষেত্রের উন্মাদনার আগে, যাঁহারা এমন আশার কথা হৃদয়ে ধরিয়া শয্যাত্যাগ করিতে পারেন, যাঁহারা মনে ভাবিতে পারেন—পাপী হই, পাষণ্ড হই, পদে পদে পতিত হই, পঞ্চ কন্যার মত পতিত পাবনের কৃপায় আমরা নিশ্চয় উদ্ধার লাভ করিব,—তাঁহারাই প্রকৃত হিন্দু।—চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

এই পঞ্চকন্যার প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় দ্বিচারিণী হইয়াও অনুশোচনায় শুদ্ধ পবিত্র হইয়াছিলেন এবং তাই তাঁহারা আমাদের স্মরণীয়; কিন্তু যাহারা অনিচ্ছায় পশুবলের কাছে পরাজিত হইয়া মর্ম্মাহত, তাঁহারা কি আমাদের অস্পৃশ্য ও পরিত্যজনীয়া হইবেন? কখনই না। যতদিন সমাজের মধ্যে এই সহজ বোধ না জন্মিবে ততদিন আমাদের ক্লীবত্ব ঘুচে নাই জানিতে হইবে। এই ক্লৈব্য ঘুচাইবার একমাত্র ঔষধ হইতেছে বাহুবলের সাধনা এবং বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত স্বচ্ছ করিয়া চিন্তাশক্তি সঞ্জীবিত করা।

বিদ্যাবল।

বিদ্যা ও শিক্ষা প্রচারের জন্য সামান্য এই কয়েকটি প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের সংবাদ আমরা পাইয়াছি—

বাখরগঞ্জ থানার অন্তর্গত কাজলাকাঠী একটি বিখ্যাত গ্রাম। গ্রামবাসী ভদ্রলোকদের উদ্যোগে গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ঐস্থানে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আশা করি বিদ্যালয়টি স্থায়ী হইবে।—বরিশাল হিতৈষী।

রহনপুরের মহাজন শ্রীযুক্ত শৈলজাকুমার দে মহাশয় ও অন্যান্যের উদ্যোগে রহনপুরে একটি এট্রান্স স্কুল স্থাপিত হইতেছে। তিনটি দালান প্রস্তুত হইতেছে। হিন্দু ও মুসলমান বোর্ডিং হইবে। রহনপুর গঞ্জে যে সকল গাড়ী যাতায়াত করে তাহাদিগের নিকট চাঁদা লইয়া প্রায় দশ হাজার টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। খুব অল্প খরচে বোর্ডিংএ থাকা চলিবে।—হিন্দুরঞ্জিকা।

রাঙ্গুনিয়া চট্টগ্রাম জেলার একটি প্রধান মহকুমা। ইহার পরিমাণফল ২৭০ বর্গমাইল; অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২৫০০০ পঁচিশ হাজার। এই অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ তিন জাতিরই বাস। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম। এজন্য গত দুই বৎসর যাবত স্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা মিলিয়া সৈদবাড়ী গ্রামে একটি উচ্চ-ইংরাজী স্কুল স্থাপনের আয়োজন করিয়াছেন। সম্প্রতি ক্লাস পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। ছাত্র সংখ্যা দুই শতের উপর। শিক্ষকদের মধ্যে একজন গ্রেজুয়েট, দুইজন আণ্ডার গ্রেজুয়েট। সংস্কৃত, পালি, পার্শি, ড্রিল প্রভৃতি শিক্ষার জন্যও শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে।—জ্যোতিঃ।

কাশিমবাজারের মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের মত বিদ্যোৎসাহী জমিদার অতি অল্পই দেখা যায়, তাঁহার মহালের সর্ব্বত্রই

তাঁহার কীর্ত্তি বিদ্যমান। সম্প্রতি ফরিদপুর জেলার হাসামপুর গ্রামের মধ্য-ইংরাজী স্কুলটিকে উচ্চ ইংরাজী স্কুল করিয়া দিয়াছেন।
—বীরভূমবাসী।

"বরিশাল জেলার অন্তর্গত ভাণ্ডারিয়া গ্রামে গত ১লা মার্চ একটি উচ্চ-ইংরাজী স্কুল খোলা হইয়াছে। এবং একজন B. A. পাশ বহুদর্শী হেড মাষ্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে। Class VII এ বহু ছাত্র দিন দিন ভর্ত্তি হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসর Class VII-এর উপরে কোন ছাত্র ভর্ত্তি করা হইবে না। আগামী বৎসর Class X পর্য্যন্ত খোলা হইবে। অল্প দিনের মধ্যেই Boarding house প্রস্তুত করা হইবে। বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্রগণ আসিয়া যাহাতে সুবিধামত জায়গীর পাইয়া পড়াশুনা করিতে পারে তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা হইবে। গরীব অথচ উপযুক্ত ছাত্রগণকে Free অথবা Half free দেওয়া হইবে।—বরিশাল হিতৈষী।

গোলকের শিশুদের ইংরাজী শিক্ষার সুবিধার নিমিত্ত একটি স্কুল স্থাপন মানসে জনসাধারণ বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন। চেষ্টাও বেশ চলিতেছে। শুনা যায় শীঘ্রই নাকি স্কুল খোলা হইবে। শুভকার্য্য শীঘ্র করাই ভাল।—বরিশাল-হিতৈষী।

বীরভূমের কুণ্ডলা গ্রামের জমীদার শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং সভ্রাতৃক শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তথায় একটি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বিগত ১২ই মার্চ্চ তারিখে উক্ত জমিদার বাবুগণের আহ্বানে বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহোদয় স্বহস্তে এই বিদ্যালয়-গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। এই নূতন ইংরাজী স্কুলের নাম হইবে "কৃপাসিন্ধু গোপেন্দ্রচন্দ্র হাই স্কুল"।
—বীরভূম-বার্ত্তা।

সিউড়ির নূতন স্কুল।—বিগত ১০ই জানুয়ারী তারিখে সিউড়িতে একটি নূতন উচ্চ-ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই স্কুলের নূতন বাড়ী নির্ম্মাণার্থ মল্লিকপুর-নিবাসী চাইবাসার সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় অষ্টাদশ সহস্র টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় আরও কয়জন ভদ্রলোক বোর্ডিংয়ের ঘর ইত্যাদির নির্ম্মাণের জন্য প্রায় দশ সহস্র [১৩ হাজার—বীরভূম-হিতৈষী] টাকা প্রদান করিবেন ঠিক করিয়াছেন। রাখাল-বাবুর স্বর্গীয় পিতার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই স্কুলের নাম হইবে "বেণীমাধব ইনিষ্টিটিউসন"।—বীরভূম বার্ত্তা।

"রাখালবাবু কথা প্রসঙ্গে আশ্বাস দিয়াছেন, যদি স্কুল কলেজে পরিণত করিবার চেষ্টা হয় তাহা হইলে তিনি তাঁহার শক্তি যথা-সম্ভব নিয়োজিত করিতে অগ্রসর হইবেন। স্কুলের স্থাপনকালীন হইতেই ইহাকে কলেজে পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষা সকলের অন্তরে জাগরিত রহিয়াছে। সৎ কার্য্যের সহায় ভগবান।—বীরভূম-হিতৈষী।

শুনিতেছি শীঘ্রই টেপা মধ্যমতরফের জমিদার দানশীল মহাত্মা রায় শ্রীযুক্ত অন্নদামোহন রায় চৌধুরী বাহাদুর মহোদয়ের উৎসাহে তদীয় জমিদারীর এলাকাধীন চামটা গ্রামে একটি মধ্য-ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইবে। তাহার আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে। তুষভাণ্ডারের সুযোগ্য ম্যানেজার-বাবুর চেষ্টা ও উৎসাহে বড়খাতা গ্রামে একটি মধ্য-ইংরাজী স্কুল ও একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। দেশে চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় যতই অধিক হয় ততই মঙ্গল।—রঙ্গপুর-দর্পণ।

বিগত জানুয়ারী মাসে বহুলাকপুর (বাঁকুড়া)-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামদয়াল দে মহাশয় স্বগ্রামে একটি অবৈতনিক মধ্য-ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার দিন প্রত্যেক বালককে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয় এবং তাহাদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করান হয়। ব্যবসায়ে অর্জ্জিত ধনের নিখুঁত সদ্ব্যয় হইয়াছে।—এডুকেশন-গেজেট।

জমিদার শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম, এ বি, এল, মহাশয় অকাতরে অন্নদান করিয়া দরিদ্র বালকের সহায়তা করিতেছেন।
—হিন্দুরঞ্জিকা।

ডাক্তার রায়ের মহত্ত্ব।—ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার বিজ্ঞান কলেজে কয়েকটি ছাত্রকে বিনা-বেতনে পড়াইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। যে-সকল সচ্চরিত্র, সদ্বংশজাত ও বুদ্ধিমান ছাত্র বি, এস সি, অথবা এম, এস সি পাশ করিয়া বিজ্ঞানচর্চা করিতে ইচ্ছা করেন, রায় মহাশয় এইরূপ ছাত্রকেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন। এ সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে ডাক্তার রায়ের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।
—২৪-পরগণা-বার্ত্তাবহ।

গৌরীপুরের দানশীল জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহোদয় নেত্রকোণা আঞ্জুমান এইচ, ই স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।—ঢাকা গেজেট।

সকল স্থানের সকল লোকের এইসব সৎদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দেশে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করা ও সহায় হওয়া উচিত।

গত চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় মন্তব্যে ম্যাট্রি-কুলেশন-পরীক্ষা স্থগিত হওয়ার প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছিল—

"অনেক বিধবা মা গয়না বন্ধক দিয়া ছেলের পরীক্ষার খরচ দিয়াছিলেন। তাঁদের মত গরীব লোকদের কি কষ্ট!"

প্রবাসীর এই আন্দাজ "কাশীপুর-নিবাসী" একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে প্রবাসীর ঐ মন্তব্য অনেক সহৃদয়কে বিচলিত করিয়াছে।—

বরিশালের মোক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "বরিশাল-হিতৈষী" পত্রের মারফতে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন—

"শুনিলাম মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অনেক গরীব ছেলে গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া ও মাতার গহনা বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছিল। পরীক্ষা বন্ধ হওয়ায়, তাহাদের পুনরায় পরীক্ষা দিতে আসা অত্যন্ত কষ্টকর হইবেক। তাই জানাইতেছি যে ঐ-প্রকার গরীব হিন্দু ৫টি ছেলেকে আগামী মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় আমার বাসায় স্থান দিতে সম্মত আছি, তাহাদের খোরাকী ও পরীক্ষাকালীন জলখাবার ইত্যাদি ব্যয় আমি দিব। নিজ নিজ স্কুলের হেড-মাষ্টারের সার্টিফিকেট সহ পরীক্ষার অন্ততঃ ১০ দিন পূর্ব্বে আমাকে জানাইতে হইবেক। ঐ সকল ছেলে ইচ্ছা করিলে পরীক্ষার অন্ততঃ ৩।৪ দিন পূর্ব্ব হইতেই আমার বাসায় থাকিতে পারিবে। —বরিশাল-হিতৈষী।

যে-সকল গরীব উপায়হীন ছাত্র পুনরায় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ব্যয় সংগ্রহ করিতে অপারগ, তাহাদের জন্য আগামী ২৫শে মার্চ্চ হইতে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার শেষ দিবস পর্য্যন্ত বাসা-খরচ ও স্কুলে জল-খাবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ছাত্রগণ স্ব স্ব হেড মাষ্টারের সার্টিফিকেট লইয়া বরিশালে আসিলে তাহাদিগকে সাহায্য করা

হইবেক। এই মর্ম্মে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় ও উকিল বাবু শরৎচন্দ্র গুহ ও বাবু বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। —কাশীপুর-নিবাসী।

ইঁহাদের এই সহৃদয়তার দৃষ্টান্তে পরীক্ষার প্রত্যেক কেন্দ্রে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে আশা করি; এইরূপ কর্ম্মের দ্বারা দেশে সমপ্রাণতা বিস্তৃত হয়; এইসব লোকই দেশের মূলধন ও গৌরব।

স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া সমাজ। কেবলমাত্র পুরুষের উন্নতি হইলেই সমাজের উন্নতি হয় না। মহামান্য বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেমস্‌ফোর্ড বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষে পুরুষ ও স্ত্রীর শিক্ষার অসমতার জন্য তাহাদের মধ্যে যে ব্যবধান ও অনৈক্য বাড়িয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া আমি ভীত হইয়াছি; স্ত্রীলোকেরা শিক্ষায় বিদ্যায় পুরুষদের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে দেশের কখনো উন্নতি হইতে পারে না।" এই কথা অতি খাঁটি। সমাজ-অঙ্গের এক অবয়ব সবল ও অন্য অবয়ব পঙ্গু হইয়া থাকিলে গার্হস্থ্য, সামাজিক রাষ্ট্রীয় কোনো ক্ষেত্রেই অগ্রসর হওয়া চলে না, সুখ শান্তি পাওয়া যায় না। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই নবীন রুষ-গণতন্ত্র স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকল লোকের সমান অধিকার স্বীকার করিয়াছেন এবং স্ত্রীলোকেরা যোগ্য হইলে মন্ত্রী ও দেশ-ধুরন্ধরের পদ পর্য্যন্ত পাইবার অধিকারিণী হইবেন। ইংলণ্ডেও স্ত্রীলোকদিগকে রাষ্ট্রপরিচালনে পুরুষদের সমকক্ষ অধিকার দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কেবল আমরাই কি জগতে এত বড় মূর্খ যে এই সোজা কথাটা কিছুতেই বুঝিব না? বা আমরাই কি জগতের বিজ্ঞতম জাতি যে, সকলজাতি যে-কাজ করিতেছে তাহা তাহাদের ভুল বুঝিয়া আমরা কিছুতেই সে পথ মাড়াইব না?

এ মাসে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে মাত্র দুটি অতি সামান্য সংবাদ আমরা পাইয়াছি।—

"বীরভূম-হিতৈষী" সংবাদ দিয়াছেন সিউড়ী বালিকা-বিদ্যালয়ের নবগৃহ-নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে। আর "এডুকেশন-গেজেট" সংবাদ দিয়াছেন—

এবার বর্দ্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ১৪ বৎসর-বয়স্কা বিবাহিতা কন্যা ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষা দিয়াছেন।

আমাদের দেশের শিক্ষা-বিস্তারের প্রধান দুই অন্তরায় দেশের লোকের দারিদ্র্য ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থার ব্যয়-বহুলতা। এই শিক্ষা-সমস্যার সমাধানের উপায় আলোচনা করিয়া "স্বরাজ" বলিতেছেন—

দেশে দিন দিন বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ছাত্র-সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কিন্তু এই সমুদয় বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে যে শিক্ষা ব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাও লক্ষ্যের বিষয়।.....

অনেক দরিদ্র ছাত্র ছাত্রাবস্থা হইতেই অর্থোপার্জ্জন করিয়া পড়াশুনা করিতে চান, কিন্তু কিরূপে অর্থোপার্জ্জন করা সম্ভবপর? এই বিশাল বাঙ্গালা দেশে কেবলমাত্র "প্রাইভেট টিউশনি" বঙ্গীয় দরিদ্র ছাত্রমহলের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু সেই প্রাইভেট টিউশনিই বা কয়টা পাওয়া যায়? .....

আমেরিকায় আমাদের ছেলেরা যান; নিজেরাই লিখিয়াছেন সেখানে তাঁহারা অনেকেই চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন। কেহবা হোটেলে ওয়েটার, কেহবা সংবাদপত্র-অফিসে নিম্নকর্ম্মচারী। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশে ইহা কি সম্ভব নয়? আমাদের দেশেও অনেক কর্ম্ম আছে যাহা ছাত্রগণ অনায়াসেই করিতে পারেন অথচ তাহাতে তাঁহাদের পড়াশুনার ও সম্মানের কিছুমাত্র হানি হইবে না।.....

প্রথমতঃ সংবাদপত্র-পরিচালকগণ ও সম্পাদকগণ যদি ছাত্রগণকে তাঁহাদিগের সহকারীরূপে নিযুক্ত করেন তবে সুন্দর হয়। "প্রুফরীডার" হইতে আরম্ভ করিয়া সহকারী-সম্পাদকের কার্য্য পর্য্যন্তও ইঁহাদিগের দ্বারা চলিতে পারে। ছাত্রগণ খুব অল্পবেতনে কার্য্য করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ পুস্তকের দোকান। বর্ত্তমানে অনেক শিক্ষিত লোক পুস্তকের দোকান করিয়াছেন, তাঁহারা ছাত্রদিগের অবস্থা বুঝেন, সুতরাং আবশ্যক অনুযায়ী তাঁহারা ছাত্রদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন। সকালে ও বিকালে ইঁহাদিগের দ্বারা সুচারুরূপে কার্য্য সমাধা হইতে পারে। অথচ বেতনও খুব কম হইবে। তৃতীয়তঃ কলিকাতার আফিসসমূহ। যে-সমুদয় মার্চ্চেণ্ট আফিসে বা অন্য কোন আফিসে কেরাণীগিরি বা অন্য কোন প্রকার কার্য্য ছাত্রদিগের দ্বারা সম্ভব, সে সমুদয় স্থানে ছাত্রদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে। এ সমুদয় ছাড়া ছাত্রগণকে দোকানে Salesman করা যাইতে পারে। তাঁহারা অবসর মত Canvassও করিতে পারেন।

এইভাবে কার্য্য করিলে যিনি নিযুক্ত করেন তাঁহারও লাভ, আর ছাত্রগণেরও লাভ। আর ছাত্রদিগের বিশেষ লাভ তাঁহারা প্রথম জীবনেই Training প্রাপ্ত হন। সুতরাং পরজীবনে জীবিকার্জ্জনের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না।

বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান। শিল্পবাণিজ্য শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে কৃষিবিদ্যার উন্নতি ও প্রচার সর্ব্বাগ্রে দরকার। এ সম্বন্ধে "চারুমিহির" কয়েকটি কাজের কথা বলিয়াছেন।—

এ দেশের কৃষককুল একে দরিদ্র, তদুপরি অশিক্ষিত। উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের কৃষকেরা কিরূপে অত্যধিক লাভবান হইতেছে, তাহার কোন কথা এ দেশের অশিক্ষিত কৃষকেরা কিছুমাত্র জানে না। অল্প ব্যয় করিয়াও কি-প্রকারে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ করিতে পারা যায়, তাহা এ দেশের কৃষকেরা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাসও করিতে পারিবে না। বিশাল বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্ট-পরিচালিত আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের সংখ্যা অতি সামান্য—পূর্ব্ববঙ্গে মাত্র ঢাকা মণিপুরায় একটি আদর্শ ক্ষেত্র আছে। পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থানের ভূমির অবস্থা, ঢাকা মণিপুরার অনুরূপ নহে। যে প্রণালীতে মণিপুরার কৃষিকার্য্য পরিচালিত হইতেছে, তাহা

দেখিয়া মধুপুর ও ভাওয়ালের জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চ ভূমির কোন কোন স্থানের কৃষকেরা কথঞ্চিৎ উপকৃত হইতে পারে। আমাদের অনুরোধ এই যে, এ দেশের যে ৭।৪ জন ভূম্যধিকারী প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় করিতে সক্ষম, তাঁহারা স্ব স্ব অধিকারে অন্ততঃ একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সত্বর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রজামণ্ডলীকে উন্নত প্রণালীর কৃষির সফলতার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করুন। গবর্ণমেণ্ট নিকটও আমাদের নিবেদন এই যে, প্রতি জেলার সদরে এবং প্রতি মহকুমায় সত্বর এক-একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সরকারী ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত করুন।

কৃষিপ্রধান দেশে কৃষকদিগকে জমিদার মহাজন প্রভৃতির অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগের অজ্ঞতা ও ভীরুতা দূর করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে কিছু কিছু প্রচেষ্টার আভাস পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তাহার মধ্যে "কৃষক-সম্মিলনী" প্রধান।—

বিগত ফেব্রুয়ারী মাসের ১৭ই তারিখে নাটোরের মৌলবী মহম্মদ এরশাদ আলি খাঁ জমীদার মহোদয়ের বাটীতে নাটোর কৃষকসম্মিলনীর দশম বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহের সহিত নিষ্পাদিত হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে সেখানে সেদিন প্রায় তিন সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। মাননীয় মিঃ এম্ আশরফ আলি সাহেব সর্ব্ব সম্মতি-ক্রমে সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব কয়টি গৃহীত হইয়াছে।

১। জমিদারী স্বত্বের কর স্থিরভাবে চলিতেছে ও চিরকাল চলিবে। কৃষি স্বত্বের কর অনন্তকাল ও অনন্ত পরিমাণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। এই বৃদ্ধি কত কাল ও কত পরিমাণ পর্য্যন্ত হইতে পারিবে তাহার চরম সীমা নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য রাজ-সরকারে প্রার্থনা করা হউক।

২। কৃষক তাহার ভূমিতে পুষ্করিণী খনন করিতে, ইমারত স্থাপন করিতে, ও ভূমির বৃক্ষাদি কর্ত্তন আদি করিতে পারিবার ক্ষমতা যুক্তে আপন ভূমি চিরকাল খরিদ-বিক্রয় করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি ঐ খরিদ-বিক্রয়ে বাধা পাইতেছে। ঐ বাধা খণ্ডাইবার, খরিদা জোতে নাম-জারিতে প্রত্যেক জোত বা জমার আফিস খরচা উল্লেখে একটিমাত্র টাকা জমিদারের পাওনা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার ও ঐ টাকা গবর্ণমেণ্টের যোগে জমিদারপক্ষের নিকটে পৌঁছা মাত্র খরিদা জোত জমাতে খরিদ দারের নামজারি গণ্য হইবার আইন করণ জন্য রাজ সরকারে প্রার্থনা করা হউক।

৩। জমিদার খাজানা গ্রহণ না করিলে যে প্রথম তারিখে প্রজা বাকী খাজানা আদালতে আমানত করিবার অধিকার পাইয়াছে জমিদারও ঠিক সেই তারিখেই ঐ খাজানার জন্য আদালতে নালিশ করিবার অধিকার পাইয়াছে। জমিদারের এই নালিশের পূর্ব্বে প্রজা তাহার খাজানা আমানত করিতে বা আমানত করিয়া তাহার নোটিশ জমিদারের প্রতি জারি করিয়া উঠিতে পারে না। এই নোটিশ জারি করিতে না পারিবার হেতুবাদে প্রজাকে খেসারার দায়ীক হইতে হয়। আদালতে খাজানা আমানতের উদ্দেশ্য বিফল হয়। অতএব জমিদারের নালিশের পূর্ব্বে প্রজা খাজানা আদালতে আমানত করিয়া যাহাতে অনায়াসে জমিদারের প্রতি নোটিশ জারি করিতে পারিয়া উঠে প্রজাকে এমত উপযুক্ত সময় দিবার ব্যবস্থা আইনে হওয়ার জন্য রাজ-দরবারে প্রার্থনা করা হউক।

৪। জমিদার কোন্ আবওয়াব গ্রহণ করেন কিনা গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ হইতে গোপনে তাহার অনুসন্ধান হইবার ও কোন-প্রকার আবওয়াব গ্রহণ করিবার বিষয় প্রমাণ হইলে তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইবার ব্যবস্থাকরণ জন্য রাজসরকারে প্রার্থনা করা হউক।

৫। কৃষিস্বত্বের জমার টাকা-প্রতি আধ আনা পথকর ধার্য্য আছে। কেহ তাহার অতিরিক্ত পথকর গ্রহণ করিলে তাহাতে অপরাধ হইবার ও ঐ অপরাধের শাস্তির বিধান হইবার জন্য রাজসরকারে প্রার্থনা করা হউক।

৬। মেয়াদী খতের দেনার টাকা আসামী আদালতে আমানত করিতে পারিবার অধিকার পাইয়াছে। সাধারণ খতে বাকী টাকাও খতিক আদালতে আমানত করিতে পারিবার অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে এরূপ আইন করণ জন্য রাজসরকারে প্রার্থনা করা হউক।

৭। পঞ্চায়তি সভার দ্বারা গ্রামে গ্রামে আদালত ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার হইবার পক্ষে আইন করণ জন্য রাজসরকারে প্রার্থনা করা হউক।

৮। মহাজনগণ কৃষকের নিকট হইতে অত্যধিক হারে সুদ গ্রহণ করিতেছেন। সুদের বাকী, আসলের টাকার চেয়ে অধিক হইতে না পারিবার পক্ষে ডীমড়ুপট আইন জারি হউক।

৯। সর্ব্বত্র নিম্নশিক্ষার বিস্তার করণ জন্য গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা হউক।

১০। জলাভাব নিবারণ জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের হাতে যে সমুদয় টাকা থাকে কনট্রিবিউশান না লইয়া ঐ-সমুদয় টাকা দ্বারা জলাভাব স্থানে পুষ্করিণী আদি দেওয়ার জন্য ডিঃ বোর্ডকে ক্ষমতা দেওয়া হউক। —পাবনা বগুড়া হিতৈষী; প্রভৃতি।

এই ক্ষেত্রে প্রজাদের সঙ্গে জমিদারের সহযোগিতা দেখিয়া আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি।

বুদ্ধিবল।

বুদ্ধিবলে বাঙালী বৈজ্ঞানিকগণ নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে ব্রতী হইয়াছেন। সম্প্রতি আমরা একটি কাজের উদ্ভাবনার সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।—

শ্রীযুত নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ আগ্রা কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি সম্প্রতি বিজ্ঞানাগারে ব্যবহৃত পেন্সিল তৈয়ার করিয়াছেন। এই পেন্সিল কাচের দ্রব্যের উপর লিখিবার জন্য বিজ্ঞানাগারে ব্যবহৃত হয়। কেবল জর্ম্মনীতে ইহা নির্ম্মিত হইত; কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে উহার আমদানি বন্ধ হইয়াছে। অধ্যাপক নাগ উহার অভাব দূর করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি দেশী দ্রব্য হইতে রঙ্গ তৈয়ার করিয়া এবং আগ্রার কাঠ হইতে ঐ পেন্সিল তৈয়ার করিয়া ইংলণ্ডের বিজ্ঞানাগার সমূহে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, "জর্ম্মন পেন্সিল অপেক্ষা উহা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে উহা ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন।" অধ্যাপক নাগ আগ্রার এক কোম্পানীর হস্তে ঐ পেন্সিল নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করিয়াছেন।—মোহাম্মদী। বরিশাল হিতৈষী। সম্মিলনী। এডুকেশন-গেজেট। ইত্যাদি।

ধনবল।

শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারিত না হইলে দেশের ধনবল বৃদ্ধি হয় না। এইক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অত্যন্ত পশ্চাতে পড়িয়া আছে; ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশ আবার সকলের পশ্চাতে

পড়িয়াছে। পরম-উদ্যোগী জর্ম্মানদের শিল্প আমদানি বন্ধ হইয়াছে; সেই সুযোগে আমরা ঘর সামলাইয়া লইতে পারিতেছি না, জাপান আসিয়া আমাদের বাজার দখল করিয়া বসিতেছে। ধনবল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দুই-একটি আশার বীজের অঙ্কুর দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।—

লক্ষ্মী ষ্টীমার।—সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্বর্গীয় অপর্ণাচরণ চৌধুরীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী ও ধুরংয়ের স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত নবচন্দ্র কেরাণী চট্টগ্রাম ও আকিয়াবের মধ্যে তাঁহাদের "লক্ষ্মী" নামক ষ্টীমার পরিচালন আরম্ভ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের মেইল ও টেলিগ্রাফিক ষ্টোর ঐ ষ্টীমারে নীত হইতেছে।—জ্যোতি।

কাগজ প্রস্তুতে উৎসাহ। রঙ্গপুরের কাগজীপাড়ার লোকদিগকে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন। উহা সত্য হইলে আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। এইরূপে দেশীয় পুরাতন শিল্পের উন্নতির প্রতি সদাশয় গবর্ণমেণ্ট দৃষ্টি করিলে দেশের অভাব অনেক পরিমাণে লাঘব হইতে পারে। রঙ্গপুর-দর্পণ।

চরিত্রবল।

আমাদের দেশের লোক এককালে চরিত্রবলে বলিষ্ঠ ছিলেন। আমাদের আদর্শ—দধীচি, যিনি স্বদেশ ও স্বজাতির রক্ষার জন্য আত্মদান করিয়াছিলেন, যাঁহার অস্থিতে বজ্র গঠিত হইয়াছিল; ভীষ্ম, যিনি চিরকুমার থাকিয়া রাজ্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; অর্জ্জুন, যিনি উর্ব্বশীকে অবহেলা করিয়াছিলেন; আর বাঙ্গালাদেশের বাঙালী মেয়ে বেহুলা আর চিন্তা। ব্রহ্মচর্য্য আর সংযম আমাদের দেশের পরম সাধনার বস্তু। কিন্তু সেদেশের এখন কী দুর্দ্দশা হইয়াছে!

মালদহ বারের প্রাচীন ও প্রবীণ উকিল ভোলাহাট নিবাসী বাবু গোপালচন্দ্র দাস মহাশয় ৩২ বৎসর বয়স্ক জনৈক প্রৌঢ় লোকের সহিত স্বীয় দৌহিত্রী কন্যা ৮ মাস বয়স্কা বালিকার বিবাহ দিয়া চক্ষু সার্থক করিয়াছেন। বৃদ্ধের বুদ্ধির বাহাদুরী বলিতে হইবে আর কি?
—মালদহ সমাচার। গৌড়দূত।

এই সংবাদটি পড়িয়া দেশের শিক্ষিত লোকের বুদ্ধি বিবেচনা ও প্রবৃত্তি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি।

"মোহাম্মদী" সংবাদ দিয়াছেন—

শ্রীহট্ট রায়নগর নিবাসী মুনশী মোহাম্মদ ছইদ সাহেবের নিকট সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতিবেশী সদ্বংশ-জাত কায়স্থ-সন্তান ২০ বৎসর বয়স্ক শিক্ষিত যুবক পবিত্রনাথ দে গত ২২শে মাঘ মোতাবেক ৪ ফেব্রুয়ারী রবিবার দিবাগত রাত্রে এসার নামাজের জমাতের পর শ্রীহট্ট বড় মসজিদের ইমাম মৌলবী নুর মোহাম্মদ সাহেবের নিকট স্বেচ্ছায় পবিত্র এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এসলামী নাম মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন রাখা হইয়াছে।

স্বীয় ধর্ম্মের অপূর্ণতা দেখিয়া অপর কোনো ধর্ম্মের মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া কেহ সেই ধর্ম্ম স্বীকার করিলে তিনি প্রশংসার যোগ্য; কিন্তু যিনি ধর্ম্মান্তর অবলম্বন করেন তিনি স্বধর্ম্মের সমস্ত তত্ত্ব বিচার করিয়া না বুঝিয়া, যাহার জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ তাহা স্বধর্ম্মে পাওয়া যায় কি না, তাহা না দেখিয়া যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন তবে তাঁহাকে সুবুদ্ধি বলা যায় না; অধিকন্তু যদি কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কেহ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম অবলম্বন করে তবে ত সে অভাজন। এই বিংশতিবর্ষীয় 'শিক্ষিত' যুবক ঐ তিন শ্রেণীর কোনটির অন্তর্গত ঠিক জানি না। এই একটি যুবক যে কিসের অভাবে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম হইতে বাহিরে চলিয়া গেল তাহা সমাজ ও ধর্ম্মের ব্যবস্থাকর্ত্তারা ভাবিয়া চিন্তিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। হিন্দুসমাজে কেন এই ভাঙন ধরিয়াছে তাহা স্থির করিয়া প্রতিকার করা শীঘ্র উচিত।

ভিখারিণীর সাধুতা। একদিন রাত্রে অংরেজা কালেক্টরীর চৌকীদারীর ক্লার্ক ঘাটে হাতমুখ ধুইয়া বাসায় যাইবার সময় পকেট হইতে ব্যাগসহ একশত টাকার ১ খানি, ১০ টাকার ১ খানি ও পাঁচ টাকার ১ খানি নোট, ৭টি টাকা ও কয়েকটি পয়সা ঐ ঘাটে ফেলিয়া যান। বাসায় গিয়াই জানিতে পারেন যে তাঁহার ব্যাগ হারাইয়াছে। পরদিন জানিতে পারেন যে একটি স্ত্রীলোক অন্দরকিল্লার কয়েকটি দোকানে বলিয়া গিয়াছে,—আমি একটা জিনিষ পাইয়াছি। তিনি যখন তাঁহাকে ব্যাগে কি আছে বলিতে পারিলেন, তখনই মেয়েটি ঐ ব্যাগ বাহির করিয়া দিল। তাহাকে ৫টি টাকা পুরস্কার দিতে চাহিলে সে বলে—"তোমার টাকা তোমাকে দিলাম, আমি টাকা লইব কেন?"—শেষে অতি কষ্টে তাহাকে পাঁচটি টাকা দেওয়া হয়। জমিদার প্রসন্ন-বাবুর বাড়ীতে যখন আশ্রয় লইয়াছিল সেখানে নাকি একদিন এক রুমালে বাঁধা একটি সোনার আংটি পুকুরের ঘাটে পাইয়া যাহার আংটি তাহাকে ঐ ভাবে ফেরত দিয়াছিল। এই মেয়েটির নাম নির্ম্মলা। তাহার বাড়ী কুমিল্লায়। এখানে আসিয়া সে প্রথমতঃ জমিদার শ্রীযুক্ত প্রসন্ন-বাবুর বাড়ীতে আশ্রয় লয়। কিন্তু মেয়েটিকে পতিতা জানিয়া ঐ বাড়ীর লোকেরা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। নানা জায়গা ঘুরিয়া সম্প্রতি সে অন্দরকিল্লায় এক মুসলমান খলিফার বাড়ীতে আছে। সে অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল। দশ বার আনা পয়সা জুটে নাই বলিয়া ছেঁড়া কাপড় পরিয়া আছে। অথচ ১২৮টি টাকা হাতে পাইয়াও পরের দ্রব্য বলিয়া তাহাতে তাহার লোভ জন্মে নাই।—জ্যোতি।

এই পতিতা মেয়েটির চরিত্রবল দেখিয়া মনে হয়, এ সহজে সমাজ ত্যাগ করে নাই; ইহার পাতিত্যের পশ্চাতে সমাজের অনেক অত্যাচার-কলঙ্ক আছে বোধ হয়।

দেশের অন্যান্য কথা।

প্রত্যেক জেলার কাগজেই ইতিমধ্যে ওলাউঠা বসন্ত প্লেগ প্রভৃতি মহামারী ও পশুপীড়ার সংবাদ আছে। সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের আভাস এরই মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেম্‌সফোর্ড সভ্য জাতির কষ্টিপাথর বলিয়াছেন। সেই কষ্টিপাথরে আমাদের

দেশের সভ্যতা নিতান্ত মেকি বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। গভর্মেণ্ট যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ১৫০ কোটি টাকা ঋণ করিতেছেন; এই ঋণ শোধ করিতে ত্রিশ বৎসর লাগিবে; সুতরাং গভর্মেণ্ট যে শিক্ষাবিস্তার ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেশী কিছু করিতে পারিবেন তাহা মনে হয় না। সুতরাং সকল বিষয়ে আমাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। পূর্ব্বে দেশের ধনী লোকেরা গ্রামে গ্রামে পুষ্করিণী কূপ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিতেন, অন্নসত্র সদাব্রত খুলিতেন; এখন তাঁহাদের লক্ষ্য বিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় পড়িয়াছে।—এ প্রচেষ্টা সাধু বটে, কিন্তু অপর দিকটা উপেক্ষিত হওয়াতে দেশে অন্নকষ্ট জলকষ্ট হইয়াছে ও তাহার ফলে পীড়া বৃদ্ধি হইতেছে। এরূপ অবস্থায় নিম্নের সংবাদগুলি পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।—

চাটমোহর, হরিপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ ও শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের স্বগ্রামে একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। —স্বরাজ।

কাঁথি অনাথাশ্রম—কাঁথি সহরের উপর মনোহরচক-নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ কর ও তদীয় ভ্রাতাগণ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তদুপরি অনেক টাকা ব্যয়ে অনাথাশ্রমের দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এখানে অনাথ আতুরগণ আশ্রয় লাভ করিবে। আশ্রমের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ উঁহারা সুন্দরবনের বংশনগর নামক লাটে তাঁহাদের ৪৭৫ বিঘা জমী আশ্রমকে দান করিয়াছেন। দাতৃবর্গের এই সদনুষ্ঠান অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি।—নীহার।

"বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী"তে এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে—

গত ১লা ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় "বেঙ্গলী" কার্য্যালয়ে বঙ্গবাসী নায়ক, বসুমতী, বাঙ্গালী, গৃহস্থ প্রভৃতি কতকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় পরিচালিত পত্রিকার সম্পাদকগণের এক বৈঠক হইয়াছিল। ঐ সভায় স্থিরীকৃত হয় যে ভারতে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবটি সকলের সমক্ষে রাখিতে হইবে এবং এ সম্বন্ধে লোকশিক্ষার জন্য ও লোকের মত গঠিত করিবার জন্য বাঙ্গালা সংবাদপত্রে এই স্বায়ত্তশাসনের কথা লইয়া ক্রমাগত আলোচনা করিতে হইবে। জাতীয় মহাসমিতির গত অধিবেশনে ভারতবাসী কি চান তাহা একটি প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং কাল-বিলম্ব না করিয়া সে-সকল সংস্কার সাধন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইতেছে, সেগুলি জাতীয় মহাসমিতির ও মসলেম-লীগের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া বিবেচনা করিয়াছেন। জাতীয় মহাসমিতি ও মসলেম-লীগ উভয়েরই মতে এই সংস্কার স্বায়ত্ত-শাসনের দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

দেশের প্রত্যেক কাগজের কর্ত্তব্য প্রত্যেক সংখ্যায় হোমরুল বা স্বরাজ সম্বন্ধে লিখিয়া দেশের লোকমত গঠন করা, সকলের স্বরাজ প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রবল করা, এবং গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দেওয়া যে স্বরাজ অপেক্ষা অল্প কোনো রাষ্ট্রীয় অধিকারই দেশের মনঃপূত হইবে না; স্বরাজ ভিন্ন দেশের দুঃখদুর্গতি ঘুচিবার নয়, দেশের গভর্ণমেণ্ট সুশৃঙ্খল ও লোকমান্য হইবার নয়। আমরা আশা করি সমস্ত সংবাদপত্র স্বদেশী ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ব্রত লইয়া নিরন্তর চেষ্টা করিবেন। স্বরাজ পাইবার পক্ষে আমাদের কি কি যুক্তি আছে ও বিদেশী স্বার্থপর লোকেরা কি কি যুক্তিতে আমাদিগকে অনুপযুক্ত মনে করে ও তাহাদের সেসব অযুক্তি ও কুযুক্তির খণ্ডন উত্তর কি কি, তাহা সকলকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া সম্পাদকদের উচিত। প্রবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই-সমস্ত বিষয় সংগ্রহ করিয়া Home Rule নামে ইংরেজিতে একখানি বই বাহির করিয়াছেন, মূল্য মাত্র বারো আনা; তাহা পাঠ করিলে সম্পাদকদের কাজ খুব সহজ হইয়া যাইবে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা

বাঙ্গালা-বানান-সমস্যা।

১। বিদেশী ভাষার কথা বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব।

বাঙ্গালা অ কারের হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই রকম উচ্চারণ আছে; আ-কারের এক হ্রস্ব উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে। এ কার দিয়া তিন রকম ধ্বনি জানান হয়। এই তিনের হ্রস্বদীর্ঘ ধরিলে ছয়ে দাঁড়ায়। ও-কারেরও এক হ্রস্বধ্বনি আছে। ব্যঞ্জন বর্ণগুলির নূতন নূতন ধ্বনি আসিয়াছে। সাধারণ পাঠকদের জন্য বাঙ্গালায় যে-সকল বই ও প্রবন্ধ লেখা হয়, তাহাতে বাঙ্গালা কথায় এই স্বর ও ব্যঞ্জন-ধ্বনির হ্রস্ব দীর্ঘ ও অন্য-প্রকার পার্থক্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়া কোনও বিশেষ লাভ নাই, বরং তাহাতে নূতন করিয়া গোলমাল উঠিবার সম্ভাবনা। ভাষাতত্ত্ব বা উচ্চারণ-তত্ত্ব লইয়া কোনও বিশেষ বই লেখা হইলে তাহাতে স্বরবর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘত্ব ও উচ্চারণের অন্য খুঁটিনাটি বিষয় জানাইবার জন্য আবশ্যক-মত বিশেষ-চিহ্ন-দেওয়া বা নূতন করিয়া উদ্ভাবিত অক্ষর ব্যবহার করিতে পারা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে আমার নিজের মত এই যে বিজ্ঞান-সম্মত রীতিতে লেখা ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক বইয়ে উচ্চারণ বা ধ্বনি জানাইতে হইলে বাঙ্গালা অক্ষরের উপর উৎপীড়ন না করিয়া রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করিলে ভাল হয়। ইউরোপে উচ্চারণ বা ধ্বনি নির্দ্দেশ করিবার জন্য রোমান বর্ণমালার অক্ষরগুলি লইয়া ও বিশেষ-চিহ্ন-দেওয়া কতকগুলি নূতন অক্ষর যোগ করিয়া যে-সকল phonetic alphabet তৈয়ারী হইয়াছে, যাহার সাহায্যে সকল-প্রকারের স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি সহজেই জানান যাইতে পারে (যেমন পারিসের Association Phonetique Internationale-এর বর্ণমালা), সেইরূপ একটি বর্ণমালার সাহায্য লওয়া উচিত। রসায়ন শাস্ত্রের (chemistry র)

মূল উপাদানের নামের সঙ্কেত বা নির্দ্দেশক চিহ্ন (symbol) গুলি যেমন আন্তর্জাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—H_2SO_4কে বাঙ্গালা রসায়নের বইয়ে যেমন 'হ২সও৪' বা H_2Oকে 'উ২অ' লেখা চলে না—ভাষাতত্ত্বের মূল উপাদান ধ্বনিগুলির আন্তর্জাতিক symbol হিসাবে, সহজ-বোধ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত, এবং ইউরোপে ও আমেরিকায় লিখিত ভাষাতত্ত্ববিষয়ক বইয়ে বিশেষরূপে প্রচলিত **a b c d, ɔ ə x** প্রভৃতি অক্ষরগুলিকে নূতন ভাবে সাজাইয়া লইয়া ও বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি নির্দ্দেশের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করিলে আমাদের জাতীয় সম্মানে আঘাত লাগিবার কোনও কারণ হইবে না।

কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা নিজেদের ও সাধারণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বাঙ্গালার ধ্বনিতত্ত্ব (phonetics)-বিষয়ে গবেষণা করুন, বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি লইয়া চুলচেরা বিচার করুন, ঠিক ধ্বনিটি নিখুঁত ভাবে নির্দ্দেশ করিবার উপযোগী symbol উদ্ভাবন করিতে থাকুন; কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বড় ধার ধারেন না এমন সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তাহার বড় একটা মূল্য নাই। বাঙ্গালা ভাষার অক্ষরগুলি এক বা একাধিক বিশেষ বিশেষ ধ্বনির মূর্ত্তি হিসাবে বাঙ্গালা ভাষার কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই-সকল ধ্বনির একটু আধটু তফাৎ যাহা আছে তাহা বাঙ্গালা বর্ণমালায় দেখান সহজ নহে; এবং খাঁটী বাঙ্গালা কথায় উচ্চারণের খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর দিবার আবশ্যকও নাই। আমাদের মাতৃভাষার কথা আমরা ঠিক-মত পড়ি, বানানের অসামঞ্জস্যে বড়-একটা আসিয়া যায় না। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় যে-সকল ধ্বনি নাই, বিদেশী নামে বা শব্দে যদি সেই-সকল ধ্বনি আসে, এবং বাঙ্গালায় যদি সেই-সকল নাম বা শব্দ লিখিতে হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা অক্ষর দিয়া তাহাদের ধরিতে গেলে মুস্কিলে পড়িতে হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে এই-সকল বিদেশী ধ্বনি উচ্চারণ করা অনেক স্থলে মোটেই কঠিন নয়, একটু নির্দ্দেশ থাকিলে বাঙ্গালী পাঠক বিদেশী শব্দটিকে ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন। কিন্তু নির্দ্দেশক চিহ্নের অভাবে অনভিজ্ঞ থাকিলে উচ্চশিক্ষিত পাঠকেরাও বহুস্থলে যথা-জ্ঞান পড়িয়া যাইতে বাধ্য হন। ফলে, বিদেশী কথা অনেক সময়ে বড়ই বিকৃত শোনায়। ঠিক-মত যাহাতে পড়িতে পারা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে গেলেই, বাঙ্গালা হরফে ফুট্‌কি বা অন্য কোনও চিহ্ন দেওয়া ছাড়া গতি নাই। ইহাতে নূতন হরফ তৈয়ারী করিতে হয়, হরফের সংখ্যা বাড়িয়া যায়, ছাপাখানা-ওয়ালারা রাজী হন না। এইজন্য ইচ্ছা থাকিলেও লেখকেরা এ বিষয়ে কিছু করিতে পারেন না।

বিদেশী ধ্বনির মধ্যে স্বর-ধ্বনি লইয়া বড় বেশী ঝঞ্ঝাট নাই। বাঙ্গালা অক্ষরের যে আধুনিক উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে দুইটি ছাড়া আর সব সাধারণ বিদেশী স্বরধ্বনি মোটামুটি ভাবে জানাইতে পারা যায়। অবশ্য হ্রস্ব দীর্ঘ জানাইবার কোনও ব্যবস্থা কতকগুলি ধ্বনির পক্ষে নাই। বিদেশী স্বরধ্বনি একেবারে ঠিকটি যদি ধরিতে না পারা যায়, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই; বাঙ্গালা অক্ষরকে না বদলাইয়া একটা কাছাকাছি দাঁড়াইলে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এখন যে দুইটি বিদেশী স্বর বাঙ্গালা অক্ষরে জানান মুস্কিল সে দুটি হইতেছে এই:—(১) ইংরেজী **but, her, sir, son**এর হ্রস্ব আ-কারের মত ধ্বনি; জর্মান, ফরাসী ও অন্যান্য অনেক ভাষায় আছে। এই ধ্বনি ইউরোপীয় কথায় থাকিলে 'অ,' 'আ' ও হালের 'অ্যা'—এই তিন উপায়ে বাঙ্গালায় লেখা হয়; যেমন, 'সর্', 'সার্', 'স্যর্' (কখন কখন 'স্যার্')। এখন এই ধ্বনি ঠিক 'অ' বা 'আ' নয়, ইহা হিন্দী মরাঠী তামিল তেলুগুর 'অ'-কারের মত। ইহাকে বাঙ্গালায় 'অ্য' রূপে লিখিলে বোধ হয় ভাল হয়; যেমন, Burns ব্যর্‌ন্‌স্, Douglas ড্যগ্‌লাস, Balfour ব্যাল্‌ফ্যর্, Milton মিল্‌ট্যন্, Sainte-Beuve স্যাঁৎ-ব্যভ্‌, Brieux ব্রিঅ্য, Königsberg ক্যনিগ্‌জ্‌-ব্যর্গ, Goethe গ্যটে (ঠিকমত গ্যা-ট্য, কিন্তু এ সম্বন্ধে বেশী উৎসাহী হইয়া 'গেটে,' 'গয়টে' প্রভৃতি প্রচলিত এ-কারান্ত রূপকে একেবারে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা করিলে কেহ শুনিবে না)। পদের মাঝে স্বরধ্বনির পর য-ফলা যুক্ত হইলে ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করিয়া পড়িবার সম্ভাবনা; কিন্তু হাইফেন্ ব্যবহার করিলে সে সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া যায়; যেমন Chatterton চ্যা-ট্যর্‌ট্যন্, Plymouth প্লি-ম্যথ্। পদের মধ্যে য-ফলার ব্যবহারে হয়ত আপত্তি উঠিতে পারে, এবং আমারও বোধ হয় চোখে যেন কেমন লাগে। কিন্তু কথার গোড়ায় এই 'অ্য' ধ্বনি আসিলে, এবং কথার শেষে বা মাঝে দুই ব্যঞ্জনধ্বনির পরে আসিলে (যেমন Milton, মিল্‌ট্যন্, Jonson জন্‌স্যন্), বোধ হয় অ-কারে য-ফলা যুক্ত করিয়া লিখিতে আপত্তি হইবে না। (২) দ্বিতীয় ধ্বনিটি ফরাসীর u এবং জার্ম্মানের ü বা ue'র ধ্বনি; ইহা 'ই' ও 'উ'র মাঝামাঝি গোছের একপ্রকার ধ্বনি; ভারতীয় বর্ণমালায় এইটিকে জানান কঠিন। ইহার উচ্চারণও অভ্যাস না করিলে সাধারণ বাঙ্গালীর মুখ দিয়া বাহির হওয়া সহজ নহে। বাঙ্গালায় ইহাকে লিখিতে গেলে 'য়ু' রূপে লেখা ছাড়া আর উপায় দেখি না। 'য়ু' লিখিলে ইহার উচ্চারণের কতকটা আন্দাজ করিতে পারা যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে 'য়ু' কে 'উ' না পড়িয়া 'yu' পড়িতে হইবে। মধ্যযুগে জর্মানে iu দ্বারা এই ধ্বনি বহুস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইত। রুষ অক্ষরে ফরাসী ও জর্মান নাম লেখা হইলে এই ধ্বনি yu রূপে লিখিত হয়; যেমন Müller, Grün, Dubois, রুষ বানানে Myuller, Gryun, Dyubva। ফরাসী কথা ইংরেজীতে আসিলে, ফরাসীর u ইংরেজীতে **yu** রূপে উচ্চারণ করা হইত ও হয়; যেমন ফরাসী peculier, ইংরেজের মুখে **pikyuliar**; cube—**kyub**; nature (নাত্যুর)-**nei-tyur**, পরে tyএর চ'য়ে পরিবর্ত্তন হয়, এবং স্বরবর্ণের উচ্চারণ ও ঝোঁক অন্যপ্রকার হইয়া যায়; তদ্রূপ attitude—**ætityud**, (ty=চ); rondure—**rɔndyur** (ɔ=অ, **dy**=জ); verdure—**vədyur** (ə=অ্য)। অতএব এই ধ্বনির সহিত অপরিচিত বিদেশীর কাছে yu রূপ ইহার সদৃশ ধ্বনি দেখা যাইতেছে; এই হিসাবে নূতন অক্ষর উদ্ভাবন না করিয়া 'য়ু' দ্বারা বাঙ্গালায় কাজ সারিতে পারা যায়; যেমন Hugo=য়ুগো, Murat—ম্যুরা, de Musset=দ্য-ম্যুসে, du Chatelet=দ্যু-শাতেলে; Müller—ম্যুলের (ম্যুলার), Brühl=ব্র্যুল্, Bühler=ব্যুলের (ব্যুলার)।

ব্যঞ্জন ধ্বনি লইয়া কিন্তু বেশী গোলমালে পড়িতে হয়। যতদিন না বাঙ্গালা হরফের সেটে জ় খ় র় প্রভৃতি হরফ সকল-ছাপাখানায় পাওয়া যাইতেছে, ততদিন যেন ইংরেজী z, w, জর্মান ch প্রভৃতির ধ্বনি বাঙ্গালা লেখায় নির্দ্দেশ করা ঘটিয়া উঠিতেছে না। কিন্তু আমি বলি যে নূতন করিয়া জ় খ় হরফ বানাইবার আবশ্যক নাই; ইংরেজী ফুল-স্টপের সাহায্যে অনায়াসে কাজ চলিতে পারে, এবং লেখকেরা z, ফরাসীর j প্রভৃতির ধ্বনি লিখিতে চাহিলে ছাপাখানা-ওয়ালাকে প্রমাদ গণিতে হইবে না। লেখকেরা যদি এবিষয়ে একটু অবহিত হন তাহা হইলে নূতন অক্ষর বাড়াইয়া ছাপাখানা-ওয়ালাদের ও কম্পোজিটর বেচারাকে বিব্রত না করিয়া এই জিনিসটা সহজেই বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। এই প্রণালী অবলম্বন করিলে নীচে-লেখা উপায়-মত বিদেশী ব্যঞ্জন-ধ্বনি বাঙ্গালায় লেখা চলিতে পারে। যিনি ঠিক উচ্চারণ করিতে পারিবেন, ভাল; যিনি না পারিবেন, তিনি বাঙ্গালার চলিত উচ্চারণ ধরিয়া পড়িলেই মূলের অনেকটা কাছাকাছি উচ্চারণ পাওয়া যাইবে।

ক.—আরবীর 'বড়ী কা.ফ.'=q: কু.ত্‌.বু-দ্দীন, মীর্-তকী, যা'কু.ব।

খ—আরবীর ও ফারসীর 'খে', জর্মানের ch : খুস্রু, খল্জী, খিলাৎ; Richter রিখ্টার্, Fichte ফিখ্টে, Bach বাখ্।

ঘ—আরবী, তুর্কী ও ফারসীর 'গ়াইন' অক্ষরের ধ্বনি: ঘুলাম, মোঘল্, তোঘ্লক্, চিরাঘ্।

জ—ইংরেজী s ও z, জর্মান s, আরবী ও ফারসী 'জে', এবং আরবীর 'ধাল, দাদ্, জো' অক্ষরের ফার্সী ও উর্দু উচ্চারণ (জ): Bridges ব্রিজেজ্, Geddes গেডিজ্, Rosalind রোজালিন্ড্, Breslau ব্রেজ্লাউ; রজীয়া, জফর্, মুইজ্জুদ্দীন, খিজ্র, হর্জ্রৎ, আওরঙ্গজেব্।

ঝ—zh, ফরাসীর j, ge, gi; Jean ঝাঁ, Joffre ঝোফ্র্, ঝোফ্ (প্রচলিত রূপ জফ্রী, জোফার), Eugenie আঝেনী।

ত—আরবীর 'তো' বর্ণ—সুলতান্, কুতব্, তাহির, নুত্ফুন্নিসা।

থ—দন্ত্য-স-ঘেঁষা উষ্ম থ, ইংরেজী thin, thickএর th, স্পেনীশের ce, ci, আরবীর 'থা' (ফার্সী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণে 'সে'); যেমন Thoburn থোবার্ন্, Thorpe থর্প্; Ciudad থিউথাদ্, থিউদাদ্, Barcelona বার্থেলোনা; হদিথ্ (=হদিস), ঘিয়াথুদ্দীন (=গিয়াসুদ্দীন)। এই থ আমাদের ত্+হ=থহ, থ নহে।

দ—আরবী 'দাদ' (=ফার্সী ও উর্দুর 'জোআদ')।

ধ—জ (z)-ঘেঁষা উষ্ম ধ, ইংরেজী then, thatএর th, স্পেনীশের d (দুই স্বরের মাঝে থাকিলে), আধুনিক গ্রীকের d, আরবীর 'ধাল' অক্ষরের ধ্বনি (=ফার্সী ও উর্দুর 'জাল')।

ফ—f, ইংরেজীর ph বা f, ফার্সীর 'ফে'। [ভারতীয় ফ=p+h, প্‌হ; বাঙ্গালায় কিন্তু মহাপ্রাণ p+hএর জায়গায় উষ্ম বা উপধ্মানীয় f খুব শুনা যায়]।

ব—'ৱ' পাওয়া না যাইলে wএর ধ্বনি জানাইবার জন্য ব-এর ব্যবহার চলিতে পারে; যেমন Wordsworth ৱর্ড্জ্ৱর্থ্। [বাঙ্গালায় waর জন্য ওআ, ওয়া, (ওা) চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু আরবী ও ফার্সী কথায় মূলানুসারী লিপ্যন্তরণে ব ব্যবহার করিতে পারা যায়]।

ভ—উষ্ম 'ভ'=ইংরেজীর v, জর্মানের w; Victoria ভিক্টোরিয়া, Viceroy ভাইস্রয়্; Wagner ভাগ্নার্, Weimar ভাইমার্; মৌলভী, ভকীল্। [ভ কেবল ইউরোপীয় শব্দে ব্যবহার করিলেই ভাল হয়; ভারতীয় শব্দে v=ব; যেমন Tinevelly=তিরুবল্লী, তিনেবেলী, Venkata=বেঙ্কট, Nigliva=নিগ্লীব]।

ল—বৈদিক ळ। ইতালীয় gl, স্পেনীশ ll, পোর্তুগীস lh-এর 'তালব্য ল'কেও ল-রূপে লিখিতে পারা যায়; llama=লামা, Magelhaes (=Magellan) মাঝেলাইঁশ্, (মাজেল্লান্)।

হ—আরবীর 'বড়ী হে'—মুহম্মদ, মহ্মুদ, হসন্।

স—আরবীর 'সাদ্'—নসির, সাহব্।

'=আরবীর 'আইন্ অক্ষর: 'ওস্মান, 'ইশ্ক্, 'আলী, শা'ইর, 'আরব, রফী'।

যাঁহাদের বিদেশী ভাষার সহিত পরিচয় আছে তাঁহারা এবিষয়ে পথ দেখাইলে ভাল হয়, বাঙ্গালায় বিদেশী ভাষার নামের বানানের একটা গতি হইয়া যায়। যতদূর জানি, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইয়ে এবিষয়ে প্রথম পথ দেখান। তারপর পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ছোট ছেলেদের জন্য একখানি ইংরেজী Word Book লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে ইংরেজী উচ্চারণ জানাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা এই ছোট বইখানি আগেকার মত আজকাল বেশী প্রচলিত নাই, কিন্তু ইহার ভূমিকায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে, এবং তাঁহার বিজ্ঞানসম্মত বর্ণান্তরীকরণ পদ্ধতিতে, শিখিবার অনেক আছে। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, পাঠক সমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় এখন এক বিরাট বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করিতেছেন। ইঁহার এই বৈশাখের প্রারম্ভেই বাহির হইবে। ইহাতে তিনি বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিবার সময় আরবী ফারসী প্রভৃতি মূল যেখানে দিয়াছেন সেখানে এইরূপ বিন্দুযুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিয়া তাঁহার অমূল্য বইয়ের উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার অভিধানের পরিশিষ্টে বাঙ্গালায় বিদেশী নাম লেখা সম্বন্ধে একটি অধ্যায় ছাপা হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালা 'লিপ্যন্তরের' একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম (উপরে-লেখা প্রণালী মত) প্রণয়নের চেষ্টা হইয়াছে, এবং অনেকগুলি বিদেশী নামের যথাযথ বাঙ্গালা বানান নির্দেশ করা হইয়াছে।

। বাঙ্গালা ভাষায় v,w

আধুনিক বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে অন্তস্থ ৱ-কারের v, w দুই উচ্চারণই শুনা যায়। তবে দক্ষিণী পণ্ডিতেরা wর যেন একটু পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়, মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতের মুখে 'বামন, বঙ্গ, বিশ্ব, বিচার, অনুবাদ' প্রভৃতি শব্দ **wamana, wanga, wis'wa, wicara,** (-চ), **anuwada**; মরাঠীদের কাছে অন্তস্থ ৱ কার wর সামিল হইয়া দাঁড়ানর দরুন মরাঠীতে ওহ্ব (=wh) দ্বারা ইংরেজী wর ধ্বনি জানায়; যেমন **ওহ্বাহ্বরায়, গওহ্বর্নমেন্ট** (হিন্দীতে ও গুজরাটীতে কিন্তু **বাহ্বরায়** বা **-রায়, গবর্নমেন্ট**); wর জন্য সাধারণতঃ **ৱ** (ৱ) ব্যবহার করে না। উত্তর ভারতের (আর্য্যাবর্ত্তের) উচ্চারণে কিন্তু v বেশী শুনি; পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের মুখে **vamana, vanga, vis'wa, vicara, anuvada** বেশী শুনিয়াছি; কিন্তু 'ত্বং' 'দ্বিত্ব' প্রভৃতিকে **twam, dwitwa** রূপে উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি, উত্তর ভারতেও **tvam, dvitva** উচ্চারণ বিরল বলিয়া মনে হয়। আরবী ও ফার্সীর 'ৱাৱ' অক্ষর, আরবী-ভাষীর মুখে w (waw), তুর্কী ও ফার্সী-ভাষীর মুখে v (vav); উত্তর ভারতে w, v দুইই শুনা যায়।

পাণিনির শিক্ষানুসারে অন্তস্থ ৱ-কারের উচ্চারণ দন্তৌষ্ঠ্য (labio-dental বা dento-labial); অর্থাৎ উপরের পাটীর দাঁত নীচের ঠোঁটে চাপিয়া উচ্চারণ করিলে যে ধ্বনি বাহির হয় তাহাই পাণিনির মতে ৱয়ের ধ্বনি; এই ধ্বনি হইতেছে ইংরেজী vর ধ্বনি। কিন্তু সামবেদের প্রাতিশাখ্য ঋকতন্ত্র ব্যাকরণের মতে 'ৱ' ওষ্ঠ্য বর্ণ। [ওষ্ঠ্যে রোঃপূ ॥৯॥ ওষ্ঠস্থানা ৱকার-ওকার-ঔকার-উপধ্মানীয়-পকার-উকার-ঊকারাঃ।] অর্থাৎ এই উচ্চারণে দাঁতের যোগ নাই, ইহা bilabial, (দুই ঠোঁটের সাহায্যে উৎপন্ন) wর উচ্চারণ। ইউরোপীয় শিক্ষা (phonetics)-এর মতে v=dento-labial spirant, voiced (অর্থাৎ ঘোষ উষ্মদন্তৌষ্ঠ্য, বা উষ্ম ভ) এবং w=semivowel.* সংস্কৃত সন্ধির 'উঅ'তে 'ৱ', ও ঋগ্বেদের ছন্দের জন্য পাঠকালে 'ৱ'কে দুই অক্ষর 'উঅ'তে বিশ্লেষ (ত্বং=তুঅম্) এবং গথিক, অ্যাঙ্গ্লো-স্যাকসন, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষার নজীর দেখিয়া অনুমান হয় যে প্রাচীনকালে আদি আর্য্য ভাষায়

---

* প্রকৃত পক্ষে ৱ-জাতীয় ধ্বনি ৩-প্রকারের—(১) bilabial semivowel=w; বৈদিক 'ৱ'; (২) bilabial spirant=w বা v; (দাঁতের সাহায্য না লইয়া কেবল দুই ঠোঁটে v উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিলে যে ধ্বনি দাঁড়ায়—ভ), পঞ্জাবীতে এবং ফরাসী ও জর্মানে এই ধ্বনি আছে। (৩) dento-labial spirant=v; লৌকিক সংস্কৃত বৈয়াকরণের মতে 'ৱ'।

ব-কারের উচ্চারণ semivowel bilabial w ছিল। পরে দন্ত্যৌষ্ঠ্য v ধ্বনি আসিয়া পড়ে, এবং প্রাচীন ভারতে বোধ হয় দেশ-ভেদে v বা w-র প্রসার ছিল, কিম্বা উচ্চারণের সুবিধা বুঝিয়া আজকালকার মত v বা w দুইই উচ্চারিত হইত। গ্রীকেরা ভারতীয় নাম যেরূপে লিখিতেন তাহা হইতে এই কথাই সমর্থিত হয় ; দেবপল্লী = **Deopalli,** সুবাস্তু = **Soastes,** ইরাবতী = **Hudraotis,** বিন্ধ্য = **Oundion** বানানে ব = w-স্থানীয় ; কিন্তু বিপাশা = **Huphasis,** বিতস্তা = **Hudaspes,** কাবেরী = **Khaberis**এর **hu** (= hw, wh, = ওহ্ব = v) এবং **b** = v হইতে দন্ত্যৌষ্ঠ ধ্বনির নির্দ্দেশ বুঝা যায়।

'আওআস' 'আওটান্' 'সোয়ামী' 'সোয়াস্তি' প্রভৃতি কথায় দেখা যায় যে যেখানে ব বাঙ্গালায় বর্গীয় ব (b) হইয়া যায় নাই, বা লোপ পায় নাই, সেখানে w রূপেই বিদ্যমান আছে। বাঙ্গালায় অন্তস্থ ব (w বা v)-এর ধ্বনি সাধারণতঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল,—হয় পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল, (যেমন—নবদ্বীপক—নবদীঅঅ—নওদীআ—নোদীয়া—নোদে, রব—রঅ—রা), না হয় বর্গীয় ব-য়ে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হালের বাঙ্গালায় w, v ধ্বনির নূতন করিয়া উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু ব অক্ষর দ্বারা ইহাদের জানাইবার চেষ্টা হয় নাই। খাঁটী বাঙ্গালা কথায় w ধ্বনি সাধারণতঃ আ-কারের পূর্ব্বে পাওয়া যায়, এবং পুরাতন পুথিতে এই wa 'ওআ, ওা, ওয়া' রূপে লিখিত দেখা যায়। 'পাওয়া' শব্দের 'পাআ' রূপ থাকিতে পারে, কিন্তু 'পাওয়া'র উচ্চারণ **pa-wa,** ঠিক **paoa** (**pa-o-a**) নয়। w, o, u—সকলগুলিই ওষ্ঠ্য ধ্বনি, একই পর্য্যায়ের ; w-র জন্য অক্ষর না মিলিলে o (ও) বা u (উ) ব্যবহার স্বাভাবিক। সেই কারণে wi বাঙ্গালায় ui (উই) লেখা হয়,—উইলিয়াম, উইল, William, Will—হিন্দীতে **বিলিয়ম, বিল** ; কুইন queen ইংরেজী উচ্চারণে **kuin** নয়, **kwin** ; ইতালীয় ভাষায় v আছে, w নাই ; ইংরেজী নাম Edward ইতালীয়ে Edoardo (আমাদের এডওয়ার্ড, এডোয়ার্ড = **Edoard**, জর্ম্মানে Eduard, ফরাসীতে Edouard) ; সেইরূপ Baldwin = Balduino (বা Baldovino). । তদ্রূপ একই চীনা কথা বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণে—Hua, Hwa ; Kuo, Kwo ; Hui, Hwi ; Hwen, Huen—দুই রকম মূর্ত্তিতে ইংরেজী বইয়ে পাওয়া যায়। w এবং o, u-র এই ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্ব হেতু ইহাদের অদল-বদল দেখা যায়। নূতন করিয়া ব-কে আমদানী না করিয়া বাঙ্গালায় wa-র ধ্বনি 'ওআ' দ্বারা বেশ চলিতেছে ; ব—এই হরফ বাঙ্গালা বর্ণমালায় b-র ধ্বনির মূর্ত্তি মাত্র ; Weber, Venice, Edwardকে 'বেবর, বেনীস, এডবার্ড' লিখিলে, ইউরোপীয় নামগুলির সহিত যাঁহার পরিচয় নাই এমন বাঙ্গালী **bebor, benis, edbardo** পড়িবেন। জোর করিয়া w-র জন্য 'ব' লিখিলে, সংস্কৃত উচ্চারণের প্রেতাত্মাকে বাঙ্গালার ঘাড়ে চাপান হয়। 'ওয়া' চলিতেছে ; 'ওয়া'র 'য়া' কে যাঁহারা দেখিতে পারেন না, তাঁহারা 'ওআ' লিখুন। 'ওা' যদি বাঙ্গালায় চলে তাহা হইলে খুবই সুবিধা হয়, শীঘ্র শীঘ্র লেখা চলে, অথচ ধ্বনি নির্দ্দেশে কোনও বাধা হয় না। খাঁটী বাঙ্গালা কথায় **wi, wu, wo** (o = অ), **wo**-র ধ্বনি আসে না ; এবং বিদেশী কথায়ও বাঙ্গালী সহজে ইহাদিগকে উচ্চারণ করিতে পারে না ; সুতরাং 'ওা' চলিলেও প্রয়োগের অভাব হেতু 'ওি ওু ওো' আসিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। wa ছাড়া এক we পাওয়া যায়, কিন্তু 'ওয়ে' [=oye] দ্বারা ইহা বেশ লেখা চলে ; এখানকার তালব্য 'য়' (y)-টা কণ্ঠ-তালব্য 'এ'র জ্ঞাতি, জ্ঞাতির আশ্রয়েই রহিয়াছে, 'ওয়া'র মত ওষ্ঠ্য 'ও' এবং কণ্ঠ্য 'আ'-র মাঝে অনধিকার-প্রবেশ করে নাই। যাঁহারা বিভীষিকা দেখেন 'ওা'কে আস্কারা দিলে ও-কার নেই পাইয়া we-র জন্য 'ওে' মূর্ত্তি ধরিয়া বসিবে, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে এ পক্ষে তিনটি অন্তরায় আছে : (১) 'ওয়ে' খাঁটী বাঙ্গালা syllable নহে, মাত্র কতকগুলি বিদেশী শব্দে আসে। (২) আগে w (ও), পরে এ (য়ে) ; লোকে সহজেই ব্যঞ্জন ধ্বনিটাকে আগে লিখিবে, ও অনুগামী স্বরটাকে পরে বসাইবে ; তাড়াতাড়ি লিখিতে গেলে 'ওয়ে' আগে বাহির হইবে, 'ওে' লিখিতে গেলে হাত কষ্ট করিতে হইবে, এবং হাত দুরস্ত হইলেও চোখে 'ওে' যেন eo, ew গোছ দেখাইবে। (৩) 'ওা'র জন্য পুরান নজীর আছে, 'ওে'র পক্ষে সেরূপ কিছুই নাই। 'ওা'র জন্য আপত্তির কারণ কি বুঝিতে পারি না ; 'অ্যা' বাঙ্গালা বানানে জাঁকিয়া উঠিয়াছে, 'অ্যাক্ওয়ার্থ' 'অ্যাট্কিন্স' 'অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান' প্রভৃতি বানান কাহারও চোখে লাগে না ; কিন্তু এই 'অ্যা' 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র আগে ছিল কি জানি না, আর 'ওা' প্রাচীন পুথিপত্রে পাওয়া যায়। তা'ছাড়া, বাঙ্গালা যাহাদের মাতৃভাষা, তাহাদের মধ্যে সংখ্যায় অর্দ্ধেকের বেশী যাহারা, সেই বাঙ্গালী মুসলমানদের মুসলমানী বাঙ্গালা সাহিত্যে 'ওা'র অবিসম্বাদিত রাজত্ব।

বাঙ্গালায় w-র জন্য অসমীয়া ৱ-র ব্যবহার চলিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগে যতদিন না এই হলেক-দেওয়া ৱ স্থান পাইতেছে ততদিন সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে ইহা গোলমেলে ঠেকিবে। w-র জন্য ৱ, ব, তদভাবে ব—চালাইতে পারিলে ত ভালই হয়। অন্ততঃ বিদেশী শব্দের উচ্চারণ কতকটা ঠিক করিয়া জানাইবার জন্য ৱ (ব, ব.) ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু ব (= b), এই জন্য কিছুতেই চলিবে না।

ব-কারের দন্ত্যৌষ্ঠ ধ্বনি, v, বাঙ্গালায় আজকাল শুনা যায়। আধুনিক বাঙ্গালায় এই ধ্বনিটি মহাপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য ধ্বনি 'ভ'এর বিকারে জাত। অন্যান্য প্রদেশের লোকের মুখে যেমন বেশ স্পষ্ট, জোর দিয়া উচ্চারিত bh শুনিয়াছি, বাঙ্গালায় 'ভ' শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের বয়স্থ ও অল্পবয়স্ক দুই-প্রকারের লোকের মুখে সেরূপটি শুনা যায় না, এবং দুই স্বরের মধ্যস্থ 'ভ' বহু স্থলে অলস ভাবে উচ্চারিত উষ্ম (v) রূপেই বেশী শুনা যায় ; যেমন, 'অভিভাবক, সভা, প্রতিভা, = **ovivabok, s'obvo,** [পূর্ব্ববঙ্গের **s'o'bb'o, s'o'bbho, s'o'bvo**], **protiva.**' ভ-এর এই উষ্ম উচ্চারণ অতি আধুনিক, বোধ হয় পঞ্চাশ বছর আগে এই উচ্চারণ ছিল না। আগে ইংরেজী কথায় v থাকিলে লোকে 'ব' দিয়াই লিখিত, 'ভ'কে আজকালকার মত v-র সামিল মনে করিত না। যেমন 'বিক্টোরিয়া, ডুবাল, বার্ণিশ, বর্সেল = Versailles, বাইসমান। এখন 'ভ', v-র অনুরূপ হইয়া পড়ায় 'ভারডুন, ভাইসরয়, ভোট' প্রভৃতি বানান। এইরূপ প্রয়োগ হইতে, ভ-কে সরাইতে পারা যাইবে না। ভ এর এই নূতন উচ্চারণ (v, ভ.) মানিয়া লইয়া ইউরোপীয় v-র ধ্বনিকে, বাঙ্গালায় যাহা স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া 'ভ'-দ্বারা লেখা উচিত। কিন্তু ভ এর মহাপ্রাণ bh ও অন্তস্থ v উচ্চারণের পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্য বিদেশী শব্দে v = ভ., এইরূপ বিন্দু-যুক্ত ভ. ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

'শব্দপ্রসঙ্গ' সম্বন্ধে দু'একটি কথা।

গত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় যে কতকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে।

১। সংস্কৃত 'শম্' ধাতুর সহিত বাঙ্গালা 'থাম্' ধাতুর কোনও সংযোগ থাকিতে পারে না। বাঙ্গালা 'থাম্' সংস্কৃত 'স্তম্ভ', শব্দ হইতে

জাত। হিন্দীতে এই প্রাকৃত ধাতুকে 'থম্ভ্‌না' 'থম্ব্‌না', 'থম্‌না,' এবং 'থাম্ভ্‌না' 'থাম্‌না' রূপে পাওয়া যায়, পঞ্জাবীতে ইহার রূপ 'থম্ম্‌ণা'; গুজরাতীতে 'থম্ভব্‌', এবং 'থাম্ভলো' 'থাম্বলো,' এবং মরাঠীতে 'থাম্বণে'। 'স্তম্ভ'—'থম্ভ' শব্দের সহিত যোগ স্পষ্ট। অবেস্তার থ্‌ম্ (থে.ম্) ধাতু হইতে বাঙ্গালা প্রাকৃত 'থাম' ধাতুর উদ্ভব একেবারে অসম্ভব। অবেস্তার ভাষায় এমন কতকগুলি ধ্বনি আছে যেগুলি ভারতীয় ভাষায় আসা সম্ভবপর ছিল না। এই ধ্বনিগুলি প্রাচীন ভারতের ভাষার পক্ষে নিতান্ত বিদেশী ও 'ম্লেচ্ছ'। অবেস্তার 'থ' ধ্বনি তাহাদের মধ্যে একটি, ইহা আমাদের মহাপ্রাণ অঘোষ দন্ত্য 'থ' (th) নয়, ইহা হইতেছে ইংরেজী think, thin, thought পদের দন্ত্য-উষ্ম 'থ',—আরবীর 'থ.', বর্ম্মীর th, এই ধ্বনি সহজেই স'য়ে পরিণত হয়, আবার দন্ত্য স ও অনেক স্থলে এই ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়, যেমন loveth—loves, আরবী 'হ.দিথ.'—ফার্সী ও উর্দু 'হদিস', 'থ.নী'—'সানী' ইত্যাদি; এবং সংস্কৃত 'বারানসী—বর্ম্মী 'বা যা ন থী', পালি 'সম্মা সম্বুদ্ধ'—বর্ম্মী উচ্চারণে 'থ.ম্মা থ.ম্বুদ্ধা'। আমাদের সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ ভাষায় এই থ নাই, ভারতে এই উচ্চারণ অজ্ঞাত। সুতরাং বাঙ্গলা 'থাম' ধাতু পারস্য হইতে আমদানী হইয়াছে এইরূপ অনুমান না করিলে √শম্—থম্—থম্—থাম—এইরূপ ব্যুৎপত্তি দাড়াইতে পারে না। সেরূপ অনুমানের পক্ষে কোনও যুক্তি দেখি না।

সংস্কৃত ও অবেস্তা (এবং প্রাচীন পারসীক) উচ্চারণতত্ত্বের একটি সূত্র এই যে সংস্কৃতের তালব্য শ'কে অবেস্তার কথায় দন্ত্য 'স' রূপে পাওয়া যায়, যেমন—'শতম্'—'সতেম্', 'শংস্'—'সঙ্‌হ্', 'বিশ্'—'বিস'; 'শর'—'সর'। এই সূত্রের উপর একটি প্রতিষেধ আছে যে আদ্য 'স' স্বরবর্ণের পূর্ব্বে থাকিলে, এবং পদের মধ্যস্থিত 'স' দুই স্বরের মধ্যে থাকিলে, অবেস্তার ভাষায় কোনও কোনও স্থলে, এবং বাণমুখ লিপির প্রাচীন পারসীক ভাষায় বহুস্থলে, বিকল্পে উষ্ম থ রূপ গ্রহণ করে। যেমন—

সংস্কৃত	অবেস্তা	প্রা. পারসীক
শম্	থে.ম, থম	
শর	সর	
অভিশর	অইবিথ্.র	
বিশ	বিস	বিথ.
শুক্র	সুখ্‌র	থুখ্.র
শংসতি	সঙ্‌হইতে	থ.াতি

এই সূত্রটি পারসীক ভাষার উচ্চারণের কথা। যে নিয়ম একটি ভাষায় খাটে সেটি সকল ভাষায় খাটে না, এমন কি এক ভাষায়ও বিভিন্ন যুগে একই নিয়ম খাটে না। ইহা মনে রাখা উচিত। প্রাচীন প্রাকৃতে পারসীকের ছাপ পড়িবার সম্ভাবনা তাদৃশ ছিল না। 'ক্ষত্রপ, দীনার, পহ্লব' প্রভৃতি কতকগুলি কথা সংস্কৃতে পারসীক হইতে লওয়া হইয়াছিল মাত্র। মুসলমান যুগে যখন বিশেষ করিয়া পারসীকের প্রভাব উত্তর ভারতের ভাষাগুলিতে আসিয়া পড়িল, তখন পারসীক আর প্রাচীন অবস্থায় নাই, আধুনিক ফারসী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফারসীতে প্রাচীন পারসীকের উষ্ম থ ধ্বনি নাই, প্রাচীনকালের 'থ' আধুনিক ফার্সীতে হয় দন্ত্য 'স'তে, না হয় 'হ'তে রূপান্তরিত হইয়াছে; যেমন,

প্রা. পারসীক থ্.শথ্.র, খথ্.র (=সং ক্ষত্র)—ফার্সী শহ্‌র্।
,, চিথ্.র (=সং চিত্র) ,, চিহ্‌র্, চিহ্‌রহ্ (চেহারা)।
,, মিথ্.র (=সং মিত্র) ,, মিহ্‌র্।
,, পুথ্.র (=সং পুত্র) ,, পুসর্, পিসর্, পুস্।
,, থ্.র (=সং ত্রি, ত্রয়) ,, সেহ্, সি।
,, থুগ্.র (=সং শুক্র) ,, সুর্খ্ (বাং সুরকী)।

এতদ্ভিন্ন, Bartholomaeর মতে অবেস্তার 'থ.' অক্ষর দন্ত্য 'স'র ধ্বনি জানাইবার আর একটি উপায় মাত্র।

২। শাস্ত্রী মহাশয় ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—√শ্বিত্, শ্‌পিত, স্পিত—ফিট।

সংস্কৃতের 'শ্ব'কে অবেস্তায় ও প্রাচীন পারসীকে 'স্প' 'শ্‌প' রূপে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃতগুলিতে 'শ্ব'এর রূপ 'সস' বা 'শশ' (মাগধীতে), প্রাকৃতে 'শ্ব'এর 'শ্‌প' বা 'স্প' রূপ পাওয়া যায় না,—প্রাকৃতের phoneticsএ পারসীকের এই নিয়ম খাটে না। মহারাজ অশোকের শাহ্‌বাজ.গঢ়ী লিপিতে একস্থানে সংস্কৃত 'স্ব'এর জায়গায় 'স্প' আছে (সব্রেষু ওরোধনেষু ভ্রতুণং চ মে স্পস্রনং চ = সর্বেষু অবরোধনেষু ভ্রাতৄণাং চ মে স্বসৄণাং চ—পঞ্চম অনুশাসন); পারসীকের মত প্রাকৃতে 'স্ব'এর 'স্প' রূপের উদাহরণ বোধ হয় এইটি ছাড়া আর নাই। কিন্তু অশোক অনুশাসনের এই পদটিকে পারসীক-প্রভাব-জাত বলা চলে; শাহবাজ.গঢ়ী পেশাওরের কাছের জায়গা, North-Western Frontier Provinceএর অন্তর্গত; সম্রাট্ দারয়বুষের (Dariusএর) কাল হইতে এই স্থানের ভাষায় ও রীতিনীতিতে পারসীক প্রভাব কিছু কিছু ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া √শ্বিত্—স্পিত—ফিট্ ব্যুৎপত্তি সমীচীন মনে হয় না। 'ফিট' কথাটিই যে বাঙ্গলায় মূল শব্দ, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 'ফিট্ ফাট্' 'ফিট্ বাবু', 'ফিট্ গৌর', 'ফিট্-সাদা'——এই কয়েকটি কথায়ই ইহার বেশী প্রয়োগ। যোগেশ বাবুর মতে সংস্কৃত √স্ফিট্ আবরণে হইতে 'ফিট্' শব্দের উৎপত্তি। তাহা হইলে 'গৌর' বা 'সাদা' শব্দের সহিত যে প্রয়োগ তাহা পরবর্ত্তী কালের, 'ফিট্' শব্দ 'বস্ত্রাবৃত' বা 'লম্ব-শাটাবৃত' অর্থে ভাষায় বহু প্রচলিত হইবার পরে 'পরিচ্ছন্ন বা শ্বেতবস্ত্রাবৃত' অর্থে 'ফিট্‌বাবু', তৎপরে এই শব্দ 'গৌর' ও 'সাদা' পদের পূর্ব্বে বসিয়া ইহাদের সাহচর্য্য করিতেছে। কেহ কেহ 'ফিট্ ফাট্' 'ফিট্ বাবু' কথার 'ফিট্'কে ইংরেজী fit শব্দ হইতে জাত বলেন। কিন্তু আমার বোধ হয় বাঙ্গালা 'ফুট্‌ফুটে'র (√স্ফুট বিকসনে*) 'ফুট' শব্দের পরিবর্ত্তনে 'ফিট্,' 'ফিট্‌ফাট্'। 'ফুট্‌ফুটে' বলিলে যে সৌকুমার্য্য ও লালিত্যের ভাব মনে হয়, 'গৌর' বা 'সাদা' কথার আগে 'ফিট্' ('ফুট্') শব্দ ব্যবহার করিয়া সেই ভাব প্রকাশের চেষ্টায় এই প্রয়োগ। বাঙ্গালায় এইপ্রকার স্বরবর্ণের পরিবর্ত্তনে জাত তির্য্যক্‌রূপের অভাব নাই।

ফার্সীর 'সপেদ্, সফে.দ্, সফ.ীদ্' শব্দের এক প্রাচীন রূপ অবেস্তার 'শ্‌পএত' (=সং শ্বেত)। আদি আর্য্য ভাষায় ***kweitos, *kweitnos** : ***kweitos** হইতে হিন্দু ইরানীয় যুগের ***s'waitas** ; ***kweitnos** হইতে প্রাচীন টিউটনীয় ***xwidnaz, *xwiddaz, *xwittaz (X = খ.)** ***hwitaz** ; ***s'waitas** হইতে সংস্কৃত **s'wetas, s'vetah,** অবেস্তার **spaeta** ; এবং ***hwitaz** হইতে গথ ভাষার **hweits,** অ্যাঙ্গ্লোস্যাকসনের **hwit.** ইংরেজী **white** (**hwait**), জর্মানের weiss (=**vais**)। বৈদিক হইতে অ্যাঙ্গ্লো-স্যাকসন নহে; এবং অ্যাঙ্গ্লোস্যাকসনের **hwit-an** ধাতু বিশেষণ **hwit** হইতে উৎপন্ন নাম-ধাতু।

* তারা-চিহ্নিত পদগুলি লুপ্ত-মূল আর্য্য-ভাষার সম্ভাব্য রূপ। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিচারের দ্বারা আদিম আর্য্য-ভাষার শব্দগুলির রূপ পুনরায় গড়িয়া তুলা হয়, সেই সম্ভাব্য পুনর্গঠিত রূপগুলি (theoretical reconstructed forms) তারা চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়।

৩। বাঙ্গালার 'খন্‌খন্‌' অনুকার শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে, অবেস্তার 'খ্বন্‌' (xvan,—x=খ.) হইতে আসা সম্ভব নয়। সং—'স্বন্‌' অবেস্তা 'খ্বন্‌', 'খ্বন্‌' হইতে ফার্সীর 'খ্বান্‌দন্‌'—পাঠ করা। অনুকার শব্দ উদ্ভব করা এবং ব্যবহার করা ভাষার প্রাণের লক্ষণ, সংস্কৃত ও অবেস্তার মিল দেখিলে বাঙ্গালা ভাষা যে জীবন্ত ভাষা তাহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। [এই যুক্তি অনুসারে ব্যুৎপত্তি করিলে বাঙ্গালার 'ঠংঠং' বা 'ঠন্‌ঠন্‌'কে বৈদিক স্তন্‌ ধাতুর সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া কঠিন হইবে না। সংস্কৃত '√স্বন্‌'এর সঙ্গে বাঙ্গালা কথার যোগ যদি খুঁজিতে হয়, তাহা হইলে 'সন্‌সন' শব্দের সঙ্গেই ইহার যোগ থাকা সম্ভব, 'খন্‌ খন্‌'এর সহিত নহে।]

৫। 'হালা' শব্দ ('হিত্বা হালাম্‌ অভিমতরসাং রেবতী লোচনাঙ্কাম্‌'—মেঘদূত) অবেস্তার 'হুরা' হইতে আসা সম্ভব নয়। সংস্কৃত শব্দের মধ্যস্থিত 'স' প্রাকৃতে 'হ' রূপে পাওয়া যায় বটে (যেমন একাদশ =এগ্গারহ —এগারহ, দিবস —দিঅহ), কিন্তু আদ্য 'স' কোথায়ও 'হ' হইয়া যায় না, অবেস্তার এ নিয়ম প্রাকৃতে খাটে না। তা' ছাড়া, সংস্কৃতের 'উ' প্রাকৃতে 'আ' কার হইয়া যাওয়ার উদাহরণ কোথাও পাই নাই। ব্যঞ্জন ধ্বনির সম্বন্ধে যেরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে, স্বর ধ্বনির পক্ষেও সেইরূপ। শাস্ত্রী মহাশয় রামদেব যে মত তুলিয়া দিয়াছেন, বোধ হয় তাহাই ঠিক, শব্দটি 'দেশী' অর্থাৎ অনার্য। আমার ধারণা এই যে ইহা মুণ্ডা ভাষার শব্দ, মুণ্ডারী এবং হো 'হাঁড়িয়া', 'হাঁরিয়া', সাঁওতালী 'হেঁড়ে', এবং হিন্দী 'কল্‌বার, কলাল, কলার' (শুঁড়ী, মদ্যবিক্রেতা অর্থে) শব্দের 'কল্‌' এবং সংস্কৃত 'হালা'—প্রাচীন মুণ্ডা কোনও শব্দ হইতে উৎপন্ন। অবশ্য এ সম্বন্ধে আমার সুদৃঢ় যুক্তি নাই। যে দুই তিনটি মুণ্ডা শব্দ আর্য্য ভাষায় পাওয়া যায়, তাহাতে 'হ' এবং 'ক'এর অদল বদল দেখা যায়, মুণ্ডা—'হোড়ো', —মানুষ, সংস্কৃতে 'কোল্ল' ('কোল') জাতিবাচক, 'দাক'- জল, বাঙ্গালা—'দহ' (সংস্কৃত 'হ্রদ' হইতে উৎপন্ন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন), 'হাড়া'—বলদ, মানভূমের বাঙ্গালায় 'কাড়া' মহিস। এই প্রকারে 'হাঁরিয়া'র প্রাচীন রূপ হইতে 'হালা' ও আধুনিক 'কল্‌(বার)' আসা একেবারে অসম্ভব নহে। 'হাঁড়িয়া' শব্দ 'হাঁড়ী', 'হাণ্ডী'র (সংস্কৃত ভাণ্ড শব্দজ) সহিত সম্পৃক্ত কিনা জানি না, খুব সম্ভব নহে, সাঁওতাল, হো, মুণ্ডারী এবং দ্রাবিড়ী ওরাওঁ জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছোটনাগপুর প্রদেশ ভিন্ন অন্যত্র এই শব্দের প্রচলন আছে কি? 'কল্‌বার' শব্দ 'কল' (=machine) পদের সহিত যুক্ত করা অনিবার্য্য, কিন্তু ধান্যয়া মদ চোয়াইতে কি কলের বা যন্ত্রপাতির দরকার? অপিচ এই ধান্যয়া মদ মুণ্ডাজাতির পক্ষে ভাতের মত নিত্যব্যবহার্য্য। মুণ্ডা ভাষায় 'ইলি' বলিয়া আর একটি শব্দ আছে, ইহাও ধান্যয়া মদ অর্থে ব্যবহৃত হয়, 'ইলি' ও 'হাঁরিয়া', 'হালা', 'কল'—ইহাদের পরস্পর যোগ আছে কি? [সাঁওতালী বাইবেলে মদ্য অর্থে 'দাকবাসা' পদ দেখিয়াছি; ইহা কি সংস্কৃত 'দ্রাক্ষারস' হইতে জাত, না সাঁওতালী 'দাক্‌' (=জল, জলীয়) পদের সহিত অন্য পদ যোগে সিদ্ধ? তামিলে মদ অর্থে 'তিরাট্‌শারশম্‌' =দ্রাক্ষারসঃ, খাঁটি দ্রাবিড় পদ কি, তাহা জানিতে পারি নাই।]

৬। 'উর্ব্বরা' শব্দ 'তরুবরা' শব্দের 'ত' লোপে সম্ভাব্য অপভ্রংশ হইতে নহে। 'তরু' শব্দটি পরবর্ত্তী যুগে, সম্ভবতঃ উত্তর পশ্চিমের পৈশাচী প্রাকৃতের প্রভাবে, 'দ্রু' হইতে জাত। 'উর্ব্বরা' শব্দ বৃ ধাতু (বৃণোতি, ঊর্ণোতি, বরতে—আচ্ছাদন করে) হইতে জাত। উর্ব্বরা—আচ্ছাদিত বা শস্যাদি দ্বারা আবৃত ভূমি। অবেস্তার 'উর্ব্বর' শব্দের যে অর্থ পাওয়া যায় (বৃক্ষ, বৃক্ষশ্রেণী) তাহা গৌণ অর্থ। 'উর্ব্বরা,' 'উর্ব্বর' শব্দের সহিত সমজাত ও সমার্থক শব্দ অন্যান্য আর্য্য ভাষায় আছে, গ্রীকে **aroura** =কৃষিক্ষেত্র, **olura**=গোধূম; লাটিনে **arvum** (আর্‌বুম্‌)—কৃষিক্ষেত্র, আর্ম্মানীতে **haravunkh.**

৭। 'স্থা' ধাতুর অভ্যস্ত রূপ 'তিষ্ঠ', বৈদিকের পূর্ব্বাবস্থায় 'স্তিস্থ' বা 'স্তিস্থ'—এইরূপ ছিল, সংস্কৃতে আদ্য 'স' লুপ্ত হইয়াছে, ও মধ্যস্থিত 'স্থ' মূর্দ্ধণ্য হইয়া গিয়াছে। তুলনীয়—গ্রীকে **hi-sta-men** =**si-sta-men,** লাটিন **si-sti-mus** তিষ্ঠাম, এখানে গ্রীক ও লাটিনে অভ্যস্ত অক্ষরের (syllableএর) 'ত' নাই। কিন্তু লাটিন **ste ti** =তস্থৌ, এখানে অভ্যাস অবিকৃত আছে, কিন্তু মূল ধাতুর 'স' লুপ্ত হইয়াছে।

৮। Paul Horn তাঁহার Neupersische Schriftsprache পুস্তকে (Grundriss der Iranischen Philologie গ্রন্থের অন্তর্গত) ফার্সী 'জবান' শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন: অবেস্তা 'হিজ্‌বা' [**hizva**], প্রাচীন পারসীক 'হিজ্‌বাম' (h)**izavam** =সং 'জিহ্বা' প্রাচীন পারসীক হইতে পহ্লবী [**zuvan, zavan, zuban, uzvan,** এবং পহ্লবী হইতে ফার্সী **zuban zaban** 'জিহ্বা' এবং 'জবান' এক মূল হইতে জাত। সংস্কৃত 'জুহু' ও 'জিহ্বা' এক পর্য্যায়ের শব্দ। Fick তাঁহার Vergleichendes Wörterbuch der Indogermanischen Sprachen বইয়ে সংস্কৃত 'জুহু জিহ্বা,' অবেস্তার 'হিজ্বা', লাটিনের **dingua, lingua,** ইংরেজীর **tongue,** জর্ম্মানের **Zunge,** লিথুআনীয় **lezuvis**—লেহনার্থক একই ধাতু হইতে জাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মূল আর্য্য রূপ তাঁহার মতে **dnghwa,** ইন্দো-ইরানীয় যুগে **dizhwa** বা **jizhwa,** তাহা হইতে সং **jihva** ও অবেস্তার **hizva**

৯। গ্রীকের **helios** ও সংস্কৃত 'স্বর'—সমধাতুক কিন্তু একই আর্য্য শব্দের ভিন্নরূপ নহে। **helios**এর প্রাচীন রূপ ডোরিক গ্রীক **aelios** শব্দে **aelios** আদিম আর্য্য **sawelios** হইতে; 'স্বর' বা 'সুবর' শব্দের আদিম রূপ কিন্তু **suwar** (**suwel**) আদিম আর্য্য ভাষার ল ধ্বনি অবেস্তায় ও বৈদিকে প্রায় সর্ব্বত্রই 'র' কারে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

১০। 'হুকা' শব্দটি আরবী, ফার্সী নহে। আরবী 'হুক্‌ক' অর্থে (১) কৌটা বা পেটিকা (২) দোয়াত (৩) পাত্র (৪) তামাক খাইবার হুকা। এই শব্দটি 'হকক' ধাতু হইতে, এই ধাতুর অর্থ দৃঢ় করিয়া রাখা বাঁধা। সত্য অর্থে 'হক' শব্দ এই ধাতু হইতে জাত।

১১। 'যুবন' লাটিন **juvenis** (য়ুবেনিস)। আদিম আর্য্য রূপ **yuwnkos** ইহা হইতে সংস্কৃত **yuvasas** যুবশ, লাটিন **iuvencus** আদিম টিউটনিক **yuwungaz** এবং টিউটনিক হইতে ইংরেজী **young** (যঙ্গ যং) জর্ম্মান **jung** (য়ুং), 'যুবন্‌' ও 'যুবশ' দুইই সংস্কৃতে আছে অতএব ইংরেজী পদটি 'যুবশ' শব্দের সহিত সমজাত 'যুবন'এর সহিত নহে। অবেস্তায় 'যবন' রূপও পাওয়া যায় যবন, যুন যুবন। 'যবন' শব্দের সহিত 'যুবন'এর কোনও সম্বন্ধ নাই। গ্রীক জাতির একটি শাখার নাম **Iones** (=**Ionian**), এই শাখা Attica প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে, আথেন্স নগরীর পত্তন ইঁহাদিগকর্ত্তৃক। এশিয়া মাইনরে ইঁহাদের বিশেষ প্রভাব ছিল। Miletos, Magnesia, Ephesos, Kolophon, Klazomenai প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগর এই জাতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার জাতিগণ প্রাচীনযুগে গ্রীকদের এই শাখার সহিতই বিশেষভাবে পরিচিত হয় সেইজন্য এই শাখার নাম গ্রীক জাতিবাচক নাম হিসাবে পশ্চিম এশিয়ার জাতিবৃন্দের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। **Iones** নামের প্রাচীন রূপ **Iavones, Iaones;** ইহা হইতে হিব্রুর **Yawan,** আরবীর **Yunan** য়ুনান, প্রাচীন

পারসীক অনুশাসনের **yauna**। অশোক-অনুশাসনের 'য়োন' ও সংস্কৃত 'যবন' শব্দ **Iavones**এর পারসীক রূপ হইতে গৃহীত, কারণ গ্রীকের সহিত ভারতবাসীর প্রথম পরিচয় পারস্যের মধ্য দিয়া। এই **Iones, Iavones** নাম এই শাখার আদি-পুরুষ **Iavon, Iaon, Ion**এর নাম হইতে ; যেমন 'মনু' হইতে 'মানব', 'আদম্' হইতে 'আদমী'। Prellwitz স্বীয় গ্রীক অভিধানে **Ion** শব্দকে ণিজন্ত ধাতু **iao** হইতে উদ্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। √**iao**র প্রাচীনতম গ্রীকরূপ √**isa-yo** ; ইহার অর্থ রোগমুক্ত করা ; এই ধাতু সংস্কৃত প্রেষণার্থক ধাতু '√ইষ'এর সহিত সম্পৃক্ত। সুতরাং যুবনের সহিত যবনের সম্বন্ধ নাই, 'ইষ' ধাতুর সহিত বরং সম্বন্ধ বাহির করা যাইতে পারে।

১২। জর্মান **Wurm** (ভুর্ম্) ও ইংরেজী **worm** (রর্ম্) এর সহিত সংস্কৃত 'কৃমি' শব্দের সম্বন্ধ নাই, 'কৃমি' শব্দের সহিত সম্বন্ধ পাতাইবার জন্য *'ঘ্ৰেমা' শব্দের কল্পনা করিবার আবশ্যক নাই। সংস্কৃত শব্দের আদ্য 'ক' 'চ' বা 'শ' —টিউটনিক ভাষায় (ইংরেজী, জর্মানে) 'হ', 'হ্ব' ; এই সূত্রের ব্যতিক্রম হয় না। 'কৃমি' = অবেস্তা 'কেরেমা', ফার্সী 'কিরম্,' স্লাভ্. 'চৃবি', লিথুআনীয় 'কির্মিস', আইরীশ্ 'ক্রুইম'।

Wurm, worm পদের আদিতে **w** আছে ; এই w, শব্দটির স্বাঙ্গীভূত, পরে আসিয়া জুড়িয়া বসে নাই। তুং, লাটিন **uermis** (রের্মিস্), গ্রীক **varmikhos** (বার্মিখোস্), স্লাভ্. **vermies** (ৱের্মাস্) ; অর্থ—কীট ; এগুলি **worm**এর সমজাত শব্দ, 'কৃমি' শব্দের সহিত ইহাদের কোনও যোগ নাই।

১৩। যোগেশ-বাবুর অভিধানে 'জাব' শব্দ সংস্কৃত 'যবস্, জবস্' (=ঘাস) শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া লেখা হইয়াছে। অন্যান্য দেশী ভাষায় এই শব্দটি আছে কি? 'জব্ধ' = যাহা খাওয়া হইয়াছে ; এই অর্থ হইতে 'জাবর'-কাটা বাক্যের উৎপত্তি হইতে পারে ; কিন্তু 'জাবর' (রোমন্থ) ও 'জাব' (খইল ও ভুসি মিশান কুচা বিচালী)—এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি মূল শব্দ? 'জাবর' যদি মূল শব্দ হয়, অর্থাৎ যদি 'জব্ধ' হইতে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে 'র' আসিল কি করিয়া? আমার বোধ হয়, √'জম্ভ', 'জব্ধ'—ইহাদের সহিত 'জাব' কথার সম্বন্ধ নাই। তামিলে √'শাপ্পডু' বা 'চাপ্পড়ু' = খাওয়া ; তুং—বাঙ্গালায় 'ভাত শাপ্‌ড়ান' ; ইহার সহিত 'জাবর' শব্দের যোগ থাকা সম্ভব ; তামিলের 'চ(=শ)' অন্যান্য দ্রবিড় ভাষায় 'জ' রূপে মিলে। 'জাবড়া, জোবড়া, সাপটা, সাপ্‌টান, সাবড়ান, সাবাড় (উচ্চারণে শ),'—এই পদগুলির সহিত 'জাবর' 'জাব' এবং 'চাপ্পড়ু'র সম্বন্ধ আছে কি?

১৪। অবেস্তা 'জে.ম্' বা 'জ.ম' = সংস্কৃত 'জ্মা'; অবেস্তা 'জে.ম অএনি', পহলবী 'জমীন' = ভূসম্বন্ধীয়, ঈন প্রত্যয়সিদ্ধ বিশেষণ পদ। আধুনিক ফার্সী 'জ.মীন্' কিন্তু বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহা হইতে বাঙ্গালা 'জমী'।

১৫। [সংস্কৃত 'বাট' শব্দ প্রাকৃত হইতে, √বৃ (আচ্ছাদনে) হইতে জাত ; 'বৃত—*বৃট—*বট্ট—বাট'—এইরূপ উৎপত্তি সম্ভব। 'বাটিকা—ৱাডিআ—বাড়ী ; বাং 'বাড়ী' ও ইং **wall** একই ধাতু হইতে (√বৃ, আদিম আর্য্য-ভাষায় কিন্তু *ৱল ধাতু)। ইংরেজীর **wall** কথাটি লাটিন **vallum** বা **uallum** হইতে গৃহীত।]

১৬। 'জেদ, জিদ'—আরবী শব্দ ; আরবী দি.দ্‌দ্ ধাতু, অর্থ পরাজয় করা, বিরোধী হওয়া ; এই ধাতুতে 'দ.াদ্' (জোআদ) অক্ষর আসে ; ফার্সী ও উর্দুতে এই অক্ষরের উচ্চারণ 'জ'; আরবী বিশেষ্য পদ 'দি.দ্দ্' উর্দুতে 'জি.দ্', 'জি.দ্' ; Fallonএর হিন্দুস্থানী অভিধানে এই পদের অর্থ '(১) opposition, opposite, the contrary, contrareity (২) reverse, obverse, antithesis (৩) insistence, persistence (sinazoti). Fallon প্রয়োগ দেখাইয়াছেন :—জি.দাবদী = ঝগড়া, জি.দ্ পর = বিরোধবুদ্ধিতে ; জি.দ্ চঢ়না, জি.দ্ আনা = ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা করা ; ; জি.দ্ রখ্‌না, জি.দ্ হোনা = হিংসা পোষণ করা ; ব্যগ্র ভাবে প্রার্থনা করা।

১৭। অবেস্তার 'ৱরেমি'তে অন্তস্থ 'ৱ' আছে, বর্গীয় 'ব' নহে ; সংস্কৃত 'ভ্রমি' = 'ৱরেমি', এরূপ হইতে পারে না। কারণ সংস্কৃত আদ্য 'ভ'এর স্থানে অবেস্তার ভাষায় অন্তস্থ 'ৱ' পাই না। 'ঊর্ম্মি' = *ৱৃর্ম্মি, *'ৱৃর্মি (তুং—সংস্কৃত 'ঊর্ণা' = গথ ভাষায় **wulls** ; ৱৃণোতি, ঊর্ণোতি ; ৱস—উৱাস, ৱচ—উৱাচ ; অবেস্তা ৱদ—সং উদ্ ; ৱহ্—উঢ, *ৱগদ হইতে) ; *ৱৃর্মি শব্দের অনুরূপ সমজাত শব্দ অ্যাঙ্গ্‌লোস্যাক্‌সনে **wielm**, স্লাভ **vluna**, লিথুআনীয় **vilnis**—ইহাদের অর্থ বিক্ষোভ, প্রবাহ। এই শব্দগুলি অ্যাঙ্গ্‌লোস্যাক্‌সন **well** (= প্রস্রবণ) পদের সহিত সম্পৃক্ত। ইং **well**, **wal-k**, সংস্কৃত 'ৱল' ('ৱল্ল') ধাতুর—(সঞ্চালন অর্থে, ৱলয়তি, ৱালয়তি) সহিত সমজাত। সংস্কৃত 'ৱল' ধাতুর আদিম আর্য্য রূপ *ৱৃ, বা *ৱৃ *ৱল্ল ; তাহা হইতে *'ৱৃর্মি', পরে 'ঊর্মি', এবং অবেস্তার 'ৱরেমি'।

সংস্কৃত 'ভ্রম্' ধাতুনিষ্পন্ন 'ভ্রমি' শব্দের সহিত আঙ্গ্‌লোস্যাক্‌সন **brim** শব্দের যোগ আছে ; **brim** অর্থে (প্রবহমান) সাগর।

১৮। **wet**—সংস্কৃত ত-প্রত্যয়ান্ত 'উত্ত' শব্দের ইংরেজী রূপ নহে। **wet, water**, স্কাণ্ডিনেভীয় **vatn**, সংস্কৃত 'উদ্, উদন্' শব্দের সহিত সমধাতুক মাত্র।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আমার ও তোমার রচনা

অধিবাসনমন্ত্র।

তোমারে গড়েছি আমি বিন্দু-বিন্দু করি'
নিখিল-সৌন্দর্য্য সবি করি আহরণ,
মানসের নানাবর্ণে তোমায়, সুন্দরি,
ভূষিয়াছি, রঞ্জিয়াছি শোণিতে চরণ।
শুধু তাই নহে দেবি, অর্চ্চনার লাগি
রাখিনু প্রণয়-পুষ্প করিয়া চয়ন,
কামনার ধূপ জ্বালি রহিলাম জাগি',
সকল রূঢ়তা ঘষি রচিনু চন্দন।
সর্ব্ব আয়োজন মাঝে সেদিন সন্ধ্যায়,
মঙ্গল পবিত্র ক্ষণে সে অধিবাসনে,
প্রাণের প্রতিষ্ঠা হলো তব প্রতিমায়,
কল্পারম্ভে হে কল্পনে নামিলে ভবনে।
তোমার বেদীর পাশে সেই হ'তে আমি,
অর্ঘ্যহস্তে রহিয়াছি চির দিবাযামী।

নবকলেবর।

আমারে গড়েছ তুমি নূতন করিয়া,
আমাতে জাগালে তুমি আমার দেবতা,
এ হৃদি-অরণ্য মাঝে হে তাপসী প্রিয়া,
ধ্বনিয়া তুলিলে তুমি অমৃত-বারতা।
দিতে গিয়ে তব নামে প্রাণের আহুতি,
তব অন্তরালে হেরি আরো দুটি পাণি,
তোমার আনন্দ মাঝে হলো অনুভূতি
কোন্ চিদানন্দ যার সত্তা নাহি জানি।
অতীতের 'আমি'-পানে চেয়ে দেখি আজ,
পৃথক জীবন বলি মনে মোর লয়
নূতন উষায় ধরা পরে নব সাজ,
হয়েছে নিজের প্রতি শ্রদ্ধার উদয়।
তোমারি বয়সী করি সৃজিয়াছ মোরে,
তব স্বর্গীয়তা দিয়ে চিত্ত দেছ ভরে'।

শ্রীকালিদাস রায়।

অপালা

(গল্পে ইতিহাস)

অপালার স্বামী তাঁর লোকজন নিয়ে কৃত পরিশ্রমে সরস্বতীর ধারে কাশবন পরিষ্কার ক'রে চাষের উপযুক্ত বেশ বড় একখণ্ড জমি তৈরী করেছেন। তার এক ধারে অনেক যত্নে জন্মান গুটিকত ফলফুলের গাছ; সেই গাছের ছায়ায় দুই-তিনখানি কুটীর; অপালা সেই কুটীরে গৃহিণী, যেন পাখীর বাসায় ছোট্ট পাখীটি; বাকী জমিটুকুতে যব আর গমের ক্ষেত; দেবরাজ ইন্দ্রের আশীর্ব্বাদে আর পরিবারের সকলের একজোট চেষ্টায় বছর বছর এই ক্ষেতে যে গম জন্মে সেই গমের ময়দায়, দুধাল গাভীর দুধে, গাছের ফলে, মৃগয়ার মাংসে, সরস্বতীর জলে, অপালার নিজ হাতে তৈরী কাপড়ে আর তাঁর গৃহিণীপনার গুণে পরিবারে কোন কিছুরই অভাব নেই, সকলেই সুখী। বাড়ীখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বুনো পশু আর অনার্য্য দস্যুর ভয়ে চার ধার কণ্টকীগাছের বেড়ায় ঘেরা, আঙ্গিনায় গাছের ছায়ায় বড় দুই খণ্ড পাথরে তৈরী জাঁতা—দুপুরে রোদের সময় অপালা বাড়ীর ক'নেদের নিয়ে এই জাঁতায় গম ভাঙ্গেন, সোমলতা পিষে সোমরস তৈরী করেন আর সেইসঙ্গে ঋগ্বেদের ভাল ভাল গান গেয়ে দেবতাদের স্তুতি করেন। গাইতে গাইতে কত সময় অপালা নিজেই সব গান র'চে ফেলেন, সে গানে ইন্দ্র মুগ্ধ, দেবতারা অনুগত! অপালা বিদুষী ব্রহ্মবাদিনী। যতদিন তিনি পিতার কাছে ছিলেন স্নেহময় পিতা, মহর্ষি অত্রি, তাঁকে কত যত্নে কত বিদ্যা শিখিয়েছিলেন! পিতার সঙ্গে এক আসনে ব'সে কত সময় কত বিষয়ের আলোচনা করতেন। তারই ফলে আজ অপালার সংসারে এত সুখ! প্রত্যূষে অপালা উষাতারার সঙ্গে-সঙ্গে উঠে সরস্বতীর ঘাটে স্নানে যান। ফিরে এসে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে দেবতা-দিগের উদ্দেশে গান ধরেন আর সেই গানের সুরে আকাশ ছেয়ে ফেলে—আঙ্গিনায় গাছে-গাছে পাখীরা জেগে উঠে সেই সুর ধ'রে নিয়ে গাইতে আরম্ভ করে; অপালা তখন অন্য কাজে যান। দুধ দুয়ে ক্ষীর পাক ক'রে সবাইকে খাওয়ান, ছেলেদের আদেশ দেন গাভী নিয়ে মাঠে যেতে; স্বামীর বীরত্বের কাছে হার মেনে জনকত অনার্য্য এসে দাসত্ব স্বীকার করেছে, তাদের দু'এক জনকে আদর ক'রে কাছে ডেকে স্বামীর সঙ্গে মাঠে চাষের কাজে পাঠিয়ে দেন; তারপর নিজে কোনদিন বা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব'সে বেদের গান মুখে মুখে তাদের কণ্ঠস্থ করান, সেই গান আবৃত্তি করতে শেখান; এইসব করেন, আবার কোন-দিন বা তাদিগকে সঙ্গে নিয়ে সুতো কাটেন, কাপড় বোনেন, সংসারের কাজকর্ম্ম দেখেন। এই ভাবে নানা কাজের ভিতরে সুখে অপালার দিন কাটে।

সেদিন তখন বেলা দুপুর, স্বামী তখনও লোকজন নিয়ে ফেরেননি, পাকশালার কাজ সেরে একটু বিশ্রামের জন্য অপালা গাছের ছায়ায় এসে বসেছেন, তাঁর পায়ের কাছে একটি হরিণ-ছানা শুয়ে ঘুমুচ্ছিল—তাকে দেখে অপালার মনে হ'ল এমনই একটি ছানা তাঁর পিতার ঘরেও ছিল, পিতা তাকে কত ভাল বাসতেন। আহা! তাঁর পিতার প্রাণে কত ভালবাসা! একদিন অপালা পুরন্দরের সঙ্গে খেলতে গিয়ে ফিরে আসতে দেরী করেছিলেন তাই তাঁকে না দেখে পিতা কত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। অনার্য্যরা বুঝি মেয়েকে চুরি ক'রে নিয়ে গেল ভেবে তাড়াতাড়ি তিনি

যজ্ঞের কাঠ কুশ যব সমস্ত ফেলে রেখে লোহার বল্লম নিয়ে ছুটেছিলেন। বাড়ীর দুয়ারে অপালাকে ফিরতে দেখে তাঁর মুখে যে আনন্দ ফুটে উঠেছিল অপালার আজ তাই মনে প'ড়ে শরীর অবশ! আহা এমন পিতা, তাঁর এত কষ্ট—কিছুতেই সংসার চলে না, দারিদ্র্য ঘুচে না। সমবেদনায় অপালার বুক ভ'রে উঠল; শেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কলসী নিয়ে তিনি সরস্বতীর ঘাটে স্নানে চ'লে গেলেন।

কতকদূর গিয়ে দেখেন কাশবনের ধারে যেখানে পথটি বেঁকে গেছে তারই পাশে ছোট্ট একটি কাটা গাছের সামান্য ছায়ায়, স্বামী নৌকা গড়বার জন্য যে সব কাঠ জড়ো ক'রে রেখেছেন তার এক ধারে, ধূলার উপর প'ড়ে আছে একজন মানুষ! কি ভয়ঙ্কর ব্যারামে তার সমস্ত শরীর ঢাকা! আঙুল-ক'টি পচে খ'সে পড়বার উপক্রম হয়েছে, মুখখানি ঠোঁট-দুখানি ফুলে উঠেছে, যেখানে চাও সেইখানেই দুরন্ত ব্যাধির চিহ্ন, তা' থেকে অবিশ্রাম পুঁযরক্ত গ'লে পড়ছে—কি সে যন্ত্রণা! অসহ্য। ব্যাধি তাকে জড়িয়ে ধরেছে—পাপের সে আলিঙ্গন অসহ্য হলেও এ জীবনে ছাড়াবার নয় বুঝে সে হতাশ হয়ে পড়েছে, মুখে তার কি বেদনার চিহ্ন, চোখে তার কি কাতর চাউনি! অপালার আর স্নানে যাওয়া হ'ল না। কিসে এই ব্যাধিকাতর লোকটির বেদনা ঘুচান যায় জানবার জন্য তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। দেখলেন এ আর কেউ নয়, তারই ছোট বেলার বন্ধু, "পুরন্দর"। পুরন্দরের আজ একি দশা! অপালা চমকে উঠলেন—তারপর সন্দেহ হ'ল বুঝি এ পুরন্দর নয়। কিন্তু পুরন্দর যখন নিজের পরিচয় দিয়ে তার দুঃখের কাহিনী কইতে লাগল তখন আর বিশ্বাস না ক'রে উপায় কি? অপালার চোখে জল এল। ছেলে বেলায় যেমন ভাবে তিনি পুরন্দরের পাশে বসতেন ঠিক তেমনি ভাবে গিয়ে তার পাশে ব'সে সব কথা শুনতে লাগলেন। পুরন্দর তাকে দূরে দাঁড়াতে বলেছিল সে কথা তিনি গ্রাহ্য করলেন না।

ছেলে বেলা তাদের যথেষ্ট কেটেছিল; কিন্তু, তারপর অপালার বিয়ে হ'য়ে গেলে পুরন্দরের প্রাণ সঙ্গীহারা হ'য়ে বড়ই কাতর হ'য়ে পড়েছিল। অপালারও প্রথমটা ভাই পুরন্দরকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু পুরন্দর যেমন মনে করেছিল যে সে চিরকালই অপালার কাছে-কাছে থাকবে, অপালা কখনও তেমন মনে করেননি, তাই অল্পদিন পরেই আপনার দুঃখকষ্ট সব সেরে গিয়েছিল—তিনি স্বচ্ছন্দে সংসার করছিলেন। এদিকে অভিমানী পুরন্দরের মাথায় কি এক খেয়াল চাপল, সে তার পিতাকে জানাল যে তাঁর মত সেও সমুদ্র পার হ'য়ে বাণিজ্যে যাবে। পিতা প্রথমতঃ আপত্তি করেছিলেন—তা সে শোনেনি; সকলের কাছে বিদায় নিয়ে তাদের ঘাটের সব চাইতে ছোট্ট আর জীর্ণ যে ডিঙাখানি তাতে উঠে বাড়ীঘর ছেড়ে সে দূর বিদেশে চ'লে গেল। যাবার সময় একটিবার কোন দেবতার স্তোত্র সে মুখে আনেনি—দেবতাদের সাহায্য চায়নি। সিন্ধুর জলে তার ডিঙা ভাসিয়ে অভিমানের ভরে পাল তুলে দিয়ে সে চ'লে গেল। পশমী কাপড়, সোনার গয়না, কাঠের কৌটা, লোহার অস্ত্র, যা-কিছু বেসাতি নিয়ে বিদেশে বেরিয়েছিল তারই বিনিময়ে সে আজ এই দুরন্ত ব্যাধি নিয়ে ফিরে এসেছে; চেয়েছিল অধঃপাতে যেতে কিন্তু অধঃপাত যে এমন ভীষণ তা সে ভাবেনি। আজ দুর্দিনে সে অপালার কাছে শেষ বিদায় চাইতে এসেছে।

অপালা সরস্বতীর জলে ধুয়ে ভাই পুরন্দরের শরীর পরিষ্কার করে দিলেন, তার ক্লান্তি দূর করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কত ক'রেও সেদিন একটিবার তাকে তাঁদের বাড়ীতে আনতে পারলেন না। ব্রহ্মাবর্ত্তের সেই কনকনে শীতের রাত সে সেই গাছের তলায় কাটাবে ব'লে প'ড়ে রইল।

পরদিন সকালে পুরন্দরকে গাছের তলায় না পেয়ে অপালা বিষণ্ণ মনে ফিরে এলেন। পুরন্দর চ'লে গেল; কিন্তু এমনি ছোঁয়াচে অবস্থা নিয়ে সে এসেছিল যে অনিচ্ছায় না-জেনে অপালাকে দিয়ে গেল দুই বিন্দু বিষ—এক বিন্দু রোগের বিষ আর এক বিন্দু অশান্তির বিষ। পুরন্দরের রোগের স্পর্শে সেই রোগ তাঁর সোনার শরীরে ফুটে উঠল, পুরন্দরের দুরবস্থার চিন্তায় তাঁর মন বিষাদে ডুবে গেল। দুঃখের উপর দুঃখ—স্বামীও শেষে অপালাকে ত্যাগ করলেন। যে ঘরে তিনি রাজরাণী ছিলেন এখন সে ঘরের তিনি কেউ নন; এতদিনের এত ভালবাসার প্রত্যেক জিনিষ থেকে মনটাকে জোরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে তাঁকে চ'লে যেতে হ'ল। পাতায় পাতায় তখন শিশির ঝ'রে পড়ছিল, চারদিক কুয়াশায় ঢাকা, তারই ভিতর দিয়ে দুঃখের বোঝা

সাপার নিয়ে অপালা চ'লে গেলেন—সে আজ কত শত বৎসরের কথা, কিন্তু তাঁর নাম ক'রে দেশের-মানুষ এখনও তাঁর রচনা ঋগ্বেদের অলঙ্কার।

শ্রীরমেশচরণ বসু মজুমদার।

হারামণি

(অজ্ঞাত কবির গান।)

পরাণ আমার সোতের দীয়া।
(আমায় ভাসাইলে কোন্ ঘাটে)
আগে আন্ধার, পাছে আন্ধার, আন্ধার নিশুইত ঢালা,
আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা (গো)।
তারার তলে কেবল চলে নিশুইত রাইতের ধারা
(তারার তলে চলে চলে নিশুইত রাইতের ধারা)
সাথের সাথী চলে বাতি নাই গো কূল কিনারা (গো)
(দিবারাতি চলে গো বাতি জ্বলে সাথে সাথে গো)।
অচিন কূলে নদীর কূলে ডাকে গো কারা
(টানে গো পরাণ)
(কূলে ভিড়া, ক্ষেণেক জিরা', সোতেরে ছাড়া')
অকূল পাড়ি থামতে নারি, আর চলে যে ধারা
(আর চলি বে-ঠিকান)।
অকূলের কূল গো, দইরার সাগর গো,
আর কয় বা কে, কেমন ডাকে, পাইমু গো লাগর (গো)।
তোমার কোলে লইবা তুইলে, জুড়াইমু গিয়া
(তোমার বুকে নিবুম সুখে, জুড়াইমু গিয়া)॥

সংগ্রাহক—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

চিত্র-পরিচয়

অবসান।

দিবসের অবসান—সান্ধ্য শান্তির মোহন রূপের মাঝে দিবসের সকল অশান্তি-কোলাহলের স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। জীবনের অবসান—চরম দিনে জীবনের সকল অপূর্ণ ব্যর্থতা এক অচেনার কোমল স্পর্শে বিলীন হয়ে যাওয়া—বাতাসের স্পর্শে শতদলের পাপড়ি রেণু আত্মহারা হয়ে ঝরে পড়ার মত।

স।

পুস্তক-পরিচয়

প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব—মোহাম্মদ মোজাফ্‌ফার উদ্দীন প্রণীত। ২৯ নং আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, মোহাম্মদী প্রেস হইতে প্রকাশিত। ছয় পয়সা।

এই চটি বইখানিতে খ্রীষ্টানদের প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব বা Doctrine of Atonement যে অসার ও ভুল তাহাই যুক্তিতর্ক ও নানা লোকের অভিমত দিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে এই উপসংহার করা হইয়াছে যে—পৌল প্রায়শ্চিত্তবাদ প্রচার করেন, স্বয়ং যিশু নহেন; 'নিজে যাহা করি যিশুর রক্তে উদ্ধার পাইব' এই বিশ্বাস ভালো, না "যে ব্যক্তি একটি পুণ্য লইয়া আল্লার নিকট উপস্থিত হইবে সে তাহার দশ-গুণ ফল পাইবে" ইসলামের বিবেকানুমোদিত এই বিধান ভালো?

বইখানির নামে পর্য্যন্ত বানান ভুল আছে।

পীযুষ-প্লাবনী—সেখ মহম্মদ আলী কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। হাবড়া। চার আনা।

পদ্যের বই। অত্যন্ত বেশীরকম সংস্কৃত-ঝোঁকা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কীয় বিষয়ের রচনা। বানান ভুল প্রচুর। যে কথার আমরা সচরাচর কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকি তাহা ব্যবহার করার সুবিধা এই যে তাহাতে ভুল হয় কম। পাণ্ডিত্য দেখাইবার ইচ্ছায় অপ্রচলিত শব্দ অভিধান না দেখিয়া ব্যবহার করিলে অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

জাতীয়-ফোয়ারা—শ্রীমোজাম্মেল হক প্রণীত। এজেন্ট মখদুমী লাইব্রেরী, ৫এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ছাপা কাগজ বাঁধানো ভালো। মূল্য বারো আনা।

পদ্যের বই। দুঃস্থ স্বসমাজের দুর্দ্দশার প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিত নয়টি জাতীয় উদ্দীপনার পদ্য ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বইখানির ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ। মুসলমান-সমাজকে উন্নতির পথে উদ্বুদ্ধ করিয়া চালিত করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত উচ্ছ্বাস। স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাস-প্রবাহের মধ্যে কবিত্বের আভা পড়িয়া এক-একবার চিকচিক করিয়া উঠিয়াছে।

আলেকজেণ্ডার—শ্রীপঞ্চানন সিংহ এম-এ বি-এল প্রণীত। প্রকাশক সেন রায় এণ্ড কোং কর্ণওয়ালিস বিলডিংস্, কলিকাতা। ১৪২+৭ পৃষ্ঠা, আলেকজেণ্ডারের একখানি উৎকৃষ্ট ছবি আছে। মূল্য বাঁধা বারো আনা, আবাঁধা আট আনা।

ইহা আলেকজেণ্ডারের জীবনচরিত ও তৎসংশ্লিষ্ট কালের ইতিহাস; প্লুটার্কের লিখিত বিবরণের বঙ্গানুবাদ। ইহা মূল প্লুটার্ক হইতে অনুবাদিত না ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ তাহা জানানো হয় নাই। অনুবাদের রচনা ও ভাষা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। অনুবাদের সঙ্গে-সঙ্গে অনুবাদক প্রসঙ্গত আধুনিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ফল এবং নিজের মন্তব্য ফুটনোটে টিপ্পনী যোগ করিয়া এই প্রাচীন পুস্তকের উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। পরিশিষ্টে পুস্তকে-ব্যবহৃত গ্রীক নামের পরিচয় ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়াতে পাঠকের খুব সাহায্য করা হইয়াছে। ইতিহাস ও জীবনচরিত দুইএর একত্র সমাবেশ হওয়াতে বইখানি সুখপাঠ্য ও সরস হইয়াছে। যাঁহারা কাহিনী পড়িতে ভালোবাসেন তাঁহারাও এই ঐতিহাসিক জীবনী পাঠে প্রীত হইবেন—ইহাতে অনেক কৌতুককর কাহিনী সংগৃহীত আছে।

X অক্ষরের বদলে বাংলায় ক্ষ লেখা ঠিক নয়, কারণ ক্ষকে আমরা বাঙালীরা ক্‌স উচ্চারণ করি না, খ্‌খ উচ্চারণ করি।

নৃপেন্দ্র-স্মৃতি—শ্রীদীনদয়াল চৌধুরী লিখিত। প্রকাশক বেঙ্গল বুক ক্লাব, ১৪নং রামমোহন দত্ত রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ১৩০ পৃষ্ঠা। ১৩ খানি চিত্র সংযুক্ত। মূল্য কাপড়ে বাঁধা দেড় টাকা, কাগজের মলাট বারো আনা।

ইহা কোচবিহারের পরলোকগত নৃপতি মহারাজা স্যর নৃপেন্দ্র-নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের বাল্যজীবনের কাহিনী ও আখ্যায়িকা। তাঁহার গুণমুগ্ধ বাল্যসহচর বয়স্য ও ভৃত্যের দ্বারা শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত লিখিত। তিন অধ্যায়ে পুস্তক বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতির পূর্বকথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে নৃপেন্দ্রনারায়ণের শৈশব হইতে ছাত্রজীবনের আখ্যায়িকা, এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বিবাহ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের নানা সময়ের গল্প বর্ণিত হইয়াছে; পরিশিষ্টে মহারাজের কয়েকখানি পত্র, অন্ত্যেষ্টি যাত্রার বিবরণ, ও সংবাদপত্রের সুখ্যাতি প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী ভূমিকায় লেখকের সহিত কোচবিহার-রাজবংশের সম্পর্ক বর্ণনার প্রসঙ্গে কোচবিহার রাজবংশের ও মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বাংলার এই স্বাধীনকল্প রাজ্যের একজন শ্রেষ্ঠ রাজার স্বভাব ও গুণ জানিবার পক্ষে তাঁহার সহচরের লিখিত এই "নৃপেন্দ্র স্মৃতি" যথেষ্ট সহায়তা করিবে; এই অনাড়ম্বর বর্ণনায়, মুগ্ধ হৃদয়ের প্রতিচ্ছবিতে নৃপেন্দ্রের বীরচরিত্রের নানা সময়ের ছায়া সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। বালক নৃপেন্দ্রের নানা সময়ের হাতের লেখার প্রতিলিপিতে তাঁহার শৈশবের অনেক পরিচয় বেশ সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দায় ও সেগুলি পাঠকের মনে যথেষ্ট কৌতুক উদ্রেক করে। —মুদ্রারাক্ষস।

প্রবাসী-পুরস্কার

বর্ত্তমান বৎসরে দুটি প্রবন্ধের জন্য **নৃত্যগোপাল-প্রবাসী-পুরস্কার** নামে দুইটি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি পুরস্কার নগদ ১০০৲ টাকা পরিমিত। বিষয় দুইটি নীচে দেওয়া হইল।

(১) অল্প মূলধনে আমাদের দেশের বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিসের কারখানা সহজে স্থাপিত হইতে পারে, কি উপায়ে উহা পরিচালিত হইতে পারে এবং উহার সাফল্য সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবার প্রমাণ কি। এবং ঐ কারখানা পরিচালনের উপযোগী লোকের নাম ও তাহাদের শিক্ষার পরিচয় যদি জানা থাকে তাহাও নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

(২) স্ত্রীশিক্ষার সহিত জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধ কি, বিশেষ ভাবে আমাদের জাতীয় উন্নতি কি পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে; হিন্দু বালিকাদের উপযোগী শিক্ষা কি এবং কি সহজ ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য সম্ভবপর উপায়ে দেশ-মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতে পারে এবং এজন্য দেশের লোকের কর্ত্তব্য কি?

প্রত্যেকটিতে, গভর্ণমেণ্টকে কি করিতে হইবে এবং দেশবাসীদিগকেই বা কি করিতে হইবে, তাহা লিখিতে হইবে, এবং অন্যান্য দেশের গভর্ণমেণ্ট ও অধিবাসীবর্গ তত্তৎদেশের শিল্প ও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন আবশ্যকমত তাহার উল্লেখ ও বৃত্তান্ত দিতে হইবে এবং কোন্ কোন্ গ্রন্থাদি হইতে এই-সব বৃত্তান্ত গৃহীত হইল তাহার নাম ও পত্রাঙ্ক দিতে হইবে। ইংরেজি কিছু উদ্ধৃত করিলে তাহার বাংলা অনুবাদ দিতে হইবে।

পুরস্কারের জন্য আগামী **২৮শে পৌষ (১৩২৭)** তারিখের মধ্যে রেজেষ্টারী ডাকে প্রবাসী-সম্পাদকের নামে প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের উপর "প্রবাসী-পুরস্কারের জন্য" লিখিয়া দিতে হইবে। পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি এবং পুরস্কার-প্রতিযোগী প্রবন্ধের মধ্যে যে চারিটি প্রবন্ধ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে তাহা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে এবং পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি পুস্তিকাকারে বা যেভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের থাকিবে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ যিনি ফেরৎ চান তিনি পাঠাইবার সময়ই রেজেষ্টারী ফী দুই আনা সমেৎ ডাকমাশুল পাঠাইবেন। প্রবন্ধের সঙ্গেই লেখকের নাম ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ কাগজের এক পিঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। একটিও প্রবন্ধ উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহ পুরস্কার পাইবেন না বা কোনটিই প্রকাশিত হইবে না।

ইচ্ছা করিলে একজন দুই বিষয়েরই প্রবন্ধ পাঠাইতে পারেন। একাধিক প্রবন্ধ সমান বিবেচিত হইলে পুরস্কার ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

আমাদের নিকট প্রেরিত প্রবন্ধ, বিচারফল প্রকাশের পূর্ব্বে, অথবা আমাদের নির্ব্বাচনের পর আমাদের নির্ব্বাচিত ও পরে প্রবাসীতে প্রকাশিত রচনা, লেখক বা অপর কেহ আমাদের বিনা অনুমতিতে অন্যত্র প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসীর স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্টীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৭শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আসল পণ্ডিত ও নকল পণ্ডিত

অথবা

সূর্য্য ও বালি।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়াছেন :—

জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানবজাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে। কথাটি অনেকদিনকার, কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন করিয়া প্রচারিত হইতেছে, কাজেই আমাদের দেশেও দুই একজন পণ্ডিত তাহা ধরিয়া বসিয়াছেন, এবং এই মতের জোরেই আমাদের এই নবজাগ্রত জাতীয় জীবনাকাঙ্ক্ষাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের এই মত ইউরোপে অনেক বড় বড় পণ্ডিত অনেকবার খণ্ডন করিয়াছেন; আমি ভরসা করি এবারও করিবেন। তাঁহাদের সমস্যা তাঁহারাই পূরণ করিবেন। কিন্তু সূর্য্যের চেয়ে বালির তাপ বেশী; আমাদের দেশে এই-সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশী যে তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না। এমন কি যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার মাটী বাঙ্গলার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ এখন—স্যার রবীন্দ্রনাথ—এবার আমেরিকায় ঐ মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটি কোন কাগজে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং পড়িতে পারি নাই, Modern Reviewতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পড়িয়াছি, হয়ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছি কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে সেই মতের এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির এই মহাসভার সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।

চিত্তরঞ্জন বাবু স্বীকার করিতেছেন যে তিনি রবি-বাবুর "সমস্ত বক্তৃতাটি" পড়েন নাই, সুতরাং "হয়ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা" করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি প্রতিবাদ করাটা চাই! এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়? যখন প্রতিবাদ করিলেনই তখন Modern Reviewএ প্রকাশিত রবি-বাবুর যে যে বাক্যের প্রতিবাদ করিতেছেন, অন্ততঃ সেইগুলি উদ্ধৃত করা উচিত ছিল; তাহা হইলে লোকে বুঝিতে পারিত যে রবি-বাবু ঠিক কি বলিয়াছেন, এবং চিত্তরঞ্জন-বাবু তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন কি না, ও প্রতিবাদ সারবান্ হইয়াছে কি না। তাহা তিনি করেন নাই। রবি-বাবুর বা অপর কোন লোকেরই মত অবিচারিতভাবে গ্রহণীয় নহে; তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আলোচনা করিতে হইলে কোন্ মতের আলোচনা হইতেছে, তাহা স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হওয়া উচিত। বক্তা রবি-বাবুর একটি কথাও উদ্ধৃত করেন নাই, কিন্তু নানা-রকমের ইঙ্গিত করিয়াছেন। যথা—(১) রবি-বাবু নকল পণ্ডিত, ইউরোপের মত ধার করিয়া নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন; (২) রবি-বাবু বালি, এবং সূর্য্য আর কেহ; (৩) রবি-বাবু আগে স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন, এখন স্যার উপাধি পাইয়া উপাধিদাতা গবর্ণমেণ্টের সন্তোষসাধনার্থ স্বদেশদ্রোহী হইয়াছেন; ইত্যাদি।

রবি-বাবু কোন্ কোন্ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কি কি মত ধার করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া তাহার পাশে

পাশে রবি-বাবুর উক্তিগুলি সাজাইয়া দেখাইলে আমরা চিত্তরঞ্জন-বাবুর সত্যপ্রিয়তার প্রশংসা করিতে পারিতাম। কিন্তু তিনি কোন-প্রকারে ধরা-ছোঁয়া দেন নাই;—বুদ্ধিজীবী মানুষের এই ত বাহাদুরী! রবি-বাবু যে বালি, চিত্তরঞ্জন-বাবু তাহা বলিয়া তাঁহাকে একেবারে মাটি (বালি নয়) করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সূর্য্য যে কে, তাহা না বলায়, বাস্তবিক রবি-বাবু তাঁহার নিকট হইতে আলোক ও তাপ সংগ্রহ করিয়াছেন কি না, তাহার বিচার করা গেল না। ইহা আর-এক বাহাদুরী। স্বদেশপ্রেমিক রবি-বাবু স্তাবক স্বদেশদ্রোহী স্যার্ রবীন্দ্রনাথ হইয়াছেন, ইহা অতি হাস্যকর মিথ্যা কথা। চিত্তরঞ্জন-বাবু মডার্ন্ রিভিউ পড়েন দেখিতেছি। সেই মডার্ন্ রিভিউএর ফেব্রুয়ারী সংখ্যার একটি প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা পড়িলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, রবীন্দ্রনাথের অধোগতি হইয়াছে কি না।

"Apparently he cares precious little for his title of English knighthood and the degree of doctorate. Indeed, he seems to regard them with half amusement." P. 218.

"When I helped him into the Pullman car at the station that night I thought of him as a personification of the Vedic spirit of Hindustan. No sentiment seems to command his life so completely as loyalty to Indian ideals. This loyalty is no mere academic formula, no pose, but a reality. It is with him something vivid, tangible: it is something alive, practical, fit to live and work for. "I shall be born in India again and again," remarked Tagore with a smile of pride lighting up his face. "With all her poverty, misery and wretchedness, I love India best." P. 220.

যে প্রবন্ধটি হইতে এই বাক্যগুলি উদ্ধৃত হইল, তাহা আমেরিকা হইতে তথাকার আইওা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু, এম্-এ, পীএইচ-ডী, লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অযথা প্রশংসা বা অযথা নিন্দা করিয়াছিলেন কি না, তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটি না ছাপিলে তাহা বুঝাইবার জো নাই। কিন্তু সামান্য একটু আভাস দিতেছি। গত বৎসর ২৬শে সেপ্টেম্বর রবি-বাবু পোর্টল্যাণ্ড শহরে "The Cult of Nationalism" নামক অভিভাষণ পাঠ করেন। শ্রোতাদের মধ্যে একটি ইংরেজ স্ত্রীলোক ছিলেন; তাঁহার আত্মীয়েরা ভারতবর্ষে বিষয়কর্ম্ম করেন। স্ত্রীলোকটি ঐ শহরের The Portland Oregonian নামক কাগজে একখানি চিঠি লেখেন; তাহাতে বলেন—"It was unfortunate that he (the poet) gave such an impression of inefficient rule in India."

রবি-বাবু সম্ভবতঃ নকল পণ্ডিত ও বালি; তবে ঠিক্ কিছু বলা যায় না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন-বাবু যে নিশ্চয়ই আসল পণ্ডিত এবং একটা সাহিত্যিক দার্শনিক রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক সৌরজগতের কেন্দ্রস্থিত সূর্য্য, কাহার সাধ্য তাহা অস্বীকার করে? এই দেখুন না, নকল পণ্ডিত রবি-বাবু ও আসল পণ্ডিত চিত্তরঞ্জন দাশের কথায় কত সাদৃশ্য রহিয়াছে। চিত্তরঞ্জন-বাবুর সমস্ত কথা তাঁহার আলোচ্য অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত। রবি-বাবুর কোন্ কথা কোথা হইতে গৃহীত তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জন। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে।...জাতিত্বের গুণেই এক জাতি দান করিতেও সক্ষম হয়, গ্রহণ করিতেও সক্ষম হয়।

রবীন্দ্রনাথ। ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার সহায়তা করিবার কি সামগ্রী উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।—স্বদেশী সমাজ।

চি। ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধন...এমন করিয়া হুড়মুড় করিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর না পড়িলে হয়ত এত সহজে এত শীঘ্র আমাদের জাতিত্বের চৈতন্য হইত না।

র। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির তেমনি হুড়মুড় করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে...এই উৎপাতে...আমাদের কি আশ্চর্য্য শক্তি ছিল তাহা চোখে পড়িল।

—স্বদেশী সমাজ।

চি। জাতিত্ব মরে না—শুধু সকল জাতির মধ্যে সকল বিশিষ্ট রূপের মধ্যে যে একত্ব আছে তাহাই জাগিয়া উঠে।

র। বস্তুত সভ্যতার ভিন্নতা আছে, সেই বৈচিত্র্যই বিধাতার অভিপ্রেত। এই ভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল সহৃদয়তা লইয়া পরস্পর প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই এই বৈচিত্র্যের সার্থকতা। যে আদর্শ অন্য আদর্শের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ তাহা আদর্শই নহে।—সমাজভেদ।

চি। পল্লী-সমাজ বাঙালীর সভ্যতাসাধনার কেন্দ্রস্থল, সেই কেন্দ্রস্থল যদি ব্যাধিদুষ্ট হইয়া তাহার সঞ্জীবনী শক্তি হারাইয়া ফেলে তাহার ফলে সমস্ত জাতিটাই অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া প'ড়।...স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে চাষাদিগকে সেই সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, পুষ্করিণী নূতন খনন করিতে হইবে, পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে, বনজঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে এবং চাষারা যাহাতে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

ভাবে জীবনযাপন করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে। অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইলে চাষাকে কম সুদে তাহার আবশ্যকীয় টাকা ধার দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীদের উপকারের জন্য তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া মিলিয়া ছোটখাট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

র। সমস্ত দেশ যে শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে যে গ্রাম্যসমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রয়স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রীসম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত কর, গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর, ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর এবং যাহাতে নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর।.. নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্ম্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার, ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে।

—পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ।

চি। আমাদের এখন বিলাতি আদর্শজনিত যে বিলাসের ভোগ তাহাকে সবলে দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। জীবনকে সহজ সরল করিতে হইবে।

র। প্রত্যেকে জীবনযাত্রাকে সরল করুন দেশের ভোগবিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে—সহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে—কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই।—বিলাসের ফাঁস—"সমাজ'।

চি। সে কালে পল্লীতে বারো মাসে তের পার্ব্বণ ছিল এখন সে আনন্দ কই, সে উৎসব কই।

র। যে দেশ বারো মাসে তেরো পার্ব্বণে মুখরিত থাকিত, সে দেশ নিরানন্দ নিস্তব্ধ হইয়া গেছে।—বিলাসের ফাঁস।

চি। আমাদের শ্রমজীবীদের যে নৈতিক জীবন তাহা এত মিল ফ্যাক্টরীতে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

র। সহরে ধনী মহাজনের কারখানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমীদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় সকলেই জানেন।

—পাবনা সম্মিলনীর অভিভাষণ।

চি। আমাদের দেশে রাজার কর্ম্মক্ষেত্র অনেক প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজা কর লইতেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া আইন বলিয়া দিতেন, কিন্তু আমাদের ঘরের কাজ আমরা নিজেরাই করিতাম, আমাদের জীবনযাপনের সকল উপায় আমরাই করিতাম।

রবীন্দ্রনাথ। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন—প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্ত্তব্যদ্বারা আবদ্ধ। জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাহার উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকেরই উপরে আশ্চর্য্যরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।—স্বদেশী সমাজ।

কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে রবি-বাবু ত এসব কথা অনেক আগে বলিয়া গিয়াছেন; আর, চিত্তরঞ্জন-বাবু গত মাসে বলিয়াছেন। সুতরাং নকল পণ্ডিত রবি-বাবু আসল পণ্ডিত চিত্তরঞ্জন-বাবুর নিকট ঋণী হইলেন কি প্রকারে? অথবা সূর্য্যরূপী চিত্তরঞ্জন বালিরূপী রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আলোক সংগ্রহ কেমন করিয়া করিলেন? যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা অধুনা-আবিষ্কৃত নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানেন না। সম্প্রতি প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, যে, নকলটা আগে হয়, তাহার পর আসলটা আসে; অর্থাৎ ভবিষ্যতে আসল পণ্ডিত কি বলিবেন, নকল পণ্ডিতেরা তাহা অনুমান করিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই তাহা বলিয়া ফেলেন। ইহাও প্রমাণ হইয়াছে, যে, আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি, আরব দেশের মরুভূমি, রাজপুতানার মরুভূমি, প্রভৃতির বালুকা আগে নিশীথ কালে দীপ্তিমান্ ও উত্তপ্ত হয়, পরে সূর্য্য প্রাতে ও মধ্যাহ্নে সেইসব বালুকণা হইতে আলোক ও উত্তাপ সংগ্রহ করেন। আরো প্রমাণ হইয়াছে যে প্রতিধ্বনি বহু বৎসর পূর্ব্বে বায়ুরাশিকে তরঙ্গায়িত করিতে থাকে, তাহার পর ধ্বনি মানুষের কর্ণগোচর হয়। এই হেতু, রবি-বাবু যে "কণিকা"য় লিখিয়াছেন

> ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,—
> ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।"

ইহা অতি ভ্রান্ত কথা। রবি-বাবু কবি মানুষ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহের কোনই খবর রাখেন না; তাই এত বড় একটা ভুল করিয়াছেন।

কেবল যে রবি-বাবুই চিত্তরঞ্জন-বাবুর নিকট ঋণী তাহা নয়, একখানা সরকারী রিপোর্ট পর্য্যন্ত তাঁহার অভিভাষণের ৪০.৪১ পৃষ্ঠায় বিবৃত পল্লীসমাজ ও জেলাসমাজের অনুরূপ, পল্লীগ্রাম অঞ্চলের কার্য্যনির্ব্বাহের প্রণালী লিখিত রহিয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে যে সরকারী জেলা-শাসনকার্য্যনির্ব্বাহ-কমিটি (Bengal District Administration Committee) নিযুক্ত হয়, লেভিঞ্জ সাহেব তাহার সভাপতি ছিলেন। এই কমিটির রিপোর্ট ১৯১৪ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার সপ্তম অধ্যায়টি পড়িলে মনে হয়, যে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় যাহা বলিবেন, মিঃ লেভিঞ্জ ও তাঁহার সহযোগীগণ ১৯১৪ সালে তাহা অনুমান দ্বারা বা অন্য উপায়ে জানিতে পারিয়া তদ্বিধ একটা কার্য্যপ্রণালী বিবৃত করিয়া থাকিবেন। আসল পণ্ডিতের মত এই-প্রকারে নকল পণ্ডিতেরা বহুপূর্ব্বে নিজেদের বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। অবশ্য সরকারী রিপোর্টে পল্লীসমাজ আদি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত হওয়া এবং গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানের অধীন করা দরকার বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে; চিত্তরঞ্জন-

বাবুর ব্যবস্থা বেসরকারী রকমের। এই অধ্যায়টি প্রবাসীতে উদ্ধৃত করিলে ৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী হইত। এতখানি জায়গা দেওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়া ইহা উদ্ধৃত করিলাম না।

বঙ্গে শিক্ষার ব্যয়।

প্রায় দেড় মাস হইল আমরা বাংলা দেশের ১৯১৫-১৬ সালের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্ট পাইয়াছি। ঐ বৎসর বাংলা দেশে শিক্ষার ব্যয় হইয়াছিল ২,৫৬,৭৮,৩৪৮, টাকা। ইহার মধ্যে ছাত্রেরা বেতন দিয়াছিল ১,১০,৪৩,১২৯ টাকা এবং চাঁদা ও শিক্ষার জন্য প্রদত্ত গচ্ছিত মূলধন আদি হইতে আয় হইয়াছিল ৪২,৮১,৮১৭ টাকা। গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ৭৮,৯৯,৪৭২ টাকা দিয়াছিলেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডও মিউনিসিপালিটি-সমূহ হইতে পাওয়া গিয়াছিল যথাক্রমে ২২,৭৮,৫৭০ টাকা ও ১,৭০,৬০৫ টাকা। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে শিক্ষার ব্যয়ের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অংশ ছাত্রেরা বহন করিয়াছিল। তা ছাড়া সর্ব্ব-সাধারণে চাঁদাও দিয়াছিল বিস্তর টাকা, এবং বদান্য বিদ্যোৎসাহী লোকেরা শিক্ষার জন্য যে ভূসম্পত্তি ও মূলধন দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও অনেক আয় হইয়াছিল। ভারতপ্রবাসী সরকারী ও বেসরকারী অনেক ইংরেজ আমাদিগকে অপমানিত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বলিয়া থাকেন যে আমরা ভিক্ষুকদের মত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভিক্ষাস্বরূপ শিক্ষা পাইয়া থাকি। ইহা যে কিরূপ মিথ্যা কথা, তাহা উপরের অঙ্কগুলি হইতে দৃষ্ট হইবে। কিন্তু বাস্তবিক যদি ছাত্রেরা এক পয়সাও বেতন না দিত, সর্ব্ব-সাধারণে এক পয়সাও চাঁদা না দিত, কিম্বা ভূসম্পত্তি-আদি শিক্ষার্থে দান না করিত, যদি শিক্ষার সমগ্র ব্যয় গবর্ণমেণ্ট বহন করিতেন, তাহা হইলেও শিক্ষা-বিষয়ে আমাদিগকে ভিক্ষোপজীবী বলা চলিত না। কারণ গবর্ণমেণ্টের টাকা মানে কোনও ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীর বা রাজকর্ম্মচারীদিগের ইংলণ্ড হইতে আনীত পৈত্রিক সম্পত্তির আয় নহে; ইহার মানে আমাদেরই প্রদত্ত ট্যাক্স।

ইউরোপীয়দের শিক্ষার ব্যয়।

১৯১৫-১৬ সালে সমুদয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৮,৪৪,-৫৪১। তন্মধ্যে ইউরোপীয় ছাত্রছাত্রী ছিল ১০,৩৩৭। প্রায় সাড়ে আঠার লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জন্য গবর্ণমেণ্ট খরচ করিয়াছিলেন ৭৮,৯৯,৪৭২, অর্থাৎ প্রায় উনআশি লক্ষ টাকা। কিন্তু দশ হাজার ইউরোপীয় ছাত্রছাত্রীর জন্য গবর্ণমেণ্ট খরচ করিয়াছিলেন ৮,৫১,৮৫১ টাকা। অর্থাৎ দেশের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকার মাথা-পিছু চারি টাকার উপর খরচ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইউরোপীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খরচ করিয়াছিলেন মাথা-পিছু প্রায় ৮৫৲ টাকা। ভারতবাসী ইউরোপীয়েরা যে-হারে ট্যাক্স দেন, তাহা কি, আমরা যে-হারে ট্যাক্স দি, তাহার কুড়িগুণেরও অধিক? নতুবা এরূপ পক্ষপাতিত্ব ন্যায়সঙ্গত হয় কেমন করিয়া?

ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যয়।

সাধারণ কলেজে ছাত্রদের শিক্ষার মোট সাক্ষাৎ ব্যয় হইয়াছিল ১৭,২৬,৫৯৭ টাকা, এবং ছাত্রীদের জন্য হইয়া-ছিল ৫২,৩৪৩ টাকা। মেডিক্যাল কলেজ-আদি বৃত্তি-শিক্ষার কলেজে ছাত্রদের জন্য মোট সাক্ষাৎ ব্যয় হইয়াছিল ৮,০৮,৯৩৮ টাকা, ছাত্রীদের জন্য হইয়াছিল ৭,৬৯০ টাকা। উচ্চ ও মধ্য স্কুল-সকলে ছাত্রদের ব্যয় ৭২,৫৪,০১৫ এবং ছাত্রীদের ৭,৫৯,৬৭০। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য খরচ ৩৭,৪০,৬৯৯, এবং ছাত্রীদের জন্য ৫,৬২,২৭১। ট্রেনিং স্কুলে ছাত্রদের জন্য ৩,২৭,৯২০; ছাত্রীদের জন্য ৬২,-৬৭২। অন্যান্য বিশেষ স্কুলে ছাত্রদের জন্য ১০,৫৩,৬০২; ছাত্রীদের জন্য ৩৮,১৪৬। মোট সাক্ষাৎ ব্যয়—ছাত্রদের জন্য ১,৪৯,১১,৭৭১; ছাত্রীদের জন্য ১৪,৮২,৭৯২। ইহা ছাড়া গৃহনির্ম্মাণ আসবাব প্রভৃতির জন্য পরোক্ষ ব্যয় আছে। কিন্তু তাহা ছাত্র ও ছাত্রদের জন্য পৃথক্ করিয়া দেখান হয় নাই। যাহা দেখান হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, যে, দেশের লোক ও গবর্ণমেণ্ট পুরুষদের শিক্ষায় যতটা মন দেন ও ব্যয় করেন, নারীদের শিক্ষায় তাহার দশভাগের একভাগ মনোযোগ ও ব্যয় করেন না। এ অবস্থায় দেশের উন্নতি কেমন করিয়া হইবে? নারীরাও মানুষ, তাহাদেরও আত্মা আছে। তাহাদেরও মুক্তি এবং জীবনের সার্থকতা শিক্ষার উপর নির্ভর করে। এবং শিক্ষা লাভ করিবার ক্ষমতাও তাহাদের আছে। তাহাদের

নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তা ছাড়া, নারীদের শিক্ষা ভিন্ন কখন দেশের উন্নতি হইতে পারে না। তাহারা দেশের অর্দ্ধেক। পুরুষদের উন্নতি নারীর উন্নতির উপর নির্ভর করে। অশিক্ষিতা মাতা স্ত্রী ভগিনী পুরুষদের উন্নতি ও অগ্রগতির কারণ না হইয়া বরং অনেক সময় তাহাদের অবনতি ও জড়তার কারণ হন।

স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি।

যাহারা নারীদের কোন প্রকার শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করে না, এসব কথা তাহাদের জন্য লিখিতেছি না। যাহারা শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করেন, তাহারা নানা-ভাগে বিভক্ত। কেহ কেহ বলেন, লেখা পড়া না শিখাইয়াও মেয়েদিগকে শিক্ষা দেওয়া যায়; তাহারা বাড়ীতে থাকিয়া গুরুজনদিগের কাজ দেখিয়া শিখে। ইহা কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ঠিক্; কিন্তু যতটা জ্ঞানলাভ ও অন্যবিধ শিক্ষার প্রয়োজন, এরূপে ততটা শিক্ষা বালিকাদিগকে দেওয়া যায় না। আর একদল মনে করেন যে বর্ত্তমানে প্রচলিত ছাত্রীদের শিক্ষা প্রণালী ছাত্রদের শিক্ষার অনুরূপ; কিন্তু উভয়ের শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হওয়া উচিত। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, দর্শন, পদার্থবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে আমরা এই পার্থক্যের প্রয়োজন স্বীকার করি না। কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা ছাত্রীদের শিক্ষা করা বেশী দরকার; যেমন গৃহকর্ম্ম, শিশুপালন, ইত্যাদি। ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষার বিষয় ও প্রণালীতে খুব বেশী পার্থক্য রাখা দরকার বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহাতে শিক্ষার অনাবশ্যকতা প্রমাণ হয় না; ইহাই প্রমাণ হয় যে ছাত্রীদের শিক্ষা নূতন রকমের হওয়া দরকার। এই মতই যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে তদনুসারেই দেশের সমুদয় বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। এই মতাবলম্বীরা নিজ মত অনুযায়ী শিক্ষার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করুন। বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া বালিকা-দিগকে অশিক্ষিত রাখা মহা অনিষ্টের কারণ। অনেকের এরূপ মত আছে যে স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষা অনিষ্টকর, অন্ততঃ উহা নিষ্প্রয়োজন। আমরা এই মতকে ভ্রান্ত মনে করি। কোন বিদ্যাতেই এমন একটা সীমারেখা নাই, যাহা অতিক্রম করিলে পুরুষ বা নারীর অনিষ্ট হইতে পারে। যদি পাটীগণিতের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ শিখিলে ক্ষতি না হয়, তাহা হইলে ত্রৈরাশিক শিখিলে অনিষ্ট হইবে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। যদি পাটীগণিত শিখিলে অনিষ্ট না হয়, তাহা হইলে বীজগণিত শিখিলে অনিষ্ট হইবে, এরূপ মনে করিবার কারণ কি? কেহ কেহ মনে করেন, উচ্চশিক্ষা দিলে মেয়েদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়। আমাদের দেশে তাহা অনেক স্থলে হয় বটে, কিন্তু তাহা শিক্ষার দোষে নয়। তাহার কারণ, ব্যায়ামের ব্যবস্থার অভাব, অবরোধ প্রথা, এবং পরীক্ষা সম্বন্ধে কুনিয়ম, ইত্যাদি। যে-সব দেশে এই কারণগুলি বিদ্যমান নাই, তথাকার উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের স্বাস্থ্য খারাপ নয়। এমন মতও আছে যে বেশী লেখাপড়া শিখিলে নারীর নারীত্ব কমিয়া গিয়া নারী পুরুষের মত হইয়া যায়। আমরা ইহা ঠিক্ মনে করি না। অজ্ঞ রাখিলে নারী নারী থাকে, জ্ঞান পাইলে তাহারা আর-কিছু হইয়া যায়, ইহা বড় অদ্ভুত কথা। বিধাতার কাজ এত কাঁচা নয় যে তুমি আমি নারীদিগকে একটু জ্ঞান লাভের সুযোগ দিলেই তাহাদের নারীত্ব লোপ পাইবে। শিক্ষা-বিষয়ে উচ্চ ও নিম্ন প্রভৃতি বিশেষণ আপেক্ষিক। আমাদের দেশে যাহাকে উচ্চ শিক্ষা বলা হয়, অনেক দেশে তাহা স্কুলের ছেলেমেয়েদিগকেই দেওয়া হয়। তথাকথিত শিক্ষা পাইয়া অনেক যুবক অহঙ্কারী, দুর্বিনীত, অমানুষ হয়; কিন্তু তজ্জন্য যেমন পুরুষদের উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করিবার প্রস্তাব বিবেচক লোকেরা করে না, কেবল বলে যে শিক্ষা-প্রণালীরই উৎকর্ষ সাধিত হওয়া উচিত; তেমনি যদি তথা-কথিত উচ্চ শিক্ষা পাইয়া কোন নারী নারীত্বে হীন হন, তাহা হইলেও তজ্জন্য শিক্ষার দোষ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। বাস্তবিক আমরা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতেছি যে উচ্চ-শিক্ষা পাইয়াও পুরুষদের মধ্যে যে পরিমাণে অমানুষ দেখা যায়, উচ্চশিক্ষিতা নারীদের মধ্যে তদ্রূপ দেখা যায় না। শিক্ষায় নারীত্ব নষ্ট হয় যাহারা বলে তাহাদের প্রথম কর্ত্তব্য নারীত্বের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা।

বাস্তবিক, কাহাকে কতদূর পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ করিতে দেওয়া হইবে, তদ্বিষয়ে একটা সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করা মূর্খতা মাত্র। প্রত্যেক ছেলে উচ্চতম শিক্ষা পায় না;

পাইবার যোগ্যও হয় না; কিন্তু কতকগুলি ছেলে উচ্চতম শিক্ষা পাইয়া থাকে, পাইবার যোগ্যও বটে। মেয়েদের মধ্যেও এইরূপ যোগ্য অযোগ্য আছে। কোন্ মেয়ে বা ছেলে কত জ্ঞান লাভ করিবে, তাহার সীমা নির্দ্দেশ তাহাদের প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে হইবে।

আর একটা এইরূপ আপত্তি সচরাচর শুনা যায়—"মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া কি চাকরী করিবে?" আমরা বলি তাহারা জ্ঞানলাভ করিলে তাহাদের মনুষ্যত্ব ও নারীত্ব আরও বিকশিত হইবে, তাহারা মুক্তির পথে অগ্রসর হইবে, তাহারা পরিবারের ও দেশের সেবায় অধিকতর সমর্থ হওয়ায় তাহাদের জীবন সার্থক হইবে, তাহারা আরও ভাল করিয়া সন্তানদিগকে পালন করিতে ও স্বয়ং শিক্ষা দিতে পারিবে। যদি অবস্থা ভাল না হয়, তাহা হইলে, উপার্জ্জন করিবার জন্য, লেখাপড়া জানা পুরুষেরা যে-সব চাকরী বা কাজ করে, তাহারাই বা তাহা কেন না করিবে? স্ত্রীলোকেরা মজুরীর জন্য নানারকম দৈহিক শ্রমের কাজ করে, গরীব ভদ্র গৃহস্থের মেয়েরা দাসী ও পাচিকার কাজ করে। তাহা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না, এবং নিন্দনীয় নহেও। শিক্ষা পাইয়া নারীরা শিক্ষয়িত্রীর কাজ, বা ডাক্তারির কাজ, বা গ্রন্থ রচনার কাজ, বা এইরূপ কোন শিক্ষাসাপেক্ষ কাজ করিলেই উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে হইবে, ইহা কিরূপ যুক্তি? স্ত্রীলোকেরা মজুরী, দাসীপনা, পাচিকার কাজ করিয়া অল্প রোজগার করিলে তাহাতে আপত্তি হয় না, কিন্তু শিক্ষা পাইয়া বেশী রোজগার করিলেই অমনি নানা আপত্তি হয়, ইহা বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার। অবশ্য, আমাদের মত এই যে, সামাজিক ব্যবস্থা এরূপ হওয়াই ভাল যে যাহাতে নারীদিগকে সন্তান পালন ও উপার্জ্জন উভয়ই করিতে না হয়; কিন্তু যদি উপার্জ্জন করিতেই হয়, তাহা হইলে সম্মানের সহিত অধিক উপার্জ্জন যাহাতে হয় এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করাই ভাল।

যাহারা বলেন, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া ভাল নয়, তাঁহারা বলুন, কতদূর শিক্ষা দেওয়া দরকার। মনে করুন, কেহ বলিলেন যে তাহাদিগকে এণ্ট্রেন্স্ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়ান যাইতে পারে। বেশ কথা; কিন্তু মেয়েদিগকে মেয়েরাই শিক্ষা দেন, ইহা বাঞ্ছনীয়, অন্ততঃ আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়। এণ্ট্রেন্স্ ক্লাসে যাঁহারা পড়াইবেন, তাঁহাদের অন্ততঃ বিএ-পাস্-করা চাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে বি এ পাস্ করা শিক্ষয়িত্রীর দরকার আছে, সুতরাং বিএ পর্য্যন্ত পড়ারও দরকার আছে। কেহ যদি বলেন যে মেয়েদের ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর পর্য্যন্ত পড়াই যথেষ্ট, তাহা হইলেও তাহাদিগকে শিখাইবার জন্য উচ্চতর-শিক্ষা-প্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রীর দরকার, এবং এই শিক্ষয়িত্রীদিগকে যাহারা শিখাইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তদপেক্ষাও উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্তা। অতএব, বালিকাদের কিছু শিক্ষা হওয়া দরকার বলিয়া যাহারা স্বীকার করেন এবং নিজ নিজ কন্যাদের তদ্রূপ শিক্ষা দেন, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে নারীদের উচ্চ শিক্ষারও দরকার। তাঁহারা যদি বলেন যে উচ্চ শিক্ষায় নারীদের নারীত্বের হ্রাস হয় বা অন্য-প্রকার অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে হয় বলিতে হইবে, যে, "আমরা বালিকাদের নিম্নতম শিক্ষাও বন্ধ করিব, কারণ শিক্ষয়িত্রী উচ্চশিক্ষিতা হওয়া চাই, এবং উচ্চ শিক্ষায় নারীর অনিষ্ট হয়, আমরা তেমন অনিষ্ট চাই না," কিম্বা তাঁহাদিগকে স্বার্থপর ভাবে বলিতে হইবে, যে, "আমাদের মেয়েদের অল্পস্বল্প শিক্ষার জন্য কতকগুলি নারীর উচ্চশিক্ষা পাওয়া আবশ্যক; তাহাতে তাহাদের অনিষ্ট হইবে বটে, কিন্তু আমাদের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য তাহাদের এই অনিষ্ট হউক।"

এরূপ একটা ধারণাও আছে, যে, শিক্ষিতা নারীরা রন্ধনাদি গৃহকর্ম্মে অসমর্থ হইয়া পড়ে। কোন কোন শিক্ষিতা মহিলা যে গৃহকর্ম্মে অপটু, ইহা ঠিক্; কিন্তু ইহা কি শিক্ষার জন্য? হাজার হাজার অশিক্ষিতা নারীও ত গৃহকর্ম্মে নিপুণ নহে, বিশেষতঃ ধনীর গৃহে; তাহাদের এই অক্ষমতার কারণটা কি? যাঁহারা শিক্ষিতা মহিলাদের বিষয় কিছুই জানেন না, তাঁহারা নানাবিধ কল্পনা জল্পনা করেন। আমরা পুস্তকরচনা, অধ্যাপনা, রন্ধন, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, জামা সেলাই, প্রভৃতি কাজে নিপুণ শিক্ষিতা নারী দেখিয়াছি বলিয়া উচ্চ শিক্ষা ও গৃহকর্ম্মনির্ব্বাহের মধ্যে কোন বিরোধ আছে বলিয়া মনে করি না। বাস্তবিক শিক্ষিতা নারীদিগকে এত ভিন্ন ভিন্ন রকমের কাজ করিতে

দেখিয়াছি, যে, তাহা শিক্ষিত পুরুষ বা অশিক্ষিতা নারীরা কেহই করিতে পারেন না। ইহা শিক্ষার গুণ বলিতে হইবে। সুচ্ছল অবস্থার লোকের বাড়ীর মেয়েরা অনেক স্থলেই গৃহ-কর্ম্ম করেন না, রাঁধুনী ও ঝি চাকরে সব কাজ করে। তাঁহারা শিক্ষিতা হইলে সময়ের ও শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, অশিক্ষিতা হইলে খেলা, গল্প, কলহ ও পরচর্চ্চায় দিন যাপন করেন।

গৃহকর্ম্ম করাটা যে নারীরই কর্ত্তব্য, পুরুষের নয়, তাহাই বা কেন ধরিয়া লওয়া হইবে? অবশ্য সন্তানপালন পিতা অপেক্ষা মাতারই অধিক কর্ত্তব্য; তিনিই তাহা করেন। কিন্তু অন্যান্য কাজ ধরুন। রান্না করিবার জন্য কেহ পাচক রাখে, কেহ পাচিকা রাখে। আমাদের দেশের হিন্দু হোটেল, মুসলমান হোটেল ও ছাত্রাবাস এবং পাশ্চাত্য বড় বড় হোটেলে পুরুষেরাই রান্না করে। অতএব, রান্নাটা বিশেষ করিয়া মেয়েদেরই কাজ এমন বলা যায় না। যে গৃহস্থালিতে বেতন-ভোগী লোকে রান্না করে না, তথায় স্ত্রীলোকেরা রান্না করেন বটে। কিন্তু স্থলবিশেষে পুরুষেও রান্না করে। যে পুরুষ অশিক্ষিত, তাহার অন্য কাজ না জুটিলে সে অন্য-বিধ মজুরীর মত পাচকের কাজও করিতে পারে, শিক্ষিত হইলে সে তাহা না করিয়া অধিক রোজগারের কাজ করে। তদ্রূপ যদি কোন শিক্ষিতা নারী রন্ধন ব্যতীত অন্য কাজে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, বা অধিক উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে রাঁধিতেই হইবে, এমন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম আছে কি? ধনীর গৃহিণীরা ত রাঁধেন না; তাহাতে তাঁহাদের কেহ নিন্দা রটাইয়া বেড়ায় না। কিন্তু শিক্ষিতা কোন মহিলা যদি না রাঁধেন, তাহা হইলে সৃষ্টি উল্টিয়া যাইবে মনে করিবার কি কারণ আছে? আমরা এমন বলিতেছি না যে রান্না করা ভাল নয় বা অনাবশ্যক; বরং নিজে রাঁধিয়া পরিবারের সকলকে খাওয়াইতে পারিলে তাহাতে আনন্দ আছে, এবং তাহাতে গৃহস্থালির খরচ কম হয় এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আমরা ইহাই বলিতেছি, যে পৃথিবীতে রান্না করিয়া পুরুষেও রোজ-গার করে, স্ত্রীলোকেও করে, পাচক ও পাচিকা পৃথিবীতে দুই-ই আছে, এবং অনেক অশিক্ষিতা নারীও রান্না করেন না। এমত অবস্থায় শিক্ষিত পুরুষেরা রান্না না করিলে যদি তাহাদের নিন্দা না হয়, তাহা হইলে কোনও শিক্ষিতা নারী যদি না রাঁধেন তাহা হইলে তাঁহারই নিন্দায় গগন বিদীর্ণ করিবার কারণ কি? এইরূপ, পুরুষেও বাসন মাজে ও ঘর ঝাঁট দেয়, স্ত্রীলোকেও বাসন মাজে ও ঘর ঝাঁট দেয়। এমন স্থলে শিক্ষিত পুরুষেরা এইরূপ গৃহকর্ম্ম না করিলে যদি তাহাদের নিন্দা না হয়, তাহা হইলে শিক্ষিতা নারীরা তাহা না করিলে তাহাদেরই বা নিন্দা হইবে কেন? বাস্তবিক, কোন গৃহকর্ম্ম বা দৈহিক শ্রম নিন্দনীয় বা হেয় নহে। পুরুষ বা নারী কাহারও আলস্যে কালযাপন করা উচিত নয়। সম্ভ্রম যাইবে বলিয়া, নিজের কোন কাজ নিজে না করিয়া চাকর রাখিয়া দেনাগ্রস্ত ও বিব্রত হওয়া যেমন পুরুষের পক্ষে নিন্দনীয়; তেমনি বাড়ীর কর্ত্তা রোজগারের জন্য খাটিয়া-খাটিয়া হায়রান হইবেন, এবং মেয়েরা পাচক ও দাস-দাসী রাখিয়া আলস্যে কালযাপন করিবেন, ইহাও তদ্রূপ নিন্দনীয়। এরূপ ব্যবহার শিক্ষিতার পক্ষে নিন্দনীয়, অশিক্ষিতার পক্ষেও নিন্দনীয়। বাস্তবিক, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত পুরুষ ও নারীরা রাঁধেন, ঘর ঝাঁট দেন ও বাসন মাজেন কি না, ইহা জিজ্ঞাস্য নহে; জিজ্ঞাস্য এই যে কে কিভাবে কালযাপন করেন। যে আলস্যে ব্যসনে পাপকার্য্যে কাল কাটায়, সে পুরুষ হউক, বা নারী হউক, শিক্ষিত হউক, বা অশিক্ষিত হউক, সে নিন্দার পাত্র। কোন পুরুষ শিক্ষক স্কুলের কাজ করিয়াও যদি নিজের রান্না নিজে করিতে পারেন ত ভাল কথা; না পারিলে তাঁহার নিন্দা হয় না। কোন শিক্ষয়িত্রীও যদি স্কুলের কাজ ছাড়া রান্নাও করেন, ভাল কথা; কিন্তু তাহা না করিলে অপযশের কারণ দেখিতেছি না।

অনেক পুরুষের শিক্ষিতা মহিলাদের প্রতি মনের বিরুদ্ধ-ভাবের আসল কারণ এই যে অজ্ঞ স্ত্রীলোকদের কাছে, তাহাদের যেমন একটা শ্রেষ্ঠত্ববোধ অক্ষুণ্ণ থাকে, শিক্ষিতা নারীদের কাছে তাহা থাকে না। এই-সকল লোকের জানা উচিত যে স্ত্রীলোককে ছোট রাখিয়া নিজেদের বড় থাকিবার বা হইবার এই যে আকাঙ্ক্ষা, ইহা নিতান্তই হাস্যকর। ইহাতে কিছুই পৌরুষ নাই, কাপুরুষতা আছে। পুরুষদিগকে ও নারীদিগকে সর্ব্ববিধ হিতকর জ্ঞান ও শিক্ষা

লাভের সমান সুযোগ দেওয়া হউক; তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, পুরুষের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় এবং নারীদেরই বা বিশিষ্টত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়। আমাদের ধারণা, কেহই অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, উভয়ে উভয়ের অপূর্ণতা পরিপূরণ করে।

নারীর শিক্ষার সুযোগ পুরুষের শিক্ষার সুযোগের সমান হওয়া চাই; নতুবা নারীরও কল্যাণ নাই, পুরুষেরও কল্যাণ নাই। বহুকাল স্ত্রীশিক্ষা অবহেলিত হইয়া আসিতেছে। এইজন্য এখন কিছুদিন বরং ছেলেদের শিক্ষার চেয়েও মেয়েদের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের ও সর্ব্বসাধারণের অধিক পরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য।

বেথুন কলেজ।

নারীদের উচ্চ শিক্ষা ভাল কি মন্দ, বাঙ্গালীদের পক্ষে উদ্বেগ ও উত্তেজনার সহিত এই প্রশ্নের আলোচনা করিবার প্রয়োজন এখনও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ডিরেক্টরের শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে দেখিতেছি যে, ১৯১৫-১৬ সালে, বঙ্গের দুকোটি ত্রিশ লক্ষ নারীর মধ্যে একচল্লিশটি মাত্র বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ঐ বৎসর বেথুন কলেজের চারিটি ক্লাশে ৭৭টি এবং ডায়োসেসান কলেজের ক্লাসগুলিতে ৪৩টি ছাত্রী ছিল; মোট ১২০। গড়ে প্রতি বৎসর ১০।১২টির বেশী মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পান না। অতএব, যদি শিক্ষায় কুফল হয় বলিয়া ধরিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলেও বাঙালীদের উদ্বেগে বিনিদ্র হইবার দরকার নাই। বৎসরে কয়েকলক্ষ স্ত্রীলোক জ্বরে মারা পড়ে। নারীদের উচ্চ শিক্ষার বিরোধীরা না হয় ধরিয়া লউন, যে, আর ১০।১২টি কিম্বা ১০০টি নারী যেন মরিয়াই গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে অনেকে মনে করে উচ্চশিক্ষা পাইলে নারীদের নারীত্ব কমিয়া যায়, এবং তাহারা পুরুষভাবাপন্ন হয়। এই আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলেও বাংলা দেশে এজন্য উদ্বেগ বৃদ্ধির কি খুব বেশী কারণ আছে? বঙ্গে পৌরুষের কি এতই ছড়াছড়ি হইয়াছে, যে, দশবিশ পঞ্চাশ বা একশটি স্ত্রীলোক পৌরুষসম্পন্ন হইয়া উঠিলে পৌরুষের আতিশয্যে ধরা টলটলায়মানা হইবেন? মা ভৈঃ, মা ভৈঃ।

আমাদের বিশ্বাস পুরুষদের মত নারীদেরও শিক্ষার সুযোগ খুব বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলা দেশে গবর্ণমেণ্ট পুরুষদের জন্য সাতটি কলেজ চালাইয়া থাকেন, নারীদের জন্য কেবল একটি। তা ছাড়া খৃষ্টিয়ানদের ডায়োসেসান কলেজে গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৬০০ টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন। তেমন, ছেলেদের বিস্তর কলেজে সরকারী সাহায্য আছে। নারীদের জন্য গবর্ণমেণ্ট এই একটি কলেজ মাত্র রাখিয়াছেন, কিন্তু সকল দিকেই তাহার দুরবস্থা। ডিরেক্টর নিজেই বলিতেছেন:—

"The Bethune College still shares its buildings with the Collegiate School, and the accommodation is inadequate and bad. Many applications for admission had to be refused. The Simla Bazar has been acquired and added to the College grounds, but it has not yet been found possible to provide funds for the construction of the new buildings......The College was affiliated in Mathematics to the Intermediate standard during the year."

এত বৎসর ধরিয়া বেথুন কলেজ চলিতেছে, অথচ কলেজ বিভাগ ও স্কুল বিভাগের আলাদা বাড়ী নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। বেসরকারী কোন শিক্ষালয়কে গবর্ণমেণ্ট বা বিশ্ববিদ্যালয় কখনই এ অবস্থায় থাকিতে দিতেন না। কলেজের সমস্ত ক্লাস করিবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কক্ষ পর্য্যন্ত নাই। কয়েকটি ক্লাস একই হলের ভিন্ন ভিন্ন অংশে হয়। ডিরেক্টর নিজেই বলিতেছেন ক্লাস করিবার যথেষ্ট জায়গা নাই, এবং যাহা আছে তাহা খারাপ। জায়গার অভাবে অনেক ছাত্রীকে ভর্ত্তি করা হয় নাই, তাহাও তিনি বলিতেছেন। সিমলা বাজার কলেজ-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য লওয়া হইয়াছে, কিন্তু টাকার অভাবে নাকি উহা নির্ম্মিত হয় নাই! অর্থের অভাব ত নয়, আগ্রহের অভাব। গবর্ণমেণ্ট যাহা দরকারী মনে করেন, তাহার কোন্ কাজটা অর্থের অভাবে অসম্পন্ন থাকে? নূতন প্রদেশ হয়, নূতন রাজধানী হয়, জেলা ভাগ হয়, পুলিশের ব্যয় বাড়ে, সিবিলিয়ানদের পাওনা বাড়ে, এমন কি শিক্ষা-বিভাগেই ছেলেদের উচ্চ শিক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়; কিন্তু মেয়েদের

একটিমাত্র কলেজের জন্য গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত দুই এক লক্ষ টাকা জুটে না। ১৯১৫-১৬ সালের রিপোর্টেই দেখিতেছি, ছেলেদের কলেজের ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের জন্য গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাড়ে নয় লক্ষ টাকা ঐ বৎসর দিয়াছেন, এবং ঐ বৎসর ছেলেদের য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য দু লক্ষ, এবং ছেলেদের বেকার মাদ্রাশা ছাত্রাবাসের জন্য এক লক্ষ বাবট্টি হাজার টাকা খরচ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা কখন কখন বলেন যে এদেশের লোকদের স্ত্রীশিক্ষায় অনুরাগ নাই; আলোচ্য রিপোর্টেই বলা হইয়াছে "local enthusiasm for girls' schools, though considerable, rarely takes the form of financial assistance." ইহা সত্য কথা, কিন্তু অর্থদানকে উৎসাহের মাপকাঠি বলিয়া ধরিলে গবর্ণমেণ্টেরও যে যথেষ্ট উৎসাহ আছে, তাহা কি বলা যায়?

বর্ত্তমান বৎসরের বঙ্গীয় বজেটে বেথুন কলেজের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হইয়াছে চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র। শুনিলাম, তাহা আস্তাবল ও ভৃত্যদের গৃহ নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইবে। ঘোড়া ও ভৃত্যদের প্রতি দয়া ভাল জিনিষ, তাহাদের সুবিধা দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু ছাত্রীদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ বোধ করি নিতান্ত অনাবশ্যক নহে।

বেথুন কলেজের গৃহ নির্ম্মাণ করা দরকার, ছাত্রীনিবাস আরও বাড়ান আবশ্যক, ছাত্রীদের প্রশস্ততর ব্যায়াম ও খেলার জায়গার প্রয়োজন আছে। তদ্ভিন্ন বি এ ক্লাস পর্য্যন্ত বিজ্ঞান ও গণিত পড়াইবার বন্দোবস্ত করা দরকার। গত বৎসর বেথুন কলেজের কয়েকটি ছাত্রী কোন কোন বিষয়ে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু কলেজে অনার-কোর্স পড়াইবার অনুমতি না থাকায় এই ছাত্রীরা প্রাইভেট ছাত্রী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে অনার কোর্স পড়াইবারও বন্দোবস্ত করা উচিত।

নূতন লেডী প্রিন্সিপ্যাল মিস্ জেনো কলেজের কাজে বেশ উৎসাহী, এবং ছাত্রীদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি তাঁহার বেশ দৃষ্টি আছে, শুনিতে পাই। তিনি অধ্যাপকদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করায় কার্য্যসৌকর্য্যও হইয়াছে। তিনি স্কুল বিভাগের কাজও কতকটা সাক্ষাৎ ভাবে দেখিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ [illegible] সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ভাবে মিশিবার খুব প্রয়োজন আছে। তাহা হইলে স্কুল বিভাগের কাজের উন্নতি হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উন্নতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহাশয় তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় কয়েকটি বক্তৃতা করিবেন। তাহা বিশদ করিবার জন্য তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলি দ্বারা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও (experiments) প্রদর্শিত হইবে। তিনি যেরূপ সরলভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাহাতে এই-সব বক্তৃতা যে অবৈজ্ঞানিক শিক্ষিত শ্রোতাদেরও বোধগম্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে অনেকের শিক্ষা লাভ হইবে। যদি এই বক্তৃতাগুলি কেহ লিখিয়া লইয়া বসু মহাশয়ের দ্বারা সংশোধন করাইয়া মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যেরও সমৃদ্ধি বাড়িতে পারে। বাংলা সংক্ষিপ্ত লিপির চর্চ্চা না হওয়া দুঃখের বিষয়। ইংরেজীতে যেমন সাংকেতিক লিপি দ্বারা বক্তৃতা দ্রুত লিখিয়া লওয়া যায়, বাংলায় সেরূপ লিখিবার অভ্যাস কতকগুলি লোকে করিলে অনেক ভাল ভাল বক্তৃতা রক্ষিত হইতে পারে। বাংলা সাঙ্কেতিক লিপি যে নাই, তাহাও নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রেখাক্ষর বর্ণমালার সাহায্যে বাংলা বক্তৃতা ও কথাবার্ত্তা দ্রুত লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। এই পুস্তক আদি-ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

বসু মহাশয়ের এই বক্তৃতাগুলির জন্য পরিষদের গৃহের বৈদ্যুতিক ও অন্যবিধ ব্যবস্থার কিছু উন্নতির প্রয়োজন। তজ্জন্য তিনি সহৃদয় সভ্যকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যে অনুষ্ঠান যত বেশী লোকের অনুরাগের ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা তত বেশী। এই জন্য, ২।১ জন ধনীর দানের উপর নির্ভর না করিয়া সকল সভ্যের নিকট সাহায্য চাওয়া ভালই হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় দেখিলাম, গত ২৭শে চৈত্র পর্য্যন্ত ৮৮১/০ আদায় হইয়াছে। আশা করি বাকী টাকাও শীঘ্র সংগৃহীত হইবে।

সভাপতি মহাশয় আরও একটি সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বঙ্গের অনেক যোগ্য লোককে তিনি গ্রীষ্মাবকাশের পর হইতে পরিষদে তাঁহাদের স্বনির্ব্বাচিত বিষয়ে ব্যাখ্যান বা অভিভাষণ পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এইগুলি পরে মুদ্রিত হইবে।

পরিষদের সংস্কার।

পরিষদের আয়ব্যয় সম্বন্ধে নানা কথা বহুদিন হইতে কোন কোন খবরের কাগজে ও মুখে মুখে রটিতেছে। আমরা পরিষদের সহিত সংসৃষ্ট না থাকায় ভিতরকার কথা অবগত নহি। কোন-না-কোন সূত্রে কিছু জানিতে পারিলেও, কাগজ-পত্র না দেখিয়া নাম ধরিয়া কিছু বলাও সঙ্গত নহে। কিন্তু এই-সকল বিষয়ে যে-সব মূলনীতি অনুসৃত হওয়া উচিত, তাহার আভাস দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা পরিষদের বেতনভোগী কর্ম্মচারী, যাঁহাদের ছাপাখানায় পরিষদের কাজ হয়, কিম্বা অন্য যে কোন প্রকারে যাঁহারা পরিষদ হইতে টাকা পান, তাঁহাদের কাহারও পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বা অন্য এমন কোন কমিটিতে থাকা উচিত নয়, যাহার টাকা খরচ বা মঞ্জুর করিবার বা কর্ম্মচারীদের বেতন বাড়াইবার ক্ষমতা আছে। এই নিয়ম যদি এখন না থাকে, তাহা হইলে নূতন করিয়া এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। নতুবা, পরিষদের কোন কোন সভ্য নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করাইয়া তাহাকে ঋণগ্রস্ত করিতেছেন, এরূপ অপবাদ নিরসনের কোন উপায় থাকিবে না। শুনা যায়, পুস্তকমুদ্রণাদি বাবতে, বর্ত্তমান সভাপতি মহাশয়ের আমলের পূর্ব্বে, পরিষদের এরূপ ব্যয় হইয়াছে, যে, কর্ত্তৃপক্ষ স্থায়ী ফণ্ড ভাঙিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা সত্য হইলে বলিতে হইবে, যে, তাঁহারা অন্যায় কাজ করিয়াছেন। পরিষদ যত বই ছাপেন, তাহার কোনখানাই কি পরে ছাপিলে চলিত না? কোনখানারই লেখকের কি মুদ্রণব্যয়-নির্ব্বাহক্ষম বংশধর বিদ্যমান নাই? আমরা পরিষদের বহি ২।১০খানা যে না দেখি, তা নয়। সবগুলাই এমন অমূল্য নিধি নহে, যে, তাহা স্থায়ী ফণ্ড ভাঙিয়া ছাপাইতে হইবে।

পরিষদের সভ্যসংখ্যা বোধ হয় দু হাজারের উপর হইবে। সকলে নিয়মিতরূপে চাঁদা দেন না। দিলেও, সভ্য আরও অনেক বেশী হওয়া আবশ্যক। কারণ, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মঙ্গলসাধন যে-সমিতির উদ্দেশ্য, তাহার কাজ যত ইচ্ছা বাড়ান যায়, এবং বাড়ান কর্ত্তব্যও বটে। কিন্তু ভাল করিয়া কাজ করিতে হইলে বিস্তর টাকার দরকার। সভ্য বাড়াইলে এবং দেশের লোকদের পরিষদের প্রতি অনুরাগ বাড়াইতে পারিলে, টাকার অভাব কখনই হইবে না। কিন্তু সম্প্রতি, শুনিলাম, পরিষদে কখন যাহা হয় নাই এরূপ একটি ঘটনা ঘটায় সভ্যসংখ্যা বাড়িবার সম্ভাবনা কমিয়াছে, এবং কতকগুলি লোকের পরিষদের প্রতি অনুরাগ না বাড়িয়া বিরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। বর্ত্তমান সভাপতি মহাশয় দলাদলির বাহিরে, কিন্তু মানুষের মন বদলান তাঁহার সাধ্যাতীত। কাহার কি অভিসন্ধি তাহা তিনি জানিবেনই বা কেমন করিয়া? পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচনের নাকি এইরূপ নিয়ম আছে যে একজন সভ্যও যদি কাহারও নির্ব্বাচনে আপত্তি করে, তাহা হইলে তিনি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। যে ঘটনার কথা বলিতেছি, তাহার আগে কাহারও নির্ব্বাচনে আপত্তি হয় নাই। হইবার কোন কারণও নাই। এই নিয়মটি উঠাইয়া দেওয়া উচিত। যে সমিতিতে রাজনৈতিক বা অন্যবিধ ষড়যন্ত্র হয়, যাহাতে নরনারীর সামাজিক অবাধ সম্মিলন হয়, কিম্বা যাহাতে বৈধ অথচ গোপনীয় কোন পরামর্শ বা মন্ত্রণা হয়, তাহাতে নির্ব্বাচনের এইরূপ নিয়ম আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু পরিষদ এরূপ কোন প্রকারেরই সমিতি নহে। যাহা হউক, এখন ঘটনাটির কথা যাহা শুনিয়াছি বলি।

কিছুদিন হইল, ৭০।৮০ জন ভদ্রলোকের নাম নির্ব্বাচনের জন্য পরিষদের নিকট উপস্থিত করা হয়; ঠিক্ কত জন বলিতে পারি না, তবে ৭০এর কম নয়। সকলেরই নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হয়। কিন্তু একজন সভ্য প্রস্তাবিত ৩ কিম্বা ৪ জন ছাড়া আর সকলের সম্বন্ধে আপত্তি আছে বলায় তাঁহারা নির্ব্বাচিত হন নাই। আপত্তির কারণ জানাইতে তিনি নিয়মানুসারে বাধ্য না থাকায় কারণ বলেন নাই। ইহা সম্ভব নয় যে এই-সব লোকের প্রত্যেকেই তাঁহার জানা লোক; তাঁহাদের নিবাস নানা

জায়গায়। যাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই, তাঁহাদের নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে এরূপ সমষ্টিগত ভাবে বাণ্ডিল-বাঁধা আপত্তি বিস্ময়কর ব্যাপার। লোকে পাইকারী দরে জিনিষ কেনে; কিন্তু পাইকারী ভাবে শিক্ষিত লোকে আপত্তিও করে, এটা নূতন ব্যাপার বটে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আপত্তিকারী মহাশয় ৩৪ জন ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে আপত্তি করেন নাই। এই গুজব কি সত্য যে, তন্মধ্যে পুলিস্‌কোর্টের দুজন কর্ম্মচারী আছেন, এবং ঐ কোর্টের সঙ্গে আপত্তিকারী মহাশয়ের এক আত্মীয়ের সম্পর্ক আছে? এই গুজব কি সত্য যে, আর-একজন ভদ্রলোক, যাঁহার বিরুদ্ধে আপত্তি হয় নাই, তিনি পরিষদের একজন প্রভাবশালী সভ্যের আত্মীয় বা কুটুম্ব? যাঁহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি হয় নাই, তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে কৃতী বলিয়া শুনি নাই। পক্ষান্তরে যাঁহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কৃতী সাহিত্যিক আছেন। যাঁহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি হইয়াছে, তাঁহারা মোটের উপর পরিষদের অধিকাংশ সভ্যেরই মত শিক্ষিত এবং কৃতী বা অকৃতী। তাঁহাদের বিশেষ কোন অযোগ্যতা দেখিতেছি না। সুতরাং তাঁহাদিগকে অপমানিত করা সর্ব্বপ্রকারেই গর্হিত হইয়াছে।

আপত্তিকারী মহাশয় আপত্তির কারণ না জানাইলেও, নানাবিধ কারণ অনুমিত হইতেছে। একটা এই, যে, বর্ত্তমানে পরিষদে যাঁহাদের প্রভুত্ব আছে, তাঁহাদের আশঙ্কা হইয়াছিল যে সভ্য বাড়াইয়া তাঁহাদিগের প্রভুত্ব লুপ্ত করা হইবে। এইজন্য তাঁহাদেরই একজন আপত্তি করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় না যে ৭০।৮০ জন শিক্ষিত ভদ্রলোক অবিচারে কাহারও নির্দ্দেশ-মত ভোট দিবেন। দিলেও, দুহাজারের অধিক সভ্যের উপর আরও জন সত্তর বাড়িলে, কমিটি এখন যেরূপ গঠিত হইয়াছে, মোটের উপর বোধ হয় প্রায় তাহাই দাঁড়াইত। এরূপ আশঙ্কার আসল প্রতিকার, সকল দলেরই খুব সভ্যসংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করা। তাহাতে দলাদলি আপাততঃ প্রবল হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, মোটের উপর পরিষদের আয় বাড়িত, এবং অধিকতর উৎসাহের সহিত কাজ চলিত। এখন যাঁহাদের হাতে ক্ষমতা আছে, তাঁহাদেরও এরূপ মনে করা উচিত নয় যে তাঁহারা ব্যতীত পরিষদের কাজ চলিতেই পারে না। গ্ল্যাডষ্টোন মরিয়া যাইবার পরও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চলিতেছে। লর্ড রবার্ট্‌স্ এবং লর্ড কিচনার মরিয়া যাইবার পরও ইংরেজ যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছে। এস্কুইথের মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইবার পর ব্রিটিশসাম্রাজ্য ছারখার হইয়া যায় নাই। পরিষদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার নহে। ইহা চালাইবার লোক একান্ত দুর্ল্লভ নহে। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত পরিষদের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের নিন্দা করিবার জন্য এসব কথা লিখিতেছি না। তাঁহারা পরিষদের কল্যাণ যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য বাঙালী মাত্রেরই চিরকৃতজ্ঞতাভাজন। আমরা কেবল এই বলিতে চাই, যে, তাঁহাদের দৃষ্টি দেশকালপাত্র-বিষয়ে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে যেন আবদ্ধ না থাকে, তাঁহারা যেন এরূপ মনে না করেন যে বাঙালী জাতির কার্য্যক্ষমতা ও চরিত্রবত্তা একটি কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দলেই আছে, অন্যত্র নাই। যদি নূতন নূতন লোক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? নূতন লোক আসিলে যেমন কাজ খারাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনাও আছে। কোন কাজে, ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা মানিয়া না লইলে, লাভের সম্ভাবনাও কম হয়।

আপত্তিকারী এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগের কাজটি নজীর হিসাবে কুফলপ্রসূ হইতে পারে। আপত্তিকারী মহাশয় সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ লোক। তিনি নিশ্চয়ই খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করেন নাই, তাঁহার মতে যথেষ্ট এমন কোন কারণে করিয়াছেন। কিন্তু সংসারে খেয়ালের অধীন ছিট্‌ওয়ালা বা পাগল মানুষ নিতান্ত বিরল নয়। পরিষদের সভ্যসকলের মধ্যে কাহারও কাহারও যদি এরূপ ধারণা জন্মে, যে, আর সভ্য বাড়া বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা হইলে তাঁহারা কেবল মাত্র "না" বলিয়া সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করিয়া পরিষদের ভবিষ্যৎ মাটী করিতে পারেন। এইজন্য, একজনও আপত্তি করিলে কেহ সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না, এই সর্ব্বনেশে নিয়ম যতশীঘ্র রহিত হয়, ততই মঙ্গল। শুনিয়াছি, সভাপতি মহাশয় এই ঘটনায় দুঃখিত হইয়াছেন। তাহা যদি সত্য হয়, এবং ঘটনাটি সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিলাম, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা

হইলে, তিনি নিশ্চয়ই প্রতিকারের সমুচিত উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিবেন।

পরলোকগত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম্ এ, বি এল, নবদ্বীপের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্রদের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন; কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন পঞ্চম। জ্ঞানেন্দ্রলাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটান কলেজে যোগ্যতার সহিত অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গবাসী, পতাকা, ও নবপ্রভার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন নব্যভারত, বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, সাহিত্য, প্রদীপ, প্রবাসী, প্রভৃতিতে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পুস্তক রচনাও তিনি করিয়াছিলেন। গরীব-সেবক দল গঠনের চেষ্টা তাঁহার জীবনের অন্যতম কাজ। তাঁহার রচনায় চিন্তাশীলতা ও দেশহিতৈষিতার পরিচয় পাওয়া যাইত।

পরলোকগত কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়।

কাপ্তেন কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়, আই এম্ এস্, মেসোপটেমিয়ায় কুট তুর্কদের হস্তগত হইবার সময় বন্দী হন। এক্ষণে সংবাদ আসিয়াছে যে গত মার্চ্চ মাসে টাইফয়েড জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কল্যাণকুমার দুই দুই বার যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হন, কিন্তু তথাপি নিজের কর্ত্তব্য করিতে বিরত হন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস ও স্থৈর্য্যের জন্য তিনি মিলিটারী ক্রসে ভূষিত হইবার যোগ্য বিবেচিত হন। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথমে এই সম্মানের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত কাপ্তেন জ্যোতিলাল সেন, আই এম্ এস্। কল্যাণকুমার বন্দী হওয়ায় তাঁহার পরিবারস্থ সকলে, বিশেষতঃ তাঁহার জননী ও সহধর্ম্মিণী, অত্যন্ত শোক পান। তাঁহার জননী কিছুদিন পূর্ব্বে পরলোকগত হইয়াছেন। গত বৎসর তাঁহার শিশু কন্যাটিও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাঁহার বিধবা পত্নীর শোক অবর্ণনীয়। বিদেশে বন্দীদশায় বঙ্গমাতার এই বীরপুত্রের অকালে পরলোকযাত্রা অতি শোকাবহ ঘটনা।

প্রবাসী বাঙালীর প্রশংসা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল, এম্ এ, লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে অধ্যাপকতা করিতেন। সম্প্রতি তিনি ঐ কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার অপরাধ সম্ভবতঃ এই যে তিনি দেশের সার্ব্বজনিক কর্ম্মে উৎসাহী ছিলেন, এবং দেশের লোক শীঘ্র স্বশাসন ক্ষমতা পায়, তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করেন। ক্যানিং কলেজের ছাত্রগণ সভা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়াছেন। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ক্যামেরর্ন সাহেব সভাপতির কার্য্য করেন। তিনি বলেন, "অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বল ক্যানিং কলেজে একটি আবিষ্ক্রিয়া ও নূতন কাজ করিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ক্যানিং কলেজের ছাত্রদের দ্বারা সমাজ-সেবা (social service) হইতে পারে, এবং তিনি ছাত্রদের মতি ও শক্তি সমাজের হিতসাধন-চেষ্টার দিকে চালিত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক বল কলেজে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। যদিও তিনি কলেজ ছাড়িয়া যাইতেছেন, তথাপি তাঁহার স্থাপিত "গোখলে ছাত্র-ভ্রাতৃমণ্ডলী"র মধ্য দিয়া তাঁহার সেবার ভাব কাজ করিতে থাকিবে। এই মণ্ডলী দ্বারা খুব উপকার হইয়াছে। ইহা অধ্যাপক বলের স্মৃতি রক্ষা করিবে।"

এই মণ্ডলীও সভা করিয়া উপেন্দ্রবাবুকে বিদায় দেন। মাননীয় পণ্ডিত গোকর্ণনাথ মিশ্র এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বন্যায় বিপন্ন লক্ষ্ণৌবাসীদিগের সাহায্যার্থ যে সব চেষ্টা হয়, উপেন্দ্র বাবু তাহার সম্পর্কে বিশেষ পরিশ্রম করেন। মিশ্র মহাশয় তাঁহার অন্য অনেক কাজেরও প্রশংসা করেন।

লর্ড কারমাইকেল ও রামকৃষ্ণ মিশন।

গত ১১ই ডিসেম্বর লর্ড কারমাইকেল দরবারে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলেন যে বিপ্লবপ্রয়াসীরা রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি জনহিতসাধক সমিতির সভ্য হইয়া নিজের দল বৃদ্ধি করিবার এবং দেশে অসন্তোষ উৎপাদনের চেষ্টা করে। লর্ড কারমাইকেলের এই উক্তির যে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা, তাহা আমরা যথাসময়ে প্রবাসীতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় এইরূপ কুফল কিছু ফলিয়াছে। মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ লর্ড কারমাইকেলের নিকট একটি আবেদন পাঠাইয়া দেখাইয়াছেন যে মিশনে বিপ্লবপ্রয়াসী কেহ নাই, এবং ইহা যদিও সেবার কাজ খুব করিয়া থাকেন, কিন্তু মূলতঃ ইহা একটি

ধর্ম্মসম্প্রদায়। আবেদনে ইহাও লিখিত আছে যে পরমহংস রামকৃষ্ণের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট আরো কোন কোন সমিতি আছে। কিন্তু তাহাদের সহিত মিশনের কোন সম্পর্ক নাই। এইরূপ নানা যুক্তি প্রয়োগ করিয়া মিশনের কর্তৃপক্ষ বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরের নিকট প্রার্থনা করেন যে তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি, রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি দ্বারা লোকের যে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা দূর করিবার কোন উপায় করিবেন। তদনুসারে লর্ড কারমাইকেল কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবার দিন স্বামী সারদানন্দকে যে চিঠি লিখিয়া যান, তাহার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

I regret very much to hear that words used by me at the Durbar in December last regarding the Mission should have led in any way to the curtailment of the good religious, social and educational work the Mission has done and is doing. As you, I know, realize, my object was not to condemn the Ramkrishna Mission and its members. I know, the character of the Mission's work is entirely non-political, and I have heard nothing but good of its work of social service for the people. What I wanted to impress upon the people is this: Charitable and philanthropic work such as the Mission undertake is being adopted deliberately by a section of the revolutionary party as a cloak for their own nefarious schemes and in order to attract to their organisation youths who are animated by ideals such as those which actuate the Mission, with the intention of perverting these ideals to their own purposes; and with this object unscrupulous use is being made of the name and reputation of the Ramkrishna Mission.

I have full sympathy with the real aims of the true Ramkrishna Mission and it was this abuse of the name of the mission that I wish to prevent. I hope the words I used will help the Mission to guard against the illegitimate use of its name by unscrupulous people.

রামকৃষ্ণ মিশন রোগীর চিকিৎসা ও সেবা, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগকে অন্নবস্ত্রদান, প্রভৃতি যে-সব কল্যাণকর কাজ করেন, তাহা অতি মহৎ। আমরাও ইচ্ছা করি যে এরূপ কাজের সর্ব্বপ্রকার বাধা দূরীভূত হয়।

মানুষ ও বন্য জন্তু।

১৯১৪ সালে বঙ্গে ৩৩২ জন মানুষ বন্য জন্তু কর্তৃক হত হয়, ১৯১৫তে ৪২৩ জনের এই প্রকারে প্রাণ যায়। তন্মধ্যে ১৯১৫ সালে হাতী, বাঘ, চিতাবাঘ এবং ভালুকে ২০৫ জনের প্রাণ বধ করে। ১৯১৪ সালে এই সব জন্তু ১২৮ জনের প্রাণবধ করিয়াছিল। সভ্যতার আধুনিক একটা মাপকাঠি এই যে কে কত মানুষ মারিতে পারে! হন্তা হত অপেক্ষা অধিক সভ্য, ইহাই বর্ত্তমান যুগের সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে! তদনুসারে বাংলাদেশের হাতী, বাঘ, ভালুক, প্রভৃতি বন্য জন্তুগুলা ক্রমশঃ সভ্য হইতেছে, বলিতে হইবে; কারণ তাহারা উত্তরোত্তর বেশী মানুষ মারিতে সমর্থ হইতেছে।

বন্য জন্তুদের শুঁড়, দাঁত, নখ প্রভৃতি স্বাভাবিক অস্ত্র আছে। মানুষের হাত পা দাঁত নখের তেমন জোর নাই। মানুষকে আত্মরক্ষা বা পরহত্যা করিতে হইলে কৃত্রিম অস্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। সুতরাং নিরস্ত্র দেশে বন্য জন্তুর হাতে অনেক মানুষের প্রাণ যাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যদিও লজ্জার বিষয় বটে। লজ্জাটা গবর্ণমেণ্টের বেশী কিম্বা আমাদের বেশী, তাহা একটু ভাবিলেই আমরা নিজে নিজে স্থির করিয়া লইতে পারি।

সাপের কামড়েও মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়াছে। ১৯১৪ সালে ৪৩৫৬ জন মরিয়াছিল, ১৯১৫তে ৪৭০৯ জন মরিয়াছে। সাপগুলাও কি বেশী সভ্য হইয়া পড়িতেছে?

১৯১৪ সালে মানুষের হাতে ২৮২৪টা বন্যজন্তু মারা পড়ে; ১৯১৫তে ২৭৬৯টা মরিয়াছে। সুতরাং মানুষের বন্য জন্তু মারিবার ক্ষমতা এক বৎসরে কিছু কমিয়াছিল বলিতে হইবে। মানুষগুলা বোধ হয় অসভ্য হইয়া যাইতেছে।

পুস্তকাদির প্রকাশ হ্রাস।

১৯১৪-১৫ সালে বঙ্গে ৪০৯৩ পুস্তক, এবং সাময়িক পত্রের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা বাহির হইয়াছিল। ১৯১৫-১৬ সালে ৩৯১০ পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকার ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে বেশী বহি ছাপা হয় বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যদেশ সকলের তুলনায় আমরা খুবই কম বহি লিখি ও পড়ি। পুস্তক রচনা ও পাঠ মানুষের উন্নতির একটা লক্ষণ। সব দেশেই বাজে বই অনেক মুদ্রিত ও পঠিত হয় বটে, কিন্তু ভাল বহিও অনেক প্রকাশিত ও অধীত হয়। বিলাতের লোকসংখ্যা বাংলার প্রায় সমান। তথায় ১৯১৫ সালে শুধু বহি (সাময়িক পত্র নয়) প্রকাশিত হইয়াছিল, নূতন বহি—৮৪৯৯, এবং পুরাতন বহির নূতন সংস্করণ—২১৬৬, মোট ১০৬৬৫। নূতন বহির মধ্যে গল্প ও উপন্যাস ৮৪৩ খানা মাত্র, বিজ্ঞান ৫৬৬, সমাজতত্ত্ব ৫০৮, ধর্ম্ম ৬৫০,

ইতিহাস ৬৩১, দর্শন ১৮৪, জীবনচরিত ৩০৮; ছেলেমেয়েদের বহি ৪৪৭, ইত্যাদি।

সঙ্গীত-বিদ্যালয়।

বঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র বাঁকুড়া জেলায় সঙ্গীত-বিদ্যালয় আছে। ১৯১৩-১৪ সালে তথায় ৫টি, ১৯১৪-১৫তে ২টি, এবং ১৯১৫-১৬তে ৩টি বিদ্যালয় ছিল। এই তিনটি বিদ্যালয়ে ১৯১৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ কেবলমাত্র ৩৭ জন ছাত্র ছিল। বাঁকুড়ায় সঙ্গীতের চর্চ্চা আছে বলিয়া এখনও সেখানে বাঙ্গালী ওস্তাদ দেখা যায়। সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া জেলার লোক। বাঁকুড়া জেলায় সঙ্গীত-বিদ্যালয় থাকা সুখের বিষয়, কিন্তু অন্য কোন জেলায় যে নাই, ইহা অত্যন্ত দুঃখেরবিষয়। কলিকাতায় সঙ্গীত-বিদ্যালয় আছে। বোলপুরে রবিবাবুর বিদ্যালয়ের ছেলেরাও সঙ্গীত শিক্ষা করে। সর্ব্বত্র সঙ্গীত শিক্ষার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। সঙ্গীতের অপব্যবহার হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে; কিন্তু কোন্ ভাল জিনিষের অপব্যবহার হয় না? সঙ্গীতকে কেবল আমোদের উপায় মনে করা ভ্রম। ইহা একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যা, বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অন্যান্য বিদ্যার মত এই বিদ্যার জন্যও উপাধি দেওয়া হয়। ইহা বিশুদ্ধ আনন্দের কারণ। সঙ্গীতের প্রভাবে মানুষের হৃদয় কোমল ও মার্জ্জিত হয়, এবং ভক্তির উৎস খুলিয়া যায়। হৃদয়ের সকল ভাব শুধু কথায় ব্যক্ত করা যায় না, সঙ্গীতের সাহায্যে ভাবপ্রকাশ পূর্ণতর হয়। সঙ্গীত আমাদিগকে যেমন অনন্ত ও অব্যক্তের নিকট লইয়া যাইতে পারে, এমন আর কিছুতেই পারে না। আমরা সাধারণতঃ যে-জগতের সহিত পরিচিত, তাহা দৃষ্টিগোচর জগৎ, তাহা প্রধানতঃ চোখে-দেখা। কিন্তু ধ্বনিরও একটি জগৎ আছে। সঙ্গীতরসজ্ঞ এই জগতে বিচরণ করেন, এবং সেখানকার নানা বৈচিত্র্যে, নানা রূপে বর্ণে, আলো ও ছায়ায় মুগ্ধ হন।

আর্ট স্কুল।

সঙ্গীতের চর্চ্চা ও সঙ্গীতবোধ আমাদের দেশে যতটুকু আছে, চিত্রকলা এবং অন্যান্য শিল্পের চর্চ্চা ও বোধ তার চেয়ে আরও কম। কোন ছবিতে যদি কোন একটা ঘটনা চিত্রিত হয়, তাহা হইলে আমরা তাহা কিছু বুঝিতে পারি, কিন্তু অন্যবিধ চিত্র বুঝিতে ও তাহার গুণগ্রহণ করিতে আমরা অল্পই পারি। আমরা মনে করি, খুব জমকাল কতকগুলা রং যাহাতে আছে, এবং যাহা ফটোগ্রাফের মত তাহাই উৎকৃষ্ট ছবি।

আর্ট শিক্ষা দিবার জন্য অনেকগুলি স্কুল থাকা উচিত, এবং যাঁহারা আর্ট বুঝেন, এমন লোকের তত্ত্বাবধানে তাহা পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের একটি আর্ট স্কুল আছে। তা ছাড়া আরও তিনটি বিদ্যালয় কলিকাতায় আছে। মফঃস্বলে একটিও নাই।

আর্ট-বোধের সঙ্গে সাহিত্য-বোধের সম্বন্ধ আছে। অনেকে মনে করেন বাংলাদেশে অনেক লোক পরীক্ষায় পাস্ হয় বলিয়া আমাদের সাহিত্য-বোধ খুব আছে। তাহা ভুল। কথার মানে ও ব্যুৎপত্তি, ব্যাকরণের নিয়ম, রচনাপ্রণালী, এবং অলঙ্কারের সংজ্ঞা শিখিলেই সাহিত্য-বোধ জন্মে না। বরং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা যে-যে বহি পড়ে, তাহার রস আস্বাদন তাহারা আর জন্মেও করিতে পারে না।

অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী।

ত্রিশ বৎসর কাল রসায়ন বিদ্যার আলোচনা ও অধ্যাপনা করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী মহাশয় সম্প্রতি কলেজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তদুপলক্ষে তাঁহার প্রাচীন ও নবীন ছাত্রগণ তাঁহার অভিনন্দন করেন। অভিনন্দন-সভার সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন যে ভারতবর্ষে ফলিত বা কেজো রসায়নে (Practical chemistryতে) ভাদুড়ী মহাশয় অদ্বিতীয়। ইহা অতি উচ্চ প্রশংসা। চন্দ্রভূষণ বাবু ইহার উপযুক্ত। এই নীরব কর্ম্মী এখনও যুবকদের চেয়ে অধিক একাগ্রতার সহিত প্রত্যহ ১৪।১৫ ঘণ্টা পরিশ্রম করেন। তিনি রসায়ন শিক্ষার জন্য বিদেশে যান নাই, কোন রাসায়নিক কার-খানাতেও শিক্ষালাভ করেন নাই। কিন্তু বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ এবং বেঙ্গল মিসেলেনী এই

দুটি রাসায়নিক কারখানা যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া লাভের কারবারে পরিণত হইয়াছে তাহা বহু পরিমাণে ভাদুড়ী মহাশয়ের রাসায়নিক জ্ঞান ও কল-কারখানা স্থাপনে দক্ষতার ফলে। ইহা খুব আশার কথা। কারণ, পৃথিবীতে এখন কেজো-রসায়নে অনভিজ্ঞ কোন জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না, অথচ রসায়নে অগ্রসর কোন জাতি অপর কোন জাতিকে নিজ গুপ্ত বিদ্যা সম্পূর্ণ শিক্ষা দিবে না। সুতরাং অনগ্রসর জাতিসকলকে অনেক পরিমাণে স্ব স্ব উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা প্রক্রিয়াদিতে নিপুণ হইতে হইবে। চন্দ্রভূষণ বাবুর দৃষ্টান্তে ইহা বুঝা যায় যে বাঙালী জাতির মধ্যে এই শক্তি সুপ্ত আছে।

পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন চুরির তদন্ত করিবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে তদন্ত বিলম্বে আরম্ভ হওয়ায় চোর ধরা গেল না। তথাস্তু। কিন্তু তাঁহারা যখন তদন্ত করিতেছিলেন, তখনই দ্বিতীয়বার পরীক্ষা গৃহীত হইবার কালে আবার প্রশ্নচুরি ধরা পড়ে। এখন আশা করি চোর ধরা পড়িবে!

প্রথমবার প্রশ্নচুরি সম্বন্ধে চৈত্রের প্রবাসীতে আলোচনা করিবার সময় আমরা, বিলাতে প্রবেশিকার প্রশ্ন বিলম্বে ছাপিতে পাঠাইবার কারণ যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহা সত্য বোধ হইতেছে। আমরা অনুমান করিয়াছিলাম যে কোন কোন ইংরেজ প্রশ্নকর্ত্তার দীর্ঘসূত্রিতার ফলে এইরূপ ঘটিয়াছিল। কমিটি বলিয়াছেন যে এইরূপ নিয়ম করা উচিত যে ভবিষ্যতে কোন প্রশ্নকর্ত্তা যথাসময়ে প্রশ্নপত্র রচনা করিয়া না দিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্থানে অন্য প্রশ্নকর্ত্তা নিযুক্ত হইবেন ও এই নবনিযুক্ত ব্যক্তি প্রশ্ন রচনা করিবেন। আমরা আরও অনুমান করিয়াছিলাম যে ইউরোপীয় রেজিষ্ট্রার এবং তাঁহার কোন কোন সহকারীর অকর্ম্মণ্যতায় বা দোষে প্রশ্ন জানা পড়িয়া থাকিতে পারে। কমিটির সুপারিস অনুযায়ী পরীক্ষা-তত্ত্বাবধায়ক একজন নূতন কর্ম্মচারী তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত হওয়ায় আমাদের অনুমান সত্য বোধ হইতেছে। কারণ রেজিষ্ট্রার ও তাঁহার কোন কোন কর্ম্মচারী উপযুক্ত লোক হইলে, নূতন কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইত না। নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়ায় রেজিষ্ট্রার এবং তাঁহার কোন কোন সহকারীর কাজ ও দায়িত্ব কমিল। অতএব আমরা জানিতে চাই, যে, তাঁহাদের বেতন কমিবে কি না। নতুবা তাঁহাদের পক্ষে যে শাপে বর হইবে। অকর্ম্মণ্যতা প্রমাণ হইবার পর যদি মানুষের কাজ কমাইয়া পূরা বেতন দিতে থাকা যায়, তাহা হইলে ত অকর্ম্মণ্যতাকে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করা হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কোন কোন সহকারীকে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের মুরুব্বির জোর থাকায় চেতনা করাইবার কোন চেষ্টা হয় নাই। এবারে দেখিতেছি, ব্যবস্থাটা তাহা অপেক্ষাও ভাল হইল। কাহারও পৌষমাস, কাহারও সর্ব্বনাশ। বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলার মহাশয় যদি প্রবল দলপতি ও দলের অস্তিত্ব হেতু অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে যথেষ্ট শাসন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে বিলম্ব না হওয়াই উচিত। আমাদের কাহারও বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত প্রতিকূল ভাব নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুগ্রহ-নিগ্রহের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। বাহির হইতে আমাদের যাহা ন্যায়সঙ্গত মনে হয় তাহাই বলি। ভুল হইলে তজ্জন্য আমরা দুঃখিত; কিন্তু দেশের নামে এবং সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর যখন কলঙ্ক পড়িতেছে, তখন আমরা চুপ করিয়া থাকিতেও পারি না।

কেরোসিন দ্বারা আত্মহত্যা।

পরনের শাড়ীতে কেরোসীন ঢালিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া এখনও বাঙালীর মেয়ে আত্মহত্যা করিতেছে। বাঙালীর এই দুরপনেয় কলঙ্ক ঘুচাইবার কোন চেষ্টা হইতেছে না। সমাজ-শরীরে বোধ হয় আর চৈতন্য খুব কম আছে। সমাজ-হৃদয়ে আর বেদনা-বোধ নাই, মায়া মমতা নাই। মানুষ বড় দুঃখেই এমন যন্ত্রণাদায়ক উপায়ে আত্মহত্যা করে। কিন্তু আমরা কি উপায় করিতেছি? প্রবাসীতে আমরা দেখাইয়াছিলাম যে বাঙালীর মেয়েরা যত আত্মহত্যা করে, ইউরোপের কোন দেশের মেয়েরা তত করে না, ভারত-বর্ষেরও অন্য কোন প্রদেশের মেয়েরা করে না। তজ্জন্য আমরা গালি খাইয়াছি। তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু উপায় কি হইবে? আমরা কি বঙ্গনারীদিগকে মুখে দেবী বলিয়া এবং কাজে মুক্তির একমাত্র উপায় আত্মহত্যা অবলম্বন করিতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? যতদিন কন্যার বিবাহ দেওয়া অতি কঠিন থাকিবে, এবং অবিবাহিতা কন্যাদের সৎপথে থাকিয়া সম্মানের সহিত জীবন ধারণের উপায় না হইবে, ততদিন "কন্যাদায়" কথাটি ও ভাবটি থাকিবে, এবং কন্যাদের আত্মহত্যাও ঘটিবে। বিবাহ সম্বন্ধে লোকের ধারণাই বদলাইয়া

যাওয়া দরকার। পাত্র ও পাত্রী জানিয়া বুঝিয়া পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্পণ করিতে পারে, এরূপ বয়সে এবং এরূপ সুশিক্ষিত হইয়া তাহারা বিবাহ করিতে পারে, সামাজিক ব্যবস্থা এইরূপ হওয়া চাই। শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহ চালাইলেই হইবে না। কেননা, যে-সব দেশে ও সমাজে যৌবন-বিবাহ চলিত আছে, সেখানেও প্রকারান্তরে কোন কোন স্থলে পণ দান ও গ্রহণ করা হয়, এবং সকল স্থলে নারীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাও নাই। এই দুরবস্থার প্রতিকার নারীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের উপর নির্ভর করে।

বিবাহিতা বালিকা ও নারীদের আত্মহত্যাও দেখাইতেছে যে কোন কোন স্থলে তাহাদের উপর ভীষণ অত্যাচার হয়। পুলিশ কোর্টে এরূপ মোকদ্দমাও হইয়াছে, যাহাতে সন্দেহ হয় যে সমুদয় তথাকথিত কেরোসীন-আত্মহত্যা আত্মহত্যা নহে, কোন কোনটা হত্যা। আইন দ্বারা সহমরণ নিষিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যেমন কোন কোন স্থলে বিধবাকে স্বামীর চিতায় দেহত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইত, কেরোসীন-আত্মহত্যারূপ সংক্রামক ব্যাধির আড়ালে সেইরূপ কোন ভীষণ রাক্ষসী বৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিতেছে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়।

"মানবের স্বাধীনতা।"

ব্রিটিশ এবং ফরাসী জাতিদের প্রতিনিধিদিগকে ১২ই মে আমেরিকার লোকেরা যে ভোজ দিয়াছেন তাহাতে মিঃ ব্যালফোর বলিয়াছেন :—"a crisis had been reached when the whole of civilisation must rise up and voice its appeal for the preservation of human liberty. 'Unless all who love liberty unite', he said, 'we shall be destroyed piecemeal'." ইহার তাৎপর্য্য এই, যে, এই সঙ্কট কালে সমগ্র সভ্য জগৎকে মানবের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহারা স্বাধীনতা ভাল বাসে, তাহারা একতাসূত্রে বদ্ধ না হইলে, প্রত্যেকেই একা একা বিনাশ পাইবে।

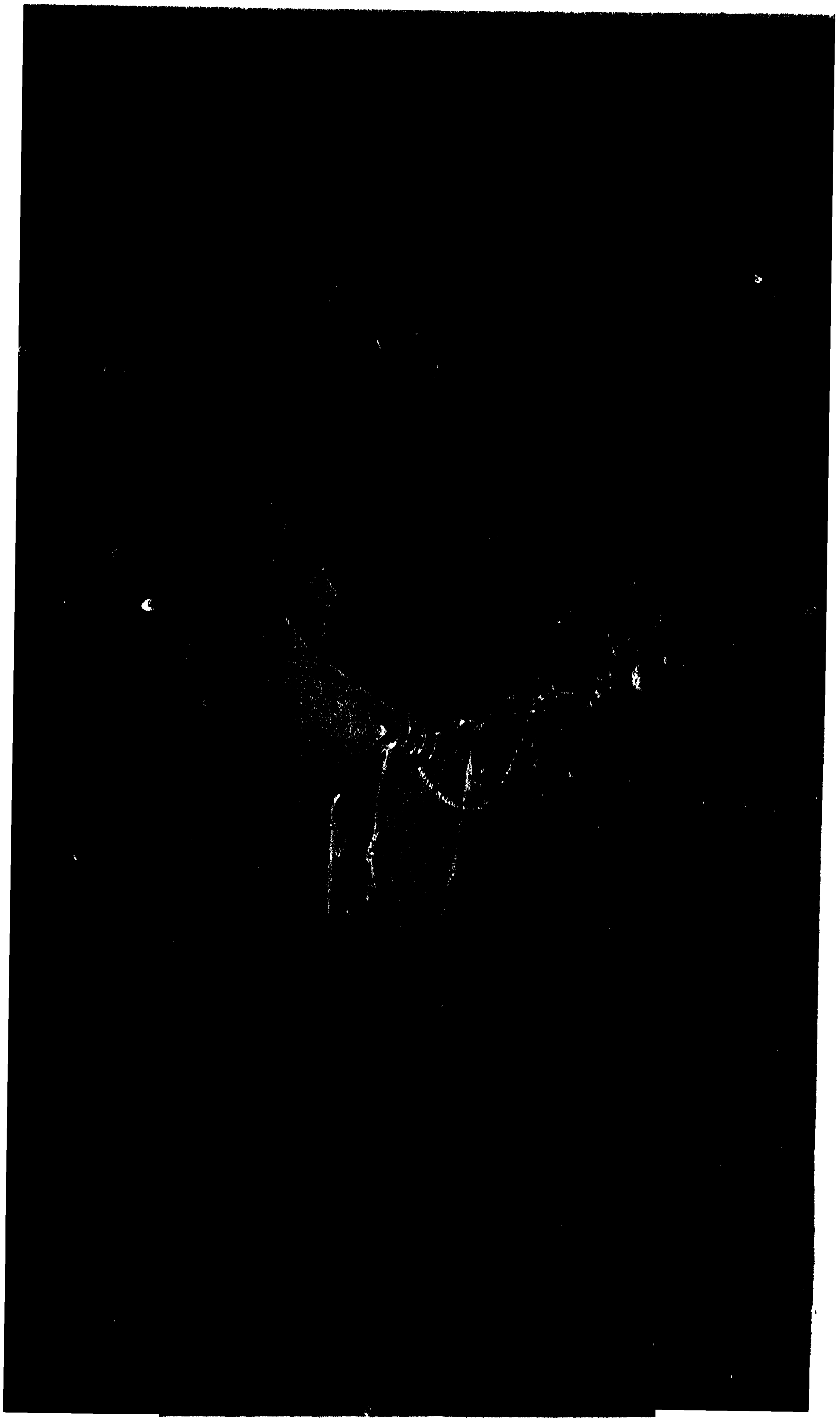
"মানব-স্বাধীনতা" কথা দুটি এ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত "সভ্য" মানুষ তাঁহাদের নিজের স্বাধীনতা অর্থে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। যুদ্ধের পরও এই অর্থই বজায় থাকিবে, না ইহার স্থানে "সভ্য" "অসভ্য", প্রবল দুর্ব্বল, দলবদ্ধ অদলবদ্ধ, সকলেরই স্বাধীনতা হইবে, তাহা বুঝিতে বেশী বিলম্ব হইবে না।

অপচয় নিবারণ ও সদ্ব্যয় বৃদ্ধি।

গবর্ণমেণ্টকে যে আমরা নানাদিকে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য বৃদ্ধি কৃষিশিল্পের উন্নতি প্রভৃতি কার্য্যে বেশী করিয়া খরচ করিতে বলি, আমাদিগকেও তদ্রূপ পরামর্শের অনুসরণ করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে শক্তির অপচয়, সময়ের অপব্যবহার, এবং ধনের অপব্যয় খুব হয়। আমরা স্বশাসক জাতিদের মত শক্তিশালী, ধনবান ও সুখী হইতে চাই। কিন্তু তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থার পশ্চাতে কতটা স্বজাতিপ্রেম ও স্বার্থত্যাগ আছে তাহা ভুলিয়া যাই। আমাদের শক্তি, সময় ও অর্থ কেবল নিজের সুখ স্বার্থ ও সুবিধা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইলে কখনই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। পুরুষনারী ধনীদরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত অল্পবয়স্ক অধিকবয়স্ক এমন কেহই নাই যিনি কোন না কোনরূপে মানুষের হিত করিতে না পারেন। হিত করিতে বলিলেই আমরা অনেক সময় মনে করি যেন আমাদিগকে কাহারও প্রতি অনুগ্রহ করিতে বলা হইতেছে। কিন্তু ইহা অনুগ্রহ মোটেই নয়। ইহা ধ্রুব সত্য যে সমগ্র জাতির শক্তি সম্মান সম্পত্তি সুখ না বাড়িলে জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের শক্তি সম্মান সম্পত্তি সুখ সম্যক্‌রূপে বাড়িতে পারে না। ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা ধনীর প্রকৃত শক্তি ও সম্মান ইংলণ্ড আমেরিকা ফ্রান্সের অজ্ঞাতকুলশীল সামান্য মজুরের চেয়েও কম। এই মজুর পৃথিবীর সর্ব্বত্র মাথা উঁচু করিয়া যাইতে পারে, স্বদেশে বিদেশে ইহার ব্যক্তিত্বের ও মতের একটা দাম আছে। আমাদের কাহারও অবস্থা এরূপ নয়। তাহার কারণ, আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই যে, সমাজের সেবা ব্যতিরেকে নিজের সেবা হইতে পারে না।

সমাজের সেবা বাস্তবিক ঋণপরিশোধ ভিন্ন আর কিছু নয়। আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের জ্ঞান, আমাদের অন্ন, আমাদের বস্ত্র, আমাদের গৃহ, আমাদের নৈতিক আদর্শ, আমাদের সুপ্রবৃত্তি; সমুদয়ের জন্য আমরা সমাজের নিকট ঋণী। অপরের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায় হইয়া, অপরকে জ্ঞান, অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় দিয়া, অপরের নৈতিক আদর্শ পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়া, অপরের সুপ্রবৃত্তির উন্মেষসাধনে তৎপর হইয়া, এই ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। এমন অকিঞ্চন অভাজন কেহ নাই যিনি কোন না কোন প্রকারে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারেন।

হিতসাধনে ব্রতী আমাদের সমুদয় সভা সমিতি মণ্ডলী অর্থাভাবে পঙ্গু হইয়া আছে। অথচ ইহা জোর করিয়া বলা যায়, যে, আমাদের সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি থাকিলে, আমরা প্রত্যেকটির জন্য যথেষ্ট অর্থ দিতে পারি। কিন্তু পাপে, ব্যসনে, বিলাসে, বড়মানুষী দেখাইবার আড়ম্বরে, অসাবধানতায়, যতদিন আমরা আমাদের অর্থ নষ্ট হইতে দিব, ততদিন হিতসাধন অতি ক্ষীণ ভাবে চলিবে, এবং আমরা মানবমণ্ডলে হেয় ও অস্পৃশ্য থাকিব।



প্রাণের উৎস কর উৎসব একটি নিমেষের মাত্র।

এক নিমেষেই কর চুম্বন নির্ব্বাণ-পানপাত্রে ॥

শ্রীযুক্ত ম আবদুর রহমান চাঘতাই কর্তৃক অঙ্কিত।

পুলিশ ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত মির্জা গুলাম রসুল,

চিত্রের অধিকারী মহাশয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত।

ভারত-শিল্পের ত্রৈগুণ্য

সাধারণতঃ আমাদের দেশে শিল্পকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যে-সব শিল্প আমাদের প্রয়োজনসকল বিধান করে তাহা কেবলমাত্র শারীর ভোগের বস্তু বলিয়া তামসিক।

যেমন, বেদে রথকারকে "মনীষী কর্ম্মকার" বলা হইয়াছে—

"যে রথকারাঃ কার্ম্মারাঃ যে মনীষিণঃ"। (অথর্ব ৩,৫,৬)

গৃহাদি-নির্ম্মাতা তক্ষার কাজের উল্লেখ বেদের বহু স্থানে আছে। [ঋগ্বেদে ১, ৬১,৪ ; ১,১৫৫,১৮ ইত্যাদি ইত্যাদি]।

বেদে কতবার যে তক্ষার গৃহনির্ম্মাণ-শিল্পের উল্লেখ আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সমস্তই তামস শিল্প। এই শিল্পের দ্বারা আমাদের দেহরক্ষা ও প্রয়োজন নির্ব্বাহ হয় মাত্র, ইহা দ্বারা কোনো যথার্থ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা চলে না। যেখানে শিল্প ধনী অথবা পুরোহিতদলের ফরমাইস-মত বস্তু সৃষ্টি করে, সেখানে ইহাকে দাসশিল্পও বলা চলে। শিল্পনিকেতনের ইহা নীচের তলার সামগ্রী।

যে-সব শিল্পের দ্বারা আমাদের দেহরক্ষা বা প্রয়োজনসাধন হয় না, কিন্তু যাহাতে আমাদের বিলাসিতা, আমাদের ঐশ্বর্য্যের ও নৈপুণ্যের প্রকাশ সম্ভব হয়, তাহা রাজসিক শিল্প। শিল্পী আপন ঐশ্বর্য্য ও শক্তির দ্বারা সেখানে সমস্ত সমাজের উপর প্রভুত্ব করে ও নিজের সৃষ্টির বৈভবে সকলের চমক লাগাইয়া দেয় সেখানে শিল্প রাজসিক। বাজসনেয়ি সংহিতায় (৩০,৭) ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩,৪,৩,১) মণিকারের উল্লেখ আছে। বাজসনেয়িতে (৩০,১৭) ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩,৪,১৪,১) হিরণ্যকারেরও উল্লেখ আছে। ইহাদের সৃষ্ট শিল্প জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে না লাগিলেও তাহা তখনকার ধনীদের বৈভব ও শিল্পীদের নৈপুণ্য প্রকাশ করিত। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ৮৫তম সূক্তে সূর্য্যার বিবাহে বধূর অলঙ্কৃত-বেশ "বাধূয়" উল্লিখিত আছে, তাহা পুরোহিতের প্রাপ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে বস্ত্রের আরম্ভে মধ্যে অবসানে যেমন নকাশী-করা কাজ ("পেশস্") থাকিয়া বস্ত্রকে অলঙ্কৃত করে, কাব্যের পক্ষে নিবিৎও সেইরূপ। যেমন অলঙ্কৃত বহুমূল্য বস্ত্র বুনিতে আরম্ভ করিলে "হাশিয়া" দিতে হয়, তেমনি কাব্যের আরম্ভে নিবিৎ থাকা চাই। বস্ত্র বুনিতে মধ্যে যেমন "হাশিয়া" দিতে হয়, তেমনি কাব্যের মধ্যে নিবিৎ থাকা চাই। বস্ত্রের অন্তে যেমন হাশিয়া দিতে হয়, কাব্যের শেষেও তেমনি নিবিৎ দিবে।

"পেশা বৈ উক্থানাম্ যন্নিবিদঃ।
প্রবয়ন্তঃ পেশঃ কুর্য্যাৎ। মধ্যতঃ পেশঃ কুর্য্যাৎ,
প্রচ্ছন্তঃ পেশঃ কুর্য্যাৎ।" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩৭,১০)

এইসব শিল্প যদিও প্রয়োজনের সামগ্রী নহে, তবুও ইহা বিলাসের উপকরণ। কাজেই ইহাও সাত্ত্বিক শিল্প নহে। এই শিল্প রাজসিক। শিল্পনিকেতনের ইহা দোতলার কথা। শিল্পদেবতার প্রাঙ্গণ হইতে উঠিয়া দেবতার ভোগ-মন্দিরে বা নাট-মন্দিরে এই শিল্প আসিয়া বসিতে পারে মাত্র। দেবগৃহে বা দেউলে প্রবেশ করিতে পারে না।

তবে সাত্ত্বিক শিল্প কি ? অনন্তের জন্য সান্তের ব্যাকুলতা যে শিল্পের প্রাণ, সীমার মন্দিরে অসীমের আনন্দ যাহাতে বাজে, তাহাই সাত্ত্বিক শিল্প। অমৃতের জন্য মর্ত্তের যে নিত্যরাগ ও নিত্যাভিসার, অরূপকে পাইয়া রূপের যে বিপুল আনন্দ, তাহাই সাত্ত্বিক শিল্পের প্রাণ, তাহাই তাহার সর্ব্বস্ব। মানব যখন বিশ্বকে কেবলমাত্র জীবনহীন জড় "তত্ত্ব" মাত্র বলিয়া জানে না, যখন সে সমস্ত বিশ্বকে আপনার জীবনে গ্রহণ করিতে চাহে, তখন সে বিশ্বকে রসরূপে পরিণত করে। রস—তরল, সদাস্পন্দিত, ভাব-চঞ্চল, রসই প্রাণ-সলিল। বৃক্ষ পার্থিব বস্তুকে রসে পরিণত করিয়া বাঁচে। সবই প্রাণরসে পরিণত করিয়া গ্রহণ করিয়া প্রাণী বাঁচে। তাই সাত্ত্বিক শিল্পীর কাছে এই পৃথ্বী জীবন্ত ; তাহার সঙ্গে যোগ কেবলমাত্র জ্ঞানের নহে, তাহার সঙ্গে যোগ প্রেমের। "পৃথিবী মাতা, আমি তাঁহার পুত্র" আথর্বণ এই মন্ত্র শিল্প-রসের উৎস। আথর্বণেরা বিশ্বজগৎকে প্রাণবান বলিয়া জানিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; তাঁহারা পৃথিবীকে প্রেমে আনন্দে নিশিদিন আলিঙ্গন করিয়া বিশ্বরস পান করিয়াছেন। তাই বিশ্বের প্রতি তাঁহাদের দরদের (sympathy) আর অন্ত নাই। সাত্ত্বিক শিল্পের ভিত্তি সেই বিশ্বপ্লাবী অমৃত-

রস। দাসশিল্প হইতে এই জন্যই সাত্ত্বিক শিল্প একেবারে স্বতন্ত্র। এ শিল্পকে কেবল আঁকিয়া বা গড়িয়া কর্ত্তব্য শেষ করা চলে না, এই শিল্পকে জীবনে গ্রহণ করিতে হয়।

হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদের মধ্যেও শিল্পের এই তিন বিভাগ স্বীকৃত হয়। তাঁহারা বলেন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শিল্পেরও তিন রূপ। শ্রীকৃষ্ণ মল্লরূপে প্রচণ্ড যোদ্ধা হইয়া শত্রু নিধন করিতেছেন,—তাঁহার এই রূপ তামসিক। তাঁহার ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি মথুরার রাজসিংহাসনে—সে ঐশ্বর্য্য অতুল। এ তাঁর রাজসিক রূপ। কিন্তু তাঁর যথার্থ সাত্ত্বিকরূপ ব্রজের প্রেমধামে। তাঁহার এই রূপ প্রয়োজনের অতীত—এ যে লীলারস।

হিন্দুস্থানী বাউলেরা শিল্পের তিন রূপ বড় চমৎকার করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন রসের প্রথম রূপ তামসিক—ধর তাহা আঙ্গুর। তাহা চোলাই করিয়া যখন উজ্জ্বল সুরা হইল, তখন তাহা ঐশ্বর্য্যরূপ—রাজসিক। আর তাহা পান করিয়া যে আনন্দ তাহা সাত্ত্বিক, তাহা বস্তু নহে—তাহা আনন্দ।

> হাথমেঁ তেরা লাল চমকৌ মৈঁ অমীরস-প্যালা।
> অন্দর তেরা জব সমাউঁ মস্তগুন মতবালা॥

হে প্রাণস্বরূপ, তোমার হাতে যখন আমি অমৃতরসের পেয়ালা হইয়া চমকাই তখন আমার কি রাগ কি চমক! যখন আমি তোমার অন্তরে প্রবেশ করি তখন আমি তোমার নেশা, আমি তোমার আনন্দ।

শিল্পী-আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথও শিল্পের এইরূপ তিনটি ভাগ স্বীকার করেন।

প্রত্যেক সভ্যতার উন্নতি ও বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে তামসিক ও রাজসিক শিল্পটা আপনি গড়িয়া ওঠে। সাত্ত্বিক শিল্পটা গড়িয়া ওঠা তত সহজ নহে, ইহা কঠিন সাধনার ধন।

সহজ নহে কেন? তাহার কারণ এই—শিল্পের এক-দিকে রূপ, অন্যদিকে অরূপ। এই শিল্পে অরূপ রূপ পরিগ্রহ করে ও অরূপের রসসমুদ্রে রূপ ক্রমাগতই আপনাকে বিলীন করিতে থাকে।

প্রায়ই দেখা যায় কোনো সভ্যতা বা রূপ-রসিক, কোনো সভ্যতা বা অরূপ তত্ত্বের ধ্যানে মগ্ন। রূপ ও অরূপ এই দুইটি একসঙ্গে বড় মেলে না। অথচ এই দুইটি তত্ত্বের হর-গৌরী মিলন না হইলে সাত্ত্বিক শিল্পের আশাই করা যায় না। তাই এই শিল্প বড় দুর্ল্লভ।

ভারতীয় প্রাচীন আর্য্য-জাতি অরূপের ধ্যানেই নিমগ্ন। তাঁহাদের মন রূপ রস গন্ধ স্পর্শের অতীত পরব্রহ্মের প্রতিই স্বভাবত ধাবিত হইয়াছে। এইজন্য তাঁহাদের মন্ত্র "অশব্দ-মস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" "পরো দিবা পরঃ পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদি। "তাঁহার রূপ রস স্পর্শ শব্দ ও বিকার নাই। তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া আছেন।"

আবার এদেশের আর্য্যদের অপেক্ষাও প্রাচীন ভারতীয় যে অনার্য্যগণ,—তাঁহারা ছিলেন রূপের উপাসক। অনার্য্য-দের মধ্যে কোনো-কোনো শ্রেণী খুবই সভ্য ছিলেন। তাঁহারা নানাবিধ মূর্ত্তি গড়িতেন ও নানাবিধ প্রতিমা পূজা করিতেন। এখনও দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশে অনার্য্য স্থপতিগণের গোপুর মন্দিরাদি যেমন চমৎকার, তেমনি বিরাট। প্রাচীন আর্য্যদের সভা আসিয়া করিত দানব—ময়; পুরীকে কি অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিল—রাবণ। এইসব ইঙ্গিতে বুঝিতে পারি যে প্রাচীন অনার্য্যগণ খুবই রূপ-রসিক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তামসিক ও রাজসিক শিল্পই ক্রমাগত বিকশিত হইতেছিল। কিন্তু অনন্তের ভাবটুকু তাঁহাদের অন্তরে না থাকাতে সেই শিল্পটি সাত্ত্বিক হইয়া ওঠে নাই। কাজেই যেই আর্য্যেরা আসিলেন, অমনি একটি গঙ্গা-যমুনা মিলন ঘটিল। রূপ ও ধ্যানের ধারা মিলিয়া একটি অপূর্ব্ব রস-তীর্থের সৃষ্টি হইল।

এইজন্য শিল্পের মালমশ্‌লা অথর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বৈদিক যুগে যেমন মেলে, ঋগ্বেদে তেমন মেলে না, তখনও আর্য্য অনার্য্য তেমন মিশ খায় নাই। অথর্ব্বে ও পরবর্ত্তী বৈদিক যুগে এই রস বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

এখন এ কথা জিজ্ঞাস্য যে জয়ী আর্য্যেরা পরাজিত ও অপসারিত অনার্য্যদের কাছে রূপ-রাগ নিতে যাইবেন কেন? কিন্তু দেওয়া-নেওয়ার শাস্ত্র বড় চমৎকার। কিছু দিবার থাকিলে পরাজিতও তাহা দেয় এবং নিবার থাকিলে জেতাও তাহা নেয়। কিছুতেই ইহার অন্যথা হয় না। যেখানে যেখানে দৈন্য আছে, সেখানে জেতাকেও পরাজিতের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেই হয়। জেতা রোমকেরা

গ্রীসের সভ্যতা নিতে বাধ্য হইল—ভারতের আর্য্যেরাও পরবর্ত্তী জেতাদিগকে দিয়াছে বিস্তর। সর্ব্বত্রই এইরূপ ঘটিয়াছে।

অথর্ব্ববেদে যে দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর স্তব ও ব্রতহীন মানবের স্তব (ব্রাত্যকাণ্ড) করা হইয়াছে তাহাতে বুঝিতে পারি যে তাহাদের মধ্যে আর্য্যপ্রভাব ছাড়া আরও প্রভাব আসিয়া জুটিয়াছিল।

মূর্ত্তি প্রভৃতি পূজা অনার্য্যদেরই ছিল বলিয়াই স্মৃতির যুগেও গ্রাম্য দেবতা ও দেবল ব্রাহ্মণ অশ্রদ্ধেয় ছিল। মূর্ত্তি পূজার নানা ভাবেই অনার্য্য-প্রভাব অনুভব করা যায়। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে (২২শ অধ্যায়) আছে দেবীপূজায় স্ত্রীলোককে অতিশয় অশ্লীল গানের দ্বারা সকলকে তুষ্ট করিতে হইবে। পুরাণে বহু স্থলেই পাই রাজারা দণ্ড দিয়া বেদবাহ্য দেবতার মূর্ত্তির পূজা ও বেদগান ছাড়া সাধারণের পূজ্য দেবতার ও প্রাকৃতজনের গান বন্ধ করিয়াছেন (লিঙ্গপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৩০শ অধ্যায়)। যে তন্ত্রে মূর্ত্তির লক্ষণ ও ধ্যানাদি বহুলভাবে আছে সেই তন্ত্রের প্রভাব দক্ষিণ দ্রাবিড়াদি দেশেই বেশী। তাহা প্রায়ই রাবণপ্রোক্ত। অগ্নিপুরাণের মতে স্থাপত্য-বিদ্যা হয়শীর্ষতন্ত্র হইতে গৃহীত—হয়শীর্ষতন্ত্র অনার্য্য তন্ত্র। প্রবন্ধান্তরে এইসব আরও ভাল করিয়া আলোচনা করা যাইবে। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে অনার্য্যদের মূর্ত্তিবিদ্যা ও মূর্ত্তিশিল্প ছিল, কিন্তু তাহাদের ইন্দ্রিয়াতীত ধ্যানরস ছিল না, তাহা ছিল আর্য্যদের। এই দুইএর মিলনে ভারতে একটি অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক শিল্পের আয়োজন হইয়া উঠিতেছিল। পৃথিবী ও পার্থিব বস্তুর প্রতি দরদই শিল্পের প্রাণ, তাহা ক্রমশঃ আর্য্যদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল।

প্রাণে যেমন জড় "দেহ" এবং দেহাতিরিক্ত অনির্বচনীয় "জীবন" থাকে, তখনকার ভারতীয় প্রতিভায় তেমনি বিশ্বের সবই জীবনের দ্বারা জীবন্ত হইয়া প্রাণরসে পরিণত হইতেছিল। তাঁহাদের কাছে কিছুই জড় ছিল না; সবই—প্রাণ।

প্রাণায় নমো যস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
নমস্তে প্রাণক্রন্দায় নমস্তে স্তনয়িত্নবে॥
নমস্তে আয়তে নমো অস্তু পরায়তে।
প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তক্মা প্রাণং দেবা উপাসতে।
প্রাণো বিরাট্ প্রাণো দেষ্ট্রী প্রাণং সর্ব্ব উপাসতে।

(অথর্ব, ১১, ৬, ১—১২]

প্রাণকে নমস্কার যাঁহাতে সব প্রতিষ্ঠিত। যে প্রাণ ক্রন্দন করিতেছেন সেই প্রাণকে নমস্কার, যে প্রাণ গর্জ্জন করিতেছেন তাঁহাকে নমস্কার, যে প্রাণ (জীবনরূপে) আসিতেছেন তাঁহাকে নমস্কার, যিনি (মৃত্যুরূপে) যাইতেছেন সেই প্রাণকে নমস্কার। মৃত্যুও প্রাণ, বেদনাও প্রাণ; দেবতারা এই প্রাণকে উপাসনা করেন। প্রাণই বিরাট্, প্রাণই সকলকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই প্রাণকেই সকলে উপাসনা করেন।

যৎ প্রাণ ঋতা বাগতে অভিক্রন্দত্যোষধীঃ।
সর্ব্বং তদা প্রমোদতে যৎকিঞ্চ ভূম্যামধি।
যদা প্রাণো অভ্যবর্ষীদ্ বর্ষেণ পৃথিবীং মহীম্।
অভিবৃষ্টা ওষধয়ঃ প্রাণেন সমবাদিরন্॥
পরাচীনায় তে নমঃ প্রতিচীনায় তে নমঃ॥

(অথর্ব ; ১১ ; ৬ ; ১—১২)

নিয়মিত ঋতু আসিয়া উপস্থিত হইলে যেই প্রাণ ওষধি-সমূহের দিকে ক্রন্দন করে (ওষধিসমূহকে ব্যথিত আহ্বান করে) অমনি এই ভূমির উপর যাহা কিছু আছে সবই প্রমোদিত হইয়া উঠে। যখন প্রাণ এই মহতী পৃথিবীকে প্রাণ রসের দ্বারা প্লাবিত করে, তখন রসসিক্ত ওষধি-সকল প্রাণের দ্বারাই মধুর ছন্দে প্রত্যুত্তর দেয়। হে প্রাণ, তুমি নিত্য প্রাচীন, তোমাকে নমস্কার; তুমি নিত্য নবীন, তোমাকে নমস্কার।

যে ভাব-রস বিশ্বচরাচরকে প্রাণিত করিয়া জীবন্ত করিয়া প্রেমে আপন করিয়া দেখিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ প্রয়োজনাতীত। প্রয়োজনের অতীত এই ভাবরস প্রেমরস কেবল সৌন্দর্য্যে শিল্পে প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছিল।

আথর্ব্বণ ও আঙ্গিরসদের মধ্যে বিশ্বের প্রতি প্রীতি, পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ, মানুষের হৃদয়ের দিকে টান অত্যন্ত বেশী। তাই তাহাদের মধ্যে বশীকরণ অভিচার প্রভৃতির মন্ত্রাদি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। স্বর্গ অপেক্ষা পৃথিবী তাঁহাদের কাছে বেশী সত্য। পৃথিবীর মাটিতেই তাঁহাদের আনন্দ। কাজেই ইঁহাদের কাছে শিল্পের মালমশ্লা বেশী মেলে।

পৃথিবীর প্রতি তাঁহাদের এই দরদেই (sympathy) শিল্পের ভিত্তি। অথর্ব বেদে এই দরদের অন্ত নাই। এই পৃথিবীকে দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। বর্ণের, রসের, আনন্দের এই বৈচিত্র্যে আথর্বণদের হৃদয় শিল্পদেবীর পাদপীঠ হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণ ও রূপ-বৈচিত্র্যে, আথর্বণ ঋষিরা মুগ্ধ।

মহীকে তাঁহারা স্তব করিয়া বলিতেছেন—

(১) গিরয়স্তে পর্ব্বতা হিমবন্তোঽরণ্যং তে পৃথিবী স্যোনমস্তু।
বভ্রুং কৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্বরূপাম্ ধ্রুবাং ভূমিম্ পৃথিবীমিন্দ্রগুপ্তাম্।
অজীতোঽহতো অক্ষতোধ্যষ্ঠাং পৃথিবীমহম্॥ (অ ১২, ১)

হে পৃথিবী, তোমার গিরি, তোমার তুষারাবৃত পর্ব্বত, তোমার অরণ্য আমার সুখকর হউক। এই ধ্রুবা ভূমিই বভ্রুবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, অরুণবর্ণ, বিচিত্ররূপা। এই দেবরক্ষিত ভূমির উপর অজিত অহত অক্ষত হইয়া আমি প্রতিষ্ঠিত আছি।

(২) মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহম্ পৃথিব্যাঃ।
ত্বামি নিষীদেম ভূমে। (অথর্ব ১২, ১)

ভূমি আমার মাতা, আমি পৃথিবীর পুত্র। হে ভূমি, আমি তোমার কোলে যেন বসিতে পারি।

(৩) যেভ্যো জ্যোতিরমৃতং মর্ত্যেভ্য উদ্যন্ সূর্য্যো রশ্মিভি রাতনোতি। (অ ১২, ১)

যেই মর্ত্ত্যগণের জন্য সূর্য্য উদিত হইয়া স্বীয় আলোকে জ্যোতি-অমৃত ছড়াইয়া দেন।

(৪) যস্তে গন্ধঃ পৃথিবি সংবভূব যং বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ।
যং গন্ধর্বা অপ্সরসশ্চ ভেজিরে তেন মাং সুরভিং কৃণু॥" (অ ১২, ১)

হে পৃথিবী তোমার যে গন্ধ ভরিয়া উঠিয়াছে, ওষধি-সকল ও সলিল যে গন্ধে ভরপূর, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ যে গন্ধের ভাগ গ্রহণ করিয়াছে সেই গন্ধে আমাকে সুরভিত কর।

যস্তেগন্ধঃ পুষ্করমাবিবেশ পৃথিবীগন্ধমগ্রে
তেন মাং সুরভিং কৃণু। (অ, ১২, ১)

তোমার যে গন্ধ পদ্মের মধ্যে আবিষ্ট, হে পৃথিবী যে গন্ধ তোমার আদিতে, সেই গন্ধে আমাকে সুরভিত কর।

শিলাভূমিরশ্মাপাংশুঃ সা ভূমিঃ সংধৃতা ধৃতা।
তস্যৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যা অকরং নমঃ॥ (অথর্ব, ১২, ১)

তোমার শিলা, তোমার ভূমি, তোমার পাষাণ, তোমার ধূলি সবাই যেন ধরিয়া রাখিয়াছে। সেই হিরণ্যবক্ষা পৃথিবীকে নমস্কার করি।

গ্রীষ্মস্তে ভূমে বর্ষাণি শরদ্ধেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ।
ঋতবস্তে বিহিতা হায়নীরহোরাত্রে পৃথিবী নো দুহাতাম্। (অ, ১২, ১)

হে মাতা ভূমি, তোমার গ্রীষ্ম, তোমার বর্ষা, তোমার শরৎ হেমন্ত, শিশির বসন্ত; তোমার সুবিহিত ঋতু, সংবৎসর, তোমার দিবা ও রাত্রি তোমার বক্ষের দুগ্ধধারার ন্যায় ক্ষরিত হউক।

যস্যাম্ গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা ব্যৈলবাঃ।
যুদ্ধ্যন্তে যস্যামাক্রন্দো যস্যাম্ বদতি দুন্দুভিঃ॥ (অ, ১২, ১)

কলকোলাহলে নিমগ্ন মর্ত্ত্যগণ যে ভূমিতে গান করিতেছেন নৃত্য করিতেছেন, যাহাতে যুদ্ধের নিনাদ ও দুন্দুভির ঘোষণা বাজিয়া উঠিতেছে, সেই ভূমি আমাদের কল্যাণ করুন।

যাং পক্ষিণঃ সংপতন্তি হংসাঃ সুপর্ণাঃ শকুনা বয়াংসি।
যস্যাম্ বাতো মাতরিশ্বেয়তে রজাংসি কৃণ্বংশ্চ্যাবয়ংশ্চ বৃক্ষান্। (অ, ১২, ১)

যাঁহাতে হংস, সুপর্ণ চীল, শকুন্ত ও ছোট বড় সব পক্ষীগণ উড়িয়া চলিয়াছে, যাঁহাতে বায়ু ধূলা উড়াইয়া বৃক্ষগণকে দোলাইয়া মায়ের অন্তরের নিশ্বাসের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে।

যামন্বৈচ্ছদ্ধবিষা বিশ্বকর্ম্মান্তরর্ণবে রজসিঃ প্রবিষ্টাম্।
ভুজিষ্যং পাত্রংনিহিতং গুহা যদাবির্ভোগে অভবন্মাতৃমদ্ভ্যঃ॥

যেই মাতা পৃথিবী অর্ণব ও বাষ্পের মধ্যে ডুবিয়াছিলেন, বিশ্বকর্ম্মা যাঁহাকে আহুতিমন্ত্রে অন্বেষণ করিতেছিলেন, গভীর গুহার মধ্যে নিহিত সেই আনন্দময় ভোগ্যপাত্রখানি মাতৃবান্ সন্তানগণের ভোগের নিমিত্ত আবির্ভূত হইল।

ভূমে মাতর্নিধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্॥ (অ, ১২, ১)

হে মাতা পৃথিবী, তুমি আমাকে কল্যাণে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।

জলের ধারা যেমন কোন উৎস হইতে উৎসারিত হয় এই সৃষ্টিও যেন একটি রস-ধারা; যে উৎস হইতে এই ধারা উৎসারিত হয়—তাহা জীবন্ত। তাহাকে আথর্বণগণ স্কম্ভ নামে অভিহিত করিয়াছেন। সৃষ্টির কাঠামোকেও স্কম্ভ বলা হয়। জীবন্ত সৃষ্টির কাঠামো কঠিন শুষ্ক কাঠ খড় নহে—তাহা জীবন্ত টলটলায়মান রস। সেই স্কম্ভ হইতেই রসে সব-কিছু পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

ঊর্দ্ধ্বংভরন্তমুদকং কুম্ভেনেবোদহার্য্যম্।
পশ্যন্তি সর্ব্বে চক্ষুষা ন সর্ব্বে মনসা বিদুঃ॥ (অ, ১০, ৮)

জলপূর্ণ কুম্ভের ন্যায় তিনি উপর পর্য্যন্ত রসে ভরিয়া দিতেছেন। চক্ষু দিয়া সকলে চাহিয়া দেখিল, মন দিয়া তো কেহ জানিল না।

তিনি কেবল রসে পূর্ণ করিয়া তৃপ্ত নহেন, তিনি সকল সংসারকে নাম ধরিয়া ধরিয়া ডাকিতেছেন। এই আহ্বানের আকর্ষণে বিশ্ব যাত্রা করিয়াছে। এবং আহ্বানেরই মাধুর্য্যে বিশ্ব স্থির হইয়া সুন্দর হইয়াছে। এই সৌন্দর্য্য প্রয়োজনের অতীত, কাজেই ইহা শিল্পের রস। প্রাণের গতি ও সৌন্দর্য্যের স্থিতি দুইই এই আহ্বানে বিদ্যমান। হরগৌরীর ন্যায় এই বেগ ও কান্তির অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তি শিল্পনন্দিরের বিগ্রহ। সেই মহা আহ্বানেই বিশ্ব যেমন জীবন্ত তেমন সুন্দর। সূর্য্যেরও পূর্ব্বে উষারও পূর্ব্ব হইতে তিনি সকলকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। আর সকল সংসার রূপের পর রূপ ধরিয়া বিকশিত হইয়া সেই আহ্বানকে সত্য করিবার দিকে যাত্রা করিয়াছে—

নাম নাম্না জোহবীতি পুরা সূর্য্যাৎ পুরোষসঃ। (অ, ১০, ৭)

বিশ্বসংসারের সকল শোভা—কেবল নানা ছন্দে বড় মধুর করিয়া নাম ধরিয়া প্রিয়জনকে আহ্বান।

এই সৃষ্টির পর সৃষ্টি আর রূপের পর রূপ ফুটিয়া চলিয়াছে, তবু যেন মধুরভাবে ডাকিবার আশা তাঁহার মিটিতেছে না—তাঁহার প্রাণও স্থির হইতে পারিতেছে না। তাই সৃষ্টিতে কিসের যেন খোঁজ চলিয়াছে।

কথং বাতো নেলয়তি কথং ন রমতে মনঃ।
কিমাপঃ সত্যং প্রেপ্সন্তী নৈলয়ন্তি কদাচন॥ (অ, ১০, ৭, ৩৭)

কেন বায়ু স্থির থাকিতে পারিল না, কেন মনের সন্তোষ আর হইলই না? কোন্ সত্যকে পাইতে ইচ্ছা করিয়া জলধারা কখনই স্থির হইতে পারিতেছে না?

এই-সকল চঞ্চলতার মধ্যেই যে একটি নিত্য অচঞ্চল আছেন, নহিলে এত প্রাণের উচ্ছ্বাস এত গতি এত প্রবাহ সব যে অসম্ভব হইত—সেই গূঢ় তথ্যটি আথর্বণগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহারা বুঝিয়াছেন মৃত্যুলোকের মধ্যেই সেই অমৃত সমাসীন, তাই এই মৃত্যুলোকের এত রূপ-বৈচিত্র্য। যিনি স্থির তিনিই সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের উৎস। কারণ সৌন্দর্য্য স্থিরতাকে চায়; বেগ ও গতি তাঁহারই প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য্য, তাহাই শিল্পের প্রাণ। তাই তিনি সনাতন ও নিত্য নূতন।

সনাতনমেনমাহুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণবঃ।
অহোরাত্রে প্রজায়েতে অন্যো অন্যস্য রূপয়োঃ॥ (অ, ১০, ৮, ২৩)

তাঁহাকে সনাতন বলা হইয়াছে এবং প্রতি অদ্যই তিনি বার বার নব নব রূপ হইতেছেন। দিন এবং রাত্রি একে অন্যের রূপকে পূর্ণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছেন।

পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচতি পূর্ণং পূর্ণেন সিচ্যতে
উতো তদদ্য বিদ্যাম যতস্তৎ পরিষিচ্যতে॥ (অ, ১০, ৮, ২৯)

পূর্ণ হইতে পূর্ণই উৎসারিত হইতেছে, পূর্ণকে পূর্ণরসেই অভিষিক্ত করা হইতেছে। আজ ইহাও জানিতে পারিয়াছি কোন্ রসে সেই সেচন চলিয়াছে।

ইয়ং কল্যাণ্যজরা মর্ত্তস্যামৃতা গৃহে। (অ, ১০, ৮, ২৬)

মৃত্যুশীলের গৃহে এই কল্যাণী অজরা অমৃতা।

সেই রসের সমুদ্রে মানুষ যেন পুষ্পের ন্যায় বিকশিত হইতেছে। এ ত প্রয়োজনের মানুষ নহে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মানুষ বস্তুমাত্র। বিশ্বের কোলে মানুষ প্রয়োজনের অতীত অনন্তবিকাশশীল কমল-পুষ্প। বিশ্বরসে ভাসমান এই কমলের সৌন্দর্য্যের সীমা কোথায়? সে যে এখানে অনন্ত!

অপাং ত্বা পুষ্পং পৃচ্ছামি যত্র তন্মায়য়া হিতম্॥ (অ, ১০, ৮, ৩৬)

জলের সেই পুষ্পের কথা তোমার কাছে জানিতে চাই কোন্ বিচিত্র কৌশলে (মায়ায়) সে এই জলে ফুটিল।

পুণ্ডরীকং তদ্ বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥ (অ, ১০, ৮, ৪৩)

এই পদ্ম-পুষ্পকে ব্রহ্মবিদেরাই জানেন।

মানুষ যেন ব্রহ্মরসে ভাসমান কমল। এই মানুষের দেহশ্রীও তাঁহাদের কম মুগ্ধ করে নাই। কি আশ্চর্য্য দেহ!

কো অস্য বাহূ সমভরদ্ বীর্য্যং করবাদিতি। (অ, ১০, ২, ৫)

বীরত্ব করিতে যেন পারে এই বলিয়া তাহার বাহু দুখানিকে কে গড়িলেন?

মস্তিষ্কমস্য যতমো ললাটং ককাটিকাং প্রথমো যঃ কপালম্।
(অ, ১০, ২, ৮)

কে ইহার মস্তিষ্ক ইহার ললাট ইহার মস্তকের পশ্চাদ্-ভাগ ও প্রথমে ইহার কপালখানি গড়িলেন?

কো অস্মিন্ রূপমদধাৎ কো মহ্মানং চ নাম চ। (অ, ১০, ২, ১২)

কে ইহাঁকে এই রূপ দিল, কে এই মহিমা দিল, এই নাম দিল?

কো [illegible] কো[illegible]। ([illegible])

কে ইহাকে সঙ্গীত দিল কে ইহাকে নৃত্য দিল?

এই মানুষ [illegible]। সে [illegible] ক্ষত্রিয় [illegible] নহে। সে ধর্ম [illegible] সব [illegible] অতীত। তাই সে [illegible] নহে। তাহার [illegible] সৌন্দর্য্য অপার [illegible]। [illegible] যদি ব্রাত্য (ব্রাত্য [illegible]) [illegible] অনুপম [illegible]! [illegible] আসন [illegible] আসন [illegible] সেই [illegible] আসন [illegible]। [illegible] দিকে [illegible] উঠ [illegible]। সেই [illegible]। [illegible] ঋষি বলিতেছেন—

স সংবৎসরম্[illegible] তং দেবা অব্রুবন্ [illegible]। (অ, [illegible])

সে সংবৎসর ঊর্দ্ধ হইয়া [illegible] তাহাকে দেবতারা বলিলেন, হে ব্রাত্য [illegible]?

সোঽব্রবীদাসন্দীং মে সং ভরন্ত্বিতি ([illegible])

সে কহিল আমাকে আসন দাও।

তস্মৈ ব্রাত্যায় আসন্দীং সমভরন্। ([illegible])

সেই ব্রাত্যকে তাহারা আসন দিলেন।

তস্যা গ্রীষ্মশ্চ বসন্তশ্চ দ্বৌ [illegible] শরচ্চ বর্ষাশ্চ দ্বৌ॥ (অ, ১৫, [illegible])

গ্রীষ্ম ও বসন্ত সেই আসনের দুই পায়া, শরৎ ও বর্ষা তাহার আর দুইখানি পায়া। (পৃথিবীই তাহার আসন।)

বেদ আস্তরণম্ ব্রহ্ম [illegible]। (অ, [illegible])

বেদ হইল সেই আসনের আস্তরণ, ব্রহ্ম হইল তাহার উপাধান।

স বিশোঽনুব্যচলৎ। তং সভা চ সমিতিশ্চ সেনা চ সুরা চানুব্যচলন্। (অথর্ব, ১৫, [illegible] ১, ২)

সে জনসমূহের দিকে চলিল। তাহার পশ্চাতে সভাসমিতি সেনা সুরা সবাই চলিল।

সেই ব্রাত্য যদি রাজার গৃহে অতিথি হয়—

রাজ্ঞোঽতিথিগৃহানাগচ্ছেৎ। (অ ১৫,১০,১)
শ্রেয়াংসমেনমাত্মনো মানয়েৎ তথা ক্ষত্রায় না বৃশ্চতে
তথা রাষ্ট্রায় না বৃশ্চতে। (অ,১৫,১০,২)

তাহা হইলে রাজা তাহাকে নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন, নহিলে তাঁহার ক্ষত্রিতে ও রাজ্যে আঘাত লাগিবে।

যদি সেই

[illegible]তিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ। (অ ১৫,১১,১)

ব্রাত্য অতিথি হইয়া (গৃহাশ্রমীর) গৃহে আসে; তবে

স্বয়মেনমভ্যুদেত্য ব্রূয়াদ্ ব্রাত্য ক্বাবাৎসীর্ব্রাত্যোদকং
[illegible] তর্পয়ন্তু [illegible] প্রিয়ং তথাস্তু। (অ,১৫,১১,২)

গৃহপতি নিজে উঠিয়া তাঁহার কাছে গিয়া বলিবেন "কোথায় তোমার বাস? এই জল, ইহা তোমাকে তৃপ্ত করুক। তোমার যাহা প্রিয় তাহাই হউক।"

স্বয়মেনমভ্যুদেত্য ব্রূয়াদ্ ব্রাত্যাতিসৃজ হোষ্যামীতি। (অ ১৫ [illegible] ,২)

স্বয়ং তাহার নিকটে গিয়া বলিবেন 'হে ব্রাত্য, অনুমতি কর তো এখন যজ্ঞের আহুতি সম্পন্ন করি।"

স চাতিসৃজেজ্জুহুয়ান্নাতিসৃজেন্ন জুহুয়াৎ॥ (অ [illegible])

যদি সে অনুমতি করে তবে যজ্ঞাহুতি সম্পন্ন করিবে না অনুমতি দিলে করিবে না।

এই আথর্বণ ঋষিগণের নিকট যেমন এই পৃথিবী, যেমন এই মানব, তেমন সবই প্রিয়। এই প্রকৃতিকে দেখিয়া তাহাদের কি আনন্দ! রাত্রির শোভা দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইল রাত্রি যেন একখানি রত্নখচিত পানপাত্র—

ভদ্রাসি রাত্রি চমসো ন বিষ্টঃ।
চক্ষুষ্মতী মে উশতী বপূংষি প্রতি ত্বং দিব্যা ন ক্ষামমুক্থাঃ। (অ,১৯,৪৯,৮)

হে রাত্রি, তুমি অলঙ্কৃত পানপাত্রের ন্যায় মনোরম, তুমি কল্যাণী। তুমি চক্ষুতে পরিপূর্ণ, কত রূপই আমাকে তুমি দেখাও! কি উজ্জ্বল দিব্য (নক্ষত্রময়) বসনখানি তুমি পরিধান করিয়াছ!

বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি এই যে দরদ, মানবে মহীতে এই যে অপূর্ব্ব প্রীতি, ইহাতেই আথর্বণ ঋষিদের "শিল্পের" আয়োজন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

যে সব কবি এই বিশ্বের রহস্য ও সৌন্দর্য্যকে বর্ণে ও সুরে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা যে মৃত্যুঞ্জয়ী এই তত্ত্ব আথর্বণেরা বুঝিতে পারিয়াছেন –

কালো অশ্বো বহতি সপ্তরশ্মিঃ সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ।
তমারোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিতস্তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা। (অ,১৯,৫৩,১)

কালরূপ সহস্রচক্ষু প্রভূতবীর্য্য অজর অশ্ব বহিয়া চলিয়াছে। তাহার সপ্ত (বর্ণ) রশ্মি। মর্ম্মদর্শী কবিগণ তাহাতে আরোহণ করেন। বিশ্বভুবন তাহার চক্র।

এই কবিগণ যে সর্ব্বরূপে অরূপ অনন্তকে দেখিতে পান সে কেবল তাঁহাদের তপস্যার বলে। লীলাময় অনন্তের রূপ যে সর্ব্বরূপে পরিব্যাপ্ত তাহা কেবল তপস্বীরাই দেখেন। সাধনায় যাহার তনু তপ্ত সেই এই লীলা স্পর্শ করিতে পারে।

পবিত্রং তে বিততম্ ব্রহ্মণস্পতে প্রভুর্গাত্রাণি পর্য্যেষি বিশ্বতঃ।
অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে শৃতাস ইদ্বহন্তস্তৎ সমাশত ॥
(সামবেদ, উ, আ, ৪,৩,২,১৬)

হে স্তবের অধিপতি দেবতা, তোমার পবিত্র তনু বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। তপস্যায় অতপ্ত (অ-তপ্ত) অপক্ক যাহার তনু সে তাহা স্পর্শ করিতে পারে না। যে তনু তপ্ত ও পক্ক, যে তনু তোমার তপস্যাকে বহন করে, সেই তনুই তোমার স্পর্শ লাভ করে। *

কবি সেই অরূপের রূপ দেখাইয়া দেন। সীমার মধ্যে অনন্তকে দেখান। সাধারণ শিল্পীর ন্যায় বর্ণ দ্বারা এই সৌন্দর্য্য না দেখাইলেও কবিকে ঋগ্বেদে বারে বারে কারু, স্রষ্টা, দিব্যবাণীর উৎস বলা হইয়াছে। তিনি ছন্দে ও সুরে এই উদ্দেশ্য সাধন করেন।

ভারতের মধ্যে মৃণ্ময় ও চিন্ময়ের এই যে চমৎকার জীবন্ত মিলন ঘটিল তাহাতে "ছায়াতপয়োরিব" শিল্পের রস-মূর্ত্তিটি মনোহর হইয়া উঠিল। তাই ইঁহাদের কাছে শিল্পের এমন আদর্শ পাই যে তাহা অপেক্ষা নূতন বা গভীর কথা আজও কেহ বলেন নাই। উপসংহারে শিল্পের সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে কয়েক পংক্তি বলিয়া অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। † কথিত আছে এক ঋষির এক পত্নী ছিলেন—"ইতরা"। শূদ্রকেই ইতরা বলে অনেকের মতে ইনি শূদ্রই ছিলেন। ‡ তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানের নামের অন্তেও "দাস" আছে। * কোনো এক যজ্ঞে বসিয়া সেই ঋষি তাঁহার উত্তমবর্ণীয়া স্ত্রীর সন্তানদিগকে আদর করিয়া, ইতরার সন্তানকে উপেক্ষা করেন। ইতরার পুত্র মার কাছে কাঁদিয়া বলিলেন "পিতা আমাকে অপমানিত করিয়াছেন। আমাকে কে তবে বিদ্যা দিবে?" ইতরা বলিলেন "আমার আর তো কোনো সম্পদ নাই, আমরা মাতা পৃথিবীর সন্তান, সেই মহীর কাছে তোমাকে লইয়া যাই। তিনি তোমাকে দীক্ষা দিবেন।"

ভূমিদেবতা দিব্যমূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ হইয়া মহিদাসকে দিব্য সিংহাসনে বসাইয়া চিন্ময় দীক্ষা দিলেন। মহীর কাছে ইতরার পুত্র দীক্ষা লইয়া মহীর জীবন্ত মন্ত্র প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন নবনব বাণীতে পরিপূর্ণ মহীর এক একখানি পত্র খুলিয়া যায়, আর বালক তাহাই প্রত্যক্ষ ও ধ্যান করিয়া মহাকবি হইয়া উঠিতে লাগিলেন। নব নব ঋতুর বাণী, প্রতিদিনের বাণী, গন্ধে স্পর্শে শব্দে রূপে রসে পরিপূর্ণ বাণী পাইয়া বালক কৃতার্থ হইয়া গেল। ইতরার পুত্র বলিয়া তাহার নাম হইল "ঐতরেয়" এবং মহীর শিষ্য বলিয়া তাহার নাম হইল "মহিদাস"। ইঁহারই রচিত ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ হইয়া যায়। এই ব্রাহ্মণে আর্য্য অনার্য্যের চিন্ময় ও মৃণ্ময় বিদ্যা আশ্চর্য্য মিশ খাইয়া জীবন্ত বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বহু বহু মহাবাণী ধ্বনিত হইয়াছে। ইঁহাদের মতে সঙ্গীত দেবশিল্প, এবং অন্যান্য শিল্প তাহারই অনুসরণ করিয়া দেবশিল্পকে মূর্ত্তিমান করে।

ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। এতেষাং বৈ শিল্পানামনুকৃতীহ শিল্পমধিগম্যতে। হস্তী কংসো বাসো হিরণ্যমশ্বতরীরথঃ শিল্পম্। [ঋগ্বেদ ঐতরেয়, ব্রা, ৬,২,৭]

এই যে সঙ্গীত গান করা হয় তাহা শিল্প, তাহা দেবশিল্প। এই শিল্পেরই অনুকরণে হস্তী (দন্তাদির দ্রব্য), কাংস্য, বস্ত্র, হিরণ্য, রথ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। (তামসিক ও রাজসিক শিল্প)।

যথার্থ শিল্প তবে কি ?

শিল্পং হ যস্মিন্নধিগম্যতে য এবং বেদ যদেব শিল্পানি। (ঐ,ব্রা, ৩,২,৫)

যিনি জানেন এই শিল্প দেবশিল্পেরই অনুকরণ তিনি যথার্থ শিল্প প্রাপ্ত হন।

* আচারী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এই শ্লোকটির বলে মুদ্রা দগ্ধ করিয়া দেহে দগ্ধ-মুদ্রা দেন। মনে করেন এই উপায়ে "তপ্ততনু" হইয়া ভগবানের তনুর স্পর্শলাভ করিবেন।

† দ্র-ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্য-ভূমিকায় সায়ন।

‡ দ্র-সামশ্রমিকৃত ঐতরেয়ালোচনম্ ১২—১৭ পৃষ্ঠা।

* দ্র-ঐতরেয় আরণ্যক ১, ৮, ২।

এই শিল্পে লাভ কি ? সুখ, না স্বর্গ, না অপবর্গ ?

আত্মসংস্কৃতি র্বাব শিল্পানি। (ঐ ব্রা, ৬, ২, ৫)

শিল্প আত্মাকে সংস্কৃত অলঙ্কৃত করে। ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ ফল। স্বর্গ বা অপবর্গ নহে।

ইহার দ্বারা যজমান আপনার আত্মাকে ছন্দোময় করিয়া তোলেন। আত্মাকে ছন্দোময় করাই ইহার একমাত্র ফল। অন্য আর কোনো ফল ইহাতে নাই। ইহার দ্বারা সুখ, সুবিধা, বিদ্যা লাভ বা অন্য কোনো উপকারই হয় না—কেবল সব কথার উপরের কথা "আত্মা ছন্দোময়" হইয়া ওঠে।

ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে। (ঐ ব্রা, ৬, ২, ৫)

এই কথাই শিল্পের সবচেয়ে বড় কথা। আত্মা ছন্দোময় হইয়া যায় ! ইহাই রসজ্ঞের স্বর্গ, ইহাই রসজ্ঞের মুক্তি !

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

কবি এ, ই,'র কবিতা

A. E. এই দুটি অক্ষর-স্বাক্ষরিত এক অজ্ঞাতনামা কবি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

এখনকার কালে কবির পক্ষে নাম লুকানো বা নাম ভাঁড়ানো বড় শক্ত। কবির স্বপনটুকুতেই পাঠকদের মন ভরে না, কবির জীবনটুকুও পূরাপূরি না জানিলে তাহাদের কৌতুহল মেটে না। এখনকার কালের বৈজ্ঞানিক যেমন বিশ্বকে দেখেন ল্যাবরেটরিতে; এখনকার কালের কাব্য-রসিক তেমনি কাব্য চাখেন কবির জীবনের ল্যাবরেটরিতে, যেখানে বিশ্বের সঙ্গে কবির মনের নানা রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার যোগে কবিতার রসান তৈরি হয়। সুতরাং বস্তু-পরিচয় করাইয়াই কবি এ, ই, যে নামরূপের মোহের উপর মুদ্গার মারিবেন, পাঠকদের তাহা সহ্য হইবে না। কারণ, ঐ নামরূপের আবরণের ভিতরেই যে বস্তু নিহিত। কবি এ, ই, যে 'জর্জ্জ রাসেল' নামধারী একজন আইরিশ,—তাঁর কাব্য বুঝার জন্য এ পরিচয়টুকু একেবারে অনাবশ্যক নয়। কেন নয়, তাহা বলিতেছি।

আধুনিক কাব্যসাহিত্য যাঁরা পড়েন, তাঁরা "কেল্টিক স্কুলের" কবিদের খবর নিশ্চয়ই রাখেন। ইঁহাদের কবিতা ও নাট্যাদি এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের জিনিস। সকল দেশেই যাকে পুরাণকথা রূপকথা, বা গাথা ছড়া প্রভৃতি বলা যায় সেই-সব লোকসাহিত্যের ভিতরে-ভিতরে মানুষের অব্যক্ত চৈতন্য আপন গভীরতম সৌন্দর্য্য বা অধ্যাত্ম রসানুভূতির নানান্ চিহ্ন আশ্চর্য্যরূপে রাখিয়া যায়। সাহিত্য-রসিকের পক্ষে তাহা একটা চমৎকার আবিষ্কারের বিষয়। ছেলেভুলানো ছড়া, গ্রাম্য সাহিত্য, বাউলের গান প্রভৃতি বাংলার লোকসাহিত্যে সেই আবিষ্কার কবি রবীন্দ্রনাথ কতক কতক করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই-সকল সাহিত্যের উপকরণ তাঁহার সৌন্দর্য্য- বা অধ্যাত্ম-রসানুভূতির প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেন নাই। তাঁর কাব্যে এসবের ছাপ নাই। তাই লোকসাহিত্যের সঙ্গে আর তাঁর সাহিত্যের স্তরের ভেদ অত্যন্ত বেশি। বোধ হয়, আমাদের দেশের চিত্ত-ক্ষেত্রে সেই ভূমিকম্প বা প্লাবন দেখা দেয় নাই যাহাতে নীচের স্তর সহসা উপরে উঠিয়া আসে, উপরের স্তর নীচে নামে। আমাদের জাতির গভীরতম instincts বা সহজ সংস্কার-গুলির অন্ধকার গুহালোকে এক-আধটা মশালের আলো দৈবাৎ গিয়া পৌঁছিতেছে সেখানকার তমসা এখনো অত্যন্ত নিবিড়।

আমাদের জাতির অব্যক্ত-চেতনার লোকে যে-সব পুরাণের জন্ম, সেই-সব পুরাণের রত্নরাজি যদি কুড়ানো হইত এবং উচ্চ সাহিত্যিকের অভিব্যক্ত-চেতনার লোকে, সূত্রে মণি-গণাইব, বড় আইডিয়ার সূত্রে যদি সেই পুরাণ-রত্নগুলিকে পরানো হইত, তবে কি রকমের সাহিত্য সৃষ্ট হইতে পারিত তাহা কল্পনা করা শক্ত নয়। "কেল্টিক রিভাইভ্যাল স্কুলের" সাহিত্য সেই ধরণের সাহিত্য। কবি ইয়েট্‌স্ এই স্কুলের সবচেয়ে বড় কবি।

বৈষ্ণব কবিতা এক সময়ে আমাদের দেশে একটা ভাবপ্লাবন উপস্থিত করিয়াছিল। কেমন করিয়া ?—সে একটা দুরূহ প্রশ্ন। নিশ্চয়ই আভীর প্রভৃতি কতগুলি নিম্ন স্তরের tribeদের মধ্যে কতগুলি নিম্ন আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল; অন্যান্য অসভ্য জাতিদের মত তাহাদের মধ্যে কামপ্রবৃত্তি (erotic instinct) স্বভাবতই প্রবল ছিল।

তাহাদের tribal দেবতাকেও তাহারা এমনিতর কতগুলি আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা পূজা করিত এবং ক্রমশঃ সেই-সকল পূজাবিধি, সেই-সকল পুরাণগাথা, উৎসব-অনুষ্ঠান, সমাজের স্তরবিপ্লবের সময়ে সমস্ত সমাজময় ব্যাপ্ত হইয়া অদ্ভুত রূপান্তরে রূপান্তরিত হইয়াছিল। সেই রূপান্তরেই বৈষ্ণব কবিতার জন্ম। তাহা ঐন্দ্রিয়কে অতীন্দ্রিয়ে, লৌকিককে অলৌকিকে রূপান্তরিত করিয়াছিল। রূপান্তরের আর-এক নাম রূপক। বৈষ্ণব কবিতা রূপক হইলেও তাহার মজ্জাগত আদিম রূপটিকে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাই মহাজন ভক্তের কাছে তার এক রস; অভাজন সংসারাসক্তের কাছে তার অন্য রস। মানুষের নিম্ন প্রবৃত্তির লীলাকে ভগবদ্‌লীলায় উত্তীর্ণ করিতে গিয়া দুই লীলারই এক অদ্ভুত সমন্বয় বৈষ্ণব কবিতায় ঘটানো হইয়াছে, দেখিতে পাই। তবু দেশের মাটির সঙ্গে ইহার প্রাণের যোগ ছিল বলিয়াই ইহা দেশকে অমন করিয়া নাড়া দিয়াছিল। দেশের উপরের স্তর হইতে নীচের স্তর পর্য্যন্ত এই কবিতার রস প্রবাহিত হইয়াছিল।

বৈষ্ণব সাহিত্যের মত সুফী কাব্যসাহিত্যও পারস্যদেশে এমনি করিয়াই ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভাবের হাঁড়িটাকে জাতির অব্যক্ত মনের আগুনের উপর রাখিলেই তাহার চাল ফোটে—তখন সাহিত্যের সেই চাল্ বা রীতিই নানা মনে মনে পরিবেষিত হয়। সমাজ এমনি করিয়া সাহিত্যকে সৃষ্টি করে; সাহিত্য সমাজের মনের উপর সুধা বৃষ্টি করে।

বৈষ্ণব সাহিত্য ও সুফী সাহিত্যের মত, "কেল্‌টিক স্কুলের" সাহিত্যও লৌকিক-অলৌকিক-সাহিত্য। অর্থাৎ, লৌকিকে ইহার ভিত্তি, অলৌকিকে ইহার সমুত্থান।

A. E. যদিচ এই স্কুলের একজন, তথাপি তাঁহাকে একজন কেল্‌টিক পদকর্ত্তা মনে করিলে ভুল হইবে। তিনি কেল্‌টিক মনের পটে বিশ্বমনের রং ফেলিয়াছেন ও ফলাইয়াছেন; সুতরাং তাঁর কাব্যে কেল্‌টিক মনের কেল্‌টিকত্ব কোথাও জাগিয়া নাই। তাঁর অনুভূতি বিশ্বানুভূতি হইয়াছে; তাঁর ভাব ও ভাষা বিশ্বভাব ও ভাষা হইয়াছে। তিনি পুরাণের নাগপাশে কোথাও বদ্ধ নন্; তিনি পুরাণের চেয়ে পুরাণো প্রকৃতির চিররহস্যাভাসে স্তব্ধ হইয়া সেই স্তব্ধতার নিবিড় সঙ্গীতের একটি-আধটি স্পন্দন মাত্র তাঁর কবিতায় জাগাইয়াছেন।

কারণ, বৈষ্ণব কবিতার বেলায় আমরা দেখিলাম যে পুরাণে কোন কাব্য বা সাহিত্য নিজেকে জড়াইলে তার জট ছাড়ানো শক্ত হয়। তখন সেই পুরাণের পুরাণো symbolগুলি মানুষের মনকে ও মনের কল্পনাকে এমনি ভারাক্রান্ত করে যে, মনে হয়, ঐ গুটিকতক symbol ও তাহার গুটিকতক রসেই যেন মানুষের মনের সব সৌন্দর্য্য ও সব অধ্যাত্মরসানুভূতি প্রকাশ করা যায়। এই কারণেই বৈষ্ণব পদাবলী তিন চারি শতাব্দী ধরিয়া কেবলি পুনরাবৃত্ত হইয়াছিল। সুফী সাহিত্য, খৃষ্টান মধ্যযুগীয় মিষ্টিক্যাল সাহিত্যেও এই পুনরাবৃত্তির কাজ শীঘ্র বন্ধ হইতে পারে নাই। পুত্তলিকা পূজা যে একবার মানুষকে পাইয়া বসিলে আর ছাড়িতে চায় না, তাহার কারণই এই। মানুষ আপনার কল্পিত symbolএর মোহে আপনি মুগ্ধ হয়—ঊর্ণনাভের মত আপনার কল্পনাকে কেন্দ্রে বসাইয়া, সেই কল্পনার সূত্রাতন্তুর জাল আপনার চারিদিকেই ঘন করিয়া বুনিতে থাকে। বাহিরের জগৎটা তখন তার কাছে ধোঁয়া হইয়া আসে। সত্যের বিচিত্ররূপ মনের দরজায় আর ঘা মারে না। নব নব সত্য, নব নব তত্ত্বের সন্ধানে সে বাহির হয় না; নব নব সত্য, নব নব তত্ত্ব হইতে নূতন নূতন রস ও তদুপযোগী নূতন নূতন symbolএর আধার সে সৃজন করে না।

কবি রবীন্দ্রনাথের "দেউল" কবিতায় এই symbol-মোহের একটি চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়।

এইজন্য সাহিত্যের পক্ষে একদিকে গণতন্ত্র হওয়া যেমন দরকার, অন্যদিকে স্বতন্ত্র হওয়াও তেমনি দরকার। কোন কোন সাহিত্য গণমনের প্রতিভাতি; কোন কোন সাহিত্য অনন্য-মনের স্বভাতি।

বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার যে তফাৎ, কেল্‌টিক কবিদের রচনার সঙ্গে এ, ই'র কবিতার সেই তফাৎ। রবিবাবুর কবিতায় বৈষ্ণব কবিতার সার আছে, ভার নাই। বৈষ্ণব কবিতার রসান আছে, পুরাণ নাই। সেই রসানে নূতন নূতন রসের তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। কৃষ্ণরাধার জায়গায় 'আমি-তুমি' বসাইয়াছেন; বৃন্দাবনের

অভিসারের জায়গায় জীবনের বিচিত্র পথের অভিসারের sym'ol আনিয়াছেন। 'রাসলীলার' জায়গায় 'বিশ্বদোল' আনিয়াছেন। আর বৃন্দাবন এবং ধামগোলোকের জায়গায় বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বমানবের ইতিহাস-রঙ্গভূমিকে আনিয়াছেন। A. E.র হাতে ঠিক তেমনি Angus বা Etain বা Lir বা Sacred Hazel প্রভৃতি তাঁর দেশীয় পুরাণ-কথার বদল হইয়াছে। ঐ-সব রসানে তিনি নূতন নূতন রসের সৃষ্টি করিয়াছেন। Angus কেল্টিক মদন। তাহার সোনার বরণ চুল, সে বীণা বাজায়, তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া পাখীরা গান গায়। সেই পাখীদের চুম্বনে প্রেম যেমন জাগে, মৃত্যুও তেমনি লাগে। প্রেম আর মৃত্যু যে এক। প্রেম যে চায় মরণ, মরণের ভিতর দিয়া অনন্ত জীবন। Etain এক দেবী, তিনি 'স্বর্গ হইতে বিদায়' লইয়া মর্ত্ত্যে মর্ত্ত্যবাসীকে ভালবাসিয়াছিলেন। Lir সেই আদিম গভীর কারণ-সমুদ্র, যাহা হইতে সমস্তের উৎপত্তি। Sacred Hazel জীবনের চিরন্তন বৃক্ষ। এই-সব পুরাণ-কথা এ,ই'র কবিতায় ছড়াইয়া থাকিলেও এই-সব symbol-এর সাহায্যে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন নাই। ইহারা তাঁহার ভাবের বাহক হইয়াছে; বাধক হয় নাই।

A. E.'র কবিতা যথেষ্ট নাই। আমার যতদূর জানা আছে, তাঁহার তিনখানি কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। The Divine Vision and Other Poems; Homeward: Songs by the Way; এবং Earth-Breath. আজকাল এই ধরণের কবিতাগুলিকে mystical কবিতা বলা হয়। এই নামটিতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। রবিবাবুর 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতির কবিতাও এই নামে পরিচিত হইয়াছে। আপত্তির কারণ এই যে, 'মিষ্টিক' বলিলে এক বিশেষ শ্রেণীর অধ্যাত্মযোগী বা সাধক বুঝায়। তাহাদের কাছে প্রাকৃতের চেয়ে অতিপ্রাকৃত বা অতীন্দ্রিয় লোকটাই সত্যতর, সুতরাং তাহাই তাহাদের অনুসন্ধানের বিষয়। নানারূপ সাধনভজন ও ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার সাহায্যে তাহারা সেই রাজ্যের "visions and voices" দৃশ্য ও শব্দ দেখিতে ও শুনিতে চেষ্টা করে। এই অতিগুহ্য অতীন্দ্রিয় লোক কি কবির কাঙ্ক্ষিত লোক? এই-সব সাধনার সঙ্গে কবির সাধনা কি মেলে? কবি রূপলোক হইতে অরূপলোকে উঠিতে পারেন—কিন্তু রূপলোকের মধ্যে থাকিয়া রূপের মধ্যেই তিনি অরূপকে দেখেন। রূপকে ছাড়িয়া যান না। সুতরাং মিষ্টিক কবিতা না বলিয়া বরং symbolical কবিতা বলিলে, এই-সব কবিতার কতকটা পরিমাণে ঠিক নামকরণ করা হয়। তবু নামকরণের অনেক দোষ। Symbolical কবিতা বলিলেও ঠিক বলা হয় না। কারণ, আমরা দেখিলাম যে, এই-সব কবিতা Symbolএর বন্ধনে জড়ায় না, সেই বন্ধনকে ছাড়াইতে চায়। সুতরাং কোন নামকরণের চেষ্টা না করিয়া সরাসরি এ,ই'র কবিতার রসটা কি, তাহা উপভোগ করিতে যাওয়াটাই সবচেয়ে সুবুদ্ধির কাজ।

অতএব symbol সম্বন্ধেই A. E.'র বক্তব্য কি তাহা উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকার পরিচয় সাধনের অবতারণা করাটা মন্দ নয়।

Homeward: Song by the Way কাব্যে একটি কবিতা আছে, "The Symbol Seduces"—অর্থাৎ symbolএর ফাঁকি। কবিতাটি এই:—

There in her old-world garden smile
A symbol of the world's desires,
Striving with quaint and lovely wiles
To bind to earth the soul of fire.
And while I sit and listen there,
The robe of Beauty falls away
From universal things to where
Its image dazzles for a day.
Away! the great life calls; I leave
For Beauty, Beauty's rarest flower;
For Truth, the lips that ne'er deceive
For Love, I leave Love's haunted bower.

ঐ যে সেই প্রাচীন জগতের কাননে, বিশ্ব-বাসনাসম্ভূত বিগ্রহ হাসিতেছে!
অগ্নিময় আত্মাকে সে পৃথিবীতে বাঁধিয়া রাখিতে চায় তাহার অদ্ভুত-মধুর ছলাকলায়!

আমি যখন সেখানে বসি, সেখানে কান পাতিয়া শুনি;
দেখি, বিশ্বের সকল পদার্থ হইতে সৌন্দর্য্যের আবরণখানি খসিয়া পড়িল
এবং ভরিল সেই জ্যোতি-ঝলসিত বিগ্রহমূর্ত্তিটিকে একটি দিনের জন্য!
আরও দূরে, ওরে যাত্রী! বৃহৎ জীবন যে তোমায় আহ্বান করিতেছে!
সৌন্দর্য্যের জন্যই সৌন্দর্য্যের এই আশ্চর্য্যতম পুষ্পকে আমি পরিহার করিয়া চলিলাম;
সত্যের জন্য, চিরবিশ্বস্ত সেই ওষ্ঠদুইটির মিনতিকে পরিহার করিয়া চলিলাম;
প্রেমের জন্য, প্রেমের নিভৃতকুঞ্জ ছাড়িলাম!

Symbol বা বিগ্রহ বিশ্বের সমস্ত পদার্থের সৌন্দর্য্যকে নিজের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বিশ্ব হইতেই আমাদিগকে প্রবঞ্চিত করে. symbol বা বিগ্রহের বিরুদ্ধে কবির এই

অভিযোগ। বিগ্রহ তাই সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্যতম পুষ্প হইলেও, যে বিশ্বসৌন্দর্য্যকে চায় সে তাহাকে পরিহার করিয়া জীবনের দিকে আরও ছুটিয়া যাইবে,—নব নব সৌন্দর্য্য আবিষ্কারে। আবার বিগ্রহ যখন মানুষের আকার ধারণ করিয়া নিবিড় প্রণয়-বন্ধনে মানুষকে বাঁধে, তখনও বিশ্ব লুক্কায়িত হয়, তখন আবার বৃহৎ জীবনের আহ্বানে তাহাকেও ত্যাগ করিয়া মানুষ নব নব বেদনাময় অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া যাত্রা করিতে থাকে। বিগ্রহ বিশ্বেরই বিগ্রহ; অথচ বিগ্রহ বিশ্বেরই স্থান জুড়িয়া বসে।

A. E.'র সমস্ত কবিতা এই "Earth-Breath" এই বিশ্বনিশ্বাসে নিশ্বসিত।

বিশ্বকে তিনি মা বলিয়াছেন; আমরা তাহার সন্তান। অথচ বিশ্বে ও আমাতে অভেদ, তিনি স্বীকার করেন। কারণ আত্মা আপনিই আপনার সাক্ষী এবং আপনিই আপনার আশ্রয়। বিশ্বাত্মাতে জীবাত্মাতে এই তো অদ্বৈত যোগ; আবার এই তো দ্বৈতলীলা। নিম্নলিখিত কবিতাটিতে এই ভাবটি ফুটিয়াছে।

THE PLACE OF REST.

The soul is its own witness and its own Refuge

Unto the deep the deep heart goes,
It lays its sadness nigh the breast :
Only the Mighty Mother knows
The wounds that quiver unconfessed.
It seeks a deeper silence still ;
It folds itself around with peace,
Where thoughts alike of good or ill
In quietness unfostered cease.
It feels in the unwounding vast
For comfort for its hopes and fears :
The Mighty Mother bows at last ;
She listens to her children's tears.
Where the last anguish deepens there
The fire of beauty smites through pain :
A glory moves amid despair,
The Mother takes her child again.

গভীর হৃদয় গভীরে যায়; গভীরের বক্ষেই সে তার ব্যথাটিকে রাখে।
তাহার ক্ষতগুলি যে অব্যক্ত হইয়া কাঁপিতে থাকে;
সেখবরটি কেবল বিশ্বমাতাই জানেন।
হৃদয় যে আরও নিবিড়তর শান্তির প্রার্থী;
সে যে শান্তির শতপাকেই আপনাকে জড়ায়।
তাহার ভাল বা মন্দের সকল চিন্তাই সেই শান্তির মধ্যে
অলালিত হইয়া নির্ব্বাণ পায়।
সেই অক্ষত অনাহত ভূমার মধ্যে তাহার সকল আশাভয়ের
এতটুকু সান্ত্বনার জন্য সে হাতড়িয়া মরে।
বিশ্বমাতা অবশেষে তাঁর মাথাটি নোয়ান,
অবশেষে তাঁহার সন্তানদের ক্রন্দন তিনি শুনিতে পান।
হৃদয়ের শেষ অন্তর্দাহ যখন হৃদয়ে নিবিড়লীন হয়,
তখনই সেই বেদনার বক্ষ চিরিয়া সৌন্দর্য্যের অগ্নি ছুটে।
নৈরাশ্যের মধ্যে একটি গৌরব জাগিয়া উঠে;
মাতা পুনরায় তাঁহার সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করেন।

বিশ্বের সঙ্গে মানুষের আত্মার ঐক্যের সম্বন্ধে এই কবি যেমন নিঃসংশয়, তেমনি সেই ঐক্য যে বিচিত্র অনৈক্যের বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতর দিয়া, সেই মিলন যে বিচিত্র বিরহের ভিতর দিয়া তবেই পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে, এ সম্বন্ধেও কবির মনে কোন সংশয় নাই। মিলনের স্বর্গ তাই তাঁহার কাঙ্ক্ষিত নয়; বিরহের অশ্রুজলসিক্ত মর্ত্ত্যই তাঁহার কাম্য-লোক। "The Man to the Angel" নামক তাঁহার এক কবিতায় মানুষ দেবতাকে বলিতেছে :—

I have wept a million tears.
Pure and proud one, where are thine ?
What the gain, though all thy years
In unbroken beauty shine ?

আমি কোটি কোটি অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিয়াছি।
হে পবিত্র, হে গর্ব্বিত দেব, তোমার চোখে অশ্রু কোথায়?
তোমার সুদীর্ঘ জীবন অম্লান সৌন্দর্য্যে দীপ্যমান হইলেও
তাহাতে তোমার কি লাভ হইয়াছে?

All your beauty cannot win
Truth we learn in pain and sighs :
You can never enter in
The circle of the wise.

যে সত্য আমরা বেদনায় ও দীর্ঘনিশ্বাসে জানি, তোমার সকল
সৌন্দর্য্য তাহাকে আহরণ করিতে পারে নাই;
জ্ঞানীদের জ্ঞান মণ্ডলের মধ্যে তোমার ত কোন প্রবেশ নাই।

... ...

Think not in your pureness there
That our pain but follows sin :
There are fires for those who dare
Seek the throne of might to win.

তুমি শুভ্র বলিয়া মনে ভাবিয়োনা যে আমাদের
এখানকার বেদনা কেবল পাপানুসারী ও পাপভাক্;
আমাদের মধ্যে যাহারা সেই পরম শক্তির সিংহাসনকে জয় করিতে
সাহসী হয়, তাহাদের জন্য অগ্নিও আছে জানিয়ো।

Pure one, from your pride refrain :
Dark and lost amid the strife,
I am myriad years of pain
Nearer to the fount of life.

হে পবিত্র, গর্ব্ব হইতে বিরত হও।
এই যে জীবনের দ্বন্দ্বের মধ্যে আমি অন্ধকারে পথভ্রান্ত,
এই আমার লক্ষ লক্ষ বৎসরের বেদনার জীবনেই,
আমি তোমার চেয়ে জীবনের উৎসের অধিকতর নিকটে আছি।

When defiance fierce is thrown
At the God to whom you bow
Rest the lips of the unknown
Tenderest upon my brow.

যে ঈশ্বরের কাছে তুমি নিত্যনত,
ভীষণ অবজ্ঞা যখন আমি তাঁর প্রতিই নিক্ষিপ্ত করি,
তখনই আমার দৃপ্ত ললাটে
সেই অজানার কোমলতম ওষ্ঠস্পর্শ আমি অনুভব করি।

এই বেদনাকেই কবি এ,ই, তাঁহার দেবতা বলিয়াছেন। এই বেদনাই সৃষ্টির মূলে। এক যেখানে লীলায় বহু, সেখানে জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া নানা জয়-পরাজয়ের ভিতর দিয়া এই বেদনারই ত নিত্য নব লীলা। অথচ অদ্বৈতবাদী যাহাকে মায়া বলেন, কবি এ,ই, তাহাকে অস্বীকার করেন না। অদ্বৈতকে মানিতে গেলেই মায়াকে না মানিয়া উপায় নাই। যাহা প্রাতিভাসিক ও নামরূপাত্মক তাহাকেই বাস্তবিক ও নিরুপাধিক সত্য মনে করিয়া আমরা ভ্রম করি। কিন্তু সেই সত্যকে যখন অদ্বৈত বলিয়া জানি, তখন সেই জ্ঞানের চরম আনন্দের অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়া আমাদের কি আর বন্ধন থাকে না, বেদনা থাকে না? সেই তাদাত্ম্য, সেই ব্রাহ্মীস্থিতি, তাহাই কি বাস্তবিক চরম অবস্থা? কবি তাহা মানেন না। সেই তাদাত্ম্যের আনন্দ পুনরায় বেদনায় দ্বিধা হয়, সেই স্থিতি পুনরায় বেদনার নব নব গতিতে নব নব চক্রপথে ভ্রমিতে থাকে। The Veils of Maya কবিতায় ইহাই কবি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন :—

THE VEILS OF MAYA.

Mother, with whom our lives should be,
Not hatred keeps our lives apart :
Charmed by some lesser glow in thee,
Our hearts beat not within thy heart.
Beauty, the face, the touch, the eyes
Prophets of thee, allure our sight
From that unfathomed deep where lies
Thine ancient loveliness and light.
Self-found at last, the joy that springs,
Being thyself, shall once again
Start thee upon the whirling rings
And through the pilgrimage of pain.

মা, আমাদের জীবন ত তোমাতেই সঙ্গত হইবে; ঘৃণা তো আমাদিগকে তোমা হইতে পৃথক করে নাই।

কিন্তু তোমারই হীনতর মায়ার উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হইয়া আমাদের হৃদয় আর তোমার হৃদয়ে স্পন্দিত হয় না।

তোমার বাণীর উদ্গাতা যারা—সেই সৌন্দর্য্য, সেই মধুর বদন, নয়ন, স্পর্শ—

যে অতলস্পর্শ গভীরে তোমার শাশ্বত পুরাতন সৌন্দর্য্য ও আলোক প্রচ্ছন্ন, তথা হইতে আমাদের দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করিয়া আনে।

অবশেষে আত্মস্থিত হইয়া তোমাতে তন্ময় হইয়া যে পরমানন্দ উপজিত হয়,

জানি, সেই আনন্দই আবার তোমাকে ঘূর্ণামান চক্রে ঘুরাইবে; আবার বেদনার পথের পথিক করিয়া বাহির করিবে।

আধুনিক কোন কবিরই কাছে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য কোন কবির বা মনীষীর কাছে, সেই ঈশ্বরতত্ত্বের কোন মূল্য নাই যাহা ঈশ্বরকে একেবারে চিরশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত পূর্ণস্বরূপ ভাবে আর এই জগৎকে অশুদ্ধ, অবুদ্ধ, বদ্ধ, অপূর্ণ জগৎ বলিয়া জানে। অথচ জগৎ ও ঈশ্বর এক, উভয়ে কোন দ্বৈত নাই—ইহা সত্য বলিয়া মানিলেও, জগতের মধ্যে যদি অশুদ্ধি বন্ধন ও অপূর্ণতা প্রাতিভাসিক বা ব্যবহারিক দিক হইতেও থাকে, তবে ঈশ্বরের মধ্যেও তাহা আছে, এই কথাই সাহসপূর্ব্বক বলিতেই কবি এ,ই',র মনের ষোল আনা ঝোঁক। সমাজের অভিব্যক্তির সঙ্গে-সঙ্গে ধর্ম্মতত্ত্বেরও অভিব্যক্তি ঘটিতেছে। সুতরাং এখন যখন সমস্ত বিশ্বমানব ও বিশ্বজগৎকে এক বলিয়া আমরা জানিতেছি, এবং জানিতেছি যে ইহা সমষ্টিগত ভাবেই ভাঙাগড়া উত্থানপতনের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ সেই আপন অখণ্ড-স্বরূপকেই উদ্ঘাটিত করিতে চলিয়াছে, তখন ঈশ্বরও নিশ্চয় এই সমষ্টিগত বিশ্বমানব ও বিশ্বজগতের ভাঙাগড়া উত্থান-পতনের সঙ্গে-সঙ্গে চলিতেছেন। কারণ বিশ্বমানব ও বিশ্বজগতের অখণ্ডস্বরূপ তো তিনিই। সুতরাং বিশ্ব অপূর্ণ হইলে, তিনি কেমন্ করিয়া স্থির হইয়া পূর্ণ হইয়া থাকেন? তিনি Becoming God, তিনি Suffering God। পাশ্চাত্যদেশে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এই এক নূতন ধারণা উপস্থিত হইয়াছে। কবি এ,ই, পাশ্চাত্য এই ধারণার সঙ্গে আমাদের প্রাচ্যদেশীয় অদ্বৈততত্ত্বের ধারণাকে এক রকম করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন। ঈশ্বর অদ্বৈত এক, অখণ্ড, পরিপূর্ণ হইলেও সৃষ্টিতে তিনি খণ্ডিত, অপূর্ণ, সুতরাং বেদনাশীল। আমরাও তাই সেই খণ্ড খণ্ড বিচিত্র বেদনাময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই একে পৌঁছিতেছি; পৌঁছিয়া আবার নূতন বিচিত্র বেদনায় খণ্ডিত হইতেছি। 'The Veils of Maya' কবিতার ইহাই ভিতরকার কথা।

'The Vesture of the Soul' বা 'আত্মার পরিচ্ছদ' কবিতায় তিনি ঐ কথাটিই আরেক ভাবে বলিয়াছেন। কবি বলিতেছেন, আত্মার পরিচ্ছদ শত-তালিযুক্ত ছিন্ন বস্ত্র, ধূলি ও বৃষ্টির দ্বারা মলিন। কিন্তু সেই পরিচ্ছদই আকাশের আলোকের ক্ষেত্রের উপর দিয়া লুটাইয়া চলে। তাহারি ভাঁজে ভাঁজে তারা সাজে, আনন্দের নিশ্বাস তাহাকেই কম্পিত করে।

এক-রকমের শান্তির সাধনা ও শান্তিনিষ্ঠা আছে, যাহা দ্বন্দ্ব, সংশয়, প্রভৃতি সকল অশান্তির কারণকে দূরে

রাখিতে চায়। কবি সেই Passivist বা Quietist নিষ্কর্ম্মা শান্তিনিষ্ঠার কোন ধারই ধারেন না। ইহার উল্টা সাধনা, কেবলি দ্বন্দ্ব, কেবলি সংগ্রাম করিয়া জয়লাভের সাধনা। কবি এই প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোন সাধনাকেই বড় বলেন নাই। তাঁহার Three Counsellors বা তিন মন্ত্রী কবিতাটি তার সাক্ষী। কবিতাটি এইরূপ :—

It was the fairy of the place,
Moving within a little light,
Who touched with dim shadowy grace
The conflict at its fever height.

একটি ছোট্ট আলোর মধ্যে একটি পরী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল ;
সংগ্রামের জ্বর-তাপ যখন অত্যুগ্র হইয়া উঠিল,
তখন সে তাহার অস্পষ্ট, ছায়াময়, শ্রীহস্তের দ্বারা একবার তাহাকে
স্পর্শ করিল মাত্র।

It seemed to whisper "quietness"
Then quietly itself was gone :
Yet echoes of its mute caress
Were with me as the years went on.

সে যেন অস্ফুটস্বরে বলিল—"শান্তি"।
তারপর নিঃশব্দে কখন্ চলিয়া গেল।
তার সেই মূক আদরের বাণীর প্রতিধ্বনি দীর্ঘকাল ধরিয়া
আমার মনে রহিয়া গেল।

It was the warrior within
Who called "awake, prepare for fight :
Yet lose not memory in the din :
Make of thy gentleness thy might :

Make of thy silence words to shake
The long-enthroned kings of earth :
Make of thy will therefore to break
Their towers of wantonness and mirth."

আমার ভিতরের যোদ্ধা আমাকে ডাকিয়া বলিল—
"জাগো, সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও।
সংগ্রামের কোলাহলে স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়ো না—
তোমার নম্রতাকেই তোমার শক্তি কর।
তোমার শুদ্ধতা হইতে এমন বাণী বাহির কর
যাহা পৃথিবীর প্রাচীন সিংহাসনারূঢ় রাজন্যবর্গকে কম্পান্বিত
করিতে পারে।

তোমার ইচ্ছা হইতে এমন শক্তি বাহির কর
যাহা তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও লঘু আমোদের রাজপ্রাসাদকে
চূর্ণবিচূর্ণ করিতে পারে।

It was the wise all-seeing soul
Who counselled neither war nor peace :
Only be thou thyself that goal
In which the wars of time shall cease.

জ্ঞানী, সর্ব্বদ্রষ্টা আত্মা যুদ্ধ কিংবা শান্তি, কোনটাই আশ্রয় করিতে পরামর্শ দিল না।
সে শুধু বলিল 'তুমি নিজেই সেই গম্যস্থান হও, যেখানে কালের সকল সংগ্রাম অবসান লাভ করিবে।'

অনেক পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদের দেশের কবি ও লেখকদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, প্রাচ্য আদর্শ পাশ্চাত্য কবির মনে তুল্য প্রভাব বিস্তার করিতেছে, ইহা দেখিলে কি আনন্দ হয় না? Veils of Maya, OM (ওঁ), প্রভৃতি কবিতা পাঠ করিবার সময়, সেই আনন্দই বারম্বারই অনুভব করিয়াছি। ভাবের এই আদানপ্রদান সাহিত্যে যতই হইবে, ততই সাহিত্যে নূতন নূতন রস দেখা দিবে।

আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে A, E.'র কবিতা আমাদের দেশের অনেক পাঠকের কাছে তত্ত্বকথা মাত্র বোধ হইবে। যাঁহারা শুধু ছন্দের ঝঙ্কার ও শব্দের রংয়ে একটা ইন্দ্রিয়সুখ বা ইন্দ্রিয়বিভ্রম উৎপন্ন হওয়াটাকেই কাব্যরসের চরম আস্বাদন বলিয়া মনে করেন, আধুনিক অধিকাংশ কবিরই কবিতা তাঁহাদের ভাল লাগিবে না। বোধ হয় গোতিয়ে, বদ্‌লেয়ার প্রভৃতি ফরাসী দেশীয় গুটিকতক কবি ভিন্ন আর কাহারও কবিতা তাঁহাদের মনে ধরিবে না। এখনকার কালের সকল কবিই জীবনটাকে বা জগৎটাকে শুধু বাহির হইতে অলস চোখে ছবি দেখার মত করিয়া দেখেন না—তাহার গভীরতম সমস্যাগুলি, তাহার সমস্ত বিচিত্র ও জটিল দ্বন্দ্ব ও বিরোধগুলি তাঁহাদের চেতনাকে আঘাত করিয়া তাঁহাদের কাছে মীমাংসা দাবী করে। তত্ত্বকে তাই তাঁহারা বাদ দিতে পারেন না। অবশ্য তাঁহারা বিচারবিতর্ক করিয়া দার্শনিকের প্রণালীতে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন না; কিন্তু জীবনের ভিতর হইতে যে তত্ত্ব আপনিই আপনাকে সৃজন করিতেছে, তাহার অনুভূতিকে তাঁহারা কাব্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই জগৎ সম্বন্ধে, এই জীবন সম্বন্ধে, ঈশ্বর সম্বন্ধে, নরনারীর সম্বন্ধ বিষয়ে, কোন্ কবির কি বলিবার আছে, তিনি কোন্ দিক্ হইতে এই-সকল চিরন্তন সত্যকে দেখিতেছেন, তাহাই আমরা তাঁহাদের কাব্যপাঠে জানিতে পারি।

এ,ই,'র কাব্যের সেই তত্ত্বটি কি, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম। এইবার তাঁহার প্রেম সম্বন্ধে গুটিকতক কবিতার পরিচয় দিয়া আজিকার মত শেষ করিব। জগৎ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে, ঈশ্বর সম্বন্ধে এই কবির কি

বলিবার আছে তাহা দেখিলাম। এইবার, নরনারীর প্রেম সম্বন্ধে তাঁহার কি বলিবার আছে তাহা দেখা যাক্।

এখানেও ঐক্যই আপনাকে দ্বন্দ্বের বেদনার ভিতর দিয়া লইয়া চলিয়াছে, ইহাই কবি বলিতে চান। শৈশবে, ঐক্য; যৌবনে দ্বন্দ্ব; এবং প্রেম সেই দ্বন্দ্বের সমাধান খুঁজিয়া ফিরে। একটি কবিতায় কবি বলিতেছেন, "শৈশবের দিনে তুমি আমি ত পৃথক্ ছিলাম না—তোমার আমার হৃদয়ে হৃদয়ে একই প্রাণের নিশ্বাস নিশ্বসিত হইত;……সহসা সেই প্রাণের ইন্দ্রজাল ফুরাইয়া গেল। প্রেম জাগিল, সেই-সব পুরাতন স্বর মিলাইয়া গেল। আর অতিমানবকে আমরা জানিলাম না, এখন হইতে আমি জানি আমি মানব এবং তুমি মানবী।"

এই যে দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছেদ, এই যে একের জন্য অন্যের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয়ের জন্য ইন্দ্রিয়ের কান্না, মনের জন্য মনের টান, আত্মার জন্য আত্মার ব্যাকুলতা—যুগলের এ আকাঙ্ক্ষা মিটে কেমন করিয়া? যুগলের এ দ্বন্দ্ব ঘুচে কেমনে? এখানে তো দেহের পাওয়ায় প্রাণের পাওয়া হয় না, নিকটের পাওয়ায় দূরের পাওয়া হয় না। দেহের টান বরং আত্মার টানকে দূর করে। দেহই সর্ব্বময় হইয়া উঠে। কবি তাই 'At One' নামক একটি কবিতায় বলিতেছেন :—

ওগো মধুর, যদিও আমরা দূরে আছি, তবু অকস্মাৎ তোমার কান্না আমার বুকে এক অশ্রুর উৎসে উচ্ছলিয়া উঠে। কখনো বা তোমার হাসি আমার অন্তরে সোনার কিরণে ঝলসিয়া পড়ে।

সেই গুপ্ত উৎসের উপর ঝুঁকিয়া কানে কানে কত আদরের কথা পাঠাই। যদি কাছে থাকিতে, বাহুবেষ্টনে ধরা দিতে, তবু কি এমন কোমল সুরে এমন মধুর বাণী বলিতে পারিতাম?

আমি যে অনুভব করি দূরে থাকিলেই তোমার প্রেমের হর্ষ আমার প্রেমকে আলো করে। তাই তুমি কাছে এস তাহা চাই না।

যে স্তব্ধতায় আমরা মিলি—যে স্তব্ধতায় এক তারা আর-এক তারায় বিলুপ্ত হয়—কি জানি তোমার নয়ন, তোমার ওষ্ঠ যদি তাহাকেই আহত করে!

শুধু যে এই দূরের লীলায় প্রেমের নিবিড়তা জমে, তাহা নয়। আত্মার যে স্বাতন্ত্র্য আছে। এক আত্মার জীবনের গতি অন্য আত্মার জীবনের গতির সঙ্গে কখনই সমান নয়। কত অভাবনীয় পথে, কত সুখদুঃখের ভিতর দিয়া, হয়ত কত জন্মজন্মান্তরে কত লোকলোকান্তরে আত্মা যাত্রা করিবে। শুদ্ধমাত্র এই শরীরের যৌনপ্রবৃত্তির ক্ষণিক আকর্ষণ সেই মহাকালের মহাযাত্রায় কোন্ ক্ষণের মধ্যেই নির্ব্বাপিত, পরিসমাপ্ত হয়। তারপর মনের সঙ্গে মনের যে যোগ—তাহাই বা থাকে কোথায়? মনও যে কত অবস্থা-পর্য্যায়ের উপর নির্ভর করে। সেই-সকল অবস্থাপর্য্যায় যখন বিপর্য্যস্ত, যখন নূতন অবস্থা নূতন চেতনায় মনকে ভরিয়া তোলে, তখন সেই মনের পূর্ব্ব যোগের স্মৃতির সূত্র কে আর টানিয়া চলিবে? কিন্তু আত্মার যোগ? হাঁ, সেই যোগই চিরন্তন। কিন্তু সে যে ক্রমাগত বিয়োগের ভিতর দিয়া যোগ। এই জগতে, এই জীবনেই তাই প্রেমের বিদায়-সম্ভাষণ বহুবার হয়। প্রেমের বিয়োগাবস্থা হয়—পূর্ণতর যোগাবস্থার জন্য। সে এক পাত্রে, এক আধারেই হয় না; পাত্রে পাত্রে হয়, আধারে আধারে হয়।

Ah! my bright companion, you and I must go
Our ways, unfolding lovely glories, not our own,
Nor from each other gathered, but an inward glow
Breathed by the Lone One on the seeker lone.

হায়! হে আমার সমুজ্জ্বল সঙ্গিনী, আমরা ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিব—
কত নির্জ্জন মহিমাকে উদ্ঘাটিত করিতে করিতে চলিব—।
সে-সকল মহিমা আমাদের নয়, তাহাকে আমরা পরস্পর হইতে সংগ্রহ করি নাই।
কিন্তু সেই যে একক এক, তিনিই একক সাধকের মনে এক দীপ্তি সঞ্চার করিয়া দেন।

If for the heart's own sake we break the heart, we may
When the last ruby drop dissolves in diamond light
Meet in a deeper vesture in another day.
Until that dawn, dear heart, goodnight, good night.

যদি হৃদয়ের নিজের জন্যই আমাদের হৃদয়কে ভঙ্গ করিতে হয়, হয়ত তাহাই হইবে।
এই চুনির শেষ স্বর্ণবিন্দুটি যখন হীরকের শুভ্র আলোয় মিলাইয়া যাইবে—
তখন আরেকদিন আরেক নিবিড়তর পরিচ্ছদে হয়ত আমরা মিলিব।
সেই পরম প্রত্যূষ না আসা পর্য্যন্ত, হে প্রিয়তমে, বিদায়! বিদায়!

অদ্বৈত আত্মতত্ত্বে যুগলের দ্বৈততত্ত্বের স্থান থাকে না। কারণ, দ্বৈত সত্য নয়। কিন্তু যুগল প্রেমের মত মানুষের জীবনের এত বড় একটা সত্যকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কোন মতেই চলে না। যুগল প্রেমের বিচ্ছেদ আছেই, কিন্তু তাহা পূর্ণতর ঐক্যেরই প্রতীক্ষা রাখে। যুগল আত্মা সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে, একদিন সেই 'পরম প্রত্যূষে,' আত্মার পূর্ণতারই পরম প্রত্যূষে, পুনরায় মিলিত হইবে—কবি এই আশ্বাস দিয়া তাঁহার প্রেমের কবিতাটি শেষ করিয়াছেন। দান্তে ও ব্রাউনিং ভিন্ন আর কোন কবিই প্রেমের এত বড় আশ্বাসবাণী আমাদিগকে শুনান নাই।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

রুশিআ কেমন ছিল ?

(ছবি)

সূর্য্য-সমুজ্জ্বল দিন। সেন্টপিটার্সবার্গের জনতাময় পথ। সহসা পিস্তলের শব্দ হইল। এক সশস্ত্র সুবেশ-মণ্ডিত সুপুরুষ সৈনিক-কর্ম্মচারী বুকে গুলি খাইয়া পড়িয়া গেল। গুলি যে ছুড়িয়াছিল সে ধরা দিল। পালাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিল না। তার নাম অ্যানা।

সে সুন্দরী। সর্ব্বাঙ্গে তার যৌবনের হিল্লোল। মুখখানি বড় কচি, হাত দুখানি ফুলের মত। চোখ আকাশের মত নীল, অধর সূর্য্যাস্তের মত রক্তিম।

এ-ও এমন কাজ করিতে পারে? সকলে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল।

অ্যানার মন ভুলাইয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া যে তাহাকে কাপুরুষের মত ত্যাগ করিল তাহাকে কেমন করিয়া ক্ষমা করা যায়!

তাইতো অ্যানা এমন কাজ করিয়াছে।

যাহাই হোক আঘাত গুরুতর হয় নাই, সে-যাত্রা সেনানায়ক বাঁচিয়া গেল। জজেরা দয়া করিয়া অ্যানাকে কেবলমাত্র একশো ঘা বেত মারিতে হুকুম দিলেন।

বেত খাইয়াও যে বাঁচিয়া থাকে তাহাকে সাইবিরিয়ায় জীবন্ত কবর দেওয়া হয়—সভ্য ইউরোপের সঙ্গে তার আর কোনো সংশ্রব থাকে না—এক-রকম তার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

সুন্দরী অ্যানা শুনিল, কোমল পৃষ্ঠে একশো ঘা কোড়া খাইবার পরও যদি সে বাঁচিয়া থাকে তবে তাহাকে কোপাল দুর্গে নির্ব্বাসিত করা হইবে। সেখানে পুরুষ অনেক আছে, ইচ্ছা করিলে সে বিবাহ করিয়া ঘরসংসারও পাতিতে পারে।

এই কোপাল দুর্গ মধ্য-এসিয়ার এক সমুচ্চ পাহাড়ের ধারে অবস্থিত। আশে-পাশে দিগন্তবিস্তৃত মরু-প্রান্তর, বৃক্ষ-গুল্ম তৃণপত্র কিছুই নাই। ক্রোশের পর ক্রোশ চলিয়া যাও, এক ফোঁটা জল মিলিবে না। দুর্গ-মধ্যে রুশ সেনানায়ক ও তাঁর সৈনিকেরা থাকে। বৎসরে কেবল দু-বার কশাক অশ্বারোহীর দল কোপালের অধিবাসীদের জন্য—আহার্য্য, মদ ও চিঠিপত্র আনিতে যায়।

এ-হেন সুন্দর স্থানে অ্যানাকে লইয়া আসা হইল প্রথমে তাহাকে একশো ঘা কোড়া মারা হইবে। কোমল প্রাণ একটি মেয়ে! শুধু বেতের ঘায়েই তার প্রাণ বাহির হওয়া আশ্চর্য্য নয়; তারপর যখন জেল-দারোগা তার গায়ের আবরণ টানিয়া ফেলিয়া দ্যায় এবং নিকটবর্ত্তী কশাককে তার দুই হাত পিছন দিকে টানিয়া বাঁধিবার হুকুম দ্যায় — তখন, তখনও সে বাঁচে কেমন করিয়া!

সাহসী অ্যানা দারুণ ঘৃণায় অপমানে ভয়ে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ভূমির উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। তার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। জেল-দারোগা তাহার গলাবন্ধটা টানিয়া ফেলিয়া দিল। অ্যানা এমন চীৎকার করিয়া উঠিল যেন জ্বলন্ত লোহা তার দেহ স্পর্শ করিয়াছে!

জেল-দারোগা ডাকিল—টোবোরগা!

কশাকের দল হইতে একজন কশাক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অ্যানা তাহাকে দেখিয়া দুই হাত দিয়া প্রাণপণ বলে বুকের কাপড় চাপিয়া ধরিয়া রহিল।

জেল-দারোগা হাঁকিল—"ওর হাত দুটো ধর! দেখো হুঁসিয়ার, যেন না কামড়ায়!"

কশাক বজ্রমুষ্টিতে অ্যানার তুষারধবল পুষ্পকোমল হাত দুখানি চাপিয়া ধরিল।

অ্যানা হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল না। বড় বড় করুণ চোখ দুটি তুলিয়া সৈনিকের চোখের উপর রাখিল। কশাক মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল। সেই সুন্দর চোখের বেদনাভরা মিনতিভরা চাহনিতে বনের পশু বশ হয়, কশাক তো কোন্ ছার!

জেল-দারোগা পুনরায় যখন অ্যানার পোশাকে হাত দিল টোবোরগা বলিয়া উঠিল—"ওকে ছোঁবেন না, ছোঁবেন না, আমি ওর অর্দ্ধেক শাস্তি নেব।"

জেল-দারোগা যেন আকাশ থেকে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল—"কোন্ অধিকারে?"

"আমি ওকে বিয়ে করবো। আপনি তো জানেন স্বামী স্ত্রীর শাস্তির ভাগ নিতে পারে।"

"ঠিক কথা। আচ্ছা জামা খোলো। এর জন্যে অনেক দুঃখ পেতে হবে, মনে থাকে যেন!"

টোবোরগা কোমর পর্য্যন্ত অনাবৃত করিল। তার

হাত দুখানি পিছন দিকে টানিয়া বাঁধা হইল, পায়ে বারো সের ওজনের লোহার গোলা বাঁধিয়া দেওয়া হইল পাছে স্থির হইয়া বেত না খায়! জেল দারোগা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায়। দুই হাতে কোড়া ঘুরাইয়া প্রাণপণ শক্তিতে এক-একবার আঘাত করিয়া বলে—"কি হে! এখনো সুন্দরী লাভের আশা! সুন্দরী বৌ বিয়ে করবে না? এইবার বিয়ের নাচ আরম্ভ হল বলে! কেমন মজা!"

টোবোরগা প্রাণপণে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া রহিল, পাছে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠে।

যে-লোকটি তাহার শাস্তির অংশ লইয়াছে তাহার দেহ হইতে টপ টপ করিয়া রুধির-ধারা ঝরিতেছে। সপাং-সপাং অবিরাম বেত পড়িতেছে। অ্যানা যতই দেখিতেছিল ততই তার চেতনা যেন লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। পঞ্চাশ ঘা হইয়া গেল। টোবোরগা বলিল—"আরো দশ ঘা মার।"

"ওঃ বড্ড সাহস যে! আচ্ছা থাম! বেশ ভালো করে' দশ ঘা লাগাই!"

অ্যানার দম বুঝি বন্ধ হইয়া যায়। এক-এক ঘা পড়ে আর তার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয়। যাট ঘা হইয়া গেল। কশাক বলিল—"আর দশ ঘা।"

জেল-দারোগা উন্মত্ত হইয়া বেত চালাইতে লাগিল। হিংস্র জন্তুর মত, সয়তানের মত সে টোবোরগাকে আক্রমণ করিল। টোবোরগা বিচলিত হইল না; নীরবে সব সহ্য করিল। অ্যানার ভাগে এখনো ত্রিশ ঘা বাকী মজুত! মঞ্চের উপর হইতে টোবোরগা দেখিল অ্যানা সংজ্ঞাহীনের ন্যায় সম্মুখে চাহিয়া রহিয়াছে। জড়িত কণ্ঠে সে বলিল—"আর দশ ঘা।" সে দশ-ঘা মারা হইল। তারপর মরণপাংশু মুখে সে বলিল—"আরো দশ!" নব্বুই ঘা বেত খাইবার পর আর তাহার কথা কহিবার শক্তি নাই। দেহ নির্জীব, চক্ষু মুদ্রিত, নিশ্বাস পড়ে কি না পড়ে।

জেল-দারোগা জিজ্ঞাসা করিল—"কিহে বাবাজি! সুন্দরীর জন্যে বাকী দশ ঘা খাবে নাকি?"

সে মাথা নাড়িয়া বলিল—"হ্যাঁ।"

সহসা অ্যানা মাটি হইতে লাফাইয়া উঠিল। দুই হাত দিয়া বুকের আবরণ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া টোবোরগার রুধিরাক্ত দেহ আবৃত করিল। আপনার অনাবৃত পরিপূর্ণ কোমল শুভ্র দেহ দিয়া কশাকের দেহ আবৃত করিয়া পাগলের মত সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো শেষ দশ ঘা আমায় মারো। আমায় মারো। আমার ব্যথার ব্যথী এই অপরিচিতই আমার স্বামী আমার দেবতা! ওগো আমার স্বামীকে বাঁচতে দাও। স্বামী-হত্যার পাতক থেকে আমায় বাঁচাও।" *

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভালোর লোভ

তোমার মুখে চাহিয়াছিনু, তাইতে হল রোষ,
ভালো আমার ভালোই লাগে এই ত আমার দোষ।
মেলে আমার আকুল আঁখি
যদিই বারেক চেয়েই থাকি,
তাতেই তোমার কিই বা হল এমন বিশেষ ক্ষতি,
চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে ব্যাকুল বসুমতী!
একটি কুসুম ফুটলে গাছে
ভ্রমর গাহে কানের কাছে,
গন্ধ যেথায় বাতাস সেথায় চুরির আশায় ফিরে,
উষার প্রকাশ হাজার হাজার পাখীর গানে ঘিরে।
ভালো আমার ভালোই লাগে,
দেহ ও মন তারেই মাগে
এ কথা মোর করতে স্বীকার নাইকো কিছুই লাজ,
তোমার সাড়া পেলেই ছুটি ফেলে হাতের কাজ!
রুধব আঁখি সাধ্য বা কি,
তুমি ছাড়া তুচ্ছ বাকী;
সকল ফেলে কেবল তোমায় দেখতে আছি রাজি,
তোমায় পেলে সংসারেরে বিদায় দেবো আজই!
ভালোর লোভে লুব্ধ যেজন,
ভালোর তরেই তার আয়োজন;
ইহার তরে তাহার পরে রাগ করাই কি চলে—
মন্দ লাগে মন্দ, ভালো ভালোই লাগে বলে?

বিশ্রী।

---

* ইংরেজি হইতে।

দুই তার

(২)

বীরেন্দ্রের বয়স যখন আঠারো বৎসর তখন তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাহাদের যে সামান্য জমিজমা ছিল তাহারই উপস্বত্ব হইতে তাহাদের সচ্ছল ভাবেই চলিয়া যাইত; এজন্য বিধবা হইয়াও বীরেন্দ্রের মাতা নিতান্ত নিরাশ্রয় বোধ করেন নাই। বীরেন্দ্র লেখাপড়া শিখিতেছে; এই বয়সেই সে বি-এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছে; শীঘ্রই বড় ও বিদ্বান হইয়া উপার্জ্জনক্ষম হইয়া উঠিবে; এই ভরসাতেই তাহার মাতা একাকী ছেলেটিকে লইয়া স্বামীর ভিটায় পড়িয়া থাকিবেন আশা করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহাকে অভিভাবকহীন দেখিয়া গ্রামের জমিদার গুণময় চৌধুরীর আয় বৃদ্ধি করিবার লোভ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। গুণময় চৌধুরী ছুইটা বড় বড় পরগনার যোল আনির মালিক; তাঁহার পরগনা ছটির নাম হইতেই তাঁহার জমিদারীর আয়তনের আন্দাজ পাওয়া যায়—একটি পরগনা ঘোড়ামারা, অপরটি হাতীকান্দা, অর্থাৎ এমুড়া হইতে ওমুড়া যাইতে ঘোড়া মারা পড়ে এবং অমন যে বলিষ্ঠ হাতী সেও কাঁদিয়া ফেলে। তাঁহার সংসারে মাত্র তিনটি প্রাণীর খরচ—তিনি, তাঁহার স্ত্রী দয়াদেবী ও কন্যা মায়া। সুতরাং তাঁহার প্রয়োজন অধিক হইবার কথা নয়। কিন্তু তাঁহার মনের খাঁই আর কিছুতেই মিটিত না। নানা-প্রকারে আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা সময়ে-সময়ে এমন উৎকট-রকমে প্রবল হইয়া উঠিত যে তখন তাঁহার আর ধর্ম্ম অধর্ম্ম জ্ঞান থাকিত না। তাঁহার প্রজাশাসন ও খাজনা-আদায়ের কড়াকড়ি এমন বিষম যে তাঁহার প্রজারা তাঁহার নামের গ ও ম অক্ষর-ছুইটা একটু টানিয়া একটু বিশেষ শ্লেষের সুরে এমন করিয়া উচ্চারণ করিত যে তাঁহার নাম শুনিয়াই লোকে বুঝিতে পারিত তাঁহার গুণ কত।

এইসব অকাজে গুণময়ের প্রধান সহকারী জুটিয়াছিল নায়েব পঞ্চানন; লোকে তাহাকে আদর করিয়া পেঁচো বলিয়া ডাকিত এবং সেই আদরের ডাকের অবস্থাবিশেষে তিন-রকম মানে হইত—প্রথম, লক্ষ্মীর বাহন স্বনামধন্য পক্ষী; দ্বিতীয়, অসহায় দুর্ব্বল শিশুর মারাত্মক প্রেত-ব্যাধি; এবং তৃতীয়, যে-লোকের মধ্যে প্যাঁচের অন্ত নাই। পঞ্চানন ওরফে পঞ্চু পাঁচু বা পেঁচো আকারে লম্বা কৃশ ফর্সা; তাহার শুক্‌নো তোবড়ানো মুখের মাঝে বঁড়শীর মতন চোখা বাঁকা নাকটা তাহার তীক্ষ্ণ কুটিলতা ও নির্দ্দয়তারই যেন জয়ধ্বজা। লোকে এইজন্য তাহাকে আর-এক নাম দিয়াছিল নাকেশ্বরী—কিন্তু নামটা যে কেন স্ত্রীলিঙ্গবাচক হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

পঞ্চানন সামান্য গোমস্তা হইতে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই সদর নায়েব হইয়া উঠিতে পারিল কেমন করিয়া তাহার একটু সামান্য ইতিহাস আছে।

গুণময় চৌধুরীর জীবনের মধ্যে প্রধান সথ ছিল তাঁহার চিরযৌবন অক্ষয় রাখার সতত জাগ্রত চেষ্টা। শত্রুপক্ষের নিন্দুক লোকেরা রটাইত বটে তাঁহার বয়স ষাটের কোটায় পৌঁছিয়াছে, কিন্তু তিনি নিজে যাহা বলিতেন তাহাতে আজ বিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার বয়স সাঁইত্রিশ হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত বার বার উঠানামা করিতেছে, ভদ্রলোকের এক কথা বলিয়া বয়স সম্বন্ধে তাঁহার কথার বিশেষ কিছু নড়চড় হয় নাই; এবং পাছে নিজেরই গোঁপ-দাড়ি তাঁহার মুখেরই উপর তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বানাইয়া দ্যায় এই ভয়ে মাসে একবার করিয়া তাঁহার নামে এবনি-ব্ল্যাকের ভিপি-পার্শেল আসিত; তাহার ফলে তাঁহার চুল আর গোঁপ কখনো বা ভ্রমরকৃষ্ণ এবং কখনো বা লোহার মরিচার ন্যায় লালচে-কালো বা কালচে-লাল রং ধারণ করিত। তিনি সকল বুড়াকেই সমীহ করিয়া চলিতেন; হাজার হোক তাহারা বয়সে বড় ত। যুবাদের গলা ধরিয়া ইয়ার্কি দিবার ব্যগ্রতা তাঁহার প্রবল ছিল, এবং যে যুবা সাহস করিয়া তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া নিজের সমবয়সী বলিয়া স্বীকার করিতে পারে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় জমিদারের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, জমিদারী সেরেস্তায় তাহার একটা হিল্লে লাগিয়া যায়।

ধূর্ত্ত পঞ্চু এই সুযোগটিকে অবলম্বন করিয়া জমিদারী সেরেস্তায় একটি গোমস্তার কাজ পাইয়াছিল; তারপর গুণময়ের বয়স যে-পরিমাণে কমিতেছিল সেই-অনুপাতে নিজের বয়স চটপট বাড়াইয়া ও জমিদারের

সকল অত্যাচারের সমর্থন ও সাহায্য করিয়া পাঁচু ক্রমে জমিদারের সদর-নায়েব ও দক্ষিণ হস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি যে যুবা ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য গুণময়ের মধ্যে মধ্যে বিবাহ করিবার ঝোঁক চাপিত। পাঁচু তাঁহার এই সখেরও যেমন পোষকতা করিত এমন আর কেহ নহে। কিন্তু অন্দরে তাঁহার স্ত্রীর কান্নাকাটিতে ও তর্জ্জনগর্জ্জনে ভয় পাইয়া গুণময় বহুদিন তাঁহার সাধ মিটাইবার সুযোগ পান নাই। অকস্মাৎ পাঁচু তাঁহার সম্মুখে এমন এক প্রলোভন আনিয়া উপস্থিত করিল যে তাঁহার স্ত্রীর মায়া ও ভয় সমস্তই চাপা পড়িয়া গেল।

হরেন্দ্র রায়ের ও গুণময়ের পূর্ব্বপুরুষ একসঙ্গেই জমিদারীর পত্তন করেন। তদবধি পুরুষানুক্রম প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরোধে ও শরিকানি মামলায় হরেন্দ্রদের অবস্থা ক্রমে হীন হইয়া পড়িয়াছিল; হরেন্দ্র এখন গুণময়েরই জোতদার প্রজা। কিন্তু গুণময়ের মন হইতে পুরুষানুক্রমের আক্রোশ ইহাতেই মিটে নাই; হরেন্দ্র যে খাড়া হইয়া পবিত্র আপনার ভিটায় বর্ত্তিয়া আছেন ইহাও তাঁহার অসহ্য বোধ হইত; কিন্তু হরেন্দ্র খুব হুঁসিয়ার সাবধানী লোক বলিয়া গুণময়ের আক্রোশ ও পাঁচুর চক্রান্ত তাঁহার কোনো ক্ষতিই করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় পাঁচু খবর পাইল যে হরেন্দ্র তাহাদেরই গ্রামের যাদব হালদারের মেয়ে দয়াদেবীকে বিবাহ করিতে যাইতেছে; হরেন্দ্র দয়াকে ছেলেবেলা হইতে খুব ভালো বাসেন, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্যই তিনি এতদিন অপর কোথাও বিবাহ করেন নাই। পাঁচু গুণময়কে বুঝাইল যে তিনি যদি দয়াকে বিবাহ করিতে পারেন তবে এক ঢিলে দুই পাখী মারা যায়—তিনি একটি সুন্দরী স্ত্রী লাভ করেন এবং হরেন্দ্রকে আশাভঙ্গের দুঃখ দেওয়া ও অপমান করা হয়। গুণময় এই সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পরামর্শ ঠিক হইল যে বিয়ের দিনের আগে এই খবর গুণময়ের স্ত্রী বা হরেন্দ্র কাহাকেও জানিতে দেওয়া হইবে না।

গুণময়ের চর পাঁচু চুপিচুপি গিয়া যাদব হালদারের সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া ফেলিল; মেয়ে রাজরাণী হইবে বলিয়াও বটে এবং জমিদারের প্রসন্নতা লাভের জন্যও বটে, যাদব অতি সহজেই পাঁচুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

বিবাহের দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হরেন্দ্র দয়াদেবী বা গুণময়ের গৃহিণী জানিতে পারেন নাই যে গুণময় দয়াদেবীকে বিবাহ করিবেন। পাছে হরেন্দ্র আসিয়া বিবাহে কোনো প্রতিবন্ধক ঘটান এই ভয়ে গুণময়ের একশো লাঠিয়াল সন্ধ্যার সময় হরেন্দ্রের বাড়ী ঘেরাও করিয়া বসিল; দয়াদেবী চোখের জলের ভিতর দিয়া গুণময়ের সঙ্গে শুভদৃষ্টি করিলেন, এবং গুণময় যখন নূতন শ্বশুরবাড়ীতে বর সাজিয়া শালী-শালাজদের সঙ্গে রঙ্গরসিকতা করিয়া বাসর জাগিতেছিলেন তখন তাঁহার শয়নকক্ষে তাঁহার গৃহিণী চোখের জলে ভাসিতে-ভাসিতে মহানিদ্রার সঙ্কল্প আঁটিতেছিলেন।

পরদিন প্রভাতে জোড়ে বাড়ী ফিরিয়া গুণময় দাসীদের হুকুম করিলেন—গিন্নিকে ডাক্, নতুন বৌকে বরণ করে ঘরে তুলুক।

দাসী ছুটিয়া গিন্নিকে ডাকিতে গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে গো, গিন্নিমা আর নেইগো।

সেই চীৎকার শুনিয়া গুণময় তাঁহার স্থূল দেহ লইয়া যথাসম্ভব দৌড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে নিজের শয়নকক্ষে গেলেন; গাটছড়া-বাঁধা দয়াদেবীকেও বাধ্য হইয়া সঙ্গে-সঙ্গে যাইতে হইল। গিয়া দয়াদেবী দেখিলেন সপত্নীকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিবার ভয়ে গুণময়ের গৃহিণী গলায় ক্ষুর দিয়া মরিয়া আছেন! সমস্ত বিছানায় রক্ত জমিয়া আছে, সর্ব্বাঙ্গে ও ঘরের মেঝেতে রক্ত ছিটাইয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বাঙ্গের আক্ষেপে বিছানাটা যেন বিমথিত হইয়া গিয়াছে! কাল সমস্ত দিন অনাহার, সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা, ও ভালোবাসার পাত্র হরেন্দ্রের সহিত বিবাহ হইবার আনন্দের উপর হঠাৎ নিরাশার দারুণ আঘাত দয়াদেবীর শরীর ও মনকে ক্লান্ত অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছিল; তাহার উপর এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহাতে বিরক্ত হইয়া গুণময় বলিয়া উঠিলেন—গিন্নির মরতেই যদি সাধ হয়েছিল বাপের বাড়ী গিয়ে মরলেই হত! নিজে ত মরলই, নতুন বৌকেও মারলে বুঝি!

নতুন বৌ মরিলেন না। কিন্তু তাঁহার কৃশ দুর্ব্বল শরীরে ও ভাবপ্রবণ মনে যে আঘাত লাগিল তাহা সামলাইয়া তিনি আর কখনো সুস্থ প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। তিনি

চিররুগ্ন হইয়া পড়িলেন; ক্ষীণ দুর্ব্বল শরীর ও শোকার্ত্ত মনে একটু উত্তেজনা তাঁহার সহে না—মন একটু চঞ্চল হইলেই তাঁহার দেহের রক্ত যেন শুকাইয়া যায়, সমস্ত রক্ত হৃদয়ে জমিয়া বুকের মধ্যে ধকধক করে, কিন্তু অতি সুশ্রী বলিয়া রক্তহীন অবস্থাতেও তাঁহাকে শ্বেতপদ্মের কলিকাটির মতন সুন্দর দেখায়। তাঁহার মুখে কেহ কখনো হাসি দেখিতে পায় না, তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠের স্বল্প বাক্যও যেন কান্নার মতন করুণ শুনায়।

এহেন পত্নীকে গুণময় ভয় করিয়া চলিতেন, কখনো সাহস করিয়া তাঁহার কাছে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিতেন না। এজন্য অল্প দিন পরেই আর-একটি বিবাহের ইচ্ছা গুণময়ের প্রবল হইয়া উঠিল; পাঁচু কনে খুঁজিতে লাগিয়া গেল। কনে মিলিতেও দেরী হইল না।

সংবাদটা শুনিয়া হরেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। দয়াদেবীকে না পাইয়া তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন; বাড়ী হইতে বাহির পর্য্যন্ত হইতেন না। এখন দয়াদেবীর সতীন হইবার আশঙ্কায় তিনি ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন; তিনি কনের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বুড়া বরে ও সতীনের ঘরে কন্যা দিতে নিবৃত্ত করিবার জন্য কনের বাপকে অনেক বুঝাইলেন। কনের বাপ বলিয়া বসিলেন—তুমি একটি সুপাত্র জুটিয়ে দাও, আমি গুণময় চৌধুরীকে মেয়ে দেবো না। তুমি ত বিয়ে করনি, তুমিই আমার মেয়েকে বিয়ে কর না?

দয়াদেবীকে না পাইয়া হরেন্দ্র সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কখনো বিবাহ করিবেন না; তিনি বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলে কনের বাপ জেদ ধরিলেন—হরেন্দ্র তাঁহার কন্যাকে বিবাহ না করিলে তিনি গুণময়কেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

তখন অগত্যা দয়াদেবীকে সপত্নীর দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্য সেই কন্যাকে হরেন্দ্রই বিবাহ করিলেন। গুণময় মনে করিলেন তিনি হরেন্দ্রের নির্ব্বাচিত পাত্রী দয়াদেবীকে বিবাহ করিয়া হরেন্দ্রকে যে অপমান করিয়াছিলেন এখন হরেন্দ্র তাঁহার নির্দ্ধারিত পাত্রীকে বিবাহ করিয়া সেই অপমানের শোধ দিলেন। গুণময় অপমানে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।

হরেন্দ্র এমন সাবধানে চারিদিক সামলাইয়া চলিতে লাগিলেন যে গুণময়ের ক্রোধে তাঁহার বিশেষ কিছুই ক্ষতি হইল না।

হরেন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী ও নাবালক পুত্র বীরেন্দ্রকে অসহায় দেখিয়া গুণময়ের এতদিনের চাপা আক্রোশ মাথা তুলিয়া উঠিল; বীরেন্দ্রের মায়ের উপরও গুণময়ের রাগ ছিল দুই কারণে,—তিনি গুণময়কে ত্যাগ করিয়া হরেন্দ্রকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তিনি গুণময়কে বড়ঠাকুর বলিয়া তাঁহার স্বামীর চেয়েও তাঁহাকে বৃদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেন।

পিতা ও মাতার উপর যে আক্রোশ ছিল তাহা যখন বালক বীরেন্দ্রের উপর আসিয়া পড়িল তখন পাঁচু প্রভুর মনোরঞ্জন করিবার জন্য তাহাকে জব্দ করিতে লাগিয়া গেল। পাঁচকড়ি নূতন জরিপ করিয়া প্রমাণ করিল যে হরেন্দ্র অনেক জমি চাপাইয়া ছিপাইয়া খাইতেছিলেন; সেসব জমি সরকারের খাস হইয়া গেল; যেসব জমি বীরেন্দ্রের ভাগে অবশিষ্ট রহিল তাহার সিঅম জমিও আওঅল হইয়া উঠিল; তাহার নূতন বন্দোবস্তে খাজনা বৃদ্ধি ও সেলামী আদায় কড়া-রকমে চলিতে লাগিল; এবং কয়েক সনের খাজনা বাকী পড়িয়াছে বলিয়া দাবী হইলে, বীরেন্দ্রের মাতা চেকদাখিলা দেখাইতে না পারাতে বাকী খাজনার নালিশ রুজু হইল।

বীরেন্দ্রের মা জমিদার-গৃহিণী দয়াদেবীর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন।

বীরেনের মায়ের কাহিনী শুনিয়া তিনি অনেকক্ষণ কিছু কথা বলিতে পারিলেন না। একটু সামলাইয়া তিনি চোখের জল মুছিয়া বলিলেন—ওঁর কিসের অভাব যে উনি এরকম অত্যাচার করেন তা বুঝতে পারিনে। প্রজারা ত ছেলের মতন, তাদের কান্না দেখে বুক যে ফেটে যায়। ওঁকে বললে বলেন আমার যা হক্‌-পাওনা আমি তা আদায় করে নেবো, তাতে লোকের কাঁদলে চলবে কেন? ওঁর শনি হয়েছে ঐ পেঁচোটা। সে থাকতে উনি কারো কথা শুনবেন না। তবু আমি যতদূর পারি চেষ্টা করে দেখব।

বীরেন্দ্রের মা আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিতেছিলেন না। দয়াদেবীকে অনেক করিয়া পায়ে ধরিয়া

বলিয়া আসিলেন—দেখো দিদি, আমার দুধের ছেলে বীরেন যেন পথে না বসে। আমি মরে গেলে তোমাদেরই ত তাকে দেখবার কথা।

গুণময় যখন রাত্রে খাইতে বসিয়াছেন তখন দয়াদেবী নিকটে ঘনাইয়া বসিয়া একথা সেকথার পর বলিলেন—আজকে বীরেনের মা এসেছিল।

গুণময় তাঁহার খুব মোটা ভুঁড়ির ওপার হইতে খাটো হাত দিয়া কষ্টে একগ্রাস খাবার সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড ছাঁটা গোঁপের তলা দিয়া মুখবিবরে চালান করিয়া দিয়া ভরা গালে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন?

—তার নামে নাকি বাকি খাজনার নালিশ হয়েছে।

গুণময় আহার চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিলেন—তা হবে। খাজনা বাকি পড়লেই নালিশ করতে হয়।

—নাবালক ছেলেটি নিয়ে বিধবা হয়েছে। এই সেদিন ওর সোয়ামী মারা গেছে।

—তাতে আমার পাওনা গণ্ডা ত মারা যেতে পারে না!

—সে বলছিল, বড়ঠাকুর—

গুণময় খাটো-খাটো বিপুল মোটা দুই হাত নাড়িয়া প্রকাণ্ড ছাঁটা গোঁপ শজারুর কাঁটার মতন ফুলাইয়া জোরে বলিয়া উঠিলেন—বড়ঠাকুর! বড়ঠাকুর! তা হলে আমি বীরেনের বাপের চেয়ে বড়! আমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে বলতে চাও…

গুণময়ের জোড়াটি বাঁধানো দাঁত ক্রোধে ঠকঠক শব্দ করিতে লাগিল।

দয়াদেবী বিপদে পড়িয়া গেলেন। তিনি স্বামীর দয়া উদ্রেক করিতে গিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থানে ঘা দিয়া তাঁহাকে যে বিমুখ করিয়া তুলিলেন ইহার জন্য লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া চুপ করিলেন; মনে করিলেন সময়ান্তরে কথাটা আবার পাড়িতে হইবে, এখন আর নয়।

গুণময় খানসামাকে বলিলেন—ওরে চতুর, পাঁচুদাকে বলে আয়, আমার সঙ্গে যেন একবার দেখা করে যায়।

দয়াদেবী প্রমাদ গণিলেন। তিনি ঢোক গিলিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—এত রাত্রে পাঁচুকে কেন?

গুণময় গম্ভীর হইয়া বলিলেন—একটু দরকার আছে। তোমাদের মেয়েমানুষের সে সব খোঁজে কাজ কি?

দয়াদেবী আর কথা বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি কতবার কত দুঃখীর হইয়া স্বামীর কাছে সাশ্রুনয়নে প্রার্থনা করিয়া এই এক বাঁধি বুলিতেই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন—তোমরা মেয়েমানুষ, দশ হাত কাপড়ে যাদের কাছা নাই, তাদের কিছু বুঝিবার সাধ্য ও যোগ্যতা থাকিতেই পারে না, তাহারা আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবরের জন্য মাথা যেন না ঘামায়। পাঁচুর সহিত স্বামীর আলাপের বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার মন ছটফট করিলেও তিনি জানিতেন যে তাহা জানিবার আর কোনো উপায় নাই।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর

(জাপানী শ্রমণ একাই কাওয়াগুচির ভ্রমণবৃত্তান্ত)

একাদশ অধ্যায়।

তিব্বত-সীমান্তে।

আমরা মালবা ত্যাগ করিয়া কালীগঙ্গার তীর ধরিয়া উত্তর পশ্চিম-মুখে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। বৃষ্টি হওয়াতে সেদিন আমাদের বেশীদূর যাওয়া হইল না। সেদিন কেবল আড়াই মাইল পাহাড়ে উঠিলাম। তার পরদিন প্রভাত-কালে ৭টায় যাত্রা করিয়া প্রায় ৫ মাইল পথ অতিক্রম করিলাম। পথটি ধারাল নুড়ি ও প্রস্তরে পূর্ণ; চলিতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। যা হোক ৫ মাইল চলিয়া বিশ্রাম ও জলযোগ করিলাম। আমরা আবার পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। এবার পাহাড় বড়ই খাড়া, পা রাখা কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। ক্রমে বাতাস এত লঘু বোধ করিতে লাগিলাম যে শ্বাসগ্রহণ কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। ৬ মাইল গিয়া আর চলিতে অক্ষম হইলাম এবং বৈকালে প্রায় ৩টার সময় ডামকর নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেহ এতই অবসন্ন হইয়াছিল, যে, তার পরদিন আর চলিতে পারিলাম না।

—সারাদিন বিশ্রাম করিলাম। ১৫ই তারিখে সোজা উত্তর দিকে যাত্রা করিয়া ৫ মাইল উঠিয়া এক বরফের নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহাও পার হইয়া ৪ মাইল খাড়াই উঠিলাম—অবশেষে এক চওড়া জায়গায় আসিয়া পৌঁছিলাম। বেলা প্রায় ১১টার সময় বিশ্রাম করিবার জন্য বসিলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম এক ফোঁটা জল কোথাও নাই। পাতলা বরফের স্তরের নীচে এক-প্রকার ছোট ছোট গাছ হইয়াছে দেখিলাম, তুলিয়া মুখে দিয়া দেখি তাহার আস্বাদ অম্ল; যাহোক সেই গাছের শিকড় চিবাইয়া তৃষ্ণা দূর করিলাম, আর কিছু বিস্কুট খাইলাম। সেদিন তাহাই আমার একমাত্র আহারের সংস্থান হইল। বৈকালে কেবল পাহাড়ে উঠা একমাত্র কাজ হইল। সে কি কষ্টে পথবিহীন তৃণগুল্মশূন্য পার্ব্বতে উঠা!—একবার পদ-স্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। পার্ব্বত্য লাঠির সাহায্যে অতি সাবধানে ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলাম। ক্রমে এত ঊর্দ্ধে উঠিলাম, যে, নীচে চাহিয়া দেখি প্রায় হাজার ফুট খাড়াই উঠিয়াছি—নীচের দিকে চাহিয়া মাথা ঘুরিতে লাগিল। একবার বরফে পা পিছলাইলে হাজার ফুট তলায় পড়িয়া মৃত্যু!—এই দুরূহ পথে আমার পার্ব্বত্য লাঠিটি একমাত্র আশ্রয়। মাঝে মাঝে বালুকার নীচে পা বসিয়া যাইতেছে। আমার সঙ্গীটির পর্ব্বতারোহণে আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতা দেখিলাম—সে লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিয়া যাইতে লাগিল। তার হাতের লাঠিটি উপযুক্ত স্থানে বঁড়শির মত আটকাইয়া সে অবলীলাক্রমে উঠিতে লাগিল, তবু তার পৃষ্ঠে প্রায় একমণ বোঝা; আমি কিন্তু পদে পদে বিপন্ন হইতে লাগিলাম। কখনও পা বসিয়া যাইতেছে, কখনও লাঠি বসিয়া যাইতেছে, কখনও বা পা ফসকাইয়া গড়াইবার উপক্রমে শূন্যে নৃত্য করিতেছি—তখন আমার পথের সঙ্গী ছুটিয়া আসিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিতে লাগিল। কষ্টের উপর আরো কষ্ট, যত উঠিতে লাগিলাম নিশ্বাসের কষ্ট বাড়িতে লাগিল। বাতাস এত পাতলা, বুক ভরিয়া নিশ্বাস লওয়া চলে না, মস্তিষ্কের ভিতর জ্বালা করিতে লাগিল, পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল, টুকরা টুকরা বরফ মুখে দিতে লাগিলাম, তাহাতে পিপাসা মিটিল না। কতবার আমার চৈতন্য লুপ্তপ্রায় হইল, বাতের বেদনায় শরীর অবশ হইয়া পড়িতে লাগিল।

আমি ত আর এক পা চলিতে পারি না। বরফের উপর শুইয়া পড়িয়া একটু ঘুমাইতে চাহিলাম। আমার সঙ্গীটি কিছুতেই আমায় বিশ্রাম করিতে দিবে না।—সে বার বার বলিতে লাগিল "এখন যদি শুইয়া পড় নিশ্চিত মৃত্যু, একবার বসিলে আর উঠিতে পারিবে না।" আমিও আর কিছুতেই পারি না। সে আমায় নানাকথা বলিয়া লইয়া চলিল। অবশেষে যখন আমি আর চলিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলাম, সঙ্গীটি নীচে গিয়া আমার জন্য একটু জল লইয়া আসিল, আমি জল পান করিয়া বাঁচিলাম। একটু বিশ্রাম করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম। কর্পূরের আরক বাহির করিয়া আমার রক্তাভ হাতে পায়ে মালিশ করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন পুনরায় যাত্রার জন্য উঠিলাম—বরফের উপর নক্ষত্রের আলোকে পথ দেখিয়া চলিলাম। এবার ক্রমশ নামা—৪ মাইল নামিয়া সান্দা নামক দশখানি-কুটীর-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র পল্লীতে পৌঁছিয়া রাত্রিবাস করিলাম। তুষারাচ্ছন্ন হিমাচল-শিখরে সান্দা একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রীষ্মের তিন মাস ছাড়া সেখান হইতে নির্গমের কোন উপায় নাই। জগতের সঙ্গে তার যেন কোন সংস্রব নাই। আমরা যে পথে আসিলাম সেই দুরূহ পথেই গ্রীষ্মের সময় লোকে গমনাগমন করে। এখানে মানুষ কি করিয়া বাস করে? এখানে "দোহু" নামক সামান্য একপ্রকার শস্য ছাড়া জীবন ধারণের কোন উপায় নাই। এখানে কিছুই জন্মায় না, চারিদিক শুভ্র তুষারে ঢাকা, তবু দশ ঘর মানুষ বাস করে। কিন্তু এখানকার দৃশ্য কি মহান্, তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা দিগন্ত-বিস্তৃত, চারিদিকে শুভ্র বরফরাশি, স্তরে স্তরে শিখরের উপর শিখর উঠিয়াছে, দেখিলে প্রাণ স্তব্ধ হইয়া শান্ত সৌন্দর্য্যে মগ্ন হয়।

আমি এতই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে ১৮ই তারিখের পূর্ব্বে আর যাত্রা করিতে পারিলাম না। এইবার আমাদের এই দুরূহ পথে অবতরণের পালা আরম্ভ হইল। শুনিলাম এই পথে প্রতিবৎসর দুই-একজন পথিক প্রাণ হারায়! আমরা উত্তর-পশ্চিম মুখে যাত্রা করিয়া ক্রমে এক উপত্যকার

আসিয়া পৌঁছিলাম, সেখানে বড় বড় গাছ পুষ্পিত বৃক্ষলতা দেখিতে পাইলাম; কিন্তু এ স্থান ভীষণ বন্য জন্তুর আবাস, এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা নিরীহ জীব কস্তুরীমৃগ। বনে রাত্রি সমাগত হইল, আমরা এক পর্ব্বতের খাঁজের ভিতর রাত্রি যাপন করিলাম। ১৯এ তারিখে উত্তর-পশ্চিম মুখেই চলিলাম, পথের দৃশ্য ক্রমে আরও মনোহর হইতে লাগিল। আমরা ক্রমশঃ ঘননিবিড় উন্নত শিখরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। আমি পথশ্রমে এতই কাতর হইলাম যে আমার সমুদায় বোঝা সঙ্গীকে দিয়া অতি কষ্টে পায় পায় যাইতে লাগিলাম। দেহ শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন, কিন্তু চারিদিকের অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমার দৈহিক যন্ত্রণা ভুলাইয়া দিতেছিল। আমি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে, সৌন্দর্য্যের লীলাভূমির দিকে চক্ষু ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—একবার হিমানীমণ্ডিত শুভ্র শিখরের দিকে চক্ষু মেলিয়া দাঁড়াইলাম, বোধ হইতে লাগিল যেন কত যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ধ্যানী বুদ্ধ স্তব্ধ হইয়া সমাধিতে মগ্ন আছেন, তাইত আমার দেবতার ধ্যানস্থ মূর্ত্তি আমার চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। আমি বাক্যহারা স্পন্দহীন, সৌন্দর্য্য-সাগরে হৃদয় মগ্ন, কিন্তু সঙ্গী আমার এই পরম ভোগে বাধা দিয়া ধাক্কা দিয়া বলিল "আরে কর কি, দাঁড়াইয়া রহিলে কেন, দাঁড়াইলে মরিবে, চল! চল।"

আমি কিন্তু গতিশক্তিহীন। সে ব্যক্তি আমার হাত ধরিয়া দশ মাইল নামাইয়া লইয়া গেল। এখনও অনন্ত-তুষার-রাজ্যে। আবার পর্ব্বতের ফাটলে রাত্রি বাস করা গেল।

২০এ জুন আবার অন্য এক পাহাড়ে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। নীচের উপত্যকায় "নাহ" নামে একপ্রকার মৃগ চরিতেছে দেখিলাম। আর একটু উঠিয়া কিছু দূরে অন্য পাহাড়ে একদল বন্য চমরী দেখিলাম। দূরের পাহাড়ে একপ্রকার অদ্ভুত জীব দেখিলাম, সঙ্গী বলিল সেগুলা বরফের নেকড়ে। দূরে ভীষণ বন্য কুকুরও দেখিলাম, ইহারা বড় ভীষণ হিংস্র, ইহাদের সম্মুখে পড়িলে কোন জীবের রক্ষা নাই। পথে পথে বরফের উপর সাদা সাদা পশুর হাড়, মাঝে মাঝে বরফের নীচে এক-একটা নরকঙ্কালও দেখিলাম। হয়ত হতভাগ্য পথিক কোন শীতে মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই-সব কঙ্কাল মস্তকশূন্য। শুনিলাম তিব্বতে নাকি নরমুণ্ড দিয়া একপ্রকার পূজার উপকরণ প্রস্তুত হয়, তাই নরমুণ্ডের এত আদর।

ক্রমে "থরপো" অথবা "শাকা" গ্রামে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে পথে-পথে বিশ্রাম করিয়া ১লা জুলাই ধবলগিরির শিখর পার হইয়া হিমাচলের অপর দিকে নামিতে আরম্ভ করিলাম। যখন একেবারে ধবলগিরির পাদদেশে আসিলাম তখন আমার সঙ্গের বোঝাও হালকা হইয়া গিয়াছে—বিস্তর আহার্য্য উদরস্থ করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আমার বোঝাটি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা নিজেই বহন করিতে পারিব।

আমার ভারবহনকারী ভৃত্যের আর কোন আবশ্যকতা নাই, তখন সঙ্গীর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "এই নীচের উপত্যকা-পথে আমি একাই যাইব, তুমি দেশে ফিরিয়া যাও, আর আমার সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই।" সঙ্গীটি ত এ আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিল। সে ভাবিল এ ব্যক্তি বলে কি? ক্রমে অবস্থা বুঝিয়া বলিল "এ পথে একা গেলে তুমি মরিবে, বোধিসত্ত্ব দেবতারাও এ পথে যাইতে পারেন না, তুমি নিশ্চয় মরিবে।" আমি তাহার কোন যুক্তিতর্ক অনুনয় বিনয় শুনিলাম না—আমি একাই যাইব স্থির। আমার দৃঢ়তা দেখিয়া লোকটি বিষণ্ণ-মুখে যে-পথে আসিয়াছিল সে-পথে যাত্রা করিল। আমি তাহার গতিশীল মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিলাম, যেই সে পর্ব্বতের অন্তরালে অদৃশ্য হইল অমনি আমি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সেই সংকটময় পথে একাকী যাত্রা করিলাম। এইবার যে-সব অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, কতবার যে মৃত্যুমুখে পড়িয়া কত বিপদ হইতে যে আশ্চর্য্য উপায়ে রক্ষা পাইলাম তাহার আর গণনা হয় না।

১৯০০ সালের ১লা জুলাই হিমাচলের সেই নির্জ্জন কঠিন পথে আবার একাকী যাত্রা আরম্ভ হইল। সঙ্গী এক কম্পাস যন্ত্র, আর পথপ্রদর্শক এক তুষারশৃঙ্গের উপর দৃষ্টি রাখিলাম। প্রথম দিন বরফের উপর শয়ন করিলাম, —দ্বিতীয় দিন, পাহাড়ের ফাটলে;—তৃতীয় দিনে ধবলগিরির শেষসীমায় পৌঁছিলাম। এখানেই নেপাল রাজ্যের শেষ, —তিব্বত রাজ্যের আরম্ভ। আমি তবে আজ তিব্বত-

রাজ্যের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি! এখানে একবার দাঁড়াইলাম। দক্ষিণের দিকে চাহিয়া দেখি ধবলগিরি ও তাহার উভয় পার্শ্বে চিরতুষারাবৃত শিখরমালা—উত্তরে চাহিয়া দেখি তিব্বত রাজ্য প্রসারিত, রজত-রেখার ন্যায় কত নদী যেন মেঘলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ব্যোম-পথে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। হাঁ এতদিনে তিব্বত রাজ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইল। কত কথা আজ আমার চিত্তে উদিত হইল—সেই বুদ্ধগয়া, সেই বোধিবৃক্ষতলে রাত্রিকাল, আমার দেবতা বুদ্ধের ধ্যান, সেই আমার স্বদেশ, আমার আত্মীয়স্বজন—আজ সকলে কোথায়? আমি ১৮৯৭ সালের ২৬ জুন স্বদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিয়া আজ ১৯০০ সালের ৪ঠা জুলাই তিব্বত-রাজ্যে পদার্পণ করিব! আমার হৃদয় আজ আশা কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজ আমি বড়ই শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত। ধীরে ধীরে একখানি পাথরের উপর বসিয়া বস্ত্র হইতে যত্নপূর্ব্বক সব তুষার ঝাড়িয়া ফেলিলাম, তৎপরে আহার্য্য দ্রব্য বাহির করিয়া আহারের আয়োজন করিলাম। গমের পিষ্টকে মাখম ও বরফ মাখাইলাম—তাহাতে লবণ ও মরিচের গুঁড়া মাখাইয়া আমার ভোজনের আয়োজন সমাপ্ত হইল! কি অমৃতই সেদিন ভোজন করিলাম তাহা আর বলিবার নয়। দুই বাটি উপর্য্যুপরি নিঃশেষ করিলাম। এমন সুখের ভোজন কদাচ ভাগ্যে ঘটে। আমি এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি—চিরদিন আমি একাহারী। একবার মাত্র উদর পুরিয়া দ্বিপ্রহরে ভোজন করি—আর দুইবার চা ও সামান্য শুষ্কফল খাইয়া থাকি। আজ আমি যাহা আহার করিলাম নিতান্ত অল্প নয় এবং পুষ্টিকরও বটে।

আহার ত করিলাম। চারিদিকেই আমার অনন্ত-প্রসারিত তুষারময় দেশ—উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে! আজ আনন্দে আমার চিত্ত উৎফুল্ল! কিন্তু যাত্রা করি কোন্ পথে!

দ্বাদশ অধ্যায়।

তুষার-রাজ্য।

পথের সংবাদ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম, সেই অনুসারে মানস সরোবরে না পৌঁছান পর্য্যন্ত ক্রমাগত উত্তর-মুখে যাত্রা করিবার কথা। কিন্তু কোন্ পথে গেলে আমি সহজে মানস সরোবরে উপস্থিত হইতে পারিব তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সঙ্গে কম্পাস আছে বটে, তবু ভাবিতে লাগিলাম—কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর-পশ্চিম মুখে যাত্রা করিলাম। এতদিন হিমাচলের যেদিকে ছিলাম সেদিকে সূর্য্যের কিরণের অপ্রতুল ছিল না; পথে বরফ ছিল বটে তাহা খুব গভীর নয়; এ যে হিমাচলের অপর দিক—এ দেশে রৌদ্র নাই আর শীতও প্রবল, পথের বরফ খুব গভীর। স্থানে স্থানে ১৪।১৫ ইঞ্চি বরফের ভিতর আমার পা বসিয়া যাইতেছে—আবার কোন স্থানে বরফের গভীরতা ৭।৮ ইঞ্চির বেশী নয়। স্থানে স্থানে বরফের ভিতর আমার পা এমন বসিয়া যাইতে লাগিল যে অতি কষ্টে আমি পা বাহির করিতে পারিলাম। এইপ্রকারে তিন মাইল নামিবার পর বরফশূন্য দেশে আসিয়া পৌঁছিলাম—সেখানে বালুকা আর নোড়ানুড়ি। আমি দেখি এত দিনে আমার ভুটিয়া পাদুকা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে—পা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ধারাল পাথরে বিদ্ধ হইয়া আমার পা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। যত দূর চলিলাম সমুদায় পথ রক্তচিহ্নিত হইল। রক্তাক্ত চরণে পথ চলা বিষম বোধ হইতে লাগিল, পৃষ্ঠের বোঝা যথার্থই দুর্ব্বহ বোঝার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পাঁচ মাইল এইভাবে চলিয়া বরফজলে পূর্ণ দুইটি হ্রদ দেখিতে পাইলাম, তাহাদের পরিধি ২ বা ২॥ মাইলের অধিক হইবে না। উভয় হ্রদেই অনেক সুন্দর সুন্দর জলচর পক্ষী দেখিলাম। চারিদিকের দৃশ্য বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ হইল। দৈহিক যন্ত্রণা ভুলিয়া আমি হ্রদের স্বচ্ছ বারির দিকে চাহিয়া রহিলাম। হ্রদ দুইটির নিজের নামে নামকরণ করিলাম। আবার একটু নামিয়া দেখি লাউএর আকৃতি আর-একটি ক্ষুদ্র হ্রদ। উত্তর-পশ্চিম মুখে আর কিছু দূর গিয়া দেখি অদূরে পর্ব্বতের উপর দুই-তিনটি তাঁবু পড়িয়াছে। সে স্থানে তাঁবু দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল এবং ভয়ও হইল। যদি আমি তাহাদের নিকট উপস্থিত হই—তাহা হইলে এই বিজন দেশে একটি আগন্তু দেখিলে তাহাদের সংশয় হইবে। কি উপায় করি। মনে করিলাম অপর দিকে গিয়া পাহাড়ের পশ্চাতে লুকাইয়া থাকি—কিন্তু তাহাতে আবার কষ্টের একশেষ হইবে। আমাদের দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রে

এমন অবস্থায় 'কার্য্যনির্ণয়ের এক সঙ্কেত আছে। আজ আমি সেই উপায় গ্রহণ করিলাম। তাহা এই—ইচ্ছা-শক্তি লোপ করিয়া ধ্যানস্থ হওয়া, তৎপরে স্বাভাবিক ভাবে যাহা আসে তাহাই করা। আমি ধ্যানস্থ হইলাম—চক্ষু মেলিয়া স্বাভাবিক ভাবে তাঁবুর দিকে চলিতে লাগিলাম।

তাঁবুতে পৌছিয়া রাত্রি হইয়া গেল। দূর হইতে তাঁবুর লোকদিগকে ডাকিবার উপক্রম করিতে দেখি ৫।৬টা ভীষণ কুকুর আমার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। আমাকে লোকে বলিয়া দিয়াছিল যে কুকুর তাড়া করিয়া আসিলে হঠাৎ মারিও না, তার মুখের সম্মুখে লাঠি ঘুরাইও। তাহাই করিলাম। কুকুরগুলি আর কামড়াইল না, তখন তাঁবুর লোকদিগকে উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলাম

শ্রীহেমলতা দেবী।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি-তর্পণ

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যনাটকাদির দোষগুণ বিচার করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরালে যে উদ্দেশ্যের প্রেরণা আমরা পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাই তাহাই আজ আমাদের আলোচ্য। তিনি প্রধানতঃ লোকশিক্ষার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, দেশহিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারই শিক্ষা দেশবাসীকে দিয়া গিয়াছেন। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন—

বিশ্ব মাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে;

তাই তিনি শুধু কোমল ভাবের বন্যায় দেশকে প্লাবিত না করিয়া বিদ্রূপের কশা ও পৌরুষের আগুন লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একদিকে যেমন ভণ্ড ও অসাধুর পৃষ্ঠদেশে তাঁহার এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশা বর্ষিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনই আবার তাঁহার পৌরুষপূর্ণ স্বদেশপ্রেমের বহ্নিতে জনসাধারণের মন বিশুদ্ধ ও ভক্তিপূত করিতে তিনি চেষ্টিত হইয়াছেন। অধঃপতিত জাতির চরিত্র-গত দোষসমূহের সংশোধন, দেশেরই ইতিহাস হইতে বীরত্ব মনুষ্যত্ব ও দেশভক্তির অপূর্ব্ব আদর্শ প্রদর্শন, এবং পরিশেষে আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীকে তাহার গৌরবমণ্ডিত অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া তাহার ম্রিয়মাণ প্রাণে আশা ও উৎসাহের উদ্বোধন,—এই উদ্দেশ্যের প্রেরণাই দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-সৃষ্টির ধারা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল।

দেশের যাহা কিছু সমস্তই তিনি ভালবাসিতে পারেন নাই। আমাদের আচারে, ব্যবহারে, সমাজে, ধর্ম্মে, যে-সকল দোষ, ত্রুটি, কদাচার, কুপ্রথা দেশের অশেষবিধ অনিষ্ট করিতেছে সেগুলিকে তিনি সনাতন বলিয়া মানিয়া না লইয়া নির্ম্মমভাবে উৎপাটিত করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন। ব্যাধিদুষ্ট মৃতবৎ সমাজশরীরে তীব্র তিক্ত মুষ্টিযোগ প্রয়োগে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। এই কারণে যাঁহারা তাঁহার স্বদেশপ্রেমে আন্তরিকতার অভাব দেখেন তাঁহারা এই দেশভক্তের প্রতি ঘোর অবিচার করেন। সুদীর্ঘ কালের পরাধীনতায় রুদ্ধগতি জাতীয় জীবনে কি পঙ্কিল আবিলতা আসে নাই? এবং তাহার ফলে কি আমাদের নৈতিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অশেষ অবনতি হয় নাই? যদি তাহা হইয়া থাকে, ধর্ম্ম ও সমাজ নানা কুসংস্কার ও কুপ্রথায় জর্জ্জরিত এ কথা যদি সত্য হয়, ভণ্ডামি ও ও শঠতায় দেশ যদি ছাইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে যিনি এই মনুষ্যত্বহীন জাতিকে 'আবার তোরা মানুষ হ' বলিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহার দেশভক্তিতে কৃত্রিমতা থাকিতে পারে না। আমরা

ছিলাম বা কি, হয়েছি এ কি!
সে কথা নাহি ভাবিয়া দেখি;
নিজের দোষ দেখালে কেহ মারিতে যাই ধেয়ে!

সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমে যে আমরা আন্তরিকতার অভাব দেখিব তাহা বিচিত্র নহে।

এইরূপে তিনি দেশের প্রকৃত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। আবার, যখন প্রয়োজন হইয়াছিল তখন উদ্দীপনার মদিরা দেশবাসীকে আকণ্ঠ পান করাইয়াছিলেন। তিনি বন্ধুদের নিকট বলিতেন, "আমাদের দেশ এখন কুম্ভকর্ণের ন্যায় ঘুমাইতেছে। রামায়ণের কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার সময় প্রথমে তাহার নাসিকার মধ্যে নানাবিধ সুগন্ধি-দ্রব্য প্রবিষ্ট করাইয়া তারপর অন্যরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; আমিও প্রথমে সকলকে শুধু হাসাইবার জন্য অনেক গান ও 'বিরহ' 'ত্র্যহস্পর্শে'র ন্যায়

প্রহসন লিখিয়াছি। সেইসঙ্গে দেশকে আঘাতও করিয়াছি এবং পরে অন্যরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছি।"

দেশের মঙ্গলকামনাই যে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মূল-মন্ত্র ছিল তাহা এখন আমরা তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হইতেই দেখাইতে চেষ্টা করিব। এই দেশানুরাগ যে তিনি তাঁহার যুগ হইতে কিয়ৎপরিমাণে পাইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 'দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দী'র জাতীয় জড়তা ও অবসাদের পর দেশ তখন ইংরেজী শিক্ষার ফলে আত্ম-চৈতন্যে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, এবং বঙ্কিম-প্রমুখ নবযুগের সাহিত্যিকগণ অপূর্ব্ব প্রভাতী গাহিয়া প্রথম জাগরণের শুভ মুহূর্ত্ত আনয়ন করিতেছিলেন। শেষ রজনীর ঘোরান্ধকার কাটিয়া গিয়াছিল। জননী তাঁহার 'বিপুল নীড়ে' ধীরে ধীরে জাগিতেছিলেন। সমাজে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই প্রবল চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। জাতীয় জীবনের এই স্মরণীয় সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব। হেম-নবীনের কাজ তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র অন্তপারের চিন্তায় 'ধর্ম্মতত্ত্বে' অভিনিবিষ্ট; এবং নব রবির কিরণালোকে বঙ্গগগনের প্রাচীদেশ উদ্ভাসিত। এই সময়ে বালক দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার অস্ফুট হৃদয়-কুসুমে গ্রথিত সঙ্গীতমালিকা 'আর্য্যগাথা' 'জননী বঙ্গভাষা'র 'অমল-চরণ-কমলে' নিবেদন করিলেন। উনবিংশ-বর্ষ-বয়স্ক তরুণ যুবক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণ তখন হইতেই দেশের দুর্দ্দশা স্মরণে কাঁদিত। তাঁহার এই প্রথম কাব্যের ভূমিকায় তিনি লিখিতেছেন, 'যদি কাহারও অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে, আর্য্যগাথা তাঁহারই আদর চাহে।"

বিলাতে অবস্থানকালে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় গ্রন্থ ইংরেজী Lyrics of Ind প্রকাশিত হয়। সুদূর প্রবাসেও মাতৃভূমির জন্য যে তাঁহার হৃদয় দুঃখ ও বেদনায় আকুল হইত তাহা এই পুস্তকের প্রথম কবিতা The Land of the Sun হইতে আমরা দেখিতে পাই। কবি ভারত-মাতার এক অতি গৌরবোজ্জ্বল বর্ণনা দিয়া শেষে যাহা বলিতেছেন আমরা তাহার অনুবাদ দিলাম—

O my land! Can I cease to adore thee,
Though to gloom and to misery hurled?
O dear Bharat! my beautiful maiden,
O sweet Ind! Once the Queen of the world.

যদিও আঁধার দুখের মাঝে নিপতিতা আজি তুমি,
তথাপি কি অবহেলিতে তোমারে পারি গো জনমভূমি?
তুমি যে একদা, হে মোর ভারত, আছিলে জগতরাণী,
ওগো সুন্দরী ভারত আমার প্রিয় নিকেতনখানি!

And though wrecked is thy pride and thy glory,
Of it nothing remains but the name;
Yet a beauty and sunshine still lingers,
And yet gleams through the mid of thy shame.

যদিও সে তব গৌরব যশ সকলি পেয়েছে লয়,
কিছু নাহি আর এখন তাহার নামটুকু শুধু রয়,
তবুও সে তব লাজ কুহেলিকা ভেদিয়া দেখি যে আসে
কি এক সুষমা - রবির কিরণ, এখনও নয়নে ভাসে!

বিংশ বৎসর পরে যে প্রদীপ্ত স্বদেশপ্রেম 'আমার দেশ' গানে দেশে উদ্দীপনার বহ্নি জালিয়া দিয়াছিল এই ইংরেজী কবিতাতে কি তাহারই স্ফুলিঙ্গ লক্ষিত হইতেছে না?

বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকার করায় দ্বিজেন্দ্রলাল যখন একঘরে হইলেন তখন তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ভীষণভাবে হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করিয়া 'একঘরে' নামক পুস্তিকা লিখিলেন। এই পুস্তক উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার দেশপ্রীতিসম্বন্ধে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে বলিয়া আমরা ইহার সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা করিব। ইহার ভাষা যে অত্যন্ত তীব্র তাহা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছিলেন। নমুনা-স্বরূপ আমরা শেষ কয় ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"হিন্দু সমাজ পচিতেছে—পৃথিবীর লজ্জা, মনুষ্যজাতির আবর্জ্জনা, পরাজিত, প্রতাড়িত, পদাহত হিন্দুজাতি আজ পচিতেছে।

শঠতার ভাণ্ডার, মিথ্যা কথার ওস্তাদ, জুয়াচুরির সর্দ্দার, ভীরুতার সেনাপতি, হিন্দুজাতি আজ পচিতেছে।"

এই তীব্রতার সহিত কোন কোন স্থলে ব্যঙ্গ মিশ্রিত হইয়াছে। একস্থলে আছে—

'পেয়াদা শ্বশুরালয়ে যাইব বলিলে যেমন তাহাকে মারিতে ইচ্ছা করে, কেহ তাঁর ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীকে প্রেয়সী বলিয়া ডাকিলে অপরের যে যাতনা হয়, হিন্দুকে আজ জাতি বলিলে আমার তেমনি শরীরে বেদনা হয়।'

কিন্তু তিনি হিন্দুজাতি ও সমাজের উপর যে এত গালি-বর্ষণ করিয়াছিলেন -

"তাহা বিদ্বেষে নহে, শত্রুভাবে নহে; ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার যে ক্রোধ, অন্যায়-ব্যবহারী পিতার প্রতি পুত্রের যে ক্রোধ সেই ক্রোধে"

তিনি এই তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ ভণ্ডামি ও শঠতায় পূর্ণ বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। সকল-প্রকার দুষ্কর্ম্ম এখানে অনুষ্ঠিত হইতেছে; কিন্তু পাপী দুরাচারদিগকে সমাজ শাসন করে না। আর কে কাহাকে শাস্তি দিবে? সমাজের প্রায় সকলেই যে এই রকম। ইহারা বিলাতফেরতাদিগকে একঘরে করিবে; কিন্তু নিজেরা "রুদ্ধ কবাটে মুরগীর ঝোল খাইয়া বাহিরে আসিয়া অমায়িক মিছা কথা কহিয়া পুণ্যসঞ্চয়" করিবে। আত্মাভিমানক্ষুণ্ণ দ্বিজেন্দ্রলাল হয়ত ন্যায়ের মর্য্যাদা ঠিক রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে স্বজাতিদ্রোহী ছিলেন না, পরন্তু দেশের মঙ্গলকামনাই তাঁহার এই আক্রমণের মূলে নিহিত ছিল তাহার প্রমাণও এই পুস্তকেই রহিয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

'একঘরে করিতে চাহেন, আসুন আজ যে-সব বিষয় সমাজের অমঙ্গলের হেতু তাহাদিগকে একঘরে করি। আসুন আজ বলি, যে শঠতা করিবে, মিছা কথা কহিবে তাহাকে একঘরে করিব; যে পঞ্চম বর্ষীয়া শিশুর বিবাহ দিবে তাহাকে একঘরে করিব; যে যুবতী বিধবার স্বেচ্ছিত বিবাহে বাধা দিবে তাহাকে একঘরে করিব; যে স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে তাহাকে একঘরে করিব; আসুন, যে-সব ব্যাধি জাতির বুকে বসিয়া অবাধে বুকের রক্ত পান করিতেছে, যাহারা নির্ভয়ে উন্নতির, প্রেমের, সত্যের হৃদয়ে শেল বিঁধিতেছে তাহাদিগকে একঘরে করি। সে 'একঘরে'তে দেখিবেন দেশের মঙ্গল হইবে, জাতির জীবন হইবে। সে একঘরের অর্থ অধর্ম্মের প্রতি সমাজের কেন্দ্রীভূত ঘৃণা ও ক্রোধ, সে একঘরের অর্থ অনর্থের উচ্ছেদ; জ্ঞানের, সত্যের, উল্লাসের নবরাজ্য। নহিলে যেখানে কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী একঘরে, সে একঘরেতে কেহ ভীত হইবে না। সে একঘরের অর্থ বিদ্যা, প্রতিভা, সত্য, ন্যায়, ধর্ম্ম।'

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই একঘরে পুস্তিকায় আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গশক্তির প্রথম পরিচয় পাই। ইহাই এখন তিনি সমাজব্যাধির প্রতিকারের চেষ্টায় নিয়োজিত করিলেন। তাঁহার ভাব আর কখনও তীব্র হয় নাই। এখন হইতে তিনি সকলকে কেবল হাসাইতে লাগিলেন। সে হাসিতে কোন সঙ্কীর্ণতা বা অনুদারতা ছিল না। সেই হাসির স্রোতে জাতীয় চরিত্রের মলিনতা ধৌত করিয়া ফেলাই তাঁহার বাসনা ছিল।

অল্পদিন পরেই তিনি 'কল্কি-অবতার' নামে এক প্রহসন রচনা করিলেন। ইহাতে তিনি হিন্দুসমাজের অন্তর্গত সমস্ত সম্প্রদায়কেই হাস্যাস্পদ করিয়াছেন। 'বিলেতফেরৎ, ব্রাহ্ম, গোঁড়া, পণ্ডিত, নব্যহিন্দু'—ইহাদের কাহাকেও তিনি ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার নিকট বিলেতফেরতাদের এইরূপ পরিচয় দিতেছেন,—

'বিলেতফের্ত্তা নামক আর এক সম্প্রদায় হইবে; তাহারা ভিতরে সাহস প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও বাহিরে বর্ণ ভিন্ন সব বিষয়ে সাহেবদিগের ষোল আনা মাত্রায় অনুবর্ত্তী হইবে। তাহারা ধুতি চাদর নিষিদ্ধ বিবেচনা করিয়া বাড়ীতে পাজামা ও বাহিরে হ্যাটকোট পরিয়া আত্মবিশেষত্ব অনুভব করিবে। তাম্বুলচর্ব্বণ, গুড়গুড়িতে ধূমপান, গুরুজনকে প্রণাম—এক কথায়—সমস্ত দেশীয় রীতিনীতির প্রতি তাহাদের দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিবে। তাহারা মাতৃভাষায় কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইবে; এবং কেবল কুলি-সম্প্রদায়ের সহিত এড়ো ভাষায় বাঙ্গালা হিন্দী কহিতে সক্ষম হইবে। তাহারা ইংরাজী শ্ল্যাং প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিবে; ইংরাজী সুরে শিস দিবে, ছড়ি ঘুরাইয়া বীরদর্পে চলিবে; ভঙ্গি থাকিবে এবং পদদ্বয় যতদূর সম্ভব দ্বিধা প্রসারিত করিয়া চুরোট টানিবে।'

কয়েক বৎসর পরে তাঁহার এই উক্তিই "আমরা বিলেতফের্ত্তা ক'ভাই" নামক হাসির গানে রূপান্তরিত হইয়া সর্ব্বজনবিদিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের এই উক্তি সকল বিলাতফেরতার প্রতিই প্রযুজ্য নয় এবং বাহ্য লক্ষণ মাত্র দেখিয়াই মানুষকে সব সময় বিচার করাও চলে না।

অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল যে-সকল ব্যঙ্গকবিতা ও হাসির গান লিখিতে লাগিলেন সেগুলি সকলের এতই পরিচিত যে এপ্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে। ব্যঙ্গের অন্তরালে বেদনা, হাস্যের সহিত অশ্রুরেখা এই গানগুলিতে তাঁহার অকপট স্বদেশপ্রেমিক হৃদয়টিকে দেশের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। তিনি এখন আর নিজেকে তাঁহার স্বদেশবাসিগণ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করেন না। দেশের দুঃখ দৈন্য লজ্জা, এমন কি তাহার দোষ-সমূহেরও তিনি অংশভাগী, সুতরাং তিনি যাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিতেছেন তাহাদের মধ্যে তিনি নিজেও একজন তাহা তিনি বিস্মৃত হন নাই, এবং বিদ্রূপকারী ও বিদ্রূপের বস্তু এই উভয়ের মধ্যে যে কোন পার্থক্য বা ব্যবধান নাই তাহা তিনি অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাই তাঁহার রসকৌতুকপূর্ণ অথচ ব্যঙ্গমূলক হাসির গান লোকের এত প্রিয় হইয়াছে।

কিন্তু শুধু দোষ দেখাইয়া কি ব্যঙ্গ করিয়া দেশের যে-হিতসাধন করা যায় তাহা আংশিক মাত্র। সঙ্গে-সঙ্গে

জাতিকে নূতন ভাব দিতে হইবে এবং যদি তাহার গৌরব করিবার কিছু থাকে, তাহাকে তাহা স্মরণ করাইয়া তাহার পদদলিত অবমানিত প্রাণে আত্মমর্যাদা উদ্দীপিত করিয়া দিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত দেশ-ভক্তের কাজ। দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা বুঝিতেন। তাই যখন তিনি দেখিলেন যে বাঙ্গবিদ্রূপ যথেষ্ট হইয়াছে, তখন তিনি ভারতগৌরব রাজপুত জাতির ইতিহাস হইতে স্বদেশপ্রেম ও মনুষ্যত্বের মহোন্নত আদর্শ বাঙ্গালীজাতির সম্মুখে উজ্জ্বলভাবে ধরিয়া 'রাণা প্রতাপ', 'দুর্গাদাস' ও 'মেবার পতন' নামক নাটকত্রয় রচনা করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হয় নাই। এই নাটকগুলি রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়া শত সহস্র বাঙ্গালীর প্রাণে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার বন্যায় জাতীয় চরিত্রের অনেক পঙ্কিলতা ধৌত হইয়া গিয়াছে।

এইখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। এই উচ্চ আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা যে বাঙ্গালীর আছে তাহাও তিনি দেখাইয়া দিয়া আশা ও উৎসাহের আগুন দেশমধ্যে জ্বালিয়া দিলেন; অধঃপতিত বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছে যে সেও একদিন জগতে মাথা উঁচু করিয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইয়াছিল, সেও সমরাভিযান করিয়া সিংহলবিজয় করিয়াছে, তাহার বাণিজ্যপোত একদিন ভারতসাগরময় ভ্রমণ করিয়াছে এবং চীন জাপান জাভায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আপন সভ্যতার প্রভূত নিদর্শন রাখিয়া আসিয়াছে। আমাদেরই নিমাই প্রেমের যে অপূর্ব্ব মন্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা জগতে নাই। আমাদের ন্যায়, আমাদের স্মৃতি দেশে যে শিক্ষা দীক্ষা ও ব্যবস্থা দিয়াছিল তাহা অন্য কোন দেশের তুলনায় হীন নহে। আর এই সেদিনও ত প্রতাপাদিত্য বিপুল মোগলশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই ত 'আমার দেশ'। যাহার অতীত এত গৌরবময় সে ভবিষ্যতে আবার কেন বড় হইতে পারিবে না?

আবার আমরা বড় হইব,—এই আশায় কবির হৃদয় এখন মাতিয়া উঠিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যিনি জাতির নিশ্চেষ্টতা ও চরিত্রহীনতা দেখিয়া নিরাশা-দিগ্ধ হৃদয়ে, বেদনা-কাতর কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

'সইবে সবই, নইত মানুষ
আমরা সবাই ভেড়ার পাল।'

তিনি এখন এক নূতন আবেগে গাহিয়া উঠিলেন,—

'আমরা মা তোর ঘুচাব দৈন্য, মানুষ আমরা নহিত মেষ!'

সমগ্র বঙ্গবাসী যদি এই মহোন্নত ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, যদি সকলেই জননীর ললাটকালিমা মুছাইতে প্রাণপণ করে, তাহা হইলে আর দুঃখ দৈন্য লজ্জা ক্লেশ কোথায় থাকে?

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও একদিন বলিয়াছিলেন, 'কে বলে মা তুমি অবলে?' হেমচন্দ্রের উদাত্ত সঙ্গীত আমরা এখনও ভুলি নাই। আর রবীন্দ্রনাথও এই একই আশার বাণী আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন—

এ নহে কাহিনী,　　এ নহে স্বপন,
আসিবে সেদিন আসিবে।

জানিনা সেদিন কবে আসিবে যখন সমগ্র বাঙ্গালী জাতি একমন একপ্রাণ হইয়া স্বদেশ-সেবায় আপনাদিগকে উৎসর্গ করিবে, যখন স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা, আলস্য ও কর্ম্ম-বিমুখতা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী সত্যসত্যই 'মানুষ আমরা' বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারিবে, যখন বাঙ্গালী তাহার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া তাহার বর্ত্তমান দুঃখ দৈন্য লজ্জা ক্লেশ বিস্মৃতির গর্ভে ডুবাইয়া দিতে সমর্থ হইবে। যখনই সেদিন আসুক না কেন, আমাদের এই ঘোরতর অধঃপতনের সময় যিনি আমাদিগকে দোষমুক্ত ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আশার বারতা শুনাইয়া দেশে উৎসাহ ও উন্মাদনার তড়িৎপ্রবাহ আনিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রাণ দেশভক্ত দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতির তর্পণ করিতে বাঙ্গালী যেন কখনও বিস্মৃত না হয়।*

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

ভাবগ্রাহী

কবির কবিত্ব চাহি—চাহি না গো নীতির বচন;
আকাশে কুসুমগুচ্ছ—নির্ব্বোধেই করে আকিঞ্চন।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

---

* ভাগলপুর সাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

বিচিত্র প্রসঙ্গ

(সমালোচনা)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় অসুস্থ দেহে বেদ হইতে পুরাণ-তন্ত্র পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধনার ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁর কতকগুলি "sug estion" বা থিওরি সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন। বিপিনবাবু "বিচিত্রপ্রসঙ্গে" সেই আলোচনাগুলি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া ও প্রকাশিত করিয়া বাংলার পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কারণ, সাহিত্য হিসাবে এই পুস্তকখানি একখানি অমূল্যগ্রন্থ হইয়াছে।

রামেন্দ্রবাবুর "প্রকৃতি" "জিজ্ঞাসা" কিংবা "কর্ম্মকথায়" তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনীষার যথেষ্ট পরিচয় পাইলেও, তাঁর মানসিকতার সম্পূর্ণ ছাপ ঐ তিন গ্রন্থের একটি গ্রন্থেও পড়ে নাই। প্রকৃতি—বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সমষ্টি; জিজ্ঞাসা—দার্শনিক প্রবন্ধের সমষ্টি; কর্ম্মকথা—সামাজিক প্রবন্ধের সমষ্টি। ঐ তিন পুস্তকে, বিজ্ঞান, দর্শন ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখক অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া নানা বিচিত্র মালমসলা উপস্থিত করিয়াছেন; সেই সকল উপকরণ লইয়া আধুনিক কালের হিন্দুসভ্যতার ব্যবহারোপযোগী ইমারত গড়ার প্ল্যানেরও কতক কতক আভাস দিয়াছেন;—কিন্তু ইমারত গড়েন নাই। শুধু বিশ্লেষণের শক্তি নয়, সৃজনীশক্তিও যে তাঁর আছে—তাঁর ঐ সকল পুস্তকে সে পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

'বিচিত্রপ্রসঙ্গ' যদিচ লেখকের মুখের কথাবার্ত্তার প্রতিবেদন মাত্র, তবু এই বইটিতে রামেন্দ্রবাবুর সৃজনীশক্তির আভাস আছে। তাঁর চিত্তক্ষেত্রের মস্ত বড় প্রসার সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব—এক কথায়, একটা সভ্যতার একেবারে আদ্যন্ত মধ্যে প্রবেশ করিবার মত তাঁর মনের বিশালতা—ইহাই এই গ্রন্থে প্রথম চোখে পড়ে। সাধারণ বাঙালী লেখকেরা জীবনের কতটুকু সামান্য অংশের উপর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করেন, আর ইনি কতখানি জীবনের উপর মনটাকে নাড়াচাড়া করিতেছেন, তাহা তুলনা করিলে ইঁহার মনের শক্তি যে কত বড় তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু শুধু মনের বিশালতায় ত সৃজনীশক্তি হয় না। মন যে-সকল মালমসলা সংগ্রহ করিয়া আনিল, তাহাকে সুবিহিত ও সুসম্বদ্ধ ভাবে সাজাইয়া তুলিতে পারিলে, তবেই ত মানসিক পসারের সার্থকতা। কারণ, এই সাজানোর মধ্যে একটা প্ল্যান আছে; সুতরাং একটা আশ্চর্য্য কল্পনা-শক্তি হইতে সেই প্ল্যানের জন্ম। কিন্তু ব্যাসকাশী সৃষ্টির মত আবার কল্পনাগড়া সভ্যতার ইতিহাস-সৃষ্টি বিশেষ কাজের হয় না। কার্লাইলের ইতিহাস-সৃষ্টিকে এই কারণে এখনকার পণ্ডিতেরা শ্রদ্ধাই করেন না। বস্তুর সত্যতা যাচাই করিতে হইবে; তারপর সম্বন্ধগুলি সুনির্ণীত করিতে হইবে। সেজন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রণালী চাই। কল্পনার আনুমানিক প্ল্যানের উপর বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রণালী প্রযুক্ত হইলে তবেই সেই প্ল্যান পাকা হয়। তখন আর গড়ায় ভুল থাকে না; তার ভিৎ খুব মজবুত হয়। রামেন্দ্রবাবুর মধ্যে কল্পনার সঙ্গে-সঙ্গে যুক্তিপ্রণালীর দ্বারা সেই কল্পনাকে চালিত ও সংশোধিত করিবার মত বিজ্ঞানও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সুতরাং এই সব শক্তির মিলনে তাঁর সৃজনীশক্তি ফুটিয়াছে। তিনি যে কিছু গড়িতে পারেন তাহা বুঝিতে দিয়াছেন। বাঙালী কয়জন লোক এই বড় গঠনী-প্রতিভার দাবী করিতে পারেন?

কিন্তু "বিচিত্রপ্রসঙ্গে" রামেন্দ্রবাবুর সৃজনীশক্তির পরিচয় থাকিলেও, তিনি এবারেও গড়েন নাই। গড়িবার একটা বড় প্ল্যান মাত্র দিয়াছেন। এই প্ল্যান দেওয়ার কাজটিকে ছোট করিয়া না দেখিলেও, আক্ষেপের বিষয় এই যে, সকল বাঙালী মনীষীই ঐ প্ল্যান পর্য্যন্ত দিয়াই ক্ষান্ত হন, তাঁদের গঠনী প্রতিভার লীলা আর দেখা যায় না। রাজা রামমোহন রায়ের যে অত বড় মনীষা ছিল,—তুলনা-মূলক ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, অর্থনীতি, প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁর সেই মনীষা যে আধুনিক জগতের জন্য নূতন অনেক ভাবিয়াছিল ও নূতন অনেক দিয়াছিল—তাহা ছোটখাট দুচারিটা বাদানুবাদ বা চটিপুঁথির মধ্যে এখানে সেখানে দুই চারিটা পংক্তির মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়াইয়া আছে মাত্র। যে জহরী, সেই জানে, সে-সকল উক্তির শুক্তির মধ্যে কি মুক্তা লুকাইয়া আছে! তারপর, বাংলায় তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে যে দুচারিজন দার্শনিক লেখক নূতন কোন চিন্তা উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারাও দুই চারিটা প্রবন্ধ লিখিয়াই ছুটি লইয়াছেন—এখানে একটু আভাস ওখানে একটু ইঙ্গিত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কোথায় আধুনিক কালের শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, কোথায় কাণ্ট বা হিউম বা বার্কলে—এমন কি হর্বার্ট স্পেনসারের মত দর্শনসৃষ্টি! এক গীতি-কাব্য ও উপন্যাস-নবন্যাস সৃষ্টি বাদে আর সকল ক্ষেত্রেই বাঙালীর মস্তিষ্কের শক্তির নানা সম্ভাবনার আভাস কখনো কখনো পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে সকল সম্ভাবনার পরে বাঙালীর আর ভাবনা নাই; সে আভাসের পরে আর বিকাশ দেখা যায় না।

রামেন্দ্রবাবু অসুস্থ দেহের দোহাই না দিলে, তাঁহার এ প্রসঙ্গের অঙ্গ-সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা যাইতে পারিত। অঙ্গ যাঁর নাই, সেই দেবতার প্রভাব কাব্য ও উপন্যাসের উপরই অধিক। কিন্তু দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান অমন আবছায়া "suggestion"এর উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অঙ্গসৌষ্ঠব যত সম্পূর্ণ হয়, ততই তাহাদের প্রাণ সপ্রমাণ হয়।

তবু বাংলা সাহিত্য এসব বিষয়ে এত দরিদ্র যে, যেখানে যেটুকু খাঁটি জিনিস যতটুকুই পাওয়া যায়, তাহাই পরম লাভ বলিয়া আগ্রহে মাথায় করিতে হয়। আভাস তো আভাসই সই! নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল—যদিচ এসব ক্ষেত্রে চক্ষুষ্মান্ মামা নহিলে কাজ একেবারেই চলে না।

যাইহোক্, রামেন্দ্রবাবু এই বইটিতে এত প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন এবং বেদ ও পুরাণাদি হইতে এত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন যে, সে-সকলের যাথার্থ্য লইয়া বিচার করিতে গেলে বেদাদি শাস্ত্র ভাল করিয়া জানা দরকার। পাঠকদের কাছে গোড়াতেই কবুল করা ভাল যে আমি সে-সব কিছুই জানি না। সুতরাং রামেন্দ্রবাবুর এই গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা বা সমালোচনা আমা কর্ত্তৃক সম্ভাবনীয় নয়। সাধারণ ভাবে নৃবিজ্ঞান (Anthropology) বা ধর্ম্মের ইতিহাস (History of Religion) বা তুলনামূলক ধর্ম্ম (Comparative Religion) অথবা সমাজ-বিজ্ঞান (Sociology) বিষয়ে তাঁর আলোচনার যেটুকুখানি সম্বন্ধ আছে, কেবলমাত্র সেইদিক্ হইতেই দুটি চারিটি কথা বলিতে পারিব। বিশিষ্ট ভাবে, ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মতত্ত্ব বা সাধনা বিষয়ে তিনি যে-সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন ও শাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণপ্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছেন, আমি সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে আদৌ অধিকারী নহি। তবে দুটা-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার বা সন্দেহ প্রকাশ করিবার অধিকার সকলেরই আছে, আমারও আছে। অতএব সেই ভাবেই আমি এ গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিব, সমালোচনা করিব না।

৫ পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে বীভৎস চিত্র কেন স্থান পাইল পক্ষে

হইতেই এই গ্রন্থের আলোচনার সূত্রপাত। সেই প্রথম প্রসঙ্গে বৌদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম্ম, সন্ন্যাসীসঙ্ঘ প্রভৃতির উৎপত্তি ও গঠনের কথা বিস্তারিত ভাবে বলিতে গিয়া রামেন্দ্রবাবু অবশেষে বলিতেছেন; "আর্য্যাবর্ত্তের সন্ন্যাসধর্ম্ম মিসরের ও প্যালেস্‌টাইনের ভিতর দিয়া য়ুরোপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, ইহা না মানিলে বোধহয় উপায় নাই।"

"যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কিছু পূর্ব্বে প্যালেস্টাইনে "এসীনি" নামক সন্ন্যাসীর দল ও মিসরে "থেরাপিউট" সন্ন্যাসীর দল আবির্ভূত হইয়াছিল। কয়েকটি নূতন doctrine আমাদের দেশ হইতে য়ুরোপে রপ্তানি হইল, মনে করা যাইতে পারে।

... ...

"প্রথমে দেখুন—Doctrine of Regeneration : এটি খাঁটি বৈদিকতত্ত্ব; যজ্ঞে দীক্ষা হইলেই নবজীবন লাভ হইত। যজ্ঞের উদ্দেশ্যও—দেবরূপে নূতন জন্মলাভ।

"পুনশ্চ দেখুন—Doctrine of Atonement : বেদে ইহার পূর্ণ-পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়। পশুযজ্ঞে যজমানের প্রতিনিধি বা নিষ্ক্রয় স্বরূপে পশুকে যজ্ঞে অর্পণ করা হইত (vicarious sacrifice); ঐতরেয় ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকার মতে পশুমাংসের পরিবর্ত্তে পুরোডাশের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সোমযজ্ঞে সোমরসের সহিত পশুমাংস এবং পুরোডাশ (অর্থাৎ চাউল কিম্বা যবের পিষ্টক) আহুতি দেওয়া হইত; পরে সোমরসের অবশেষের সহিত সেই মাংসের এবং পুরোডাশের অবশেষটুকু সেবন করিলে যজমানের দেবত্ব লাভ হইত।"

এ সম্বন্ধে গুটিকতক প্রশ্ন করা যাইতে পারে। সন্ন্যাসধর্ম্ম যে ভারতবর্ষ হইতেই মিসর প্যালেস্টাইনে গিয়াছে এবং সেখান হইতে ইউরোপে গিয়াছে, ইহা না মানিয়া "উপায় নাই" কেন? প্রথমতঃ "এসিনী" সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মতামতের সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্মের যে বিশেষ কিছুই যোগ বা সম্পর্ক নাই, একথা এখনকার অনেক পণ্ডিতই পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন। সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় চীনে, মিসরে, ব্যাবিলন প্রভৃতি স্থানে বহুপূর্ব্ব যুগ হইতে নানা আকারে ছিল; লাওৎস চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুপূর্ব্বে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় পত্তন করিয়াছিলেন। আদিম কৌলিক যুগের কৌলিক সমাজ-ব্যবস্থায় (Primitive tribal life) Shamanism বা অভিচারাদির ঔষধাদি আবিষ্কারের ও নানা যাদুবিদ্যার একটা বড় স্থান ছিল একথা যদি মানি, তবে একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়কে ঐ-সকল কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই প্রয়োজন হইতেই ক্রমশঃ সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অন্যান্য নানা কারণে তাহা বিশিষ্ট আকার পাইয়াছিল, একথা বলিলে কে কাহার কাছে কি পরিমাণে ঋণী তাহার হিসাব খতাইয়া দেখিবার দরকার থাকে কি? যদি দেখিতাম যে monachism জিনিসটা ভারতবর্ষেরই বিশেষত্ব, উহা আর কোথাও নাই—তবে ভারতবর্ষ হইতেই ঐ জিনিসটা সর্ব্বত্র রপ্তানি হইয়াছে বলিলে ক্ষতি ছিল না।

তারপর Doctrine of Regeneration, Doctrine of Atonement প্রভৃতিতে বৈদিক পুরোডাশ ও খৃষ্টান Eucharistএর সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া বৈদিক তত্ত্বই খৃষ্টান দেশে গিয়া পড়িয়াছে এই থিওরি।—এ সম্বন্ধেও এভাবে খৃষ্টানতত্ত্ব বৈদিক তত্ত্বের কাছে ঋণী বলিবার বিশেষ হেতু আছে কি? Fraser, Tylor প্রভৃতি প্রাচীন এবং আরও আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন যে, আদিম কৌলিক যুগে (Primitive tribal age) ইহা ইহা [illegible] সাধারণ ব্যাপার ছিল। সকল tribeদের মধ্যেই একটা বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের রক্তমাংস খাইলে তাহার গুণ বর্ত্তে, পশুর রক্তমাংস খাইলেও সেই একই ফল হয়। ক্রমে ইহাতে ধর্ম্মভাব আসিয়া বলির পশু Sacrosanct হইল এবং ক্রমে পশুমাংস খাইলেই দেবতার সহিত এক হওয়া যায় এই ভাব আসিল। এই জায়গায় বৈদিক যজ্ঞের সঙ্গে খৃষ্টান Eucharist ভক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে অমনি এখান হইতে সেখানে এ ব্যাপারটি ধার করা হইয়াছে-মনে করিব কেন? ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের যে আলোচনা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে নৃতত্ত্বের এই সিদ্ধান্ত পরিষ্কার ব্যক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গে, রামেন্দ্র বাবু আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন যে, শয়তান বা পাপপুরুষের কল্পনা খৃষ্টানধর্ম্মে যেমন আছে তেমনি বৌদ্ধধর্ম্মেও আছে; কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে ইহা কোথাও দেখা যায় না। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বেদের রুদ্রদেবতা, অসুর বা রাক্ষস, বা নির্ঋতি দেবতা ভীষণ হইতে পারেন, কিন্তু ইঁহারা কেহই শয়তানের মত পাপে প্রবর্ত্তিত করেন না। "তন্ত্রশাস্ত্রেও শয়তান প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই।" তবু তিনি মনে করেন যে, তন্ত্রসাধনায় যেখানে Black magicএর মত অনুষ্ঠানাদি দেখা যায় সেখানে "সেই-সকল অনুষ্ঠানের অধিকাংশই দেশী ও বিদেশী অনার্য্য সম্প্রদায় হইতে আসিয়াছে। এই-সকল অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তনের জন্য বৌদ্ধগণই অনেকটা দায়ী।" তিনি বলেন, "অথর্ব্ব বেদেই হৌক, আর আধুনিক হিন্দুতন্ত্রেই হৌক, শয়তানের পূজা, একজন Tempter অর্থাৎ পাপ-প্রণোদকের পূজা, আবিষ্কার করা চলিবে না। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের পরবর্ত্তী এবং আধুনিক ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যে বৌদ্ধসাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিল, তাহাতে শয়তানকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। মার ষোলআনা শয়তান, Tempter।...ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে মার প্রবেশ লাভ করিলেন; সেখানে তিনি পাপ-প্রবর্ত্তক ও শাস্তি-বিধাতার মূর্ত্তিতে দেখা দেন না; সেখানে তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র কন্দর্পরূপে বিরাজ করিতেছেন।... বেশ বুঝা যায় যে, এই শয়তানি ভাব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ধাতের সঙ্গে খাপ খাইল না।"

খৃষ্টানধর্ম্মে ও বৌদ্ধধর্ম্মে শয়তানের পুরাপুরি আধিপত্য, অথচ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে তাহার অস্তিত্বই থাকিল না, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া একদিকে খৃষ্টান ও বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সাদৃশ্য এবং খৃষ্টান ও বৌদ্ধধর্ম্মের উভয়ের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত পার্থক্য কোন্ কোন্ বিষয়ে—তাহা রামেন্দ্র বাবু অতি সুন্দররূপে আলোচনা করিয়াছেন। খৃষ্টানধর্ম্মের মধ্যে original sinএর আইডিয়ার জন্য জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের দ্বৈত, জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের দ্বৈত অত্যন্ত স্পষ্ট। বিজ্ঞান বা দর্শন সেই দ্বৈতকে ঘুচাইবার জন্য কখনো কখনো চেষ্টা করিলেও তাহা ঘুচিবার নয়। অনন্তপাপ ও অনন্তপুণ্য, শয়তান ও ঈশ্বর—দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মত খৃষ্টানধর্ম্মের মূলে বিরাজিত। হিন্দুর অদ্বৈততত্ত্বে ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, সুতরাং নির্দ্বন্দ্ব। রামেন্দ্রবাবু বলেন, "ব্যবহারিক জগতে যে অমঙ্গল বা দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও স্বরূপতঃ আনন্দস্বরূপ। যে মায়া হইতে তাহার উৎপত্তি, সেই মায়া অর্থাৎ বিশ্বজননী শক্তিও আনন্দরূপিণী; এই মায়া কখনও বিভীষিকাময়ী কল্পিত হয় নাই।... অনার্য্যপূজিতা ভয়ঙ্করী বিন্ধ্যবাসিনী এবং চামুণ্ডাও ব্রাহ্মণের হস্তে আনন্দময়ী শিবশক্তিতে পরিণত হইয়াছেন।... বৈদিক ঋষি সমস্ত জগৎটা দ্যুতিমান, দীপ্তিমান দেখিতেন।......এই ভাবটি বেদান্তে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আত্মা বা ব্রহ্ম যখন সকল ভূতেই বর্ত্তমান এবং সকল ভূতই যখন আত্মাতে বর্ত্তমান, তখন সমস্ত জগৎ এবং সমস্ত জাগতিক দ্রব্য যে দেবতা হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?"

বৌদ্ধধর্ম্মে জগৎটা দুঃখময়। তাই "খৃষ্টানের মত বৌদ্ধও বাহ্য জগৎটাকে Evil অশিব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন।.... এইখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়।" বৌদ্ধ এবং খৃষ্টীয় দুই ধর্ম্মেই তাই সন্ন্যাসাশ্রমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, গৃহস্থাশ্রমের নয়। কারণ দুই ধর্ম্মেই নারীর প্রতি বিদ্বেষভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

খৃষ্টানধর্ম্মের মূলে পাপ, বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে দুঃখ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূলে আনন্দ। এই আনন্দের তত্ত্বে পাপ ও দুঃখের আপাত-অস্তিত্ব থাকিলেও স্বরূপতঃ কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, বেদান্তের এই আনন্দতত্ত্বের পরে বৌদ্ধতত্ত্ব বিকশিত হইয়াছিল, সুতরাং বৌদ্ধতত্ত্বকে ভুঁইফোড় তত্ত্ব বলা কোনক্রমেই চলে না। তারপর বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাধনা হইতে তন্ত্রপুরাণাদির ধর্ম্ম ও সাধনা অনেক পরিমাণে অভিব্যক্ত হইয়াছে, রামেন্দ্রবাবুর এই পুস্তকে তাহার অনেক আলোচনা আছে। অথচ বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসপ্রধান ধর্ম্ম ছিল বলিয়া এবং তাহার মধ্যে সংসারটাকে হেয় ও কদর্য্য জ্ঞান করিবার দিকে একটা প্রবল ভাব ছিল বলিয়া, রামেন্দ্রবাবু বেদ-বেদান্ত হইতে পুরাণ-তন্ত্রাদির অভিব্যক্তির ক্রমগুলি বেশ দেখাইয়াছেন, কিন্তু সেই ক্রমের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাধনার স্থানটা তেমন দেখা যায় না। মনে হয় তাহা যেন বাস্তবিকই ভুঁইফোড় বা বৈদেশিক। এদেশের মাটিতে তাহার উদ্ভব যেন হয় নাই বলিয়াই এদেশের ধাতের সঙ্গে তাহা খাপ খায় নাই ও সেইজন্য তাহার লোপ ঘটিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? খৃষ্টান ধর্ম্মের ক্রমবিকাশমান ইতিহাসেও Judaismএর জাতীয় বাহ্যানুষ্ঠানমূলক ধর্ম্ম খৃষ্টের ধর্ম্মে ব্যক্তিগত অন্তরায় ধর্ম্মের রূপান্তর পাইল; বৈদিক এবং বৈদান্তিক ধর্ম্মের মধ্যে যে পার্থক্য, Judaism ও খৃষ্টান ধর্ম্মে সেই পার্থক্য। তারপর Roman বা Latin Christianityর সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের সাদৃশ্য পাই। নানা জাতির নানা ধর্ম্মের জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া ল্যাটিন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সেই-সকল নানা ধর্ম্মমতকে আত্মসাৎ করিয়া চর্চ্চের আকার ধারণ করিল; বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যেও নানা জাতির নানা ধর্ম্ম ভিড় করিয়া মিলিয়া মিশিয়া একটা বিরাট সঙ্ঘ বা সঙ্গীতি গঠিত করিয়াছিল। চর্চ্চ বা সঙ্ঘের গড়িবার একটা ভিতরকার কারণ বিচিত্র উপকরণকে ব্যূহবদ্ধ বা organised করিবার প্রয়োজন। খৃষ্টীয় চর্চ্চ জিনিসটা রোমান সভ্যতার ছাপ লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্রমে খৃষ্টান চর্চ্চ যেমন নানা বিকারে বিকৃত হইল, ও ক্রমে সংস্কারের প্রয়োজন হইল; ক্রমে খৃষ্টান সন্ন্যাসধর্ম্মও যেমন আর টিকিল না; তেমনি বৌদ্ধসঙ্ঘও ক্রমশঃ নানা বিকারে বিকৃত হইল, তাহারও ভিক্ষুভিক্ষুণী-ধর্ম্মও আর টিঁকিল না। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের আধুনিক বিকাশের সঙ্গে মধ্যযুগীয় বা পুরাতন খৃষ্টধর্ম্মের যতই বিরোধ থাক—তাহার ক্রমবিকাশের ধারা সমানই আছে। ঠিক সেইরূপ বৈদিক, বৈদান্তিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, তান্ত্রিক—ইত্যাদির ভিতর দিয়া একটি অলঙ্ঘ্য অভিব্যক্তির সূত্র রহিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধকে আকস্মিক বা উদ্ভট বলা কোনক্রমেই চলে না। গোড়াতেই বলিয়াছি যে শাস্ত্রে আমার কোন অধিকার নাই, কিন্তু প্রশ্নের অধিকার আমার আছে।

বৈদিক সাহিত্যে পাপপুণ্যের ভিতরকার দ্বন্দ্বের ভাবটা গোড়ায় স্ফুটরূপে প্রকাশ না পাইবারই কথা। কারণ animistic ধর্ম্মে Ethical consciousness বা ধর্ম্মনীতির বোধ যথেষ্ট ফোটে না। তবু বরুণ যখন হইতে পাপমোচনের দেবতা হইলেন, তখন হইতে পাপবোধটা ক্রমশঃ আর্য্যদের মনে উজ্জ্বলতর ও স্ফুটতর হইতে লাগিল মনে করা যাইতে পারে। তারপর আথর্ব্বণ ঋষিদের মধ্যে এই পাপবোধের দিকটা যথেষ্ট ফুটিয়াছে দেখা যায়; অথর্ব্ববেদে অভিচারাদি কর্ম্মের ব্যবস্থা অত্যন্ত বেশি পরিমাণে আছে। উপনিষদে 'আমি পাপের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ' এম্বিতর স্ফুটতর পাপবোধের উক্তিসমূহ দেখা যায়। পাপ ও পুণ্যের বোধ এইরূপে ক্রমে স্ফুট হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে স্ফুটতর আকার ধারণ করিয়াছে, Ethical Planeএর দ্বন্দ্বে উত্তীর্ণ হইয়াছে—এমন দিক্ হইতে কি ঐ প্রশ্নটাকে আলোচনা করা যায় না? কেবলমাত্র আনন্দের তত্ত্বে পাপ ও বাসনা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের সম্পূর্ণ সমাধান মিলে কি? সৃষ্টির মূলে আনন্দও যেমন কল্পিত হইতে পারে; দুঃখও ত তেমনি কল্পিত হইতে পারে। বৌদ্ধ মনস্তত্ত্বে বাসনার যে বিশ্লেষণ দেখা যায়, বেদান্তের মনস্তত্ত্বে বিষয়-বাসনার সে বিশ্লেষণ কোথায়? তবে, বৌদ্ধের সঙ্গে খৃষ্টানের মৌলিক তফাৎ এই যে, বৌদ্ধ চায় দুঃখ হইতে ত্রাণ, খৃষ্টান চায় "দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ।" খৃষ্টান ধর্ম্মে দুঃখের মূল্য অত্যন্ত বেশি; কারণ স্বয়ং ভগবান জীবের জন্য আপনাকে বলিদান দেন, অসীম দুঃখকে স্বীকার করেন—সুতরাং খৃষ্টান ধর্ম্মে যেমন পাপপুণ্যাত্মক দ্বৈত আছে, তেমনি vicarious হিসাবে অদ্বৈতবোধও আছে। জীবও সকল সম্বন্ধে vicarious ভাবে নিজের স্বার্থকে বলিদান দিয়া আপনাকে সেই নানা সম্বন্ধের ভিতরে বিলাইয়া দিতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্মের বিশ্বমৈত্রীর সাধনা ও খৃষ্টানের এই vicarious সাধনার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই—শুধু, একের মধ্যে ঈশ্বরের স্থান নাই, অন্যের মধ্যে আছে। ধর্ম্মনৈতিক দিক হইতে বৈদিক সাধনার চেয়ে এই সাধনার মূল্য বেশি বলিয়া মনে করি। আনন্দতত্ত্বে মুক্তি কৈবল্যমুক্তি হইয়াছে, একলার মুক্তি হইয়াছে। দুঃখতত্ত্বে সর্ব্বমুক্তি ভিন্ন কাহারও একলার মুক্তি নাই। আনন্দতত্ত্বে সংযমের দিক্ হইতে সংসারাশ্রমের সার্থকতার কথা আছে; কিন্তু সংসারের কর্ম্ম শুধু জ্ঞানের নিমিত্ত। দুঃখতত্ত্বে সংসারাশ্রমের চেয়ে সন্ন্যাসাশ্রম বড় হইলেও পরের জন্য কর্ম্মের বিরাম নাই। মুক্ত হইলেও কর্ম্ম থাকে।

তৃতীয় প্রসঙ্গে রামেন্দ্রবাবু তান্ত্রিক পূজার ব্যাখ্যা দিতে গিয়া এক স্থানে বলিতেছেন "বেদপন্থী হিন্দু এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পূজা করেন না; তৎপরিবর্ত্তে বহু দেবতার, বহু দ্রব্যের পূজা করেন। তিনি বলেন—ব্রহ্ম ত আমিই; আমি আবার আমার পূজা করিব কিরূপে? .....

"কথাটা এই যে আমরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলি, তাঁহার পূজার কোনও অর্থ নাই; দেবতার পূজার অর্থ আছে; এবং আমরা দেবতারই পূজা করি। আমাদের মধ্যে যে নব্য সম্প্রদায় সমাজবদ্ধ হইয়া নির্দ্দিষ্ট মন্দিরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ধ্যান, স্তুতি ও প্রার্থনা দ্বারা ব্রহ্ম উপাসনা করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ দেবতা পূজা করেন এবং ঐ পূজাতেই Communal ভাবটাই অধিক স্পষ্ট দেখা যায়।"

এখানে বক্তব্য এই যে, নির্গুণ ব্রহ্মের পূজা হয় না, সগুণ ব্রহ্মের (Personal God) পূজা হইতে পারে এ কথা বলিলে কোনই আপত্তির কারণ থাকে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি যাঁহারা ব্রহ্মপূজা এদেশে নূতন ভাবে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই নির্গুণ ব্রহ্মের পূজা হইতে পারে বলেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐদিক হইতেই শঙ্কর অদ্বৈতবাদকে মানিতে পারেন নাই, কারণ শঙ্কর নির্গুণ ব্রহ্মের দিকে এত ঝোঁক দিয়াছেন যে তাহাতে Theismএর স্থান থাকে না বলিয়াই দেবেন্দ্রনাথের মনের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম হইলেই বহুদেবদেবীবাদ মানিতে হইবে,—'বহুদ্রব্যের' পূজা করিতে হইবে কেন? Monistic বা Dualistic theismএর মানে বুঝা যায়, Tritheistic monotheismএর স্থানও বুঝি—কিন্তু Pluralistic monotheism কি ভাবে হইতে পারে বুঝি না। তাহার সঙ্গে Polytheismএর তফাৎটা কোন্ জায়গায়? ধর্ম্মসমাজে Communal Worship ও

থাকিবেই সুতরাং আচার অনুষ্ঠানও থাকিবে। কিন্তু সেই কারণেই সকল পূজারীতিই যে দেবতার পূজা হইবে, ব্রহ্মপূজার কোন অর্থ থাকিবে না, ইহা মনে করিবার কারণ বুঝা যায় না। Personal God মানিলেই কি বহুদেবতা মানা হইবে?

পঞ্চম প্রসঙ্গে, কৃষ্ণতত্ত্ব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে খুবই নূতনত্ব আছে। শ্রীকৃষ্ণ আভীর জাতির কুলদেবতা ছিলেন, এই মত মানিতে তিনি নারাজ। পাণিনি সূত্রে, উপনিষদে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে বলিয়া তিনি কৃষ্ণের প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই বলেন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নামের কৃষ্ণ ও ভিন্ন ভিন্ন legends কি থাকিতে পারে না? বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, গোড়ায় ভিন্ন ভিন্ন tribal chiefsদের নাম ছিল বলিয়া মনে হয়—পরে তাহাদের দৈননি অর্থ করা হৌক। যাহাই হৌক, ঋগ্বেদের নিরুক্ত হইতে রামেন্দ্রবাবু গো অর্থে বাক্ ও ধেনু অর্থে বাক্ বুঝায়, ইহা টানিয়া বাহির করিয়া গোলোক গোপী প্রভৃতি সমস্তকেই ঐ অর্থের দিক হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোলোক বাঙ্ময় লোক। প্রত্যেক দ্রব্য, প্রত্যেক জীব—গোরূপী। ভগবান গো ও গোপের পতি। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্বের মূল বেদে। রামেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন "ভগবান জীব হইতে অভিন্ন; সুতরাং তিনিও যেমন গোপাল, জীবও সেইরূপ গোপ বা গোপাল। তিনি জীবগণের বা গোপগণের সহচর এবং সখাও বটেন, রক্ষাকর্ত্তাও বটেন। বৃন্দাবনে তিনি গো এবং গোপগণকে কালিয় নাগের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। যদ্দ্বারা তিনি গো গোপকে আচ্ছাদন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই শৈলটার নাম গোবর্দ্ধন। জগৎপতি তাঁহার সৃষ্ট জগতের মধ্যে বা Natureএর মধ্যে জীবনসংগ্রামের সৃষ্টি করিয়া মঙ্গল এবং অমঙ্গলের মধ্যে একটা বিরোধের অভিনয় করিয়া আনন্দলীলা করিতেছেন; সেই অমঙ্গলের আক্রমণ হইতে জীবকে রক্ষা করা ও তাহার মঙ্গল বিধান তাঁহার কার্য্য।" রামেন্দ্রবাবুর এই ব্যাখ্যা নূতন ও আশ্চর্য্য সন্দেহ নাই; কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে ভগবান তো ঈশ্বর নন, তিনি সখা, তিনি পতি, তিনি পুত্র—এমন কি পিতামাতাও নন। সুতরাং বেদের শব্দব্রহ্ম বা বেদান্তের ব্রহ্মবাদের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষ যোগ কি আছে? গোলোককে বাঙ্ময় পৃথিবী বলায় কিম্বা গোপীকান্ত ঈশ্বরকে শব্দ বলার দ্বারা বৈষ্ণব কর্ত্তৃক ব্যবহৃত গো বা গোলোক বা গোপীকান্তের অর্থের কি বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে? ভাগবতের চতুর্ব্যূহবাদের সঙ্গেও বেদান্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। সেখানে বাসুদেব সগুণ, নির্গুণ পুরুষ নহেন। রামেন্দ্রবাবু এ সকল ভেদ স্বীকার করিয়াও মনে করেন যে "বৈষ্ণব মতের মূল বেদান্তেই। জীব ও ব্রহ্ম এক; কিন্তু রস বা emotion না থাকিলে religion হয় না, ঐক্যে রস নাই। সেইজন্য religionএর খাতিরে এই কথাটা স্পষ্ট না বলিয়া ঈশ্বর ও জীব উভয়কেই গোপরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; এবং সেই ঈশ্বরের প্রতি জীবের নানারূপ প্রীতির সম্পর্ক পাতাইবার জন্য নন্দ যশোদা, বলরাম, শ্রীদামাদি গোপ, ললিতাদি সখী, এবং রূপমঞ্জরী প্রভৃতি সহচরী কল্পনা করা হইয়াছে।" কিন্তু এই রসের religionএর উৎপত্তি হইল কেমন করিয়া? আভীর প্রভৃতি অনার্য্য tribeদের ভিতরে ইহার উৎপত্তি মনে করিলে দোষ কি, কারণ অনেক tribeদের মত বিবাহ-বন্ধন তাহাদের মধ্যে হয়ত যথেষ্ট দৃঢ় ছিল না—সুতরাং এ-রকমের একটা legend তাহাদের মধ্যে চলিত ছিল। তা ছাড়া বৈষ্ণব রসধর্ম্মের মধ্যে erotic passionএর একটা উপাদান খুব বেশি পরিমাণে আছে; ইহার অনার্য্য উৎপত্তির তাহাও একটা কারণ হইতে পারে। অতএব বেদ বা বেদান্তে ইহার মূল না হইয়া বেদ বা বেদান্তে ইহাকে পরবর্ত্তীকালে কলমে জোড়া লাগাইবার চেষ্টা হইয়াছে—সুতরাং ইহার মধ্যে নূতন তত্ত্ব দেখা গিয়াছে—এমন একটা থিওরিও খাড়া করা যাইতে পারে। রাধাকে হ্লাদিনী শক্তি বলার তত্ত্ব যেমন। ইহার সঙ্গে বেদান্তের সত্যই সাদৃশ্য আছে।

উপরি-উক্ত থিওরিকে রামেন্দ্রবাবু তাঁহার পাণ্ডিত্যের দিক হইতে অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় সংস্কারের দিক হইতে তিনি অগ্রাহ্য করিবেন না। কারণ তাঁহার একটি উক্তি উদ্ধার করিয়া আমি এই আলোচনা বন্ধ করিতে চাই—সেই উক্তি হইতেই তাঁহার চিত্তের উদারতা সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না। সেই আশ্চর্য্য উক্তিটি এই:—

"আর্য্য, শূদ্র ও দ্রাবিড়ীয় ও অবশেষে বৈদেশিক—এই সকলকে লইয়া এক খলে পিষিয়া মাড়িয়া যে নূতন আকারের culture প্রস্তুত হইয়াছিল—এই বিপুল synthesis এবং reconstruction ব্যাপারের ইতিহাসই ভারতবর্ষের ইতিহাস।"

কিন্তু সে ইতিহাসের এক বিস্ময়কর প্ল্যান মাত্র তিনি এস্থলে দিয়াছেন; সে ইতিহাস লেখেন নাই।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

জাত সম্বন্ধে রিজলী সাহেবের মত ও তাহার সমালোচনা

(Emile Senartএর ফরাসী হইতে)

মানবীয় জাতি-বিভাগগুলির (race) মধ্যে, এবং তাহা হইতে যে অমিল উৎপন্ন হয় সেই-সব অমিলের মধ্যেই রিজলী সাহেব জাতের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন। ইহা নেস্ফীল্ড সাহেবের মতের স্পষ্ট বিরুদ্ধ। রিজলী সাহেবের কথায় যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, বিশুদ্ধ আর্য্যজাতি হইতে সুরু করিয়া অতীব আদিমনিবাসী জাতি পর্য্যন্ত যে সোপান-পরম্পরা নামিয়া আসিয়াছে সেই সোপানের পদমর্য্যাদা অনুসারেই জাতের বর্ত্তমান পদমর্য্যাদার ক্রম নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এইবার ব্যবসায়ের স্থানে জাতি-বিভাগকে জাতের মূল রূপে স্থাপন করা হইয়াছে। "নাসিকা-নিদর্শন" নামে তিনি নাকের গঠন-পরিমাপের একটা সূত্র-নিয়ম স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ইহাই জাতি-বিভাগের সুনিশ্চিত মাপ-কাটি। রিজলী সাহেবের আলোচনা (অন্তত একটা

দিক্ হইতে) এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পর্যাবসিত হইয়াছে। "নাকের প্রশস্ততা অনুসারে সামাজিক পদমর্যাদার উচ্চনীচতা—এই মূলসূত্রটিকে ভারতীয় জাতের গঠনসম্বন্ধে একটি নিয়ম বলিয়া ধরিলে বোধ হয় অতিশয়োক্তি করা হইবে না।" এই কথায় একটু সংশয় না করিয়া কেহ কি থাকিতে পারে?

রিজ্‌লী সাহেব যে-সব মাপ-জোক্ করিয়াছেন, শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে বিচার-তর্ক করিবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। কিন্তু অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যে-সকল মতবাদে জাতিতত্ত্বের দিক্ দিয়া ভারতের সামাজিক অবস্থা আলোচিত হইয়াছে, সেই-সকল মতবাদ, এখনো-পর্য্যন্ত, কতকগুলি স্ববিরোধী কথার মধ্যে, দুর্মোচনীয় কঠিন সমস্যা-জালের মধ্যে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে করিয়া অজ্ঞলোকদিগের মনে অবিশ্বাস উৎপন্ন হইবারই কথা। গভীর জাতিসংমিশ্রণ ও নিতান্ত আকস্মিক ধরণের উপাদান সত্ত্বেও, এতটা সম্পূর্ণ মিল (রিজ্‌লী সাহেব নিজেও ইহা স্বীকার করেন) হওয়া—কতকটা অলৌকিক ঘটনা বলিয়া মনে হয়। নেস্‌ফীল্ড সাহেব, সামাজিক পদমর্য্যাদা ও শ্রমশিল্পের ক্রমবিকাশ—এই দুয়ের মধ্যে যে মিল আবিষ্কার করিয়াছেন,—সে বিষয়ে তিনিও খুব দৃঢ়নিশ্চয়। কোন্ আলৌকিক উপায়ে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন উৎস হইতে নিঃসৃত এই দুই মূল-নিয়মের পরস্পর মিল হইতে পারে? আমি এই সমস্যাকে বাদ-বিসম্বাদের হাতে ছাড়িয়া দিলাম। নিপুণভাবে স্বীয় মতবাদের সমর্থন করিয়া এই দুই পণ্ডিত যে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে আসল সমস্যার সমাধান হয় নাই। তাঁহাদের সিদ্ধান্তে সামাজিক সোপানের মানমর্য্যাদার ক্রম সম্বন্ধে যতটা আলোচিত হইয়াছে, জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে ততটা আলোচিত হয় নাই।

প্রাচীন "বর্ণ" শব্দ এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় এই "বর্ণ" শব্দের যে অর্থ করা হয়—তাহারই প্রমাণ বলে—বিজেতা ও বিজিত জাতির মধ্যে, সাদা কালোর মধ্যে, যে একটা স্বাভাবিক বিরোধ ছিল—সেই বিরোধের মধ্যেই রিজ্‌লী সাহেব বর্ণভেদের অঙ্কুর দেখিতে পাইয়াছেন। অন্তর্বিবাহের (endogamy) নিয়মগুলিই এই বর্ণভেদ প্রথার মূল ভিত্তি। অজ্ঞাত ঘৃণিত লোকদিগের সম্মুখে,—আর্য্যেরা স্বকীয় বিশুদ্ধ শোণিতকে অব্যাহত রাখিবার জন্য আত্মরক্ষার্থ এই প্রাচীরটি তুলিয়াছিলেন। নেস্‌ফীল্ড্ সাহেবের মতে, জাতটা ব্যবসায়ের ব্যাপার; রিজ্‌লী সাহেবের মতে জাতটা বিবাহের ব্যাপার। গোড়ায় যে দলবিভাগ হইয়াছিল, তাহারই দেখাদেখি, তাহারই অনুকরণে, শাস্ত্রের মঞ্জুরী পাইয়া, ঐ-সব দল আরও ছড়াইয়া পড়ে, এবং বিভিন্ন কারণ ও উপলক্ষ্যে উহা হইতে অসংখ্য শাখাপ্রশাখা নিঃসৃত হয়। কারণ ও উপলক্ষ্য যথা:—ভাষাসাম্য, নৈকট্য, কিংবা ব্যবসায়-সাম্য, ধর্ম্মবিশ্বাস, বা সামাজিক সুবিধা।

তিনি একটু ঘোর-ফের করিয়া অন্য পথ দিয়া ব্রাহ্মণ-দিগের সনাতন পদ্ধতির অনেকটা কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে পুরোহিতমণ্ডলী অল্প অল্প করিয়া ক্রমশ যে প্রাধান্য অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাই সমস্ত ক্রমবিকাশের প্রধান উৎস। লোকসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বিভিন্ন পরিমাণে তাহার মধ্যে মিশ্রণ ঘটিতে লাগিল। এবং এইরূপ মিশ্রণই উপবিভাগের সংখ্যাবৃদ্ধির মুখ্য কারণ।

সঙ্কর-বাদের মতবাদটা, তাঁহার মতে, উক্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁহার মতে উহা একটি বহুমূল্য সাক্ষ্য। জাতিসংক্রান্ত জাতের কড়াকড় "অন্তর্বিবাহিক" (endogamic) নিয়ম যদি ভারতবর্ষের নিজস্ব হয়, "বহির্বিবাহিক" (exogamic) নিয়মগুলি—(যাহার ক্রিয়া অন্তর্বিবাহিক নিয়মের ঠিক পাশাপাশি চলিয়াছে—পূর্ব্বে বলিয়াছি) আরো বেশী ব্যাপক বলিতে হইবে। অসমান পরিমাণে ও বিভিন্ন আকারে, এই বহির্বিবাহিক নিয়মটা সার্ব্বজনীন। বিবিধ পরিবর্ত্তিত নামে,—বহির্বিবাহিক নিয়মানুবর্ত্তী দলগুলি হিন্দুসমাজের শীর্ষে ও তলদেশে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে "গোত্র", আদিম অধিবাসী লোকের মধ্যে (clan) শাখা দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন দেখা যায় একটা আর-একটার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নিজের সমাজগঠনের সহিত ব্রাহ্মণিক ব্যবস্থা পদ্ধতি মিশাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত;

কেন না, উহা হইতে একটা আভিজাত্য-সম্ভ্রম লাভ করা যায়। আদিমনিবাসী-জাতিদিগের ঐতিহ্য ও প্রথাদি, জাতগুলার স্থিরনির্দ্দিষ্ট অবস্থার উপর যে ক্রিয়া প্রকটিত করিয়াছে, সে সম্বন্ধে, রিজ্‌লী ও নেস্‌ফীল্ড্ দু-জনেরই এক মত। তাঁহারা উভয়েই বলেন যে, স্বশাসিত জাতিগুলি পর-পর খণ্ডখণ্ড হইয়া পড়ায়, তাহা হইতে কতকগুলি জাতের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ঐ প্রত্যেক জাতির প্রতিষ্ঠানাদির উপর—আরো ঠিক করিয়া বলিতে গেলে—আদিমনিবাসী জাতির প্রতিষ্ঠানাদির উপর উহারা যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা অসমান।

জাত যে-সকল নিয়ম স্থাপন করিয়াছে, তদন্তর্গত অনেকগুলি নিয়মের মূল উৎসকে নেস্‌ফীল্ড্ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন;—যেমন মনে কর—"অন্তর্বিবাহিক নিয়ম।" রিজলী ঐ-সকল নিয়মের মধ্যে, আর্য্য-প্রথাদির সহিত, কেবল কতকগুলি অদ্ভুত সাদৃশ্যাভাস খুঁজিয়া পাইয়াছেন,—যথা বহির্বিবাহিক বারন-বাধাসমূহ; কিন্তু ইহাতে করিয়া এরূপ সার্ব্বজনীন তথ্যগুলির একটা বিশেষ নিগূঢ় অর্থ আর রহিল না।

যে-সকল মতবাদ অতীব ভয়সঙ্কুচিত—যাহারা হিন্দু-ঐতিহ্যের দাসত্ব হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে সাহস পায় না, সেইসকল মতবাদ নিতান্তই সামর্থ্যহীন। আবার যে-সকল সিদ্ধান্ত অতীব অস্পষ্ট, অতীব ব্যাপক, সেই-সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ-পক্ষে সতর্ক থাকাও কম আবশ্যক নহে। যদি বর্ণভেদপ্রথা স্থাপনের পক্ষে ব্যবসায়-সাম্যই যথেষ্ট হয়, তাহা হইলে ভারত ব্যতীত অন্যান্য দেশেও উহার আবির্ভাব হইত। এ আপত্তিটা ত সহজেই চোখে পড়ে। এবং যে-সিদ্ধান্ত, ঐতিহাসিক শৃঙ্খলকে অনুসরণ না করিয়া, একটা কিছু ঠিক্ নির্দ্দেশ না করিয়া, বর্ণভেদ প্রথাকে কোন শাখাজাতির বা গোষ্ঠীর প্রাচীন সমাজগঠনের উদ্বর্ত্তনরূপে ব্যাখ্যা করে, তাহাও কম দূষনীয় নহে।

"মানবীয় সামাজিকতার আদিমকালে, সমাজগঠনের যে-সকল লক্ষণ সর্ব্বসাধারণ ও স্বাভাবিক এবং যে-সকল লক্ষণ বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই-সকল লক্ষণের উল্লেখ করিয়া কি ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? না,—এ সমস্ত বড়ই অস্পষ্ট, উহার দ্বারা কিছুই ব্যাখ্যা করা যায় না। যদি বিশেষ করিয়া কেবলমাত্র ভারতীয় আদিমবাসীর সমাজগঠনের উল্লেখ করা হয়, যদি এইরূপ স্বীকার করা হয় যে, হিন্দুজগতের সাধারণ ব্যবস্থাপদ্ধতির উপর, আদিমবাসীর সামাজিক গঠনপদ্ধতি একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া প্রকটিত করিয়াছিল, কোন এক উচ্চাভিলাষী পুরোহিত-সম্প্রদায় উক্ত আদিমবাসীর সমাজ-গঠনকে হস্তায়ত্ত করিয়া, উহাকে সংগ্রামের একটা অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা হইলে সম্ভবত ঐতিহাসিক স্রোতের মুখ ফিরাইয়া দিতে হয়, কতকগুলি ক্ষীণ পরিচালক শক্তির প্রতি অযথা পরিমাণ শক্তিমত্তার আরোপ করিতে হয়। সমস্ত হইতেই ইহা সূচিত হয় যে, ভারতীয় সভ্যতার যাত্রাপথে যে-সকল উপাদান বিশেষভাবে কাজ করিয়াছিল তাহা আর্য্য-উপাদান। আদিমবাসী-সংশ্লিষ্ট যে-সকল উপাদান কাজ করিয়াছিল তাহা কেবল স্বল্প-বিকারোৎপাদক, আংশিক ও গৌণমাত্র।

তবে কি বলিতে হইবে, জাত ও শাখাজাতির সন্নিকর্ষ একেবারেই নিষ্ফল হইয়াছে? না, বরং ইহা হইতে বেশ একটা নূতন জ্ঞানের আভাস পাওয়া যায়; তবে কিনা, ঐ জ্ঞানকে তথ্যের দ্বারা ভাল করিয়া আয়ত্ত করা আবশ্যক। সুবিধাজনক কতকগুলি আনুমানিক তত্ত্বের দীপ্তিচ্ছটায় অন্ধ হইয়া ঐতিহাসিক বাস্তবতায় প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলটিকে আমাদের দৃষ্টি হইতে যেন আমরা অপসারিত না করি। জাতের প্রতিষ্ঠার জন্য আধুনিক গবেষণা মধ্যে-মধ্যে যে-সকল আলোচনা করিয়াছে সেইসকল আলোচনার খুঁটিনাটি-গুলি এই কারণেই আমি বর্জ্জন করিয়াছি। এমন কি, যে-সকল তথ্যের আলোচনাকে সুবুদ্ধিপূর্ব্বক আর্য্য এলাকার মধ্যেই বদ্ধ রাখা হইয়াছে, উহা নিতান্ত সরাসরি-ধরণের বলিয়া, ক্রমবিকাশের মর্ম্মস্থানে বড় একটা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আপাতত উহা হইতে আমাদের কিঞ্চিৎ লভ্য হইতে পারে। কিন্তু নিতান্ত বস্তুনিরপেক্ষ সারতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের যে কি বিপদ্ তাহা আমি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছি।

জাতের অস্তিত্ব ভারত ছাড়া আর কোথাও নাই। অতএব ভারতের বিশেষ অবস্থার মধ্যেই, এই রহস্য-ভাণ্ডারের চাবি খুঁজিতে হইবে। অন্যান্য আলোকরশ্মির

প্রতি চক্ষু মুদিত না করিয়া, বিশেষ করিয়া জাতের লক্ষণ-পরিচালক উপাদানগুলির বিশ্লেষণ হইতে আলোক লাভ করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক, বর্ত্তমানের তথ্যাদি পর্য্যবেক্ষণ ও অতীতের তথ্যাদি আলোচনা করিয়া আমরা এই-সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিব।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কষ্টিপাথর

বৌদ্ধধর্ম্ম—থেরাবাদ ও মহাসাংঘিক।

বৌদ্ধেরা অবিদ্যা, সংস্কারবিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, এই বারটি সংসারের নিদান বা মূল কারণ বলিয়া দেখেন। বৌদ্ধেরা যখন বুদ্ধদেবের নিদান খুঁজিতে যান, তখন তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বুদ্ধ হওয়ার জন্য কি কি করিয়াছিলেন, তাহাই খোঁজেন। এই বুদ্ধনিদান সম্বন্ধে থেরাবাদীদের ও মহাসাংঘিকদের বিশেষ মতান্তর। থেরাবাদীরা চব্বিশটি বই বুদ্ধ মানেন না।—১ দীপঙ্কর, ২ কৌণ্ডিন্য, ৩ মঙ্গল, ৪ সুমনস, ৫ রেবত, ৬ শোভিত, ৭ অনোমদর্শিন্, ৮ পদ্ম, ৯ নারদ, ১০ পদ্মোত্তর, ১১ সুমেধাঃ, ১২ সুজাত, ১৩ প্রিয়দর্শিন্, ১৪ অর্থদর্শিন্, ১৫ ধর্ম্মদর্শিন্, ১৬ সিদ্ধার্থ, ১৭ তিষ্য, ১৮ পুষ্য, ১৯ বিপশ্যী, ২০ শিখী, ২১ বিশ্বভূ, ২২ ক্রকুচ্ছন্দ, ২৩ কনকমুনি, ২৪ কাশ্যপ। ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি যিনি শাক্যমুনি বুদ্ধ হইবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, তিনি তিনিই শাক্যমুনি বুদ্ধের নিদান।

দীপঙ্কর তাঁহার এক শিষ্য মেঘ নামে এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে বলিয়াছিলেন, অনাগত অধ্বা অর্থাৎ ভবিষ্যকালে তুমি শাক্যমুনি নামে বুদ্ধ হইবে, কপিলবাস্তু তোমার জন্মভূমি হইবে, শুদ্ধোদন তোমার পিতা হইবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই চব্বিশ জনের মধ্যে আরও ২।৪ জন শাক্যমুনি সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিয়া গিয়াছেন। চব্বিশজনের শেষ বুদ্ধ কাশ্যপ বলিয়াছিলেন, হে শিষ্য জ্যোতিপাল, আমার পরেই ভবিষ্যতে তুমি শাক্যমুনি বুদ্ধ হইবে।

এই হইল থেরাবাদমতে শাক্যসিংহের নিদান। এ মতে বুদ্ধ চব্বিশজন কেন হইলেন, বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয়, সেকালের লোকে চব্বিশ সংখ্যাটা বড় ভালবাসিত। থেরাবাদীদের ত চব্বিশজন বুদ্ধ ছিলেন; জৈনদের চব্বিশজন তীর্থঙ্কর; সাংখ্যদের চব্বিশটি তত্ত্ব; কোন কোন পুরাণে ভগবানের অবতার চব্বিশটি; আমরা যে-সকল মুনিদের মত লইয়া চলি, তাঁহাদেরও সংখ্যা চব্বিশ,—"চতুর্ব্বিংশতিমুনিমতম্" নামে একখানি প্রাচীন স্মৃতি-সংগ্রহ আছে।

মহাসাংঘিকদের মতে বুদ্ধনিদান অন্যরূপ। তাঁহাদের মতে বোধিসত্ত্বগণের চারিপ্রকার চর্য্যা অর্থাৎ আচার আছে। এক এক চর্য্যায় কত শত জন্মজন্মান্তর চলিয়া যায়। থেরাবাদীরা যাহা বলিতেছেন, তাহা শেষ চর্য্যার শেষ অংশ মাত্র; পূর্ব্ব তিনটি চর্য্যার নামও ইহাতে নাই। চর্য্যা চারিটির নাম—১ প্রকৃতিচর্য্যা, ২ প্রণিধানচর্য্যা, ৩ অনুলোমচর্য্যা, ৪ অনিবর্ত্তনচর্য্যা।

প্রকৃতিচর্য্যায় বোধিসত্ত্ব মাতৃভক্ত, পিতৃভক্ত, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্, কুল-জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তিমান্, দশ কুশলকর্ম্মপথের পথিক, লোককে সর্ব্বদাই দান করিতে পুণ্যকর্ম্ম করিতে উপদেশ দেন, বুদ্ধদিগের পূজা করেন; কিন্তু তাঁহার মন এখনও বোধি লাভের জন্য লালায়িত নয়।

ইহার পরে প্রণিধানচর্য্যা অর্থাৎ আমাকে বুদ্ধ হইতেই হইবে ইহা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা। এই প্রণিধানচর্য্যায় পাঁচটি অংশ আছে, এক একটির নাম প্রণিধি। প্রথম প্রণিধি—আমি বুদ্ধ হইব। দ্বিতীয় প্রণিধি—আমি বুদ্ধকে অনেক বস্তু দান করিলাম। তৃতীয় প্রণিধি—যত কালই যাউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, আমাকে বুদ্ধ হইতেই হইবে। চতুর্থ প্রণিধি, বুদ্ধ ও সংঘের জন্য অনেক গুহা, অনেক বিহার দান করা। পঞ্চম প্রণিধি, জগৎ অনিত্য, এইটি বুঝিতেই হইবে।

ইহার পর তৃতীয়, অনুলোমচর্য্যা। প্রণিধান চর্য্যার অনুকূল যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা এই চর্য্যায়ও করিতে হয়।

চতুর্থ—অনিবর্ত্তনচর্য্যা, এই চর্য্যা বোধিলাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিত্ত আর অন্য দিকে ফিরিয়া আসিতে চাহে না, এই চর্য্যায়ই ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা অথবা ভবিষ্যদ্বাণী। অর্থাৎ কোন বুদ্ধ তাঁহার শিষ্য বোধিসত্ত্বকে বলিয়া দেন, তুমি ভবিষ্যতে কোন না কোন সময়ে বুদ্ধ হইবে। থেরাবাদীদের নিদান এই ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, উহা একপ্রকার শেষ চর্য্যার নিদান।

তবে মহাসাংঘিকদের নিদান কিরূপ? চারি চর্য্যায় অসংখ্য নিদান। শাক্যসিংহের প্রকৃতিচর্য্যার নিদান অপরিমিতধ্বজ বুদ্ধ। তখন আমাদের শাক্যমুনি একজন চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। তিনি ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইয়া দশ কুশলকর্ম্মপথের পথিক হন, বৌদ্ধ ভাষায়—দশ কুশলকর্ম্মের গোড়া গাড়েন। প্রণিধানচর্য্যায় আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধের নিদান একজন অতীত শাক্যমুনি বুদ্ধ। আমাদের শাক্যমুনি তখন বণিক্‌শ্রেষ্ঠী ছিলেন, তিনি বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমিও একদিন শাক্যমুনি নামে বুদ্ধ হইব, আমারও একদিন কপিলবাস্তু নামে নগর হইবে। অনুলোমচর্য্যায় শাক্যমুনির নিদান সমিতাবী বুদ্ধ। তখন শাক্যমুনি একজন চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। অনিবর্ত্তনচর্য্যায় শাক্যমুনির অনেক নিদান; তন্মধ্যে দীপঙ্কর তাঁহার ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। দীপঙ্করের পরে আরও অনেক বুদ্ধ সেই ব্যাকরণের অনু-ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাভিভূ ভগবান্ বুদ্ধ অনু-ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। বিপশ্যী, ক্রকুচ্ছন্দ, কাশ্যপ শাক্যমুনির ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। কাশ্যপ আবার বলিয়াছিলেন, তোমায় আমি যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলাম।

যৌবরাজ্যে অভিষেক থেরাবাদীদের নাই, চব্বিশজনের অধিক বুদ্ধও নাই, কিন্তু মহাসাংঘিকদের মতে সহস্র সহস্র বুদ্ধ। মহাবস্তু অবদানের আদিতেই "নিদাননমস্কারাণি সমাপ্তানি" বলিয়া একটি ছোট্ট প্যারাগ্রাফ আছে। সেই প্যারাগ্রাফে যে কয়েকটি নিদানের নাম আছে, তাহাই আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। কিন্তু বই পড়িতে পড়িতে অনেক বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। মহাবস্তুর মূল গদ্য, কিন্তু তাহার আবার মূল পদ্যে বা গাথায় আছে।

মহাসাংঘিকদের সংখ্যাটা খুব লম্বা লম্বা। কথায় কথায় তিন কোটি, চারি কোটি, নব্বই হাজার, বিশ হাজার, চৌরাশী হাজার বুদ্ধের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। গরিব থেরাবাদীদের অত লম্বা-চৌড়া ছিল না। এ দিকে যেমন সংখ্যায় লম্বা-চৌড়া, কালের পরিমাণেও মহাসাংঘিকেরা সেইরূপ লম্বা-চৌড়া। নবনবতিকোটিকল্প মহাযানীরা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মহাসাংঘিকেরাও বড় কম যান না। সমিতাবী নামে একজন বুদ্ধ দেখিলেন, আমি [illegible]

কল্পের পরে বুদ্ধ হইবেন। কিন্তু এত কাল ধরিয়া ত বুদ্ধ-কার্য্য হওয়া চাই। বুদ্ধ হইবে না; ত, কে করিবে? অতএব আমাকেই থাকিতে হইল। তিনি শত সহস্র কল্প রহিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন সহস্র কল্পের পর বুদ্ধ হইবেন, এখন শত সহস্র কল্প রহিয়া গেলেন! মাঝের ও-শতটা যেন কিছুই নয়!

অল্পবয়স্ক ভিক্ষুরা বুদ্ধদেব আশীবৎসরে মরিয়া গেলেন বলিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন, বুদ্ধদেব ত মনে করিলেই এক কল্প দুই কল্প থাকিতে পারিতেন, থাকিলেন না কেন? থেরাবাদীরা বলিলেন, তিনি মরিয়াছেন। অনেক বিরুদ্ধবাদীরা বলিলেন, না, তিনি মরেন নাই, মরিবেনও না, তিনি মৃত্যুর ভান করিয়াছেন মাত্র। কোন কোন মহাযানের বইয়ে আছে, সমুদ্রের জলবিন্দু বরং গণিয়া উঠা যায়, সুমেরু গুঁড়াইয়া সরিষার মত করিয়া ফেলিলে সে সরিষাও গণিয়া উঠা যায়, কিন্তু শাক্যমুনির বয়স গণিয়া উঠা যায় না।

পালি জাতকে বুদ্ধদেবের নিদানের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া আছে, মহাবস্তুতে সেগুলি একত্র করিয়া একটা ধারা বাঁধিয়া লেখা আছে। ধারা এই যে, চারি চর্য্যায় যতগুলি নিদান আছে, চর্য্যাক্রমে সেগুলিকে সাজান হইয়াছে। কালের পরিমাণ যতই লম্বা চৌড়া হউক, সময়ানুসারে সেগুলিকে সাজান হইয়াছে। থেরাবাদীরা "বুদ্ধায় নমঃ" বলিলেই যথেষ্ট মনে করেন, কিন্তু ইহাঁরা গোড়াইই আরম্ভ করিলেন, "ওঁ নমঃ শ্রীমহাবুদ্ধায়াতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নেভ্যঃ সর্ব্ববুদ্ধেভ্যঃ" অর্থাৎ তাঁহারা এক বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে যত বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, হইবেন ও হইতেছেন, সকল বুদ্ধকে নমস্কার করিতেছেন। থেরাবাদীরা চব্বিশ ও দুই (শাক্যসিংহ ও মৈত্রেয়) এই ছাব্বিশজনেই সন্তুষ্ট, কিন্তু মহাসাংঘিকেরা "ছাব্বিশকোটিনিযুতশতসহস্রে"ও সন্তুষ্ট নহেন!

নিদান-নমস্কারে প্রকৃতিচর্য্যায় ভগবান্ শাক্যসিংহ একজন মাত্র অর্থাৎ অপরিমিতধ্বজ বুদ্ধের নিকটে ধর্ম্মের গোড়া গাড়িয়াছিলেন, কিন্তু সংক্ষেপের জন্য সেখানে একজনের নাম করা হইয়াছে। বহুতর বুদ্ধের নিকটেই তিনি ধর্ম্মের গোড়া গাড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বিস্তার করিয়া দেওয়া আছে। যথা—

প্রথমতঃ সত্যধর্ম্মবিপুলকীর্ত্তিঃ, ততঃ সুকীর্ত্তিঃ, লোকাভরণঃ, বিদ্যুৎপ্রভঃ, ইন্দ্রতেজঃ, ব্রহ্মকীর্ত্তিঃ, বসুন্ধরঃ, সুপার্শ্বঃ, অনুপবদ্যঃ, সুজ্যেষ্ঠঃ, সুষ্টরূপঃ, প্রশস্তগুণরাশিঃ, মেঘস্বরঃ, হেমবর্ণঃ, সুন্দরবর্ণঃ, মৃগরাজঘোষঃ, আশুকারী, ধৃতরাষ্ট্রগতিঃ, লোকাভিলষিতঃ, জিতশত্রুঃ, সুপূজিতঃ, যশোরাশিঃ, অমিততেজঃ, সূর্য্যগুহ্যঃ, চন্দ্রভানুঃ, নিশ্চিতার্থঃ, কুসুমগুপ্তঃ, পদ্মাভঃ, প্রভংকরঃ, দীপ্ততেজঃ, সপ্তরাজাঃ, গজদেবঃ, কুঞ্জরগতিঃ, সুঘোষঃ, সমবুদ্ধিঃ, হেমবর্ণ-লম্বদামঃ, কুসুমদামঃ, রত্নদামঃ, অলংকৃতঃ, বিমুক্তঃ, ঋষভগামী, ঋষভঃ, দেবসিদ্ধিমাত্রঃ, সুপাত্রঃ, সর্ব্ববন্দ্যঃ, রত্নমকুটঃ, চিত্রমকুটঃ, সুমকুটঃ, বরমকুটঃ, চলমকুটঃ, বিমলমকুটঃ, লোকংধরঃ, বিপুলোজঃ, অপরিভিন্নঃ, পুণ্ডরীকনেত্রঃ, সর্ব্বসহঃ, ব্রহ্মগুপ্তঃ, সুব্রহ্ম, অমরদেবঃ, অরিমর্দ্দনঃ, চন্দ্রপদ্মঃ, চন্দ্রাভঃ, চন্দ্রতেজঃ, সুসৌমিঃ, সমুদ্রবুদ্ধিঃ, রতনশৃঙ্গঃ, সুচন্দ্রদৃষ্টিঃ, হেমক্রোড়ঃ, অভিন্নরাষ্ট্রঃ, অবিক্ষিপ্তাংশঃ, পুরন্দরঃ, পুণ্যদত্তঃ, হলধরঃ, ঋষভনেত্রঃ, বসুবাহুঃ, যশোদত্তঃ, কমলাক্ষঃ, দৃষ্টশক্তিঃ, নরপ্রবাহুঃ, প্রণষ্টদুঃখঃ, সমদৃষ্টিঃ, দৃঢ়দেবঃ, যশকেতুঃ, চিত্রচ্ছদঃ, চারুচ্ছদঃ, লোকপরিত্রাতা, দুঃখমুক্তঃ, রাষ্ট্রদেবঃ, রুদ্রদেবঃ, ভদ্রগুপ্তঃ, উদাগতঃ, অস্খলিত-প্রবরাগ্রঃ, ধনুনাসঃ, ধর্ম্মগুপ্তঃ, দেবগুপ্ত, শুচিগাত্রঃ, প্রহেতিঃ, প্রথমশতমার্য্যপক্ষস্ত॥"

যেখানে একটি ছিল, সেখানে সাতানুব্বইটি নাম পাইলাম। গ্রন্থকার কিন্তু ইহাকেই একশত বলিয়াছেন, হয় ত লেখকের দোষে, তিনটি নাম পড়িয়া গিয়াছে। আর-একনিশ্বাসে আর-একশত নাম আছে। আরও একনিশ্বাসে প্রায় আর-একশত নাম আছে। ইহাতে ত "অষ্টমা ভূমি" শেষ হইল। আবার "নবমা ভূমি"তেও এইরূপ। সুতরাং লম্বা হাতে নাম বাড়াইতে মহাসাংঘিক মহাশয়েরা খুব মজবুত। ইহাদের সঙ্গে গরীব থেরাবাদীরা পারিবে কেন? কাজেই ক্রমে তাঁহাদিগকে ভারত ছাড়িতে হইয়াছে!

(নারায়ণ, চৈত্র) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* * *

রাজপুতানার দেবালয়ে বাঙ্গালী পূজারি।

রাজপুতানার অন্তর্গত পুষ্করাদি স্থানে যথেষ্ট বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ থাকা সত্ত্বেও, জয়পুরে, গোবিন্দ ও গোপীনাথ জীউর মন্দিরে, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজারির কার্য্য সম্পন্ন হয় কেন?

অবশ্য ঔরংজেবের সময়ে জয়পুর-রাজ ও কেরৌলী-রাজ গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের মন্দিরস্থিত বিগ্রহগুলিকে, অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বৃন্দাবন হইতে লইয়া গিয়াছিলেন সত্য, এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদিগের বাঙ্গালী পূজারিগণও ঐ সকল স্থানে গিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বংশধরেরা এতাবৎকাল পূজারির কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বৃন্দাবন ত বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত নহে! তথায়ই বা সে সময়ে, বাঙ্গালীরা পূজারির কর্ম্ম করিতেন কেন? সে প্রদেশে কি, সে সময়ে ব্রাহ্মণের অভাব ছিল?

না, তাহা নহে। সে স্থানে, তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। তথায় যথেষ্ট ব্রাহ্মণের বাস ছিল, এবং তাঁহারা বাঙ্গালী কবি জয়দেবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, বৃন্দাবনে ঐ সকল দেবালয়ে, পূজারির কর্ম্ম করিতেন। তবে এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

আমাদিগের বাঙ্গালা প্রদেশে যেমন রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সিংহাসনের মধ্যস্থলে থাকেন, সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে সমান স্থান খালি থাকে, পশ্চিমাঞ্চলে কিন্তু সেরূপ নহে। সিংহাসনের ঠিক মধ্যস্থলে কৃষ্ণ এবং বামে রাধিকা। কৃষ্ণের দক্ষিণ দিকে, আর কিছুই নাই।

তাহার কারণ—পূর্ব্বে কেবল কৃষ্ণই সিংহাসনের মধ্যস্থলে পূজিত হইতেন। তৎকালে মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানগুলি, ভরতপুর-রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। তখন দিল্লির সিংহাসনে পাঠান-রাজ কুতুবুদ্দিন। কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা অধিকার করিলে পর, বঙ্গভূমি যবনাধিকৃত হইয়াছে দেখিয়া, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তীর্থবাসী হইবার বাসনায়, বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত, বঙ্গভূমিতে বেদাধ্যয়ন খুব কমই আছে। যাহা আছে, তাহা অধিকাংশ পশ্চিমী ব্রাহ্মণের দ্বারা পঠিত হয়। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতেও পশ্চিমে বেদাধ্যয়নের ব্যবস্থা প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

সে সময়ের ভরতপুর রাজ ঐ সকল বাঙ্গালী-পণ্ডিতদিগের সম্প্রদায়-ভুক্ত জয়দেবের "গীত গোবিন্দ" গ্রন্থে লিখিত, রাধিকা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। কিন্তু সিংহাসনের মধ্যস্থলে, যেখানে পূর্ব্বাপর কৃষ্ণ পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন, সে স্থান হইতে তাঁহাকে একটুও সরান উচিত নয় বিবেচনায়, সিংহাসনের মধ্যস্থল হইতে তাঁহাকে একটুও সরান হয় নাই। তখন লতাকুঞ্জে ঐ সকল বিগ্রহের সিংহাসন থাকিত। ইহার বহু শতাব্দী পরে, মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ভরতপুর-রাজের এই নববিধান দর্শনে, ক্রুদ্ধ হইয়া পুরাতন পূজারিরা, এমন কি, তৎপ্রদেশীয় সকল ব্রাহ্মণই, মৎস্যাহারী বাঙ্গালীর রচিত গ্রন্থে লিখিত, নববিধানের বিগ্রহ পূজা করিতে অস্বীকার করায়, অগত্যা

ভরতপুর রাজ, ঐ সকল নবাগত বাঙ্গালীদিগকে পূজারির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(সুবর্ণবণিক সমাচার, বৈশাখ) শ্রীদুনিয়ালাল মল্লিক।

* * *

বাংলার রকমারি ধান।

আমন ধান—সমগ্র ভারতে প্রায় ১০ হাজার রকম আমন জাতীয় ধান চাষ হয়। বাঙলা দেশে আমন ধানের সংখ্যা ৪ হাজারের কম হইবে না।

সুন্দরবন জঙ্গল মহলে ২৫।৩০ রকম, মেদিনীপুরে ৩০।৩২ রকম, যশোহরে ৬২ রকম, ঢাকা বরিশালে শতাধিক রকম, ২৪ পরগণা, নদীয়ায় ৬০।৬২ রকম, হুগলী বৰ্দ্ধমান পুর্ণিয়ায় ৭০।৭২ রকম, আসামেও বহু রকম ধানের আবাদ হয়।

বাঙলার কয়েকটি আমন ধানের নাম—কার্ত্তিকশাল, জটাকল্মা, ঝিঙ্গাশাল, ইন্দ্রশাল, হাতিশাল, কামিনীশাল, সাদাশঙ্খা, বাঁকতুলসী, নাগরা, দাউদখানি, কাটারিভোগ, বাদসাভোগ, সমুদ্রবালি, বাসমতি।

আউস ধান।—কত প্রকার আউস আছে তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। দেখা যায় যে—মেদিনীপুরে ১৬ প্রকার; বীরভূমে ৬৬ প্রকার; বৰ্দ্ধমানে ৪।৫ প্রকার; ২৪ পরগণায় ৩০ প্রকার; সুন্দরবন বিভাগে ১০ প্রকার; নদীয়া জেলায় (এখানে আমন অপেক্ষা আউসের চাষই অধিক)—১০ প্রকার; জলপাইগুড়িতে ২।৩ প্রকার; দিনাজপুরে ৮ প্রকার; ফরিদপুরে (এখানেও আউসের চাষ অধিক) ৮ প্রকার; বাখরগঞ্জে ২১ প্রকার; আসামে ২০।২২ প্রকার; ঢাকা, মৈমনসিং ও রংপুরে বহু প্রকার আউসের আবাদ হয়। চট্টগ্রামে আউস-বালাম নামে এক প্রকার আউসের চাষ হয় তাহা কিছু মিহি, আউস পাটনাই ও আউস রামশাল ধানও আউসের মধ্যে মিহি। আউস রামশাল বীরভূমের আউস। এখন ২৪ পরগণায় চাষ হইতেছে।

কতগুলি আউস ধানের নাম—

দুর্গাভোগ, দুধকল্মা, কেলে রয়ে, কেলে বোগড়া, লক্ষ্মী পারিজাত, লক্ষ্মীপুরা, রাজা শাইল, শালাই, সীতাহার, সুখামণি, সুখামুখী।

বোরো ও জলি ধান।—বোরো ধানকে আমন বা আউস কিছুই বলা যায় না। ইহা উহাদের মাঝামাঝি এক প্রকার মোটা ধান্য। জলি ধানকে বরং আউসের শ্রেণীতে ফেলা যায়।

(কৃষক, ফাল্গুন-চৈত্র) শ্রীশশীভূষণ সরকার।

* * *

অবরোধ প্রথার দুর্গতি।

অবস্থা এমনই শোচনীয় এবং জঘন্য হইয়া পড়িয়াছে যে, আমাদের স্ত্রীলোকেরা পল্লীগ্রামের দশপাদভূমি যাইতে হইলে আটজন পুরুষের কাঁধে চড়িয়া যান। ইহাই হইতেছে সম্ভ্রমের লক্ষণ? একজন মানুষ, দুইজন, চারি বা আটজন মানুষের কাঁধে চড়িয়া যাইতেছে, ইহা যারপরনাই অসভ্য ও নিন্দনীয় প্রথা। যাহাদের কাঁধে চড়া যায় আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞানের হিসাবে তাহারা পশুরও অধম হইয়া যায়। যাহারা আরোহণ করে, তাহাদেরও আত্মার অবনতি হয়।

এই পৈশাচিক অবরোধ-প্রথার ফলেই আমাদের স্ত্রীলোকদিগের দুপাদভূমি যাইতে হইলেও এক ধুমধাম পড়িয়া যায়। বিধাতা হাঁটিবার জন্যই পা সৃষ্টি করিয়াছেন, পাল্কীতে তুলিয়া রাখিবার জন্য নহে।

ইউরোপীয় একটি স্ত্রীলোক পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রেলে ষ্টীমারে অশ্বে পদব্রজে আত্মরক্ষা করিয়া স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে সক্ষম। আর আমাদের স্ত্রীলোকেরা নিজের পল্লীতে বাহির হইতেও অক্ষম; ইহা কি আমাদের জাতির জড়ত্ব ও হীনতার লক্ষণ নহে?

এদেশে আর্য্য বংশীয় হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধ-প্রথা সম্মানজনক বোধ হইত বলিয়া, মুসলমানদের মধ্যেও এই প্রথা ক্রমশঃ দৃঢ় বদ্ধমূল হয়। কিন্তু এদেশে যে-সমস্ত মুসলমান মহিলা আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বাধীনা ছিলেন। অনেক হিন্দু লেখক ও পণ্ডিত নিজেদের জাতীয় কলঙ্ক মুসলমানের ঘাড়ে চাপাইবার জন্য এসলাম ধৰ্ম্ম এবং মুসলমানদিগকেই এই কুপ্রথার জন্য দায়ী করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মুসলমানদের দেখাদেখি কিম্বা মুসলমানদিগের অত্যাচার ভয়ে হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধের সৃষ্টি, ইহা অপেক্ষা মিথ্যা কল্পনা আর কিছুই হইতে পারে না। আসল কথা হইতেছে—আর্য্য হিন্দুদের মধ্যে পূৰ্ব্ব হইতেই অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল। আর কোচ, রাজবংশী, এবং দ্রাবিড়, তৈলঙ্গী ও মারাঠী প্রভৃতি অনার্য্য হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধ-প্রথা কোনও কালেই ছিল না। এসলাম ধর্ম্মে অবরোধ প্রথার সমর্থন নাই এবং অন্য কোনও মুসলমান দেশে উহা প্রচলিতও নাই; ইহা যে, ভারতবর্ষীয় প্রথা তাহা বলাই বাহুল্য।

খলিফার নেতৃরূপে নিৰ্ব্বাচিত হইবার সময় পুরুষদিগের নিকট হইতে যেমন "ভোট" লইতে হইত, স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতেও তেমনি "ভোট" লওয়া হইত। স্ত্রীলোকেরা খলিফার দরবারে উপস্থিত হইয়া ভোট দিতেন। এসলাম স্ত্রীজাতিকে যে অধিকার ও সম্মান দিয়াছে, অন্য কোনও ধর্ম্মেই তাহা দিতে পারে নাই। এসলাম ধর্ম্মে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের অধীন।

সৎশিক্ষা এবং স্বাধীনতাই চরিত্র রক্ষা এবং মহত্ত্ব লাভের একমাত্র উপায়। নিজের মনের বলে এবং নিজের শিক্ষায় স্ত্রীলোকেরা যদি ধর্ম্মানুরাগিণী এবং সতীত্বপরায়ণা না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে জবরদস্তি করিয়া কারাগারে বদ্ধ করিয়া সতী সাজাইয়া রাখিবার চেষ্টা যারপরনাই কৃত্রিম এবং হাস্যাস্পদ।

মানুষের হৃদয় যতই সঙ্কীর্ণ এবং দুৰ্ব্বল হইবে, পাপও তত বেশী হইবে। মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী হৃদয়ের দুৰ্ব্বলতাই হইতেছে পাপানুষ্ঠানের প্রধান কারণ। আর পরাধীনতা, শিক্ষার অভাব, অনভিজ্ঞতাই হইতেছে দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ। আর আমাদের দেশে এই পরাধীনতা মূর্খতা এবং অনভিজ্ঞতার প্রধান কারণ হইতেছে—অবরোধ। সুতরাং অবরোধ-প্রথাকে বিলুপ্ত করিলে শিক্ষা স্বাধীনতা এবং অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে-সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র আরও উন্নত পবিত্র এবং উজ্জ্বল ও সরল হইবে। আরব্য, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশের স্ত্রী-সমাজই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশে অবরোধ-প্রথা থাকার দরুন স্ত্রীলোকেরা অশিক্ষিত দুর্ব্বলদেহ ও দুর্ব্বলমন।

কোনও দেশের পুরুষদিগের চরিত্র কখনই উন্নত হইতে পারে না—যদি তাহাদের স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিত ও স্বাধীন না হয়। স্ত্রী অশিক্ষিত এবং মূর্খ বলিয়াই আমাদের দেশের বহুলোক চরিত্রহীন হইবার সুবিধা পায় নাই কি?

আমাদের স্ত্রীলোকেরা অবরোধবাসের ফলে এতই ভীরু, এত বেশী মাত্রায় লজ্জাশীলা এবং দুৰ্ব্বলপ্রকৃতি-বিশিষ্টা হইয়া পড়িয়াছেন যে একটা গুণ্ডা বা বদমাশকে দেখা মাত্রই ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। কি পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান রাজ্যসমূহ, কি ইউরোপখণ্ড, কোথায়ও স্ত্রীস্বাধীনদেশে পথে ঘাটে স্ত্রীলোকদের উপর গুণ্ডাদের অত্যাচারের কথা কদাপি শুনা যায় না।

একবার আমাদের পরিচিত একটি দারোগার বাসায় আগুন

লাগিয়াছিল। পার্শ্বেই কতিপয় মুসলমানের বাড়ী ছিল। তথাপি দারোগার স্ত্রীটি বাটীর বাহিরে যাইতে সাহসী হন নাই। মূর্খ ও বেওকুফ ব্যক্তিরা ইহা খুব গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারে; কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বুঝিতেছেন যে, ইহা আমাদের নারী-জাতির শোচনীয় নিশ্চলত্ব ও জড়ত্বের অতীব ভয়াবহ দৃষ্টান্ত।

যে জাতির নারীরা এইরূপভাবে মনুষ্যত্বহীন এবং জড়ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন, তাঁহাদের গর্ভে বীর ধীর কর্ম্মী ও তেজীয়ান সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা নিতান্তই কি আকাশকুসুম নহে? তাই প্রাণের আবেগে এবং কর্ত্তব্যের আহ্বানে ও ধর্ম্মের অনুরোধে আজ শিক্ষিত নবাযুবক ও আলেমগণকে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা এবং স্বাধীনতা দান করিবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে আহ্বান করিতেছি। আশা করি যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণ সত্যসন্ধ তেজস্বী চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের সাড়া ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব না।

(আল-এস্‌লাম, ফাল্গুন চৈত্র) সিরাজী।

রুশ-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আমাদের দেশে সাধারণ ইংরেজিনবিশ পাঠকেরা রুশ-সাহিত্যের সংবাদ খুব অল্পই রাখেন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র টলষ্টয়ই অল্প-বিস্তর পরিচিত। টলষ্টয় ছাড়া অন্যান্য অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন রুশ-সাহিত্যিকের রচনার সহিত পরিচয় বাংলাদেশে মাত্র অল্প-সংখ্যক সাহিত্যরসিকের আছে। মাসিক-পত্রের স্বল্প পরিসর প্রবন্ধের মধ্যে রুশ-সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয় অসম্ভব। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে রুশ-সাহিত্য-রথীগণের পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো।

রুশ-সাহিত্যের অন্তর্গত যে-কোনো প্রসিদ্ধ পুস্তকের মধ্যে বারবার পুশকিনের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলেকজাণ্ডার পুশকিন রুশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। ইহাঁর জন্ম মস্কো নগরে, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে। তিনি নিত্য-পরিবর্ত্তন-শীল সমুদ্র, ডানিউব নদী দ্বারা ধৌত জনপদ ও ক্রিমিয়া দেশ সম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা রচনা করেছিলেন।

"স্বাধীনতার জয়গান" রচনা করায় তাঁর প্রায় দ্বীপান্তর হবার জোগাড় হয়েছিল। ১৮৩৭ সালে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি নিহত হন। "ইউজেন ওনেগিন্" তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। পুশকিনের একটি কবিতার অনুবাদ এই :—

দিব্যজ্ঞানী।

আমার মন শ্রান্ত হইয়াছিল, আমি তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছিলাম, তিমির-মগন বিজন প্রদেশে আমি পথভ্রান্ত হইয়াছিলাম।

পথের চৌমাথায় স্বর্গদূত ছয় পক্ষ মেলিয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

আমার অক্ষি-পল্লব তিনি স্পর্শ করিলেন, তাঁর আঙুলগুলি ঘুমের মত কোমল;

ভয়ার্ত্ত ঈগলের চোখের মত আমার দিব্যদৃষ্টিপূর্ণ চোখদুটি খুলিয়া গেল।

তিনি আমার কর্ণমূল স্পর্শ করিলেন এবং উহা বিচিত্র শব্দ ও কোলাহলে ভরিয়া দিলেন; শুনিতে পাইলাম আকাশ কম্পিত হইতেছে, ঊর্দ্ধে দেবদূতেরা দ্রুতগতি চলিয়াছে, গভীর জলের তলে লক্ষ লক্ষ প্রাণী চলা-ফেরা করিতেছে—এমন কি শুনিতে পাইলাম উপত্যকায় বৃক্ষশাখা গজাইয়া উঠিতেছে। তিনি আমার উপর নত হইয়া পড়িয়া আমার ঠোঁটের দিকে চাহিলেন; আমার পাপপূর্ণ জিহ্বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; যাহা অলস এবং যাহা মন্দ ডান হাতে তাহা লইলেন,—রক্তে সে হাত ভিজিয়া গেল; এবং আমার মৃতপ্রায় ঠোঁট দুখানির মধ্যে আমার জিহ্বার স্থানে এক বহুদর্শী সর্পের জিহ্বা তিনি বসাইয়া দিলেন।

তরবারি দিয়া তিনি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিলেন; আমার কম্পিত হৃদয় তিনি উপড়াইয়া লইলেন; এবং আমার ক্ষত-বিক্ষত বুকের মধ্যে তিনি একখানি জ্বলন্ত অঙ্গার স্থাপন করিলেন।

মরুভূমির উপর মৃতদেহের মত আমি পড়িয়া ছিলাম, বিধাতা আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "হে দিব্যজ্ঞানী জাগ্রত হও, অবহিত হও, শ্রবণ কর; আমার ইচ্ছায় পূর্ণ হও; জলস্থলের উপর দিয়া চলিয়া যাও, এবং আমার বাণীর আলোকে জগজনের চিত্ত আলোকিত কর।"

তাঁর পরবর্ত্তী কবির নাম মাইকেল লীরমণ্টভ। এঁর জন্ম মস্কো নগরে ১৮১৪ সালে। ইনি চমৎকার গীতি-কবিতা রচনা করে' গিয়েছেন। সাতাশ বছর বয়সে তিনি একখানি উপন্যাস লেখেন, তার ফলে তাঁকে একটি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করতে হয় এবং সেই যুদ্ধে তিনি মারা পড়েন।

তার পর বিখ্যাত ঔপন্যাসিক নিকোলাস গোগোলের জন্ম। তাঁর নিখুঁত চরিত্রসৃষ্টি এবং বিদ্রূপাত্মক রচনা করবার শক্তি ছিল অসাধারণ। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম, মৃত্যু ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। ইভান টুর্গেনিভ এবং ডষ্টএভস্কি তাঁর সমসাময়িক ছিলেন।

কাউণ্ট টলষ্টয় ১৮২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ন'বছর বয়সে তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। বাল্যকালে তিনি স্নেহের অভাবে যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁর রচনার মধ্যে একস্থানে আছে, নির্জ্জনে একদিন বসে' ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হল মৃত্যু সর্ব্বদাই আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় বসে আছে; এবং সুখলাভ করতে হলে ভবিষ্যতের চিন্তা না করে' বর্ত্তমানকে উপভোগ করতে হবে! মাত্র এগারো বছর বয়সেই টলষ্টয় জীবনের নানা তত্ত্ব চিন্তা করতেন

জীবনকে ভোগের মধ্যে নিমজ্জিত করেও তিনি সুখী হননি। ভোগময় জীবনের অবসাদ তাঁর "যৌবন"-নামক রচনায় সু-প্রকাশিত। তিনি বরাবরই প্রকৃতি-প্রেমিক ছিলেন। প্রকৃতির সঙ্গে যোগ স্থাপনে এবং প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে লীন করে' দেওয়াতেই যথার্থ সুখ।—একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। টলষ্টয় এবং টুর্গেনিভের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও দুজনের মতের মিল একেবারেই ছিল না। টলষ্টয় ভাবতেন সাধারণ লোক উচ্চ শ্রেণীর লোকদের চেয়েও মোটামুটি শক্তিমান, ন্যায়পরায়ণ, এবং দয়ালু। ১৯০১ সালে "রিসারেকশন" নামক বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করার জন্যে পাদরিরা গির্জ্জার খাতা থেকে তাঁর নাম কেটে দ্যান। ১৯১০ সালে তিনি নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে সুনিপুণ অসামান্য শক্তিশালী লেখক ডষ্টএভস্কির জন্ম ১৮২১ সালে, এবং মৃত্যু ১৮৮১ সালে। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস Crime and Punishment একবার পড়লে আর ভোলা যায় না। এ বইখানির সম্বন্ধে একজন সমালোচক লিখেছেন "গভীরতম ট্রাজেডির বিকাশে, পাঠকের মনে সহানুভূতি এবং ভীতি উৎপাদনে আর কোনো উপন্যাস এতদূর সফল হয়নি।"

ডষ্টএভস্কির জীবন দুঃখময় বিপদসঙ্কুল। তাঁর জন্ম হয় মস্কোর দরিদ্র লোকেদের এক হাসপাতালে। তেইশ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। ১৮৪৯ সালে স্বাধীনতাকামী এক সভার সভ্যরূপে অন্যান্য ৪৩ জন সঙ্গীর সহিত তিনি ধরা পড়েন। সকলের প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হয়। তিনি ও তাঁর ২১ জন সঙ্গী বধ্য-ভূমিতে নীত হলেন, তাঁদের গায়ের জামা খুলে নেওয়া হল। মৃত্যুদণ্ডের আদেশপত্র সকলকে পড়ে' শোনানো হল। সকলে ক্রুশ চুম্বন করলেন এবং তার পর প্রথম তিনজনকে চোখ বেঁধে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হল। তারপর বন্দুকে টোটা ভরবার হুকুম দেওয়া হল। আর এক মুহূর্ত্ত পরেই সব শেষ হবে। এমন সময়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এক কর্ম্মচারী এলেন—মৃত্যুদণ্ড রহিত করে' সাইবিরিয়ায় সকলের কয়েদের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে। যে-তিনজনকে গুলি করবার জন্যে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে একজন সেই কয়েক মুহূর্ত্তের ভাবনাতেই উন্মত্ত হয়ে গেলেন।

সাইবিরিয়ার জেলের মধ্যে দাগী বদমায়েসদের সঙ্গে ডষ্টএভস্কি চার বৎসর কাটান (১৮৪৯—১৮৫২)। তারপর চার বৎসর তিনি সাধারণ সৈনিকের কাজ করেন।

১৮৬৬ সালে "Crime and Punishment" প্রকাশিত হয়। সাইবিরিয়ার কয়েদখানায় যে-অভিজ্ঞতা লাভ হয়, এ পুস্তকখানি তারই ফল। বইখানি চারিদিকে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অনেকগুলি পুস্তক রচনা করা সত্ত্বেও কখনো তাঁর আর্থিক সচ্ছলতা ঘটেনি। অন্নাভাবে প্রায়ই তিনি মরমর হতেন। একবার তিনি পাওনাদারের তাড়ায় দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন।

আর্টিষ্ট হিসাবে টুর্গেনিভকে রুশ-সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। টুর্গেনিভের জন্ম ১৮১১ ও মৃত্যু ১৮৮৩ সালে। Smoke ও Virgin Soil তাঁর বিখ্যাত রচনা। রুশ মনীষী ও গ্রন্থকার ক্রপট্‌কিন তাঁর আত্মজীবনী Memoirs of a Revolutionist নামক পুস্তকে এই দুখানি বইয়ের উল্লেখ করেছেন।

টুর্গেনিভ সম্বন্ধে এক সমালোচক বলেন—তাঁর কাছে ছিল মানব-মনের সকল প্রকোষ্ঠের চাবী। মানুষের উচ্চ এবং নীচ ভাব, মহৎ এবং হীন ভাব—কিছুই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না।

সূর্য্যালোক, আনন্দ এবং মানুষের জীবন-কাব্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। সেই জন্যেই যা-কিছু কুৎসিত অসুন্দর ও অসমঞ্জস তার প্রতি অত্যন্ত বিতৃষ্ণা থাকাতে তিনি মানব-প্রকৃতির যেটি কোমল দিক সেইটিই প্রকাশ করেছেন। প্রেমের বর্ণনা টুর্গেনিভের বিশেষত্ব। কৃষক-জীবনের ছোট ছোট চিত্র রচনা করে' তিনি তাঁর সাহিত্য-জীবন আরম্ভ করেন এবং সেগুলি তাঁর দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। টুর্গেনিভের উপন্যাসে আমরা কেবল শিক্ষিত রুশকেই দেখতে পাই, কারণ তিনি চিন্তাশীল অগ্রগামী রুশ-সমাজকেই ভালো-রকম জানতেন। তিনিও তাঁদেরই একজন ছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে বিদেশীরাই টুর্গেনিভের আর্টের সম্যক কদর করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এখন তাঁর দেশবাসীরা তাঁকে বুঝতে পেরেছেন। টুর্গেনিভ যে-সময়ে

জীবিত ছিলেন সে-যুগটা রুশিয়ার নিতান্ত নীরস গদ্যময় যুগ। দেশের যে-সকল লোকের প্রতি তিনি বিশেষ আসক্ত ছিলেন তাঁরাই তাঁর উচ্চাশা মহৎ-প্রচেষ্টা বুঝতে না পেরে বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হতেন। এর দরুন টুর্গেনিভের জীবন অত্যন্ত বিরস হয়ে উঠেছিল। টুর্গেনিভ রমণীচিত্র রচনার ওস্তাদ।

টুর্গেনিভ ও ডষ্টএভস্কির মৃত্যুর পর রুশ-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ অবসান হল। দেশের সাহিত্যে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ভাঁটা পড়ল। এই অবস্থা রুশ-জাপান যুদ্ধ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এসময় কয়েকজন মাত্র সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন— শেকভ, গার্সিন, করলেঙ্কো ও ম্যাকসিম গোর্কি। এঁদের মধ্যে শেকভ ও গোর্কি শ্রেষ্ঠ। শেকভ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে চিত্রিত করে' রুশ-সাহিত্যের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছেন। রুশ-সাহিত্যে কৌতুকের সুর তিনিই ফিরিয়ে এনেছেন। গোর্কি ভবঘুরে, শ্রমজীবী, চোর এবং বড় বড় শহরের নানা-প্রকার আবর্জ্জনা চিত্রিত করে' রুশ-সাহিত্যে এক নূতন ধারার প্রবর্তন করেছেন। গোর্কির আলোচ্য বিষয়গুলি স্বপ্নেরও অগোচর দেশের দ্বার খুলেছে। জীবনের প্রতি গোর্কির এবং তাঁর চিত্রিত নায়কদের যে ভাব, তা তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী রুশ-ঔপন্যাসিকদের ভাব থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

যে-ধরণের জীবন ও তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন তিনি চিত্রিত করেছেন ও যে-ভাবে করেছেন তা একেবারে নূতন, তাঁর নিজস্ব। বিশেষ করে' প্রকৃতির বর্ণনায় এই কথা প্রযুজ্য। রুশগদ্য-সাহিত্যে তাঁর রচনাতেই সর্ব্বপ্রথম আমরা বাঁধি নিসর্গ-চিত্র ছেড়ে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে প্রাণের পরিচয় করতে দাঁড়াই। গোর্কির "মাদার" বা "কমরেড্‌স্" এবং "থ্রী অফ্ দেম্" অতি উৎকৃষ্ট বই। কমরেড্‌স্ বইএ স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টার অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গোর্কি এইজন্য রাজরোষে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন। রাজতন্ত্র উচ্ছেদের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে এনে শিল্পবিভাগের কর্ত্তা করে দেওয়া হয়েছে।

শেকভ পুরাণো ধারাতেই রচনা করতেন। তিনি রুশিয়ার কর্ম্মহীনতার যুগ সকলের চেয়ে ভালো করে' দেখিয়েছেন। শেকভের চিত্র ফোটোগ্রাফের মত, কিন্তু তিনি আর্টিষ্ট-হিসাবেও নগণ্য নন; তাঁর রচনার মধ্যগত নিরাশার ভাব, কৌতুকরসবোধ ও মানব-প্রেমের দ্বারা অনেকটা সহনীয় হয়ে এসেছে। তা যদি না হত, তা' হলে তাঁর চিত্রিত ব্যবসাদার, ছাত্র, জমীদার, সরাইওয়ালা, স্কুলমাষ্টার, ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি যে দুঃখের দুঃসহ বোঝা বইছে, তার ভারে আমরা ভেঙে পড়তুম।

শেকভের অনেকগুলি রচনা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্যে লেখা হয়। তাঁর নাটক অভিনয় করা সহজ নয়। তিনি ১৯০৪ সালে রুশ-জাপান-যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর মারা যান।

রুশগদ্য-সাহিত্যে মেরেজকবস্কির স্থান—সমালোচনা-এবং কল্পনামূলক ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে। য়ুরোপে তাঁর রচিত The Death of the Gods, The Resurrection of the Gods এবং The Antichrist প্রসিদ্ধ। কিন্তু তিনি নিছক সমালোচনার মধ্যেই আরো বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। টলষ্টয়, ডষ্টএভস্কি এবং গোগোল সম্বন্ধে তিনি যে-সব বই লিখেছেন সেগুলি তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের চেয়েও ঢের বেশি মৌলিক এবং সুরচিত।

রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় লিওনাইড আণ্ড্রিভ নামে এক লেখক ছোটগল্প ও নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর লেখার ভঙ্গী সহজ ও সুন্দর।

রুশ-সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দ্যাখা যায় অন্যান্য দেশের সাহিত্যের তুলনায় এর জীবন অতি সংক্ষিপ্ত—রুশ-সাহিত্যের আরম্ভ ঊনবিংশ শতাব্দীতে। তার পর আমাদের মনে হয় যে এ-সাহিত্য অন্য সকল সাহিত্য অপেক্ষা বয়সে নবীন হলেও এর আত্মা সকলের চেয়ে প্রবীণ। কোনো কোনো দিকে পর্য্যালোচনা করলে মনে হয় বয়স্ক হবার আগেই এ-সাহিত্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছে; এইখানেই রুশ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়।

এ সাহিত্যের স্বাভাবিকতা ও আন্তরিকতা অতুল্য। এ-সাহিত্যের বস্তুতন্ত্রতা অসাধারণ; এবং এ-সাহিত্যের মধ্যে সেই গভীর দুঃখ ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় যা মহৎ অন্তঃকরণের নিজস্ব সম্পত্তি।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রহসন

(গল্প)

১

আমার নাম অসিতা; কিন্তু আমার রংটা নাকি ঠিক বিদ্যুতের মতোই শুভ্র, শানিত অসির মতন ঝকঝকে তাই অসিতা না বলে লোকে আমায় অসি বলে ডাকে।

আমার বাবা ছিলেন এলাহাবাদে ডাক্তার। সেখানে মা'কে যখন হারাই তখন আমার বয়স পাঁচ বৎসর। ঐ পাঁচ বৎসরের পরিচয়েই মা ছিলেন মা! আর এই কুড়ি বৎসর ধরে যাকেই আমার অতৃপ্ত স্নেহ-পিপাসা নিয়ে জড়াতে চেয়েছি, সে-ই আমায় একপাটি পুরোনো জুতোর মতো পথের পাশে ফেলে রেখে গেছে। আমি যেন একটা অভিশাপ!

আমরা মোটে দু ভাই বোন্। সেজন্য অবশ্য আপশোষ নেই; আমার ঐ একটি ভাই, সে বেঁচে থাকুক, শুভ্র নিষ্কলঙ্ক হোক তার চরিত্র, বংশের উপযুক্ত হোক তার শিক্ষা দীক্ষা, আর কিছু চাই না।

মনে আছে, আমরা খুব কেঁদেছিলুম। মৃত্যু যে কী ব্যাপার, তা আমার তখনো জানাই ছিল না; তবু আমার শিশুপ্রাণ জানি না কোন্ রহস্যময় বেদনায় হাহাকার করে উঠেছিল। আমার কাছে মা'র খানিকটা অশ্রু বুঝি পাওনা ছিল।—কি ঋণেই না আমায় বেঁধে রেখে গেছ মা গো! সে ঋণ শোধ দিতে প্রাণ যে যায়! এ দুঃখের কি আর শেষ নেই? এ অশ্রুর কি আর বিরাম নেই?······সে অশ্রুর ইতিহাসই আজ বলতে বসেছি।

তখন আমরা বড় হয়েছি। বাবা কাজ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। মাকে আমরা যত সহজে ভুলতে পেরেছিলুম, তিনি তত সহজে পারেননি। তাঁর সমস্ত কাজে একটা নিরুৎসাহ এসেছিল। যে টেবিলে বসে তিনি লেখাপড়া করতেন, চায়ের পেয়ালা থেকে আরম্ভ করে খাবারের প্লেট, খবরের কাগজ, চশমার খাপ, কাৎ-হয়ে-পড়া ফুলদান পর্য্যন্ত রাজ্যের সমস্ত জিনিষ মিলে তার উপরটাকে নিবিড় করে তুলত। সন্ধ্যা হলে উড়ে খানসামা গিরিধারী তার মেয়েলি গিন্নিপনায় আমাদের সকলকে অস্থির করে তুলে সেগুলোকে গুছিয়ে রেখে যেত। বাবা সর্ব্বদা আমায় কাছে কাছে রাখতে চাইতেন; তাঁর মনটা আমার হাসি-গল্পের মধ্যে যেন নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচত! কিন্তু তাঁকে অতটুকু সুখী করতেও যে কী অবহেলা ছিল আমার, সে কথা ভাবতেও আজ লজ্জায় অনুতাপে মাথাটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ে।

দাদার পড়বার ঘরে পাড়ার ছেলেদের মজলিস বসত। থেকে থেকে তাদের হাসির শব্দ আমার কানে এসে বাজত। আমি ভাবতুম, অতবড় একটা আনন্দ-লোক, সেখানে আমার প্রবেশের অধিকার নেই কেন, কেন নেই? বইয়ের পাতাগুলো ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়ে এই প্রশ্নটাই ফিরে ফিরে চোখের সামনে জেগে উঠত।

তাদের প্রত্যেকটি কথার মধ্য দিয়ে আমি একটা নূতনতর চিন্তার ধারার, একটা নূতনতর জীবনের পরিচয় পেতুম। একটা মোহ আমাকে ব্যাকুল করে তুলত। মনে হোত বাংলার মেয়েরা পুরুষদের কোনোদিন পুরুষের মতো করে পায় না। মেয়েরা খাটো হয়ে আছে বলেই তারাও খাটো হয়ে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে আসে; তাদের সত্যিকার চেহারা ধরা যায় না। এই জন্যেই বাংলার বুকের ওপর দুটো ভিন্ন জাত, ভিন্ন সুখ দুঃখ, ভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গড়ে উঠেছে। তাদের একের সঙ্গে অপরের কোনো যোগ নেই; সামান্য যেটুকু আছে তাও আবছায়ার মধ্য দিয়ে; নিতান্ত কেজো প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে; অশুচিতার মধ্য দিয়ে।

আমাদের বাড়ীর ঠিক সামনেই ছিল মাঠ। সেখানে তারা খেলতে নেমে গেলে, দাদার ঘরটিতে চোরের মতো এসে ঢুকতুম। এ ছিল মাতালের নেশার মতন। কেন যে তাদের বইগুলোকে নতুন মলাট পরিয়ে, জামাগুলো থেকে আরম্ভ করে ছাতাটিকে অবধি ঝেড়েঝুড়ে র‍্যাকে তুলে রেখে তৃপ্তিতে আমার মনটা কানায়-কানায় ভরতি হয়ে উঠত, সে কথা বোঝবার সাধ্য আমার কোনোদিন হয়নি, আজো না।

একদিন সকলে খেলে ফিরে এসেছে; আমি দাদার ঘর থেকে পালিয়ে এসে পাশের ঘরটিতে লুকিয়েছি।—

বাতাসে দুঘরের মাঝখানকার পর্দ্দাটা কেঁপে-কেঁপে উঠচে, তার সঙ্গে আমার বুকটাও দুরদুর করে কাঁপছে। একজন বল্লে "এ বাড়ীতে পা দিয়ে অবধি বইগুলোর স্বভাব বিগ্‌ড়ে গেছে। ওরা ঘড়ি ঘড়ি পোষাক বদলায়!" কে একজন গম্ভীরভাবে উত্তর করলে "দেশে বাবুয়ানার একটা হুজুক উঠেছে, এটার পরিণাম কিছুতেই ভালো হবে না!"—তারপর একটা চাপা গলার হাসি। ঘামে আমার সমস্ত শরীর ভেসে যেতে লাগ্‌ল। কে যেন আমায় খুনের দায়ে নির্ম্মম বিচারকের চোখের সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মনে হলো আমার মনের যে গোপন রহস্যটুকু আমি এতদিন ধরে বুঝতে চেষ্টা করেছি, তাই যেন তাদের সকলের কাছে ধরা পড়ে গেছে। চকিতের মতো সে-কথাটা আমারও মনে একটুখানি ছায়াপাত করে গেল; মনে হলো, উষ্ণ রক্তের স্রোত আমার কানের কাছে ভেরী বাজিয়ে নৃত্য করছে।

এরি মধ্যে কে একজন বলে উঠল—"এ যেন ঠিক সেই সোনার কাঠির স্বর্গের মতো—ইত্যাদি।" তার কথা শেষ হলে সকলে একসঙ্গে বাহবা দিয়ে উঠল। একজন তার পিঠ চাপড়ে বল্লে "ঠিক বলেছিস্‌ কবি!"

বাতাসে পর্দ্দাটাকে খুব জোরে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল! সেই একটি মুহূর্ত্তে যতখানি সম্ভব লোকটাকে দেখে নিলুম। কবি হওয়ার যোগ্য বটে! কী উজ্জ্বল তার চোখের দৃষ্টি, অথচ তার পশ্চাতে একটা অশ্রুর সাগর যেন নিসুপ্তির মতো মগ্ন হয়ে আছে!

নিঃশব্দে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে বাবার কাছে চলে গেলুম। গিরিধারী আলো ধরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, মাষ্টার-মশাই এককোণে একটি চেয়ারে বসে, একখানা বই নিয়ে তার পাতাগুলোকে একবার ডান থেকে বাঁয়ে আবার বাঁ থেকে ডানদিকে উল্টিয়ে যাচ্ছেন। বাবা বল্লেন "তোমায় ডাকব ভাবছিলুম অসি! তুমি নেহাৎ একলা আছ দেখে এঁকে আনিয়েছি।......এ মাসের সাধনাখানি একটু পড়ে শোনাও ত মা, সময়টা যেন কাটছেই না।"

রাতে শুতে যাওয়ার আগে দাদাকে সে কবিটির কথা জিজ্ঞাসা করলুম। দাদা বল্লেন "ও যে নিশীথ, আমার বন্ধু!"—এমন বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা বটে। কতক্ষণ চুপ করে রইলুম। পাঁজর ভেঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল; স্পষ্ট দেখলুম যে দীর্ঘশ্বাস দুখানা শুভ্র পাখা বিস্তার করলে, তারপর উড়ে গিয়ে নিশীথের পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়ল। মনটাকে বুঝালুম যে এ স্বপ্ন। প্রাণের সমস্ত গোপন সঞ্চয় নির্ভয়ে এখানে ছড়িয়ে রাখা চলে, কেউ দেখতে পায় না;—কিন্তু দাদা দেখতে পেয়েছিলেন।

পরদিন দাদার ঘরে আমার ডাক পড়ল। সেখানে আমার জন্যে কী দুর্ভাগ্যের আয়োজন হচ্ছে তা' ত আর আগে জানা ছিল না!—তবু কেন যে বুকটা ভয়ে সঙ্কোচে সেদিন এমনভাবে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল! ভাবছি, মা বুঝি সেদিন পেছন থেকে আমায় টেনেছিলেন তাঁর অদৃশ্য বাহুর অভয় প্রসার দিয়ে;- তখন কিন্তু সেকথা ভাবিনি।

দাদা আমায় জোর করেই ধরে নিয়ে গেলেন, বল্লেন "ঐ ত তোর দোষ অসি! সব তাতেই তোর লজ্জা।......এস নিশীথ, তোমাদের পরিচয় করে দি......" নীরবে নিশীথকে একটি কম্পিত হাতের নমস্কার জানিয়ে দাদার টেবিলের উপরকার কাগজগুলোকে খামকা গোছাতে আরম্ভ করলুম। কারো মুখেই কোনো কথা নেই, দাদা অপ্রতিভ হয়ে কেবল দুজনার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে, ঘেমে, ছুটে বেরিয়ে এসে বাঁচলুম; এমন দুর্ম্মতিও মানুষের হয়! মনে মনে দাদাকে অভিসম্পাত করলুম।

পরদিন দেখি দাদা নিশীথকে একবারে আমাদের চায়ের আবহাওয়ার মধ্যে ডবল প্রোমোশান দিয়ে তুলে এনেছেন। কবিতায় চায়ের পেয়ালাগুলো সেদিন ভরতি হয়ে উঠলো, নদীর দিকে চেয়ে মনে হলো তার স্রোতের সঙ্গে রূপকথার দিনগুলো যেন ভেসে ভেসে আসছে!

দাদা বল্লেন "নিশীথের সঙ্গে বন্ধুত্বটা আজ পাকাপাকি করে নেওয়া গেল অসি।—তুমি ওকে একটুও সঙ্কোচ করতে দিও না।" নিশীথের চোখের একটা সলজ্জ পুলকের হাসি আমার চারিদিকের বাতাসটাকে মাতাল করে দিয়ে গেল।

এর পর নিশীথের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কেমন করে যে এত সহজ হয়ে গেল, তা ভেবে আমিই আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। কাঁচা প্রণয় যে কখনো অসঙ্কোচ হতে পারে

এ ধারণা আমার আদপেই ছিল না ; এক্ষেত্রে দেখলুম তাও ঘটলো। সন্ধ্যাবেলাকার স্নিগ্ধ গাম্ভীর্যটুকুর মুখোমুখি বসে আমরা তার ভবিষ্যৎ জীবনখানিকে আমাদের আশা আমাদের উদ্দীপনা দিয়ে মণ্ডিত করে তুলতুম। উৎসাহের আবেগে তার চোখ দুটি জলজলে হয়ে উঠত। মাঝে-মাঝে সে তার তপ্ত হাত দুখানি দিয়ে আমার দুখানি হাত চেপে ধরত ; আমার সমস্তটুকু অনুভূতি তার সেই স্পর্শটুকুর মধ্যে আমি নিঃশেষে ডুবিয়ে দিতুম, আমার চোখের দৃষ্টি অবশ হয়ে আসত।

কিন্তু এর চেয়ে বেশী কোনোদিন কিছু পাইনি। যেটুকু অমনি পেয়েছি, আপনা হতে যে সুধাপাত্র আমার পিপাসু অন্তরের কাছে উঠে এসেছে, তাই নিয়ে আমি মাতাল।—আরো যে পাওয়া চাই,—অতবড় একটা কথা ভাবতেও বুকটা দুরদুর করে উঠত। পারতুম না—সাহস হোত না।

হায়রে! ভুলকে যতক্ষণ ভুলে থাকি, ততক্ষণ তার মতো বন্ধু আর কেউ নেই ; কিন্তু একবার সে ভাঙ্গলে—

(২)

আমার একটি মাসতুত বোন, বেচারি অনেকদিন রোগে ভুগে, পশ্চিমে ঘুরে-টুরে সুস্থ হয়ে কলকাতায় এসে প্রণয়-রোগে মারা পড়ল। সে উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে সেদিন ছিল পার্টি। ওকে অনেক কষ্টে তার স্বামীর কাছ থেকে ছাড়িয়ে আমাদের গানের মজলিসে নিয়ে এলুম। কথা রইল সেখানে তাকে একটা জিনিষ দেখাব।

নিশীথ তখন গান ধরেছিল। মেয়েরা গায়, সে গানের আড়াল থেকে অলঙ্কারের শব্দ ঝুমঝুমিয়ে মায়া তুলে ওঠে। আগুনে তো আর ভেজাল নেই, তার গলা থেকে সেদিন গলগল করে আগুন গলে পড়ছিল। সে আগুনে আর যাই হোক আমার তরল মনটা বাষ্পের মতোই উধাও হয়ে উড়ে গিয়েছিল। নিশীথকে দেখিয়ে সুরমার কানে-কানে বল্লুম "দেখ্‌লি ?"

"সে কি ?—মানুষ ?"

"তা নয়ত কি জানোয়ার ?"

এর পর সে আর সেখানে বসল না, কিছুতেই তাকে ধরে রাখতে পারলুম না। বল্লে, এসেন্সের গন্ধে তার মাথা ধরে ; বলে' জোর করে উঠে গেল।

আজো কানে বাজছে আমার সেই কাতর মিনতি "আর একটা গান নিশীথবাবু, আর একটা।" একটা সুধার সমুদ্রে বিশ্ব-সংসার ডুবেছিল, আমিও ডুবেছিলুম। মানুষ মরে'ও ত ভাসে, আমিও ত মরেছিলুম- কিন্তু এমন করে তলিয়ে গেলুম কেন ?

হঠাৎ খাওয়ার আহ্বান এল। পূজারি যেমন করে দেবীর শূন্য বেদীটির ওপর লুটিয়ে পড়ে, তেমনি করে আমি ঘরের ভিতের উপর উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়লুম, যেখানে তার পায়ের চিহ্ন পড়েছে সেই জায়গাটিকে বুক দিয়ে স্পর্শ করে। সমস্ত বুকটায় কতগুলি তৃষাতুর চুম্বন সাপের মতো ফণা ধরে উঠল।

সুরমা চুপিচুপি আমার পাশে এসে বসেছিল—আমি টের পাইনি ; যখন টের পেলুম তখন অশ্রুর প্রাচীর কেমন করে যে খসে গেল ! এ সংসারে অশ্রু মুছাবার মানুষ যদি না থাকতো, তবে বোধহয় অশ্রুও থাকতো না।

সে কেবল বল্লে "মরেছিস্ ?"

"মরেছি ;—এ যদি মৃত্যু—তবে, মৃত্যুতে আমার ক্ষোভ নেই।"

সে বল্লে "কিন্তু এ মৃত্যু যদি ফুরোয়, যদি—যদি একটা দুঃসহ reality'র মধ্যে কোনোদিন বেঁচে উঠিস্, তার আলোটা চোখে সইবে ?"

হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সত্যটা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মতো প্রখর বলে লোকে তার দিকে চাইতে পারে না ; আমার মনটাও ইচ্ছা করেই এতদিন সব ভয় ভাবনার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল। জীবনে সেই প্রথম-বার মনে হলো নিশীথের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা দরকার ; কিন্তু প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সঙ্কোচের প্রাচীর-টার গায় মাথা খুঁড়েও তাকে একটু টলাতে পারলে না।

আর একটি লোকের কথা এখানে বলা দরকার। তিনি আমার মাষ্টার। গুরু, আমার গুরু ! এতদিন পরে তোমায় চিনতে পেরেছি এই আমার ক্ষোভ। বুক দিয়ে পড়ে তিনি আমায় সাহায্য করতেন। তাঁর কাছে চাইতে পারি কি না এই কথা নিয়ে আমার মনে যতক্ষণ নাড়াচাড়া চলত ততক্ষণে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য আপনি এসে জুটত। কিন্তু যা লোকে চেয়েও পায় না, আমি অমনি পেয়েও সেটাকে কেবল অপমান করেছি।

যতদূর পারি তাকে এড়িয়ে চলতুম। আমাদের যতটুকু প্রয়োজন তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কেবল ততটুকু, এ কথাটা পাকেচক্রে তাঁকে বুঝিয়ে দিতুম। আমাদের প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক ব্যবহারে তাঁর প্রতি একটা উৎকট অবহেলা গা-ঢাকা দিয়ে থাকত।

কিন্তু তাঁর প্রতি এই অবহেলার ভাবটা আমার মনটা-অবধি শিকড় ছড়ায়নি তা আমি পরে বুঝেছিলুম। এটা ছিল বাইরের জিনিষ, যাকে নিয়ে বিচার চলে না।

তাই একদিন হঠাৎ আমার নারীপ্রাণ অলক্ষ্যে তার আত্মমহিমায় সচেতন হয়ে উঠ্‌ল এবং আমি তাতে একটুও আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম না।

মেয়েদের কতদূর স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতার অধিকার দেওয়া উচিত এই নিয়ে সেদিন তর্ক উঠেছিল। একপক্ষে দাদা আর নিশীথ, অন্যদিকে মাষ্টার। অতি ধীর শান্তভাবে তিনি তাঁর সুন্দর সবল যুক্তিগুলাকে দাঁড় করালেন, আর তারা অর্থহীন যুক্তিহীন বিদ্রূপের আঘাতে সেগুলোকে ভাঙ্গবে। এই দুঃসহ ধৃষ্টতার মধ্যেও তাঁর চোখ দুটি একটা অনাবিল স্থৈর্য্যের জ্যোতিতে সন্ধ্যাতারার মতো সমুজ্জ্বল। আজ তাঁর এই আত্মপ্রতিষ্ঠার পায় আমার এতদিনের জমাট অহঙ্কার ধূলিসাৎ হয়ে গেল, আমি স্থির থাকতে পারলুম না, বল্লুম "তোমাদের আশ্রিত বলে তোমরা এঁকে আজ এমন করে অপমান করছ দাদা, কিন্তু চিরদিন কারো সমান যায় না। এটা ভগবানের রাজ্য; প্রভেদ যারা করে তাদের চোখ ফোটাবার অস্ত্র তাঁর অস্ত্রশালায় ভালো করেই মজুত থাকে!" বলে' সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এলুম। নিজের ঘরে এসে মনে হলো এ কী করেছি? কী দরকার ছিল এর? মাষ্টার আমার কে যে তার জন্যে—ইচ্ছে হতে লাগল রবার দিয়ে ঘষে আমার জীবনের পৃষ্ঠা থেকে আজকের এই স্মৃতিটাকে মুছে ফেলে দি। কী মনে করেছে নিশীথ? সে যদি মনে করে থাকে আমি মাষ্টারকে—

আকাশে সেদিন মেঘ জমেছিল। একটা অন্ধকারের রহস্যের নীচে সমস্ত পৃথিবী মৌন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে ছিল। দোর দিয়ে, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। বৃষ্টি যখন নামল তখন মনের ঘোরও অশ্রুজলে ঝরে হাল্কা হয়ে গেছে। দাদার সঙ্গে কথা বন্ধ হলো। কোন্ মুখে তাঁর কাছে আর যাব? নিশীথও আর আসত না। দিনগুলোকে মনে হোত অভিশাপ। সবার সামনে হাসিমুখে ফিরতে হোত এই ছিল আর-এক শাস্তি। কিন্তু পারলুম না; একদিন মুখ ফুটে দাদাকে নিশীথের খবর জিজ্ঞেস করলুম। দাদা একটু গম্ভীর হয়ে উত্তর করলেন "তোমায় বুঝি বলিনি, তার অসুখ।" এমনি স্বার্থপর আমি, এ খবর শুনে ভাবনা হওয়া দূরে থাক মনে হলো একটা ভারী বোঝা যেন ধপ করে আমার বুকের উপর থেকে নেমে পড়ল। একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ভাবলুম—যাক্ তবে সে রাগ করেনি। বল্লুম—"তুমি আমায় নিশীথবাবুদের বাড়ী নিয়ে চল।" কথাটা আমি ঝোঁকের মাথায় বোকার মতো বলিনি; বেশ করে ভেবে, মনের সমস্ত আগ্রহ দিয়েই বলেছিলুম। কিন্তু দাদা হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমি আবার বল্লুম "নিয়ে চল—" তখন তাঁর হুঁস হলো। বল্লেন "তোমার যাওয়াটা ভালো দেখায় না অসি!"

ভালো মন্দের কী সুন্দর বিচার! সমাজ আমাদের প্রাণের সম্বন্ধটাকে আজো স্বীকার করেননি, সেইজন্য সমাজ-সম্বন্ধের চেয়ে প্রাণের সম্বন্ধ খাটো! মুমূর্ষু সে, আমার একটুখানি সমবেদনার অশ্রুতে এই পরপারের যাত্রীর যাত্রাপথখানি হয়ত স্নিগ্ধ হয়ে উঠবে, কিন্তু তাকে আমার দেখতে যাওয়া নিষেধ; সমাজের বিধি!

কারা আমার আপনার জন সেটা একবার নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন বিধাতা, আর-একবার নির্দ্দেশ করবেন সমাজ! আর আমার মধ্যে আমি বলে যে একটা জিনিষ আছে,—সেটাকে চেপে পিষে মেরে ফেলে দেব, এইত? বাঃ!

আমার সুখদুঃখ নিয়ে সবাই ভাবছে, এক আমি ছাড়া। আমার জন্যে এক আমি ছাড়া আর কারো চোখেই ঘুম নেই! দাদাকে বল্লুম "নিশীথবাবুর অসুখের কথাটা তবে আমাকে না জানালেই হোত!" দাদা তাঁর ব্যথিত দৃষ্টিখানি নীরবে আমার চোখের উপর নামিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন! তারপর থেকে জোর করা হাসিও আর হাসতে পারতুম না, আমার চোখের দিকে চেয়ে দাদার চোখদুটিও ছলছল করে উঠত।

(৩)

একদিন দেখলুম আমার কপট হাসি দিয়ে আর যাকেই ভুলিয়ে থাকি বাবাকে ভোলাতে পারিনি। তাঁর সন্দেহ-দৃষ্টির অনিমেষ লক্ষ্য একেবারে আমার মর্ম্মের গোপনতম কোণটিতে অবধি প্রবেশ করেছে। তিনি একদিন আমাকে ডেকে বল্লেন "পশ্চিম থেকে একবার ঘুরে এলে হোত না অসি?" মনটা চারিদিক থেকে কশাঘাত সয়ে সয়ে একেবারে মরীয়া হয়ে উঠেছিল, পশ্চিমের এই আহ্বান একটা মুক্তির আস্বাদ নিয়ে আমাকে পাগল করে তুল্‌ল, তার পরিপূর্ণ রহস্যের মধ্যে আর বাবার পরিপূর্ণ স্নেহের মধ্যে আমি নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করে দিলুম। একটা ত্যাগের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে আমার বিপন্ন জীবন বর্ষাধৌত প্রকৃতির মতো ঝলমল করে উঠ্‌ল।

সিমলায় পৌঁছে খবর পেলুম নিশীথ ভালো হয়েছেন। ভগবানকে প্রাণভরে ধন্যবাদ দিলুম। দাদার কাছে প্রতি হপ্তায় তাঁর চিঠি আসত। সেগুলোকে লুকিয়ে লুকিয়ে পাঁচবার ছ'বার উল্টে উল্টে পড়তুম। সবার শেষে একটি কোণে, একপাশে যেখানে ছোট্ট করে লেখা থাকত "অসিতা কেমন আছেন", সে জায়গাখানিকে বুকে চেপে ধরে অশ্রুর স্রোত বইয়ে দিতুম। ঐটুকু কথা। আমার কাছে ওটুকুরই বড় মূল্য।

একদিন জানালার কাছে একটা সোফায় পড়ে পড়ে ভাবছি। সুরমা আমায় চিঠি লিখেছে, সমস্ত রাজ্যের খবর একখানা চিঠির ঘাড়ে চাপিয়ে শেষটায় কথাপ্রসঙ্গে সে লিখেছে "আর যাই করো পৃথিবীকে বিশ্বাস কোরো না, যেখানে পাবে তাকে জবাবদিহি কোরো, যা তার কাছ থেকে নেবে বোঝাপড়া করে নিয়ো।" এইসব। বোঝাপড়া করে পেতে গেলে যে পাওয়ার মাধুর্য্য থাকে না, যা অমনি এসে জোটে তা খাঁটিই হোক্ আর ফাঁকিই হোক্ তাই যে আমার একান্ত করে পাওয়া। দাদা ডাকলেন "অসি!" চমকে ফিরে চাইলুম, দেখলুম একখানি বইয়ের পাতা উল্টে উল্টে তিনি আমার ঘরে এসে ঢুকছেন, একটা স্মিতহাস্যে তাঁর মুখখানি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

তারপর একটি মুহূর্ত্তে আমার জীবনের খেলাঘর কেমন করে যে হঠাৎ পাল্টে পাল্টে হয়ে গেল—সে কথা গুছিয়ে লিখতে পারব কিনা জানিনে। ভেবেছিলুম লিখব না, কিন্তু তা হলে আমার অশ্রুর ইতিহাসের মেরু-দণ্ডটাকে বাদ দেওয়া হবে। তোমরা পড়ে হয়ত হাসবে, কিন্তু এ কথাও বলে রাখছি যে মানুষের জীবনের হাজারে নশো দুর্ভাগ্যের মূলে এমনি একটা অর্থহীন প্রহসন, যদি একে তোমরা প্রহসন বল।

বইখানি নিশীথের। তার কল্পকুঞ্জের এই প্রথম কুসুমটিকে সে শ্রীমতী অ—রায়কে উদ্দেশ করে উৎসর্গ করেছে। কবিতাগুলির কোনোটিতে প্রতীক্ষার দুঃসহ ব্যাকুলতা, কোনোটিতে ব্যর্থতার অশ্রুভরা ইতিহাস, কোনোটিতে মিলনের উচ্ছল আনন্দ। ··এগুলি সে আমাকেই উদ্দেশ করে লিখেছে আমাকেই

তার সঙ্গে আমার কদিনেরই বা জানাশোনা,—এরি মধ্যে এত কবিতাও না গোপন ছিল। দাদাকে জিজ্ঞেস করলুম "এতে লোকে কিছু মনে করবে না?" দাদা বল্লেন "নিশীথ ত ছেলেমানুষ নয়, সে বেশ করে বুঝেশুনেই এটা করেছে। কবি হলেও সংসারকে সে বোঝে" একটা সুখের আবেগে বইখানিকে বুকে চেপে ধরলুম। এত সুখ এমন অকস্মাৎ। ও. ভগবান!

একটু পরে বাইরে এসে দাঁড়ালুম, দেখলুম পৃথিবীর চেহারাটা নূতন হয়ে গেছে। ভাবলুম, প্রিয়তম! এত ভালোবাসো তুমি আমাকে? এর বাড়া সুখ কল্পনায়ও আসেনি। কোথায় পড়ে ছিলুম, কেউ জানে শোনেনি, খোঁজ নেয়নি, আর আজ তুমি আমায় কোথায় টেনে তুলেছ একেবারে সমস্ত জগতের চোখের ওপর। আজ হয়ত বাংলা জুড়ে মেয়েরা পড়ছে "শ্রীমতী অ—রায়কে" আর ঈর্ষায় তাদের দৃষ্টি কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছে। জয়গর্ব্বে বুকটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল, সুরমা আজ কি ভাবছে?

কলকাতায় ফিরে এসে শুনলুম নিশীথ প্রফেসারের কাজ পেয়ে পাটনা চলে গেছে। সে খবরটাও আমি পাইনি, তার ওপর অভিমান করতে ত পারলুম না। দাদা বল্লেন "ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে সে হয়ত একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছে। তাই আমাদের জন্যে অপেক্ষা না করেই চলে গেছে। ছেলেবেলা থেকেই ও এমনি লাজুক। তাকে দোষ দেওয়া চলে না।"

সুরমাকে কিছু লুকাইনি। সে বলেছে "তুমি এ-কথা আর কাউকে বোলো না, লোকে কানাঘুষো করতে পেলে উঠেপড়ে লাগে—তাত জানই। "অ—রায়" যতদিন "অ—রায়" ততদিন তাঁর আর ভয় নেই; কিন্তু তাঁর দুরাশা যদি "অ"কে ছাপিয়ে অসি হয়ে ওঠে তার পরিণামটা হবে ভয়াবহ।

সময়টা বড় সুখেই কেটে যেতে লাগল। কিন্তু আমি দেখেচি মানুষ যখন বড় সুখের আবেগে বিভোর হয়ে পড়ে, তার অগোচরে তখন বিধাতার কর্ম্মশালায় আঘাতের শেল তৈরি হতে থাকে। আমার এত সুখ স্বর্গের বুঝি সইল না!

দাদা বড়দিনের ছুটিতে সপ্তাহেকের জন্যে আমাদের এক মাসীর বাড়ী বেড়াতে গেছেন। বাড়ীতে বাবা, মাষ্টার আর আমি। একদিন বেড়িয়ে এসে বাবা বিছানায় পড়লেন। ডাক্তার এসে বলে গেল নিউমোনিয়া; কিন্তু এত শীগ্‌গির তাঁকেও যে হারাব তখনো তা জানিনি।

(৪)

দাদা ফিরে এসে বাবাকে দেখতে পাননি; তাঁর বুকের স্নিগ্ধ আশ্রয়টি পেয়ে আমার শোকার্ত্ত প্রাণ কিছুদিনেই আমার নিত্যকার সুখদুঃখের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াল; আবার একটি বছর অতীতের বুকে গড়িয়ে পড়ল।

একদিন দাদা আমায় ডেকে বল্লেন "তোমাকে একটা কথা বলব-বলব দুদিন ধরে' মনে করছি। এমন করে আর কতদিন চলবে? নিশীথকে একখানা চিঠি লিখে দি, তোমাদের বিয়ের কথাটা এইবার উঠুক।" একটা চৌকিকে আশ্রয় করে একটু স্থির হয়ে নিলুম, তারপর বল্লুম "তার চাইতে তুমি মাষ্টার-মশাইদের বাড়ীতে এখনি একখানা চিঠি লিখে দাও, আসছে মাসেই বিয়েটা যাতে হয়।"

"সে কি অসি? তোর সবতাতেই রহস্য!"

আমি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বল্লুম, "এ যদি রহস্য, তবে এ রহস্য আমার নয়, অদৃষ্টের! বাবা মৃত্যুশয্যায় আমাকে তাঁরই হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন।"

সাপ দেখলে লোকে যেমন করে চমকায়, দাদা ঠিক তেমনি করে চমকে উঠলেন; একটু পরে একটু স্থির হয়ে বল্লেন "এ আমি হতে দিতে পারব না।"

আমি বল্লুম "তাঁর ইচ্ছা অমান্য করার মত ঔদ্ধত্য আমার নেই, তা ছাড়া তিনি ইহলোকে নেই বলেই তাঁর অন্তিম ইচ্ছাটা আমার বেশীরকম শ্রদ্ধার।"

দাদা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, বল্লেন. "তবে তুই মাষ্টারকেই বিয়ে করবি?"

মনের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করে দৃঢ় কণ্ঠে আমি বল্লুম "হাঁ।"

দাদা একটু ভেবে বল্লেন "কিন্তু নিশীথের কথাটা তুই কি ভেবে দেখেছিস্ একবার? তোর একটুখানি ভুলে তার সমস্ত জীবনটাই হয়ত মাটি হয়ে যাবে। সে যে-রকম sentimental! তুই বরঞ্চ একটু স্থির হয়ে ভাব্।"

কি আর ভাবব? নিজের ওপর, নিজের অদৃষ্টের ওপর অভিমান হয়েছিল। তাই নিষ্ঠুর হয়েই নিজের ওপর শোধ তুলতে বসেছিলুম। আর অভিমান হয়েছিল নিশীথের ওপর। আমি না হয় দুর্ভাগ্যটাকে ইচ্ছা করেই স্বীকার করছি, কিন্তু সে কেন এসে জোর করে বল্‌বে না "তোমাকে আমি ছাড়ব না, তোমাকে আমি চাই?" নিজেকে বলি দিয়ে তার ওপরও আমি শোধ তুলতে বসলুম।

হাসিমুখেই তাই দুর্ভাগ্যটাকে বরণ করলুম। শুভ মুহূর্ত্তেও দাদা চোখে দুফোঁটা অশ্রু এনে বল্লেন "তোকে আর নিশীথকে একসঙ্গে দেখব আশা ছিল অসি। তুই আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলি।"—আর আমার স্বপ্নই বুঝি অটুট থাকল? ভগবান্!

এ বিবাহে সুরমার খুব উৎসাহ দেখা গেল। একটা নীরব শ্রদ্ধার দৃষ্টি দিয়ে সে আমার এই আত্মোৎসর্গটাকে অভিনন্দন করলে।

তারপর স্বামীর সঙ্গে চিরপরিচিতের মত চির-অপরিচিত একটা সংসারে এসে ঢুকলুম। মনে হলো আমার সমস্ত কর্ত্তব্য যেন ফুরিয়েছে, আমার কাছে সংসারের, সংসারের কাছে আমার,— কারো যেন কোনো দাবী দাওয়া নেই।

স্বামীর সঙ্গে বড় একটা দেখা হোত না; আমি যেতুম না, তিনিও যেচে আমার সঙ্গে কথা কইতেন না। তিনি হয়ত অধঃপাতের মুখ থেকে আমায় বাঁচাতে পারতেন; তিনি যদি একটু শক্ত হোতেন তবে হয়ত এমন করে আমি

বয়ে যেতুম না। কিন্তু তাঁর মনটি ছিল নারীর মতো কোমল। সমস্ত ব্যবহারে এমন একটা সলজ্জ স্নিগ্ধতা, যা পুরুষের ঠিক মানায় না, আর তাঁর চোখ ছুটিতে ভেতরকার কি একটা নিগূঢ় বেদনা যেন ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে পড়ত।

একদিন তিনি ডেকে বল্লেন "তুমি নিজের জীবনটাকে যেমন মাটি করেছ, তেমনি আমারও সমস্ত জীবনের সুখসাধ ভেঙ্গে দিয়েছ।"

আমি বল্লুম "আপনার জীবনের সমস্ত সুখসাধ ভেঙ্গে দিয়েছি অতবড় তিরস্কার আপনি আমায় করবেন না। ইচ্ছা হলে আপনি আমায় ত্যাগ করতে পারেন; সংসারে আমার কিছুরি প্রয়োজন নেই।"

অস্ফুট স্বরে তিনি কেবল বল্লেন "ছি ছি, তোমার কি হৃদয় নেই?"

পরদিন কলকাতায় দাদার কাছে ফিরে এলুম। ভেতরকার কথা তাঁকে একটুও জানতে দিলুম না; স্বামী জানাবেন না, সে বিশ্বাসও আমার ছিল। আমার দুর্ভাগ্যের বালুচরে শৈশব যে সুখস্মৃতির টুকরোগুলো ফেলে রেখে গেছে, সেইগুলো কুড়িয়ে জমা করে একটু শান্তি পাবার প্রয়াস করতে লাগলুম।

(৫)

সমস্ত মন দিয়ে একটা কাজে লেগে পড়া গেল। আমি ও সুরমা মিলে মেয়েদের একটা সমিতি করলুম, আমি হলুম তার সেক্রেটারী। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের এমন করে জাগানো যাতে তারা তাদের পরিবারকে ছাপিয়ে সমস্ত দেশের জন্যে, সম্ভব হলে পৃথিবীর জন্যে তাদের সামর্থ্যটাকে নিয়োগ করে দিতে পারে। আমাদের আয়োজন দেখে দেশ জুড়ে বাহবা পড়ে গেল। ঈর্ষ্যায় অনুতাপে আজ নিশীথের অন্তরটা হয়ত জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে, এ-কথা ভাবতেও কত সুখ!

অরুণা বলে' একটি মেয়ে আমার সহকারী হয়ে কাজ করত। মাঝে-মাঝে তাকে আমাদের বাড়ী নিয়েও যেতুম। একদিন কথায়-কথায় তাকে বল্লুম "আপনি আমায় দিদি বলে ডাকবেন।"

সে চুপ করে থেকে বল্লে "কেন, ওকথা কেন?"

আমি তাড়াতাড়ি বল্লুম "ও কিছু না; তবু বলুন আমায় দিদি বলে ডাকবেন।"

সে আবদার করে বল্লে "আপনাকে বলতেই হবে।"

আমি বল্লুম "আপনাকে দেখলেই ভালোবাসতে সাধ যায়। আমি বড় বোনের অধিকারটুকু আপনার কাছে প্রার্থনা করছি,—বলুন আমায় বঞ্চিত করবেন না। বড় সুখী হব তাহলে।"

সে বল্লে "বেশ তাই হোক্; কিন্তু তার আগে বলুন আমায় 'আপনি' বলবেন না, 'তুমি' বলবেন। দুদিক থেকেই রফা হয়ে যাক্। রাজি?"

"রাজি।"

বড় ভালো মেয়ে এই অরুণা। এমন মিষ্টি স্বভাব! এমন নরম কথাবার্ত্তা!

একদিন দাদাকে বল্লুম "তুমি অরুণার সঙ্গে কথা বল না যে?"

দাদা বল্লেন "দরকার?"

আমি বল্লুম "ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয় ত বেশ হয়।"

দাদা হোঃ হোঃ করে হেসে কথাটাকে চাপা দিয়ে দিলেন। বল্লেন "একবার তুই আমার ঘটকালিকে অপমান করেছিলি, তার শোধ না নিয়ে ত আমি ছাড়ব না!"

সুরমা দুতিনদিন এসেছিল, কি যেন বলবে মনে করে এসেছিল। হয়ত বলতে সাহস হয়নি অথবা আর কিছু মনে করে ফিরে গেছে। আমার তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়ত উচিত ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা তখন তলিয়ে বুঝিনি। তাছাড়া সে সব বিষয়েই ঐরকম চাপা। একটা তুচ্ছ বিষয়ও সে মুখ ফুটে বলতে ভয় পায়। তাই এ ব্যাপারের কোনো গুরুত্ব আমার চোখে পড়েনি।

স্বামীর কোনও খবরই পেতুম না। আর-একদিন অরুণার কথা নিয়ে দাদার সঙ্গে আমার আলোচনা হল। সেদিন দাদা অনেকক্ষণ ভাবলেন। ভেবে বল্লেন "তুই ঘটকালিতে কাঁচা।"

আমি বল্লুম "কেন?"

তিনি বল্লেন "ধর্, আমি ছাড়াও ত সংসারে লোকের অভাব নেই। আর কারো সঙ্গে যদি তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে থাকে।"

আমি হেসে উঠে বল্লুম "ওঃ, এই কথা? তাহলে বল তুমি এ বিয়ে করতে রাজি?—তারপর সব ভার আমার।"

অরুণাকে ভ্রাতৃবধূ করার প্রলোভন কতবড় প্রলোভন!

সুরমাকে বল্লুম। সে সেদিন আর পারলে না—কেঁদে আমার বুকে লুটিয়ে পড়ল! বল্লে "নিরাশার কথাটা তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে তোমার জীবনটাকে আমিই ব্যর্থ করে দিয়েছি। একটুখানি ভুলের সুখ থেকে তোমায় বঞ্চিত করতে পারিনি বলে চিরদুঃখিনীর মূর্ত্তিতে তোমাকে আজ দেখতে হয়েছে। কিন্তু তোমাদের দুই ভাই-বোনেরই জীবন যদি একই-রকম করে নিরর্থক হয়ে যায় তবে সে পাতক আমায় খুব বেশী করেই লাগবে।"

*

রাত্রিতে বিছানায় ক-বার এপাশ-ওপাশ করে বাইরে এসে দেখি, দাদা নিঃশব্দে রেলিংএ ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন; চাঁদের আলো তাঁর মুখের ওপর পড়ে মুখটাকে ভয়ানক পাণ্ডুর দেখাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলুম "তুমি ঘুমোওনি যে?"

তিনি বল্লেন "ঘুম আস্‌চে না।"

নিঃশব্দে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিছুক্ষণ উভয়েই স্তব্ধ হয়ে রইলুম। তারপর আমার দিকে চোখ না ফিরিয়েই দাদা জিজ্ঞেস করলেন "অরুণা তা হলে নিশীথের স্ত্রী?"

আমি বল্লুম "না, তবে বছর চার ধরে তাদের বিয়ে একরকম স্থির। আর মাস দুই পরে—"

দাদা আমার কথায় বাধা দিয়ে বল্লেন "তোকে ঘটকালিতে কাঁচা বলেছিলুম, কিন্তু আমিও যে তোর চেয়ে কম কাঁচা নই সে কথাটা আজ প্রমাণ হয়ে গেল।"

আমি একটু কেবল হাসলুম। পাঁজরটা ভেঙ্গে যাচ্ছিল সে হাসির অভিনয় করতে।

দাদা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠ্‌লেন "কিন্তু আর যে যাই করুক তুই আমায় দোষী করিসনে। তুই জানিসনে, তুই আমার কতবড় গৌরবের জিনিষ ছিলি। তোকে যে কেউ অবহেলা করতে পারে, তুচ্ছ করতে পারে এ-কথা ভাবতেও পারিনি আমি। ঐটুকু আমার অপরাধ।"

আমি উত্তর করলুম না। একটা পাথর ভেতর থেকে গলার কাছে ঠেলে-ঠেলে উঠছিল, অশ্রুজলে সেটাকে গলিয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু কাঁদব? ছি ছি!

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লুম "নিশীথের "অ—রায়"টি কে তা এবার বুঝেছ দাদা?"

আর্ত্তস্বরে দাদা বলে উঠ্‌লেন "থাক্, থাক্, ওকথা থাক্, অসি!"

তার পরদিন খবর এল আমার স্বামী আর্ত্তসেবকের ব্রত নিয়ে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেছেন। আমায় প্রতীক্ষা করতে বলে যান্‌নি। কিন্তু না চেয়েই তাঁর কাছ থেকে সব পেয়েছি; প্রতীক্ষার অধিকার তিনি আমায় দিয়ে যাননি বলেই, আমি যদি প্রতীক্ষা করি তাহলে তিনি আমায় ক্ষমা করবেন না, একথা আমি ভাবতে পারিনে। আমি আজ তাঁরি পথ চেয়ে বসে আছি।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

গুড়ের বিধান

(Manufacture)

অনন্তর গুড়ের বিধান অর্থাৎ ভিয়ান বলিতেছি। প্রথমে আখের গুড় দেখি। তাল, খেজুর, বীট-পালং প্রভৃতি হইতে গুড় জন্মিতেছে বটে, কিন্তু আখের কাছে সে-সব নগণ্য। যে বুদ্ধিমানের ভূয়োদর্শন হইয়াছে, সে গুড় রাঁধিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে তাহাকে 'বাড়ই' বলে। সংস্কৃতে 'ব্রার্ত' বা 'ব্রার্তক' শব্দ হইতে বাড়ই নাম। 'ব্রার্ত' অর্থে পটু, যে বার্তায় পটু হইয়াছে (expert)। অতএব নানা কর্মের বাড়ই আছে।* এখানে বাড়ই অর্থে গুড়ের বাড়ই। দুই তিন গ্রামের মধ্যে একজন, কদাচিৎ দুইজন, 'গুড়ের বাড়ই' খ্যাতি পায়। দেশের যেখানে গুড় ভাল,

* স' 'বর্ধক' বা 'বর্ধকি' শব্দ হইতেও বাড়ই। 'বর্ধকি' শব্দে ছুতার। এই অর্থে হিন্দী ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় বর্ধকি শব্দের অপভ্রংশ চলিত আছে। বাঙ্গালায় যে ঘর কাঠাম করে, ঘর ছায়, তাহাকেও 'বাড়ই' বলে। বোধ হয় 'বাড়ই' শব্দের দুই অর্থ মিশিয়া গিয়াছে।

সেখানে বাড়ই দ্বারা গুড় করা হয়। মাং কম, সার বা খাঁড় বেশী করাই বাড়ইর লক্ষ্য।

আমি বহুকাল বঙ্গের আখ-শাল দেখি নাই। বাল্য-কালে দেখিয়াছি; মনে আছে, গ্রামে আখ-শাল* বসিয়াছে,—এটা যেমন-তেমন সংবাদ ছিল না। বিশেষতঃ প্রকৃতি-দেবী যে বালককে মধুর রসের অনুরাগী করিয়াছেন, তাহার নিকট গ্রামের আখ-শাল এক মহোৎসব। সেখানে আখ খাইতে পাওয়া যাইত, রস পাওয়া যাইত, গুড় পাওয়া যাইত, বিশেষতঃ ভিঁড়া পাওয়া যাইত। বাঙ্গালী অন্ন-দানে কাতর ছিল না, গ্রামের কৃষক ক্ষেতের আখের প্রার্থী পাইলে আনন্দিত হইত। সম্বৎসরের যত্ন, শ্রম, চিন্তার ফল বিলাইতে আনন্দ হইবারই কথা। যে আখ-শালে তাহার মত আরও দশ-পনর জনের ভাগ্য-পরীক্ষা হইবে, যাহাকে নির্বিঘ্নে সম্পাদন করিতে বিঘ্ন-হরণ গণেশের ও রস-পাকবিধাতা ব্রহ্মাগ্নির পূজা বিহিত, সেখানে সাত্ত্বিকভাব থাকেই থাকে। আখ-চাষ বহু না হইলে কেহ একা আখ-শাল করিতে পারে না। বহু চাষ করিবার সাধ্যও নাই। ধন-বল, ভূমি-বল, জন-বল না থাকিলে আখ-চাষ হয় না। এ-কথা আজি নহে। চব্বিশ শ বছর আগে চাণক্য লিখিয়াছিলেন, আখ-চাষে "বহু বাধা বহু ব্যয়।" এস্থলে দশ-পনর ঘর কৃষককে গাঁতা (সং সঙ্গত,—গোষ্ঠী, club) করিয়া আখ-শাল করিতে হয়। বাড়ই ঠিক করিয়া লোকালয় হইতে দূরে, আখ-বাড়ীর (plantation) নিকটে, ডাঙ্গা পরিষ্কৃত করিয়া গোবর মাটি দিয়া নিকাইয়া ইক্ষু-শালা নির্মিত হয়। আখ-শালে আগুনের আশঙ্কা থাকে। অনভিপ্রেত দিক হইতে বাতাস বহিলে আগুন মন্দ হইতে পারে, পাকের সময় রস হঠাৎ শীতল হইতে পারে। একারণ দক্ষিণ-উচা উত্তর-নীচা, প্রায়ই ভূ-স্পৃষ্ট, পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এক-চালার আখ-শাল হয়। দক্ষিণে সম্মুখ, পশ্চিমে চুল্লী-মুখ, পূর্বে ধূম-পথ, উত্তরে গুড়-ভাঁড়ার। মাটিতে লম্বা জোল (চুল্লী) কাটিয়া তদুপরি ১০।১২।১৫ রস-কুণ্ড পরে পরে সাজাইয়া কাদা দিয়া বসানা হয়। এই-সকল রস-কুণ্ড পুরু, সুপোড়, দুর্ভঙ্গ মাটির। কানা-পুরু, মুখ

* Sugar Factory. মরাঠীতে বলে 'গুল্-হাল', অর্থাৎ গুড়-শাল।

চওড়া, নীচের দিকে ক্রমশঃ সরু। পশ্চিম বঙ্গে নাম 'বাইন'।* বাইনের আকার গোরুর বাঁটের মতন, এবং বানী বা বাইন কানা দ্বারা বাঁটের মতন জোলের ভিতরে ঝুলিতে থাকে। কানার পাশে ফাঁক থাকে না, আগুনের শিখা কিংবা ধুঁয়া উঠিতে পারে না। মাটির ভিতরে কাদা-লেপা জোলে আগুন জ্বলে, তাপ বিকীর্ণ হইতে পারে না। চুলীর মুখ ('জ্বাল-মুখ') মাটির নীচে, অবশ্য বড়। অন্য প্রান্তের ধূম-পথ (শিয়ালিয়া—'শিয়াল্যে') মাটির উপরে; অবশ্য ছোট, যেন শিয়ালের গর্তের মুখ। গুড় রাঁধিতে আখের খোআ ও পাতা প্রধান জ্বালন। কিন্তু ইহাতে কুলায় না। আমাদের গ্রামে শর-গাছ এক প্রসিদ্ধ জ্বালন। শরগাছ আখের সদৃশ দীর্ঘ তৃণ। নদীর ধারে ধারে, বালিতে, বন হইয়া জন্মে। সুতরাং কাটার শ্রম ব্যতীত অন্য ব্যয় পড়িত না। এখন শর-গাছ কিনিতে হইতেছে।

চুলীতে তাপের অপচয় হয় না। বিশেষ এই, যে বাইনে যত তাপ চাই, সে বাইনে তত পায়। শিয়াল্যের নিকটে তাপ কম; সে দিকের চুলীর তলা কিছু উচা। সে দিকে আখের রসের 'রস্যুয়া' বা 'রঁসা' বাইন ৫।৭।৮-৯টা। এখানে কাঁচা রস মৃদুতাপে থাকে, হাত-সহা উষ্মায় থাকে। গাদ উঠাইবার পক্ষে এই উষ্মা উত্তম। পূর্বে বাঁশের শলার 'বাড়' দিয়া গাদ তুলিয়া ফেলা হইত। ইদানী লোহার ছান্‌তা প্রচলিত হইতেছে। রঁসো বাইনে রস তত শুখায় না। এসবে গাদ তোলা হয়। এই সবের পরে, জ্বাল-মুখের দিকের বাইনে তাপ অধিক লাগে। এখানে দুইটা বাইনে গাদ-তোলা রস ঢালা হয়। হাত তিনেক লম্বা বাঁশের মাথা চিরিয়া একটা ভাঁড়ের গলায় বাঁধিয়া সেই ভাঁড়ে করিয়া এক বাইনের রস অন্য বাইনে ঢালা হয়।† যে বাইনে—দুইটা বাইনে—গাদ-তোলা

* ওড়িয়াতে 'বণা', উত্তর ওড়িয়াতে 'বাইণি'। সংস্কৃতে 'ব্রাণ' শব্দের এক অর্থ গো স্তন।

† আমাদের গ্রামে এই রস-তোলার ভাঁড়কে 'লাবুড়ী' বলে। বোধ হয়, অ-লাবু—লাবু—লাউ আকার হইতে 'লাবুড়ী' বা 'লাবড়ী' নাম। ভাঁড় এই আকারের হইলে রস তুলিতে ঢালিতে সুবিধা। ভাঁড় ও হাঁড়ীতে প্রভেদ আছে। হাঁড়ীর আকার নানাবিধ হইলেও এক এক স্থানে এক এক আদর্শে গড়া। পশ্চিমবঙ্গের হাঁড়ীর ফাঁড় (মধ্যভাগ) চেড়। ভাঁড়ের আদর্শ কলশ। লম্বা আকার ব্যতীত ভাঁড় পুরু।

রস মারা হয়, সে বাইনের নাম 'ভাঁড়ার'। রঁসো বাইনের পরেরটা 'কোল ভাঁড়ার', ইহার পরেরটা 'ভাঁড়ারিয়া' বা 'ভাঁড়ারো'। এইখানে তাপ সমধিক ও প্রখর। এখানে রস গাঢ় হয়। এই ছুইএর পরে আর ছয়টা বাইন। এ গুলাতে গুড় রাঁধা হয়। এ কারণ নাম 'গুড়িয়া' বা 'গুড়ো'। ছয়টাই আর-গুলা অপেক্ষা কিছু নীচে করিয়া বসানা হয়। কারণ জ্বাল-মুখের কাছে তাপ উপরে তত উঠে না। মুখের কাছের চারিটা একসারিও নহে, ছুইসারি; চারিটা চতুরস্রের চারি কোণে বসানা হয়, সকলেই প্রায় সমান, কিন্তু মৃদু তাপ লাগে। ভাঁড়ারোর গাঢ় রস গুড়ো বাইনের প্রত্যেকটায় অল্প অল্প করিয়া ঢালা হয়; সেখানে গুড়-পাক শেষ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, চুলী নির্মাণে, এবং তাপ অনুসারে রসের বাইন, ভাঁড়ার, ও গুড়ের বাইন বসানায় বুদ্ধি-প্রয়োগ করা হইয়াছে।

বাইনের আকার ঠিক করিতেও অল্প বুদ্ধি আবশ্যক হয় নাই। পেট-মোটা হাঁড়ী নহে, সমান মোটা ডাবাও নহে; গো-স্তনের আকার। বাইনের মুখ ফাঁদাল হওয়াতে রস হইতে বাষ্প দ্রুত উঠিতে পারে; নীচের দিকে সূচ্যাকার হওয়াতে রসে তাপ অধিক লাগে। ডাবার আকার হইলে তলার দিকে রস অধিক থাকিত, তাপ অল্প পাইত। যখন বাইন মাটিরই করিতে হইবে, তখন তাহা উনাধিক বর্তুলকার (cylindrical) করিতেই হইবে। তাওয়ার মতন অগভীর, কিন্তু বিস্তারিত করিলে বাইন ভাঙ্গিয়া যাইত। এ বিষয় পরে দেখা যাইবে।

গুড়ের বাড়ই ময়রার এক-তার-বন্দ, দু-তার-বন্দ রস ধরে না। কারণ দু-তার-বন্দ রসও গুড়ের পক্ষে 'তনু' (পাতলা)। দু-তার-বন্দ রসে ঝোলা গুড় হয়। যখন রস লাবড়ীতে জড়াইতে থাকে, তখন পাক শেষ হয়। এক পাকে গুড় তোলা চলে না। কোন পাক 'খর', কোন পাক 'মাদা' (মৃদু) তুলিতে হয়। দুই পাক লাবড়ী দিয়া তুলিয়া 'বেঁঅতি' নামক পাত্রে ঢালা হয়। ইহার আকার খোলার ন্যায়; বিশেষ এই যে ইহার মুখ (spout) থাকে।* গুড়ো বাইনে গুড়পাক শেষ হইবার সময় 'বেঁঅতীর' মুখ বাইনের দিকে রাখিয়া বসানা হয়, এবং 'লাবড়ী' দিয়া গুড় তোলা হয়। 'বেঁঅতী'র গুড় গুড়ের নাঁদায় (বা নাঁদে (সং 'নন্দা') ঢালিয়া মোটা কাঠি দিয়া ঘাঁটিয়া শীতল করা হয়। ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেক নাঁদে কিছু 'বীজ' দেওয়া হয়। বীজ না দিলে ভাল দানা বাঁধে না। ভিঁড়া-ই গুড়ের 'বীজ'। এক সের বীজ করিতে হইলে দুই সের আড়াই সের গাঢ় রস আবশ্যক। বীজের গুড় অত্যন্ত গাঢ়, লাবড়ীতে জড়াইয়া ধরে, এবং একটু শীতল হইলে জমিয়া যায়। বীজের গুড় 'বেঁঅতী'তে তুলিয়া কয়েক-বার তাড়ু (সং 'তর্দ্দ') মারিলে কেলাসিত হয়। এই কেলাসই বীজ।

গুড়-পাক মোটামুটি দেখা গেল। ইহাকে তিন অংশে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথমে গাদ তোলা, দ্বিতীয়ে রস গাঢ় করা, তৃতীয়ে কেলাসিত করা। প্রথম কর্ম্ম সবাই পারে। বস্তুতঃ সেখানে করিবার কিছুই নাই, কেবল মৃদু তাপে গাদ উঠিলে সে গাদ তুলিয়া ফেলা। গাদ অবশ্য ফেলিয়া দেওয়া হয় না। ইহা পাকে গাঢ় করিয়া তামুক-মাখা চিটা করা হয়। দ্বিতীয়, বিশেষতঃ তৃতীয় কর্ম সু-সম্পন্ন করিতে ভূয়োদর্শন ও অভ্যাস চাই।

কিন্তু এখনও আখ হইতে রস বাহির করা দেখা হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তেঁতুল কাঠের দুই 'গঁড়ীর' (roller) ভিতরে আখ দিয়া পিষিয়া রস বাহির করা হইত। কাপাসের বীজ ও তুলা পৃথক্ করিবার যেমন 'খাঅই' (সং 'খাদক'), আক-মাড়ার যন্ত্রও তেমন। এ কারণ এই যন্ত্রকে আখ-খাঅই বলা চলে।* কিন্তু কাপাস-খাঅই ঘোরানা এক জনের এক হাতের লঘু কর্ম্ম। আখ-খাঅই ঘোরানা দুইজন বলিষ্ঠ যুবার পক্ষেও গুরু কর্ম্ম। দুই গঁড়ী দুই পাশের দুই পায়াতে (পাদে) শোয়াইয়া আঁটা হইত। মাটির পিণ্ডার উপর বসিয়া এপাশে এক, সে-পাশে এক, বলিষ্ঠ যুবা গঁড়ীর প্রান্তে নিবদ্ধ অরা (spokes) হাত দিয়া টানিয়া পা দিয়া ঠেলিয়া গঁড়ী ঘোরাইত। অল্পক্ষণে ঘর্মাক্তদেহ হইত, এক প্রহর

* সং 'বক্ত্র'—মুখ হইতে পশ্চিমবঙ্গের অপভ্রংশে 'বেঁত্'। 'বক্ত্রী' হইতে 'বেঁঅতী' বা 'বেঁউতী' নাম।

* ওড়িয়াতে বস্তুতঃ 'আখু-খাই' বলে।

হইতে না হইতে শ্রমে ও ক্ষুধায় কাতর হইত। তখন অপর দুইজন তাহাদের স্থানে গিয়া কর্ম করিত। এই চারি মুনিষ ব্যতীত অপর দুইজন লাগিত। একজন আখ খাওয়াইত, অন্য জন বহিষ্কৃত রস সরাইত ও খাঅইর কাছে আখ জোগাইত। তখন আখ-মাড়া বৃহৎ ব্যাপার ছিল, কেঁ-কোঁ তুরী ধ্বনিতে দূরস্থ গ্রামবাসীও জানিতে পারিত। এখন লোহার গুঁড়ীর খাঅই দ্বারা আখ-মাড়া হইতেছে। যেখানে কল, সেখানে নিরুৎসব। মুনিষও কলের পুতুলের মতন হয়। লোহার গুঁড়ী তৈলযোগে বোবা; তাহা বোবা গরুতে ঘোরায়! মুনিষের মধ্যে একজন আখ খাআয়, এক জন আখ জোগায় রস সরায়, আর এক জন গোরু তাড়ায়। তিন মুনিষ দুই গোরুতে কর্ম নির্বাহ হয়।

[কিন্তু এটা কেবল-কর্ম, নিরানন্দ কর্ম। পূর্বে গ্রামের কামার 'গুঁড়ী গাছ' (crushing plant) বা আখ-খাঅই গড়িত, বেতন পাইত, আখ পাইত, গুড় পাইত। আখ-শালে কত মুনিষ লাগিত; সবাই বেতন পাইত, আখ পাইত, গুড় পাইত। বঙ্গের বহু গ্রামে এখনও কুমার মাটির বাসন জোগাইতেছে। মাড়া আখের রস ধরিবার ও গুঁড়ী গাছের কাছের 'গেছো' (প্রায় একমণী ডাবা), এই রস বহিয়া লইবার 'পাইলা' (পাদ+লা, দশ শেরী) ভাঁড়, রস রাখিবার 'ডাঙ্গরিয়া' (ছয়মণী ডাঙ্গর বা ডাগর ডাবা), গুড় রাঁধিবার বাইন, লাবড়ী, বৈঅতী, নাঁদা জোগায়, দাম পায়, আখ পায়, গুড় পায়। গ্রামের যে মুচী আখশালে জ্বাল দেয়, সে জ্বালই (fire-man) বেতন ছাড়া আখ পায়, গুড় পায়। যে পুরোহিত আখশাল পূজা করেন, তিনিও ঠাকুর-নৈবেদ্যের সহিত আখ পান গুড় পান। গ্রামের আখ-চাষ গ্রামেরই বটে; একা কৃষকের নয়। এখন, কোথাকার কে কর্মকার লোহার খাঅই ঢালিয়া দিতেছে, মহাজন ভাড়া লইতেছে। কর্মকারের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ নাই; সে আখ চায় না, গুড় লয় না। ভাড়া শব্দটাই গ্রামের লোকের কানে বাধে; ভদ্রসমাজে হেয়; কারণ দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে টাকার সম্বন্ধ প্রকাশ করে। টাকা-পয়সার হেয় সম্বন্ধে মানুষের সম্বন্ধ কই?

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল বিহারের বিহিয়া নামক স্থানে লোহার আখ-খাঅই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল। তখন তাহাতে দুইটা গুঁড়ী ছিল। সে দেশের কাঠের দাঁড়া 'গুণ্ডী'র অনুকরণে লোহার খাঅইর উৎপত্তি। ওড়িষ্যার কোন কোন গ্রামে এখনও কাঠের দাঁড়া 'গুঁড়ী' প্রচলিত আছে। বোম্বাই প্রদেশেও দাঁড়া গুঁড়ী ছিল, এবং অদ্যাপি কাঠের দাঁড়া গুঁড়ী আছে। পঞ্জাবের 'বেলনা' ও বঙ্গের গুঁড়ী শোআ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তেলের ঘানীর মতন ঘানীতে—'কলহু'তে—আখ পেষা হইত। পূর্বকালে কাঠের তিন-গুঁড়ী খাঅইও ছিল। তাহার অনুকরণে লোহার তিন-গুঁড়ী খাঅই নির্মিত ও প্রচলিত হইয়াছে।

ব্যবসায়ে লাভবান্ হইতে হইলে আয়-বৃদ্ধি ও ব্যয়-হ্রাস দুই-ই কর্তব্য। গুড়-ব্যবসায়ে লাভ করিতে হইলে প্রথমে উত্তম আখ চাই, তার পর আখের শর্করার অপচয় হ্রাস করা চাই। কিছু অপচয় হইবেই। কিন্তু অপচয় হইতে না দিলেও অধম আখ জন্মাইয়া অন্যের সহিত ব্যবসায়-সংগ্রামে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আখের জাত (variety) ও অন্য অনেক কারণে রসের উপাদানের ভাগের ন্যূনাধিক্য হয়। উৎপন্ন গুড়ের পরিমাণের ও গুণেরও ইতরবিশেষ হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের গ্রামের এক বাড়ইর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমি ৪০ বৎসর গুড় রাঁধিতেছি। আমাদের অঞ্চলে তিন জাত আখের চাষ হইয়া থাকে,—সাচি, বোম্বাই ও শ্যামসাড়া। এ ছাড়া কেহ কেহ চীনা আখও অল্প পরিমাণে ইহাদের সহিত করে। চীনা আখের গায়ে লম্বা দিকে বেগুনা ও শাদা ডোরা আছে। কেহ কেহ দুই এক ঝাড় কাজলা আখ করে। গত বৎসর তারকেশ্বর অঞ্চলে গুড় রাঁধিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এক-রকম নূতন আখ দেখিয়াছি। সে আখ খুব মোটা ও লম্বা। বাঁশের মতন, কিন্তু ভিতর ফোরা। ইহার রস দেখি নাই। আমাদের অঞ্চলের কাজলা আখও খুব বড় হয়। কিন্তু মোটা হয় না। বড় কঠিন, মাড়িবার সময় গুঁড়া হইয়া যায়। রস কম হয়, গুড় ভাল হয় না, কাল হয়। বোম্বাই আখও পৃথকভাবে করার সুবিধা নাই। অল্প বাতাসেই আখ পড়িয়া যায়, ভাঙ্গিয়া চূর-মার হয়। বোম্বাই আখে রস খুব বেশী হয়, কিন্তু সে পরিমাণে গুড় হয় না। শ্যামসাড়ার

যেখানে দেড়টা রসে একটা গুড় হয়, বোম্বাইর ২টা রস লাগে। সাচি আখের গুড় কিছু কাল হয়, কিন্তু ভাল থাকে, বর্ষাকালেও গন্ধ হয় না। শ্যামসাড়া আখের গুড় পরিষ্কার হয়, কিন্তু বর্ষাকালে কিছু লোল (fluid) হয়, গন্ধও ছাড়ে। এজন্য আমাদের দেশে শ্যামসাড়ার সহিত কিছু সাচি * আখেরও চাষ হয়।

"রস পরিষ্কার করিতে আমি চূন দিই না। চূন দিলে গুড় লাল হয়। সাজি-মাটি দিলে গুড় বর্ষাকালে ফাঁপিয়া উঠে, গন্ধও বেশী হয়। 'সোডা' দিলে গাদ খুব উঠে সত্য, কিন্তু গুড় লাল হয়। বেশী পড়িলে কাল হয়। সময়-সময় চূনজল দিতে হয়। যদি কুয়াসা কিম্বা অন্য কারণে রস 'কাটিয়া' যায়, তাহা হইলে ডাঙ্গরিয়াতে পরিষ্কার চূনের জল অল্প পরিমাণে ঢালিয়া দিই, গুড় খারাপ হইতে পায় না। না দিলে 'কাটা' রসে গুড় করিলে সজিনা-আঠার মতন চট্‌চটে ও চিটার মতন হয়।

"আমাদের দেশে গাদ না তুলিয়া গুড় করা হয় না। লোক যত সভ্য হইতেছে গাদ তোলার চেষ্টা ততই হইতেছে। গাদ না তুলিলে গুড় কাল হয়, আরও দোষ পড়ে। কাল গুড়, লাল গুড় কেহ চায় না। বাইনের কাছে একটি লোক নিয়ত বসিয়া থাকা আবশ্যক। ভাঁড়ারের পর যে-সব বাইনে রস পাকে, সেখানে বাকি গাদ সব তুলিয়া ফেলা চলে।

"আমাদের দেশে লোকে ভিড়া করে না। দুই সের আড়াই সের গুড় মারিলে এক সের ভিঁড়া হয়। কিন্তু গুড় খুচরা চারি আনা সের, ভিঁড়া ছয় আনা। এজন্য ভিঁড়ায় পোষায় না। ভিঁড়াতে দলুয়া কিংবা চিনী হয় না, মুড়কীও হয় না, রুটী লুচি দিয়াও খাওয়ায় সুবিধা হয় না। আজিকালিই দেশে বিলাতী চিনির চলন হইয়াছে। আগে সব কাজ গুড় হইতে করা হইত। নাঁদার তলা ফুটা করিয়া ঝোলা বাহির করিয়া গাঁজ দিয়া দলুয়া বা শর্করা করা হইত। ময়রারা দলুয়ায় কাজ করিত, ঝোলা গুড়ে মুড়কী ঝিলাপী বন্দিয়া ইত্যাদি করিত। পশ্চিমে ভেলী করে।

* বোধ হয়, এই সাচি আখ অন্যত্র 'পুরী' নামে খ্যাত। ইহা শ্যামসাড়া অপেক্ষা সরু, ও ছোট। সাচি আখ কোমল, দাঁতে ছাড়াইয়া খাইবার যোগ্য।

কেন করে, জানি না। বোধ হয় সে-দেশের লোক আমাদের মতন গুড় করিতে জানে না, কিংবা সে-দেশের আখে ভাল গুড় হয় না।"*

বাড়ইর এই উক্তি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, সে ভূয়োদর্শী ও বিচক্ষণ। হয়ত লিখিতে পড়িতে জানে না, কিন্তু অ-পঠ হইলেও অ-শিক্ষিত নহে। এই-রকম লোক শিক্ষার (training) সহিত কিছু বিদ্যা পাইলে দেশের কত উপকার হইত।

সম্প্রতি বাড়ইর উক্তি গুড়-বিদ্যার সাহায্যে বুঝিয়া দেখা যাউক। উত্তম গুড়ের লক্ষণ এই,—ইহা পাণ্ডুবর্ণ, অল্পদ্রব, সুকেলাসিত, সুগন্ধ। নূতন বেলায় সব গুড়ই সুগন্ধ ও সুস্বাদু। বর্ষাকালেই গুড়ের পরীক্ষা। গ্রীষ্ম সময়ে গুড়ের জল শুখাইয়া যায়। বর্ষার ভিজা বাতাসে গুড়ের ঊন-শর্করা দ্রব হয়, গুড় 'লোল' রাখে। সে সময়ের আর্দ্র ও উষ্ণ বায়ুতে অণুজীব ও তুলছাতা প্রভৃতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদের সম্যক্ বৃদ্ধি হয়। গুড়ে তুল-ছাতা দেখা না গেলেও অণুজীবের ক্রিয়া চলিতে থাকে। যে গুড়ে যত ঊন-শর্করা, যত জল, ও যত মল, সে গুড় তত আক্রান্ত হয়। ফলে গুড়ের স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত হয়, ভিতরে বাষ্প জন্মিয়া গুড়কে ফাঁপাইয়া তোলে। অতএব এক কথায় বলিতে গেলে যে গুড়ে যত ইক্ষু-শর্করা সে গুড় তত ভাল। অন্য কথায়, যে গুড়ে যত খাঁড় সে গুড় তত ভাল। †

* এই উক্তি বাড়ইর মুখে শুনি নাই। আমার ভাইপো শ্রীমান্ আশুতোষ রায়, বি, এল, উকীল হইলেও অধিকাংশ সময় গ্রামে থাকে। আমি কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। সে সকলের উত্তর বাড়ই যাহা করিয়াছে, আশুতোষ তাহাই লিখিয়া পাঠাইয়াছে। বস্তুতঃ আখ-শালের অনেক বিষয় নূতন করিয়া জানিয়া লইতে হইয়াছে।

† কোন্ গুড়ে কত খাঁড় (solid) তাহা গুড়ের ভিতরে শলা চালাইয়া অনুমান করা হয়। কিন্তু অনুমান সোজা নহে। সময়ে সময়ে ব্যাপারী ভুল করে, ঠকে। 'উদমান' (hydrometer) যন্ত্র দ্বারা গুড়ের ঘন নিরূপণ সোজা। জল-মেশানা দুধের দুধ নিরূপণের 'দুগ্ধমান' (lactometer) যেমন, উদমানও তেমন। বস্তুতঃ দুগ্ধমান একটা উদমান। 'উদমান' অর্থে যদ্দ্বারা উদ—জল পরিমিত হইতে পারে। জলের ভাগ জানিলে মিশ্রিত দ্রব্যের ভাগও জানিতে পারা যায়। অতএব নাম উদমান হইলেও কাজে ঘন-মান। ইক্ষু-রসের শর্করা মাপিবার এইরূপ শর্করামান বিলাতে (Brix hydrometer)

অতএব খাঁড়গুড় পাইতে হইলে গুড়ের গাদ তুলিয়া ফেলিতে হইবে, এবং যাহাতে রসে উনশর্করা বৃদ্ধি না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আখের দেহ অসংখ্য কোষে নির্মিত। সে-সব কোষে জল ও শর্করা থাকে, পার্থিব দ্রব্য ও অন্য জৈবও থাকে। আখ পিষিলে কোষ-গুলা ছেঁচিয়া ছিঁড়িয়া যায়, ভিতরের যাবতীয় দ্রব বাহির হয়, মলও হয়। শর্করা ব্যতীত যে অন্য জৈব থাকে, তন্মধ্যে অণ্ডলালাবৎ একটা থাকে। ইহা তাপে ঘনীভূত হয়। ডিম সিদ্ধ করিলে এই শাদা লালা ঘন পিণ্ডে পরিণত হয়। এই লালাকে 'লালীন' (albumen) বলা যায়। আখের রসের তৎসদৃশ দ্রব্যকেও 'লালীন' বলিতে পারা যায়। রস জ্বাল দিলে রসের লালীন তাপে ঘনীভূত হইয়া অন্য জৈব বাঁধিয়া লইয়া উপরে ভাসে। এই পৃথক্-কৃত মলই গাদ। ইহাতে রসের পার্থিব দ্রব্যও (ভস্ম) অনেক থাকে। অতএব গাদ কাটাইলে দ্বিবিধ মল কিছু কিছু দূর হয়। রসে এই দুইএর পরিমাণ ১-২ ভাগ বটে; কিন্তু যখন এক মণ গুড় পাইতে অন্ততঃ ৫-৬ মণ রস লাগে, তখন ১-২ ভাগ মল ৫-১০ ভাগে দাঁড়ায়। বঙ্গদেশে গাদ তোলা হয় বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের বহু দরিদ্র প্রদেশে, যেখানে লোকে গুণ অপেক্ষা পরিমাণ বাঞ্ছা করে, সেখানে গাদ তোলা হয় না। গাদ তুলিলে মণকে প্রায় ৩॥০ সের গুড় কম হয়। কিন্তু গাদ থাকিলে গুড় দুর্গন্ধ হয়, রংও কাল হয়। নূতন গুড়ের যে গুড়-গন্ধ, তাহারও প্রধান কারণ জৈব মল। গাদ কাটাইতে অসুবিধাও তেমন নাই। রস

নির্মিত হইয়া থাকে। কিন্তু শীতদেশের নিমিত্ত যন্ত্র এই গ্রীষ্মদেশের পক্ষে ঠিক হয় না। কারণ শীতদেশে জল শীতল, এবং শীতল জল গুরু; আর উষ্ণদেশের জল উষ্ম, উষ্ম জল লঘু। উষ্মজলে উদমান যত ডুবিয়া যায়, শীতল জলে তত যায় না। কত উষ্মার (temperature) নিমিত্ত উদমান অংশিত (graduated) হইয়াছে, এবং উপস্থিত রস কত উষ্ম, তাহা জানিলে দৃষ্ট ঘনতার (density) সংস্কার করিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু সে নিমিত্ত একটা উষ্মমান (thermometer) আবশ্যক। আখের রস পাক করিবার সময়ও উষ্মমান কাজে লাগে। সে কথা পরে বলা যাইবে। শতাংশিক (centigrade) উষ্মমানে সুবিধা হইবে। দুঃখের বিষয়, এদেশের ডাক্তার ও আবহ-বিভাগের কর্তারা ফারাংশিক (Fahrenheit) উষ্মমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহারা নাই পারুন, আমাদের পক্ষে শতাংশিকই ভাল। যাহাতে ১৫০ অংশ পর্যন্ত অঙ্কিত আছে, তেমন একটা হইলে গুড় বাঁধার সময়ও কাজে লাগিবে। শর্করামানেরও প্রয়োজন নাই। বোধ হয় কলিকাতায় সর্বদা পাওয়া যায় না। কিন্তু সামান্য উদমান পাওয়া যায়। দাম দুই এক টাকার মধ্যে। উষ্মমানের দামও এইরূপ। যে উদমানে অন্ততঃ ৭৫ পর্যন্ত ঘনতার চিহ্ন আছে, তেমন একটা চাই। ইহার অর্থ, জলের ঘনতা ০; শর্করাদি হেতু জলের ঘনতা বৃদ্ধি হয়। ভাল আখের রসের ৭০।৭৫, কদাচিৎ ৮০।৮২ পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি ৪ বৃদ্ধিতে ঘন ১ ভাগ। উদমান প্রায়ই ১৫·৫ শতাংশে কিংবা ইহার তুল্য ৬০ ফারাংশে অংশিত হইয়া থাকে। শীতকালের রাত্রে ব্যতীত এই উষ্মা এদেশে ঘটে না। কাজেই রসের উষ্মা এতদপেক্ষা বেশী থাকে। ১৫·৫ হইতে প্রতি ৩ অংশ বৃদ্ধিতে ঘনতা ১ ভাগ বাড়াইলে সংস্কার প্রায় ঠিক হইবে। যথা, কটকে 'মুঙ্গা' নামক আখের রসে উদমান ৫৮, এবং উষ্মমান ২৩ শতাংশ দেখা গেল। ২৩—১৫·৫ = ৭·৫। এই হেতু ঘনতায় ২ বাড়িয়া ৫৮ + ২ = ৬০ হইল। ৪ দিয়া ভাগ করিতে ১৫ পাওয়া গেল। অর্থাৎ সে রসের শতকে ১৫ ভাগ ঘন। শতক হইতে মণে আনা সোজা। ২ দিয়া গুণ ও ৫ দিয়া ভাগ করিলেই হইল। অতএব এই রসের মণ-প্রতি ৬ সের ঘন। গুড়ের মণকে ৬ সের জল ধরিলে ৩৪ সের পাইতে প্রায় ৫॥০ মণ রস চাই। বলা বাহুল্য এই যে ঘন ধরা যাইতেছে তাহা শুধু শর্করা নহে। তাহাতে মলও আছে।

এইরূপে গুড়েরও ঘন নিরূপিত হইতে পারে। এনিমিত্ত একটি মান-পাত্রও চাই। অভাবে, উদমানের সহিত যে পরিবর্তুল (cylinder or cylindrical jar) পাওয়া যাইবে, তাহাতে জল ওজন করিয়া এবং মোটা বালি কিংবা সরু উখা দ্বারা একটা চিহ্ন করিয়া তাহাকেই মান-পাত্র করিতে হইবে। এই চিহ্ন পর্যন্ত ১০০ ভাগ মনে কর। এখন নির্দেয় গুড় ১০ ভাগ ওজন করিয়া মান-পাত্রে রাখিয়া চিহ্ন পর্যন্ত জল পূর্ণ করিলে ১০০ ভাগে ১০ ভাগ গুড় ফেলা হইবে। তখন উদমান দ্বারা ঘনতা নির্ণয় করিয়া সে গুড়ের ১০ ভাগে কত ঘন বলিতে পারা যাইবে। যথা, ঘনতা ২৯, এবং উষ্মা ২৫ শতাংশ দেখা গেল। উদমান ১৫·৫ শতাংশে অঙ্কিত। উষ্মান্তর হেতু ঘনতায় ৩ বৃদ্ধি করিয়া প্রকৃত ঘনতা ৩২ হইল। ৪ দিয়া ভাগ করাতে ৮ ঘন জানা গেল। অর্থাৎ গুড়ের ১০ ভাগের ৮ ভাগ ঘন, শতকে ৮০ ভাগ। অতএব জল ২০ ভাগ। সে গুড়ে বস্তুতঃ ১৯ ভাগ জল ছিল। 'টয়াডেল' (Twaddel)-অংশিত উদমান ছোট আকারে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার প্রতি অংশে ৫ বুঝিতে হয়। ইহার ১ নম্বর উদমান ২৫ পর্যন্ত অংশিত। অতএব ইহা দ্বারা ২৫ × ৫ = ৭৫ পর্যন্ত ঘনতা নির্ণীত হইতে পারে। কখন কখন ইহা ৮৪ ফারাংশে (= প্রায় ২৯ শতাংশ) অংশিত পাওয়া যায়। এরূপ পাইলে এবং মোটামুটি পরীক্ষা করিতে হইলে উষ্মমান যন্ত্র আবশ্যক হইবে না।

মৃদুতাপে (৫০-৬০ শতাংশে) থাকিলেই অধিকাংশ গাদ উপরে উঠে। পরিষ্কৃত চুন-জল যোগ করিলে গাদ আরও উঠে, গুড় আরও নির্মল হয়।

চুন-জলে আরও কাজ হয়। ইহা দ্বারা উন-শর্করার বৃদ্ধি নিবারিত হয়। পূর্বে দেখা গিয়াছে, রসে উন-শর্করা যে পরিমাণে থাকে, সে পরিমাণে খাঁড় হয় না, অর্থাৎ ইক্ষু-শর্করা সে পরিমাণে কেলাসিত হয় না। অতএব রসে যাহাতে উন-শর্করা বাড়িতে না পারে, তাহাতে মন দেওয়া কর্তব্য। রসের উনশর্করার উৎপত্তি আখেই আছে। স্বাভাবিক রসের শতকে ॥০—২ পর্যন্ত উনশর্করা থাকে। আখের জাত, কৃষি, বয়স, অংশ প্রভৃতি ভেদে উন-শর্করার ন্যূনাধিক্য হয়। ঝড়ে গাছ পড়িয়া গেলে, আখ কাটিয়া মাড়িতে দেরি হইলে উন-শর্করা বাড়ে। ফলে গুড়ে মাৎ বাড়ে। এ-সব ছাড়া অন্য কারণ আছে। আখের রস স্বভাবতঃ ঈষৎ অম্ল। মুখে দিয়া বুঝিতে পারা যায় না, অন্যবিধ পরীক্ষা দ্বারা পারা যায়। অম্লযুক্ত রস কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে উন-শর্করা বাড়ে। রস রাখিয়া দিলে অর্থাৎ ফুটাইতে দেরি করিলে তাহাতে অণুজীব বাড়িতে থাকে; ইহাদের ক্রিয়াহেতু রসের উপরে ফুট ধরে, রস অম্ল হয়, উন-শর্করা বৃদ্ধি হয়। রস অনেকক্ষণ ধরিয়া ফুটাইলেও উনশর্করা বৃদ্ধি হয়। বলা বাহুল্য রসের ইক্ষু-শর্করাই উনশর্করায় পরিবর্তিত হয়। অতএব দুইদিকে ক্ষতি; খাঁড় কম, মাৎ বেশী হয়।

এক উপায় দ্বারা সব দোষের প্রতিকার হইতে পারে না। কিন্তু আদি প্রতিকার শুচি। পিষিবার পূর্বে আখের গায়ের মাটি কাদা ধুইয়া ফেলা; গুঁড়ী, ও গেছো, পাইলা, ডাঙ্গরিয়া, বাইন প্রভৃতি যাবতীয় পাত্র নির্মল করা ও নির্মল রাখা। গুঁড়ী হইতে রস পড়িবার সময় কম্বল দিয়া ছাঁকা কর্তব্য। আখের গোআর ছোট ছোট কুঁচিও ছাঁকা কর্তব্য। অনাবশ্যক যাহা কিছু, সবই শুচির বিরোধী। মানুষের হাত যত না লাগে, ততই ভাল।*

রস হইলে বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র এবং দ্রুত পাক অবশ্য কর্তব্য। শুচি, হইয়া শীঘ্র এবং দ্রুত পাক করিতে পারিলে অন্য প্রতিকার প্রায় আবশ্যক হয় না।

তথাপি রসের স্বাভাবিক অম্লতা, এবং নানা কারণে জাত অম্লতার নিবারণ কর্তব্য। সাজি, 'সোডা', ও চুন—ক্ষার। অম্ল ও ক্ষার পরস্পর বিরোধী। অতএব যে-কোন ক্ষার যোগ করিলে অম্ল নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু দেখিতে হইবে এক দোষ নষ্ট করিতে গিয়া অন্য দোষ না ঘটে। 'সোডা'র দোষ উহা রসে থাকিয়া যায়, রসের পার্থিব মল বৃদ্ধি করে। সাজির এই দোষ আছে, অন্য দোষও আছে। উহাতে সোডা ছাড়া অন্য নানাবিধ পার্থিব দ্রব্য থাকে। সুতরাং সাজি দ্বারা গুড়ের অধিক ক্ষতি হয়। চুনের গুণ এই যে, ইহা অম্ল নাশ করিয়া ঘন আকারে পৃথক হইয়া পড়ে। বিশেষ গুণ, লালীনাদি জৈব মলের সহিত যুক্ত হইয়া পৃথক হয়। একারণ চুন দিলে রস নির্মল হয়, পাতলা হয়।*

---

* একথা সবাই জানে, অথচ জানে না। এ বেলার রাঁধা ব্যঞ্জন ও বেলার তরে রাখিতে হইলে ব্যঞ্জনে হাত দিয়া রাখা হয় না, ধাতুনির্মিত হাতা দিয়া রাখা হয়। নাঁদার গুড় বাহির করিতে হইলেও হাতা দিয়া করা ভাল। কাসন্দী করিতে কত শুচি হইতে হয় তাহা সুগৃহিণী মাত্রেই জানেন।

* 'এত রসে এত চুন দিবে' বলিতে পারিলে বাড়ুইর কর্ম লঘু হয়। ৺ নৃত্যগোপাল মুখার্জী রসের প্রতি-কলশীতে আধ তোলা চুন দিতে বলিয়াছিলেন। তাহা হইলে প্রতি-মণে ১৪ তোলা। বোম্বাই অঞ্চলের বাড়ুইরা ২ তোলা দেয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সাজি দেয়। সেখানকার সরকারী কৃষিবিভাগের উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হাদী সাহেবও সাজি দিতে বলেন। (Improvements in Native Methods of Sugar Manufacture. S. M. Hadi, U.P. Agri. Bulletin No 19 1907.) আধ মণ জলে আধ সের সাজি ফুটাইয়া ছাঁকিয়া জলটা দিতে বলেন। ভালচা সাজি পাওয়া না গেলে সোডা দিতে বলেন। কিন্তু আমি সাজি ও সোডার পক্ষপাতী হইতে পারি নাই। গুড়ের রং সাদা করিতে গিয়া মাতের পার্থিব মলবৃদ্ধি যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। কেবল সাদা খাঁড় কিংবা গুড়ের কেলাস পাইলেই চলে না; যে মাৎ হয়, তাহাও যত ভাল থাকে তাহা দেখা কর্তব্য। নতুবা মাতের দাম কম হইবে। তিনি ঢেঁড়শ-গাছের ও তৎসদৃশ 'দেউলা' নামক একটা বন্য গাছের লাল্-লালা আঠাও দিতে বলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'দেউলা' এদেশের সর্বোত্তম মলাপহ। সাজি ও 'দেউলা'র লালা একত্রে দিতে বলিয়াছেন। আমি 'দেউলা' দেখি নাই। ঢেঁড়শের ফলের লালার এমন কিছু গুণ দেখি না। এই লালা শীতল জলে অল্প, কিন্তু ফুটন্ত জলে সমস্ত মিশ্রিত হয়। ক্ষার-যোগেও হয়।

কিন্তু চূনের মাত্রা অধিক হইলে এক দোষ নিবারণ করিতে অন্য দোষ ঘটিবে। গুড় কাল হইবে। রসে উন-শর্করা থাকেই। ক্ষার-যোগে উন-শর্করা কাল হয়। সাজি সোডা চূন, তিনেরই আধিক্যে গুড় কাল হয়। অতিরিক্ত ক্ষারের অন্য দোষ আছে। স-ক্ষার গুড় অধিক দিন অবিকৃত রাখা কঠিন। ক্ষার-রসে অণুজীব যত বাড়ে, অম্ল-রসে তত বাড়ে না। অতএব চূনের মাত্রা বরং উন ভাল, অধিক ভাল নহে। রস বরং কিছু অম্ল থাকিবে, কিন্তু ক্ষার হইবে না। যদি ডাঙ্গরিয়ার রসে ফুট দেখা যায়, অর্থাৎ অণুজীবের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে রস অবিলম্বে জ্বাল দিয়া ফুটাইয়া অণুজীব মারিয়া চূন দেওয়া কর্তব্য। চূনে অণুজীব মরে, কিন্তু অল্প চূনে মরে না। পাত্রাদি অপরিষ্কার হইলে অণুজীবের বৃদ্ধি। গ্রীষ্মে বৃদ্ধি; এই হেতু শীতের সময় কুয়াসা হইলে, পাক করিতে বেলা হইলে, গুড়ের মাৎ বৃদ্ধি হয়। রাত্রি থাকিতে রস করিতে পারিলে অনেক সুবিধা। তখন ভোর হইতে রস পাক আরম্ভ করিতে পারা যায়, কিন্তু দ্রুত পাক করিতে হইবে; কারণ যত বিলম্ব হইবে, রস তাপে থাকাতে উহার ইক্ষুশর্করা উনশর্করায় তত পরিবর্তিত হইবে।

এখন আর-এক সমস্যায় পড়া গেল। কি উপায়ে রস দ্রুত মারিতে পারা যায়? (১) তাপ যত অধিক পাইবে রস তত শুখাইবে। (২) পাত্র যত চেপটা হইবে, যেমন তাওয়া, রস তত অগভীর হইবে, দ্রুত শুখাইবে। এই হেতু লোহার বড় বড় তাওয়া এদেশের বহু স্থানে প্রচলিত হইয়াছে। বোম্বাই অঞ্চলে তাওয়া প্রচলিত ছিল। বিলাতী চীনিকরেরা পূর্বে লোহার তাওয়ায় রস জ্বাল দিত। এখন কোথাও কোথাও আছে, কিন্তু প্রায়ই অন্য এক কৌশলে রস গাঢ় করা হইতেছে। এই যে কৌশল, তাহা আমাদের সাধ্য নহে। সুতরাং সে উপায় ভবিষ্যবংশীয়ের নিমিত্ত

অতএব আখের রসেও মিশিয়া যায়। সে রস ফুটাইলে যে গাদ ওঠে, তাহা রসের গাদ। ঢেঁড়শের লালাও কিছু পৃথক হয়। কিন্তু বোধ হয় রসে অনেকটা থাকিয়া যায়। এইরূপে রসের "অন্য জৈব মল" বৃদ্ধি যুক্তি-সঙ্গত মনে হয় না। সাজি ও 'দেউলা' যোগের পূর্বে ও পরে রসের কিংবা গুড়ের ভাগ নির্ণয় করিলে হাদী সাহেবের উপদেশ সহজে বুঝিতে পারা যাইত। তিনি করিয়াছিলেন কি না, প্রকাশ নাই। চীনি করিতে দুধ-জল কিংবা ডাবের জল প্রক্ষেপ দ্বারা খাঁড়ের গাদ পৃথক করা হয়। এখানে ক্রিয়াটা স্পষ্ট। এই দুই জলে 'লালীন' (albumen) আছে যেটা তাপে ঘনীভূত হয়। কিন্তু ঢেঁড়শ-গাছে 'লালীন' কই? এইরূপ, তিনি খাঁড় হইতে চীনি করিবার সময় খাঁড়কে রিঠা ফলের কাথ দিয়া ধুইতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমি একথাও বুঝিতে পারি নাই। সাজি ও রিঠা (অরিষ্ট) মলগ্রাহ বটে, কিন্তু সে সে মল অপকর্ষণ করে কি?

বিলাতের গুড়-কার রসের মণপ্রতি ৬।৭ তোলা চূন যোগ করে। শুখ্না চূন নহে। টাটকা কলি চূন জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া সেই চূনগোলা দেয়। কিন্তু মাপা আবশ্যক হয়। কারণ কত গোলায় কত চূন রহিল তাহা দেখিয়া জানিতে পারা যায় না। সহজ উপায় চূন জল করিয়া সেই জল যোগ করা। এক মণ চূন-জলে ৬॥০ তোলার অধিক চূন থাকে না। এইরূপে কিন্তু এক মণ রসে, বিলাতী চীনি-করের হিসাবে, এক মণ চূন-জল ঢালিতে হয়। সুতরাং সুবিধা নাই। তা ছাড়া সব রসে সমান ভাগে দেওয়াও কর্তব্য নহে। অতএব বাড়ইকে প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এখানে সহজসাধ্য পরীক্ষা লিখিত হইতেছে। চূন-সংযোগে হলুদ লাল হয়, যাবতীয় ক্ষার-সংযোগে হয়। লাল হলুদ অম্ল-সংযোগে স্বীয় পীতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। অতএব ১ সের টাটকা শুখনা খুলী চূনে ১০ সের জল মিশাইয়া গোলা কর। চূন ভাল হইলে, অর্থাৎ মাটি বালি খিচ না থাকিলে এই গোলার দুই ছটাকে (১০ তোলায়) ১ তোলা চূন থাকিবে। একটা হাঁড়ীতে ১০ তোলা চূন-গোলা লইয়া তাহার সহিত কিছু হলুদ-বাটা মিশাও যেন বেশ লাল হয়। এখন ইহার সহিত রস মিশাইতে থাক। মিশাইতে মিশাইতে লালবর্ণ ক্রমশঃ ফিকা হইতে থাকিবে। যখন দেখিবে লাল গিয়া হলুদ রং আসিয়াছে, তখন জানিবে রসের ক্ষার কাটিয়া অম্ল আসিয়াছে। যত সের রস লাগিল, তাহা হইতে কত মণ রসে কত চূন দিতে হইবে অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। এই রূপে চূনের মাত্রা কখনও অধিক হইবে না। বিপরীত ক্রমেও পরীক্ষা করিতে পারা যায়। পাঁচ সের রসে হলুদ দিয়া হলুদা রং কর। এখন ইহাতে অল্পে-অল্পে চূন গোলা মিশাইতে থাক। যখন হলুদা রং গিয়া ঈষৎ লাল হইবে, তখন বোঝা যাইবে চূন একটু অধিক হইয়াছে। অতএব কিছু চূন কম করিয়া লইতে হইবে। রসে হলুদ পড়িলে ক্ষতি হয় না, অতএব পরীক্ষার রস ফেলা যাইবে না। কাঁচা হলুদ পাইলে রং দেখায় সুবিধা হইবে। হলুদের তুল্য অনেক রং আছে, যাহা দ্বারা ক্ষার বুঝিতে পারা যায়। যেমন অশ্বত্থ ছালের রং। ক্ষার যোগে ইহা রক্তবর্ণ, এবং অম্লযোগে পীতবর্ণ হয়। গুড়ের পক্ষে হলুদই ভাল।

রাখিয়া সাধ্য উপায় স্থির করিতে হইবে। তাওয়া করিতে হইলে ধাতুর করা চাই; মাটির তাওয়া, বৃহৎ তাওয়া, যাহাতে আধমণ রস পাক করিতে পারা যায়, তেমন তাওয়া মাটির করা যাইতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই পুরু করিতে হইবে, সুতরাং তাপের অপচয় ঘটিবে। তা ছাড়া, সে তাওয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কাও প্রবল। কিন্তু লোহার করিলে দোষ কি? ধাতুর দোষ কি?

গুড়-বিদ্যায় বলে, ধাতুপাত্রে ইক্ষুশর্করার জল ফুটাইলে উনশর্করায় পরিণতি শীঘ্র ঘটে, কাচ-পাত্রে কাচের ক্ষারত্ব হেতু প্রতিরুদ্ধ হয়। রসে অম্ল থাকেই; লবণও থাকে। ইহাদের সহিত ধাতুর সংযোগ ঘটে; কিন্তু লোহা তামা প্রভৃতির ধাতুঘটিত লবণ উনশর্করার অনুকূল, মাটির পাত্র প্রতিকূল। অতএব লোহা তামা চলিবে না।*

অন্ততঃ যতদিন ভাল মন্দ বুঝিতে পারা না যাইতেছে, ততদিন মাটির বাইনই ভাল বলিতে হইবে। পাক শেষ করিতে সময় লাগে, কিন্তু লোহায় পুড়িয়া যাইবার ভয় থাকে না। বাড়ই ও জ্বালই দক্ষ হইলে গুড় পোড়ে না। গুড় পুড়িলে দুই দিকে ক্ষতি; (১) গুড়ে কম হয়, (২) গুড় কাল হয়, এমন কাল হয় যে সে রং সহজে নষ্ট করিতে পারা যায় না। ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত খেজুর গুড়ে পাওয়া যায়।

এতদূর পর্যন্ত কাজটা সোজা। পাকশেষে যখন গুড় বেঁঅতীতে কিংবা নাঁদায় তুলিতে হইবে, তখন বাড়ইর ভূয়োদর্শন অবশ্য চাই। পাক নরম হইলে গুড়ে এক দিকে খাঁড় অপর দিকে মাৎ পৃথক থাকিবে, পাক কড়া হইলে গুড় পুড়িয়া যাইবে। কারণ এখন গুড়ে ৭।৮ ভাগের অধিক জল থাকে না।*

গুড় বেঁঅতীতে তুলিয়া মোটা কাঠী দিয়া ঘাঁটিয়া শীতল হইতে দিলে ছোট ছোট দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে। গুড়ের উষ্ণ গাঢ় রসে অপেক্ষাকৃত শীতল ও তনু রস যোগ করিলে দানা সহজে বাঁধিতে আরম্ভ হয়। কারণ শৈত্যযোগে গুড়-রস শীতল হয়। সে গুড় বেঁঅতীতে লইয়া তাড়ু দিয়া নাড়িয়া-নাড়িয়া ঠাণ্ডা করিলে ভিঁড়া হয়। উত্তম ভিঁড়ায় দানা (কেলাস) থাকে। সে দানা খুব ছোট ছোট বটে, কিন্তু তাহার গায়ে ইক্ষু-শর্করা জমিয়া দানা বড় বড় হয়। ভিঁড়ায় কেবল ইক্ষু-শর্করা থাকে না, উন-শর্করাও থাকে। কেলাসে উন-শর্করাও জমিয়া যায়। কিন্তু উন-

* হাদী সাহেব চীনির নিমিত্ত গুড় করিতে হইলে লোহা বর্জন করিতে বলিয়াছেন। লোহা হেতু গুড়ের রং পাঁশুটা হয়, সে রং সহজে দূর করিতে পারা যায় না। কিন্তু তাঁমার পাত্র নির্দেশ করিয়াছেন। গুড়ের কিংবা চীনির বর্ণের পক্ষে তামা অনিষ্টকর না হইলেও খাঁড়ের পক্ষে কি না, তাহা বলেন নাই। পশ্চিমে কোথাও-কোথাও তামার ডেকচি প্রচলিত আছে। লোহার গুঁড়ীতে রসের গুণান্তর ঘটে কি না, তাহাও কেহ পরীক্ষা করেন নাই। বোম্বাই অঞ্চলে কোন কোন কৃষক কাঠের গুঁড়ী ছাড়ে নাই। তাহারা বলে লোহার গুঁড়ীতে গুড় ভাল হয় না। পঞ্জাবে লোহার গুঁড়ীর রস কেহ খায় না, কারণ বিস্বাদ লাগে। বঙ্গদেশেও সবাই জানে আগের কাঠের গুঁড়ীর রসের যেমন আস্বাদ পাওয়া যাইত, এখন লোহার গুঁড়ীর রসে সে আস্বাদ পাওয়া যায় না। অতএব লোহাহেতু রসের গুণান্তর হয়। অথচ কেহ কেহ কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কাঠের ঘানী ও লোহার ঘানীর তেল কখনও একবিধ নহে। তবে, লোহা হেতু গুড়ের কি বিষয়ে কি অনিষ্ট হয় তাহা না জানিলে তর্কের শেষ পাওয়া যাইবে না। তা ছাড়া, ইহাও ঠিক, এমন কোন কিছু নাই যাহাতে দোষ নাই কিংবা গুণ নাই। বস্তুতঃ সকল বিষয়েই আয়-ব্যয়, ক্ষতি-বৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়।

* যে গুড় রাঁধে নাই, গুড়ের ফুট চেনে না, তাহাকে লিখিয়া শিখাইতে পারা যায় না। তবে উষ্ণমান যন্ত্র দ্বারা অনেকটা সাহায্য হইতে পারে। এই উষ্ণমান ১৫০ শতাংশ পর্য্যন্ত চিহ্নিত থাকা চাই। গুড় রাঁধিতে এত লাগে না, ১৩০ শতাংশ হইলেই চলে। রসের বাইনে উষ্ণমান ডুবাইয়া ধরিলে ১০০ শতাংশের অধিক কখনও দেখা যাইবে না। ভাঁড়ারে থাকিবার সময়ও ইহার অধিক উঠে না। গুড়ের বাইনে ১০১, ১০২, ক্রমে উঠিতে থাকে। ১১০ শতাংশে ময়রার এক-তার-বন্দ রস হয়। তখন রসে প্রায় ২০।২২ ভাগ জল থাকে। ১১৫ শতাংশে দু-তার বন্দ। তখন জল প্রায় ১৬ ভাগ। ইহার পর জল দ্রুত শুখাইতে থাকে, উষ্মাও দ্রুত উঠিতে থাকে। ১২০ শতাংশে জল ১২ ভাগ থাকে। পটু না হইলে এই সময়ে, বরং পূর্বেই, গুড় তোলা কর্তব্য। বাইন হইতে বেঁঅতীতে তুলিতে-তুলিতে রস আরও মরিয়া যায়। ১২৮ শতাংশে জলের ভাগ ৮ থাকে। বোধ হয় পটু বাড়ই এইখানে থামে। আমি পটু বাড়ইর কর্ম দেখি নাই। অনুমান দ্বারা লিখিলাম। ফুটন্ত গুড় ছিটকাইয়া নষ্ট হইতে পারে, গায়ে পড়িলে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হয়। একটু তেল দিলে গুড় শান্ত হয়।

শর্করা বায়ুর জলীয় বাষ্প শোষণ করে, সূক্ষ্ম কেলাসগুলি অদৃশ্য হয়, ভিঁড়াঃ ভিজা-ভিজা দেখায়।*

আখের জাত, বয়স, অংশ, কৃষি, ক্ষেত্র, প্রভৃতি নানা কারণে গুড়ের ইতর-বিশেষ হয়। এসব কৃষির অন্তর্গত, কৃষকের জ্ঞাতব্য। গোবর-সারে, খইলে, রেড়ীর খইলে, সময়ের জলে, অসময়ের জলে, শুখায়, ঝড়ে, রোগে, কীটে, উইএ, শিয়ালে, প্রভৃতি কত দিকে কত পরিবর্ত্তন করে, কত জানিবার বুঝিবার ও প্রতিকার করিবার আছে। গোড়ার রস মিষ্টতম, ডগার জলুয়া। ডগার রসে উন-শর্করাও অধিক। কাঁচা আখে, এবং পাকিয়া ক্ষেতে থাকিলে সে আখেও উন-শর্করা অধিক। ঝড়ে বাতাসে গাছ পড়িয়া গেলেও উন শর্করা জন্মে। রোগে ও কীটে আক্রান্ত হইলেও তাই। এ সব ত আছেই। এক এক জাতেরও দোষগুণ আছে। এখানে বর্দ্ধমান অঞ্চলের উৎকৃষ্ট কয়েক জাতের রসের ভাগ লিখিত হইতেছে। (ডাঃ লীথার সাহেবের পরীক্ষা-করা। ইং ১৮৯৭ সাল)।

	আখে রস	ঘনতা	রসে শর্করা	রসে উন-শর্করা
শ্যামসাড়া	৭২	৭৮	১৫.২৪	১.৮৬
পুরী	৭২	৮৩	১৮.০২	০.৭৬
কাজলা	৬৮	৮০	১৭.০৫	১.৫৪
খড়ী	৬২	৮৪	১৮ ৯৬	০.৩৬
পুণার পুণ্ডিয়া	৭০	?	১৬ ১৭.৪	১.২-১.৬
সাহারণপুরী	?	৭০	১৪ ৯২	০.৩৭
বিহারের মুঙ্গা	৬০	৬৪	১৩.৫৩	০.৪৬

লোহার তিন-গুঁড়ী খাঅইতে পিষিয়া যে রস ও যত রস পাওয়া গিয়াছিল, তাহা লিখিত হইল। সব ভাগ শতকে। বলা বাহুল্য সব বৎসর সব ক্ষেতে সমান ভাগ থাকে না। 'আখে রস', কিংবা 'রসে শর্করা' দেখিয়া গুড়ে লাভালাভও বুঝিতে পারা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গে শ্যামসাড়ার চাষ অধিক। ইহার অনেক গুণ আছে। দোষ, উন-শর্করার আধিক্য। পাঁচ মণ রসে এক মণ গুড় করিলে, অন্য কারণ না থাকিলেও, উন-শর্করা স্বভাবতঃ অধিক হইবে। কিন্তু গুড়ের শতকে ১০ ভাগের অধিক ঘটিলে বাড়ইর দোষ। খড়ী আখের অনেক গুণ আছে। সহজে মরে না, কষ্ট সহিতে পারে, রসে শর্করা বেশী, উন-শর্করা কম; কিন্তু রস কম। তা ছাড়া গাছ সরু, শ্যামশাড়ার মতন লম্বাও নহে। আখ যত সরু, খোআ তত বেশী; আর খোআ যত বেশী, রসেরও তত অপচয়। কারণ খোআতে রস শুষিয়া রাখে। ডাঃ লীথারের পরীক্ষা হইতে দেখা যায়, এক মণ কাঁচা খোআ শুখাইয়া নী-রস করিলে মাত্র ১২।১৩ সের হয়। অতএব ২৭।২৮ সের রস খোআয় থাকে। অবশ্য আখের তুলনায় এত নহে। শ্যামশাড়ার শতকে ৭২ ভাগ, মণকে ২৮।২৯ সের রস, খোআ ১১।১২ সের। এই ১২ সের খোআয় প্রায় ৮ সের রস, এবং ১ সের ১৷৹ সের শর্করা থাকে। এমন কল নাই যাহাতে সব রস বাহির হইতে পারে। বোম্বাই অঞ্চলের কোথাও-কোথাও কুমারে গুড়-পাকের বাসন দেয়, খোআ লয়। তাহারা জলে খোআ ধুইয়া জল মারিয়া গুড় করে। অবশ্য সে গুড় তত ভাল হয় না। কারণ শেষাস্ত রসে মল অধিক থাকে। বিলাতে নানা উপায় করা হয়। শ্রেষ্ঠ উপায়, আখ না মাড়িয়া ইহাকে কুচি-কুচি করিয়া কাটিয়া কুচিগুলি গরম জলে ধোআ। ঠিক ধোআ নহে। এ বিষয় পরে বলা যাইবে। দ্বিতীয় উপায়, খোআ জলে ভিজাইয়া আবার পেষা। মনে কর, এক মণ খোআয় ৬ সের জল দিয়া আর-এক খাঅইতে আবার পেষা গেল। এখন এই জল খোআর ১২ সের রসের সহিত মিশিয়া বাহির হইবে। সে খোআয় আবার ৬ সের জল দিয়া তৃতীয় খাঅইতে পিষিলে আরও কিছু শর্করা পাওয়া যাইবে। কিন্তু দুইবারে রসে ১২ সের

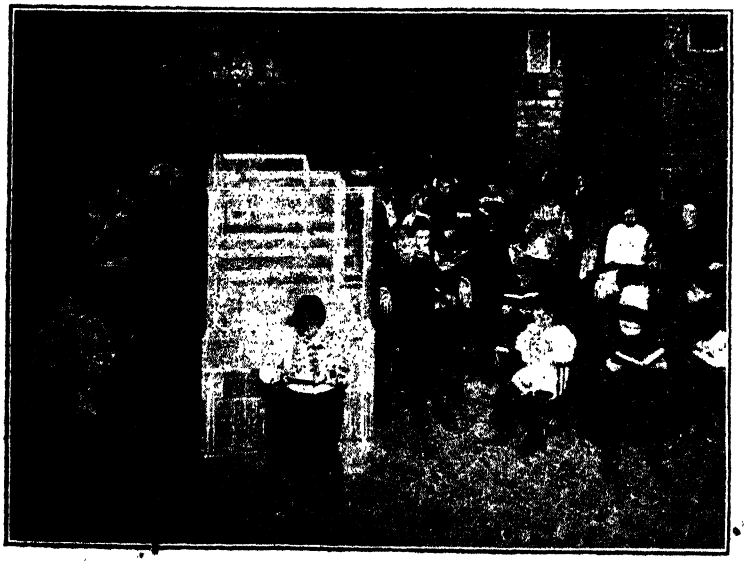
* গুড় পুড়িয়া লাল হয়। বিলাতে মৃদু তাপে রস মারা হয়, গুড় লাল হয় না। তাপ মৃদু: অথচ রস দ্রুত মরে। বাইনের উপরে যে বায়ু থাক, এবং যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, এই দুই সরাইয়া তাপ মৃদু রাখিয়া রস দ্রুত মারিতে পারা যায়। এইখানে বর্ত্তমান বিজ্ঞান দ্বারা গুড়কারের সাহায্য হইয়াছে। এই কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে এদেশী ও বিদেশী গুড়-কলা এক। কিন্তু ভিঁড়া পাণ্ডুর দেখায় কেন? 'সোডা' দিলে গুড় পাণ্ডুর বর্ণ হয় কেন? হয়ত বাতাস লাগিয়া অর্থাৎ গুড়-বিন্দু বায়ু-স্তর দ্বারা বেষ্টিত থাকে বলিয়া শাদাটে দেখায়। কিন্তু এই অনুমান সত্য হইলে ভিঁড়ার পানা লাল দেখাইত। বাস্তবিক দেখায় না, আপীত অর্থাৎ ভিঁড়া-বর্ণই দেখায়। অতএব কারণ অন্বেষণ কর্ত্তব্য।

জল পড়িবে। কিন্তু এই জ'লো রস দিয়া নূতন খোআ ভিজাইলে মোট জল ৬ সেরই থাকিবে। কোথাও কোথাও গরম জল দেওয়া হয়। গরম জলে শর্করা বেশী বাহির হয়। কিন্তু শেষ কথা, খরচায় পোষায় কি না। তিন বার পর্যন্ত নাকি পোষায়; পরে গুড়ের দামে জ্বালের খরচ পোষায় না। তৃতীয় উপায়, দুই তিন বার না পিষিয়া কেবল গরম জলে ধোআ। মনে কর, ডাবায় জল গরম হইতেছে। এক ঝোড়া খোআ সেই জলে, ৭।৮ মিনিট ডুবাইয়া রাখা গেল। খোআর কিছু শর্করা সে জলে চলিয়া আসিবে। সে খোআ ফেলিয়া আবার নূতন খোআ, তাহা ফেলিয়া আবার নূতন খোআ, এইরূপ একই জলে ৮।৯ ঝোড়া খোআ ধোআ হয়। মোট রসে ৬।৭ সের জল বাড়ে, কিন্তু আখের রসের মণকে ৩৮ সের পর্যন্ত রস পাওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ আখের সমুদয় রসের মণকে মাত্র ২ সের, আখের খোআয় থাকিয়া যায়। কেবল একবার পিষিলে মাত্র ২৮ সের। আমাদের এই দরিদ্র দেশে গুড় একটুও অপচয় করিতে পারা যায় না। যেখানে জ্বালন সুপ্রাপ্য, সেখানে এই তৃতীয় উপায় দ্বারা লাভ থাকিবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।



টমাস এ ফরসীথ।



শিশু-রোগীদের অপেক্ষা-ঘর।

দাঁতের যত্ন

আমেরিকার লোকেরা যা কর্ত্তব্য বলে' স্থির করে তা তারা পুরাদস্তুর ভালো করে'ই সম্পন্ন করে। যেই তারা জানতে পারলে যে মশা-ই হচ্ছে ম্যালেরিয়ার বাহন, অমনি তারা মশক ধ্বংসের জন্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে' তার বৃহৎবদ্ধ ব্যবস্থা আয়োজন করে' ফেললে। আমেরিকার হাভানা আর রিও শহর আগে রোগের আস্তানা ছিল - তাকে সে-দেশের লোকেরা Pest-holes বলত। এখন ঐ দুই শহর স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হয়েছে। রিও শহর

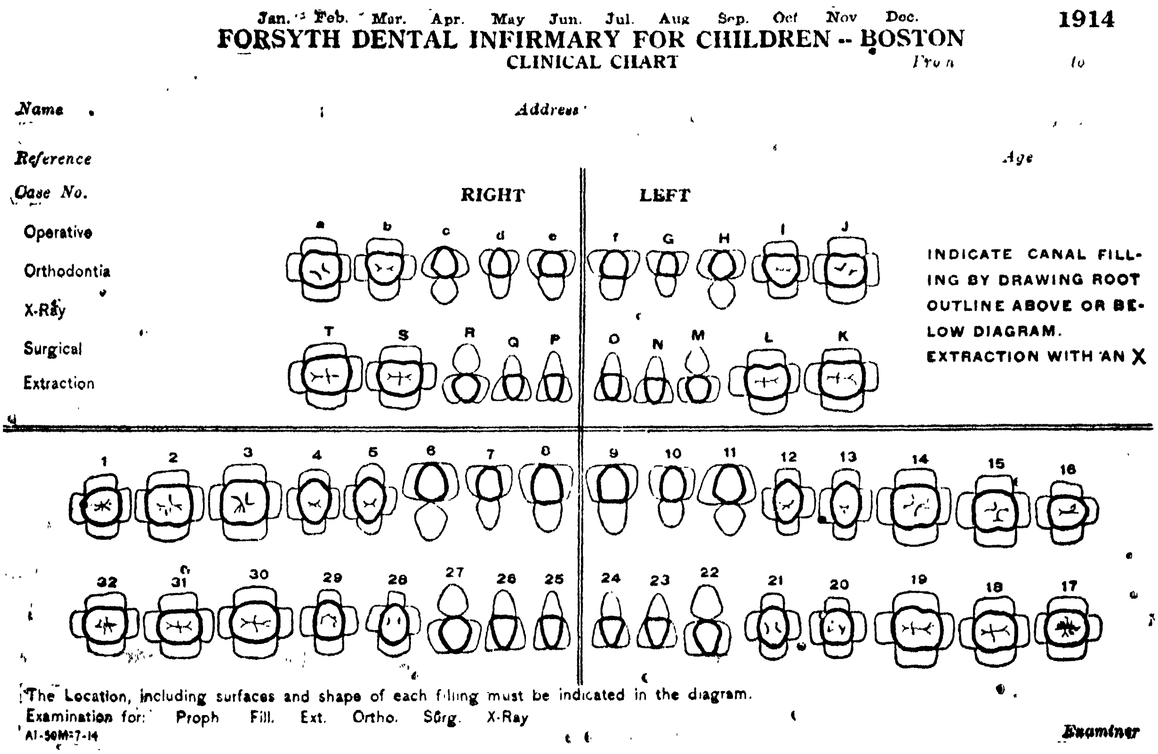
মশা মারবার জন্যে দেড়শো কোটি টাকা খরচ করেছিল, তার ফলে লাভ হয়েছে আরো ঢের বেশী। শহরের মিউনিসিপালিটিতে মশক-বিভাগ বলে' একটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে; কোনো বাসিন্দা যদি সেখানে টেলিফোঁ করে' জানায় যে সে একটা মশা দেখতে পেয়েছে তবে তখনি দু-দুজন ইন্সপেকটার সেই মশাটাকে গেরেপ্তার করতে



X-রের ঘর।



নানাবিধ যন্ত্রের মাঝে ডাক্তার দাঁড়াইয়া আছেন।



Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug Sep. Oct Nov Dec. 1914

FORSYTH DENTAL INFIRMARY FOR CHILDREN -- BOSTON

CLINICAL CHART

From *to*

Name *Address*

Reference *Age*

Case No.

Operative
Orthodontia
X-Ray
Surgical
Extraction

RIGHT LEFT

a b c d e f G H I J

T S R Q P O N M L K

INDICATE CANAL FILLING BY DRAWING ROOT OUTLINE ABOVE OR BELOW DIAGRAM. EXTRACTION WITH AN X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

The Location, including surfaces and shape of each filling must be indicated in the diagram.

Examination for: Proph Fill. Ext. Ortho. Surg. X-Ray

AI-50M-7-14 *Examiner*

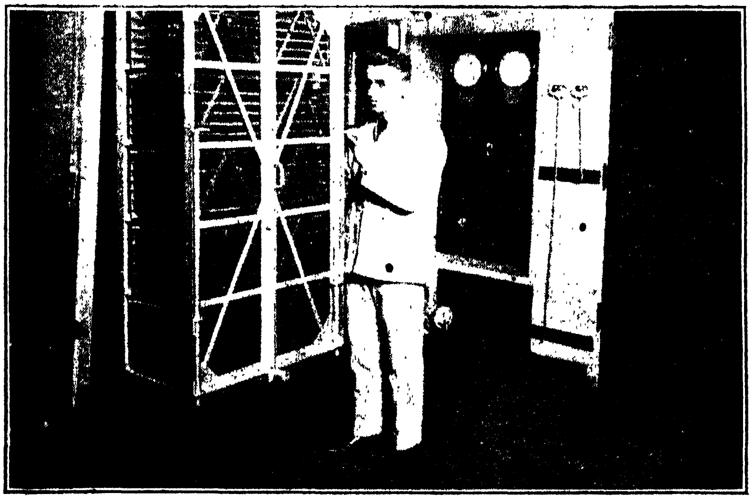
এই-ছকের উপর রোগীর প্রতিদিনকার অবস্থা ও-চিকিৎসার ফল টুকিয়া দেওয়া হয়।



এই ঘরে উপরি যন্ত্র ও ঔষধ ঠিক করিয়া রাখা হয়।



দাঁত তুলিবার ঘর।



এই প্রকাণ্ড খাঁচার মধ্যেকার সমস্ত যন্ত্র একই সময়ে চুল্লীর উপর তাতাইয়া শোধিত করা হয়।

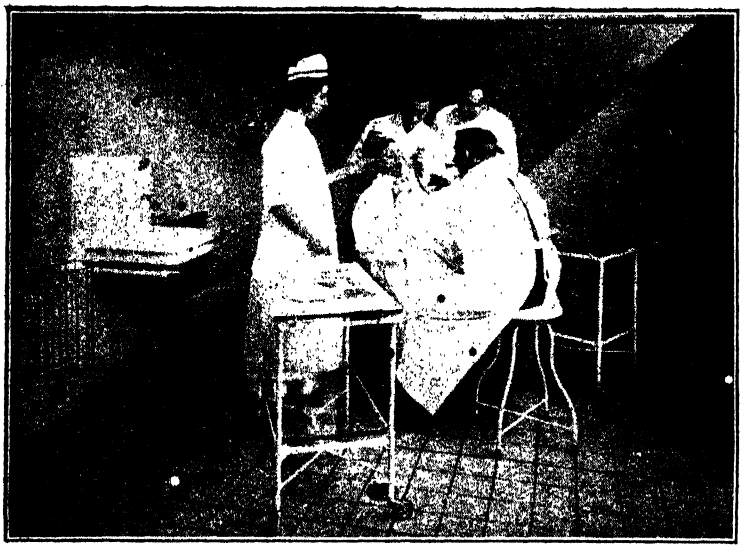


দাঁত তোলার পর শিশুরা মুখ ধুইতেছে।

মোটরে চড়ে' ছোটে! এটা হাসবার ব্যাপার নয়; কাজ যেমন করে' করা উচিত এ তারই দৃষ্টান্ত। এই-রকম করে' সেই ম্যালেরিয়ার দেশ ম্যালেরিয়া থেকে মুক্ত হয়ে উঠেছে! এখন তারা জানতে পেরেছে যে দাঁতের যত্ন ছেলেবেলা থেকে না করলে দাঁতে পোকা ধরে; পোকা-খেকো দাঁতে খাবার ভালো করে' চেবানো যায় না; চিবিয়ে না খেলে হজমের ব্যাঘাত হয়; হজম না হলে মানুষ সুস্থ থাকে না; দেশবাসী অসুস্থ হলে দেশের কাজ উৎকৃষ্টভাবে সম্পন্ন হয় না; প্রজা অসুস্থ হলে আখেরে ষ্টেট বা রাজ্যেরই লোকসান। অতএব প্রজা যাতে সুস্থ সবল দারিদ্র্যমুক্ত থাকে তার ব্যবস্থা করা ষ্টেটেরই কর্ত্তব্য ও স্বার্থ। তাই আমেরিকার স্কুলে স্কুলে ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দাঁতেরও যত্ন করতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ডাক্তার অস্লার বলেছেন যে মদে মানুষের যে সর্ব্বনাশ করছে, খারাপ দাঁতে তার চেয়েও বেশী ক্ষতি হচ্ছে।

অম্ল-রস লেগে লেগে দাঁতের উপরকার এনামেল ক্ষয়ে যায়, সেই ক্ষয়া জায়গায় খাবারের কুচি আটকে থাকে, তাতে অণুজীব জন্মে' দাঁতের মাথা খেতে থাকে। এই ক্ষতির প্রতিকারের জন্যে দাঁত সর্ব্বদা খুব পরিষ্কার রাখা উচিত। সকল লোকে ত পরিষ্কার থাকার মূল্য বোঝে না, সকলে জানেও না; জানলেও অনেকে পরিষ্কার করবার উপায় জানে না, ডাক্তারের পরামর্শ নেবার সঙ্গতিও সকলের থাকে না; আবার ডাক্তারই বা কজন আছে? আমেরিকায় ৯ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের বাস; সেখানে দাঁতের ডাক্তার আছে ৪৫ হাজার! এঁরা বড়-জোর দেড়কোটি লোকের দাঁতের তদারকের ভার নিতে পারেন; বাকী ৮ কোটি লোকের কি উপায় হবে? উপায়, স্কুলের প্রত্যেক ছেলে-মেয়েকে ছোটখাট ডাক্তার করে' তোলা, তাদের সকলকে দাঁতের যত্ন করতে শেখানো।



অস্ত্রচিকিৎসা।

প্রত্যেক স্কুলে এইজন্যে একজন করে' মেয়ে-ডাক্তার নিযুক্ত আছেন, তিনি ছেলেদের দাঁত মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে' দেখেন আর তাদের দাঁতের যত্ন করতে শেখান, খারাপ দাঁত মেরামত করেন, রোগের চিকিৎসা করেন। এর জন্যে প্রত্যেক ছেলে-মেয়ের দাঁতের অবস্থা খাতায় টুকে রাখা হয়। যেসব ছেলেমেয়ে যেদিন দাঁত না মাজে, তাদের নাম শিক্ষকেরা প্রত্যহ সকালে বিকালে দুবার



এইখানে প্রত্যেক শিশুকে এক-একখানি ছক দিয়া ডাক্তারের কাছে পাঠানো হয়। চিকিৎসার পর নুতন একখানি কার্ডে পুনরায় কবে আসিবে লিখিয়া দেওয়া হয়।



আলজিব বাড়িয়াছে কিনা পরীক্ষা করা হইতেছে। প্রত্যেক শিশুকেই এ-পরীক্ষা করা হয়।

ক্লাসের ব্লাকবোর্ডে লিখে প্রচার করে' দ্যান।

প্রত্যেক শহরের মাঝের পাড়ায় একটা করে' দাঁতের চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেসব ছেলের দাঁত এমন খারাপ যে স্কুলের টোটকা চিকিৎসায় সারবার নয় বা দাঁতের ব্যথায় তারা কষ্ট পায়, তাদের স্কুলের অধ্যক্ষ সই করে' এক একখানি কার্ড দ্যান; তারা সেই কার্ড দাঁতের চিকিৎসালয়ে দেখালে সেখানে তাদের বিনা পয়সায় বা অল্প খরচায় চিকিৎসা করা হয়।



ডাক্তার বোতাম টিপিলেই এই ভৃত্য প্রত্যেক রোগীর জন্য এক বারকোষ শোধিত যন্ত্র আগাইয়া দ্যায়।

বষ্টন শহরে এইরূপ একটি উৎকৃষ্ট শিশুদন্তের চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠাতার নামে বিখ্যাত—Forsyth Dental Infirmary for Children.

টমাস ফরসীথ ১৪ বছর বয়সে মজুরের কাজে জীবন-যাত্রা সুরু করে' কোটিপতি হয়ে ওঠেন। একটা হোটেলে থাকবার সময় পাশের একটা ভাড়াটে বাড়ীতে একটি শিশুকে দাঁতের ব্যথায় কাতরাতে শুনে তাঁর মনে বড় কষ্ট হয়। তাই তিনি শিশুদের দাঁতের চিকিৎসার জন্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দান করেন। তারই ফল ফরসীথ ডেণ্টাল ইনফার্মারী ফর্ চিলড্রেন। এমন সিজিল বন্দোবস্তের এতবড় দাঁতের ডাক্তারখানা জগতে আর দ্বিতীয় নেই।



এই গবেষণাগারে অহরহ নূতন নূতন গবেষণা চলিতেছে।

ফরসীথ-ডাক্তারখানায় শুধু দাঁতেরই চিকিৎসা যে হয় তা নয়; মুখরোগ মাত্রই চিকিৎসিত হয়। আবার রোগ চিকিৎসার চেয়ে রোগ হতে না দেওয়াই ভালো বলে' এখান থেকে রোগ নিবারণের উপায়ও ছেলে-মেয়েদের ও তাদের অভিভাবকদের শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। এতে করে' সেই অঞ্চলের লোকদের জ্ঞান ও স্বাস্থ্য এবং সঙ্গে-সঙ্গে কর্ম্মপটুতা ও সচ্ছলতা বেড়ে চলেছে।

ষোলো বছরের ছোট আর দরিদ্র পরিবারের একটি ছেলের দাঁতে ব্যথা হলেই তাকে স্কুলের নার্স বা তার বাপ-মা কেউ একজন সঙ্গে

করে' এখানে নিয়ে আসে। বাড়ীতে ঢুকেই বস্ত্রাগার; সেখানে ছাতা ওভারকোট রেখে দায়; আর তার নিদর্শন নম্বর-সক্ত একটা চাক্তি ছেলেটির গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়—এতে চাক্তি হারাবার সম্ভাবনা থাকে না। চাক্তিগুলি নম্বরওয়ারি দেওয়া হয় বলে' কার পর কে এসেছে ঠিক থাকে, এবং আগের জনকে আগে চিকিৎসা করা হয়। তারপর সে অপেক্ষা-কক্ষে যায়; সেখানে ছাপানো ফর্মে আবশ্যকীয় প্রশ্নের উত্তর লিখে দিতে হয়। অপেক্ষাকক্ষের দেয়ালের গায়ে ছেলেদের রুচিকর বহু-প্রকারের ছবি টাঙানো থাকে; মাঝঘরে কাঁচের চৌবাচ্চায় লাল মাছ প্রভৃতি সুন্দর-সুন্দর জলচর জিয়ানো থাকে; শিশুপাঠ্য বহুবিধ ছবির বই আর খেলার সরঞ্জাম থাকে; ছেলেরা সেখানে অপেক্ষা করাটা মোটেই কষ্টকর মনে করে না, অথবা পরে যে তাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে সে খেয়ালও তার থাকে না। অপেক্ষা-কক্ষ থেকে ছেলেটিকে ভর্ত্তি-ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়; সেখানে প্রত্যেককে দশ পয়সা জমা দিতে হয়; পয়সা জমা দিলে ছেলেটিকে একটি চিকিৎসার ছক দেওয়া হয়, তাতে যতদিন তার চিকিৎসা চলে দিনকের দিন তার অবস্থা ও চিকিৎসার ফল টুকে দেওয়া হয়। সেখান থেকে যার যেমন রোগ তাকে সেই বিভাগে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করে—কেউবা যায় দাঁত তোলাবার ঘরে, কেউবা যায় X রে বিভাগে, কেউবা যায় নাক অথবা গলার চিকিৎসকের কাছে। চিকিৎসার পর ডাক্তার তাকে নূতন একটি কার্ড দ্যান; সেই কার্ডে লিখে দেওয়া হয় আবার তাকে কবে আসতে হবে। ফিরে যাবার সময় সে গলার চাক্তি ফিরিয়ে দিয়ে নিজের কাপড়-চোপড় ফেরত নিয়ে যায়।



শিশু রোগীরা ডেস্কের সামনে দাঁড়াইয়া বাঁধি প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেছে।

এইরূপে প্রত্যহ গড়ে ৪০০ ছেলের চিকিৎসা হয়ে থাকে। ১৯১৫ সালে মোট ১৯ হাজার ৯ শ ৩০ জনের চিকিৎসা হয়েছিল। বর্ত্তমানে ৬৪টি অস্ত্র-করবার জায়গা, ৩০ জন অস্ত্রকরবার ডাক্তার আর ১৪০ জন পরিদর্শক আছে। ১৯১৫ সালে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৪০৪ বার অস্ত্র-করা



অস্ত্র চিকিৎসার ঘরে কয়েকজন ডাক্তার।

হয়েছিল। দাঁত-তোলা বিভাগে ৭১৫২ রোগীর ১৬ হাজার ৭৪টি দাঁত তোলা হয়েছিল। ৫৮৬টা বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল, তাতে সবসুদ্ধ ৭৭০১ জন ছেলে মেয়ে উপস্থিত ছিল।

এখানকার সমস্ত অস্ত্র-করবার খাটের সঙ্গে বৈদ্যুতিক এঞ্জিন সংযুক্ত আছে এবং তার দরুন খাটগুলিকে ইচ্ছামত সহজে ঘোরানো ফেরানো নড়ানো যায়; খাটের সঙ্গে সঙ্গেই জলের কল ও সাইফন নর্দ্দমা প্রভৃতি যতকিছু আধুনিক সুবিধাজনক উপায় হতে পারে তা আছে। প্রত্যেক ডাক্তার প্রত্যেকবার অস্ত্র করবার সময় এক-সাট শোধন-করা অস্ত্র পান; অস্ত্র করা হয়ে গেলেই সেসব অস্ত্র শোধনের জন্যে শোধনাগারে চলে' যায়, আবার অন্য এক-সাট অস্ত্র এনে হাজির করা হয়। শোধনাগারে একটা প্রকাণ্ড খাঁচায় অস্ত্রের বারকোষগুলি সাজিয়ে কপিকল দিয়ে টেনে খাঁচাটিকে চুলার আগুনের ওপর তুলে দেওয়া হয়; এইরূপে সমস্ত দিনের সকল অস্ত্রকরার সময় ব্যবহৃত সমস্ত অস্ত্র একসঙ্গে একবারেই শোধন করা হয়ে যায়।

এই ডাক্তারখানার সংলগ্ন গবেষণার লেবরিটারীতে লেলাক্ষেপা জড়ভরত বুদ্ধিবঞ্চিত কতকগুলি ছেলে নিয়ে নানাবিধ কৌতূহলজনক অন্বেষণ চলছে; এই অনুসন্ধান থেকে জড়বুদ্ধির নিদান সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কৃত হবে।

এইরূপে ফরসীথ দাঁতের ডাক্তারখানা থেকে মানবের যে কত-রকমের উপকার সাধিত হচ্ছে তা বলে' শেষ করা যায় না।

ভারতবর্ষের হিন্দুমুসলমান উচ্চ-নিম্ন সকল শ্রেণীর লোকই ছেলেবেলা থেকে দাঁতন মাজন দিয়ে দাঁত মেজে থাকে। তবু ভারতবর্ষের লোকের প্রায় সকলের ক্ষয়া ভাঙা খেয়ো দাঁত আছে। এক কলকাতার স্কুলের ছেলে-দের মধ্যে শতকরা ৩০ জনের দাঁত খেয়ে গেছে; আমে-রিকায় স্কুলের ছেলেমেয়ের ৯০ জনের খেয়ো দাঁত। আজকাল স্কুল আপিসের তাড়ায় নরম নরম খাবার না চিবিয়ে তাড়াতাড়ি গেলবার অভ্যাস যত বাড়ছে দাঁতও তত বেশী লোকের খারাপ হচ্ছে। অথচ বাংলা-দেশে দাঁতের স্বতন্ত্র ডাক্তারখানা ত নেইই, দাঁতের ডাক্তারই বা কজন আছে? যাঁরা দাতের ডাক্তারখানা খুলে বসেছেন তাঁদের অনেকেই আনাড়ি হাতুড়ে। সম্প্রতি একজন বাঙালী আমেরিকা থেকে D. D. S. উপাধি পেয়ে কলিকাতায় ডাক্তারখানা খুলেছেন। আমাদের দেশের ছেলেদের আমেরিকায় গিয়ে দাঁত ও চোখের চিকিৎসা শিখে এসে আনাড়ি চশমাওয়ালা ও "ভগ্নদন্তচিকিৎসক"দের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করা উচিত।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম বাঙ্গালী সৈনিকদল

১৯১৪ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসের শেষে য়ুরোপে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। এই মহাযুদ্ধে বাঙ্গালীর হৃদয়রক্ত যে আহুতিস্বরূপ প্রদত্ত হইবে একথা তখন কেহই ভাবে নাই, ফল্গু-প্রবাহের মত সুপ্ত ক্ষাত্রিয়বীর্য্য যে এখনও বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় প্রবহমান এ কথায় তখন কেহই



শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক
ফরাসী সৈন্যের বাঙালী ব্রিগেডিয়ার।

বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না। এক নূতন ঘটনাস্রোতে বাঙ্গালীজাতির চির দুর্নাম মুছিয়া গেল।

১৯১৫ খৃঃ অব্দের ৩০ ডিসেম্বর প্রজাতন্ত্র ফরাসী-রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট মাসিয় পঁয়াকারে (President Poincare) আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে ফরাসী ভারতের হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রজামণ্ডলী স্বেচ্ছা-সৈনিকের পদ



শ্রীতাবুলচন্দ্র দাস ও শ্রীগোবর্দ্ধন দাস (দুই ভাই)
ফরাশী সৈন্যের বাঙালী গোলন্দাজ।

গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। ১৯১৬ খৃঃ অব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ফরাসী-ভারতের গবর্ণর মার্ত্তিনো মহোদয় ফরাসী প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া এক দীর্ঘ প্রস্তাব সহ এই আজ্ঞা নগরে নগরে প্রচার করেন। এইরূপ আজ্ঞা-পত্রগুলি ক্ষুদ্র চন্দননগরের প্রধান প্রধান স্থানে লটকাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু সরকারী ইস্তাহারের মত ইহা প্রথমে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। শ্রীমান্ সিদ্ধেশ্বর ঘোষাল, শ্রীমান্ হারাধন বক্সী, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ সরকার সর্ব্ব প্রথমে ইহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমাকে ইহার জন্য একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে অনুরোধ করেন। তখন ভাবি নাই এই অপূর্ব্ব ব্যাপারে কোন বাঙ্গালী যোগদান করিবে, এই ঘটনার সূত্র অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী বহুদিনের



শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, পদাতিক।

জড়তা হইতে মুক্ত হইয়া জগতে বীর নামে সুপরিচিত হইবে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে ভারতবাসীর স্বেচ্ছাসৈনিক হইবার জন্য যে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এতদিন পরে ঘটনাচক্রে আজ সে আশা পূর্ণ হইল।

৭৫ জন শিক্ষিত ভদ্র যুবক শত বাধা উপেক্ষা করিয়া

সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করেন। ইহাদের মধ্যে ৩২ জন ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষার্থে পণ্ডিচেরীতে প্রেরিত হন। পণ্ডিচেরীর ব্রিটিশ কন্সালের আপত্তিতে ৪ জন এবং ২ জন স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। এক্ষণে মাত্র ২৬ জন ফরাসী সমর-বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপন করিয়া পশ্চিমপ্রান্তে যুদ্ধযাত্রা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

পণ্ডিচেরীতে শিক্ষাকালীন লেফ্‌টেনান্ট জিলে মহোদয় বাঙ্গালীদের চরিত্র ও কার্য্যকুশলতায় প্রীত হইয়া আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশের অনুবাদ এইস্থানে প্রদত্ত হইল।

"পণ্ডিচেরীতে আসিয়া অবধি তাহারা যেরূপ যোগ্যতার সহিত কার্য্যাদি করিতেছে তাহাতে তাহাদের সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। এই অল্পবয়স্ক যুবকগণ সকলেই সৎ, তাহাদের বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন দোষ দেখি নাই। ইহারাই আমার সকল সেনাদলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাদল (champions) এই কথায় একটু মাত্রও অত্যুক্তি নাই। ইত্যাদি।" ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের বাঙ্গালী যুবকগণ বৈদেশিক কর্ম্মচারিগণের চিত্ত কিরূপ আকর্ষণ করিয়াছেন। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে উচ্চ ফরাসী অফিসারগণ ইহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতায় চমৎকৃত হইয়া পদাতিক (Infantry) শ্রেণী হইতে উন্নীত করিয়া ইহাদিগকে কামান শিক্ষায় (Artillery) নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাদের কার্য্যদক্ষতা ও উপস্থিত বুদ্ধি সন্দর্শনে একজন অতি উচ্চ ফরাসী বলিয়াছেন, "বাঙ্গালীদের মত আমাদের সকল Regiment গুলি হইলে অনেক সুবিধা হইত।" বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নয়। ইহারই মধ্যে শ্রীমান্ হারাধন বক্সী ও শ্রীমান্ সিদ্ধেশ্বর মল্লিক বিগ্রাদিয়ের (Brigadier) হইয়াছেন।

চন্দননগর। শ্রীমতিলাল রায়।

পঞ্চশস্য

শূন্য কি জ্যোতির্ম্ময়?—

আকাশ-নীহারিকা অত্যন্ত উষ্ণ বলিয়াই সাধারণের ধারণা। এই সকল বিরাট এবং উজ্জ্বল বাষ্পস্তূপ কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া শীতল হইতে হইতে ক্রমশ সংহত আকারে তারকায় পরিণত হয়। এই সকল তারকা আরও শীতল ও সংহত হইলে কালক্রমে একেবারে আলোকবর্জ্জিত জমাট অন্ধকার-স্তূপে পরিণত হইতে পারে। বাষ্প স্তূপের বাষ্প শীতল হইয়া বাষ্প আকারেই থাকিতে পারে এ-ধারণা সাধারণের ছিল না। অধ্যাপক বার্ণাড তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহেন।

আকাশের ফটোগ্রাফ তুলিলে তাহার মধ্যে বড় বড় কালো চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম দর্শনে মনে হয় সেগুলি তারার মাঝে মাঝে বড় বড় ফাঁক, যাহার মধ্য দিয়া সুদূর শূন্যের কৃষ্ণমূর্ত্তি আমাদের চোখে পড়ে।

অধ্যাপক বার্ণাড একই আকারের আকাশের দুইখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন। ঐ দুইখানি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় একটিতে বক্রাকার উজ্জ্বল বস্তু ও অপরটিতে ঠিক ঐরূপ আকারের একটি কৃষ্ণবর্ণ বস্তু। একটি যেন সাধারণ উজ্জ্বল নীহারিকা হইল, অপরটি তবে কি?

অধ্যাপক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ইহাও একটি নীহারিকা, কেবল ইহার বাষ্পসমষ্টি শীতল হইয়া আলোকবর্জ্জিত অন্ধকারময় হইয়াছে। নীহারিকার বাষ্প, বাষ্প অবস্থায় থাকিলেও খুব ঘন হওয়ায় উজ্জ্বল শূন্যের উপর বিশিষ্ট আকারে সু-প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। আকাশে সুস্পষ্ট আকারের কালো কালো চিহ্ন অনেক স্থলে দেখা যায়। এবং এই সকল চিহ্নের পশ্চাৎভাগ আলোকিত করিবার জন্য কোনো উজ্জ্বল তারকা বা নীহারিকাও নাই। তাহা হইলে এই সকল চিহ্নের পিছনে আলো আসিল কোথা হইতে—যাহার জন্য সেগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে শূন্য জ্যোতির্ম্ময়। শূন্যে যে জ্যোতি আছে তাহা হয়তো অতি সামান্য ও মৃদু। কিন্তু শূন্যও অসীম, তাই এই মৃদু জ্যোতিও ঘনীভূত হইয়া ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর সুস্পষ্ট ছাপ রাখে।

শিতেন-নো—

জাপানী মতে আদর্শ বৌদ্ধজগৎ একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বত। তার মধ্যে অনেকগুলি স্বর্গ, অনেক ভূখণ্ড ও সাগর, সে-সকলের নাম সুমেরু বা শুমিসেন। এই রাজ্যের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারিদিক এক একজন দেবতা তাঁহার বহু বহু অনুচর লইয়া রক্ষা করেন। এই চারিজন বিঘ্ন-বিনাশন দেবতা শিতেন-নো নামে খ্যাত।

উত্তর দিকে যে-দেবতা পাহারা দ্যান তাঁর নাম বিশামোন-তেন, সংস্কৃতে বৈশ্রবান। চীনা ভাষায় ইঁহার নাম তামোনতেন, যার অর্থ বহুকর্ণবিশিষ্ট স্বর্গের রাজা, অর্থাৎ যাঁর শ্রবণশক্তি অসাধারণ। প্রাচীন সূত্রকারদের মতে এই দেবতাসকল বৌদ্ধজনপদের রক্ষাকর্ত্তা বুদ্ধের



(১) জোচো-তেন বা বিরূঢ়ক
(২) জিকোকু-তেন বা ধৃতরাষ্ট্র
(৩) বিশামোন তেন বা বৈশ্রবান
(৪) কোমোকু-তেন বা বিরূপাক্ষ

বাণী অহরহ শুনিতেছেন। হিন্দু দেবমণ্ডলীতে ইনি কুবের নামে খ্যাত।

জাপানী বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে বিশামোন-তেনের এইরূপ রূপবর্ণনা আছে—ডান হাতের তালুর উপর একটি ছোট স্তুপ, বাঁ হাতে একগাছা দণ্ড। ডান হাতের স্তুপের উপর তাঁর একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ। তিনি বর্ম্মপরিহিত, তাঁর কটিবন্ধে এক অসুর। যাশা ও রাশেৎসু নামক দুই ভয়ানক অসুরের উপর তিনি দণ্ডায়মান। বিশামোনের মূর্ত্তি সোনালি রং করা এবং অনুচরদের দেহ হরিদ্রাবর্ণ। বিশামোন তেনের বাঁ হাতে কখনো কখনো একটি ত্রিশূল থাকে, অন্য হাত উরুর উপর স্থাপিত।

পূর্ব্বদিক পাহারা দ্যান জিকোকু-তেন, সংস্কৃত নাম ধৃতরাষ্ট্র। তাঁর বাঁ হাতে তরবারি, অন্য হাতে একটি মণি। কখনো কখনো ডান হাতটি উরুর উপর স্থাপিত। তাঁর রাজত্ব সোনায় ভরা। তাঁর দেহ রক্তবর্ণে রঞ্জিত, মুখ ভয়ঙ্কর। তরবারি এই দেবতার বিশেষ চিহ্ন, এটি থাকা চাই ই।

কোমোকু তেন, সুমেরুর পশ্চিম দিকের রক্ষাকর্ত্তা। সংস্কৃতে এঁর নাম বিরূপাক্ষ। ইনি নাগেদেরও রাজা। কখনো কখনো ইঁহাকে আকুমোকু, শুমোকু, বা জোশিকি নামেও অভিহিত করা হয়। ইনি নিরন্তর বর্ম্মপরিহিত, বাঁ হাতে ত্রিশূল, ডান হাতে একগাছা লাল দড়ি বা পাশ। কখনো কখনো ইঁহার বাঁ হাতে বজ্র থাকে এবং অন্য হাতে মন্ত্রলিখিত পাকানো পুঁথি। আবার কখনো বা ডান হাতে জাপানী লিখিবার তুলি এবং অন্য হাতে একতাড়া লিখিবার কাগজ। ইঁহার দেহের বর্ণ সাধারণত শাদা।

বৌদ্ধজগতের দক্ষিণদিকের পাহারাদার জোচো তেন, সংস্কৃতে বিরূঢ়ক। ইনি বর্ম্ম-পরিহিত, ডান হাতে প্রকাণ্ড একখানি তরবারি, অন্য হাত মুষ্টিবদ্ধ, উরুর উপর স্থাপিত। দেহের বর্ণ উজ্জ্বল লাল।

প্রত্যেক দেবতারই মাথায় জাঁকালো মুকুট। বর্ম্মগুলির প্রসাধন সুন্দর। বৌদ্ধযুগের আরম্ভের সময় চারিটি দেবতারই পূজা একত্রে হইত, পরে তাঁহাদের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা হইল।

জাপানী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রবল মুরুব্বি প্রিন্স সোতোকু প্রকাশ্য ঘোষণাপত্রে জানাইয়াছিলেন—"রাজ্য পরিচালনের ভিত্তি হইবে সামঞ্জস্য, এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন স্থাপিত হইবে বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিরত্নের উপর বিশ্বাসে।" তিনিই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ওসাকা শহরের নিকটে শিতেন-নো-জি নামক বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করান। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচলনের বিরোধী দলকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রিন্স সোতোকু ঐ চারি দেবতার বেদির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করিলে তিনি তাঁদের জন্য এক বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন। তাঁর কামনা পূর্ণ হওয়াতে তিনি এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দ্যান। অবশ্য ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই এই বিরাট ইমারত নির্ম্মাণে তাঁর অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। সে উদ্দেশ্য—দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা। সেই সময়ে সোতোকু কুদারার (কোরিআ) রাজাকে সাহায্য করিতেছিলেন শিরাগির (কোরিআ) রাজার বিরুদ্ধে। শিরাগির রাজা জাপান আক্রমণ করিবে এবং ওসাকায় অবতরণ করিবে এরূপ একটা জনরব রটিয়াছিল। তাই জাপানের প্রবেশপথে মন্দির নির্ম্মাণ

করাইয়া এই চারি দেবতার ঘাটি বসানো হইল। পরবর্ত্তী কালে যে-যে স্থানে শক্রর অবতরণের আশঙ্কা ছিল, সেই-সেই স্থানেই এই বিঘ্ননাশন দেবতাদের মন্দির নির্ম্মাণ করা হইত। শিতেন নোর মূর্ত্তি অন্যান্য অনেক মন্দিরেও স্থাপন করা হইয়াছিল, প্যাগোডার দ্বারের উপরও অনেক স্থলে তাঁহাদের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। বৌদ্ধ মন্দিরের প্রবেশপথে শিতেন নোর অনেক মূর্ত্তি দেখা যায়।

য়্যামাতোর হোরয়ূজি মন্দিরের মূর্ত্তিগুলি চার ফুটের কিছু উঁচু। এগুলি প্রাচীন জাপানের কাঠের খোদাইয়ের কাজের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ৬৪৫—৬৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খোদিত হইয়াছিল।

সানগাৎসূদো নামক মন্দিরে এই চারি দেবতার কতকগুলি গালার রং করা মূর্ত্তি আছে। ৭৮১ খৃষ্টাব্দে সেগুলি নির্ম্মিত হয়। অষ্টম শতাব্দীর উৎকৃষ্ট খোদিত গালার কাজের এগুলি নিখুঁত নিদর্শন।

সার অরেল ষ্টাইন চীনা তুর্কিস্থানে শিতেন-নোর কতকগুলি মূর্ত্তি দেখিতে পান। সেগুলি মন্দিরের পতাকার উপর অঙ্কিত ছিল। অন্যান্য ভ্রমণকারী তুরফানে দেয়ালের গায়ে ঐরূপ মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিয়াছেন। গান্ধার মূর্ত্তিশিল্পের মধ্যেও শিতেন নোর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। একটি নিদর্শন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে।

* * *

আমরা খাই কেন ?—

এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব— খিদে পায় বলে'। কিন্তু এ কথা বলিলে ঠিক বলা হয় না। অনেক সময় আমরা অন্য কারণেও খাইয়া থাকি। যেমন গরমের দিনে আইসক্রিম খাই ঠাণ্ডা হইবার জন্য। বিকাল বেলা বাজার করিতে বাহির হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে চা'র দোকানে গিয়া বসি চা ও কেক লইয়া; কতকটা সময় বিশ্রামসুখ উপভোগ করিবার জন্য—ঠিক ক্ষুধা নিবারণের জন্য নয়।

তারপর আমরা যে সব খাদ্য খাই—তাহারা যে পরিমাণে সুস্বাদু সে-পরিমাণে শরীর গঠনের উপযোগী নয়। মসলা সংযুক্ত সুগন্ধি অনেক আহার্য্য আমাদের ভালো লাগে বলিয়া কতকটা ক্ষুধার উদ্রেক করে, কিন্তু সে সব খাদ্যে পুষ্টিকর পদার্থ খুব অল্পই থাকে। মাংস সিদ্ধ করিয়া আমরা ঝোলটুকু খাই—সেটুকু বেশ সুগন্ধি ও সুস্বাদু বলিয়া; কিন্তু তাহাতে









(১) জোচো তেন　　(২) কোমোকু-তেন
(৩) বিশামোন তেন　　(৪) জিকোকু-তেন

যথেষ্ট পরিমাণে চর্বি না থাকিলে তাহা মোটেই পুষ্টিকর নয়। কিন্তু যে-মাংস সিদ্ধ করিয়া ঝোল তৈরি হইয়াছিল সে মাংস আমরা ফেলিয়া দিই বিস্বাদ বলিয়া। অথচ সেই মাংসের মধ্যেই শতকরা ৯৬ ভাগ অন্নসার (protein) থাকে।

আমরা যে সব খাদ্য খাই তাহা অনেকাংশে আমাদের অভ্যাস, দেশের রীতি ও সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন আমরা বাঙালী মাছের ও শাকসব্জীর যত পক্ষপাতী মাংসের তত নই। আবার শীতের দেশের লোকেরা, যেমন য়ুরোপীয়েরা, শাকসব্জী মাছের চেয়ে মাংসেরই অধিক পক্ষপাতী; জাতিগত ও ধর্ম্মগত অভিজ্ঞতাও বিভিন্ন জাতির খাদ্য নিরূপণে অনেকটা সহায়তা করিয়াছে। তারপর এক-একটা ভূখণ্ডে এক-এক যুগে এক-এক রকম খাদ্য ব্যবহারের প্রচলন ছিল। রাঁধুনীর রন্ধনকুশলতার উপরও আমাদের খাদ্য নির্ব্বাচন নির্ভর করে। রাঁধুনী শাকসব্জী ভালো রাঁধিলে আমরা মাছমাংস অপেক্ষা তাহারই অধিক পক্ষপাতী হইয়া পড়ি, আবার মাছমাংস ভালো রাঁধিলে শাকসব্জীর কথা মনে রাখি না। তারপর খাদ্য আহরণের সুবিধা, আর্থিক স্বচ্ছলতা বা তাহার বিপরীত অবস্থা ইত্যাদির উপরও আমাদের খাদ্য নির্ব্বাচন কম নির্ভর করে না।

উপরোক্ত বিষয়গুলি হইতে বুঝা যাইবে কোন খাদ্য দেশের পক্ষে পুষ্টিকর এ চিন্তা আমাদের খাদ্য নির্ব্বাচনে খুব কমই সহায়তা করে। আমরা যে পরিমাণ পরিশ্রম করি, যে পরিমাণ রৌদ্র বা হিম লাগাই, আমাদের বয়স এবং দেহের কৃশতা বা স্থূলতা এ-সব কথা খাদ্য নির্ব্বাচনের সময় আমরা কত কম মনে রাখি। প্রায়ই দেখা যায় অতি স্থূলকায় ব্যক্তিও নির্ব্বিচারে চর্ব্বিসংযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া খাইয়া অবশেষে পীড়িত হইয়া একেবারে অকেজো হইয়া পড়িতেছে। তাহার পক্ষে আহারের পরিমাণ কমানো যে বিশেষ আবশ্যক সে-কথা তার প্রায়ই মনে থাকে না।

অনেকে বলেন যে খাদ্য ভালোরকম হজম করিয়া পুষ্টদেহ হইতে হইলে খাদ্য খুব সুস্বাদু হওয়া দরকার—যে-খাদ্য আমরা খুব তৃপ্তির সহিত খাইতে পারি। এ-ধারণা ভুল, কারণ দেখা গিয়াছে যে লোকে পরীক্ষার হিসাবে অতি বিস্বাদ অথচ পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়াও বেশ হজম করিয়াছে; জীবজন্তুকেও জোর করিয়া পুষ্টিকর অথচ বিস্বাদ খাদ্য খাওয়াইয়া অনেক সময় ভালো বই মন্দ ফল হয় নাই।

বৈজ্ঞানিক ধরণে মানুষ যেমন জীবজন্তুকে খাওয়াইতে আরম্ভ করিয়াছে মানুষকেও তেমনি খাওয়াইতে আরম্ভ করিলে সুফল ফলিবারই সম্ভাবনা।

*
* *

পোড়াঘায়ের চিকিৎসা—

শরীরের কোনো অংশ পুড়িয়া গিয়া ঘা হইলে ক্ষতস্থানে নূতন মাংস জন্মাইবার এক অভিনব উপায় ফরাসী চিকিৎসক ডাক্তার বার্থ দ্য সাঁফর্ (Barthe de Sandfort) উদ্ভাবন করিয়াছেন।

দীর্ঘ ২২ বৎসর পরীক্ষার পর এই চিকিৎসা-প্রণালী তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। দেহের অনেকখানি অংশ পুড়িয়া গেলেও এই চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করা যায়। এই চিকিৎসা-প্রণালী অতি সরল।

বাতাসে নানাপ্রকার রোগের বীজাণু থাকে। আলোচ্য প্রণালীতে ক্ষতের উপরে বাতাস যাহাতে কিছুকাল কোনোমতেই না লাগিতে পারে এই ব্যবস্থা করিয়া প্রকৃতিকে ক্ষতের উপর নূতন চামড়া গজাইবার অবসর দেওয়া হয়।

পোড়াঘায়ের উপর হইতে পুঁজ ও অন্য ময়লা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া ঐ স্থান বৈদ্যুতিক গরম-হাওয়া-পোরা যন্ত্রদ্বারা শুকাইয়া ফেলা হয়, তারপর ঐ ক্ষতের উপর মিশ্রিত রজন ও মোম গলাইয়া গরম অবস্থায় ক্ষতের উপর পিচকারির ঝারি দিয়া ফেলা হয়। ক্রমে সমস্ত ক্ষতটির উপর একটি নরম শাদা আবরণ পড়ে। উহা গরম থাকিতে থাকিতে উহার উপর পাতলা কাপড়ের টুকরা বসাইয়া পুনরায় উহার উপর ঐ গরম প্রলেপটি মাখাইয়া দেওয়া হয়। প্রলেপ শুকাইয়া আসিলে সম্পূর্ণ ঘা'টি একেবারে ঢাকা পড়ে, বাহিরের বাতাস আর ক্ষতস্থান স্পর্শ করিতে পারে না।

ক্ষতের উপর প্রলেপটি ঝির ঝির করিয়া অতি সূক্ষ্ম বিন্দুতে পড়ে বলিয়া রোগীর কষ্টবোধ হয় না। ব্রুশ দিয়া বা অন্য কোনো প্রকারে প্রলেপ লাগানো অসম্ভব হইত। প্রলেপটি কেবল যে বাতাস বন্ধ করে তাহা নয়, ক্ষতের বেদনা ও জ্বালাও উপশম করে।

প্রলেপ ব্যবহারের সময় উহার উত্তাপ থাকে ৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, অথবা ১৭৫ ডিগ্রি ফার্ণহাইট। সুস্থ চামড়ার উপর এত গরম পড়িলে ফোস্কা পড়ে। সেই জন্য প্রলেপ ব্যবহারের সময় খুব সাবধান হইতে হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, এত সহজ চিকিৎসা প্রণালী কেন সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই। ইহার কারণ, মোম ও রজনের মিশ্রণ ঠিকমত তৈরি করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার। এই চিকিৎসা-প্রণালীর আবিষ্কর্ত্তা কেবল একজনকে উহা ঠিকমত প্রস্তুত করিতে শিখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। বাইস বৎসর চেষ্টার পরও তিনি বলেন মোম এবং রজনের গুণ ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে এখনও শিখিবার অনেক আছে।

জার্ম্মেনীতে পোড়াঘায়ের চিকিৎসার জন্য এই প্রণালীর অনুরূপ একটি প্রণালী প্রচলিত আছে।

*
* *

কাশিতে শক্তিক্ষয়—

এক জার্ম্মেন পরীক্ষক হিসাব করিয়াছেন, রোগী পনের মিনিট অন্তর একবার হিসাবে দশ ঘণ্টা কাশিলে তাহার যে শক্তিক্ষয় হয় তাহা তিনটি ডিম ও দুই গ্লাস দুধ খাইয়া যে পুষ্টি লাভ করা যায় তাহার সমতুল্য। মানুষ সাধারণ অবস্থায় নিশ্বাস ফেলিলে বুক হইতে বাতাস এক সেকেণ্ডে চারফুট হিসাবে বাহির হয়, কিন্তু খুব কাশির সময় ঐ বাতাসের বেগ সেকেণ্ডে ৩০০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য কাশির সময় যে-মাত্রায় শক্তি খরচ হয় সমপরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়াও সে শক্তি ফিরিয়া পাওয়া যায় না। অবিরাম কাশি কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার একটি প্রধান কারণ, যদিও অন্যান্য কারণও আছে। সেইজন্য কাশি খাড়িতে দেওয়া মোটেই ভালো নয়—আরম্ভেই সাবধান হইয়া সারাইয়া ফেলা উচিত।

বাঙ্গলা-দেশ ও তাহার কৃষির উন্নতির অন্তরায়

বাঙ্গলার লোকসংখ্যা ও অধিবাসী।

গত ১৯১০ সালের আদমসুমারীতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে সমস্ত বাঙ্গলাদেশের মোট লোকসংখ্যা ৪,৬৩,০৫,৬৪২। তন্মধ্যে সাড়ে তিন কোটি লোক কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবন যাপন করে। ইহার মধ্যে প্রায় তিন কোটি প্রাণী অর্থাৎ পূর্ণ লোকসংখ্যার দুইতৃতীয়াংশ ভাগ সাধারণ চাষী, আর কেবল মাত্র ১২ লক্ষ, অর্থাৎ শতকরা ৩ জন ব্যক্তি, চাষোপযোগী জমির আয় হইতে জীবন ধারণ করেন, অর্থাৎ জমিদার, ভূস্বামী ইত্যাদি; এবং মাত্র ৩২ লক্ষ লোক অর্থাৎ শতকরা সাড়ে সাত জন জনমজুরের কার্য্য করিয়া থাকে। বাঙ্গলাদেশে কেবলমাত্র ৩৪,৪১,০০০ জন উৎপাদক ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে, তন্মধ্যে এক-চতুর্থাংশ সুতার ব্যবসায়ে নিযুক্ত। অতএব যে জাতির পূর্ণ লোক-সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ আজীবন কৃষিকার্য্য দ্বারা প্রাণ রক্ষা করে, সফল কৃষিকার্য্য যে কতদূর সেই জাতির জন্ম মৃত্যু ও বৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ কারণ তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। সরকারি সেন্সাস্ রিপোর্ট প্রথম ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়। তখন হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে কি পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা একটু শিক্ষাপ্রদ হইবে বিবেচনা করিয়া নিম্নে দিলাম,—

গণনার বৎসর	লোক সংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধির হার
১৮৭২ সাল	৩৪৬৮৭২৯২	...
১৮৮১ ,,	৩৭০১৪৯৮৯	৬.৭
১৮৯১ ,,	৩৯৮০৫৯৪২	৫.৫
১৯০১ ,,	৪২৮৮১৭৭৬	৭.৭
১৯১১ ,,	৪৬৩০৫৬৪২	৮.০

ইয়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, (১) ক্ষেত্রফলের তুলনায় তত্তদ্দেশীয় প্রদেশসমূহের মধ্যে বাঙ্গলার স্থান এইরূপ — জর্ম্মানি, ফ্রান্স, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বেহার-উড়িষ্যা, যুক্ত-প্রদেশ, যুক্তসাম্রাজ্য, বাঙ্গলাদেশ; (২) লোকসংখ্যার তুলনায় বাঙ্গলার স্থান এইরূপ—জর্ম্মানি, যুক্তপ্রদেশ, বাঙ্গলাদেশ, মান্দ্রাজ, যুক্তসাম্রাজ্য, ফ্রান্স, বেহার-উড়িষ্যা, বোম্বাই, (৩) কিন্তু অধিবাসীবর্গের ঘনত্বের তুলনায় এইরূপ—বাঙ্গলাদেশ, যুক্তসাম্রাজ্য, যুক্তপ্রদেশ, বেহার উড়িষ্যা, জর্ম্মানি, মান্দ্রাজ, ফ্রান্স, বোম্বাই। অর্থাৎ অধিবাসীবর্গের ঘনত্বের তুলনায় যাবতীয় পাশ্চাত্য ও ভারতবর্ষীয় প্রদেশ-সমূহের মধ্যে (কেবলমাত্র বেলজিয়ম ও নিজ ইংলণ্ড ব্যতীত) বাঙ্গলার স্থান সর্ব্বপ্রথম। এবং যদি মনে রাখা যায় যে এই বিস্তৃত ৮৪,০৯২ বর্গমাইল অথবা ৫৩৯৩১৫০৪ একার ভূমিখণ্ডের মধ্যে কত ভূমিখণ্ড নদ, নদী, পর্ব্বত, জলা, অরণ্য আদির দ্বারা আবৃত, তাহা হইলে বাঙ্গলার অধিবাসী-বর্গের ঘনত্ব কত অধিক তাহা সহজে উপলব্ধি হইবে।

বাঙ্গলার এই বহুল অধিবাসী, গ্রাম এবং গণ্ডগ্রাম বা ছোট সহরে বাস করে। বাঙ্গলার আধুনিক সহর-সকল কোন কোন রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রতিষ্ঠিত এবং বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সকল সহর ক্রমশঃ কুলিদিগের বাসস্থান, পণ্য দ্রব্যের গুদামঘর, ফিরিওয়ালা ও রেলযাত্রীর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রীর দোকান-ঘরে ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে। বাঙ্গলার পুরাতন সহরগুলি প্রায় নদীর নিকটবর্ত্তী কোন সুবিধাজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইত। বাঙ্গলার মাঠে মাঠে, ধানক্ষেতের মধ্যে, আম্র-কাঁঠাল-কদলী-বৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত, পরস্পর হইতে কিছু দূরে দূরে অবস্থিত চালাঘরের সমষ্টিগুলিই বাঙ্গলার গ্রাম। গ্রামগুলির নিকটে কোথাও ধানের আড়ত, পাটের গুদাম; কোন কোন স্থানে ধানের বা পাটের হাট বা বাজার বসে; গৃহস্থের ঘর হইতে শস্যাদি সেই সকল বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেখান হইতে পুনরায় রপ্তানির জন্য বিদেশে অথবা অন্য কোথাও দেশের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য চালান হয়।

বাঙ্গলার চাষী-সম্প্রদায় জাতিতে অধিকাংশ মুসলমান এবং নমঃশূদ্র। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যগণ নিজেরা চাষের কার্য্য কুত্রাপি করেন না। তাঁহারা আজকাল চাষের কার্য্য "চাষার" কার্য্য বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন এবং বরং চাকরি, উমেদারি, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবেন তথাপি চাষের কার্য্য করিবেন না। বাঙ্গলার এই চাষী-সম্প্রদায়ের

বিষয়, ডাঃ ফোএল্‌কার (Dr. Voelcker) তাঁহার Report of the Improvement of Indian Agriculture নামক পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

"At his best, the Indian ryot or cultivator is quite good as, and in some respects the superior to, the average British farmer, while at his worst it can only be said that this state is brought about largely by an absence of facilities for improvement which is probably unequalled in any other country; and the ryot will struggle on patiently and uncomplainingly in the face of difficulties in a way that no one else would. The native, though he may be slow in taking up an improvement, will not hesitate to adopt it if he is convinced that it constitutes a better plan and one to his advantage."

"ভারতীয় চাষী তাহার উৎকৃষ্ট অবস্থায় ইংরেজ কৃষকের সমকক্ষ কিম্বা কোন কোন বিষয়ে তদপেক্ষা উন্নত। তাহার নিকৃষ্ট অবস্থায়, এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে উন্নতি করিবার সুবিধার অবর্ত্তমানতা—এবং সুবিধার এত অভাব বোধ হয় আর কোন দেশে নাই—তাহার সেই নিকৃষ্ট অবস্থার কারণ। ভারতীয় কৃষক তাহার সহস্র প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়া ধীরভাবে বিনা আক্ষেপে দিনগুলি এমন ভাবে কাটাইয়া দিবে যেমনটি আর কেহ পারিবে না। দেশীয় চাষী সম্প্রদায় উন্নত উপায় অবলম্বন করিতে দ্বিধা করিলেও যদি বুঝিতে পারে যে ঐ উপায় উৎকৃষ্টতর, অথবা উহা তাহার পক্ষে সুবিধাজনক, তখন উহা অবলম্বন করিতে তাহারা তিলমাত্র দ্বিরুক্তি করিবে না।"

বাঙ্গলার চাষী-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বুদ্ধিমান দক্ষ ও কার্য্যতৎপর হইলেও, বাঙ্গলার অধিবাসীবর্গ ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল হইলেও এবং চাষোপযোগী জমি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেও, কেন যে বাঙ্গলার খাদ্যসামগ্রী এত দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িতেছে, বাঙ্গালী এত দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, তাহা প্রত্যেক চিন্তাক্ষম ব্যক্তির চিন্তার বিশেষ কারণ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার প্রতিকার নিরূপণ করিবার সময় আসিতে আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব নাই।

বাঙ্গলার জলবায়ু ও আবহাওয়া।

চাষোপযোগী জল বায়ু সম্বন্ধে বাঙ্গলার অদৃষ্ট পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রসন্ন। বৃষ্টি কিছু অধিক হয় বলিয়া অজন্মার সম্ভাবনা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অল্প, তথাপি অতিবৃষ্টিতে পূর্ব্ববঙ্গ এবং অনাবৃষ্টিতে বাঁকুড়া কিরূপে অন্নাভাবে পীড়িত হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে দেশের লোক যুদ্ধবিগ্রহে মারা পড়িত, আজকাল অনশনে মরিতেছে; অনাবৃষ্টিজনিত অন্নাভাবগ্রস্ত কোন বিশেষ প্রদেশ জনশূন্য না হইয়া, আজকালকার দুর্ভিক্ষ সমস্ত দেশব্যাপী অন্নকষ্ট জন্মায়।

জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত যে ষান্মাসিক দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ সাগর হইতে আমাদের দেশের উপর দিয়া বর্ষার অবিরল জলধারা বর্ষণ করিয়া যায়, তাহার উপরই সমস্ত বাঙ্গলাদেশের হৈমন্তিক ধান্য ও অন্যান্য শস্যের সুজন্মা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। উত্তর-পূর্ব্ব বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবাহের প্রত্যাবর্ত্তন মাত্র। ইহার জন্য কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুনের মধ্যে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। ইহার দ্বারাই বাঙ্গলার রবিশস্যের বিশেষ উপকার ঘটে। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ভীষণ গ্রীষ্মকালে ভারতের মধ্যে একমাত্র আসাম বাঙ্গলাদেশ ও ব্রহ্মদেশে কিঞ্চিৎ জলপাত হয়, অন্যত্র যাহা হয় তাহা অকিঞ্চিৎকর। বাঙ্গলার অধিবাসীগণ হৈমন্তিক ধান্যের উপরই জীবনধারণের নিমিত্ত সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ঐ হৈমন্তিক শস্য কোনপ্রকারে নষ্ট হইলে দেশ দুর্ভিক্ষে ছাইয়া যায়।

বাঙ্গলার বৎসরে গড়পড়তা ৬০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ১০০ ইঞ্চির উর্দ্ধে বৃষ্টিপাত হয়। চিরাপুঞ্জির (আসামে) গড়পড়তা বৃষ্টিপাত ৪০০ ইঞ্চি। কলিকাতার ৬৫ ইঞ্চি, পাঞ্জাবের মাত্র ২০ ইঞ্চি। বৃষ্টিপাত এত অধিক বলিয়া আমাদের দেশে ধান এবং পাট চাষের এত সুবিধা, এবং সাধারণ কৃষিকার্য্য সহজ ও তাহার ফলাফল কতক পরিমাণে নিশ্চিত। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে শস্যের পর্য্যাপ্ত ফলন কোন বৎসরের মোট বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে না। যদি একই পরিমাণের বৃষ্টি অল্পে অল্পে সমস্ত ঋতু ব্যাপিয়া হয় তাহাতে চাষের সমূহ উপকার দর্শে; আবার যদি সেই পরিমাণের বৃষ্টি এককালে অধিক পরিমাণে পড়ে, তাহাতে চাষের সুবিধা না হইয়া বরং ক্ষতি হয়।

দেশ ও দেশবাসীর অবস্থা।

বাঙ্গলার কৃষিবিষয়ে পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, বাঙ্গলাদেশ সম্বন্ধে মোটামুটি যে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন তাহা কতক পরিমাণে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করা গেল।

এখন দেখা যাইতেছে আমাদের দেশের অন্তর্বল বড় অল্প নহে। বহুজনাকীর্ণ এই প্রদেশ দক্ষ কার্য্যকুশল ও বুদ্ধিমান জাতির দ্বারা অধ্যুষিত। ইহার বিস্তৃত প্রান্তর-গুলি কৃষির উপযোগী যথেষ্ট উর্ব্বর মৃত্তিকার দ্বারা আবৃত। ইহার বক্ষের উপর দিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের কাণ্ড শাখা প্রশাখা লইয়া বহিয়া চলিয়াছে। জগৎপিতার অপার করুণায় ইহার আকাশে ঘনঘটা প্রচুর বারিবর্ষণে মৃত্তিকাকে আর্দ্র করে ও বায়ুকে শীতল রাখে। ইহার স্বাভাবিক দৃশ্যাবলী নিরন্ন দরিদ্রেরও নিরাশ হৃদয়ে শান্তি ও তৃপ্তির মাধুরী বিস্তার করে। ক্ষমতাশালী রাজার শাসনে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি চিরসংরক্ষিত। তবে কেন আমাদের এ সোনার বাঙ্গলার দ্বারে দ্বারে দুর্ভিক্ষ, অনশন, অভাব, অস্বচ্ছন্দ, ও মড়ক তাহাদের মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে? অনেকে বলেন ভারতের অধিবাসীর অবস্থা মন্দ কে বলে! পূর্ব্বে, দেশের লোকেরা খালি পায়ে খালি গায়ে থাকিত, কোথাও যাওয়া আসা করিতে হইলে পদব্রজে ভিন্ন উপায় ছিল না। সহরের দৃশ্য এখন কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কত পাকাবাড়ী, ট্রাম, গাড়ি, সহরের উপকণ্ঠে ধনীগণের সুদৃশ্য সৌধাবলী, বাগান-বাটী—এ-সব কি দেশের লোকের সুদিনের চিহ্ন নয়? আমরা বলি দেশের লোক ত শহরের মধ্যে বা উপকণ্ঠে বাস করে না; "The nation lives in the huts" "পল্লীবাসীরাই দেশবাসী;" এই দেশবাসীর অবস্থা দেখ, গ্রামে যাও, প্রতি চাষাচাষীর জনমজুরের কুটীরে উঁকি মারিয়া দেখ। দেখিবে, দরিদ্র পিতা মাতা সন্তানভারে প্রপীড়িত, সারাদিনের কষ্টলব্ধ মুষ্টি-অন্ন সকলের উদর পূরণে অক্ষম। তাহারা একবেলা খাইয়া কোন-রকমে জীবন কাটাইয়া দিতেছে। পিতামাতা মুখের গ্রাস সন্তানের মুখে তুলিয়া দিয়া নিজেরা অভুক্ত রহিতেছে। লজ্জা নিবারণের আবরণ দেহে নাই, রোগে চিকিৎসার সামর্থ্য ও সুযোগ নাই। বর্ষায়, শীতে, জ্বরে, প্রপীড়িত হইয়া দরিদ্রের আয়ু স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইতেছে। জীবনে উৎসাহহীন, মরণে আশাহীন, প্রাণে দুর্ব্বল—ইহাই ত বাঙ্গলার ছবি, ইহাই আমাদের দেশ!

আমাদের দেশের এই বর্ত্তমান অবস্থার (একমাত্র কারণ বলিলে যদি অত্যুক্তি হয়) শ্রেষ্ঠ কারণ কৃষিকার্য্যের উন্নতির অভাব। যে দেশের লোকসংখ্যার দুইতৃতীয়াংশ জীবনধারণের নিমিত্ত মুখ্যভাবে কৃষির প্রতি নির্ভর করে, সে দেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন না করিলে দুর্দ্দশার ছায়া যে অচিরেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমাদের বর্ত্তমান কৃষিপদ্ধতি যে কতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। অতএব বাঙ্গলায় কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন করিতে হইবেই। কৃষির উন্নতি করিতে হইলে, কৃষির উন্নতির অন্তরায়গুলি অথবা অবনতির কারণগুলি দূর করিতে হইবে। কৃষির উন্নতির অন্তরায়গুলি আমরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে চাহি—১। কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিষয়ে কৃষকদিগের অজ্ঞতাজনিত অন্তরায়, ২। লোকসাধারণের প্রকৃতিগত, শিল্প ও শিক্ষাবিষয়ক, সামাজিক, অর্থব্যবহার এবং অন্য সম্বন্ধীয় অভাব ও অজ্ঞতাজনিত অন্তরায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র।

স্মৃতির সৌরভ

দুইএর পরিচ্ছেদ।

সেদিন ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন। সন্ধ্যার সময়। সারাদিন কাঠফাটা রোদ আর গুমট গরমের পর সবে একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল; সূর্য্যদেবের অস্ত যাইতে তখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। বাগানের চারিধারের এলম্ গাছের ঘন পাতার বুননি ভেদ করিয়া আসাতে পড়ন্ত রৌদ্রের তেজটা আর তেমন নাই। কাজেই শেভারেল প্রাসাদের ময়দানে ওই দুটি মহিলা সামান্য রোদটুকুকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের সূচিকর্ম্ম ও বসিবার ছোট ছোট তাকিয়াগুলি লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। তরুণীটির অতি লঘু দ্রুত পাদক্ষেপেও নরম ঘাসের মাথাগুলি নুইয়া পড়িতেছে। মেয়েটির ছোটখাট ছিপ্‌ছিপে একহারা ধরণের চেহারা, সুগঠিত পা দু'খানি ছোট ছোট। তরুণী প্রবীণার আগে আগে ছোট তাকিয়াগুলি হাতে করিয়া চলিয়াছে, নারেল গাছের ঝাড়ের নীচের ঢালু জায়গাটি তাহার বড়ই প্রিয়। পদ্মবনের ফুলে ফুলে রোদের খেলা সেখান হইতে দেখা যায়,

সেই জায়গাটি আবার খাইবার ঘরের জানালা দিয়া দেখা যায়। মেয়েটি সেইখানে বালিশগুলি নামাইয়া মন্থরগামিনী প্রবীণার অপেক্ষায় ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহার বড় বড় কালো চোখদুটিই সবার আগে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হরিণ শিশুর চোখের মতো তাহাদের সরল উদাস দৃষ্টি। নিজের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। খুব লক্ষ্য করিলে দেখা যায় নবযৌবনের লালিমা তাহার কচি মুখখানিকে এখনই ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহার মুখ ও গলার রং দক্ষিণ দেশীয়দের মতো একটু হল্‌দে ধরণের। গলায় জড়ানো একখানা কালো লেসের রুমাল তাহার গায়ের রং ও শাদা মস্‌লিনের পোষাকটাকে একটু তফাৎ করিয়া দিয়াছে। মেয়েটির কালো চুলগুলি পিছন দিকে জড়ো করিয়া বাঁধা কাজেই বড় বড় চোখদুটি আরো বেশী সুন্দর দেখাইতেছে। মাথার উপর একটি ছোট টুপি, তাহার এক পাশে একটি গোলাপী ফিতার ফুল।

প্রবীণার চেহারা একেবারে অন্য ধরণের। তিনি একে খুব লম্বা তাহার উপর আবার পাউডার-দেওয়া চুলগুলি মাথার উপর চূড়া করিয়া বাঁধাতে আরও লম্বা দেখাইতেছে। চুলের উপর লেস ও ফিতা দেওয়া। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু মুখশ্রী এখনও বেশ তাজা ও সুন্দর, গায়ের রং গোলাপী। তাঁহার স্ফুরিত অধর ও ধূসর রঙের দৃষ্টি যেন সকলকে অবহেলা করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিতেছে, হাঁটিবার সময় মাথাটা একটু পিছনদিকে হেলিয়া যেন গর্ব্বভরে তাঁহার আভিজাত্যের পরিচয় দিতেছে। নীলরঙের আঁটসাট পোষাকে তাঁহাকে ঠিক রাজেন্দ্রাণীর মতো মানাইয়াছিল, ময়দানে বেড়াইবার সময় দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন প্রসিদ্ধ চিত্রকর স্তর জোস্থয়া রেনল্ডের আঁকা কোন ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি ছবির ফ্রেম ছাড়িয়া সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া খাইতে নামিয়া পড়িয়াছেন। বর্ষীয়সী রমণী একটু দূর হইতে ডাকিয়া বলিলেন "ক্যাটেরিনা, বালিশগুলো একটু নামিয়ে রাখ, নইলে মুখে বড় রোদ পড়বে।" তাঁহার কথা বলার ভঙ্গীটা ঠিক হুকুম করার মতো।

ক্যাটেরিনা হুকুম তালিম করিলে দুজনে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজনের হৃদয় বিষাদ-ভরা ও আর-একজনের হৃদয় জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

সেদিন সন্ধ্যায় কোন চিত্রকর থাকিলে শেভারেল প্রাসাদের ছবিখানা বাস্তবিকই সুন্দর হইত। ধূসর পাথরের শিখর ও বুরুজ-দেওয়া বাড়ীখানি যেন একটি দুর্গ। গরাদে দেওয়া বড়-বড় জানালার নানা আকারের সার্সীর ভিতর দিয়া সান্ধ্য সূর্য্যের কিরণ সোনা ঢালিয়া দিতেছিল। একটা প্রকাণ্ড বিচগাছ প্রাসাদের বাহিরের একটা বুরুজের-গায়ে হেলিয়া পড়িয়াছে। তাহার কালো-কালো ডালগুলি একপাশে নুইয়া পড়িয়া যেন বাড়ীর সম্মুখের মাপ-যোখ করা ব্যবস্থা ভঙ্গ করিতেছিল। পাথর-বাঁধানো চওড়া রাস্তা বাড়ীর ডানদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। তাহার পাশ দিয়া এক সারি লম্বা-লম্বা পাইন গাছ, পাশে একটা পুকুর। বাঁদিকে কয়েকটা ঘাসের-জমি, তাহার উপর মাঝে-মাঝে গাছের ঝোপ। সেখানে উজ্জ্বল সবুজরঙের লেবু ও বাবলাগাছের পাশে স্কচ ঝাউগাছের লালগুঁড়ি পড়ন্ত রোদের আভায় জল্‌-জল্‌ করিতেছে। বড় পুকুরটায় এক জোড়া রাজহাঁস ডানার মধ্যে একটা-একটা পা গুঁজিয়া দিয়া আরামে গা ঢিলা দিয়া সাঁতার দিতেছে; ফুটন্ত পদ্মগুলির মুখে সন্ধ্যার আলো চুম্বন দিয়া যাইতেছে, তাহারা স্থিরভাবে পড়িয়া আছে। ময়দানের মরকত মণির মতো উজ্জ্বল সবুজ ঘাসগুলি ক্রমশ বাগানের মাঠের জংলী লাল্‌চে ঘাসের দিকে নামিয়া আসিয়াছে। এই মাঠেই সেই মহিলাদুটি বসিয়া।

খাইবার ঘরের জানালা হইতে তাঁহাদের চেহারা পরিষ্কার দেখা যায়। সেই ঘরে যে তিনটি ভদ্রলোক পান করিতেছিলেন তাঁহারা বেশ ভাল করিয়াই ইঁহাদের দেখিতে পাইতেছিলেন। ওই দুই সুন্দরীর সহিত ইঁহারা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে জড়িত। ভদ্রলোকগুলির দেখিবার মতো চেহারা। তবে কোনো নূতন লোক এই ঘরে প্রথম ঢুকিলে হয়ত ঘরখানার রূপেই বেশী মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন। ঘরে আসবাবের সংখ্যা নিতান্ত কম হওয়াতে তাহার উপাসনার মন্দিরের মতো স্থাপত্য সৌন্দর্য্যই লোকের মন মোহিত করে। এক দরজা হইতে আর-এক দরজা অবধি একখানা মাদুর পাতা, একটুকরা পুরানো কার্পেট খাইবার টেবিলের তলায় পড়িয়া। এক কোণে একটা বাসন রাখিবার কাঠের তাক্‌। এই কয়টা সামান্য জিনিষ দৃষ্টিকে কিছুমাত্র ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। ঘরটি দেখিলে

খাইবার ঘর বলিয়া মনে হয় না, যেন সুন্দর কারুকার্য্য দেখাইবার জন্যই জায়গাটি ঘিরিয়া রাখা। ছোট টেবিলটি ও তাহার চারি ধারের লোক কয়টি যেন হঠাৎ উড়িয়া আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের জন্যই যে ঘরখানা তাহা কে বলিবে।

কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে লোকগুলিও নেহাৎ তাচ্ছিল্য করিবার মতো নয়। ইঁহাদের মধ্যে যিনি খবরের কাগজ হাতে করিয়া ফরাসী পার্লামেন্টের টাট্‌কা খবর সংগ্রহ করিতে-করিতে মাঝে-মাঝে তাঁহার তরুণ সঙ্গী দুইটির দিকে ফিরিয়া মন্তব্য করিতেছিলেন তিনি বয়সে বৃদ্ধ। কিন্তু বৃদ্ধ ইংরেজ মহলে তিনি সুপুরুষ নাম পাইবারই যোগ্য। তাঁহার কালো চোখদুটি উঁচু ঘন ভ্রূর তলায় চক্‌চক্‌ করিতেছিল। ভ্রূর চুলে মাঝে-মাঝে পাক ধরাতে আরো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বাজপাখীর ঠোঁটের মতন বাঁকা নাক দেখিলে তাঁহাকে কঠোর-হৃদয় বলিয়া যেটুকু শঙ্কা হয়, মুখের কাছের রেখাগুলি সে শঙ্কা অনেকটা কমাইয়া দেয়। ষাট বৎসর বয়সেও তাঁহার সব কয়টি দাঁতই আছে এবং মুখের ভাবে দৃঢ়তার একটুও কম্‌তি নাই। পাউডার-দেওয়া চুলগুলি টানিয়া পিছন-দিকে টিকির মতন করিয়া রাখাতে কপালের সূক্ষ্মাগ্র রেখা আরো স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। একখানা ছোট শক্ত চেয়ারে তিনি বসিয়া ছিলেন। চেয়ারাখানা আরামকুর্শির পাশ দিয়াও যায় না, পিছনদিকটা একেবারে খাড়া, কাজেই তাঁহার সোজা চেপ্টা পিঠ ও চওড়া বুকের চেহারাটা তাহাতে ভাল করিয়াই দেখা যায়। মোটকথা বৃদ্ধ স্যর ক্রিষ্টফার শেভারেলের চেহারাটা চমৎকার।

স্যর ক্রিষ্টফারের দিকে চাহিলেই হয়ত পাঠকের মনে হইবে তাঁহার একটি উপযুক্ত যুবক পুত্র আছেন; কিন্তু তাঁহার দক্ষিণে উপবিষ্ট যুবকটিকে হয়ত তাঁহারা এই পদটা দিতে ততটা ইচ্ছুক হইবেন না। যুবকের ভ্রূ ও চোখ অনেকটা এই জমিদার-বংশেরই মতন। যুবকের চেহারাটা যদি একটু কম সুন্দর হইত, তাহা হইলেও তাঁহার পোষাকের সৌন্দর্য্যেই লোকের চোখ ধাঁধাইত, কিন্তু তাঁহার পাতলা একহারা চেহারার কাঠামোখানাই এমন নিখুঁত ও সুগঠিত যে এক দরজি ছাড়া আর কেহই তাঁহার মখমলের নিখুঁত কোটের দিকে চাহিত না। তাঁহার সাদা ধপ্‌ধপে ছোট ছোট হাত দুখানির নীল শিরা ও সূক্ষ্মাগ্র আঙুলগুলিও রূপের আলোয় হাতের উপরের লেসের ঝালরগুলিকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছিল। কেন জানিনা, মুখখানা দেখিলে একটুও আনন্দ হয় না। তাঁহার সুন্দর মুখশ্রীর চেয়ে কোমল মুখশ্রী আর কাহারও হইতে পারে না; পাউডার-দেওয়া চুলের পাশে মুখের রং আরো খুলিয়াছে। নীল নীল শিরাগুলি চোখের পাতার উপর ফুটিয়া উঠিয়া সেগুলিকে অতি সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, পিঙ্গল চোখ দুটি আলস্যমাখা। পাতলা নাক ও ছোট ওঠটির গড়নে কোনো খুঁত নাই। চিবুক ও চোয়ালের নীচের দিকটা বোধ হয় একটু বেশী ছোট, মুখের এইটুকুই খুঁত। সমস্ত শরীরটাই কোমলতার দিকে একটু বেশী ঝুঁকিয়া আছে, এই খুঁতটুকুতে সেই কোমলতাই বাড়িয়াছে। ভ্রূদুটিও সরু ও বাঁকা, কপালটি মর্ম্মরের মতন নিষ্কলঙ্ক। এমন মুখকে সুন্দর না বলিয়া উপায় নাই; কিন্তু অধিকাংশ নরনারীই ইহার মধ্যে কোনো মাধুর্য্য খুঁজিয়া পাইত না। যে-চোখ রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশংসা ও বিস্ময়ে উজ্জ্বল হইয়া না উঠিয়া অলসভাবে তাহা গ্রহণ করে, রমণী সে-চোখের পক্ষপাতী নয়। পুরুষেরা, বিশেষতঃ যাঁহাদের নাকচোখগুলো একটু ভোঁতা রকমের, তাঁহারা ত' এই কন্দর্পটিকে দাম্ভিক একটা ফুলবাবু বলিয়াই উড়াইয়া দিবেন। টেবিলের উল্টা দিকে উপবিষ্ট পাদ্রী মেনার্ড গিলফিল প্রায়ই ইঁহাকে মনে মনে এই নামে ভূষিত করিতেন। অবশ্য অনায়াসে অমন ধৃষ্টতাটা করিয়া যাইবার মতন মুখের গড়ন কি পা পাদ্রী সাহেবের ছিল না। তাঁহার স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল সরল মুখশ্রী ও সতেজ হাতপাগুলি আট-পৌরে জীবন-যাপনের পক্ষে খুব ভালই ছিল। উক্ত দেশীয় মালী মিঃ বেট্‌সের মতে সৈনিক হইলে তাঁহার চেহারাখানা খাসা খুলিত। স্যর ক্রিষ্টফারের ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী কাপ্তেন উইব্রো অবশ্য বংশগৌরবের দাবীতে মালীর ভক্তির পাত্র, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার খোঁচা-খোঁচা নাক মুখ ও রোগা-পট্‌কা চেহারাটা সৈনিকের সাজে পাদ্রী সাহেবের মতন মানায় না। কিন্তু মালীর অত প্রশংসাতে কিইবা হয়! মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলো যে বেয়াড়ারকম

একগুঁয়ে। আমের রসের লোভে যাহার মুখে জল গড়াইতেছে, সারা বাগানের শাকসবজি উজাড় করিয়া দিলেও তাহার চোখ সে-দিকে তাকায় না। মিঃ বেটসের মতামতে মিঃ গিলফিলের মনে একটা রেখাও পড়িত না, কিন্তু আর-একজনের মতামতে সেই মনেই খুব গভীর রেখা পড়িত। কিন্তু কপাল এমনই যে সে আর-একজনটি তাঁহাকে মোটেই মিঃ বেটসের চোখে দেখিত না।

এই আর-একজনটি যে কে তাহা বাহির করিবার জন্য খুব একজন বড় পর্য্যবেক্ষকের দরকার হয় না। ময়দানের উপর দিয়া বালিশগুলি হাতে করিয়া ওই যে ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি চলিয়াছে, তাহার দিকে মিঃ গিলফিলের আকুল দৃষ্টিটি লক্ষ্য করিলেই সেই মানুষটিকে আবিষ্কার করা যায়। কাপ্তেন উইব্রোও সেইদিকেই চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সুন্দর মুখটিতে সৌন্দর্য্যের প্রশংসা ছাড়া আর বেশী কিছুর ছায়া পড়ে নাই।

খবরের কাগজের উপর হইতে মুখ তুলিয়া স্যর ক্রিষ্টফার বলিলেন "ওহে! ঐ যে দেখি আমার গিন্নী! অ্যান্টনি ঘণ্টাটা বাজাও ত', কফি আন্‌তে বল। চল, আমরাও ওখানে গিয়ে হাজির হই। টিনা আমাদের একটা গান শোনাবে এখন।"

তখনই কফি আসিয়া হাজির হইল। আজ কিন্তু লাল-পোষাক-পরা খানসামা বাহকরূপে আসে নাই। বাড়ীর বুড়ো চাকরই, একটা ঝাড়া ধোয়া পুরানো কালো জামা গায়ে দিয়া কফির সরঞ্জাম লইয়া আসিল। টেবিলের উপর বড় বারকোষখানা নামাইয়া সে বলিল, "হুজুর, হার্টপ বুড়োর বিধবা স্ত্রী ভাঁড়ার-ঘরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁদছে, একবারটি আপনার দর্শন চায়।"

স্যর ক্রিষ্টফার খুব তীক্ষ্ণ সুরে জোর দিয়া বলিলেন, "ওর যা বিলিব্যবস্থা করবার সে ত আমি মার্থামকে বলেই দিয়েছি। তাকে বলবার আর আমার কিছু নেই-টেই।"

ভৃত্য হাত জোড় করিয়া আর-একটু বিনয়ের সুরে বলিল, "মহারাজ, গরীবের উপর একটু দয়া করুন। হতভাগী একেবারে ভেঙে পড়েছে। বলে, আপনার দর্শন না মিললে সে সারারাত একবার চোখ বুজতেও পারবে না। এমন সময় আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছে বলে মহারাজ দুখিনীর অপরাধ নেবেন না। আহা, কেঁদে কেঁদে অভাগীর বুকটা যেন দুখান হয়ে যাচ্ছে।"

"হাঁ, হাঁ, চোখের জল ফেলতে ত' আর কড়ি ফেলতে হয় না। আচ্ছা, যাও তাকে একবার লাইব্রেরীর-ঘরে পাঠিয়ে দাও গিয়ে।"

কফি পান শেষ হইল। যুবক দুইটি উঠিয়া ময়দানে মহিলাদের কাছে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ জমিদার লাইব্রেরী-মুখো হইলেন; সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছে তাঁহার আদরের ডালকুত্তা রিউপার্ট। আহারের সময় সে প্রভুর ডানদিকে নিজের প্রিয় স্থানটিতে অত্যন্ত ভদ্রলোকের মতন চুপটি করিয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু পানের সময় আসিতেই সে টেবিলের তলায় অন্তর্দ্ধান। বোধ হয় তাহার মনে হইতেছিল পানাসক্তিটা মানুষগুলোর একটা দুর্ব্বলতা। সে সেটা সমর্থন করিতে বিশেষ নারাজ।

খাইবার ঘরের পরেই দেয়াল-ঘেরা একটুখানি পথ, পথের উপর মাদুর পাতা। দুই চারি পা যাইলেই লাইব্রেরী। ঘরের জানালার উপর একটা প্রকাণ্ড বিচ গাছ ঝুঁকিয়া ছায়া করিয়া আছে, চারটি দেয়ালের গা গাঢ় রঙের পুরানো বই দিয়া মুড়িয়া দেওয়া। ঘরখানি যেন মুখ আঁধার করিয়া আছে। বিশেষতঃ খাইবার ঘরের অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও হাল্‌কা রঙের চিত্রে সোনালি ছোপের বাহার দেখিবার পর এ ঘরে ঢুকিলে ঘরখানাকে নিষ্প্রভ লাগাটা খুবই স্বাভাবিক।

ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে একটি স্ত্রীলোক বিধবার পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। স্যর ক্রিষ্টফার ঘরের দরজা খুলিতেই দরজা দিয়া উজ্জ্বল আলোর স্রোত আঁধার ঘরের ভিতরে সেই মেয়েটির গায়ে গিয়া পড়িল। গৃহস্বামী ঘরে ঢুকিতেই বিধবা খুব নত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। বিধবার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, বেশ হাসিখুসী নধর চেহারাটি। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটি লাল হইয়া উঠিয়াছে। ডান হাতে একটা মোচড়ানো রুমাল; চোখের জলে ভিজা। স্যর ক্রিষ্টফার সোনার নস্যাধারটি বাহির করিয়া তাহার ঢাকনাটায় টোকা দিতে দিতে বলিলেন, "কিগো, হার্টপ-গিন্নি, আমার কাছে আবার

কি মনে করে'? মার্থাম তোমায় জমিজমা ছেড়ে দেবার পারোয়ানা দিয়েছে না?"

"আজ্ঞে, হাঁ মহারাজ, দিয়েছে বটে। সেই জন্যেই ত' আপনার চরণে এসে পড়েছি। ধর্ম্মাবতার, গরীবের কথা আর একবারটি ভেবে দেখবেন। চন্দ্রসূর্য্যের উঠতে ভুল হলেও আমার স্বামীর খাজনা দিতে একটি দিনও ভুল হয়নি। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে আমায় ভিটে-ছাড়া করবেন না।"

"যাও, যাও, আর মেলা বাজে বোকোনা। একটা জমি ইজারা নিয়ে স্বামীর রোজগারের শেষ কড়িটি অবধি খুইয়ে তোমারি বা কি লাভ হবে, আর তোমার ছেলেপিলেরই বা কি লাভ হবে, বল দেখি! তার চাইতে যেখানে টাকা কটা রাখতে পার এমন কোনো জায়গায় যাও, এখানকার পুঁজি-পাটা বেচে দিয়ে বসবাস কর গিয়ে। এ ত' জানা-কথা যে আমি প্রজা মারা গেলে তার স্ত্রীকে জমি ইজারা দিইনা।"

"দোহাই ধর্ম্মাবতার, একবার আমার কথাটায় কান দিন। ঘাস খড় ধান চাল গরু বাছুর পাখ পাখালী সব বেচেও ধার শোধ করে টাকা খাটাতে গেলে একবেলা দুটো মুখে দেবার মতনও থাকবে না বোধ হয়। তারপর ছেলেগুলোকে মানুষ করবই বা কি দিয়ে আর কাজ কম্ম শেখাবই বা কি করে'? আপনার জমিদারীর প্রজার মান কত? মরাই বাঁধবার আগে কোনো দিন যে গম নাড়ায়-নি, খড় বেচেও খায়নি, তারই ছেলে কিনা শেষে দিন-মজুরি করে' খাবে! হা আমার কপাল! গাঁয়ের চৌসীমানার চাষাদের ডেকে জিগেস করুন, আমার স্বামীর চেয়ে ধীর স্থির আর ভদ্র লোক রিপস্টোন বাজারে আর একটি যেত না। মরবার সময় আমায় শেষ কথা বলে গেল, 'বেসি, জমিদার-মশায় যদি দয়া করেন, তবে চাষ বাসের জমিটা ছেড় না, চালিয়ে নিও।'"

কাঁদিতে-কাঁদিতে হার্টপ-গিন্নি থামিয়া গেল, স্যার ক্রিষ্টফার সেই অবসরে বলিয়া লইলেন, "হুঁ হুঁ, ঢের হয়েছে। এখন আমার কথাটা শোন; বুদ্ধি বিবেচনা কাণ্ডজ্ঞান কাকে বলে সেটা একটু বুঝতে শেখ। চাষবাস চালাতে তুমি তোমার গোয়ালে-বাঁধা গরুটার মতই মজবুত। দেখবার শোনবার লোক তোমার সেই রাখতেই হবে; সে হয় তোমার পয়সা কটা ঠকিয়ে হাত করে' নয় ফুসলিয়ে-ফাসলিয়ে তোমায় বিয়ে করে' বসবে।"

"ওমা গো, সে কি কথা, তেমন মেয়েমানুষ আমি নই; অমন কথা আমায় কেউ কোনো দিন বলতে পারেনি।"

"হ্যাঁ, তা' সেটা না বলাই সম্ভব, কারণ এর আগে ত' আর তুমি কোনোদিন বিধবা হওনি। মেয়েমানুষ চিরকালই বোকা, তার ওপর বিধবা হ'লে যেন নীরেট বোকা হয়ে ওঠে। এখন ভেবে দেখদিখি, বছর চার এই-সব কারবার চালালে যখন তোমার পয়সা কড়ি সব ফুরিয়ে যাবে, অদ্ধেক খাজনা বাকি পড়ে' যাবে আর চাষ-বাসও সব গোল্লায় যাবে, তাতে তোমার লাভটা কি হবে? আর নয়ত কোন একটা হামদো বুড়ো বর জুটে তোমার ছেলেপিলেগুলোকে পিটিয়ে আর দিবারাত্রি তোমায় গাল পেড়ে ভূত-ছাড় করে' দেবে।"

"আজ্ঞে না মহারাজ, চাষবাস আমি বেশ বুঝি, জন্মে অবধি বলে ওই-সবের মধ্যে কাটিয়েই তিন কাল কাটালাম। আর এই দেখুন না, আমার এক দিদিশাশুড়ী কম করে' কুড়ি বচ্ছর একটা ক্ষেত খামারের কাজ চালালে, তারপর বুড়ী মরবার সময় সব কটা নাতিনাতনীর জন্যে দাম-পত্তর লিখে দিয়ে গেল; আমাদের উনি ত তখনো জন্মান-নি; তা তিনিও দিদিমার সম্পত্তির ভাগ থেকে বাদ পড়েন-নি।"

"হুঁঃ, সেই পাঁচ হাত লম্বা মেয়েমানুষ ত; ট্যারা-ট্যারা চোখ আর খোঁচা-খোঁচা হাত পা। যেন রায়-বাঘিনী, মহিষমর্দ্দিনী। তোমার মতো' ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায় না গো হার্টপ-গিন্নি।"

"ওমা গো, সেকি কথা, সাত জন্মেও ত' তার ট্যারা চোখের কথা শুনিনি। লোকে বরং বলত, ইচ্ছে করলে সে সাত বার বিয়ে করতে পারত। তাও আবার যেমন-তেমন টাকার কাঙালগুলোর সঙ্গে নয়। বেশ ভাল ঘরে বরেই হত।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাদের সব অমনিই বুদ্ধি। জগতে যত লোক তোমাদের দিকে একবার তাকিয়েছে, সবাই তোমাদের বিয়ে করবার জন্যে হা-পিত্যেশ করে' বসে' আছে। আর যার যত শূন্য ঝুলি আর গণ্ডাভর্ত্তি ছেলে

তারই তত আদর। তা যাক, ও-সব বকবকিয়েও কিছু হবে না, কেঁদেও হবে না। আমি যা ভাল বুঝেছি, করেছি, এখন আর কিছু বদলাতে পারব না। বাড়ী গিয়ে বুঝে-সুজে উঁচুদরে ঘরের মালগুলো বেচে ফেল, আর একটা ভাল দেখে জায়গা খুঁজে ওঠবার জোগাড় কর। বুঝলে ত! যাও এখন বেলামী-গিন্নির ঘরে গিয়ে এক পেয়ালা চা চেয়ে নিয়ে বিদায় হও।"

স্যর ক্রিষ্টফারের কথার ধরণেই হার্টপ-গিন্নি বুঝিল যে আর কিছু নড়চড় হইবার পথ নাই। অগত্যা সে নত হইয়া একটা নমস্কার করিয়া লাইব্রেরী হইতে বিদায় লইল। জমিদার-মহাশয় তখন জানালার কাছে বসিয়া এই চিঠিখানা লিখিয়া ফেলিলেন—মিঃ মার্থাম, ক্রোজফুট কটেজ ভাড়া দিবার কোনো চেষ্টা করিও না। হার্টপের বিধবা স্ত্রী বাড়ী ছাড়িয়া উঠিলে আমি তাহাকে সেখানে থাকিতে দিতে চাই। তুমি যদি শনিবার বেলা এগারটার সময় একবার এস তবে আমি তোমার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়া বাড়ীটা মেরামত করার বন্দোবস্ত করিয়া আসি। আর খানিকটা জমিও ওই সঙ্গে রাখা দরকার, কারণ হার্টপের স্ত্রীর গরু-বাছুর ও শূয়োরগুলি রাখিবার জায়গা চাই ত। ভবদীয় ক্রিষ্টফার শেভারেল।

ঘণ্টাটা টানিয়া চিঠিখানা যথাস্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্যর ক্রিষ্টফার ময়দানের দলে যোগ দিতে বাহির হইয়া পড়িলেন। সেখানে গিয়া দেখেন শুধু বালিশগুলি পড়িয়া আছে, কাজেই বাড়ীর পূর্ব্ব-দিকে বসিবার ঘরের সন্ধানে চলিলেন। বসিবার ঘরের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রকাণ্ড জানালার পাশেই বাড়ীতে ঢুকিবার পাশ দরজা। তাহার সামনে কাঁকর-বিছানো পথ। মস্ত বড় একটা ঘাসের মাঠ পড়িয়া আছে, তাহার উপর দিয়া বাতাস ঘাসের মাথায় ঢেউ দিয়া যাইতেছে। মাঠের দুই ধারে সারি সারি গাছ। জানালাটি যেন মাঠের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। দূরের ক্ষেতের ভিতর দিয়া একটি ঘাসে ঢাকা পথ চলিয়া গিয়াছে। তাহারও কিছু দূরে খিলান-করা গেট। জানালাটি খোলা; স্যর ক্রিষ্টফার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, তিনি যাহাদের খুঁজিতেছিলেন, তাহারা এইখানে ঘরের ছাদের অসমাপ্ত কাজ দেখিতেছে। খাইবার ঘরের ধরণের উজ্জ্বল কারুকার্য্য এখানেও। তবে এখানের কাজটা আরও মার্জ্জিত। দেখিলে মনে হয় এক-টুকরা সুন্দর লেস পাথর করিয়া ফেলা হইয়াছে। নানা রঙের সুতার বুনানিতে যেন তাহা গড়িয়া উঠিয়াছে। এখনও চারিভাগের এক ভাগে রং করা হয় নাই। তাহার তলায় যত মই, সিঁড়ি, ভারা, যন্ত্র প্রভৃতি জড়ো করা। বাকি ঘরখানা একেবারে খালি। কোনো আসবাব নাই। কেবল পাঁচটি মানুষ যেন একটা প্রকাণ্ড 'গথিক্' চাঁদোয়ার তলে দাঁড়াইয়া।

স্যর ক্রিষ্টফার দলে যোগ দিয়াই বলিলেন, "ফ্রান্সিস্কে দেখ্ছি আজকাল একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাচ্ছে লোকটা আশ্চর্য্য কুড়ে, বাস্তবিক মানুষটার রকম দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। কি করে' তুলি হাতে করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমোয়! লোকটাকে কিন্তু তাড়া দিতে হচ্ছে, নইলে অ্যান্টনি যদি এবারকার কাজে সুদক্ষ সেনাপতির লক্ষণ দেখায় তবে ত বউ আসবার আগে ঘর থেকে ভারাই নড়বে না। কি বল হে? শীগ্গির শীগ্গির কেল্লা দখল কর।"

কাপ্তেন উইব্রো একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আরে মশায় এই অবরোধ জিনিষটাই যুদ্ধ-ব্যাপারের মধ্যে সবচেয়ে একঘেয়ে।"

"দুর্গের দেয়ালের ভিতর কোমলহৃদয় নামে একটি বিশ্বাসঘাতক থাকলে বোধ হয় আর তা' হয় না। আর বিয়েট্রিস যদি মায়ের রূপের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর হৃদয়টুকুও পেয়ে থাকে, তা হ'লে সে বিশ্বাসঘাতকটির অভাব হবে বলে' বোধ হয় না।"

স্বামীর মুখে পূর্ব্বস্মৃতির কথা শুনিয়া লেডি শেভারেলের মনের ভিতর খোঁচা দিয়া উঠিল। বোধহয় কথার স্রোতটা ফিরাইয়া দিবার জন্যই তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, স্যর ক্রিষ্টফার, ছবি টাঙাবার সময় 'সিবিল'-খানা দরজার উপর দিলে কেমন হয় বল দেখি? আমার বসবার ঘরে ছবিখানা যেন ছবির ভিড়ে খুঁজেই পাওয়া যায় না।"

স্যর ক্রিষ্টফার অত্যন্ত বেশীরকম ভদ্রতা দেখাইয়া সোহাগ-মাখা সুরে বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, গিন্নি, সে ত' বেশ খাসাই হবে। তুমি যদি তোমার ঘরের অমন অলঙ্কার-খানা হাতছাড়া করতে রাজি থাক তবে ত' কথাই নেই

এ ঘরে সেখানা দিব্যি মানাবে। স্যর জোশুয়ার আঁকা আমাদের ছবিদুখানা জানলার উল্টোদিকে দিলেই হবে, 'খৃষ্টের রূপান্তর'খানা একেবারে শেষে। অ্যান্টনি, দেখছ ত তোমার আর বউমার ছবির জন্যে ঘরের আর কোনো ভালো জায়গায়ই খালি রাখলাম না।"

এইরকম কথাবার্ত্তার মধ্যে মিঃ গিলফিল ক্যাটেরিনার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এ বাড়ীর আর সব জানলার চাইতে এই জানলার সামনের দৃশ্যটি আমার সুন্দর লাগে।"

ক্যাটেরিনা কোনো উত্তর দিল না, গিলফিল দেখিলেন তাহার চোখ দুটি জলে টলটল করিতেছে; তাই দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "এস, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। স্যর ক্রিষ্টফার ও গৃহিণীকে বিশেষ ব্যস্ত বোধ হচ্ছে।"

ক্যাটেরিনা নীরবে সম্মতি জানাইলে দুইজনে একটা কাঁকর-বিছানো রাস্তা ধরিয়া লম্বা-লম্বা গাছের তলা দিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া খোলা সবুজ মাঠের উপর দিয়া একটি বেড়া-দেওয়া বড় ফুলবাগানে গিয়া পড়িলেন।—বেড়াইবার সময় কাহারও মুখে কথা ছিল না; মেনার্ড গিলফিল জানিতেন যে ক্যাটেরিনার মন আর-এক জায়গায় পড়িয়া আছে; আর সেও আর-সকলের নিকট হইতে সযত্নে নিজের মনের ভাবটি লুকাইয়া রাখিয়া মেনার্ডের উপর এই বিষাদের বোঝাটি চাপাইয়া দিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

বাগানের কাছে পৌঁছিয়া তাহারা উঁচু বেড়ার ভিতর দিয়া কলের পুতুলের মতন খোলা দরজাটির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। প্রথমেই অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া উজ্জ্বল রঙের খেলা। সবুজের উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া আসিতে-আসিতে হঠাৎ টকটকে ফুলের রং যেন আগুনের হল্‌কার মতন চোখ ধাঁধাইয়া দিল। বাগানের জমিটাও ঢেউখেলানো। এতখানি সমতলের পর ইহারও একটা নূতনত্ব ছিল। ঢুকিবার দরজার কাছ হইতে ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়া শেষের দিকে আবার উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে একটি কমলালেবুর বাগান মুকুট হইয়া শোভা পাইতেছে। ফুলগুলি সন্ধ্যার সাজে ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল। সূর্য্যমুখী ও 'ভর্বেনা' ফুলের মধুর গন্ধে বাগান ভরপূর। যেন আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের মেলা; সেখানে দুঃখবেদনার দিকে চাহিয়া দেখিতে কেহ নাই। ক্যাটেরিনার মনে এই ভাবটি জাগিয়া উঠিল। সোনালী, গোলাপী, লাল, নীল, নানা রঙের ফুলের কেয়ারির ভিতর ঘুরিতে-ঘুরিতে তাহার মনে হইল ফুলগুলি যেন তাহার দিকে পরীর মতন চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে, দুঃখ কাহাকে বলে জানে না। তাহার দুঃখের সাথী কেহ নাই। এই একলার দুঃখের ভারে সে যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। তাহার ম্লান গণ্ড বাহিয়া মাঝে-মাঝে দুই এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতেছিল; এইবার বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইয়া আসিল; চোখের জলও ঝর-ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।—সেই দুঃখিনীর দুঃখে একটি-মাত্র স্নেহময় মানুষের হৃদয় দুঃখ পাইতেছিল। সে যে দুঃখিনী তাহা তিনি বুঝিতেন কিন্তু তাহার পাশে দাঁড়াইয়াও কেমন করিয়া এই বেদনার অশ্রু মুছাইবেন তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি যে নিরুপায়। এই মানুষটির মনের কথা যে ক্যাটেরিনার ইচ্ছার উল্টাদিকে চলিয়াছে, সেই চিন্তাটুকুই কিন্তু তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিতেছিল। তিনি যে তাহার বৃথা আশার জন্য, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই দুঃখ করিতেছেন, তাহার নিরাশার সম্ভাবনায় নয়;—এই চিন্তাতেই সে ঐ লোকটির সমবেদনায় তৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। যে সহানুভূতির মধ্যে সমালোচনার গন্ধ পাইবার সন্দেহ আছে আমাদের দশজনের মতো ক্যাটে-রিনাও তাহার প্রতি বিরূপ। সন্দেশের মধ্যে অদৃশ্য ঔষধের সন্দেহ করিয়া ছোট ছেলেরাও এমনই করিয়াই তাহা দূরে ঠেলিয়া রাখে।

মিঃ গিলফিল বলিলেন, "ক্যাটেরিনা, কার যেন গলার স্বর পাচ্ছি। ওঁরা বোধ হয় এই দিকে আসছেন।"

মনের ভাব লুকাইতে সে অনেক দিন হইতেই অভ্যস্ত। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, সে বাগানের আর-একদিকে দৌড়িয়া চলিয়া গেল; যেন গোলাপফুল বাছিতে মহা ব্যস্ত। একটু পরেই কাপ্তেন উইব্রোর হাতের উপর ভর দিয়া লেডি শেভারেল এবং তাঁহাদের পিছন-পিছন স্যর ক্রিষ্টফার ঢুকিলেন। ফটকের কাছের জিরানিয়ামের সারির রূপ দেখিয়া তাঁহারা কিছুক্ষণ থামিলেন। ইতিমধ্যে ক্যাটেরিনা একটি গোলাপের কুঁড়ি হাতে করিয়া লঘু গতিতে আসিয়া জমিদার মহাশয়কে বলিল—

"এই নাও, জ্যাঠামশায়, তোমার জামায় লাগাবার জন্যে কেমন সুন্দর গোলাপ এনেছি।"

তিনি আদর করিয়া টিনার গাল টিপিয়া বলিলেন, "ওরে বাঁদরী, মেনার্ডের সঙ্গে পালিয়েছিলি বুঝি। বেচারীকে জ্বালিয়ে মারলি?—না, দুটো চারটে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে' আর-একটু পাগল করে' তুললি? আয়, আয়, আমরা তাস খেলতে বসবার আগে আমাদের সেই গানটা শোনাবি আয়। অ্যান্টনি কাল সকালে যাচ্ছে, শুনেছিস্ ত! তোর কোকিল-কণ্ঠটা শুনিয়ে ওকে একেবারে পুরোদস্তুর ভাবুক প্রেমিক করে' তোল্; 'বাথে' গিয়ে যেন ঠিক ঠিক চলতে পারে।" টিনার ছোট হাতখানি নিজের হাতের ভিতর দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া জমিদার-মহাশয় গৃহিণীকে "ওগো হেনরিয়েটা" বলিয়া ডাক দিয়া আগে আগে বাড়ীর দিকে চলিলেন।

সকলে বসিবার ঘরে ঢুকিলেন। জানালাতে কোনো-রকম আড়াল না থাকাতে এবং দেয়ালে নাইট ও লেডিদের লাল শাদা সোনালী প্রভৃতি রং দেওয়া ছবি থাকাতে ঘরখানা লাইব্রেরীর মতন মুখ আঁধার করিয়া নাই। স্যর ক্রিষ্টফারের সুবিখ্যাত পূর্ব্বপুরুষ স্যার অ্যান্টনির একখানা ছবি দেয়ালে টাঙানো। চেহারাখানা জমকালো বটে। এই ছবিখানার মুখোমুখি একটি মহিলার ছবি ঝুলিতেছে; তাঁহার মুখশ্রী কোমল ও গম্ভীর, চুলগুলি কটা কিন্তু প্রায় সোনার মতন চক্‌চকে, তুষারের মতন শুভ্র সুন্দর গড়ানে গলার উপর দিয়া দুইদিকে দুইটি গুচ্ছের মতন পড়িয়া আছে। গায়ের শাদা সাটিনের পোসাকটা যেন সুন্দরীর জ্যোৎস্নার মতন কোমল রঙের কাছে আপনার কর্কশতায় লজ্জা পাইতেছে। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় রাজারাজড়ার মা হইবার উপযুক্ত বটে।

এই ঘরে চা দেওয়া হইল; রোজ সন্ধ্যায় যেমন নিয়মিত-ভাবে চাতালের মস্ত বড় ঘড়িটায় গম্ভীর স্বরে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিয়া যায় অমনি নিয়মিত ভাবেই এই ঘরে জমিদার-মহাশয় গৃহিণীকে লইয়া তাস খেলিতে বসেন। সাড়ে দশটা বাজিয়া গেলে মন্দিরে পরিবারের সকলে মিলিত হন এবং মিঃ গিলফিল শাস্ত্র হইতে প্রার্থনা পাঠ করেন।

কিন্তু আজ এখনও নয়টা বাজে নাই, কাজেই ক্যাটেরিনাকে তাহার ছোট বাজনাটি বাজাইয়া স্যর ক্রিষ্টফারের প্রিয় গানগুলি গাহিতে হইবে। সেদিন কপাল-গুণে গান দুটির ভাবের সঙ্গে গায়িকার মনের ভাব খুব মিলিয়া গিয়াছিল, দুইটিতেই গায়ক তাহার হারামণির উদ্দেশ্যে হৃদয়ের ব্যাকুলতা ঢালিয়া দিতেছে। ক্যাটেরিনার বেদনা তাহার গানের বাধা না হইয়া যেন তাহারই জোর বাড়াইয়া দিল। তাহার সকল শক্তির মধ্যে গাহিবার শক্তিটি ছিল শ্রেষ্ঠ, এই একটি মাত্র গুণেই বোধ হয় সে অ্যান্টনির বাগদত্তা বড়ঘরের সুন্দরীটিকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিত। তাহার ভালবাসা, ঈর্ষা, গর্ব্ব, ও নিজের ভাগ্যের প্রতি বিদ্রোহ সবগুলি যেন আজ একসঙ্গে মিশিয়া একটা আবেগের স্রোত বহাইয়া তাহার মধুর গভীর স্বরের লহরীর রূপ ধরিয়া উছলিয়া পড়িতেছিল। তাহার গলার স্বর বেশ নীচু। লেডি শেভারেলের সঙ্গীতের উপর খুব ঝোঁক; টিনার গলা বেশী গাহিয়া পাছে একটু খারাপ হইয়া যায়, সেদিকে তাঁহার খুব নজর ছিল।

প্রথম গানটির শেষে লেডি শেভারেল বলিলেন, "ক্যাটেরিনা, আজ তোমার গান চমৎকার হয়েছে, তোমাকে অমন গাইতে আর আমি কখনো শুনিনি। আর-একবারটি গাও।"

আবার সেই গানটিই হইল। তাহার পর দ্বিতীয় গান। ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল, কিন্তু স্যর ক্রিষ্টফার এই গানটিও দুইবার না শুনিয়া ছাড়িলেন না। গানের শেষ সুরটি যখন মিলাইয়া যাইতেছে তখন তিনি বলিলেন, "আমার কালো-চোখী কি আশ্চর্য্যি মেয়ে! এইবার তাস খেলবার টেবিলটা নিয়ে এস ত।" ক্যাটেরিনা টেবিলটা টানিয়া আনিয়া তাসগুলি তাহার উপর রাখিল; তাহার পর পরীর মতন ক্ষিপ্রগতিতে স্যর ক্রিষ্টফারের সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাঁহার হাঁটু জড়াইয়া ধরিল। তিনি নীচু হইয়া তাহার গালে আস্তে-আস্তে টোকা দিতে-দিতে হাসিতে লাগিলেন।

লেডি শেভারেল বলিলেন, "ক্যাটেরিনা, কি বোকামি কচ্ছ। যত-সব সেকেলে থিয়েটারী ঢং!—ছাড়লে বাঁচি।" সে চট্ করিয়া উঠিয়া গানের বইগুলি বাজনার উপর গুছাইয়া রাখিল। জমিদার ও তাঁহার গৃহিণী তখন খেলায়

ব্যস্ত; তাহা দেখিয়া সে আস্তে-আস্তে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

গানের সময় কাপ্তেন উইব্রো ছিলেন বাজনার গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আর তরুণ পাদ্রী ঘরের এক কোণে একটা সোফায় শুইয়া। দুইজনই এখন একখানা করিয়া বই লইয়া বসিলেন। মিঃ গিলফিলের হাতে একটা মাসিকের শেষসংখ্যা; কাপ্তেনের হাতে একখানা "Faublas." তিনি গদির উপর পড়িয়া আছেন। ঘরখানি একেবারে নিঃঝুম নিস্তব্ধ। দশ মিনিট আগে এই ঘরই ক্যাটেরিনার সুরের উচ্ছ্বাসে কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

টিনা দালানের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া চলিয়াছে। দালানের মাঝে-মাঝে ছোট ছোট তেলের-বাতির আলোয় অন্ধকারটা একটু সরিয়া-সরিয়া গিয়াছে। ইহার পরে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একটা মস্ত দালান সমস্ত বাড়ীর পূর্ব্বদিকটা জুড়িয়া আছে। ক্যাটেরিনার এইটি একলা আপন মনে বেড়াইবার জায়গা। জানালার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল আলো আসিয়া দেয়ালের গায়ের নানা-রকম আসবাবপত্রের উপর পড়িয়া আলো ও ছায়ার কি একটা অদ্ভুত ধরণের নক্সা কাটিতেছিল। কোথাও একটা গ্রীক মূর্ত্তি, কোথাও বা কোনো রোমান রাজার মূর্ত্তি; এক জায়গায় একটা নীচু দেরাজের মধ্যে নানারকম দুষ্প্রাপ্য জিনিষ সংগ্রহ করা আছে; আর-এক জায়গায় হরিণ মহিষ প্রভৃতির শিং, গরম দেশের নানারকম পাখী সাজানো। বড়-বড় শাঁখ, শামুক, হিন্দু দেবমূর্ত্তি, তলোয়ার, ছোরা, এক-টুকরা বর্ম্ম, রোমান আলো, গ্রীক মন্দিরের ছোট-ছোট প্রতিমূর্ত্তি, এইসব কত হরেক-রকমের সংগ্রহ। তাহাদের উপরে উঁচুতে এই বংশের পুরানো ছবি ঝুলিতেছে - ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের মাথা চাঁছা, গলায় শক্ত ঝালর দেওয়া ছবি, আর একদিকে কত গোলাপী গণ্ডের বাহার; সুন্দরীদের মুখের চাইতে মাথার টুপির বাহার ঢের বেশী; আবার কত বীর পুরুষের ছবি, তাঁহাদের কাঁধ উঁচু-উঁচু, লাল দাড়ি ছুঁচোলো।

বর্ষাবাদলের দিনে স্যর ক্রিষ্টফার সগৃহিণী এইখানে বেড়াইতেন। এখানে বিলিয়ার্ড খেলাও চলিত। কিন্তু সন্ধ্যায় এদিকটায় এক ক্যাটেরিনা ছাড়া আর বড় কাহারও গতি ছিল না। মাঝে-মাঝে আর-একজনেরও ছিল।

সে জ্যোৎস্নার আলোয় এদিক ওদিক পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার ফ্যাকাশে মুখ আর শাদা পোষাকে তাহাকে অতীতের কোনো লেডি শেভারেলের ছায়ামূর্ত্তির মতন দেখাইতেছিল, যেন চাঁদের আলোর মায়া কাটাইতে না পারিয়া আবার এ-জগতে দেখা দিতে আসিয়াছেন।

একটু পরে সে গাড়ী-বারান্দার দিকের জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, সামনের গাছপালা আর সবুজ মাঠের দিকে চাহিয়া দেখিল, কতদূর জুড়িয়া চলিয়া গিয়াছে! চাঁদের আলোয় যেন শীতে আড়ষ্ট হইয়া বিষণ্ণভাবে পড়িয়া আছে।

হঠাৎ একটা গরম নিশ্বাসের হাওয়ার সঙ্গে গোলাপের গন্ধ তাহার দিকে ভাসিয়া আসিল; কে তাহাকে বাহু-বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া একখানা নরম হাতে তাহার ছোট হাতখানি তুলিয়া ধরিল।

ক্যাটেরিনার শরীরের ভিতর দিয়া যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিয়া গেল; একমুহূর্ত্ত সে পাথরের মূর্ত্তির মতন নিশ্চল হইয়া রহিল; পর মুহূর্ত্তেই হাত দুইখানাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের উপর যে একখানা মুখ ঝুঁকিয়াছিল, ক্যাটেরিনা করুণামাখা চোখ দুটিতে ভর্ৎসনা ভরিয়া তাহার দিকে তাকাইল। সে-চোখে হরিণীর আপনা-ভোলা দৃষ্টি আর নাই। ওই দৃষ্টিটুকুতেই দুঃখিনী বালিকার হৃদয়ের কথা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গভীর ভালবাসা ও প্রবল হিংসাই তাহার স্বভাবের সার।

খুব নীচু গলায় কাপ্তেন উইব্রো বলিল, "আমায় ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছ কেন টিনা? ভাগ্য আমার প্রতি বিরূপ বলে' কি তুমি আমারই উপরে রাগ করেছ? যে-মামা আমাদের দুজনের জন্যেই এত করেছেন, তুমি কি চাও যে আমি তাঁর এত সাধের বাসনার পথে বাধা দিই? তুমি ত জানো আমাকে—অর্থাৎ আমাদের দুজনকেই কর্ত্তব্যের কাছে হৃদয় বলি দিতে হবে।"

ক্যাটেরিনা মাটিতে পা ঠুকিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা জানি তা' আর দুবার করে' বলতে হবে না।"

ক্যাটেরিনার মনের ভিতর যে-কথাটি উঁকি মারিতেছিল,

তাহাকে সে এখনও আসরে নামিতে দেয় নাই। মন কেবল বলিতেছিল, "তবে ও আমাকে ভাল বাসালে কেন? যদি আমার জন্যে এতটুকু সংগ্রামও করতে পারবে না জানতো, তবে কেন আমাকে ওর ভালবাসা জানালে।" প্রেম উত্তর দিল, "ক্যাটেরিনা, তুমিও যেমন হৃদয়ের টানে ভালবেসে ফেলেছ, সেও তেমনি না বুঝে তখন জানিয়ে ফেলেছে। এখন কিন্তু তোমার ওকে উচিত পথে চলতে সাহায্য করা উচিত।" মন আবার বলিল, "ওর কাছে সে সব ছেলেখেলামাত্র ছিল; তোমায় ফেলে যেতে ওর কিছু তেমন লাগে না। ও ত' দুদিনের মধ্যেই—সেই সুন্দরীকে ভালবাসবে, আর এই রোগা ফ্যাকাশে মেয়েটাকে একেবারে ভুলে যাবে।"

তরুণ প্রাণটির মধ্যে রাগ হিংসা ও ভালবাসার এইরকম সংগ্রাম চলিতে লাগিল।

কাপ্তেন উইব্রো আর-একটু নরম সুরে বলিতে লাগিলেন, "তা ছাড়া আর-একটা কথাও আছে টিনা; আমি বোধ হয় এ-কাজে সফল হব না। মিস্ আশার, শুনেছি, আর-একজন কাকে পছন্দ করেন। আর তুমি ত' জানই এ ব্যাপারে বিফল হওয়াই আমার একান্ত ইচ্ছা। আমি ভাগ্যহীন কুমাররূপে ফিরে এসে হয়ত দেখব, ইতি-মধ্যেই সুন্দর পাদ্রীটির সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। সে ত' তোমার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। বেচারা! স্যর ক্রিষ্টফার ত' তোমার সঙ্গে গিলফিলের সম্বন্ধ ঠিক করেই রেখেছেন।"

"ও-সব তোমায় কে বলতে বলেছে। নিজের টান নেই তাই যত কথার জাল ফাঁদছ। যাও, আমার কাছথেকে সরে' যাও।"

"টিনা, লক্ষ্মীটি ঝগড়া করে' বিদায় দিও না। এ-সবই হয়ত একদিন কেটে যাবে। হয়ত এমনও ঘট্‌তে পারে যে আমার বিয়েই হবে না। এই রোগেই হয়ত আমার দিন ফুরিয়ে যাবে; তখন আর আমি আর-কারুর স্বামী হব না, জেনে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারবে। কখন যে কি হতে পারে তা কে বলতে পারে বল? বিয়ের পবিত্র বাঁধনে বাঁধা পড়বার আগেই হয়ত আমি স্বাধীন হয়ে যেতে পারি; তখন আমি আমার পাপিয়াটিকেই বরণ করে নেব। সময় হবার আগেই অত ভেবে মরে' কি লাভ?"

"প্রাণে এতটুকু মায়া না থাকলে অমন কথা বলা খুব সোজা। পরে কি হবে না-হবে কে জানে; এখনকার দুঃখই যে সয় না। তা' আমার দুঃখে ত'. আর তোমার কিছু এসে যায় না।" বলিতে-বলিতে টিনার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

অ্যান্টনি হাত দিয়া টিনার কোমর জড়াইয়া, তাহাকে কাছে টানিয়া একেবারে মন-গলানো মিষ্টি সুরে বলিল, "টিনা, তোমার দুঃখে আমার কিছু হয়না?" বেচারী টিনা এই স্পর্শ ও এই স্বরের যেন কেনা দাসী! দুঃখ, ক্রোধ, অতীতের চিন্তা, ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কা কোথায় মিলাইয়া গেল। গত ও আগত সমস্ত জীবন এই একটি মুহূর্ত্তের আনন্দের মধ্যে মিশিয়া অ্যান্টনির চুম্বনে রূপ ধরিয়া উঠিল।

কাপ্তেন উইব্রো ভাবিল, "আহা, বেচারী টিনা! আমায় পেলে ওর কি সুখটাই না হ'ত। কিন্তু মেয়েটা একেবারে পাগল।"

সেই মুহূর্ত্তে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ঘণ্টার উচ্চধ্বনিতে টিনার সুখস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল। মন্দিরের প্রার্থনার সময় হইয়াছে। ঘণ্টা তাই সকলকে ডাক দিতেছে। টিনা ছুটিয়া চলিয়া গেল; কাপ্তেন উইব্রো ধীরে ধীরে তাহার পিছনে চলিল।

মন্দিরের ভিতরের দৃশ্যটি ভারি সুন্দর। পরিবারের সকলে হাঁটু গাড়িয়া পূজায় বসিয়াছে; একজোড়া মোম-বাতির ম্লান কোমল আলো নত দেহগুলির উপর পড়িয়াছে। বেদীর সামনে মিঃ গিলফিল; আজ তাঁহার মুখ অন্য দিনের চেয়ে আরো বেশী গম্ভীর। তাঁহার দক্ষিণ দিকে লাল মখমলের গদির উপর বাড়ীর কর্ত্তা ও গৃহিণী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া; প্রৌঢ় বয়সের গাম্ভীর্য্যমাখা শ্রীতে তাঁহাদের সৌম্য সুন্দর মুখ দুখানি উজ্জ্বল। তাঁহার বাঁ দিকে যৌবনশ্রী অ্যান্টনি ও ক্যাটেরিনার রূপে বিরাজিত। তাহাদের চেহারায় কিন্তু আশ্চর্য্য প্রভেদ। একজনের সুগঠিত দেহের সুন্দর রেখাগুলি ও উজ্জ্বলবর্ণ তাহাকে অমরপুরীর দেবমূর্ত্তির যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল; আর-একজন ছোটখাট শ্যামবর্ণ যেন একটি বেদিয়া বালিকা। লাল-কাপড়-ঢাকা কাঠের

আসনের উপর বাড়ীর ঝি-চাকরের দল বসিয়া ছিল, মেয়েদের মধ্যে বাড়ীর ভাঁড়ারের কর্ত্রী বুড়ী বেলামী গিন্নি দুধের মতন শাদা ধপ্‌ধপে টুপি জামা পরিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া সকলের আগে বসিয়াছে। তাহার সঙ্গেই গৃহিণীর ঝি খিট্‌-খিটে শার্প-গিন্নি সম্প্রদায়ের জাঁকালো পোষাক পরিয়া বসিয়া। পুরুষদের মধ্যে সর্দ্দার চাকর মিঃ বেলামী ও স্যর ক্রিষ্টফারের খানসামা মিঃ ওয়ারেন সকলের আগে।

বন্দনার পরে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল, ঝি চাকরেরা নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ীর লোকেরা ড্রয়িং রুমে গিয়া পরস্পরের শুভ রাত্রি কামনা করিয়া যে যাহার ঘরে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। দুটি মানুষ কেবল ঘুমাইল না। ক্যাটেরিনা বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বারটা বাজিবার পর ঘুমাইল। ক্যাটেরিনা হয়ত কাঁদিতেছে এই ভাবনায় মিঃ গিলফিল প্রায় সারারাত্রি জাগিয়া পড়িয়া রহিলেন।

ক্যাপ্তেন উইব্রো এগারটার সময় খানসামাকে বিদায় দিয়া মধুর নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল; চিকণের কাজ করা বালিশের উপর তাহার সুন্দর মথটি খোদাইকরা একটি মণির মতন দেখাইতেছিল।

(ক্রমশ)

শ্রীশান্তা দেবী।

আলোচনা

"কষ্টি-পাথরে" বাজে দাগ

গত চৈত্র মাসের প্রবাসী "কষ্টিপাথর" স্তম্ভে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহাশয়ের "বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তক কে ?"-শীর্ষক এক মন্তব্য নব্যভারত হইতে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন।

"বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তক কে ?"—ইহা স্থির করিতে যাইয়া, বিদ্যাবিনোদ পদ্মনাথ ১৮৬৮ সাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অতি কৌশলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণী (minute) গুলির আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু যে কয়েকখানি মিনিট স্পর্শ করিলেও অন্ততঃ তাঁহার সংশয়-নিরাশে কালবিলম্ব ঘটিত না, সে কয়খানি তিনি সরাইয়া রাখিয়া মন্তব্য লিখিলেন কেন ? সত্য প্রকাশে এরূপ কৃপণতার প্রকৃত হেতু কি ?

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সমগ্র প্রবন্ধটিতে প্রমাণ করিতে প্রয়াস করা হইয়াছে যে, (১) "বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রবর্ত্তন স্যার আশুতোষের দ্বারাই হইয়াছে"—এই যে সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য, "ইহা বিচারসহ" নহে। (২) "তিনি (স্যার আশুতোষ) সুদীর্ঘকাল ভাইস্‌চ্যান্সেলাররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন। * * * যথোচিত বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতা দেখাইতে না পারিয়া অপ্রশংসারই ভাজন হইয়াছেন।" (৩) "নূতন বিধানে বাঙ্গালা ভাষা যে ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, তাহাতে স্যার আশুতোষের উদ্ভাবিত নূতন কিছু আছে বলিয়া তো দেখা যাইতেছে না।" (৪) পরবর্ত্তী বর্ষের (১৮৯৬) মার্চ্চ মাসে ফ্যাকাল্‌টি অব আর্টস-এর অধিবেশনে * * * বহু আলোচনার পরে এতদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কল্পে একটি কমিটি গঠিত করা হয়, তাহাতেও স্যার গুরুদাস বসেন। স্যার আশুতোষ ঐ কমিটিতে ছিলেন। তবে তিনি যে এ বিষয়ে কোনও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।" ইত্যাদি।

১৮৫৭ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তখন মাত্র প্রবেশিকা ও বি, এ,—এই দুই পরীক্ষার বিধান ছিল। এফ, এ, পরীক্ষার তখন আদৌ সৃষ্টিই হয় নাই। সেই সময়ে প্রবেশিকা এবং বি, এ, পরীক্ষায় বঙ্গভাষা বৈকল্পিক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা এই দুয়ের যেটি যাহার ইচ্ছা লইতে পারিত। ইহাতে একটি কুফল এই হইতেছিল যে, প্রায় অধিকাংশ ছাত্রই বাঙ্গালা লইত, সংস্কৃতের দিকে বড় কেহ যাইত না। ১৮৬১ অব্দে এফ, এ, পরীক্ষার সৃষ্টি হয়, তাহাতেও বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বৈকল্পিক (optional) রূপে নির্ব্বাচিত হয়। শেষে এমন হইয়া উঠিল যে, সকলেই বাঙ্গালা পড়িত, সংস্কৃত কেহই পড়িতে চাহিত না। এই বিষয়ের প্রতিকার-কল্পে ১৮৬৮ অব্দে এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্য হইতে বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু প্রবেশিকায় বাঙ্গালা পূর্ব্ববৎ optional থাকিয়া যায়। ইহার ফলও ঠিক বিপরীত হইল। এফ-এ, বি এতে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বলিয়া প্রবেশিকায় কেহই আর বাঙ্গালা লইত না, সংস্কৃতই পড়িত। সুতরাং প্রবেশিকায় বাঙ্গালা রাহল বটে, কিন্তু সে থাকা, একপ্রকার না থাকারই তুল্য।

এদিকে বঙ্গভাষারও নানারূপ চিন্তাগর্ভ গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে দেশের লোক আবার বাঙ্গালা ভাষাকে তাহার পূর্ব্বাধিকার দিবার দাবী করিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে সে দাবী টিকিল না। পূর্ব্বে কলিকাতায় "অণ্ডারগ্রাজুয়েটস্ এসোসিয়েসন" নামে এক সমিতি ছিল। এ সমিতি হইতে বঙ্গভাষার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আবেদন করা হইল।

১৮৮৭ অব্দের ১৯শে নভেম্বর তারিখে "ফ্যাকলটি অব আর্টস্"-এর মিটিংএ এ আবেদন বিবেচিত হয়। সেই মিটিংএ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ডাক্তার পি, কে, রায় ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার অধিকারী এতদ্দেশীয় এই তিনজন জীবিত আছেন। যোগেশ রায় ঐ পূর্ব্বোক্ত আবেদনে প্রার্থিত বঙ্গভাষা এফ, এ, পরীক্ষায় Second Language রূপে নির্দ্ধারিত করিবার প্রস্তাব করেন এবং ৺গৌরীশঙ্কর দে মহাশয় তাহার সমর্থন করেন। ঐ সভায় স্যার আলফ্রেড ক্রফট, কে, এম, ম্যাকডোনেল প্রমুখ পাঁচজন সাহেব ও মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অধিকারী, মহামহোপাধ্যায় ৺নীলমণি মুখোপাধ্যায়, ৺কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ১৪ জন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। ইহা সত্ত্বেও খিদিরপুরনিবাসী যোগেন্দ্র ভোটে হারিয়া যান। বাঙ্গালা ভাষার দ্বার রুদ্ধই থাকিয়া যায়। (Minute for 1887-88. P. 163)

তারপর, ১৮৯১ সালের ১৪ই মার্চ্চ সিণ্ডিকেট-সভায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয়ের সমস্ত আর্টস্ পরীক্ষায় অর্থাৎ এফ-এ, বি-এ, ও এম-এ পরীক্ষায় বঙ্গভাষার প্রচলনের প্রস্তাব

করেন। স্যার আশুতোষ মাত্র বঙ্গভাষার কথা বলিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি বলিয়াছিলেন যে, যাহারা সংস্কৃত Second Language লইবে তাহাদের বাঙ্গালা হিন্দি বা উড়িয়া ইহার কোন একটি ভাষাতে পাঠ্য পুস্তকের পরীক্ষা দিতে হইবে। এ সময়ে স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাইস্‌চেন্‌সলার। এই দিনের সিণ্ডিকেটেও স্যার গুরুদাসই সভাপতি ছিলেন। স্যার আশুতোষের ঐ প্রস্তাবগুলি "ফ্যাকলটি অব আর্টস্" কমিটিতে বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়। (Minute for 1890-91. P. 414 15.)

তারপর ১৮৯১ অব্দের ১১ই জুলাই-এর ফ্যাকল্টি অব আর্টস্ সভায় সিণ্ডিকেট হইতে প্রেরিত আশুতোষের ঐ প্রস্তাবাবলী পুনরুত্থাপিত হয়। সিণ্ডিকেট এবং 'ফ্যাকলটি অব আর্টস'এর এই মিটিংএর মধ্যে প্রায় চারিমাস কাল ব্যবধান ছিল। বাঙ্গালাভাষা যাহাতে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিতে না পারে, এ পক্ষে বঙ্গের সুসন্তানগণের অনেকে এই চারিমাস কাল চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করেন নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ফ্যাকলটি মিটিংএ ভাইসচান্সেলর স্যার গুরুদাস উপস্থিত হন নাই। এই সভায় স্যার আশুতোষ প্রস্তাব করেন যে, "সিণ্ডিকেট হইতে প্রেরিত মদীয় প্রস্তাবিত বঙ্গভাষা প্রভৃতি, আর্টস পরীক্ষায় নির্ব্বাচন বিষয়ে বিবেচনার নিমিত্ত শিক্ষিত একটি কমিটি গঠিত হউক।" এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, গৌহাটির বিদ্যাবিনোদ, শ্রীমান্ অজয়ের বাঁকিপুরের প্রবন্ধ মাত্র অবলম্বন না করিয়া, যদি একবার মিনিটখানা খুলিয়া দেখিতেন,—তাহা হইলেই দেখিতে পাইতেন যে, স্যার গুরুদাসের কন্‌ভোকেশন্ অভিভাষণ হইতে তিনি যেটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন, স্যার আশুতোষও ঐ অংশ তদীয় প্রস্তাবের মধ্যে তুলিয়া বলিয়াছিলেন—Sharing the view thus set forth, and believing that the time has come when the University should take action in the matter, I beg to submit for the consideration of the syndicate the following propositions :—

ফ্যাকলটির এই মিটিংএ স্যার আশুতোষের এই প্রস্তাব লইয়া যে বিষম মতভেদ হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই অনেকটা প্রচার হইয়া পড়ে। এই দিন যদি ভাইস্‌চান্‌সেলর স্যার গুরুদাস উপস্থিত থাকিতেন,—তবে হয় ত বঙ্গভাষার "অদৃষ্ট প্রসন্ন" হইতে এত কালবিলম্ব ঘটিত না। স্যার গুরুদাসের অনুপস্থিতিতে, স্যার আল্‌ফ্রেড ক্রফট এইদিন সভাপতির কার্য্য করেন। এই মিটিংএ সর্ব্বসমেত ৩০ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন,—তন্মধ্যে ৪ জন ইংরেজ এবং ২০ জন বাঙ্গালী। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্যার আশুতোষের প্রস্তাব সমর্থন করেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়, স্বর্গীয় রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, ডাক্তার ম্যাকডোনেল্ড, মি. আনন্দমোহন বসু, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ১১ জন ব্যক্তিও স্যার আশুতোষের প্রস্তাব অনুমোদন করেন,—কিন্তু মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, স্যার আল্‌ফ্রেড ক্রফট, বাবু সারদাচরণ মিত্র, নবাব আবদুল লতিফ প্রভৃতি অবশিষ্ট সভ্যের বিরুদ্ধতায় স্যার আশুতোষের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। বঙ্গভাষা দীর্ঘকালের জন্য বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হন। (Minute for 1891-92, p. 56 57.) ১৮৮৭ অব্দে "আণ্ডার গ্রাজুয়েট্‌স্ এসোসিয়েসনের" আবেদনানুসারে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষাকে এফ-এ পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিবার প্রস্তাব করিয়া যখন ভোটের যুদ্ধে পরাজিত হন, তখন দেশের মধ্যে একটা বেশ হুলস্থূল পড়িয়া যায়। সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যবহারে দুঃখিত হন। সাময়িক সংবাদপত্রাদিতেও, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বঙ্গসন্তানগণের এই অদ্ভুত আতিথ্যে নানা আলোচনা আরম্ভ হয়। বাঙ্গালা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনঃপ্রবিষ্ট হউক, দেশের লোকের এই সঙ্গত অভিলাষের বা ন্যায্য দাবির প্রতিচ্ছবি তাই অতি স্পষ্টভাবে স্যার গুরুদাসের কন্‌ভোকেশন-অভিভাষণে দেখিতে পাওয়া যায়। লোকমতের অথবা কোন মতের প্রতিকূলতা করা বা প্রতিকূল কথা বলা ত দূরের কথা, যতটা সম্ভব, সৌজন্যের সুমিষ্ট আবরণে মণ্ডিত করিয়া অনুকূল মত প্রকাশ করা স্যার গুরুদাসের প্রকৃতিসিদ্ধ। তাই দেশের তদানীন্তন অধিকার-প্রার্থনার প্রতিধ্বনি আমরা স্যার গুরুদাসের অভিভাষণে শুনিতে পাই। কন্‌ভোকেশনের অভিভাষণে স্যার গুরুদাস বঙ্গভাষা সম্বন্ধে যেরূপ অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই মন্তব্যানুসারে স্যার আশুতোষ যখন বঙ্গভাষার পুনঃপ্রচলনের জন্য প্রয়াস করিতে লাগিলেন, তখন যদি স্যার গুরুদাস ঐরূপ অনুকূল থাকিতেন তাহা হইলে স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট প্রভৃতি শ্বেত পুরুষগণের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও স্যার আশুতোষের প্রস্তাব পরিগৃহীত হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে স্যার গুরুদাস সেদিন উপস্থিত হন নাই। সুতরাং অনুকূল প্রতিকূল কোন দিকেই তিনি ধরা পড়েন নাই।

ইহার পর দেশের সভাসমিতিগুলির দু'একটিতে বঙ্গভাষার পুনঃপ্রচলনের আলোচনা যে না হইয়াছে তাহা নহে। তবে সে সকল আলোচনার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্পর্ক নাই।

তার পর ১৯০৪ অব্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধির কথা—সে যে কাহার কতটা কৃতিত্ব, তাহা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের আলোচনা না করিলেই শোভন হইত। উক্ত রেগুলেশনে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যতালিকায় বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া, আসামী, উর্দ্দু, বার্ম্মিজ, আর্ম্মানি, তিব্বতীয় ও খাসিয়া ভাষায় রচনার (composition) প্রথা সন্নিবিষ্ট করিয়া উক্ত নূতন বিধানের কর্ত্তা স্যার আশুতোষ তদীয় দীর্ঘকালের অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। অথবা শুধু ইহাই নহে—ম্যাট্রিকুলেশনে যাহারা ইতিহাস লইবে, তাহারা ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতিতে উত্তরপত্র পর্য্যন্ত লিখিতে পারিবে, এই বিধান করিয়া স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীচ্য সৌধে প্রাচ্যের বাগ্‌দেবতার সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ম্যাট্রিকুলেশন, এফ-এ, বি-এ তিনটি পরীক্ষাতেই বাঙ্গালা ভাষা পাঠ্য করিয়া স্যার আশুতোষ, সেই ১৮৯১ অব্দের পরাজয়ের প্রতীকার করিয়াছেন; আজীবন যাহা অভিপ্রেত, তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, গণিত, দর্শন প্রভৃতিতে যদি পর্য্যাপ্তরূপে বাঙ্গালা গ্রন্থ থাকিত, তবে তাহা যে উচ্চপরীক্ষা-সমূহের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচন করিতে স্যার আশুতোষ দ্বিধা করিতেন না, তাহা তদীয় পুস্তকনির্ব্বাচনের ব্যাপার দেখিলেই বুঝা যায়। I. A. পরীক্ষায় লজিকের পাঠ্য তালিকায় ছয়খানি ইংরেজী পুস্তকের পার্শ্বে "তর্কবিজ্ঞান" নামক একখানি বাঙ্গালা পুস্তকের নাম আজ কয়েকবৎসর দেখিতে পাইতেছি। (Calendar 1916, Part I. p. 370.) প্রতি বর্ষে হাজার হাজার ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশনে, ইতিহাসের উত্তরপত্র স্ব স্ব মাতৃভাষায় লিখিতে পাইতেছে,—এইসমুদয় তথ্য ত কাহারই অবিদিত নহে, তবে বিদ্যাবিনোদ পদ্মনাথের এমন দিগ্‌বিভ্রম ঘটিল কেন?

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

কষ্টিপাথরে বাজে দাগ (প্রত্যুত্তর)

বিগত মাঘ-সংখ্যক 'নব্যভারতে' মুদ্রিত মদীয় প্রবন্ধ-বিশেষ হইতে আহরণ-পূর্ব্বক চৈত্রের প্রবাসীতে "বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তক কে?" এই শীর্ষক যে আলোচনাটুকু প্রকাশিত হইয়াছিল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "কষ্টিপাথরে বাজে দাগ" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু প্রবাসীর পাঠক মহাশয়গণ 'নব্যভারতের' সমগ্র প্রবন্ধ হয়তো অনেকেই পাঠ করেন নাই। তাই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতিবাদের আলোচনা এখানে একটু বিস্তৃতভাবে করিতে হইল, নচেৎ তদীয় প্রতিবাদের সারবত্তা কতটুকু তাহার অবধারণ করিতে সমর্থ হইবেন না।

বাঁকীপুর সাহিত্য-সম্মিলনে আমি উপস্থিত ছিলাম। মাননীয় স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়কে সভাপতির পদে বৃত করিবার প্রস্তাবকালে তাঁহার অতিপ্রশংসাবাদ হইয়াছিল। 'নব্যভারত' (মাঘ ১৩২৩) পত্রিকায় "বাঁকীপুর সাহিত্য সম্মিলন" এই শীর্ষক প্রবন্ধে আমি তৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলাম—

"যে স্থলে 'ভূতার্থব্যাহৃতি'ই যথেষ্ট, সেস্থলে স্তুতিবাদ অনাবশ্যক—বিশেষতঃ তাহা যদি অমূলক হয়, তবে বাস্তবিকই বিরক্তির কারণ ঘটে। স্যর আশুতোষ সম্বন্ধে তাদৃশ একটি কথা বারংবার শ্রুত হইল; সেটি এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রবর্ত্তন স্যার আশুতোষের দ্বারাই হইয়াছে। বিদ্যাভূষণ (সতীশচন্দ্র) প্রমুখ ব্যক্তিগণের উদ্যোগে স্যার আশুতোষের যে মর্ম্মর দেহার্দ্ধ (bust) বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহে সংস্থাপিত হইয়াছে তাহার নিম্নে পশ্চাদ্ভাগে লেখা হইয়াছে—

His noblest achievement surest of all,
The place of his mother-tongue in step-mother's hall.

(সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তার ইহাই নিশ্চয়।
মাতৃভাষা স্থান পায় বিমাতা-আলয়॥)

ইহা কতদূর বিচারসহ দেখা যাউক।" নব্যভারত, মাঘ, ২৩; ৬০৪ পৃঃ।

এই বলিয়া আমি বিষয়টির আলোচনা করিয়া দেখাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতেই বঙ্গভাষা ছিল—১৮৬৮ অব্দের পর এফ্ এ বি এ পরীক্ষায় পুরুষ পরীক্ষার্থিগণের পক্ষে বাঙ্গালা-সাহিত্য-পাঠ প্রতিষিদ্ধ হইল—কিন্তু স্ত্রীগণের তথা প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বসাধারণের তাহা অব্যাহত থাকে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই-সকল কথার একপ্রকার সমর্থনই করিয়াছেন।

তারপর এই যে পুনঃপ্রবর্ত্তন, ইহাতেও স্বস্তিবাচন পূজাপাদ স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৯১ অব্দে তদীয় ভাইস্‌চ্যান্সেলারের অভিভাষণে করেন। তারপর বঙ্গীয় সাহিত্য-পারিষদ স্থাপিত হইলে তাঁহাতে ১৮৯৪ অব্দে প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় যে "প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিত ভূগোল ও ইতিহাস বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় পরীক্ষা গৃহীত হউক এবং এফ্ এ, বি-এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত হউক।" এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় স্যর গুরুদাস তাহাতে অগ্রণী ছিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিষদ যে আবেদন করেন, তাহার লেখার ভার স্যর গুরুদাসের উপরে অর্পিত হয়, ফেকাল্টি অব্ আর্ট্‌স্ সভায় স্যর গুরুদাস ঐ আবেদন পেশ করেন—তাহাতে যে কমিটি গঠিত হয় তন্মধ্যে স্যর গুরুদাস ছিলেন, ঐ কমিটির রিপোর্টে স্যর গুরুদাসের নাম সর্ব্বাদৌ ছিল এবং স্যার গুরুদাসের প্রস্তাবেই ঐ রিপোর্ট পরিগৃহীতও হয়। অবশেষে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসের সিনেট্ সভায় যে চূড়ান্ত প্রস্তাব হয় তাহাতেও সমর্থকরূপে স্যর গুরুদাস ছিলেন। ইহার ফলে তখন এফ্-এ ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনা প্রবর্ত্তিত হয়।

তারপর বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় যে কমিশন হয়—সেই কমিশনে স্যর গুরুদাস থাকিয়া বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশভাষা যাহাতে অবশ্যপাঠ্য হয়, তদ্বিষয়ে মন্তব্য নিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়-বিষয়ক আইন অনুসারে স্যর আশুতোষের অধিনায়কত্বে (ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত) এক কমিটি কর্ত্তৃক নিউ রেগুলেশন্‌স্ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে যে ভাবে বাঙ্গালা প্রভৃতি ঢুকিয়াছে, তজ্জন্য স্যর আশুতোষ স্বয়ং এমন কি করিয়াছেন যে তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাকে এইরূপ স্তুতিবাদ করা যায়। বরং ব্যক্তিগতভাবে স্যর গুরুদাসের একটা দীর্ঘ প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে—এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও তজ্জন্য আন্দোলন করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

আরও একটু নূতন কথা এখানে বলিতে হইল। বাঁকীপুর-সম্মিলনে স্যর আশুতোষ সভাপতি ছিলেন—সাহিত্য-শাখার অধিবেশনেও তিনি উপস্থিত থাকিবেন—ইহাই সম্ভাবিত ছিল। শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সাহিত্য-শাখায় "বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গভাষা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার আদ্যন্ত স্যর আশুতোষের প্রশংসাবাদে পরিপূর্ণ থাকিলেও যাহা ছিল তাহা শুনিয়া নায়কের শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি-বাবু স্পষ্ট বলিয়াছিলেন "অজয় তো আশুবাবুর খুব স্তুতিগান করিয়াছে—কিন্তু যদি কোনও ব্যক্তি এই বঙ্গভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকে—তবে সে তো গুরুদাস বাবু।" ফলতঃ অজয় বাবুর প্রবন্ধ হইতেই আমি আমার এতদ্বিষয়ক বক্তব্যের বহুকথা সংগৃহীত করিয়াছিলাম—সুদূর গৌহাটিতে থাকিয়া স্যর গুরুদাসের বক্তৃতার ও কমিশনের রিপোর্টের উদ্ধৃতাংশ আমি তেমন সহজে পাইতে পারিতাম না—বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনিট্‌সগুলির সন-তারিখও জানিতে পারিতাম না।

এখন শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধের আলোচনা করিব। তিনি তদীয় প্রবন্ধের প্রথমেই একটা ভুল করিয়াছেন। "বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালাভাষার প্রবর্ত্তক কে?" এই প্রশ্ন আমি করি নাই—এটা প্রবাসী-সম্পাদক-মহাশয়ের প্রদত্ত শিরোনাম—তাহা নব্যভারতখানি পড়িয়া দেখিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন। যাহা হউক তাহার প্রবন্ধে তিনি দু-একটি নূতন কথা শুনাইয়াছেন—যাহা বাস্তবিক আমি জানিতামই না—অজয়-বাবুর প্রবন্ধে এইগুলির কোনও উল্লেখ না থাকাই আমার না জানার কারণ। আমার বিশ্বাস ছিল অজয়-বাবু যখন স্যর আশুতোষের সাক্ষাতে উহা পড়িবেন বলিয়া লিখিয়াছেন—এবং যখন উহাতে স্যর আশুতোষের ভূয়সী প্রশংসা—(অনেকটা খাপছাড়া ভাবেও) আছে, তখন তিনি পারতপক্ষে স্যর আশুতোষের পক্ষে যাহা যায় তাহা বলিতে ত্রুটি করেন নাই। বিশেষতঃ তিনি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসেই কাজ করেন। তবে ইহাও বক্তব্য যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় নূতন কথা যাহা শুনাইলেন, তাহাতে স্যার আশুতোষের স্তুতিসমর্থক বিশেষ কিছু নাই। ঐ কথাগুলির আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম কথা এই যে ১৮৮৭ অব্দে বঙ্গভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আণ্ডার গ্রাডুয়েট্‌স্ এসোসিয়েসান হইতে আবেদন করা হয়। প্রার্থনার বিষয় ছিল, এফ-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালাভাষা সেকেণ্ড লেঙ্গুয়েজ (second language) করা। এই আবেদন অগ্রাহ্য হয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয়

তত্ত্বপক্ষে বলেন "বাঙ্গালা ভাষার দ্বার রুদ্ধই থাকিয়া যায়" অন্যত্র ; বলেন "সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যবহারে দুঃখিত হন" ইত্যাদি। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে কি হইত ? না—কেহ আর এফ-এ ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত নিত না ; কেননা প্রবেশিকায় যদিও বাঙ্গালা ছিল, এফ-এ তে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বলিয়া প্রায় সকলেই প্রবেশিকার পরীক্ষায় সংস্কৃত লইত। বি-এ-তে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য ছিল না—তৎপরিবর্ত্তে গণিত ও ইতিহাস ছাত্রেরা নিতে পারিত। অতএব, এফ, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালা সেকেণ্ড লেঙ্গুয়েজ হইলে এন্ট্রেন্স ও বি-এ পরীক্ষায় কেহ সংস্কৃত নিত কিনা সন্দেহ। প্রবন্ধের প্রথমাংশে বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিন্তু এতাদৃশ কথাই বলিয়াছেন—"সেই সময়ে (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অবস্থায়) প্রবেশিকা এবং বি, এ, পরীক্ষায় বঙ্গভাষা বৈকল্পিক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল—সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা এই দুইএর যেটি-যাহার ইচ্ছা লইতে পারিত। ইহাতে একটি কুফল এই হইতেছিল, প্রায় অধিকাংশ ছাত্রই বাঙ্গালা লইত, সংস্কৃতের দিকে কেহ যাইত না" ইত্যাদি। তবে প্রথমে যাহা 'কুফলদায়ক বলিয়া বর্জ্জিত হইল, তাহা এক্ষণে প্রত্যাশাত হওয়াতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের (এবং তন্মতে দেশবাসী 'সকলেরই') পরিতাপের কারণ কি ? ফল কথা বিষয়টা তেমন উল্লেখযোগ্যই নয়—তাই অজর-বাবুর প্রবন্ধে তাহা ছিল না। বিশেষতঃ ইহাতে স্যর আশুতোষের স্তুতি-বাদেরও কোনওরূপ সমর্থন হয় না। তবে বিদ্যাভূষণ মহাশয় কেন উল্লেখ করিলেন, তাহারও কারণ তদীয় প্রবন্ধেই পাঠক, মহোদয়গণ দেখিতে পাইয়াছেন। স্যর গুরুদাস কন্‌ভোকেশনে যে (১৮৯১ অব্দে) বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার প্রচলনার্থে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব একটু খর্ব্ব করা। সে সম্বন্ধে পশ্চাৎ বলা যাইবে।

দ্বিতীয় অভিনব কথাটি এই যে, ১৮৯১ অব্দের মার্চ্চ মাসে সিণ্ডিকেটে স্যর আশুতোষ প্রস্তাব করেন যাহারা সংস্কৃত সেকেণ্ড লেঙ্গুয়েজ (second language) লইবে, তাহাদের বাঙ্গালা প্রভৃতি স্বীয় মাতৃভাষাতে পাঠ্য পুস্তকের পরীক্ষা দিতে হইবে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বেশ কৌশলে কথাটি পাড়িয়াছেন। অণ্ডার গ্রাজুয়েটস্ এসোসিয়েশনের বিষয়টা বলিয়াই "তারপর" দিয়া স্যর আশুতোষের এই প্রস্তাবটির কথা তুলিয়াছেন। তবে জলজীবন্ত সত্য কথাটা একেবারে ধামা চাপা দেওয়া যায় না—তাই শেষে স্যর গুরুদাসের কন্‌ভোকেশন বক্তৃতার কথাটা উল্লেখমাত্র করিয়া, চোখ রাঙ্গাইয়াছেন যে কনভোকেশনের বক্তৃতার কথাটি যখন উল্লেখ করা হইয়াছিল, তখন স্যর আশুতোষের উক্তিটি বাদ দেওয়া কেন হইল ! (স্যর আশুতোষের উক্তির অনুল্লেখের কারণ ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে) যেন কনভোকেশনের বক্তৃতার সঙ্গে ইহার নিত্য সম্বন্ধ ! যাহা হউক এখন ইহার আলোচনা দ্বারা সেই ত্রুটি সংশোধন করিতেছি। ১৮৯১ অব্দের ২৪শে জানুয়ারি তারিখের কন্‌ভোকেশনে স্যর গুরুদাস বলেন—

"I also deem it not merely desirable but necessary that we should encourage the study of those Indian Vernaculars that have a literature by making them compulsory subjects of our examinations in conjunction with their kindred classical languages" ইত্যাদি। ইহার মাত্র সাত সপ্তাহ পরে স্যর আশুতোষ সিণ্ডিকেট সভায় উল্লিখিত প্রস্তাব করিয়াছিলেন—তাহাতে স্যর গুরুদাসেরই স্পষ্ট প্রতিধ্বনি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তখন স্যর আশুতোষ নূতনকল্পে সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ—হাইকোর্টে উকীলভাবে প্রবেশোন্মুখ—ফি সবেমাত্র ঢুকিয়াছেন। স্যর গুরুদাসের তখন পূর্ণ প্রতিপত্তি—স্যর আশুতোষ হয় তাঁহারই ইঙ্গিতে, নয় তাঁহারই প্রীত্যর্থে, তাঁহার কথাটা যাহাতে কাযে পরিণত হয় তদুদ্দেশ্যে, প্রস্তাবটি করিয়াছিলেন। তার পর এই প্রস্তাবে তখনও অনেক প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তির, বিশেষতঃ ইংরেজ রাজপুরুষগণের আপত্তি ছিল ;—বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেছেন "এই প্রস্তাব লইয়া যে বিষম মতভেদ হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই অনেকটা প্রচার হইয়া পড়ে।" ফলতঃ স্যর গুরুদাস, এই প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্ভাবয়িতা হইলেও তিনি কস্মিন্ কালেও আপনার মত নিয়া জেদ প্রকাশ করা সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই—আজকাল যেমন চোখ রাঙ্গাইয়া ধমক দিয়া দল পাকাইয়া সভাস্থলকে বেয়ার গার্ডেনে (Bear garden) পরিণত করিয়া নিজের জেদ বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা কোনও কোনও সময়ে দেখিতে পাইয়াছি, স্যর গুরুদাসের আমলে তাহা ছিল না। যাহা হউক তখন স্যর এল্‌ফ্রেড ক্রফট্ ফেকাল্টি অব্ আর্টসএর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ; সুতরাং স্যর গুরুদাস উপস্থিত থাকিয়াও উক্ত সভায় প্রিসাইড (Preside) করিতে পারিতেন না ; ক্রফট সাহেবই করিতেন। তাই সম্ভবতঃ তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বকই ঐ সভায় উপস্থিত হন নাই। ফেকাল্টির মিটিংএ ভাইস্ চ্যানসেলারএর উপস্থিতি বিধেয় নহে ; কারণ ভাইস্ চ্যান্‌সেলার যখন উক্ত মিটিংএ সভাপতিত্ব করিতে পারিতেন না তখন তাঁহার উপস্থিতি এনোমেলাস (anomalous) হইত। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার এই অনুপস্থিতি নিয়া বেশ একটু কটাক্ষপাত করিয়াছেন—ইহাতে স্তুতি-নিন্দায় অবিচলিত স্যর গুরুদাসের কোন হানি হইবে না। তিনি (স্যর গুরুদাস) উপস্থিত থাকিলেও সভাপতি হইতেন, একথা যে ভিত্তি-শূন্য তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবং তিনি সভাপতি হইলেও যে ৩৫ জনের মধ্যে ১৮ জন (অন্ততঃ) তাঁহার দিকে ভোট দিতেন, স্যর গুরুদাসের রীতি-প্রকৃতি যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা কখনই এটা বিশ্বাস করিবেন না—তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্যর গুরুদাসের কন্‌ভোকেশন বক্তৃতায় অণ্ডার গ্রাজুএট এসোসিয়েশনের আবেদন উপলক্ষে আন্দোলনের একটা প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইলেন—কিন্তু ঐ এসোসিয়েশনের প্রার্থনীয় বিষয় ছিল, বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে লইতে পারিবার অধিকার প্রদান ; স্যর গুরুদাস ইহাকে সংস্কৃতের সঙ্গে রাখিয়া অবশ্যপাঠ্য করিবার জন্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে 'প্রতিচ্ছবিই' বা হইল কিরূপে ?

যাহা হউক ঐ যে ১৮৯১ অব্দের পরাজয় ইহা প্রকৃতপক্ষে স্যর আশুতোষের নহে—স্যর গুরুদাসেরই। তিনি কিরূপে পরাজয়ের প্রতীকার করিয়াছিলেন, সে কথাও এ স্থলে বলিতেছি। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহা চাপিয়া গিয়াছেন ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রবর্ত্তিত আন্দোলন লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় তিনি বলিতেছেন, "ইহার পর দেশের সভাসমিতিগুলির দু-একটিতে বঙ্গভাষার পুনঃ প্রচলনের (এখন আর 'প্রবর্ত্তন' বলেন না) আলোচনা যে না হইয়াছে এমন নহে," ইত্যাদি ! অথচ সাহিত্য-পরিষদের আন্দোলন এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন "সে-সকল আলোচনার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও সম্পর্ক নাই !" বটে ? যদীয় যে প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতেছেন, তাহাতেই তো স্পষ্ট আছে পরিষদের আবেদনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্, এ, ও বি এ-তে বাঙ্গালা রচনা প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি আণ্ডার গ্রাজুএট্‌স্ এসোসিয়েশনের ক্ষণিক ও অনর্থক প্রয়াসের সগৌরবে উল্লেখ করিলেন (কেননা তাহাতে স্যর গুরুদাসকে কিছু খর্ব্ব করা হয় কিনা চেষ্টা ছিল)—আর সাহিত্য-পরিষদের বর্ষত্রয়ব্যাপী (অন্ততঃ আংশিক) সফল প্রয়াসের উল্লেখ অনাবশ্যক মনে করিলেন—কেননা—সে কথা আর বলিব না। অথচ আমার উপর "প্রকৃত তথ্য গোপনের" একটা অভিযোগ ঠিক এই প্রসঙ্গেই করা হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষদের আন্দোলনে স্যর গুরুদাস মনঃপ্রাণ ঢালিয়া যোগ প্রদান করেন—তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। তিনি ও অপর চারিজন সদস্য মিলিয়া যে সার্কুলার পত্র দেন, তাহাতে পরিষদের অভিপ্রায় বিশদভাবে বিবৃত হয়। এই পত্রের উত্তরে দেখা যায় যে পূর্ব্বে (বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লেখানুসারে) যাঁহারা স্যর আশুতোষের (অর্থাৎ স্যর গুরুদাসের) প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের মতের একটা মূল্য আছে তাদৃশ সকলেই (যথা ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ৺নীলমণি ন্যায়লঙ্কার, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র) পরিষদের প্রস্তাবে অনুকূল মত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তারপর পরিষদ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পত্র প্রেরিত হয় এবং যাহার ড্রাফ্‌ট্ করিবার ভার স্যর গুরুদাসের উপরে অর্পিত হয়, তাহাতে প্রার্থনা ছিল—

"That at the F. A. Examination and at the B. A. Examination in the A course where a classical language is taken as the third subject a paper be set containing (i) passages in English for translation into one of he vernaculars of India recognized by the Senate, (ii) a subject of original composition in one of the said vernaculars, text books being recommended as mode s of style."

ইহার সঙ্গে আরো অনুরোধ ছিল :

"That the Vice-chancellor and the syndicate will be pleased to consider how far under present circumstances the second recommendation may be given effect to."

সেই second recommendation ছিল—

"That the University be moved to adopt a regulation to the effect that in History, Geography and Mathematics of the Entrance Examination, the answer may be given in any of the living languages recognised by the senate."

তারপর স্যর গুরুদাস যে ইউনিভারসিটি কমিশনে ছিলেন তাহার রিপোর্টে এই ছিল—

"Para 95—We consider that the establishment of Professorships in the vernacular languages is an object to which university funds may properly be devoted. We also think that vernacular composition should be made compulsory in every stage of the B. A. Course, although there need be no teaching in the subject.

অতএব নিরপেক্ষ পাঠকমহোদয়গণ দেখুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান রেগুলেশনে বঙ্গভাষা সম্বন্ধে যাহা যাহা আছে, তাহার মূল কোথায়।

পূর্ব্বতন প্রবন্ধে আমি বলিয়াছিলাম যে এই রেগুলেশন সঙ্কলনে স্যর আশুতোষের কৃতিত্ব খুবই আছে। তথাপি বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেছেন এ বিষয় নাকি আমার আলোচনা না করিলেই শোভন হইত; কিন্তু আমার আলোচনা এ স্থানে আরও একটু করা আবশ্যক মনে করিতেছি। এই যে নূতন রেগুলেশন হইয়াছে তাহা গঠনের ভার সিনেট্ সভার উপর পড়ে; তজ্জন্য দেড় বৎসর সময় দেওয়া হইলেও সিনেট সভা কাজ শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই—অথচ এড্‌ভোকেট জেনারেলের মতানুসারে আর সময়ও গবর্ণমেন্ট্ দিতে পারিলেন না। সিনেট্ সভা কাজ কতদূর করিয়াছিলেন, আমরা তাহা সবিশেষ অবগত নই—এবং বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধীয় বিধিগুলির কতটা সিনেটের দ্বারা হইয়াছিল তাহাও জানা আমাদের এক্ষণে অসাধ্য। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মহাশয়গণ এতৎসম্বন্ধে তথ্যাবগতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯০৫-১৯০৬ সালের নিয়মগুলি পাঠ করিতে পারেন; তবে সিনেট কর্ত্তৃক রেগুলেশনের কাজটা যে প্রায় সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছিল—তাহার আভাস গভর্ণমেণ্ট্ এর ১৯০৬ অব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখের ৬০০ নং রিজোলিউসন হইতেই যেন বুঝা যায়। যাহা হউক স্যর আশুতোষ অসাধারণ ভাগ্যবান্—এখন নূতন রেগুলেশনে যাহা দেখা যায় সমস্তই তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক বলিয়া খ্যাপিত হইয়া আসিতেছে। হউক, ক্ষতি নাই—কিন্তু রেগুলেশনে যাহা আছে, তাহাতে তদীয় উদ্ভাবনা কিছু আছে কি না, পরিষদের আবেদনপত্র ও কমিশনের মন্তব্য (উভয়ত্র স্যর গুরুদাসের সম্পর্কও দ্রষ্টব্য) পড়িয়া পাঠকসাধারণ বিবেচনা করিয়া দেখুন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় যদি ১৯০৪ অব্দের বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক আইনের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের শাসাইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে দুইটি কথা মনে রাখিতে বলিব; প্রথম ঐ আইনে (এক্‌টে) বঙ্গভাষার কোনও বিশেষ কথা নাই—দ্বিতীয়তঃ আইনটি অচ্ছিদ্র করিবার জন্য যখন ভেলিডেশন একট্ (Act II of 1905) কাউন্সিলে প্রবর্ত্তিত হয় তখন লর্ড কর্জ্জনের বক্তৃতায় আইন সঙ্কলনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি যে মন্তব্য প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা বিশেষ গৌরবসূচক নহে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় আর একটি কথা নূতনকল্পে বলিয়াছেন; সেটি 'তর্কবিজ্ঞান' পাঠ্য হওয়ার কথা। তিনি জানেন কি না জানেন, ঐ গ্রন্থখানি গৌহাটি সাহিত্যানুশীলনী সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল—ঐ সভার সঙ্গে এ অধমের একটু জন্য-জনক সম্বন্ধও ছিল। তাই ঐ গ্রন্থের নাম পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়াতে আমরা শ্লাঘ্যম্মন্যই হইয়াছিলাম। ইহাতে গ্রন্থকার সম্মানিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই—কিন্তু লাভবান্ কতদূর হইয়াছেন জানি না। লজিকে কোনও নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ পাঠ্য নাই—ছয়খানি পুস্তকের নাম আছে—ঐগুলির মধ্যে এক বা ততোধিক গ্রন্থ পড়ান বা না পড়ান অধ্যাপকের ইচ্ছাধীন। তর্কবিজ্ঞান অধীত বা অধ্যাপিত হইতে পারেনা—ইহার প্রধান কারণ এই যে উত্তর যখন ইংরেজী ভাষায় লিখিতে হইবে, তখন লজিকের পারিভাষিক শব্দগুলির ইংরেজী সংজ্ঞায় অভ্যস্ত না হইলে চলিবে না—'Barbara' স্থলে একটি তর্কবিজ্ঞানোক্ত 'কামাখ্যা' লিখিলে উত্তর গ্রাহ্য হইবার কথা নহে। স্যর আশুতোষ যদি (মেট্রিকুলেশনে ইতিহাসের ন্যায়) বাঙ্গালায় লজিকের উত্তর প্রদানের অধিকার দিতে পারিতেন, তবে বুঝিতাম 'বঙ্গভাষার' প্রকৃত উপকার হইত।

এতাদৃশ পুস্তক সম্বন্ধে বিশ্ববিদালয় কমিশনের রিপোর্টে ছিল—Further encouragement might be given by the offer of prizes for literary and scientific works of merit in the vernacular languages. স্যর আশুতোষ এস্থলে তাহা করিলেই শোভন হইত। গ্রন্থকারেরও লাভ হইত—অপরেও এতাদৃশ গ্রন্থ লিখিতে উৎসাহিত হইত। যাহা করিয়াছেন, তাহাতে কাগজে-কলমে দেখায় বেশ কিন্তু বঙ্গভাষার উপকার অথবা গ্রন্থকারের আর্থিক লাভ বেশী কিছুই হয় নাই। আর বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে বলেন অর্থনীতি মনোবিজ্ঞান গণিত দর্শন প্রভৃতিতে বাঙ্গালা পুস্তক থাকিলে তাহা উচ্চপরীক্ষাসমূহে পাঠ্য হইত—এবিষয়ে আমার প্রশ্ন এই যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ইত্যাদি বিষয়ের পাঠ্য হইবার পুস্তক কি নাই? নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক শ্রেণীতে কোন্ ভাষার পুস্তক পাঠ্য হইত? শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরীর 'দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা,' ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের 'বেদান্ত লেকচারস্' পাঠ্য হইতে পারিয়াছে কি? ফল কথা, তর্ক-

বিজ্ঞানের গ্রন্থকার—স্যার আশুতোষের নাকি সমপাঠী—ধরিয়াছিলেন, তাই গ্রন্থখানি পাঠ্য হইয়া গেল।

বিশেষ চিন্তা করিয়া অথবা মাতৃভাষার উন্নতিবিধান করিব - এইরূপ প্রতিজ্ঞাপর হইয়া স্যর আশুতোষ কস্মিন্ কালে কোনও কাজ করিয়াছেন বলিয়া তো দেখা গেল না। ১৮৯১ সালের ক্ষণিক চেষ্টা—স্যর গুরুদাসের ছন্দানুবর্ত্তন মাত্র; বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানেও স্বাধীন ভাবে মৌলিক কিছু করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। তর্কবিজ্ঞান পাঠ্য করাতেও কোনও 'ফিক্সড্ প্রিন্সিপল্‌স ফলো' (fixed principles follow) করা হয় নাই বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে। এইরূপ আকস্মিক কাজ দ্বারা কেহ সভাজনযোগ্য হইতে পারেন কিনা নিরপেক্ষ মহোদয়গণ বিচার করুন।

মাতৃভাষায় যাঁহার গাঢ় অনুরাগ থাকিবে, তিনি ঐ ভাষায় লেখা-পড়াতে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিবেন নিশ্চয়ই। স্যর আশুতোষের তাদৃশ কিছু তো দেখা যায় নাই। সভাপতিরূপে তৎপঠিত নানা অভিভাষণ যিনি বা যাঁহারা লিখিয়া দিয়াছেন তাঁহারা নাকি প্রকাশ্যেই সেকথা লোকের নিকটে বলিয়া বেড়াইতেছেন! নানাভাষায় সুপণ্ডিত অসাধারণ মেধাবী স্যর আশুতোষের এই অপটুতাই প্রমাণ করিতেছে—মাতৃভাষায় তাঁহার প্রকৃত অনুরাগ কতটুকু।

যাহা হউক এই অপ্রীতিকর আলোচনা উপসংহার করিবার পূর্ব্বে বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে একটি কথা বলিব। তাঁহার প্রবন্ধে এই অধমের প্রতি নানারূপ বক্রোক্তি প্রয়োগ হইয়াছে। প্রবন্ধে গালি দেওয়া ভদ্র-রীতিবিরুদ্ধ।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে আমরা স্যর আশুতোষের পরীবাদকারী নহি—'নব্যভারতে' (মাঘ ১৩২৩) বাঁকীপুর সম্মিলন বিষয়ক প্রবন্ধটি পড়িলেই পাঠকমহাশয়গণ দেখিবেন যে মুক্তকণ্ঠে নানা বিষয়ে তাঁহার প্রশংসাবাদ করা হইয়াছে।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

বঙ্গে কৃষির সামগ্রী ও চড়ক।

গত মাসের প্রবাসীতে "বঙ্গে কৃষির সামগ্রী" পড়িতে পড়িতে কয়েকটা কথা মনে হইল। লেখক পরিশ্রম করিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু লেখার কতখানি স্বয়ং-জ্ঞান, এবং কতখানি পর-জ্ঞান, তাহার নিদর্শন দিলে ভাল করিতেন। "Crystalline soil অথবা দানাদার মৃত্তিকা" কি রকম, বুঝিতে পারিলাম না। "এই মাটিতেও ফস্ফরিক এসিড, নাইট্রোজেন, ও জৈব পদার্থের অভাব সত্ত্বেও, উত্তম রূপে জল পাইলে ইহার উর্ব্বরতা পলি মাটি অপেক্ষা কোন অংশে হীন বলিয়া মনে হয় না।"—ইহাও বোধগম্য হইল না। কারণ জল দ্বারা ঐ তিনের পূরণ হইতে পারে কি?

শালি-জমি অর্থাৎ ধান-জমি তিন চারি বৎসর অন্তর দূরে থাক, দশ বার বৎসর অন্তর একবার পতিত রাখিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু বঙ্গদেশে কোথায় পতিত থাকে, জানাইলে ভাল হইত। যদি কোথাও থাকে, বোধ হয় লোক অভাবে থাকে, কিংবা পোমায় নী বলিয়া থাকে। ইচ্ছা করিয়া, জমির তেজ বাড়াইবার আশায়, পতিত রাখা হয় কি না, সন্দেহ।

'একার' মাপ বঙ্গে অজ্ঞাত। বিঘায় বলিলে ভাল হইত। "গম, যব, বার্লি, ডাউল"—যবের ইংরেজী নাম 'বার্লি'। তবে যদি oats শব্দের অনুবাদে 'যব' হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'জই' বলিলে ভাল হইত। 'জই' নাম চলিত আছে। কিন্তু বঙ্গে জইর চাষ নগণ্য। "ফসল" আর "শস্য" একই। নদীয়া জেলায় রবী ফসলকেই 'ফসল' বলে। সে জেলায় ধান কলাই 'ফসল' নহে। অর্থাৎ 'রবী'টুকু লোপে 'ফসল'। 'ডাউল' নহে, 'ডাইল'। এসব অবান্তর কথা। আমার প্রয়োজন, পাট। "স্মরণাতীত কাল হইতে যে বাঙ্গলায় পাট চাষ চলিয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।" কথাটা এত সোজা নহে; অন্ততঃ আমার ঘোর সন্দেহ আছে। অবশ্য শাগের নিমিত্তে, কি ঔষধের নিমিত্তে দুই এক কাঠা 'নালীকা' বা নালীতার চাষের কথা বলিতেছি না। দোড়ীর জন্য পাটের চাষ দুই শত বৎসর পূর্বেও ছিল কি? বিষয়টা অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। বিশ্বাস হইয়াছে, বিদেশী বণিকের প্ররোচনায় এদেশে পাট চাষ হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে অদ্যাপি 'গাছ-পাট' নাম আছে। কারণ পাট বলিলে তুৎ-পাট বুঝায়। সেখানে তুৎ-পাটের অর্থাৎ রেশম পাটের চাস হইত। ওড়িয়ায় 'ঝট' নহে, 'ঝূট' বলে। সংস্কৃত 'জূট' হইতে। (আমার শব্দকোষে ভুল হইয়াছে।) ইংরেজীতে jute শব্দের মূলও এই। কিন্তু অল্পদিন হইতে ওড়িশায় 'ঝূট'-চাস আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে তাহাও অধিক স্থানে নহে, 'কঙরিআ' (এই ঙ ঠিক ঙ পড়িতে হইবে। কামরাঙিয়া?) গাছের চাষ হইত। অদ্যাপি মানভূম, সম্বলপুর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে মরাঠা প্রদেশে চাষ হয়। মানভূমে বলে 'কুদরম', বাঙ্গলায় নদীয়া জেলায় বলে 'কোষ্টা'। 'কোষ্টা' জবাদিবর্গের গাছ। কোষ্টার চাষও বেশী দিনের বোধ হয় না। অন্ততঃ সংস্কৃতে কোষ্টার উল্লেখ নাই। যেমন সং'পট্ট' সাদৃশ্যে 'পাট', তেমন সং'কোষ'—গুটার তসর সাদৃশ্যে 'কোষ্টা'। কোনও কালে গাছ পাটের অংশ হইতে "চরকার দ্বারা সূতা" কাটা হইত, গাছ পাটের "পরিধেয় মোটা বস্ত্র" হইত, "কাপড় তৈয়ার" হইত, এ-সব কেহ লিখিয়া থাকিলেও সহজে বিশ্বাস করিতে পারিব না। বহু পূর্ব্বকাল হইতে, অন্ততঃ তিন হাজার বছর হইতে শণ চাষ আছে। লেখক শণ ভুলিয়া গিয়াছেন! সেকালে দোড়ী সূতা কাপড়, এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ 'দুকূল', নিমিত্ত (অতসী=) তিসীর চাষ ছিল। এখন পুরাণের কথায় দাঁড়াইয়াছে। হয়ত লেখক শণ ও আধুনিক পাট এক মনে করিয়া ফেলিয়াছেন। নতুবা, "পাট হইতে গুণ-চট" বলিলে সোনার পাথর-বাটী বলা হয়। "তুঁতগাছে রেশম পালন করা হয়।"—অনবধানে লেখা।

"চড়ক"—সম্বন্ধেও দুই-এক কথা বলি। ফার্সী 'চর্খ' শব্দ থাকুক, সংস্কৃত 'চক্র' হইতে 'চড়ক' মনে করি। ইহার উৎপত্তি কবে, তাহা

জানি না। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা ধর্ম্মমঙ্গলাদি পড়িলে অনুমান হইবে। ওড়িষ্যাতেও 'চড়ক' আছে। নাম কিন্তু 'ঝাম-ঝাঁপ'। অর্থ আগুনে ঝাঁপ দেওয়া। (সং ধ্মা ধাতু হইতে ধাম-ঝাম; তু' ঝামা ইট)। এই সেদিন কটক শহরেও 'ঝাম-ঝাঁপ' হইয়া গেল। সহরে আগুনের লেশ নাই। গ্রামে আছে, চড়ক আছে; সেই নানারূপ কৃচ্ছ্র করা আছে। এ প্রদেশে গর্ত্তে আগুন করিয়া সেই আগুনের উপর দিয়া চলা চড়কের এক অঙ্গ। আমি দেখি নাই, অনেকের মুখে শুনিয়াছি। গামার গাছ কাটা, বাণ ফোড়া, সন্ন্যাসী হওয়া ইত্যাদির সহিত লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতীর 'শালে ভর' তুলনা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ চড়ক পূজা হিন্দুর নহে; উহা ধর্ম্মের গাজন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'আলোচনা' সম্বন্ধেও কিছু বলিবার ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সময়াভাব।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সৌভাগ্য

কোন দিন কোন ফুল হায়,
নাহি ফোটে বাগানে আমার।
রোপিলে মরিয়া উঠে গাছ;
শুধু মোর বোনা হয় সার।
হঠাৎ আজিকে ভোর বেলা
যেতেছিনু বাগানের মাঝে,
পাশে দেখি নামহীন গাছে
ছোট্ট এক ফুল ফুটে আছে।
কত যত্নে বোনা ফুল-গাছে
না ফুটিল কিছুতেই ফুল।
অলক্ষিতে পড়ে' এক বীজ,
সৌভাগ্যের জন্মিল মুকুল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

মাকাল ফল

(ভিক্তরিয়াঁ সার্দু'র মূল ফরাসী গল্প হইতে)

নববর্ষের দিন সকলের উপহার দেবার ঘটা দেখে আমার অনেক দিন আগেকার নগর-অবরোধের কথা মনে পড়ে গেল। সে ব্যাপারটায় আমি বেশ একটু খ্যাতি লাভ করেছিলাম বলে গর্ব্ব করে থাকি।

আপনারা নগর অবরোধের কথা শুনে যেন এইখানেই থেমে যাবেন না। আপনাদের কেল্লাতেও যেতে হবে না, যুদ্ধক্ষেত্রেও না। আমি একটু এগিয়ে আপনাদের আমার অনেক কালের বন্ধু ত্রিতেইর বাড়ীতে নিয়ে যাব। ত্রিতেইর বাড়ী রিউ ত্রেভিসে, সেখানে তার মস্ত ওষুধের দোকান। ওষুধ ছাড়াও অনেক রাসায়নিক জিনিষ তাতে বিক্রী হত। ত্রিতেইএর সুখ চারপোয়া পূর্ণ ছিল। ত্রিতেই-গৃহিণী খাসা মানুষ, তাঁদের মেয়েটিও চমৎকার, যেমন দেখ্‌তে তেমনি স্বভাব। বন্ধুর কাজকর্ম্মের হাত খুব ভাল, আর দেশ-ভক্তিটা বেজায় প্রবল, তবে তাঁর রাজনৈতিক মতামত-গুলোতে বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত না। মোটের উপর দেখ্‌তে গেলে এমন মানুষ দুনিয়ায় মেলে না।

যুদ্ধের গোড়াতেই বন্ধুবর পোঁটলাপুঁটলী বাঁধছিলেন, সহর থেকে সরে' পড়বার জন্যে, কিন্তু তাঁর জিনিষ গোছান শেষ হবার আগেই শত্রুরা পারী ঘিরে বসে' গেল। তিনি তখন জিনিষপত্র আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে এই মনে করে' নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লেন যে অবরোধটা আট দিনের বেশী থাকতেই পারে না। গৃহিণী বৃথা ভাবনায় সময় না কাটিয়ে কাজে লেগে গেলেন, না খেয়ে মরতে না হয় তা ত দেখা চাই? তিনি বাড়ীতে এত রসদ জমা করে' ফেল্লেন যে শত্রুরা আট দিন ছেড়ে যদি আট মাসও বসে' থাকৃত, তা হলেও ওঁদের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হয়ে মরবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। বাগানখানাতেও একটা গোয়াল, একটা মুরগীর ঘর আর একটা শূয়োরের খোঁয়াড় তৈরী করে' তবে গৃহিণী ক্ষান্ত দিলেন।

যত দিন যেতে লাগ্‌ল জিনিষেরও দর ততই চড়তে লাগ্‌ল। তবে আমার একটা বড়-রকমের সুবিধা ছিল, বৃহস্পতিবার আর রবিবার বিকেলে গিয়ে বন্ধুর বাড়ী খেয়ে

আসতাম, সারা সপ্তাহের ক্ষতিপূরণ ঐ দুদিনেই করতাম। এমন দুঃখের দিনে অমন চপ কট্‌লেটের মুখ দেখলে কার না মন মজে' যায়? দ্যিতেই-এর ওষুধগুলো আর তার খাবারগুলো যে একই লোকের হাত থেকে বেরচ্ছে তা বুঝবার কোনই উপায় ছিল না।

খাবার নিমন্ত্রণ ও-বাড়ীতে কেবল আমার একলারই হত না। আর-একজনের খাবার জায়গাও রোজ আমার পাশেই হত। দ্যিতেই-এর দোকানের প্রধান কর্ম্মচারী আনাতোল্ রিশো। তার বয়স কমই, তবে কাজে কর্ম্মে খুব ওস্তাদ; একহারা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, মুখখানা সব সময়ই বিষণ্ণ। অনেক দিন থেকেই বেচারা তার মনিবের মেয়ে গারত্রিদের কাছে হৃদয় হারিয়ে বসে' আছে, আর সে খবরটা মহিলাটিরও জানতে বাকি ছিল না। কর্ত্তাগিন্নির যদিও এ সম্বন্ধে আনাতোলের সঙ্গে কোন কথাই হয়নি, তা হলেও ব্যাপারটা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁদের অমতও বিশেষ কিছু ছিল না। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে বরং ভালই, একমাত্র মেয়ে, তাকেও দূরে পাঠাতে হয়না, তা ছাড়া কারবারের সুবিধা ত আছেই। সবই ক্রমে ভালর দিকেই এগোচ্ছিল, এমন সময় কোথাথেকে এই যুদ্ধ এসে জুট্‌ল! আনাতোলকে দেশরক্ষার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিতে হল, তাদের ছাউনি পড়ল সঁ্যা দেনিতে। নিজের যা কাজ তা সে ঠিকমতই করে' যেত, কোন্ জিনিষই বা সে বেঠিক করে? কিন্তু কাজে তার কোন উৎসাহ ছিল না, মনে-মনে সে তার সুখের পথের কাঁটা এই অবরোধটাকে অভিশাপ দিত। কখনও যদি কোথাও যুদ্ধের সমালোচনা আরম্ভ হত, আনাতোল তাতে ভদ্রভাবেই ভাচার কথা বল্‌তে চেষ্টা করত, কিন্তু তার কথার ঝাঁঝটা পরিষ্কার ধরা পড়ে যেত।

এ-রকম ব্যবহারে দ্যিতেই ক্রমেই আনাতোলের উপর চটে' উঠছিল,—সে হল গিয়ে মহা দেশভক্ত, তার উপর পারীর সৈন্যাধ্যক্ষ ত্রোকিয়্যর পরম বন্ধু। আর-একটা জিনিষ মাঝে পড়ে' তার রাগ বাড়িয়ে দিলে। পারীর প্রধান খবরের কাগজ ল্য তাঁ। তাতে পরে-পরে কতগুলো প্রবন্ধ বেরচ্ছিল, যুদ্ধের যা-কিছু ব্যবস্থা হয়েছে সমস্তকে খুব কষে' গাল দিয়ে। কি-রকম হলে যে ঠিক হয় তারও একটা নক্সা এঁকে দিতে সম্পাদক মশায় ছাড়েন-নি, সেটাতে কিন্তু তাঁর মস্তিষ্কের অবস্থা সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ হতে পারে। এই প্রবন্ধগুলো দ্যিতেই-এর বেজায় মনে ধরে' গেল। তিনি পারীর একখানা ম্যাপ্ কিনে, তার উপর ছোট-ছোট নিশান সাজিয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নির্দ্দেশমত আপন মনেই খুব যুদ্ধ করে' যেতে লাগলেন। কোন্ দল কখন্ এগোচ্ছে, কে পেছচ্ছে, তা নিয়ে তাঁর উৎসাহ কি! তাঁর জয়লাভ যে কিরকম সুনিশ্চিত সে খবরও তাঁর কাছে আমরা মাঝে-মাঝে পেতাম। আনাতোলের যেমন কপাল, সে একদিন বলে বসল যে ওরকমভাবে যুদ্ধ চালালে জিতবার সম্ভাবনা কিঞ্চিৎ কম। দ্যিতেই ত একেবারে চটেই খুন! আমরা মাঝে পড়ে কোনওরকমে তাদের শান্ত করলাম, কিন্তু দ্যিতেই তার প্রধান কর্ম্মচারীর ও-হেন যুদ্ধকৌশলের প্রতি অবিশ্বাস দেখে মনে-মনে চটেই রয়ে গেল।

* * *

আর একটি নূতন অতিথির আবির্ভাবে ব্যাপার আরও সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল। বিকেলে আমার ওদের বাড়ী পৌছতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, গিয়ে দেখি দ্যিতেই গৃহিণীর ডান দিকে, আমার কায়েমী জায়গায় একটা কে অজানা লোক বসে' রয়েছে। মুখের রং তার লাল টক্‌টকে, মস্ত জোয়ান, খুব উঁচু গলায় কথা বলছে। যা-কিছু বলছে সবই তার নিজের কথা, তার জাঁক দেখে কে! একটা কাপ্তেনের পোষাক তার গায়ে, সেটাও এমনি অদ্ভুত, যে, দেখলেই মনে হয় কোনো থিয়েটারের সাজ-ঘরের ফেলে-দেওয়া জিনিস। আর পায়ের জুতোরই বা কি বাহার! এক এক পাটী এমন বড় যে তার ভিতর একটি বাছুর স্বচ্ছন্দে বসে' থাকতে পারে। ব্যক্তিটি যে একজন মস্ত বীর-পুরুষ, তা তাঁকে দেখলেই সবাই বুঝতে পারবে।

দ্যিতেই পরিচয় করে' দিলেন "ইনি হচ্ছেন ম্যস্যিয় রোবিয়ার, কুরবিভোয়ার নগররক্ষী সৈন্যদলের কাপ্তেন।"

আমি তখন মাংসের ঝোল খেতেই ব্যস্ত, কে তখন কাপ্তেন সাহেবের সঙ্গে কথা বলে? এই বীরপুরুষগুলির কাজ ছিল, সহরতলীর যত বাড়ী থেকে লোকজন

পালিয়ে গিয়েছে, সেই-সব বাড়ীর জিনিষপত্র সরানো। কি জানি শত্রুরা যদিই লোভে পড়ে সেগুলো লুট করতে আসে! আমাদের খাবারে ভাগ বসাতে আসাতে আমি একটু চটে' গিয়েছিলাম, দ্যিতেই গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলাম "এই লোকটিকে জোটালেন কোথা থেকে?" তিনি আমার কথার উত্তরে উচ্ছ্বসিতভাবে এক লম্বা কাহিনী বলে' গেলেন। সকাল বেলা বুলভার পোয়াসোনায়েরএ যেতে গিয়ে তিনি রাস্তায় পড়ে' গিয়েছিলেন, বরফ পড়ে' রাস্তা বেজায় পিছল হয়ে ছিল। কাপ্তেন রোবিয়ার তখন ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দ্যিতেই গৃহিণীকে তুলে কাছেরই এক ডাক্তারখানাতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর সেখান থেকে বাড়ী নিয়ে এসেছেন। কৃতজ্ঞতা দেখানোর জন্যেও ত তাকে বাড়ীতে একবার খেতে বলা উচিত? গৃহিণীর কথা শুনে আমি একটু আশ্বস্ত হলাম। ভাবলাম, এই একবার বই ত নয়, এর পর বীরপুরুষ নিজের পথ দেখবেন এখন।

লোকটি মোটেই বোকা নয়। তার নাকি একখানা কয়লার জাহাজ আছে, তাতে করে' সে সারা ইউরোপ ঘুরে এসেছে। সমুদ্রযাত্রার গল্পও করলে ঢের। এখন যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে জাহাজখানা পারীতে ফিরে এসেছে, দেশ রক্ষার জন্যে সেটা দরকার। এসবও তবু সয়ে ছিল, কিন্তু তার পর সে নিজের আর তার নগররক্ষী সৈন্যদলের যে-সব বীরত্বের কাহিনী বলতে সুরু করলে, সেগুলো বিশ্বাস করা নেহাৎ বোকার পক্ষেও অসম্ভব। শত্রুরা একেবারে দমে' গিয়েছে, তাদের আর কোনো ক্ষমতাই নেই। রোবিয়ার সাহেব যদি নিজের নগররক্ষী সৈন্যদলের মত সাহসী আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর পাঁচ হাজার সৈন্য পান, তা হলে শত্রুসেনাকে একেবারে সগার পার করে' দিয়ে আসতে পারেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। দ্যিতেই-গৃহিণী বেশ ধীরভাবেই গল্প শুনে যাচ্ছিলেন। ওগুলোকে বিশ্বাস করতে দ্যিতেই-এর খুবই লোভ হচ্ছিল বটে, তবে যার ঘটে এক ফোঁটাও বুদ্ধি আছে সে আর কি করে' ওরকম গাজাখুরি কথা বিশ্বাস করে? গ্যারত্রিদ্ একেবারে চুপ্‌চাপ্ বসে'। কাপ্তেন সাহেবের গল্প সম্বন্ধে তার কোন উৎসাহই দেখা গেল না। আর আনাতোল বেচারা ত কাপ্তেন সাহেবের পাশে বসে' তার জ্যোতিতে একেবারেই ম্লান হয়ে গিয়েছিল। একে ত তার সৈনিকের পোষাকটা তার গায়ের মাপের চেয়ে অনেক বড় হওয়াতে, তাকে ঠিক একটি কাপড়ের পোট্‌লা মনে হচ্ছিল, তার উপর আবার একটু সর্দ্দিজ্বর-মতন হওয়াতে তার চেহারা অন্য দিনের চেয়ে ঢের বেশী রোগা আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। কাপ্তেন রোবিয়ার মাঝে-মাঝে আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বেশ দু'চারটা কথার খোঁচা লাগাচ্ছিলেন।

লোকটার জাঁক আর সইতে না পেরে, আমি একটা ছুতো করে' টেবিল থেকে উঠে গেলাম; ভাবলাম, যাক্ আজকের দিন ত শেষ হয়ে গেল, হতভাগাটা বোধ হয় আর আস্‌বে না। কিন্তু দেখলাম বেশ ভুল করেছি। বৃহস্পতিবারে গিয়ে দেখি সে দিব্যি জমিয়ে বসে' আছে, রবিবারেও সেই অবস্থা! তারপর যখনি যাই দেখি সে বাড়ীর লোকদের সঙ্গে খেতে বসে গিয়েছে।

দ্যিতেই-পরিবারটি ত একেবারে তার গুণে মুগ্ধ। দ্যিতেই গৃহিণী ত তার রসিকতায় আর সসম্মান ব্যবহারে একেবারে গলে' গিয়েছেন, আর অত-বড় কাপ্তেনের ম্যাপের উপর লাল নিশান নিয়ে যুদ্ধ করার আশ্চর্য্য ঝোঁক দেখে দ্যিতেইও বেজায় খুসী। আনাতোল বেচারা ক্রমেই নগণ্য হয়ে উঠতে লাগ্‌ল, কাপ্তেনই তার জায়গা দখল করে নিল। শরীরটাও তার খারাপ হয়ে গিয়েছে, সর্দ্দি-জ্বর আর ছাড়েই না।

"বুর্জে"র যুদ্ধের পর আনাতোলের প্রতিপত্তি আরও কমে' গেল। সে নিজের কাজ প্রাণ দিয়েই করেছিল, ডানহাতখানাও সঙ্গীনের খোঁচায় একেবারে ঘায়েল। তার দিন দুই পরে খেতে এসে সে যুদ্ধের গল্পই করছিল, কেমন করে' তাদের সেনাপতি বেকল্ শেষ অবধি তার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে লড়তে লড়তে মরেছেন, কেমন করে' তারপর সব হট্‌তে লাগল, সবই সে বিষণ্ণ নিরুৎসাহ ভাবে বলে' যাচ্ছিল। কাপ্তেন সাহেবের বীরের রক্ত গরম হয়ে উঠ্‌ল, তিনি আর-একটু হলেই আনাতোলকে ভীরু কাপুরুষ বলে গাল দিয়ে উঠতেন। নেহাৎ বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নির মুখ চেয়ে তা করলেন না, কিন্তু গোটাকয়েক কথা শোনাতে ছাড়লেন না। তাঁর নগররক্ষী সৈন্যদল যদি

ওখানে থাক্‌ত, তা হলে ব্যাপারটা যে একেবারেই অন্যরকম দাঁড়াত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কোন্ পথ দিয়ে, কোন্ পাহাড়ের আড়াল, কোন্ নদীর ধার দিয়ে, কখন্ ডাইনে এগিয়ে, কখন্ বাঁদিকে পিছিয়ে গেলে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী হ'ত তা তিনি চট্‌পট্ বলে' যেতে লাগ্‌লেন। দ্যিতেই ত একেবারে উৎসাহে আত্মহারা! বেচারা আনাতোল মাথা নীচু করে' বিবর্ণ মুখে চুপ্ করে ছিল, তার ক্ষতবিক্ষত হাতখানা তখন তাকে বড়ই যাতনা দিচ্ছিল। গ্যারব্রিদ্ একদৃষ্টে তার দিকেই চেয়েছিল, আর আমি টেবিলের সব কজনেরই মুখ ভাল করে' দেখে নিচ্ছিলাম।

পরদিন তার জ্বর খুব বেড়ে উঠ্‌ল, অনেকদিন বিছানায় পড়ে থাক্‌তে হল, কাজেই দুতিন সপ্তাহ তাকে দ্যিতেইদের খাবার টেবিলে দেখা গেল না। কাপ্তেন সাহেব কুমারী গ্যারব্রিদের পাণিগ্রহণ করবার ইচ্ছা জানালেন, কর্ত্তাগিন্নি তখুনি অবশ্য কোনো পাকা কথা দিলেন না, তবে তাঁদের ধরণধারণে বোঝা গেল যে তাঁদের বিশেষ আপত্তি নেই। আনাতোলের যেদিন জ্বর ছাড়্‌ল, সে-দিনই সে এসে হাজির। আমিও সেদিন গিয়েছিলাম, গ্যারব্রিদের লাল চোখ দেখে বুঝলাম যে মায়ে মেয়েতে একটা ঝগড়াঝাঁটী হয়ে গেছে। দ্যিতেই-গৃহিণী ত এখন রোবিয়ারের নামেই অজ্ঞান। ব্যাপার দেখে আমি বুঝলাম এইবার আমাকে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে হবে, তা না হলে এই তরুণ তরুণী দুটির সমূহ বিপদ। সেদিন বছরের শেষদিন, সকলেই নববর্ষের গল্প করছিল, সেদিন এই বাড়ীতে একটা মস্ত ভোজ হবার কথা আছে।

কাপ্তেন হঠাৎ দ্যিতেই-গৃহিণীর দিকে ফিরে বলে উঠ্‌ল, "ভাল কথা, দেখুন কাল্‌কে আমি আপনাকে একটা খুব আশ্চর্য্যরকমের নববর্ষের উপহার দেব।"

তার কথা শুনে আমার মাথায়ও একটা ফন্দি গজিয়ে উঠল।

* * *

নববর্ষের দিন আমরা বিকেলবেলা ও-বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। দ্যিতেই ত আদর-আপ্যায়নে আমাদের একেবারে অস্থির করে তুল্‌ল। আমরা সকলেই এক-একখানা নূতন গল্পের বই পেলাম, ম্যাস্‌সিয় দ্যিতেই-এর নববর্ষের উপহার। আনাতোল দিন কয়েক আগে ফাঁদ পেতে একটি খরগোষের বাচ্চা ধরেছিল, সেইটিই সে উপহারস্বরূপ এনেছে। আর কাপ্তেন রোবিয়ারের উপহার সত্যিই আশ্চর্য্য। জর্ম্মান-সৈন্যেরা যে-রকম লোহার টুপী পরে, সেইরকম একটা টুপীতে করে' সে একগাদা চোকোলেট্ বিস্কুট নিয়ে এসেছে। এসেই সে হাস্‌তে-হাস্‌তে বাড়ীর গিন্নিকে বল্‌ল, "দেখুন এই যে টুপীটা দেখছেন, চোকোলেট্ বিস্কুটের বদলে ঐ টুপীর অধিকারীর মাথাটাও আমি ইচ্ছে করলে নিয়ে আস্‌তে পারতাম।" দ্যিতেই-গৃহিণী চম্‌কে উঠে বল্‌লেন, "সে কি? আপনি তাকে মেরে ফেলেছেন নাকি?" কাপ্তেন বললেন, "তা যা হোক, আমি জোর করে' বলতে পারি যে এমন চোকোলেটের বাক্স যে-সে দিতে পারে না।"

তার পর আরম্ভ হল তার গল্প, সে আর শেষই হয় না। কেমন করে' সে একটা পিপের ভেতর ওৎ পেতে বসে ছিল, ঐ টুপীর অধিকারী জর্ম্মন সৈন্যটিকে কেমন হঠাৎ আক্রমণ করে' উল্টে ফেলে দিয়েছিল, তারপর ধস্তাধস্তি করে কেমন ক'রে তার গলা টিপে মেরেছিল, পিস্তল ছোড়েনি পাছে শত্রু-শিবিরে খবর পৌঁছে যায়। আনাতোলের খরগোষটাও ফাঁদ পেতে ধরা এবং গলা টিপে মারা বটে, কিন্তু ও-হেন জয়চিহ্নের পাশে সেটা নেহাৎই মাঠে মারা গেল।

তখন আমি বল্‌লাম, "কাপ্তেনের সমকক্ষতা করবার মুরোদ যদিও আমি রাখি না, তা হলেও আমারও একটি নূতন ধরণের উপহার আছে। যাক্ সেটা এখনও এসে পৌঁছয়-নি, আমার মতে ত আর দেরী না করে' এখন খেতে বসাই ভাল।"

আমার সঙ্গে সবাই একমত হওয়াতে খেতেই বসা গেল, ভোজটা জম্‌ল তোফা। রান্নাটা সেদিনকার খুবই ভাল হয়েছিল।

খাওয়াটা হয়ে যাবার পর যখন বসে' কেউবা কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছি কেউবা সিগারেট ধরিয়েছি, এমন সময় একজন চাকর এসে খবর দিল যে, একজন গোলন্দাজ সৈন্য আমার উপহার নিয়ে এসেছে, সেটা বস্‌বার ঘরে রাখা হয়েছে।

সবাই বসবার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম, দেখি জিনিসটা একটা টেবিলের উপর রয়েছে, ঝক্‌ঝকে রূপোলি কাগজে জড়ানো, আর একটি নীল চওড়া রেশমী ফিতে দিয়ে বাঁধা।

দিত্যেই-গৃহিণী হাসিমুখে বললেন, "এটা কি হতে পারে?"

আমি বল্‌লাম, "ভেবে তা আপনারা কিছুতেই ঠিক করতে পারবেন না, আমিই বলে দিচ্ছি, এটা একটা বোমা।"

"সে কি? বোমা!"

আমি বল্‌লাম, "দিত্যেই অনেকবারই আমাকে বলেছে যে তার একটা বোমা পাবার খুব ইচ্ছে—অবিশ্যি এমন জিনিষ যার কাজ হয়ে গিয়েছে। তাই আমার অনুরোধে আমার বন্ধু রোলাঁ, তিনি গোলান্দাজদের সেনাপতি, আমাকে এইটে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটা নাকি আর্দ্রেঁা উপত্যকায় এসে পড়েছিল, তারপর আর কেউ ওটার খোঁজখবর করেনি, মাটিতে পোঁতা পড়েই ছিল।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে আমি নীল ফিতেটা খুলে, কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেল্‌লাম, বোমাটা বেরিয়ে পড়ল, ঘোর কালো রং, মরণের দূতের মতনই তার ভীষণ চেহারা।

দিত্যেই লাফিয়ে উঠে বল্‌ল, "বাহাবা! খাসা জিনিস, আমার সৌখীনজিনিষের আল্‌মারীর এটা খুবই শোভা বাড়াবে।"

দিত্যেই গৃহিণী জিনিসটা দেখে অবধি একটু অস্বস্তি অনুভব করছিলেন, তিনি বল্‌লেন, "কিন্তু দেখ, ওটা যদি না ফুটে গিয়ে থাকে?"

আমি বল্‌লাম, "মিছে ভয় পান কেন? আমি রোলাঁকে খুব ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছি যে বেশ ভাল করে ফুটে গিয়েছে, যার ভেতর বারুদ, কি অ্যাশিড্ কিছু নেই, এমন ছাড়া অন্য-রকম বোমা যেন কিছুতেই না পাঠায়। এই যে তার চিঠিও রয়েছে দেখছি, এটা পড়লেই ত সব আপদ চুকে যায়।"

বোমাটার গায়েই একখানা চিঠি লট্‌কানো ছিল, আমি সেটা খুলে নিয়ে চেঁচিয়ে পড়বার উপক্রম করলাম, কিন্তু প্রথম লাইন পড়েই আমার মুখে বোধহয় ভয় আর বিস্ময়ের চিহ্ন খুব ভাল করেই ফুটে উঠ্‌ল, কারণ সকলেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বল্‌ল, "কি ব্যাপার? কি হয়েছে?"

আমার গলা দিয়ে তখন আর স্বর বেরচ্ছে না, আমি হাঁপাতে-হাঁপাতে বল্‌তে লাগলাম, "কি সর্ব্বনাশ! আমি এখন... শোন একবার কাণ্ডটা," বলে' আমি চিঠিখানা তাদের পড়ে শোনালাম। তাতে এই ছিল—

প্রিয় বন্ধু,

তুমি একটা বোমা চেয়েছিলে তাই এটা পাঠালাম। কিন্তু তখন হাতের কাছে কোনো গোলান্দাজকে পেলাম না, কাজেই ওটা ফুটিয়ে দিতে পারিনি। তুমি ওটাকে থিয়েটারে যাবার রাস্তায় যে বন্দুকপিস্তলের দোকান আছে, সেইখানে নিয়ে যেও, তারা এটাকে বেশ ভাল করেই খালী করে দিতে পারবে। কিন্তু দেখ, খুব সাবধান। কোনও রকম ধাক্কা কি ঘষ্‌ড়ানি যেন কিছুতেই না লাগে, এমন কি একটা কাগজের ঘষ্‌ড়ানি লাগ্‌লেই ওটা ফেটে যাবে। ইতি·

ঘরের সকলে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। দিত্যেই-গৃহিণীর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, তিনি বল্‌তে লাগলেন, "শিগ্‌গির ওটা নিয়ে যাও। ওরে বাবারে কি ভীষণ কাণ্ড! আমার ঘরের ভিতর বোমা!"

"তাইত, কি সর্ব্বনাশ," বলে' আমি সেটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালাম।

"এই, এই, কি কর? খবরদার ওটায় হাত দিয়োনা।"

আমি তখন হঠাৎ খুব বুদ্ধিমানের মত বলে উঠ্‌লাম, "তার আর কি, যে লোক ওটা নিয়ে এসেছে, সেই ওটা নিয়ে যাবে।"

দরজার কাছে একটা চাকর দাঁড়িয়েছিল, সে ভয়ে কাপ্‌তে-কাপ্‌তে বল্‌ল, "কিন্তু মশায়, সে গোলান্দাজটা ত চলে গিয়েছে।"

ঘরের ভিতর আবার সবাই গোলমাল করে' উঠ্‌ল।

আমি বললাম, "তা হলে এটা আমারই নিয়ে যাওয়া উচিত।"

দিত্যেই লাফিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "খবরদার যদি ওটা ছোঁবে, আমি বারণ করছি। এখান থেকে একটানে থিয়েটারের রাস্তা অবধি ওটা বয়ে নিয়ে যেতে পার এমন জোরই তোমার গায়ে নেই। তুমি ওটাকে একবার সিঁড়িতে কি কোনো ঘরে না রেখেই পারবে না, তারপর একখানা কিছু হোক্ আর কি!"

দিত্যেই-গৃহিণী আমার দুই হাত চেপে ধরে' বলতে লাগলেন, "তুমি নয়, ওতে ভারি বিপদ আছে। তুমি ছুঁয়োনা।"

দিত্যেই বলে' উঠল, "এটা একজন গুণ্ডাগুণ্ডা সৈনিকের কাজ। ভাগ্যে কাপ্তেন এখানে ছিলেন!"

কাপ্তেন চম্‌কে উঠে বললেন, "আঁ। আমি!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই। তোমরা ত এইসব নিয়েই আছ, স্কুলের ছোক্‌রাগুলো যেমন মার্বেল আর ফানুস্' নিয়ে খেলে, তোমরাও ত তেমনি গোলাগুলি আর বোমা নিয়ে খেল।"

কাপ্তেন সাহেবের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে এল, তিনি বল্‌লেন "আমাকে যদি মাপ করেন। এত বড় বোমাটা··· আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? আজ এটা এখানেই থাক, কাল লোক ডেকে পাঠিয়ে দিলেই হবে।"

দিত্যেই-গৃহিণী প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন, "কাল? আমি তা হলে সারারাত চোখ বুজতে পারব না। আমি বরং কোনও হোটেলে গিয়ে থাকি।"

এমন সময় আনাতোল আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বল্‌ল, "আপনি এত ভয় পাবেন না। আমি বোমাটা নিয়ে যাচ্ছি।"

সকলে হাঁ হাঁ করে উঠ্‌ল, দিত্যেই বল্‌ল, "তোমার মাথা খারাপ নাকি হে ছোক্‌রা? এই সেদিন জ্বর থেকে উঠ্‌লে এখনও ত হাতখানা সারেনি। বাড়ীটা উড়িয়ে দিতে চাও বুঝি?"

আমি বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে বললাম, "ঠিক্ কথা, এ রোগা মানুষের কাজই নয়।"

দিত্যেই বলতে লাগল, "এটা কাপ্তেনেরই কাজ। ওকে ছাড়া আর কাউকে আমার বিশ্বাস নেই। এস হে, এগিয়ে এস, এই বিদ্‌ঘুটে জিনিষটা সরিয়ে ফেল. আমাদেরও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ুক।"

কাপ্তেন সাহেবের অবস্থা যে কাহিল, তা বেশ বোঝাই যাচ্ছিল। কিন্তু এত সহজে হটে' যাবার ছেলে সে নয়। সে জোর করে' একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, "হ্যাঁ কাজটা আমার উপরই পড়া উচিত বটে। তা আমি একটা কথা বলতে চাই। এমন জিনিষ নিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া ভয়ানক বিপজ্জনক। রাস্তাটা বেজায় পিছল, একবার পা হড়্‌কালেই অন্তত ছ সাতজন লোকের দফা নিকেশ হবে। গাড়ী করে' নিয়ে গেলেই ঠিক হয়।"

দিত্যেই বল্‌ল, "এমন সময় গাড়ী পাবে কোথায়? যে কখানা ছিল, সব কটাই ত যুদ্ধের হাসপাতালে মানুষ বইবার জন্যে নিয়ে গিয়েছে।"

হঠাৎ কাপ্তেন বলে উঠল, "ভাল কথা, জেনারেল স্মিজ্, ঐ একটু দূরে রেবার হোটেলে খানা খেতে গিয়েছেন। তিনিই ত আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর গাড়ী নিশ্চয়ই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, আমি সেটা চেয়ে আনি গিয়ে। নিশ্চয়ই গাড়ীখানা দেবেন, তিনি আমার মস্ত বন্ধু। কতটুকু সময়ই বা লাগবে। আমার কোমর-বন্দটা পরে' নেওয়া, আর ঐ অতদূর যাওয়া আর আসা। দশ মিনিট কি বড় জোর পনেরো মিনিট।"

দিত্যেই গৃহিণী বললেন, "শিগ্‌গির যাও তাহলে। ওটা বিদায় হলে তবে আমার ধড়ে প্রাণ আসে।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আমি এক্ষনি যাচ্ছি," কাপ্তেন সাহেব নিজের টুপী আর ক্লোক্ নিয়ে চট্‌পট্ বেরিয়ে গেল। যে রকম হুড়মুড় করে' সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, তাতে বেশ বোঝাই গেল সে, তার যাবার তাড়া খুবই বেশী।

আমি ফিরে এসে ঘরে ঢুকলাম, বোমাটি তখনও সেই-খানে বিরাজ করছে। দিত্যেই-গৃহিণী ঘর ছেড়ে পালাবেন, না বোমাটার উপর চোখ রাখবেন, তাই ঠিক করতে পার-ছিলেন না। আমি জান্‌লার কাছে দাঁড়িয়ে আড়চোখে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিলাম। ফুট্‌ফুটে চাঁদের আলোয় বেশ অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল।

আনাতোল নীচু গলায় বল্‌ল, "আমাকে নিয়ে যেতে দিলেই হত।"

দিত্যেই ধমক্ দিয়ে বলল, "চুপ কর, মেলা বাজে কথা বোকো না।" সে কিন্তু এই রোগা ছেলেটার আশ্চর্য্য সাহস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

দিত্যেই-গৃহিণী কান্নার সুরে বলতে লাগলেন, "কাপ্তেন যদি বেশীক্ষণ আমাদের বসিয়ে না রাখেন তা হলেই বাঁচি।"

আমি হাস্‌তে-হাস্‌তে বললাম, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত

থাকতে পারেন, বসে' আপনাদের অনেকক্ষণই থাকতে হবে, কারণ কাপ্তেন সাহেব আর ফিরছেন না।"

"কি বল! আর ফিরবেন না?"

"নিশ্চয়ই না, রেবাঁর হোটেলে যেতে হলে ত রাস্তার ডান দিকে মোড় ফিরতে হয়; আমি বেশ দেখলাম তিনি বাঁ দিকে মোড় ফিরে চোঁ-চাঁ দৌড় দিচ্ছেন।"

"ওমা তুমি বল কি!"

"কি আবার বলব, বলছি এই যে, বন্ধু খিতেই, তোমার কাপ্তেনটি একটি মস্ত বড় ফন্দিবাজ; আর তাঁর সব জারী-জুরি ভেঙ্গে দিতে পেরেছি বলে' আমার বেজায় আনন্দ হচ্ছে। যাক্ বোমাটা কাজে লাগল বটে!"

এই বলে একখানা ছবির বই তুলে আমি বোমাটার উপর ধাঁই করে' এক ঘা লাগালাম। অমনি চারধারে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে—চোকোলেট ছড়িয়ে পড়ল। বোমাটা চোকোলেটেরই তৈরী! ঘরের গালিচার উপর ঝুরঝুর করে' লজেন্স, চোকোলেট, বিস্কুট, বাদাম, আখরোট, আরও কত-কিছু গড়িয়ে পড়ল। ঘরসুদ্ধু লোক প্রথমটা আঁৎকে উঠে শেষে হা হা করে' হেসে উঠ্‌ল।

তিনমাস পরে আনাতোলের সঙ্গে গ্যারব্রিদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের নিমন্ত্রণে কাপ্তেন রোবিয়ারকে দেখিনি।

শ্রীসীতা দেবী।

আলুর দম্ বখ্‌শীশ্

আমার এক ভারী আংরেজী-জানা গাহক বঙ্গালী বাবুর নিকট শুনিয়াছি যে কার্লাইল ভারী আলুর দম খেতো। তেনার এক কেতাবে আছে:—

"Had I but two potatoes in the world and one true idea, I should hold it my duty to part with one potato for paper and ink, and live upon the other till I got it written."

আজকাল তো বিলাতে আলু ভারী মাহাঙ্গা হোয়েছে, পাওয়াই যায় না। ইহার জন্য আংরেজী সাহিত্যের অবস্থা কেমন হইয়াছে, সে বিষয়ে যাহার লেখা খুব উম্‌দা হোবে তেনাকে আমি খুব বড়া বড়া দোচার আলুর দম বখ্‌শীশ দেবো। কুছ মশালা ভী উহার সাথ দেবো।

ময়রাপটী।　　শ্রীবাদীরাম হালুইকর।

দেশের কথা

আমাদের দেশের কথা শুধু—অভাব! অভাব! অভাব! অন্ন জল স্বাস্থ্য অর্থ চিকিৎসা বিদ্যা সাহস বীর্য্য সব কিছুর অভাব। ইহারই মধ্যে মফস্বলে জলের অভাব তীব্র হইয়া উঠিয়াছে; রোগের সংবাদও পাওয়া যাইতেছে।

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় পল্লীগ্রামে চিকিৎসক সরবরাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তারগণ পল্লীগ্রামে যাইয়া থাকিতে পারেন না; কারণ তথায় তাঁহাদের উপযুক্ত অর্থাগম হয় না। এই জন্য ডাক্তার সরকার প্রস্তাব করেন যে, বঙ্গের মেধাবী বাঙ্গালানবিশ যুবকদিগকে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে মোটামোটা ডাক্তারী শিক্ষা দিয়া পল্লীগ্রামে পাঠান হউক, তাহা হইলে দরিদ্র গ্রামবাসীর পক্ষে চিকিৎসা সুলভ হইতে পারে। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গলা দেশের জন্য আরও ৯০ হাজার ডাক্তার আবশ্যক।—যশোহর।

এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু রোগের নিদান দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করা দরকার। দারিদ্র্যের পেষণ হইতে দেশের লোককে মুক্তি দিবার চেষ্টা বা উপায় সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারিয়াছি—

আসামে আকের ক্ষেত।—গত এক বৎসরে বঙ্গদেশে যাবা প্রভৃতি দূর দেশ হইতে প্রায় ৭ কোটী টাকার চিনি আসিয়াছে। চিনির জন্য বিদেশে এতগুলি টাকা প্রেরণ করা কি সহজ? আসাম হইতে একটু আশার সংবাদ আসিয়াছে। সেখানে গবর্ণমেণ্ট বিস্তৃত ক্ষেত ও চিনির কারখানা খুলিতেছেন। উত্তর কামরূপের খাগড়াবাড়ী নামক স্থানে ৩০০ তিন শত একর জমিতে এক আকের ক্ষেত করা হইয়াছে। ঐ ক্ষেতে উৎকৃষ্ট আক জন্মিয়াছে। এক শত মণ আকে ১৫ মণ অতি পরিষ্কার চিনি পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক একর জমিতে ২০ হইতে ২৫ টন পর্য্যন্ত আক জন্মিয়াছে। উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হইলে আরো অধিক জন্মিবে বলিয়া আশা করা যায়। গবর্ণমেণ্টের ঐ ক্ষেতের চারিদিকে বিস্তৃত জমি রহিয়াছে; তাহাতে আকের চাষ করিলে ১০টি আকের কারবার চলিতে পারিবে। ব্রহ্মদেশেও অনেক বিস্তীর্ণ জমি পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, হয় না? ব্রহ্মদেশের ভূমিতে যদি আসামের ন্যায় ফল পাওয়া যায় তবে বৈদেশিক চিনির রপ্তানী অচিরে বন্ধ করিতে কোন বাধা হইবে না।—জ্যোতি।

সুদের হার।—দেশের মহাজনদের অত্যধিক সুদের দায়ে দেশের কৃষক সাধারণ চিরদারিদ্র্যে ডুবিয়া রহিয়াছে,—তাহারা আর মাথা তুলিতে পারিতেছে না। মহাজনদের সাহায্য ভিন্ন গরীব কৃষকদের জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার সামর্থ্য নাই সত্য, কিন্তু তাহারা একবার মহাজনের নিকট ঋণগ্রস্ত হইলে সুদের সুদ দিতে দিতে জীবনেও তাহারা সেই ঋণ শোধ করিতে পারে না। অনেক স্থলে ঋণের দায়ে গরীব কৃষককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও মহাজনের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটে না। মহাজনদের এই অত্যাচার হইতে দরিদ্র প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিবার জন্য এক আইন-সংক্রান্ত এই নজীর বাহির হইয়াছে

যে, আদালতের বিচারে সুদখোর মহাজনেরা প্রজার নিকট শতকরা মাসিক এক টাকার অধিক সুদ ডিক্রী পাইবে না। ইহাতে প্রজাদের খুবই উপকার হইবে, যদি মহাজনেরা অন্য কোনরূপ কৌশলজাল বিস্তার না করে। এ ছাড়া হাইকোর্টের আরও একটি নজীর বাহির হইয়াছে যে, ভূম্যধিকারীর অনুমতি পাইলেও প্রজার বিনা অনুমতিতে ঋণের দায়ে তাহার রেহানাবদ্ধ সম্পত্তি বাদে জোত স্বত্ব নীলাম হইতে পারিবে না।—নীহার।

কাপড়ের মূল্য।—কাপড়ের মূল্য বড়ই বাড়িয়াছে। পঞ্চমের অধিক সুর চড়াইবার গ্রাম না মাত্রা নাই। কিন্তু ইহা তাহাকেও অতিক্রম করিয়াছে। দরিদ্রগণের বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বিলাত হইতে কাপড় আমদানী হ্রাস হওয়াই ইহার কারণ। ইহা হইতে আমাদের দুরবস্থারও গভীর আভাস পাওয়া যাইতেছে। আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা ও পর-নির্ভরতার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। আশা করি এবার লোকে আপনাদের অবস্থা বুঝিতে পারিবে। আবার পূর্ব্বের ন্যায় ঘরে ঘরে চরকা চলিবে। সরু মোটা সূতা প্রস্তুত হইবে। ঘরে ঘরে কার্পাস চাষেরও ব্যবস্থা হইবে। কলের দ্বারা আমাদের উপকারের সম্ভাবনা আদৌ নাই। আবার গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য শিল্পের উদ্বোধন কর, গ্রামে গ্রামে কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতিকে স্ববৃত্তিতে প্রাণোদিত কর, গ্রামে গ্রামে আত্মনির্ভর কর। সমুদায় দেশে তোমাদের যে প্রয়োজন সিদ্ধ হইত পূর্ব্বের ন্যায় এক-একটি গ্রামকে একটি দেশরূপে পরিণত করিয়া সমুদায় প্রয়োজনীয় সেই গ্রাম হইতেই সাধন কর। বিলাসিতা পরিত্যাগ কর। গ্রামের ধন ধান্য গ্রামেই রাখিবার ব্যবস্থা কর। এইরূপে ৪।৫টি বা ৮।১০টি গ্রাম লইয়া এক-একটি মণ্ডলী কর। যাহার যে বিষয়ের অভাব হইবে পরস্পর তাহা পূরণ করিয়া মণ্ডলীর সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি কর। আবার নিজের ভাবে, নিজের ভাষায়, নিজের কাজে, নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতায় ফিরিয়া আইস। আত্মনির্ভরতাই সুখ—পরমুখাপেক্ষিতায় সর্ব্ব দুঃখের আকর! তাই বলিতেছি কাপড় কাগজের দুর্ভাবনাই এখন আমাদের এমন সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

দারিদ্র্য ছাড়া স্বাস্থ্যনাশের আর-এক কারণ ভেজাল খাদ্য। ভেজাল দ্রব্য যাহারা বিক্রয় করে তাহাদেরও ব্যবসায়ে উন্নতি হয় না, যাহারা কেনে তাহাদেরও অর্থনাশ মনস্তাপ স্বাস্থ্যহানি ঘটে। বিলাতের ব্যবসাদারদের যেমন ব্যবসায়ে সততা আছে, একটা কোম্পানির নামই উৎকৃষ্ট জিনিসের যেন গ্যারাণ্টি, তেমন আমাদের দেশে নাই বলিলেও চলে। সুতরাং এই সামান্য সংবাদটি আমাদের খুব আনন্দের কারণ হইয়াছে—

ভেজাল ঘৃত দূরীকরণ।—রাণীগঞ্জের মাড়োয়ারী মহাজনেরা সকলে একত্রিত হইয়া প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছেন যে তাঁহারা কেহই আর ভেজাল ঘৃত বিক্রয় করিবেন না। যিনি ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন তাঁহাকে ৫০১৲ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। ইহাতে অনেক সুফলের আশা করা যায়।—বীরভূম-বার্ত্তা।

দেশের জ্ঞান ও বিদ্যার অভাব মোচনের দিকে নিম্ন-লিখিতরূপ চেষ্টা ও ফল গত একমাসে হইয়াছে।—

বেদাভ্যাসে কায়স্থ।—কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে এতকাল কায়স্থগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। এবার সে নিয়ম হইয়াছে। অতঃপর কায়স্থগণ উক্ত বিভাগে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন।—২৪-পরগণা-বার্ত্তাবহ। যশোহর।

বিদ্যা ও জ্ঞান যে জাতিবিশেষের সম্পত্তি নয় এ বোধ বহুকাল আগেই হওয়া উচিত ছিল। শ্রেণীবিশেষের অন্যায় গোঁড়ামি যত দূর হইবে ততই মঙ্গল।

গত মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮॥ ঘটিকার সময় যশোহর টাউন উচ্চ-প্রাথমিক মক্তবের ভিত্তি-প্রস্তর প্রতিষ্ঠাকল্পে যশোহরের ঘোপ গ্রামে একটি জনসাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর একটি দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া বলেন যে, এ জেলায় প্রায় ১১।১২ লক্ষ মুসলমানের বাস। একটি কেন এরূপ শত সহস্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই বিদ্যালয়ে ৪৫টি ছাত্র থাকে, তন্মধ্যে ৪০ জন মুসলমান ছাত্র। তাই আমি বলিতেছি যে, মুসলমান ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করুন, কিন্তু তাহাদের কেবল চাকুরী করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের প্রবৃত্তি যেন না হয়। পরন্তু চাকুরি করিতে গেলেই প্রায়ই সততা রক্ষিত হয় না। ২০৲ বেতনের কর্ম্মচারী আর ২০৲ টাকা ঘুস পাইবার আশা করে, অতএব ছাত্রগণ যাহাতে বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা পায় সে দিকেও কর্ত্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকদিগের দৃষ্টি রাখা উচিত। কৃষি-কাজটিই সর্ব্বাংশে ধর্ম্মানুমোদিত, কারণ তাহা করিতে যাইয়া কোনরূপ অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। ব্যবসা বাণিজ্যে সত্যকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। চাকুরিতে ঘুস। ইত্যাদি।—যশোহর।

নূতন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়।—মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত বাসুদেবপুর গ্রামে স্থানীয় কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির যত্নোদ্যমে একটি উচ্চ-ইংরেজী-বিদ্যালয় নবপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র রায় মহাশয় পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়া গিয়াছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীগণও এখন আর পাঁচ সহস্রাধিক টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুর আপাততঃ স্কুলের সাহায্যার্থ এক শত টাকা দান করিয়াছেন। আমরা এই নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির স্থায়িত্বের কামনা করিতেছি।

—নীহার। মেদিনীবান্ধব।

২৪ পরগণা বারাকপুর সবডিভিসনভুক্ত "বলাগড়" গ্রামে সাইমীনার সহৃদয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে প্রতিষ্ঠিত "নন্দদুলাল বিদ্যালয়ের" নব গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। অধুনা এই নব গৃহেই বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে। স্কুল কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত মেঘনাথ পাল এই গৃহনির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। —২৪-পরগণা-বার্ত্তাবহ।

বালিকা-বিদ্যালয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে মালদহ-সমাচারে এস্থানে একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের অভাব সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছিলাম। একস্থানে উহা কিরূপ ভাবে স্থাপিত হইলে জনসাধারণের সুবিধা হয় তাহাও জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। এই অভাব অভিযোগ আমাদের স্বদেশ-হিতৈষী ধর্ম্মপ্রাণ মোহান্ত শ্রীযুক্ত গোসাঁই বলদেবানন্দ গিরি মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি এ স্থানে কলিকাতার মহাকালী পাঠশালার অনুকরণে একটি আদর্শ বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। —মালদহ-সমাচার।

বীরভূম মহিলা-সমিতি। গত ২১শে চৈত্র অপরাহ্ণে বীরভূম মহিলা-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সমিতির উদ্দেশ্য,—

বীরভূম জেলায় প্রাথমিক স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি; জেলার, বিশেষতঃ সিউড়ী সহরের, মহিলাদিগের মধ্যে প্রীতির আদানপ্রদান ও জেল বা হাঁসপাতালের এবং অন্যান্য লোকহিতকর কার্য্যে যথাসম্ভব সাহায্যদান। সৈনিকদিগের জন্য জামা পাজামা রুমাল প্রভৃতি এই সমিতি হইতে সেলাই করাইয়া দেওয়া হইতেছে। —বীরভূমবাসী।

পর্দ্দা রক্ষা করিয়া অন্তঃপুর-মহিলাদের প্রীতিসম্মিলন ও বঙ্গ-সাহিত্যের সঙ্গে ইহার যোগ রাখিবারও ইহাতে উত্তম ব্যবস্থা হইয়াছে। বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেলাই ও রন্ধন প্রভৃতি কার্য্যকরী শিক্ষার উৎসাহ দান, পীড়িত ব্যক্তিদিগের ক্লেশ মোচন ও অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার সুবন্দোবস্তের ভার মহিলাসমিতি যথাশক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব রক্ষার জন্য যে-সব সৈনিক-পুরুষ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এই বঙ্গভূমির প্রান্তবর্ত্তী অন্তঃপুরা-বদ্ধ মহিলাগণ নিজের শ্রম ও অর্থ দ্বারা তাঁহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে নানাপ্রকার দ্রব্য-প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন ইহা তাঁহাদের সহৃদয়তা ও গৌরবের পরিচায়ক। আমরা ভাবিতে পারি নাই যে এই জেলায় এরূপ মহিলা সম্মিলন ও অন্তঃপুর-মহিলাদের দ্বারা এরূপ সদনুষ্ঠান সম্ভবপর হইবে। —বীরভূম বার্ত্তা।

পরীক্ষায় সাহায্য।—কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাস গুপ্ত ভিষগ্‌রত্ন মহাশয় আমাদিগের নিকট লিখিয়াছেন—প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী ছাত্র-দের মধ্যে যাহার বরিশালে আসিয়া আহার ও বাসস্থানের নিতান্ত অসুবিধা, এমত ২টি ছাত্র পরীক্ষার কয়েক দিবস তাঁহার বাসায় আহার ও বাসস্থান পাইবে এবং পরীক্ষার ১০ দিন পূর্ব্বে হেডমাষ্টারের জ্ঞাত-সারে তাঁহাকে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিতে হইবে।—কাশীপুরনিবাসী।

আমরা বরিশালের এই-সকল মহাত্মার সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অপর সকল জেলার মহানুভব সহৃদয় ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

দেশে বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞান বিস্তারের জন্য দেশবাসীর খুব বেশী করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ—

সার শঙ্কর নায়ার জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পরেও ভারতগবর্ণমেণ্ট অবৈতনিক নিম্নশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিবেন এমন কোন সঙ্কল্প তাঁহাদের মনে এখনও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যদি কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থলে ইহার পরীক্ষা করেন তাহাতে ভারত-গবর্ণমেণ্ট কোন আপত্তি করিবেন না। —ত্রিপুরা-হিতৈষী।

এবং বাংলার গভর্ণর লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে বাহাদুর বলিয়া-ছেন যে দেশের অভাব মোচন করিতে হইলে দেশবাসীকে অতিরিক্ত কর দিয়া গভর্মেণ্টকে সাহায্য করিতে হইবে। পরের হাতে অর্থ তুলিয়া পরবশ হওয়ার চেয়ে নিজেরাই উদ্যোগ করিয়া দেশের সকলবিধ অভাব মোচন করা ঢের ভালো। প্রত্যেক গ্রাম যদি নিজের এলাকার সমস্ত অভাব দূর করিবার চেষ্টা করে তবে অচিরে সোনার বাংলা আবার সোনার বাংলা হইয়া উঠে।

দেশ যে এখনো মনুষ্যত্ব ও উদ্যম হারায় নাই নিম্নলিখিত সংবাদগুলি সেই আশার সাক্ষী।—

অগ্নিকাণ্ডে ছাত্রের কৃতিত্ব।—৮ই বৈশাখ ঠিক সন্ধ্যার সময় বেনীয়ানগর, ঠাকুরদাস লেনের এক গরীব গৃহস্থের ঘরে আগুন ধরিয়া যায়। অগ্নি নির্ব্বাপণ ব্যাপারে ঢাকা জুবিলি স্কুলের ছাত্র শ্রীমান হরিদাস দাস ও ইম্পিরিয়াল সেমিনারীর ছাত্র শ্রীমান্ জানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যম ও সাহসিকতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

— ঢাকা-প্রকাশ।

সৎকার্য্য।—গত ১লা বৈশাখ রামপুরহাট সহরের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে পাথুরিয়া গ্রামে কয়েকটি খড়ের গাদায় আগুন লাগে। অগ্নি ভীষণাকার ধারণ করে। রামপুরহাট হাইস্কুলের অনেকগুলি বালক রামপুরহাট হইতে এই অগ্নিকাণ্ড দেখিতে পায়। অমনি তাহারা তাহাদের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সামসুদ্দিন হোসেন ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে দৌড়িয়া পাথরিয়া গমন করে এবং প্রভূত চেষ্টা করিয়া সেই প্রবল অগ্নি নির্ব্বাপিত করে। বালকদিগকে আমরা আশীর্ব্বাদ করি, এবং যে শিক্ষকদ্বয় বালকগণকে এইরূপ সৎকার্য্যে উৎসাহ দেন, তাঁহাদিগকেও আমরা ধন্যবাদ দিই।— বীরভূমবাসী।

সৎসাহস।—বিগত ৩রা বৈশাখ বেলা ১১ ঘটিকার সময় অত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠির পশ্চিম পার্শ্বে হোসেনাবাদ গ্রামে এক গরীব গৃহস্থের বাটীতে হঠাৎ আগুন লাগে। তাঁহার মটর-ড্রাইভার বীরেন্দ্র-মোহন ভট্টাচার্য্য এই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাইবামাত্র সেস্থানে যাইয়া তিনি নিজে ও লোকজনের সাহায্যে অনেকগুলি বাড়ী ও গৃহপালিত পশু রক্ষা করেন। আমরা এই ড্রাইভারের সৎসাহসের কথা শুনিয়া বাস্তবিকই সুখী হইয়াছি।—বীরভূমবার্ত্তা।

বীরবালক।—গত ২২শে চৈত্র অপরাহ্ণ ২॥০ ঘটিকার সময় শিব-বাড়ীর ময়মনসিংহ ঘাট হইতে এক উন্মাদিনী যুবতী ব্রহ্মপুত্র নদে সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিয়া যখন মধ্য নদে উপনীত হইয়াছিল, তখন তাহার শরীর অবশ হইয়া অর্দ্ধমৃতাবস্থায় জলের তলে যাইতে থাকে। তাহার চুলগুলি ব্যতীত শরীরের অপর কোন অংশ জলের উপরিভাগে ছিল না। ঐ সময় ঘাটে যে সকল লোক উপস্থিত ছিল, তাহাদের কেহই পাগলিনীকে উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিল না। স্থানীয় মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ শশধর গোস্বামী দৈবাৎ উক্ত ঘাটে উপস্থিত হইলে ঐ দৃশ্য দেখিয়া তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং জীবন বিপন্ন করিয়া বহু কষ্টে যুবতীকে তীরে আনয়ন এবং শুশ্রূষা দ্বারা উহার চৈতন্যসম্পাদন করে। বালকের এই সৎ-সাহসের জন্য বালক সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।—চারুমিহির।

বর্দ্ধমান জেলার অগ্রদ্বীপ-নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক দ্রব্যাদিসহ ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে তেঁতুলিয়ার নদীর ঘাটে গো-শকটে পার হইয়া যাইতেছিলেন। গাড়ী প্রায় একহাঁটু কাদায় পড়িয়াছিল; গরু দুইটিও অবসন্ন হইয়াছিল। ঘাটে অনেক লোক ছিল; তন্মধ্যে কোন ভদ্র-লোক কিন্তু কেহই ভদ্রলোকের উপস্থিত বিপদে দৃক্‌পাতও করিল না। এমন সময় তেঁতুলিয়া-নিবাসী ভিকু সেখ নামক জনৈক নিরক্ষর মুসলমান কৃষক আসিয়া গাড়ীখানি তুলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। শীতকাল, ফাঁকা মাঠ, শীতে ডাঙ্গাতেই তিষ্ঠান ভার, কিন্তু কৃষক কাপড় ভিজাইয়া বিশেষ কাতর হইয়া পড়িলেও প্রাণপণে চেষ্টা করিতে করিতে প্রায় এক ঘণ্টা পর কৃতকার্য্য হইল। বাবুটি বিশেষ অবস্থাপন্ন ছিলেন না; কৃতজ্ঞতা সহকারে ৵০ জল খাইতে তাহাকে দিলেন; সে লইতে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিলে পর বাবুটির নির্ব্বন্ধাতিশয়ের সহিত আশীর্ব্বাদী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। কৃষকের পরোপকার প্রশংসনীয়; সকলেরই উহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। যাহার চিত্ত উন্নত, সেই শিক্ষিত ও নমস্য। শ্রীভগবান তাহাতে প্রকটভাবে আছেন।—এডুকেশন-গেজেট।

সেবক যুবকদল।—প্রতি বৎসর চড়ক উপলক্ষে তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথের দর্শন ও সেবার্থ বহু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর তারকনাথ দেবের সন্ন্যাসীর সংখ্যা কম ছিল। নালিকুলের হিতকরী সমিতির যুবকগণ প্রতি বৎসর চড়ক-সংক্রান্তির উৎসব সময়ে তারকেশ্বরযাত্রী সন্ন্যাসীদিগের তৃষ্ণা নিবারণার্থ সুশীতল জল দান করিয়া থাকেন। এবারও তাঁহারা যথারীতি ৩০শে ও ৩১শে চৈত্র এবং ১লা বৈশাখ দিবসত্রয় সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে সন্ন্যাসীদিগকে জলদান করিয়া অক্ষয় পুণ্যার্জ্জন করিয়াছেন। সাধু! —চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

রামকৃষ্ণ-মিশনের সেবকদের সেবার সংবাদও আমরা বহুক্ষেত্রে পাইয়াছি। তাঁহারা ত সেবাব্রতের জন্যই বিখ্যাত।

দেশ যে একেবারে হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে নাই তাহার দৃষ্টান্ত—

ঢাকার নবাব বাহাদুর বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করিয়াছেন। বার লাইব্রেরীর সভায় নবাব বাহাদুর বলিয়াছেন যে, তিনি রাজার ও দেশের কাজে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন। নবাব বাহাদুর যুদ্ধে যোগদান করিয়া তাঁহার বংশমর্য্যাদার উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। —যশোহর। বীরভূম বার্ত্তা।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম, রাজা শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য বাহাদুর ভারতরক্ষী সৈন্যদলে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ঐ দলে প্রবেশ করিবার জন্য যে-সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার কোনও কোনও নিয়ম তাঁহার ভর্ত্তি সম্বন্ধে প্রতিকূল হওয়ায় তিনি ঐ সকল বিষয়ে অনুমতি প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছেন। সম্ভবতঃ ঐ অনুমতি তিনি প্রাপ্ত হইবেন। অনুমতি পাইলেই তিনি ভারতরক্ষী সৈন্যদলে প্রবেশ করিবেন। আমরা আশা করি, অন্যান্য জমিদারবংশের যুবকগণও সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া দেশের অন্যান্য শ্রেণীর লোকের নিকট এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপিত করিবেন।

—চারুমিহির।

যাঁহাদের উপার্জ্জনের উপর পরিবারের নির্ভর করিতে হয় না এরূপ স্বচ্ছল অবস্থার প্রত্যেক বাঙালীরই ভারতরক্ষী সৈন্যদলে ভর্ত্তি হওয়া উচিত।

সমাজসংস্কারের উপকারিতা আজকাল নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরাও অনুভব করিতেছে।

কুর্ম্মী বা কুড়মী সভা।—মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাঞ্চলে অনেক কুর্ম্মী বা কুড়মী জাতির বাস আছে। এই জাতির সমাজপতি রাইমোহন মাহাত প্রমুখ কয়েকজন প্রতিশ্রুত হইয়াছে যে, পতিসত্ত্বে পত্যন্তর গ্রহণ, বিধবার একাধিকবার বিবাহ দেওন, গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ বন্ধন, গাভী দ্বারা হল চালন, অখাদ্য ভোজন, স্ত্রীলোকগণের নর্ত্তন, কাহারের ডুলি বা চৌদল আরোহণ, গুরু ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের অন্নাশন, নাচনী-থাওয়াসীন পালন, সুরা সেবন, বিবাহের মিঠাই অন্যে প্রস্তুত করণ, সান্ন পাকপাত্র মাথায় লইয়া মাঠে গমন, সধবা স্ত্রীলোকগণের হাটে গমন এবং অবগুণ্ঠন নিবারণ প্রভৃতি কার্য্য এই জাতির সমাজে রহিত হইবে। উচ্চশিক্ষার গুণে আজকাল সকলেই সভ্যতা ও জাতীয় উন্নতিকল্পে সচেষ্ট।—মেদিনী-বান্ধব।

ইহারা পশ্চিমের লোক, বাংলায় উপনিবেশ করিয়াছে। ইহাদের প্রতিশ্রুতিগুলি দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় ইহারা নিজেরা ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজেদের সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতেছে না; বাংলার উচ্চশ্রেণীর লোকেদের সামাজিক রীতির অনুকরণে ইহারা আপনাদের সমাজ গঠন করিতে চাহিতেছে। তাহাদের সঙ্কল্পিত নিয়মের কতকগুলি যে উচ্চ সমাজের গোঁড়ামির দেখাদেখি তাহা সুস্পষ্ট। অতএব উচ্চ সমাজের কর্ত্তব্য সকল-প্রকার গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া নিখুঁত আদর্শ সৃষ্টি করা। তাঁহাদের হাতেই দেশের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তক-পরিচয়

খুকুর কথা—স্বর্গীয়া চারুবালা দেবী ও দিদিমা কর্ত্তৃক লিখিত। ময়মনসিংহ জামালপুর হইতে শ্রীললিতচন্দ্র সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৭৩ পৃষ্ঠা, ১২ খানি ছবি সংযুক্ত, কাপড়ে বাঁধা। মূল্য এক টাকা।

চারুবালা দেবীর খুকু অর্থাৎ খোকা—হইলে পর "তখন আদরের খুকুর কথা সকল আত্মীয় স্বজনই জানিতে চাহিতেন। চিঠিতে তাহাদিগকে খুকুর কথা লিখা হইত। সেই-সব চিঠি নিয়াই 'খুকুর কথা'র সৃষ্টি।" ইহাতে শিশুচরিত্রের কৌতুককর অথচ মধুর পরিচয়ের মধ্য দিয়া শিশুর মনস্তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। শিশুর মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিতে এইরূপ পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইবে। খুকুর নানা বয়সের ছবি, তাহার বহু আত্মীয় স্বজনের ছবি ও খুকুর হাতের লেখা ও ছবি আঁকার নমুনা সন্নিবেশিত আছে।

মুদ্রারাক্ষস।

মূক-বধিরদের অভিনয়

সম্প্রতি কলিকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অঙ্গভঙ্গী ও ইঙ্গিতের দ্বারা হরিশ্চন্দ্র নাটক অভিনয় করিয়াছিল। তাহাদের ভাষা ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গী বলিয়া তাহারা মূক-অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব ও দক্ষতা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিল। যাঁহারা তাহাদের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহাদের মতে তাহাদের অভিনয়-কৃতিত্ব ফটোগ্রাফে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে নাই; তৎসত্ত্বেও আমরা ফটোগ্রাফগুলি হইতে বুঝিতে পারিব তাহারা কিরূপ নিপুণতার সহিত আপনাদের মনের কথা কেবল মাত্র মুখের ভাব অঙ্গভঙ্গী ও ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে।



১। বিশ্বামিত্রকে রাজ্যদান করিয়া হরিশ্চন্দ্র সপরিবারে প্রাসাদ ত্যাগ করিতেছেন। রোহিতাশ্বের গলায় একছড়া মণিহার আছে দেখিয়া বিশ্বামিত্র তাহা দাবী করিতেছেন ও রোহিতাশ্ব হার খুলিয়া দিতেছে।



২। বিশ্বামিত্রকে সমস্ত রাজ্য দান করিয়া দক্ষিণা দিবার জন্য হরিশ্চন্দ্র পত্নী শৈব্যাকে ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রয় করিয়া অর্দ্ধেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন ; ব্রাহ্মণ শৈব্যার সহিত রোহিতাশ্বকে লইতে অস্বীকার করাতে মাতা-পুত্রের ব্যাকুলতা।

সুবোধ ষ্টুডিও কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ।



৩। বিশ্বামিত্রকে দেয় অৰ্দ্ধেক দক্ষিণার জন্য হরিশ্চন্দ্র আপনাকে চণ্ডালের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।

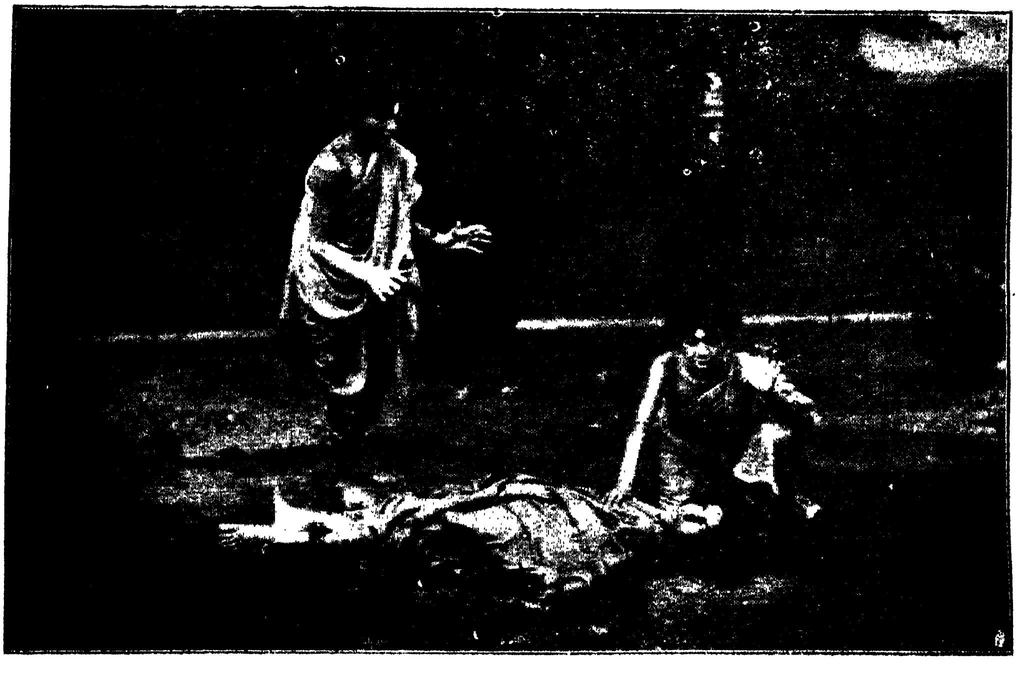


৪। শৈব্যার প্রভুপত্নী কর্কশস্বভাবা ব্রাহ্মণী শৈব্যাকে প্রহার করিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ ও রোহিতাশ্বের দুঃখ এবং রোহিতাশ্বকে তাহার সঙ্গীদের সান্ত্বনা দান।

সুবোধ ষ্টুডিও কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ



৫। রোহিতাশ্ব ফুল তুলিতে গিয়াছে ; তাহার এক সঙ্গী তাহাকে একটি ফল তুলিয়া উপহার দিতেছে, দেখিয়া অপর এক সঙ্গী সেই ফলটি চাহিতেছে, এবং প্রথম সঙ্গী দ্বিতীয়কে উহা দিবে না বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। ওদিকে রোহিতাশ্বের পশ্চাতে মাথার উপর একটি সাপ তাহাকে দংশন করিতে আসিতেছে।



৬। সর্প দংশনে রোহিতাশ্বের মৃত্যুতে তাহার সঙ্গীদের বিস্ময় ও ভয়।



১১। বিশ্বামিত্রের বরে রোহিতাশ্বের জীবনলাভ, মাতা-পুত্রের মিলনে আনন্দ ও পিতা হরিশ্চন্দ্রের কৃতজ্ঞতা।

সুবোধ ষ্টুডিও কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ।



৭। মৃত পুত্রকে কোলে করিয়া শৈব্যা শ্মশানে যাইতেছেন।



৮। গভীর রাত্রিতে মেঘলা অন্ধকারে চণ্ডাল-ভৃত্য হরিশ্চন্দ্র শোকাকুল মাতার ক্রন্দন শুনিয়া বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন।



৯। বিশ্বামিত্র অন্ধকারে পত্নীকে চিনিতে না পারিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে তাঁহার পুত্রের মৃতদেহ সংকারের শুল্ক চাহিতেছেন ও শৈব্যা নিঃস্বতা জানাইতেছেন।



১০। সহসা বিদ্যুৎ চমকে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা পরস্পরকে চিনিতে পারিয়াছেন।

সুবোধ ষ্টুডিও কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ।

ক্রন্দসী

১

হায়গো একি কান্না শুনি বিশ্বভুবন জুড়ে!
সেই সুরটির ঢেউ লেগেছে আমার হৃদয়পুরে!
হাজার রকম সুখের মাঝে,
নয়নভরা অশ্রু রাজে,
হাল্কা কথার হাওয়া পেলেই কপোল ভেসে যায়;
দেখছি আমার বেঁচে থাকাই হলো বিষম দায়!

২

মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ওই যে শিশু হাসে,
ওই হাসিতে একটা করুণ কান্না ছুটে আসে!
বোনের স্নেহে, প্রিয়ার চুমোয়,
সেই যে কাঁদন সুখে ঘুমোয়,
আধেক-ফোটা ফুলকুমারীর আকুল-করা রূপে,
আছড়ে-কাঁদা বসত করে বেড়ায় চুপে চুপে!

৩

ওই যে পতি-সতীর সাথে গল্পে কাটায় রাতি,
ওর মাঝে সেই মাতাল কাঁদন করছে মাতামাতি!
গভীর প্রেমের আনন্দেতে,
বক্ষ ওঠে দুঃখে তেতে,
প্রেম-আলিঙ্গন-অন্তরালে, নিদ্রালু দুই চোখে,
তৃপ্তিবিহীন সেই যে তৃষা কাঁদে সুখের শোকে!

৪

এই যে বনে, ফুলকাননে, ওই যে পাখীর গানে,
জ্যোৎস্নারাতে নেচে উঠি একটা অভিমানে!
এইগুলো সেই দুঃখে ভরা,
কেবল মাথা কুটেই মরা,
না জানি হায় কবে আমার কান্না যাবে ঘুচে!
একটা মধুর সান্ত্বনাতে ফেলবো নয়ন মুছে!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

স্বরলিপি

পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই ত তোমায় পাওয়া।
যাত্রা-পথের আনন্দ-গান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।
চায় না যেজন পিছন পানে ফিরে,
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,
তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে
যার পরাণে লাগল তোমার হাওয়া॥

পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে,
পথিক চিত্তে তোমার তরী বাওয়া।
দুয়ার খুলে সমুখ পানে যে চাহে,
তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া
বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি মন তারি উদাসে,—
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

I ণা ধা ণা । ধা পা া I ক্ষা ধা পা । মা মা মা । সা া া । সম্ মা গা ।
পা ন্ থ তু মি ০ পা ন্ থ জ নে র স ০ ০ খা ০ ০ ০

॥
গপা পা া । া া া । সা সা া । মা গা মা I পা পা পা । পক্ষা পা পা I
হে ০ ০ ০ ০ ০ প থে ০ চ লা ই সে ই ত তো মা য়

ধা া ণা । ধা পা া I সা সা । মা গা মা I পা পা পা । ধা না না I
পা ০ ও য়া ০ ০ যা ০ ত্রা প থে র আ ন ন্ দ গা ন

র্সা া র্গা । র্রা র্সা না I র্সা া া । ধা া া I নর্গা র্গা া । র্রা র্রা র্সনা I
যে ০ ০ গা ০ ০ হে ০ ০ ০ ০ ০ তা রি ০ ক ণ্ ঠে

নর্রা র্সা নর্সা । ধা পা পা I পা র্সা নর্সা । ধা া ণা II
তো মা ০ রি গা ন গা ০ ও য়া ০ ০

II পা া পা । না ধা না I র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা না I র্সা া না I
চা য় না সে জ ন্ পি ছ ন্ পা নে ০ ফি ০ ০

র্রর্সা া া I র্সা া ধা । না না া । ধা না না । র্সা র্সা না I
রে ০ ০ বায় ০ না ত রী ০ কে ব ল তী রে ০

ধনা া া । ধা পা া I র্গা র্গা র্গা । র্রা র্সা া I
তী ০ ০ রে ০ ০ তু ফা ন্ তা রে ০

র্গা র্গা া । র্রা র্সা না I র্রর্সা র্সা র্সা । ধা পা া I রা রা গা ।
ডা কে ০ অ কূ ল নী ০ ০ রে ০ ০ যা র প

গা রা গা I মা মা পা । পধা পা পা I মা গা মা । রা সা া ।
রা ণে ০ লা গ্ ল ০ তো মা র হা ০ ও য়া ০ ০

সা া সা । মা গা মা I পা পা পা । ধা না না I র্সা া র্গা ।
যা ০ ত্রা প থে র আ ন ন্ দ গা ন যে ০ ০

র্রা সা না I র্সা া া । ধা া না I র্নর্গা র্গা া । র্রা র্রা র্সনা I নর্রা র্সা নর্সা I
গা ০ ০ হে ০ ০ ০ ০ ০ তা রি ০ ক ণ্ ঠে তো মা

ধা পা পা I পা র্সা র্নর্সা । ধা া ণা II
রি গা ন গা ০ ও য়া ০ ০

II সা সা সা । মা মা া I সা মা মা । মা মা মা I মা া গা ।
পা ন্ থ তু মি ০ প থে র জ নে র স ০ ০

মগা পা ক্ষা I পা া া । া া া I ধা ধা র্সা । ধা া পা I
গা ০ ০ হে ০ ০ ০ ০ ০ প থি ক চি ০ ত্তে

ক্ষা পা া । ধা পা া I মা গা পা । পমা মা া I সমা মা মা ।
তো মার ০ ত রী ০ বা ০ ধ য়া ০ ০ দু য়া র

মা মা া I সমা মা মা । মা মা া I মা া া । মা গা পক্ষা I
খু লে ০ স ম্ মু খ পা নে ০ যে ০ ০ চা ০ ০

পা া া । া া া I ধা ধা সা । ধা পা পা I ক্ষা পা পা ।
হে ০ ০ ০ ০ ০ তা র চাও য়া যে ০ তো মা র

পধা পা া I রা গা মা । পা ধা পা I মা া া । া া া I পা পা পা । না ধা না I
পা নে ০ চা ০ ০ ০ ০ ও য়া ০ ০ ০ ০ ০ বি প দ বা ধা ০

র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা না । র্সা া না । র্রর্সা র্সা া I র্সা র্সা ধা ।
কি ছু ই ড রে ০ না ০ ০ সে ০ ০ র য় না

না না া I ধা না া । র্সা র্সা না I ধনা না া । ধা পা া I
প ড়ে ০ কো ন ০ লা ভে র আ ০ ০ শে ০ ০

পর্গা র্গা র্গা । র্রা র্সা া I র্সা র্গা র্গা । র্রা র্সা না I র্রর্সা র্সা ।
যা বা র লা গি ০ ম ন্ ত্রা রি উ ০ দা ০ ০

ধা পা া I পাসা র্সা নসা । ধা পা া I রা গা মা । ধা পা া I
সে ০ ০ যাও য়া ০ সে যে ০ তো মা র পা নে ০

মা গা মা । রা সা া I সা া সা । মা গা মা I পা পা পা । ধা না না I
যা ০ ও য়া ০ ০ যা ০ ত্রা প থে র আ ন ন্ দ গা ন

র্সা া র্গা । র্রা র্সা না I র্সা া া । ধা া না I নর্গা র্গা া । র্রা র্রা র্সনা ।
যে ০ ০ গা ০ ০ হে ০ ০ ০ ০ ০ তা রি ০ ক ণ্ ঠে

নর্রা র্সা নর্সা । ধা পা পা I পা র্সা নর্সা । ধা া ণা I "(ধা া ণা ... পা া া)" II I
তো মা ০ রি গা ন গা ০ ও য়া ০ ০ পা ন্ থ হে ০ ০

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।"

১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩২৪ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতার জয় ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

অনেক ইংরেজ ও ঔপনিবেশিক মন্ত্রী ও রাজনীতিজ্ঞ বহুবার বলিয়াছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীতে স্বাধীনতার জয় ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। এখনও এইরূপ ঘোষণার জের মরে নাই। সঙ্গে-সঙ্গে আমরা দেখিতেছি, ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা এরূপ কথা বলিতেছেন না, এরূপ কথায় সায় দিতেছেন না, বরং অধিকন্তু ইহার বিপরীত কথা বলিতেছেন এবং বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা রুশিয়ার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কত কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বড়লাট অনেক-বার বলিয়াছেন ভারতবর্ষকে অতি ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। এ পর্য্যন্ত অতি সামান্য রাষ্ট্রীয় অধিকার আমরা যাহা পাইয়াছি, এবং যেরূপ বহুবৎসর পরে পরে পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহার কথায় আশার পরিবর্ত্তে নিরাশার উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা বেশী। তিনি খবরের কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্রের নাগপাশ একটুও আলগা করিতে রাজী নন। পঞ্জাবে, বোম্বাইয়ে, মধ্যপ্রদেশে, স্বরাজ্যলাভ-প্রচেষ্টার প্রধান প্রধান কয়েকজন নেতার গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে। বোম্বাইয়ে শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর টিলক স্বরাজ্যবিষয়ক বক্তৃতার জন্য অভিযুক্ত হইয়া খালাস পাইয়াছেন। মান্দ্রাজে শ্রীমতী এনি বেসাণ্টকে নিউ ইণ্ডিয়া কাগজ লইয়া অনেক হাজার টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, এবং ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। সম্প্রতি পঞ্জাবে ছোটলাট স্বরাজ্যলাভপ্রচেষ্টা যে তাঁহার শাসিত প্রদেশে চলিতে দিবেন না, তাহা প্রকারান্তরে স্পষ্টই বলিয়াছেন। তাহা অপেক্ষাও স্পষ্ট এবং ভয়প্রদর্শক ভাষায় মান্দ্রাজের গবর্ণর বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার প্রদেশে ঐ প্রচেষ্টা দমন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করিবেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের পর গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে যেরূপ রাজনৈতিক সংস্কার করিবেন, তাহা ভারতীয় নেতাদের দাবী অপেক্ষা খুব কম হইবে, এবং তজ্জন্য দেশে নৈরাশ্য জন্মিবার সম্ভাবনা। আয়র্লণ্ডে স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন এক শতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া চলিতেছে। আইরিশরা কয়েকবার বিদ্রোহ করিয়াছে, বর্ত্তমান যুদ্ধের মধ্যেও সকল বিষয়ে স্বাধীনতাপ্রয়াসী শিন্ ফেন্ দল বিদ্রোহ করিয়াছিল। সম্প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সমুদয় আইরিশ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদিগকে মন্ত্রণা করিয়া আয়র্লণ্ডের স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যুদ্ধের পর রাজ-নৈতিক সংস্কার কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোন দলকেই কিছু বলিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আহ্বান

করেন নাই, খুব রাজভক্তদলেরও কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করেন নাই, এমন কি গবর্ণমেণ্ট যাহা করিবেন তাহা সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছেন। অধিকন্তু আমাদের উনিশ জন ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য যে-যে বিষয়ে উন্নতি ও সংস্কার আবশ্যক বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের কাগজে তাঁহাদিগকে উপহাস বিদ্রূপ করা হইয়াছে, এবং ভূতপূর্ব্ব কোন-কোন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাস্তবিকই যে পৃথিবীতে স্বাধীনতার জয় ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, এই বিশ্বাস আমাদের মনে উৎপাদন করিবার জন্য ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনকর্ত্তাদের কথা ও কাজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজনীতিজ্ঞদের ঘোষিত নীতির অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। কেন না, ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর অন্তর্গত সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর মত।

মিঃ লয়েড জর্জ লণ্ডনের গিল্ডহলের প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় ভারতবাসীদের সম্বন্ধে বলেন :—

I think I am entitled to ask that this loyal people should feel not that they are a subject race in the Empire, but partners with us. Timorous faint-heartedness, abhorrent in peace or war, in war is fatal. Britain has faced the problems of war with a courage which is amazing. She must face the problems of peace with the same brave spirit.

তাৎপর্য্য।—"এই রাজভক্ত জাতি ব্রিটিশসাম্রাজ্যে পরাধীন জাতি নহে কিন্তু আমাদের অংশীদার, যাহাতে তাহারা এইরূপ অনুভব করিতে পারে, এমন ব্যবস্থা করা হউক বলিয়া দাবী করিবার আমার অধিকার আছে। যুদ্ধের সমস্যাসকল সমাধানে ব্রিটেন আশ্চর্য্য সাহসের সহিত ব্যাপৃত আছে। যুদ্ধের পরবর্ত্তী শান্তিকালীন সমস্যাসকলের সমাধানেও ব্রিটেনকে তেমনি সাহস দেখাইতে হইবে।"

এই প্রসিদ্ধ বক্তৃতার মর্ম্ম রয়টারের তারের খবরে যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তখন তাহাতে এ-সব কথার কোন আভাসও ছিল না। পরে বিলাতী খবরের কাগজ এদেশে পৌঁছিবার পর ইহা জানা গিয়াছে। ভারতবাসীর অনুকূল কথাগুলি কে, কোথায়, কি কারণে, বাদ দিয়াছিল?

মিঃ জর্জই ত এখন সাম্রাজ্য-পরিবারের বড়কর্ত্তা। আমাদিগকে কার্য্যতঃ অংশীদার বলিয়া অনুভব করাইবার সূত্রপাত তিনিই করুন না। ভারতবর্ষপ্রবাসী ছোট কর্ত্তাদিগকে তিনি একটু সমঝাইয়া দিলে মন্দ হয় না। পাব্লিক সার্ভিস কমিশন প্রকারান্তরে ভারতবর্ষের বড়-বড় কাজগুলি ইংরেজদের একচেটিয়াই রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু এদেশের ছোটবড় সব কাজে আমাদেরই দাবী প্রথমস্থানীয়, আমরা উপযুক্ত না হইলে তবে অন্য লোকে পাইবে; এইরূপ ব্যবস্থা না হইলে আমাদের পরাধীনতা-বোধ কখনও লুপ্ত হইতে পারে না। মিঃ জর্জ এ বিষয়ে কি করিতেছেন?

ভারতবাসীদিগের সহিত আর পরাধীনজাতির মত ব্যবহার করা হইবে না, প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তিতে ফরাসীরা আনন্দিত হইয়াছেন। এই উক্তি কার্য্যে পরিণত করিবার কি আয়োজন হইতেছে, ফরাসীরা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কি? যুদ্ধ থামিবার পর, ভারতের অবস্থার পরিবর্ত্তন কি হইল, সভ্যজগতে কেহ জানিতে চাহিবে কিনা জানিনা।

"একমাত্র শাসনপ্রণালী।"

যুদ্ধ সম্বন্ধে দৌত্য ও মন্ত্রণা করিবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান অন্যতম মন্ত্রী ও ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ ব্যালফুর আমেরিকা গিয়াছিলেন। কানাডার পার্লেমেণ্টে তাঁহার খুব সম্বর্দ্ধনা হয়। তদুপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহাতে বলেন :—

We are convinced that there is only one form of government, whatever it may be called, namely, where the ultimate control is in the hands of the poeple."

"আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এই, যে, [শাসনপ্রণালী নামের যোগ্য] শাসনপ্রণালী বা গবর্ণমেণ্ট কেবল এক প্রকারের আছে,—তাহার নাম যাহাই দেওয়া হোক; তাহা সেই প্রণালী, যাহাতে, নিয়মাধীন ও দায়ী করিবার ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত থাকে।"

ইহা সত্য কথা। কিন্তু ভারতবাসীদের হাতে এরূপ কোন ক্ষমতা নাই। তাহা হইলে, দার্শনিক, মন্ত্রী ও রাজনীতিজ্ঞ মিঃ ব্যালফুরের সংজ্ঞা অনুসারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট বা শাসনপ্রণালীর কি নাম হওয়া উচিত? ইহার নাম যাহাই হউক, সেটা তত দরকারী কথা নয়। যাহাতে ইহা মিঃ ব্যালফুরের মতে শাসনপ্রণালী নামের যোগ্য হয়, এরূপ পরিবর্ত্তন করা তাঁহার ও অন্যান্য মন্ত্রীদের কর্ত্তব্য। আমাদেরও নিশ্চেষ্ট থাকিলে ত চলিবেই না। কারণ, ইহা অতি সত্য কথা, যে, যে-জাতি যেরূপ শাসন-প্রণালীর

উপযুক্ত তাহারা তাহাই পায়। আমরা হোমরুল বা স্বরাজ্য পাইবার জন্য যদি কায়মনোবাক্যে বৈধ চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমাদের অযোগ্যতাই প্রমাণিত হইবে। ভারতপ্রবাসী রাজপুরুষেরা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে আমাদের চেষ্টায় বাধা না দিলে ব্রিটিশ রাজনীতির সুনাম হয়।

কানাডার পার্লেমেণ্টে এই বক্তৃতায় মিঃ ব্যালফুর আর-একটি কথা বলেন যাহা আমাদের সুর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। তিনি বলেন, "Patriotism overcomes all difficulties," "স্বদেশ-প্রীতি সমুদয় বাধা অতিক্রম করে।" যিনি যে-প্রকারেই আমাদের বিরুদ্ধ আচরণ করুন না, আমাদের যদি আন্তরিক স্বদেশপ্রীতি থাকে, তাহা হইলে আমরা চেষ্টা করিলে সমুদয় বিঘ্ন বিনাশ করিতে পারিব।

আমেরিকা কেন যুদ্ধ করিতেছে।

গত এপ্রিল মাসে পিল্‌গ্রিম্‌স্‌ ক্লাব নামক একটি বিলাতী ক্লাব আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মিঃ পেজ্‌কে ভোজ দেন। তদুপলক্ষে মিঃ পেজ বলেন :—

"We are come to save our own honour and to uphold our ideals—come on provocation done directly to us. ("Hear, hear.") But we are come also for the preservation, the deepening, and the extension of free government. Our creed is the simple and immortal creed of democracy, which means government set up by the governed; for this alone can prevent physical or intellectual or moral enslavement."

তাৎপর্য্য। "আমরা যুদ্ধে যোগ দিয়াছি, আমাদের নিজের মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য এবং আমাদের আদর্শগুলি প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য ;—আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ ভাবে শত্রুতা করিয়া আমাদিগকে উত্তেজিত করায় আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছি। কিন্তু আমরা স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট রক্ষা করিবার, গভীরতর করিবার এবং পৃথিবীতে তাহার বিস্তার সাধন করিবার জন্যও যুদ্ধে যোগ দিয়াছি। গণতন্ত্রবাদীদের সরল অবিনশ্বর রাষ্ট্রনৈতিক মতই আমাদের মত ; সেই মতের মানে এই, যে, শাসিত যাহারা তাঁহারাই আপনাদের শাসনপ্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত রাখিবে। কেবল ইহাই মানুষের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক দাসত্ব নিবারণ করিতে পারে।"

এই-প্রকারের শাসনপ্রণালী জগতে বিস্তার করা আমেরিকার যুদ্ধে যোগ দিবার অন্যতম কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী এই-প্রকার করিবার জন্য আমেরিকা ইংলণ্ডকে অনুরোধ করিবেন কি?

জগতে ভারতের সংবাদ প্রচার।

আয়র্লণ্ডকে স্বায়ত্তশাসন দিবার জন্য ইংলণ্ডের মন্ত্রীদের যে-একটা ব্যস্ততা দেখা যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ দুটি। প্রথম কারণ এই, যে, আয়র্লণ্ডকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে যুদ্ধ-জয়ে বিলম্ব ঘটিতেছে। কেন না, অসন্তুষ্ট আয়র্লণ্ডে পাহারা দিবার জন্য অনেক সৈন্য রাখিতে হইতেছে ; আইরিশরা সন্তুষ্ট হইলে এই-সব সৈন্যকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পাঠান যাইতে পারিবে। আইরিশরাও আরও বেশী পরিমাণে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটির গুরুত্বও কম নয়। আমেরিকা হইতে এবং ব্রিটিশ উপনিবেশ-সকল হইতে অনুরোধ আসিয়াছে যে আয়র্লণ্ডের অসন্তোষ শীঘ্র দূর করা হউক, নতুবা যুদ্ধ জয়ে বিলম্ব ঘটিবে। ইংলণ্ডের মিত্রদেশসকলেরও মনের ভাব এইরূপ।

আমেরিকা ও কানাডাকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা যে ইংলণ্ডের আইরিশদিগকে হোমরুল বা স্বরাজ্য দিবার ব্যগ্রতার আংশিক কারণ তাহার যত প্রমাণ আছে, তাহার মধ্যে কিছু উল্লেখ করিতেছি। কানাডার রাজধানী অটাওয়া সহরে ১৮শে এপ্রিল তারিখে এক বিরাট সভায় সোৎসাহে আয়র্লণ্ডকে অবিলম্বে হোমরুল দিবার সপক্ষে একটি প্রস্তাব ধার্য্য হয়। তাহাতে বলা হয়, যে, জার্মেনী সৈনিক-শক্তির প্রভুত্বে এবং শাসিতদের সম্মতি ব্যতিরেকে শাসনে বিশ্বাস করে ; কিন্তু ইংলণ্ডের মিত্রেরা ক্ষুদ্র জাতিদেরও সমান অধিকারে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস-অনুযায়ী কাজ সর্ব্বত্র করাইতে হইলে আয়র্লণ্ডকে স্বরাজ্য দেওয়া প্রয়োজন।

A crowded meeting in the Russell Theatre to-night enthusiastically adopted the following resolution: "That with a view to strengthening the hands of the Allies in achieving the recognition of equal rights for small Nations and the principle of Nationality, against the opposite German principle of military domination and Government without the consent of the governed, it is, in the opinion of this meeting of Canadian citizens, essential, without further delay, to confer upon Ireland the free institutions long promised to her."

লণ্ডনের বিখ্যাত দৈনিক টাইম্‌সের নিউইয়র্কস্থ সংবাদদাতার পত্রে জানা যায় যে আমেরিকার দেশনায়ক মিঃ উইলসন দুটি প্রধান কারণে ইংলণ্ড ও তাহার মিত্রদের পক্ষ

অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে যোগ দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন—(১) রুশিয়ার জারের জয় হইলে কি গণতন্ত্রের মঙ্গল হইবে? ইহার উত্তর তিনি দিতে পারেন নাই। কিন্তু জারের পতন ও রুশিয়ায় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এই আপত্তি আর রহিল না। (২) কিন্তু আয়র্লণ্ডের প্রতি ইংলণ্ডের ব্যবহার আর একটি বাধা। তৎসম্বন্ধে তিনি মিঃ লয়েড্ জর্জকে চিঠি লিখিবেন এইরূপ শুনা গিয়াছিল; সম্ভবতঃ লিখিয়াছেন। মার্কিনদের মতও তাহাদের দেশনায়কেরই অনুরূপ।

The Times New York correspondent had taken some pains to sound American opinion on the subject and he felt "No hesitation in stating, that from President Wilson downwards the people of the country feel that now is the psychological moment to solve the Irish problem in the interest of the Allies and, above all, in the interest of the most effective possible participation of the United States in the war." "Those who are acquainted with the mind of the President," the correspondent added, "know that before the autocratic frightfulness of Germany finally drove him into declaring war for the salvation of democracy he was constantly confronted by two arguments which he found it very difficult to answer. One of these arguments concerned Russia. When he was asked: 'Do you think the victory of Tsardom will be in the interests of democracy?' he was reduced to silence. The recent revolution dramatically removed this obstacle to a clear vision of the issue of the war as a struggle between democracy and autocracy. It dissipated the last scruples of the President, but it left Great Britain in the anomalous light of being the only Power in the democratic Entente which was open to the charge of 'oppressing' a small nation."

ভারতবর্ষকে আত্মশাসনক্ষমতা দিবার জন্য কেহ ইংলণ্ডকে অনুরোধ করিতেছে না কেন? আয়র্লণ্ড অপেক্ষা আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার ত খুব কম। ইহার একটা কারণ, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সত্য সংবাদ জগতে প্রচারিত হয় নাই।

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে এবং তদ্বিষয়ে আমাদের মনের ভাব সম্বন্ধে ঠিক্ জ্ঞান যদি ইংলণ্ডের মিত্রদেশ-সকলের এবং ব্রিটিশ উপনিবেশ-সকলের থাকিত, তাহা হইলে আমরা আইরিশদের সমান সহানুভূতি পাইতাম, এমন কথা বলিতে পারি না। কারণ আমরা ইউরোপীয় নই, খৃষ্টিয়ান নই, এবং আমাদের গায়ের চামড়াটা কটা নয়। কিন্তু কেহ না কেহ হয়ত ভারতবাসীদিগকে রাজনৈতিক অধিকার দিবার জন্য অনুরোধ করিত; বিশেষতঃ যদি লোকের এই ধারণাটা জন্মিত যে ভারতবর্ষকে সন্তুষ্ট না করিলে যুদ্ধজয়ে বিলম্ব ঘটিবে। এই জন্য যতপ্রকারে সম্ভব ভারতবর্ষের খাঁটি-খবর সভ্য জগতের লোকদিগকে দেওয়া উচিত।

কিন্তু সভ্যজগতের অন্যান্য দেশের কথা দূরে থাক্, ইংলণ্ডেই আমাদের খবর অতি অল্প লোকে জানে। আমাদের কথা বলিবার জন্য কয়েকজন নামজাদা ভারতবাসী শীঘ্র বিলাত যাইবেন বলিয়া কাগজে সম্প্রতি তাঁহাদের নাম ছাপা হয়। তাঁহাদের মধ্যে কাহার কাহার সম্মতি ছিল, জানি না। কিন্তু কেহই গেলেন না; কারণ, সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন্ বলিয়াছেন, এখন সেখানে কাজ করার সুবিধা নাই! আমাদের বোধ হয়, একজন মানুষের পরামর্শ এত বেশী করিয়া শিরোধার্য্য করা ভাল নয়। তিনি ভাল লোক হইলেও ভ্রমপ্রমাদের অতীত নহেন। আমাদের বিবেচনায়, যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে কি পরিবর্ত্তন দরকার, তাহা বিলাতে জানাইবার সময় আসিয়াছে ও চলিয়া যাইতেছে।

নিজের উপর নির্ভর।

এরূপ কেহ যেন মনে না করেন যে ইংরেজরা নিজে বা অন্য দেশের লোকদের অনুরোধ উপরোধে আমাদিগকে স্বরাজ্য দিবে। আমাদিগকে স্বশাসন-ক্ষমতা না দিলে আর চলিতেছে না, এইরূপ অবস্থা না দাঁড়াইলে, অর্থাৎ ইংলণ্ডের উপর চাপ না পড়িলে, ইংলণ্ড আমাদিগকে হোমরূল বা স্বরাজ্য দিবে না, ইহা নিশ্চিত। সেরূপ অবস্থা দাঁড় করাইবার প্রথম উপায়, আমাদের নিজেদের এই বিশ্বাস দৃঢ় ও স্বাভাবিক হওয়া, যে, মুক্ত মানুষই মানুষ। বড়মানুষদের ঘোড়ার ও কুকুরের শরীরের যত্ন এবং খাওয়া-দাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা যেমন সুন্দর, আমাদের মত অনেক মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনাদির বন্দোবস্ত তেমন নয়। তথাপি আমরা বড়মানুষের ঘোড়া বা কুকুর হইতে চাই না; মানুষ থাকিতেই চাই। অন্যেরা আমাদের ব্যবস্থা, বড়মানুষদের ঘোড়ার মত উৎকৃষ্ট, করিয়া দিলেও আমরা তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। আমরা নিজের বন্দোবস্ত নিজে করিতে চাই; কারণ নিজের কাজ নিজে করিতে পারাই মনুষ্যত্ব। ইংরেজরা ও তাহাদের মিত্রেরা যে বলিতেছে, যে, গণতন্ত্রই একমাত্র শাসনপ্রণালী, এই

বিশ্বাসটা আমাদের দেশের সকল লোকের জন্মিলে হোম-রুল বা স্বরাজ্য পাইতে দেরী হইবে না। দ্বিতীয় উপায়, যাহাতে আত্মমর্য্যাদার হানি হয়, এরূপ কোন কাজ করিতে বা এরূপ কোন অবস্থায় পড়িতে বা থাকিতে রাজী না হওয়া। তৃতীয় উপায়, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়পরতা, ও সাধুতার সহিত, মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য নিজের নিজের কাজ করা। চতুর্থ উপায়, স্বরাজ্যের একান্ত আবশ্যকতা সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচার করা।

উপরে ইংলণ্ডের উপর চাপ পড়ার উল্লেখ করিয়াছি। কোন-প্রকারের দৈহিক বা আগ্নিক বল প্রয়োগ দ্বারা এই চাপ দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে; তাহাতে সিদ্ধিলাভ হইবে না। আমরা যে চাপের কথা বলিতেছি, তাহা মানসিক ও নৈতিক বলের উপর নির্ভর করে। যিনি নিজে কাহারও অনিষ্ট করিবেন না, কাহাকেও আঘাত করিবেন না, কিন্তু নিজের বা দেশের পক্ষে যাহা অনিষ্টকর বা অপমানজনক তাহাও মানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত ক্ষতি ও ক্লেশ এবং দুর্লঙ্ঘ্য বাধাসত্বেও তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন, এবং সেই চেষ্টা করিতে গিয়া প্রয়োজন হইলে নিজে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সহ করিবেন,—এরূপ মানুষই এই-প্রকার মানসিক ও নৈতিক বল প্রয়োগ করিতে পারেন।

সকল দেশের সকল মানুষের সকল অবস্থাতেই দুর্গতিমোচনের প্রকৃষ্ট উপায় কি, আমরা বিশেষ আলোচনা না করিয়া বলিতে পারি না। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই বলিলাম।

সহানুভূতি।

এমন মানুষও পৃথিবীতে জন্মিয়াছেন, যাঁহারা ইতর-প্রাণীদেরও দুঃখে দুঃখ বোধ করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণতঃ কোন মানুষ, এত দয়ালু না হইলেও, অন্য মানুষের কষ্টে বেদনা বোধ করিয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিলে আমরা তাঁহার প্রশংসা করি। মানুষের এই সমবেদনা অনেক সময় কেবল স্বশ্রেণীর স্বজাতির স্বদেশের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। "সভ্য" দেশের অধিকাংশ লোক "অসভ্য" লোকদের দুঃখ বুঝিতে পারে না, অন্তরের মধ্যে তাহাদিগকে ঠিক্ মনুষ্য বলিয়া উপলব্ধিই করিতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশসকলে, বিশেষতঃ আমেরিকায়, যখন দাসত্ব-প্রথা প্রবল ছিল, তখন নিগ্রোরা যে মানুষ ইহা অনেক পাদ্রী পর্য্যন্ত মানিত না। আমাদের দেশের "অস্পৃশ্য" জাতিরাও কার্য্যতঃ মানুষ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই; এখন কিয়ৎ পরিমাণে হইতেছে।

মানুষ এমন অবুঝ যে অনেক সময় চড় না খাইলে অন্যের মনুষ্যত্ব স্বীকার করিতে চায় না। জাপান রুশিয়াকে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তবে মানুষের শ্রেণীতে অর্থাৎ "সভ্য"-জগতে স্থান পাইয়াছে। তথাপি অনেক "সভ্য" দেশের লোক এখনও জাপানীদিগকে শ্বেতকায়দের মত অবাধে আপনাদের দেশে বাণিজ্যাদি করিতে দেয় না। তজ্জন্য, জাপানীরা আপনাদের দেশের সভ্যতার বৃত্তান্ত বিদেশীদিগকে জানাইয়া, জাপানে কি কি দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতব্য, সম্ভোক্তব্য, শিক্ষণীয় আছে, তাহা প্রচার করিয়া, বিদেশীরা জাপান গেলে তাহাদের আরামের বন্দোবস্ত করিয়া, নানা বিদ্যায় উন্নতি লাভ করিয়া, অপর শক্তিশালী জাতি-সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে, যে, তাহারা তাহাদের সমকক্ষ সমশ্রেণীস্থ, এবং মানুষের মত ব্যবহার পাইবার যোগ্য।

নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ শক্তিশালী জাপানকে যখন এত চেষ্টা করিতে হইতেছে, তখন রাষ্ট্রীয়শক্তিহীন ভারত-বর্ষের চেষ্টা কিরূপ একাগ্র ও প্রবল হওয়া উচিত, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। রাষ্ট্রীয় শক্তি লাভের চেষ্টা আমাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে; আমরা স্বদেশে হীন থাকিব, অথচ বিদেশে আমাদিগকে স্বাধীন জাতির লোকদের সমান সুবিধা ও অধিকার দেওয়া হইবে, ইহা দুরাশা মাত্র। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শক্তি লাভের চেষ্টাই যথেষ্ট নহে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জগতের জন্য কি করিয়াছিলেন তাহা প্রচার করাও যথেষ্ট নয়;—তাঁহাদের কীর্ত্তিসম্বন্ধীয় অনুসন্ধানও প্রধানতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা করিয়াছেন। সভ্য জগৎকে বুঝাইতে হইবে যে জীবিত ভারতবাসী-দিগকে বাদ দিলে মানবসমাজের ক্ষতি আছে। মানুষের সভ্যতা বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, তাহাতে আমরা পৃথিবীকে বর্ত্তমান সময়ে সমৃদ্ধ করিতেছি কি না দেখিতে দেখাইতে

হইবে। ধর্ম্মে, সামাজিক ব্যবস্থায়, শিক্ষাদান-প্রণালীতে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে, বর্ত্তমান যুগের ভারতবাসীরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসকলকে কি শিখাইতে পারেন, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। দুএকজন মনীষী দেশে জন্মিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। তাঁহারা আমাদের উন্নতির সম্ভাবনার লক্ষণ ও মাপকাঠি মাত্র। সমগ্র জাতিটা এখনও সব বিষয়ে উন্নত ও অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হয় নাই। কোন্ বিদেশে আমাদিগকে ঢুকিতে দেয় না, ভাল পাড়ায় থাকিতে দেয় না, রাস্তার ফুটপাথে চলিতে দেয় না, এ-সব ভাবিয়া শুধু বিলাপ বা আক্রোশ প্রকাশ করা বৃথা। আমরাও আমাদের স্বদেশী অনেক শ্রেণীর লোকের প্রতি এই-প্রকার ব্যবহার করি। আমরা সকলকে সমান অধিকারের যোগ্য মনে করিয়া, স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর উন্নতিতে মন দিলে নিশ্চয়ই আমাদের দুঃখ দূর হইবে।

পুস্তক, সাময়িক পত্র ও খবরের কাগজের দ্বারা বিদেশীদিগকে ভারতবর্ষের কথা জানান ছাড়া আরও একটি উপায় অবলম্বন করা আমাদের উচিত। বিদেশীরা ভারতবর্ষে আসিয়া যে-সব হোটেলে থাকে, তাহার প্রায় সমস্তই ইংরেজদের দ্বারা চালিত। বিদেশী ভ্রমণকারীরা হোটেলে বা কাহারও অতিথি হইয়া থাকিলে ইংরেজদের সংসর্গেই থাকে, ইংরেজরা ভারতবর্ষকে যেমন করিয়া দেখায় তেমনি করিয়া দেখে। আমরা যদি কোথাও তাহাদের অভ্যর্থনা করি, তাহাও বিলাতী পোষাক পরিয়া বিলাতী ধরণে করি। এইরূপে বিদেশীরা "ভারতবাসীর ভারতবর্ষ" দেখিবার ও তাহাকে জানিবার সুযোগ পায় না। ইহার কোন প্রতিকার কি আমরা করিতে পারি না?

বন্ধন।

রাষ্ট্রীয় বন্ধনকেই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসহ বন্ধন মনে করা পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাভাবিক। এই বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক। স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা লাভ করিবার চেষ্টা করাও সকলেরই উচিত। ইহা ব্যতিরেকে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাই একমাত্র বা সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর বন্ধন নহে। সকলের চেয়ে দুশ্ছেদ্য বন্ধন প্রত্যেক মানুষের অন্তরে রহিয়াছে। ভিতরের নাগপাশ, ভিতরের গ্রন্থি, যিনি কতক পরিমাণেও ছেদন করিতে পারিয়াছেন, বাহিরের বন্ধন তাঁহাকে পঙ্গু করিয়া রাখিতে পারে না। বিগতভয়, বিগতমোহ, বশী যিনি, তিনিই বাস্তবিক স্বাধীন।

পোল্যাণ্ড ও ফিন্‌ল্যাণ্ড।

রুশিয়ার লোকেরা স্বাধীনতাপ্রিয়তার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে, যে বাস্তবিক স্বাধীনতা ভালবাসে, সে নিজে স্বাধীন থাকিয়া অপরকে অধীন রাখিতে চায় না। বহুকাল পূর্ব্বে জার্ম্মেনী অষ্ট্রীয়া ও রুশিয়ার রাজারা পোল্যাণ্ড দেশকে আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিল। তদবধি পোল্যাণ্ডের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। রুশিয়ার লোকেরা তাহাদের সম্রাট্‌কে পদচ্যুত ও বন্দী করিয়া আপাততঃ যে গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত করিয়াছে, তাহা প্রথমেই যে-সব কাজ করিয়াছে, তন্মধ্যে, পোলদিগের রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকার করা, একটি। রুশরা ঘোষণা করিয়াছে, পোলদের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ এবং শাসন-প্রণালী কিরূপ হইবে তাহা তাহারাই নিজে স্থির করিবে, এবং স্বাধীন পোল্যাণ্ড-রাষ্ট্র গঠিত হইলে ইউরোপে স্থায়ী ভাবে শান্তি স্থাপনের উহাতে খুব সাহায্য হইবে। রুশরা কেবল পোল্যাণ্ডকেই স্বাধীন ও শক্তিশালী হইবার সুযোগ দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই; তাহারা ফিন্‌দের রাষ্ট্রীয় দাবী সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতেছে। ফিন্‌রা স্বরাজ্য চায়, এবং চায়, যে, তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য শক্তিশালী জাতিরা প্রতিশ্রুত থাকিবেন। ফিন্‌রা যে রুশিয়ার প্রভুত্বপাশ হইতে মুক্ত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রুশরা খুব সুদৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। রুশিয়ার মিত্রদের সঙ্গে রুশ-সম্রাটের সন্ধির এই একটা সর্ত্ত ছিল যে যুদ্ধে জয়ের পর তুরস্কের রাজধানী কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল রুশিয়ার হস্তগত হইবে। কিন্তু নূতন রুশীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, তাঁহারা পরের দেশ দখল করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন না, তাঁহারা কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল চান না।

খীবা ও বোখারায় প্রজার অধিকার।

লণ্ডনের টাইমস্ কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে, রুশিয়ার বিপ্লব হওয়ায় তাহার প্রভাবে বোখারার আমীর এক

ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন যে দেশ-শাসনসম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে সংস্কার করিবেন। তিনি কারাগারে আবদ্ধ সমুদয় লোককে ছাড়িয়া দিতেও হুকুম দিয়াছেন। খীবার খাঁও এই-প্রকার ঘোষণাপত্র জাহির করিয়াছেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষের স্থান।

ভারতসচিব চেম্বারলেন সাহেব বলিয়াছেন যে ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যের মন্ত্রীসভার যে বার্ষিক অধিবেশন হইবে, তাহাতে ভারতবর্ষেরও প্রতিনিধি থাকিবেন। ভারতসচিব স্বয়ং এবং ভারতগবর্ণমেণ্টের মনোনীত একজন লোক প্রতিনিধিত্ব করিবেন। এই মনোনীত লোকটি সাধারণতঃ ভারতবর্ষীয় হইবেন, কিন্তু বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় ইংরেজও মনোনীত হইতে পারিবেন। এই বিশেষ অবস্থাগুলি কি, জানি না।

ভারতসচিব বলিতেছেন, এই-প্রকার প্রতিনিধিত্বে অধিকার পাওয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষের স্থানটা খুব বেশী উঁচু হইল। আমরা তাহা মনে করি না। আমরা যদি হোমরূল পাই, সাম্রাজ্যের মন্ত্রীসভার বার্ষিক অধিবেশনে নিজেরা যোগ্য ভারতীয় লোকদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে পারি, তাহা হইলে সাম্রাজ্যে ভারতের স্থান এখনকার চেয়ে উঁচু হয় বটে।

উপনিবেশগুলির সহিত ব্যতীহার।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মন্ত্রণাসভায় ভারতসচিব ভারতবর্ষের "প্রতিনিধি" হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য এবং তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট বিকানীরের মহারাজা, সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এবং সার্ জেম্‌স্ মেষ্টনকে পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহারা মন্ত্রণা-সভায় উপস্থিত থাকিবার এবং বক্তৃতা করিবার অধিকারও পাইয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলা হইতেছে। তাহা আমরা স্বীকার করি না। আমরা ইঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করি নাই, এবং সাম্রাজ্য-সভায় ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে কি বলিতে হইবে, ভারতবর্ষের লোকদের বা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের নিকট হইতে তাঁহারা তদ্বিষয়ে কোন ভার পান নাই বা লন নাই। সুতরাং তাঁহারা যাহা কিছু বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ভারতবাসীরা কোন-প্রকার অঙ্গীকারবদ্ধ হয় নাই, তাহার জন্য আমরা দায়ী নহি। তাঁহারা ন্যায্য কথা যাহা বলিয়াছেন, অবশ্য তাহার জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ভারতবর্ষের লোকেরা অবাধে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে গিয়া মজুরী বা অন্যবিধ উপায়ে উপার্জ্জন এবং বসবাস করিতে পারে না; কোথাও কোথাও এখন আর যাইতেই পারে না। কানাডায় কয়েক বৎসর আগে কতকগুলি ভারতবর্ষীয় লোক গিয়া বসবাস করে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহারা পরিবার লইয়া যাইতে পারে নাই।

উপনিবেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ এইরূপ। কিন্তু ঔপনিবেশিকেরা যে-কেহ স্বচ্ছন্দে এদেশে আসিতে এবং যে-কোন প্রকারে ইচ্ছা রোজগার করিতে ও বসবাস করিতে পারে। এ-রকম সম্বন্ধ ন্যায্য নয়। তুমি আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিবে, আমিও তোমার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারিব, ইহাই ন্যায্য বন্দোবস্ত। ইহাকে ইংরেজীতে বলে reciprocity, বাংলায় ব্যতীহার।

ভারতবর্ষের তথাকথিত "প্রতিনিধি" তিন জন, ভারতের সহিত উপনিবেশগুলির সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব মন্ত্রণাসভায় পেশ করেন, এবং মন্ত্রণা-সভা সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশিক গবর্ণমেণ্টের সানুগ্রহ বিবেচনার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

প্রথম প্রস্তাব। যে-সব ভারতীয় লোক কোন উপনিবেশে স্থায়ী ভাবে বাসিন্দা হইয়াছে, তাহাদিগকে স্ত্রী ও নাবালক সন্তানগণকে আনিতে দেওয়া হউক। এই প্রস্তাবটি অতি উত্তম ও ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু কোন পুরুষ বহু-বিবাহিত হইলে একাধিক স্ত্রীকে বা তাহাদের সন্তানকে আনিতে দেওয়া হইবে না। বহুবিবাহ কুপ্রথা, এবং প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অনুসারে উহা অবৈধ। খৃষ্টিয়ানদের দেশে যাহাতে কোন-প্রকারে বহুবিবাহের নিকৃষ্ট আদর্শ প্রবর্ত্তিত না হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করিবার অধিকার এই-সব দেশের আছে। কিন্তু যদি কোন উপনিবেশে এমন কোন ভারতবাসী স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছে, যাহার একাধিক স্ত্রী আছে, সে কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে লইয়া যাইবে? এইজন্য এইরূপ নিয়ম করিলে ভাল হয়, যে, কোন উপনিবেশের বর্ত্তমান যে-সব

ভারতীয় স্থায়ী বাসিন্দার বহুবিবাহ ঐ উপনিবেশে যাইবার পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রমাণ আছে, তাহারা একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্ত্রী ও সন্তানদিগকে আনিতে পারিবে, তাহার পর আর কেহ একাধিক স্ত্রী বা তাহার সন্তান আনিতে পারিবে না। বিবাহিতা নারীদের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য এই নিয়ম করিতে বলিতেছি।

প্রথম প্রস্তাবে ইহাও বলা হইয়াছে, যে, অন্যান্য বিষয়ে, স্থায়ী ভারতীয় বাসিন্দাদের সুবিধা ও অধিকার স্থায়ী জাপানী বাসিন্দাদের চেয়ে কম হইবে না। ইহা মন্দের ভাল, কারণ এখন আমাদের সুবিধা ও অধিকার জাপানীদের চেয়ে কম আছে। কিন্তু আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী, জাপানীরা নহে; সুতরাং আমাদের সুবিধা ও অধিকার জাপানীদের চেয়ে বেশী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্বেত অধিবাসীদের সমান হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সাম্য স্থাপিত হয়। আমরা কিন্তু চাই যে আমাদের ও জাপানীদের, উভয়েরই অধিকার শ্বেত ব্রিটিশ প্রজাদের সমান হউক। যাহা হউক, আমাদের অধিকার জাপানীদের চেয়ে কম হইবে না, ইহার মানে, অন্ততঃ সমান হইবে, বেশীও হইতে পারে। সুতরাং যদি আমাদিগকে বেশী অধিকার দিয়া পরে জাপানীদিগকেও তদ্রূপ অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে কাহারও মন ক্ষুণ্ণ হয় না।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সম্ভব হইলে, উপনিবেশে মজুরী বা বসবাসের জন্য ভবিষ্যতে ভারতীয়দের প্রবেশ অন্য কোন এসিয়াজাত লোকদের প্রবেশের বিধি অপেক্ষা কম সুবিধাজনক বিধি দ্বারা নিয়মিত হইবে না। "সম্ভব হইলে" কথা দুটিতে আপত্তি আছে। উহা উঠিয়া যাওয়া উচিত। দ্বিতীয় মন্তব্য এই যে আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী; সুতরাং অন্য কোন এশিয়াবাসী জাতির সঙ্গে তুলনা না করিয়াই আমাদিগকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া কর্ত্তব্য। শেষ মন্তব্য এই, যে, এশিয়ার লোকেরা ইউরোপের লোকেদের চেয়ে নিকৃষ্ট বলিয়া কেন ধরিয়া লওয়া হয়? ইউরোপের যত শ্বেত ভবঘুরো এশিয়ার সব লোকের চেয়ে সুবিধাজনক নিয়মে ব্রিটিশ উপনিবেশ-সকলে যাইবার, খাটিবার ও থাকিবার অধিকার পাইবে কেন? ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অন্যায়। ইহাতে আমরা সায় দিতে পারি না।

তৃতীয় প্রস্তাব। দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসারে কাজ করা অসম্ভব হইলে, মজুরী কিম্বা স্থায়ী বসবাসের জন্য বিদেশযাত্রা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ও বিশেষ বিশেষ উপনিবেশের মধ্যে ব্যতীহার হইবে। যদি কোন উপনিবেশ এই দুই-রকমের ভারতীয় যাত্রীকে ঢুকিতে না দেয়, ভারতবর্ষও তাহা হইলে ঐ উপনিবেশের এই দুরকম যাত্রী এদেশে আসিতে দিবেন না। পরিষ্কার করিয়া মানিয়া লইতে হইবে, যে, জাতিগত প্রতিকূল সংস্কার (racial prejudice) বশতঃ কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ হইবে না, কেবল ভারতবর্ষ ও উপনিবেশ-বিশেষের ধনোৎপাদনাদি বিষয়ক পার্থক্যের জন্যই (owing to different economic conditions) হইবে।

এই তৃতীয় প্রস্তাবটিতে আমরা কখনই সম্মত হইতে পারি না। প্রকৃত এবং ন্যায্য ব্যতীহার হইতেছে এই, যে, তোমরাও আমাদের দেশে আসিয়া কোন-প্রকারে রোজগার করিতে পারিবে না, আমরাও তোমাদের দেশে গিয়া কোন উপায়ে রোজগার করিতে পারিব না; অথবা তোমরাও পারিবে, আমরাও পারিব। কি উপায়ে রোজগার করা হইতে পারিবে বা পারিবে না, তাহা যেভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে ভারতবাসীদিগকে ঠকিতে হইবে। ঔপনিবেশিকেরা মজুরী করিবার জন্য বা স্থায়ী বাসিন্দা হইবার জন্য এদেশে আসে না; তজ্জন্য আসিবার তাহাদের দরকার নাই। তাহারা সরকারী বা বেসরকারী চাকরী, বাণিজ্য, কারখানা স্থাপন, এই-সব করে; তাহাতে বাধা হইবে না। ভারতবর্ষের লোকেরা কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে মজুরী করিতে ও তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হইতে যাইতে চাহিতে পারে; অনেকে পূর্ব্বে গিয়াছে। ইহাতে এখন যেমন বাধা আছে, তাহা থাকিয়া যাইবে। সুতরাং এই তৃতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যতীহারে আমাদের ক্ষতি আছে, ঔপনিবেশিকদের কোন ক্ষতি নাই। কথামালার শৃগাল ও সারসের গল্পটি মনে পড়িতেছে। শৃগাল সারসকে খাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া, থালায় ঝোল রাখায়, শৃগালের চাটিয়া চাটিয়া খাইবার সুবিধা হইল, কিন্তু সারসের হইল না। অবশ্য গল্পে আছে যে সারস শৃগালকে নিমন্ত্রণ করিয়া কুঁজোর মধ্যে ঝোল

রাখিয়া তাহার ভদ্রতার ঋণ শোধ করিল। ফল এই হইল, যে, কুজোর মধ্যে সারসের ঠোঁট ঢুকিল, কিন্তু শৃগালের মুখ না ঢুকায় তাহাকে উপবাসী থাকিতে হইল। আমাদের কিন্তু উপনিবেশিকদিগের সৌজন্য এই-প্রকারে শোধ দিবার ক্ষমতা নাই। আরও একটা গল্প আছে, যে, যখন বাঘে ও হাতীতে বন্ধুত্ব ছিল, তখন এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে তাহাদের মধ্যে কখনও শক্রতা হইলে তাহারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধে সব-রকম অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না। ধূর্ত্ত বাঘ বলিল যে কেবল থাবা মারিয়া যুদ্ধ চলিবে। বোকা হাতী তাহাতেই রাজী হইল। পরে যখন শক্রতা-বশতঃ লড়াই হইল, তখন বাঘ থাবার এক এক আঘাতে হাতীর চামড়া ও মাংস খতকখানি করিয়া ছিঁড়িয়া লইতে লাগিল; হাতী কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণনখরহীন থামের মত পা গুলা দ্বারা বাঘকে আঘাত করিতে পারিল না। সে বাঘের মত ধূর্ত্ত হইলে, বন্ধুত্বের সময় বলিয়া রাখিত যে কেবল শুঁড় দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া পায়ে থ্যাঁৎ-লাইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে।

জাতিগত প্রতিকূল সংস্কার বশতঃ কেহ কাহারও প্রবেশ রোধ করিতে পারিবে না, এরূপ কথা তুলাই হাস্য-কর; কেননা, ঔপনিবেশিকেরা স্বয়ং বরাবর ইউরোপের ও এশিয়ার লোকের মধ্যে জাতিগত কারণে প্রভেদ করিয়া আসিতেছে।

কোন কোন এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ বলিতেছে, ঔপনিবেশিকরা এদেশে কলকারখানা স্থাপন করিলে অনেক ভারতীয় লোক চাকরী ও মজুরী পায়, তাহাতে দেশের লোকদের উপকার হয়; কিন্তু ভারতবর্ষীয় লোকেরা উপনিবেশে মজুরী করিতে গেলে মজুরীর দর কমিয়া যাওয়ায় তথাকার শ্বেত শ্রমজীবীদের অসুবিধা হয়। ইহার উত্তর এই, যে, এদেশে কোন কোন ব্যবসা বাণিজ্য ও কল-কারখানার ক্ষেত্র বিদেশীরা যে-পরিমাণে অধিকার করিয়া বসিবে সেই পরিমাণে আমাদের কার্য্যক্ষেত্র সংকীর্ণ হইবে, এবং আমাদের সেই সেই কাজে প্রবৃত্ত ও লাভ-বান হইবার পথে ঐ বিদেশীরা বাধা দিবে। ঔপ-নিবেশিকরা ত আমাদের কাহারও উপকারের জন্য এখানে আসে না; আসে টাকা রোজগারের জন্য। আমাদের কাহারও কাহারও উপকার তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির উপায়-স্বরূপ আনুষঙ্গিক ঘটনা মাত্র। পক্ষান্তরে, ভারতবাসী শ্রমজীবীদের দ্বারা উপনিবেশসকলের ধনবৃদ্ধি হইয়াছে। তা ছাড়া নিরপেক্ষ লোকেরা বলেন যে কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, প্রভৃতি উপনিবেশে প্রাচ্য শ্রামিকের প্রয়োজন আছে। অষ্ট্রেলিয়া বিস্তৃত মহাদেশ। তথাকার অনেক বিস্তীর্ণ প্রদেশ কেবল উষ্ণদেশবাসীদের বাসের ও শ্রমের উপযোগী বলিয়া অনধ্যুষিত ও অকৃষ্ট অবস্থায় পড়িয়া আছে; অষ্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা অতি সামান্য, তাহাও অতি অল্পই বাড়িতেছে। অষ্ট্রেলিয়গণ এশিয়াবাসীদিগের প্রবেশ বন্ধ করিয়া কথামালায় বর্ণিত অশ্বগণের আহারস্থানশায়ী কুক্কুরের মত ব্যবহার করিতেছে।

ভারতপ্রবাসী সকল ঔপনিবেশিক কলকারখানা স্থাপন করিয়া শত শত মজুরের অন্নের সংস্থান করিয়া দেয় না। অনেকে অন্যপ্রকারে উপার্জ্জন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব্ পুলিস্ ম্যারিস্ নামক ঔপনিবেশিকের নাম করা যাইতে পারে।

চতুর্থ প্রস্তাব। উল্লিখিত প্রবেশনিষেধ সম্বন্ধীয় বন্দো-বস্তের সঙ্গে সঙ্গে, ভ্রমণকারী, ছাত্র, প্রভৃতির যাতায়াতের পূর্ণ সুবিধা দেওয়া হইবে; কিন্তু ইহারা কেহ মজুরী করিতে বা স্থায়ী বাসিন্দা হইতে পারিবে না। আমেরিকায় অনেক ছাত্র মজুরী করিয়া শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করে। আমাদের ছাত্রেরা কানাডা বা অন্য উপনিবেশে গিয়া এরূপ করিতে চাহিলে তাহা করিতে দেওয়া উচিত। অবশ্য তাহাদিগকে কলেজের সার্টিফিকেট দেখাইয়া প্রমাণ করিতে হইবে যে তাহারা ছাত্র। এইরূপ সামান্য কয়েক জন ছাত্রের প্রতিযোগিতায় ঔপনিবেশিক শ্রমজীবীদের ক্ষতি হইবে না।

চুক্তিবদ্ধ কুলি চালান বন্ধ।

গত ২৩ শে মে তারিখে ভারতসচিব হাউস্ অব্ কমন্সে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ হইতে কোন ব্রিটিশ উপনিবেশে পুনর্ব্বার কুলি চালান প্রথা আরম্ভ করা হইবে না। এখন যুদ্ধ উপলক্ষে শ্রমজীবীর দরকার বলিয়া উহা বন্ধ আছে। আনন্দের বিষয়।

বালিকাও অবশ্যশিক্ষণীয়া।

কোন কোন দেশীয় রাজ্যে প্রত্যেক বালকের পিতা-মাতাকে তাহাকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে বাধ্য করা হয়। মহীশূরে আর্থিক অবস্থার উন্নতিবিধায়িনী যে আলোচনা-সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে এবৎসর তত্রত্য মহারাজার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়স্কা বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে পিতামাতাকে বাধ্য করা উচিত। তিনি বলেন মহীশূরের মহিলাসমিতিগুলি বালিকাদের এইরূপ অবশ্যশিক্ষণীয়তাবিষয়ক আইনের সপক্ষে। যে মিউনিসিপালিটি বালিকাদিগকে শিক্ষাদানের অবশ্যকর্ত্তব্যতার বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন, যে, পুরুষেরা রক্ষণশীলতা বশতঃ এরূপ নিয়মের বিরোধী বটে, কিন্তু নারীরা ইহার পক্ষপাতী। এই প্রস্তাব লইয়া খুব তর্ক বিতর্ক হয়। শেষে ইহার সপক্ষে বিরুদ্ধপক্ষ অপেক্ষা একটি ভোট বেশী হওয়ায় ইহা গৃহীত হয়। সুসংবাদ। বাংলাদেশে অনেক "বিজ্ঞ," "শিক্ষিত" লোকে বালিকা ও নারীদের শিক্ষা এখনও উপহাসের বিষয় মনে করেন। কেহ কেহ ভাবেন, কথায় ও কাজে ইহার সমর্থন করা ব্রাহ্মদেরই শোভা পায়। মহীশূর কিন্তু হিন্দু রাজ্য। যে সভায় এই প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে, তাহা তথাকার সরকার পক্ষ হইতে আহূত ও সরকারী লোকের দ্বারা পরিচালিত। মহীশূরে ৫৭ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে কেবল ৪৫ জন ব্রাহ্ম। মহীশূর নারীশিক্ষায় বাংলা দেশের চেয়ে খুব পশ্চাতে পড়িয়া থাকায় অত্যুন্নত বাঙ্গালীদের সমকক্ষ হইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছে, এরূপ বলিবারও যো নাই। বাংলা দেশে হাজারে ১১ জন স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে পারে, মহীশূরে হাজারে ১৩ জন স্ত্রীলোক পারে।

শ্রীমতী গৌরী আম্মা।

ত্রিবাঙ্কুড় ও মালাবারের একটি তথাকথিত "অস্পৃশ্য" জাতির নাম এজাভা। ত্রিবাঙ্কুড়ে শ্রীমতী গৌরী আম্মা নাম্নী এজাভা-জাতীয়া একটি মহিলা বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তদুপলক্ষে ঐ রাজ্যের শ্রীনারায়ণ-ধর্ম্ম-পরপালন-যোগম্ নামক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুসমিতি সভা আহ্বান করিয়া শ্রীমতী গৌরীকে অভিনন্দন করেন, এবং ত্রিবাঙ্কুড়ের এজাভা নারীরা তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেন। শ্রীমতী গৌরী এম্-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। বাংলা দেশে কোন মুচি হাড়ি বা বাউরী জাতীয়া নারী বি এ পাস্ করিলে ধর্ম্মসমাজগুলের তাঁহাকে অভিনন্দন করা আবশ্যক হইবে।

পারস্যে নারীর অবস্থা।

পারস্যদেশের নারীদের অবস্থা ও শিক্ষা সম্বন্ধে একজন তদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক বিলাতের পেল মেল গেজেটে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, পারস্যদেশের লোকেরা মুসলমান। তিনি বলেন তথাকার নারীরা বরাবরই বহু বিষয়ে শিক্ষা পাইতেন। গত কুড়ি বৎসরে তাঁহাদের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কুড়ি বৎসর আগে তাঁহারা প্রধানতঃ ধর্ম্ম, কাব্য ও প্রাচীন ফারসী গীত সম্বন্ধে শিক্ষা পাইতেন। ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, আদি আধুনিক বিদ্যার কোন শাখার জ্ঞান তাঁহাদের প্রায় হইত না; কিন্তু তাঁহাদের কাহারও কাহারও হাফিজের অর্দ্ধেকটা মুখস্থ থাকিত, অনেকেই হয় ত সাদীর গুলেস্তাঁর অনেকখানি আবৃত্তি করিতে পারিতেন, এবং ফারসী সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহাদের খুব জ্ঞান ছিল। কিন্তু তখন তাঁহারা প্রকাশ্যে বাহির হইতেন না বলিয়া লোকে তাঁহাদের শিক্ষা ও শক্তির পরিচয় পাইত না। পারসীকরা গত কুড়ি বৎসরে বেশ পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে জাতীয় উন্নতির জন্য নারীর শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। ফলে, প্রথমে ইউরোপীয় স্ত্রীলোকেরা এবং পরে পারসীকেরা অনেক নারীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। একমাত্র তেহেরান শহরেই এখন ত্রিশটি বালিকা-বিদ্যালয়ে বিদেশী নানা ভাষা, সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা দেওয়া হয়। সদ্বংশজাতা খুব কম বালিকা আছে যাহারা ফরাশী বা ইংরেজী ভাষায় কথা বলিতে পারে না। অনেকে সঙ্গীত জানে। রাজনৈতিক বিষয়ে পারসীক মহিলাদের খুব আগ্রহ দেখা যায়। পারস্যের প্রত্যেক বৃহৎ প্রচেষ্টায় নারীদের খুব হাত দেখা যায়। দশ বৎসর আগে, গত রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়, পারসীক মহিলাদের অনেক অন্তরঙ্গ-সমিতি ছিল। তাঁহারা দেশে নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী স্থাপনের জন্য প্রাণ দিয়া খাটিয়া-

ছিলেন। এতদর্থে তাঁহারা নিজ নিজ স্বামী ও অন্যান্য সম্পর্কীয় পুরুষদের উপর যতটা প্রভাব খাটে, তাহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

বালিকা-বিদ্যালয়সকলের কার্য্য সুশৃঙ্খল করিবার জন্য পারস্যের শিক্ষামন্ত্রীসভা খুব চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের ছুটির পূর্ব্বে এই মন্ত্রীসভার প্রতিনিধিদের সমক্ষে স্কুলে স্কুলে মেয়েদের পরীক্ষা হয়, এবং যাহারা খুব পারদর্শিতা দেখায় তাহারা সার্টিফিকেট পায়। তাহাদিগকে বক্তৃতা করিতে হয়। গত বৎসর অনেকের বক্তৃতায় পারসীক মহিলাদের বাগ্মিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সেলাই, বুটিতোলা, এবং অন্যান্য সূচীশিল্প বরাবরই বালিকাদের শিক্ষার অঙ্গ ছিল। তাহারা আগে এই শিক্ষা বাড়ীতে পাইত, এখন স্কুলে পায়।

শিক্ষণীয়দিগের ঊর্দ্ধসংখ্যা।

আমাদের দেশে শিক্ষাবিভাগের রিপোর্ট-সমূহে এইরূপ বরাবর ধরিয়া লওয়া হইতেছিল, যে, যে-সব বালকবালিকা ও যুবকযুবতীর শিক্ষা পাইবার বয়স আছে, অর্থাৎ যাহারা শিক্ষণীয়, তাহারা দেশের মোট লোকসংখ্যার শতকরা ১৫ জন। অর্থাৎ যদি কোন দেশের লোকসংখ্যা একলক্ষ হয়, তাহা হইলে তথাকার শিক্ষা পাইবার মত বয়সের সকল বালকবালিকা ও যুবকযুবতীই যদি পাঠশালা ও স্কুলকলেজে যায়, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা হইবে পনের হাজার। শিক্ষণীয়দের এই ঊর্দ্ধসংখ্যা ধরিয়া লইয়া, তাহাদের কত অংশ শিক্ষা পাইতেছে, আমাদের দেশের সব সরকারী রিপোর্টে তাহাই দেখান হইত। সভ্যদেশ-সকলের শিক্ষা-রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে এই ঊর্দ্ধসংখ্যা ঠিক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রের (U. S. A.) উল্লেখ করা যাইতে পারে। তথাকার ১৯১৪ সালের শিক্ষারিপোর্টে দেখা যায় যে ঐ বৎসর সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ২১·৪ জন শিক্ষা পাইতেছিল। কোন কোন রাষ্ট্রে ইহা অপেক্ষাও বেশী অংশ শিক্ষা পাইতেছে। যেমন নর্থ ক্যারোলিনাতে সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ২৭·৪ জন শিক্ষা পাইতেছিল। শতকরা ১৫ জনই যদি শিক্ষণীয়দের ঊর্দ্ধসংখ্যা হইত, তাহা হইলে কোন দেশেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তাহার বেশী হইত না। বাস্তবিক শিক্ষণীয়দের ঊর্দ্ধসংখ্যা নির্দ্দেশ করা কঠিন। কারণ প্রত্যেক মানুষের কত বয়স হইতে কত বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা পাওয়া উচিত বলা কঠিন।

এই-সব কথা আমরা ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসের মডার্ণ রিভিউয়ে লিখিয়াছিলাম। তাহার পরও একাধিকবার লিখিয়াছি। আমরা লিখিয়াছিলাম যে শিক্ষণীয়দের ঊর্দ্ধসংখ্যা শতকরা ১৫জন না ধরিয়া শিক্ষারিপোর্ট-সকলে কেবল দেখান উচিত যে সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা কত জন বাস্তবিক শিক্ষা পাইতেছে। সুখের বিষয় ভারতগবর্ণমেণ্ট এখন আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন। ভারতে ১৯১৫-১৬ সালের যে শিক্ষাবিবরণ ভারত-গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে শতকরা ১৫ জন শিক্ষণীয়, এই ঊর্দ্ধসংখ্যার অনুমান ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই রিপোর্টে সমগ্র লোকসংখ্যার কত অংশ শিক্ষা পাইতেছে, তাহাই দেখান হইয়াছে। আশা করি ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক ডিরেক্টরদিগকেও এইভাবে রিপোর্ট দিতে আদেশ করিবেন।

এই পরিবর্ত্তনটি তুচ্ছ নহে। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে অমুক গ্রামে ১৫ জন ক্ষুধিত আছে, তাহা হইলে তন্মধ্যে ১০ জনকে খাওয়াইলেও মনে হয়, যে, অধিকাংশকে খাওয়ান হইল; আর যদি ১৫ জনকেই খাওয়ান হয়, তাহা হইলে ত কর্ত্তব্য পুরা মাত্রাতেই করা হইয়াছে বলিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু বাস্তবিক হয়ত গ্রামে আরও ক্ষুধিত লোক আছে। বিদ্যাসম্বন্ধেও এইরূপ। গবর্ণমেণ্ট ধরিয়া লইতেছিলেন যে, যে জায়গায় মোট লোক-সংখ্যা ১০০ জন, সেখানে শিক্ষণীয় কেবল ১৫ জন। তাহার মধ্যে ৮ জনকে শিখাইলেও ভাবিতেছিলেন যে অধিকাংশ শিক্ষা পাইতেছে। কখন ১৫ জনই শিক্ষা পাইলে ভাবিতেন যে শিক্ষার সুযোগ সকলেই পাইতেছে। অথচ দেখা যাইতেছে যে অনেক সভ্যদেশে সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ১৫ জনের অনেক বেশী লোক শিক্ষা পাইতেছে। সুতরাং আমাদের দেশে যদি কখন ১৫ জনও পাইত, তাহা হইলেও তখনও অনেক বালকবালিকা যুবকযুবতী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকিত। এখন যে রীতি অনুসারে ছাত্রছাত্রীর অনুপাত দেখান হইবে, তাহাতে সভ্যদেশ-সকলের সঙ্গে

তুলনা করিবারও সুবিধা হইবে। ১৯১৫-১৬ সালে ভারতের সমুদয় অধিবাসীর শতকরা ৩·১ জন শিক্ষা পাইতেছিল। ১৯১৪ সালে আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে (U. S. A) সমগ্র অধিবাসীর শতকরা ২১·৪ জন শিক্ষা পাইতেছিল। অতএব আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার সাতগুণ বাড়িলে আমরা শিক্ষায় আমেরিকার সমান হইব। আমরা এবং গবর্ণমেণ্ট খুব বেশী চেষ্টা না করিলে সে সুদিন আসিতে বিস্তর বিলম্ব হইবে। ১৯১৪-১৫ সালে ভারতের অধিবাসীদের শতকরা ৩·০৬ জন শিক্ষা পাইতেছিল, ১৯১৫-১৬ সালে ৩·১ পাইতেছিল। অর্থাৎ একবৎসরে শতকরা ·০৪ বাড়িয়াছে। আমেরিকা ও ভারতবর্ষের শতকরা তফাৎ ২১·৪-৩·১ = ১৮·৩। বৎসরে ·০৪ বাড়িলে ১৮·৩ বাড়িতে ৪৫৭ বৎসর ৬ মাস লাগিবে! সুতরাং শিক্ষাবিষয়ে ভারতে গরুর গাড়ীর চা'ল ছাড়িয়া দিয়া রেলের ডাকগাড়ীর চা'ল আবশ্যক হইয়াছে।

গ্রামের উন্নতি।

মহীশূরের প্রধান মন্ত্রী সার্ মোক্ষগুণ্ডম্ বিশ্বেশ্বরায়া একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, গ্রাম মানবসমাজের ক্ষুদ্রতম লোকসমষ্টি। উন্নতির চেষ্টা গ্রামেই আরব্ধ হওয়া উচিত। যে-সব গ্রামের লোকদের আত্মসম্মান বোধ আছে, তথায় ন্যূনকল্পে নিম্নলিখিত ফললাভের চেষ্টা করা উচিত :—

(১) গ্রামের সমগ্র লোকসংখ্যার অন্ততঃ দশমাংশের শিক্ষা পাওয়া উচিত; অর্থাৎ গ্রামে ২০০ লোক থাকিলে অন্ততঃ ২০টি বালকবালিকার ইস্কুলে যাওয়া চাই। কোন গ্রামে বিদ্যালয় না থাকিলে নিকটবর্ত্তী গ্রামের পাঠশালায় তাহাদিগকে পাঠান উচিত।

(২) গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক লোকদিগকে পড়িতে, লিখিতে ও হিসাব রাখিতে শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় বা তদ্রূপ কোন বন্দোবস্ত থাকা উচিত।

(৩) গ্রামে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য বৎসরে কত উৎপন্ন হইতেছে, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব প্রস্তুত করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে ধনোৎপাদন বিষয়ে গ্রামটির যথেষ্ট সামর্থ্য আছে কি না। যে গ্রামে বৎসরে মাথা-পিছু অন্যূন ৩৩ টাকার দ্রব্য উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয় না, তাহার আর্থিক বা সাংসারিক অবস্থা নিরাপদ নহে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(৪) যে গ্রামে ৩০০ বা তাহার বেশী লোক আছে, তথায় নিজ নিজ কাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত অন্ততঃ একজন কামার ও একজন ছুতার থাকা চাই।

(৫) প্রত্যেক চাষী গৃহস্থের ব্যয় সংকুলনের জন্য চাষ ছাড়া আর কিছু আনুষঙ্গিক উপার্জ্জনের উপায় থাকা আবশ্যক। মোটামুটি বলিতে গেলে, এক এক গ্রামের, প্রতি ২৫০ জন পিছু, চাষ ছাড়া, কোন একটি করিয়া শিল্প বা কারবার প্রচলিত থাকা চাই। যেমন কোথাও তাঁত চালান, কোথাও বাসন গড়া, কোথাও চামড়া কষ করা, ইত্যাদি।

(৬) অজন্মার প্রতিকার-স্বরূপ, প্রত্যেক রায়তকে অন্ততঃ দুবৎসরের খাইখরচের শস্য সঞ্চিত রাখিতে প্রবৃত্ত করা কর্ত্তব্য। ধন উৎপাদন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ঋণ করিতে খুব নিষেধ করা উচিত।

শহরের সমুদয় অধিবাসীর অন্ততঃ শতকরা ১৫ জন শিক্ষাধীন থাকা উচিত। তাহার মধ্যে মোটামুটি প্রতি দুইশতে অন্ততঃ একজন উচ্চ বিদ্যালয়ে, প্রতি পাঁচশতে অন্ততঃ একজন কলেজে, এবং প্রতি হাজারে অন্ততঃ একজন উচ্চতর বৃত্তিশিক্ষালয়ে যাহাতে শিক্ষা পায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

এখন যেখানে যত শস্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহার দেড়-গুণ উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নয়।

মহীশূরের দেওয়ান মহাশয় আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত অনুরোধ ও উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। তিনি ন্যূনকল্পে যাহা করিতে বলিয়াছেন, তদপেক্ষা বেশী করিতে পারিলেই সুখের বিষয় হয়। বাংলা দেশের অবস্থা ও অভাব সব বিষয়ে মহীশূরের মতও নহে। কিন্তু বাংলাদেশের উন্নতির মানে যে প্রধানতঃ গ্রামগুলির উন্নতি তাহাতে সন্দেহ নাই। আর্থিক অবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি পরস্পরের সহিত এরূপ জড়িত, এবং প্রত্যেকটি অপরগুলির উপর এরূপ নির্ভর করে, যে, কোন্‌টিতে আগে কোন্‌টিতে পরে মন দিতে হইবে, বলিবার জো নাই। যাঁহার যে-দিকে ঝোঁক আছে,

এবং শক্তি ও সুবিধা বেশী আছে, তিনি তাহাতেই লাগিয়া যান্।

বাঙালীর কৃতিত্ব ও আমেরিকার বিদ্যোৎসাহিতা।

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের অন্যতম প্রিয় ছাত্র রসিকলাল দত্ত রাসায়নিক গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্‌সি উপাধি পাইয়াছেন। তিনি অনেক রাসায়নিক গবেষণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে তাঁহার হেলোজেনেশ্যন্ (halogenation) বিষয়ক নূতন আবিষ্ক্রিয়ায় তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া, এবম্বিধ কার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিবার ও তাঁহাকে উৎসাহ দিবার জন্য আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্র (U. S. A.) তাঁহাকে প্রায় ছত্রিশ হাজার টাকার বৃত্তি দিয়াছেন। মার্কিন রাষ্ট্রের এই গুণগ্রাহিতা ও বিদ্যোৎসাহিতা বড় আনন্দের বিষয়। ইহাতে মার্কিনদের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বাস করেন, আগে তাহার নিকট হইতে উৎসাহ পাইলে স্বাভাবিক হইত।

উস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

হাইদরাবাদের নিজাম তাঁহার রাজ্যে উস্‌মানিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় নামে একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে আদেশ দিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দ্দু ভাষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন ও আধুনিক নানা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু ইংরেজী ভাষাও সকল ছাত্রকেই শিখিতে হইবে। দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রাচীন ও আধুনিক সদুপায়-সকল অবলম্বিত হইবে। ছাত্রদের নৈতিক উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। এখানে নানাবিদ্যার গবেষণাও হইবে।

জমীদার ও জমীর খাজনা।

ম্যাড্রাস মেল মান্দ্রাজের একখানি এংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক। ইহার কলিকাতাস্থ একজন সংবাদদাতা, গবর্ণমেণ্ট কোন্ প্রদেশ হইতে যুদ্ধ-ঋণ কত পাইয়াছেন, তাহার আলোচনা করিতে গিয়া মান্দ্রাজের পক্ষে ওকালতী করিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। সে-সব কথায় আমাদের দরকার নাই। তাঁর একটা কথা লইয়া আমরা বাংলা দেশের পক্ষ হইতে কিছু শিক্ষালাভ করিতে চাই। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ভূমিকর দেয় মোটামুটি ২¾ কোটি টাকা, মান্দ্রাজ ৬¾ কোটি, আগ্রা-অযোধ্যা ৬½ কোটি, ইত্যাদি। তাঁহার অঙ্কগুলি মোটামুটি শুদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বঙ্গে যদি ভূমির খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকিত, তাহা হইলে এই প্রদেশ হইতে মোটামুটি আরও চারিকোটি টাকা গবর্ণমেণ্ট পাইতে পারিতেন, এইরূপ বলা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট জমীদারদের সহিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া খাজনা বাড়াইয়া আরও চারিকোটি টাকা আদায় করুন, ইহা আমরা বলিতেছি না। বাস্তবিক বাংলা দেশ হইতে প্রতি বর্গ মাইল হিসাবে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা সরকার যে খুব কম খাজনা পান, তাহা নয়। খরচ বাদ, প্রতি বর্গমাইলে ইহার পরিমাণ, আগ্রা-অযোধ্যায় ৪৯৪ টাকা, বোম্বাইয়ে ৩৪৩, মান্দ্রাজে ৩১৫, বঙ্গে ২৮৬, পঞ্জাবে ২৩৫, ব্রহ্মে ১৬৩, মধ্যপ্রদেশে ১৪৭, বিহার ওড়িশায় ১৪৪, এবং আসামে ১১২। ইহাও বিবেচ্য যে বাংলায় রায়তদের অবস্থা অন্য কোন কোন প্রদেশ অপেক্ষা ভাল। আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিতে বলিতেছি না। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, যে, জমীদাররা যে টাকাটি বহুবৎসর ধরিয়া পাইয়া আসিতেছেন, তাহাতে বাঙ্গালী জাতির কি উপকার হইয়াছে? আমরা বলিতেছি না, বাংলাদেশে কোন ভাল জমীদার জন্মগ্রহণ করেন নাই, বা কেহ কোন সৎকাজ করেন নাই; তাহা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। কিন্তু মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে, যে, যে রায়তদের পরিশ্রমে তাঁহারা ধনী ও বিলাসী, তাহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির জন্য জমীদার-শ্রেণী উল্লেখযোগ্য কিছু করেন নাই। অন্যদিকে জমীদারেরা নিজেও বাস্তবিক উপকৃত হন নাই; তাঁহারা অনেকে অমানুষ হইয়া আছেন। দুরাচার, দুশ্চরিত্র, অত্যাচারী জমীদার অনেক আছে। যাহারা কিছু ভাল, তাহারাও অধিকাংশ বিলাসে ও আলস্যে সমস্ত জীবনটা কাটাইয়া দেয়। মানুষের মত পরিশ্রম করেন, শক্তির সদ্ব্যবহার করেন, এবং রায়তদের ও সমাজের মঙ্গল করেন, এরূপ জমীদার খুব কম। সুতরাং জমীদারদের অর্থের প্রধানতঃ অপব্যয়ই হয় বলিতে হইবে।

কেবল যে এই অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা নয়। অন্য যে-সব প্রদেশে জমীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, তথায় লোকে টাকা করিবার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য কল-কারখানায় মন দেয়, এবং হাতে কোন উপায়ে টাকা আসিলে তাহাও কারবারে খাটাইয়া আরও বাড়াইতে চেষ্টা করে। বঙ্গে অলস পরগাছা জমীদারের দল থাকায় এবং তাহাদের আয় সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রম ও বিষয়-বুদ্ধি সাপেক্ষ না হওয়ায়, বাংলাদেশ শিল্প-বাণিজ্যে পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এই পশ্চাদ্বর্ত্তিতার অন্য কারণ অবশ্য আছে, কিন্তু ইহা একটি প্রধান কারণ। তাহার পর অন্য প্রদেশের কোন কোন লোক কোন উপায়ে অর্থের অধিকারী হইলে যেস্থলে তাহা শিল্পবাণিজ্যে খাটায়, বঙ্গে সেস্থলে ঐরূপ লোকেরা জমীদারী কিনিয়া বংশপরম্পরায় অলস বিলাসী পরগাছার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করে।

বঙ্গের জমীদারী প্রথায় আরও একটি অনিষ্ট হইয়াছে। জমীদারের কর্ম্মচারীরা অনেকস্থলে অত্যাচারী ও অসৎ হওয়ায়, কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকেরা "ভদ্র" শ্রেণীর লোকদিগকে অনেকস্থলে বিশ্বাস করে না। কোন "ভদ্র" লোক সত্য-সত্যই গরীব লোকদের কোন উপকার করিতে চাহিলে প্রথম-প্রথম তাহারা তাহাকে খুব সন্দেহ করে, মনে করে তাহার কোন কুমতলব আছে। পরে অবশ্য তাহার সদভিপ্রায় ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় পাইলে গরীব লোকেরা তাহার খুব ভক্ত হয়। "ভদ্র" শ্রেণীর ও সাধারণ লোকদের মধ্যে এই অবিশ্বাস আমাদের মনগড়া কথা নয়। বঙ্গের একজন জমীদার একথা আমাদিগকে বলিয়াছেন। জমীদারেরা সাক্ষাৎভাবে, অথবা পরোক্ষ-ভাবে তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা, দেশের আর-একটি অনিষ্ট এই করিয়াছেন, যে, তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে লেখাপড়ার বিস্তারে সাহায্য না করিয়া বরং তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন, তাহার নানা কারণ এস্থলে আলোচ্য নয়।

জমীদারদের নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বলিতে চাই যে তাঁহারা খাজনা হইতে লব্ধ অর্থের যথেচ্ছ অপব্যবহার করিতে ধর্ম্মতঃ অধিকারী নহেন। তাঁহারা, অন্যান্য ধনীর মত, ভগবানের খাজাঞ্চী মাত্র। জন-সমাজের হিতের জন্য এই অর্থ প্রযুক্ত হইলেই সদ্ব্যয় হয়, এবং তাঁহারাও অমানুষ না হইয়া মানুষ হন। ধনের অপব্যবহার স্থায়ী হইতে পারে না। জীবন ও চরিত্র মানুষের মত না হওয়ায় অনেক জমীদারবংশ দরিদ্র বা নির্ম্মূল হইয়াছে, জমীদারী হস্তান্তর হইয়াছে। জমীদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটাকেও চিরস্থায়ী মনে করা ভুল। যাহা মানবসমাজের কল্যাণকর নহে, তাহা টিকিতে পারে না, যে-সব সাম্রাজ্যের দ্বারা মানবের অকল্যাণ হইতে-ছিল, একে একে সবই লয় পাইতেছে, এবং তাহার জায়গায় সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইতেছে; চিরস্থায়ী জমীদারী প্রথা ত কোন্ ছার! ইহা দ্বারা চিরকাল ধরিয়া দেশের এবং জমীদারদের অকল্যাণ হইতে থাকিবে, এরূপ হইতে পারে না। জমীদার-শ্রেণীর সুবুদ্ধি ও সুমতি না হইলে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। অতএব অবিলম্বে সকলের চালচলন বদলান দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্রষ্টব্য।

১৯১৪ সালে নিমাইচরণ মৈত্র ও মণিকুমার মুখোপাধ্যায় নামক দুটি যুবক এম্ এ পরীক্ষা দেয়। সেনেট হাউসে প্রশ্নের উত্তর লিখিবার জন্য পরীক্ষার্থীদিগকে যেরূপ খাতা দেওয়া হয়, ইহারা সেইরূপ খাতায় বাড়ী হইতে কিছু উত্তর লিখিয়া আনিয়া তাহা সেনেট হাউসে লিখিত উত্তরের খাতার সঙ্গে চালাইয়া দেয়। এই অসাধুতা ধরা পড়ে, এবং তাহারা দণ্ডস্বরূপ ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। নিমাইচরণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহকারী রেজিষ্ট্রারের পুত্র এবং মণিকুমার তাহার বন্ধু। গত বৎসর ৭ই জুলাই সীণ্ডিকেট এই দুজন ছাত্রকে ১৯১৯ সালে বা তাহার পরে পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। কিন্তু জানিতে চাই, সীণ্ডিকেটের নিকট ইহারা নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছে কি না, কোথা হইতে কাহার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরের শাদা খাতা চুরি করিয়াছিল তাহা বলিয়াছে কি না, এবং কোথা হইতে কাহার সাহায্যে এম্ এ পরীক্ষার প্রশ্ন জানিতে পারিয়াছিল, তাহা বলিয়াছে কি না। যদি এরূপ কোন দোষ স্বীকার ইহারা না করিয়া থাকে, এবং খাতা চুরি ও প্রশ্ন চুরি কাহার সাহায্যে করিয়াছিল না বলিয়া থাকে, তাহা হইলে কি কারণে ইহাদিগকে ক্ষমা করা হইল এবং পুনর্ব্বার পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হইল, সাধারণের জানিবার অধিকার আছে। বর্ত্তমানে এ বৎসর প্রশ্নচুরির তদন্ত চলিতেছে। এইজন্য ইহাদের কাছে ইহাদের চোর-বন্ধুদের নাম জানিতে পারিলে সুবিধা হইত। কারণ যাহারা আগে চুরির সাহায্য করিয়াছিল, এ বৎসরও হয় ত তাহারাই করিয়াছে।

আর এক কথা, যে ৭ই জুলাই তারিখে তাহারা আবার পরীক্ষা দিবার অনুমতি পায়, ঐ তারিখেই বীরেন্দ্রনাথ বসু নামক আর-একজন ছাত্রের দরখাস্ত সীণ্ডিকেটের সম্মুখে ছিল। সেও, ১৯১৩ সালে, পাস করিবার জন্য অসাধু উপায় অবলম্বন করায় পুনর্ব্বার পরীক্ষা দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, এবং বক্ষ্যমাণ দরখাস্ত দ্বারা আবার পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রার্থনা করে। ইহার বেলায় কিন্তু সীণ্ডি-

কেট বলেন, দরখাস্ত সীণ্ডিকেটের আগামী অধিবেশনে বিবেচিত হইবে, যদিও সে পূর্ব্বোক্ত দুজনের চেয়ে এক বৎসর বেশী সময় পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত আছে। ১৫ই জুলাইয়ের সেই অধিবেশনে হুকুম হয়, দরখাস্তের নকল সীণ্ডিকেটের সভ্যদের নিকট প্রেরিত হউক। তাহার পর কি হইয়াছে জানি না। হয়ত এখনও তাহার দরখাস্ত সীণ্ডিকেটের সভ্যদের দ্বারে দ্বারে আঘাত করিয়া বেড়াইতেছে। এই ছাত্রটি বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর বা সদস্যের পুত্র, পুত্রবন্ধু, জামাতা, বা অন্যবিধ সম্পর্কের লোক নয়। সে জন্মিবার আগে, কাহার পুত্র হইয়া জন্মিবে, তাহা স্থির করিবার অধিকার সম্ভবতঃ বিধাতার নিকট পায় নাই। কিন্তু কাহারও পুত্রবন্ধু হওয়া বোধ হয় তাহার সাধ্যাতীত নহে। জামাতৃত্বের পথও মন্দ নয়। সে বিবাহিত কি না জানি না। বিবাহিত হইলে, শ্বশুর মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাবশালী হইতে পারেন কি না, চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। অবিবাহিত হইলে, বিনাপণে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুতির বিজ্ঞাপন দিয়া, বীরেন্দ্রনাথ বসুর এমন একজন ভাবী শ্বশুর বাহির করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাবশালী আছেন বা হইতে পারেন।

কলেজে অধ্যাপনার সময়।

গত ৯ই জুন সেনেটের অধিবেশনে হাইকোর্টের উকীল ডাক্তার দ্বারকানাথ মিত্রের নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

"That a Committee of Seven be appointed to enquire into the working and effects of the system introduced in some of the Arts and Science Colleges in Calcutta last session, under which different sets of Classes are held in the course of the day, and to submit to the Senate a full report on the subject."

কলেজে অধ্যাপনা সাধারণতঃ ১০টা হইতে ৩টা ৪টা পর্য্যন্ত হয়। কলিকাতার কোন কোন কলেজে গত বৎসর দিবসের অন্য অংশেও অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছে। তাহার কারণ, ছাত্রাধিক্য, যথেষ্ট কলেজের অভাব, এবং বর্ত্তমান কলেজগুলিতে এই অধিক সংখ্যক ছাত্র বসাইবার স্থানের অভাব। কোন কলেজে হয় ত বৃহৎ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীকে দুটি কিম্বা তিনটি বিভাগে বিভক্ত করিয়া এই বিভাগগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে বসাইয়া পড়াইবার স্থান আছে। কিন্তু যদি আরও অধিক ছাত্র সেই কলেজে পড়িতে আসে, তখন অধ্যক্ষ তাহাদিগকে ভর্ত্তি করিয়া, অতিরিক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া, প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে বা সন্ধ্যায় তাহাদের অধ্যাপনায় বন্দোবস্ত করিতে পারেন। এইরূপ ব্যবস্থা কোথাও কোথাও হইয়াছে। তাহারই ফল কিরূপ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য এই কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। কমিটি নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা সেনেটের আছে। সে দিক্ দিয়া কোন আপত্তির কারণ ঘটে নাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কলেজ-ইন্‌স্পেক্টর যখন রহিয়াছেন, এবং সেনেটের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সীণ্ডিকেট রহিয়াছেন, তখন আগে তাঁহাদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা তদন্ত করাইলে ভাল হইত। তাঁহারা কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই। এইজন্য আমাদের মনে হয় যে তাঁহাদিগকে ডিঙাইয়া কমিটি নিযুক্ত করায় প্রকারান্তরে তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে।

কমিটির সিদ্ধান্ত কিরূপ হইবে, আগে হইতে তাহা অনুমান করিয়া লইয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত হইবে না। কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের অন্যায্য ও অনাবশ্যক প্রতিবন্ধক যাহাতে না জন্মে, এবং ছাত্রদের শিক্ষালাভের সুযোগ হ্রাস যাহাতে না হয়, তজ্জন্য আমরা দু-চার কথা বলা আবশ্যক মনে করি। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মধ্যাহ্নটা বাদ দিয়া সকাল বিকাল সন্ধ্যা পড়িবার ও পড়াইবার সময় আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছিল। শরীরের অবসাদ ও স্ফূর্ত্তির অনুযায়ী বলিয়া ইহাই ঠিক্ ও স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। সুতরাং কোন কলেজে, দিবসের মধ্যভাগ ছাড়া, প্রারম্ভ ও শেষভাগেও পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইলে, তাহা মধ্যভাগের ব্যবস্থা অপেক্ষা স্বভাবতই কুফলপ্রসূ হইবে, এমন বলা যায় না। তদ্ভিন্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের এবং অন্যান্য আইন-কলেজে সকাল বিকাল পড়ান হইয়া থাকে। মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুলসমূহেও এইরূপ হয়; তথায় রাত্রে পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে শিক্ষার্থ হাঁসপাতালে রোগীদের পরিচর্য্যা করিতে হয়। এই-সব কারণেও সকালে বিকালে পাঠনার বিরুদ্ধে গোড়াতেই আপত্তি উঠিতে পারে না। কেবল দেখা চাই, যে, দিবসের মধ্যভাগে যে-সব ছাত্র শিক্ষা পায়, সকাল-বিকালের ছাত্ররা সব বিষয়ে তাহাদের সমান শিক্ষার সুযোগ পায় কি না।

এই-সব সুযোগের মানে, যথেষ্ট বসিবার স্থান এবং তথায় যথেষ্ট আলো বাতাস ও অন্যবিধ স্বাস্থ্যের ও শিক্ষাসৌকর্য্যের ব্যবস্থা, যথেষ্টসংখ্যক যোগ্য অধ্যাপক, প্রত্যেক বিষয়ে যথেষ্ট সময় ব্যাপিয়া অধ্যাপনা, লাইব্রেরী হইতে পুস্তক পাইবার ব্যবস্থা, বিজ্ঞানাগারে দক্ষ শিক্ষিত লোকের তত্ত্বাবধানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষার সুযোগ, সাময়িক পরীক্ষার উত্তর সংশোধনের ব্যবস্থা, ছাত্রদের মধ্যে "বিনয়" (discipline) অর্থাৎ নিয়মানুগত্য রক্ষার ব্যবস্থা, ইত্যাদি। দিবসের মধ্যভাগে অধ্যাপনার জন্য এই-সব বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা আছে, সকালবিকালের ব্যবস্থা তদ্রূপ হইলেই যথেষ্ট হইল। অধ্যাপকগণ সাধারণতঃ সপ্তাহে যত ঘণ্টা খাটেন, বক্ষ্যমাণ কলেজ-সকলে তদপেক্ষা কেহ বেশী খাটিতে বাধ্য হইতেছেন কি না, তাহাও দেখা উচিত। অবশ্য

২।১ ঘণ্টা বেশী শ্রমে কিছু আসিয়া যায় না। যদি কোন কোন বিষয়ে কোন ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতীকার করিলেই চলিবে। তজ্জন্য সকালবিকাল পড়াইবার ব্যবস্থা রহিত হইতে পারে না। আমাদের দেশে শিক্ষার দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। যথেষ্টসংখ্যক নূতন নূতন কলেজ স্কুল খোলা ও চালান নানা কারণে দুঃসাধ্য হইয়াছে। এইজন্য বর্ত্তমান শিক্ষালয়গুলি দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বৈধ উপায়ে যত বেশী ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমরা খেলো শিক্ষা দিতে বলিতেছি না; কিন্তু শিক্ষার বিস্তার বন্ধ বা হ্রাস করিবার জন্য খুব লম্বাচোড়া আদর্শের কথা কেহ বলিলে তাহারও সমর্থন করিতে পারি না। তাহা অসহ্য। কোন দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাহার রাজা যদি বলে, আমি মণকরা ২৩৮/১৫ দরের চালের ভাত ভিন্ন কাহাকেও খাইতে দিব না, তবে তাহার প্রশংসা করা যায় না। যে সরু চালের ভাত খাইতে পারে, সে খাক; কিন্তু বুভুক্ষিতদের জন্য মোটা চালই যথেষ্ট। মোটা চাল, আর পচা চাল বা পচা ভাত, এক নয়। পচা জিনিষ খাওইবার ব্যবস্থা কেহ করিতেছে না। ইংরেজ রাজপুরুষেরা অনেক সময় বলেন, "No education is better than a bad education!" কিন্তু bad education বা কুশিক্ষার মানে কি? মোটামুটি শিক্ষা কুশিক্ষা নয়, যেমন মোটা ভাত মানে পচা ভাত নয়। আমাদের কলেজগুলি লণ্ডন, অক্সফর্ড, কেম্ব্রিজ, পারিস, বার্লিন, হার্ভার্ডের মত নয়, বটে। কিন্তু আমরা ত শিখাই না, যে, চুরি করা ভাল, দুই আর দুইয়ে পাঁচ হয়, আগুনে স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়, বা বরফ পুড়াইয়া রেলের এঞ্জিন চালাইতে হয়। আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প শিখাই বটে, কিন্তু জ্ঞাতসারে কুশিক্ষা বা ভ্রান্ত শিক্ষা দি না।

কমিটি সম্বন্ধে আর একটি অবান্তর কথা বলিতে চাই। এই কমিটিরও সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বোর্ড ও অন্যবিধ কাজে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব আছে। তাহার উপর দেখা যায় যে কোন কমিটি নিযুক্ত হইলেই প্রায় আশুবাবু তাহার সভাপতি হন। ইহা তাঁহার প্রভাব, কার্য্যক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কিন্তু তাঁহার পক্ষে আত্মপ্রসাদের কারণ হইলেও অন্য ফেলোদের পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয় নহে। সেনেটে কি আর বুদ্ধিমান কার্য্যদক্ষ মানুষ নাই? না, অধিকাংশ লোকে আশুবাবুর ভয়ে তটস্থ কিম্বা তাঁহার অনুগৃহীত বা অনুগ্রহপ্রার্থী? অথবা আর সকল যোগ্য লোকই কি নিজের নিজের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাজে আকণ্ঠ নিমগ্ন বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে সময় ও শক্তি নিয়োগ করিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ? তাহা হইলে কি আশুবাবুর বিশ্ববিদ্যালয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই বাংলা দেশকে আঁধার দেখিতে হইবে? গতিক সেইরূপই বটে। কেন না, সেনেটে আশুবাবু যে প্রস্তাবের পক্ষে তাহা মঞ্জুর হয়, তিনি যাহার বিরুদ্ধে, তাহা নামঞ্জুর হয়। আশুবাবুর ভ্রম প্রমাদ হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়, এবং অনেক বিষয়ে এক জনের বুদ্ধি অপেক্ষা অনেক জনের বুদ্ধি ও মন্ত্রণা সুফলপ্রদ হইয়া থাকে। এইজন্য আমরা সেনেটে আরও বেশী পরিমাণে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন মতের বিকাশ দেখিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি, প্রয়োজন হইলে পরে তাহা বলিব।

দেশী রাজ্যের সু-খবর।

মহীশূরের মহারাজার জন্মদিনের আনন্দ উৎসবে প্রতি বৎসর প্রাসাদের দরবার-সকলে নর্ত্তকীদের নৃত্য হইত, এবং তাহারা শহরের মিছিলেও সঙ্গে-সঙ্গে নৃত্য করিত। বর্ত্তমান বৎসর হইতে তাহা বন্ধ হইল। নারীদের পক্ষে নৃত্য দোষের বিষয় নয়; কিন্তু তাহার সঙ্গে পাপব্যবসার সম্বন্ধ ঘটায় তাহা সমাজের অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে।

ইন্দোর রাজ্যে আইন হইয়াছে, তথাকার এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের যে-কোন অবিবাহিত স্ত্রীলোক ও পুরুষ, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে, বিবাহে বাধাজনক রক্ত বা অন্যবিধ সম্পর্ক না থাকিলে এবং যথাক্রমে অন্ততঃ ১৪ ও ১৮ বৎসরের হইলে, ঐ রাজ্যে ১৪ দিন বাসের পর বিবাহ করিতে পারিবে। স্ত্রীলোক ১৮ এবং পুরুষ ২১ বৎসরের কম বয়স্ক হইলে পিতামাতা বা অপর অভিভাবকের সম্মতি চাই। পুরাকালে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। এরূপ বিবাহ এখনও সর্ব্বত্র আইনসঙ্গত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে বিবাহের জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ অনাবশ্যক হইবে। এবং সম্মিলিত ভারতীয় জাতি গঠনের একটি বাধা দূর হইবে।

ছোট দেওয়াস রাজ্যে যে-সকল গ্রাম্য পঞ্চায়েত নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে নিরক্ষর এবং "অস্পৃশ্য" জাতির লোকও আছে। তাহারা দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার, গ্রামের স্বাস্থ্যবিধান, শিক্ষালয়, চালান, গবাদির খোঁয়াড় চালান, প্রভৃতি কাজ দক্ষতার সহিত করিতেছে।

ব্রাত্য

কেবল গতি বা কেবল স্থিতি প্রাণের ধর্ম্ম নহে। প্রাণ একদিকে পরম গতি, আবার অন্যদিকে ধ্রুব স্থিতি। অথর্ব-বেদের প্রাণ-সূক্তে আছে—প্রাণচক্রের পরিধি নিত্য-চঞ্চল, নিত্য-সৃষ্টি তাহাতে জায়মান, কিন্তু সেই চক্রের নেমি নিত্য-ধ্রুব, তাহা অচঞ্চল। এই দুইয়ে প্রাণ পরিপূর্ণ। চক্রের পরিধি নিত্য ভুবনস্রষ্টা, চক্রের নেমি গভীর গুহায় নিহিত।

অর্দ্ধেন বিশ্বংভুবনং জজান যদস্যার্ধং কতমঃ স কেতুঃ।
(অ ১১,৬,২২)

স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য হইলেই প্রাণ সম্পূর্ণ হয়। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় যাওয়া-আসার দ্বৈত প্রাণে আছে। অথর্ব-বেদের প্রাণ-সূক্তে (অ ১১, ৬,) প্রাণের স্বরূপ অতি সুন্দর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

নমস্তে অস্ত্বায়তে, নমো অস্তু পরায়তে।
নমস্তে প্রাণ তিষ্ঠতে, আসীনায়োত তে নমঃ॥
(অ ১১,৬,৭)

আসিতেছ তুমি তোমাকে নমস্কার, যাইতেছ যে প্রাণ তোমাকে নমস্কার। তুমি (গমনে উদ্যত অতএব) দণ্ডায়মান, তোমাকে নমস্কার; তুমি (স্থির অতএব) উপবিষ্ট, তোমাকে নমস্কার।

নমস্তে প্রাণ প্রাণতে নমো অস্ত্বপানতে।
পরাচীনায় তে নমঃ প্রতীচীনায় তে নমঃ॥
(অ ১১,৬,৮)

হে প্রাণ, তুমি নিশ্বাসে প্রবহমান হইয়া আসিতেছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রশ্বাসে প্রবহমান হইয়া যাইতেছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি চির প্রাচীন, তোমাকে নমস্কার; তুমি নিত্য নবীন, তোমাকে নমস্কার।

কিন্তু মানবের ও মানবজাতির মধ্যে দেখা যায় প্রায়ই একদল চলার দিকে ঝোঁকে, অন্যদল না-চলার দিকে ঝোঁকে। আমাদের দেশে এখন আমরা না-চলারই দিকে। এখন আমরা জড়ের ন্যায় মাথা পাতিয়া দিয়াছি, আমাদের মাথার উপর দিয়া সমস্ত জগতের জীবন্ত লীলার রথচক্র ঘর্ঘর শব্দে যাত্রা করিয়াছে। কিন্তু চিরদিনই আমরা কেবল স্থিরতার ও স্তব্ধতারই উপাসক ছিলাম ইহা মনে করিলে অতিশয় ভ্রম করা হইবে।

না-চলার পক্ষে আমাদের যে-সব পরম আশ্রয় আছে, বেদ তাহার প্রধান। কিন্তু আমরা অনেক সময় জানিনা এই বেদ কি ভাবে প্রাণের গতির ও প্রচণ্ড বেগের যশোগান করিয়াছে। যে বেদকে আঁকড়িয়া আমরা পড়িয়া থাকিতে চাই, তাহার একএকখানি পত্র প্রাণ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

এমন এক সময় ছিল যখন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঘোষণা করিয়াছেন "চল, অগ্রসর হও। তাহাই জীবন, তাহাই অমৃত।"

"পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেহস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ॥—চরৈবেতি।"

"যে বিচরণ করে শ্রমবশতঃ তাহার দৈহিক কান্তি বিকশিত পুষ্পের ন্যায় সুষমাময়ী হইয়া উঠে, তাহার আত্মা নিত্য বৃহৎ হইতে থাকে, এবং সে নিত্যই বৃক্ষের ফললাভ করে। যে পথ সম্মুখে নিত্য উন্মুক্ত তাহাতে যে বিচরণ করে, শ্রমের দ্বারা হতবীর্য্য হইয়া তাহার সকল পাপ মরিয়া শুইয়া পড়ে। অতএব বিচরণ কর, বিচরণ কর।"

"চরণ্ বৈ মধু বিন্দতি চরণ্ স্বাদুমুদুম্বরং
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরণ্॥—চরৈবেতি।"

"যে চলিতেছে সেই মধুলাভ করিতেছে, যে চলিতেছে সেই অমৃতময় ফললাভ করিতেছে, ঐ দেখ সূর্য্যের কি দীপ্ত শ্রেষ্ঠত্ব, সে যে চলিতে চলিতে কখনও তন্দ্রাকে প্রাপ্ত হয় না। অতএব যাত্রা কর, যাত্রা কর।"

এই যাত্রা নিজেই অমৃত মধুর, নিজেই অমৃত ফল। যাত্রাতেই সূর্য্য-চন্দ্র-তারার জ্যোতি, যাত্রাই তৃপ্তি, যাত্রাই দীপ্তি।

আথর্বণ ঋষিরা চিরদিনই প্রাণের, মহীর, মানুষের স্তবগান করিয়াছেন। এই স্তবগান যাহার, সে সনাতন নিয়মে দীক্ষিত ব্রতধারী শান্ত স্থির নিশ্চল ধীর মানুষ নহে। সমস্ত চূর্ণ করিয়া, সমস্ত বাধা ধূলিসাৎ করিয়া, সমস্ত নিয়মকে অগ্রাহ্য করিয়া, সনাতন শাস্ত্র-বিধিকে ফুৎকারে উড়াইয়া এ মানুষ যাত্রা করিয়াছে। ওয়াল্ট হুইটম্যান যেমন লক্ষ্মীছাড়া নিয়ম-হীন Vagabondএর যশোগান করিয়াছেন, এও সেইরূপ ব্রাত্যের যশোগান।

এ ব্রাত্য কোনো বিশেষ সমাজের বিশেষ শিক্ষাদীক্ষায়

শিক্ষিত দীক্ষিত শান্ত শীর্ণ নিরীহ প্রয়োজনসাধক মনুষ্য-বস্তু নহে। এ সমস্ত-শিক্ষাদীক্ষার প্রাচীরের ধ্বংসকারী অশান্ত প্রবল প্রচণ্ড মানুষ! ইহার দ্বারা প্রয়োজন সাধন দূরে থাকুক, এ সর্ব্ববিধ কর্ম্মশৃঙ্খলার মূর্ত্তিমান-বিদ্রোহ! ইহার ব্রত নাই—এ ব্রাত্য! ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ন্যায় এ পরিমিত কোনো ধর্ম্ম লইয়া নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থানে বসিল না,—এ সমস্ত ভুবনখানি আসন করিয়া না লইয়া বসিবেই না (অথর্ব ১৫ কাণ্ড, ১ অনু, ৫ম পর্য্যায়)। বেদ ও যজ্ঞাদির দ্বারা এ বদ্ধ নহে, তাহারাই বরং ইহার অনুসরণ করে (অথর্ব ১৫ কাণ্ড, ১ অনু, ২য় পর্য্যায়)। এইরূপ সর্ব্বত্রই সে স্বাধীন, সে প্রচণ্ড, সে বিদ্রোহ, সেই নায়ক; সব তাহার পশ্চাতে চলিয়াছে। সে যে বীর, সে ঈশান, সে নিয়ন্তা।

অথর্ব-বেদের ১৫শ কাণ্ডখানি এই ব্রাত্যের স্তবগান দিয়াই শেষ হইয়াছে। এ গোটা কাণ্ডখানাই ব্রাত্য-কাণ্ড। ইহাতে কিছু লুকাইয়া, কিছু বাদ দিয়া বলা হয় নাই। সবই খুব খোলা, খুব স্পষ্ট লেখা। মাঝে-মাঝে বার-বার একই কথার পুনরুক্তি আছে, জোর দিবার জন্যই সেই-সব পুনরুক্তি।

অথর্ব কিছুই গোপন করেন নাই, কারণ তখন সমাজ জীবন্ত। তখন একদিকে যেমন শান্ত ধীর ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং ব্রহ্মচারীর স্তবগান যেমন করা হইয়াছে, তেমনি অন্য-দিকে অশান্ত অধীর ব্রাত্যের স্তবগানে তাঁহাদের কিছু সঙ্কোচ নাই। এই দুইটি পক্ষ বিস্তার করিয়াই তো ভুবন-বিহঙ্গ অনন্ত আকাশে যাত্রা করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ব্রাত্যের পরিচয়টুকু লুপ্ত করিবার জন্য চেষ্টার আর ত্রুটি হয় নাই। অথর্ব-অনুক্রমণিকায় এই কাণ্ডের প্রারম্ভেই আছে "অধ্যাত্মকম্" অর্থাৎ ইহা আত্মার উদ্দেশে লেখা। ব্রাত্য যে আত্মার মতই মুক্ত, সে যে দেহী হইয়াও বিদেহ; কাজেই কথাটা অনেক দূর পর্য্যন্ত বেশ খাটে; কিন্তু তবু তো আসল কথা ঢাকা যায় না। কোনো কোনো উপনিষদেও এইরূপ কথা আছে (চুলিকোপনিষৎ ১১, Asiatic Society edition)। ছান্দোগ্য কিন্তু বিশেষ স্থলে ব্রাত্যকে পরমাত্মার সমান বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা জ্ঞানীর পক্ষেই। ছান্দোগ্য ব্রাত্যটিকে উড়াইয়া আত্মাকেই সবটা স্থান দেন নাই।

এবংবিদ্ যদ্যপি চণ্ডালায়োচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেদ্ আত্মনি হেবাস্য হুতং স্যাৎ।
(ছান্দোগ্য ৫,২৪,৪)

এমন জ্ঞানী যদি চণ্ডালকে যজ্ঞভাগ-শেষ দেন তবে আত্মাতেই তাহা আহুতি দেওয়া হইবে॥

বোম্বাইবাসী পণ্ডিত রাজারাম ভাগবতের মতে ব্রাত্য অনার্য্যজাতীয়। তাঁহার মতে ব্রাত্যের উষ্ণীষ তাহার প্রভুত্বব্যঞ্জক। তাহার প্রতোদের দ্বারা সে সব-কিছু বিদ্ধ করে এবং বিপথ নামক রথে সর্ব্বত্র গমন করে।

ব্রাত মানে ভবঘুরের দল, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বাহিরে বৃথা একদল মানুষ। সেই দলের লোকই ব্রাত্য। বৌধায়ন বলেন দীক্ষাহীনের পুত্রই ব্রাত্য।

বর্ণশঙ্করাদুৎপন্নান্ ব্রাত্যানাহুর্মনীষিণঃ।
(বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র, ১ম প্রঃ, নবম অধ্যায়, ১৫-১৭)

মনুও বলেন আর্য্যও দীক্ষা-প্রাপ্ত না হইলে ব্রাত্য হন।

অব্রতান্ তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যান্ ইতি বিনির্দ্দিশেৎ।
ব্রতহীন সাবিত্রী ভ্রষ্টকে ব্রাত্য জানিবে। (মনু ১০,২০)

মহাভারতের মতে ব্রাত্য সমাজের জঞ্জাল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন ব্রাত্য চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ-শীল পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। কিন্তু মূল দেখিলেই সব স্পষ্ট হইবে।

সায়নও ব্রাত্যের কলঙ্কটুকু ঢাকা দিতে পারেন নাই—সায়ন বলিতেছেন—

"অত্র কাণ্ডে ব্রাত্য মহিমা প্রপঞ্চ্যতে। ব্রাত্যো নাম উপনয়নাদি-সংস্কারহীনঃ পুরুষঃ। সোঽর্থাদ্ যজ্ঞাদি বেদবিহিতাঃ ক্রিয়াঃ কর্ত্তুং নাধিকারী। ন স ব্যবহারযোগ্যশ্চেত্যাদি জনমতং মনসিকৃত্য ব্রাত্যো-ধিকারী ব্রাত্যো মহানুভাবো ব্রাত্যো দেবপ্রিয়ো ব্রাত্যো ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়ো-র্বর্চসো মূলং, কিংবহুনা ব্রাত্যো দেবাধিদেব এবেতি প্রতিপাদ্যতে। যত্র ব্রাত্যো গচ্ছতি বিশ্বং জগদ্ বিশ্বে চ দেবা স্তত্র তমনুগচ্ছন্তি, তস্মিন্ স্থিতে তিষ্ঠন্তি, তস্মিং শ্চলতি তে চলন্তি। যদা স গচ্ছতি রাজবৎ স গচ্ছতীত্যাদি।"

"এই কাণ্ডে ব্রাত্যের মহিমা প্রকাশ করা হইতেছে। উপনয়নহীন সংস্কারহীন পুরুষই ব্রাত্য। অতএব সে যজ্ঞাদিবিহিত ক্রিয়ার অনধিকারী। সে কোনোরূপে ব্যবহার-যোগ্য নহে এই জনমত মনে করিয়াই ব্রাত্য অধিকারী, ব্রাত্য মহানুভব, ব্রাত্য দেবপ্রিয়, ব্রাত্য ব্রহ্ম-ও-ক্ষত্র-তেজের মূল, এবং ব্রাত্যই দেবতার অধিদেবতা—এসব কথা প্রতি-পাদিত হইয়াছে। ব্রাত্য যেখানে যায় বিশ্বজগৎ বিশ্ব-দেবতা সেখানে তাহারই অনুসরণ করে, সে দাঁড়াইলে

সবই দাঁড়ায়, সে চলিলে সবই চলে। সে যেখানে যায় রাজার ন্যায় মহিমায় যায় ইত্যাদি।"

ইহা বলিয়া সায়ন বলিতেছেন—

"ন পুনরেতৎ সর্ব্ব ব্রাত্যপরং প্রতিপাদনম্ অপি তু কংচিদ্বিদ্বত্তমং মহাধিকারং পুণ্যশীলং বিশ্বসংমান্যং কর্ম্মপরৈ ব্রাহ্মণৈর্বিদ্বিষ্টং ব্রাত্যম্ অনুলক্ষ্য বচনম্ ইতি মন্তব্যম্॥"

"এই-সব কথা সমস্ত ব্রাত্যকে লক্ষ্য করিয়া বলা চলে না; কোনো একটি বিশেষ, বিদ্বান্ মহাধিকার পুণ্যশীল, বিশ্বমান্য, অথচ যাগযজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণের দ্বারা অবজ্ঞাত ব্রাত্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে।"

মূলে কিন্তু ব্রাত্যের সঙ্গে সুরা প্রকৃতিরও যোগ রহিয়াছে। তাহাকে যে বিদ্বান বলা হইয়াছে, সে প্রাকৃত মানুষের শাস্ত্র-ভারবর্জ্জিত সহজ বিদ্যার সম্পর্কে। এই বিদ্যাতেই ব্রাত্য আচার-পীড়িত জনসমূহকে নবজীবন নবশক্তি নব-আদর্শ দেয়।

ব্রাত্য পূর্ণ প্রাণের এক পিঠ মাত্র;—ইহাকে ও ব্রতশীল ব্রহ্মচারীকে লইয়াই পূর্ণ জীবন, পূর্ণ প্রাণ, পূর্ণ ব্রত। অবশ্য উচ্ছৃঙ্খল ব্রতহীন নিয়মভ্রষ্ট হইলেই যে সে পূজ্য হয় তাহা নহে। তাই সায়ন বলিতেছেন যে এমন ব্রাত্যকেই পূজ্য বলি যিনি বিদ্বান্ মহাধিকার, পুণ্যশীল অথচ নিয়ম মানেন না বলিয়া নিয়ম-নিষ্ঠ বিপ্রাদির অবজ্ঞাত। অর্থাৎ যিনি মহাধিকার, যাঁহার অন্তরে এত উচ্চ আদর্শ স্বভাবতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে যে তিনি সামাজিক পরিচিত অভ্যস্ত প্রাণহীন নিয়মকে গতানুগতিক ভাবে গ্রহণ করিতে অসমর্থ। প্রশ্নোপনিষদে আছে "ব্রাত্য স্তং প্রাণৈকঋষি" "হে ব্রাত্য, প্রাণৈকঋষি, তুমি প্রাণমন্ত্রকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছ।" ওখানে শঙ্কর বলিতেছেন—"প্রথমজত্বাদ্ অন্যস্য সংস্কর্ত্তুর্-অভাবাদ্ অসংস্কৃতো ব্রাত্যস্ ত্বং স্বভাবত এব শুদ্ধ!" "হে ব্রাত্য, তুমিই তো সকলের আগে (নিয়ম-সংস্কারাদি সব তোমার পরে পরে সৃষ্ট হইয়াছে); তখন কেবা তোমার সংস্কার করিবে, তাই তোমার সংস্কার হয় নাই; তুমি তাই স্বভাবতই শুদ্ধ।"

এমনও হইতে পারে যে ব্রহ্মচারীর যেমন একটা ব্রত-শীল ধীর নিয়ম-নিষ্ঠ type আছে এবং তাহাকে যেমন স্তব করা হইয়াছে, তেমনি ব্রাত্য typeকেই স্তব করা হইয়াছে। কোনো বিশেষ ব্রাত্যকে নহে।

জ্ঞান দুই-প্রকার। এক-প্রকার—জ্ঞাতা যেখানে নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া জানেন। আর এক-প্রকার—যেখানে জ্ঞাতা নিজের জ্ঞানের কথা জানেনই না। অনেক সময় এইরূপ আত্ম-বিস্মৃত জ্ঞানীর মধ্যেই খুব গভীর ভাবের জ্ঞান নিহিত থাকে। মাটির অভ্যন্তরে যেমন নির্ম্মল স্বচ্ছ জলের অফুরন্ত ধারা আছে, এই জ্ঞান সেইরূপ। মাটির অন্তরে আছে, মাটি তাহা জানে না। এই জ্ঞান কোনো বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা প্রস্তুত নহে – ইহা প্রাণের ন্যায় বিধাতার দান, তেমনি গভীর তেমনি বিরাট। অথর্বে যে বিদ্বান্ ব্রাত্য আছে, হয়তো তাহা এই প্রাকৃত "স্বভাব-প্রাপ্ত" জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। এই জ্ঞান সাধারণ জনগণের গভীর অন্তরে নিত্য নিহিত আছে। অথর্বে ব্রাত্যের সঙ্গে সঙ্গে "বিশ" অর্থাৎ "জনসমূহের" উল্লেখ আছে। খুব সম্ভব ব্রাত্য-কাণ্ডে কোথাও বা খুব উচ্চ আদর্শবান্ ব্রতহীনকে, কোথাও বা আত্মবিস্মৃত গভীর "সহজ-জ্ঞানী" ব্রতহীনকে স্তব করা হইয়াছে। কোথাও বা উভয়কেই করা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমি নিজে কিছু বলিতে চাই না, পাঠক স্বয়ং বিচার করিয়া লইবেন।

তখন হয়তো যাগযজ্ঞে বিধি-নিষেধে সামাজিক অবস্থা জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই মানব শিক্ষাদীক্ষার বাহিরে স্বাভাবিক জীবনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছিল। তাই সামাজিক ব্যবস্থার নিয়মের গণ্ডীর বাহিরে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহজ প্রাণ ও সহজ জ্ঞানের জন্য রুদ্ধশ্বাস দেশ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। অথর্বের এই ব্যাকুলতাটুকু আমাদের এখনকার বহুভার-নিপীড়িত মনকে বড় ব্যাকুল করিয়া তোলে।

খুব সম্ভব এই ব্রাত্যদেরই একদল নানাস্থানে বিচরণ করিয়া "চরক" আখ্যা পাইয়াছিল। ইহাদের কৃপায় আমরা পার্থিব বহু বিজ্ঞান ও শিল্পাদি লাভ করিয়াছি। কিন্তু সব দীক্ষা হইতে যে বড় দীক্ষা এই ব্রাত্য দিতে সক্ষম তাহা কোনো বিশেষ বিজ্ঞানের বা শিল্পের দীক্ষা নহে—তাহা মুক্তির দীক্ষা, তাহা সহজের দীক্ষা, তাহা প্রাণের দীক্ষা!

ব্রাত্য প্রজাপতিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। ব্রাত্যই তাঁর শ্রেষ্ঠ (সুবর্ণ) সৃষ্টি।—

ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ ॥১॥ স প্রজাপতিঃ

সুবর্ণমাত্মন্নপশ্যৎ তৎ প্রাজনয়ৎ ॥২॥ তদেকমভবৎ তল্ললামমভবৎ তন্মহদভবৎ তজ্জ্যেষ্ঠমভবৎ তদ্ ব্রহ্মাভবৎ তৎ তপোঽভবৎ তৎ সত্যমভবৎ তেন প্রাজায়াত ॥৩॥ সোঽবর্ধত স মহানভবৎ স মহাদেবোঽভবৎ ॥৪॥ স দেবানামীশাম্ পর্যৈৎ স ঈশানোঽভবৎ ॥৫॥ স এক ব্রাত্যোঽভবৎ স ধনুরাদত্ত তদেবেন্দ্রধনুঃ ॥৬॥ নীলমস্যোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্ ॥৭॥ নীলেনৈবাপ্রিয়ং ভ্রাতৃব্যং প্রোর্ণোতি লোহিতেন দ্বিষন্তং বিধ্যতীতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ॥৮॥ (অথর্ব, ১৫ কাণ্ড, ১ অনু, ১ পর্যায়)

ব্রাত্য ছিলেন। তিনি যেই (প্রজাপতির অন্তর হইতে বাহিরে) চলিতে উদ্যত হইলেন অমনি প্রজাপতিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন ॥১॥ প্রজাপতি আপনার মধ্যে দেখিলেন কি এক সুবর্ণ, তিনি তাহাকে জন্ম দিলেন (প্রাজনয়ৎ) ॥২॥ তাহা মুখ্য এক হইল, তাহা ললাম হইল, তাহা মহান্ হইল, তাহা জ্যেষ্ঠ হইল, তাহা ব্রহ্ম হইল, তাহা তপ হইল, তাহা সত্য হইল, তাহাকে জন্ম দিয়া প্রজাপতি যথার্থ জন্মদাতা হইলেন ॥৩॥ সে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সে মহান্ হইল, সে মহাদেব হইল ॥৪॥ সে দেবগণের নায়কত্বকে পরিবেষ্টন করিল, সে দেবগণের চালক হইল ॥৫॥ সে মুখ্য ব্রাত্য হইল, সে ধনু গ্রহণ করিল, তাহাই ইন্দ্রধনু ॥৬॥ সেই ধনুর উদর নীল এবং পৃষ্ঠ লোহিত ॥৭॥ ব্রহ্মবাদীরা বলেন, নীলের দ্বারা সে অপ্রিয় জ্ঞাতিকে প্রাবৃত করে এবং লোহিতের দ্বারা দ্বেষকারীকে বিদ্ধ করে ॥৮॥

যেই দিকেই এই ব্রাত্য গমন করে সমস্ত বেদমন্ত্র বিশ্বসংসার তাঁহার অনুগমন করে। ব্রাত্য কাহারও অধীন নহে, সে মুক্ত, তাহারই অনুগমন সকলে করে। সবই তাহাতে আসক্ত, সমস্ত প্রকৃতি তাহার ঐশ্বর্য্য ও অলঙ্কার। বিপথেই তাহার গমন, বিজ্ঞানই তাহার বসন। হাস্য, আনন্দ তাহার নিত্যসঙ্গী।—

স উদতিষ্ঠৎ স প্রাচীং দিশমনু ব্যচলত ॥১॥ তম্ বৃহচ্চ রথন্তরং চাদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবা অনুব্যচলন্ ॥২॥ বৃহতে চ বৈ স রথংতরায় চাদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ দেবেভ্য আবৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি ॥৩॥ শ্রদ্ধা পুংশ্চলী মিত্রো মাগধো বিজ্ঞানং বাসোঽহরুষ্ণীষং রাত্রী কেশা হরিতৌ প্রবর্তৌ কল্মলির্মণিঃ ॥৫॥ ভূতং চ ভবিষ্যচ্চ পরিষ্কন্দৌ মনো বিপথং ॥৬॥ মাতরিশ্বা চ পবমানশ্চ বিপথবাহৌ বাতঃ সারথী রেষ্মা প্রতোদঃ ॥৭॥ কীর্তিশ্চ যশশ্চ পুরঃ সরাবৈনং কীর্তির্গচ্ছত্যা যশো গচ্ছতি য এবং বেদ ॥৮॥ (অথর্ব, ১৫ কাণ্ড, ১ অনু, ২ পর্যায়)

সে উত্থিত হইল এবং পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিল ॥১॥ তাহাকে বৃহৎ সাম রথংতরসাম আদিত্যগণ এবং সকল দেবগণ অনুগমন করিল ॥২॥ বৃহৎ রথংতর আদিত্য ও বিশ্বদেবকে সে আঘাত করে, যে এরূপ বিদ্বান (বিজ্ঞানবান্) ব্রাত্যকে অবজ্ঞা করে ॥৩॥ শ্রদ্ধা তাহার অনুরাগিণী, মিত্র তাহার যশোগায়ক, বিজ্ঞান তাহার বসন, দিবা তাহার উষ্ণীষ, রাত্রি তাহার কেশ, হরিৎ (দিক্‌চক্রবাল) তাহার বলয়, দীপ্তি তাহার মণি ॥৫॥ ভূত এবং ভবিষ্যৎ তাহার পালিত ভৃত্য, মন তাহার পথহীন পথে (বি-পথে) ধাবিত ॥৬॥ মাতরিশ্বা ও পবিত্রকারী পবমান বায়ু (নিশ্বাস-প্রশ্বাস) তাহাকে বি-পথে বহন করে, বায়ু তাহার সারথি, গর্জ্জনকারী ঘূর্ণীবায়ু তাহার (শূল) বিদ্ধ করিবার দণ্ড ॥৭॥ কীর্ত্তি এবং যশ ইহার অগ্রগামী দূত। যিনি এইরূপ জানেন কীর্ত্তি ও যশ তাহাকে অনুগমন করে ॥৮॥

স উদতিষ্ঠৎ স দক্ষিণাং দিশমনুব্যচলৎ ॥৯॥ তম্ যজ্ঞায়জ্ঞিয়ং চ বামদেব্যং চ যজ্ঞশ্চ যজমানশ্চ পশবশ্চানুব্যচলন্ ॥১০॥ যজ্ঞায়জ্ঞিয়ায় চ বৈ স বামদেব্যায় চ যজ্ঞায় চ যজমানায় চ পশুভ্যশ্চাবৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি ॥১১॥ উষাঃ পুংশ্চলী মন্ত্রো মাগধো বিজ্ঞানং বাসোঽহরুষ্ণীষম্ রাত্রী কেশা হরিতৌ প্রবর্তৌ কল্মলির্মণিঃ ॥১৩॥ অমাবাস্যা চ পৌর্ণমাসী চ পরিষ্কন্দৌ মনো বিপথম্ ॥১৪॥

সে উত্থিত হইল এবং দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিল ॥৯॥ তাহাকে যজ্ঞায়জ্ঞিয় সামমন্ত্র, বামদেব্য সামমন্ত্র, যজ্ঞ যজমান ও পশুগণ অনুগমন করে ॥১০॥ যজ্ঞায়জ্ঞিয়, বামদেব্য, যজ্ঞ যজমান ও পশুগণকে সে আঘাত করে, যে এরূপ জ্ঞানবান্ ব্রাত্যকে অবজ্ঞা করে ॥১১॥ উষা তাহার অনুরাগিণী, মন্ত্র তাহার স্তব গান করে, বিজ্ঞান তাহার বসন, দিবা তাহার উষ্ণীষ, রাত্রি তাহার কেশ, হরিৎদিক্‌চক্রবাল তাহার বলয়, দীপ্তি তাহার মণি ॥১৩॥ অমাবস্যা এবং পৌর্ণমাসী তাহার পালিত ভৃত্য, মন তাহার পথহীন পথে ধাবিত ॥১৪॥

স উদতিষ্ঠৎ স প্রতীচীং দিশমনু ব্যচলৎ ॥১৫॥ তম্ বৈরূপং চ বৈরাজম্ চাপশ্চ বরুণশ্চ রাজানব্যচলন্ ॥১৬॥ বৈরূপায় চ বৈ স বৈরাজায় চাদ্ভ্যশ্চ বরুণায় চ রাজ্ঞ আবৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি ॥১৭॥ ইরা পুংশ্চলী হসো মাগধো বিজ্ঞানং বাসোঽহরুষ্ণীষম্ রাত্রি কেশাহরিতৌ প্রবর্তৌ কল্মলির্মণিঃ ॥১৯॥ অহশ্চ রাত্রী চ পরিষ্কন্দৌ মনো বিপথম্ ॥২০॥

সে উত্থিত হইল এবং পশ্চিম দিকে যাত্রা করিল ॥১৫॥ বৈরূপ বৈরাজ সামমন্ত্র, সলিল বরুণ ও রাজা তাহাকে অনুগমন করিল ॥১৬॥ বৈরূপ বৈরাজ সলিল বরুণ ও রাজাকে সে আঘাত করে, যে এইরূপ বিদ্বান ব্রাত্যকে অবজ্ঞা করে ॥১৭॥ প্রফুল্লতা তাহার অনুরাগিণী, হাস্য তাহার স্তবগায়ক, বিজ্ঞান তাহার বসন, দিবা তাহার উষ্ণীষ, রাত্রি তাহার কেশ, হরিৎ দিক্-চক্রবাল তাহার বলয়, দীপ্তি

তাহার মণি ॥১৯॥ দিবা এবং রাত্রি তাহার পালিত ভৃত্য, মন তাহার পথহীন পথে ধাবিত ॥২০॥

স উদতিষ্ঠৎ স উদীচীন্ দিশমনু ব্যচলৎ ॥২১॥ তম্ শ্যৈতং নৌধসম্ চ সপ্তর্ষয়শ্চ সোমশ্চ রাজানুবাচলৎ ॥২২॥ শ্যৈতায় চ বৈ স নৌধসায় চ সপ্তর্ষিভ্যশ্চ সোমায় চ রাজ্ঞ আবৃশ্চতে য এবম্ বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি ॥২৩॥ বিদ্যুৎ পুংশ্চলী স্তনয়িত্নু র্মাগধো বিজ্ঞানং বাসোঽহরুষ্ণীষম্ রাত্রি কেশা হরিতৌ প্রবর্তৌ কল্মলির্মণিঃ ॥২৫॥ শ্রুতং চ বিশ্রুতং চ পরিষ্কন্দৌ মনো বিপ ; ॥২৬॥ মাতরিশ্বা চ পবমানশ্চ বিপথবাহৌ বাতঃ সারথী রেষ্মা প্রতোদঃ ॥২৭॥ কীর্ত্তিশ্চ যশশ্চ পুরঃ সরাবৈনম্ কীর্ত্তির্গচ্ছত্যা যশো গচ্ছতি য এবম্ বেদ ॥২৮॥

সে উত্থিত হইল এবং উত্তর দিকে যাত্রা করিল ॥২১॥ তাহাকে শ্যৈত নৌধস সামমন্ত্র সপ্তর্ষি সোম এবং রাজা অনুগমন করিল ॥২২॥ সে শ্যৈত নৌধস সপ্তর্ষি সোম ও রাজাকে আঘাত করে, যে এইরূপ বিদ্বান ব্রাত্যকে অবজ্ঞা করে ॥২৩॥ বিদ্যুৎ তাহার অনুরাগিণী, বজ্র তাহার স্তবগায়ক, বিজ্ঞান তাহার বসন, দিবা তাহার উষ্ণীষ, রাত্রি তাহার কেশ, হরিৎ দিক্‌চক্রবাল তাহার বলয়, দীপ্তি তাহার মণি ॥২৫॥ শ্রুত ও (নানা স্থান হইতে) বিশ্রুত তাহার পালিত ভৃত্য; মন তাহার পথহীন পথে ধাবিত ॥২৬॥ মাতরিশ্বা ও পবিত্রকারী পবমান বায়ু তাহাকে বিপথে বহন করে, বায়ু তাহার সারথি, গর্জ্জনকারী ঘূর্ণী বায়ু তাহার বিদ্ধ করিবার দণ্ড ॥২৭॥ কীর্ত্তি এবং যশ ইহার অগ্রগামী দূত। যিনি এইরূপ জানেন, কীর্ত্তি ও যশ তাঁহাকে অনুগমন করে ॥২৮॥

এই ব্রাত্য সমাজের বিহিত কোনো পরিচিত ব্রত বা স্থান লইয়া বসিবার পাত্র নহে। বিশ্বভুবন তাহার চাই।

স সংবৎসরমূর্ধ্বোঽতিষ্ঠৎ তং দেবা অব্রুবন্ ব্রাত্য কিংনু তিষ্ঠসীতি ॥১॥ সোঽব্রবীদাসন্দীং মে সংভরন্ত্বিতি ॥২॥ তস্মৈ ব্রাত্যাসয়ান্দীং সমভরন্ ॥৩॥ তস্যা গ্রীষ্মশ্চ বসন্তশ্চ দ্বৌ পাদাবাস্তাং শরচ্চ বর্ষাশ্চ দ্বৌ ॥৪॥ বেদ আস্তরণং ব্রহ্মোপবর্হণম্ ॥৭॥ তামাসন্দীং ব্রাত্য আরোহৎ ॥৯॥ তস্য দেবজনাঃ পরিষ্কন্দা আসন্‌সংকল্পাঃ প্রহায্যা বিশ্বানি ভূতান্যুপসদঃ ॥১০॥ (অথর্ব ১৫ কাণ্ড, ১ অনু, ৩য় পর্য্যায়)

সে সংবৎসর উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল॥ তাহাকে দেবতারা বলিলেন, ব্রাত্য তুমি বসিতেছ না কেন? সে বলিল আমাকে (যোগ্য) আসন দাও॥ সেই ব্রাত্যকে তাঁহারা আসন দিলেন॥ গ্রীষ্ম ও বসন্ত সেই আসনের দুই পায়া, শরৎ ও বর্ষা আর দুই পায়া (অর্থাৎ পৃথিবী হইল তাহার আসন)। বেদ হইল তাহার আস্তরণ, স্তবমন্ত্র হইল তাহার উপাধান। সেই আসনে ব্রাত্য আরোহণ করিল॥ দেবজন-গণ তাহার আশ্রিত ভৃত্য হইল, সঙ্কল্পসমূহ তাহার প্রতিহারী হইল। বিশ্ব-ভূত অনুচর হইল॥

দিকে দিকে যে-সব দেবতার কল্পনা আছে সে সেই-সব অগ্রাহ্য করে; বরং দেবতারাই তাহার সেবায় প্রবৃত্ত।

তস্মৈ প্রাচ্যা দিশো অন্তর্দেশাদ্ ভবমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥২॥ তস্মৈ দক্ষিণায়া দিশো অন্তর্দেশাচ্ছর্বমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥৪॥ তস্মৈ প্রতীচ্যা দিশো অন্তর্দেশাৎ পশুপতিমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥৬॥ তস্মা উদীচ্যা দিশো অন্তর্দেশাদুগ্রং দেবমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥৮॥ তস্মৈ ধ্রুবায়াং দিশো অন্তর্দেশাদ্ রুদ্রমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥১০॥ তস্মা উর্দ্ধায়াং দিশো অন্তর্দেশান্মহাদেবমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥১২॥ তস্মৈ সর্বেভ্যো অন্তর্দেশেভ্য ঈশানমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥১৫॥ (অথর্ব ১৫ কাণ্ড, ১ অনু, পঞ্চম পর্য্যায়)

পূর্ব্ব দিকের অন্তর্দেশ হইতে ইষুক্ষেপক ভবকে তাহার অনুচর করিয়া দিল॥ দক্ষিণ দিকের অন্তর্দেশ হইতে ইষুক্ষেপক শর্বকে তাহার অনুচর করিয়া দিল॥ পশ্চিম দিকের অন্তর্দেশ হইতে ইষুক্ষেপক পশুপতিকে তাহার অনুচর করিয়া দিল॥ উত্তর দিকের অন্তর্দেশ হইতে ইষুক্ষেপক উগ্রদেবকে তাহার অনুচর করিয়া দিল॥ ধ্রুব দিকের অন্তর্দেশ হইতে ইষুক্ষেপক রুদ্রকে তাহার অনুচর করিয়া দিল॥ ঊর্দ্ধ দিকের অন্তর্দেশ হইতে ইষুক্ষেপক মহাদেবকে তাহার অনুচর করিয়া দিল॥ সর্ব্বদিকের অন্তর্দেশ হইতে ইষুক্ষেপক ঈশানকে তাহার অনুচর করিয়া দিল॥

স ধ্রুবাং দিশমনুব্যচলৎ ॥১॥ তং ভূমিশ্চাগ্নিশ্চৌষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ বানস্পত্যাশ্চঃ বীরুধশ্চানুব্যচলন্ ॥২॥ স ঊর্দ্ধাং দিশমনুব্যচলৎ ॥৪॥ তমৃতং চ সত্যং চ সূর্যশ্চ চন্দ্রশ্চ নক্ষত্রাণি চানুব্যচলন্ ॥৫॥ স উত্তমাং দিশমনুব্যচলৎ ॥৭॥ তম্ ঋচশ্চ সামানি চ যজুংষি চ ব্রহ্ম চানুব্যচলন্ ॥৮॥ স বৃহতীং দিশমনুব্যচলৎ ॥১০॥ তমিতিহাসশ্চ পুরাণংচ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্যচলন্ ॥১১॥ স দিশোঽনুব্যচলৎ তং বিরাডনুব্যচলৎ সর্বে চ দেবাঃ সর্বাশ্চ দেবতাঃ ॥২২॥

(অথর্ব, ১৫, ১ অনু, ৬ষ্ঠ পর্য্যায়)

সে ধ্রুব দিকে যাত্রা করিল ॥১॥ ভূমি, অগ্নি, ওষধি, বনস্পতি, বনস্পতি সম্বন্ধীয় সব-কিছু তাহাকে অনুগমন করিল ॥২॥ সে ঊর্দ্ধদিকে যাত্রা করিল ॥৪॥ তাহাকে ঋত, সত্য, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, অনুগমন করিল ॥৫॥ সে উত্তমা দিকে যাত্রা করিল ॥৭॥ ঋক্, সাম, যজু, স্তববাণী তাহার অনুগমন করিল॥ সে বৃহতী দিকে যাত্রা করিল ॥১০॥ ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, ও মানবস্তব তাহাকে অনুগমন করিল ॥১১॥ সে সব-

দিকে যাত্রা করিল! তাহাকে বিরাট ও সমস্ত দেবতা অনুগমন করিল ॥২২॥

স মহিমা সদ্রুর্ভূত্বান্তং পৃথিব্যা অগচ্ছৎ স সমুদ্রোঽভবৎ ॥১॥
(অথর্ব, ১৫ কাণ্ড, ১ অনু, ৭ম পর্য্যায়)

সেই মহিমা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া পৃথিবীর অন্তে গেল। সে সমুদ্র হইল।

সে-ই ক্ষত্রিয়ের মূল, সে ই জনসমূহের বান্ধব।

সোঽরজ্যত ততো রাজন্যোঽজায়ত ॥১॥ স বিশঃ সবন্ধূনন্নমন্নাদ্যমভ্যুদতিষ্ঠৎ ॥২॥ (অথর্ব ১৫ কাণ্ড, ২য় অনু, ১ম পর্য্যায়)

সে অনুরাগী হইল। তাহা হইতে রাজন্য জন্মগ্রহণ করিল॥ সে জনসমূহ, বান্ধব, অন্ন ও অন্নভোজীর অভিমুখে উত্থিত হইল॥

তাহার সঙ্গে সঙ্গে জনসমূহ, সুরা, শক্তি সবাই চলে—

স বিশোঽনু ব্যচলৎ ॥১॥ তং সভা চ সমিতিশ্চ সেনা চ সুরা চানুব্যচলন্ ॥২॥ (২য় অনু, ২য় পর্য্যায়)

সে জনসমূহের দিকে যাত্রা করিল। তাহার পিছে পিছে সভা সমিতি সুরা সেনা সবই যাত্রা করিল।

এই ব্রাত্য যাহার গৃহে পদার্পণ করিবে সেই ধন্য। রাজাও এমন অতিথি পাইলে ধন্য হয়। ইহা হইতেই উদ্ভূত যে পবিত্রতা তাহাতে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব; ইহার শক্তি হইতেই ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব; ইনিই সব ব্রহ্মণ্য ও ক্ষাত্র শক্তির মূলাধার।

তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো রাজ্ঞোঽতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ ॥১॥ শ্রেয়াংসমেনমাত্মনো মানয়েৎ তথা ক্ষত্রায় নাবৃশ্চতে তথা রাষ্ট্রায় নাবৃশ্চতে ॥২॥ অতো বৈ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোদতিষ্ঠতাং তে অব্রূতাং কং প্রবিশাবেতি ॥৩॥ অতো বৈ বৃহস্পতিমেব ব্রহ্ম প্রবিশত্বিন্দ্রং ক্ষত্রং তথা বা ইতি ॥৪॥ অতো বৈ বৃহস্পতিমেব ব্রহ্ম প্রাবিশদিন্দ্রং ক্ষত্রম্ ॥৫॥
(অথর্ব, ১৫ কাণ্ড, ২য় অনুবাক, ৩য় পর্য্যায়)

এইরূপ বিদ্বান্ ব্রাত্য যদি কোন রাজার গৃহে অতিথি হইয়া প্রবেশ করে ॥১॥ তিনি তাহা হইলে ইহাকে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন, তাহা না হইলে তাঁহার ক্ষাত্রধর্ম্মে আঘাত লাগিবে ॥২॥ তাহা হইতেই ব্রহ্মণ্য এবং ক্ষাত্রধর্ম্ম উদ্ভূত হইল। তাহারা বলিল—কাহাতে আমরা প্রবেশ করি ॥৩॥ তখন ইহা উক্ত হইল যে, ব্রহ্মণ্য বৃহস্পতিতে ও ক্ষাত্রধর্ম্ম ইন্দ্রতে প্রবেশ করুক। ৪॥ তাই বৃহস্পতিতে ব্রহ্মণ্য ও ইন্দ্রে ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রবেশ করিল।

এই ব্রাত্য গৃহাশ্রমীরও প্রার্থনার ধন। এ যে সহজ মানুষ, এ সকলেরই আনন্দ-ধন, সকলেরই প্রিয়জন। ইনি পথের লোক, এই পথই দেবধাম, এবং পথের দীক্ষায় ব্রাত্যই গুরু।

তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যোঽতিথির্গৃহমাগচ্ছেৎ ॥১॥ স্বয়মেনমভ্যুদেত্য ব্রূয়াদ্ ব্রাত্য ক্বাঽবাৎসীর্ব্রাত্যোদকং ব্রাত্য তর্পয়ন্তু ব্রাত্য যথা তে প্রিয়ং তথাস্তু ব্রাত্য যথা তে বশস্তথাস্তু ব্রাত্য যথা তে নিকামস্তথাস্ত্বিতি ॥২॥ যদেনমাহ ব্রাত্য ক্বাঽবাৎসীরিতি পথ এব তেন দেবযানানবরুন্ধে ॥৩॥ যদেনমাহ ব্রাত্য তর্পয়ন্ত্বিতি প্রাণমেব তেন বর্ষীয়াংসং কুরুতে ॥৫॥
(অথর্ব ১৫ কাণ্ড, ২য় অনু, ৪র্থ পর্য্যায়)

যে-কোন গৃহস্থের গৃহে এইরূপ বিদ্বান্ ব্রাত্য অতিথি উপস্থিত হয় সে স্বয়ং তাহার নিকট গিয়া বলিবে "হে ব্রাত্য কোথায় তোমার নিবাস। এই জল, ইহা তোমাকে তৃপ্ত করুক; তোমার যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ হউক, তোমার যেরূপ পরিতৃপ্তি সেরূপ হউক।" ঐ যে গৃহপতি তাহাকে বলেন "ব্রাত্য কোথায় তোমার নিবাস" তাহাতে সেই গৃহপতি সকল-পথের অধিকার লাভ করেন, পথেই দেবতাগণের সর্ব্বদা গতিবিধি। ঐ যে গৃহপতি তাহাকে বলেন "ব্রাত্য তোমার তৃপ্তি হউক" তাহাতে তিনি প্রাণকে চিরন্তন করিয়া প্রাপ্ত হন।

এই ব্রাত্য দেবতা-অপেক্ষা সত্য। ব্রাত্যকে উপেক্ষা করিয়া দেব-সেবা যাগযজ্ঞ সব নিষ্ফল, বরং ইহার জন্য দেবতা-অর্চ্চনাও স্থগিত হইতে পারে।

তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য উদ্ধৃতেষ্বগ্নিষ্বধিশ্রিতেঽগ্নিহোত্রেঽতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ ॥১॥ স্বয়মেনমভ্যুদেত্য ব্রূয়াদ্ ব্রাত্যাতিসৃজ হোষ্যামীতি ॥২॥ স চাতিসৃজেজ্জুহুয়ান্নচাতিসৃজেন্নজুহুয়াৎ ॥ ৩ ॥ স য এবংবিদুষা ব্রাত্যেনাতিসৃষ্টো জুহোতি ॥ ৪ ॥ ন দেবেষ্বাবৃশ্চতে হুতমস্য ভবতি ॥ ৬ ॥ অথ য এবংবিদুষা ব্রাত্যেনানতিসৃষ্টো জুহোতি ॥ ৮ ॥ আ দেবেষু বৃশ্চতে অহুতমস্য ভবতি ॥ ১০
(অথর্ব ১৫ কাণ্ড, ২য় অনু, ৫ম পর্য্যায়)

গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যে গৃহপতি অগ্নিহোত্রে প্রবৃত্ত, সেই গৃহপতির গৃহে এইরূপ বিদ্বান্ ব্রাত্য অতিথি হইয়া যখন আসে, তখন গৃহস্থ স্বয়ং তাহার নিকট গিয়া বলিবেন "হে ব্রাত্য, অনুমতি কর তো অগ্নিহোত্রে আহুতি দান করি।" সে অনুমতি দিলে আহুতি দিবে, না দিলে আহুতি দিবে না। এইরূপ অনুমতি লইয়া যে আহুতি দেয়, সে দেবতার বিরুদ্ধে আঘাত করে না এবং তাহার আহুতিই সিদ্ধ হয়। আর এই অনুমতি না লইয়া যে আহুতি দেয় সে দেবতাদের আঘাত করে, এবং তাহার আহুতি অসিদ্ধ হয়।

একটি রাত্রির আতিথ্যেই এই ব্রাত্যকে বিদায় দেওয়া চলে না। এ যতদিন গৃহে থাকে ততদিনই গৃহপতির কল্যাণ।

তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য একাংরাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি ॥১॥ যে পৃথিব্যাং পুণ্যা লোকস্তানেব তেনাবরুন্ধে ॥২॥ তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো দ্বিতীয়াং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি ॥৩॥ যেঽন্তরিক্ষে লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে ॥৪॥ তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যস্তৃতীয়াং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি ॥৫॥ যে দিবি পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে ॥৬॥ তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যশ্চতুর্থীং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি ॥৭॥ যে পুণ্যানাং পুণ্যালোকাস্তানেব তে নাবরুন্ধে ॥ ৮ ॥ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যেऽপরিমিতা রাত্রীরতিথির্গৃহে বসতি ॥৯॥ স এবাপরিমিতাঃ পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে ॥১০ ॥

(অথর্ব ১৫ কাণ্ড, ২য় অনু, ৬ষ্ঠ পর্য্যায়)

এইরূপ বিদ্বান্ ব্রাত্য যাহার গৃহে এক রাত্রি বাস করে সে পৃথিবীর পুণ্যলোককে অধিকার করিতে সমর্থ হয়। এই ব্রাত্য যাহার গৃহে দ্বিতীয় রাত্রি বাস করে সে অন্তরীক্ষের পুণ্যলোক অধিকার করিতে সমর্থ হয়। যাহার গৃহে এই ব্রাত্য তৃতীয় রাত্রি বাস করে সে দ্যুলোকস্থিত পুণ্যলোক অধিকার করিতে সমর্থ হয়। যাহার গৃহে এই ব্রাত্য চতুর্থ রাত্রি বাস করে সে পাবনেরও পাবনলোক অধিকার করিতে সমর্থ হয়। যাহার গৃহে এই ব্রাত্য অপরিমিত রাত্রি বাস করে সে অপরিমিত পুণ্যলোক লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সমস্ত বিশ্বভুবনই এই ব্রাত্যের প্রাণ। সে যে কেবল আপনার দেহে আপনি সম্পূর্ণ তাহা নহে। সে ভুবন-জোড়া, সে অপরিমিত। এই সৃষ্টিতে (প্রজা) মানবও অপরিমিত অসীম।

তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য প্রথমঃ প্রাণ ঊর্দ্ধো নামায়ং স অগ্নিঃ ॥৩॥ তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য দ্বিতীয়ঃ প্রাণঃ প্রৌঢ়ো নামাসৌ স আদিত্যঃ ॥৫॥ তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য তৃতীয়ঃ প্রাণোঽভ্যূঢ়ো নামাসৌ স চন্দ্রমাঃ ॥৫॥ তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য সপ্তমঃ প্রাণ অপরিমিতোনাম তা ইমাঃ প্রজাঃ ॥৮॥

(অথর্ব ১৫ কাণ্ড, ২য় অনুবাক্, ৮ম পর্য্যায়)

এই ব্রাত্যের প্রথম প্রাণ ঊর্দ্ধ, তাহা অগ্নি। এই ব্রাত্যের দ্বিতীয় প্রাণ প্রৌঢ়, তাহা আদিত্য। এই ব্রাত্যের তৃতীয় প্রাণ অভ্যূঢ়, তাহা চন্দ্রমা। এই ব্রাত্যের সপ্তম প্রাণ অপরিমিত-নাম, তাহা প্রজা।

এই ব্রাত্যের দেহ সমস্ত ভুবন, সে ত আপনার দেহেতে আপনাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে নাই, সে বিশ্বকায়।

তস্য ব্রাত্যস্য ॥১॥ যদস্য দক্ষিণমক্ষ্যসৌ স আদিত্যো। যদস্য সব্যমক্ষ্যসৌ স চন্দ্রমাঃ ॥২॥ যোঽস্য দক্ষিণঃ কর্ণোঽয়ং সো অগ্নির্যোঽস্য সব্যঃ কর্ণোঽয়ং পবমানঃ ॥৩॥ অহোরাত্রে নাসিকে দিতিশ্চাদিতিশ্চ শীর্ষকপালে সংবৎসরং শিরঃ ॥৪॥ অহ্না প্রত্যঙ্ ব্রাত্যো রাত্র্যা প্রাঙ্ নমো ব্রাত্যায় ॥৫॥ (অথর্ব ১৪ কাণ্ড, ২য় অনু, ১১ পর্য্যায়)

এই ব্রাত্যের যাহা দক্ষিণ নেত্র তাহা আদিত্য, যাহা বাম নেত্র তাহা চন্দ্রমা। তাহার দক্ষিণ কর্ণ অগ্নি, বাম কর্ণ সর্ব্বপাবন পবন। দিন এবং রাত্রি তাহার নাসারন্ধ্র। দিতি ও অদিতি তাহার সম্মুখস্থ ললাট ও মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগ, সম্বৎসর তাহার শির। দিনের সহিত এই ব্রাত্য পশ্চিমমুখ, রাত্রির সহিত এই ব্রাত্য পূর্ব্বমুখ, ব্রাত্যকে নমস্কার॥

হে ব্রাত্য আমরাও তোমাকে নমস্কার করি। আমাদিগকে মুক্তি দাও, সংস্কারহীন গভীর সহজ জ্ঞান দাও, প্রকৃতির কোলে বসিতে শিখাও, প্রকৃতি আমাদের ভূষণ হউক, দিবসের সঙ্গে রাত্রির সঙ্গে আমাদের মুখও যেন পশ্চিমে ও পূর্ব্বে ফেরে, আমাদের মনও যেন নিত্য চলে এবং আমরা যেন বিশ্বভুবনের দিকে চাহিয়া দেখি। আমরা যেন নিত্য নূতন পথহীন পথে নিজেদের প্রাণের অপরিমিত বেগে পথ করিয়া করিয়া অগ্রসর হইতে পারি।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

দুই তার

(৩)

সকাল হইতে-না হইতেই পঞ্চানন বীরেনদের বাড়ীর সদর দরজায় গিয়া ডাকিল বীরেন! ও বীরেন! এত বেলাতেও ঘুমুচ্ছিস নাকি?

পেঁচোর গলা শুনিয়াই বীরেনের মায়ের প্রাণ শুকাইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল কাল তিনি দয়াদেবীকে যে প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছেন, তাহারই মঞ্জুরী হুকুম জানাইতে পঞ্চানন আসিয়াছে বোধ হয়। তিনি নিদ্রিত পুত্রের গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন—বাবা বীরু, ওঠ বাবা, পাচু ভটচায্ ডাকছে!

বীরেন্দ্র ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল,—মা, কাল-পেঁচাটা ভোরবেলা জ্বালাতে এসেছে কেন?

—কি জানি বাবা। কাল দয়াদিদিকে বলে এসেছিলাম…

পঞ্চানন আবার ডাকিল—ওরে বীরে! ঘুম ভাঙল?

বীরেন্দ্র নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে একটু বিদ্রূপের স্বরে চেঁচাইয়া বলিল—আজ্ঞে যাই।

বীরেন কাপড়খানা কষিয়া পরিতে পরিতে যাইতে যাইতে হিতোপদেশের লঘুপতনক বায়সের কথা স্মরণ করিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, প্রাতরেব অনিষ্টদর্শনং জাতং, ন জানে কিম্ অনভিমতং দর্শয়িষ্যতি!

বীরেন সদর দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বলছেন?

—তোর মা কোথায়? তোর মাকে বল আমি এসেছি।

– মা এইখানেই আছেন, আপনি বাড়ীর ভেতরে আসুন।

বীরেন্দ্রের মা ঘরের দরজার একপাটি কপাট ভেজাইয়া তাহার আড়ালে দাঁড়াইলেন, বীরেন্দ্র খোলা কপাটের নিকট দেয়ালে হেলান দিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চানন দালানে দাঁড়াইয়া একটু উঁচু গলায় বলিতে লাগিল—বাবু কতকগুলি খুব দামি কুকুর কিনেছেন, সেগুলিকে সর্ব্বদা চোখের উপর রাখা দরকার।

এই দরকারের সহিত বীরেন্দ্রের মায়ের কি সম্পর্ক তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। পঞ্চানন আবার বলিতে লাগিল—বাবুর বাড়ী থেকে এই বাড়ীটি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর ইচ্ছে এই বাড়ীটি তিনি বীরেনের কাছ থেকে দাম দিয়ে কিনে নিয়ে এইখানে কুকুরগুলি রাখেন।

বীরেন্দ্রের মা বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—যে বাড়ীতে ঠাকুর-দেবতার পূজো হয়েছে, সোয়ামী শ্বশুর চোদ্দপুরুষ ধরে মানুষ হয়েছেন, সেই ভিটেয় হবে কুকুরের বাথান, সেখানে থাকবে মেথর মুদ্দফরাস! আমার জীবন থাকতে তা কখনো হবে না।

পঞ্চানন ক্রূর হাসি হাসিয়া খড়্গের ন্যায় বাঁকা নাক আরো বাঁকাইয়া, লাউ-বীচির মতন শাদা শাদা বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া বলিল—শাস্ত্রেই আছে যত্র জীব তত্র শিব। কুকুর মেথর সবই ত কেষ্টর জীব! কুকুর ঠাকুর, বামুন মেথর সব সমান! ভেদবুদ্ধি মায়াতে বৈ ত নয়!

বীরেন্দ্রের মা লজ্জা ভুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন তা হলে আমার আর মায়া নেই, দেখতে পাচ্ছি পেঁচো ভটচায্ মেথর মুদ্দফরাস কুকুরেরও অধম!

পঞ্চানন একটুও অসন্তুষ্ট বা অপ্রতিভ না হইয়া তেমনি হাসিমুখে বলিতে লাগিল—আমাকে যত ইচ্ছে গাল দিন। কিন্তু আমার কি দোষ বলুন। আমরা মুনিবের হুকুমের চাকর। বাবু বলেছেন বাড়ীর ন্যায্য দামের চতুর্গুণ দাম দেবেন……

বীরেনের মা আর আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন—বীরু, কুকুরটাকে মেরে তাড়িয়ে দে ত!

পঞ্চানন আশ্চর্য্য-রকম শান্তভাবে মিনতি করিয়া বলিল—আপনি অত তপ্ত হয়ে উঠছেন কেন? একটু তলিয়ে সব দিক ভেবে দেখুন। জমি জমিদারের; তাঁর দয়াতে আমরা প্রজারা জমির ওপর চাষবাস করে উপর-স্বত্ব ভোগ করতে পাই। তাঁর ন্যায্য অধিকার তিনি ফিরিয়ে চাইলে আমাদের দিয়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি বলুন! তবে আমাদের বাবুর খুব নাকি দয়ার শরীর, তাই তিনি একখানা পুরোনো বাড়ী নতুনের চতুর্গুণ দাম দিয়ে কিনতে চাচ্ছেন। অন্য লোক হলে লেঠেল দিয়ে জোর করে দখল করত। কিন্তু আমাদের বাবু ত সে-রকম অধার্ম্মিক নন।……

বীরেনের মা ক্রমে বেশী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন; রুষ্ট স্বরে বলিলেন—বাবু ছলে কৌশলে ত সব নিয়েছেন, এখন বাকি আছে ভিটেটুকু; তা লেঠেল দিয়ে জোর করে কেড়ে না নিলে আমি দেবো না, আর তাও আমার প্রাণ থাকতে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না!

বীরেনের মা যত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন পঞ্চানন তত সন্তুষ্ট হইয়া পরম বিনয় ও মিনতির ভাবে মিষ্ট করিয়া কথা বলিতেছিল। সে বলিল—আপনি যখন অমন অবুঝের মতন একগুঁয়েমি করছেন তখন আমাকে আসল কথাটি খুলে বলতে হল, মনে করেছিলাম প্রকাশ করব না। বীরেনের বাবা এই বাড়ী আর তাঁর জমি জমা সব বাবুর কাছে পাঁচ হাজার টাকায় বন্ধক রেখেছিলেন; সাতশ টাকা উশুল দিয়েছিলেন; সুদে-আসলে দেনা এখন সাড়ে পাঁচ হাজারে দাঁড়িয়েছে। সেই দেনার দায়ে এ বাড়ী ত বিকিয়েই গেছে; তবু বাবুর আমাদের দয়ার শরীর কিনা তাই কিছু টাকা ধরে দিয়ে বাড়ীটে চাচ্ছিলেন।

বীরেনের মা বলিলেন—আমরা তিনটি প্রাণী; আমাদের অত টাকা ধার করবার কি দরকার হয়েছিল?—মেয়ে-ছেলের বিয়ে পৈতে দিয়েছি, না দোল দুর্গোচ্ছব করেছি যে ধার হবে!

পঞ্চানন একটু হাসিয়া কিন্তু-ভাবে বলিল—শেষদানি দাদার চরিত্তিরটা......

বীরেনের মা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—মিথ্যে-বাদী জালিয়াত! তুই আমার বাড়ী থেকে এখুনি দূর হ বলছি। তারপর যা পারিস করগে যা।

বীরেনও রাগে ফুলিতে-ফুলিতে বলিল—দূর হও শিগগির, নইলে—

পঞ্চানন হাসিমুখে একবার বীরেনের দিকে তাকাইয়া তাহার মাকে উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া যাইতে-যাইতে বলিয়া গেল—তবে আসি বৌঠাকরুণ, একটু ভেবে চিন্তে বীরেনকে দিয়ে আমায় খবরটা পাঠাবেন। যদি জেদ না ছাড়েন আদালত-ঘর করতে হবে।

(৪)

বাবু পঞ্চাননকে ডাকিয়া অত রাত্রে বীরেন্দ্রের জমিজমা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিলেন তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া সমস্ত রাত্রি দয়াদেবী ভালো করিয়া ঘুমাইতে পারেন নাই। প্রভাতে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়াই যে-ঘর হইতে বীরেন্দ্রদের বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায় সেই ঘরের জানলায় আসিয়া দাঁড়াইয়া অন্যমনস্কভাবে সেই দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন কেমন করিয়া উহাদের রক্ষা করিবার কি উপায় তিনি করিতে পারেন। এমন সময় দয়াদেবী দেখিতে পাইলেন পঞ্চানন আসিয়া বীরেন্দ্রদের দরজায় দাঁড়াইল। তাঁহার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি উৎসুক হইয়া সেই জানলার কাছে ঠায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দাসী আসিয়া ডাকিল—মা, মুখ ধোবার জল দেওয়া হয়েছে।

"যাচ্ছি" বলিয়াও দয়াদেবী সেখান হইতে নড়িলেন না।

তিনি দেখিলেন বীরেন আসিয়া পঞ্চাননকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল।

দয়াদেবীর দশ বছরের মেয়ে মায়া আসিয়া ডাকিল—মা, আমায় খেতে দেবে এস।

দয়াদেবী বলিলেন—মোহিনীকে বলগে খেতে দেবে।

মায়া আব্দার করিয়া বলিল—না, তুমি দেবে এস।

মাতা কন্যার দিকে না ফিরিয়া বলিলেন—আমি এখন যেতে পারব না, তুই যা।

মেয়ে রাগ করিয়া পা ছড়াইয়া সেইখানে মেঝেতে বসিয়া রহিল, তাহা তিনি দেখিলেন না, তাঁহার দৃষ্টি বীরেনদের বাড়ীর দিকেই নিবদ্ধ।

মোহিনী দাসী আসিয়া মায়াকে ডাকিল—দিদিমণি, খাবে এস।

মায়া কোনো কথা বলিল না, গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল।

মোহিনী বলিল—মা, দিদিমণিকে খেতে যেতে বল।

দয়াদেবী বীরেন্দ্রদের বাড়ীর দিক হইতে চোখ ফিরাইতে পারিতেছিলেন না, যে মুহূর্ত্তে তিনি চোখ ফিরাইবেন সেই মুহূর্ত্তে যদি এমন কিছু ঘটিয়া যায় যাহা তাঁহার দেখা উচিত ছিল। তিনি না ফিরিয়াই বলিলেন—মায়া, যা।

মায়ার নড়িবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। যে মা রোজ তাহাকে নিজের হাতে খাবার দিয়া কাছে বসিয়া খাওয়ান, সেই মা আজ একবার ফিরিয়াও চাহিতেছেন না, এই উপেক্ষায় আদুরে মেয়ের অভিমান উছলিয়া উঠিতেছিল।

মোহিনী বলিল—মা, দিদিমণি যে নড়ে না।

দয়াদেবী শুধু বলিলেন—থাক, পরে খাবে 'খন।

দাসী অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল—কাল রাত্রে বাবুর সঙ্গে মায়ের বোধহয় ঝগড়া হয়েছে।

পঞ্চানন বীরেন্দ্রদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। অমনি জানলা হইতে ফিরিয়াই দয়াদেবী বলিলেন—মোহিনী, যা ত বীরেনের মায়ের কাছে, বলগে আমি ডাকছি।

মোহিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তুমি মুখ ধোবে না।

—ধোবো 'খন, তুই আগে চট করে বীরেনের মাকে ডেকে আন।

মোহিনী আশ্চর্য্য হইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল। এইবার মায়ের আদর পাইবে মনে করিয়া মায়া খুব রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইয়া বসিয়া আড়-চোখে মায়ের দিকে ঘন-ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু দয়াদেবী দাঁড়াইয়া অন্যমনে কি ভাবিতেছিলেন, মেয়ের দিকে তাঁহার নজর পড়িল না।

বীরেনের মা আসিয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন—দিদি, ডেকেছ ?

"হাঁ" বলিয়া দয়াদেবী একবার মোহিনীর দিকে একবার মেয়ের দিকে চাহিলেন। তারপর বীরেনের মাকে বলিলেন—তুমি আমার সঙ্গে এস······ মোহিনী তুই মায়ার কাছে থাক।

মায়ের আজ এই নূতন ভাব দেখিয়া মায়ার কান্না পাইতেছিল। মোহিনী কাছে গিয়া সেই বলিল- দিদিমণি, ওঠ, খাবে চল।—অমনি মায়া ঝাঁঝের সহিত "যাঃ আমি যাব না" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

দয়াদেবীর কানে আজ সেই কান্না পৌঁছিলেও তিনি তাহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন না। তিনি বীরেনের মাকে নির্জ্জন মালখানার ঘরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—পেঁচো এত সকালে কি করতে এসেছিল তোমাদের বাড়ী ?

বীরেনের মায়ের কাছে সমস্ত শুনিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন—বাড়ীটা ওকে ছেড়ে দাও বৌ; ওঁর যখন ঝোঁক চেপেছে তখন স্বয়ং ব্রহ্মা এলেও রদ করতে পারবে না। যে টাকা দিতে চাচ্ছেন সেই টাকা নিয়ে অন্য জমিদারের এলাকায় গিয়ে বাস করগে; নইলে টাকাও পাবে না, বাড়ীও যাবে।

দয়াদেবীর মুখেও এই কথা শুনিয়া বীরেনের মা মনে করিলেন ইহাও জমিদারের ফন্দি, নানান-রকমে ভুলাইয়া তাঁহাকে ভিটা-ছাড়া করিবার চাল। তাই তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—আমার দেহে প্রাণ থাক্‌তে সোয়ামী শ্বশুরের ভিটে আমি ছাড়তে পারব না! তা তোমরা যা করতে পার কর।

বীরেনের মা রুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া দয়াদেবী বলিলেন—তবে এক কাজ কর বৌ; যে টাকাটায় বাড়ী বন্ধক আছে ওরা বলছে, সেই টাকাটা ওদের ফেলে দাও।

বীরেনের মা ক্রোধ বিদ্রূপ ও হতাশার হাসি হাসিয়া বলিলেন—আমার সর্ব্বস্ব ত তোমরা নিয়ে চুকেছ দিদি, অত টাকা আমি আর কোথায় পাব!

"সেই পরামর্শ করতেই ত তোমায় ডেকেছি" ব্যথিত স্বরে বলিয়া দয়াদেবী আঁচল হইতে চাবির গোছা লইয়া একটি লোহার আলমারি খুলিলেন; তাহার ভিতর হইতে একটি হাত-বাক্স টানিয়া বাহির করিয়া তাহার ডালা খুলিয়া ফেলিলেন; বাক্সটি গহনায় ভরা। দয়াদেবী বলিলেন—বৌ, এই বাক্সয় যে গহনা আছে তার দাম অনেক হবে; এই-সব বেচে কি বন্ধক দিয়ে তুমি ওদের দাবী মেটাও। সন্ধ্যার পর বীরেনকে পাঠিয়ে দিও বাক্স নিয়ে যাবে।

দয়াদেবীর এতখানি দয়া বীরেনের মা সরল মহত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ মিশাইয়া হাসিয়া বলিলেন—হাঁ, ওটা আর বাকী থাকে কেন? গহনা নিতে এসেই হোক, কি বিক্রী বন্ধক করতে গিয়েই হোক, চোর দায়ে ধরা পড়ে বীরেনের জেল না খাটলে মনঃপুত হবে কেন!

সরল দয়াদেবী বীরেনের মায়ের বিদ্রূপ বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া বলিলেন—তবে কি হবে বৌ? আমার কাছে নগদ টাকা ত অত নেই। আমি ছশো টাকা মাসহারা পাই; আজ থেকে আমি তার এক পয়সা খরচ করব না; তোমরা মকদ্দমা কর, বীরেন যেন চুপিচুপি মাসমাস সেই টাকা নিয়ে যায়। আমি এই সোনা ছুঁয়ে দিব্যি করছি বৌ, বীরেনের বাপের ভিটে খালাস করতে না পারলে আমি এ গহনার একখানিও অঙ্গে তুলব না; মা কালীর কাছে মানত করে তুলে রাখছি। যদি বাড়ী না খালাস হয়, এই সোনা রূপো হামামদিস্তায় কুটে তাল পাকিয়ে বীরেনকে দেবো, তা হলে ত ধরা পড়বার কোনো ভয় থাকবে না। আমার স্বামীর ঋণ আমাকে শোধ করতে হবে।

বীরেনের মা আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে দয়াদেবীর পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন—দিদি, আমায় ক্ষমা কোরো, দয়াদেবীর যে এত দয়া তা আমি বুঝতে পারিনি। তোমার আশীর্ব্বাদে বীরেনের আমার কোনো অকল্যাণ হবে না।

দমকা হাওয়ার মতন হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া মায়া মাঁকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—আমায় খেতে দেবে এস না।

দয়াদেবী আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন—চ, যাচ্ছি।

মায়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল—সকালে উঠেই পাড়ার লোককে ডেকে গপ্প!

দয়াদেবী মায়ার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন—তোরই অকল্যাণের ভয়েরে! তোরই কল্যাণের জন্যে!

(৫)

বীরেনের বাবার সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করার তমসুখ তামাদি হইয়া যাইতেছে বলিয়া বাধ্য হইয়া গুণময় বাবুকে বীরেন ও তাহার মায়ের নামে নালিশ করিতে হইল; কেবল ডিক্রিটা করাইয়া রাখিবেন, নতুবা বিধবা ও নাবালকের উপর ডিক্রি জারি করিয়া তাহাদিগকে জেরবার করা ত তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। বিশেষ করিয়া তাঁহাকে নালিশ করিতে হইয়াছে বীরেনের মা তমসুক জাল বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন বলিয়া। যিনি গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধাম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ, যিনি খুব তিলক ফোঁটা কাটেন, তিন ঘণ্টা ধরিয়া জপ আহ্নিক করেন, গেরুয়া পরেন, আলোচাল নিরামিষ খান, স্বয়ং সেই হরদেব মুখুয্যের হাতের লেখা তমসুক; তমসুকের ইসাদী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, চতুর বিশ্বাস, নফর পোদ্দার, বেচারাম পরামাণিক, আর রামকালী গাঙ্গুলি। তাহাদের মধ্যে নফর পোদ্দার ও রামকালী গাঙ্গুলির মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সই জলজ্যান্ত বিদ্যমান আছে; তমসুকের পিঠে বীরেনের বাবার নিজের হাতে লেখা সাতশো টাকা উশুল দেওয়া আছে। শুধু তাই নয়, বাবুর খাস নগ্‌দী লক্ষ্মণ বাগ্দী, খানসামা হারাণে কৈবর্ত্ত আর রতনহাটির মদন মজুমদার টাকা উশুল দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিল, তাহারাও সাক্ষী দিবে। সকলেই জানে কোন্ বাড়ীর কোন্ ঘরে কিসের কলমে কোন্ সময়ে কখন্ ঐ তমসুক লেখা হইয়াছিল ও তখন কে কে কোন্-মুখো বসিয়া বা দাঁড়াইয়া ছিল এবং টাকার মধ্যে কত ছিল রোক নগদ আর কত ছিল কোম্পানির নোট!

ঐ তমসুক সর্ব্বৈব জাল বলিয়া বিধবা ও নাবালকের পক্ষে একমাত্র যিনি সাক্ষ্য দিতে পারিতেন তিনি বীরেনের বাবা—তিনি এখন পরলোকে।

বীরেন লেখাপড়া বন্ধ করিয়া ভিটা রক্ষার জন্য জেলা আর ঘর ছুটাছুটি করিতেছে; কিন্তু সে উকিল মোক্তার কাহাকেও পাইল না, সবাইকে আটক-দক্ষিণা দিয়া জমিদারের তরফ হইতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে একজন উকিল আনা হইয়াছে, সে উকিল কাজে দক্ষ না হইলেও তাঁহাকে মফঃস্বলে আনার জন্য দক্ষিণা প্রচুর দিতে হইতেছে। বীরেনের মা ছেলেকে জেলায় পাঠাইয়া ঠাকুর-দেবতার কাছে মাথা খুঁড়িতে থাকেন, অশ্রুর ঝারায় তাঁহাদের স্নান করান, তাঁহার প্রাণ তুকতুক করিতে থাকে পাষণ্ড জমিদার গরিবের বাছাকে একলা কারে পাইয়া প্রাণে বা বধ করে।

ঠাকুরের দরজায় বীরেনের মাতার মাথা খোঁড়া আর দয়াদেবীর মানতের চেয়ে দেখা গেল পঞ্চাননের তদ্বির ঢের জোরালো। তমসুকের টাকার ডিক্রি হইয়া গেল।

দয়াদেবী স্বামীর পায়ে ধরিয়া বলিলেন—আমার একটি কথা রাখবে?

গুণময় গম্ভীর হইয়া বলিলেন—কি?

—বিধবা আর নাবালককে ভিটে-ছাড়া করো না; ধর্ম্মে সইবে না।

—কী! যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা! আমাকে ধর্ম্ম দেখানো! আমি ওদের উচ্ছেদ করে দেখাবো যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছু নেই।

গুণময় পা ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন।

কাল বীরেনদের বাড়ী ক্রোক হইবে।

বীরেনের মা সন্ধ্যাবেলা দয়াদেবীর কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন—দিদি, তুমি করতে কসুর করলে না, আমাদের ভাগ্যের দোষ! কাল বীরু আমার পথে দাঁড়াবে। পারো ত তাকে তুমি দেখো।

স্বামীর কঠিন জেদের কাছে নিতান্ত অক্ষম দয়াদেবী আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন—দেখ বৌ, গহনা-পত্তর যা আছে এনে আমার কাছে রেখে যাও; জিনিস-পত্তর যা পার বাড়ী-বাড়ী সরিয়ে রাখ, সব কেন ক্রোক করতে দেবে?

বীরেনের মা জিভ কাটিয়া বলিলেন—না দিদি, তা কি হয়! এঁরা জোচ্চুরি করছেন বলে আমি কি তা পারি! বীরুর তাতে অকল্যাণ হবে যে। বীরুকে তুমি দেখো।

দয়াদেবী আর কোনো কথা বলিতে পারিলেন না,

চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বীরেনের মা আবার তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া বিদায় হইলেন।

রাত্রে মায়ের কোলের কাছে শুইয়া বীরেন কাতরস্বরে বলিল—মা, আমাদের বাড়ীতে শোওয়া আজ এই শেষ! কাল কোথায় শোব মা?

"ভয় কি বাবা, তুই বেটাছেলে……" বলিয়া তাহার মা আর কোনো কথা বলিতে পারিলেন না; ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ছেলেও কাঁদিতে লাগিল।

কাঁদিতে-কাঁদিতে বীরেন ঘুমাইয়া পড়িলে তাহার মা উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার একবার মনে হইল সমস্ত বাড়ীতে কেরোসিন ছড়াইয়া আগুন লাগাইয়া দিয়া বীরেনের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেলে কেমন হয়। তখনই মনে হইল আশেপাশের বাড়ীতে আগুন লাগিয়া অপরের সর্ব্বনাশ হইতে পারে। অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিয়া-ভাবিয়া সন্তর্পণে পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া তিনি আস্তে-আস্তে কপাট খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সকাল বেলা পঞ্চাননের ডাকাডাকিতে বীরেনের ঘুম ভাঙিল। বীরেন ঘরে মাকে দেখিতে পাইল না। সে পেঁচোর ডাকে সাড়া দিয়া সদর দরজা খুলিয়া পঞ্চাননের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

পঞ্চানন বলিল—তোমার মাকে বল, আস্তে আস্তে মানে মানে বেরিয়ে যান, আদালতের পেয়াদা এসে বার করে দেবে সেটা কি ভালো হবে?

বীরেন্দ্র মাকে বলিতে বাড়ীর মধ্যে আসিয়া ডাকিল—মা!

কোনো সাড়া পাইল না।

এঘর সে-ঘর খুঁজিল, কোথাও তাহার মা নাই। খিড়কির পুকুরে হাতমুখ ধুইতে গিয়াছেন মনে করিয়া খিড়কির দিকে যাইতেই ভয় পাইয়া বীরেন চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শুনিয়া পঞ্চানন ছুটিয়া আসিয়া দেখিল খিড়কির পথের ধারে শিউলি-গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়া বীরেনের মা ঝুলিতেছেন; মরণযন্ত্রণায় সর্ব্বাঙ্গের আক্ষেপে নাড়া পাইয়া শিউলি গাছ হইতে হাসির মতন শুভ্র ফুলগুলি ঝরিয়া ঝরিয়া গাছের তলা একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে, মরণ যেন পঞ্চাননের স্পর্দ্ধাকে হাসিয়া বিদ্রূপ করিতেছে!

পঞ্চানন বীরেনকে টানিতে-টানিতে বাহিরে লইয়া আসিল। বীরেন্দ্র মা-মা করিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া মাটি ভিজাইতে লাগিল।

তাহার কান্নার শব্দে পাড়াপ্রতিবাসী ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া পঞ্চাননকে জিজ্ঞাসা করিল—ভটচায্যি-মশায়, কি হয়েছে?

পঞ্চানন মুচকি হাসিয়া বলিল—মাগী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

পঞ্চানন একজন পাইককে বলিল—ওরে যতু, যা ত হংসেশ্বর-দারোগাকে খবর দিয়ে আয়।

প্রভাতে উঠিয়াই দয়াদেবী ম্লান চিন্তাকুল মুখে যে জানলা হইতে বীরেনদের বাড়ী দেখা যায় সেই জানলাটিতে আসিয়া দাড়াইয়া বীরেনদের বাড়ীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিলেন। তিনি দেখিতে লাগিলেন পঞ্চানন আসিল, বীরেন বাহিরে আসিয়া আবার বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল, একটু পরেই পঞ্চাননও ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া আকুল-কান্নায়-কাতর বীরেন্দ্রকে টানিতে-টানিতে বাহিরে লইয়া আসিল, বীরেন মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে, পাড়ার লোকেরা আসিয়া জমিতেছে। দয়াদেবী ক্রোধে জ্বলিতে-ছিলেন, এই মনে করিয়া, যে, পাষণ্ড পেঁচোটা ঐ দুধের ছেলেটার গায়ে হাত তুলিতে পারিয়াছে! আর পাড়ার লোক সব দাড়াইয়া দেখিতেছে! নিষ্ফল বেদনায় তিনি ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিলেন। তারপর দেখিলেন হংসেশ্বর দারোগা চৌকীদার সঙ্গে করিয়া আসিল। দয়া-দেবীর বুক কাঁপিয়া উঠিল, এত করিয়াও ইহাদের মনের সাধ পূর্ণ হইল না—শেষে দুধের ছেলেটাকে পুলিশে দিবে নাকি! রাগে দুঃখে তাঁহার চিররুগ্ন দুর্ব্বল শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এমন সময় মোহিনী ঝি ছুটিয়া আসিয়া বলিল—মাগো মা শুনেছ?—বীরেন-দাদার মা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে!

দয়াদেবী শাকমূর্ত্তি হইয়া কপালে চোখ তুলিয়া ভয়ার্ত্ত ব্যথিত কণ্ঠে বিস্ময়প্রকাশ করিয়া শুধু বলিতে পারিলেন—অ্যাঁ!

তারপর উন্মাদিনীর ন্যায় বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া স্রোতের ন্যায় নামিয়া খিড়কি দরজা পার হইয়া বীরেনদের বাড়ীর দিকে নক্ষত্র-গতিতে ছুটিলেন। তাঁহার মাথা হইতে ঘোমটা খসিয়া পড়িয়াছে, রাত্রিবাসে কবরী শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, উত্তেজনায় তাঁহার মুখখানি রক্তপদ্মের মতন হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সমাগত জনতার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বীরেনের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই হাতের সমস্ত বলে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন—বাবা বীরেন!

সমস্ত লোক তটস্থ হইয়া সরিয়া গিয়া সসম্ভ্রম বিস্ময়ে চাপা গলায় বলিয়া উঠিল—রাণীমা!

বীরেন দ্বিগুণ ব্যথায় উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—জেঠিমা গো, মা যে মরে গেল, আমার কি হবে?

—ভয় কি বাবা, আমি তোর মা। আয় তুই আমার সঙ্গে বাড়ীতে।—বলিয়া দয়াদেবী বীরেনের হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠিক সেই সময় দু'জন লোকে ধরাধরি করিয়া বীরেনের মায়ের শবদেহ বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া আসিল, গলার দড়িটা মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে আসিতেছে। ইহা দেখিয়াই দয়াদেবী জোরে বলিয়া উঠিলেন—উঃ!—তারপর থরথর করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে বীরেনের পায়ের কাছে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

চারিদিকে মহা কলরব পড়িয়া গেল—জল আনো, পাখা আনো, লাস সরাও, শিগগির একখানা পাল্কী আনাও, বাবুকে খবর দাও।......

জল আসিল, পাখা আসিল, কিন্তু জমিদারের গৃহিণীর গায়ে হাত দিবে কে? সকলেই বলিতে লাগিল—বীরেন, বীরেন, তুই মুখে জল দে, আমরা বাতাস করছি।

দেখিতে দেখিতে পাড়াপড়শী স্ত্রীলোকেরা লজ্জা অতিক্রম করিয়া সেখানে আসিয়া দয়াদেবীর সেবায় নিযুক্ত হইল।

দয়াদেবী চোখ মেলিয়াই চারিদিকে চাহিয়া মাথার ঘোমটা টানিতে চেষ্টা করিলেন। একজন স্ত্রীলোক মাথায় কাপড়টা তুলিয়া দিল। দয়াদেবী ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—বাবা বীরেন, আমাকে তুই ধরে বাড়ী নিয়ে চ।

পঞ্চানন আগাইয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে পাল্কী আনতে লোক গেছে।

দয়াদেবী জোর করিয়া টলিতে-টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বীরেনকে বলিলেন—বাবা, তুই আয়।

পঞ্চানন অমনি বলিয়া উঠিল—বীরে, বীরে, ধর, ধর, রাণীবৌ টলছেন, এখনি পড়ে যাবেন!

বীরেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে ধরিল; দুএকজন স্ত্রীলোকও ধরিল; অনেক লোকে ধরিল দেখিয়া বীরেন দয়াদেবীকে ছাড়িয়া দিয়া মায়ের পায়ের কাছে আবার বসিয়া পড়িল।

দয়াদেবী বীরেনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—বাবা বীরেন, আমাকে বাড়ীতে তুই নিয়ে চ, ছোট-বৌএর সৎকারের ব্যবস্থা করে দিইগে।

বীরেন কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমি তোমাদের বাড়ীতে যেতে পারব না জেঠিমা—আমায় ওখানে যেতে বোলো না।

দয়াদেবী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—ও-বাড়ীতে তোকে যেতে বলব কেন? এই বাড়ীই আজ থেকে আমার বাড়ী, আমি যে তোর মা!

বীরেন আর পঞ্চানন অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সমস্ত লোক স্তব্ধ।

দয়াদেবী হংসেশ্বর দারোগার দিকে ফিরিয়া হুকুমের স্বরে বলিলেন—লাস আপনারা নিয়ে যাবেন না।

হংসেশ্বর ব্যস্ত হইয়া বলিল—আজ্ঞে না, আপনারা দাহ করবার ব্যবস্থা করুন।

দয়াদেবী ডাকিলেন—বীরেন, লোক ডাক।

সমবেত জনতার ভিতর হইতে অনেকেই বলিয়া উঠিল—আমরাই নিয়ে যাচ্ছি।

পঞ্চানন আগাইয়া আসিয়া বলিল—আপনি বাড়ীর মধ্যে যান, আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি।......

দয়াদেবী দুর্ব্বল চরণে ধীরে ধীরে বীরেনের বাড়ীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্য্যজাতির মধ্যে জাতের অঙ্কুর

(Emile Senart এর ফরাসী হইতে)

জাতই সমস্ত ব্রাহ্মণ্যিক সমাজ গঠনের কাঠাম। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ভিতর আসিবার জন্যই আদিমনিবাসী লোকেরা কতকগুলি জাতরূপে আপনাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে, জাতের কড়াক্কড় নিয়ম-সকল গ্রহণ করিয়াছে; এবং এই ব্যাপারটা অতীতের উচ্চ শিখর পর্য্যন্ত সমুত্থিত। দেখা যায়, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কতকগুলি ভিন্নজাতীয় উপাদান গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে; ইতিহাসের গতি সহকারে কাল-ক্রমে কতকগুলি বাহ্য প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়াছে; মোটের উপর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আর্য্য ঐতিহ্যের প্রতিনিধিরূপে ভারতে রহিয়া গিয়াছে। যে প্রতিষ্ঠানটি ব্রাহ্মণ্যিক মতবাদের সহিত ও ব্যক্তিগত জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে মিশ্রিত বলিয়া আমাদের মনে হয়,—সাহায্যকারী অন্য ঘটনাসমূহের ক্রিয়াফলকে কোন প্রকারে বর্জন না করিয়া, প্রথমে আর্য্য-উৎসের মধ্যেই সেই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার ন্যায্য অধিকার আমাদের আছে।

প্রাচীন আর্য্য সমাজ-সমূহের ইতিহাস ক্রমবিকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থানভেদে, প্রাচীন গার্হস্থ্য ব্যবস্থাভেদে, এই ক্রমবিকাশ বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। আর্য্যবংশের বিভিন্ন শাখার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবয়ব লক্ষণও তুলনা করিয়া দেখিলে আর্য্য মুখশ্রীর পরিচয় পাওয়া যায়।

যে-আত্মীয়তার ধারণা জাতের ভিতর ওতপ্রোত রহিয়াছে, জাত-সংক্রান্ত যে শাস্ত্রনিয়ম-সমূহ ব্যক্তিগত জীবনকে যথেচ্ছাচারীর ন্যায় শাসন করে;—বিবাহ আহার ক্রিয়া কলাপ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পঞ্চায়তের গঠন ব্যবস্থাদিকে নিয়মিত করে—সেই আত্মীয়তার ধারণা ও শাস্ত্র নিয়ম আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়—বস্তুত সেই পারিবারিক ব্যবস্থাপদ্ধতি যাহা ন্যূনাধিক পরিমাণে "বংশের" (family) মধ্যে, "মূল-জাতির মধ্যে (Gens), "শাখা-জাতির" (tribe) মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। উহার গোড়ার অবয়ব-রেখাগুলিও কম পরিস্ফুট নহে। তবে, আরও নিকট হইতে নিরীক্ষণ করিলে,—জাতি-শাখাজাতি প্রভৃতির অন্তর্ভূত সমসাধারণ উপাদানগুলি একই ধারা-ক্রমে পরিপুষ্ট ও সমানভাবে বিস্তৃত না হইলেও, উহার অঙ্কুরটি বেশ প্রত্যক্ষগোচর হয়। মূলতঃ এই একই ব্যাপারের আরও অনেক দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে আছে। যে-সকল বিষয় আর্য্যজাতির শাখা-উপশাখার মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিবার কৌতূহলকে জাগাইয়া তুলে, প্রায় সেই-সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে গিয়া কোথাও বা আমরা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম একই-রকম ঘটনাসমূহের মধ্যে আসিয়া পড়ি, কোথাও বা একই-রকমের গভীর পার্থক্য আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। আত্মীয়তার সম্বন্ধটা এমন-কি মূল উপাদানে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে; ঐ উপাদানগুলি একটা নূতন ছাঁচের মধ্য দিয়া এখানে প্রবাহিত হইয়াছে, স্পষ্টই উপলব্ধি হয়।

জাতের ভিতর যে-সকল নিয়ম বিবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেই-সব 'বহির্বিবাহিক' নিয়ম যাহা একই উপবিভাগের একই গোত্রের অথবা একই শাখার অন্তর্ভূত লোকের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ বর্জ্জন করে, সেই সকল নিয়ম স্বকীয় কঠোরতার পরিচয় দেয়। ঐ সকল নিয়ম, সমস্ত আদিম সমাজের মধ্যে, প্রভূত আধিপত্য প্রকটিত করিয়াছে। কিন্তু যেখানে ও যখনই অপেক্ষাকৃত জ্ঞানালোকসমন্বিত সমাজ-গঠনের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেইখানে তখনই এই আধিপত্যের হ্রাস হইয়াছে। অন্য জাতির ন্যায় আর্য্যজাতির নিকটেও বিবাহের এই নিয়মটি নিশ্চয়ই সুপরিচিত ছিল। প্লুটার্কের সাক্ষ্যে জানা যায়, প্রাচীন যুগে রোমকেরা শোণিত-সম্পর্কের রমণী-দিগকে বিবাহ করিত না। আমাদের পরিজ্ঞাত পৌরজন্ত্রী-দিগের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহই পতির কৌলিক নাম ধারণ করে না। গোত্র ব্রাহ্মণের নিজস্ব। গোত্রের ব্যবহার প্রাচীনকাল হইতে নিশ্চয়ই চলিয়া আসিতেছে। দূর-অতীতকালের আগন্তু-আর্য্যদের মধ্যেও যে এই "বহির্বিবাহে"র নিয়ম ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। গোত্রের আকারে এই নিয়মটি এতদূর আদিম যে, উহা জাতেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, উহা জাতের কাঠামকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। একই গোত্র বহুবিভিন্ন জাতের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব, বর্ণভেদ-পদ্ধতির মধ্যে উহা অতিরিক্ত-ভাবে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই দুই প্রতি-ষ্ঠান মিশিয়া গিয়াছে বলিয়াই যে উহারা একসূত্রে আবদ্ধ একথা বলা যায় না। এথেন্সেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল যখন (Demes) ডেমেসদিগের স্বশাসিত নগর কোন বিশেষ বংশের

(Gens) লোকদিগের জন্য বিভিন্ন জিলা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল।

অন্তর্বিবাহের নিয়মটা আরো বেশী আমাদের নজরে পড়ে—যে নিয়মানুসারে, ভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। আদিম ধরণের মানবসমাজে "বহির্বিবাহিক" নিয়ম অপেক্ষা "অন্তর্বিবাহে"র নিয়মের বিস্তারটা বড় কম নহে। তবে কি না, আর্য্যজাতিদের মধ্যে এই নিয়মটা তেমন প্রত্যক্ষগোচর কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। অপর এক শ্রেণীর তথ্য ও হৃদয়ের কথার (Sintiment) সহিত ইহা যোগসূত্রে আবদ্ধ; ঐ-সকল তথ্য ও মনোভাব হইতে উহার মূলটি ধরা পড়ে। এথেন্স-নগরে, ডেমস্থিনিসের সময়, "Phratrie"র (ভ্রাতৃমণ্ডলী?) অন্তর্ভুক্ত হইতে হইলে, যে-সকল বংশ লইয়া Phratrie সংগঠিত, তাহারই কোন বংশে বিবাহ করা আবশ্যক হইত। গ্রীসে, রোমে, জর্ম্মানিতে, তত্রস্থ আইন অনুসারে, রীতিনীতি অনুসারে, সমান পদবীর রমণী ভিন্ন, "স্বাধীন নাগরিকা" ভিন্ন, অন্য রমণীর সহিত বিবাহ বৈধ বিবাহ বিবেচিত হইত না। (১)

সবাই জানে, "বিবাহ-আইন" ভাঙ্গিবার জন্য, "পেট্রিসিয়ান"দিগের সহিত বিবাহ করিবার অধিকার পাইবার জন্য, প্লিবিয়ানদের কত বুঝাবুঝি করিতে হইয়াছিল। অনেকে ইহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীসমূহের একটা রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম বলিয়া মনে করে। কিন্তু আসলে ইহা ভিন্ন ব্যাপার। ইহা কেবল আভিজাত্যের অহঙ্কার মাত্র নহে; পেট্রিসিয়ান্ অভিজাতবর্গ মনে করিত, তাহারা বিশুদ্ধ অমিশ্র জাতির লোক, প্রাচীন ধর্ম্মের সমগ্রতা তাহারাই ঠিকমতো রক্ষা করিয়া আসিতেছে; সেই পবিত্র অধিকারের বলেই তাহারা কৌলিক ক্রিয়া-কলাপ-বর্জ্জিত সঙ্করজাতি প্লিবিয়ানদিগের সহিত বিবাহে অমত করিয়াছিল।

পেট্রিসিয়ানরা সেই একই প্রকার সংকোচ অনুভব করিত, যাহা আজিকার দিনে, আর-এক নূতন কাঠামের ভিতর, জাতের অন্তর্বিবাহ-নিয়মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। কিন্তু, জাতের পদ্ধতিতে, ভারতে, এই নিয়মের সংকীর্ণতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। রোমে শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সংগ্রাম চলিয়াছিল, রাষ্ট্রনৈতিক পদ্ধতির অধীনে সেই সংগ্রাম বিশেষ-অধিকারের বেড়া ভাঙ্গিয়া দিল। সেই সংগ্রাম, গণ্ডীর সীমা প্রসারিত করিয়া সমস্তকে "পৌরজনের" একপর্য্যায়ের মধ্যে আনিয়া ফেলিল। এই সম্বন্ধে,—অতীব বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও-সাদৃশ্যটাকে আরও অনেকদূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করা যাইতে পারে। সমস্ত পরিমাণ বজায় রাখিয়া, ইহারই অনুরূপ ব্যাপার কি ভারতেও সংঘটিত হইতেছে না? যখন দেখা যায়, কোন জাত অন্য উপজাতের সহিত বিবাহ করিতে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইতেছে, তখন কি মনে হয় না, সমস্ত পরিমাণ বজায় রাখিয়া উপরি-উক্ত ব্যাপারের অনুরূপ ব্যাপার ভারতেও সংঘটিত হইতেছে?

যখন স্থান ও অবস্থা-অনুসারে, সহজেই এই গণ্ডীর পরিবর্ত্তন হয়, তখন সেইসঙ্গে সাধারণ নিয়মের কঠোরতাও বিনষ্ট হয় বলিয়া মনে হয় না কি? হিন্দুর জাত ও রোমকগণের "সিটি" (নগর) এই দুয়ের প্রবাহগতি অন্য-প্রকারে বিভিন্ন হইলেও এই বিষয়ে একটা সৌসাদৃশ্য আছে; ইহা উভয়কার মূলগত আত্মীয়তার সাক্ষ্য দেয়।

এমন কি শাস্ত্রমতে, উচ্চ জাতের কোন পুরুষ খুব নিম্ন জাতের রমণীকেও বিবাহ করিতে পারে। রোম কিংবা এথেন্সেও এইরূপ হইত। সমপদবীর রমণীকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য হইলেও, বিদেশীয় বা দাসত্বমুক্ত, কোন নিম্ন বংশের রমণীকে বিবাহ করিতে কোন বাধা ছিল না। "হিন্দু-পরিবারের মধ্যে শূদ্রা পত্নীর অবস্থা ঠিক এইরূপ। শাস্ত্রমতে বর্জ্জিতা হইলেও, কার্য্যতঃ শূদ্রা রমণী উচ্চ জাতির পত্নীত্বের অধিকার হইতে বর্জ্জিতা নহে। কিন্তু শূদ্রা-গর্ভস্থ সন্তানেরা উহাদের পিতার সমকক্ষ হইতে পারে না। কেন পারে না, তাহা আমরা জানি। উভয়তঃ দম্পতীর মধ্যে, একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক আছে; সেটা,—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অসমতা।

মনুর বিধান-অনুসারে, শূদ্রার হস্তে প্রস্তুত নৈবেদ্য দেবতারা আহার করেন না। রোমনগরে উচ্চবংশীয় লোকের যজ্ঞস্থলে কোন পরকীয় লোক উপস্থিত থাকিলে দেবতারা রুষ্ট হইতেন। (২)

শূদ্রা ভিন্ন-জাতের লোক; উপবীত দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যে-জাতের লোক ধর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হয়, দ্বি-জন্ম লাভ করে, শূদ্রা সে-জাতের লোক নহে।

(১) Hearne দ্রষ্টব্য, p. 157-7

(২) Tustel do Coulanges, La Citi Antique, p. 117.

ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারিণী ধর্ম্মপত্নীর পাশাপাশি শূদ্রাকে বিবাহ করিলেও, সে-বিবাহের অনুষ্ঠানে দীক্ষার মন্ত্র পঠিত হয় না। বিবাহসম্বন্ধে আর্য্যজাতির যেরূপ ধারণা, সেই ধারণানুসারে দম্পতির উভয়েই গৃহ-বেদীসংশ্লিষ্ট যজ্ঞের যজ্ঞকর্ত্তা। শেষ-বিশ্লেষণে, এই আর্য্যসাধারণ ধারণার উপরেই প্রাচীন রোম ও গ্রীসের বিবাহসংক্রান্ত বিধি-নিষেধের ন্যায়, হিন্দু জাতের অন্তর্বিবাহিক নিয়মটি প্রতিষ্ঠিত।

অন্য জাতের লোকের সহিত আহার করা, নিকৃষ্ট জাতের হস্তে প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। এইরূপ উদ্ভট অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। ইহার গূঢ় মর্ম্ম অনবগাহ্য নহে। সর্ব্বকালের আর্য্যেরা সর্ব্বকালেই আহারকে একটা ধর্ম্মাধর্ম্মের মধ্যে ধরিয়া আসিয়াছে। পবিত্র গৃহজাত দ্রব্য,—বংশের ও বংশগত ধারাবাহিকতার বাহ্য নিদর্শন; উহা হইতেই (libation) দেবতা ও পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে জল বা মদ্য নিবেদন, ভারতে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে দৈনিক তর্পণ। এমন-কি যে স্থলে প্রতিষ্ঠানাদির অনিবার্য্য জীর্ণতাবশত আদিম অর্থের একটু লাঘব হইয়াছে, সে স্থলেও—যেমন মনে কর,—অন্ত্যেষ্টি ভোজের ব্যাপারে, গ্রীকদিগের মধ্যে perideipnon, রোমদিগের মধ্যে sili cernium জীবন্ত আকারে রহিয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানটি আত্মীয়দিগের মৃত্যু উপলক্ষে, বংশের অবিচ্ছিন্ন একতা প্রকটিত করে। (৩)

হিন্দুদের মধ্যেও আহারের যে একটা ধর্ম্মঘটিত তাৎপর্য্য আছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ শুধু যে ভিন্ন-জাতের সহিত বা নিকৃষ্ট জাতের সহিত এক-পাত্রে আহার করে না তাহা নয়, পরন্তু নিজ পত্নীর সহিত, নিজ অদীক্ষিত পুত্রের সহিতও এক-পাত্রে আহার করে না। (৪) এস্থলে ধর্ম্মঘটিত এতটা সঙ্কোচ, যে, স্বেচ্ছানিরপেক্ষ কোন দৈব কারণেও যদি কোন ব্রাহ্মণ অশুচি হইয়া থাকে, তাহার সহিতও আহার করা নিষিদ্ধ। (৫) একজন শূদ্রও যদি কোন অশুচি দ্বিজের অন্ন গ্রহণ করে, সেও কলুষিত হয়। অশুচিতা অন্নে সংক্রামিত হয়; তাই আহারের যে ধর্ম্মঘটিত ক্রিয়া সেই ধর্ম্মক্রিয়া হইতে সংক্রামিত ব্যক্তি বর্জ্জিত হয়। এই কারণেই, যে অপরাধী ব্যক্তি দণ্ডস্বরূপ কিছুকালের জন্য এইরূপ আহারের অধিকার হইতে বর্জ্জিত হয়, সে ব্যক্তি জাত-ভাইদের সহিত একত্র আহার করিয়া আবার জাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই একই মূলসূত্রের বলে, রোমকদিগের গম্ভীর বিবাহ-অনুষ্ঠানে, পুণ্য-অগ্নির সম্মুখে বর-কন্যা একটি পিষ্টক একত্র আহার করে। এই অনুষ্ঠানটি অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য; এই অনুষ্ঠানের দ্বারা পত্নী পতিবংশের কুলধর্ম্মে গৃহীত হয়। ইহাকে যেন একটা বিচ্ছিন্ন উদ্ভট প্রথা বলিয়া কেহ না মনে করে। ইহা বলিতে পারা যায়, যে-পূজা-অনুষ্ঠানে, "curie" (উপশাখা) অথবা "Phratrie"র একতা সম্পাদিত হইত, সেই পূজা-অনুষ্ঠানে একত্র ভোজন করা ধর্ম্মের লক্ষণ-পরিচায়ক ছিল। Caristie দিগের রোমীয় ভোজ যাহা আত্মীয়দিগকে একত্র সমবেত করিত, সেই ভোজ হইতে শুধু যে পরকীয় লোক বর্জ্জিত হইত তাহা নহে, কদাচারী নিন্দিত আত্মীয়জনও বর্জ্জিত হইত। পারসীকেরাও এইরূপ প্রথা রক্ষা করিয়াছিল। Prytanes (সেনেট সভার সভাপতিদিগের) দৈনিক ভোজ, গ্রীকদিগের মধ্যে, City-সংশ্লিষ্ট ধর্ম্মের এক সরকারী অনুষ্ঠান-রূপে রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রস্তুত ব্যঞ্জনের তালিকাটি নির্ব্বিশেষ রকমের নহে। কিরূপ ভোজ্যদ্রব্য ও পানীয় মদ্য পরিবেষণ করিতে হইবে তাহা নিয়মের দ্বারা স্থির নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্থানভেদে নিয়মগুলিও ভিন্ন ছিল। অমুক অমুক খাদ্য বর্জ্জন করিয়া, ভারত উক্ত নিয়মের প্রয়োগকে আরো ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছে। ভারত এই নিয়ম উদ্ভাবন করে নাই। আর্য্যজাতির অতীতের মধ্যে, ইহারও সাদৃশ্য আছে, অঙ্কুর আছে।

একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই—যে-হিন্দুরা, অন্য আকারে সাধারণ ভোজের মর্ম্মার্থটা ঠিকমতো রক্ষা করিয়া আসিয়াছে—মনে হয় যেন প্রসারিতও করিয়াছে—তাহারাই আবার শ্রাদ্ধভোজে, আদিম আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে, শাস্ত্রের কথা-অনুসারে আত্মীয়দিগকে ভোজে একত্র সম্মিলিত না করিয়া, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন করান

(৩) Leist. Altariches Jus Civile, p. 201.

(৪) মানব ধর্ম্মশাস্ত্র।

(৫) বিষ্ণুস্মৃতি।

হয়। কিন্তু পিতৃপুরুষদিগের প্রতিনিধিরূপেই, পিতৃপুরুষদের নামেই তাহাদিগকে ভোজন করান হয়। যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করে সেই ব্রাহ্মণেরা অন্ততঃ রূপকের হিসাবে—পিতৃপুরুষদিগের সহিত যোগসূত্রে আবদ্ধ। ক্রম-বর্দ্ধিত ক্রিয়াকলাপ যতই নূতন নূতন ধারণা প্রবর্ত্তিত করুক না কেন, বংশ-ভোজের যে আদর্শ সেই আদর্শেরই জের এখনো পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ভোজ নিমন্ত্রণে যেরূপ যত্ন সহকারে ব্রাহ্মণদিগকে বাছিয়া লইতে হয়, তাহা আদিম কালের অতিথিসংক্রান্ত শুচিতাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আত্মীয়ের বদলে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার এই যে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার কারণ পৌরোহিতিক ক্ষমতা-বিস্তার বৈ আর কিছুই নয়; ভাষ্যকারেরা বলেন না কি, ব্রাহ্মণকে কিছু অর্থদান করিলেই হত্যার প্রায়শ্চিত্ত হয়? আর যাই হোক, ইহা নিশ্চয়, আর্য্যজাতির অতীতকালে, মৃত জনের বংশকে অর্থদান করা হইত। হিন্দু ব্যবস্থাগ্রন্থাদিতে শ্রাদ্ধকর্ম্ম শুধু ব্রাহ্মণের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করা হইয়াছে; ইহা হইতেই, ব্যবস্থাদির কোন্ দিকে প্রবণতা তাহা বেশ বুঝা যায়। অবশেষে, শুধু একটা জায়গা আত্মীয়দের জন্য রাখা হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যায়, এই-সকল নিয়ম-বাধা সত্ত্বেও, প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে একটা সাধারণ ভোজ হইয়া থাকে। হিন্দুরা এই শ্রাদ্ধের বিভিন্ন প্রকার-ভেদ নির্দ্দেশ করে—অন্ত্যেষ্টির সহিত যাহার কোন সম্পর্ক নাই। যেমন মনে কর "গোষ্ঠী-শ্রাদ্ধ" নামক প্রায়শ্চিত্তের শ্রাদ্ধ; অপরাধী ব্যক্তি জাতে উঠিবার সময় যে ভোজ দেয়, ইহা উক্ত শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানেরই এক-প্রকার প্রতিবিম্ব। উহাকে শ্রাদ্ধ-পর্য্যায়ভুক্ত করায় ইহাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা প্রাচীন বংশ-ভোজের মর্ম্মার্থের সহিত শ্রাদ্ধের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করিত। গৃহ-রক্ষিত অগ্নির পবিত্রতা হইতেই উক্ত শ্রাদ্ধ স্বকীয় সংস্কার-ধর্ম্ম লাভ করে। প্রাচীন রোমে, "অগ্নিনিষেধে"র অর্থ ছিল—ধর্ম্মমণ্ডলী ও রাষ্ট্রমণ্ডলী হইতে বহিষ্করণ। "জল-নিষেধের"ও ঐ একই অর্থ ছিল। ভারতেও ভিন্ন জাতের অগ্নি ও অশুচি জলের সংস্রব-বশতই কোন অনাচারী ব্যক্তির প্রদত্ত বা প্রস্তুত অন্ন বিশেষরূপে কলুষিত হয়। আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, কতকগুলি উৎকৃষ্ট জাত, কতকগুলি নিকৃষ্ট জাতের হাতে ভাজা শস্যদানা গ্রহণ করিতে পারে—যদি জলের সঙ্গে কোনরূপ মিশ্রণ না ঘটে। যে-সকল হিন্দু মুসলমানের নিকট হইতে দুগ্ধ গ্রহণ করে, যদি তাহাদের মনে হয় উহাতে জল মিশ্রিত হইয়াছে, অমনি তাহা ঘৃণার সহিত তাহারা দূরে নিক্ষেপ করে।

জাতের বহিষ্করণ অনুষ্ঠানে, অপরাধীর জলপাত্রটিতে জল ভরিয়া দেওয়া হয় এবং একজন দাস এই মন্ত্রটি পড়িতে-পড়িতে জলপাত্রটি উল্টাইয়া ফেলে:—"আমি অমুককে জল হইতে বঞ্চিত করিলাম"। দেখিতে পাওয়া যায়, আর্য্য-জীবনের এই-সকল ধারণার মধ্যে একটা দূরবর্ত্তী অর্থ ও কতকগুলি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে।

পুরোহিত-সাহিত্যের প্রাচীন যুগে রচিত কতকগুলি বচন কেন জল-আচরণীয় গণ্ডী ও বিবাহের গণ্ডী—এই উভয় গণ্ডীকে একই পদবীতে স্থাপন করিয়াছে তাহাও এইসঙ্গে একেবারেই বুঝা যায়। (৬)

একত্র ভোজনের ভাবটা ও তৎসম্বন্ধীয় নিষেধ-নিয়মগুলি লোকের আচার ব্যবহারের মধ্যে এরূপ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া আছে যে, উহা পুরাতত্ত্বঘটিত অন্ধসংস্কার-বর্জ্জিত একজন সমসাময়িক পর্য্যবেক্ষকের খুব চোখে পড়িয়াছে। ইবেট্‌সন্ সাহেব বলেন: "শোণিত-সাম্যের বাহ্য নিদর্শন-রূপে ও গম্ভীর অভিব্যক্তিরূপে একত্র ভোজনের নিয়মটা প্রচলিত।" একই ভোজনের স্থানে আত্মীয়েরা একত্র সম্মিলিত হয়।

প্রতিলোম-ক্রমে, একই মূলসূত্র অনুসারে, যাহারা একই কৌলিক ক্রিয়াকলাপে যোগ দেয় না, তাহাদের মধ্যে একত্র ভোজন চলে না, কোন প্রকার ছোঁয়াছুঁয়ি চলে না। এই যে চিরাগত প্রথা, ইহার নিদর্শন ভারত ছাড়া অন্যত্রও পাওয়া যায়।

চুম্বনের নিয়ম (Jus osculi) ও আলিঙ্গন-স্পর্শ আত্মীয়-তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। (৭) অতএব অঙ্কুরটা এস্থলেও খুব প্রাচীন। মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ যে বর্জ্জিত হয়, শব-দেহের অশুচিতাই কতকটা যে তাহার কারণ

(৬) Indische Stud—X, p. 77, 78.

(৭) Leist দ্রষ্টব্য, Alter Jus civ, p. 49, 50, 261.

তাহাতে সন্দেহ নাই। মৃত্যু তাহাকে পরিবারের বাহিরে স্থাপন করে; পতিত ব্যক্তির স্পর্শের ন্যায় সেই শবদেহের স্পর্শ ও অধিষ্ঠান নিকট-আত্মীয়দিগকে অশুচি করিয়া দেয়। (৮) আমরা যেন মনে রাখি, যে অনুষ্ঠানের দ্বারা কোন ব্যক্তি জাত হইতে বহিষ্কৃত হয় সেই অনুষ্ঠানটি পর্য্যন্ত মৃত্যুর সহিত একাত্মীভূত হইয়াছে; উভয় ক্ষেত্রেই, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়। শোকের সময়ে আত্মীয়জন অশৌচগ্রস্ত হয়—এই যে ধারণা, ইহা সমস্ত প্রাচীন আর্য্য-যুগের ধারণা। অধিষ্ঠানের নৈকট্যে অশৌচ সংক্রামিত হয়। পুরুষ হইতে স্ত্রীতে ও ভৃত্যে সংক্রামিত হয়। অতএব যাহাতে অশৌচগ্রস্ত হইতে হয় এরূপ জিনিষ বা লোকের সংস্পর্শ যত্নসহকারে পরিহার করিতে হইবে; সেই-সকল লোকের সংস্রব বর্জ্জন করিতে হইবে, যাহারা দৈব কারণে অশৌচগ্রস্ত না হইলেও এক-জল ও এক-অগ্নি আচরণীয় মণ্ডলীভুক্ত নহে বলিয়াই অশুচি বলিয়া পরিগণিত। জাতের ভিতর এই নিয়মের পরিপুষ্টি সম্পূর্ণরূপেই যুক্তি-সঙ্গত।

জাতের পঞ্চায়ৎ-সভা ও সেই সভার একটা সীমাবদ্ধ বিচার-এলাকা—এসম্বন্ধেও পূর্ব্ববর্ত্তী দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রাচীন গ্রীসে, রোমে, ও জর্ম্মানীতে একটা পারিবারিক সভা ছিল,—যে-সভা পরিবারের পিতাকে কোন গুরুতর ব্যাপার-উপলক্ষে বিশেষত অপরাধী পুত্রের বিচার-উপলক্ষে সাহায্য করিত। জাতের বহিষ্করণের স্থলে পরিবারের বহিষ্করণ হইত। উভয় ক্ষেত্রেই এই বহিষ্করণের পদ্ধতি সমান ভীতিজনক। ল্যাটিন ভাষায় ইহা "Sacer" (অর্থাৎ বলি) শব্দের দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়াছে। রোমক-দিগের মধ্যে এই বহিষ্করণ-পদ্ধতি এমন একটা ধর্ম্মসংক্রান্ত ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহা "পতিত" হিন্দুর অবস্থারই অনুরূপ। ল্যাটিন্ Gens নামক জনমণ্ডলীর একজন মোড়ল ছিল যে-ব্যক্তি তদন্তর্ভুক্ত লোকদিগের মোকদ্দমার বিচার করিত। Gentesদিগের বিচার-নিষ্পত্তি City কর্ত্তৃক সম্মানিত হইত। জাতের মতো Gensএর অন্তর্ভুক্ত লোকেরাও কতকগুলি বিশেষ প্রথা মানিয়া চলিত।

পক্ষান্তরে, কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ, কতকগুলি বিশেষ দেবতার প্রতি ভক্তি কোন কোন বৈদিক পরিবারের বিশেষত্ব ছিল। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের পরিবার-মণ্ডলীতেও এইরূপ ধর্ম্মবিশ্বাসের বিশেষত্ব ছিল। Gensদিগের ভিতর, কতকগুলি বিশেষ পূজাপদ্ধতি ছিল; কতকগুলি অনন্য-সাধারণ ক্রিয়াকলাপ ছিল।

ভারতের অনেক স্থলেই, সম-সাধারণ পূর্ব্বপুরুষের বা কোন সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষের পূজাপদ্ধতি, গ্রীস-রোমীয় মহাপুরুষদিগের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও এ-কথা বলা যায় না যে, ইহা জাতের একটা বিশেষ লক্ষণ। স্বাধীন দার্শনিক চিন্তার প্রভাবে, ভারতবর্ষে ধর্ম্মসংক্রান্ত স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি বেশ একটু অগ্রসর হইয়াছে; অন্যত্র, রাষ্ট্র-নৈতিক ব্যবস্থাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, এই স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থাপদ্ধতি ধর্ম্মবিশ্বাস-সংক্রান্ত কোন নূতনত্ব প্রবর্ত্তনের একান্তই বিরোধী। ভারতে ধর্ম্ম, স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ হইতে পারিয়াছে, অসংখ্য খণ্ডাংশে বিভক্ত হইতে পারিয়াছে, এবং সময়-বিশেষে এরূপ স্বাধীনতার সহিত আপনাকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারিয়াছে যে, সেরূপ স্বাধীনতা প্রাচীন রোম ও গ্রীসদেশে অপরিজ্ঞাত ছিল। শুধু আচারব্যবহারের মধ্যেই জাতের ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতা প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শুক্তি

গরবে সারা-হিয়া চরণে বিদলিয়া
গিয়াছ কবে নাহি স্মরণে,
আজিও দুটি পায় আল্‌তা হয়ে ভায়
শোণিত-লেখা তব চরণে;
দলিত হৃদি মম শুক্তি-হিয়া সম
পাটল্ শোণিমায় রাঙিয়া,
দু'ফোঁটা আঁখিজল মুকুতা-ঝলমল
মরম-পুটে রহে জাগিয়া।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

(৮) Leist, Gracco ital Becbtsgesch.

সাংখ্যের মোট সিদ্ধান্ত

সাংখ্যের প্রকল্পিত কার্য্যকারণ সোপানের সবে-মাত্র পাঁচটি পৈঁটা :—

(১) সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা **প্রকৃতি**।

(২) প্রকৃতি হইতে আসিল **বুদ্ধি**।

(৩) বুদ্ধি হইতে আসিল **অহঙ্কার**।

(৪) অহঙ্কার হইতে আসিল **পঞ্চতন্মাত্র** ;
তথৈব মনঃপ্রধান একাদশ ইন্দ্রিয়।

(৫) পঞ্চতন্মাত্র হইতে আসিল **পঞ্চ স্থূল ভূত**।

এই পাঁচটি পৈঁটা একে একে যথাক্রমে পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।*

* কালিদাসের মেঘদূতের ৫২ শ্লোকের প্রথম দুইটি চরণ এই :—
"তস্মাদ্ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়-স্বর্গ-সোপান-পংক্তিং।"

তবেই হইতেছে যে, সোপানপংক্তি = সিঁড়ির ধাপ! আমার একজন সম্মানাস্পদ বন্ধু আমাকে বলিলেন যে, প্রাচীন হিন্দীভাষায় প্রবেশ-স্থান অর্থে, অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে stepping stone, সেই অর্থে, পঁইট শব্দ ভূরি ভূরি ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু, from the *stepping stone* to the *step of a ladder* there *is but a step* ; অতএব এটা স্থির যে, ধাপ = পংক্তি = পঁইট = পঁইটা। এই সোজা কথাটার কেহ যদি মশা-মারিতে-কামান-পাতা-গোচের গাণিত প্রমাণ (mathematical demonstration) চা'ন, তবে তিনি নিম্নে প্রণিধান করুন্ :—

জানা কথা।

গ্রন্থি = গাঁইট ·····ক

উপবীত = পইত = পইতা ····খ

প্রশ্ন ॥ গ্রন্থি : গাঁইট = পংক্তি : কী ?

উঃ ॥ গ্রন্থি : গাঁইট = পংক্তি = পঁইট।

এটা যখন স্থির যে, গ্রন্থি : গাঁইট = পংক্তি : পঁইট,

আর এটাও যখন স্থির যে, গ্রন্থি = গাঁইট [ক দেখ]

তখন, কাজেই, পংক্তি = পঁইট।... ... ... গ

পুনশ্চ

প্রশ্ন ॥ পইত : পইতা = পঁইট : কী ?

উঃ ॥ পইত : পইতা = পঁইট : পঁইটা

এটা যখন স্থির যে, পইত : পইতা = পঁইট : পঁইটা।

আর এটাও যখন স্থির যে, পইত = পইতা [খ দেখ]

তখন, কাজেই পঁইট = পঁইটা।

অতএব প্রমাণ হইল যে, পংক্তি = পঁইট = পঁইটা [গ দেখ]

কিন্তু every rule has its exception, আর, সেইজন্য, এটাও দেখা চাই যে,

যেমন { (১) পদ-গ্রন্থি = পায়ের গাঁইট ;
(২) মাল্য-গ্রন্থন = মালা-গাঁথন।

তেমনি { (১) সোপান-পংক্তি = সিঁড়ির পৈঁটা ;
(২) খদ্যোত-পংক্তি = জোনাক-পাঁতি।

প্রথম পৈঁটা

ত্রিগুণ প্রকৃতি।

জিজ্ঞাসু ॥ সত্ত্বরজস্তমোগুণ কোন্‌জাতীয় পদার্থ?— দ্রব্য-পদার্থ না গুণ-পদার্থ ?

প্রবোধয়িতা ॥ গুণই বা তুমি বলিতেছ কাহাকে? বস্তুই বা তুমি বলিতেছ কাহাকে ?

জিজ্ঞাসু ॥ ঐ সরস্বতীর প্রতিমা-খানির সাদা রঙ যাহা আমি চক্ষে দেখিতেছি তাহাকে বলিতেছি **গুণ**, আর ঐ সাদা রঙের আবরণের মধ্যে যে-একটি মাটির মূর্ত্তি ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে তাহাকে আমি বলিতেছি **বস্তু**।

প্রবোধয়িতা ॥ তুমি যাহাকে বলিতেছ **গুণ**, তাহাই কেবল আমি দেখিতে পাইতেছি ; যাহাকে বলিতেছ **বস্তু**, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না, বস্তুটা আমাকে দেখাইতে পার কি ?

জিজ্ঞাসু ॥ অতি সহজে দেখাইতে পারি—বিশেষতঃ সাদা রঙ্ যখন এখনো পর্য্যন্ত কাঁচা রহিয়াছে। এই দেখুন্ সাদা রঙ মুছিয়া ফেলিলাম। সেই-যে সাদা রঙ যাহা আপনি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন তাহা **গুণ**, আর, এই-যে মাটির মূর্ত্তি যাহা এখন দেখিতেছেন ইহা গুণ নহে ; ইহা **বস্তু**।

প্রবোধয়িতা ॥ পূর্ব্বে আমি দেখিয়াছিলাম **সাদা রঙ** ; এখন আমি দেখিতেছি **মেটে রঙ**। তুমি কি বলিতে চাও "সাদা রঙ **গুণ**, আর, মেটে রঙ **বস্তু** ?"

জিজ্ঞাসু ॥ তা যদি বলেন—তবে একখানি লম্বা চওড়া গোচের ছুরি যদি আপনার এখানে থাকে—আমাকে একবার তাহা দি'ন।

প্রবোধয়িতা ॥ এই লও ;—এতে হবে তো ?

জিজ্ঞাসু ॥ যথেষ্ট হবে ;—এ তো ছুরি নয়—এ-যে ছোরা! এই দেখুন্—প্রতিমা-খানির গা থেকে সমস্ত মাটির আবরণ চাঁচিয়া চুঁচিয়া নিঃশেষিত করিলাম। **এখন** এই যে দেখিতেছেন খড়-জড়ানো কাঠ—ইহা নিছক **বস্তু**।

প্রবোধয়িতা॥ দেখিবার মধ্যে আমি মেটে রঙের পরিবর্ত্তে মলিন জর্‌দা রঙ দেখিতেছি—বস্তুর নামগন্ধও দেখিতেছি না।

জিজ্ঞাসু॥ তবে আমি হা'র মানিলাম! **বস্তু** বলিতে **আপনি** কী বোঝেন তাহাই আমাকে বলুন্।

প্রবোধয়িতা॥ যেখানে বাঘের ভয়—সেইখানেই সন্ধ্যা হয়! আমি মনে করিয়াছিলাম—বস্তু-গুণের প্রশ্নটাকে বেশী না-ঘাঁটাইয়া উহার মীমাংসা-কার্য্য তোমাকে দিয়া যৎকথঞ্চিৎ-প্রকারে করাইয়া লইয়া—উত্থাপিত তর্কজালের আশপাশের ফাঁক-ফোঁকের মধ্য দিয়া পলাইয়া বাঁচিব; ইতিমধ্যে তুমি ঐ বিভ্রাট্‌জনক প্রশ্নটির মীমাংসার ভার আমারই স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া আমার মনোরথ-সিদ্ধির পথ রাখিলে না **মোটে**। পলাইবার কোনো রাস্তা না দেখিয়া—পঞ্চাশ ষাট্‌ মোন ওজনের দার্শনিক লৌহ মুদ্‌গর ভাঁজিয়া যাঁহাদের হস্তে এবং গ্রীবায় কড়া পড়িয়া গিয়াছে—উপস্থিত প্রশ্নটির মীমাংসার ভার তাঁহাদের দুই এক জনের স্কন্ধে পাকে-প্রকারে গছাইয়া দিয়া উহার আক্রমণ হইতে আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা এক্ষণে তাই আমার মনে বলবতী হইয়াছে। অতএব, তোমার ঐ প্রশ্নটির উত্তর হার্বার্ট্‌ স্পেন্‌সারই বা কিরূপ দা'ন, আর, কান্ট্‌ই বা কিরূপ দ্যা'ন—দ্যাখা যা'ক্।

হার্বার্ট্‌ স্পেন্‌সার্ বলেন "the real, as we conceive it, is distinguished solely by the test of persistence." ইহার টীকা:—Latin ভাষায় res-শব্দে বুঝায় **বস্তু**;—"real" কিনা বস্তু-সম্বন্ধীয়, এক কথায় **—বাস্তবিক**। তবেই হইতেছে যে, reality = **বাস্তবিকতা**। ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে, স্পেন্‌সরের মতে স্থায়িত্বই বাস্তবিকতার একমাত্র পরিচয়-লক্ষণ। কান্ট্‌ বলেন "in all phenomena the permanent is the substance"। স্পেন্‌সরের ঐ কথাটা Kant-এর এই কথাটিরই প্রতিধ্বনি তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। তোমার ঐ সরস্বতীর প্রতিমাখানির উপরের সাদা রঙ্‌, ভিতরের মেটে রঙ্‌ এবং তাহার আরো ভিতরের মলিন জর্দা রঙ্‌—সবই অস্থায়ী। তাহা আ'জ না হো'ক্ কা'ল—কা'ল না হো'ক্ পরশু—একদিন না একদিন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে নিশ্চয়ই; পরন্তু প্রতিমা-খানির মূল উপাদান কোনো অবস্থাতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। প্রতিমাখানির সেই যে চিরস্থায়ী মূল উপাদান, তাহাকেই বলা যায় **বস্তু**।

জিজ্ঞাসু॥ তাহা যেন বুঝিলাম—কিন্তু তাহা কোথায় পাওয়া যায়? তাহা পদার্থটা কি?

প্রবোধয়িতা॥ সেইটিই হ'চ্চে শক্ত সমস্যা! বৈশেষিক পণ্ডিতদিগের মতে তাহা **পরমাণু-বৃন্দ**। পাশ্চাত্য রাসায়নিক পণ্ডিতদিগের মতেও তাই। বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার Hector Macpherson, কিন্তু, শেষোক্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্রীয় কথাটির সঙ্গে বেদান্ত-শাস্ত্রের একটি কথা জুড়িয়া দিতেছেন; তিনি বলিতেছেন

"Science brings us down to atoms. Philosophy cannot rest in the atomic conception of the Cosmos. It reduces the atoms to centres of force and energy. Thus we come to the view that matter is but the phenomenal appearance of an Infinite Energy which, though unseen, is the real basis of matter, the source of life, the inspirer of law and order."

বেদান্তেও বলে তা'ই;—বেদান্তে বলে "অনির্ব্বচনীয়া সংসার-প্রবর্ত্তনী শক্তি (Infinite Energy) সমস্ত জগতের মূল উপাদান।" বর্ত্তমান শতাব্দীর Scienceএর গতি-চক্র ঘুরিয়া, এই তো দেখিতেছি, বেদান্তের Philosophyতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। অতএব, এখন আর তুমি এ কথা বলিতে পারো না যে, জগতের গোড়া'র একত্ব Philosophy'রই ধ্যানের কথা, তা বই তাহা বিজ্ঞানের পরীক্ষার কথা নহে। তবে এ কথা তুমি বলিতে পার যে, উপরের উদ্ধৃত ইংরাজী বচনগুলির কোনো স্থানেই তাহাদের গোড়ায় বল-সঞ্চার করিতে পারিবার মতো কোনো মাতব্বর শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের নামোল্লেখ না দেখিয়া তাহার প্রতি তোমার সমুচিত শ্রদ্ধা বর্ত্তিতেছে না; তাহা যদি বলো, তবে পণ্ডিতবর Macpherson স্থানান্তরে কী বলিতেছেন শ্রবণ কর। তিনি বলিতেছেন

"The investigations of the scientists like Clerk, Maxwell, Helmholtz, and Hertz, into the electro-magnetic theory of light go to prove that we are dealing not with properties of matter, but with undulations and vibrations of energy. It is now an

established fact that all forms of radiant energy consist essentially of undulating motions of one uniform medium."

ইহার আর-একটু পরে বলিতেছেন

"The dynamical view of nature entirely changes our conception of matter, which is no longer primary but derivative : it is built up out of our conception of force. Forces, standing in correlation, as Spencer remarks, form the whole content of our idea of matter. Thus we come to the conclusion that the multiform energies of Nature are reducible to one form of energy, protean in its manifestation, and to whose conservation and transformation all phenomena are due."

এইসকল কথার মধ্য হইতে আমরা দুইটি মোট বৃত্তান্তের সন্ধান পাইতেছি এই যে, প্রাকৃত জগতের মূল উপাদান—বৈশেষিকদিগের এবং বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ-কালের বৈজ্ঞানিকদিগের মতে—**পরমাণু-বৃন্দ**, আর, বৈদান্তিকদিগের এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদিগের মতে—**সংসার-প্রবর্ত্তনী মহতী শক্তি**—Infinite Energy। সাংখ্যের মত স্বতন্ত্র। সাংখ্যের মতে প্রাকৃত জগতের মূল উপাদান "সত্ব, রজ, তম," এই তিন রকমের তিনটা গুণ-সংজ্ঞক বস্তু; তাহার মধ্যে সত্বগুণ প্রকাশক, রজোগুণ প্রবর্ত্তক, এবং তমোগুণ আবরক।

জিজ্ঞাসু॥ যদি বলা যায় যে, জগতের মূল উপাদান এক বই দুই নহে, তবে তাহাতে আমাদের মনও সহজেই সায় দ্যায়, আর তা ছাড়া—আপনি যেমন দেখাইলেন—বর্ত্তমান শতাব্দীর নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞানের নেতাদিগের সুমার্জ্জিত অন্তঃকরণের মধ্য হইতেও সায় পাওয়া যায়; পক্ষান্তরে, "সত্ব রজ এবং তম এই তিন রকমের তিনটা বস্তু সমস্ত জগতের মূল উপাদান" এ কথায় আমাদের মনও সহজে সায় দিতে চাহে না, আর, ওরূপ-একটা আজগুবি-ধরণের কথার সঙ্গে এ-কালের মার্জ্জিত বিজ্ঞানের বড়-একটা যে সম্পর্ক আছে, তাহাও বোধ হয় না। আমার তাই মনের মধ্যে রহিয়া রহিয়া এইরূপ একটা জিজ্ঞাসা চাগাড় দিয়া উঠিতেছে যে, তবে কি সাংখ্য-দর্শনের ঐ গোড়া'র কথাটা একটা পৌরাণিক উপন্যাস-মাত্র?

প্রবোধয়িতা॥ ভগবদ্গীতায় লেখে যে, প্রকৃতি দ্বিবিধা—(১) পরা এবং (২) অপরা। তাহার মধ্যে পরা প্রকৃতি = জীব-জগৎ; অপরা প্রকৃতি = জড়-জগৎ। গীতার এই দ্বিবিধা প্রকৃতির মধ্যে—সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি এবং প্রকৃতির ডালপালা যত কিছু—সমস্তই অন্তর্ভূত রহিয়াছে। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, সাংখ্যের **প্রকৃতি**=গীতার **অপরা প্রকৃতি**; সাংখ্যের **পুরুষ**=গীতার **পরা প্রকৃতি**। গীতার **পুরুষ** তবে কে? সাংখ্যের পুরুষ অসংখ্য জগতের অসংখ্য পুরুষ; গীতার পুরুষ—নিখিল প্রকৃতির অধীশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় পরম পুরুষ। গীতার এই যে, একমাত্র অদ্বিতীয় পরম পুরুষ, কে ইনি? প্রাণের ভাষায়—ইনি **ভগবান্**; জ্ঞানের ভাষায়—ইনি **পরমাত্মা**। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেরই গোটা দুই তিন অধ্যায়ে ইঙ্গিতও করা হইয়াছে এইরূপ যে, এ তত্ত্ব (অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব) পঞ্চবিংশ তত্ত্বেরও উপরের তত্ত্ব—ইহা **ষড়্বিংশতত্ত্ব**। সাংখ্য-দর্শনের কোথাও কিন্তু ষড়্বিংশ তত্ত্বের ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সাংখ্যের এই গোড়ার শূন্য স্থানটি বেদান্তে কিরূপে পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই কথাটা তবে তোমাকে বলি। নাঃ—সে কথা পরে হইবে;—এ জায়গায় তাহাকে ঘাঁটাইয়া ঝোলে অম্বলে মিশানো শ্রেয় বোধ করি না। তোমার প্রশ্নের উত্তরে একটি বিষয়ে কিন্তু তোমার ভুল ভাঙিয়া দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন বোধ করিতেছি। তুমি যে বলিলে " 'তিন রকমের তিন বস্তু সমস্ত জগতের মূল উপাদান'—এ কথার সহিত অধুনাতন-কালের মার্জ্জিত বিজ্ঞানের বড়-একটা সম্পর্ক নাই" এটা তোমার বড়ই ভুল। সত্বরজস্তমোগুণের মূর্ত্তি তিন-প্রকার—(১) লৌকিক মূর্ত্তি, (২) দার্শনিক মূর্ত্তি, (৩) বৈজ্ঞানিক মূর্ত্তি। লৌকিক মূর্ত্তি—সুখদুঃখমোহ। দার্শনিক মূর্ত্তিটি জর্ম্মান দেশীয় মহাদার্শনিক হেগেল দেখিতে পাইয়াছিলেন * এইরূপ—

Quality
[ত্রিগুণ]

A—Being, Naught, Becoming.

Being [সত্ব] is the simple empty [অমিশ্র অবস্থায় emptyই বটে] immediateness [চিদাত্মার

* Colebrooke-এর কৃত সাংখ্যকারিকার ইংরাজী অনুবাদ হেগেলের চক্ষে পড়িয়াছিল কি না, তাহা বলা সুকঠিন।

অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী সত্তা – চিদাত্মার ক্রোড়-ঘাঁসা সত্তা] which has its opposite [its প্রতিদ্বন্দ্বী] in pure Naught [in অমিশ্র তমঃ], and whose union therewith is Becoming: as transition [সংসৃতি] from Naught to Being [from তমঃ to সত্ত্ব] it is Beginning; the converse is Ceasing [আবির্ভাব এবং তিরোভাব উভয়ে উভয় দ্বারা রঞ্জিত—এই অর্থে রজঃ]; এই গেল অব্যক্ত মূল প্রকৃতির সারভূত অমিশ্র (pure) সত্ত্ব রজ এবং তমঃ। তাহার পরে আসিতেছে - ব্যক্ত প্রকৃতির সারভূত মিশ্র (compound) সত্ত্বরজস্তমঃ।

B.—Determinate Being.

[মিশ্র সত্ত্ব = রজস্তমে জড়ানো সত্ত্ব]

Determinate Being is Become [is সম্ভূত] or determined [সুব্যক্ত] Being [অর্থাৎ অব্যক্ত মূল প্রকৃতির অমিশ্র (pure) ত্রিগুণ-সত্তা হইতে সম্ভূত মিশ্র (compound) ত্রিগুণ-সত্তা], a Being [সত্ত্ব] which has a relation to its non-being [to তমঃ].

এই গেল সত্ত্বরজস্তমোগুণের দার্শনিক মূর্ত্তি। এখন, উহার বৈজ্ঞানিক মূর্ত্তি কিরূপ—দেখা যা'ক্।

সত্ত্বগুণের বৈজ্ঞানিক মূর্ত্তি- আলোক - প্রকাশ-ভৃৎ আকাশ অর্থাৎ Luminiferous Ether। রজোগুণের বৈজ্ঞানিক মূর্ত্তি = ওজঃ = Energy। তমোগুণের বৈজ্ঞানিক মূর্ত্তি—নিবিড়ত্ব বা স্থূলত্ব = impenetrability (আর, সাংখ্যমতে যেহেতু ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মীর মধ্যে প্রভেদ গ্রাহ্যযোগ্য নহে) = স্থূল ভূত Matter।

বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন উচ্চশ্রেণীর মার্কিনদেশীয় বৈজ্ঞানিক R. K. Duncan তাঁহার প্রণীত New Knowledge নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের মোহাড়াতেই কী বলিতেছেন শুনিবে? বলিতেছেন তিনি—

When a man begins to think seriously, of the worlds, or world, around about him, he is at first dazed by the seeming complexity of it all. Thousands of phenomena confront him, inextricably tangled, and there seems to be no single way of co-ordinating them. That the universe must be harmonious, is a fundamental demand of our human nature. Just so soon as we actually begin to sort things out, matters proceed with gratifying smoothness and it soon becomes apparent that one may place all he knows of the universe of space and time into just exactly three compartments. These compartments we shall label:

1. Matter [তমোগুণ],
2. Ether [সত্ত্বগুণ],
3. Energy [রজোগুণ],

These are three physical entities [প্রাকৃত বস্তু], outside of which, so far as we understand the physical universe [প্রাকৃত জগৎ], there is nothing, and to which the universal content of the mind of man, so far as it concerns things out of itself, may be stowed away.

Matter [তমোগুণ].

What matter is, in itself and by itself, is quite hopeless of answer and concerns only metaphysicians...... Science is naive, she takes things as they come, and rests content with some such practical definition as will serve to differentiate matter from all forms of non-matter. This may be done by defining matter as that which occupies space and possesses weight [সাংখ্যকারিকার ত্রয়োদশ সূত্রে স্পষ্ট লেখে "তমোগুণ is that which possesses weight—'গুরু', and that which covers space—'আবরক';" লেখে 'গুরুবরণকং তমঃ']. Now, governing matter in all its various forms, there is one great fundamental law. This law, known as the law of conservation of the mass, states that no particle of matter may be created or destroyed [সাংখ্যকারিকা'র দশম সূত্রের গৌড়পাদীয় ভাষ্যে লেখে "অব্যক্ত মূল প্রকৃতি উৎপত্তি-বিহীন বলিয়া নিত্য" "নিত্যমব্যক্তং অনুৎপাদ্যত্বাৎ"; আবার-একাদশ সূত্রের গৌড়পাদীয় ভাষ্যে লেখে "অব্যক্ত প্রকৃতিও ত্রিগুণ" "অব্যক্তমপি ত্রিগুণং"; এমতে পাইতেছি যে, মূল প্রকৃতি নিত্য এবং ত্রিগুণ, আর, তাহা হইতেই আসিতেছে যে, মূল প্রকৃতি যেমন নিত্য—ত্রিগুণও তেমি নিত্য। এইরূপ, দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্যমতেও Matter (তমোগুণ) নিত্য, সুতরাং cannot be created or destroyed].

Ether [সত্ত্বগুণ],

The properties of the ether are for the most part negative [ঠিক্ এই কথাটি সাংখ্যকারিকা'র ত্রয়োদশ সূত্রের তত্ত্ব-কৌমুদী-ভাষ্যে ইঙ্গিত ইসারায় জ্ঞাপন করা হইয়াছে এইরূপ :— "সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম দুইটি—লঘুত্ব এবং প্রকাশকত্ব; তাহার মধ্যে কার্য্যাভিব্যক্তি ঘটাইয়া তুলিবার কর্ত্তা লঘুত্ব-ধর্ম্মটি গুরুত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ গুরুত্বের ঠিক্ উল্টা—negation of গুরুত্ব" "সত্ত্বমেব লঘুপ্রকাশকং ......তত্র কার্য্যোদ্গমনে হেতু" "ধর্ম্মো লাঘবং গৌরব-প্রতিদ্বন্দ্বি"। ফল-কথা এই যে, Matter (=তমোগুণ) স্বভাবতই মাধ্যাকর্ষণের বশবর্ত্তী—কাজেই গুরু, এবং স্বভাবতই স্থান আবরণ করে অর্থাৎ জায়গা জোড়ে—কাজেই আবরক—"গুরুবরণকং তমঃ"। সাংখ্য-

কারিকা'র ত্রয়োদশ সূত্র দেখ)। Ether কিন্তু সে-রকম বস্তু নহে; Ether জড়বস্তু অবশ্য, কিন্তু তাহা matter নহে—তমোগুণ নহে; Ether মাধ্যাকর্ষণেও বাঁধা পড়ে না—স্থানও আবরণ করে না; Ether—matterএর ঠিক উণ্টা; matter গুরু এবং আবরক—Ether লঘু এবং অনাবরক। তা' বটে—কিন্তু Ether কি-অর্থে লঘু এবং কি-অর্থেই বা অনাবরক, তাঁহা বুঝিয়া দেখা চাই। বায়ুকে যদি বলা যায় "লঘু" এবং "অনাবরক," তবে তাহাতে বুঝায় শুধু এই যে, জলস্থলাদি'র অপেক্ষা বায়ু কম-গুরু এবং উঁহাদের অপেক্ষা কম-পরিমাণে স্থান আবরণ করে; পক্ষান্তরে, luminiferous ether'কে—আলোকভৃৎ আকাশকে, সংক্ষেপে আলোককে, যদি বলা যায় "লঘু এবং প্রকাশক" (সাংখ্যদর্শনে সত্ত্বগুণ'কে বলা হইয়াছেও তাই)—gh=ঘ সুতরাং সংস্কৃত লঘুতা-শব্দ ইংরাজী light-শব্দের বৃদ্ধপ্রপিতামহ—এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া light'কে যদি বলা যায় "light" কিনা লঘু, এবং প্রকাশক; তবে তাহার অর্থ স্বতন্ত্র; তাহার অর্থ এই যে, ether মূলেই গুরু নহে—ponderable নহে—এই অর্থে লঘু, তা' বই, "তাহা জলস্থলবায়ু অপেক্ষা কম-গুরু" এ অর্থে না। তথৈব, luminiferous ether কিনা আলোক তিমিরাবৃত স্থান দর্শকের চক্ষে অনাবৃত করে—এই অর্থেই প্রকাশক, তা'বই, "তাহা জলস্থলবায়ু অপেক্ষা কম-পরিমাণে স্থান আবরণ করে" এ অর্থে না; তবেই হইতেছে যে, তমোগুণ গুরু এবং আবরক; সত্ত্বগুণ গুরুও নহে—আবরকও নহে। সত্ত্বগুণের এই যে দুটি ধর্ম্ম—অ-গুরুত্ব এবং অনাবরকত্ব—দুইটিই ব্যতিরেকাত্মক অর্থাৎ negative। প্রথমটি মাধ্যাকর্ষণের অভাব-জ্ঞাপক; দ্বিতীয়টি স্থানাবরোধকতার অভাব-জ্ঞাপক]; so negative, indeed are they (কিনা properties of the ether), that when one says boldly that we cannot see ether, hear it, taste it, smell it, exhaust it, weigh it, or measure it, one feels timid that sane-minded people will meet these negative qualities of our ether by a decided negation of belief in its existence. But the fact of the matter is that if this thing "ether" is not visible to the eye of sense it is visible to the eye of the mind, which is much less liable to err. To demonstrate this, place a little instrument known as radiometer up in the sunlight. This instrument consists of a glass bulb containing a partial vacuum in which hangs poised a tiny mill wheel of aluminum. On the impact of the sunlight the wheel at once begins to revolve and soon attains a velocity so great that the eye is unable to distinguish the separate vanes. Something therefore flies 93,000,000 of miles from the sun and causes that wheel to revolve, and that something must be the radiations of light and heat. With regard to the nature of these radiations we are positively shut up to one of two explanations. The light and heat proceeding from the sun consist either of particles or of waves. The first assumption that they consist of particles is known as the "corpuscular theory" and was killed outright and buried years ago after a battle royal. The second assumption, that of waves, known as the "undulatory theory," meets with universal acceptance. It is the only complete explanation of all the known facts. The radiations from the sun, therefore, that moved our mill wheel consist of waves; and now comes the inevitable back-thrust of the mind, waves of what? Once convinced that light consists of waves, the mind insists that these waves shall inhere in something.......This something cannot be air or water or any form of matter as we know it, for throughout that great reach of 93,000,000 of miles between the sun and us there exists but empty space. Filled this empty space is, however, and to the brim. There is no such thing as emptiness. From corner to corner of the universe, wherever a star shines or light darts, there broods this vast circumambient medium—ether. Not only through interstellar spaces, but through the world also, in all its manifold complexity, through our own bodies, all lie not only encompassed by it but soaking in it as a sponge lies soaked in water [গ্রন্থকারের এই কথাগুলির মধ্য হইতে সত্ত্বগুণের দার্শনিক মূর্ত্তির সহিত তাহার বৈজ্ঞানিক মূর্ত্তির সৌসাদৃশ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে খুবই স্পষ্ট। সত্ত্বগুণের দার্শনিক মূর্ত্তি—বুদ্ধি-সত্ত্ব কিনা বাস্তবিক সত্তা; আর, তাহার বৈজ্ঞানিক মূর্ত্তি—আলোক-সত্ত্ব কিনা ether। বাস্তবিক সত্তা যেমন সমস্ত জগতের অন্তরে বাহিরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিব্যাপ্ত—ether তেমি বহির্জগতের অথবা, যাহা একই কথা, আকাশ-ক্ষেত্রের আদি অন্ত-মধ্যে—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিব্যাপ্ত। সাঁটে-সোঁটে, তাই, বলা যাইতে পারে যে, Ether =সত্ত্বগুণের দার্শনিক নিজ মূর্ত্তির বৈজ্ঞানিক প্রতিমূর্ত্তি; ইংরাজী ভাষায়—Ether is the physical counterpart of metaphysical Being, i. e. of সত্ত্ব। গ্রন্থকার একটু পূর্ব্বে বলিয়াছেন "if this thing 'ether' is not visible to the eye of sense it is visible to the eye of mind;" আবার, পাতঞ্জলদর্শনের সাধনপাদের সপ্তদশ সূত্রের ভোজরাজকৃত টীকার গোড়াতেই আছে "দ্রষ্টা চিদ্রূপঃ পুরুষঃ দৃশ্যং বুদ্ধিসত্ত্বং" "চিদাত্মা দ্রষ্টা—বুদ্ধিসত্ত্ব দৃশ্য।" এমতে দাঁড়াইতেছে যে, আলোক-সত্ত্বও যেমন—বুদ্ধি-সত্ত্বও তেমি, ঈথরও যেমন—বাস্তবিক সত্তাও তেমি, দুইই দৃশ্য বস্তু; প্রভেদ কেবল এই যে, আলোক-সত্ত্ব is visible to the "mind's eye" কিনা মনো-নেত্রে; বুদ্ধিসত্ত্ব is visible to the eye of চিৎ, কিনা সাক্ষাৎ জ্ঞান-নেত্রে—"চিদ্রূপঃ পুরুষঃ, দৃশ্যং বুদ্ধিসত্ত্বং"]।

Energy [রজোগুণ].

Just as there is no such thing as emptiness, so there is no such thing as rest even in a relative sense. The very particles that constitute the materials of our so-solid-seeming earth, are in a state of perpetual unremitting quiver—what we call temperature—and that quivering, had we eyes but big enough to see it, is very far indeed removed from rest. Now, this motion is constantly changing, from one velocity to another, and the same kind of reasoning that led us to believe in the ether leads us to believe that a body

can go faster or slower only because of some cause. This cause, or this power to change the state of motion of a body, is energy কিনা রজোগুণ [সাংখ্যকারিকা'র ত্রয়োদশ সূত্রে লেখে "রজোগুণ উপষ্টম্ভক এবং চলস্বভাব" "উপষ্টম্ভকং চলং চ রজঃ"। উপষ্টম্ভন শব্দের অর্থ জড়তা'র (inertia'র) বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ। ঐ সূত্রের তত্ত্বকৌমুদী ভাষ্যে লেখে "সত্ত্বও যেমন—তমও তেমি—উভয়েই নিষ্ক্রিয়স্বভাব, আর সেইজন্য স্বকার্য্যসাধনে উভয়েই অপটু; উভয়কেই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার কর্ত্তা আর কেবল রজোগুণ" "সত্ত্বতমসী স্বয়ং অক্রিয়তয়া স্ব স্ব কার্য্যপ্রবৃত্তিং প্রতি অবসীদন্তী রজসা উপষ্টভ্যেতে; অবসাদাৎ প্রচাব্য স্বকার্য্যে তে উৎসাহং প্রযত্নং কার্য্যেতে"]. Matter is but a stepping stone to energy, here and away, through one form to another, and from one body to another, infinitely restless, constant only to one thing,—its total quantity. However much energy may be transformed or transferred, when any quantity of one form disappears, a precisely equal quantity simultaneously appears in some other form or forms. Just as with matter, you cannot create or destroy any quantity of energy however small, and since energy is the great worker of the universe you cannot get something for nothing……It will readily be seen then, that since energy may be transformed from one form into another, since it may equally well be transferred from one body to another, and since, moreover, it cannot be created or destroyed [একটু পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সাংখ্যমতে তিন গুণই নিত্য, সুতরাং তিন গুণের কোনোটিই cannot be created or destroyed], we have precisely the same grounds for believing in its existence as an actual entity as we had for believing in the existence of matter. It is proper for us to hold as reasonable the view that energy is an existing "thing". [সাংখ্য দর্শনের ৬১ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্যে স্পষ্ট লেখা আছে "সত্ত্বাদীনি দ্রব্যানি" "সত্ত্বাদি দ্রব্য" "ন বৈশেষিকা গুণাঃ" "বৈশেষিক গুণ নহে"।]

জিজ্ঞাসু ॥ তাহাই যদি হয়—এরূপ যদি হয় যে, তিন রকমের তিনটি-বস্তু-এইযে—সত্ত্ব রজ এবং তম, ইহাই প্রকৃতির সার-সর্ব্বস্ব, তবে, জিজ্ঞাসা করি, দর্শনাদি শাস্ত্রে প্রকৃতিকে **তিন** না বলিয়া **এক** বলা হয় কোন্ যুক্তিতে ?

প্রবোধয়িতা ॥ ধরিয়াছ তুমি মন্দ না ! তোমার এই প্রশ্নটির উত্তরে বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি R. K. Duncan কি বলিতেছেন তাহা শ্রবণ কর :—

We have thus reduced the universe to three terms : matter [তমোগুণ]—ether [সত্ত্বগুণ]—energy [রজোগুণ], and we ought now to consider whether this triune conception may not be capable of a deeper synthesis. We have all, I imagine, a deep-seated conviction of the essential "oneness" of the universe, and to justify it, we must assume, either that these three things are after all but "forms" or phases of an underlying and unknowable (অব্যক্ত) reality, or that, separate and distinct as they appear, they are themselves One, in some mysterious way altogether beyond the power of human reason to grasp.

এই সঙ্গে, সাংখ্যদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের উনচল্লিশ সূত্রে এবং তাহার প্রবচন-ভাষ্যে কি লেখে, সে কথাটাও বলি—শ্রবণ কর :—

সাংখ্য-দর্শন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

৩৯শ সূত্র।

সত্ত্বাদীনাং অতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ।

ইহার অর্থ এই যে, সত্ত্বাদিগুণকে প্রকৃতির **ধর্ম্ম** বলা সাজে না এইজন্য—যেহেতু সত্ত্বাদিগুণ প্রকৃতির **স্বরূপ**।

সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য।

সত্ত্বাদিগুণানাং প্রকৃতিধর্ম্মত্বং নাস্তি প্রকৃতিস্বরূপত্বাদ্ ইত্যর্থঃ। যদ্যপি শ্রুতিস্মৃতিষু উভয়মেব শ্রূয়তে, তথাপি তত্ত্বতঃ স্বরূপত্বমেবাবধার্য্যতে, ন তু ধর্ম্মত্বং। সত্ত্বাদিত্রয়ং কিং প্রকৃতেঃ কার্য্যরূপো ধর্ম্মো, অথবা আকাশস্য বায়ুবৎ সংযোগমাত্রেণ নিত্য এব ধর্ম্মঃ স্যাৎ। আদ্যে-একস্মাদেব প্রকৃতে দ্রব্যান্তর-সঙ্গং বিনা বিচিত্রগুণত্রয়োৎপত্তিরসম্ভবঃ। অন্ত্যে, নিত্যেভ্য এব সত্ত্বাদিভ্যো অন্য-সঙ্গেন বিচিত্র-সকল-কার্য্য উৎপত্তৌ তদতিরিক্ত-প্রকৃতি কল্পনা-বৈয়র্থ্যমিতি সত্ত্বাদীনাং প্রকৃতিকার্য্যত্বাদি বচনানি চ অংশতঃ প্রকাশাদি-কার্য্যোপহিততয়া অভিব্যক্তি-আদিকমেব বোধয়ন্তি—যথা পৃথিবীতো দীপোৎপত্তিরিতি।

ইহার বাংলা অনুবাদ।

সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রকৃতির **ধর্ম্ম** নহে—তাহা প্রকৃতির **স্বরূপ**। এটা সত্য যে, শ্রুতি ও স্মৃতি-সমূহে দুই রূপই লেখে; কোনো বা স্থলে লেখে "গুণত্রয় প্রকৃতির **ধর্ম্ম**", কোনো স্থলে বা লেখে "গুণত্রয় প্রকৃতির **স্বরূপ**"; কিন্তু তথাপি যুক্তিতে এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গুণত্রয় প্রকৃতির স্বরূপই, তা বই, তাহা প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে।* জিজ্ঞাসা করি—কিরূপ অর্থে সত্ত্বাদিগুণ প্রকৃতির ধর্ম্ম ?

---

* এই স্থানটিতে, এবং প্রাচীন ভারতের দর্শনাদি শাস্ত্রের আরো অনেকানেক স্থানে, অধুনাতন কালের স্মার্ত্তবাগীশদিগের পুঁথিগত বিদ্যার প্রতিযোগে পূর্ব্বতন কালের আচার্য্যদিগের শাস্ত্রাশাস্ত্র-নিরপেক্ষ নির্ভীক সত্যানুরাগ কেমন স্পষ্টাক্ষরে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা দুইদণ্ডকাল চক্ষু ভরিয়া দেখিবার সামগ্রী।

কারণের ধর্ম্ম যেমন কার্য্য উৎপাদন করা—সেইরূপ অর্থে কি? অথবা আকাশের ধর্ম্ম যেমন নিরন্তর বায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকা—সেইরূপ অর্থে? যদি বলো যে, পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থে গুণত্রয় প্রকৃতির ধর্ম্ম, অর্থাৎ তাহারা প্রকৃতি-সম্ভূত কার্য্য এইরূপ অর্থে; তবে তাহা হইতে পারে-না এইজন্য যেহেতু অপর কোনো বস্তুর বিনা-সাহায্যে আকলা মাত্র প্রকৃতি হইতে তিন-রকমের তিন গুণ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। যদি বলো যে, গুণত্রয় শেষোক্তরূপ অর্থে প্রকৃতির ধর্ম্ম, অর্থাৎ তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর যোগযুক্ত—এইরূপ অর্থে; তবে প্রকৃতির থাকা না-থাকা সমান হয় এইজন্য—যেহেতু তাহা হইলে যাহা কিছু উৎপন্ন হইবার তাহা গুণত্রয়ের পরস্পরের যোগাযোগ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তা বই, তাহার উৎপত্তি ঘটাইবার জন্য গুণত্রয়ের অতিরিক্ত দোসরা কোনো জগৎকারণের অপেক্ষা থাকে না। অতএব "সত্ত্বাদিগুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে," "সত্ত্বাদিগুণ প্রকৃতির সঙ্গের সঙ্গী" এ সব রকমের শাস্ত্রবচনের তাৎপর্য্যার্থ শুধু কেবল এই যে, ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ যেমন একই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন আংশিক অভিব্যক্তি—তিন গুণের প্রকাশাদি তিন প্রকার কার্য্য তেমি একই প্রকৃতির তিন প্রকার আংশিক অভিব্যক্তি। ইতি অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বীপের উপমার উজ্জ্বল দীপালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, নানা দ্বীপে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী যেমন এক বই দুই নহে, সাংখ্যমতে তেমি ত্রিগুণের ত্রিধারায় বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি এক বই দুই নহে। এ মতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, অভিব্যক্ত হইবার সময় যেমন—তরঙ্গ ফেন এবং বাষ্প - এই তিন পদার্থ একই সমুদ্র হইতে একসঙ্গে অভিব্যক্ত হয়, এবং নিলীন হইবার সময় একই সমুদ্রে খণ্ড খণ্ড হইয়া নিলীন হইয়া যায়, তেমি, জগৎকার্য্যে অভিব্যক্ত হইবার সময় সত্ত্ব রজ এবং তম—এই তিন গুণ একই প্রকৃতি হইতে একসঙ্গে অভিব্যক্ত হয়; এবং জগৎকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সময় পরস্পরের সঙ্গ-নিরপেক্ষ আপনাকে আপনাকে লইয়া একই প্রকৃতিতে নিলীন হইয়া যায়।

জিজ্ঞাসু॥ আপনার মোট কথাটার ভাব বেস্ আমি বুঝিতে পারিয়াছি; কেবল, "পরস্পরের সঙ্গ-নিরপেক্ষ" এ কথাটা বলিলেন কেন, সেইটি আমি বুঝিতে পারিলাম না। অতএব, শেষের এই কথাটি আর একটু যদি খোলাসা করিয়া ভাঙিয়া বলেন তবে ভাল হয়।

প্রবোধয়িতা॥ সাংখ্য মতে গুণ-ত্রয়ের পরিণাম দুই প্রকার (১) বিসদৃশ পরিণাম এবং (২) সদৃশ পরিণাম। মেঘচ্যুত বিশুদ্ধ জল সমুদ্রে নিপতিত হইয়া লবণাক্ত হইয়া গেলে, বিশুদ্ধ জলের সেইরূপ লোনতা জলে পরিণত হওয়াকে সাংখ্যের ভাষায় বলে "বিসদৃশ পরিণাম"; আর, সূর্য্যের উত্তাপে সমুদ্রের লবণাক্ত জল বাষ্পীভূত হইয়া বিশুদ্ধ মেঘ বারিতে পরিণত হইলে, লোনতা জলের সেইরূপ বিশুদ্ধ জলে পরিণত হওয়াকে সাংখ্যের ভাষায় বলে "সদৃশ পরিণাম"। সৃষ্টিকাল অবধি করিয়া প্রলয়কাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত সত্ত্বগুণ—রজস্তমের সহিত, রজোগুণ—তমঃসত্ত্বের সহিত, তমোগুণ—রজঃসত্ত্বের সহিত ন্যূনাধিক পরিমাণে যোগযুক্ত হওয়া কারণ হইতে কার্য্যে এবং কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে যখন ছুটাইয়া চালাইতে থাকে—তাহাদের তখনকার সেইরূপ নিয়মপরতা অথবা যাহা একই কথা কার্য্য-প্রবণ পরিণামের নামই বিসদৃশ পরিণাম; পক্ষান্তরে প্রলয়-কালে যখন সত্ত্বরজস্তমের পরস্পরাক্রান্ত বিমিশ্র মূর্ত্তি তাহাদের বিশুদ্ধ নিজ নিজ মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, তখনকার সেইরূপ স্বরূপাশ্রিত পরিণামের নামই সদৃশ পরিণাম। সাংখ্য কারিকার ১৬শ শ্লোকের তত্ত্বকৌমদী-ভাষ্যে স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে এইরূপ :—

> "প্রতিসর্গাবস্থায়াং (বিনা প্রলয়াবস্থায়াং) সত্ত্বং রজশ্চ তমশ্চ সদৃশপরিণামানি ভবন্তি। পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যব-তিষ্ঠন্তে। তস্মাৎ সত্ত্বং সত্ত্বরূপতয়া, রজো রজোরূপতয়া, তমস্তমোরূপ-তয়া প্রতিসর্গাবস্থায়ামপি প্রবর্ত্ততে।"
>
> ইহার বাংলা অনুবাদ।
>
> 'প্রলয়াবস্থায়, সত্ত্ব রজ এবং তম- তিন গুণেরই সদৃশ পরিণাম হয়। গুণত্রয় স্বভাবতই যেহেতু পরিণাম প্রবণ, এই হেতু উহারা কোনো না-কোনোরূপে পরিণত না হইয়া এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে না। প্রলয় কালে গুণত্রয় অপর কোনো রূপে পরিণত না হইলেও স্ব-স্ব রূপে পরিণত হয় সত্ত্ব সত্ত্বরূপে পরিণত হয়, রজঃ রজোরূপে পরিণত হয়, তমঃ তমোরূপে পরিণত হয়॥ অনুবাদ সমাপ্ত॥

স্পেন্সারের ভাষায়, মূল শক্তির এইরূপ সদৃশ পরিণাম persistence শব্দের বাচ্য। স্পেন্সারের মতের গোড়ায় কিন্তু মস্ত একটা গলদ রহিয়াছে;—স্পেন্সারের ভক্ত

শিষ্যদিগের কোনোজনের তাহা চক্ষে পড়িয়াছে কিনা জানি না। স্পেন্সারের এই যে একটি কথা—যে, একমাত্র অদ্বিতীয় persistent force সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গোড়ার তত্ত্ব—এ কথাটা কাণে শুনিতে শুনায় যদিচ দিব্য মনোহর, কিন্তু উহা হইতে পারে-না এইজন্য যেহেতু persistence শব্দের অর্থই হ'চ্চে বাধার প্রতিস্রোতে স্বরূপে অবিচলিত থাকা। Persistent force বলে কাহাকে? না যে-শক্তি আপনার এক বা একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে আপন স্বরূপে ভর করিয়া অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকে। তবেই হইতেছে যে, Persistent force আপনার প্রতিপক্ষস্থানীয় এক বা একাধিক শক্তিকে অপেক্ষা করে, তা বই, তাহা অনন্য-সাপেক্ষ একমাত্র মূল-শক্তি হইতে পারে না। সাংখ্যের মত এরূপ দোষাক্রান্ত নহে;—সাংখ্যের মতে মূলশক্তি এক নহে পরন্তু তিন; (১) সত্ত্বগুণের প্রকাশ-শক্তি, (২) রজোগুণের চালন-শক্তি, (৩) তমোগুণের বাধা-শক্তি এবং আবরণ-শক্তি। প্রলয়কালে তিনগুণের তিন শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে persist করে, কিনা অন্যেতর-শক্তির বিরুদ্ধে আত্ম-শক্তিতে বা স্বরূপে ভর দিয়া দণ্ডায়মান থাকে; আর এইরূপ persistentএর নামই সদৃশ পরিণাম। স্পেন্সার যদি বলিতেন যে, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চক্রবৎ নিয়ত ঘূর্ণায়মান হইতেছে এই-যে তিন রকমের তিন শক্তি—(১) আলোকের দ্যোতন-শক্তি, (২) উত্তাপের প্রবর্ত্তন শক্তি, (৩) তড়িতের (electricityর) নিয়ামিকা শক্তি, এই তিন শক্তি একত্রে মিলিয়া সমস্ত জগতের মূল কারণ; তাহা হইলে এইরূপ বুঝাইত যে, প্রলয় কালে প্রত্যেক শক্তি স্বরূপে ভর দিয়া অব্যক্তভাবে persist করে এবং সৃষ্টিকালে পরস্পরের সহযোগে ব্যক্ত জগতে পরিণত হয়। কিন্তু স্পেন্সার তাহা বলেন না—এ কথা তিনি বলেন না যে, তিন শাখা-force = এক মূল forceএর সহিত অভেদ-ভাবে চিরবর্ত্তমান; বলিবার মধ্যে কেবল বলেন যে, তিন শাখা-force এক-মূল forceএর রূপান্তরিত পরিণাম ছাড়া—transformation ছাড়া—আর কিছুই নহে। স্পেন্সারের এ কথা সত্য হইতে পারে না এইজন্য—যেহেতু অপরাপর শক্তির বিনা সাহায্যে অ্যাকলা-মাত্র একটি স্বরূপ-নিষ্ঠ persistent শক্তির পক্ষে ত্রিধা-ভিন্ন তিন-শক্তিতে পরিণত হওয়া transformed হওয়া একান্ত পক্ষেই অসম্ভব। কেন না, ক্ষেত্র এবং জলবায়ুর বিনা সহযোগে অ্যাকলা-মাত্র বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি যেমন একান্ত পক্ষেই অসম্ভব; তেমি অপরাপর forceএর বিনা সহযোগে অ্যাকলা-মাত্র একটি-কোনো force এর বিসদৃশ বিচিত্র পরিণাম (transformation) একান্ত পক্ষেই অসম্ভব। অতঃপর, একটি সহজবোধ্য উপমা দিয়া এই দুরূহ বিষয়টির উপসংহার করি। সূর্য্যের সমগ্র রশ্মিমণ্ডল যেমন এক-মাত্র—প্রকৃতি তেমি একমাত্র। আবার, নীল পীত এবং লোহিত এই তিন বর্ণের তিন বিভিন্ন ছটা যেমন একই রশ্মিমণ্ডলের সার-সর্ব্বস্ব, তেমি তমঃ সত্ত্ব এবং রজ এই বিভিন্ন গুণত্রয় একই অভিন্ন প্রকৃতির সারসর্ব্বস্ব। ঐ ত্রিধা ভিন্ন তিন প্রকার রশ্মিছটা যেমন সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে নিজ নিজ বিশুদ্ধ (pure) স্বরূপে ভর করিয়া বর্ত্তমান থাকে এবং বহির্জগতে নানাবিধ মিশ্র (compound) বর্ণে পরিণত হয়; গুণত্রয় তেমি অব্যক্ত মূল-প্রকৃতির অভ্যন্তরে নিজ নিজ বিশুদ্ধ স্বরূপে ভর করিয়া বর্ত্তমান থাকে এবং ব্যক্ত জগতে পরস্পরের সহিত ন্যূনাধিক পরিমাণে যোগযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নানাপ্রকার ব্যবহার্য্য বস্তুতে পরিণত হয়। সাঁটে-সোঁটে এই যাহা ইঙ্গিত করিলাম—সাংখ্যের তত্ত্ব-সোপানের প্রথম পৈঁটার স্থূল মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে আপাতত-কার মতো ইহাই যথেষ্ট। আর একটি উপমা যাহা আমার মনে হইতেছে, সেটিও মন্দ না; তাহা এই: হাঁসের ডিমের অন্তঃসারের ভিতরে প্রথমে যেমন জনিষ্যমান শাবকের চক্ষু চঞ্চু এবং চরণ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের পরমাণু-সমূহ পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকিয়া আপন আপন সাম্যরক্ষা করে, সৃষ্টির পূর্ব্বে তেমি সত্ত্বরজস্তমোগুণ অব্যক্ত মূল-প্রকৃতির অভ্যন্তরে পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকিয়া আপন আপন সাম্য রক্ষা করে; আর, সেইজন্য, সাংখ্যদর্শনে মূল প্রকৃতির নাম দেওয়া হইয়াছে "সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা"। সাংখ্যের এই গোড়ার কথাটির শুধু কেবল শব্দার্থ বুঝিলে চলিবে না—তাহার ভাবার্থ বোঝা চাই। "His Majesty" এই ইংরাজি শব্দটির ভাবার্থ যেমন 'Majesty-সমন্বিত রাজা অর্থাৎ মহামহিমান্বিত রাজা;

"অব্যক্ত মূল প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা" এই শাস্ত্রবচনটির ভাবার্থ, তেম্নি, "অব্যক্ত মূল প্রকৃতি = সাম্যাবস্থাপন্ন সত্ত্বরজস্তমোগুণ"। তাহার পরে যথাকালে হাঁসের ডিমের অন্তঃসারের পরমাণুসমূহের সাম্য ভঙ্গ হইলে যেমন জনিষ্যমাণ শাবকের অঙ্গপরিস্ফুটনের গোড়া'র কার্য্যের প্রতিষ্ঠা পত্তন আরম্ভ হয়—সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্য ভঙ্গ হইলে তেম্নি বিশ্বভুবনের বৈচিত্র্য বিকাশনের গোড়ার কার্য্যের প্রতিষ্ঠা পত্তন আরম্ভ হয়, আর সেই শুভ যোগে জগতের অভিব্যক্তি অনুলোম সোপানের প্রথম পৈঁটা হইতে দ্বিতীয় পৈঁটায় পদনিক্ষেপ করে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা হইতে সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধিতে অবতরণ করে।

দ্বিতীয় পৈঁটার বিবরণ বারান্তরে আগামী বারে পর্য্যালোচনা করা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোচনা

বাঙ্‌লার বানান-সমস্যা।

চৈত্রের (১৩২৩) প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যের (ফাল্গুন, ১৩২৩) আলোচনা করিয়াছেন। আমি এবার তাঁহার উক্তির সংক্ষেপে একটু পুনরালোচনা করিতে ইচ্ছা করি—তত্ত্বনির্ণয়ের আশায়, নিবন্ধ রক্ষার জন্য নহে।

১। আমি বলিয়াছিলাম সংস্কৃত করণ হইতে করা, চলন হইতে চলা, ইত্যাদি। যুক্তিও দিয়াছিলাম। সেই যুক্তিটাই আজ আর একটু বিশেষ করিয়া বলিব। বৈদিক ভাষা হইতেই দেখা যায় নকারের পূর্ব্ববর্ত্তী অকার প্রায় আকার হইয়া যায়, আর ঐ নকারের লোপও প্রায় হয়। আত্মন আত্মা, রাজন রাজা, ইত্যাদি উদাহরণ পূর্ব্বে দিয়াছি। আরো দেখুন, √জন + ত = জাত, √জন + য + তে = জায়তে, √খন + ত = খাত, √খন + য + তে = খায়তে, √সন + ত = সাত, √সন + য + তে = সায়তে, √তন + য + তে = তায়তে। ব্যভিচারও আছে √হন + ত = হত, √তন + ত = তত, কর্ম্মন—কর্ম্ম। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, নকার লুপ্ত হইয়া পূর্ব্বের অকারকে আকার করে, অপর কথায় আকার শুধু আকার নহে, ইহা পরবর্ত্তী লুপ্ত নকারের সূচনা করিয়া নিজে যে পূর্ব্বে অকার রূপে ছিল তাহাও সূচনা করে।

যোগেশ বাবু ইহা স্বীকার করেন। কিন্তু রাজন হইতে রাজা হওয়ার সাদৃশ্যে করণ অথবা করন হইতে করা হওয়া স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—"বাং ভাষা, রাজন্—রাজা, বিচার কিংবা স্মরণ করিয়া রাজা শব্দ গ্রহণ করিয়াছে কি? বোধ হয়, এত বিচার করে নাই। কারণ ইহাতে সেকালের লোকের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান সমধিক ছিল স্বীকার করিতে হয়, সংস্কৃত ও বাঙ্গালার পরিমাণের প্রয়াসও স্বীকার করিতে হয়। তা ছাড়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ব্যতীত ভাষায় রাজন শব্দ ছিল কি? সুতরাং সাদৃশ্যে 'করণ' হইতে 'করা' করিবার যুক্তি ছিল না।' এ সম্বন্ধে আমার এইরূপ মনে হয়—কথ্যভাষার শব্দসমূহকে যে সকলত্রই কেহ বসিয়া বসিয়া বিচার করিয়া নির্ম্মাণ করে এবং তাহার পর সেই ভাষাভাষী লোকদিগকে তাহা প্রয়োগ করিবার জন্য অর্পণ করে, তাহা নহে। ও সব শব্দ নিজের বিচিত্র স্বভাবে (The Genius of the Language) নিজে-নিজেই উৎপন্ন হয়† প্রাকৃতিক অন্যান্য পদার্থের ন্যায় কথ্যভাষায় শব্দসমূহও নিজে নিজেই হইয়া পড়ে। এবং তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে একটা বিচিত্র সঙ্গতি অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায় যাহা দেখিয়া মনে হইতে পারে যে যেন কোনো বিচক্ষণ শব্দশিল্পী একই ছাঁচে ইহাদিগকে ঢালাই করিয়া দিয়াছে। একটা উদাহরণ দিব। বাঙ্‌লায় যে সকল শব্দের আদিতে অথবা আদ্য বর্ণে অকার ও শেষে অকার আকার ছাড়া অপর স্বরবর্ণ থাকে সেই সকল শব্দের আদিতে বা আদ্যবর্ণে স্থিত অকার হ্রস্ব ওকারবৎ* উচ্চারিত হয়। যেমন অহি—ওহি (অ—হি বা ahi নহে), মণি—মোণি (ম—ণি বা mani নহে), রবি—রোবি (র—বি বা rabi নহে)। এই যে, অকারকে ওকারবৎ উচ্চারণ ইহাকে কি কেহ নিয়ম করিয়া উদ্ভাবন করিয়া বাঙালীদিগকে দিয়াছে? (চলন—চলা, চালক—, বলন—বলা—) এই কথ্যভাষায় এই শব্দ কেহ কি বসিয়া বসিয়া গড়িয়াছেন? আপামর শিশুদের নিকট যে ভাষা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কি কেহ ব্যাকরণ বিচার করিয়া উদ্ভাবন করিয়া তাহাদিগকে শিখাইয়া দিয়াছেন? অথচ এই সমস্তের মধ্যে একটি বিচিত্র সাদৃশ্য বিচিত্র নিয়ম আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। লেখ্য বা সাহিত্যের ভাষায় বিচার বিতর্ক ও ব্যাকরণের আইন কানুন খাটে, তাহা ভাষাকে বন্ধন করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে চালাইতে পারে কিন্তু কথ্যভাষার উপর রাজচক্রবর্ত্তীরও আদেশ চালাইবার শক্তি নাই,। যদিও তিনি সাম্রাজ্যের সমস্ত আইন কানুন বদলাইতে পারেন। বৈদিক কথ্য ভাষায় অন্ যেরূপে আ হইয়া গিয়াছে, সেইরূপেই বাঙ্‌লাতেও তাহা আ হইয়াছে।

২। আমি স্বীকার করি বাঙ্‌লা বিচার করিয়া রাজন হইতে রাজা পায় নাই সেকালেরই রাজা পাইয়াছে এবং ইহাও স্বীকার করি যে, রাজন যেমন রাজা হয়, করণ ও সেইরূপ করা হইল—

---

* বাঙ্‌লায় হ্রস্ব ওকার সূচন করিবার পৃথক বর্ণ না থাকায় অগত্যা প্রচলিত ওকারই লিখিতে হইল।

† "Though the individual seems to be the prime agent in producing new words and new grammatical forms, he is so only after his individuality has been merged in the common action of the family, tribe or nation to which he belongs. He can do nothing by himself, and this first impulse to a new formation in language, though given by an individual, is mostly, if not always, given without premeditation, nay unconsciously. The individual, as such, is powerless, and the results apparently produced by him depend on laws beyond his control, and on the co-operation of all those who form together with him one class, one body, or one organic whole."—Max Muller's *Science of Language,* Vol I p 43

এই বিচার বা স্মরণ করিয়াও বাঙ্‌লা ভাষা ক রা পদ পায় নাই। আমি বলিতেছি, প্রাচীন অথবা স্বাভাবিক উচ্চারণ প্রভাবেই ক র ণ বাঙ্‌লায় ক র' হইয়াছে।

ইহাই যদি না হয়, তবে যোগেশ বাবুরও মতে দোষ হয়। ধরিয়া লইলাম, ক রি বা হইতেই ক্রমশ ক রা হইয়াছে। এখানে কি কোন ব্যক্তি-বসিয়া-বসিয়া বিচার করিয়া ইং বা লোপ করিয়া তাহার স্থানে আ বসাইয়া দিল? যোগেশ বাবুর উত্তর হইবে—কেহই দেয় নাই, উচ্চারণের বৈচিত্র প্রভাবে আপনা-আপনি, স্বভাবতই এইরূপ হইয়াছে। তবেই শাস্ত্রার্থের বিচারকরার ভাষায় বলিতে হয়—

> "যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারশ্চ তাদৃশঃ।
> নৈকস্তত্রানুযোজ্যঃ স্যাৎ তাদৃশার্থবিচারণে॥"

অ ন্ আ রূপে পরিণত হইতে পারে না, ইহা বলিবার উপায় নাই। তবে যোগেশ বাবু যেরূপ তর্ক তুলিয়াছেন, এরূপ আরো তর্ক উঠাইতে পারা যায়, এবং এগুলি উপেক্ষা না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিয়া দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য।

২। আমার বক্তব্য বলিলাম, আরো কিছু বলিব। আমি এখন দেখিতে পাইয়াছি, আমি ক রা সম্বন্ধে যা বলিয়াছি তাহা নিতান্ত প ণ্ডি তী ধরণের হইয়াছে। যোগেশ বাবুর সহিত সংগ্রামে আমার পরাজয় হইয়াছে, আমি অকপট চিত্তে আনন্দের সহিত তাঁহাকে বিজয়মালা পরাইয়া দিতেছি। আপাতদৃষ্টিতে বীম্‌স সাহেব যেমন প্রসঙ্গত বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত বেষ্টন হইতে হিন্দী বেঢ়া, বাঙ্‌লা বেড়া (A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, Vol I. p. 2/3), আমারও পূর্ব্বে বহুকাল হইতে মনের মধ্যে সেইরূপ একটা ধারণা ছিল, উহাই বারে বারে ফাঁপিয়া উঠিয়া আমাকে এত নাকাল করিয়াছে। দেখিতেছি আমরা যাহা লইয়া আলোচনা করিতেছি, বহু পূর্ব্বে প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বীম্‌স সাহেব (*Ibid.* Vol. III., pp. 234—236) এবং তাহার পরে ইহারই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া হর্ন্‌লে সাহেব প্রাকৃতের সাহায্যে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া ফেলিয়াছেন (A Comparative Grammar of the Gaudian Languages, pp. 145—150)। ইহা পড়িলে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে জানা যাইবে, সংস্কৃত √কৃ+তব্য= ক র্ত্ত ব্য অথবা ক র্ত্ত ব্য ক নানারূপে পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া হিন্দী, মৈথিলী, উড়িয়া প্রভৃতি গৌড়ীয় ভাষাসমূহে ক রি ব, ক র ব, ক রি বা * (অথবা এতৎসদৃশ বকার বা বকার-অন্ত অপর কোন) রূপ প্রাপ্ত হয়। জিপ্‌সী ভাষাতেও এইরূপ পদ পাওয়া যায়। হর্ন্‌লে সাহেব ক্রমপরিবর্ত্তন এইরূপ দেখাইয়াছেন:—সংস্কৃত ক র্ত্ত ব্য ম্ (অথবা * ক রি ত ব্য ম্, প্রাকৃত ক রে অ ব্ব ং অথবা ক রি অ ব্ব ং, অপভ্রংশ * ক রে ব্ব ং অথবা ক রি ব্ব ং অথবা ক রে ব ং, পূর্ব্বী হিন্দী (E. H.) ক রি ব, অথবা ক র ব। আবার সংস্কৃত ক র্ত্ত ব্য ক ং, প্রাকৃত ক রে অ ব্ব অ ং অথবা ক রি অ ব্ব অ ং, অপভ্রংশ (ক) * ক রে ব উ, অথবা (খ) ক রে ব উ, অথবা (গ) ক রে বা; গৌড়ীয় ভাষাসমূহে (ক) মারাঠী ক রা বে, (খ) পশ্চিমা হিন্দী (W. H.) ক রি বো, (গ) উড়িয়া ক রি বা। এতদূর পর্য্যন্ত যুক্তিযুক্তরূপে পাইলে ক রা পাওয়ার আর বিলম্ব হয় না। ক রি বা—ক র বা—(ব লোপে) ক রা। এখানে বলা যাইতে পারে, ক রা র মূল ক রি বা কে ছাড়িয়া বলিবার বিশেষ কারণ নাই, ইহা বাঙ্‌লা উড়িয়ার সাধারণ। এই পদটি মূলত ক র্ত্ত ব্য ক হইতে (ক র্ত্ত ব্য হইতে নহে) হইয়াছে বলিলে ভাল হয়। পাঠকগণ শেষোক্ত বইখানি পড়িলে এ বিষয়ে অতি সন্তুষ্ট হইবেন।

৩। যোগেশ বাবু প্রশ্ন করিয়াছেন, এখানে কোন্ ব, বর্গীয় না অন্তস্থ? যখন ত ব্য প্রত্যয় হইতে ব পাইতেছি, তখন নিশ্চয়ই অন্তস্থ। কিন্তু কেবল বাংলায় নহে, হিন্দী, মৈথিলী ও উড়িয়াতেও অন্তস্থ বকারও বর্গীয় বকার রূপে উচ্চারিত হয়। এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ বক্তব্য সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা আছে। প্রকৃত স্থলে যখন স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে ব (অন্তস্থ), তখন তাহার লোপের ত কোনো বাধাই নাই।

৪। অন্তস্থ ও বর্গীয় উভয় বকারেরই পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর থাকা দরকার। আমার এমন আগ্রহ নাই যে, ব অন্তস্থ, আর ব বর্গীয় হইবে। সংস্কৃত দেবনাগরে এইরূপ প্রচলন আছে, এবং সম্ভবত ইহারই অনুকরণে বাংলা অক্ষরেও পেটকাটা ব দিয়া বর্গীয় বকার প্রকাশ হইয়াছে। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত অনেক সংস্কৃত পুস্তক এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই আমি গতানুগতিক হইয়া এখনো চালাইতেছি। যোগেশ বাবু ব দিয়া অন্তস্থ ব বুঝাইতে চাহেন, কিন্তু ইহাতে যে তিনি নিজেই সন্তুষ্ট নহেন, ইহা তিনি বলিয়াছেন। একটা ঠিকঠাক হইয়া গেলে পূর্ব্ব প্রথা ছাড়িতে আমার আপত্তি হইবে না।

৫। যোগেশ বাবু ঠিকই বলিয়াছেন ক রা কাজ, শো না কথা, জা না পথ, ইত্যাদি স্থলের বিশেষণ রূপ ক রা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বিশেষ্য রূপ ক রা প্রভৃতি হইতে ভিন্ন। হর্ন্‌লে সাহেবের আলোচনা পাঠ করিলে (*Ibid*, pp. 137. ff) দেখা যায় এই সব পদ ধাতুর পর ত (সংস্কৃত ক্ত) প্রত্যয় যোগে ক্রমপরিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে উৎপন্ন হইয়াছে। যোগেশ বাবুরও ইহা অনভিমত মনে হয় না।

৬। একটা প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যাউক। যোগেশ বাবু বলেন ঝা ড় ন, কা ম ড়া না, আঁ ক ড়া না, এই সকল শব্দের সংস্কৃত মূল নাই। তৃতীয় শব্দটি যে সংস্কৃতে আ ক র্ষ ণ, এবং ইহার পালি আ ক ড্ ঢ ন (কর্ষণ=প্রা০ ক ড্ ঢ ণ, অথবা ক ট্ ঠ ণ, গউড়বহ, ১০৯)

"The student of language, in the presence of the mysterious power which creates and changes language, has been compelled to adopt this medieval procedure and has vaguely defined, by the name of 'the Genius of the Language,' the power that guides and controls its progress. If we ask ourselves who are the ministers of this power, and whence its decrees derive their binding force, we cannot find any definite answer to our question. It is not the grammarians or philologists who form or carry out its decisions, for the philologists disclaim all responsibility, and the schoolmasters and grammarians generally oppose, and fight bitterly but in vain, against the new development."—L. P. Smith's *The English Language*, p. 27.

* অপর স্থানে (Vol III, p. 237) আবার বাঙ্‌লা ক রা শব্দের মূল খুঁজিতে গিয়া তিনি নিজের কোনো বিশেষ মত স্থির করিতে না পারিয়া আঁচিয়াছেন যে, খুব সম্ভব তাহা সংস্কৃত ত ব্য প্রত্যয়ের সহিত সম্বন্ধ হইবে।

* সাধারণ উচ্চারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য এখানে ব (বর্গীয়) দেওয়া হইল।

হইতে হইয়াছে, তাহা সুপ্রসিদ্ধ, ও এ ভাষার ব্যাকরণে দেখা যায়। প্রথমটির সংস্কৃত মূল আছে কি না সন্দেহ। ঝাড়ন শব্দটি কিঞ্চিৎ রূপভেদে মারাঠী, মৈথিলী, হিন্দী সিন্ধী ও গুজরাটীতে আছে [illegible] ও উড়িয়ায় ঝাটন আছে। [illegible] ঝাড়ন, ঝাটা ঝাটা, ইত্যাদি। বীমস্ সাহেব মনে করেন [illegible] ঝাটন। [illegible] ব্যাকরণে [illegible] ভেদ নাই।

[illegible] লিখিয়াছেন (কুমার [illegible]) [illegible]

[illegible] আমি [illegible] দুইটি [illegible] প্রাচীন প্রণালী [illegible] ধ্বনির [illegible] কোন [illegible] দেখেন। [illegible] কার [illegible] আশ্রয় করেন। [illegible] ধ্বনি [illegible] প্রকাশ [illegible] আমার [illegible] অক্ষরের যে ধ্বনি [illegible] কোনো ভেদ [illegible] স্বতন্ত্র ধ্বনি প্রকাশ করে। [illegible] স্বতন্ত্র। কেহ যদি [illegible] অর্থাৎ [illegible] লিখিতে চাহেন [illegible] দোষ দেখি না। আবার যদি কেহ [illegible] তাহাতেও দোষের কারণ ত দেখিতে পাইতেছি না। সব স্থানের লোকে একরূপ উচ্চারণ করে না সেই জন্যই শব্দের রূপও ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। [illegible] ফুল না বলিয়া আমরা [illegible] অনেকস্থানে।

* The Sanskrit original appears to be [illegible] with the causal form of অট "to go, so that [illegible] would mean "I cause to pass over (a broom or brush understood) —A Comparative Gram. vol I, 177 "

। অনেক স্থানে এই জন্য বলিতেছি যে পদ্যের ছন্দের জন্য স্থানে স্থানে [illegible] লিখিবারও প্রয়োজন হইতে পারে।

[illegible] বলি ইহা [illegible] অপলাপ করিব। আর যখন বলি, তখন [illegible] অন্য [illegible] করিব জানি না। [illegible] দেখা যায় [illegible] হইয়াছে তাহাতে [illegible] হইয়াছে [illegible] হইয়াছে [illegible]।

প্রাচীন [illegible] কথা [illegible] বলিয়াছিলাম যোগেশ বাবু ইহাতে [illegible]। আর [illegible] প্রয়োগ দিতেছি।—

[illegible]

[illegible] কবিয়া [illegible]

[illegible]

[illegible] ৩ পৃ।

[illegible]

[illegible]

ঐ, ৩১১ পৃ।

[illegible]

চণ্ডীদাস ([illegible]) ৭০ পৃ।

[illegible] কিঙ্কিণী [illegible]

[illegible] দেখি [illegible]

জ্ঞানদাস [illegible] ১১ পৃ।

[illegible] দামিনী।'

ঐ ১০৬ পৃ।

[illegible] শব্দের [illegible] হইয়াছে।

[illegible] উচ্চারণ [illegible] যেমন [illegible] অথবা [illegible]

[illegible] যোগেশ বাবুকে [illegible] শব্দের [illegible] উচ্চারণ [illegible] যে ধ্বনি প্রকাশ করিতে চাহি [illegible] আমার মনে হয় [illegible] উচ্চারণ করিয়া থাকেন। [illegible] করেন তাহাদিগকে [illegible] করিতে হইবে। [illegible] প্রাপ্ত হয়, [illegible] দিতে হইবে। [illegible] বস্তুত [illegible] হয়। [illegible] মূল [illegible] মালদহে [illegible] দেখা দিয়াছে [illegible] মালদহে [illegible] বলা হয়। [illegible] প্রাচীন পুস্তকে দেখা যায় ? ঠিক বলিতে পারি না, আমিও এই প্রশ্ন করিতেছি। এ সম্বন্ধে আমার মনে যে [illegible] হইতেছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে

Beames vol I, p 78 See also Hoernle, p 12.

[illegible] আমার বন্ধু [illegible] শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে [illegible] দিয়াছেন।

বলিবার ইচ্ছা থাকিল। আচ্ছা, এতাদৃশ প্রয়োগই কি সূচনা করিতেছে না যে, বাঙ্‌লায় ঙকারের উচ্চারণ অঁ? ঙা; ইহা সত্য-সত্যই তাহা সূচনা করিতে পারিত, যদি ইহাতে যুক্তি দেখিতে পাইতাম; কিন্তু যুক্তি ত দেখিতেছি না। আর যদি বা তাহাই হয়, তবে পূর্ব্বোদাহৃত শিঙা শব্দের উচ্চারণ কি শিআঁ করিতে হইবে, শিঙার কে বলিতে হইবে শিআঁর? এরূপ কি কোন বাঙালী করেন? যদি বা করেন, তাহা হইলে, আমরা রাঙা লিখিয়া ঙকারের দ্বারা যে ধ্বনি প্রকাশ করিতে চাহিতেছি, বাঙালী বলিয়া যাহা সূচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহার দ্যোতক অক্ষর কি হইবে?

অনুস্বার দিয়া বাংলা লেখার প্রবর্ত্তক রবি বাবু। তাঁহার সহিত আমার বস্তুত মতভেদ নাই। তিনি বলেন বাঙ্‌লায় অনুস্বারের ও ঙকারের উচ্চারণ একই। প্রসঙ্গ-বিশেষে তিনি বলিতেছিলেন বাঙ্‌লায় অনুস্বারের আকারও (ং) ইহা সূচনা করিতেছে, তুলনীয়—ং ঙ। অতএব ং=ঙ্‌ হইলে বাংলা=বাঙ্‌লা।

বাঙ্গালা শব্দকোষে (৬৯১ পৃ) যোগেশ বাবু নিজেও ভেক অর্থে বেঙ্‌গ্‌ শব্দের ন্যায় তাহার পাশাপাশি বেং ও বেঙ্‌ শব্দও লিখিয়াছেন।

৮। মাএর এবং মায়ের এই উভয়ের মধ্যে মাএর লেখাতে আমার পক্ষপাত বেশী বলিয়াছি, ইহার কারণও বলিয়াছি; মায়ের হয় না, ইহা বলি নাই, এখনো বলিতেছি না। যদি কোনো কোনো স্থানের উচ্চারণে য শ্রুতি থাকে, মায়ের পদই হইবে। বাঙ্‌লা মূলত এক ভাষা হইলেও তাহার অবান্তর ভেদ অনেক আছে, এক স্থানে যেরূপ উচ্চারণ হয়, অন্যস্থানে সেরূপ হয় না। হয় না বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন আকারে দেখা যায়। প্রকৃত স্থলের কথা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, বলিয়াছি মাতা সাধারণ প্রাকৃতে মাআ, কিন্তু আর্য প্রাকৃতে মায়া। উচ্চারণভেদে এইরূপ হইয়াছে। যাঁহারা আর্য প্রাকৃত বলিতেন তাঁহাদের উচ্চারণে এতাদৃশ স্থলে য-শ্রুতি ছিল। প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণ ইহা লইয়া গোলমাল করেন নাই, তাঁহারা কর্ত্তব্যবোধে উভয়ই স্বীকার করিয়া লিখিয়া পড়িয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণেও ইহাই করা হইয়াছে। কঃ+আস্তে=ক আস্তে, আবার কয়াস্তে ইহাও হয় (দ্রষ্টব্য পাণিনি, ৮।৩।১৭—২০)। এ সম্বন্ধে আমার আরো অনেক বক্তব্য আছে, সময়ান্তরে বলিব। মায়ের পদ আমি যে স্বীকার করি না তাহা নয়। পালি প্রাকৃতের সন্ধিপ্রকরণ পড়িলে কাহারো ইহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। এই-সব কথার আলোচনা করিবার সময় আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমরা কেবল সাহিত্যেরই ভাষা আলোচনা করিতেছি না, প্রাদেশিক ভাষাগুলিও ইহার মধ্যে আলোচিত হইয়া পড়িতেছে। প্রাদেশিক ভাষার ভেদ অনুসারে শব্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আসিবেই। ইহা লইয়া গোলমাল করায় কোনো ফল নাই। প্রকৃত স্থলে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে যেমন দুই রূপই চলিতেছে, কোনটিই দোষাবহ নহে, তখন বাঙ্‌লাতেও তাহার অনুসরণে এবং বিভিন্ন উচ্চারণের অনুকূলভাবে উভয়ই চলিতে পারে, কোনটাকেই ভুল বলিতে পারি না।

৯। প্রাকৃত বলিতে কোন্ ভাষা বুঝিতে হইবে, যোগেশ বাবু প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহার যৌগিক অর্থ যাহাই থাকুক, এবং সেই অনুসরণ করিয়া যতই কেন ব্যাপকভাবে ইহা বিভিন্ন ভাষা বুঝাইতে প্রযুক্ত হউক, আমি যখন এই শব্দটি প্রয়োগ করি, তখন, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যসমূহে স্ত্রীলোক প্রভৃতির যে ভাষা দেখা যায়, এবং বররুচি, হেমচন্দ্র প্রভৃতি যে ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, তাহাকেই মনে করিয়া লিখিয়া থাকি; এই ভাষাতেই প্রাকৃত শব্দ যোগরূঢ়। দেশভেদে এই প্রাকৃত কিছু কিছু ভিন্ন ছিল; এবং ঐ-সমস্ত প্রাকৃত ভাষার মধ্যে বিশেষ কোনো একটি হইতে, অথবা কতকগুলির সম্মিশ্রণে বাঙ্‌লা, মৈথিলী প্রভৃতি বর্ত্তমান প্রাদেশিক ভাষাসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। কোন্ ভাষাটা মূল কোন্ প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন, ইহা স্থির করা শক্ত হইলেও অসাধ্য নহে। প্রদেশান্তরের ন্যায় বঙ্গদেশেও এ চেষ্টা চলিতেছে, আশা করা যায়, ইহার ফল পাইতে কিছু বিলম্ব হইলেও, কোনো সংশয় নাই।

শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু যে, আমার শব্দপ্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন, ইহাতে আমি সত্যসত্যই বহু উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছি। সে সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, পরে বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গে কৃষির সামগ্রী।

গত বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত "বঙ্গে কৃষির সামগ্রী" শীর্ষক প্রবন্ধে কতিপয় ত্রুটি লক্ষিত হইল। রেশম-শিল্পের সংশ্রবে রহিয়াছি; সুতরাং এই শিল্প সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে সেই বিষয়েরই আলোচনা করিব।

"মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী এবং বৰ্দ্ধমানে প্রধানতঃ তুত গাছে রেশম পালন করা হয়।" লেখকের প্রকৃত মনোগত ভাব এই উক্তিতে স্পষ্ট প্রকাশিত হয় নাই। ঐ-সকল স্থানে তুঁত পাতা খাওয়াইয়া রেশম কীট পালন করা হয় ইহাই বোধ হয় লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু লিখিত ভাষায় সে ভাব পরিস্ফুট হয় নাই। "মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী এবং বৰ্দ্ধমানে প্রধানতঃ তুতপত্রে রেশমকীট পালন করা হয়" এইরূপ লিখিলেই ভাল হইত।

"রংপুর, জলপাইগুড়ি এবং বগুড়া এড়িসিল্কের জন্মস্থান।" লেখকের এই উক্তিও সত্য নহে। এড়ি সিল্কের জন্মস্থান আসাম; এইজন্য এড়ি-সিল্ক "আসাম সিল্ক" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে ইহা বোধ হয় স্বয়ং লেখকও অবগত আছেন। আসামের সহিত একসীমান্তবর্ত্তী বলিয়া আসাম হইতেই এই-সকল জেলায় এড়ি-রেশমের চাষ প্রসারিত হওয়া খুব স্বাভাবিক। বহুকালাবধি এই-সকল জেলায় এড়ি সিল্কের চাষ যে চলিতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও, রংপুর, জলপাইগুড়ি অথবা বগুড়াকে এড়ি-সিল্কের জন্মস্থান বলা যাইতে পারে না। তবে লেখক কোনও প্রামাণিক দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার উক্তির সমর্থন করিতে পারিলে তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।

স্থানান্তরে লেখক বলিয়াছেন "গুটি হইতে সুতা প্রস্তুত করিবার Filature ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালা দেশে অবস্থিত।" লেখকের এই উক্তিটিও অমূলক। লেখক বোধ হয় কাশ্মীরের রেশম-খানার কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন অথবা হয়ত তিনি ইহার সংবাদই রাখেন না। কাশ্মীরের রেশমখানা (Silk Factory) জগদ্বিখ্যাত এবং পৃথিবীতে সর্ব্ববৃহৎ বলি। খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এখানে তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ কারখানা আগুনে পুড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্বে প্রত্যহ প্রায় পাঁচ ছয় সহস্র মজুর খাটিত। এখনও বার্ষিক প্রায় দুইলক্ষ পাউণ্ড রেশম এই কারখানায় কাটাই হইয়া থাকে। অথচ লেখক ইহাকে এতই নগণ্য মনে করিয়াছেন যে 'Filture ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালা দেশে অবস্থিত' বলিয়া বসিয়াছেন।

শ্রীরসিকরঞ্জন ঘোষ।
শ্রীনগর, কাশ্মীর।

বাংলা সংক্ষিপ্ত লিপি।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় ১১৩ পৃঃ "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উন্নতি" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম প্যারায় সম্পাদক লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালা সংক্ষিপ্ত লিপির চর্চ্চা না হওয়া দুঃখের বিষয়। ইংরেজিতে যেরূপ সাঙ্কেতিক লিপি দ্বারা বক্তৃতা দ্রুত লিখিয়া লওয়া যায়, বাঙ্গালায় সেরূপ লিখিবার অভ্যাস কতকগুলি লোক করিলে অনেক ভাল ভাল বক্তৃতা রক্ষিত হইতে পারে। বাঙ্গালা সাঙ্কেতিক লিপি যে নাই তাহা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রেখাক্ষর বর্ণমালার কথা বলা যাইতে পারে।" আপনাদের এই প্যারার উপর আমার নিবেদন এই যে—বাঙ্গালা সংক্ষিপ্ত লিপির চর্চ্চা অনেকেই করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু বক্তৃতা লিখিবার জন্য ত কেহ তাঁহাদের ডাকেন না, বিশিষ্ট বক্তার বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিয়া রক্ষা করিবার আবশ্যকতা বোধ সমাজের হয় নাই। সাংকেতিক বর্ণমালায় বাঙ্গালা বক্তৃতা লিখিয়া দিতে এক্ষণে অনেকেই পারেন। এখন আর লোকের অভাব নাই। কার্য্যেরই অভাব। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ ও আরও আবিষ্কর্ত্তাদের ছাত্রেরা ত এ কার্য্য অনায়াসেই করিতে পারেন ; আমার নিজেরও একপ্রকার সাংকেতিক লিখন-প্রণালী আছে, তাহা দ্বারা আমিও বাঙ্গালা ভাষার যে কোনও বক্তৃতা দ্রুত বর্ণে বর্ণে লিপিবদ্ধ করিয়া পুনরায় সঠিক লিখিয়া দিতে পারি। এই কার্য্য আমি ১৩ বর্ষ হইল করিতেছি। গত তিন বর্ষ হইতে আমি "কাসিমবাজার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর" কার্য্য-বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছি। এ কথা উক্ত "সম্মিলনীর" মুখপত্র "গৌরাঙ্গ-সেবক" নামক পত্রিকায় ১৩২৩ সালের বৈশাখ মাসের খণ্ডে স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা ভিন্ন কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরী প্রভৃতি অনেক সমিতির অনেক বক্তৃতা আমি লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বা কোন সমিতি বা পত্রিকা ইচ্ছা করিলে আমি ডাক্তার জগদীশ বসুর উক্ত বক্তৃতা অনায়াসে বর্ণে বর্ণে লিপিবদ্ধ করিয়া দিতে পারি।

শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য।
৬৮।২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্মৃতির সৌরভ

তিনের পরিচ্ছেদ।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে শেভারেল-প্রাসাদের ভিতরকার অবস্থা যে কি-রকম ছিল সূক্ষ্মদর্শী পাঠক আগের পরিচ্ছেদ পড়িয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সেবারকার গ্রীষ্মে অতবড় ফরাশী জাতিটা যে, দুঃখের সূচনা-স্বরূপ নানা বিরোধী চিন্তা ও প্রবৃত্তির সংগ্রামে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে কথা আমরা জানি। আমাদের টিনার ছোট হৃদয়খানির মধ্যেও একটা প্রবল সংগ্রাম চলিয়াছিল। বেচারী ছোট পাখীটি উড়িবার চেষ্টায় অদৃষ্টের লোহার খাঁচায় বৃথাই তাহার কোমল বুকটি ঠুকিয়া মরিতেছিল। মুক্তি যে নাই। এই উদ্বেগের ফল যে কি তাহা ত' আমরা দেখিতেই পাইতেছি। এই বেদনা যদি বাড়িয়াই চলে, যদি আর দূর না হয়, তবে ত' তাহার আহত হৃদয়খানি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িতে পারে।

ইতিমধ্যে যদি ক্যাটেরিনা ও তাহার বন্ধু-বান্ধবের উপর তোমাদের একটু টান হইয়া থাকে,—আমার ত' বিশ্বাস সেটা হইয়াছে—তবে হয়ত সে এখানে কি করিয়া আসিল, সে প্রশ্নটাও তোমাদের মনে জাগিয়াছে। এই যে দক্ষিণ-দেশীয়া মেয়েটির কালো হরিণ-চোখ, ছোটখাট গড়ন, শ্যাম বর্ণ, যাহার মুখ দেখিলেই অলিভ গাছে ঘেরা পাহাড় আর বাতি-জ্বালা মন্দিরগুলি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে, সে এই সুন্দরী গৌরী প্রবীণা লেডি শেভারেলের পাশে এই জমকালো ইংরেজী প্রাসাদে বাসা বাঁধিল কোথা হইতে? ঠিক যেন একটি ছোট টুন্‌টুনি পাখী বাগানের এল্‌ম্ গাছের ডালে রাণীর পোষা সুন্দর লক্কা পায়রাটির পাশে আসিয়া বসিয়াছে। এ ইংরেজীও বলে বেশ, প্রোটেষ্টাণ্ট পূজায় যোগও দিতেছে। নিশ্চয়ই খুব ছোট বেলায় কেহ ইহাকে ইংলণ্ডে আনিয়া পালন করিয়াছে। সত্যই তাই।

স্যর ক্রিষ্টফার যখন বছর পনের আগে গৃহিণীকে সঙ্গে করিয়া শেষবার ইতালী যান, তখন তাঁহারা মিলানে কিছুদিন ছিলেন। স্যর ক্রিষ্টফার গথিক স্থাপত্যের বড়ই ভক্ত। সে সময় তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল নিজের শাদাসিধা ইটের বাড়ীখানাকে গথিক ধরণে প্রাসাদ বানাইয়া ফেলেন। তাই তিনি মিলানের মর্ম্মর মন্দিরের রহস্য উদ্ধারে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। লেডি শেভারেল ইতালীর যে শহরেই বেশীদিন ছিলেন, সেখানেই গানের জন্য একটি শিক্ষক রাখিতেন; এবারও সেটা বাদ পড়ে নাই। তাঁহার তখন গলাটাও ছিল খুব উঁচু আর মধুর এবং গান জিনিষটাতেও বেশ অধিকার ছিল। তখনকার দিনে বড়লোক-মহলে হাতের লেখা গান আর স্বরলিপির ব্যবহারটা ছিল খুব পয়সাওয়ালার পরিচয়। তাই যাহাদের রোজগার করিবার মতন আর কোন গুণ ছিল না এমন অনেক লোকে তাঁহার মতন বড়লোকদের জন্য গান নকল করিয়া দিন চালাইত। লেডি শেভারেলের এই কাজের জন্য একটি লোক দরকার

হওয়াতে তাঁহার ওস্তাদ আলবানী বলিলেন যে তাঁহার পরিচিত একটি লোক আছে তাহার মতন সুন্দর আর নিভু্ল করিয়া নকল করিতে প্রায় আর কাহাকেও দেখা যায় না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে লোকটির সব সময় মতি স্থির থাকে না, কাজেই তাহার কাজটা অগ্রসর হয় কিছু ধীরে ধীরে। কিন্তু শেভারেল গৃহিণী যদি গরীব বেচারা সার্টিকে কাজে লাগান তবে সে দয়াটা তাঁহার মতন সুন্দরী ও ধনী-গৃহিণীর উপযুক্ত কাজই হইবে।

শার্প-গৃহিণী লেডি শেভারেলের ঝি; তাহার বয়স তখন সবে তেত্রিশ বৎসর, বেশ টাট্‌কা তাজা শরীর। ওস্তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার পরদিন সকালে মিসেস শার্প গৃহিণীর খাস কামরায় গিয়া খবর দিল, "ঠাকরুণ, বাইরে একটা যাচ্ছে-তাই নোংরা ময়লা কুচ্ছিত লোক এসেছে, সে মিঃ ওয়ারেনকে বলে কি না ওস্তাদ তাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাকে এখানে আনাটা আপনি পছন্দ করবেন বলে ত আমার মনে হয় না। লোকটা বোধ হয় ভিখিরী ধরণের হবে।"

"হ্যাঁ, হাঁ, তাকে এখুনি ভেতরে ডেকে আন।"

শার্পগিন্নী বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে বাহির হইয়া গেল। ইতালী-সুন্দরী ও তাঁহার সন্তানদের প্রতি তাহার ভক্তির কোন লেশ দেখা যাইত না। স্যর ক্রিষ্টফার ও তাঁহার গৃহিণীর প্রতি যদিও তাহার অচলা ভক্তি, কিন্তু তাঁদের মতন ভদ্রলোকের এমন আজগুবি দেশে বেড়াইবার খেয়াল যে কেন হয়, তাহা তাহার ধারণার বাহিরে। "যত সব বিধর্ম্মীর আড্ডা, সাত জন্মে লোকে কাপড়চোপড় রোদে দেয় না, আর গায়ের রসুনের গন্ধে ত' ভূত পালায়।"

যাহা হউক খানিক পরেই আবার সে একটি বেঁটে-খাটো রোগা লোককে সঙ্গে করিয়া হাজির হইল। তাহার গায়ের রং শ্যাম, কিন্তু তাহাও অস্বাস্থ্যের কল্যাণে 'হলুদ-বরণ' হইয়া উঠিয়াছে। নিস্তেজ চোখদুটির চাহনি কেমন যেন চঞ্চল। অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে একটা অতি ভীতির ভাব জড়ানো। দেখিলে মনে হয় লোকটি বহুকাল নির্জ্জন কারাবাসে কাটাইয়া আসিয়াছে। এই দীনতা ও মলিনতার মধ্যেও যৌবনের শেষ রশ্মি মাঝে-মাঝে উঁকি দিতেছিল; এককালে যে চেহারাটা ভালই ছিল তাহাও দেখিয়া বোধ হইতেছিল। লেডি শেভারেলকে অতি কোমলহৃদয়া বলা মোটেই চলে না, ভাব-প্রবণ ত' আরোই না, তবে দয়া জিনিসটার মূল্য তিনি খুব ভাল করিয়াই বুঝিতেন; অন্ধ, আতুর, পঙ্গুর মতন যাহারা তাঁহার মন্দিরে আসিত, দেবীর মতন কৃপা করিয়া তাহাদের কল্যাণ বিতরণ করিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। দরিদ্র সার্টিকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল: সে যেন একখানা ভাঙা নৌকার শেষটুকরা; অভাবে কোন দিন হয়ত বেণু ও বীণার সুরের তালে তালে নাচিতে নাচিতে জীবনের স্রোতে উজান বাহিয়া যাইতে পারিত। যে গানগুলির স্বরলিপি নকল করিতে হইবে লেডি শেভারেল সদয়ভাবে সেগুলি তাহাকে দেখাইয়া দিলেন। এই মহিমাময়ী যেন আপন প্রভায় লোকটাকে তাজা করিয়া তুলিলেন। গানের বইগুলা বগলে করিয়া বাহির হইয়া যাইবার সময় এইবার সে যে নমস্কার করিল, তাহাতে ভক্তির ভাগটা কম পড়ে নাই বটে, কিন্তু ভীতির ভাবটা অনেক কম।

কম করিয়া দশ বৎসরের মধ্যে সার্টির চোখে লেডি শেভারেলের মতন উজ্জ্বল মহান আর সুন্দর কোনো জিনিষ পড়ে নাই। যে কালে সে অল্পদিনের জন্য চক্‌চকে সাটিন আর শুভ্র পালকের পোষাক পরিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রধান গায়কের পদে দেখা দিয়াছিল, সে কাল ত' কোন্ আদি যুগের কথা। তাহার পরের বৎসর শীতের সময় তাহার অমন সুন্দর গলা কোথায় হারাইয়া গেল, পড়িয়া রহিল শুধু ভাঙা বাঁশীর মতন তাহার তুচ্ছ দেহটা; তাহাতে এক আগুন জ্বালা ছাড়া আর কোন্ কাজ চলে? সাধারণ ইতালীয় গায়কদের মতন তাহারও বিদ্যা নিতান্তই অল্প, শিক্ষা দিয়া খাওয়া তাহাতে চলে না; হাতের লেখাটা সুন্দর না হইলে অসহায় তরুণী স্ত্রীটিকে লইয়া তাহাকে বোধ হয় না খাইয়া মরিতে হইত। তাহাদের তৃতীয় সন্তানটির জন্মের পর কি এক ভীষণ জ্বর আসিয়া দুর্ব্বল মাতা ও বড় ছেলেটিকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সার্টিকেও জ্বরে ধরিল; কিছুদিন রোগভোগের পর দুর্ব্বল দেহ ও মস্তিষ্ক লইয়া সে একটি চার মাসের ছোট মেয়েকে সম্বল করিয়া রোগশয্যা ছাড়িয়া উঠিল। তাহার বাসা ছিল এক স্থূলকায়া উগ্রচণ্ডা ফলওয়ালীর দোকানের উপর। মেয়ে-

মানুষটির যেমন গলার জোর তেমনি মেজাজ গরম। তবে সেও এককালে ছেলেপিলের মা ছিল, কাজেই কালো কালো চোখওয়ালা ওই ছোট ফ্যাকাশে মেয়েটির ভার সে-ই লইল, অসুখের সময় সার্টির সেবাটাও সে-ই করিয়াছিল। সার্টি বাসা বদলাইল না, স্বরলিপি নকল করিয়া যা' দুই-চার পয়সা জুটিত তাহাতেই ছোট মেয়েটিকে লইয়া কষ্টেসৃষ্টে তাহার চলিত। বেশীর ভাগ কাজই জুটাইয়া দিতেন ওস্তাদ আলবানী মহাশয়। ছোট মেয়েটির মুখ চাহিয়াই সে বাঁচিয়া ছিল। দোকান-ঘরের উপরে দোতলার ছোট ঘরখানাতে একলা খুকীকে লইয়াই সে ব্যস্ত। তাহাকে যত্ন করিত, তাহাকেই আদর করিত; খেলার সাথীও সে, গল্পের সঙ্গীও সে। কাজ আনিবার ও দিয়া আসিবার জন্য যেটুকু সময় বাহিরে থাকিতে হইত, সেইটুকুর জন্য বাড়ীওয়ালীর উপর তাহার প্রিয়মেনিটির ভার দিয়া যাইত। দোকানে ফল-পাকুড় কিনিতে আসিলে লোকে প্রায়ই দেখিয়া যাইত ক্ষুদে ক্যাটেরিনা মটরের গাদার মধ্যে পা ডুবাইয়া মেজের উপর বসিয়া আছে। পা দিয়া মটরগুলো ছড়ানতে তাহার বেজায় আনন্দ। কখন বা দেখা যাইত ফলওয়ালী দুষ্টুমি বন্ধ রাখিবার জন্য একটা মস্ত ঝুড়ির ভিতর খুকীকে বসাইয়া রাখিয়াছে।

ফলওয়ালী ছাড়া সার্টির খুকীর আর এক রক্ষয়িত্রীও ছিল। সার্টির দেবতায় নিষ্ঠা ভক্তি খুব। ক্যাটেরিনাকে সঙ্গে করিয়া সপ্তাহে তিনবার সে একটা বড় গির্জ্জায় যাইত। সকালবেলার সূর্য্যের আলো যখন এই গির্জ্জার বাহিরের অসংখ্য ঝকঝকে চূড়াগুলিকে গরম করিয়া ভিতরের অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দিত, তখন প্রায়ই দেখা যাইত বড় বড় থামগুলার অলস ছায়ার পাশে একটি পুরুষের ছায়া চঞ্চল হইয়া ফিরিতেছে; তাহার কোলে একটি শিশু। গানের ঘরের কাছে একটি নিরালা জায়গায় একটি ছোট টিনের ম্যাডোনা-মূর্ত্তি ছিল, লোকটির গতি সেইদিকে। শিশু যেমন প্রকৃতির মহান সৌন্দর্য্যের মধ্যে আকাশ কি তরুলতার দিকে ফিরিয়াও দেখে না, আপনার চোখের দৃষ্টির কাছাকাছি যে ছোট পালক, কি পোকাটি উড়িয়া বেড়ায় তাহারই উপর নিজের মনটা ঢালিয়া দেয়, বেচারী সার্টিও তেমনি এই প্রকাণ্ড গির্জ্জার এত বিরাট মূর্ত্তির মধ্যে সব ছাড়িয়া দিয়া ওই ছোট টিনের মাতৃমূর্ত্তিটিকেই দেবতার করুণা ও আশ্রয়ের মূর্ত্তিরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। ক্যাটেরিনাকে পাশে বসাইয়া সার্টি এইখানেই পূজা ও প্রার্থনা করিত। মাঝে মাঝে গির্জ্জার কাছাকাছি কোনো জায়গায় যাইবার দরকার হইলে সার্টির যদি খুকীকে সেখানে লইয়া যাইবার ইচ্ছা না থাকিত, তবে সে তাহাকে এই ম্যাডোনার কাছে আনিয়া বসাইয়া দিত। খুকী লক্ষ্মী মেয়ের মতন আপন মনে সেইখানে বসিয়া দুলিত আর হাত মুখ ঘুরাইয়া মিষ্টি সুরে অজানা ভাষায় কত কথা বলিত। সার্টি ফিরিয়া আসিয়া দেখিত মা তাহার ক্যাটেরিনার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

এই সার্টির মোটামুটি ইতিহাস। লেডি শেভারেল তাহার কাজে এতই খুসী হইয়া উঠিলেন যে সে-কাজ শেষ করিয়া আনিয়া দিবামাত্র নূতন কাজ দিলেন। কিন্তু এবার সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তাহার আর দেখা নাই। নিজেও আসে না, স্বরলিপিও পাঠাইয়া দিল না। লেডি শেভারেল উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, মনে করিলেন তাহার বাড়ীর ঠিকানায় ওয়ারেনকে পাঠাইয়া দি। ইতিমধ্যে একদিন বেড়াইতে বাহির হইবার সময় খানসামা একটুকরা কাগজ আনিয়া দিয়া বলিল, একটা ফলওয়ালা মা-ঠাকরুণের জন্য কাগজখানা রাখিয়া গিয়াছে। কাগজে ইতালীয় ভাষায় মাত্র তিন লাইন লেখা, অক্ষরগুলি কাঁপিয়া গিয়াছে।

"মহা-মহিমান্বিতা ঠাকুরাণী কি ঈশ্বরের প্রেম স্মরণ করিয়া কৃপা-পূর্ব্বক এই মুমূর্ষুকে একবার দেখা দিবেন?" হাতের লেখা কাঁপিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সার্টির লেখা বলিয়া বোঝা যায়। লেডি শেভারেল গাড়োয়ানকে সার্টির বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন। একটা অপরিচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ রাস্তায় লা পাজ্জিনীর ফলের দোকানের সামনে গাড়ী থামিতেই ফলওয়ালী বিশাল দেহ লইয়া দরজায় আসিয়া উপস্থিত। শার্প্গিন্নী ত' তাহাকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ফলওয়ালীর হাসি আর ধরে না, গোটা কয়েক নমস্কার ঠুকিয়া মিলানের ভাষায় মহারাণীকে সম্বোধন করিয়া অনেক কথা বলিল। দুঃখের বিষয় তিনি কথাগুলি

ভাল করিয়া বুঝিলেন না, কাজেই সার্টি মহাশয়ের ঘর দেখাইয়া দিবার অনুরোধ করিয়া তাহার কথার স্রোত বন্ধ করিলেন। সরু সরু অন্ধকার সিঁড়ি। লা পাজ্জিনী আগে আগে চলিয়া উপরে মহারাণীর জন্য দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। দরজার উল্টা দিকে একটা নীচু খাটে ছেঁড়া বিছানা। তাহার উপর সার্টি পড়িয়া আছে। তাহার চোখ দুটা কাচের চোখের মতন জলজল করিতেছে। ঘরে লোক ঢোকার কোনো সাড়া সে পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল না।

খাটের তলার দিকে একটা সাদা টুপি পরিয়া একটি ছোট মেয়ে বসিয়া আছে। তাহার বয়স তিন বৎসরের বেশী হইবে না। পায়ে দুটা চামড়ার জুতা, তাহার উপর-দিকে রোগা-রোগা দুটো ফ্যাকাশে হলদে মতন পা দেখা যাইতেছে। গায়ের জামার কাপড়টা বোধ হয় এককালে খুব চটকদার ফুলকাটা রেশমী ছিল। পোষাকের মধ্যে ওইটি মাত্র তাহার সম্বল। তাহার ছোট মুখখানার মধ্যে বড় বড় কালো চোখ দুটি পুরানো হাতীর দাঁতের অদ্ভুত মূর্ত্তির মণির চোখের মতন ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। তাহার হাতে একটা খালি শিশি। তাহার ছিপিটা বার বার ফট্ ফট্ করিয়া খুলিয়া আর বন্ধ করিয়া সে খেলা করিতেছিল।

লা পাজ্জিনী বিছানার কাছে গিয়া বলিল, "এই যে রাণীমা এসেছেন!" কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, তখনই আবার চমকাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "হা ভগবান! এ যে সব শেষ হয়ে গেছে!"

তাই! বটে চিঠিখানা যথাসময়ে পাঠানো হয় নাই, তাই হতভাগ্য সার্টির শেষ বাসনা আর মিটিল না। সে যে আশা করিয়া ছিল এই বড়-ঘরের ইংরেজ-ঘরণীর হাতে তাহার টিনাকে সঁপিয়া দিবে। যে মুহূর্ত্তে সে বুঝিয়াছিল যে এবার মৃত্যুর ডাক আসিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে কেবল ওই কথাই ঘুরিয়াছে। তাঁহার ধন আছে, দয়া আছে, এই দরিদ্র অনাথ শিশুকে তিনি কিছুতেই পায়ে ঠেলিতে পারিবেন না। তাই সে তাঁহার দর্শনভিখারী হইয়া ওই কাগজের টুকরাটুকু পাঠাইয়াছিল, প্রার্থনাও তাহার পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া ভিক্ষা চাহিবার জন্য সে প্রাণটাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। মৃতের প্রতি মানুষের শেষ কর্ত্তব্যটুকু যেন ভদ্রভাবেই হয় এই ইচ্ছায় লেডি শেভারেল লা পাজ্জিনীকে কিছু টাকা দিয়া ক্যাটেরিনাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। স্যর ক্রিষ্টফারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। কান্নাকাটি মিসেস শার্পের আসে না। কিন্তু ক্যাটেরিনাকে কোলে করিয়া আনিবার জন্য তাহাকে যখন সার্টির ঘরে ডাকা হয়, তখনকার সে করুণ দৃশ্য দেখিয়া তাহার মনটাও এমন হইয়া যায় যে অমন খিটখিটে মানুষও এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলিয়া পারিল না। মিসেস শার্প বিশেষ কারণেই কান্না জিনিষ-টাকে বাদ দিয়া চলিত। চোখের পক্ষে কান্নাই যে জগতের মধ্যে সব-চেয়ে অনিষ্টকর- এ-কথা তাহার মুখে প্রায়ই শুনা যাইত।

হোটেলে ফিরিবার পথে, ক্যাটেরিনা সম্বন্ধে লেডি শেভারেল মনে মনে অনেক ব্যবস্থাই করিলেন। কিন্তু শেষকালে একটি চিন্তাই সকলের উপরে স্থান পাইল। মেয়েটিকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া মানুষ করিলে হয় না? আজ বার বৎসর তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু শেভারেল-প্রাসাদে শিশু-কণ্ঠের মধুর কাকলি ত' একদিনও শুনা যায় নাই; এ সঙ্গীতের একটু ধ্বনি যদি সেখানে উঠে তবে ভাল বই মন্দ নিশ্চয়ই হইবে না। তাহার উপর এই "পোপ-তন্ত্রের" শিশুটিকে খাঁটি প্রোটেষ্টাণ্টের মতন শিক্ষা দিতে পারিলে এবং এই ইতালীয় শাখায় ইংরেজী ফল ফলাইতে পারিলে ত' খৃষ্টানের যোগ্য কাজই হইবে।

স্যর ক্রিষ্টফার এই ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ রাজি। ছোট ছেলেমেয়ের তিনি খুবই ভক্ত, কাজেই সেই মুহূর্ত্ত হইতে এই কালো-চোখী ছোট বাঁদরীটিকে একেবারে আপন করিয়া লইলেন। টিনা পৃথিবীতে যে কয়টি দিন ছিল, তাঁহার কাছে এই ডাকই শুনিত। লেডি শেভারেল কিম্বা তাঁহার স্বামী কেহই কিন্তু মেয়েটিকে নিজেদের পদে তুলিয়া লইয়া কন্যার স্থানে বসাইবার কোন কল্পনা করেন নাই। ইংরেজের রক্ত ও কুলগর্ব্ব তাঁহাদের শিরায়-শিরায় এমন সজাগ ভাবে বহিত যে এ-সব ঔপন্যাসিক কল্পনার সেখানে ঢুকিবার কোনো পথই ছিল না। আশ্রিত অনাথ শিশুর মতনই সে তাঁহাদের বাড়ীতে মানুষ হইবে; আখেরে কাজ দিবে এখন। পশম কাটা, হিসাব রাখা, পড়িয়া শুনানো, এই

রকম আরও কত কাজ আছে। বয়সে যখন গৃহিণীর চোখের আলো ম্লান হইয়া আসিবে তখন টিনাই তাঁহার চশমার স্থান লইয়া এ-সব কাজ করিয়া দিবে।

খুকীর জন্য নূতন কাপড়চোপড় কিনিতে শার্পগিন্নী বাহির হইয়া পড়িল—সুতী টুপি, ফুলকাটা জামা আর চামড়ার জুতা জোড়া সব কয়টাই বদলাইতে হইবে। ক্ষুদে ক্যাটেরিনার জীবনের ত্রিশটি পূর্ণিমা রজনী কাটিয়াছে। ইহার মধ্যে সে অজ্ঞাতে অনেক দুঃখ কষ্ট অমঙ্গল সহিয়াছে। কিন্তু আজই প্রথম বেদনা তাহাকে জানাইয়া দেখা দিল। গ্রীক অ্যাজাক্স বলেন "অজ্ঞতা বেদনাহীন অমঙ্গল।" আমার মতে ধূলাময়লাও সেই দলের। ইহাদের সঙ্গে হাসি মুখগুলি ত' বেশ মিলিয়া মিশিয়া থাকে। অন্তত পরিচ্ছন্নতা যে মাঝে-মাঝে বেদনাময় মঙ্গল হইয়া দাঁড়ায় তাহার সাক্ষী অনেক আছে। অনামিকায় সোনার আংটি পরিয়া একখানা নির্দ্দয় হাত যখন উল্টা দিক থেকে মুখখানা ঘসিতে থাকে তখনকার ব্যথার স্বাদ যে পাইয়াছে সে ভুলিবে না। পাঠক যদি এ দুঃখ ভোগ কখনো না করিয়া থাকেন তবে মিসেস শার্পের সাবান-জলের অভিনব অভিষেকে ক্যাটেরিনা যে কি যাতনা সহ্য করিয়াছিল, তাহার মোটামুটি ধারণাও আপনার কল্পনার অতীত। সুখের বিষয়, এই ভীষণ পরীক্ষার পরেই সোজা সে লেডি শেভারেলের বসিবার ঘরে আনন্দের স্রোতে আসিয়া পড়িল; সেখানে ভাঙিবার জন্য যথেষ্ট খেলনা ছিল, স্যর ক্রিষ্টফারের পায়ের উপর ঘোড়াঘোড়া খেলা হইল, আবার একটা নিরীহ কুকুরও নির্ব্বিবাদে তাহার হাতের চড়কীল-গুলি সহ্য করিয়া পড়িয়া থাকিবার জন্য প্রস্তুত ছিল।

(ক্রমশ)

শ্রীশান্তা দেবী।

মুক্তামালা

তোমারি আঘাতে মোর, হে নিঠুর প্রিয়!
যে ব্যথা মুকুতা হয়ে লুটিছে ধূলায়,
ক্ষণেক থামিয়া পথে করে তুলে নিও,
বারেক গাঁথিয়া মালা পরিও গলায়।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

প্রবাসী বাঙ্গালী ও বঙ্গসাহিত্য

(বাঁকিপুর হেমচন্দ্র-পুস্তকালয়ের নবগৃহ প্রবেশ উপলক্ষে অভিভাষণ)

রসিক ফরাসী জাতির মধ্যে একটা চলিত কথা আছে—"There is a man mightier than Napoleon, cleverer than Telleyrand. That man is *all men*." অর্থাৎ "সমুদ্রগুপ্তের চেয়েও বেশী ক্ষমতাশালী, চাণক্যের চেয়েও বেশী ধূর্ত্ত একজন লোক আছে। সেই লোকটার নাম মনুষ্যজাতি।"

কোন দেশের গৌরব বা ক্ষমতা সেই দেশের দুই-একজন মহাপুরুষের উপর নির্ভর করে না, সেই দেশের সাধারণলোকের সমবেত বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। যে পরিমাণে দেশের মাঝারি গোছের লোক বেশী জানে শুনে, ঠিক চিন্তা করিতে পারে, বেশী সভ্য ও একতায় গাঁথা, সেই পরিমাণে ঐ দেশের জাতীয় শক্তি প্রবল হইবে। যুদ্ধেও তাহাই দেখা যায়। রণনীতি সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ক্লৌজেভিট্জ্ (Clausewitz) বলিয়াছেন "War is a contest between the spirits of two nations" অর্থাৎ যুদ্ধ হচ্ছে দুটি জাতির হৃদয়বলের পরীক্ষা।

এই জাতীয় বলবৃদ্ধির একমাত্র উপায় জাতীয় জ্ঞানবৃদ্ধি, এবং জাতীয় জ্ঞানবৃদ্ধি মাতৃভাষার সাহায্য ভিন্ন হইতে পারে না। দেশের সাহিত্য যতদূর উন্নত, বিচিত্র ও সত্য, দেশের লোকের জ্ঞানও ততদূর উচ্চ, বিবিধ এবং খাঁটি হইবে। মাতৃভাষার প্রচলিত গ্রন্থ হইতে আমরা যে বিদ্যা লাভ করি তাহা অতি সহজে, অতি অদৃশ্যরূপে এবং দিনের পর দিন অবিরত ভাবে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে। আমাদের সমাজ জ্ঞানের যে স্তরে উঠিয়াছে তাহা কথাবার্ত্তায় আহারে ভ্রমণে আমাদের ছেলেদের নিজস্ব হইয়া পড়ে—মাছ যেমন জল হইতে, গাছ যেমন মাটি হইতে খাদ্য ও বল সংগ্রহ করে, আমাদের জাতীয় জীবনও তেমনি দিশী সাহিত্য হইতে বল ও প্রাণ পায়। যে পরিমাণে কোন স্থানের জল বা মাটি বিশুদ্ধ ও ওজস্বী রাসায়নিক গুণে ভূষিত, সেই পরিমাণেই তথাকার মাছ ও গাছ সবল হয়, বড় হয়। যে দেশের মাতৃভাষায় অতি উচ্চ জ্ঞানের, বিবিধ বিজ্ঞানের, এবং পৃথিবীর, এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অংশের বিবরণ আছে,

সেই দেশের লোক জীবন-সংগ্রামে অপর সমস্ত জাতিকে পরাস্ত করিবেই করিবে। সব দেশেই মহাপুরুষেরা বিদেশী ভাষার সাহায্যে জ্ঞানের উচ্চ সীমায় পৌঁছিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা কম, তাঁহাদের এই জ্ঞানলাভ অত্যন্ত কষ্ট-সাধ্য। সাধারণ লোকে এ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকে অথচ এই সাধারণ লোকের গড়পড়তার বিদ্যাবুদ্ধির উপরই জাতীয় শক্তি ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। এই দেখুন, ক্লাইবের মত ইস্কুল-পালান, বাপে-তাড়ান, মায়ে-তাড়ান একটা ছেলেকে ধরিয়া সেনাপতি করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার পক্ষে দেবভাষা লাটিন বা গ্রীক হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করা অসম্ভব, তিনি শিক্ষিত ইংরেজসমাজ হইতে নিশ্বাসের সঙ্গে অনেকটা নব্য বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, আর বাকী বিদ্যাটুকু উন্নত মাতৃভাষার বই পড়িয়া অতি সহজে অধিকার করিলেন। তাঁর ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতিরা পণ্ডিত না হওয়ায়, কৃচ্ছ্র-সাধনশীল সংস্কৃত বা আরবী ভাষা শিক্ষা না করায় এবং নবজ্ঞানে বঞ্চিত দিশী সমাজে বর্দ্ধিত হওয়ায়, তাঁহার কাছে জ্ঞানে শক্তিতে পরাভূত হইল। দিশী সাহিত্য যত উন্নত, বিদ্যালয়ের কাজ ততই লাঘব হয়, ইস্কুলে নামকাটা ছেলের মূর্খ বা অকর্ম্মণ্য হইবার সম্ভাবনা ততই কম হয়। অতএব জাতীয় বল বাড়াইবার জন্য মাতৃভাষার সাহিত্যকে পরিপুষ্ট, বিবিধ জ্ঞানে ভূষিত, নব্যতম ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। সাহিত্য সখের জিনিষ নহে; সাহিত্য-সেবা সাধনার একটি রূপ মাত্র। আজ যে এখানে সাহিত্য-সেবার স্থায়ী আগার প্রতিষ্ঠা হইল, ইহা বঙ্গভাষীদের স্থায়ী লাভের বিষয়।

কিন্তু বাড়ী ত হইল মানুষ কই! এর পর মহাপুরুষের দরকার। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণ একেলা কাজ করেন; স্থানীয় সমাজকে উপেক্ষা করিয়া, হয়ত তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া, তাঁহারা নিজ সাধনা উদ্‌যাপন করেন। এই বনস্পতিগণ অতি দূর নিভৃত ভূমিস্তর হইতে খাদ্যরস সংগ্রহ করেন; ভীষ্মের ন্যায় শুধু সেই অন্তঃসলিলা গঙ্গার বারিধারায় তাঁহাদের ক্লান্তদেহের তৃষ্ণা নিবারণ হয়। কিন্তু তাঁহাদের সাধনা সমাপ্ত হইবামাত্র তাহার ফল আমাদের জনসাধারণের নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া যায়। তাই কবি গাহিয়াছেন—

দেবি! এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি অনেক গান,
পেয়েছি অনেক ফল;
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,
ভরেছি ধরণীতল।
বলেছি যে কথা, করেছি যে কাজ,
আমার সে নয়, সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার-মাঝ
বিবিধ সাজে॥

সাহিত্যের মহাপুরুষগণের ক্ষমতাই ইহা। তাঁহারা একা হইলেও সমস্ত জগত নড়াইতে পারেন, মানবজাতিকে নবীন পথে চালাইতে পারেন। তাঁহারা এক-একটি যুগ-প্রবর্ত্তক। রাজা কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, দেশ হইতে নির্ব্বাসিত, পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক ধিক্কৃত বৃদ্ধ ভল্‌টেয়ার ক্ষুদ্র ফার্ণিগ্রামে সুইজারলণ্ডের পর্ব্বত বন হ্রদের মাঝে অরণ্যবাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার লেখা পূর্ব্বপ্রান্তে মস্কো নগর হইতে পশ্চিমপ্রান্তে লিস্‌বন রাজধানী পর্য্যন্ত সমস্ত ইউরোপ প্লাবিত করিল, ফরাসীরাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব জন্মাইল। সাহিত্যের যাহা খাঁটি সত্য তাহা ক্ষুদ্র হইলেও জীবন্ত অগ্নিকণার মত তাহাতে খাণ্ডবদাহন করিবার শক্তি আছে। যদি অগ্নি স্বর্গ হইতে চুরি-করা দেবতাদের ব্যবহার্য্য পদার্থ হয়, তবে সাহিত্যের শক্তিও দৈবশক্তি, সাহিত্য-সেবাও দেব-পূজার নামান্তর মাত্র।

এই যোগ-সাধনার একটি বিশেষ প্রণালী আছে, ইহাতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের একটি বিশেষ স্থান, বিশেষ কর্ত্তব্য আছে।

প্রবাসী বঙ্গভাষীদের নিকট বঙ্গসাহিত্য কি কি চাইতে পারেন ইহা আমাদের ভাবা উচিত। আমরা কখনও প্রথমশ্রেণীর কাব্য বা গান রচনা করিতে পারিব না, কারণ বিশুদ্ধ কথিত বাঙ্গলার স্রোত আমাদিগকে ঘিরিয়া নাই, অন্যভাষাভাষীদের মধ্যে আমাদের জন্ম, শিক্ষা ও বসতি। অথচ কাব্যের ভাষার মারপেঁচ এমন যে, ঠিক বঙ্গদেশের জল ও বাতাসে বর্দ্ধিত না হইলে আমাদের বাঙ্গলা কাব্যে খাঁটি বাঙ্গলা রস হয় না। এখানকার বাঙ্গালী শিশু ধাত্রীর কাছে ঘুম-পাড়ান মাসীপিসির গান শুনে না, বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর শুনে না; সে শিশু শোনে "গঙ্গা মাইয়া ঢুন্ধা দিয়া চৌড়া দিয়া রামা"। সুতরাং তাহার জিহ্বা রামদেও না বলিয়া স্বভাবতঃই রামদেও বলিতে

চাইবে; ঠাকুরমশায় না বলিয়া "বাবাজী" বলিবে। তাহার রচিত বাঙ্গলা কাব্যে ব্যাকরণ-দোষ থাকিবে না বটে, কিন্তু ভাষার ঝঙ্কারের মধ্যে একটু বিদেশী সুর থাকিবে, একটু খট্‌কা থাকিবে তাহা চোখে বাধে না, কিন্তু বঙ্গবাসীদের কানে বাধিবে। তাঁহারা যেই উহা শুনিবেন অমনি ধরিয়া ফেলিবেন এবং বলিবেন "ঐ রে ওটা মনুষ্য নয়, হবে কোন প্রবাসী।"

সুতরাং কাব্য মহাকাব্য ভিন্ন অন্যান্য বিভাগে বঙ্গসাহিত্য পুষ্ট করিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের একটি বিশেষ সুবিধা আছে। এত শতাব্দীর ক্রমাগত চেষ্টার ফলে বাঙ্গলাদেশে সাহিত্যের মালমসলা প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে, আর কিছুই নূতন নাই, যেন সব দৃশ্যই বর্ণনা করা হইয়া গিয়াছে, যেন সব ভাবই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, যেন সব গল্প গুলিই বলা হইয়াছে, লেখকের মনে যেন বার্দ্ধক্যের ভাব চাপিয়াছে, পাঠকের মুখে যেন অরুচি।

কিন্তু বঙ্গের বাহিরের প্রাকৃতিক দৃশ্য, আচারব্যবহার, কথা-উপকথা, মানবহৃদয়ের সনাতন ভাবগুলির প্রকাশের পদ্ধতি, বঙ্গবাসীদের পক্ষে এখনও নূতন। এই অজস্র ভাণ্ডার হইতে নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমরা বঙ্গসাহিত্যকে ধনী করিতে পারি, সেই বৃদ্ধের শরীরে নূতন মাংস, নূতন রক্ত, নূতন মেদ যোগ করিয়া তাহাকে পুষ্ট করিতে পারি, আবার নবীন করিতে পারি। যেমন ভাষাতত্ত্বে দেখা যায়, যে, যখন সাধু-ভাষার কথাগুলি ক্রমাগত ব্যবহারে ক্ষয় পাইয়া যায়, তখন প্রাদেশিক বুলি ও অপকথা (Slang) হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া ভাষাকে নূতন বল দেওয়া হয়। ইহার নাম dialectic regeneration।

মহাসমুদ্রগুলির পরপারে ইংলণ্ডের যে-সব উপনিবেশ আছে, যাহাকে বৃহত্তর ব্রিটেন বলা হয়, সেখান হইতেও ঠিক এইরূপে ইংরেজী সাহিত্য পুষ্ট হইতেছে। ভারতে প্রতিপালিত রাডিয়ার্ড কিপলিঙ্, দক্ষিণ-আফ্রিকার রাইডার হাগার্ড, অষ্ট্রেলিয়ার র‍্যালফ্ বল্‌ডারউড্, আরব মিশরের মারমাডিউক্ পিক্‌থাল, স্থানীয় প্রকৃতি ও স্থানীয় চরিত্র বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের উপন্যাসগুলির দ্বারা ইংরেজী সাহিত্যে এক নূতন রস, এক নূতন জীবন-স্রোত আনিয়া দিয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদিগকে তাহাই করিতে হইবে। আমরা স্থানীয় জীবন সমাজ ও প্রকৃতি হইতে নব নব উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া বঙ্গমাতার নিকট, বঙ্গভাষার নিকট নিজ ঋণভার কতক পরিমাণে লাঘব করিব। বঙ্গবাসীগণের সহিত আমাদের আদানপ্রদানের সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে। আমরা শুধু লইব না, দিতেও পারিব।

এই-সব সুহৃদ্-পরিষদ-গৃহ সেই ঋণশোধের কার্য্যালয় হইবে। কিন্তু এই কার্য্যালয়ে এই ব্যবসায়ের খাঁটি কার্য্য-প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে, নচেৎ প্রথম দিনের আনন্দধ্বনি থামিয়া যাইবার পর হইতেই, এই ব্যাঙ্ক ফেল হইবে, দেনা শোধ হইবে না। এই ব্যবসায়ের খাঁটি প্রণালী কি, একটু ভাবিয়া দেখা যাউক।

এই যে সাহিত্য পরিষদ-গৃহকে আমরা বাণীর মন্দির বলি, এই যে আমরা নিজকে সাহিত্য-সেবক বলিয়া পরিচয় দিই, এ যদি শুধু মুখের কথা না হয় তবে আমাদিগকে দৃঢ় পণ করিতে হইবে যে, আমাদের সাহিত্য-আলোচনা-গৃহ, আমাদের পাঠাগার, যেন সেই সত্যস্বরূপিণী শ্বেতভুজা সরস্বতীর মন্দির থাকে, যেন ইহা কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের ভজন-গৃহে পরিণত না হয়। যেন আমরা আমাদের মন্দিরে আমাদের রচনায় নররূপী কোন সরস্বতীকে পূজা করিয়া দেবী সরস্বতীকে অপমানিত না করি। আমরা যেন সাধক থাকি, চাটুকার না হই। দেবী সরস্বতীর পুত্রগণ এ জন্মে মাতার প্রদত্ত পুরস্কার পান না। নররূপী সরস্বতীর পুরস্কার হাতে-হাতে পাওয়া যায়, তাহার প্রলোভন-শক্তি অতি ভীষণ। কালিদাস একস্থলেও বিক্রমাদিত্যের স্তুতিবাদ করেন নাই। আমাদের মধ্যে যাহারা কলির কালিদাস হইতে ব্যগ্র তাঁহারা যদি কলির বিক্রমাদিত্যের অহোরাত্র জয়গান করিতে থাকেন তবে তাঁহাদের ও সেই প্রাচীন কালিদাসের মধ্যে একটু প্রভেদ হইবে, এই ভাবিয়া আমার দুঃখ হয়। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে মুসলমান-রাজত্বকালে খোসামুদের যুগ ছিল। কিন্তু তখনও বাণীর বরপুত্রগণ কিরূপ সাহসী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আড়াই শ বৎসর হইল বিজাপুরের মুসলমানরাজ্যে মীর্জা

মর্ছিয়া খ্বান নামক কবি শুধু ঈশ্বরের গুণগান রচনা করিতেন। তাঁহার কবিতা লোকে ঘরে ঘরে হাটে ঘাটে গাইত। একদিন সুলতান আলী আদিল শাহ তাঁহাকে ডাকিয়া অনেক উপহার দিয়া বলিলেন "আমার কীর্ত্তি গান করুন।" কবি বলিলেন "আমার জিহ্বা ঈশ্বরের স্তবে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি, রাজার স্তুতি গাইতে পারিব না।" (B. S. 395)

দ্বিতীয়তঃ আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে যে এই সাহিত্য-মন্দির যেন মল্লযুদ্ধের রঙ্গভূমিতে পরিণত না হয়। আমি আমার দলঘেরা হইয়া ভাড়াকরা পাঁচ-সাতখান খবরের কাগজে নিজের জয়ডঙ্কা বাজাইতে-বাজাইতে অগ্রসর হইলাম। আপনিও আপনার পারিষদবর্গ লইয়া আপনার হাত-ধরা পাঁচ-সাতখানা পত্রিকায় ঢাক বাজাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর আমাদের দুজনের মধ্যে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। এই ভাবে সৃষ্ট সাহিত্য আমাদের অরুচিব্যাধিগ্রস্ত নব্য শিক্ষিত পাঠকবর্গের প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ ক্ষুধা বৃদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু ইহাতে দেবীপূজার বিঘ্ন হয় মাত্র। অর্থলোভী সেবাইৎদের মধ্যে লাঠালাঠি হইতে পারে, ভক্ত উপাসকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই। তাহারা সব গুরুভাই।

উদ্যোগী পুরুষসিংহের নিকট লক্ষ্মী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু খোসামুদে জোগাড়ে সাহিত্যিকের জয় ক্ষণিক, তিনি যে লক্ষ্মীকে লাভ করেন সে বড়ই চঞ্চলা, সে লোক-ভুলান মায়াময়ী মাত্র। আর উদ্যোগী পুরুষসিংহ, বহুবর্ষ-ব্যাপী নীরব নিভৃত সাধনার পর, প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখাইয়া কেবলমাত্র নিজের হৃদয়ের বলে মনের তেজ প্রয়োগ করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে যশস্বরূপিণী লক্ষ্মীকে লাভ করেন তাঁহার অতুলনীয় মূর্ত্তি কবির তুলিতে এই বর্ণে আঁকা হইয়াছে—

নবকুন্দ-ধবলদল-সুশীতলা,
অতি সুনির্ম্মলা, সুখ-সমুজ্জ্বলা,
শুভ সুবর্ণ আসনে অচঞ্চলা।
স্মিত-উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী,
পূর্ণ-সিতাংশু-বিভাস-বিকাশিনী,
নন্দন-লক্ষ্মী সুমঙ্গলা॥

মাতৃভাষার সেবার জন্য ব্যগ্র যুবকবৃন্দ! তোমাদের সম্মুখে এক কঠোর পরীক্ষা সমাগত। একদিকে প্রকৃত সাহিত্য-সেবার কঠোর তপস্যার প্রস্তাব, অপর দিকে জোগাড়ের জয়ের চাটুকারের লাভের মনোমুগ্ধকর দৃষ্টান্ত। একদিকে শ্রমের ও ত্যাগের, অপর দিকে ভোগের ও আরামের আহ্বান। গ্রীসদেশের যুবকবীর হার্কিলিসকে যে দুই নারীমূর্ত্তি দুদিক থেকে দুই হাত ধরিয়া টানিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল, তোমাদেরও ঠিক সেই পরীক্ষা উপস্থিত। কিন্তু মনে রাখিও ভোগসুখপ্রদায়িনী মূর্ত্তিটি দেবী নহে, দানবী। তাহার দান কুহকমাত্র, তাহা দুদিনে উড়িয়া যায়, এবং ভ্রান্ত সেবককে দুর্ব্বলতা, অবসাদ, সমাজের ধিক্কার এবং নিজের মনস্তাপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। শস্তায় যশ লাভ করিব, ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিব, আবশ্যক পরিশ্রম ও সজাগ যত্ন হইতে নিজেকে বাঁচাইব, যোগাড় করিয়া সত্যসমালোচনার পথ বন্ধ করিব,—এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া যদি তোমরা সাহিত্য সৃষ্টি কর তবে তাহা বাঁচিয়া থাকিবে না, তাহা সজীবও হইবে না, তাহা জাতীয় জীবনের ধমনীতে নববলের ধারা প্রবাহিত করিতে পারিবে না। জগতের সমস্ত দেশের সাহিত্যের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দিতেছে; ভারতবর্ষে এই সত্যের ব্যতিক্রম হইবার কোন কারণ নাই।

অতএব, যদি সাহিত্য-সেবা করিতে চাও তবে প্রথমে মানুষ হও, বীর হও, স্বাধীন-চেতা হও। শুধু ভোগ ও আরামের লালসা ত্যাগ করিলেই হইবে না, শুধু শ্রমশীল হইলেই চলিবে না, প্রকৃত সাহিত্য-সেবককে উন্নত মস্তক হইতে হইবে, চাটুকারের বৃত্তিকে পদাঘাত করিতে হইবে, অর্থলোভকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি নিজকে এক অশরীরী দেবীর পূজারি বলিয়া জানেন; কোন জীবন্ত রাজা মহারাজার সভাসদ বলিয়া স্বীকার করেন না। এই নির্ভীক সত্যসন্ধানীকে গৃহে, সমাজে, এমনকি রাজদ্বারে অনেক অবিচার, অনেক অন্যায় লাঞ্ছনা, অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তিনি সেজন্য ভীত নহেন। তাঁহার দৃষ্টি জাতীয় জীবনের সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি নিহিত। তিনি জানেন যে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে একদিন তাঁহার দিন আসিবেই আসিবে, তখন হয়ত তিনি স্বর্গগত কিন্তু তাঁহার আত্মা পৃথিবীতে তাঁহার গ্রন্থের রূপ ধারণ করিয়া বিরাজিত; তখন তাঁহার ব্যর্থ সাধনখানি সার্থকফল হইয়াছে। এই

আত্মা তখন বিজয়ী। তখন তিনি আর বলিতে পারেন না

স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ক্ষণ
আনিয়াছি গীতহীনা
আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন
ছিন্নতন্ত্রী বীণা!
ওগো ছিন্নতন্ত্রী বীণা
দেখিয়া তোমার গুণীজন সবে
হাসিছে করিয়া ঘৃণা॥

কারণ সেদিন তাঁহার "ব্যর্থ সাধনখানি" সব হতে সার্থক হইয়াছে। বাণীর কাছে

যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠদান
দিতেছি চরণে আসি—
অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনা রাশি।

এবং বাণী আজ তাহা কর পাতিয়া লইয়াছেন, আপনার হাতে মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। আজ কবির বিফল বাসনারাশি তাঁহার জীবন সফল করিয়াছে!

আজ যে বাণীর মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার জন্য আমার মত অকৃতিকে আদেশ করিয়াছেন তাহা যেন সর্ব্বদাই দেবমন্দির হইয়া থাকে; যেন তাহাতে সাধকগণ শুধু এই তিনটি মন্ত্রই জপ করেন—

সত্যমেব জয়তে নানৃতং!
উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ!
শরীরং বা পাতয়েয়ম্ মন্ত্রম্বা সাধয়েয়ম্!

এই মন্দিরে যেন মিথ্যাভাষী চাটুকারগণ, অর্থলোভী সত্যভীত পুণ্য-ভীরু কাপুরুষগণ, বিলাসী সাহিত্যসৌখীনগণ, সরস্বতীর নামাবলিতে গা ঢাকিয়া উপস্থিত না হয়। কারণ এটি নরপূজার মন্দির নহে। ইহাতে যিনি প্রকৃত পূজার অধিকারী তাঁহাকে সংযম পালন করিতে হইবে, তাঁহাকে ধনত্যাগী সুখত্যাগী ব্রহ্মচারী হইতে হইবে। যে মহাশক্তিশালী বীর দানব জয় করিয়া দেবজাতির উদ্ধার করিয়াছিলেন তাঁহার মাতা—রাজার নন্দিনী হইয়াও, অনুপমা সুন্দরী হইয়াও, শিরীষ-পুষ্পের মত কোমলদেহ হইয়াও কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। আর সেই বিজয়ী কুমারের পিতা—অরূপহার্য্যং মদনস্য নিগ্রহাৎ পিনাকপাণি—যিনি কামকে ভস্মে পরিণত করেন এবং রূপকে পরাভব করেন। সেই-মত যে-সাহিত্য আমাদের জাতির জন্য নবজীবন আনয়ন করিবে, ভারতবর্ষকে জয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহার রচয়িতাকে বহুবর্ষব্যাপী নীরব সাধনা করিতে হইবে, সুদীর্ঘ উদ্যোগ-পর্ব্ব উদ্‌যাপন করিতে হইবে; তবে তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাকে নিষ্কাম তপস্বী হইতে হইবে, তাঁহাকে বীর হইতে হইবে। প্রত্যেক বিভাগে খণ্ড খণ্ড আকারেও যিনি এইরূপ স্থায়ী জাতীয় সাহিত্য রচনা করিতে চান, তাঁহাকে অক্লান্ত সত্যসন্ধানী নির্ভীক সত্যবাদী, দীর্ঘ আত্মোৎকর্ষ- ও উদ্যোগপরায়ণ এবং সরস্বতীর নিষ্কাম সেবক, হইতে হইবে। ইহার কোন সহজ বা সুলভ পন্থা নাই, একথা যেন আমরা কখন না ভুলি। অনেকদিন ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া, বড়ই ক্ষোভে, জাতীয় জীবনের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বড়ই শঙ্কায়, আজ আমি বঙ্গসাহিত্যের জন্য এই পঞ্চতিক্ত-কষায়ের ব্যবস্থা করিলাম। রোগী কি ইহা গ্রহণ করিবেন, তিনি কি নিজ রোগ স্বীকার করিবেন?

আমাদের যুবকবৃন্দের যে হৃদয়ের বলের ও অধ্যবসায়ের জীবন্ত দৃষ্টান্ত এই সুহৃদ-পরিষদ্-গৃহ আজ সম্পূর্ণ হইল, সেই হৃদয়ের বল, সেই অধ্যবসায় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেই আমাদের সমস্ত আশা সফল হইবে। তাহারা ইটের বদলে রোড়া (rubble) ব্যবহার করে নাই, তাহারা শুর্কির বদলে কাদার কাঁচা গাঁথনি দেয় নাই, এবং সব দোষ চুনকামে ঢাকিয়া তাড়াতাড়ি নূতন বাড়ীটি গ্রাহককে ঠকাইয়া বেচিয়া পালাইয়া যাইবার চেষ্টা করে নাই। ইংরেজীতে যাহাকে jerry-built house বলে, এটা তাহা নয়। আমাদের বাঁকীপুরের সাহিত্যপ্রিয় যুবকগণ অনেক বাধা অনেক বিপত্তিকে উপহাস করিয়া বুক বাঁধিয়া কত বছর খাটিয়া তবে এই গৃহটিকে দৃঢ় ও স্থায়ীভাবে গঠন করিয়াছে। ঠিক এই গুণগুলিই সাহিত্য-রচনায় দেখাও, আর কিছুই চাই না।

আজ যে মন্দিরের অর্গল মোচন করিতে আমরা সকলে যাইতেছি তাহা যেন প্রকৃতই দেবগৃহ হয়, যেন আমাদের

এবং যুগে-যুগে আমাদের বংশধরগণের পক্ষে ইহা পবিত্রতার, নির্ভীকতার, সত্যবাদিতার, কর্ত্তব্যপরায়ণতার, দেবসেবার, জনসেবার ক্ষেত্রই থাকে। যেন ক্ষণিক সুখের লোভে নব-বিকশিত-কিশলয় বালকবৃন্দ কলুষে মলিন, ইন্দ্রিয়ভোগ-স্পৃহার উত্তেজক সাহিত্যকে এ গৃহে স্থান না দেয়। যেন এখানে আসিয়া, চিন্তা করিয়া, আলোচনা করিয়া, পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করিয়া আমরা উদার হইতে শিখি, বীর হইতে শিখি, বাঙ্গালী নাম উজ্জ্বল করিতে লেশমাত্রও ব্যগ্রতা অনুভব করি।

বাঁকীপুরস্থ বাঙ্গালীদের পক্ষে আজকার সন্ধ্যা সন্ধ্যা নহে, ইহা নবজীবনের প্রভাত। এই মন্দিরের মুক্তদ্বার দিয়া আমরা আজ একটি নব জগতে প্রবেশ করিতে যাইতেছি। তাই আমাদের হইয়া আমাদের আজকার হৃদয়ের প্রার্থনা কবি ঈশ্বরসমীপে বলিয়া রাখিয়াছেন :—

মোরে, ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে—
তোমার বিশ্ব-সভাতে,
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে!
উদয়-গিরি হতে উচ্চে কহ মোরে—
"তিমির লয় হল দীপ্তি সাগরে,
স্বার্থ হতে জাগ, দৈন্য হতে জাগ,
সব জড়তা হতে জাগ, জাগরে,
সতেজ উন্নত শোভাতে!"
(আজি এ মঙ্গল প্রভাতে।)
মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন
ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন
তোমার উজ্জ্বল শুভ্র রোচন
নবীন নির্ম্মল বিভাতে॥
(আজি এ মঙ্গল প্রভাতে।)

শ্রীযদুনাথ সরকার।

কোহিনুর

মনের মানিক কোহিনুর,
হাজারো রাজার বাজার ফিরিয়া
দাম বেড়ে গেছে বহুদূর।
হাজার বছর বনের কিনারে
লুকানো নিথর পাথর মিনারে,
দরদী আঁখির আদর বিনারে
ধূসর ধুলায় পরিপুর,
ছিলে এতদিন আঁধার আধারে
আলোর আগার কোহিনুর!

প্রথম নিরিখে পরখ করিল
চোখা-আঁখ কে সে সুচতুর।
জানিনা কখন্ আদিম প্রভাতে
ধরা দিলে তুমি যেচে কার হাতে,
ধাঁধিয়া নয়ন অতুল প্রভা'তে
জগতে করিলে লোভাতুর।
অসত যুগের ঘুম ভেঙে কবে
জাগিয়া উঠিলে কোহিনুর!

সকল মণিরে কাচ করে দিলে
পলকে রচিয়া মায়াপুর।
যত মাণিকের আলোর বহর
আলোড়ি জহুরী চিনিল জহর,
দাম কেটে দিল ছুতোড়া মোহর,
সহরে সহরে মঞ্জুর।
অপলক-আঁখি রহিলে চাহিয়া
অতুল রতন কোহিনুর।

বাজিছে তোমার বন্দনা-গীতে
যুগজনমের সাধা সুর।
কনক-কিরীটে পাতিয়া আসন
পৃথিবী-পতিরে করিছ শাসন,
করে জগতের জীবন চয়ন
তোমার কিরণ সুমধুর।
চির যুগ ঢালো অফুরান আলো
হীরক-কমল কোহিনুর।

সরযূ সেন।

ভারতবর্ষে বায়োস্কোপ

অল্প দিনের মধ্যেই বায়োস্কোপ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিচিত ও লোকপ্রিয় হয়ে পড়েছে। বায়োস্কোপ ত কেবল মাত্র আনন্দ-দায়ক নয়, তা থেকে শিক্ষাও যে পাওয়া যায় প্রচুর। আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেবার সুবিধা থাকাতে বায়োস্কোপ য়ুরোপ-আমেরিকায় লোকশিক্ষার জন্য খুব ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হচ্ছে। স্কুলে কলেজে ছেলে-মেয়েদের বিশেষ বিশেষ বিদ্যার সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ শিক্ষা বায়োস্কোপের দ্বারা দেওয়া হয়; জনপদবাসীদের স্বাস্থ্যতত্ত্বের মহিমা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়; কৃষকদের উদ্ভিদ- ও কৃষি-তত্ত্ব অল্প সময়ে খুব ভালো রকমে মনে গেঁথে দেওয়া যায়। এই-সমস্ত সুবিধা ভারতবর্ষেরও ছাত্রছাত্রী জনপদ-বাসী ও কৃষকদের সামনে উপস্থিত করা উচিত।

কিন্তু করবে কে? ভারতবর্ষে সব-প্রথম বোধ হয় শ্রীযুক্ত হীরালাল সেন ও মতিলাল সেন বায়োস্কোপের ব্যবসায় অবলম্বন করেন; কতকটা মূলধনের অভাবে, কতকটা উদ্যমের অল্পতায় তাঁদের রয়াল বায়োস্কোপ এই ক্ষেত্রে প্রথম হয়েও প্রধান হয়ে উঠতে পারল না; সেদিন ত তাঁদের বায়োস্কোপের সরঞ্জাম সব পুড়ে গিয়ে তাঁরা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের দেখ্‌তা আরো দুচারজন বাঙালী বায়োস্কোপের কারবার চালাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে-সব দুদিন টিমটিম করেই নিবে গেছে। সকলকে কোণঠাসা করে' উপস্থিত হয়েছে পার্সী মদনের এলফিন্‌ষ্টোন বায়োস্কোপ। পেশওয়ার থেকে রেঙ্গুন আর মান্দ্রাজ থেকে দারজিলিং চৌহদ্দীর মধ্যে সকল বড় শহরে একাধিক আড্ডা খুলে বসেছেন। এই ব্যবসায়ে তিনি ধনী হচ্ছেন ভারতবাসীর টাকারই হাত-ফেরিতে;—আমাদের সকলকার পকেট থেকে টাকাটা সিকেটা চাঁদা নিয়ে তিনি একা গাঁদয়ান হচ্ছেন বটে, কিন্তু আমাদেব দেওয়া টাকার বেশীর ভাগ চলে যাচ্ছে বিদেশে ফিল্‌ম্‌-তৈরিব কারখানা-ওয়ালাদের হাতে। বিদেশ থেকে অর্থ আহরণ করে' দেশে আনতে না পারলে দেশ ধনী হয় না; আমাদের দেশের অল্প ব্যবসাদারই এই সহজ কথাটা বুঝতে পারেন। আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত দুটি পৌরাণিক নাটকের ফিল্‌ম্‌ তৈরি হয়েছে—সাবিত্রী-সত্যবান আর হরিশ্চন্দ্র। সাবিত্রী-সত্যবানের অভিনয় এবং অভিনয়স্থলে ও অভিনেতাদের উপর আলোক-সম্পাত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু পুরুষে মেয়ে সাজাতে আর দাড়িগোঁপগুলো মাত্রীর দরুন পেটো অস্বাভাবিক হওয়াতে অভিনয় দৃষ্টিকটু হয়ে শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে; হরিশ্চন্দ্র নাটকের অভিনয় সজ্জা সমস্তই অস্বা-



ন দ সাহা, হিন্দু রাজার সাজে।

ভাবিক ও উৎকট বর্ব্বর রকমের হয়েছে। এ ছাড়া দরবার প্রভৃতি সাময়িক ঘটনার কিছু কিছু ফিল্‌ম্‌ এলফিন্‌ষ্টোন বায়োস্কোপ এখানে তৈরি করিয়েছেন। কিন্তু এর কোনো টাই বিদেশে বেচে দেশে টাকা আনবার মতন নয়; বিদেশী

লোকেরা নিতে পারে আমাদের বর্ব্বরতা ও অক্ষমতা জগতের লোকের চোখের সামনে ধরবার জন্যে।

শুধু-চোখে যে-সব সাজসজ্জা আর অভিনয়-ভঙ্গী চলনসই বলে' চলে যায়, ক্যামেরার সূক্ষ্মদর্শী চোখের সামনে তা একেবারে অচল, তার সামনে সামান্য খুঁতও খুঁটি হয়ে চোখে বেঁধে। কাজেই অভিনয় সুন্দর শোভন আর সুদর্শন করতে হলে দক্ষ অভিনেতার ভাবভঙ্গী আর সুন্দর সাজসজ্জা যেমন স্বাভাবিক হওয়া দরকার তেমনি যে-



স ন গুহ ও আব্বাস আলি দ্বিতীয় সারে,
নিয়ও দি পেল নামক নাটক অভিনয়ে।

অধ্যক্ষ ফটোগ্রাফে সেই-সমস্ত ভাবভঙ্গী ধরে তারও রসবোধ আর সৌন্দর্য্যবোধ খুব তীক্ষ্ণ হওয়া আবশ্যক; প্রত্যেক দৃশ্য কিরূপ হলে শোভন হবে, আলোর কমবেশীতে অভিনয়ের পরিণামফল কেমন হবে, কোন্‌দিক থেকে কেমন করে' কোন্ ভাবভঙ্গীগুলি ফটোগ্রাফে ধরলে পরে দর্শকের প্রীতিকর হবে, কোন্ দৃষ্টি-কটু অংশ ত্যাগ করতে হবে, তা অধ্যক্ষই আন্দাজে ঠিক করে ক্যামেরা-ম্যানকে নির্দ্দেশ করতে থাকবে আর ক্যামেরা-ওয়ালা সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী ফটো তুলবে। নাটক-লেখকেরা একটা ঘটনা পরম্পরা খাড়া করেই খালাস হয়; সেটা হয়ত সংসাহিত্য হতে পারে, উত্তম শ্রাব্য কাব্য হতে পারে, কিন্তু দৃশ্য-কাব্য হিসাবে তাতে অনেক ত্রুটি থাকা সম্ভব। বড় বড় ফিল্‌ম্-কোম্পানির হাতে প্রত্যহ হাজারখানেক করে' নাটকের খসড়া আসে। সেইসব পড়ে' অধ্যক্ষকে বিচার করে' নির্ণয় করতে হয়, ছবিতে কোন্‌টা চলবে আর কোন্‌টা দাঁড়াবেও না; কোন্‌টার কতখানি আর কোথায়-কোথায় কেমন ভাবে বদল করলে ছবিতে অভিনয় ভালো দেখাবে। অধ্যক্ষ কেবল নাটক-রচনার ত্রুটি সংশোধন করেই নিষ্কৃতি পায় না, তাকে অভিনেতাদেরও তালিম করে তুলতে হয়; পাকা অভিনেতারা নিজেদের অভ্যাসের বশীভূত হয়ে নানা-রকম মুদ্রাদোষ আয়ত্ত করে, অধ্যক্ষকে সেইসব ত্রুটি সংশোধন করে দিতে হয়, সেইসব দোষ বাঁচিয়ে ছবি তোলাতে হয়।

ক্যামেরা-ওয়ালাও অধ্যক্ষের যোগ্য সহকারী হওয়া দরকার; কেমন আলোতে কেমন ভঙ্গীর ছবি নিলে ভালো উৎরাবে অধ্যক্ষের বিবেচনার সঙ্গে-সঙ্গে ক্যামেরা-ওয়ালার বিচারও তা নির্ণয় করে চলবে।

অধ্যক্ষের সব-চেয়ে কঠিন কাজ অভিনেতা নির্ব্বাচন। যে-রকম চরিত্র অভিনয় করতে হবে অভিনেতা যদি কতকটা সেই ধরণের লোক (type) না হয়, তবে অভিনয় নিখুঁত হয় না। ক্যামেরা বড় সূক্ষ্ম কড়া সমালোচক। হাজার সাজসজ্জা রং চিত্র করা সত্ত্বেও ক্যামেরার কাছে স্বভাব ঢাকা যায় না। যদি একজন ধার্ম্মিক সাধু ব্যক্তির জীবন অভিনয় করতে হয়, তা হলে কেবল মাত্র ধর্ম্মের বাহ্যিক বেশভূষা ও আচার অনুষ্ঠান বজায় রাখলেই হবে না, বা লোকটি সুশ্রী হলেও অভাব পূর্ণ হবে না; যদি অভিনেতা লোকটি নিজে ধর্ম্মানুরাগী না হয় ও তার মুখের ভাবে সাধুতার আভাস না ফুটে থাকে তবে তাকে ছবিতে ভণ্ড তপস্বীর মতন দেখাবে;—ঠিক এই-রকম হয়েছে এলফিন্‌স্টোন বায়োস্কোপের হরিশ্চন্দ্র ফিল্মে বিশ্বামিত্র আর বশিষ্ঠ;



স ন গুহ, তুর্কী সৈনিকের সাজে, ব্ল্যাক বক্স মিষ্টেরী নামক নাটক অভিনয়ে।

পাটের দাড়ি গোঁপ আর গেরুয়া কাপড়েও তাদের প্রাকৃত ভাব ঢাকা পড়েনি; তাদের হাত নেড়ে নেড়ে ঝগড়া, সে ত নিতান্ত বর্ব্বর অসভ্যদের মতন হাস্যকর ব্যাপার। যার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা পরিস্ফুট নয় তাকে দিয়ে ঋষি মুনি তপস্বীর অভিনয়ে তার ভণ্ডতাই বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এইজন্য আমেরিকায় য়ুরোপে কোনো আধ্যাত্মিক ব্যাপারের ফিল্ম্ তেমন উৎকৃষ্ট হয় না। সেখানকার মেয়েপুরুষ হাল্কা ভাবে চটুল অভিনয় করতেই দক্ষ। বায়োস্কোপ অভিনয়ে সাজসজ্জা রং চিত্র করাও একটা মস্ত আর্ট। দাড়ি-গোঁপ এমন করে লাগানো উচিত যেন ঠিক স্বাভাবিক দেখায়। লাল রং গালে ঈষৎ লাগালে শুধু-চোখে দেখতে সুন্দর দেখায়; কিন্তু ফটোগ্রাফে লাল রং কালো হয়ে ওঠে, তখন মনে হয় যেন গালে মেচেতা পড়েছে। সুতরাং রঙের বাহার বিচার করতে হবে ক্যামেরার চোখ দিয়ে। দক্ষ সাজকর হলে গালে কপালে দুটো চারটে বলি-রেখা চিত্র করে' প্রৌঢ়কে বুড়ো দেখাতে পারে; প্রৌঢ়ার বলিকুঞ্চিত চর্ম্মের উপর রং ভরাট করে যুবতীর নিটোল সৌন্দর্য্য প্রকাশ করতে পারে; কালোকে ফর্সা, আর ফর্সাকে কালো বানাতে পারে; একটু চেহারার আদল থেকে দুজন লোককে হুবহু একরকম সাজিয়ে তুলতে পারে. ইতিহাস-বিখ্যাত মহাপুরুষদের চেহারার সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে দিতে পারে;—আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কলন্ বা নেপোলিয়নের চেহারার অসাধারণ বিশেষত্ব পর্য্যন্ত ফুটিয়ে তুলে আশ্চর্য্যরকম দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়। এই আর্টটি শিক্ষাসাপেক্ষ; এদিকেও আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার।

ছবিতে অভিনয়ের আর-একটি প্রধান মনোযোগের বিষয় দৃশ্য নির্ব্বাচন। থিয়েটারের অভিনয়ে ষ্টেজের কৃত্রিম দৃশ্যেই কাজ বেশ চলে। কিন্তু ছবির অভিনয়ে কৃত্রিম দৃশ্য একেবারেই অচল, বড় চোখে বাধে। স্বাভাবিক দৃশ্যের মধ্যে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক রকমের অভিনয়ের ছবি তুলতে পারলেই নয়নের প্রীতিকর হয়। সুতরাং বায়োস্কোপ কারখানায়-গড়া কৃত্রিম জিনিস নয়; এর প্রত্যেক দৃশ্যে আর ভাবভঙ্গীতে প্রকৃতি ও প্রাণের পরিচয় বিকশিত হয়ে ওঠা চাই। যে লোক বস্তুতন্ত্রতার সঙ্গে শিল্পসুষমা যোগ করতে না পারে, যে দৃশ্যের সঙ্গে ইঙ্গিতে অভিনয়ের অন্তরগত গূঢ় অর্থ মিলিয়ে ধরে' তার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করতে না পারে, যে দেশকালপাত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করেনি, সে-লোক কখনো দক্ষ অধ্যক্ষ হতে পারে না। অতীত কালের বা ভিন্ন দেশের ঘটনাকে প্রকাশ করতে হলে অভিনয়ের আবেষ্টন ও পারিপার্শ্বিক সমস্ত খুঁটিনাটিকে সেই অতীত কালের বা ভিন্ন দেশের সাক্ষী করে তুলতে পারলেই ছবি সফল হবে। হরিশ্চন্দ্র নাটকের ফিল্ম্ কতক তোলা হয়েছিল কলকাতার চোরবাগানে রাজেন্দ্রমল্লিকের বাড়ীর মধ্যে ও বাড়ীর হাতায়, কতক কালীঘাটে মহীশূরের রাজার শ্মশান-ঘাটে, কতক দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর কাছে। এই-সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে এমন স্পষ্ট আধুনিকতা আছে যে তা দেখলে ঘটনার অতীত কালের সঙ্গে দৃশ্যের বর্ত্তমানতার বিরোধ হাস্য ও বিরক্তিই উদ্রেক করে।



স ন গুহ, মুসলমান সাজে।



স, ন, গুহ, মিশরী নর্ত্তকীর সঙ্গীরূপে, আঙার দি ক্রেসেণ্ট নামক নাটক অভিনয়ে।

শিক্ষাদানের গুরুভার নিতে হবে বায়োস্কোপ-ওয়ালাদের। জীবন্ত ছবির সাহায্যে গ্রাম্য নিরক্ষর লোকদের কৃষিতত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ইতিবৃত্ত, সারা জগতের কর্ম্ম ও চিন্তাধারা শিক্ষা দিতে হবে—সমস্ত অতীত বর্ত্তমানের সারা জগৎব্রহ্মাণ্ডটাকে তাদের ঘরের দরজার গোড়ায় এনে হাজির করতে হবে। তাতে তাদের মন সংস্কার-বিমুক্ত হয়ে ক্ষুদ্রতা পরিহার করতে শিখবে—বৃহতের বেগের গতির পরিচয় পেয়ে তারা নিজেরাও বৃহৎ ও বেগবান হয়ে উঠবে, নব নব আশা-আকাঙ্ক্ষায় তাদের মন উদ্বেলিত হতে থাকবে।

এই কাজ যদি একার অসাধ্য বোধ হয়, দশের সম্মিলনে তা সুখসাধ্য হবে। এই কর্ম্ম সম্পাদনের জন্যে দশে মিলে সমবায় বা কোম্পানি গড়ে জুড়ে কাজে ভিড়ে যাবার

ধ্যানরসিক আর ভাবুক বলে' জগৎময় ভারতবাসীর একটা নামডাক আছে। সেই ভাবুকতার বলে আমাদের দেশের কবিরা পুষ্পক-রথ, আগ্নেয়াস্ত্র, জৃম্ভকাস্ত্র প্রভৃতির কল্পনা করেছিলেন, যা এখন য়ুরোপ যন্ত্রবিজ্ঞানের বলে গড়ে' দেখাচ্ছে; সেই ভাবুকতার বলে আমাদের দেশে জ্যোতিষ চিকিৎসা প্রভৃতি বহুবিদ্যার গোড়াপত্তন হতে পেরেছিল, যা উন্নততর হয়ে উঠেছে য়ুরোপের যন্ত্রবিজ্ঞানের বলে। এখন ধুয়া গাইবার সময় এসেছে—য়ুরোপ যন্ত্র তৈরি করে নিয়ে এসে হাজির হয়েছে, আমাদের ভাবুকতা আর কল্পনা তার সঙ্গে জুড়ে আমাদের দেশের যুগযুগান্তর-সঞ্চিত চিন্তা ও কর্ম্মের জীবন্ত ছবি জগতের চোখের সামনে ধরতে হবে। সমস্ত জগৎ ভারতের জীবন-ধারার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে, এই সুযোগে জগতের সামনে আমাদের বেরিয়ে দাঁড়ানো দরকার। তাতে আমাদের দেশের দারিদ্র্যমোচনেরও একটা পথ খোলসা হতে পারবে।

আমাদের দেশে শতকরা ৯৫ জন লোক একেবারে নিরক্ষর, কিন্তু তারা অশিক্ষিত নয়। কারণ, পুরাণ-কথায় আর ধর্ম্ম-বিধানে অভিজ্ঞ সুকণ্ঠ সুরসিক কথকেরা গ্রামে-গ্রামে ঘুরে দেবালয়ের নাটমন্দিরে বা বারোয়ারি-তলায় কথকতা করে বেড়াতেন; গ্রামের লোক তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে ফেলে সেখানে এসে জড়ো হত, কানে শুনে-শুনে তাদের বহু বিষয়ের শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ হত। এখন এই



ক্যামেরার কাছে ক্যামেরাম্যান। তার ঠিক পরের লোকটি—কীন-ষ্টোন ফিল্ম্ কোম্পানির প্রেসিডেণ্ট ডিরেক্টার জেনারেল, যিনি হিন্দু পোষাকে "চার্লি চ্যাপলিন" করেছিলেন। তার পরে (দাঁড়াইয়া) ব, দ, পাতেল; স, ন, গুহ; (বসিয়া) নিরূপমচন্দ্র গুহ এবং মোগল খাঁ।

[এই ছবিখানি হার্পার ব্রাদার্স প্রকাশিত এবং রবার্ট ই ওয়েলশ কর্ত্তৃক লিখিত A. B. C of Motion Pictures নামক পুস্তক হইতে গৃহীত।]

সময় এসেছে। এক-এক প্রদেশের সমস্ত স্কুল চাঁদা করে' এই কাজের সূত্রপাত করতে পারে; সেই চাঁদায় কেনা আর তৈরি যন্ত্রপাতি নিয়ে তাদের নিযুক্ত লোক পালা করে' গ্রামে-গ্রামে ফিরে স্কুলের ছেলেমেয়েদের ও তাদের পাড়া-প্রতিবাসীদের ইতিহাস ভূগোল উদ্ভিদবিদ্যা জীববিদ্যা স্বাস্থ্যতত্ত্ব কৃষিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে বেড়াবে আর তার বদলে কিছু-কিছু দক্ষিণা সকলে দেবে। এই-রকম করে দেশে শিক্ষা ও বিদ্যার বিস্তার হতে পারবে। আজকাল একের চেষ্টায় বৃহৎ অনুষ্ঠান হবার আর জো নেই, দশের সমবায়ে সব কাজ করতে হবে; দশের সম্মিলিত চেষ্টা আর ইচ্ছাতেই দেশ ও জাতি প্রবল ও প্রধান হয়ে উঠবে। এই-রকম চেষ্টার ফলে আমেরিকায় বহু লোক সামান্য অবস্থা থেকে হঠাৎ কোটিপতি হয়ে উঠেছে।

আমেরিকায় আমাদের দেশের অনেক লোক বায়োস্কোপে অভিনয় করতে সুরু করেছেন। এদেশে কেউ এই ব্যবসায়ের চেষ্টা করলে তাঁদের কাছ থেকে উপদেশ আর সাহায্য পেতে পারবেন।

চারু।

পঞ্চশস্য

শিশুর চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা—

আমেরিকার আদিম বাসিন্দা লাল লোকদের একটি পাঁচ বছরের ছেলে স্যাম্প্‌সন্ সিম্প্‌সন্ কোনো লোককে ছবি আঁকতে না দেখে নিজে থেকেই কাগজ কেটে ছবি আঁকার শক্তির অদ্ভুত পরিচয় দিয়েছে। সে কাগজের উপর বস্তুর আকার দেগে না নিয়েই একেবারে কাঁচি চালিয়ে ছবির আকৃতি কেটে বার করে। তার কাঁচি-কাটা কাগজের ছবিগুলির প্রত্যেকটিতেই গতির ভঙ্গী থাকে; সমস্ত প্রাণীর ছবিরই হাঁটু স্পষ্ট করে আঁকে এবং গতির বেগে হাঁটু বেঁকে থাকে। প্রত্যেক প্রাণীর গতির ভঙ্গী চমৎকার স্বাভাবিক হয়। ময়ূরের দৌড়, মাছের সাঁতার, কুকুরের খেলা, ছেলের ছুট, বুনো ঘোড়ার উপর দক্ষ সওয়ার, তিতির পাখীর চলা, মোরগের রাগ, শিকারীর বন্দুক দাগা, খরগোশের পলায়ন, মোটা শূওরের চলা প্রভৃতি সে কাগজ কেটে আশ্চর্য্য-রকম দক্ষতার সহিত প্রকাশ করতে পারে। এই শিশুটি যে-জাতির ও যে বংশের তারা অসভ্য, যুগযুগান্তের শিল্পসাধনার ধারা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আসছে না; তাদের মধ্য থেকে এই অদ্ভুত দক্ষ শিল্পী ছেলের অশিক্ষিত-পটুত্ব দেখে বহু লোক আশ্চর্য্য হয়ে গেছে। আর্ট ওয়ার্লড্ নামক শিল্পবিষয়ক মাসিক কাগজে এই শিশুশিল্পীর বিবরণ বেরিয়েছে।



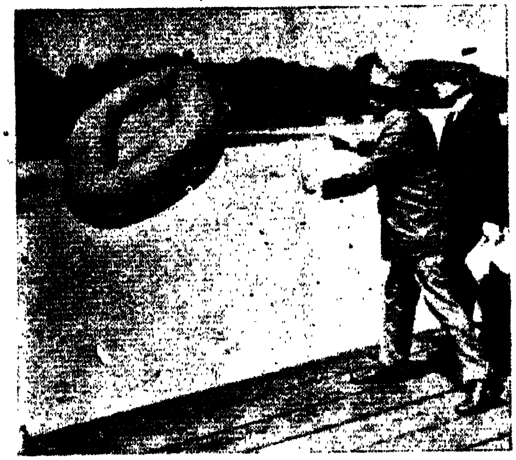
পাঁচ বছরের ছেলের তৈরী কাগজ-কাটা ছবি।

দুধে রসুনে-গন্ধ—

বর্ষার মুখে মাঠে একরকম বুনো পেঁয়াজ-রসুনের গাছ হয়, তাকে আমাদের দেশে রসুনে ঘাস' বলে; সেই গাছের ডগা গোরু খেলে গোরুর দুধে রসুনে গন্ধ হয়। আমেরিকার কৃষিবিভাগ সন্ধান করে দেখেছেন যে, গোরু চরে' আসার চার ঘণ্টা পরে দুধ দোওয়া হলে দুধে আর গন্ধ থাকে না; যদি বা একটু থাকে, দুধ দুয়ে চার ঘণ্টা রেখে দিলে আর কিছুই টের পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের গোয়ালাদের এটি জানিয়ে দেওয়া উচিত।

মুড়ে-রাখা হাল্কা প্রাণ-বাঁচাই নৌকা—

জার্ম্মানী সাপ হয়ে কামড়ায় আবার রোজা হয়ে ঝাড়ায়। জার্ম্মানী ডুবো জাহাজ দিয়ে চোরা গোপ্তা জাহাজ ডুবিয়ে লোকের প্রাণ বধ করবার পথ দেখিয়েছে; এখন আবার জাহাজডুবি হলে তা থেকে নৌকায় (লাইফ-বোটে) করে বাঁচবার সহজ উপায়ও সে-ই বার করেছে। সায়েন্টিফিক আমেরিক্যান কাগজে এর একটি বিবরণ বেরিয়েছে। বার্লিনের হ্যার্ মেয়ের নামক এক ব্যক্তি এই নৌকা উদ্ভাবন করেছেন। এই নৌকাটির মাঝখানের পাটাতনটি কাঠের, ৪ হাত লম্বা, ২ হাত চওড়া; তার পাশের বেড়টি ফাঁপা রবারের নলের; পাটাতন আর বেড় মুড়ে-সুড়ে ছোট একটি পুঁটুলি বেঁধে রাখা যায়; দরকার হলে পাটাতন ছড়িয়ে তার পাশে বেড়টি লাগিয়ে বেড়টিতে বাতাস ভরে ফুলিয়ে তুলতে দু-তিন মিনিট সময় লাগে। এই নৌকা মুড়ে রাখলে এর ওজন মাত্র সাড়ে সাত সের; কিন্তু একে ফুলিয়ে ভাসালে ৯-১০ মণ ভার বইতে পারে। অকস্মাৎ রবারের নল ফুটো হয়ে গেলে হুস করে বাতাস বেরিয়ে যায় না, ধীরে ধীরে বাতাস বেরোয়, তাতে মেরামত করে নেবারও সময় পাওয়া যায়। এই নৌকার চড়নদারেরা দাঁড় বা হাত দিয়ে জল টেনে নৌকা চালাতে পারে। এই নৌকাতে বেশী লোক চাপলেও উল্টে বা ডুবে যাবার ভয় নেই;—নৌকার তলাতেও জলের উপর খোল থাকাতে সেখানকার বাতাস চাপ পেয়ে যে পরিমাণ বেরিয়ে যেতে থাকে সেই পরিমাণ জল তলায় এসে নৌকাকে অবলম্বন জোগায়; যদি এমনই



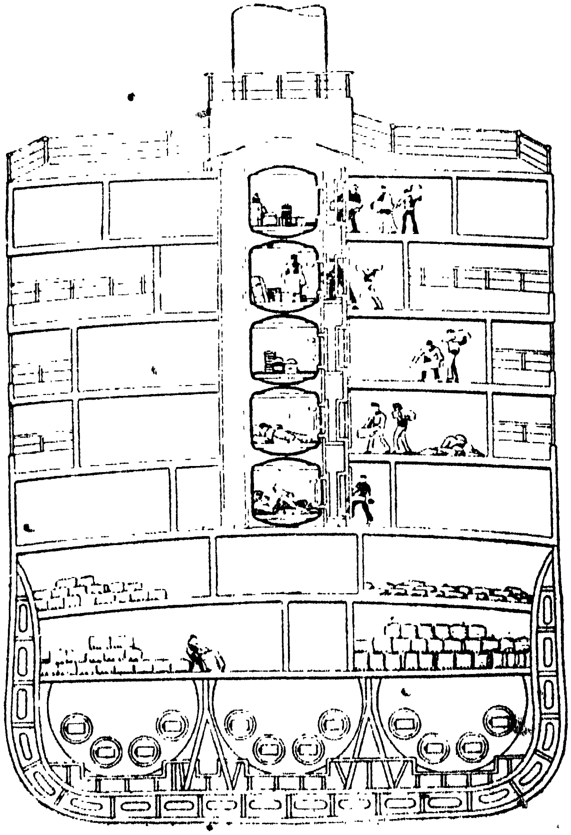
প্রাণ-বাঁচাই মুড়ে-রাখা নৌকা ভাসানো।



প্রাণ-বাঁচাই মুড়ে-রাখা নৌকায় ৫০ জন লোক চাপিয়াছে।



প্রাণ-বাঁচাই নৌকা মুড়িয়া থলিতে ভরিয়া পৃষ্ঠে বহন।



জাহাজে ভাসন্ত সিন্দুক রাখিবার নক্সা।

ভার চাপে যে নৌকা আর ভেসে থাকতে না পেরে জলের মধ্যে তলাতে থাকে, তা হলে চড়নদারেরা জলের সঙ্গে ঠেকবামাত্র যেমন একটু হাল্কা হয়ে নৌকা থেকে আলগা হয়ে ওঠে অমনি নৌকাও আবার ভেসে ওঠে। নৌকার পাশে পাশে অনেকগুলি হ্যাংটা লাগানো থাকে; তাই ধরে ধরে অনেক লোক নৌকায় ভার না বাড়িয়ে জলের উপর ভেসে থাকতে পারে। এই নৌকা জলে ভাসাতেও কোনো বেগ পেতে হয় না. এর উপর নীচ ছবিদুটো [illegible] এর আর উল্টা সোজা।



জাহাজডুবির পর ভাসন্ত সিন্দুক, ইহা কিছুতেই ডোবে না।



লম্বা-শিং-ওয়ালা গোরু।



ধোঁয়ার আড়ালে যুদ্ধ-জাহাজ।

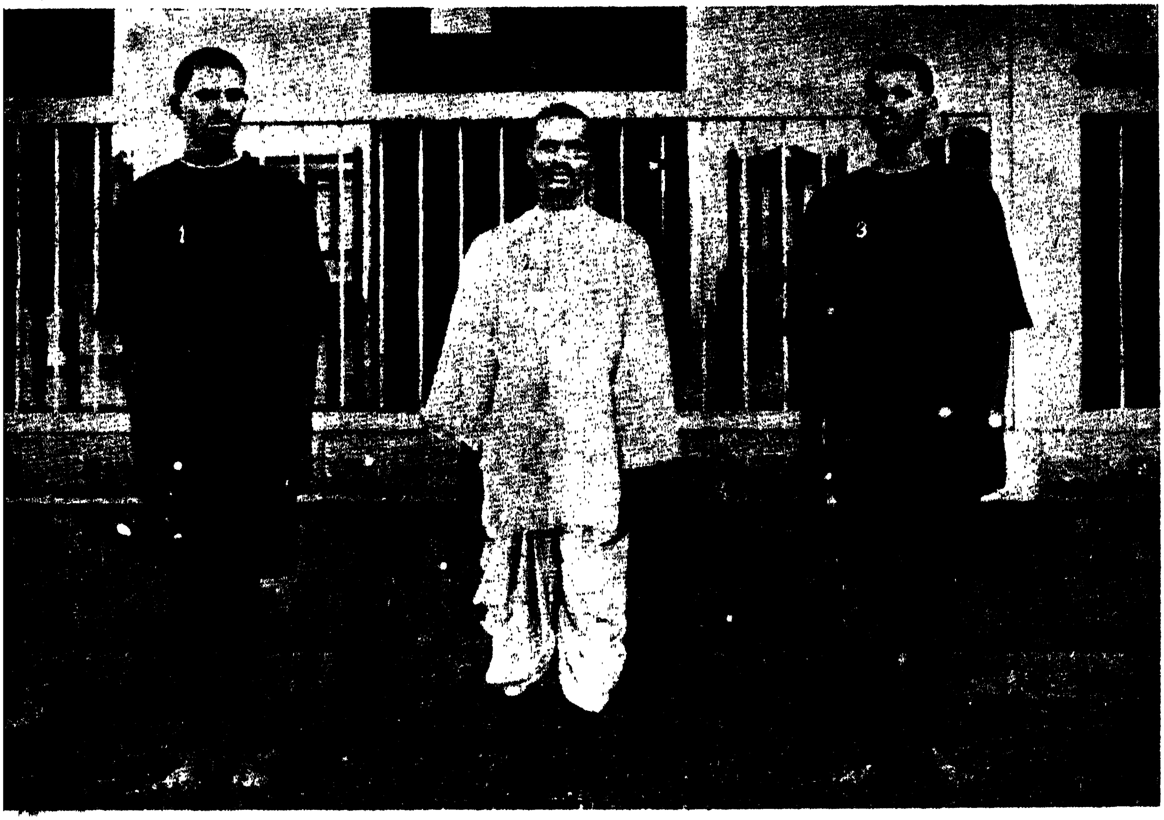
নেই ; জলে ছুড়ে ফেলে দিলেই হল, যে-পিঠ উপরে করে' যেমন হচ্ছে ভাসুক তাতে কিছু আসে যায় না। এই নৌকার উদ্ভাবনকর্ত্তা এখন আবার বড় ধরণের নৌকা গড়েছেন ; তার ওজন ২ মণ ৩০ সের ; কুড়ি ফুট লম্বা, দশ ফুট চওড়া ; ২৭৫ মণ ভার বইতে পারে ; নৌকার খোলে পাটাতনের উপর ৫০ জন ও বেড়ের রবার নলের উপর ঘোড়ায় পিঠে চড়ার মতন করে বসে' আরো ১০০ জন লোক যেতে পারে।

লম্বা-শিং-ওয়ালা গোরু—

আমেরিকায় আর ইংলণ্ডে আগে লম্বা-শিং-ওয়ালা গোরু অনেক দেখা যেত, ক্রমে তাদের বংশ লোপ পেয়ে আসছে। তাদের বদলে এখন খাটো-শিঙের গোরু বেশী হয়েছে। এক-রকম গোরুর মোটেই শিং হচ্ছে না। তারাই বোধ হয় ভবিষ্যতে প্রধান হবে। এখন আমেরিকা আর ইংলণ্ডে লম্বা-শিং-ওয়ালা গোরুর নমুনা দু-চারটি জীইয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। আমেরিকার আদিম অধিবাসী লাল মানুষই শাদা মানুষের চাপে লোপ পেয়ে গেল। কিন্তু শাদা মানুষদের মানব-প্রীতি অপেক্ষা পশুপ্রীতি সময় সময় প্রবল হয়ে ওঠে, তাইকি গোরু কটা বেঁচে থাকতে পেলেও পেতে পারে।

ধোঁয়ার আড়াল—

আজকালকার যুদ্ধে ঘন ধোঁয়ার আড়ালে থেকে শত্রুর দৃষ্টি রুদ্ধ করে এগিয়ে বা পিছিয়ে যাওয়া একটা প্রধান প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সায়াণ্টিফিক আমেরিক্যানের মতে এই উপায় আমেরিকার বহর হতে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। জাটল্যাণ্ডের জলযুদ্ধে জার্ম্মানরা এই উপায় অবলম্বন করেছিল ; এডমিরাল জেলিকোর অধীনের ব্রিটিশ বহরের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে জার্ম্মান জাহাজের বহর ধোঁয়ার আড়াল দিয়ে পালিয়ে যায়। এই ধোঁয়া জাহাজের চিমনী থেকেই ছাড়া হয় এবং সেই ধোঁয়া ঘন হয়ে জমে অন্ধকার দেয়াল রচনা করে দ্যায়।



জমখিড়ী দোড়ের বাজিতে

১ম হুসেনী মদরখিড়ী। ২য় রাচয্যা পূজারী। ৩য় বালু মানে।

জাহাজে ভাসন্ত সিন্দুক—

যুদ্ধের সময় জাহাজডুবিতে জান ও মাল দুইএরই লোকসান হয়। জান বাঁচাবার জন্যে কতবিধ উপায় রোজ-রোজ উদ্ভাবিত হয়ে চলেছে—ভাসন্ত ভেলা, লাইফ-বোট বা প্রাণ-বাঁচাই নৌকা, নিত্য নূতন উন্নততর পদ্ধতিতে নির্ম্মিত হচ্ছে। এতদিনে জানের সঙ্গে মাল বাঁচাবারও উপায় করা হয়েছে। নিউইয়র্কের পপুলার সায়ান্স মান্থলী পত্রিকায় এর বিবরণ বেরিয়েছে। মেনোটি নান্নি নামক একজন লোক একরকম ভাসন্ত সিন্দুক তৈরি করেছেন; সেই সিন্দুক অনেকগুলি করে' জাহাজে থাকবে; চড়নদারদের সমস্ত দামী মাল সেই-সব সিন্দুকে রাখা হবে, জাহাজ-ডুবি হলে সেই সিন্দুকগুলি জলে ভাসতে থাকবে, অন্য কোনো জাহাজ সেগুলি তুলে নিতে পারবে; দামী জিনিসগুলো নাহক সমুদ্রের তলায় ডুবে গিয়ে নষ্ট হবে না। জিনিসগুলো মালিক যদি ফিরিয়ে নাও পায় তবু অন্য মানুষের কাজে ত লাগবে। এই সিন্দুকে ডাকের রেজেষ্টারী ইনসিওর করা চিঠিপত্র পার্শেল রেখে দিলে জরুরী ডাক মারা পড়বার সম্ভাবনা অনেকাংশে দূর হবে। অনেক সময় ভরা-ডুবি জাহাজ থেকে মাল তুলতে যে কষ্ট ও ব্যয় করতে হয়, তাতে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যায়; এখন এই সিন্দুকের কল্যাণে সেসব লেঠা আর পোহাতে হবে না। নান্নি এইরূপ প্ল্যান করেছেন যে জাহাজের মাঝখানে একটা কূপের মতন খাড়া ডহরা ইস্পাতের খোলের মধ্যে সিন্দুকগুলি উপরাউপরি রাখা থাকবে; ইস্পাতের খোলের মাথায় একটা আল্গা ঢাক্না থাকবে; জাহাজের প্রত্যেক তলা থেকে এক-একটি সিন্দুকে যাবার দরজা থাকবে; নীচের দুটো সিন্দুকে ডাক আর দামী মাল রাখা হবে; বাকী তিনটেতে প্রথম দ্বিতীয় আর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দামী জিনিস রাখা হবে; প্রত্যেক সিন্দুকের দোহারা দরজার সামনে এক-একজন গার্ড থাকবে, চড়নদারদের দরকার-মতন তারা সিন্দুক থেকে তাদের জিনিস বার করে দেবে আবার রেখে দেবে। জাহাজ ডুবে গেলে কূপের মুখের উপরকার আল্গা ঢাকনিটা ভেসে উঠবে; অমনি কূপের খোল জলে ভর্ত্তি হয়ে যাবে, আর সিন্দুকগুলি উপরে ঠেলে উঠে ভেসে উঠবে। তারপর অন্য কোনো জাহাজ সেইসব সিন্দুক দেখতে পেলে উঠিয়ে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেবে, সিন্দুকের গায়ে জাহাজ আর কোম্পানির নাম লেখা থাকবে। ডাক আর মালের পাঁচটা সিন্দুক ছাড়া সবার তলায় জাহাজের সঙ্গে কাছি দিয়ে বাঁধা আর-একটা সিন্দুক থাকবে, সেটা জাহাজের উপরে বয়ার মতন ভাসবে; তা দেখে বুঝতে পারা যাবে কোন্ জাহাজ ডুবেছে আর জাহাজখানা এখন কোথায় আছে, সেখানাকে আবার তুলে ভাসানো চলবে কি না।

শান্তির সময়ও দৈবদুর্বিপাকে অনেক জাহাজ ডুবি হয়; টাইটানিক জাহাজ বরফের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবেছিল; জাহাজে-জাহাজে ধাক্কা লেগে অনেক ডোবে; ঝড়তুফানেও [illegible] মারা পড়ে। এক ব্রিটিশ

উপকূলেই বছরে ১৪ কোটি টাকার মাল জাহাজডুবিতে নষ্ট হয়; যুদ্ধের সময় ত কথাই নেই। লুসিটানিয়া জাহাজে ৪০ লক্ষ টাকার সোনা আর জহরাত এবং অন্যান্য মাল ছিল। নাম্রির উদ্ভাবনের কল্যাণে এই টাকাটা বেঁচে যাবে।

দর্শন-নল ছাড়া ডুবো জাহাজ—

ডুবো জাহাজ বা সাবমেরিন দর্শন-নল বা পেরিস্কোপ জলের উপরে উঁচু করে তুলে দেখে নেয় চৌহদ্দীর মধ্যে কোথায় শত্রুর জাহাজ আছে; এটা তার পক্ষে বিপদ জনক; কারণ শত্রু তার চোখে টিক করে কামান দেগে তাকে কাণা করে জখম করে দিতে পারে, ডুবিয়েও দিতে পারে চাইকি। জার্ম্মানী দর্শন-নল তুলে দিয়ে এই অসুবিধার প্রতীকার করেছে। ডুবো জাহাজের দুপাশে দুখানা লেন্স বা আতসী কাচ আঁটা থাকে এবং তার সামনে কতকগুলি আয়না সাজানো থাকে; তাইতেই জলের তলায় যে আলো এসে পড়ে তাই প্রতিফলিত হয়ে উপরকার সমস্ত স্পষ্ট দেখিয়া দায়। এতে অবশ্য ডুবো জাহাজকে জলের উপর-তলের খুব কাছ-ঘেঁসে ভেসে চলতে হয়। লেন্সের মধ্য দিয়ে রাত্রিকালে খুব জোরালো সন্ধানী আলো বা সার্চ-লাইটও ছাড়া যায়।

দৌড়ের বাজি—

মহারাষ্ট্র দেশে জমখিণ্ডী নামে একটি করদ মিত্ররাজ্য আছে। সেখানকার 'শ্রীমন্ত রামচন্দ্ররাও আপ্পা সাহেব রাব' দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে গত পয়লা জানুয়ারীতে নানাবিধ খেলার প্রতিযোগিতার মধ্যে ৩০ মাইল দৌড়ের এক বাজি স্থির করে ভারতবর্ষের সকল দেশের লোককে আহ্বান করেছিলেন। ছ মাস ধরে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। অনেক লোক এই প্রতিযোগিতায় ভর্ত্তি হয়েছিলেন। দৌড়ের এত বড় বাজি ভারতবর্ষে এর আগে আর হয়নি;—শ্রীযুক্ত সদাশিব বিশ্বনাথ দত্তর ২৭ মাইল পর্য্যন্ত ২ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ২২ সেকেণ্ডে দৌড়েছিলেন। এই বাজির দৌড় আরম্ভ হবার সময় বারোজন রওনা হয়েছিলেন; ৩০ মাইলের শেষ পর্য্যন্ত যেতে পেরেছিলেন মাত্র তিনজন। প্রথম যিনি সীমায় পৌঁছান তাঁর নাম শ্রীযুক্ত হুসেনী মদরখিণ্ডী, ৩ ঘণ্টা ১৬ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড সময়ে ৩০ মাইল দৌড়ে যান। দ্বিতীয় রাচয্যা পুজারী ৩০ মাইল গিয়েছিলেন ৩ ঘণ্টা ১৭ মিনিটে; অর্থাৎ প্রথমের চেয়ে মাত্র ১৫ সেকেণ্ড দেরীতে। তৃতীয় বাসু মানে ৩০ মাইল দৌড়েছিলেন ৩ ঘণ্টা ২১ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডে। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি জমখিণ্ডী-রাজসরকারের ভৃত্য; দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ রাজ্যের কড়পটি গ্রামের বাসিন্দা। এঁরা যথাক্রমে ১২০৲, ৯০৲ আর ৬০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। এঁদের বিবরণ ও ছবি হিন্দী চিত্রময়-জগৎ নামক পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হল।

য়ুরোপে ম্যারাথনের সার্ব্বভৌম দৌড়ের বাজিতে এ পর্য্যন্ত যাঁরা প্রথম হয়ে নাম রেখেছেন তাঁদের কৃতিত্বের বিবরণ ১৩২২ সালের পৌষ মাসের প্রবাসীর ২৩৫ পৃষ্ঠায় এইরূপ দেওয়া হয়েছে—হেইস ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ দৌড়ান ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ১৮⅖ সেকেণ্ডে; ম্যাক আর্থার ও গিটশ্যাম ২৫ মাইল দৌড়ান যথাক্রমে ২ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট ৫৪·৪ সেকেণ্ড ও ২ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ৫২ সেকেণ্ডে। দত্তর দৌড়ান ২৭ মাইল ২ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ২২ সেকেণ্ডে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই জমখিণ্ডী-দৌড়ই জগতের মধ্যে সব চেয়ে লম্বা ও কৃতিত্বের দৌড়। এই তিনজন দৌড়ুনেক লোককে বরাবর অভ্যাস করিয়ে যুদ্ধের পর য়ুরোপের ম্যারাথন দৌড়ে প্রতিযোগিতা করতে পাঠাবার জন্যে জমখিণ্ডী-রাজের আয়োজন ও উদ্যোগ করা উচিত। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ সকল জগৎবাসীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে পারলেই জগৎসভায় যে সম্মানের আসন পাবে; আর তাকে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য হয়ে থাকতে হবে না।

চারু।

পাগ্‌লা

কোথাকার পাগ্‌লা এল
　　আজি ঐ গগন-মাঝে,
মাথাতে পাগ্‌ড়ি মেঘের
　　নয়নে তড়িৎ নাচে!
ঢেকেছে দিনের হাসি,
　　এনেছে কালোর রাশি,
ডমরুর তালে তালে
　　মুখে তার অট্ট হাসি!
মাতনের ঢেউ তুলেছে,
　　সজোরে ছুড়ছে গোলা,
শিহরি কাঁপ্‌ছে জগৎ
　　দিয়েছে মস্ত দোলা!
হাসিতে আগুন ছুটে
　　নিনাদে বজ্র টুটে,
মাতনে বিশ্ব-জুড়ে,
　　জড়তা শিউরে উঠে!
বাহিরে রুদ্র তালে
　　এসেছে কি এক পাগল,
ঘরে নে নেরে তারে
　　নিসাড়ে করুক উতল!
পরাণে নাচিয়ে দেরে
　　পাগলের তাথৈ নাচে,
লাফায়ে মাত্‌না জেগে,
　　মরণে রাখ্‌না পাছে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

চীনি

পূর্বোক্ত বাড়ই একটা বড় কথা বলিয়াছে, "আজিকালিই দেশে চীনির চলন হইয়াছে। আগে সব কাজ গুড় হইতে করা হইত।" বাস্তবিক রুচি-পরিবর্তনই আমাদের অনেক অনিষ্টের হেতু। এই পরিবর্তন অল্পে অল্পে বহুকালে ঘটিলে দেশে তদনুরূপ আয়োজন হইতে পারিত। দেশ কাজে "সভ্য" না হইয়া ব্যবহারে "সভ্য" হইয়া পড়িয়াছে। সে-দিন বঙ্গদেশের মনে হইল, 'তাই ত বিদেশী চীনি খাইতেছি'; অমনই "বিদেশী-বর্জন" প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিল না। স্বদেশী জিনিস নাই, যাহা নইলে সাধারণ মানুষ চলিতে পারে না, তাহা পাইবার উপায় না করিয়া হঠাৎ "বিদেশী-বর্জন" প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইতে পারে না। 'বিলাতী চীনি খাইব না' বলিলেই স্বদেশী চীনি জন্মে না। ইহার বিপরীত বরং সত্য। 'দেশী চীনি খাইব,' —এই প্রতিজ্ঞা করিলে দেশী চীনি বরং উৎপন্ন হইতে পারে। আমরা ক্রোধ বশে এক একটা কর্ম না করি, এমন নহে; কিন্তু অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যে ক্রোধ জন্মে, তাহা উপশান্ত হইতে অধিক কাল লাগে না। স্বদেশ, এই জ্ঞান জন্মিলে ভক্তি আসিত, ভক্তি হইতে কর্ম আসিত। তখন 'দেশী চীনি কেন চাই', এ তর্কই উঠিতে পারিত না।

গুড়ে অখাদ্য কিছুই নাই। পুরানা হইলে গুড় বিকৃত হয়; তখন নূতনের স্বাদ ও গন্ধ থাকে না। কিন্তু তাহাতে দেহের অহিতকর হয় না। বরং আয়ুর্বেদ বলেন, পুরাতন তণ্ডুলের ন্যায় পুরাতন গুড় "পথ্যতম" (most wholesome)। এ বিষয় পরে দেখা যাইবে। আমরা কতক গুড় নূতন বেলা খাইয়া ফেলি, কতক গুড় পরে খাইব বলিয়া রাখিয়া দি-ই। কতক গুড়ে মুড়কী ঝিলাপী প্রভৃতি গ্রাম্য ময়রার কাজ হয়, কতক গুড়ে দলুয়া চীনি হয়। যে গুড় হইতে দলুয়া বা ভুরা চীনি হয়, বা আরও নির্মল ও বি-মল দোবারা চীনি করিতে পারা যায়, সে গুড় অবশ্য শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ দ্বারা নিকৃষ্ট কর্ম-নির্বাহ যুক্তি-সঙ্গত নহে। যখন গুড় নানাবিধ হইয়া থাকে, তখন বাছিয়া নিকৃষ্টকে নিকৃষ্ট কর্মে, এবং উৎকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট কর্মে প্রয়োগ কর্তব্য। এই নীতি পালিত না হইতেছে, এমন নহে। তবে বোধ হয় আর একটু বুঝিয়া পালিত হইলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হইত।

পূর্বে দেখা গিয়াছে, যে গুড়ে ইক্ষু-শর্করা যত অধিক, সে গুড় তত ভাল। যদি গুড়ে কেবল ইক্ষু-শর্করা থাকিত, তাহা হইলে তাহা উৎকৃষ্ট চীনি নাম পাইত। কিন্তু সযত্নে গুড়ের গাদ অর্থাৎ মল কাটাইলেও কিছু রহিয়া যায়। এই মল ছাড়া উন-শর্করা-রূপ 'খল' দুর্জনের ন্যায় অনাবশ্যক আসিয়া জোটে। এই 'খল' (foreign matter) যেটা আমরা চাই না, সেটা চীনি করিতে বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু উন-শর্করাও অখাদ্য নহে, ইক্ষু-শর্করা অপেক্ষা কম বলকর ও পুষ্টিকর নহে। অতএব সম্বৎসরের খাবার গুড় রাখিতে হইলে ভিঁড়া (বা ভেলী) করিয়া রাখাই শ্রেয়।* উহা শুষ্ক; বর্ষাকালে একটু রসে বটে, কিন্তু গুড়ের মতন বিকৃত হয় না। ইহাতে গাদ ব্যতীত আখের রসের কিছুই ফেলা যায় না। তবে, চটে করিয়া রাখা কর্তব্য নহে। গুড় রাঁধিবার সময় নূতন নাঁদায় ভরিয়া গরম গরম থাকিতে থাকিতে নাঁদার মুখে ওলোপ কর্তব্য। গুড়ের নাঁদারও মুখে উত্তম রূপে ওলোপ দেওয়া কর্তব্য। কেবল পীপিড়ার

---

* জর্মান দেশে ঘরে খাবার গুড়কে ভিঁড়া করিয়া রাখে। গুড়ের বাইনের গুড় তাওয়ায় তুলিয়া ৬০—৯০ শতাংশে, অর্থাৎ ফুটন্ত জলের কম উষ্মায় রাখে। গুড়ের জল শুখাইয়া যায়; তখন ভাঁড় বা ভেরীতে ঢালিলে সব কেলাসিত পিণ্ডে পরিণত হয়। ইহার নাম 'melis' or lump-sugar। কিন্তু পূর্বোক্ত বাড়ই বলিয়াছে, ভিঁড়া বিক্রয়ে লাভ থাকে না। কারণ তাহার মতে দুই শের গুড় মারিলে এক শের ভিঁড়া হয়। অথচ গুড়ের শের যখন ।০ আনা, তখন ভিঁড়ার শের ।৵০ আনা মাত্র। আমার অনুমানে দুই-ই ভুল। কেবল জলের ভাগে, গুড় ও ভিঁড়ায় প্রভেদ। গুড়ের শতকে ১০।১২ হইতে ১৮।২০ ভাগ, এবং ভিঁড়ায় ৩।৪ হইতে ৭।৮ ভাগ জল থাকে। গুড়ের শতকে ১৫, এবং ভিঁড়ার ৫ ভাগ জল ধরিলে মণকে ৬শের ও ২ শের হয়। অতএব ১ মণ গুড়ে বাস্তবিক ৩৪ শের, এবং ১ মণ ভিঁড়ায় ৩৮ শের গুড় থাকে। তবেই গুড়ের শের ।০ আনা হইলে ভিঁড়ার ।৵০ আনা হইবার কথা। গত ফাল্গুন মাসে কলিকাতায় উত্তম গুড় ৭৷৷০, মধ্যম ৬৷৷০—৭৲, এবং উত্তম ভেলী ৮৲, মধ্যম ৭—৭৷৷০ টাকা দর ছিল। উত্তমে উত্তমে তুলনা করিলে দরে ১৫:১৬ পড়ে। কিন্তু ভিঁড়ার দর কম হইবার কথা। কারণ গুড় করিতে বাড়ই ভাল চাই, আখের জাত ও রস ভাল চাই। সাধারণতঃ ভেলীতে উনশর্করার ভাগ বেশী থাকে। উনশর্করা, ইক্ষুশর্করার সমান মিষ্ট নহে। পশ্চিমবঙ্গে ভিঁড়া করা হয় না বলিয়া বাড়ই ঠিক দর করিতে পারে নাই। কটকে ভেলী সস্তা। যখন গুড়ের সের ।০ আনা, তখন ভেলী ৵০ মাত্র। দক্ষিণে ও উত্তরে ভেলী প্রচুর জন্মে। সেই ভেলী এখানে আসে, অথচ দরে সস্তা পড়ে।

আক্রমণ নহে; অশেষরোগবাহী মাছির পাদ-স্পর্শ আরও ভয়ানক।

গুড়ের কেলাস হইতে চীনি। গুড়ের সব ইক্ষুশর্করা কেলাসিত হয় না। বিলাতী চীনিকরেরা বলে, উন-শর্করা ও পার্থিব মল হেতু কেলাসিত হয় না। তাহারা বলে গুড়ে যত উন-শর্করা, ইক্ষু-শর্করার তত অকেলাস্য; এবং পার্থিব মল যত, তাহার পাঁচ গুণ ইক্ষু-শর্করা অকেলাস্য। কেহ কেহ বলে আখের গুড়ের পার্থিব মলে তত দোষ হয় না। তাহারা মোট ইক্ষুশর্করা হইতে উনশর্করার দেড়া বাদ দেয়। হিসাবটা ঠিক কি না, কে জানে। তবে মোটামুটি এই-রকম দেখা যায় *

অতএব চীনি করিবার গুড়ে কিছুমাত্র খাদ রাখা চলিবে না। উত্তম খাঁড় করিতে হইলে যে যে প্রকরণ "গুড়ের বিধান" পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে, সে-সব সাবধানে পালন করিতে হইবে। যে গুড়ে যত খাঁড়, সে গুড়ে তত চীনি। দুই মণ গুড় হইতে অন্ততঃ এক মণ দলুয়া না হইলে সে গুড় কাজের নয়। দুই একটা উদাহরণ দিই। কটকের সরকারী কৃষিক্ষেত্রে যেখানে যথাসাধ্য সাবধানে এবং চূন যোগে ও লোহার তাওয়ায় সদ্য সদ্য রাঁধিয়া গুড় করা হইয়াছিল, সে গুড়েও ৫০ ভাগের অধিক দলুয়া হইত না। শাদা চীনি করিতে হইলে আরও কম হইত। অথচ এই গুড় কটকের বাজারে ৮৲ টাকা দরে বিকাইয়াছিল। ওড়িষ্যার কা-ল চট্-চট্যা গুড়ে বড় বড় কেলাস ছিল, কিন্তু ৩০ ভাগের অধিক নয়। এই গুড়ও ৮৲ টাকার দরে বিকাইয়াছিল। যশোরের এক খেজুরা গুড় আরও চট্‌চট্যা ও কা-ল, দর ৩৷৷০ টাকা। জলে কম হইলেও তাহাতে ২৪ ভাগ মাত্র কেলাস ছিল। অথচ এই গুড়ে ইক্ষুশর্করা প্রায় ৫৫ ভাগ ছিল। এই-রকম গুড় দ্বারা কেবল কৃষকের ক্ষতি নহে, দেশের ক্ষতি। সৈয়দ হাদী সাহেবের হিসাবে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গুড় (রাব) হইতে মণকে ১২।১৩ শের মাত্র দলুয়া (খাঁড়) হয়। যশোরে খেজুরা গুড় হইতে মণকে ১৬।১৭.শের দলুয়া হয়। যোগ্যকে অযোগ্য করিলে কিংবা হইতে দিলে দেশের ক্ষতি। এ গ্রামে সে গ্রামে উৎকৃষ্ট আখ, উৎকৃষ্ট গুড় জন্মিলেই চীনির সমস্যা মিটিবে না। তিল তিল করিয়া তাল হয়; কিন্তু ভুয়া তিলে তাল হইলে কি, না হইলেই কি?

প্রথমে দলুয়া করা দেখা যাউক। দলুয়া করা সোজা। অথচ লোকে কেন করে না, তাহা প্রথমে ভাবিয়া পাই নাই। ভাল গুড়ের নাঁদার তলে ফুটা করিয়া মাৎ ঝরাইয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু কেলাসে মাৎ আঠার মতন লাগিয়া থাকে, প্রাতলা হইলে ঝরে, নতুবা ঝরে না। এ নিমিত্ত আমাদের দেশে জলের বাষ্প লাগানা হয়। এক চমৎকার উপায়ে বাষ্প করা হয়। জলে নানা জাতি ক্ষুদ্র গাছ জন্মে। উহাদের দেহে বিস্তর জল থাকে। পুকুর হইতে তুলিলে সে জল অল্পে অল্পে বাষ্পীভূত হয়; গাছ ক্রমশঃ শুখাইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে এক জাতির নাম 'শেঅলা', পশ্চিম বঙ্গে প্রায়ই 'ময়রা শেঅলা' নামে খ্যাত। অনেকে 'গাঁজ'ও বলে। †

* যথা, কটকের সরকারী কৃষিক্ষেত্রের একটা গুড়ের শতকে ইক্ষু-শর্করা ৭২.৫, উন-শর্করা ৭.২, ভস্ম ১.৮ ছিল। অতএব কেলাস্য ইক্ষু-শর্করা ৭২.৫—৭.২ - ৫ × ১.৮ - ৫৬.৩ ভাগ। বস্তুতঃ সে গুড়ে ৫১ ভাগ মাত্র কেলাস ছিল। মাৎ হইতে কষ্টে কিছু পাওয়া যাইত। কিন্তু সে গুড় হইতে দলুয়া ৫০এর অধিক ঘটিত না।

বাজারের (মিথিলেটেড) কোহলে (alcoho) প্রথমে গুড় ধুইয়া পরে অষ্ট কোহলের শতকে ১০ ভাগ জল মিশাইয়া এবং তাহাতে শাদা চীনি 'পর্যাপ্ত' দ্রব করিয়া সেই জলে ধোআ হইয়াছিল। কোন্ গুড় হইতে কত দলুয়া হইতে পারে, তাহা জানিবার পক্ষে এই বুদ্ধি মন্দ নহে। গ্রামে কোহল পাওয়া যায় না, কিনিতেও পয়সা লাগে। অভাবে, প্রথমে গুড়ের মাৎ যথাসাধ্য ঝরাইয়া ফেলিবে। একটা পাতলা নেকড়া সহিত গুড় ওজন করিয়া সেই নেকড়ায় ঝুলাইয়া মাৎ ঝরাইতে পারা যাইবে। তার পর শাদা চীনির 'পর্যাপ্ত' জল করিতে হইবে। একটা বোতলে ১০ ভাগ জল, ও ৮ ভাগ চীনি ফেলিয়া মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিলে দুই এক ঘণ্টার মধ্যে চীনি যত দ্রব হইবার তত হইবে, বোতলের তলায় ২।১ ভাগ বরং উদ্‌বর্ত হইবে। এই জলকে 'চীনি পর্যাপ্ত জল' (saturated solution) বলা যায়। এই জলে গুড়ের পুটলী ধুইয়া রোদে শুখাইলে কেলাস কত থাকিল, ওজন করিলেই জানা যাইবে।

† সং গঞ্জ হইতে গাঁজ শব্দ। যে জলজ শীর্ণ-পত্র কোমল গাছ জলের মধ্যে জন্মিয়া নিবিড় বনের মতন হয়, তাহার সামান্য নাম 'গাঁজ'। আর, জলজ কোমল পিচ্ছিল গাছের সামান্য নাম 'শেঅলা'। উল্লিখিত গাছ ঠিক শেঅলা নহে। কারণ ইহা পিচ্ছিল নহে। ইহা পুকুরে জন্মে, শীতকালে ছোট ছোট ফুল ধরে। শিকড় সরু সরু, ডাঁটাও সরু সরু। ডাঁটাকে বেড়িয়া গাঁইটে গাঁইটে ৩-৬ সরু সরু, প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা পাতা হয়। উদ্ভিদবিদ্যায় ইহার নাম Vallisneria verticellata। যাহার প্রকৃত নাম 'গাঁজ', তাহার শিকড় হয় না, ফুল হয় না। যাহা পাতার স্থানে থাকে, তাহা সরু সরু ডাঁটা।

ভারতবর্ষের সর্বত্র এই বিধি। শেঅলা হইতে উন্মুক্ত বাষ্পে কেলাসের মল ধৌত হয়, শোঠ হইয়া ঝরে। কেলাস বি-বর্ণও হয়। তখন এই বি-বর্ণিত (bleached) খাঁড় চাঁচিয়া লইয়া রোদে দেওয়া হয়। রোদে আরও বি-বর্ণ হয়। গুড়ের বড় বড় চাপ থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া শেঅলা চাপা ও রোদ খাওয়ানো কর্তব্য। এই কারণে, 'দল'—খণ্ড ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া রোদে দেওয়া হয় বলিয়া 'দলুয়া' নাম। দলুয়া লালচা, সুতরাং বিমল নহে। যে গুড় কা-ল, চট্‌চটা, তাহা হইতে একবারে দলুয়া হইতে পারে না। সে গুড়ে জল দিয়া ফুটাইয়া গাদ তুলিয়া আবার গুড় করিতে হয়। দ্বিতীয় বারে গুড়ের মল অনেক চলিয়া যায়; যে খাঁড় থাকে তাহা হইতে দলুয়া করা চলে। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কেলাসিত করিয়া ইক্ষু-শর্করা পৃথক করা হয়।

গুড় ভাল হইলে অর্থাৎ উহার রং ফিকা হইলে দলুয়াও ভাল হয়। না হইলে দলুয়াকে আবার বি-মল (refined) করিতে হয়। এই বিমল চীনি, 'ভুরা'। ইহার অপর নাম 'দোবারা'। ভাল খাঁড় পাইলে একবারে ভুরা করাও চলে। খাঁড় অল্প জল দিয়া আগুনে তপ্ত করিতে হয়। তখন গাদ উঠে। সে গাদ তুলিয়া ফেলিয়া কাঁচা দুধ-জলের প্রক্ষেপ দেওয়া হয়। দুধের 'লালীন' যেটা ছেনা হয়, সেটা রসের অন্য জৈব ও পার্থিব আটকাইয়া লইয়া গাদ হইয়া উঠে। ডাবের জলেও 'লালীন' আছে। এই কারণে কোথাও কোথাও ডাবের জল দেওয়া হয়। রস নির্মল ও গাঢ় হইলে শীতল করিলে ইক্ষু-শর্করা কেলাসিত হয়। এই কেলাসই ভুরা। কখন কখন একটু মাৎ থাকে। অল্প হইলে সে মাৎ কেলাসে মাখা হইয়া থাকে। অধিক হইলে ঝরাইয়া ফেলিতে হয়। রস শীঘ্র শীতল না করিয়া বহু সময়ে করিলে কেলাস বড় বড় হয়, গায়ের মাৎ জমিয়া পরস্পর সংহত হয়। ইহাই মিছরী। বলা বাহুল্য, ভুরা কিংবা দেশী মিছরী বি-বর্ণ কিংবা বিমল নহে। তথাপি "নিতান্ত সভ্য" না হইলে দলুয়া ও ভুরাতে সব কাজ চলে।

এখন দলুয়া করিতে একটু আয়-ব্যয় খতাই। প্রথমে পূর্বোক্ত বাড়ইর হিসাব দেখি। "এখন গুড়ের দর ৭৲ টাকা। দুই মণ গুড় হইলে এক মণ দলুয়া, এক মণ মাৎ হয়।

২/০ গুড়ের দাম	১৪৲
গাঁজ দিয়া দলুয়া করিতে	১৲
	১৫৲
বাদ, ১/০ মাৎ	৫৲
১/০ দলুয়ায় পড়তা	১০৲

এখন কলিকাতায় বিলাতী (জাবার) লাল চীনির দর ১৩৲। অতএব ১১৲ দরে দলুয়া বেচিলে বেশ লাভ থাকিবে।" ঠিক কথা। কিন্তু বিলাতী চীনির দর নামিয়া গেলে? লাল চীনির দর ৬৲ হইলে পোষাইবে কি? বর্তমান ইয়ুরোপের যুদ্ধ হেতু চীনির দর চড়িয়াছে। গুড়েরও চড়িয়াছে। কিন্তু চীনি যত চড়িয়াছে, গুড় তত চড়ে নাই। অর্থাৎ গুড়ের বর্তমান দরেই বেশ লভ্য থাকিতেছে। গত দুই বৎসর আখচাষে নাকি বিশেষ বিঘ্ন হয় নাই। কিন্তু বিলাতে যুদ্ধ; এদেশে গুড়ের দর চড়ে কেন? এই কথা বুঝিলে অনেক রহস্য বোঝা যাইবে।

অগ্র সূচল। উদ্ভিদ বিদ্যায় ইহার নাম Chara। কোথাও কোথাও 'ঝাজি' বলে। ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও এই গাঁজ দেওয়া হয়। এই দুই গাছের মধ্যে 'গাঁজ' কোমলতর, শীঘ্র শুখাইয়া যায়। যথা, ঘরের ভিতরে শীতকালে কাঠের উপরে 'ময়রা-শেঅলা' ২ ঘণ্টায় ২৯, ২০ ঘণ্টায় ৮০ ভাগ, এবং 'গাঁজ' ২ ঘণ্টায় ২৯.৬, ২০ ঘণ্টায় ৮৪.৫ ভাগ শুখাইতে দেখিয়াছি। শূন্যে ঝুলাইয়া দেখিয়াছি, শেঅলা ১ ঘণ্টায় ৭৭॥০, গাঁজ ৮০ ভাগ, এবং ২ ঘণ্টায় শেঅলা ৮৮, গাঁজ ৮৯ ভাগ শুখাইয়াছিল। অতএব কেবল বাষ্পমোচন দেখিলে দুই-ই সমান। ওড়িষ্যার কোথাও কোথাও এবং দক্ষিণে পুকুরের পাঁক চাপা দেওয়া হয়। আমেরিকারও কোন কোন গুড়শালে পাঁক দেওয়া চলিত আছে। কিন্তু পাঁক অপেক্ষা শেঅলা বা গাঁজ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। পাঁক দ্রুত কিংবা প্রায় সমবেগে শুখায় না। আমার বোধ হয়, শেঅলা কিংবা গাঁজ দিবার উদ্দেশ্য কেবল শোঠ ঝরানো নহে। বাষ্পের নিমিত্ত যে-সে জলজ গাছ লইলে চলিত। ভিজা নেকড়াও চলিত। বোধ হয়, গুড় বি-বর্ণ (bleach) করাও উদ্দেশ্য। গাঁজ ও শেঅলা চাপা দিয়া দেখিয়াছি, শেঅলায় কাজ ভাল হয়, গুড় বি-বর্ণও হয়। কেমন করিয়া হয়, তাহার পরীক্ষার অবসর পাই নাই। বোধ হয়, গাছ হইতে যে 'অক্‌সিজেন' ওঠে, তাহা 'ওজোন' কিংবা 'হাইড্রোজেন পর-অকসাইড' অবস্থায় ওঠে। এই দুই এর বিবর্ণনের (bleaching) গুণ আছে। কাপড় কাচিবার সময় ধোবা ময়লা কাপড় ক্ষারে কাচিয়া পরে ভিজা কাপড় ঘাসের উপরে মেলিয়া দেয়। রোদে কাপড় বিবর্ণ হয়, কিন্তু ঘাসেরও গুণ আছে। উহা হইতে মুক্ত 'অকসিজেন' কাপড় বি-বর্ণ করে। কিন্তু তাহা 'ওজোন', কি 'হাইড্রোজেন পর-অক্‌সাইড' তাহা ধরা কঠিন। যাহাই হউক, উন্মুক্ত অক্‌সিজেনের গুণ আছে, স্বীকার করিতে হইবে।

মনে কর, বিলাতী চীনি ৬৲ কি ৬৷৷০ দরে বিক্রি হইতেছে। তখন গুড়ের দর ৪৲ টাকার অধিক হইবে না। অতএব

২/০ গুড়ের দাম	৮৲
দলুয়া করিতে খরচ	১৲
	৯৲
বাদ ১/০ মাৎ	২৷৷০
১/০ দলুয়ার পড়তা	৬৷৷০

লভ্য কই? মাৎ ২৷৷০ দরে বিকাইবে কি না, সন্দেহ। না বিকাইলে, লভ্য দূরে থাক্, মূলে হানি হইবে।

প্রথমে মনে হয়, গুড় সস্তা হইলে বিলাতী চীনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারা যাইবে। কিন্তু "গুড় সস্তায় বেচিতে পারিলে" সে কথা সত্য হইবে। মনে করি যেন দেশের সব গ্রামে আখ-চাষ ভাল হয়, গুড়-রাঁধাও ভাল হয়। পূর্বোক্ত বাড়ই আখ-চাষের একটা হিসাব দিয়াছে। জানাইয়াছে, "আমি বিঘায় ৫০ মণ পর্য্যন্ত গুড় হইতে দেখিয়াছি। গত বৎসর আমাদের গ্রামের এক জনের ৭ কাঠা আখ হইতে করতা বাদে ১৭।১৮ মণ গুড় হইয়াছিল। বিঘায় সচরাচর ৪০।৪২ মণ গুড় হয়। এখন গুড়ের দর ৭৲। কাজেই বিঘায় প্রায় ২৮০৲ টাকা উৎপন্ন হইতেছে। অবশ্য খরচও আছে। মোটা খরচের মধ্যে বিঘা-প্রতি শাল খরচ ৫০৲, খইল ৫০৲, খাজনা ১০৲, ক্ষেতের বেড়া বাঁধা ৫৲। তারপর চাষের খরচ আছে। সব বাদ দিলে বোধ হয় বিঘায় ৬০৲।৭০৲ টাকা লভ্য থাকিতেছে।"

বাড়ই দুই কারণে লভ্য দেখাইয়াছে। (১) এখন গুড়ের দর চড়া, (২) বিঘায় ৪০ মণ গুড়। কিন্তু দুই-টাই বেশী। প্রথমে মনে করি বিঘায় ৪০ মণ গুড় হয়, কিন্তু দর ৫৲ হইয়াছে। তাহা হইলে বিঘায় ২০০৲ টাকার গুড় হইবে। কিন্তু ৪০ মণ গুড় জন্মাইতে খরচা পূর্ববৎ থাকিবে, বরং দিন দিন বাড়িবে। ৭৲ টাকার দরে ২৮০৲ টাকায় ৬০৲।৭০৲ লভ্য; অর্থাৎ খরচাই প্রায় ২০০৲ টাকা! খরচার টানাটানি করিলেও বিঘায় ২০৲। ২৫৲ টাকার অধিক লভ্য থাকিবার কথা নহে। কিন্তু সব অঞ্চলে বিঘায় ৪০ মণ গুড় হয় না। ৺নিত্যগোপাল মুখার্জীর অনুমানে হারা-হারি ২৭ মণ; বেশী হইলে ৩৬ মণ। অবশ্য তখন খরচও কম। ষোল বৎসর পূর্বে তিনি জমির খাজনা ১৲ এবং মুনিষের বেতন।০ আনা ধরিয়াও খরচা ৫০৲, এবং লভ্য ৩০৲ টাকা দেখাইয়াছিলেন। শিবপুর সরকারী কৃষিক্ষেত্রে এই। অত বৎসর পূর্বে পুনাতে সরকারের কৃষি-অধ্যক্ষ বিঘা-প্রতি খরচা ১৬২৲, উৎপন্ন ১৮৭৲, এবং লভ্য ২৫৲ টাকা দেখাইয়াছিলেন। ইনি জমির খাজনা ধরিতে ভুলিয়াছিলেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে ডাঃ ভলকার কোইম্বাটুর প্রদেশের আখচাষে বিঘা-প্রতি ২৮৲—৩৫৲ টাকা লভ্য ধরিয়াছিলেন।

হঠাৎ মনে হয়, বিঘায় ২৫৲।৩০৲ টাকা লভ্য কি কম? কম ত নহেই, বরং একটু ত্রৈরাশিক কষিলে আখ-চাষ হইতে বার মাসে ১২০০৲ টাকা আয় দেখানো যাইতে পারে। বিঘায় ২৫৲ টাকা; ৫০ বিঘা চাষ করিলেই ঘরে বসিয়া ১২০০৲। কিন্তু ত্রৈরাশিকে অসম্ভব সম্ভব হয়, এক বছরের অট্টালিকা নির্মাণ একদিনে, এমন কি লোক লাগাইলে এক সেকেণ্ডে সমাপ্ত করিতে পারা যায়। একটা অসম্ভব কল্পনা করা যাউক। মনে করি বিঘায় ১০০৲ টাকা লভ্য থাকে। তখন ১২ বিঘা চাষ করিলেই বার মাসে ১২০০৲ টাকা আয় হইবে। হইবে বটে; কিন্তু গোটা চারি "কিন্তু" আছে। কয় বৎসর আয় হইবে? যে-সে জমিতে আখ জন্মে না, বছর বছর একই জমিতে জন্মে না। যদি তিন বছর অন্তর একই জমিতে করা যায়, তাহা হইলে ত ৩৬ বিঘা জমি দরকার! এমন জমি যাহা জল পাইতে পারে, এমন গ্রাম যেখানে যথাসময়ে আবশ্যক মুনিষ পাওয়া যায়, এমন বৎসর যে বৎসর ঝড় অতিবৃষ্টি হইবে না, আখে পোকা রোগ প্রভৃতি অভ্যাপাত হইবে না।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে যে জমিতে আখ হয়, তাহাতে পাটও উত্তম হয়। সেখানে ১ বিঘা পাট চাষে খরচ ২৭৲ টাকা, উৎপন্ন ৭/০ মণ পাট ৮৲ টাকার দরে ৫৬৲ টাকা, লভ্য ২৯৲ টাকা।* অথচ ছয় মাসে পাট শেষ, অপর

* পাট-চাষে এত লভ্য থাকিলেও আমাদের গ্রামের কৃষকেরা বুঝিয়াছে সে লভ্য কবিরাজ ও ডাক্তারকে দিতেই যায়; ফলের মধ্যে

মাসে রবী ফশল করা চলে। অত কথায় কাজ কি, ধান ধরি। বিঘায় ১০/০ মণ ধানে ২৫৲, খড়ে ৫॥০ ; মোট ৩০॥০ টাকা। খরচ ১৭৲।১৮৲, লভ্য ১২৲।১৩৲ টাকা থাকে।

যদি আখ-চাষে তেমন লভ্য না থাকে, তাহা হইলে চাষ হয় কেন? আমি ইহার সব উত্তর দিতে পারিব না। বোধ হয়, অনেক কারণ আছে। কৃষককে পাঁচ-রকম ফশল করিতে হয়, দুই-একটায় নির্ভর চলে না। অন্য ফশলের মধ্যে আখও কিছু করে। কোন ফশলে লভ্য বেশী, কোনটায় কম, হরণ-পূরণে এক-রকম পোষাইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, যে সময় অন্য ফশল হয়, সে সময় আখের জমিতে প্রায় কিছু করিতে হয় না। অতএব আখ-চাষে তাহার কর্ম্ম জোটে। যাবতীয় ফশল হইতে যে লভ্য পায়, তাহার কিয়দংশ নিজের বেতন হইতে পায়। এই বেতন বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাই ফশল হইতে লভ্য। এই লভ্য কম বলিয়াই কৃষি-কর্ম্ম "ভদ্র" লোকের পোষায় না। আমি যে অঞ্চলের কথা বলিতেছি, সে-অঞ্চলে মুনিষের দিনিকা ।৵০। বস্তুতঃ মাসে ১৪৲।১৫৲ টাকার কমে বাঙ্গালী মুনিষের পোষায় না, পোষাইতে পারে না। স্ত্রীপুত্র লইয়া "পঞ্চপ্রাণী"র পক্ষে মাসে ১৫৲, জনকে ৩৲ টাকার কমে বাঁচিতেই পারে না। তাহাও গ্রামে বলিয়া। ত্রিশ দিনে কত চাল লাগে, তাহা স্মরণ করিলেই কথাটা স্পষ্ট হইয়া পড়ে। বঙ্গের কোথাও কোথাও মুনিষ সস্তা। কিন্তু তাহারা শিক্ষিত (trained) নহে। অ-শিক্ষিত মুনিষ বা কার্মিক (labourer) সর্বত্র সস্তা। কিন্তু "সস্তার তিন অবস্থা" কথাটার তুল্য সত্যও আর নাই। আমাদের দেশে মুনিষ বাস্তবিক মহার্ঘ, এই কথাটা বহুলোকে জানেন না বলিয়া বহু অনর্থ হইতেছে। অন্যত্র যেখানে আখ-চাষ বিস্তর আছে, যেমন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, সেখানে মুনিষ সস্তা, উৎপন্নও কম। মুনিষের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ও কম। বঙ্গদেশে মুনিষ দুর্লভ। দরিদ্র প্রদেশ হইতে "কুলী" আসে বলিয়া বঙ্গদেশের কল-কারখানা, কোথাও কোথাও চাষ, এমন কি ঘরের কাজ চলিতেছে।* ফলে বঙ্গদেশে আখ-চাষ কমিয়া গিয়াছে। এখনকার দুই এক বৎসরের কথা নহে; বহু পূর্বে যত চাষ হইত, দুই তিন বৎসর পূর্বে তত হইতেছিল না। বিলাতী লাল চীনির দর ৭॥০ টাকা হইলে উত্তম গুড়ের দর অন্ততঃ ৪৲ টাকা হইতে হইবে। কিন্তু ৪৲ হইলে আখ-চাষে সর্বত্র লভ্য থাকে না। অন্য চাষে থাকে।

আমার বোধ হয়, কোন্ গুড় হইতে কত চীনি পায়, তাহা না জানাতে সাধারণ লোকে গুড় কেনে। চীনি ৭॥০ টাকা, গুড় ৫৲ টাকা দেখিয়া গুড় কেনে। বাস্তবিক, ময়রা কিংবা 'খাঁড়-সারী' (যাহারা খাঁড় সারায়, গুড় হইতে চীনি করে), তাহাদের নিকট ৫৲ টাকার গুড় মাহাঙ্গা পড়ে। পড়িবারই কথা। যাহারা খাবার জন্যে গুড় কেনে, এবং গুণ না দেখিয়া পরিমাণ খোজে, তাহাদের নিকট ৬৲ টাকাও সস্তা। কিন্তু বিসম কথা এই যে, বিলাতী চীনি গুড় করিয়া বিক্রি করিলে লভ্য থাকে। মনে করুন, বিলাতী চীনি ৭৲ দরে বিক্রি হইতেছে। ইহার সহিত ২৲ টাকায় আধমণ অপকৃষ্ট গুড় মিশাইয়া একটু রাঁধিয়া গুড় করিলে ৫৲ টাকা মণে বিক্রি হইতে পারে। "স্বদেশী"র দিনে কেহ বিলাতী চীনির গুড় করিয়াছিল

মেলেরিয়াতে প্রায় ছয় মাস কষ্ট-ভোগ। যে দুই এক জন অল্প-স্বল্প পাট চাষ করে, তাহারা লোকালয় হইতে দূরে পাট পচায়। পাট-চাষে জল-পচার প্রতিকার উদ্ভাবন অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

---

* আমাদের দেশে মুনিষ মহার্ঘ, এই কথা বার বার বলা আবশ্যক হইয়াছে। শিক্ষার অভাবে মহার্ঘ। সে শিক্ষা, ক-খ লেখা ও পড়া নহে। ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দিতে পারা যায়। ওড়িষ্যায় মুনিষ সস্তা; পূর্বে গামে দিনিকা ৴০ আনা ছিল, এখন ৵০ আনা হইয়াছে। কিন্তু কাজে ৵০ আনাও মহার্ঘ পড়ে। এখানকার এক ভদ্রলোক পশ্চিমবঙ্গ হইতে একজন ভাল মুনিষ ১০৲ টাকা বেতনেও আনাইতে পারেন নাই। কারণ সে ঘরে বসিয়া ১০৲ টাকা উপার্জন করে। এমন গ্রাম্যকলা নাই যাহাতে মাসে ১০৲ টাকা আসে। অথচ এই টাকার কমে মাস চলিতে পারে না। এই কারণে লোকে কলা ছাড়িয়া চাষ ধরিতেছে, চাষ না পারিলে চাকরি করিতেছে। বস্তুতঃ চাকরিতে এখনও লাভ থাকে। এ বিষয় এখানে আলোচ্য নহে। তবে একটা কথা বলা আবশ্যক। আমি মুনিষ শব্দ প্রয়োগ করিতেছি। পশ্চিম-বঙ্গে এই নাম প্রচলিত। সেখানে 'কুলী' নামে অবজ্ঞা, এবং 'মজুর' নামে দৈন্য প্রকাশ পায়। 'মানুষ' শব্দের বিকারে 'মুনিষ'। 'মুনিষ' পরিবর্তে 'জন' শব্দও আছে। কিন্তু 'মুনিষ' কিংবা 'জন' বলিলে অবজ্ঞা কিংবা দৈন্য বুঝায় না। কেন না, মুনিষ মানুষ; আমি তুমি যেমন মানুষ, যেমন জন, মুনিষও তেমন মানুষ তেমন জন। এই আত্ম-গৌরব আছে বলিয়াই দরিদ্র বাঙ্গালীও 'কুলী' হইতে চায় না। কুলীর পরাধীনতা ও বেতনে তাহা পোষায়ও না। আমি বাঙ্গালী মুনিষকে অন্য প্রদেশের মুনিষকে কলিকাতায় 'কুলী' নামে ডাকিতে শুনিয়াছি।

কিনা, জানি না ; কিন্তু কত বিলাতী চীনি যে দেশী হইয়া গিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। অদ্যাপি কটকেও দেখিতেছি বিলাতী চীনি দেশী গুড়ের সহিত মিশাইয়া পাক করিয়া 'কন্দ' নামে বিক্রি হইতেছে, লোকে চীনি অপেক্ষা চড়া দরে কিনিতেছে, কারণ 'কন্দে' শ্রদ্ধা আছে, কন্দ দেশী ও শুদ্ধ! এই মহার্ঘের দিনেও বিদেশী অপেক্ষা কাশীর চীনি চড়া দরে বিক্রি হইতেছে। কারণ কাশীর চীনি শুদ্ধ। কিন্তু অর্থনীতির কাছে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পরাজিত হয়ই হয়।

শেষে মনে করি, বিলাতী চীনির আমদানি চিরকালের তরে রহিত হইয়া গেল। তখন গুড় ও চীনি কি সস্তা হইবে? মোটেই না। এখন বিদেশীর সহিত ব্যবসায়-সংগ্রাম হেতু গুড় বরং সস্তা আছে। তখন এ প্রদেশের সহিত সে প্রদেশের সংগ্রাম হইবে বটে, কিন্তু গ্রাহককে বেশী দাম দিতে হইবে। কারণ লাভ না দেখিলে কৃষক অন্য ফশল করিবে, দেশের উৎপন্ন কম হইয়া পড়িবে।

অনেকে মনে করেন, দেশে চীনির কুঠী নাই বলিয়া আমাদিগকে বিলাতী চীনি খাইতে হইতেছে। কথাটার দুই আনা সত্য, চৌদ্দ আনা অসত্য। লোকে বিলাতী চীনি খায়; কারণ দেশী পায় না। কিন্তু গুরুতর কারণ—দেশী আক্রা, বিদেশী সস্তা। ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত কাশীর চীনি। বিদেশী অপেক্ষা চড়া দরে বিক্রি হইয়া আসিতেছে। গ্রাহকের শ্রদ্ধা দেখিয়া দর চড়া নহে, তেমন চড়া বেশী দিন টেকে না। গুড়ের দাম চড়া, চীনিরও দাম চড়া। অতএব চীনির কুঠী করিলে বিশেষ কি হইত? লাভের মধ্যে একটা বহুকালের গ্রাম্যকলা (village industry) দুই দশ জনের কিংবা সমিতির হাতে গিয়া পড়িত। আমি চীনির কুঠীর সংবাদ জানি না। যে দুই-একটার পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিতেছি, কুঠীতে কুঠীআলের লাভ হইতেছে না।* সম্প্রতি দুই-এক বৎসর হইতেছে, কিন্তু যুদ্ধ শেষে অবস্থা পূর্ববৎ হইলে কুঠী বন্ধ করিতে হইবে, কিংবা উপায়ান্তর দেখিতে হইবে। অত কথায় কাজ কি, বিহারের ও পশ্চিমের নীল-কর সাহেবেরা—যাঁহাদের ধন অগাধ, প্রতিষ্ঠা অগাধ, তাঁহারাই, চীনির কারখানায় হাত দিই-দিই করিয়াও দিতে পারিতেছেন না। সরকার হইতে ইক্ষু-প্রাজ্ঞ, গুড়-প্রাজ্ঞ নিযুক্ত হইয়াছেন, উত্তর-ভারতে ও দক্ষিণ-ভারতে পরীক্ষা হইতেছে।

কিন্তু সে বহুকালের কথা। আর, তুমি আমি দুই চারি বিঘা উৎকৃষ্ট আখ জন্মাইয়া দক্ষ বড়িই লাগাইয়া উত্তম গুড় করিয়া ফেলিতে পারিলেই চীনির কষ্ট দূর হইবে না। দশ বৎসর হইল সরকারের কৃষিবিভাগের উপাধ্যক্ষ হাদী সাহেব এক পুস্তিকা প্রচার করিয়া চীনি-করার দেশী ক্রমে উন্নতির সম্ভাবনা দেখাইয়াছিলেন। যে প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া উন্নতির উপায় দেখাইয়াছিলেন, সে-প্রদেশের পক্ষে কিছু উন্নতি বটে। বঙ্গদেশের পক্ষেও একটা নূতন হইত, গুড়ের মাৎ ঝরানার নিমিত্ত তামার জালের পিঞ্জর নূতন হইত। (কিন্তু দাম ৪০০্ টাকারও উপর!) এতদ্দ্বারা প্রত্যহ ৪।৫ মণ গুড় হইতে দলুয়া করিতে পারা যায়। এই পিঞ্জরের ভিতরে মাৎ ও জল মিশাইয়া গুড় ঢালিয়া বেগে ঘুরাইলে মাৎ ছিদ্রপথে বাহিরের একটা পাত্রে

---

* আমি দুইটা কুঠীর অধ্যক্ষকে পত্র লিখিয়াছিলাম। একটা যশোরের কোটচাঁদপুরের নিকটস্থ তারপুরের, অপরটা মান্দ্রাজ ব্রহ্মপুরের (বহরমপুর) নিকটস্থ আসিকার চীনির কুঠী। তারপুরে প্রায়ই খেজুরা গুড় হইতে চীনি করা হইতেছে। খেজুর-রস হইতেও কিছু হয়। আসিকায় (Aska) আখ হইতে, অধিকাংশ আখের গুড় হইতে চীনি করা হয়। দুই-এরই অধ্যক্ষ আশাহীন উত্তর দিয়াছেন। গুড় আক্রা! তারপুরের চীনির কুঠী ছাড়িয়া দিই, কারণ ঘরের কাছে। আসিকার কুঠীর নাম-ডাক খুব আছে; যিনি এদেশের গুড় ও চীনির ব্যবসায় বলিয়াছেন, তিনিই সুখ্যাতি করিয়াছেন। এই কুঠীর একটু ইতিহাস দিই। প্রায় সত্তরি বৎসর হইল মান্দ্রাজের এক সাহেব কোম্পানীর পক্ষে মিঞ্চিন (Minchin) নামে এক সাহেব গঞ্জাম জেলার ব্রহ্মপুর হইতে ২৬ মাইল দূরে 'আসিকা' নামক উপনগরে চীনির কুঠী খোলেন। গুড়-বিদ্যায় যাহা কিছু উপকরণ ও আয়োজন জানা আছে, তিনি সব করিয়াছিলেন। বেশ লাভ করিয়াছিলেন। পরে কুঠীটি নিজের করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেকালে যখন প্রতিযোগিতা দুষ্কর হয় নাই, তখন যে কিছু নূতন করিত, সেই লাভ পাইত। তথাপি তাঁহার উদ্‌যোগ ও ব্যবসায়-বুদ্ধির প্রশংসা করিতেই হইবে। কয়েক বৎসর হইল তিনি বাবু পরমানন্দ সাহা নামক এক ধনাঢ্য ওড়িয়া ভদ্রলোককে কুঠী বিক্রি করিয়াছেন। আগের আয়োজন সবই আছে, অথচ বিলাতী চীনির সস্তার বাজারে টিকিতে পারিবে কি না, সন্দেহ। পঁচিশ বৎসর পূর্বে ডাঃ ভলকর সাহেব যাঁহাকে দেশের কৃষির উন্নতির পথ দেখাইতে সরকার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনিও লিখিয়াছিলেন, চীনির কুঠী চলিবে না। শুনিতে পাই, কলিকাতার নিকটস্থ কাশীপুরের চীনির কুঠীতে যাবা-দ্বীপের গুড় হইতে চীনি করা হয়। ইহাতেই নাকি টিকিয়া আছে।

ছিটকাইয়া পড়ে, ভিতরে কেলাস রহিয়া যায়। বিলাতে এইরূপ ঘূর্ণ্যমান পিঞ্জর (centrifugal) দ্বারা গুড়ের কেলাস পৃথক করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের চীনি-সমস্যা এইখানে আটকায় নাই। ফলে আট বৎসর যাইতে-না-যাইতে সরকারী পুস্তকে পড়িতেছি, হাদা সাহেবের চেষ্টা নিষ্ফল প্রমাণিত হইয়াছে।*

আমি গুড় ও চীনি ব্যবসায়ের বাহিরের লোক। সুতরাং সঠিক সংবাদের অভাবে আমার ভুল হইতে পারে। তথাপি ব্যবসায়ের আয়-ব্যয় ও স্থিতি বিবেচনা করিলে মনে হয়, কেবল ব্যয় হ্রাস দ্বারা স্থিতি বৃদ্ধি হইবে না, আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে। জর্মানী একটা শাগের শিকড়ে শতকে ১৮ ভাগ ইক্ষুশর্করা করিয়াছে, আমরা গুড়-বৃক্ষ আথে এত পাই না! শাগের শিকড় হইতে বিঘায় ১৬৷৷০ মণ চীনি, গুড়ে অন্ততঃ ৩৩ মণ জন্মাইতেছে, আমরা দীর্ঘ বৃক্ষ হইতে ২৫ মণও পাই না! সে দেশে এক মণ চীনির পড়্তা ৫৲ টাকা মাত্র! আর আমরা এক মণ গুড় ৫৲ টাকায় বেচিতে পারিতেছি না। সাহেব আথ চাষীর সহিত তুলনা করিলে আমরা দাঁড়াইবার তল পাই না। তাহারা বিঘায় আথ হইতে ৩৬ মণ চীনি,—গুড় নয় চীনি,—জন্মাইতেছে! মণকে পড়্তা পড়িতেছে ৪৷০ আনা মাত্র! কখনও কখনও বিঘায় ৪৫ মণেরও উপরে উঠে।† না জানি কেমন আথ, কেমন কৃষক! ইহাদের সহিত আমরা পারিব? আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট আথের রসে ১৪।১৫ ভাগের অধিক ইক্ষু-শর্করা নাই, তাহাদের রসে ২০।২২ পর্যন্ত হইয়া থাকে। আমেরিকার কিউবা দ্বীপ বঙ্গদেশের ৷৷৵০ আনা। কিন্তু আশিয়া মহাদেশে যত গুড় উৎপন্ন হয়, একা কিউবা দ্বীপে নাকি তাহার অর্ধেক হইতেছে।‡

বর্তমান অবস্থায় কি করা যাইতে পারে? কিছু করিবার আছে, না বিদেশী জাহাজের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা যাইবে? কারণ, ইহা নিশ্চয়, কিছুদিন এইরূপে গেলে আমরা দেশের গুড়ও খাইতে পাইব না। বিদেশের নূতন আখ আনাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেশ-মধ্যে প্রচলিত করিতে বহুকাল লাগিবে। এদিকে কিন্তু একটা বছর যাইতেছে, আর আমরা দশ বছর পিছাইয়া পড়িতেছি। পরীক্ষা চলুক; এই দেশেই যে-সব ভাল আথ কোথাও-না কোথাও জন্মিতেছে, ইতিমধ্যে সে-সব সর্বত্র প্রচলন করিতে পারিলে অনেক সুবিধা হইবে। নূতন স্থানে গেলে প্রথম দুই এক বৎসর গাছ ভাল জন্মে না। আথও না। ক্ষেতের মাটি, কৃষির প্রভেদ, জল-বায়ুর প্রভেদ হেতু আথের গুণের তারতম্য হয়। কিন্তু লাগিয়া থাকিলে আথের নূতন দেশ সহ্য হইয়া যায়। ইহাও সত্য, গাছেরও স্থান-পরিবর্তনে উপকার হয়। কৃষি-জাত গাছমাত্রেই কিছু দুর্বল, আমাদের "বাবু"র তুল্য। আথে যে এত শকরা জন্মে, তাহা আথের স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। প্রথম পরীক্ষা কৃষকের সাধ্য নহে। সব তত্ত্ব সে জানিবে না, আথ ভাল জন্মাইতে পারিবে না। পরীক্ষা করিবার তাহার সময় নাই, পয়সাও নাই। কেবল সরকারী কৃষিক্ষেত্রের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলেও চলিবে না। কত জায়গায় কটা কৃষিক্ষেত্র হইবে? সুখের বিষয়, আজিকালি দেশ-হিতৈষী রাজা ও জমিদারের অভাব নাই। তাঁহারা একটু মন দিলে প্রত্যেক ডিহিতে একটা করিয়া ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র অনায়াসে করিতে পারেন। খরচ বেশী পড়িবে না, ডিহির নায়েব বা গোমস্তা দ্বারা চাষের পরীক্ষা চলিতে পারিবে। বীজ, সরকার যোগাইবেন। সে ক্ষেত্রে যে-আথ ভাল দাঁড়াইবে, তাহার ডগা কৃষককে বিক্রি কিম্বা বিতরণ করিতে হইবে। একই ক্ষেতের একই জাতের সব গাছ ভাল জন্মে

---

* To the earlier days belongs also the introduction of the Hadi process of sugar manufacture as a village industry, which, after promising well, was unfortunately found to be unsuitable for general adoption.,—*Agriculture in India.* J. Mackenna, I. C. S. 1915.

† *Industrial Chemistry* Martin. 1915.

‡ কিউবা দ্বীপে তিন উৎকৃষ্ট জাতের রসের হারাহারি ভাগ এই,—ঘনতা ৮৮, শর্করা ২১.৫, ইক্ষুশর্করা ২০.০, উন-শর্করা ০.২৩, অন্ত জৈব ১.২৬। সেখানে যাবাদ্বীপের কাজলা আথের চাষ হয়। এই আথের রসের ঘনতা ৯০, শর্করা ২২.০, উনশর্করা লেশমাত্র, অন্ত জৈব ০.৭০। বোধ হয় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আথ আর জানা নাই। মরীচ দ্বীপে যে আথ হয়, তাহাতে সেই আথে জল ৬৯.০, ইক্ষু-শর্করা ২০.০, উনশর্করা লেশ মাত্র, খোআ ১০.০, পাথিব ০.৭—১.২। ইহাতে রস কম বটে, কিন্তু ইক্ষুশর্করা বেশী। সেদিন সংবাদ-পত্রে পড়িতেছিলাম, আসামে সরকারী কৃষিক্ষেত্রে এক জাত আথ নাকি উত্তম জন্মিয়াছে। শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু উপরের আথের সহিত তুলনা না করিলে কত উত্তম তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। আসল কথা, উৎপন্ন আথ হইতে চীনির পড়্তা কত পড়ে, তাহা জানা চাই।

না। যে গাছগুলি গুড়ের পক্ষে ভাল, সেগুলি বাছিয়া নূতন বৎসরের নিমিত্ত রাখিতে হইবে। বেশী থাকিলে ডগা, নতুবা গোটা আখ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বসাইতে হইবে। বীজ-নির্বাচনে যে কত হিত হয়, তাহা কৃষক জানিয়াও জানে না, উত্তম বীজ সহজে সংগ্রহ করিতে পারে না। আমাদের জমিদারবর্গ উত্তম বীজ যোগাইবার ভার লইলেও বহু উপকার হইবে। একথা কেবল আখ-চাষে নয়, সকল চাষেই প্রযোজ্য। এখানে আর এক কথা না বলিয়া পারি না। আমরা দামোদরের বন্যার শক্রতাই দেখি, মিত্রতা দেখি না। দামোদরের পলিতে যেমন ফশল হয়, পশ্চিম-বঙ্গে আর কোথাও তেমন হয় কি না, সন্দেহ। অথচ সেই পলি যাহাতে ক্ষেতে পড়িতে না পারে, যাহাতে সমুদ্রে গিয়া নষ্ট হইতে পারে, তাহার চিন্তায় আমরা অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু বানের কষ্ট বরং সহিতে পারা যায়, অন্নের কষ্ট একদিনও পারা যায় না। এমন উপায় কি নাই, যাহাতে বান আসিবে পলি পড়িবে, অথচ ঘরবাড়ী ভাঙ্গিবে না? নিশ্চয়ই আছে। আখের পক্ষে, এবং অল্প ব্যয়ে আখ চাষের পক্ষে, এমন মাটি, এত বিস্তীর্ণ ক্ষেত আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

আয়-বৃদ্ধির পর ব্যয়-হ্রাস দেখিতে হইবে। গ্রামের মধ্যে যাহাতে বহু কৃষক গাঁতা (সঙ্ঘাত) করিয়া এক কি দুই জাতের চাষ করে, এবং সব আখ এক আখ-শালে মাড়ে ও গুড় করে, তাহারও চেষ্টা আবশ্যক। ইহাতে ব্যয় কম হইবে, দক্ষ বাড়ই পাওয়া যাইবে। চীনির নিমিত্ত উত্তম রসের গুড়, এবং সম্বৎসর খাইবার নিমিত্ত ভিঁড়া করাইলে রসের অপচয় হ্রাস হইবে। আখ চাষ বেশী হইলে আখ-শালেই দলুয়া করিলে আরও সুবিধা। (১) ইহাতে মাঝের দলুয়া-কর বা খাড়সারীর লভ্য কৃষকের থাকিবে, গ্রাহকও দলুয়া সস্তা পাইবে। এখন আখ-চাষে কৃষকের লভ্য দেখাই দরকার হইয়াছে। (২) দলুয়া করিতে নূতন উপকরণ ও আয়োজন আবশ্যক হইবে না। (৩) ঝরা মাতের গাদ তুলিয়া ভিঁড়া করিতে পারা যাইবে; কম দরে মাৎ বেচিতে হইবে না। (৪) দলুয়া করিতে সময় লাগে। কিন্তু মাৎ শুখাইয়া যদি ভিঁড়া করা হয়, তাহা হইলে সময় অনেক বাঁচাইতে পারা যাইবে। শেঅলা চাপা দিয়া অল্প অল্প খাঁড় চাঁচিয়া লইয়া সব গুড় শেষ করিতে সময় লাগে। ইহার পরিবর্তে, বাইনের গাঢ় রসে, এমন কি মাতের রসে গুড় ধুইয়া ফেলা চলিবে। নাঁদায় গুড় বসাইবার প্রয়োজন হইবে না। মনে কর নাগরায় গুড় বসাইয়া পরে তলে ফুটা করিয়া কিছু মাৎ ঝরাইয়া ফেলা গেল। তার পর সে গুড় বাঁশের 'ঠেকা'তে (সরু বোনা ঝোড়া) ঢালিয়া বাইনের রসে নাড়িয়া নাড়িয়া ধুইয়া কেলাস পৃথক করিতে পারা যাইবে। প্রথমে মাতের রসে, তার পর গুড়ের রসে, শেষে শুদ্ধ জলে ধুইয়া লইলে আর কিছু করিতে হইবে না। তখন রোদে মেলিয়া দিলে খাঁড় শুখাইবে, এবং বিবর্ণ হইবে। রসে ও জলে ধোআতে কিছু ইক্ষুশর্করা অবশ্য চলিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা ত ফেলা যাইবে না। আমার বোধ হয় বঙ্গদেশ চীনির আশায় সব আখে গুড় করিতে গিয়া ঠকিতেছে। গ্রাহকও ঠকিতেছে। কিন্তু সে দিনকাল পড়িয়াছে, গ্রাহক সহজে ঠকিবে না, গুড় খাইতে চাহিবে না। যে কাজের পক্ষে যে যোগ্য, তাহাকে সে কাজে লাগানাই শ্রেয়।

বিলাতী চীনি-কর যে পথ দিয়া চীনি করিতেছে, সে-পথ আমাদের যথাসাধ্য অনুসরণ কর্তব্য। সে কেবল চীনি করে না, আখ-চাষও করে। তাহার আখের জাত ভাল, চাষ ভাল, গুড় রাঁধা ভাল। আমাদের তিনই অধম। কোথাও কোথাও গুড় কিনিয়া চীনি করে, কিন্তু গুড় সস্তা পায়। আমাদের এইখানেই আটকাইয়াছে। অপচয় হ্রাস করিতে পারিলেই গুড় সস্তা হইবে না। অপচয় দ্বিবিধ, দ্রব্যের অপচয় ও সময়ের অপচয়। আমাদের দেশে সময়ের অপচয়ে তত ক্ষতি হয় না, কারণ মুনিষের বেতন কম। দ্রব্যের অপচয়ই বড় অপচয়। পশ্চিম-বঙ্গেও অনেক স্থানে দ্রব্যের অপচয়ও যৎসামান্য। কিন্তু সর্বত্র তাহা নহে। সর্বত্র গুড় করা ভাল নহে, সর্বত্র বাড়ই শিক্ষিত নহে। আখ কিনিয়া কুঠীতে মাড়িয়া গুড় করা যাইতে পারে, কিন্তু সে নিমিত্ত কুঠীর গায়েই আখ-বাড়ী থাকা চাই, আখ বেচিতে কৃষকের আগ্রহ চাই। কারণ আখ কাটিয়াই রস ও গুড় করিতে পারা চাই। রেলপথ থাকিলে ভাল; কিন্তু রেলের ভাড়া কম না হইলে, কিংবা আবশ্যক সময়ে আখ আনিবার গাড়ী না পাইলে, রেল থাকা না-থাকা

সমান। ইহাতেও কুঠীর কাজে সুবিধা হয় না। যত আখ পাইবে, সব একজাতের হওয়া চাই। কুঠীর কার্ম্মিকের বেতন বেশী, কারণ সে শিক্ষিত। কোন্ আখে কি প্রক্রিয়া আবশ্যক, তাহা নির্ণয় করিতে, আখের জাত বাছিতে সময় যায়। এখানেও শেষ নহে। বারমাস আখ কিংবা গুড় চাই, নতুবা উপকরণ (appliance) বৃথা পড়িয়া থাকিবে, মূলে ক্ষতি করিবে। চীনির আদি গুড়, গুড়ের আদি আখ। আখ ভাল হইলে সব ভালয় ভালয় সমাধা হয়। যে কুঠীআলের নিজের বিস্তীর্ণ আখবাড়ী আছে, নিজের গুড়-শাল, চীনিশাল আছে, সেই লাভবান্ হইতে পারে। এইরূপ, যাহার নিজের বিস্তীর্ণ খেজুর বাড়ী আছে, সে যেমন সব সুবিধা করিয়া লইতে পারে, বাজারের কেনা গুড়ে তেমন ঘটে না।

'গুড়ের বিধান' প্রবন্ধের আদ্য পাদটীকায় একটু ভুল ছাপা হইয়াছে। 'রসক' বা 'রসিকি' নহে, 'রস ক' বা 'রস কি' হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

প্রথম দাগ

(গল্প)

বাহিরবাড়ীর পুকুরের পাড়ে আমগাছ-তলায় দুইটি শিশু খেলা করিতেছিল। একটির বয়স পাঁচ, আরেকটি বছর তিনেকের হইবে।

খেলাটা জমিয়াছিল ভাল। নিলু নামে বড় ছেলেটি একটা আমগাছের চারিদিকে ঘুরিতেছিল; ছোটটি ছুটিয়া-ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে না পারায় একটি হাস্য-মিশ্রিত কলরব উঠাইয়া পাছে পাছে দৌড়াইতেছিল। বড়টি যখন কতকটা ক্লান্ত হইয়া মন্দগতি হয়, ছোটটি তখন তাহার গায়ের উপরে যাইয়া পড়ে এবং উভয়েই একত্রে উচ্চ হাস্য করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। তারপর বড়টি আবার দৌড়ায়, ছোটটি আবার তাহার পিছনে ছোটে।

হঠাৎ রাখাল নামে ইহাদের এক ক্রীড়াসঙ্গী আসিয়া রসভঙ্গ করিল এবং একটি নূতনতর ক্রীড়ারস উপস্থিত করিল। রাখাল একটি বিড়ালছানার কর্ণধারণ করিয়া পাঠশালার গুরুমহাশয়ের অনুকরণ করিতেছিল; বিড়াল-শাবকটিকে যখন সে কানে ধরিয়া শূন্যে উঠাইয়া চলিতে থাকে শাবকটির মা তখন রাখালের পায়ের কাছে ঊর্দ্ধমুখে ব্যস্তভাবে "মেও মেও" করিতে করিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলে। পরে যখন রাখাল শাবকটিকে মাটিতে রাখে বিড়ালটি তখন উহার ঘাড়ে কামড় দিয়া লইয়া যাইতে থাকে; কিছু-দূরে গেলে রাখাল আবার শাবকটিকে কানে ধরিয়া লইয়া আসে। এইরূপে খেলিতে খেলিতে সে বাড়ী হইতে বাহির-বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়াছে।

ক্রীড়ামগ্ন বালক দুইটি একটা নূতন রকমের মজা দেখিয়া খেলা ছাড়িয়া রাখালের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রাখাল সেই শাবকটির কানে ধরিয়া শূন্যে উঠাইয়া হাসিল, উহারা দুইজনেও খুব হাসিয়া উঠিল এবং ছোট ছেলেটি আনন্দে ছুটিয়া এক পাক ঘুরিয়া একটা আছাড় খাইল এবং হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিয়া হাততালি দিতে লাগিল।

এই যে বহিরঙ্গণে অবসানপ্রায় অপরাহ্নে তিনটি শিশু সরল তুচ্ছ আনন্দে মাতিয়াছিল, মনে হয়, ধরিত্রীর প্রাঙ্গণে নিখিল মানব-শিশুর জীবনযাত্রার আনন্দ এমনি অকিঞ্চিৎকর আবার এমনি সত্য।

কয়েকবার এইরূপ খেলা দেখার পর প্রথমোক্ত শিশু-দুইটির সাহস বাড়িয়া উঠিল। অবশেষে বিড়াল-ছানাটির গায়ে হাত বুলাইতে এবং লেজ টানিতেও তাহাদের আর দ্বিধা রহিল না। রাখালের খেলার উৎসাহ ইহাতে আরও বাড়িয়া গেল, কারণ বিড়ালছানাটাকে ধরিয়া আনিবার সময় এখন নিলুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগে। দুই জনেই আগে যাইয়া ধরিতে চায় এবং ধরার পর টানাটানি বাধাইয়া দেয়।

ইতিমধ্যে রাখালের মা ঘাটে জল লইতে আসিয়া ফিরিবার সময় তাহাকে খেলা হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল। নিলু প্রথমে একটু দমিয়া গেল। তারপর কনিষ্ঠ সঙ্গীটির সহিতই বিড়ালছানা লইয়া পূর্ব্ববৎ খেলিতে লাগিল।

একটু পরে বিড়ালছানাটা আর দাঁড়াইতে পারে না দেখিয়া খেলোয়াড় দুইটি আরেকটা নূতন মজা আবিষ্কার করিল। নিলু বাচ্চাটির পায়ে ধরিয়া দাঁড় করাইতে চায়, সে হেলিয়া পড়ে। নিলু হাসিয়া ওঠে আর বলে "দাঁড়া বলছি, বাঃরে, দাঁড়াবিনা?" নিলুর সঙ্গীটিও ছুটিয়া ছুটিয়া নাচিয়া নাচিয়া এক-একবার নিলুর সঙ্গে আসিয়া বলে

"দা--আ, দায়ায়িনা।" বিড়ালটি তখন শাবকের এ-পাশে ও-পাশে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া করুণস্বরে কেবলি ডাকিতেছিল।

বালকেরা জানিতে পারে নাই যাহাকে লইয়া তাহারা আনন্দ করিতেছিল তাহার ক্ষুদ্র প্রাণের স্পন্দনটুকু গলার মধ্যে একবার মুষ্টির চাপ লাগায় কখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে!

নিলুর চেয়ে তিন বছরের বড় দিদি ক্ষেন্তি কতকগুলি সন্ধ্যামালতী আঁচলে করিয়া আনিতেছিল। দূর হইতে যখন সে দেখিল নিলু তাহার আদরের বিড়ালছানাটিকে লইয়া খেলা করিতেছে তখন ফুলভরা আঁচলটি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া সে দৌড়াইয়া আসিতে আসিতে চীৎকার করিয়া বলিল "ফের আমার ছানা ধর্‌ছিস্? রাখলি? রাখ্ বল্‌ছি?" নিলু একবার মাত্র ধাবমানা ভগ্নীর প্রতি ঈষৎ চাহিয়া নিজের খেলায় নিবিষ্ট হইল,—শত্রুর ভ্রূকুটিকে সে যেন কিছুমাত্র ভয় করে না। ফস্ করিয়া ক্ষেন্তি আসিয়াই নিলুর পৃষ্ঠে এক কিল বসাইয়া দিল এবং বিড়াল ছানা তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। বিড়াল-ছানাকে ক্ষেন্ত একটু ব্যস্তভাবে নাড়িয়া দেখিল; নিলু ভগ্নীর পায়ে দুইবার খিমচি কাটিল এবং যখন যোদ্ধবেশে দাঁড়াইয়া ভগ্নীর বিড়ালশাবক-ধৃত হাত টানিয়া লইবার জন্য রুখিয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে ক্ষেন্ত চীৎকার করিয়া ক্রন্দন-মিশ্র স্বরে বলিল "পাজি, ছানা মেরে ফেলেছিস্, তুই কেন মার্‌লি আমার ছানা!" ক্ষেন্তির কথা শুনিয়া নিলুর উদ্যত হস্ত নামিয়া পড়িল এবং ক্ষেন্তমণি ছানা ফেলিয়া দিয়া নিলুকে উপরি উপরি খুব মারিতে লাগিল।

ক্ষেন্তর আঁচল হইতে তখন ফুলগুলি শাবকের উপর পড়িয়া গিয়া যেন তাহার পুষ্পের কবর রচনা করিয়া দিয়াছিল।............

কোন দিন যাহা হয় নাই আজ তাহাই হইল। নিলু বিনা আপত্তিতে অপরাধীর মত ভগ্নীর সেই প্রহার সহ্য করিল। নিলুর আরেক ভগ্নী আসিয়াও তাহাকে ভর্ৎসনা করিল, বলিল "আহা, এমন সুন্দর ছানা! পাজি কোথাকার —মেরে ফেল্লি।" এই বলিয়া সেও নিলুকে দু-ঘা মারিল। প্রতিবেশী দুইজন স্ত্রীলোক সেখান দিয়া যাইতেছিল; তাহারাও বিড়ালছানার জন্য করুণা প্রকাশ করিতে লাগিল। একজন বলিল "নিলুর হাতে গণককে কিছু দান কর—তবেই দোষ কাটিবে।"

প্রহার ও তিরস্কারের আঘাত নিলুর দেহে ও মনে যুগপৎ ব্যথা দিয়া তাহার ক্ষুদ্র আত্মাটিকে বড়ই অপরাধী সাব্যস্ত করিল। মাথা নীচু করিয়া অশ্রুসিক্ত চক্ষে সে সকল শাস্তি বহন করিল। ক্ষেন্তর মা আসিলে ক্ষেন্ত ক্রন্দনের মাত্রা বাড়াইয়া নিলুর বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিয়া "পাজি, গাধা" প্রভৃতি আপত্তিজনক শব্দে নিলুকে বিশেষিত করিল। ক্ষেন্ত এমন সুবিধা আর পায় নাই; অন্য দিন হইলে নিলু চীৎকার করিয়া ক্ষেন্তর চুল টানিয়া তাহাকে কিল মারিয়া জয়ী হইয়া তবে ছাড়িত। আজ সে শাবকটি মারিয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে।

সেইদিন খাইতে বসিয়া নিলু প্রতিদিনের মত জায়গা, পীঁড়ি, গ্লাস, কিছুই লইয়া গোল বাধাইল না। এবং বিনা আপত্তিতে সকল গ্রাসগুলিই গ্রহণ করিল। বিড়ালটা যখন পাতের কাছে আমিষের আশায় আসিল, নিলু চক্ষু নীচু করিয়া রহিল—যেন বিড়ালটাকে তাহার বড়ই ভয় করে। সেইদিন সন্ধ্যায় সে ঠাকুরমাকে রূপকথা বলার তাগিদ দিল না এবং কেহ জানিল না সে কখন খাইয়া বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পরদিন প্রভাতে অভ্যাসমত সে যখন আমগাছতলায় খেলিতে যাইতেছিল হঠাৎ বিড়াল-টাকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থামিয়া রহিল এবং একটু পরে পুকুরে কাগজের নৌকা ভাসানোর জন্য রাখাল যখন তাহাকে ডাকিল, সে গেল না। তার ছোট ভাই ছুটিয়া আসিয়া, যখন বলিল—'দাদা, মেওকে আল মেলো না! দিদি কাঁবেব!" তখন নিলুই কাঁদিয়া ফেলিল।

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ।

আমার

খাঁচা ভাবে 'আমার পাখী',
　　পাখী ভাবে 'আমার খাঁচা';
প্রভু ভাবেন 'আমার হাতেই
　　তোদের দুয়ের মরা বাঁচা!'

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্র।

তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর

(জাপানী শ্রমণ একাই কাওাগুচির ভ্রমণ বৃত্তান্ত)

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

দয়াময়ী বৃদ্ধা।

আমার ডাক শুনিয়া একজন বৃদ্ধা তাঁবু হইতে মুখ বাহির করিয়াই দেখিয়াই বাহিরে আসিয়া আমার ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত, ধূলি-ধূসরিত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "আহা হা! কোন তীর্থযাত্রী!" তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইবার কোন লক্ষণ দেখিলাম না। তখন সাহস করিয়া বলিলাম "আমি কৈলাশ-পর্ব্বতের যাত্রী, লাসা হইতে আসিতেছি। আমাকে দয়া করিয়া যদি তাঁবুতে আশ্রয় দেন, বাঁচিয়া যাই—বাহিরে বড় শীত।" বৃদ্ধা আনন্দিতচিত্তে আমাকে তাঁহার তাঁবুতে আশ্রয় দিলেন। যখন তাঁবুর ভিতর গিয়া বসিয়াছি তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিয়া তুমি এ-পথে এসেছ? এ-রাজ্যে সহজে কেহ আসে না।" আমি বলিলাম "সাধু গিলং রিনপোচির নিকট যাইতেছিলাম কিন্তু পথ হারাইয়া এদিকে আসিয়াছি।" তিনি আমার সমুদায় বাক্য বিশ্বাস করিলেন, এবং কেটলিতে চা ফুটিতেছিল, তাহা হইতে এক বাটি ঢালিয়া আমায় দিলেন। আমি চা লইলাম, তারপর গমের রুটীর মত এক-প্রকার খাদ্য আমায় দিতে আসিলেন, আমি বিনীত ভাবে বলিলাম "আমি বৌদ্ধ শ্রমণদিগের ন্যায় একাহারী, দুইবার আহার আমার বিধিবিরুদ্ধ।" এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধার আমার প্রতি অগাধ ভক্তি জন্মিল। কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে গিলং রিনপোচির গুহা সেখান হইতে একদিনের পথ-সে অঞ্চলে তাঁহার ন্যায় সাধু আর একজনও নাই, তাঁহাকে দর্শন করিলে অনেক পুণ্য ও অশেষ ফল লাভ হয়। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আমায় বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। পথে একটি নদী আছে, তাহার জল এত ঠাণ্ডা যে হাঁটিয়া পার হওয়া অসম্ভব। তিনি বলিলেন যে তাঁর একটি চমরী গরুতে চড়িয়া আমি তাহা পার হইতে পারিব। বৃদ্ধার পুত্র তখন কার্য্যান্তরে কোথায় গিয়াছিলেন, সেদিনই ফিরিবার কথা। বৃদ্ধা বলিলেন "আমার ছেলেও তোমার সঙ্গে যাইবে।" আমি এ প্রস্তাব শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহাকে আমার জীর্ণ পাদুকার কথা বলিলাম। চমরীর চামড়ার তালি লাগাইয়া সেটা মেরামত করিব, কিন্তু চমরীর চামড়া দুদিন জলে ভিজাইয়া না রাখিলে সেলাই করা যায় না। বৃদ্ধা বলিলেন "এখান হইতে আমাদের কালই যাইতে হইবে। তুমি সেখানে গিয়া দুদিন বিশ্রাম করিও, সেই সময় জুতাও মেরামত করিয়া লইবে। সম্প্রতি আমার ছেলের জুতা পায় দিয়া যাও—সেখানে গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিও।" এই-সকল কথাবার্ত্তার পর রাত্রে শুইতে যাইতেছি এমন সময় তাঁহার পুত্র আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম মাতাপুত্রের গিলং রিন-পোচির উপর অগাধ ভক্তি—তিনি তাহাদের পক্ষে দৈব-শক্তি-বিশিষ্ট কোন দেবতা, মানুষ নহেন। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া বৃদ্ধার আজ্ঞাক্রমে পুত্র আমার জন্য চমরী সজ্জিত করিয়া আনিল। চমরী গরু-জাতীয় জীব, দেখিতে অনেকটা সেই-প্রকার—কিন্তু পাগুলি খাটো-খাটো, উচ্চে গরুর চেয়ে কম, গায়ে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লোম, লেজটি চামরের গোছার মত। চমরী-গাইএর চক্ষুর দৃষ্টি বড় ভীষণ—আর শিং এত দীর্ঘ এবং ছুঁচাল যে দেখিলে ভয় হয়, কিন্তু বাস্তবিক চমরী-গাইএর প্রকৃতি ভীষণ নয়, বরং সাধারণ গাভী অপেক্ষা শান্ত। চমরী তিব্বত-বাসীর জীবনের প্রধান অবলম্বন। বৃদ্ধার পুত্র, তিনটি চমরী সজ্জিত করিল, একটি আমার জন্য, একটি তাহার নিজের জন্য, আর একটির পৃষ্ঠে সেই সাধুর জন্য নানাবিধ উপহার সজ্জিত হইল—যথা মাখন, গমের রুটী, শুষ্ক দুধ, ইত্যাদি। যাত্রার পূর্ব্বে বৃদ্ধা আমায় এক বাটি গরম চা দিলেন, ইহার তুল্য আদর-অভ্যর্থনার বস্তু আর নাই। এই-প্রকারে সজ্জিত হইয়া আমরা সাধুর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। উত্তর-পশ্চিম দিকে দুই আড়াই মাইল চড়াই-উতরাই ভাঙ্গিয়া চলিয়াছি, এমন সময় ভীষণ ঝড় শিলা-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। দুই ঘণ্টা পথে বসিয়া থাকিতে হইল। এই অবসরে আমার সঙ্গীর নিকট পথের সমুদায় তথ্য সংগ্রহ করিয়া লইলাম। আবার চলিতে আরম্ভ

করিয়া শীঘ্রই ১২০ হাত চওড়া এক নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিয়া চমরীতে চড়িয়া সহজেই তাহা পার হইলাম, পথে ঐরূপ আরও দুইটি নদী পার হওয়া গেল। এবং প্রায় ৬ মাইল চড়াই পার হইয়া এক শুভ্র পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হইল। সঙ্গী বলিল "ঐ সেই সাধুর আশ্রম।" যতই নিকটস্থ হইতে লাগিলাম ততই দেখিতে পাইলাম পূর্ব্বে যাহা প্রকাণ্ড পর্ব্বত বলিয়া মনে হইয়াছিল বাস্তবিক তাহা এক বিস্তীর্ণ গুহা, তাহার সম্মুখে ধূসর রং‌এর আর-এক গুহা দেখিলাম; শুনিলাম সেখানে গিলং রিনপোচির শিষ্যেরা বাস করে। সাধুর গুহার সম্মুখে পৌঁছিতে প্রায় ৩টা বাজিয়া গেল। আমার সঙ্গী, সাধুর চরণ দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু শুনিলেন তখন কিছুতেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে না। তখন অগত্যা তাঁহার এক শিষ্যের নিকট তাঁহার মাতার প্রেরিত সমুদায় উপহার-সামগ্রী রাখিয়া কহিলেন "বলিও যে পাসাং এই-সমুদায় পাঠাইয়াছেন। পথে শিলাবৃষ্টির জন্য দেরী হইয়া গেল, আমাকে আজই ফিরিয়া যাইতে হইবে।" সে ব্যক্তি চলিয়া গেল। আমি সেই গুহায় সাধুর শিষ্যের সহিত রহিলাম। তাহার নিকট হইতে কৈলাশ পর্ব্বত সম্বন্ধে নানা সংবাদ গ্রহণ করিতে লাগিলাম। সে ব্যক্তি যাহা বলিল তাহা বড় আশাপ্রদ নহে। সেখান হইতে কৈলাশ পর্ব্বত ২২।২৩ দিনের পথ—পথে মানবের সমাগম নাই, যদি থাকে তবেই বিপদ—তাহারা নিশ্চয় ডাকাত। আমি শুনিয়া বলিলাম "ডাকাতের হাতে পড়িলে ভয় নাই, যথা-সর্ব্বস্ব দিয়া প্রাণ বাঁচাইব।" নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর যথারীতি ধ্যানধারণায় সময় অতিবাহিত করিয়া শয়ন করিলাম। পরদিন চক্ষু খুলিয়া দেখি শিষ্যটি গুহার বাহিরে আগুন জ্বালাইতেছেন। আমি উঠিয়া মুখ না ধুইয়াই ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিতে বসিলাম। আমি যে লাসা হইতে আসিয়াছি বলিয়া পরিচয় দিয়াছি, মুখ ধোয়া লাসার রীতি নয়, আমি কি করিয়া মুখ ধুই! আমি যে কি অস্বচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিলাম তা আর কি বলিব? লাসার মত হওয়াও চাই। সেই মুখেই আহার করিয়া বেলা ১১টার সময় সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গুহাবাসী সাধু।

যে সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম তিনি বড় সাধারণ ব্যক্তি নন। সেই গুহার চারিদিকে ১০০ মাইল পর্য্যন্ত লোকের তিনি ইষ্ট-দেবতার ন্যায়। সে অঞ্চলের সমুদায় লোক শয়ন করিবার পূর্ব্বে উহাঁর দিকে ফিরিয়া বার বার ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া বলে "আমি প্রভু গিলং‌এর শরণাপন্ন হইতেছি, তিনি আমার পরিত্রাতা প্রভু।" আমি দেখি সাধুর গুহার সম্মুখে প্রায় ২০ জন লোক অপেক্ষা করিতেছে, তাহারা সকলেই রাত্রে পর্ব্বতের নিকটে তাঁবুতে রাত্রি যাপন করিয়াছে। তাহারা সকলেই সাধুর দর্শনা-কাঙ্ক্ষী। আমি যতদিন ছিলাম প্রতিদিনই এই দৃশ্য দেখিয়াছি। এই সময় ভিন্ন অন্য সময় সাধুকে দর্শন করা যায় না। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় আমরা গুহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম গুহার দ্বার রুদ্ধ। এবং তখনই প্রায় ৭০ বৎসরের একজন বৃদ্ধ দ্বার খুলিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। যাহার যাহা অর্ঘ্য ছিল, তাঁহার নিকট দিল, তিনি সমুদয় গ্রহণ করিয়া সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। তৎপরে প্রত্যেককে "ওঁ মণি-পদ্মে হুং" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সাধু এক টেবিলের অপর পারে বসিয়া ছিলেন, সকলে সাধুকে দর্শন করিতে গেল। দেখিলাম প্রত্যেকে টেবিলের সম্মুখে গিয়া জোড়-হস্তে মস্তক অবনত করিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া দাঁড়াইল। এই-প্রকারে নাকি দীনতা জানাইতে হয়। সাধু প্রত্যেকের মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। যাহারা পদস্থ, তাহাদের মস্তকে দুই হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমার মস্তকে দুই হাত রাখিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি দেখিলাম সাধুর আকৃতি অতি সৌম্য এবং সুন্দর, দেহ দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ, যদিও বৃদ্ধ তথাপি দেহে স্বাস্থ্য এবং শক্তি যথেষ্ট আছে। সাধুর এমন বলিষ্ঠ আকৃতি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। কিন্তু যাহা দেখিলাম এবং শুনিলাম, তাহাতে আর সংশয় মাত্র রহিল না যে তিনি বাস্তবিকই সাধু—জীবের প্রতি তাঁর অসীম দয়া। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন "তোমার ন্যায় ব্যক্তির এই দুর্গম পথে ভ্রমণ সাজে না, তুমি কেন এখানে এসেছ?"

"আমি বৌদ্ধ-পুরোহিত, তীর্থ দর্শন করিয়া বেড়াইতেছি, আপনার খ্যাতি শুনিয়া ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।"

"কি-প্রকার শিক্ষা?"

"আপনি শত শত ব্যক্তিকে মুক্তি দিতেছেন, তাহার গূঢ় সঙ্কেত কি তাহাই জানিতে চাই।"

"বন্ধু, তুমি নিজের মনেই তা জান, বৌদ্ধধর্ম্মের সমুদায় উন্নত শিক্ষা আমি তোমার মধ্যে দেখিতেছি, আমি আবার তোমায় কি শিক্ষা দিতে পারি? আমার একখানি ধর্ম্ম-পুস্তক আছে, তাহার সাহায্যে মানুষের মুক্তির উপায় বলিয়া দিয়া থাকি।"

"কোথায় সে ধর্ম্ম পুস্তক, আমি কি একবার দেখিতে পারি?"

"নিশ্চয় পারিবে" বলিয়া গুহা হইতে একখানি পুস্তক আনিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি সেদিন গুহায় আসিয়া সারাদিন সেই পুস্তকখানি পড়িলাম। আমার বোধ হইল "সূত্র-সন্দর্ভ-পুণ্ডরীক" হইতে সেখানি রচিত হইয়াছে। তৎপর দিন পাদুকা-সংস্কার কার্য্যে কাটাইলাম। পর দিন সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুস্তকখানি ফিরাইয়া দিলাম এবং তাঁহার সহিত তিব্বতের এবং জাপান ও চীনের বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পার্থক্য সম্বন্ধে অনেক কথা হইল।

৭ই জুলাই সাধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তিনি আমায় প্রায় দশ সের আহার্য্য—গমের রুটী মাখন ইত্যাদি—উপহার দিলেন। বলিলেন "এ-সকল পথের সম্বল না লইয়া গেলে তুমি অনাহারে পথেই মরিবে।" আমি পৃষ্ঠে বিপুল বোঝা লইয়া সাধুর নিকট হইতে চলিলাম।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দুর্দ্দশার একশেষ।

সাধুর গুহা ত্যাগের কয়েক ঘণ্টা পরে আমি ১৮০ গজ চওড়া এক নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন প্রায় বেলা ১১টা হইবে। নদী পার হইবার পূর্ব্বেই প্রাতরাশ সমাধা করিয়া লইলাম। আহারান্তে পাদুকা খুলিয়া কাপড় উপরে তুলিয়া নদী পার হইবার উদ্যোগ করিলাম। নদীর জলে অবতরণ করিবামাত্র সমুদায় দেহ যেন অবশ হইয়া আসিল, জল একেবারে বরফ! আমি বুঝিতে পারিলাম এ নদী পার হইতে হইবে না, মধ্য পথেই আমার মৃত্যু হইবে। তৎক্ষণাৎ জল হইতে উঠিয়া পড়িলাম, কিন্তু বরফজলে আমার শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে কম্পও আসিল। আমার নিকট লবঙ্গের তৈল ছিল, উত্তমরূপে তাহা সর্ব্বাঙ্গে মাখিলাম। তখন একটু রৌদ্রও ছিল, তেল ঘসিতে ঘসিতে যেন একটু সুস্থ হইলাম, তাহার পর আবার নদীতে নামিলাম। জল বরফগলা, অর্দ্ধপথে যাইতে না যাইতে দেহের নিম্নার্দ্ধ অসাড় হইয়া আসিল, আমি লাঠিদ্বয়ে ভর করিয়া কোনমতে ত নদী পার হইলাম। নদীর জল কটিদেশ পর্য্যন্ত ছিল, এবং স্রোতও খুব প্রবল। নদী পার হইয়া দেখিলাম আমার দেহ বাস্তবিক অসাড় হইয়াছে। বুঝিলাম এখন শরীরে রক্তের চলাচল হওয়া আবশ্যক, দেহ উত্তমরূপে ঘসিতে হইবে—ঘসিব কি, হাত দুটি একেবারে অবশ!—যাহোক দুটি ঘণ্টার পরিচর্য্যার পর দেহ সবল হইল। বেলা দুইটার সময় যাত্রা আরম্ভ করিলাম, তখন পা দুটির এমন অবস্থা যে মনে হইতে লাগিল যে বুঝিবা পা দুটি শরীর হইতে খসিয়া পড়িবে। পৃষ্ঠের বোঝা একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে আধ মাইল উঠিয়া আবার এক মাইল নামিয়া একটি নদীর তীরে আসিয়া পড়িলাম। তখন বেলা প্রায় ৪টা। শরীরের অবস্থা তখন এমন যে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তখন সেখানে রাত্রি যাপনের আয়োজন করিলাম। কোন-প্রকারে একটু আগুন করাই আমার একমাত্র কার্য্য হইল। কাঠ ত সে দেশে নাই—থাকিবার মধ্যে চমরীর ও বন্য ঘোড়ার করীষ, তাহাই চারিদিক হইতে সংগ্রহ করিয়া বেশ করিয়া সাজাইলাম। দেশলাই ত নাই, এখন আগুন জ্বালি কিরূপে! লোহার সহিত পাথর ঠুকিয়া অনেক চেষ্টার পর আগুনও জ্বলিল। এইবার চা প্রস্তুত করা। চা ফুটিতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল, তাহার পর তাহাতে একটু মাখন ও লবণ দিয়া পান করিলাম। আগুন একটু-একটু সারারাত রাখিলাম। কিন্তু শীত এমন প্রচণ্ড যে কার সাধ্য নিদ্রা যায়। কোনমতে রাত্রি যাপন করিয়া ভোর হইবামাত্র আবার আগুন জ্বালাইয়া আহারের আয়োজন করিলাম। আহারান্তে নদী পার হইতে গিয়া দেখিলাম

নদীর উপর জল জমিয়া গিয়াছে। নদী কিরূপে পার হইতে হইবে সে সম্বন্ধে যে উপদেশ পাইয়াছিলাম তা ভুলিয়া গেলাম। নদী পার হইবার সময় পাহাড়ে বুদ্ধের এক প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখা যাইবে, শুনিয়াছিলাম। পার হইবার সময় সেখানে কিছুই দেখিলাম না। দেখিব কি, আমি ত ভুল পথে আসিয়াছি। পাঁচ মাইল গিয়া এক বিস্তীর্ণ উপত্যকায় আসিয়া পড়িলাম; তাহা ১৭।১৮ মাইল দীর্ঘ, ৮।৯ মাইল প্রশস্ত হইবে। তাহার মধ্য দিয়া এক নদী প্রবাহিত। কম্পাস দেখিয়া বুঝিলাম উত্তর-পশ্চিম মুখে যাত্রা করিতে হইলে এই নদী পার হইতে হইবে। বরফ-জলে আবার অবগাহন আমার নিকট বিষম বলিয়া বোধ হইল। নদীর দিকে চাহিয়া ইতস্তত করিতেছি, এমন সময় দেখি এক ব্যক্তি নদী পার হইয়া আমার দিকে আসিতেছে। নদী পার হইলেই তাহাকে ডাকিলাম। শুনিলাম সে ব্যক্তি থাম হইতে গিলং রিনপোচি সাধুর দর্শন মানসে যাইতেছে। তাহাকে কিছু শুষ্ক পীচ ও গমচূর্ণ দিয়া আমায় নদী পার করিয়া দিতে বলিলাম। সে ব্যক্তি আশার অতীত দাক্ষিণ্য দেখিয়া আনন্দের সহিত আমার জিনিষপত্র নিজে বহিয়া হাত ধরিয়া আমায় পার করিয়া দিল। আমার গন্তব্য পথ দেখাইয়া বলিল, দুই দিন যাত্রার পর লোকালয় মিলিবে। সে আবার নদী পার হইল। আমিও নির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করিলাম।

ষোড়শ অধ্যায়।

বিপদের পূর্ব্বাভাস।

সেদিন যাত্রা আরম্ভ করিবার কিছুক্ষণ পরেই নিঃশ্বাসের কষ্ট আরম্ভ হইল এবং বমনের উদ্বেগ হইতে লাগিল। আমি পৃষ্ঠের বোঝা নামাইয়া বসিলাম, বোঝা বহিয়া আমার পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা হইয়াছিল, যেন কোন ভীষণ ক্ষত। সুস্থ হইবার জন্য ঔষধ সেবন করিলাম। ঔষধ খাইবার পরই আমার মুখ দিয়া অঞ্জলি-পরিমাণ রক্ত উঠিল। আমি বড় ভীত হইলাম—আমার ত কোন-প্রকার পীড়া নাই। এত দুর্ব্বল বোধ করিলাম যে উঠিয়া আর চমরীর করীষ অন্বেষণ করিতে পারিলাম না, অগ্নি জ্বালান হইল না। শুইয়া পড়িলাম এবং শুইতে-না-শুইতে গভীর নিদ্রা আসিয়া আমাকে অচেতন করিল। কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিলাম জানি না। আমার মুখের উপর চড়বড় করিয়া শিল পড়িতেছে দেখিয়া জাগিয়া পড়িলাম, উঠিবার চেষ্টা করিলাম, শরীরে দারুণ বেদনা—কোনমতেই উঠিতে পারি না; শেষে অনেক চেষ্টার পর উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু আবার পথ চলা বা করীষ সংগ্রহ করা অসম্ভব হইল। আমি মেষচর্ম্মের উপর বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলাম। তখনও রাত্রি অবসান হয় নাই, আকাশে চন্দ্র ক্ষীণ জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছে—দূরে উচ্চ পর্ব্বতমালা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, চারিদিকের কি মহান সুগম্ভীর ভাব। আমি সেই উন্নত হিমাচল-শিখরে নির্জ্জনে একাকী বসিয়া কত কি ভাবিলাম। কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা আমার এই প্রকৃতির বিরাট দৃশ্য উপভোগে অন্তরায় হইতেছিল। যাহোক অনেক চেষ্টার পর ভাবসাগরে চিত্ত তন্ময় হইল – তখন মনের আনন্দে কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলাম, এত্র কষ্টের ভিতরও পরম সুখ সম্ভোগ করিলাম। প্রভাত হইল। উষ্ণ আঙুর খাইয়া আজ প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলাম। তার পর প্রসন্নচিত্তে আবার যাত্রা আরম্ভ করিলাম। একটি ছোট নদীর তীরে আসিয়া আমি আগুন জ্বালিয়া আহারের উদ্যোগ করিলাম। চা পান করিয়া নদী পার হইয়া পাহাড়ে উঠিয়া দেখি সম্মুখে একটি সাদা আর কয়েকটি কাল রং-এর তাঁবু পাতা রহিয়াছে। তিব্বতে সাদা তাঁবু হয় না, আমি এই সাদা তাঁবুর অর্থই বুঝিতে পারিলাম না। আমার আর ভাবিবার সময় নাই, তাঁবুতে যত শীঘ্র পারি পৌঁছিতে পারিলে বাঁচি। অতি কষ্টে বড় তাঁবুর কাছাকাছি উপস্থিত হইয়াছি—আর ৫।৬টা ভীষণ কুকুর আমায় তাড়া করিয়া আসিল; আমি চলচ্ছক্তিরহিত, তবুও যেটুকু শক্তি অবিশিষ্ট ছিল তদ্দ্বারা কোন-মতে লাঠি ঘুরাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলাম।

শ্রীহেমলতা দেবী।

মহতের নিন্দা

মহতের নিন্দা শুনি রেগো না হে কেউ,—
বাঘেরই পিছনে সদা ডেকে থাকে ফেউ।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

সেকেন্ পণ্ডিত

(গল্প)

পুকুরের পাড়ে খড়ের আটচালায় গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুল। গোলোক ভট্টাচার্য্য এই স্কুলের সেকেন্ পণ্ডিত।

ভট্টাচার্য্যের মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে, কিন্তু তাঁহার বয়স কত বলা কঠিন। গ্রামস্থ যাহারা লেখাপড়া শেষ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, যাহাদের শিক্ষালাভ প্রায় শেষ হইয়া আসিল এবং সবেমাত্র যাহাদের বিদ্যারম্ভ হইয়াছে,—সকলেই পণ্ডিত মহাশয়ের ছাত্র। বিজয়ার সম্ভাষণ উপলক্ষে পিতা পুত্র এবং পৌত্র—তিন পুরুষেই তাঁহার পদধূলি লইয়া থাকে।

বর্ষাকালে দেশ জলে ভাসিয়া গেলে ছাত্রদিগকে তালের ডোঙ্গায় স্কুলে আসিতে হয়। যে-সব ডোঙ্গা পণ্ডিতের বাড়ীর পথে যাতায়াত করে তাহারই একখানিতে তাঁহার গমনাগমন নির্ব্বাহ হয়। ছাত্রেরা স্কুলের জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে পায়, দূরে বাঁশের লগি মারিয়া ডোঙ্গা আসিতেছে—মাঝখানে কালর উপর মলিন শাদা কাপড়ে ছাওয়া খোলা ছাতা। ঐ ছাতার নীচে যে মাথা সেটা নিশ্চয় গোলোক পণ্ডিতের। ছেলেরা অমনি শশব্যস্ত হইয়া ভাল-মানুষটির মত যথাস্থানে গিয়া বসে।

গ্রীষ্মকালে পুকুরের পাড়ে এক কোণে শনি-মঙ্গলবারে খড়ের হাট বসে। কাল-বৈশাখীর অপরাহ্নকালে যখন ঈশান কোণে পুঞ্জীভূত মেঘ আসন্ন ঝঞ্ঝার সূচনা করে তখন ব্যাপারীরা ত্রস্ত হইয়া ব্যস্ত ভাবে খড়ের বোঝা মাথায় লইয়া বাড়ীর দিকে ছুটে। সকলে চলিয়া গেলে শেষের বোঝাটি যাহার সে বিব্রত হইয়া পড়ে; তখন স্কুল-ঘর হইতে বাহির হইয়া বিপন্ন ব্যাপারীর মাথায় বোঝাটি তুলিয়া দেন—সেকেন্ পণ্ডিত।

২

হেডপণ্ডিত অহিভূষণ ঘটক নর্ম্যাল স্কুলের পাশ। তিনি বিদেশী, তাই জমিদার-বাবুর কাছারী-বাড়ীর এক প্রান্তে আড্ডা ফেলিয়াছেন। জমিদার-বাবু যে সুনিয়মে রাজ্যশাসন করেন তাহার প্রমাণ বাহিরের লোকে বড় একটা পায় না; তবে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনের নমুনা-স্বরূপ তিনি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খয়রাত করিয়া থাকেন। সকাল বেলা কাছারী-ঘরে গরিব-দুঃখীর ভিড়ের মধ্যে খাজানা আদায় ও রোগী বিদায় সমান ভাবে চলে।

অহিভূষণ অত্যন্ত সংস্কৃত-ঘেঁসা সাধুভাষায় কথা কহেন। তিনি ফরাসের এক পাশে বসিয়া 'শব্দকল্পদ্রুম নামক বৃহদভিধান পাঠ' করিতে করিতে 'হৈমপথেরও' চর্চ্চা করিয়া থাকেন। 'এ ক্ষেত্রে নক্সভমিকার ত্রিংশৎ ক্রমের এক মাত্রা প্রয়োজ্য,' 'পল্‌সেটিলা সেবন না করিলে রোগিণী ব্যাধিমুক্তা হইবে না,' ইত্যাকার পরামর্শ জমিদার-বাবু হেড পণ্ডিতের নিকট প্রত্যহই লাভ করেন।

গোলোক ভট্টাচার্য্যও মাঝে মাঝে ফরাসে আসিয়া বসেন। তবে তাঁহার রুচি আহারে যত ঔষধে তত নয় বলিয়া কোথাও ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইলে সেই আলোচনাই বিশেষ ভাবে করিয়া থাকেন। বৃহৎ গ্রামে বহুলোকের বাস, সুখদুঃখও এখানে অনেক; অন্নপ্রাশন অথবা আদ্যশ্রাদ্ধ, বিবাহ কিংবা সপিণ্ডীকরণ ঘন-ঘনই হইয়া থাকে। ছানাবড়ার চেয়ে পানতোয়া ভাল, কি পায়স অপেক্ষা ক্ষীর উৎকৃষ্ট, এ-সকল বিষয়ে ভট্টাচার্য্য নিমন্ত্রণ-কারীকে মন্ত্রণাদানে বিমুখ হন না।

আহারের পর বিশ্রাম স্বাস্থ্যনীতির অবশ্যপালনীয় উপদেশ। সুতরাং ভোজন গুরুতর হইলে বিরামও দীর্ঘতর হওয়া উচিত, ইহাই সেকেন্ পণ্ডিতের অভিমত। এই জন্য কোথাও ভোজ হইলে গোলোক ভট্টাচার্য্য সেদিন হাফ্ স্কুল করিতে হেড পণ্ডিত মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু অহিভূষণ বলেন, শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইলেই পণ্ডিতেরা অৰ্দ্ধেক পরিত্যাগ করিবেন; ব্রাহ্মণভোজন নিমন্ত্রণকারীর যাহাই হউক, নিমন্ত্রিতের সর্ব্বনাশ নহে, সুতরাং বিদ্যালয়ের অৰ্দ্ধেক বর্জ্জন করা অনুচিত। ভট্টাচার্য্য নিরুপায় হইয়া ছাত্রদিগকে পুনরায় পড়াইতে আরম্ভ করেন। টেবিলের উপর সশব্দে বেত্রাঘাত এবং হুঙ্কার করিয়া ছেলেদের গোল থামাইলেন, পরক্ষণেই প্রশ্ন—'সন্ধি কর, বধূ ছিল উদয়।' কয়েকটি ছাত্র সমস্বরে উত্তর করিল—'বধূদয়'। চেয়ারের উপর পা দু'খানি তুলিয়া গোলোক পণ্ডিত তদুপরি উড়ানি টানিয়া দিলেন এবং পিঠের দিকে কাঠের উপর মাথা রাখিয়া পুনরপি আদেশ করিলেন,

‘বিশ্লেষ কর্—নবোঢ়া।’ বধূদ্বয়ের প্রীতিকর অনুষ্ঠানের পর নবোঢ়ার সন্ধি বিচ্ছেদের নিদারুণ আদেশ দিয়া ভট্টাচার্য্য নাসিকাধ্বনি আরম্ভ করিলেন। অহিভূষণের বিশ্বাস, দ্বিতীয় পণ্ডিত অতিরিক্ত দধিভোজন করিয়া নিদ্রালু হন। এ সম্বন্ধে সহকারীকে সাবধান করিতে তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি নাই, কিন্তু ‘দ্বিতীয়’ ‘প্রথমের’ কথায় কর্ণপাতও করেন না।

৩

গোলোকের মাতৃদেবী বর্ত্তমান। তিনি নিজে বিবাহ করেন নাই। সংসারে শুধু মা ও ছেলে। মা এক-একবার আক্ষেপ করেন, “বাবা, বিয়ে করিলি না; তোর সোনার সংসার হইত, আমি দেখিয়া চোখ জুড়াইতাম।” ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলেন, “মা, নিজের ছেলের চেয়েও কি পরের মেয়ে মিষ্টি? সেকেন্ পণ্ডিতি করি, ছেলেপিলেকে কি খাওয়াইতাম?”

প্রত্যূষে মায়ের পূজার জন্য ফুলতোলা গোলোকের নিত্যকর্ম্ম। রাত্রি শেষ না হইতে তিনি সাজি হাতে বাহির হন। অন্ধকারে বাগানে মানুষের সাড়া পাইলেই কাহারও বুঝিতে বাকী রহে না যে ভট্টাচার্য্য আসিয়াছেন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, “কে?” উত্তর হয়, “আমি গোলোক।” দারুণ শীতে অথবা ঘোর দুর্য্যোগেও এ পুষ্পচয়নের বিরাম ঘটে না। লোকে বলে, গোলোক ভট্টাচার্য্য এক ফুলে মায়ের পূজা দেবতার পূজা দুই-ই করে। অহিভূষণ একদিন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয় রথাবলোকন এবং কদলী বিক্রয় যুগপৎ করিয়া থাকেন!”

বাড়ীর চারি ভিটায় চারিখানি খড়ের ঘর। একপাশে কতকগুলি আম জাম কাঁটালের গাছ। আঙ্গিনা পরিষ্কার করিয়া নিকানো; এক কোণে তুলসীমঞ্চ। দিনের বেলা আহারের মাত্রা প্রায়ই চড়ে বটে, কিন্তু রাত্রে গোলোক ভট্টাচার্য্য স্বল্পাহারী। দুই বেলা সমানভাবে রান্না বৃদ্ধা জননীর কষ্টকর বলিয়াই বোধ করি ভট্টাচার্য্যের এ অভ্যাস হইয়াছে।

সন্ধ্যা না হইতেই আহার শেষ হয়। গরমের দিনে ছেলের খাওয়া হইলেই মা জপের মালা লইয়া ঘরের দাওয়ায় বসেন, আর ভট্টাচার্য্য তুলসীতলায় মাদুর বিছাইয়া ছোট একটি তাকিয়া মাথায় দিয়া হারিকেন লণ্ঠনের আলোকে ভাগবত পড়েন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর চোখ বুজিয়া আসে, খোলা বইখানি হাত হইতে খসিয়া বুকের উপর বিরাম লাভ করে। গভীর রাত্রে কখন্ লণ্ঠন নিবিয়া গিয়া বনের অন্ধকার আঙ্গিনাটি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; মা হঠাৎ তন্দ্রাভঙ্গে চকিত স্নেহার্দ্র কণ্ঠে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলেন, “বাবা, ঘরে শোবে এস।”

৪

বর্ষাকাল, খালবিল নদীনালা একাকার হইয়া গিয়াছে। জলপ্লাবিত প্রদেশে জমিদার-বাবুর অট্টালিকা উচ্চ দুর্গের ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মাঝে-মাঝে ভদ্রলোকের খড়ো বাড়ী এবং চাষীদের কুঁড়ে ঘর গুচ্ছে গুচ্ছে দ্বীপের মত দেখাইতেছে। বারোয়ারি কালী-বাড়ীর অশ্বত্থ আজানু জলমগ্ন; রথতলায় কাঠের খুঁটিতে বাঁধা রথ হাবুডুবু খাইতেছে। ক্ষেতে ক্ষেতে ধানের শীষগুলি ডিঙ্গি মারিয়া কোনমতে জলের উপর গলা বাড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে। ডিঙ্গি ডোঙ্গা তাহাদের ভিতর দিয়া সর্ সর্ শব্দে বিদ্রূপ করিয়া চলিয়া যায়। গরিবের সরিবার ঠাঁই কোথায়! শীষগুলি কাঠের তলায় লুটাইয়া পড়ে। চাষাদের ছেলেরা ঘরের মাচার উপর বসিয়া মাঠের জলে ছিপ ফেলে, অদূরে নদীর উপর দ্রুতগামী ষ্টীমারের চাকার আঘাতে আলোড়িত বারিরাশি তরঙ্গ তুলিয়া ফাৎনা কাঁপাইতে থাকে।

ভাদ্র সংক্রান্তি; আজ বিশ্বকর্ম্মা পূজা। ভোর হইতে আকাশ অন্ধকার; মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া দিনের আলো ভাল ফুটিতে পায় নাই। বিষণ্ণ প্রকৃতির দীর্ঘনিশ্বাসের মত এক-একবার হু হু করিয়া হাওয়া দিতেছে; গাছপালা হাত পা ছুঁড়িয়া যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। কামার কুমোর ছুতারমিস্ত্রিরা সকাল বেলা হাতিয়ার পূজা করিয়া অপরাহ্ণের প্রতীক্ষায় নিষ্কর্ম্মা বসিয়া রহিয়াছে; বিকাল বেলা ‘বাচ্’ খেলা হইবে।

তিনটা না বাজিতে গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বিলের মধ্যে এক-একখানি করিয়া নৌকা আসিতে লাগিল। নৌকাগুলি সমস্তই সুসজ্জিত; পাটাতনের উপর শতরঞ্চ বিছানো, সিন্দূর-রঞ্জিত গলুইতে লাল শালু বাঁধা। কোন নৌকায়

জারিগান হইতেছে, কোথাও খোল করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তন চলিতেছে, আবার একখানি নৌকায় সামিয়ানা খাটাইয়া গ্রামস্থ রজকদিগের সখের যাত্রা সুরু হইয়াছে। নৌকায় নৌকায় এবং বিলের ধারে মেলা বসিয়াছে। হাঁড়ি-কলসী কুলা চালুনী মাটির-পুতুল পাতার-বাঁশী ছুরি কাঁচি বঁটি দা কালীঘাটের-পট রবিবর্ম্মার-ছবি মুড়ি মুড়কি বাতাসা এবং নানা মনোহারী দ্রব্য গ্রামের ছেলে-বুড়াকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে। বাদলার দিনে লোকে ঘরের বাহির হয় না, তথাপি সমারোহ বড় অল্প নয়।

ক্রমে বাচ্ আরম্ভ হইল; নৌকাগুলি পঁচিশ ত্রিশ বোঠে মারিয়া পাশাপাশি দ্রুতবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত নৌকায় 'সাপা' হা'ল—সেও এক একখানি প্রকাণ্ড বোঠে; মাঝিরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হা'ল টানিতে লাগিল। ঝপ্ ঝপ্ শব্দে অসংখ্য বোঠে পড়িতেছে—যেন সারি সারি পা ফেলিয়া নৌকাগুলি জলের উপর দৌড়িতেছে। চারিদিকে জল ছিটাইয়া খেলোয়াড়েরা ভিজিয়া একেবারে স্নান করিয়া উঠিল। নৌকাগুলি বিল হইতে নদী এবং নদী হইতে বিল—প্রায় তিন চার রশি পথ যাওয়া আসা করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার দিকে আকাশ ভাঙ্গিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কড়্কড়্ মেঘের গর্জ্জন এবং চড়্চড়্ বারিপাতের গম্ভীর নিনাদে আর সমস্ত শব্দ ডুবিয়া গেল। থাকিয়া থাকিয়া জলের ঝাপটায় দিগন্তব্যাপী গভীর কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হইতে লাগিল। বিলের ধারের মেলার লোকে যে যেখানে পারে ছুটিয়া পলাইল, তীরের জনতা ছায়াবাজির মত মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

এমন সময় নদীর মোহানায় বিলের কাছাকাছি একখানি ডোঙ্গায় সেকেন্ পণ্ডিতের পরিচিত খোলা ছাতাটি দৃষ্টিগোচর হইল। সে-দিনও ভট্টাচার্য্যের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া অহিভূষণ যথারীতি স্কুল খোলা রাখিয়াছিলেন। ছুটি হইলে গোলোকের ছাত্র তিলিদের ফটিকচাঁদ তাঁহাকে নিজের ডোঙ্গায় তুলিয়া লয়। এমন দুর্দিনে ডোঙ্গায় না চড়িলেই ভাল হইত; কিন্তু ঝড়জল কখন থামিবে বলা যায় না—বাড়ী ত যাইতে হইবে! বিশেষতঃ বিলের পথে গ্রামের মধ্যে বিপদের আশঙ্কা অল্প।

বায়ু-তাড়িত জলধারায় চারিদিক্ ঘন ঘন অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। ডোঙ্গা কখন্ যে পথ ছাড়িয়া নদীর মোহনায় আসিয়া পড়িয়াছে, ফটিকচাঁদ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। একবার কুয়াসা কাটিয়া গেলে গোলোক ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, তিনচারখানি বাচের নৌকা বিলের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, ডোঙ্গা একেবারে তাহাদের মুখে! মুহূর্ত্তমধ্যে একখানি নৌকার গলুইএর আঘাতে ফটিকচাঁদ জলশায়ী হইল। ভট্টাচার্য্য তৎক্ষণাৎ ছাতা ফেলিয়া 'মধুসূদন, মধুসূদন!' বলিয়া চীৎকার করিয়া দুই হাত বাড়াইয়া লাফাইয়া নদীতে পড়িলেন। তিনি একবারে ফটিকের সঙ্গে সঙ্গে ডুবিয়া গেলেন। সমস্ত নৌকার বোঠে হঠাৎ থামিল, কিন্তু নৌকাগুলি ছুটিতেছিল, তাহাদের বেগ যখন কমিয়া আসিল তখন শূন্য ডোঙ্গা দূরে পিছন দিকে ঢেউএর উপর আছাড় খাইতেছে। কয়েকজন সন্তরণপটু বাচখেলোয়াড় বহু চেষ্টায় মৃতবৎ ফটিকচাঁদকে টানিয়া তুলিল, কিন্তু গোলোক ভট্টাচার্য্যকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সেই দিগন্তব্যাপী জলরাশির কোন্খানে তাঁহার সমাধি হইল কে বলিবে!

তদবধি প্রতিবৎসর ভাদ্র-সংক্রান্তিতে স্কুলের ছুটি হয়। ছেলেদের কেহ যদি বলে,—আজ বিশ্‌করম পূজা, অন্যে তৎক্ষণাৎ তাহার ভুল দেখাইয়া দেয়,—না, আজ সেকেন্ পণ্ডিত স্বর্গে গিয়াছেন!

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

কষ্টিপাথর

বৌদ্ধধর্ম্মে মানুষ ও রাজা।

পৃথিবীর সকল দেশেই, পৃথিবীর উৎপত্তি কিরূপে হইল, মানুষ কিরূপে জন্মাইল, এই দুইটি কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া থাকে।

বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—তাহা ভাবিয়া তোমার দরকার কি? এমন কি, মানুষ কোথা হইতে আসিল, তাহাও তিনি কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যান নাই।

মহাসাঙ্ঘিকেরা কিন্তু, মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন—অনাদিকাল হইতেই 'সম্বর্ত্ত' (প্রলয়) ও 'বিবর্ত্ত' (সৃষ্টি) চলিতেছে। প্রলয় হইয়া গেলে সমস্ত সত্ত্ব (জীব) 'আভাস্বর' নামে এক স্বর্গে উৎপন্ন হয়। আবার যখন সৃষ্টি হয়, লোকের থাকিবার স্থান হয়, কতকগুলি 'সত্ত্ব' 'আভাস্বর' হইতে নামিয়া পৃথিবীতে উৎপন্ন হন। তখন তাঁহারা 'স্বয়ংপ্রভ', 'অন্তরীক্ষচর', 'মনোময়', 'প্রীতিভক্ষ', 'সুখস্থায়ী', ও

'কামচর' থাকেন। তাঁহাদের নিজের শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত হয়, চন্দ্রসূর্য্যের প্রয়োজন থাকে না, নক্ষত্রতারার প্রয়োজন থাকে না, আকাশের দরকার হয় না, দিন থাকে না, রাত্রি থাকে না, পক্ষ থাকে না, মাস থাকে না, ঋতু থাকে না, অয়ন থাকে না, বৎসরও থাকে না, তাঁহারা, যখন যেখানে ইচ্ছা, অন্তরীক্ষে ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহাদের আহার প্রীতি এবং বাড়ীর সুখ। সুখনিবাসে থাকিয়া তাঁহারা প্রীতি ভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহারা যাহা করেন, সবই ধর্ম্ম।

তাহার পর পৃথিবী উদয় হইল—যেন একটি হ্রদ, জলে পরিপূর্ণ। সে জলের কি রঙ! কি আস্বাদ! মিষ্ট যেন মধু, যেন ক্ষীরের ধারা, যেন ঘৃতের ধারা। কোন কোন জীব একটু লোভে পড়িয়া আঙ্গুলের আগায় সেই মধু তুলিয়া একটু চাখিলেন, ভাল লাগিল; আবার চাখিলেন, ক্রমে খাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি আরও পাঁচজনে চাখিতে ও খাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা পেট পুরিয়া খাইতে লাগিলেন। এতদিন জীবগণ লঘুকলেবর ছিলেন; খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীর ভারী হইয়া উঠিল, শক্ত হইয়া উঠিল, কর্কশ হইয়া উঠিল। তাঁহাদের যে গুণগুলি ছিল, সেগুলি ক্রমে লোপ হইল, দেহের জ্যোতি লোপ হইল, শুধু প্রীতি ভক্ষণ করিয়া আর তাঁহাদের চলে না, অন্তরীক্ষে আর তাঁহারা বেড়াইতে পারেন না; সুতরাং চন্দ্রসূর্য্যের দরকার হইল, নক্ষত্রের দরকার হইল; দিন, রাত্রি, মাস, সংবৎসরের দরকার হইল।

পৃথিবীর রস খাইতে খাইতে তাঁহাদের রঙও সেইরূপ হইয়া গেল। এইরূপে অনেক দিন যায়। যাঁহারা অধিক আহার করেন, তাঁহাদের রঙ খারাপ হইয়া উঠে; আর যাঁহারা অল্প আহার করেন, তাঁহাদের রঙ ভাল থাকে। ভাল রঙের লোকে মন্দ রঙের লোককে অবজ্ঞা করে। সুতরাং 'আমি বড়' 'তুমি ছোট' এই মান-অভিমান জাগিয়া উঠিল। এতদিন যে ধর্ম্ম তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল, অভিমানের উদয়ে সে ধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া গেল। পৃথিবী হইতে সে রসও লোপ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা খান কি? পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভুঁইপটপটি উঠিল—চারিদিকে যেন বেঙের ছাতা ফুটিয়া উঠিল। আহা, তাহার কি বর্ণ! কি রঙ! কি গন্ধ! কি আস্বাদ! মিষ্ট যেন মৌচাকের মধু। পৃথিবীর রস অন্তর্দ্ধান হইলে জীবসকল দুঃখে গাহিয়া উঠিলেন—হায় রস! হায় রস!

ক্রমে তাঁহারা ভুঁইপটপটি খাইতে লাগিলেন। ভুঁইপটপটির মত তাঁহাদের রঙ হইল। এইরূপে কত কাল-কালান্তর কাটিয়া গেল। যাঁহারা অধিক আহার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের রঙ খারাপ হইয়া আসিল; যাঁহারা অল্প আহার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের রঙ ভাল থাকিল। যাঁহাদের রঙ ভাল, তাঁহারা খারাপ রঙের লোককে অবজ্ঞা করেন। আমি 'বড়', 'তুমি ছোট' এই মান-অভিমান বাড়িয়া উঠিল। ভুঁইপটপটির লোপ হইল, তাহার জায়গায় বনলতা জন্মাইল। লোকে তাহাই আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রঙ বনলতার মত হইয়া গেল। ক্রমে বনলতার বেলায়ও মান-অভিমান আসিয়া জুটিল, বনলতারও লোপ হইল। এবার আসিলেন শালিধান। এ ধানের কণা নাই, তুষ নাই, অতি সুগন্ধ। সন্ধ্যায় ধান কাটিলে, সকালে আবার গজাইয়া উঠে, সকালে কাটিলে সন্ধ্যায় গজাইয়া উঠে; শুধু গজাইয়া উঠে, এমন নয়, একেবারে ধান পাকিয়া উঠে, বার ঘণ্টায় একেবারে পাকা ধান পাওয়া যায়। এই ধান খাইয়া লোকে কতকাল রহিল। প্রথম প্রথম সকলেই সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা ধান ঝাড়িয়া আনিত। সকাল সন্ধ্যায় খাইত, সঞ্চয়ের নামটিও করিত না, কিন্তু ক্রমে দু একজন ভাবিল, দু বেলাই বা ধান কাটিতে হইবে কেন? এক বেলাতেই দু বেলার ধান যোগাড় করিয়া আনি। তাহারা তাহাই করিতে লাগিল। তাহাদের দেখাদেখি অনেকেই সেইরূপ করিতে লাগিল, বরং সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এখন আর দু'বেলার সঞ্চয়ে কুলায় না, দুই দিনের সঞ্চয় হইতে লাগিল, ক্রমে দুই সপ্তাহেরও সঞ্চয় হইতে লাগিল। ক্রমে ধানের কণা আর তুষ বাড়িতে লাগিল। আর সকালে ধান কাটিলে সন্ধ্যায় আর গজায় না, সন্ধ্যায় কাটিলে সকালে আর গজায় না।

অন্নরসের সঙ্গে-সঙ্গে আর-এক উৎপাত আসিয়া জুটিল। কতকগুলি জীবের শরীরে পুরুষের চিহ্ন দেখা দিল, কতকগুলি জীবের স্ত্রীচিহ্ন দেখা দিল। তাহারা আবার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে লাগিল, একদৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, ক্রমে দোষ উৎপন্ন হইল। দোষ উৎপন্ন হইলে লোকে লাঠি, ঠেঙা, ঢিল পাটকেল মারিতে লাগিল, গায়ে ধূলা দিতে লাগিল। দেশে অধর্ম্ম উপস্থিত হইল বলিয়া সাড়া পড়িয়া গেল। এ কি? একটি জীব আর-একটি জীবের দোষ উৎপন্ন করিয়া দেয়—এ ত বড় অন্যায়। ইহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, নিয়মবিরুদ্ধ। ক্রমে ক্রমে অনেকদিনের পর এ দোষ সহিয়া গেল। লোকে মনে করিল, ইহা ধর্ম্মসম্মত, সমাজসম্মত, সহবতসম্মত। লোকে প্রথমে ভয়ে ভয়ে এক দিন দুই দিন একত্র বাস করিত, এখন মাস, পক্ষ, সংবৎসর একত্র বাস করিতে লাগিল, গৃহকর্ম্ম সকলও স্ত্রীলোকদিগকে করাইতে লাগিল, ক্রমে অধর্ম্মের কথা চাপা পড়িয়া গেল।

ওদিকে কণাওয়ালা, তুষওয়ালা ধান ক্ষেতি না করিলে আর জন্মায় না। কতকগুলি দুষ্টলোকে অন্যায় করিয়া সঞ্চয় করিতে গিয়া আমাদের এমন সুখের খোরাকে ছাই দিল; এখন ক্ষেত ভাগ করিতে হইবে, সীমাসরহদ্দ বাঁধিয়া দিতে হইবে। এইরূপে আবার কিছুদিন চলিল।

একজন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—আমার ত এই ক্ষেত, এই ধান। যদি কম জন্মায়, কি করিয়া চলিবে? সে মনে মনে ঠাহরাইল, দিক্ আর না দিক, অন্যের ধান আমি তুলিয়া লইব। সে আপনার ধানগুলি সঞ্চয় করিয়া অপরের ক্ষেতের ধানগুলি উঠাইয়া লইয়া আসিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া বলিল, "তুমি কর কি? পরের ধান তাহাকে না বলিয়া তুলিয়া আনিতেছ?" "আর এরূপ করিব না।" কিন্তু আবার সে পরের ধান না বলিয়া তুলিয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া আবার বলিল, "তুমি ফের এই কাজ করিলে?" সে বলিল, "আর এরূপ হইবে না।" কিন্তু কিছুদিন পরে সে আবার পরের ধান উঠাইয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি এবার আর চুপ করিয়া রহিল না। সে তাহাকে বেশ উত্তম-মধ্যম দিয়া দিল। তখন ধানচোর হাত তুলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল,—"দেখ ভাই, আমাকে মারিতেছে, দেখ ভাই, আমাকে মারিতেছে, কি অন্যায়! কি অন্যায়!" এইরূপে পৃথিবীতে চুরি, মিথ্যাকথা ও শাস্তির প্রাদুর্ভাব হইল।

তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল—আইস, আমরা একজন বলবান্, বুদ্ধিমান, সকলের মন যোগাইয়া চলে, এমন লোককে আমাদের ক্ষেত রাখিবার জন্য নিযুক্ত করি। তাহাকে আমরা সকলে ফসলের অংশ দিব। সে অপরাধের দণ্ড দিবে, ভাল লোককে রক্ষা করিবে, আর আমাদের ভাগমত ফসল দেওয়াইয়া দিবে। তাহারা একজন লোক বাছিয়া লইল। তাহাকে তাহারা ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ দিতে রাজী হইল। সকলের সম্মতিক্রমে সে রাজা হইল, এইজন্য তাহার নাম হইল মহাসম্মত।

মহাবস্তু অবদানে বুদ্ধদেবের উপকথা উপলক্ষে এই বৃত্তান্তটি দেওয়া

হইয়াছে। এই মহাসম্মতের অনেক পুরুষ পরে ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর অনেক পুরুষ পরে শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদনের পুত্র বুদ্ধদেব।

পলিত্রিপিটকেও এইরূপ একটি গল্প আছে, 'অগ্গঞ্ঞ সুত্ত', অর্থাৎ অগ্রণ্যসূত্র, অর্থাৎ কে সকলের আগে—গল্পচ্ছলে তাহার উপদেশ। থেরাবাদীরা এ গল্পটি স্বয়ং বুদ্ধদেবের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের এক শিষ্য ছিলেন, তাহার নাম বাশিষ্ঠ ভারদ্বাজ, তিনি যদিও ভিক্ষু হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া মনে মনে গর্ব্ব করিতেন। তাই বুদ্ধদেব একদিন তাঁহাকে এই গল্পটি শুনাইয়া দেন। তিনি বলিয়া দেন ব্রাহ্মণ অগ্রণ্য নয়, ভিক্ষুই অগ্রণ্য।

রাজা যে ঈশ্বরের অংশ—এই মতটি অধিক দেশেই চলিত। রাজা যে প্রজার চাকর, এ কথা অনেকেই বলিতে সাহস করে না। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এই মত অনেকদিন চলিয়াছিল। চন্দ্রকীর্ত্তি খৃঃ পঞ্চম শতকে বলিয়াছেন :—

"গণদাসস্য তে গর্ব্বঃ ষড়্ভাগেন ভৃতস্য কঃ।"

"তুমি ত দেশের লোকের দাস। ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ লইয়াই তোমার জীবিকা। তুমি আবার গুমর কর কি?"

(নারায়ণ, বৈশাখ) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* * *

ইউরোপীয় ট্র্যাজেডি ও ভারতীয় করুণরস।

জিনিষ গড়িতে যেমন আনন্দ, ভাঙ্গিতেও ঠিক তেমনি আনন্দ। শুধু গড়ার জন্য যেমন গড়া, শুধু ভাঙ্গার জন্যই তেমনি ভাঙ্গা—ইহাতেই আনন্দ। কোন উদ্দেশ্য, কোন ফল বা অফল সম্মুখে রাখিয়া এ আনন্দ নহে, এ আনন্দ অহৈতুক নিরপেক্ষ। এই ভাঙ্গনের পদ্ধতিটি, তাহার মধ্যে যে রসটি, তাহা লইয়া হইতেছে ট্র্যাজেডি। বস্তু বস্তুর সংস্পর্শে কিরূপ চুরমার হইয়া যাইতেছে, ঘটনা ঘটনার সহিত সংযুক্ত হইয়া কিরূপে প্রলয়কে ডাকিয়া আনিতেছে, জগতের মধ্যে, মানুষের মধ্যে রুদ্রের যে তাণ্ডব নৃত্য তাহাই চিত্রিত করিতেছে ট্র্যাজেডি। বস্তুর ভাঙ্গনের অন্তরালে একটা গড়নের দিক আছে কি না, সংঘর্ষের পশ্চাতে শান্তি, বিরহের পরে মিলন, দুঃখের অবসানে সুখ আছে কি না বা থাকা উচিত কি না—এ প্রশ্ন না তুলিয়া, তাহার প্রতি অণুমাত্র দৃষ্টি না দিয়া, শুধু ভাঙ্গন, শুধু সংঘর্ষ, শুধু বিরহ, শুধু দুঃখের খেলাকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়া ট্র্যাজেডি অপরূপ রস সৃজন করিয়া চলে।

এই হিসাবে ভারতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডি বলিয়া জিনিষটি যে ছিল, এমন বোধ হয় না। ভারতীয় কবিবৃন্দ এই বৈপরীত্যের, এই ভাঙ্গনের দিকটা যে জানিতেন না, তাহা নয়। বিশেষরূপেই জানিতেন—ধ্বংসের মধ্যে, বিচ্ছেদের মধ্যে যে রস উদ্বেলিত, তাহার মহনীয় চিত্র আমরা যথাতথা পাই। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ছিল সর্ব্বদাই গড়নের, মিলনের, শান্তির রেখা টানিয়া ভাঙ্গনের খেলাকে সুবলয়িত করিয়া ধরা। দুঃখের কষ্টের চিত্র অঙ্কিত কর, যত মর্ম্মন্তুদ করিয়া চিত্রিত করিতে পার কর, কিন্তু সমাপ্তিতে চাই সুখ, স্বস্তি—মধুরেণ সমাপয়েৎ। ভারতীয় সাহিত্যে পাই করুণরস, কিন্তু তাহা ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয় নাই। পাশ্চাত্যও যে কোনদিন ঐ ভারতীয় ভাবের ভাবুক হয় নাই, তাহা নয়। ঐ কথাটি মনে রাখিয়া লাতিন আলঙ্কারিক কাব্যরচনার সূত্র দিয়াছেন, Tragicum principium et comicum finem, কিন্তু বস্তুতঃ ইউরোপের কবিপ্রাণে এ ভাবটি স্থান পায় নাই। দান্তে তাঁহার মহাকাব্যের নাম দিয়াছেন Divine Comedy, ইহার শেষ মিলনাত্মক। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ মহাকাব্য ট্র্যাজেডির রসেই ভরপুর। এ কমেডির অর্থ দুঃখেরই মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ নিহিত রহিয়াছে, জিহোবার ভ্রূকুটির মধ্যেই যে হাস্যরেখা লুক্কায়িত। দান্তের সমস্ত কাব্যটি জীবনের ট্র্যাজেডি প্রতিফলিত করিতেছে Inferno'র সেই বিখ্যাত ছত্রে—

Lasciate ogni sperranza voi ch'entrate.

প্রথমে বিয়োগের দৃশ্য, কিন্তু অন্তিমে মিলনের দৃশ্য—ভারতীয় কবিপ্রেরণা ইহাই চাহিয়াছে। মানুষ সাধারণতঃ ইহাই চাহে। দুঃখের মধ্যে আছে এক অস্বস্তি, এক অতৃপ্তি—তাহার মধ্যেই সব শেষ হইলে হৃদয়ে কেমন এক ফাঁক রহিয়া যায়, মনের প্রশ্ন অমীমাংসিতই রহিয়া যায়—ততঃ কিম্? এই প্রশ্নটিকে বুকে রাখিয়া অস্বস্তির ভারে পীড়িত হইয়া মানুষের পক্ষে থাকা দুরূহ। শেষ অর্থই ত মীমাংসা, তৃপ্তি জিজ্ঞাসার মীমাংসা, প্রাণের তৃপ্তি। তাই কপালকুণ্ডলার পরিণাম জানিতে আমরা উৎসুক, পরিশিষ্ট লিখিয়া তাহার একটা পরিশেষ না পাইলে প্রাণটা কেমন চঞ্চল হইয়া পড়ে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে যাহাই হউক, কবিও প্রাণের এই অস্বস্তি, এই অতৃপ্তি, এই জিজ্ঞাসা-নিরসনের জন্যই যে অন্তিমে মিলনের, সুখের, হাস্যের অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহা ঠিক নয়। উহা অপেক্ষা গভীরতর কারণ আছে। কাব্যের লক্ষ্য ও কাব্যের উদ্দেশ্যের সহিত সে কারণ বিজড়িত।

ভারতীয় কবিগণ কাব্যসৃষ্টিকেও আধ্যাত্মিকতা অথবা মানুষের পক্ষে উচ্চতর কল্যাণকর একটা কিছুর সহিত মিলাইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বলিয়াছেন—"সা চ নিঃশ্রেয়সমূলম্"। মানুষের মধ্যে মহত্তর বৃত্তি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, সাধারণ জীবনের খণ্ডতা, দ্বন্দ্ব, আবিলতার অতীতে আর একটা অলৌকিক প্রতিষ্ঠানের বিমলতা, শান্তি, পূর্ণতাকে গোচর করিতে হইবে,—ইহাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সাহিত্য মানুষের অন্তরে একটা দিব্য চেতনা, একটা বিশুদ্ধ আনন্দ, একটা শান্তির সুষমা উদ্বুদ্ধ করিয়া দিবে। সাহিত্যও হইবে শিক্ষার ও সাধনার উপায়। মানুষের মন, মানুষের প্রাণ, মানুষের প্রবৃত্তি নিশ্চয় এরূপভাবে পরিচালিত করিতে হইবে, এমন ছাঁচে ঢালিতে হইবে, এমন একটা সুরে বাঁধিয়া দিতে হইবে যেন মহৎ জীবনের উচ্চতর বৃত্তির একটা দিব্যলোকেরই ছায়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইবার অবাধ অবসর পায়। সেই জন্য ভারতীয় সাহিত্য জগৎকে কেবলই নিরানন্দে দ্বন্দ্বে ভরিয়া, মানুষকে কেবলই অভিশাপগ্রস্ত করিয়া দেখাইতে চাহেন নাই। জগতে দুঃখ, দ্বন্দ্ব, খেদ অতিমাত্রই আছে—সাহিত্যের মধ্যেও তাহাকে আবার টানিয়া লইব কেন? সাহিত্য জগতের প্রতিকৃতিমাত্র হইবে কেন? জগতের যে অভাব, মানুষের যে দৈন্য, তাহাকে পূর্ণতা ও ঋদ্ধির মধ্যে ধরিয়া দেখাইয়াই সাহিত্যের সার্থকতা। তাই বৈদিক ঋষি বলিতেছেন, "কবিঃ কবিত্বা দিবি রূপমাসজৎ"। কবি দেখাইবে দিব্য রূপ। তাই ভারতীয় কবি স্থূল-জগতের দ্বন্দ্ব, নিরানন্দ, নশ্বরতাকে মিলনে, সুখে, স্থিতির মধ্যে সকল অভিশাপকে দিব্যবরে মণ্ডিত করিয়া পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। কষ্টের মধ্যে রস আছে, প্রবৃত্তির তৃপ্তিহীন সমাপ্তিহীন হাহাকারের মধ্যেও আনন্দ আছে। কিন্তু তাহা বিপরীত রস, আসুরিক আনন্দ। ভারতীয় কবি এই যে বিকার, বিপর্য্যয়, তাহাকেই একান্ত করিয়া ধরেন নাই, তাহারই প্রভাব মানুষের মনে আঁকিয়া দিতে চাহেন নাই। জিনিষকে ঋজু করিয়া স্থাপন করিয়া মানুষের মনে একটা দিব্য আনন্দই ফুটাইতে চাহিয়াছেন। শকুন্তলা কেন 'ওথেলো'র আদর্শে, কাদম্বরী কেন Bride of Lammermoor-এর আদর্শে রচিত হয় নাই, তাহার কৈফিয়ৎ এইখানে।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না, নীতিশিক্ষাদানই ভারতীয় কাব্যের লক্ষ্য ছিল। এমনও নয় যে, ভারতীয় কবিবৃন্দের সর্ব্বদা সজ্ঞান চেষ্টা

ছিল, কি করিয়া মানুষের মধ্যে মার্জ্জিত রুচি, শোভনতর বৃত্তি, পরিশুদ্ধ অনুভূতি, মহনীয় কল্যাণকর কিছু প্রস্ফুটিত করা যায়। এই-সকল ভাব বা আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারা কাব্যরচনা করিতে প্রয়াস পান নাই। কোন মহাকবিই এইরূপে কাব্য সৃষ্টি করেন নাই। কাব্য আত্মানুভূতির সহজ পরিস্ফূর্ত্তি। আমরা বলিতে চাই, ভারতীয় এই কবি-আত্মা একটি বিশেষ ধাতুতে গঠিত, একটি বিশেষ প্রকৃতি লইয়া উহার নৈসর্গিক অভিব্যক্তি। এই ধাতু, এই প্রকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতের যে অতিপ্রাকৃতের সমুচ্চের প্রতি টান, বিশুদ্ধ বিরজ একেরই প্রতি অনুরাগ, তাহার সে নিঃশ্রেয়সমুখী প্রেরণার জোরে। এই প্রকৃতি হইতেছে দৈবীপ্রকৃতি, উহা সত্ত্বগুণপ্রধান। এই ভারতীয় কলাসৃষ্টি মূলতঃ হইতেছে শান্তরসাস্পদ, উহা সর্ব্বোপরি চায় ধ্যানের নিস্তব্ধতা, প্রসন্নতা। মিলনে শান্তে উহার পর্য্যবসান। বুদ্ধমুক্তির কথা ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু দেখ, নটরাজ রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য—তাহার মধ্যে অপার্থিব শান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রতিপদবিক্ষেপে সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু অন্তরালে নবসৃষ্টির শতদল যেন বিকশিত হইতেছে। অন্য পক্ষে ইউরোপীয় কবিপ্রকৃতি এক আসুরিক তীক্ষ্ণতায় ভরা, উহা প্রধানতঃ রজোগুণের খেলা। তাই গতি, দ্বন্দ্ব, বিক্ষোভের মধ্যেই তাহার আনন্দ। ইউরোপীয় শিল্পের ভঙ্গিমা একীকরণ ততখানি চায় না, সামঞ্জস্যই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। নির্ব্বাণের শান্তি সে চায় না, সে চায় প্রকাশের বৈচিত্র্যের ছন্দোময় দ্বন্দ্ব। এই ভারতীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত জ্ঞানের প্রশান্ত কিরণলেখা; ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত কর্ম্মের বিক্ষোভিত তরঙ্গমালা। ভারতীয় কবি উদাসীন, উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত যোগীর চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন—তাঁহার নয়নে প্রতিভাত 'শান্তং শিবং' সৃষ্টির বিরাটের দিকটি। ইউরোপীয় কবি কর্ম্মজগতে স্থাপিত কর্ম্মীর চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন—সংঘর্ষের, ভাঙ্গনের ভঙ্গিমাটিই তাঁহার চক্ষে বড় হইয়া উঠিয়াছে। তাই মিলনের রসে ভারতীয় কবিপ্রাণ আপনাকে এমন মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন আর বিচ্ছেদের রসেই ইউরোপীয় কবির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিসমুদায়।

ভারতে বিরহী কবির সকল বেদনা, রুক্ষতা, নৈরাশ্যেরও অন্তরে রহিয়াছে কেমন একটি শান্তরসের ছায়া, একটি ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, নির্ভরতা, কেমন একটি দিব্য প্রসন্নতা, একটা স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকতা। দুঃখ দ্বন্দ্ব সেখানে দুঃখত্বে দ্বন্দ্বত্বে, আপন অবিমিশ্রিত স্বরূপসত্তায় উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে নাই। করুণরসের অবতার বাল্মীকি বলিতে পারিয়াছেন—

> "তিষ্ঠ তিষ্ঠ বরারোহে ন তেঽস্তি করুণা ময়ি।
> নাত্যর্থং হাস্যশীলাসি কিমর্থং মামুপেক্ষসে॥"

করুণরসের ইহা পরাকাষ্ঠা। কিন্তু শেক্সপীয়রের সেই—

Absent thee from felicity awhile

And in this harsh world draw thy breath in pain—

ট্র্যাজেডির ইহা পূর্ণ প্রতিমা। সেক্সপীয়রের ভঙ্গিমার মধ্যে কেমন একটি আভাস পাই, সমস্ত জগৎখানি যেন খানখান হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, মানুষের সমস্ত সত্তাটি শতধা বিদীর্ণ হইয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। অরফিউ'র (Orpheus) দেহের ন্যায় সৃষ্টির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া শুধু একটা হাহাকারের প্রতিধ্বনির মধ্যে দিক্‌প্রান্তে মিশিয়া গিয়াছে। তাহাদের উদ্ধার করিবার কোনই উপায় নাই, কোন প্রয়োজনও যেন নাই। একটা মহা অবসানের ঘনঘোরে নিরর্থক হইয়া পড়ায় যেন সৃষ্টির সার্থকতা।

ভারতীয় নাট্যকবি—কালিদাস বা ভবভূতি—কিরূপে করুণরসটি সৃজন করিয়া তুলিয়াছেন, কি প্রণালীতে বিরহের লীলাটি ক্রমপ্রকট করিয়া ধরিয়াছেন এবং সে প্রণালীর সহজ গতি অনুসরণ করিয়া বিরহকে মিলনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ করিয়াছেন; আর ইউরোপীয় নাট্যকার—সেক্সপীয়র বা সোফোক্লিস (Sophocles) কিরূপে কোন্ প্রণালীতে বিরহের বিচ্ছেদের খেলাকেই পরিস্ফুট করিয়া ধরিয়াছেন, পরিশেষে একটা বিরাট বিধ্বংসের মধ্যে সব নিঃশেষ করিয়াছেন, এই দুইটি চিত্র অতি মনোরম, অতি শিক্ষাপ্রদ। প্রাচ্য কবি করুণরসের অবতারণা করিয়াছেন, বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছেন, পরিণামের শান্তি ও মিলনকে গভীরতরভাবে অনুভব করাইবার জন্য। ঐক্যের প্রাণটি সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত করিবার জন্যই তাহার আগে ভেদের খেলাটি দেখাইয়া লইয়াছেন। সংসারের বিচিত্র বহুভঙ্গিম দ্বন্দ্ব ভোগ যে যতখানি করিয়াছে, অন্তিমে সন্ন্যাসের সমরস সে ততই তীব্রভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। আদিপর্ব্ব, যুদ্ধপর্ব্ব, শান্তিপর্ব্ব—ইহাই জীবনের ক্রম। শিল্পে রসসৃষ্টিরও এই একই ক্রম। ইউরোপ জীবনকে এ ভাবে দেখে নাই। দ্বন্দ্ব হইতে জীবনের উদ্ভব, দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া দ্বন্দ্বেই উহার পর্য্যবসান। ভারতীয় প্রতিভা ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়া গড়ার দিকটা দেখাইয়াছে, ইউরোপীয় প্রতিভা ভাঙ্গনের মধ্য দিয়া ভাঙ্গনের দিকটাই দেখাইয়াছে। দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে ভারতের উপলব্ধিটিই বোধ হয় পূর্ণতর সত্য। কিন্তু কবির লক্ষ্য কেবলই সেই সত্যটিই নহে—যাহা পূর্ণতম, ব্যাপকতম। সত্যের ব্যাপ্তি (comprehensiveness) তিনি ততখানি দেখাইতে চাহেন না, যতখানি তিনি দেখাইতে চাহেন তাহার নিগূঢ় অন্তর্ভাবটি (intensiveness)। বস্তুতঃ দার্শনিকেরই চেষ্টা হইতেছে বাহির করা সেই এক সত্যটি, কবি কিন্তু দেখেন বহু সত্য, এক সত্যেরই যে নানা দিকটি—নানা ভাব, নানা রস, নানা রূপ। কবি যখন দৃষ্টিপাত করেন দুঃখ দ্বন্দ্ব বিনাশের উপর—তখন তিনি যদি ইহাদের যে স্ব স্ব ধর্ম্ম, স্ব স্ব গুণ, কেবল তাহাই পরিলক্ষিত করেন, তাহারই সত্য আত্মা, নিভাজ সত্তাটি ফুটাইয়া তুলেন, তবে তাহাতেই তাঁহার কবিত্বের পূর্ণ সার্থকতা।

ইউরোপীয় কবি এই যে ভাঙ্গনের দিকটি দেখাইয়াছেন, এই যে বিয়োগাত্মক রসসৃষ্টি করিয়াছেন, তাই তাহার মধ্যে আছে কেমন একটি তীব্রতা, একটা ঝাঁঝ, একটা ঝাল। ইউরোপীয় কাব্যজগৎ হইতে যাঁহারা হঠাৎ ভারতীয় কাব্য-জগতের মধ্যে আসিয়া পড়েন, তাঁহারা বোধ করেন কেমন এক স্বাদের অভাব,—অতিমাত্র সুন্দর মনোহর হইয়াও অথবা সেই জন্যই কেমন একটা নীরসতায় মাখা। ভারতীয় কাব্য নাটকাদি কখন ইউরোপীয়দিগের নিকট যে artificial নাম পায়, তাহার কারণও ঐখানে। অন্য পক্ষে ভারতীয় কাব্যরসে যাঁহারা বর্দ্ধিত, তাঁহারা ইউরোপীয় কাব্যের সংস্পর্শে আসিয়া উহার দ্বন্দ্ব বিরোধ ধ্বস্তাধ্বস্তি দেখিয়া সহজেই যে বলিয়া উঠিবেন—কি বর্ব্বরতা, কি প্রাকৃতজনসুলভ মাদকতা, তাহাও কিছু আশ্চর্য্য নহে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ভারতীয় কবি artificial নহেন, ইউরোপীয় কবিও বর্ব্বর নহেন। দুইজনেই artistic। তবে দুই রকম আর্ট, দুই রকম রসসৃজন।

দ্বন্দ্বের মধ্যে, সংঘর্ষের মধ্যে, জীবনের বিষময় পরিণামের মধ্যে যে আনন্দ লুক্কায়িত, তাহা প্রাকৃতজনের উপলব্ধি নহে, তাহা কবিদৃষ্টিরই উপলব্ধি। হইতে পারে, এ দৃষ্টি ইতমুখী, কিন্তু তাই বলিয়া উহা কম সুন্দর—কম সত্য নহে। ইউরোপের এই প্রতীতিকে ভারতবর্ষ একান্ত করিয়া লয় নাই। সে চাহিয়াছে সমুদ্রের যে শান্তি, যে সামঞ্জস্য, যে মিলন, তাহাই সুষমায় ভরিয়া সকল গড়িতে সাজাইতে। কিন্তু ঠিক এই জন্যই যে কাব্যহিসাবে উহা শ্রেষ্ঠতর হইবে, তাহাও আবার নয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় কবি দৈবীপ্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান, ইউরোপীয় কবি আসুরীপ্রকৃতি রজঃপ্রধান। ইহাতে একটু ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। সত্ত্বপ্রধান হইলেই কবিত্ব হিসাবে তাহা শ্রেষ্ঠতর হইবে, আর রজঃপ্রধান হইলেই যে তাহা হীনতর হইয়া

পড়িবে, এ কথা সত্য নয়। কবির যে দৃষ্টি, তাহা ত্রিগুণাতীত। উহা ত্রিগুণাতীত; সেই জন্যই যে-কোন গুণের প্রেরণা লইয়া সে সৃষ্টি করিতে পারে। কবি সিদ্ধপুরুষ, তাই তিনি দিব্যভাব বা আসুরী ভাব উভয়েরই মধ্যেই আপনাকে পূর্ণভাবে প্রকটিত করিতে পারেন। কবিত্বের দিক্ হইতে রসসৃষ্টির দিক্ হইতে তাহাতে কোন অঙ্গহানি হইবে না।

(নারায়ণ, বৈশাখ) শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

* * *

কৃষি সমবায়।

কৃষিবস্তু উৎপাদনের জন্য যে সকল সমবায় আছে, তাহারই কয়েকটির এস্থলে উল্লেখ করিব। ইংরেজিতে এইরূপ সমবায়ের নাম Productive Co-operation.

গাঁতা।

বিভিন্ন কৃষক—প্রত্যেকেরই লাঙ্গল, গরু প্রভৃতি কৃষি কার্য্যের সকল উপকরণ আছে, এমন কয়েকজন ব্যক্তি—বৎসরের প্রথমেই এইরূপ অঙ্গীকারপত্রে আবদ্ধ হয় যে, প্রত্যেকের জমি চাষ, শস্যক্ষেত্র নিড়ান, শস্য কর্ত্তন—সকল ব্যাপারে সকল সময়ে একযোগে সাহায্য করিবে। ইহাতে সুবিধা—বর্ষার প্রথমে যখন শস্য রোপণের জন্য কৃষিক্ষেত্র তৈয়ারী করা অতি শীঘ্র আবশ্যক হইয়া পড়ে, সেই সময় প্রত্যেকে একযোগে সকলের সাহায্য পাওয়ায় প্রত্যেকের কার্য্য অতি দ্রুত হয়। এই সময় বর্ষার জল মরিতে না মরিতে কৃষিক্ষেত্র রোপণের উপযুক্ত করিতে না পারিলে সমস্ত বৎসরের শস্যের ক্ষতির সম্ভাবনা। এই প্রণালীর অনুসরণে ওই কার্য্য অতি দ্রুত নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভবপর হয়।

লাঙ্গল হালা।

গাঁতা প্রণালীতে প্রতি কৃষকের land, labour, capital and implements সকলই থাকে প্রত্যেকে বিভিন্ন ভাবে চাষ করিলেও ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে পারে। অর্থশাস্ত্রের কথায় উহা Simple Union ;—Co-operation between different factors of production নহে। কিন্তু লাঙ্গল হালা প্রণালীতে—একজন কৃষকের হয়ত সামান্য ৩।৪ বিঘা জমি আছে সঙ্গতির অভাবে বৎসরের প্রারম্ভে লাঙ্গল অথবা গরু ক্রয় করিবার সামর্থ্য হয় নাই। নিজের কৃষিক্ষেত্র নিজে চাষ করিয়া লাভবান হইব এ আকাঙ্ক্ষাও তাহার হৃদয়ে আছে—অথচ সঙ্গতির অভাবে তাহা সিদ্ধ হইবার পথে প্রচুর বাধা বর্ত্তমান, ইহাও সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছে। এরূপস্থলে সে অন্য একজন কৃষকের সহিত—যাহার লাঙ্গল গরু আছে—এরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় যে উক্ত কৃষকের শস্যক্ষেত্রে নিজ শরীর দিয়া খাটিয়া শস্য রোপণ, কর্ত্তন প্রভৃতি সকল কার্য্যে সমস্ত বৎসর সাহায্য করিবে এবং পরিশ্রমের বিনিময়ে সময়-মত লাঙ্গল, গরু ও প্রয়োজন হইলে উক্ত কৃষকেরও সহায়তা লাভ করিবে। ইহাতেও দুই পক্ষের সুবিধা। যাহার লাঙ্গল গরু আছে—সে উহাদের বিনিময়ে, জমিতে "জল লাগিলে" অথবা শস্য "খড়াইয়া" যাইবার পূর্ব্বেই অপর একজন কৃষকের সহায়তা পায়। বর্ষাকালেও শস্য কর্ত্তনের সময় যখন শ্রমজীবীগণের আদর বিলক্ষণ বাড়িয়া যায়—অতি উচ্চ পারিশ্রমিক ভিন্ন যখন তাহাদিগকে নিযুক্ত করা সম্ভবপর হয় না—তখন এইরূপ লাঙ্গল ও গরুর বিনিময়ে সমপরিমাণে সবল দেহ, কার্য্য অভিজ্ঞ অপর একজন কৃষকের সাহায্য পাওয়া অল্প সুবিধার কথা নহে। এই সকল প্রয়োজন হইলে সুবিধার জন্য লাঙ্গল-হালা কৃষকদ্বয়কে বিনা পারিশ্রমিকে অথবা অল্প পারিশ্রমিকে পরস্পরের সাহায্য করিতে হয়। বর্দ্ধমানে কোন অঞ্চলে এইরূপ অঙ্গীকারবদ্ধ লাঙ্গল-ও-গরুবিহীন কৃষকের নাম "ঢুটলাগা"।

লাগার।

লাগার কৃষকের জমি নাই। সে অপর একজন ধনবান কৃষকের গৃহে কৃষিকার্য্যে সাহায্য করিতে, মজুরের কাজ করিতে নিযুক্ত হয়। পূর্ব্বে এইরূপ লাগার কৃষকের বাৎসরিক মজুরী ১৬।১৭ ্ টাকার বেশী হইত না। কিন্তু এখন খাদ্যদ্রব্যের দুর্মূল্যতা ও জমির উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে লাগার কৃষকও পূর্ব্ব পারিশ্রমিকে কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত নহে। এখন এই পারিশ্রমিক বর্দ্ধিত হইয়া ৩৫।৩৬ ্ হইতে ৪০।৪৫ ্ এবং কোন কোন স্থলে ৬০।৭০ ্ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। লাগার কৃষক কখন কখন বাৎসরিক বেতন ছাড়া—নিজে চাষ করিবার জন্য ১২।১৩ বিঘা জমি প্রার্থনা করে। এই জমির উৎপন্ন শস্যের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ সে নিজে গ্রহণ করে। এ পারিশ্রমিক শুদ্ধ অর্থ ও বেতন নহে (Nominal wages)। মজুরকে অর্থ ও বেতন ভিন্ন, পরিশ্রমের দিবস জলযোগের জন্য মুড়ি, স্নানের জন্য তৈল ও একবেলা অন্ন প্রদানের ব্যবস্থা আছে। লাগার কৃষককে কখন কখন গৃহে শয়নের স্থানও দেওয়া হয়;—পূজা, পার্ব্বণ—বিবাহ, পৈতা বা অপর কোন উৎসবে লাগার কৃষককে কাপড়, গামছা, গেঞ্জি, গায়ের কাপড় প্রভৃতি প্রদানেও ভুল হয় না। ইংরেজিতে এইরূপ পারিশ্রমিকের নাম Real wages। ইহার উপর লাগার কৃষকের জমির কিয়দংশ নিজে চাষ করিতে ও উৎপন্ন শস্যের অংশ-বিশেষ গ্রহণ করিতেও অধিকারী হইতেছে—এইরূপে Profit-sharingএর জটিল প্রশ্নেরও আমাদের কৃষক-সমাজে কিয়ৎ পরিমাণে সমাধান হইতে চলিয়াছে।

পৃথিবীতে অন্যত্র সকল দেশে Labour ও Capitalএর মধ্যে যে নিদারুণ স্বার্থসংঘর্ষ-ফলে সমাজ দুই যুধ্যমান দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে, আমাদের দেশে সে বিপ্লব বীজ উপ্ত হয় নাই।

ভাগে দেওয়া।

ব্রাহ্মণাদি উচ্চ ও অন্য শ্রেণীরও কয়েক ঘর কৌলিন্য-অভিমানী বংশ, নিজে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করেন না—অথচ বংশ আভিজাত্য-ভাব রক্ষা করিতে গিয়া, সময়-মত লাঙ্গল ও গরু ক্রয় করিবার অর্থও নষ্ট করিয়া ফেলেন। আবার কেহ কেহ বা কৃষি হেয় উপজীবিকা জ্ঞান করিয়া, কৃষকগণের জন্য রাখিয়া দূর প্রবাসে চাকুরী অনুসন্ধানে চলিয়া যান। এইরূপ লোকের জমি প্রায়ই "ভাগে দেওয়া" থাকে। জমি অপর কৃষকে চাষ করে, শস্য কর্ত্তন করে ও তাহার পর প্রথা-মত ১৬।২৪, ১৮।২২ অথবা "আধা আধি" ভাগ হয়। ১৬।২৪ অর্থ উৎপন্ন শস্যের ৪০ ভাগ হইয়া—১৬ ভাগ কৃষক গ্রহণ করে, অপর অংশ জমির অধিকারী পাইয়া থাকেন। এই প্রথার দোষ গুণ দুই আছে। দোষ এই—জমির মালিক কৃষি-কার্য্যের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন না। ফলে সময়-মত উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রদান প্রায়ই হয় না। জমি ক্রমে অনুর্ব্বর, ঊষর হইয়া পড়ে। চাষ ও শস্য রোপণ প্রভৃতিও উপযুক্ত সময়ে হয় না বলিয়া—উৎপন্ন শস্যও যথেষ্ট পরিমাণে হয় না; পরিশেষে মালিকের জমি রক্ষাই কষ্টকর হইয়া পড়ে। আবার ইহাতে সুবিধা যে নাই তাহাও বলিতে পারি না। যাহাদিগকে কার্য্য-ব্যপদেশে বিদেশে থাকিতেই হইবে, তাহাদিগের এই প্রণালী অবলম্বন ভিন্ন উপায় কই?

পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে কৃষিকর্ম্ম নিন্দনীয় ছিল না। উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি যদিও একার্য্যে নিজ হস্তে লাঙ্গল ধারণ করিতেন না, কিন্তু "কোদাল" দিয়া জমি পাট, "কাস্তে" সাহায্যে শস্য কর্ত্তন, "মুনিষ" মজুরের সঙ্গে শস্য রোপণ প্রভৃতি সকল কার্য্যই তাঁহারা করিতেন। এ ভিন্ন গৃহেও শারীরিক পরিশ্রমের বহু কার্য্য করিতে তাঁহারা হেয় বোধ করিতেন না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই কর্ম্মে আবার অগ্রসর হইলে "গোলাভরা" ধান্য, "সোনা ফলা" জমি আবার উদ্দিত হইবে।

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক বা যৌথ-ঋণদান সমিতি।

কৃষিকর্ম্মেও অর্থের প্রয়োজন। বাহির হইতে টাকা না আসিলে, সময়-মত অর্থের সাহায্য না পাইলে কৃষি উপযুক্ত পরিমাণে ফলপ্রদ হয় না। কিন্তু বঙ্গের কৃষকের অভাবই সেইস্থলে। সকল কৃষকই অল্পাধিক ঋণগ্রস্ত। সমবায়-ঋণ-গ্রহণ-প্রণালীর সৃষ্টি না হইলে কৃষক সমাজের ঋণ-ভার ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিবে। দেশের ধনবান ব্যক্তিগণ অর্থের কিয়দংশের সংস্থান করিয়া দিলে গভর্ণমেণ্টের সমূহ আনুকূল্য ও সাহায্য পাইয়া থাকেন। বিচক্ষণ লোক চরিত্র-অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি এইরূপ Bank হইতে নিযুক্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে, এই নূতন সমবায় প্রণালী কৃষক সমাজে শিক্ষা দিয়া বেড়ান, তাহা হইলে অচিরে কৃষকের জীবনভার লঘু হইবে—সময়ে অর্থের সাহায্য পাইয়া কৃষকও জমিতে সোনা ফলাইতে পারিবে। কৃষক কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য পরস্পরের মধ্যে মিলিতে শিখিয়াছে Co-operative in production। সমাজ পূর্ব্ব হইতে এইরূপ যৌথ প্রণালীর সৃষ্টি সম্ভব করিয়া রাখিয়াছিল—কৃষক এখন তাহার ফল ভোগ করিতেছে। বর্ত্তমানে শিক্ষিত ও ধনবান ব্যক্তিগণ যদি কর্ত্তব্যের উদার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সমবায় ঋণ গ্রহণ প্রণালী শিক্ষাদান ও স্থাপন করেন—সমগ্র ভবিষ্যৎকালে সমাজ তাঁহাদের সেই অনুষ্ঠান স্মৃতি বুকে চাপিয়া লইয়া যুগযুগান্তরের কৃতজ্ঞ বন্ধ্য ধরিয়া অগ্রসর হইবে।

(গৃহস্থ, মাঘ)

* * *

বাঙলার কয়েকটি প্রধান ধান

(১) অঘানি—অগ্রহায়ণ মাসে পাকে বলিয়া। ত্রিহুত জেলায় প্রায় ৩৩ রকম অঘানি ধান আছে। পাটনা জেলাতে ও এতদঞ্চলে প্রায় ৪৬ রকম অঘানি ধান আছে। (২) ভাদুই—এই ধান সাধারণতঃ ৬০ দিনে পাকে। কোথাও কোথাও আউস ধানকেই ভাদুই ধান বলা হয়। (৩) আশ্বিনি। (৪) আশ্বিনা। (৫) বারমেসে ধান—পুরীধামের সন্নিকটে লক্ষ্মীজলা নামে একটি জলা আছে, তথায় বারমাস ধান চাষ হয়। ইহা ধানের গুণ কিম্বা জলার গুণ তাহা বলা কঠিন অথবা এখানে বীজ, ক্ষেত্র এবং চাষের নিপুণতা এই কয়টিই একাধারে মিলিয়াছে। (৬) বাদসা ভোগ—গোড়ায় অধিক জল থাকিলে দানা মোটা হয়। (৭) বাধা। (৮) বেগুন-বিচি—বেগুন বিচির মত ছোট ও সরু চাউল। (৯) বাঁকুচ। (১০) বাদাম। (১১) বেনাফুলী। (১২) বেনাফুল। (১৩) বাঁকচুর। (১৪) বাও—৩০ ফুট জলের উপরেও এই ধান-গাছ মাথা তুলিয়া থাকে। (১৫) বিয়ানী। (১৬) বোকা—ইহার চাউল সিদ্ধ করিয়া খাইতে হয় না। চাউল কিছুক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলেই নরম ভাতের মত হয়। (১৭) বুনা—বিল জমিতে ছিটাইয়া দিলেই ধান জন্মে, অন্য কিছু বিশেষ চাষ-কারকিতের আবশ্যক হয় না। এই কারণে ইহাকে বুনা বা বুনো (Wild) ধান বলে। (১৮) চাঁপা। (১৯) চেঙা—জল-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে গাছ বাড়িতে থাকে। (২০) ছত্রভোগ। (২১) ছোটনা আমন—প্রকারভেদে ইহা প্রায় ১৩ রকম। (২২) চিনিসাগর, চিনিশকর, চিনিশর্কর। (২৩) দালকচু। (২৪) ধলি—ধান শাদা হয় বলিয়া ইহার নাম ধলি হইয়াছে। (২৫) ধুলিয়া। (২৬) দুধরাজ—খুব শাদা বলিয়া এই নাম। (২৭) দুধকলমা। (২৮) দুর্গাভোগ। (২৯) গজালগরিয়া—এই ধানে ভাল খৈ প্রস্তুত হয়। (৩০) গোবিন্দভোগ। (৩১) গোপালভোগ। (৩২) হরিশঙ্কর। (৩৩) হাতিশাল—বুড কিঞ্চিৎ কাল। (৩৪) জোঙ্গা। (৩৫) কালাজিরা। ধান কাল, খর্ব্বাকৃতি। চাউল খুব মিহি নহে। (৩৬) কালামাণিক। (৩৭) কালিজিরা। (৩৮) কমলভোগ—ইহা বাঙলার একটি প্রধান ধান। ইহার চাউল লম্বা, খুব মোটা নহে, সুগন্ধ আছে। (৩৯) কামিনী বা কামিনী সরু। (৪০) কামোদ।

(কৃষক, বৈশাখ)

কৃষির অন্তরায়

(নৃত্যগোপাল-প্রবাসী-পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধের অংশ)

(ক) অনাবৃষ্টি বা অনিয়মিত বৃষ্টি।

বাঙ্গলার সুফলা চাষের একটি প্রধান অন্তরায় অল্প বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি। বাঙ্গলায় সম্পূর্ণ অনাবৃষ্টি কখনও ঘটে না। অনাবৃষ্টি অপেক্ষা উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি না হইয়া, আজিকাল চাষের বিশেষ বিঘ্ন জন্মাইতেছে। বাঙ্গলার মাটি আলগা ও নরম। একবার বৃষ্টি পড়িলে প্রথম জলটা মাটি সম্পূর্ণভাবে শুষিয়া লয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জল মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃত্তিকারেণুগুলিকে ফুলাইয়া দিয়া অধোমুখে জলপ্রবাহের পথ রুদ্ধ না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বৃষ্টির জল মাটি ভিজাইতেই খরচ হইয়া যায়। মাটি ভিজিবার পর অতিরিক্ত বৃষ্টির জল মাটির উপর জমিয়া থাকে, অথবা নিচুদিকে প্রবাহিত হইয়া অন্যত্র চাষের সুবিধা জন্মায়। ধান চাষের জন্য ক্ষেত্রের উপর এককালীন ৩।৪ ফুট জল জমিয়া থাকা আবশ্যক, এবং ধানই আমাদের দেশের প্রধান শস্য; এবং তাহার সফলতার জন্য অধিক পরিমাণ জলের আবশ্যক। বাঙ্গলায় জলাগমের প্রধান উপায় বর্ষা। বৃষ্টির পরিমাণ অনুযায়ী বাঙ্গলাদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমভাগ, পূর্ব্ববঙ্গ, যেখানে বৃষ্টি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয় অর্থাৎ চাষের জন্য বৃষ্টির জলই যথেষ্ট বা অতিরিক্ত; দ্বিতীয়ভাগ, অবশিষ্ট বঙ্গ, যেখানে বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ চাষের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত; বিগত কোন কোন বৎসর উপযুক্ত বৃষ্টি না হইয়া, বা বারে বারে পরিমিত বৃষ্টিপাতের পরিবর্ত্তে একেবারে অপরিমিত বৃষ্টিপাত হইয়া, বা মোট বৃষ্টিপাতের অল্পতাপ্রযুক্ত যাবতীয় শস্যের অল্পাধিক অজন্মা ঘটাইয়াছিল। ভারতবর্ষে আর একশ্রেণীর স্থান আছে যথা পঞ্জাব রাজপুতনা, সিন্ধু প্রভৃতি, যেখানে বৎসরের মধ্যে হয়ত মোট ১০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতও হয় না।

অনাবৃষ্টির ক্ষতিপূরণের উপায়—(১) কৃত্রিম জলপ্লাবন বা Irrigation.

চাষ করিতে হইলে যেস্থানে স্বাভাবিক উপায়ে জলাগমের সুবিধা নাই, সেখানে কৃত্রিম উপায়ে জলপ্লাবন-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। উল্লিখিত তিন শ্রেণীর দেশ-সমূহের মধ্যে প্রথমোক্ত দেশসকলে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিবার কোন আবশ্যক হয় না। তৃতীয় প্রকার দেশ-সমূহে কৃত্রিম উপায়ে জলপ্লাবন অপরিহার্য্য; তজ্জন্য সেই সকল স্থানে উক্ত উপায় স্থায়ীভাবে অনুষ্ঠিত হইলে দুর্ভিক্ষ বা অন্নাভাবের হাত হইতে একরকম পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কেবল উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশগুলির অবস্থা বড়ই অনিশ্চিত ও দৈবাধীন; একদিকে বরুণদেবের অনিশ্চয়তা, অপর দিকে স্থায়ী জলপ্লাবনপদ্ধতির অপ্রয়োজনাধিক্য।

যাহা হউক বাঙ্গলায় এই অনিয়মিত বৃষ্টির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার প্রধান উপায় সরকারি অথবা বেসরকারি কৃত্রিম উপায়ে জলপ্লাবন। কৃত্রিম উপায়ে জলপ্লাবন দ্বারা অনুর্ব্বর পতিত জমি যে কি পরিমাণে শস্যশ্যামলা করিয়া তোলা যায় তাহার দৃষ্টান্ত ইজিপ্টে এবং ইয়ুরোপের কোন কোন দেশখণ্ডে বহুপুরাকাল হইতে বর্ত্তমান থাকিলেও, আদর্শের নিমিত্ত আমাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে না। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে ইংরেজ-পূর্ব্ব ও ইংরেজশাসন কালে কৃত্রিম উপায়ে জলপ্লাবন-প্রথা প্রভূত পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

জলপ্লাবন মোটামুটি তিন উপায়ে করা হইয়া থাকে। প্রথম পয়ঃপ্রণালী (Irrigation Canals) যেমন শোণ-কেনাল, মেদিনীপুর কেনাল, কাবেরী ডেল্টা সিষ্টেম, পাঞ্জাব কেনালস্ ইত্যাদি। কোন একটি বৃহৎ নদীর সুবিধাজনক স্থানে এপার-ওপার বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া ফেলা হয়, এবং সেই বাঁধের উর্দ্ধে কোথাও নদীর পাড় কাটিয়া খাল প্রস্তুত করা হয়। আবদ্ধ জল সেই খালের মধ্য দিয়া নদী হইতে বহুদূরে লইয়া গিয়া, খালের ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখাদ্বারা জলপ্লাবন করিয়া, কৃষিজমির অভাব মোচন করা হয়। এইরূপ পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জলপ্লাবন গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন বেসরকারি কোম্পানি অথবা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নহে। মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সিতে বেসরকারি কোম্পানির হস্তে কাজ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কোম্পানি অসমর্থ হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে তাহার ভার গ্রহণ করেন। পঞ্জাবে ও সিন্ধুপ্রদেশে পয়ঃপ্রণালী দ্বারা গবর্ণমেণ্ট জলহীন, মরুপ্রায়, বিস্তৃত ভূখণ্ড-সকল উর্ব্বর আবাদী জমিতে পরিণত করিয়া জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। যথা চেনাব কেনাল ২০ লক্ষ একার ভূখণ্ডে জলপ্লাবন করে, এবং তাহার জলনির্গম-ক্ষমতা সাধারণতঃ প্রতি সেকেণ্ডে ১১ হাজার কিউবিক ফুট। এ বিষয়ে সার জন ষ্ট্রাচী (Sir John Strachey) তাঁহার 'ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকের ২২১ পৃষ্ঠায় যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত,—

"No similar works in any countries approach in magnitude the irrigation works of India, and no public works of nobler utility have ever been undertaken in the world."

"পৃথিবীর অন্যকোন দেশ ভারতবর্ষে জলসেচন-প্রণালীর পরিমাণের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে নাই, এবং পৃথিবীর কুত্রাপি মহত্তর পূর্ত্তকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই।" পঞ্জাবে এ বিষয়ে জনসাধারণের ও ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ উদ্যোগ আছে। সেখানে প্রায় ১০ লক্ষ একার ভূমি ব্যক্তিগত পয়ঃপ্রণালী দ্বারা চাষ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বৃহৎ জলাশয়, জলাধার বা কৃত্রিম হ্রদ। বোম্বাই ও সেণ্ট্রাল প্রভিন্সেস্, বিশেষতঃ মান্দ্রাজে এই-প্রকার জলপ্লাবন-প্রথা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়; বিহারেও এরূপ কিছু-কিছু আছে। দেশের মধ্যে সুবিধাজনক উচ্চ স্থানে পাড় দিয়া বৃহৎ গভীর জলাশয়ে বৃষ্টির অথবা কোন নদীর জল আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, অথবা কোন ঢালু ভূপৃষ্ঠে বাঁধ দিয়া তাহার উপরিভাগের বৃষ্টির জল অবরোধ করা থাকে। সেই জলাশয়ের পাড় হইতে জলপ্লাবনের জন্য খাল কাটা হয়। এবং অতিরিক্ত জল জমিয়া জলাশয়ের ক্ষতি করিবার ভয় থাকিলে জল-নিষ্কাশন করিবার পথও রাখিতে হয়। জলপ্লাবনের খাল জলাশয় হইতে নির্গত হইয়া তাহার শাখাপ্রশাখা লইয়া দূরদেশে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ-প্রকার জলাশয় ব্যক্তিগত উদ্যম এবং গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা উভয় উপায়েই হইতে পারে। ভারতবর্ষে এ-প্রকার জলাশয়, সাড়ে ছয় কোটি কিউবিক ফুট জলধারণক্ষম,

নয়বর্গমাইল-ব্যাপী বিশাল জলাশয় হইতে, মাত্র দশ একার ভূমি প্লাবনে সমর্থ ক্ষুদ্র জলাশয় পর্য্যন্ত আছে। বৃহৎ জলাশয়গুলি গবর্ণমেণ্টের সংরক্ষিত, ক্ষুদ্রগুলি সাধারণতঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই-প্রকার জলাধার নির্ম্মাণ ব্যয়-সঙ্কুল ও কষ্টসাধ্য। ইংরেজপূর্ব্ব ভারতে বিশেষতঃ মান্দ্রাজে বহু পুরাতন জলাধার ছিল; ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে কাবেরী নদীতে বৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া হিন্দুরাজগণ জলপ্লাবন করিতেন। এক্ষণে উক্তপ্রকার অনেক জলাধার অসংস্কৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে; অনেকগুলি আবার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাগণ কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিয়াছেন।

তৃতীয়, কূপ অথবা পুষ্করিণী। বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র কূপ খনন করিয়া কপিকলের দ্বারা মানুষের অথবা বলদ মহিষাদির জোরে, চক্রাকারে আবদ্ধ একসারি বালতি অথবা ডোলের সাহায্যে, কিম্বা পাম্প দ্বারা জল উত্তোলন করিয়া দুইটি আইলের মধ্য দিয়া জলপ্রবাহ চালাইয়া ক্ষেত্রে জল দেওয়া হয়। দেশ, কাল ও স্থানীয় নিয়মানুসারে এত বিভিন্ন উপায় প্রচলিত হইয়াছে, যে, সেগুলি এককালীন যেমন মনোহর, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। পুষ্করিণী হইতে জল উত্তোলন করিবার সাধারণতঃ এই চারিটি উপায় প্রচলিত আছে,—ডোঙ্গা, লাঠাথাম্বা, মোশক এবং সিউনী। এগুলি আমরা সকলেই প্রায় একপ্রকার জানি বলিয়া প্রত্যেকটির বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক মনে করিলাম না। ভারতবর্ষের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশে কূপ বা নদী বা পুষ্করিণী হইতে জল উত্তোলন করিবার নিমিত্ত সেখানকার লোকেরা বিবিধ উপায় অবলম্বন করেন, কিন্তু প্রায় সকলগুলিই উক্ত প্রণালী কয়টির অল্পাধিক রূপান্তর মাত্র। তবে ঐ সামান্য রূপান্তর হইতেই কোন দেশের উপায় অন্যদেশের উপায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। মনে হইতেছে "ব্যবসা বাণিজ্যের" কোন এক সংখ্যায়, মান্দ্রাজে নূতন এক water lift বা জল-উত্তোলন-যন্ত্র উদ্ভাবনের কথা পড়িয়াছিলাম। ভিন্ন-ভিন্ন দেশে যে-সকল উপায় প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি আমাদের দেশে প্রচলিত উপায় অপেক্ষা অল্প আয়াসে, অল্প লোক বা বলদের সাহায্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে, অথচ আমাদের অসুবিধাজনক না হয়, তাহা পরীক্ষা করা উচিত। উক্ত উপায়গুলি ব্যতীত, আজকাল এক-প্রকার Tube well বা নলকূপ বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে, তাহাও অতিশয় সুবিধাজনক। যাহা হউক, উক্ত উপায়গুলি এত সহজসাধ্য ও একটি কূপে বা পুষ্করিণীতে এত অল্প জমি প্লাবিত হয় যে ইহাতে সরকারের প্রত্যক্ষভাবে হাত-দেওয়া অধিক সুবিধাও নহে, আবশ্যকও হয় না। এই কূপগুলি কোথাও বৃহদাকার ইষ্টক বা প্রস্তরগাত্র করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়, আবার কোথাও বা মৃত্তিকাগাত্র অস্থায়ী কূপও খোদিত হইয়া থাকে। পুষ্করিণী বা কূপ হইতে জল তুলিয়া চাষ অতি উচ্চ অঙ্গের। অন্য উপায়ে জলপ্লাবন দ্বারা লব্ধ শস্য অপেক্ষা কূপপ্লাবন দ্বারা লব্ধ শস্যের মূল্য অনেক অধিক।* যে-সকল স্থানে অল্প মাটি কাটিলেই কূপ হইতে জল পাওয়া যায় সেই-সকল স্থানের পক্ষে কূপপ্লাবন বিশেষ উপযোগী। ভারতবর্ষে ১৩০ লক্ষ একার ভূমিতে কূপজলে চাষ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে ৯৫ লক্ষ একার যুক্তপ্রদেশে ও পঞ্জাবে এবং প্রায় সাড়ে ২৭ লক্ষ একার মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে অবস্থিত। বাঙ্গলাদেশে মাত্র ১৬,৩৮৫ একার ভূমিতে কূপপ্লাবন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ৬ হাজার একার জলপাইগুড়ি জেলায় ও ৪ হাজার বর্দ্ধমানে, অবশিষ্ট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বাঙ্গলায় কূপখনন অতি অল্প আয়াসেই হইতে পারে; সাধারণতঃ তিন চারি শত টাকা খরচ করিলে ২০।২৫ বিঘা জমি চাষ করিবার উপযোগী একটি স্থায়ী কূপ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। কূপপ্লাবনপ্রথা বাঙ্গলার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।† কূপপ্লাবনের উপযোগিতা ইচ্ছামত সংযত জলসেচনক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সেই কারণে পুষ্করিণী- অথবা কূপপ্লাবন রবিশস্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কূপজল এত আয়াসলব্ধ ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের যে তাহার দ্বারা ধান অথবা পাটচাষ সম্ভব নহে; তবে ঐ উপায়ে অনাবৃষ্টির সময়ে পাট বা ধান্য-চাষের কতক সাহায্য করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে তামাক, ইক্ষু, তুলা, শব্জী প্রভৃতি অন্যান্য শস্যের পক্ষে কূপজলে চাষ অত্যন্ত উপযোগী। বর্ত্তমানে এই-সকল শস্য অনেকস্থলে পুষ্করিণীর জলে চাষ হইয়া থাকে, কিন্তু

---

* Imperial Gazetteer, vol III, পৃ ৩১৮।

† Imperial Gazetteer, vol III, পৃ ৩১৯।

পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে এবং বৃহৎ পুষ্করিণী কাটিতে হইলে বেশী খরচ ও অনেকটা উত্তম জমি নষ্ট করিতে হয়। লোকাধিক্য ও অন্যান্য কারণবশতঃ উত্তম কৃষিজমির অভাব ঘটায়, এ বিষয়ে বিশেষ কৃচ্ছ্রতা আবশ্যক।

বাঙ্গলাদেশে জলাধারে জল আবদ্ধ করিয়া চাষের নিমিত্ত জলসেচন-প্রথা যে, ধান্য ও পাট প্রভৃতি সকল প্রকার চাষের বিশেষ সুবিধাজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গলায় একেবারে অনাবৃষ্টি কখনও হয় না, অনিয়মিত বৃষ্টিই এদেশের কালস্বরূপ। অতএব উক্ত প্রথা দেশের মধ্যে যতই প্রচলন হয় ততই মঙ্গল। বাঁকুড়া জেলার বিবরণী District Gazetteer পাঠে জানা যায় যে ঐ প্রদেশে এই উপায়ে জলসেচন-পদ্ধতির সম্পূর্ণ প্রচলন হওয়া উচিত। পার্ব্বতাময় বাঁকুড়া জেলায় কোন বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিলে তাহা হইতে জল নিঃসরণ হওয়া একেবারে অসম্ভব; অতএব স্থানে স্থানে কোন পর্ব্বত-বেষ্টিত গভীর ভূভাগের একদিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া বর্ষার জল আবদ্ধ করা উচিত। বাকুড়াতে পুরাকালের ঐরূপ কোন কোন বৃহৎ জলাধার বা বাঁধ এখনও নষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অভিমত এই, যে, উক্ত জলাবরোধ জমিদারগণেরই কর্ত্তব্য এবং তাঁহারাই পূর্ব্বে ইহার সংরক্ষণাদি কার্য্য করিতেন। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকড়া, হুগলি, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় এবিষয়ে বাস্তবিক সরকার এবং জমিদারগণের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য, এবং এই-সব জেলায় রূপনারায়ণ, দামোদর প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নদী হইতে জল গ্রহণ করিয়া জলাধার বা জলাশয় হইতে জলপ্লাবন করা বিশেষ অসুবিধার কার্য্য নহে।

Canal system বা পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জলসেচন কার্য্যের অনুষ্ঠান কেবলমাত্র এক মেদিনীপুর ভিন্ন বাঙ্গলায় আর কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছু গবর্ণমেণ্ট করেন নাই। জলপাইগুড়ি ও বর্দ্ধমানে কিছু আছে বটে, কিন্তু মোটের উপর ১,০৭,০৪৫ একার মাত্র ভূমিতে বাঙ্গলাদেশে সরকারি সাহায্যে জলসেচন হইয়া থাকে। নিম্নের তালিকাটি বাঙ্গলায় কৃত্রিম উপায়ে জলপ্লাবনের বিবরণ দেখাইতেছে :—

যে উপায়ে জলপ্লাবন হয়	একার ভূমি
সরকারি কেনাল।	১,০৭,০৪৫
বেসরকারি কেনাল।	১,৬১,৪৩২
জলাশয়।	৯,৯০,২৫৮
কূপ।	১৬,৩৮৫
অন্য উপায়।	১০,৪৮,৭৩৯
মোট	২৩,২৩,৪৫৯

বাঙ্গলায় কৃষিকার্য্যে জলপ্লাবন-বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ঔদাসিন্যের সম্যক পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুর কেনালের আয়ব্যয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য পাঠ করিয়া মনে হয়, বাঙ্গলাদেশে পূর্ত্তবিভাগ হইতে খরচের অনুপাতে শতকরা লাভের হার কম থাকাই ইহার প্রধান কারণ।—

"State irrigation works have never hitherto proved remunerative in Bengal. * * * The three major works which have been constructed are all unremunerative. The Orissa Canals to which reference has already been made, do not pay their working expenses, and the Sone Canals in Southern Behar, which are the most successful, do not on the average yield more than 3 per cent on their capital cost. * * * * until higher rates for water can be obtained from the people, such works are never likely to be remunerative."

"বঙ্গদেশে রাজসরকারের প্রবর্ত্তিত জলসেচন-কার্য্য এপর্য্যন্ত লাভজনক হয় নাই। অনুষ্ঠিত তিনটি প্রধান ব্যাপারই লাভশূন্য। উড়িষ্যার খালসমূহ নিজ ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ এবং দক্ষিণ বিহারের শোণ-কেনালগুলি চরম উৎকর্ষ লাভ করিলেও মূল ব্যয়ের উপর গড়ে শতকরা ৩ টাকার অধিক লাভ রাখিতে সমর্থ হয় না। জলের জন্য লোকসাধারণের নিকট উচ্চহার না পাইলে এরূপ কার্য্য কখনই লাভজনক হইতে পারে না।"*

আমরা এক্ষণে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতে নব-প্রবর্ত্তিত পূর্ত্তনীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। আমরা এখানে পূর্ত্তবিভাগ কেবল জলপ্লাবনবিভাগ অর্থে ব্যবহার করিব।

(৬) Imperial Gazetteer vol III পৃ. ৩৪০.

পূর্ত্তবিভাগের সমস্ত কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত—Major Works 'প্রধান ব্যাপার' এবং Minor Works 'অপ্রধান ব্যাপার'। 'প্রধান ব্যাপার'গুলির মধ্যে যেগুলি অনুষ্ঠান মাত্রেই লাভজনক হইবে এরূপ আশা করা যায়, সেগুলিকে Productive Public Works, অথবা 'উৎপাদক পূর্ত্তকার্য্য' বলা হয়। লর্ড লরেন্সের শাসনকালে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, এই নূতন নীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর, ১৯০৩ সালের মধ্যে উক্তরূপ কার্য্যে ৩৮ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ঐ-সকল কার্য্য ঋণলব্ধ অর্থ দ্বারাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ১৮৭৬ সালে এক ভীষণ মন্বন্তর উপস্থিত হয়। তাহার পরও উপর্য্যুপরি অনেকবার দুর্ভিক্ষ হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট হঠাৎ কোন দুর্ভিক্ষ বা অনিশ্চিত অভাব সহজে রোধ করিতে পারিবেন এই বিবেচনায় বাৎসরিক ১।০ কোটি টাকার একটি দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার স্থাপন করিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের Famine Commission স্থির করিলেন যে উল্লিখিত Famine Insurance Grant হইতে অর্থ লইয়া প্রতি ভূবৎসরে Protective Works বা "রক্ষাপ্রদ ব্যাপারের" অনুষ্ঠান করা হইবে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ রক্ষাপ্রদ জলসেচন ব্যাপারে মাত্র ২॥০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। উল্লিখিত Productive ও Protective উভয় প্রকার ব্যাপারই Major Works নামে অভিহিত হয়।

Minor Works বা অপ্রধান ব্যাপার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি দেশী পূর্ব্বপরিচালিত লুপ্ত অনুষ্ঠানের পুনরুদ্ধার করিয়া জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৯০২-০৩ সালে বাঙ্গলায় মূল ব্যয়ের অনুপাতে Major Works হইতে গড়ে শতকরা ১.৬ রাজস্ব আদায় হইয়াছে, এবং Minor Works হইতে গড়ে শতকরা —০.৪ রাজস্ব আদায় হইয়াছে; ঐ সময়ে পাঞ্জাবে Major Works হইতে গড়ে ৯.৭ এবং কোন বিশেষ পয়ঃপ্রণালী, যথা চেনাব-কেনাল, হইতে শতকরা ২১.৩, রাবি দোয়াব কেনাল হইতে ১২.৯ রাজস্ব আদায় হইয়াছে, এবং Minor Works হইতে শতকরা মোট ৮.০ রাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছে। মান্দ্রাজে রাজস্বের পরিমাণ পঞ্জাবের অনুরূপ এবং 'কাবেরী ডেল্টা-সিষ্টেম' নামক জলসেচন-ব্যাপার হইতে ঐ বৎসর শতকরা ২৮.৫ রাজস্ব আদায় হইয়াছে। সিন্ধু প্রদেশে Major Works হইতে গড়ে শতকরা ৫.০ এবং Minor Work হইতে গড়ে শতকরা ২০.৪ রাজস্ব আদায় হইয়াছে। ১৯০২-০৩ সালে যুক্তপ্রদেশে Major Works হইতে গড়ে মোট শতকরা ৭.০ এবং Minor Works হইতে ২.৮ রাজস্ব আদায় হইয়াছে; বোম্বাই প্রদেশের জলসেচন বিভাগের রাজস্ব ঐরূপ যথাক্রমে ১.৯ ও ০.৪। উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যায় যে বাঙ্গলার পূর্ত্তবিভাগের রাজস্ব-আয় ভারতবর্ষীয় অপর সকল প্রদেশের রাজস্ব আয় অপেক্ষা অল্প। এত অল্প লাভই বাঙ্গলায় পূর্ত্তকার্য্য বিস্তার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আলস্যের কারণ। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আলস্যের আরও একটি কারণ আছে। বেঙ্গল কাউন্সিল রেগুলেশন দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার জমিদারদিগকে তাঁহাদের অধিকৃত জমির মালিক (proprietors of the soil) বলিয়া স্বীকার করেন। ১৭৯৩ সালে স্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ক আইন (Bengal Permanent Settlement Regulation) প্রচারিত হয়। ঐ আইনের ৭ ধারায় এইরূপ নির্দ্দেশ আছে—

"The Governor General in Council trusts that the proprietors of land, sensible of the benefits conferred upon them by the public assessment being fixed for ever, will exert themselves in the cultivation of their lands, under the certainty that they will enjoy exclusively the fruits of their own good management and industry, and no demand will ever be made upon them, or their heirs or successors, by the present or any future government, for an augmentation of the public assessment in consequence of the improvement of their respective estates."

"ভারত গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন, যে, ভূস্বামীগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শুভফল অবগত হইয়া, এবং স্বীয় সুব্যবস্থা ও অধ্যবসায়ের ফল নিজেরাই ভোগ করিবেন ও তাঁহাদের পরম্পরের জমিদারির উন্নতির পরিণামে তাঁহাদের, কিম্বা তাঁহাদের ওয়ারিশগণের নিকট হইতে, বর্ত্তমান, অথবা ভবিষ্যত কোন গবর্ণমেণ্ট, কোনকালে রাজস্ববৃদ্ধির দাবি করিবেন না, ইহা অবধারিত জানিয়া, তাঁহারা কৃষিকার্য্যে বিশেষ শক্তি প্রয়োগ করিবেন।" অতএব জলসেচনাদি প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভূমির উন্নতি সাধন করিলে তাহার ফল ভূস্বামীই লাভ করিবেন, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব এক কপর্দ্দক বৃদ্ধি হইবে না, সেই কারণেও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট

জলসেচন-কার্য্যে উদাসীন; সেই জন্যই গবর্ণমেণ্টের প্রতি-রিপোর্ট বা বিবরণে প্রকাশ যে এ বিষয়ে দেশীয় জমিদার-গণের চেষ্টা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ডাঃ ফোএলকার (Dr. Voelker) তাঁহার Report on the Improvement of Indian Agriculture (১৮৯৭) নামক পুস্তকে, ৮১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,

"It is to assist the people in works which they can carry out themselves and to do what they cannot do, that the efforts of Government should be put forward. The initiative must now rest more than ever with Government * * * *."

"যে-সকল ব্যাপার জনসাধারণ নিজেরা চালাইতে পারে সেই-সকল কার্য্যে সাহায্যার্থে, এবং যে-সকল কার্য্য তাহারা করিতে পারে না, তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত, গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া উচিত। কার্য্যের প্রারম্ভ পূর্ব্বাপেক্ষা এখনই বেশী গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিবে।" ঐ পুস্তকের ৮৩ পৃষ্ঠায় ডাক্তার ফোএলকার আবার বলিয়াছেন—

"There is no doubt that a great deal can be done to improve the water supply in precarious districts, if Government are prepared to look on the measures taken as those of a protective and not purely a remunerative nature. This is well-expressed in a note by Colonel Mead, Chief Engineer for Irrigation, Madras. He said in 1887: 'Much can no doubt be done to improve the existing supply to tanks if Government are prepared to accept the benefit to the raiyat as a sufficient return for the outlay incurred, and to consider the works as entirely protective in nature.'"

"একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে, যদি গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত উপায়-সকল কেবল মাত্র লাভজনক ব্যবসায় জ্ঞান না করিয়া, রক্ষাপ্রদ ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে অনিশ্চিত দেশগুলিতে জলসেচনক্রিয়ার যথেষ্ট উন্নতি করা যাইতে পারে। মান্দ্রাজের জলসেচন বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়র কর্ণেল মীড তাঁহার এক মন্তব্যে ঐ মত বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ১৮৮৭ সালে বলিয়াছিলেন যে কৃষকের মঙ্গলজনক পরিণামই খরচের যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে গবর্ণমেণ্ট যদি প্রস্তুত থাকেন এবং ঐ-সকল কার্য্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষাপ্রদ বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান জলাশয়গুলির অনেক উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে।"

এই বিষয়ে জনসাধারণের বিশেষ উপকার করিবার আর-একটি পন্থা বা উপায় সরকারের হস্তে আছে। বোম্বাই, পাঞ্জাব, মুলতান, প্রভৃতি স্থানে ইহার বিশেষ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ প্রদেশে কূপ ও পুষ্করিণী নির্ম্মাণ এবং সংস্কার-কার্য্যে "তাকাবি" প্রথা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কৃষক-দিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহার নিয়মানুসারে গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক শতকরা ৬।০ টাকা সুদে চাষীদিগকে কৃষিসম্বন্ধীয় উন্নতি, প্রধানতঃ কূপাদি খনন, নিমিত্ত টাকা ধার দিয়া থাকেন। এই প্রথার প্রচলন বাঙ্গলায় একেবারে নাই। বাঙ্গলার জমিদারগণের খাজনার সহিত সম্বন্ধ, জমির উৎপন্ন শস্যের আধিক্যের বা হ্রাসের সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব নাই; তাঁহারাও অনেকে এত ঋণভারাক্রান্ত যে জলসরবরাহের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে একেবারে অক্ষম। কৃষকগণও এত দরিদ্র যে সাহায্য ব্যতীত ঐ বিষয়ে কিছু করিতে একেবারে অসমর্থ। গবর্ণমেণ্টও জমিদারের সহিত রাজস্ব আদায়ের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, প্রজার অবস্থার উন্নতি হইলে তাঁহাদের যখন অতিরিক্ত অর্থলাভের আশা নাই তখন তাঁহারাই বা এ বিষয়ে চেষ্টা করেন কেন?

উল্লিখিত কারণসমুদয়ের মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গলার কৃত্রিম উপায়ে জলসেচন-ব্যাপার, মহাসমুদ্রে কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় ইতস্ততঃ চালিত হইতেছে।

দেশের মধ্যে শস্যাভাব কমাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট রেল বিস্তার কার্য্যে অনেক অর্থ এবং শক্তি ব্যয় করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ঋণ করিয়া এবং Famine Insurance Grantএর অধিকাংশ অর্থ লইয়া ভারতবর্ষে রেল-বিস্তার করিয়াছেন। কোন্ বৎসর হইতে কোন্ বৎসর পর্য্যন্ত কত টাকা গবর্ণমেণ্ট উক্ত Loan এবং Grant হইতে গ্রহণ করিয়া রেলবিস্তার কার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করি না; তবে মোটামুটি একথা বলা যাইতে পারে যে জলসেচন-কার্য্য অপেক্ষা রেলবিস্তারে অনেক অধিক উদ্যম করা হইয়াছে। গবর্ণ-মেণ্টের রেলবিস্তারের হেতুবাদ এইরূপ—দেশে রেল

বিস্তার হইলে খাদ্যশস্যাদি দেশের মধ্যে সহজে চলাফেরা করিতে পারিবে, এবং কোন মন্বন্তরের সময় অভাবগ্রস্ত প্রদেশের যাবতীয় লোক সকলেই অন্নাভাবে না মরিয়া অন্যদেশ হইতে আগত শস্যের সাহায্যে জীবনধারণে সক্ষম হইবে; অর্থাৎ কোন এক দেশের অভাবের আতিশয্য হ্রাস হইবে। দেশের প্রধান শস্য-বিপণিসকল নিকটবর্ত্তী করিয়া ভূস্বামী এবং কৃষকদিগকে অর্থলাভে সাহায্য করিবে। তদ্ব্যতীত রেলরোড ব্যবসায়ের জন্মদাতা, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু ফলে কি হইয়াছে। রেলরোড অভাবের আতিশয্য দেশময় বিস্তার করিয়াছে, সাধারণলোকে শস্য-সঞ্চয়ের অভ্যাস হারাইয়াছে, শস্যবিক্রয়ের ফলস্বরূপ কৃষকের লাভ না হইয়া দালালগণের হস্তে অর্থ যাইতেছে, রেলরোড কেবলমাত্র শস্য-আদানপ্রদানের সুবিধা করে, শস্য-উৎপাদনে ইহার কোন ক্ষমতা নাই; পয়ঃপ্রণালী শস্য উৎপাদন ও বহন উভয় কার্য্যই করিতে সক্ষম। রেলরোড দুর্ভিক্ষভার অপনোদন করিতে কতদূর অক্ষম তাহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান বাঁকুড়া। রেলরোড না থাকিলে আরও অধিক লোক মরিত স্বীকার করি, কোন জনসাধারণ বিনামূল্যে শস্য বিতরণ না করিলে এবং রাজসরকার "Famine declare" না করিলে কোন ব্যক্তিকে বাঁচান যাইত না। দেশে অর্থাভাব এবং শস্যাভাব দুইই আছে, লোকের অর্থ না থাকিলে শস্য আনিয়া লাভ কি? সে শস্য ক্রয় করিবে কে? উল্লিখিত কারণগুলি ব্যতীত রেলরোডের বিপক্ষে দেশের স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতি সম্বন্ধীয় অনেক কথা বলিবার আছে। বর্ত্তমান সরকারি মতে "দেশের মধ্যে রক্ষাপ্রদ প্রধান রেলপথগুলি যতদূর সম্ভব শেষ করা গিয়াছে, এবং ১৮৯৮ ও ১৯০১ সালের Famine Commissions এক্ষণে দেশের মধ্যে রক্ষাপ্রদ জলসেচন-প্রণালীর অধিকতর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।"*

(২) অনাবৃষ্টি নিবারণের উপায়—সংরক্ষিত বনভূমি।

অনাবৃষ্টি বা অনিয়মিত বৃষ্টির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত উল্লিখিত প্রত্যক্ষ উপায় ব্যতীত একটি পরোক্ষ উপায় আছে, সেটি সরকারি Reserved Forests বা সংরক্ষিত বনভূমি। উচিত পরিমাণে বনভূমি সংরক্ষণ করিলে সেই প্রদেশের বৃষ্টিপাত অতি আশ্চর্য্য উপায়ে সংযত হয়। সংরক্ষিত বনভূমি হইতে নিম্নলিখিত উপায়ে চাষের সুবিধা হয়। বনভূমিতে বৃষ্টির জল পড়িয়া আবদ্ধ হইয়া থাকে। সেই সঞ্চিত জল ক্রমে-ক্রমে বহিয়া নিকটস্থ ক্ষেত্র-সকল আর্দ্র করে। বৃক্ষাদির পত্র হইতে বাষ্পাকারে উদ্গত জলকণা চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলকে প্রচুর পরিমাণে শীতল করে। বায়ু শীতল হইলে বায়ুস্থিত জলকণা উড়িয়া না গিয়া সহজে জমিয়া যায় এবং ফলে অল্প-অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইতে থাকে, তদ্ব্যতীত ঐ কারণে বৃক্ষাদিবহুল স্থানের নিকটে যে অধিক পরিমাণে শিশির পড়ে তাহা সকলেরই জানা আছে এবং শিশিরও কৃষিভূমিকে ভিজাইয়া রাখে। ডাঃ ফোএলকার বলেন যে ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস পাঠে মনে হয় যে কৃষিকার্য্যের বিস্তৃতির সহিত ভারতের বনভূমি ও পশুচারণের স্থানাদি অনেক পরিমাণে দূরীকৃত হওয়ায়, ভারতে জলবায়ুর বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বনভূমি গোমহিষাদির আহার যোগাইয়া অন্নাভাবের বৎসরে তাহাদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। বনভূমির সহিত বৃষ্টির এবং চাষের সুবিধার সম্বন্ধ Dr. T. Croumbie Brown লিখিত Forests and Moisture নামক গ্রন্থ অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে।

অনাবৃষ্টির ক্ষতিপূরণের জন্য গভর্মেণ্টের কর্ত্তব্য।

অতএব অনাবৃষ্টি বা অনিয়মিত বৃষ্টির প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত উপায়গুলি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

১। ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচারের নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারী বা সভা বা কমিটি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া তত্তদ্দেশীয় জলপ্লাবন বিষয়ে কৃষকদিগের অনুকরণযোগ্য প্রথাগুলি বাঙ্গলার কৃষকদিগের সম্মুখে স্থাপন করিবেন।

২। এগ্রিকাল্চারাল ফার্ম্স্ বা কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রে এ-সকল ভিন্ন-দেশীয় প্রণালীর উপযুক্ততা এবং উপকারিতা গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা করিবেন এবং কৃষকদিগকে পরীক্ষা-লব্ধ ফল শিক্ষা দিবেন।

৩। জনসাধারণের মধ্যে ঐ-সকল উপায়ের বিবরণ

* Imperial Gazetteer Vol, III. পৃঃ ৪৯৬।

ও তাঁহাদের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল পুস্তিকাকারে প্রচার করিবেন।

৪। জমিদারগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং জলসেচন-প্রণালীর উপায় স্থানবিশেষে প্রচলন করিবেন।

৫। তাকাবি প্রথা প্রচলন করিয়া দরিদ্র কৃষকদিগকে অর্থ সাহায্য করিবেন এবং সেই অর্থে যাহাতে তাহারা ক্ষেত্রের অভীষ্ট পরিবর্ত্তন করে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

৬। কৃষিবিভাগ উল্লিখিত উপায়ে বাঙ্গলায় কত পরিমাণ সংরক্ষিত বনভূমি থাকা উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া যদি আবশ্যক হয় তাহার বিস্তার করিবেন এবং রেলপথ কেনাল ও রাজপথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষাদি রোপণ করিবেন।

অনাবৃষ্টির ক্ষতিপূরণের জন্য জমিদারগণের কর্ত্তব্য।

এ বিষয়ে জমিদারগণের কর্ত্তব্য এইরূপ—

১। নিজ নিজ জমিদারির মধ্যে বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র জলাধার নির্ম্মাণ করিয়া তাহা হইতে কৃষকদিগের ক্ষেত্রে জলপ্লাবন করিবেন। Public Demands Recovery Actএর সাহায্যে তাহাদের নিকট হইতে জমিদার তাঁহার ব্যয় আদায় করিয়া লইতে পারেন। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনেও জমিদারের চেষ্টায় উন্নত জমির উচ্চহারে খাজনা আদায় করার ক্ষমতাও আছে।

অনাবৃষ্টির ক্ষতিপূরণের জন্য জনসাধারণের কর্ত্তব্য।

এ বিষয়ে আমরা, দেশবাসীরা, যে সম্পূর্ণ উদাসীন তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দারিদ্র্য অত্যন্ত অধিক তাহা স্থির, কিন্তু যাহারা সক্ষম তাহারাও একটু খরচ কিম্বা কষ্ট করিয়া ক্ষেত্রের উন্নতি করিতে একেবারে অনিচ্ছুক, আমাদের সেই পুরাতন রীতি চলিয়া আসিবে, তাহার উন্নতির কোন চেষ্টা আমরা করি না। আমাদের সাধ্যমত পুষ্করিণী বা কূপ নির্ম্মাণ করিয়া, নূতন ফসল বপন করিয়া, চাষের উন্নতির সমধিক চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র।

দেশের কথা

দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেশাত্মবোধ স্পষ্ট ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রতিধ্বনি আমরা মফস্বলের সকল খবরের কাগজেই অল্পবিস্তর শুনিতে পাইতেছি। সকলেরই এক আকাঙ্ক্ষা একই দাবী—আমাদের স্বরাজ চাই। নিজের ঘরে পরের হাত-তোলা প্রসাদ পাইয়া জীবন যাপন করা যে লজ্জাজনক তাহার বোধ জন্মিয়াছে; কিন্তু তাহার সঙ্গে, যাহারা আমাদিগকে স্বাধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব জাগরিত হয় নাই—ইহাই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। বরং ভারতের বহুশতাব্দীর শিক্ষার মজ্জাগত মৈত্রীভাব অপর পক্ষের বিপদের সময় প্রবল হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। ইহা স্বার্থান্বেষীর প্রবলের তোষামোদ নহে; প্রসাদ পাইবার বা পুরস্কার লাভের আশায় নহে। এক দিকে আমরা যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের প্রতি অবিচার ভুলিয়া রাজশক্তির পক্ষে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আমাদের প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ সমগ্র সাম্রাজ্যের হিতসাধন ব্রত করিয়াছি, তেমনি অপরদিকে নিজেদের অধিকার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া আমরা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবার দাবী ও চেষ্টা করিতেছি। "যশোহর" দেশের লোকের সেই মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

> অযোগ্যতার দোহাই শুনিয়া ভারতবাসী এখন আর সন্তুষ্ট হইতে চাহিতেছে না। এই দেড় শত বৎসরের শিক্ষার ফলে ভারতবাসীর অন্ততঃ এতটুকু আত্মবোধ জন্মিয়াছে যে, তাহারা ক্ষেত্র পাইলে জগতের যে-কোনও সুশিক্ষিত ও সুসভ্য জাতির লোকের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিতে সমর্থ। সুতরাং এখন আর তাহাদিগকে অনুপযুক্ত বলিয়া তাহাদের উচ্চাভিলাষ পূরণের মিয়াদ বৃদ্ধি করা সঙ্গত হইবে না।

কিন্তু ইংরেজীতে একটা কথা চলিত আছে যে, সকল ভেড়ার পালেই একটা-ড়টো কালো ভেড়া থাকেই থাকে। সোনার লঙ্কাতেও ঘর-ভেদী বিভীষণ ছিল! সকল দেশে ও কালে দেশশত্রু দেশহিত-বিরোধী ক্ষুদ্রাশয় লোক কেউ-না-কেউ থাকেই থাকে। তাহারা ঘৃণা ও কৃপার পাত্র হইলেও উপেক্ষার পাত্র নহে। তাহাদের চিনিয়া রাখিয়া সাবধান হওয়া সকল দেশহিতৈষীর কর্ত্তব্য। এই-রকম একদল দেশ-শত্রুর সন্ধান "নোয়াখালি-সম্মিলনী" দিয়াছেন—

> অত্রত্য এমুলামিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে মাওলানা মহম্মদ আবুবকর

সাহেবের সভাপতিত্বে মুসলমান জনসাধারণের এক সভা হইয়াছে। এই সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, অল ইণ্ডিয়া মোসলেম লীগ গবর্ণমেণ্টের নিকট যে স্বায়ত্তশাসন প্রার্থনা করিয়াছেন, ভারতীয় মুসলমানগণ তাহা পাওয়ার এখনও উপযুক্ত হন নাই, সুতরাং তাহা যেন দেওয়া না হয়। ঐ সভায় মোসলেম লীগের ঐ কার্য্যের প্রতিবাদও করা হইয়াছে। আমরা মাওলানার এই কার্য্য দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। অল ইণ্ডিয়া মোসলেম লীগ, প্রভিন্সিয়াল মোসলেম লীগ যে কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, মাওলানা কোন্ সাহসে কোন্ বিচারবুদ্ধিতে সেই কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বঙ্গের মাওলানা ও মৌলবীগণ সর্ব্বদা ধর্ম্মই প্রচার করিয়া থাকেন, রাজনীতির বড় ধার ধারেন না, কিন্তু মাওলানা আবুবকর সাহেব ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গ হইতে নোয়াখালী আগমন করিয়া ধর্ম্মসভার নামে জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া বেশ রাজনৈতিক চাল চালিয়াছেন। ঐ সভায় যে সমস্ত মুসলমান উপস্থিত ছিল, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা একজনও স্বায়ত্ত শাসনের অর্থ বুঝিতে পারে নাই। তাহাদের দ্বারাই প্রস্তাব পাশ করাইয়া মাওলানা বাহাদুরী লইয়াছেন। মাওলানা সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন যে, ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে তদ্দারা হিন্দুদেরই আধিপত্য হইবে, মুসলমানগণকে হিন্দুদের পদানত হইয়া থাকিতে হইবে। আমরা এই যুক্তির কোনরূপ সারবত্তা দেখিতে পাইতেছি না। ন্যাশনাল কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধে একমত হইয়া যে সমস্ত প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সে সমস্ত বিষয়ে সকলে একমত হইতে না পারিলেও আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই না, এ কথা বলা সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচায়ক নহে। তাই আমরা বলি, মাওলানার এই সভার প্রতি জনসাধারণের কোন সহানুভূতি নাই। উহা ধর্ম্মভীরু অথচ রাজনীতি বুঝিতে অক্ষম, এইরূপ কতকগুলি মুসলমান লইয়া গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং উহা দেশের লোকের মত বলিয়া সরকার বাহাদুর যেন গ্রহণ না করেন, এই আমাদের প্রার্থনা।”

এই কালো ভেড়ার দলের সম্বন্ধে মুসলমান সমাজের মুখপত্র “মোহাম্মদী” বলিতেছেন—

সহযোগী যে-সব কথা বলিয়াছেন আমরা তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছি। পক্ষান্তরে সুফী সাহেবের এই প্রচারের ফলে যে একেবারেই কোনই ফল হইবে না তাহাও আমরা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বে দেশের শিক্ষিতরাই স্বায়ত্তশাসন, অটোনমির তত্ত্ব লইত, এবং তাহারাই ইহার সংবাদ রাখিত। সুফী সাহেবের এই প্রচারের ফলে দেশের নিরক্ষর অজ্ঞ জনসাধারণও স্বায়ত্তশাসন অটোনমি কি তাহা শিখিয়া ফেলিবে। অবশ্য সুফী সাহেব তাহাদিগকে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেই শিক্ষা দিতেছেন, কিন্তু সকল মনুষ্যেতেই যখন বিবেক নামক একটি বস্তু আছে তখন বিষয়টি অবগত হইতে পারিলে তাহাদের ভিতরের বহু লোক যে আবার স্বায়ত্তশাসন চাওয়ার দলে যোগদান করিবে না এমন কথা কে বলিতে পারে? তবে আমরা কিন্তু অজ্ঞ জনসাধারণের ভিতর রাজনীতি চর্চ্চা করার বিরোধী, কেননা অজ্ঞ লোকে একটা বিষয়কে ভাল বলিয়া বুঝিয়া ফেলিলে তাহাকে পাইবার জন্য অন্যায়রূপে জেদ ধরিয়া বসে এবং তাহার ফলে দেশে অশান্তিরও সৃষ্টি হইতে পারে। বলিতে কি এই জন্যই মোসলমান নেতৃবৃন্দ সাধারণ মুসলমানদিগকে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, অশিক্ষিত মুসলমানরা এই আন্দোলনে যোগদান করিলে, দেশে ভয়ানক অরাজকতার সৃষ্টি হইবে, তাহার ফলে দেশে খুনখারাপিও হইবে। এতদিন মুসলমান নেতৃবৃন্দ যে কাজ করেন নাই এখন সংসার বিরাগী সুফী মাওলানা আবুবকর সেই কার্য্যের ভার লইয়াছেন। ভার আবার কেমন! তিনি এক কথায় সকলকে স্বায়ত্ত শাসন ব্যাপার শিখাইয়া বেড়াইতেছেন। ইহার ফলে পরিণামে দেশে অশান্তি সৃষ্টি হইলে তজ্জন্য দায়ী হইবে কে? মাওলানা সাহেব আবার “মুসলমানদিগকে হিন্দুদিগের পদানত হইতে হইবে” একথারও প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহাতে অজ্ঞ মুসলমানদিগের পক্ষে হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠাও অসম্ভব নয়। সেবার এই মাওলানার চেলা বেলারাই পূর্ব্ববঙ্গের জামালপুর প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধাইয়া দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। অজ্ঞ জনসাধারণের মাথায় একবারে পর-জাতি-বিদ্বেষ ও স্বাধীনতার মন্ত্র ঢুকান ভাল কথা নয়।

মানুষ নিজেদের মঙ্গলের সম্বন্ধে এমন অজ্ঞ ও অন্ধ কেমন করিয়া হয়? হয় তাহারা স্বার্থহানির ভয়ে ভীত অপর পক্ষের ভাড়া-করা যন্ত্র, তাহারা আপনাদের আপাত ক্ষণিকের সুবিধাকেই ভবিষ্যতের স্থায়ী কল্যাণের চেয়ে বড় করিয়া দেখে; নয় তাহারা বৃহত্তের কল্যাণের জন্য নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে না। “চারুমিহির” একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে এই সমস্যার যে সমাধান করিয়াছেন তাহা হইতে আর-একটি কারণ পাওয়া যাইতেছে। প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।—

দাসত্বেরও একটা মোহ আছে; দাস-জীবনেরও একটা সুখ আছে। আমেরিকা হইতে যখন দাসত্ব প্রথা দূর করিয়া দেওয়ার চেষ্টা হয় তখন দাসগণের মধ্যেই অনেকে উহাতে বিরক্তি বোধ করিয়াছিল। তাহারা মনে করিত, সরল ও সহজভাবে তাহাদের জীবনটি কাটিয়া যাইতেছে; নিয়মিত সময়ে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াই তাহারা প্রভুর কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছে, সারাদিন প্রভুর জন্য খাটিতেছে, কার্য্যের ত্রুটার জন্য প্রভু প্রহার করিতেছে বটে কিন্তু অনাহারে মরিতে হইতেছে না। এই ভাবনাশূন্য দায়িত্বহীন চিরপরিচিত জীবন-প্রণালীটিকে তাহারা পরিবর্ত্তন করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিল। নিজের জীবন পোষণের দায়িত্ব নিজকে গ্রহণ করিতে হইবে, নিজ পরিবার রক্ষার ভার নিজের উপর পতিত হইবে, নিজকে ভাবনাচিন্তা করিয়া কাজকর্ম্ম করিতে হইবে ইহাও তাহারা বড়ই অসুবিধাজনক মনে করিতেছিল। এই-সকল কারণে দাসত্বজীবন পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবন যাপন করিতে তাহারা নিজেও অনিচ্ছুক ছিল, পরকেও তাহারা তদ্রূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেছিল।

আমরা শতাধিক বৎসর যাবৎ যে-জীবন যাপন করিতেছি তাহার মধ্যে জাতীয় দায়িত্বজ্ঞানের কোনও স্থান নাই। জাতীয় হিসাবে আমাদের মানসম্ভ্রম রক্ষা করা, জাতীয় অর্থ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা, পৃথিবীর অন্য জাতির সমক্ষে আমাদের গৌরব প্রতিষ্ঠা করা, ইত্যাদি কার্য্যের কোনও চিন্তাই আমাদের অনেকের মনেই স্থান প্রাপ্ত হয় না। পরসেবা করিয়া এবং তোষামোদ দ্বারা পরের চিত্ত-বিনোদন করিয়া কিছু-কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিব, তদ্দ্বারা নিজের ও নিজের স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়া সরল ও সহজভাবে জীবন

কাটাইয়া দিব ইহাই তাহাদের মনের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। বিদেশীয় শত্রু আসিয়া দেশ আক্রমণ করিলে দেশরক্ষার ভার অন্যের উপর থাকিবে, অথবা দেশরক্ষা করার কোনও প্রয়োজনই ইহারা অনুভব করিবে না; যে-ব্যক্তি যখন দেশে আসিয়া কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিবে তাহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। নিজ পরিবারের মানসম্ভ্রম নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে তজ্জন্য অন্য লোকের দ্বারস্থ হইয়া প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিজেরা কোনও গোলমালে না পড়িয়া ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও সন্তান-উৎপাদন করিয়া সাংসারিক দায়িত্ব সমাপন করাই ইহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য; এবং যথাকালে পুত্র-দিগকে বিবাহ করাইয়া তাহাদিগকে স্বীয় আহার ও বংশরক্ষণ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া জীবন সমাপ্ত করাই ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগণ কি ভাবে জীবন যাপন করিতেছে, তাহারা কিরূপ গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সংসারে বিচরণ করিতেছে, তজ্জন্য ভাগ্যলক্ষ্মী কি ভাবে তাহাদিগকে সেবা করিতেছেন, এই কর্ম্মনিষ্ঠা ও দায়িত্বগ্রহণের গুণে তাহারা পৃথিবীতে আমাদের ন্যায় অকর্ম্মা জাতিগণের উপরে কিরূপ প্রভুত্ব পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন তাহা দেখিয়াও আমাদের দেশের এই-সকল আরাম-প্রয়াসী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের আরামপ্রদ সহজ জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। দাসত্বের সুখ পরিত্যাগ করিয়া দায়িত্বের শৃঙ্খল গ্রহণ করা ইহাদের নিকট অতি কঠিন ও অপ্রীতিকর কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

যাহারা ভীরু কাপুরুষ, যাহারা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য দেখিয়া ভীত হয়, পৃথিবীর মনুষ্যসমাজে তাহাদের স্থান নাই; তাহারা পৃথিবীর মনুষ্যসমাজের বাহিরে। যাহারা বীরের ন্যায় সংসারের সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হয় তাহারাই পৃথিবীতে মনুষ্য-নামের উপযুক্ত এবং তাহারাই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার সুখ ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার অধিকারী। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" ইহা শাস্ত্রবাক্য।

শতাধিক বৎসর যাবৎ আমরা মনুষ্যোচিত সর্ব্বকার্য্যে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে ঐ প্রকার কোনও কোনও কার্য্যে দায়িত্বগ্রহণের সুযোগ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। যে সৈনিক বিভাগের দ্বার আমাদের নিকট সর্ব্বপ্রকারে অর্গলাবদ্ধ ছিল তাহা সম্প্রতি আমাদের যুবকগণের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে। এতদিন যাবৎ দেশরক্ষার দায়িত্বের সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। সম্প্রতি আমরা যাহাতে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারি তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই আরামপ্রিয়তা ও পরসেবা-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। পরমুখাপেক্ষী হওয়ায় যে আরাম আছে, দাসত্বজীবনে যে সুখের মোহ আছে তাহা ইহা-দিগকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে।

বহুদিনের রুদ্ধদ্বার অধিকারের পথ খোলা পাইয়া দেশের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার মহৎ উদ্দেশ্যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোদ্ধৃ-ব্রত গ্রহণ করিতেছেন। আমরা সংবাদ পাইয়াছি মেদিনীপুরের একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সাত বৎসরের পাকা চাকরীর আরাম ছাড়িয়া এগার টাকা ভাতার সৈনিকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আর—

মুক্তাগাছার জমিদার হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়কুমার আচার্য্য চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয় ভারতরক্ষী সৈন্যদলে প্রবেশ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আশা করি ইঁহার প্রদর্শিত এই দৃষ্টান্তে অন্যান্য জমিদার যুবকগণ সৈন্যদলে প্র[বেশ] করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন। চারুমিহির।

বাঙালী সৈন্যের একটি নূতন কীর্ত্তি-কথা সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে।

বাঙ্গালী সৈন্যের মহীশূর আক্রমণ—মেদিনীপুর সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসের যে-সমুদায় কর্ম্মচারী সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য নাম লেখাইয়াছিলেন তাহাদের বিদায়ের জন্য মেদিনীপুর সেটেলমেণ্ট অফিস প্রাঙ্গণে সমুদায় কর্ম্মচারীর এক বিরাট অধিবেশন হয়। সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ এ কে জেমসন, আই সি এস মহোদয় বক্তৃতায় বলেন যে While investigating the pipers of the district he came to learn that in about 1780 in Rani Janoki's time a large number of Bengalee soldiers raised from the Mahisadal parganas of this district went to fight in Mysore. মেদিনীপুরের কাগজ পত্র অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, রাণী জানকীর রাজত্বকালে মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণা হইতে একটা বিরাট সৈন্যদল গঠিত হইয়া মহীশূরে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালীর সৈনিকবৃত্তি নূতন নহে। বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে অতি অল্পকাল-মধ্যেই সেই সুপ্ত উদ্যম অধ্যবসায় শক্তি ও সাহস উদ্বুদ্ধ করিতে পারে।

মেদিনীপুর হিতৈষী।

নিজেরা নিজেদের ঘরসংসার চালাইবার যোগ্য হইতে হইলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা হওয়া চাই ও সকলের সকলবিধ অধিকার লাভের পথ সুগম হওয়া চাই। এই বোধ হইতেই "স্বরাজ" অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন চাহিয়াছেন; "রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ" "স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন" স্বীকার করিয়া তাহার যুক্তি দিয়াছেন এই—

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর দেশে অনুভূত হইতেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বোধ হয় বড় বেশী লোক নাই যাঁহারা স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন। মেয়েদের মধ্যেও উচ্চশিক্ষালাভ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। অল্প-বয়স্কা মহিলারা যাহারা শৈশবে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই, তাঁহারা তাঁহাদের মেয়েদিগকে ভালভাবে লেখাপড়া শিখাইবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইবেই। বালকদিগের এবং মেয়েদিগের মধ্যে শিক্ষা, ভাব ও চিন্তার বৈষম্য অনেক অনর্থের হেতু। পূর্ব্বে এদেশীয় নরনারীগণের মধ্যে এ পার্থক্য সম্ভবপর ছিল না, কারণ স্ত্রীপুরুষের শিক্ষা একরূপই হইত। পুরুষগণ সাধারণতঃ নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর ছিলেন, বঙ্গের কুলললনাগণও তদ্রূপ ছিলেন। সুতরাং একজাতীয় ভাবে ও চিন্তায় স্ত্রীপুরুষের হৃদয় অনুপ্রাণিত হইত। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা যতই দিন দিন বালকদিগের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছে ততই ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ উদ্ভূত হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মনের মিল হইতে পারে কিরূপে? স্ত্রী যদি মতাদি সম্বন্ধে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হন, তাহাও হৃদয়ের সহিত হইতে পারেন না। হইলেও প্রাচীনাগণের নিকট তিরস্কৃত এবং নিন্দিত হইতে হয়। নবীনাগণ কষ্টের সহিত আপন আপন জন্মগত

সংস্কার বিসর্জ্জন দিয়াও শিক্ষিত স্বামীর মন যোগাইতে পারেন না। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বামীদের মধ্যে ভাব চিন্তা ও আদর্শে প্রাচীন সমত্ব তিষ্ঠিতে পারে না। অনেক স্থলে তাহার ফল বিষময় হইয়া উঠে। নারীজাতি এবং পুরুষজাতির মধ্যে সমত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার দুই পন্থা আছে। একটি ছেলেদের ইংরেজী শিক্ষা না দেওয়া। অন্যটি বালকেরা যেরূপ শিক্ষা পাইতেছে, তদ্রূপ বা তাহা বালিকা-উপযোগী করিয়া মেয়েদের মধ্যে প্রবর্ত্তন এবং বিস্তার করা। এই দুইটির মধ্যে একটির দ্বারাই চিরবাঞ্ছিত সমত্ব স্থাপিত হইতে পারিবে। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে এরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, নিষ্ঠাবান হিন্দুমহাত্মাগণও ইংরেজীভাষা এবং জ্ঞান-আলোচনা করিতে বিরত হইতেছেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় অনেক ইংরেজী অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইংরেজী-শিক্ষার নিন্দা করিয়াও নিজের ছেলেদিগকে চতুষ্পাঠীতে না পাঠাইয়া ইংরেজী স্কুলে পাঠাইতেছেন। মহামহোপাধ্যায়ের পুত্রগণও সুযোগ্যতার সহিত বিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষা পাশ করিতেছেন। দেশে যে উচ্চ আধুনিক জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা নিবারিত হইবে না। তাহার নিবারণ বাঞ্ছনীয়ও নহে। সুতরাং নারীদের শিক্ষার পথ সুপ্রশস্ত করিতে হইবে। নতুবা স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে এবং পারিবারিক ও সামাজিক শান্তির ভীষণ পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইবে। স্ত্রী এবং পুরুষ ভেদ হইলেও উভয়ের জাতি এক। তাহাদের শিক্ষা অনেকটা একজাতীয় হওয়া দরকার। মানসিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে যেমন ছেলেদের, তদ্রূপ মেয়েদের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের প্রয়োজন। জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, অনেক বিষয়ে পুত্র কন্যাগণের সমজাতীয় শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উচ্চশিক্ষা পাইলে কত লীলাবতী ক্ষণা এ দেশে এখনো উৎপন্ন হইতেন কে বলিতে পারে।

সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের অধিকার যে সমান তাহা বিধাতার বিধান বলিয়া স্বীকার করিয়া "যশোহর" বলিতেছেন—

বিলাতের রমণীগণের ভোটদানের অধিকার নাই। এই অধিকার লাভ করিবার জন্য শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের কতিপয় রমণী চেষ্টা করিয়া বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন; এই মহাযুদ্ধের কালে উক্ত সাফ্রিজিষ্ট দলের রমণীরাই দেশের জন্য এখন নানারূপে আত্মনিয়োগ করিয়া বিরুদ্ধবাদী পুরুষদল ও গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এক্ষণে অনেকেই বলিতেছেন যে, স্ত্রীলোকদিগের ভোট দানের অধিকার থাকা উচিত।

ভগবানের ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করিতে যাওয়া মানুষের একটা প্রকৃতি, কিন্তু কালে বিধাতার বিধান মানিয়া লইতেই হয়।

পুরুষের ন্যায় স্ত্রীদিগেরও সমান শিক্ষা ও অধিকার না থাকিলে সমাজে কিরূপ অন্যায় অত্যাচার ও অশোভন অনাচার ঘটে তাহার একটি দৃষ্টান্ত "যশোহর" দেখাইয়াছেন—

যশোহর শ্রীধরপুরের বিখ্যাত বসু বংশীয় পুণ্যশীল জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজরাজ বসু মহাশয়, গত ২৮শে বৈশাখ তারিখে এক দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার পাণিপীড়ন করিয়াছেন। দ্বিজ বাবুর বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, স্বাস্থ্যও ততটা ভাল নহে, এরূপ অবস্থায় পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন ও সমাজের অনভিপ্রায়ে তিনি কেন যে একটি বালিকা বধে বদ্ধপরিকর হইলেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

গৃহে স্নেহময়ী জনক জননী আজিও সশরীরে বর্ত্তমান। সেবা-পরায়ণ যুবক পুত্রগণ বিদ্যমান। এই পুত্রগণের বিবাহ দিলেই তাঁহার বার্দ্ধক্যকষ্টের সমুচিত প্রতিকার ব্যবস্থা হইত। এই বিধি-সঙ্গত ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক তিনি যে মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, ভগবান না করুন, হয়ত তাহা অচিরাৎ বিষাক্ত কণ্টকে আচ্ছন্ন হইবে। এই পথেই হয়ত বিপিনবাবুর পুণ্যের সংসারে পাপের দানবী লীলা প্রকটিত হইবে। আমরা অবশ্য ইহা কামনা করি না, শাপগ্রস্তা হিন্দু বালিকাটির জীবন শান্তিময় হউক ইহাই আমাদের অভিপ্রেত।

তবে কথা হইতেছে যে, কন্যাদায়গ্রস্ত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী হিন্দু-সম্প্রদায় মাথার বোঝা নামাইয়া হাঁপ ছাড়িবার জন্য আপনাপন কন্যাগণকে জলে, অনলে বা গরলে বিসর্জ্জন করিতে পারেন; এই মুক্তিলাভের সহিত স্বার্থ সংশ্রব থাকিলে ত কথাই নাই। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের যুগে শিক্ষিত ভদ্রপরিবারের বিশেষতঃ ঋষিকল্প পিতার জ্যেষ্ঠসন্তান দ্বিজবাবু জীবনের চতুর্থ প্রহরে এমন গর্হিত কার্য্য কেন করিলেন?

কিন্তু আমাদের দেশে এখনও এমন লোকও আছে যাহারা এইরূপ গর্হিত কার্য্য প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে সমর্থন করিতে লজ্জা বোধ করে না। নমুনা—

দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ।—মহেশ্বরপাশা নিবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়ঃক্রম ৪৬ বৎসর, ১ম পক্ষের স্ত্রী জীবিতা আছেন বটে কিন্তু বন্ধ্যা। এজন্য মন্মথ বাবু তাঁহার অনুরোধে ঐ গ্রাম-নিবাসী বাবু নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। শরীর এবং আর্থিক অবস্থা ভাল থাকিলে বংশ রক্ষার জন্য এরূপ বিবাহে যে কি দোষ হইতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। কিন্তু স্থানীয় "খুলনা" মন্মথ বাবুকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন।—খুলনাবাসী।

"খুলনাবাসী" এই কর্ম্মের দোষ দেখিতে পান নাই, যেহেতু উহার লেখক মহাশয় পুরুষ। স্ত্রীলোকেরাও যদি কারণে অকারণে স্বামীসত্ত্বেও বিবাহে দোষ না দেখিতে পান তবে এরূপ পুরুষদের চৈতন্য হইতে বিলম্ব ঘটে না। যাহারা অত্যাচারে নিগৃহীত দাস তাহারাই সুবিধা পাইলেই দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া নিজের প্রভুত্ব ফলাইবার চেষ্টা বেশী করে। তাই আমাদের যত প্রভুত্ব মেয়েদের উপর। এ ভাব শুধু এক-আধ জনের মনে বদ্ধমূল নহে, ইহার মূল বিস্তৃতভাবে ছড়াইয়া আছে; নতুবা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ন্যায় সমবেত মণ্ডলীরও রাগ মেয়েদের উপর প্রকাশ পায় কেন?

"হিন্দুরঞ্জিকা" রাজসাহী জেলার সমস্ত শিক্ষালয়ের বিবরণ দিয়া সংবাদ দিয়াছেন—

যে সমস্ত প্রাইমারী স্কুলে বালকদিগের সহিত বালিকারা পড়ে তাহাদিগকে বোর্ড সাহায্য দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

একে ত আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়; তাহার উপর এইরূপ জুলুম হইলে স্ত্রীশিক্ষার পথ বন্ধ হইবে। বোর্ডের রাগ কি ছেলে মেয়ে একত্র পড়ে বলিয়া? কিন্তু য়ুরোপ-আমেরিকা পরীক্ষা দ্বারা ছেলে-মেয়ের একত্র পাঠের উপকারিতা বুঝিয়া উহার বহুল প্রবর্ত্তন করিতেছে; একত্র পাঠে ছেলে-মেয়ের sex-consciousness উগ্র হইতে পারে না, উভয়েই সংযত ও সম্ভ্রমশীল হইতে বাধ্য হয়।

এই-সমস্ত অল্প স্বল্প অবিবেচনার বাধা সত্ত্বেও দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছেন, স্বকীয় মত প্রচলিত মতের বিরোধী হইলেও অকপটে স্পষ্ট স্বীকার করিতে কুণ্ঠা অনুভব করিতেছেন না, কর্ম্মের ক্ষেত্র পাইলেই স্বার্থত্যাগ করিয়া অসুবিধা কষ্ট বরণ করিয়া তাহাতে নিজেদের শক্তি নিয়োগ করিতেছেন। যাহারা অর্থ সাহায্যের দ্বারা ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা দেশের অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞতা দূর করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারাও দেশকে বলিষ্ঠ উন্নত হইবার সাহায্য করিতেছেন। এ সম্পর্কে আমরা এই সদনুষ্ঠানগুলির সংবাদ পাইয়াছি।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যে সকল দয়াবান মহাত্মা সাধারণের চিকিৎসার্থ হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের জন্য অর্থ প্রদান করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, তন্মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ করিলাম—১। বাবু কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় হাওড়া জেলার বালটিকিরি ঔষধালয়ের জন্য ৪২০০০ হাজার টাকা দিয়াছেন। ২। উত্তরপাড়ার রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের শুশ্রূষাকারিণী ধাত্রীদিগের বাটী নির্ম্মাণের জন্য ৩০০০০ হাজার টাকা দিয়াছেন। ৩। বাবু অন্নদাকুমার ঘোষ ও বাবু রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ খুলনা জেলার নওয়াপাড়ায় একটি হাসপাতাল নির্ম্মাণ জন্য যথাক্রমে ১৭,১২৯ ও ৫৮০০ টাকা দিয়াছেন। ৪। বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৪ পরগণা জেলার নওয়াপাড়ায় একটি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপনের ব্যয় স্বরূপ ১৫,০০০ হাজার টাকা দিয়াছেন। ৫। নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর-নিবাসী স্বর্গীয় বাবু রামরাজা লাহিড়ীর গুণবতী ভার্য্যা শ্রীমতী রাধারাণী দেবী শান্তিপুর দাতব্য ঔষধালয়ে একটি স্ত্রী বিভাগ খুলিবার ও একজন স্ত্রী চিকিৎসক নিয়োগের জন্য ১০,০০০ টাকা দিয়াছেন। ৬। মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর বহরমপুর হাসপাতালের দাতব্য ঔষধালয় নির্ম্মাণার্থ ১৮,০০০ টাকা ব্যয়ভার বহনে প্রতিশ্রুত হইয়া তন্মধ্যে গত বর্ষে ৮০০০ টাকা দিয়াছেন। ৭। হুগলী জেলার ধনেখালি থানার অন্তর্গত দশঘরা গ্রামের শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ রায় দশঘরা দাতব্য ঔষধালয়ের বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা পরিচালনার্থ ৫০০০ টাকা দিয়াছেন। ৮। ভাগ্যকুলের জমিদার রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর ঢাকা জেলার শেখরনগরে একটি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপনের জন্য ৭০০০ টাকা দিয়াছেন। "দাতা শতং জীবতু।" পল্লীগ্রাম-সমূহে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব। যে-সকল ধনাঢ্য ও মহানুভব ব্যক্তি পল্লীগ্রামস্থ দীন দরিদ্র লোকের চিকিৎসার্থ দাতব্য ঔষধালয় ও ঔষধাদি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহারা বাস্তবিকই ধন্যবাদের পাত্র। জগদীশ্বর তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করুন।—চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

দান।—হেতমপুরের মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত সদানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় ইতিপূর্ব্বে সিউড়ি ইন্‌ডোর হাঁসপাতাল গৃহ নির্ম্মাণ জন্য ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে উক্ত গৃহ নির্ম্মাণ জন্য আরও ২০০০৲ দুই হাজার টাকা আবশ্যক হওয়ায় দানশীল মহারাজ-কুমার এই ২০০০৲ টাকাও দান করিতে স্বীকৃত হইয়া সকলের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।—বীরভূমবার্ত্তা।

নলহাটীর নৈশ বিদ্যালয়।—অনেক দিন হইতে নলহাটীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত কে, ডি, সরকার প্রমুখ কতিপয় ভদ্রলোক তথায় শ্রমজীবীদিগের লেখাপড়ার সুবন্দোবস্তের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় এবং তাহার গৃহ নির্ম্মাণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। তবে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে পাছে নলহাটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের চাঁদা আদায়ের ও তাহার অন্যান্য কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে এজন্য এতদিন তাঁহারা এদিকে তেমন মনোযোগ দিতে পারেন নাই। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম এক্ষণ নলহাটী হাই স্কুলের কার্য্য শেষ হওয়ায় এই নৈশ বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। নলহাটীতে যে নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবীগণের লেখা পড়া শিক্ষা দিবার আয়োজন হইতেছে একথা শুনিয়াও আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। এই মহৎ কার্য্যে সকলেরই সাধ্যানুসারে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। বীরভূমবার্ত্তা।

শিবগঞ্জ ও কানসাট এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী পুখুরিয়া গ্রাম। সম্প্রতি এই গ্রামে এণ্ট্রান্স স্কুলের ৭ম ও ৮ম বর্গ শ্রেণী খোলা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকের দেড় ক্রোশ দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ছেলেরা পড়িতে আসিতেছে। পুখুরিয়ার পার্শ্ববাহিনী তুলসীগঙ্গার অপর পার হইতেও অনেক ছেলে স্কুলে পড়িতে আইসে।

—মালদহ-সমাচার।

নিম্নশিক্ষা। অনেক দিন হইতেই শিয়াইল, চাটমহর গ্রামে একটি নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালা আছে এবং জেলাবোর্ড হইতে মাসে তিন টাকা সাহায্যও পাওয়া যায়। ছাত্রদের সকলেই নিরন্ন কৃষিজীবী মুসলমানের সন্তান—তাহাদের নিকট আশানুরূপ ছাত্রবেতন আদায়ের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পাঠশালাটির অভাব অভিযোগও পূরণ হয় না। বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রধান অভাব স্কুলের নিজস্ব গৃহ। একজন মুসলমান অধিবাসী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য জেলাবোর্ডের অনুকূলে ১ বিঘা পরিমাণ জমি বিনা খাজনায় রেজিষ্টারী করিয়া দিয়াছেন। এখন জেলাবোর্ড এ বিষয়ে মনোযোগী হইলেই গ্রামবাসীগণ সুখী হয়।

—স্বরাজ।

"দুবরাজপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্থানীয় সবরেজিষ্টার শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বসু মহোদয় বিশেষরূপেই চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে এজন্য কতক টাকা চাঁদাও আদায় হইয়াছে। হেতমপুরের রাজা শ্রীযুক্ত সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় দুবরাজপুরে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন জন্য ২৫০৲ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।" দুবরাজপুর একটি সুবৃহৎ গ্রাম, সেখানে ইউনিয়ন কমিটি আছে, মুন্সেফী চৌকী আছে, থানা ও সবরেজিষ্টারী অফিস আছে, একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ও আছে; নাই কেবল বালিকা বিদ্যালয়। সাধারণের চেষ্টায় বহুদিন পূর্ব্বেই এই বালিকা বিদ্যালয় সেখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। যাহা হউক কিশোরী বাবু সাধারণের এই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য যে বিশেষ চেষ্টা

করিতেছেন স্থানীয় অধিবাসী মাত্রেরই তজ্জন্য তাঁহাকে এ কার্য্যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য।—বীরভূম-বার্ত্তা।

বিবাহে অধ্যাপক।—পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল প্রতাপে প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতিগুলি এদেশ হইতে প্রায় সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এদেশের অধ্যাপকমণ্ডলীর আর্থিক অবস্থাও অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে অর্থ-লোভে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অন্যায় কার্য্যে বাধ্য হইয়া অগ্রসর হইয়া থাকেন। তাঁহারা যদি সৎপথে থাকিয়া সামাজিকগণের নিকট হইতে তাঁহাদের ভরণ-পোষণ উপযোগী পরিমিত অর্থ লাভে সমর্থ হন তাহা হইলে আর তাঁহারা অন্যায় পথে পদার্পণ করিয়া যুগপৎ আপনাদের ও সমাজের অনিষ্ট করেন না। সাতক্ষীরার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র রায় পুত্রের শুভ বিবাহে অনেকগুলি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের যথোপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। আমরা আশা করি, দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ লক্ষ্মণ বাবুর এই সাধু দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবেন।

—খুলনাবাসী।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের স্বরাজ লাভের আশা সম্বন্ধে মনে হয়

"সে নহে কাহিনী সে নহে স্বপন,
আসিবে সেদিন আসিবে!"

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

—— ——

পুস্তক-পরিচয়

সঙ্গীত-চন্দ্রিকা—দ্বিতীয় ভাগ—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ৮৲ টাকা।

আমরা "সঙ্গীত-চন্দ্রিকা"র দ্বিতীয় ভাগ আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। ইহার প্রকাশে আমরা পরমানন্দ লাভ করিলাম। এই দ্বিতীয় ভাগে, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, গজল, ভজন, চতুরঙ্গ, হপ্তরঙ্গ, ত্রিবট্, তেলানা, রাগমালা, টপ্ খেয়াল, হোরি প্রভৃতি হিন্দুসঙ্গীতের তাবৎ বিভাগেরই উদাহরণ-স্বরূপ কিছু কম প্রায় ২৫০ শত ভাল-ভাল প্রসিদ্ধ গানের স্বরলিপি প্রদত্ত হইয়াছে। ধ্রুপদের অংশই বেশী। কতকগুলি বাঙ্গলা গানেরও স্বরলিপি আছে। অধিকাংশ গানই হিন্দী। হিন্দী গান আয়ত্ত করিতে না পারিলে, উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত শিক্ষা করা অসম্ভব। গ্রন্থকার ফুটনোটে কোন কোন গানের দুর্ব্বোধ হিন্দী শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া শিক্ষার্থীর বুঝিবার পক্ষে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এবং কতকগুলি বহু পুরাতন গানের ও কতকগুলি লুপ্ত রাগিণীর স্বরলিপি প্রকাশ করিয়া তিনি একটা বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন। পরিশিষ্টে, বাদীসম্বাদীর বিচার করিয়া এবং কোন্ রাগিণীর কোন্ স্বর বাদী ও কোন্ স্বর সম্বাদী ইত্যাদি দেখাইয়া প্রধান প্রধান রাগরাগিণীর একটা বিশুদ্ধ তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেও সঙ্গীতশিক্ষার্থীর সঙ্গীতশিক্ষার পক্ষে বিশেষ-সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। "সঙ্গীত-রসোদ্দীপনা" প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ঋি-স্বর ও প-স্বর সম্বন্ধে "গীতসূত্রসারের" প্রতিবাদ করিয়া যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হইল। আসল কথা, আমাদের সঙ্গীতে করুণ-রস ও শান্ত-রসের প্রভাবই সমধিক। অধিকাংশ রাগ-রাগিণীতে স্বরগুলি যেরূপ মূর্চ্ছনা-যোগে এক স্বর হইতে স্বরান্তরে গড়াইয়া পড়ে, তাহাতে উৎসাহ ও বীর-রস প্রকাশের আদৌ সুযোগ হয় না। তাই, শাস্ত্রে যাহাই বলুক, আমাদের সঙ্গীত সারগমের কোন্ স্বরটি বিশেষরূপে উৎসাহবর্দ্ধক বা বীর-রসাত্মক তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে, যে-সকল রাগরাগিণীর স্বরবিন্যাসে মূর্চ্ছনা বেশী নাই, এবং স্বরগুলি কাটা-কাটা ও ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া চলে, সেই-সকল রাগ রাগিণীই উৎসাহ ও বীর রসের উপযোগী বলিয়া মনে হয়। 'বীর-রস, বা রুদ্র-রস প্রকাশের জন্য কোন একটি বিশেষ-স্বর আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। তবে, মল্লার ও কানেড়া রাগিণীতে রচিত দুই-একটা গানে ঝড়ের যে বর্ণনা দেখিয়াছি, তাহাতে রুদ্ররস বেশ ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস,—কোন-একটি বিশেষ স্বরে নহে, পরন্তু কতকগুলি স্বরের যোগাযোগেই কোন-একটি বিশেষ রসের উদ্দীপনা হয়। বলাবাহুল্য, এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার সঙ্গীত-শিক্ষার্থী ও সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি মাত্রকেই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আর-এক কথা, আমাদের ওস্তাদেরা সঙ্গীতের শিক্ষাদানে কিরূপ কার্পণ্য করিয়া থাকেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু সঙ্গীতাচার্য্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সে প্রকৃতির লোক নহেন। তিনি অকাতরে ও অসঙ্কোচে সর্ব্বসাধারণের নিকট সঙ্গীত ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া মুক্তহস্তে সঙ্গীতরত্ন বিতরণ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার আন্তরিক উদারতা ও অকৃত্রিম বিদ্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষণে আমরা "সঙ্গীত-চন্দ্রিকা"র তৃতীয় ভাগের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

শ্রীজ্যো—

বঙ্কিম-জীবনী—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬অং ৮৬৪ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ।

আমাদের প্রথম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখক প্রতিভাশালী ও চিন্তাশীল মনীষী বন্দেমাতরম্-মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের কাহিনী ও ইতিহাস এবং তাঁহার উপন্যাস প্রভৃতি রচনার পরিচয় ও বিশ্লেষণ এই প্রকাণ্ড পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নামে প্রচারিত অনেক আজগুবি অতিপ্রাকৃত কথা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনের বহু ঘটনা ইহাতে সংগৃহীত আছে; এই-সমস্ত আখ্যায়িকা অতিশয় কৌতুককর এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় লেখককে সম্পূর্ণভাবে মানুষ হিসাবে বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। বইখানিতে যদিও শৃঙ্খলা ও বিচারবিচক্ষণতা তাদৃশ প্রকাশ পায় নাই, ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা একটি সুস্পষ্ট চরিত্র গঠিত হইয়া উঠে নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও ধর্ম্মমতের আলোচনায় যদিও নিপুণ বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, তথাপি ইহা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ধারণা করিবার সহায়তা লাভ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা, প্রকাশিত পুস্তকের পরিত্যক্ত অংশ প্রভৃতি সংগৃহীত থাকাতে বইখানি অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোক মাত্রেই; বঙ্গের বাহিরেও অনেকেই; তাঁহার এই একখানি মাত্র জীবনচরিত সকলেরই একবার পাঠ করিয়া দেখা উচিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। ৩৮০ পৃষ্ঠা। ৬ খানি ছবি আছে। কাপড়ে মজবুত বাঁধা। দাম দেড় টাকা।

অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবনচরিত। ভূমিকায় লেখক স্বীকার করিয়াছেন "বিস্তারিত জীবনচরিত বলিলে যাহা বুঝায় এই পুস্তক ঠিক তাহা নহে—ইহাকে কবিবরের জীবনের অনুশীলন (study) বলা যাইতে পারে।" বিভিন্ন সময়ে বিবিধ সাময়িক পত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে যে-কিছু আলোচনা হইয়াছিল তাহা [illegible] করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া এই জীবনচরিত রচনা করা

লাভ হইয়াছে এই যে বহু লোকের মনে দ্বিজেন্দ্রলাল কিরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন তাহার একটা সমষ্টিগত আভাস পাইয়া পাঠক নিজের মনে সব মিলাইয়া একটি ধারণা গঠন করিয়া লইবার সুযোগ পায়; দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাগুলির বিশ্লেষণ ও সমালোচন প্রসঙ্গে দেশের কোন্ সমালোচক কি বলিয়াছেন তাহাও জানিয়া রচনারও দোষগুণ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ধারণা করার সুবিধা ঘটে। কিন্তু ক্ষতি হইয়াছে এই যে দ্বিজেন্দ্রচরিত্র ও দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভা সম্পূর্ণ ও organic রকমে প্রকাশ পাইবার অবকাশ পায় নাই। তবু আমরা এই সংগ্রহ হইতে জানিতে পারি দ্বিজেন্দ্রলাল মানুষহিসাবে বাল্যাবধি কি রকম নির্ভীক আত্মনির্ভর অন্যায়-অসহিষ্ণু খাতিরনদারদ ছিলেন; কর্ম্মক্ষেত্রেও তাহা কেমন ভাবে প্রবল মাত্রায় বজায় ছিল; গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনে এবং সামাজিক ব্যবহারে তিনি কি-রকম স্নেহশীল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও বন্ধুবৎসল অমায়িক ছিলেন; তাঁহার রচনায় তাঁহার রসিক কবি-হৃদয় কেমন সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কবির জীবনের ছোটখাটো ঘটনা ও কার্য্যের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পরিচয় সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তিন বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব অসাধারণ ও প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বলিয়া আমরা মনে করি—(১) প্রাণের তীব্র জ্বালা ও বেদনাকে হাস্যরসে মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করার দক্ষতায়—হাসির গানগুলি তাহার সাক্ষী, (২) কবিতার পদান্ত মিল নির্ব্বাচনে—গান ও কবিতায় তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলিবে, (৩) দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ সঙ্গীত সংরচনায়। আমরা একদিন তাঁহাকে দুঃখ জানাইয়া বলিয়াছিলাম "গান কবিতা রচনা ছেড়ে নাটক রচনায় মন দেওয়াতে বাংলা-সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।" তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন "আমি জানি আমার নাটকগুলো তেমন কিছু হচ্ছে না; কিন্তু তা লিখে আমি হাজার-হাজার টাকা পাচ্ছি, দেশ-সুদ্ধ লোকের বাহবা হাততালি পাচ্ছি! আর আমার মন্দ্র আলেখ্য কজনেই বা পড়ে আর তার সুখ্যাতি এক এই আপনাদের মতন দুচারজনের মুখে ছাড়া ত বড় একটা শুনি না!" দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের উক্তিকে যেমন সহজে মানিয়া লইয়াছিলেন এমন খুব অল্প লেখকই পারেন। সেই বলিষ্ঠ হৃদয়ের বহু পরিচয় ও সেই কুশলী লেখকের বহু বিশ্লেষণ এই জীবনচরিতের মধ্যে সমাবেশ করা হইয়াছে। দেশভক্ত দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচয় যাঁহারা পাইতে চান তাঁহারা এই জীবনচরিত অবশ্যই পাঠ করিবেন। কোনো কবির কাব্য ও রচনার রস তখনই যথার্থভাবে সম্ভোগ করা যায় যখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানুষটিরও পরিচয় জানা যায়, যখন রচনার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণের দ্বারা তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এই পুস্তক হইতে তাহার যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইবে। দ্বিজেন্দ্রলালের নানান বয়সের ছবি দেওয়া হইয়াছে, হাতের লেখার নমুনাও দেওয়া উচিত ছিল।

ইলিয়াড—শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত। প্রকাশক সিটিবুক সোসাইটি, কলিকাতা। রয়াল ১৬ অং ৮৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র। দাম ছয় আনা।

ইলিয়াড গ্রীস দেশের মহাকবি হোমারের রচিত মহাকাব্য ও য়ুরোপের আদি কাব্য বলিয়া আমাদের দেশের রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় সেদেশে বিশেষ সমাদৃত। সেই মহাকাব্যের আখ্যান সংক্ষেপে ছেলেদের উপযোগী করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বর্ণিত হইয়াছে। এই উপাখ্যান পাঠ করিয়া বালকবালিকারা বিদেশের একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তকের পরিচয় লাভ করিতে পারিবে। পুস্তকের ভাষাও বিশেষ কঠিন নয়, তবে বিশেষ সহজও নয়, একটু বড় ছেলেমেয়েরা পড়িয়া বুঝিতে পারিবে। ছবিগুলি বিলাতী বই হইতে নেওয়া, সুতরাং উৎকৃষ্ট। মলাটের ছবিখানি হিতেন্দ্র বসুর আঁকা, সেখানিও উত্তম। কম বই ছেলেবেলা হইতে পড়াইয়া ছেলেমেয়েদের বিশ্বসাহিত্যের সহিত ও জগতের সহিত পরিচয়সাধন করিয়া দেওয়া সকল অভিভাবকের কর্ত্তব্য।

ছেলেদের বত্রিশ সিংহাসন—শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চাটার্জি কোম্পানি, কলিকাতা। ১০৭ পৃষ্ঠা। সচিত্র। মূল্য আট আনা, এই যুদ্ধের বাজারে খুব সস্তা।

সংস্কৃত ভাষায় কালিদাসের নামে চলিত একখানি গল্পের বই আছে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা। তার উপাখ্যানই বত্রিশ-সিংহাসন। রাজা বিক্রমাদিত্য, হারুন অল রসীদ, শার্লেমান, সলোমন, আর্থার প্রভৃতি রাজাদের নামের সঙ্গে নানাবিধ গল্প জড়িত হইয়া তাহাদের দেশে প্রচারিত আছে। আমাদের দেশে রাজা বিক্রমাদিত্যকে লইয়া বহুবিধ অলৌকিক গল্প রচিত হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের পরবর্ত্তী রাজা ভোজ উজ্জয়িনী নগরে মাটি খুঁড়িয়া একটি সিংহাসন পাইয়াছিলেন, সেটি মাথায় করিয়া বত্রিশটি পুতুল ছিল। রাজা ভোজ সেই সিংহাসনে বসিতে গেলে বত্রিশটি পুতুল বত্রিশটি গল্পে রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাকে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসিতে নিরস্ত করে। সেই বত্রিশ পুতুলের বত্রিশটি গল্প ছেলেদের পাঠের যোগ্য করিয়া এই পুস্তকে লেখা হইয়াছে। গল্পগুলি কৌতুকজনক। বইএর ছবিগুলিও উৎকৃষ্ট। ছেলেরা এ বই পাইলে আনন্দ ও শিক্ষা পাইবে।

মুদ্রারাক্ষস।

চিত্র-পরিচয়

মুখপাতের "নির্জ্জলা একাদশী" ছবিখানি শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আঁকা। এই ছবিতে চিত্রকর আমাদের হিন্দুদের হৃদয়হীনতার ছবি আশ্চর্য্য রকম জোরালো ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাড়ীর কর্ত্তা গুরু-ভোজনে ভুঁড়ি ফুলিয়ে কাছা সামলাতে সামলাতে আর দাঁত খুঁটতে খুঁটতে আঁচাতে চলেছেন; বাড়ীর সধবা গিন্নিটি কর্ত্তার প্রসাদী দুধের বাটিটিতে দিব্যি চুমুক মারছেন, বিড়াল কাক পিঁপড়ে মাছি—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সবাই আহারে লেগে গেছে; কেবল বাড়ীর বিধবাটি জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের দীর্ঘ দিবসের প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপে ক্ষুধাপিপাসায় কাতর হয়ে পাষাণ দেবতার দ্বারে ধন্না দিয়ে পড়ে ধুঁকছে। সকল বিধবার অশ্রুজল নির্জ্জলা একাদশীর দিনে পাষাণের উপর ঝরে পড়ছে! আর বিশ্বের বিস্মিত চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে বাড়ীর অপর লোকদের ব্যবহার দেখছে। এই ছবির প্রত্যেক রেখার বক্রতায় এই কঠোরতার ভাবটি স্পষ্ট ফুটে ফুটে উঠেছে!

"আলোক-দূত" ছবিখানিতে চিত্রকর দেখাতে চেয়েছেন "রাত্রি" "আলোকের" প্রতীক্ষায় নীলাম্বরী শাড়ী আর কপালে চন্দ্রকলার উপর তারার টিপ পরে' ম্লানমুখে বসে রয়েছে; পিছন দিক থেকে যখন "আলোক" অগ্রসর হয়ে আসছে সে সঙ্গে নিয়ে আসছে প্রিয়তমার জন্য ভোরের শীতল বাতাসের মতন মধুর স্পর্শ আর বিকশিত পুষ্পের ন্যায় অমল আনন্দ!

চারু।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৭শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩২৪

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

দাদাভাই নওরোজী।

মানুষ অনন্ত-পথের যাত্রী; এই অনন্ত যাত্রা ইহ-জীবনেই আরম্ভ হয়। যাঁহারা মানুষের মত মানুষ তাঁহাদের জীবন কোথাও আসিয়া থামিয়া যায় না, কিম্বা তাঁহারা কতক দূর অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ পিছাইতে থাকেন না। দাদাভাই নওরোজী এই শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ রাজনীতিজ্ঞ ও রাজনৈতিক সংস্কারক বলিয়া পরিচিত। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি বরাবর যুবকদের মত আশাশীল এবং অগ্রসর দলের সঙ্গে ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি আমাদের দাদা অর্থাৎ ঠাকুরদাদা বা দাদা মহাশয়ের মত ছিলেন। ভারতবাসী সকলকে তিনি ভাই মনে করিয়া চিরকাল তাহাদের হিত-চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নওরোজী নামও সার্থক ছিল। তিনি "নওরোজ" বা নূতন দিনের অগ্রদূত ছিলেন, এবং চিরদিন নূতন দিনের প্রতীক্ষা করিয়া তাহা আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের অনেক রাজনৈতিক-সংস্কার-প্রার্থী মধ্যপথে আসিয়া থামিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা হোমরূলের নামে ভয় পান, কিম্বা হয় ত হোমরূল কথাটা ভারতে তাঁহাদের দ্বারা প্রথমে খুব ব্যবহৃত ও চলিত হয় নাই বলিয়া তাহা ব্যবহার করিতে চান না। দাদাভাই নওরোজী এ-রকম মানুষ ছিলেন না। শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট যখন ভারতবর্ষে হোমরূল-প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেন, তখন হইতে ইহার সহিত দাদাভাই নওরোজীর আন্তরিক যোগ ছিল। তিনি জানিতেন, তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে সভাপতিরূপে যে স্বরাজের দাবী করিয়াছিলেন, ইহা তাহাই। মৃত্যুশয্যায় শয়ান থাকিয়াও তিনি পৃথিবীর সার্ব্বজনিক সংবাদ জানিতে ব্যগ্র ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বের চারিদিন অত্যন্ত দুর্ব্বলতা-বশতঃ তিনি কথা কহিতে পারিতেন না; কিন্তু সর্ব্বদাই জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, খবর জানিতে চাহিতেন। তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত দাদীনা এবং তাঁহার দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণ তাঁহাকে খবরের কাগজ হইতে প্রধান প্রধান সংবাদ পড়িয়া শুনাইতেন। হোমরূল সম্পর্কীয় সংবাদ তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত শুনিতেন।

দাদাভাই নওরোজী অন্তরে বাহিরে খাঁটি সাধু মানুষ ছিলেন। বাল্যে গৃহীত পবিত্র জীবন-যাপনের ব্রত তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে পালন করিয়া গিয়াছেন। মধ্যবয়সে তাঁহার একবার কঠিন পীড়া হয়। তখন একজন বহুদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি বরাবর এরূপ পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছেন, যে, তাঁহার শরীরের কোন যন্ত্রে ঘুণ ধরে নাই, তিনি দীর্ঘজীবী হইবেন। দাদাভাই নওরোজীকে অন্তরের সহিত

শ্রদ্ধা করিতে কোন সঙ্কোচ বোধ হয় না। সাধারণতঃ লোকে মনে করে, সার্ব্বজনিক কাজের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের সম্পর্ক কি? তজ্জন্য আমাদের দেশের (এবং অন্য দেশেরও) রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এমন মানুষ দেখা গিয়াছে এবং এখনও যায়, যাহাদিগকে স্পর্শ করিলে অশুচি হইবার আশঙ্কা হয়, এবং যাহাদের সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। দাদাভাই নওরোজীকে দেখিলে ও স্পর্শ করিলে লোকে 'ধন্য হইলাম' মনে করিত।

এই মহাত্মা ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯১ বৎসর ৯ মাস ২৬ দিন হইয়াছিল। চতুর্থ জর্জ, চতুর্থ উইলিয়ম, ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড এবং পঞ্চম জর্জ, ইংলণ্ডের এই পাঁচ জন রাজা ও রাণীর রাজত্ব তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের কুড়িজন গবর্ণর জেনারেলের শাসনকাল তাঁহার জীবনের মধ্যে পড়িয়াছে। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। তাহার পর বেণ্টিঙ্ক, অকল্যাণ্ড, এলেনবরা, হার্ডিং, ডালহাউসী, ক্যানিং, এল্‌গিন্, লরেন্স্, মেয়ো, নর্থব্রুক্, লিটন, রিপন, ডফারিন, ল্যান্স্‌ডাউন্, এল্‌গিন্ (আগেকার এলগিনের পুত্র), কার্জ্জন, মিণ্টো, হার্ডিং (আগেকার হার্ডিঞ্জের পৌত্র) এবং চেম্‌স্‌ফোর্ড ভারতশাসন করিতে আসেন। এই দীর্ঘ জীবনের মধ্যে তিনি শেষ দশ বৎসর বিশ্রাম করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সময়েও বয়ঃকনিষ্ঠেরা তাঁহার পরামর্শ, উৎসাহ, সহানুভূতি, ও অনুপ্রাণনা হইতে কখনও বঞ্চিত হয় নাই। একুশ বৎসর তাঁহার শিক্ষার সময়, এবং বাকী একষট্টি বৎসর ধরিয়া তিনি নানা-প্রকারে নিঃস্বার্থভাবে, অকপটে ও সমুদয় শক্তির সহিত দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। তিনি পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাঁহার বিধবা মাতা, ভ্রাতার সাহায্যে তাঁহাকে মানুষ করেন। দাদাভাই আত্ম-চরিতের যে এক অধ্যায় লিখিয়া প্রকাশ করিতে দিয়াছিলেন, তাহার শেষে মাতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"......there is one who, if she comes last in this narrative, has ever been first of all—my mother...... She worked for her child, helped by a brother. Although illiterate, and although all love for me, she was a wise mother. She kept a firm hand upon me and saved me from the evil influences of my surroundings. She was the wise counsellor of the neighborhood. She helped me with all her heart in my work for female education and other social reforms against the prejudices of the day. **She made me what I am.**"

"এই বৃত্তান্তে একজনের কথা যদিও সর্ব্বশেষে বলিতেছি, তথাপি তিনি আমার জীবনে সকল সময়ে সকলের অগ্রস্থানীয়া ছিলেন তিনি আমার মা। তিনি তাঁহার এক ভ্রাতার সাহায্য লইয়া, তাঁহার শিশুটির জন্য খাটিতেন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন এবং আমার প্রতি স্নেহে তাঁহার হৃদয়মন পূর্ণ ছিল, কিন্তু তিনি খুব বিবেচক ছিলেন। তিনি আমাকে সর্ব্বদা শক্ত শাসনে রাখিতেন, কখন আস্কারা দিতেন না; আমার আশে পাশের সকল রকম কুপ্রভাব হইতে তিনি আমাকে রক্ষা করিতেন। তিনি পাড়ার সকলের বিজ্ঞ পরামর্শদাত্রী ছিলেন। তৎকালীন নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমি স্ত্রীশিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে সামাজিক সংস্কারের জন্য যে সব চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতে সমস্ত হৃদয়ের সহিত তিনি আমার সাহায্য করিয়াছিলেন। আমি যাহা, তিনিই আমাকে তাহা করিয়াছেন। আমি তাঁরই হাতের তৈরী।"

দাদাভাই খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি যে স্কুলে শিক্ষা পান, সেখানে ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হইত না। এই শিক্ষার উল্লেখ করিয়া তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন :—

"Had there been the fees of the present day, my mother would not have been able to pay them. This incident has made me an ardent advocate of free education and the principle that every child should have the opportunity of receiving all the education it is capable of assimilating, whether it is born poor or with a silver spoon in its mouth."

"তখন আজকালকার মত বেতন দিতে হইলে আমার মা কখনই তাহা দিতে পারিতেন না। এই ঘটনার জন্য আমি আগ্রহের সহিত অবৈতনিক শিক্ষার সমর্থন করিয়া থাকি, এবং আমার মত এই যে, দরিদ্রের ঘরের হউক বা ধনীর বাড়ীরই হউক, প্রত্যেক শিশুকে, সে যতটা শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ, ততটা শিক্ষা পাইবার সুযোগ দেওয়া উচিত।"

আমরাও এই কথা নানা আকারে পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিতেছি। সমুদয় সভ্যদেশে এই শিক্ষা-রীতি অনুসারে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে কাজ হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্ট এখনও ইহার অনুসরণ না করিয়া স্বকীয় অনুন্নততা প্রমাণ করিতেছেন। শিক্ষিত মানুষই প্রত্যেক দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ; হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ যোজন জমী অকৃষ্ট অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে যেমন দেশের ধন বাড়ে না, তেমনি শিক্ষা না পাইলে কেবল লোক-সংখ্যার জোরে কোন দেশ মহৎ হয় না। আমাদের দেশে শিক্ষার

অভাবে কত শিশুর প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অবৈতনিক সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রচলিত থাকিলে আমাদের দেশের আরও কত শিশু বড় হইয়া ধর্ম্ম সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে জগতের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি ও কল্যাণসাধন করিতে পারিত, কে বলিতে পারে?

কি করা উচিত বা কিরূপ হওয়া উচিত, এই বোধ ও আকাঙ্ক্ষা যখন মানুষের জন্মে, তখন সে প্রকৃত মনুষ্যজন্ম লাভ করে ও দ্বিজ হয়; তাহার আগে সে অন্যান্য প্রাণীর মত প্রাণী মাত্র থাকে। দাদাভাই লিখিয়াছেন, তাঁহার আত্মার এই জাগরণ পনের বৎসর বয়সের সময় ঘটে। তিনি লিখিয়াছেন,

"ঠিক যেন কল্যকার ঘটনার মত আমার মনে পড়ে, কোন্ রাস্তার কোন্ খানে আমি, কখনও অভদ্র অশুচি ভাষা ব্যবহার করিব না, বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করি। তখন হইতে শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমি, ইহা করিব, ইহা করিব না, এইরূপ নানা প্রতিজ্ঞা করি; এবং আমি সেইসব প্রতিজ্ঞা সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করিয়াছিলাম, বলিতে পারি।"

গুজরাটী ও ইংরেজী স্কুলের পড়া সাঙ্গ করিয়া তিনি এলফিনষ্টোন কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি বলেন, "এক্ষেত্রেও আমার ভাগ্য ভাল ছিল। স্কুলগুলির মত এখানেও বেতন ছিল না। অবস্থাটা বরং তাহার বিপরীতই ছিল। যাহারা ছাত্রবৃত্তি লাভ করিত, তাহারাই কলেজে ভর্ত্তি হইতে পাইত, সৌভাগ্যক্রমে আমি একটা বৃত্তি পাইয়াছিলাম।" এই সময়ে তিনি জরথুস্ত্র-মতাবলম্বীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ হইতে, চিন্তায় বাক্যে ও কর্ম্মে শুচিতা-রক্ষা-সম্বন্ধীয় উপদেশ লাভ করেন। এই উপদেশ তাঁহার জীবনে পালিত হইয়াছিল।


দাদাভাই নওরোজী।

"শিক্ষায় যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, আমার চিন্তাও তেমনি নানাদিকে বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। আমি উপলব্ধি করিলাম, যে, আমি দরিদ্র লোকদের প্রদত্ত অর্থে শিক্ষা পাইয়াছি। এই চিন্তা আমার মনে বিকশিত হইল, শিক্ষা এবং শিক্ষাপ্রদত্ত সমুদয় উপকার ও সুবিধা যখন দেশবাসীদের সাহায্যেই আমি পাইয়াছি, তখন, আমার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহা আছে, তাহা দেশবাসীদিগকে প্রতিদান করা আমার কর্ত্তব্য। আমাকে স্বদেশীয়দিগের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতেই হইবে। এই চিন্তা যখন আমার মনে স্পষ্টতর আকার ধারণ করিতেছিল, তখন "দাস ব্যবসায়" সম্বন্ধে ক্লার্কসনের বহি এবং নরহিতৈষী হাওয়াডের জীবনচরিত আমার হাতে পড়িল। তখন আর কোন দ্বিধা রহিল না। এই আকাঙ্ক্ষা আমার জীবনের নিয়ামক ইচ্ছায় পরিণত হইল, যে, যখন যে ভাবে সুযোগ পাইব দেশবাসীদের সেবা করিব।"

আমরা কেহ কেহ সরকারী বৃত্তি পাইয়া, কেহ কেহ বা অন্য প্রকারে বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়াছি। এই শিক্ষার জন্য আমরা দেশবাসীদের নিকট ঋণী, কারণ, তাঁহাদেরই প্রদত্ত খাজনা হইতে শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। যাঁহারা বেতন দিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে, মেডিক্যাল কলেজে, বা এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বহুব্যয়সাধ্য শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহারাও তাঁহাদের শিক্ষার জন্য দেশবাসীদের নিকট ঋণী। প্রেসিডেন্সী কলেজে এক-একজন ছাত্র বহুসুরে

১৪৪৲ টাকা বেতন দেন। কিন্তু ১৯১৫-১৬ সালে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য বার্ষিক ব্যয় হইয়াছিল ৩৬২৸৵৫ পাই। ছাত্র-বেতন বাদে বাকী টাকাটা দেশবাসীদের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে আসে। ১৯১৫-১৬ সালে সরকারী রাজস্ব হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের সমুদয় ছাত্রের (৯৭৫ জন) জন্য ২৩৪০২৪ টাকা খরচ করা হইয়াছিল। মেডিক্যাল কলেজে ঐ বৎসর প্রতি ছাত্র গড়ে ৮৮৸৴২ বেতন দিয়াছিল। কিন্তু প্রতি ছাত্রের জন্য মোট খরচ হইয়াছিল ৩১৩৸৵২। সমুদয় (৮৬৩ জন) ছাত্রের জন্য মোট সরকারী ব্যয় ঐবৎসর ২১৩৫৪৭ টাকা হইয়াছিল। শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রত্যেক ছাত্রের জন্য গড়ে বার্ষিক ব্যয় হইয়াছিল ৭৮৩৸৴৮ কিন্তু প্রত্যেক ছাত্র গড়ে বেতন দিয়াছিল প্রায় ৬৬ টাকা। সমুদয় (২৮৩ জন) ছাত্রের জন্য সরকারী ব্যয় হইয়াছিল ১৯২৪৩২ টাকা। এই সকল ও অন্যান্য কলেজ ও স্কুলের ধনী ও দরিদ্র ছাত্রেরা দাদাভাই নওরোজীর মত, দেশবাসীর নিকট এই ঋণ স্বীকার করিয়া, সেবাদ্বারা তাহা শোধ করিতে চেষ্টা করেন কি? তাঁহাদের অভিভাবকগণ যে বেতন দিয়া থাকেন, তাহাও পরোক্ষভাবে দেশের চাষাভুসা-মজুরদের পরিশ্রমের টাকা। জমীদার উকীল হাকিম প্রভৃতি অনেকে এইসব গরীব লোকদের অন্নে পালিত।

দাদাভাই জীবনে নানাপ্রকারে দেশের সেবা করিয়াছেন। অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়াও বাদ পড়ে নাই। কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া যখন তিনি সংসারে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন তিনি কয়েক বৎসর বোম্বাইয়ে তাঁহার পাড়ার ছেলেদিগকে স্বেচ্ছায় এবং কোনও বেতন না লইয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন।

১৮৫৫ সালে তিনি ও তাঁহার দুই বন্ধু বিলাতে গিয়া "কামা এণ্ড কোং" নাম দিয়া লণ্ডনে একটি ব্যবসা খুলেন। বিলাতে ভারতবাসীদের এই প্রথম কারবার। এই ব্যবসায়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ও সাধু কারবারী বলিয়া তাঁহার সুনাম অক্ষুণ্ণ ছিল।

বিলাতে ব্যবসা করিতে যাইবার আগেকার ছয় সাত বৎসর তিনি নানাবিধ সংস্কারকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা, সামাজিকসম্মিলন ও অন্যান্য সার্ব্বজনিক সভায় পুরুষদের সহিত নারীদেরও যোগদান, শিশুশিক্ষালয় স্থাপন, ছাত্রদের জন্য নানাস্থানে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সভা-স্থাপন, দেশভাষায় প্রয়োজনীয় জ্ঞানবিস্তারিণী সভা স্থাপন, পার্সীদের মধ্যে সংস্কার, বাল্যবিবাহের উচ্ছেদসাধন, হিন্দু-বিধবাদের পুনর্বিবাহদান, পার্সীদের ধর্ম্মের সংস্কার, প্রভৃতি নানাবিষয়ে তিনি এই সময়ে মন দিয়াছিলেন। কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক যুবক এই-সব কাজে তাঁহার সহায় ছিল। প্রধানদের নিকটও তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে উৎসাহ পাইয়াছিলেন। দাদাভাই নওরোজীই বোম্বাইয়ে সর্ব্ব-প্রথমে অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা এই-সকল বিদ্যালয়ে বিনাবেতনে শিক্ষকতা করিতেন। ষ্টুডেণ্টস্ লিটারেরী মিসেলেনী নামক সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া তিনি তাহাতে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

বাংলাদেশে প্রেসিডেন্সি কলেজ যেমন প্রধান সরকারী কলেজ, বোম্বাইয়ে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজ তদ্রূপ। দাদাভাই নওরোজী এই কলেজে গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে সরকারী কলেজে কোন ভারতবাসী অধ্যাপক নিযুক্ত হন নাই। বিলাত যাইবার পর তিনি লণ্ডনের ইউনিভারসিটী কলেজে গুজরাটীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিলাতেও তিনিই এই-প্রকারে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও সংস্কারক সার্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এলফিন্‌ষ্টোন কলেজের তাঁহার অন্যতম ছাত্র। ভাণ্ডারকর মহাশয়ের বয়স এখন ৮০ বৎসর।

অন্যান্য অনেক কার্য্যক্ষেত্রের ন্যায় সংবাদপত্র পরিচালনেও তিনি বোম্বাইয়ে একজন অগ্রণী ছিলেন। তিনি "রাস্ত্ গোফ্‌তার" বা "সত্যবাদী" নামক গুজরাটী খবরের কাগজ স্থাপন ও দুই বৎসর সম্পাদন করেন। এখন আর উহার ঐ নামের সার্থকতা নাই। শ্রীযুক্ত মালাবারীর সহযোগিতায় তিনি "ভয়েস্ অব্ ইণ্ডিয়া"ও স্থাপন করেন। ইহা এখন লুপ্ত হইয়াছে।

মদ্যপান নিবারণ কার্য্যেও তিনি একজন নেতা ছিলেন। সামুয়েল স্মিথ ও কেন্ সাহেব যাঁহাদের সাহায্যে এংলো-ইণ্ডিয়ান্ টেম্পারেন্স এসোসিয়েশন স্থাপন করেন, দাদাভাই

তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার বাল্যকালে তাঁহাদের সমাজে মদ্যপান বোধ হয় বেশী প্রচলিত ছিল। তিনি রাত্রে আহারের পূর্ব্বে একটু মদ খাইতেন। এক দিন বাড়ীতে মদ না থাকায় তিনি নিকটবর্ত্তী মদের দোকানে পানার্থ প্রেরিত হন। সেখানে গিয়া তথাকার দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার এমন লজ্জা বোধ হয় এবং মাথা হেঁট হয় যে, তিনি তাহা জন্মেও ভুলিতে পারেন নাই। শৈশবের এই ঘটনার পর তিনি আর কখনও মদ্যপান করেন নাই।

গত (উনবিংশ) শতাব্দী যখন ষাটের কোঠায় তখন তিনি লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের হিতার্থ লণ্ডন-ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটী স্থাপন করেন। তিনিই বদরুদ্দিন তৈয়াবজী, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শাহ মেহতা, প্রভৃতিকে সার্ব্বজনিক কাজে প্রবৃত্ত করেন। বিলাতে ও ভারতে যুগপৎ সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণের ঔচিত্য সম্বন্ধে বিলাতে আন্দোলন তিনিই প্রথমে করেন। আরও যত কাজ করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা দেওয়াও এখানে অসম্ভব। তিনি যখন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন বোম্বাইয়ের নাগরিকগণ কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ তাঁহাকে ত্রিশ হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দেন। তাঁহার খুব টাকার দরকার ছিল; কিন্তু তিনি এই উপহারের প্রত্যেকটি টাকা সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি, কর্ত্তব্যবোধে, মহলার রাও গাইকবারের রাজত্বকালের শেষ সময়ে বড়োদার প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এই কাজ তিনি বেশীদিন করেন নাই। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই, পুরাতন অত্যাচারী ঘুষখোর কর্ম্মচারীদের বাধা ও চক্রান্ত এবং ইংরেজ রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারের সহযোগিতার অভাব সত্ত্বেও, তিনি বড়োদার শাসনসংক্রান্ত নানা ব্যবস্থার ও প্রণালীর বিস্তর উন্নতিসাধন করেন। বড়োদার প্রধান মন্ত্রীর পদের বেতন ছিল বার্ষিক এক লক্ষ টাকা। কিন্তু দাদাভাই যখন দেখিলেন যে বড়োদার তদানীন্তন মহারাজা শাসনপ্রণালীর সংস্কার অসম্ভব করিয়া তুলিতেছেন, তখন কার্য্য ত্যাগ করিলেন। তাহার পর জুনাগড়ের নবাব তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দাদাভাই রাজী হন নাই।

ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথমে পার্লেমেণ্টের সভ্য হন। তিনি তিনবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহার সমুদয় কার্য্যের কেবলমাত্র একটি তালিকা দেওয়াও অসম্ভব। ভারতবর্ষের অর্থনীতি-ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান কাজ দুটি। অর্থনীতি-ক্ষেত্রে তিনি ভারতবর্ষের ঘোর দারিদ্র্য প্রমাণ করেন, এবং প্রদর্শন করেন যে তাহার একটি প্রধান কারণ, ভারতবর্ষ হইতে নানা আকারে প্রতি বৎসর অনেক কোটি টাকা বা তুল্য-মূল্য দ্রব্য বিলাতে রপ্তানী, যাহার কোন প্রতিদান আমরা পাই না। তাঁহার "পভার্টি এণ্ড আন্-ব্রিটিশ রূল্ ইন্ ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনিই প্রথমে ভারতবর্ষে স্বরাজের আদর্শ পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করেন এবং স্বরাজের দাবী করেন। ১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি সংক্ষেপে এই আদর্শ নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করেন।

(1) Just as the administration of the United Kingdom in all services, departments and details is in the hands of the people themselves of that country, so should we in India claim that the administration in all services, departments and details should be in the hands of the people themselves of India. The remedy is absolutely necessary for the material, moral, intellectual, political, social, industrial and every possible progress and welfare of the people of India.

(2) As in the United Kingdom and the colonies all taxation and legislation and the power of spending the taxes are in the hands of the representatives of the people of those countries, so should also be the rights of the people of India.

তাৎপর্য্য। (১) বিলাতের রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহের ভার যেমন সমুদয় বিভাগে, সকল রকম চাকরীতে, ছোট বড় পুঙ্খানুপুঙ্খ সকল বিষয়ে ঐদেশের লোকদের হাতেই আছে, তেমনি আমাদেরও দাবী করা উচিত, যে, আমাদের দেশেরও রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহের ভার সমুদয় বিভাগে, সকল-রকম চাকরীতে, ছোট বড় পুঙ্খানুপুঙ্খ সমুদয় ব্যাপারে ভারতবর্ষেরই লোকদের হাতে থাকা উচিত। ভারতবর্ষের লোকদের আর্থিক, নৈতিক, মানসিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও শিল্পবাণিজ্যিক এবং অন্য সর্ব্বপ্রকারের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য এই প্রতীকার একান্ত আবশ্যক। (২) বিলাতে এবং তাহার উপনিবেশসমূহে ট্যাক্স বসাইবার ও ধার্য্য করিবার, আইন প্রণয়ন করিবার, এবং ট্যাক্স হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব ব্যয় করিবার ক্ষমতা যেমন তত্তৎদেশের লোকদের প্রতিনিধিগণের হস্তে আছে, ভারতবর্ষের লোকদেরও অধিকার ঐরূপ হওয়া উচিত।

আমাদেরও মত ঠিক্ এইরূপ। আমরা ইহার কয়ে-

কোনমতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। যাঁহারা হোমরূল কথাটিতে ভয় পান, তাঁহাদের জানা উচিত, হোমরূল প্রার্থীরা গত কংগ্রেস ও মস্লেমলীগের সম্মিলিত দাবীপত্রে বর্ণিত সংস্কার ও অধিকার মাত্র চাহিতেছেন। এই-সব সংস্কার ও অধিকারের দাবী দাদাভাই নওরোজীর স্বরাজের আদর্শ-অনুযায়ী দাবী অপেক্ষা অনেক কম। কংগ্রেসওয়ালা কেহ কখন দাদাভাইয়ের আদর্শের প্রতিবাদ করেন নাই। সুতরাং এখন হোমরূল কথাটার জন্য কোন প্রকার প্রকাশ্য বা গোপন দলাদলি করা কোনও কংগ্রেসওয়ালার পক্ষে নির্বুদ্ধিতা ও ক্ষুদ্রাশয়তা মাত্র।

দাদাভাই নওরোজীর জীবন হইতে আমরা দেখিতে পাই, দেশের কল্যাণ করিতে হইলে জাতীয় জীবনের সকল বিভাগেই উন্নতির চেষ্টার প্রয়োজন। সকল-রকমের সংস্কারকার্য্য পরস্পরের উপর নির্ভর করে। শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার ভিন্ন রাজনৈতিক সংস্কার দুঃসাধ্য; আবার দেশবাসীর হস্তে রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকিলে শিক্ষার সম্যক্ বিস্তার এবং উন্নতিও সম্ভবপর নহে। দেশের স্বাস্থ্য ভাল না হইলে আমরা শিক্ষায় উন্নততম দেশের সমকক্ষ হইতে পারি না; কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতিও শিক্ষা সাপেক্ষ। দেশের ধনবৃদ্ধি শিক্ষার উপর নির্ভর করে; কিন্তু শিক্ষার বিস্তারও অর্থসাপেক্ষ। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এইজন্য প্রকৃত সংস্কারক যিনি, তিনি জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে সংস্কারের চেষ্টা করিতে না পারিলেও, সর্ব্ববিধ সংস্কার-চেষ্টার সমর্থন তিনি নিশ্চয় করিবেন, যদিও কি ভাবে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে সংস্কারের প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে।

দাদাভাইয়ের একটি বিস্তৃত জীবনচরিত ইংরেজীতে ও প্রধান প্রধান দেশভাষায় লিখিত হওয়া আবশ্যক। নতুবা ২।১টি ছোট বা বড় প্রবন্ধে তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষণীয় সমুদয় বিষয় বর্ণিত হইতে পারে না। আপাততঃ, মান্দ্রাজের ইণ্ডিয়ান রিভিউএর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নটেশন্ তাঁহার যে ক্ষুদ্র জীবনচরিত প্রকাশ করিয়া চারি আনা মূল্যে বিক্রয় করেন, তাহা ইংরেজী-জানা লোকেরা পড়িলে উপকৃত হইবেন। ইহা অবলম্বন করিয়া কেহ একটি ক্ষুদ্র বাংলা জীবনচরিত লিখিলে ভাল হয়। তাহা হইলে বাংলা দেশের লোকে তাঁহার নির্ম্মল সাধুচরিত্র, মিষ্ট স্বভাব, সৌজন্য, ঈর্ষাশূন্যতা, দেশের কল্যাণার্থ অক্লান্ত ও অবিরত পরিশ্রম, নিঃস্বার্থতা, বহুবার বহু চেষ্টায় বিফলপ্রযত্ন হওয়া সত্ত্বেও একাগ্রতা ও আশাশীলতা, প্রভৃতির পরিচয় পাইতে পারিবেন।

শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট প্রভৃতির স্বাধীনতা লোপ।

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ যিনি তিনি বিলাতের ইংরেজ ও উপনিবেশের ইংরেজ ও বোয়ারদিগের স্বাধীনতার সপক্ষে বক্তৃতা শুনিয়া, ও ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের আচরণ দেখিয়া, এবং ভারতবর্ষ যে ভবিষ্যতে স্বরাজ্য লাভ করিবে ও তৎপরে পূর্ণ মনুষ্যত্বের পথে আরও অগ্রসর হইবে তাহা জানিয়া, নিশ্চয়ই হাস্য করিতেছেন;—অবশ্য যদি হাস্যরূপ মানবিক ক্রিয়া তাঁহাতে আরোপ করা চলে।

ভারতপ্রবাসী সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ এবং তাঁহাদের বিলাতী সমর্থকেরা যাহাই বলুন, শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট, এবং শ্রীযুক্ত জি এস্ এরাণ্ডেল ও বি পি ওয়াডিয়ার স্বাধীনতা লোপ করা অন্যায় হইয়াছে। বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কোন রাজনীতিবিৎ শাসনকর্ত্তা এরূপ কাজ করিতেন না। শ্রীমতী বেসাণ্ট ও তাঁহার দুইজন সহকর্ম্মী কোন অবৈধ বা গর্হিত কাজ করেন নাই। মান্দ্রাজের গবর্ণরের মতে যদি তাঁহারা কোন বেআইনী কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রকাশ্য আদালতে তাঁহাদের বিচার হইলে তবে লোকে বুঝিতে পারিত যে কেন তাঁহাদিগকে একটা শহরে আবদ্ধ করা হইল, এবং বক্তৃতা ও মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে নিজ নিজ মত প্রচারের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল। তাঁহাদিগকে যে আইন অনুসারে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহা যুদ্ধসম্বন্ধীয় অপরাধের জন্য শাস্তি দিবার নিমিত্ত প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যুদ্ধঋণ দিবার জন্য লোককে উৎসাহিত করিয়া, সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে লিখিয়া, রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পূর্ণ বৈধ ও আইন-সঙ্গত উপায়ে করিবার জন্য লোককে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া, গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যই করিয়াছেন। অধিকন্তু, বলা বাহুল্য, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের



শ্রীযুক্ত বি পি ওাডিয়া

শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট

শ্রীযুক্ত জি এস এরাণ্ডেল

বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করেন নাই, ইংলণ্ডের শত্রুদের সঙ্গেও গোপনে কোন-প্রকারে যোগ দেন নাই। সুতরাং যুদ্ধ সম্পর্কীয় অপরাধের জন্য যাহা অভিপ্রেত, সেই আইন তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া লর্ড পেন্টল্যাণ্ড আইনের অপব্যবহার করিয়াছেন। বড়লাটের সভায় সার রেজিন্যাল্ড ক্র্যাডক বলিয়াছিলেন, যে, যাহারা ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে নজরবন্দী হয়, তাহাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান হয়, এবং কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু শ্রীমতী বেসাণ্ট লর্ড পেন্টল্যাণ্ডের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় স্বীয় অপরাধ জানিতে চাহিলেও গবর্ণর মহাশয় তাহা বলেন নাই বা বলিতে পারেন নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে সার রেজিন্যাল্ডের উক্তি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের গবর্ণর শ্রীমতী বেসাণ্টের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় তাঁহাকে বলেন, আমরা আপনার সকল-রকম কাজ বন্ধ করিব। পরে এই কড়া হুকুম কিছু শিথিল করা হইয়াছে; রাজনৈতিক ভিন্ন অন্য বিষয়ে তাঁহার রচিত পুস্তকাদি গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা করাইয়া প্রচার করিতে দিবেন। গবর্ণরমহাশয়ের উদ্দেশ্য এই পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইবে যে শ্রীমতী বেসাণ্ট নিজের হাতে কিছু লিখিতে, নিজের মুখে কিছু বলিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার অভিপ্রেত কথা আজ শতকণ্ঠে ঘোষিত হইতেছে, শত হস্ত তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শের অনুরূপ কথা লিখিয়া প্রচার করিতেছে। যাঁহারা আগে হোমরুল লীগের সভ্য ছিলেন না, এমন শত-শত ব্যক্তি সভ্য হইতেছেন। সকলেই যে মুখের ফাঁকা কথা বলিয়া সভ্য হইতেছেন, তাহা নহে। অনেকের ত্যাগ দ্বারা বুঝা যাইতেছে, যে, লোকে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য সত্য-সত্যই ব্যগ্র হইয়াছে। বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত এস্ আর্ বোমাঞ্জি তত্রত্য হোমরুল-লীগের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। কুমারী হামাবাঈ পেতিত বোম্বাইয়ের হোমরুল-লীগে কুড়ি হাজার টাকা দিয়াছেন এবং মান্দ্রাজের "শ্রীমতী বেসাণ্ট ফণ্ডে" পাঁচ হাজার দিয়াছেন। আরও অনেকে টাকা দিয়াছেন ও দিতেছেন। (বাংলাদেশের কেহ হোমরুলের জন্য অর্থদান বা অনুরূপ ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া এখনও শুনা যায় নাই।) বাংলাদেশ ও অন্যান্য দু-একটি অনগ্রসর ভূখণ্ড ছাড়া ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই অনেক লোক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে, গবর্ণমেণ্ট যদি হোমরুলের আদর্শ বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করেন; তাহা হইলেও তাঁহারা ঐ আদর্শ প্রচার করিতে ছাড়িবেন না; এবং তজ্জন্য দণ্ডিত হইতে হইলে তাঁহারা দণ্ডভোগ করিতে প্রস্তুত আছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, মান্দ্রাজের গবর্ণর শ্রীমতী বেসাণ্টের দেহটিকে একটি জায়গায় আবদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু যাঁহাদের আত্মা শ্রীমতী বেসাণ্টের প্রার্থিত জিনিষটি চায়, তাঁহাদিগকে পঙ্গু করিতে পারেন নাই; বরং তাঁহাদের অনেকের উৎসাহ এবং কাজ করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি বাড়াইয়া দিয়াছেন।

ভারতসচিবের উক্তি।

ভারতসচিব চেম্বার্লেন এখানকার অনেক বড় সাহেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন, শ্রীমতী বেসাণ্টের কাজকর্ম্ম বড় অনিষ্টকর হইতেছিল, কোন্ দিন উহা হইতে একটা কি বিপদ হইয়া বসিতে পারিত, ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তারা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যাহা করিবেন তাহার সমর্থন তিনি নিশ্চয়ই করিবেন, ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীমতী বেসাণ্ট কি অনিষ্টকর কাজ করিয়াছেন, কেহ স্পষ্ট করিয়া তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন না। আমরা বিশ্বাস করি না, যে, তিনি কোন অনিষ্টকর বা বিপজ্জনক কাজ করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা দেশে কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা অরাজকতা হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। এই যুদ্ধের সময় তিন বৎসর ধরিয়া মান্দ্রাজ অন্যান্য অনেক প্রদেশ অপেক্ষা শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করিয়াছে; তথায় "রাজনৈতিক" ডাকাতি বা হত্যা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, আদি হয় নাই। স্বরাজ চাওয়াটা কি অনিষ্টকর ও বিপজ্জনক? তাহা হইলে, ইংরেজরা আয়র্লণ্ডকে কেন স্বরাজ দিতে ব্যগ্র হইয়াছেন? তাহা হইলে ইংরেজরা রুশিয়ায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় উল্লসিত হইতেছেন কেন? তাহা হইলে তাঁহারা পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতালাভের সমর্থন কেন করিতেছেন? তাহা হইলে তাঁহারা বেলজিয়মের স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছেন বলিতেছেন কেন? আমরাই কি পৃথিবীতে সৃষ্টিছাড়া জীব?

ভারত-সচিব ইহাও বলিয়াছেন, যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মান-সম্ভ্রম ও গবর্ণমেণ্টের উপর মানুষের আস্থা (ইংরেজীতে the prestige of the British Government) কাহাকেও নষ্ট করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। আমরা বলি, এই প্রেষ্টিজ্ জিনিষটি আমাদের সমালোচনা দ্বারা তত নষ্ট হয় না, যত নষ্ট হয় গবর্ণমেণ্টের বড় ও ছোট কর্ম্মচারীদের কথা ও কাজের দ্বারা। পৃথিবীময় ঘোষিত হইতেছে যে ইংরেজেরা জগতে মানবের স্বাধীনতা এবং প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী স্থাপন করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। ইংরেজেরা মুখে ও কাগজে লিখিয়া রুশিয়ায়, পোলাণ্ডে, আয়ার্লণ্ডে প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠার সমর্থন করিতেছেন। ভারতপ্রবাসী অধিকাংশ ইংরেজ কিন্তু ভারতবর্ষের লোকদের জন্য সেই স্বর্গটা সুদূর অনির্দ্দিষ্ট ও অনির্দ্দেশ্য ভবিষ্যতে স্থাপন করিতেছেন। আমরা যাহা চাহিতেছি, তাহা নাকি দেওয়া অসম্ভব! কেন অসম্ভব? পৃথিবীর অন্যত্র অন্যজাতিদের দ্বারা বিজিত ও শাসিত লোকদের পক্ষে যাহা পাওয়া সম্ভব, আমাদের পক্ষে তাহা পাওয়া অসম্ভব কেন? আর, ধরুন যদি আমরা একটু বেশীই চাই, তাহার জন্য নিগ্রহ ও দমন-নীতি অবলম্বন করা হইতেছে কেন? আমরা যাহা বরাবর চাহিয়াছি, তাহা কি তোমরা দিয়াছ? দাও নাই। তাহাতে আমরা তোমাদের কি করিয়াছি? কিছুই করি নাই। এবারেও না দিলেই চুকিয়া যায়। ভিক্ষুকদের পেছনে তাড়া করিবার বা তাহাদিগকে আবদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। পৃথিবীর কোন্ দেশের প্রজারা কবে শাসনকর্ত্তাদের মনের কথা জানিয়া তাঁহারা যতটুকু অধিকার দিতে চান, ঠিক্ ততটুকু চাহিতে পারিয়াছে? প্রেষ্টিজ্ রক্ষার একমাত্র উপায়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইংরেজেরা যাহা তাঁহাদের মূলমন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, সেই মূলনীতি অনুসারে ভারতবর্ষেও কাজ করা। আমাদের শাসনকর্ত্তারা তাহাই করুন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রেষ্টিজ শতগুণ বাড়িবে। আমাদের মুখ বন্ধ করা সোজা, কিন্তু আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ও দুর্ব্বলতমেরও চিন্তার গতিরোধ করা প্রবলতম সাম্রাজ্যের অতিশক্তিশালী শাসনকর্ত্তাদেরও সাধ্যের সম্পূর্ণ অতীত। ইতিহাসে যাহা শতবার ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষেও তাহাই ঘটিবে। আমরা জিতিব, আমাদেরই জিদ্ বজায় থাকিবে, সত্য ও ন্যায় এবং বিশ্বের সমুদয় শক্তি ইহার অনুকূল। এই জন্য, চর্ম্মচক্ষে আমাদিগকে খুব দুর্ব্বল মনে হইলেও, আমরা বাস্তবিক শক্তিশালী। আমরা আত্মার বলে সুফল-কাম হইব।

সিদ্ধির পথ।

শ্রীমতী বেসাণ্ট প্রভৃতিকে আবদ্ধ করার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে যে-সকল সভার অধিবেশন হইতেছে, প্রস্তাব ধার্য্য হইয়া বিলাতে প্রেরিত হইতেছে, কাগজে যাহা লেখা হইতেছে, তাহা ঠিক্‌ই হইতেছে। চুপ করিয়া থাকিলে জগতের লোকে ভাবিবে, নিগ্রহনীতিতে আমরা সায় দিতেছি। তা ছাড়া, সিদ্ধির একটি মন্ত্র "সংবদধ্বম্" "একই কথা এক যোগে বিশ্বাসের সহিত সকলে বল"; ইহাতে সাহস ও উৎসাহ বাড়ে, একপ্রাণতা আসে। এই জন্য আরও প্রতিবাদ-সভা হওয়া উচিত; বিশেষতঃ বাংলা দেশে। বাংলাদেশ অনেক বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু দুটি বিষয়ে আমাদিগকে মন দিতে হইবে। আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা শুধু বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না; তাহা বিলাতে ও অন্য বিদেশে পৌছাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিলাতে প্রধান মন্ত্রীকে ও ভারত-সচিবকে এবং প্রধান প্রধান কয়েকটা কাগজে টেলিগ্রাম পাঠান কর্ত্তব্য। কোন কোন স্থান হইতে তাহা করা হইয়াছে। আমাদের খবরের কাগজগুলির কোন্ খানির কোন্ সংখ্যা সেন্সর বিদেশে যাইতে দিতেছেন না, তাহা জানিবার উপায় নাই। এই জন্য বিলাতে ও অন্য বিদেশে যাঁহাদের চিঠি যায়, তাহার মধ্যেও ভারতবাসীদের প্রকাশ্য সভা-সকলের বৃত্তান্ত খবরের কাগজ হইতে কাটিয়া বা নকল করিয়া পাঠান কর্ত্তব্য। সবগুলা না হউক, কিছু যথাস্থানে পৌঁছিতে পারে।

দ্বিতীয় কথা এই, যে, আমাদের সমুদয় শক্তি কেবল প্রতিবাদ করিতে এবং রাজপুরুষদের সমালোচনা করিতেই যেন নিঃশেষ হইয়া না যায়। আমরা কেন স্বরাজ চাই, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে এবং দেশবাসী সর্ব্ব সাধারণকে বুঝাইতে হইবে; স্বরাজের যোগ্যতা মানে কি কি বিষয়ে যোগ্যতা তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে। দেশবাসীকে বুঝাইতে হইলে পুস্তিকা প্রচার ও বক্তৃতা করিতে হইবে। পুস্তিকা সকলে পড়িতে পারে না; সুতরাং পড়িবার ক্ষমতা জন্মাইবার জন্য দেশমধ্যে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে।

সর্ব্বোপরি, আমাদের স্বরাজের যোগ্যতা ক্রমশ বাড়াইতে হইবে। স্বরাজের যোগ্যতা বলিয়া কাটা-ছাঁটা মাপা বা ওজন করা একটি নির্দ্দিষ্ট কোন জিনিষ নাই। ইহা আপেক্ষিক বস্তু। কোন জাতিরই দেশের কাজ চালাইবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা নাই; কারণ স্বাধীনতম দেশের লোকও খুব বড় বড় ভুল করিতেছে, এবং অযোগ্যতাবশতঃ আপনাদের অনেক দুঃখের কারণ হইতেছে। কোন জাতিই

দেশের কাজ করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্যও নহে; কারণ পরাধীন দেশের লোকেরাও বাস্তবিক দেশের অনেক কাজ নিজেরাই করে ও করিতে পারে, যদিও কর্ত্তৃত্বটা বিদেশীদের হাতে থাকায় নামটা হয় তাহাদের। আমাদেরও স্বরাজের যোগ্যতা আছে। কিন্তু ইহা আপেক্ষিক, সম্পূর্ণ নহে। এই যোগ্যতা আমরা যত চেষ্টা করিব ততই বাড়িবে। যোগ্যতা বাড়াইবার চেষ্টা করিতে এজন্য বলিতেছি না যে আমরা আরও যোগ্য হইলেই ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা আমাদিগকে স্বেচ্ছায় সানন্দে স্বরাজ দিবেন; সেরূপ আশা বাতুলেই করে। আমাদের যোগ্যতা বাড়াইতেই হইবে এইজন্য, যে, তদ্দ্বারা আমরা দেশের কাজ আরও ভাল করিয়া করিতে পারিব, এবং তাহার বলে আমরা স্বরাজ আদায় করিতে পারিব। যোগ্যতা বাড়াইবার উপায় কি? সাধারণ ভাবে সকল বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি, এবং বিশেষভাবে অন্যদেশে সার্ব্বজনিক কাজ কেমন করিয়া নির্ব্বাহিত হয়, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানবৃদ্ধি একটি উপায়। দ্বিতীয় উপায়, যতটুকু ক্ষমতা ও অধিকার গ্রাম্য পঞ্চায়েতে ও ইউনিয়নে, মিউনিসিপালিটিতে, লোকাল বোর্ডে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে, এবং প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আমরা পাইয়াছি, নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত ভাবে, সাহস জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সহিত তাহার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করা। একথা বলা যায় না যে যাহারা এই সকল ছোট বড় সভায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁহারা সকলেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। আমাদেরও কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহা উচিত নয়। এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোক আছেন বা থাকিতে পারেন, যাহারা, অন্যের প্রতিকূল বা অনুকূল মতের অপেক্ষা না রাখিয়া, নিজের কাজ করিয়া যান। কিন্তু এরূপ লোকও অনেক আছেন, বোধ হয় তাঁহাদের সংখ্যাই বেশী, যাহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধিটাকে সমালোচনা দ্বারা সচেতন রাখা আবশ্যক। তা ছাড়া, আমাদের কোন প্রতিনিধিই ত সবজান্তা নহেন। আমরা যে কেবল সমালোচনাই করিব, তাহা নয়, তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য তথ্য, খবর এবং পরামর্শও দিব, এবং তাঁহাদের গুণ ও সৎকার্য্যের প্রশংসা করিব। এসব কাজ মাসিকপত্রের দ্বারা হইতে পারে না। কলিকাতার ও মফঃস্বলের দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজগুলি দ্বারা এই কাজ হইতে পারে। দুঃখের বিষয় মফঃস্বলের অনেক সাপ্তাহিক প্রধানতঃ নীলামের বিজ্ঞাপন ছাপিয়াই নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। এবং কলিকাতার ইংরেজী দৈনিকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের বক্তৃতাদির রিপোর্ট অনেক স্থলে উৎকর্ষ অনুসারে ছাপা হয় না; সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের সহিত যাঁহার খাতির আছে, তাঁহার বক্তৃতাদি সহজে ছাপা হয়। এইজন্য অনেক খাঁটি কথা দেশের লোকে পড়িতে পায় না।

সর্ব্বশেষে ইহা মনে রাখিতে হইবে, যে, স্বরাজের যোগ্যতাবৃদ্ধি ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সার্ব্বজনিক সর্ব্ববিধ কার্য্যেরই সম্পাদনে সাধুতা, জ্ঞানবত্তা, দক্ষতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। বড় বড় চাকরো, বড় বড় নেতা, আইনব্যবসায়ী ও অন্যান্য 'স্বাধীন' জীবিকার লোক, ইহাদিগকেও এইভাবে যোগ্যতা বৃদ্ধি করিতে হইবে; কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়। আমরা ভ্রমবশতঃ যে-সব মুটে মজুর মেথর কুলি প্রভৃতিকে সামান্য বা ইতর লোক মনে করি, কিন্তু যাহারা বাস্তবিক সমাজের ভিত্তি-স্বরূপ, তাহাদিগের সাধুতা, জ্ঞানবত্তা, দক্ষতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ব্যতিরেকে দেশ বড় হইতে পারে না, জাতির স্বরাজের যোগ্যতা বাড়িতে পারে না। তাহাদের যোগ্যতাবর্দ্ধনরূপ সেবার কাজে আমাদিগকে ভাল করিয়া লাগিতে হইবে। সেটা অনুগ্রহ বা দয়া মনে করিলে মহা ভ্রম হইবে। আমরা ইহা না করিলে নিজেও যোগ্য হইব না। এই-প্রকার সেবা ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভের জন্য সাধনার অন্যতম প্রধান পন্থা।

বীরত্বের প্রকারভেদ।

শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট এবং তাঁহার দুইজন সহকর্ম্মী যেরূপ সাহসের সহিত সর্ব্বসাধারণের হিত করিতে গিয়া অবরুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা খুব প্রশংসার বিষয়। এই উপলক্ষে যাঁহারা খবরের কাগজে কড়া-কড়া চিঠি লিখিতেছেন, কিম্বা বলিতেছেন, যে, গবর্ণমেণ্ট হোমরূল-প্রচেষ্টাকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেও তাঁহারা হোমরূলের জন্য আন্দোলন করিতে ছাড়িবেন না, তাঁহাদেরও সাহস আছে। কিন্তু খবরের কাগজে চিঠি লেখা যত সোজা, সম্পাদকের বা মুদ্রাকরের পক্ষে তাহা ছাপা তত সোজা নয়। তাহার কারণ বলিতেছি। কাগজে যাহা কিছু বাহির হোক্ না, বিনা বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার জন্য অনেক টাকা জামিন চাহিতে পারেন; আগে হইতে জামিন দেওয়া থাকিলে আরও বেশী পরিমাণে জামীন চাহিতে পারেন। সর্ব্বোচ্চ জামীন লওয়া হইয়া গিয়া থাকিলে তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে, এমন কি, প্রেসও বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। কিন্তু পত্রলেখককে এত সহজে দণ্ডিত করা যায় না। চিঠির নীচে যাহার নাম ছাপা হয়, আদালতে তাঁহার বিচার করিতে হইলে তিনিই যে লেখক তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। তাহার পর রীতিমত বিচার হইবে। অতএব খবরের কাগজে বীররসপূর্ণ পত্র লিখিতে সাহসের প্রয়োজন হইলেও এই সাহস খুব বেশী নয়।

লেখার বা মুখের কথার বীরত্বের আর-একটা সুবিধা এই আছে, যে, তাহাতে লোকের বাহবা পাওয়া যায়। দেশের লোক আমার তারিফ করিতেছে, এই বিশ্বাস

অনেক সময় মানুষের সাহসকে পুষ্ট করে। কিন্তু এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের নাম খবরের কাগজে কখন উঠে নাই, উঠিবেও না; যাঁহারা কোন অবৈধ অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিলেন না; যাঁহারা হয়ত অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়ে গরীব লোকদিগকে পড়াইতেন, কিম্বা মড়কের বা অন্য রোগের সময় রোগীর সেবা করিতেন, কিম্বা বন্যা বা দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের সাহায্য করিতেন, এবং সেই-জন্য পুলিসের সন্দেহভাজন হওয়ায় স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত ও জেলে বা অন্যত্র অবরুদ্ধ হইয়াছেন। ইঁহাদের জন্য নগরে নগরে প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হয় নাই, ইঁহাদের প্রশংসায় খবরের কাগজের কলেবর পূর্ণ হয় নাই। হাজার হাজার মানুষের বাহবা ইঁহাদের সাহস ও দৃঢ়তাকে পুষ্ট করে নাই; হাজার হাজার মানুষের সহানুভূতি ইঁহা-দিগকে সান্ত্বনা দিতেছে না। ইঁহাদের নিঃস্বার্থ সেবা ও বীরত্ব আমরা যেন বিস্মৃত না হই। যে অন্তর্যামী পুরুষ সকলের আত্মায় বিরাজমান, তিনি তাঁহাদের সহায় ও সান্ত্বনাদাতা।

ইহার মানে কি ?

বেঙ্গলীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে মুদ্রিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই, কিন্তু উহার অভিপ্রায় কি এবং ফল কি হইবে ঠিক্ বুঝিতে পারি নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত ছাত্রদের সম্পর্ক সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া বেঙ্গলী বলিয়াছেন—

"Both the Bombay and the Bengal circulars in this connection make definite mention of the Home Rule League, thus indicating that it is the Home Rule propaganda only against which the present campaign is directed. If it is the intention of the powers that be to discriminate between the self-government agitation of the Congress and the Moslem League and the Home Rule propaganda, a thick veil will be lifted off the political controversies of to-day."

গবর্ণমেণ্ট যদি বাস্তবিকই বলেন যে হোমরূল দমন করাই তাঁহাদের অভিপ্রেত, তাহা হইলে বেঙ্গলীর দল কি আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকিবেন? অন্যসব প্রদেশের মডারেট দলের নেতারা বুঝিয়াছেন যে কংগ্রেস ও মসলেম-লীগের সম্মিলিত দাবী অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য আন্দোলন দমন করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য; কেবল বেঙ্গলীই কেন তাহা বুঝিলেন না, জানি না। গবর্ণমেণ্টের সার্কুলারে হোমরূল-লীগের উল্লেখ থাকিবার কারণ এই যে, ইহা কংগ্রেস ও মসলেম-লীগের দাবী অনুযায়ী, আন্দোলন কয়েকটি প্রদেশে বাস্তবিক কাজে করিতেছে, কংগ্রেস ও মসলেম-লীগ তাহা করিতেছে না। মান্দ্রাজের হোমরূল-লীগের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য, কংগ্রেস ও মসলেম-লীগের স্বরাজের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা, বলিয়া লেখাও আছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট "মডারেট"দিগকে কতকটা হাত করিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে "এক্‌ষ্ট্রিমিষ্ট"দলন কার্য্য ভাল করিয়া চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের মত প্রধান একজন "মডারেট"কেও ঐ নিগ্রহনীতির ফলভাগী হইতে হইয়াছিল। ব্যক্তিগত লাভালাভের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেহ বলিতে পারেন কি, মডারেট এক্‌ষ্ট্রীমিষ্ট দলাদলিতে একদল কতকটা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করায় দেশের কি লাভ হইয়াছে? আমাদের কি কখনও চোখ ফুটিবে না? আমরা কি প্রধানতঃ ব্যক্তিগত সম্বারী, ঈর্ষা, ও তদনুরূপ অন্যান্য ভাব দ্বারাই চালিত হইব?

দমননীতির ফল।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি নির্ব্বাসিত হন, তখন এমন একটা আতঙ্ক হইয়াছিল যে কলিকাতার প্রতিবাদ-সভায় রাজনৈতিক কোন নেতাকে সভাপতি হওয়াইতে না পারিয়া ধর্ম্মপ্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে সভাপতি করিতে হইয়াছিল, এবং পাঁচ ছয় মাস "দেশপূজ্য" বা অন্যবিধ কোন কোন নেতা কোন স্বদেশী সভায় সভাপতি হন নাই, বা বক্তৃতা করেন নাই। অবশ্য সকলেই খুব ভয় পায় নাই। এখন শ্রীমতী বেসাণ্ট প্রভৃতি অবরুদ্ধ হওয়ায় তেমন আতঙ্ক দেখা যাইতেছে না। মান্দ্রাজে, আগ্রা-অযোধ্যায়, বোম্বাইয়ে, পঞ্জাবে, সিন্ধুদেশে, বিহারে, এমন কি বাংলা দেশেও, প্রসিদ্ধ নেতারা প্রতিবাদসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, যে, জুজু চিরকাল জুজু থাকে না।

বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য ব্যক্তির সহযোগিতায় "বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ" প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় দিয়াছেন। তাঁহার বিভাগের কতকগুলি পুস্তক লিখিবার ভার ইতিমধ্যেই কেহ কেহ লইয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিভাগেও কেহ কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুস্তক লিখিবার ভার লইয়াছেন।

কাজটি যেমন কঠিন, আংশিকভাবে করিয়া তুলিতে পারিলেও বঙ্গদেশের পক্ষে তেমনই হিতকর হইবে। এই জন্য উদ্যোগীরা যোগ্য ব্যক্তিগণের সাহায্য পাইবার আশা

করেন। এখন কাগজ অত্যন্ত দুর্মূল্য। কিন্তু "শুভস্য শীঘ্রম্" নীতির অনুসরণ করিয়া তাঁহারা কাগজ সস্তা হইবার অপেক্ষা না করিয়া সত্বর দু-একখানি বহি প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিবেন।

বাংলা লেখা।

গত দুই এক শত বৎসরে নানাবিষয়ে মানুষের জ্ঞান যতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ পাশ্চাত্য জাতিসকলের চেষ্টাতেই হইয়াছে। এই নবলব্ধ জ্ঞান পাশ্চাত্য জাতিসকলের ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা পাশ্চাত্য কোন-না-কোন ভাষা শিখিয়া কিয়ৎ পরিমাণে এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি। প্রধানতঃ ইংরেজীই এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিয়াছে। এই হেতু আমরা অনেক বিষয়ে ইংরেজীতে যত সহজে লিখিতে পারি, বাংলায় তত সহজে পারি না। ইংরেজীতে আমাদের ব্যাকরণের ভুল হইতে পারে, ইংরেজী ঈডিয়মে আমাদের দখল না থাকিতে পারে; কিন্তু এই ভাষায় তথ্য, তত্ত্ব, চিন্তা ও ভাব প্রকাশ করিবার শব্দ এবং পারিভাষিক শব্দের অভাব অনুভূত হয় না। বাংলার এ বিষয়ে এখনও যথেষ্ট দৈন্য আছে। এই জন্য যাঁহারা বাঙালীর মনের গভীরতা ও প্রসার বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত বাংলা সাহিত্যকে বিদ্যার নানা বিভাগে ঐশ্বর্য্যশালী করিতে চান, তাঁহাদিগকে শব্দের অনুসন্ধান ও রচনার জন্য অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হয়। তাঁহাদের সকলের রচনায় সাহিত্যরস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না থাকিলেও তাঁহাদের কাজ যে কঠিন, প্রয়োজনীয় ও হিতকর তাহা অস্বীকার করা যায় না।

যাঁহারা সহজে ভাল ইংরেজী লিখিতে পারেন, দেশের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিবার জন্য তাঁহারাও বাংলা লিখিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। অনেক সময় বাংলা লিখিতে গিয়া আমাদের নিজেদের জ্ঞানের অস্পষ্টতা ধরা পড়ে। আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা কতকগুলি ইংরেজী কথা শিখিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তর্নিহিত চিন্তা ও ভাব আমাদের মনে সুস্পষ্ট হয় নাই। বাংলা লিখিতে গিয়া যদি আমাদের জ্ঞান সুস্পষ্ট হয়, তাহা কম লাভ নয়।

বাঙালী কখন্ শিক্ষায় মার্কিনের সমকক্ষ হইবে?

আষাঢ়ের প্রবাসীতে লিখিয়াছি,

আমাদের দেশে শিক্ষাবিভাগের রিপোর্টসমূহে এইরূপ বরাবর ধরিয়া লওয়া হইতেছিল, যে, যে-সব বালকবালিকা ও যুবক-যুবতীর শিক্ষা পাইবার বয়স আছে, অর্থাৎ যাহারা শিক্ষণীয়, তাহারা দেশের মোট লোকসংখ্যার শতকরা ১৫ জন। * * * ভারতগবর্ণমেণ্ট এখন আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন। ভারতে ১৯১৫-১৬ সালের যে শিক্ষাবিবরণ ভারতগবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে শতকরা ১৫ জন শিক্ষণীয়, এই উর্দ্ধ সংখ্যার অনুমান ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই রিপোর্টে সমগ্র লোকসংখ্যার কত অংশ শিক্ষা পাইতেছে, তাহাই দেখান হইয়াছে।"

ইহার পর আমরা লিখিয়াছিলাম, "আশা করি ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক ডিরেক্টরদিগকেও এইভাবে রিপোর্ট দিতে আদেশ করিবেন।" এরূপ আদেশ দেওয়া বাস্তবিক খুব আবশ্যক হইয়াছে। ১৯১৫-১৬ সালের বঙ্গের শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে সেই পুরাতন প্রথা অনুসারে দেখান হইয়াছে যে শিক্ষণীয় সমুদয় বালক ও যুবকদের মধ্যে শতকরা ৪৬·৫ জন ঐ বৎসর শিক্ষা পাইতেছিল, এবং শিক্ষণীয়া সমুদয় বালিকা ও যুবতীদের মধ্যে শতকরা ৮·৫৮ জন শিক্ষা পাইতেছিল; ছাত্রছাত্রী দুই লইয়া সমগ্র শিক্ষণীয় ও শিক্ষণীয়াদের শতকরা ২৭·০৩ জন শিক্ষা পাইতেছিল। এই অঙ্কগুলি হইতে মনে হইতে পারে যে বাংলাদেশের যত ছেলের শিক্ষা পাওয়া উচিত তাহার প্রায় অর্দ্ধেক শিক্ষা পাইতেছে, এবং যত মেয়ের শিক্ষা পাওয়া উচিত, তাহার প্রায় বার ভাগের এক ভাগ শিক্ষা পাইতেছে। কিন্তু এরূপ ধারণা ভুল। শিক্ষায় অগ্রসর কোন দেশের সঙ্গে তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

১৯১৩ সালে আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ৯৭১৬৩৩৩০ ছিল, এবং তথায় সকলপ্রকারের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২১৬৩২৫১৩। ইংরেজ-অধিকৃত বঙ্গের লোকসংখ্যা ৪৫৪৮৩০৭৭, অর্থাৎ আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রের অর্দ্ধেকেরও কম। ১৯১৫-১৬ সালে আমাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৮৪৪৫৪১। বাংলার লোকসংখ্যা আমেরিকার লোক-সংখ্যার যদি মোটামুটি অর্দ্ধেক বলিয়াও ধরা যায়, তাহা হইলে শিক্ষায় আমেরিকার সমান অগ্রসর হইতে হইলে আমাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৮ লক্ষ না হইয়া ১ কোটি ৮ লক্ষ হওয়া উচিত।

আমেরিকার সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ২১·৪ জন শিক্ষা পাইতেছে। বঙ্গের সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৪·০৫ জন শিক্ষা পায়। অর্থাৎ আমাদিগকে আমেরিকার সমকক্ষ হইতে হইলে শিক্ষার বিস্তার এখনকার পাঁচগুণ হওয়া দরকার। এখন হিসাব করিয়া দেখা যাক্, বঙ্গে যেরূপ বেগে ছাত্রসংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাতে কত বৎসরে আমরা শিক্ষায় আমেরিকার সমান হইতে পারিব। ১৯১৪-১৫ সালে বঙ্গের মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৩·৯৫ জন শিক্ষা পাইয়াছিল। ১৯১৫-১৬ সালে শতকরা ৪·০৫ জন শিক্ষা পাইয়াছিল। অর্থাৎ এক বৎসরে শিক্ষার বিস্তারের

পরিমাণ হইয়াছে শতকরা ·১ জন। আমেরিকা ও বাংলা-দেশে শিক্ষার বিস্তারে তারতম্য আছে শতকরা ২১·৪—৪·০৫=১৭·৩৫ জন। প্রতি বৎসর শতকরা ·১ জন করিয়া বাড়িলে শতকরা ১৭·৩৫ জন বাড়িতে ১৭৩ (একশত তিয়াত্তর) বৎসর ৬ (ছয়) মাস লাগিবে! বড়ই আশার কথা!

বাস্তবিক আমেরিকার সমকক্ষ হইতে আমাদের আরও বেশী সময় লাগিবে। কারণ আমেরিকায় ১৯১০ সালে শিক্ষা যেরূপ ছিল, তাহার সহিত ১৯১৫-১৬ সালের বঙ্গের শিক্ষার অবস্থার তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু ১৯১৫-১৬ সালে আমেরিকা আরও অগ্রসর হইয়াছে; কি পরিমাণে হইয়াছে, তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। আমরা যে ১৭৩ বৎসর ৬ মাস ধরিয়া আমেরিকার সমান হইতে চেষ্টা করিব, আমেরিকা ততদিন আমাদের জন্য একজায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবে না; সেও অগ্রসর হইতে থাকিবে।

আরও একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। ১৯১৫-১৬ সালে বঙ্গের মোট লোকসংখ্যার কত অংশ শিক্ষা পাইয়াছিল তাহা গণনা করিবার জন্য আমরা বঙ্গের লোকসংখ্যা ১৯১১ সালের সেন্সস্ বা আদমসুমারি অনুসারে ধরিয়াছি, অথচ ছাত্রসংখ্যা ধরিয়াছি ১৯১৫-১৬ সালের। কিন্তু ১৯১৫-১৬ সালে বঙ্গের লোকসংখ্যা ১৯১১ অপেক্ষা কিছু বাড়িয়াছে। সুতরাং আমরা মোট অধিবাসীদের যত অংশ শিক্ষা পাইতেছে বলিয়া ধরিয়াছি, বাস্তবিক তাহা অপেক্ষা কম অংশ শিক্ষা পায়।

এখন উপায় কি? আমরা কি ১৭৩ বৎসর ধরিয়া ইংরেজ কর্ম্মচারীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিব? তত দিন আমরা কেহই বাঁচিব না, আমাদের পুত্র পৌত্রেরাও না। ইংরেজকর্ম্মচারীদের প্রভুত্বও ততদিন না থাকিবারই সম্ভাবনা। এবং যে-হারে ম্যালেরিয়ায় বাংলার মানুষ মরিতেছে, তাহাতে কালে বাঙালীরও অস্তিত্ব লুপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়,—যদি ইতিমধ্যে আমরা দেশের স্বাস্থ্য ভাল করিতে না পারি। তাহাও অনেকটা শিক্ষা-সাপেক্ষ। অতএব শিক্ষাবিষয়ে বঙ্গে গরুর গাড়ীর চা'ল ছাড়িয়া দিয়া রেলের ডাকগাড়ীর চা'ল আরম্ভ করা আবশ্যক হইয়াছে।

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা দেশে যে একেবারে হইতেছে না, তাহা নয়; আলাদা আলাদা চেষ্টা অনেকে করিতেছেন, দুএকটি সমিতিও এই চেষ্টা করিতেছেন, এবং ২।১ জন জমীদারও অনেকদিন হইতে এবিষয়ে মনোযোগী আছেন। শিক্ষাপ্রসারক ব্যক্তি ও সমিতিসমূহের আরও খুব বেশী আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন ত আছেই; অন্য প্রকারেও দেশের লোকদের তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক হওয়া উচিত। হয়ত একজন শিক্ষাপ্রসারক পুলিশের সন্দেহভাজন হওয়ায় অবরুদ্ধ হইলেন। তাহাতে তাঁহার অনুষ্ঠিত শিক্ষাবিস্তার-চেষ্টা বন্ধ হওয়া উচিত নয়। অন্য লোকের সেই কাজে লাগিয়া যাওয়া উচিত, এবং যেখানে এই চেষ্টা হইতেছিল তথাকার লোকদের সভা করিয়া ইহা বলা উচিত যে শিক্ষাপ্রসারক মহাশয়ের শিক্ষাবিস্তার-চেষ্টার তাঁহারা সমর্থন করেন, এবং এই কার্য্যে তাঁহাদের যোগ আছে। ইহা করিলে উৎপীড়িত হইবার আশঙ্কা থাকায়, ইহা করিবার জন্য মনুষ্যত্বের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু মনুষ্যত্ব ভিন্ন কোন্ বড় কাজ হইতে পারে?

বাংলাদেশে এপর্য্যন্ত যাহারা শিক্ষাবিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু তাঁহারা প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য টাকা দিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রারম্ভিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য সদাশয় ধনী ব্যক্তিরা টাকা দিলে, দেশের খুব কল্যাণ হয়। সচ্ছল অবস্থার লোকের পক্ষে সাহায্য দিয়া এক-একটি পাঠশালা খুলাইয়া দেওয়া ও চালান খুব সোজা। অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের নিমিত্ত বঙ্গের একটি সমিতির অর্থের জন্য প্রার্থনাপত্রে দেখিলাম, তাঁহারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে যথাক্রমে মাসিক দুই ও তিন টাকা সাহায্য দেওয়াতে কোথাও-কোথাও স্থানীয় লোকেরা পাঠশালা খুলিতে ও চালাইতে সমর্থ হইয়াছে। সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এই সমিতির সভাপতি। ৬২টি বিদ্যালয় ইহার সাহায্যে বা তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। যাহারা এই সমিতিকে টাকা দিতে চান তাঁহারা, ৪৯-২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ঠিকানায়, ইহার অন্যতম সম্পাদক রায় সাহেব রাজমোহন দাস মহাশয়ের নামে পাঠাইতে পারেন।

আমরা শিক্ষার বিষয়ে প্রায়ই কিছু-না-কিছু লিখিয়া থাকি। তাহার কারণ, শিক্ষাই ভারতবর্ষের উন্নতির একমাত্র উপায় না হইলেও, শিক্ষা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ই সম্যক্ ফলপ্রদ হইতে পারে না। শিক্ষা একান্ত আবশ্যক, এবং সকলেরই জন্য আবশ্যক।

শিক্ষালয়ের গৃহের সম্পূর্ণ ব্যবহার।

আমরা আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম যে কোন কলেজে যদি এত বেশী ছাত্র ভর্ত্তি হয় যে এক একটা শ্রেণীকে একাধিক বিভাগে বিভক্ত করিয়াও সকল শ্রেণীর সকল বিভাগকে ১০টা ৪ টার মধ্যে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে, তাহা হইলে যথেষ্ট-সংখ্যক অতিরিক্ত অধ্যাপক রাখিয়া সকাল বিকাল ও সন্ধ্যায় ক্লাস করিয়া এই অতিরিক্ত ছাত্রদিগকে পড়ান উচিত। স্কুলের বন্দোবস্তও এইরূপ করা

কর্ত্তব্য। কারণ বাংলা দেশে যত ছেলে কলেজে ও স্কুলে পড়িতে চায়, তাহার মত যথেষ্ট-সংখ্যক কলেজ ও স্কুল নাই। নূতন কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার জন্য নূতন গৃহনির্ম্মাণ করা কষ্টসাধ্য ও বহুব্যয়সাধ্য। বাংলা দেশের মত দরিদ্র দেশে আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা হইলে এখন অপেক্ষা অনেক বেশী ছেলে পড়িতে পাইবে, এবং শিক্ষার বিস্তার অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য হইবে।

আমরা দরিদ্র দেশের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিতেছি আমেরিকার মত ধনী দেশে তাহা ইতিপূর্ব্বেই একাধিক শহরে করা হইয়াছে। তথাকার ইণ্ডিয়ানা নামক প্রদেশে গ্যারী শহরে মিঃ ওর্ট (Mr. Wirt) নামক একজন শিক্ষাবিধায়ক প্রথমে এই প্রণালী অবলম্বন করেন। তাহার পর তাঁহারই তত্ত্বাবধানে নিউ-ইয়র্ক শহরে অনেকগুলি স্কুলে এই প্রণালী পরীক্ষিত হইতেছে। ফলসম্বন্ধে একটি বিষয়ে সকলেই একমত। সকলেই বলেন যে ইহাতে স্কুলগৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় খুব বাঁচিয়া যায়। আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রের ১৯১৫ সালের শিক্ষারিপোর্টে (Report of the U. S. A. Commissioner of Education for the year ended June 30, 1915, Vol. 1, p. 29,) দেখিলাম যে এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে শিক্ষা বোর্ডের ১৯১৬র স্কুল বজেটে স্কুলগৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় ধরিতে হইবে না; এবং তাহাতে ৪০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় এক কোটি ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বাঁচিবে। ঐ রিপোর্টের ১ম খণ্ডের ২৭ পৃষ্ঠায় ইহাও লিখিত আছে, যে, "Now, after less than a year of trial, those who control the finances urge the adoption of the plan for the whole city." "এক্ষণে এক বৎসরেরও কম সময় পরীক্ষার পর আয়ব্যয়ের অধ্যক্ষেরা নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেছেন যে এই প্রণালী নিউ-ইয়র্ক শহরের সর্ব্বত্র অবলম্বিত হউক।" এই প্রণালীর নাম "The Gary Duplicate Plan"।

বিলাতও ভারতবর্ষ অপেক্ষা ধনী দেশ। তথাকার প্রধান সংবাদপত্র টাইম্‌সের ১৯১৬ সালের ২রা নবেম্বরের শিক্ষা-বিষয়ক ক্রোড়পত্রে (পৃঃ ১৮৯) এই প্রণালী সমর্থিত হইয়াছে। সমালোচনায় কেবল বলা হইয়াছে এরূপ করিলে যদি শিক্ষকদের মোট সাপ্তাহিক কাজের সময় বাড়িয়া যায় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দিনে পালা করিয়া দুই পালাই কাজ করান উচিত নয়; অর্থাৎ টাইম্‌সের মতে যথেষ্ট অতিরিক্ত শিক্ষক রাখা উচিত। তাহা ত আমরাও বলিয়াছি। টাইম্‌সের ভাষায়, মিঃ ওর্টের প্রণালী অনুসারে কাজ করিতে হইলে কেবল ইহা ধরিলেই হইল যে প্রত্যেক স্কুল যত ছেলের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহার দ্বিগুণ ছেলে পড়ান যাইতে পারে। ("To give effect to this scheme all that seemed necessary was to count each school as available for double the number of pupils for which it was originally intended.") ইহাতে দেশের লোকেরা স্কুলগৃহের পুরা দামটা উশুল করিয়া লইতে পারে; কারণ উহা প্রত্যূষ হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খোলা থাকে ও ব্যবহৃত হয়। ইংলণ্ডে শিক্ষার উন্নতির জন্য টাইম্‌স এই প্রণালী অবলম্বন করিতে এবং প্রাতে মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে ক্লাস করিতে বলিতেছেন। ("There should be early-morning courses, middle-of-the-day courses, afternoon courses, and perhaps evening courses.")

ধনী বিলাত ও আমেরিকায় যে প্রণালী সমর্থিত হইতেছে, দরিদ্র ভারতবর্ষে তাহা প্রথমতঃ বেসরকারী স্কুল কলেজে চলুক, পরে অন্যান্য শিক্ষালয়েও চলিবে। আমাদের মনে হয় স্কুল ও কলেজগৃহে এরূপ আসবাবের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, যাহাতে ঐ গৃহগুলি ছাত্রাবাস-রূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। কেবল স্বতন্ত্র রান্নাঘর, ভোজনগৃহ ও রোগী-নিবাস আদি রাখিলেই চলে। এরূপ ব্যবস্থায় ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের বহুব্যয় বাঁচিয়া যাইতে পারে।

শিক্ষকদের পদমর্য্যাদাবৃদ্ধি।

গত জানুয়ারী মাসে দিল্লী শহরে সকল প্রদেশের শিক্ষা-ডিরেক্টরদের একটি মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হয়। বড়লাট তাহার প্রারম্ভিক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় ডিরেক্টরদের মন্ত্রণায় শিক্ষকদের পদগৌরব ও কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি সমর্থিত হয়। ইহার জন্য প্রধানতঃ দুটি উপায়ের উল্লেখ এই মন্ত্রণাসভার রিপোর্টে দৃষ্ট হয়। প্রথম, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি; দ্বিতীয়, তাঁহাদিগকে বা শিক্ষাবিভাগে-প্রবেশার্থী-দিগকে শিক্ষণপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া। দ্বিতীয় উপায়টির খুব প্রয়োজন আছে, কিন্তু শিক্ষণপ্রণালীতে শিক্ষিত শিক্ষক না পাইলে শিক্ষার প্রসার আর বাড়ান যায় না, বা উচিত নহে, এরূপ মতের আমরা সমর্থন করিতে পারি না। কারণ, ট্রেনিং কলেজে না পড়িয়াও হাজার হাজার লোক ভাল শিক্ষক হইয়াছেন। প্রথম উপায়টি অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ইহা মনে করা ভুল যে শিক্ষকদের বেতন বাড়াইয়া দিলেই ভাল শিক্ষক পাওয়া যাইবে। শিক্ষকদের পাওনা উকীল, হাকিম, ও দেশী উচ্চ পুলিশ কর্ম্মচারীদের সমান হইলে, এখন যে-সব বুদ্ধিজীবী লোক ঐসব কাজ করেন, তাঁহাদের কেহ কেহ হয়ত শিক্ষক হইবেন। কিন্তু বুদ্ধিবিদ্যা থাকিলেই মানুষ শিক্ষকতার যোগ্য হয় না। শিক্ষককে মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়তা করিতে হয়। কিন্তু এখন শিক্ষকেরা দেশের বড় বড় প্রয়াসের

সঙ্গে, বিশেষতঃ রাজনৈতিক অধিকার লাভের চেষ্টার সঙ্গে, সম্বন্ধ বর্জ্জন করিতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, সরকার আশা করেন যে সরকারী শিক্ষকেরা ছেলেদের রাজনৈতিক মতিগতির উপর লক্ষ্য রাখিবেন এবং দরকার-মত গোপনীয় রিপোর্টও দিবেন। এ অবস্থায় শিক্ষকেরা ছাত্রদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস- ও শ্রদ্ধা-ভাজন কেমন করিয়া হইবেন, এবং তাহা-দিগকে মানুষ হইবার পথে চালিত কেমন করিয়া করিবেন? শিক্ষকেরা আপনাদের মনুষ্যত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ছাত্রদের মনুষ্যত্বকে সম্মান করিয়া সুপথে চালিত করিতে পারিলে, তবে তাঁহারা সুশিক্ষক হইতে পারেন, এবং তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি হয়। ব্যাকরণের বা পাটীগণিতের কস্‌রতে ছাত্রদিগকে সুদক্ষ করিতে পারিলেই সুশিক্ষক হওয়া যায় না।

বেতন বৃদ্ধি করার কথাটা ত বড়লাট ভুলিয়াছেন, কিন্তু বাংলা গবর্ণমেণ্ট যে বলিয়াছেন যে, বি এ, বি-এস্‌সিরা ৩০।৩৫ টাকায় এবং এম্ এ, এম্-এস্‌সিরা ৫০ টাকায় কাজ আরম্ভ করিবেন, ইহাই কি দুর্ব্বুদ্ধির নমুনা?

ঢাকায় গবর্ণরের বক্তৃতা।

বঙ্গের গবর্ণর ঢাকায় অনেকগুলি অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে যে বক্তৃতা করেন, তাহার মধ্যে তিনি বলেন, লোকে আরও ইস্কুল চায়, রেলওয়ে চায়, জলনিঃসারণের সুনির্ম্মিত নর্দ্দমা চায়, আরও কত কি চায়। কিন্তু এ-সকল তৈরী করিতে হইলে অনেক টাকার দরকার। টাকার জোগাড় করিতে হইলেই আরও ট্যাক্স্ বসাইতে বা বাড়াইতে হয়। কিন্তু আরও ট্যাক্স দিতে কাহারও ত উৎসাহ দেখা যায় না।

গবর্ণর মহাশয় একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী। তাঁহার নিজের দেশে ও বিদেশে, ধনী বা দরিদ্র কোন দেশে ট্যাক্স দিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখিয়াছেন কি? তাঁহার দেশের লোকেরা প্রতিনিধিদের দ্বারা নিজেরাই ট্যাক্স বসায়, নিজেরা ট্যাক্স দেয় এবং ট্যাক্স ব্যয় করে; আমরা কেবল ট্যাক্স্ দিবার অধিকারটুকু ভোগ করিতেছি; তাহা বসান বা না বসান, বাড়ান বা কমান, ব্যয় করা বা না করা আমাদের অধিকারের বহির্ভূত। এমন অবস্থায়, ট্যাক্স্ দিবার উৎসাহ আমাদের নাই বলিয়া ব্যঙ্গ করা সেই দেশের কোন মানুষের পক্ষে শোভা পায় না, যে-দেশের লোক "No taxation without representation" এই রাষ্ট্রীয় নীতির জন্য লড়িয়া ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যে-সব মোটা মাহিনার রাজকার্য্যে ইংরেজ নিযুক্ত আছে, তাহার প্রায় সমস্তই অপেক্ষাকৃত কমবেতনভোগী দেশী সুদক্ষ লোকের দ্বারা সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে। ইহাতে বিস্তর টাকা বাঁচিতে পারে। ইংরেজ কর্ম্মচারীরা খুব বেশী বেতন পায় বলিয়া, দেশী কর্ম্মচারী অনেককেও কিছু বেশী মাহিনা দিতে হয়। প্রায় সব কাজে দেশী লোক রাখিলে এই-সব মাহিনাও কমান যায়। এই উপায়ে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া উদ্বৃত্ত টাকায় স্কুল নর্দ্দামা আদি নির্ম্মাণ করিতে শাসনকর্ত্তাদের উৎসাহ দেখা যায় না। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের এবং কৃষির উন্নতির আন্তরিক চেষ্টা করিলে তাহাতে দেশের লোক ধনী হয়, এবং অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এই-প্রকারে দেশকে ধনী করিতে শাসনকর্ত্তাদের মৌখিক উৎসাহ লক্ষিত হইলেও কার্য্যগত কোন উৎসাহ এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই।

গবর্ণর মহাশয় লোককে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, যেন তাঁহারা স্বায়ত্তশাসন পাইবার এরূপ আশা না করেন, যাহা পূর্ণ হইতেই পারে না; তাঁহার শাসনকালের মধ্যে ত আশা পূর্ণ হইবেই না। দেশের লোককে এমন করিয়া সাবধান না করিলে ভাল হইত; না করিলে যে চলিত, তাহাতে ত কোন সন্দেহই নাই। দেশে এরূপ লোক বিস্তর আছে যাহারা মনে করে যে ব্রিটিশ রাজত্ব থাকিতে দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এই দলের অনেকে বিপ্লবপ্রয়াসী। গবর্ণর মহাশয়ের কথায় তাহাদের বিশ্বাস যদি পরোক্ষভাবে দৃঢ়তর হয়, তাহা কি বাঞ্ছনীয় হইবে? আর-একদল লোক আছে, যাহারা মনে করে, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে থাকিয়াও ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইবে, কিন্তু তাহা শাসনকর্ত্তাদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত হইবে না; পৃথিবীর ঘটনাচক্রের চাপে এবং ভারতবাসীদের বৈধ-আচরণে-প্রকাশোন্মুখ-বা-প্রকাশিত মানসিক-অবস্থার চাপে তাহা প্রদত্ত হইতে পারে। এই দলের লোকদের পক্ষে গবর্ণরের উক্তি অনাবশ্যক। কারণ, তাহারা ত জানেই, যে, তিনি যে শাসক-শ্রেণীর লোক, তাঁহারা আমাদিগকে কস্মিন্ কালেও স্বেচ্ছায় স্বরাজ দিবেন না। আর-এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা শাসক-সম্প্রদায়ের অনুগ্রহে সামান্য কিছু অধিকার পাইবার আশা রাখে। কিন্তু তাহারা বোধহয় কল্পনাতেও স্বরাজের স্বপ্ন দেখিতে ভয় পায়। সুতরাং তাহাদিগকে সাবধান করাও অনাবশ্যক। অবশ্য আমরা ঠিক্ জানি না যে এরকম লোক দেশে আছে কি না, বা কয়জন আছে, যাহাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, আশা, কল্পনা, ও চিন্তার দৌড় সরকারী মাপ-

কাঠির দ্বারা নিয়মিত হয়। আগে-আগে, দেশের লোক চাহিত, শাসনকর্ত্তারা দিতেন না। আপদ্ চুকিয়া যাইত। এখন শাসনকর্ত্তারা বলিতেছেন, চাহিও না; আশাও করিও না। দেশের লোক রাজকর্ম্মচারী-ভক্তির বশে, "জো হুকুম" বলিয়া, রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে কিছু আশা করিবে না; কিন্তু বিধাতার নিকট আশা করিবে। এবং সে আশা নিশ্চয় পূর্ণও হইবে।

অপর্য্যাপ্ত ক্ষমতা ভোগ করিয়া শাসকসম্প্রদায় মনে করিতেছেন যে তাঁহারা আমাদের আশাকেও হুকুমের অধীন করিবেন। ইহা কি মানসিক সুস্থতার লক্ষণ?

মানুষের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে কয়েকটি মত।

আমরা এমাসেও মানুষের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে ব্রিটিশ, ঔপনিবেশিক এবং মার্কিন রাজনীতিজ্ঞদের কিছু মত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এইরূপ মত অনুসারে ভারতবর্ষে কাজ হউক না হউক, ভারতবাসী জানিয়া রাখুন, মানুষের অধিকার কি এবং সব দেশের শাসন-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত। অন্যতম ইংরেজ মন্ত্রী ব্যালফুর তাঁহার সম্মানার্থ এম্পায়ার পার্লেমেন্টারী এসোশিয়েশ্যন কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভোজে বলেন, যে আমেরিকায় "he had been deeply impressed by the spontaneous exhibition of enthusiasm for the common cause of the world's freedom." এই world's freedomটা সমস্ত পৃথিবীর, না ভারতবর্ষ বাদে পৃথিবীর?

আমেরিকার পতাকা-উৎসব দিবসে (Flag Day) দেশনায়ক উইলসন বলেন যে -

"Their (the Germans') present particular aim is to deceive all those who throughout the world stand for rights of peoples and self-government of nations, for they see what immense strength the forces of justice and liberalism are gathering out of this war."

কোন্ কোন্ জাতি, *throughout the world*, জগৎ জুড়িয়া, বাস্তবিক লোক-সকলের অধিকার এবং জাতি-সকলের স্বশাসনের পক্ষে, তাহা জানিতে পারিলে আমাদের কাজে লাগে।

আমেরিকা হইতে রুশিয়ায় যে-সব দেশদূত প্রেরিত হন, তন্মধ্যে মিঃ ডাঙ্কান মার্কিন শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি ছিলেন। মার্কিন শ্রমজীবী সম্মিলনীর সভাপতি মিঃ গম্পার্স মিঃ ডাঙ্কানকে তারযোগে যে সন্দেশ প্রেরণ করেন তাহাতে বলেন :—

"Of course you will insist on the acceptance of the fundamental principles of domocracy for every country and also on the necessity for all people of each country living their own lives and working out their own destinies."

ইংলণ্ড ও তাহার মিত্রগণের যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য কি কি, তদ্বিষয়ে ইংলণ্ড হইতে যে পত্র রুশিয়ায় প্রেরিত হয়, তাহাতে একটি উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে— "Another object has now been added, namely, liberation of the populations oppressed by alien tyranny."

আমেরিকার দেশনায়ক উইলসন রুশ জাতিকে যে সন্দেশ প্রেরণ করেন, তাহা হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি—

"We are fighting again for the Liberty of Self-government and the undictated development of all Peoples; and every feature of the settlement that concludes this war must be conceived and executed for the purpose."

"......they must follow a principle and that principle is plain. No people must be forced under a sovereignty under which it does not wish to live;..."

"Brotherhood of mankind must no longer be a fair but empty phrase. It must be given a structure of force and reality."

ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার অন্যতম সভ্য মিঃ বার্নেস্ (Mr. Barnes) যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণা-সভার (War Cabinet) সভ্য-রূপে প্রথম যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলেন :—

"We stood for the principle of each nation living its own life in its own way. The Central Powers stood for letting each nation live as they ordered."

"We were not out to fight the German people, but we were out for the liberation of *all* peoples.."

"আমরা জার্ম্মেনদের সঙ্গে লড়িবার জন্য বাহির হই নাই; কিন্তু আমরা সকল জাতিকে স্বাধীন করিবার জন্য বাহির হইয়াছি।"

এইরূপ উক্তি আরও আছে।

শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি কথা

আমাদের ছেলেরাই আমাদের জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ আশাস্থল। তাহাদের উপর আমাদের দেশের উন্নতি সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে। দেশের দুঃখ দূর করিতে, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প দ্বারা অর্থ উপায় করিয়া আনিতে, লোকশিক্ষার দ্বারা জনসাধারণের দৈহিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিধান করিতে, তাহারাই আমাদের সম্বল। যথোচিত শিক্ষাদানে, যাহাতে তাহাদিগকে চরিত্রবান, জ্ঞানবান ও কর্ম্মবীর করিয়া তুলিতে পারি, ইহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যাহাতে তাহারা মাতৃভূমির সমস্ত দুঃখ মোচন করিবার উপযুক্ত সুসন্তান হইয়া উঠিতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা আমাদের সকলের একান্ত কর্ত্তব্য।

নিজের নিজের বাড়ীর পরেই স্কুল হইতেই আমাদের জীবনের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন আরম্ভ হয়। উত্তর কালে যে যেরূপ হইবে, তাহার ভিত্তিস্থাপন স্কুলগৃহেই। এতগুলি নবীন জীবনের বিকাশের সাহায্য করিবার ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত, তাহাদের দায়িত্ব কত বেশী, তাহা আমরা সকলেই বুঝি। ছেলেবেলায় নরম মনের উপর সহজেই যে ছাপ পড়ে, বড় হইলে কখনই তাহা আর মোছে না। তখন অলক্ষিতভাবে যে প্রবৃত্তি ও চিন্তা আমাদের মনে প্রবেশ করে, সারাজীবন আমরা তাহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকি। সেইজন্য ভাল শিক্ষকের ঋণ আমরা কোন কালে শোধ দিতে পারি না। তাঁহারা চেষ্টা করিলে ছেলেদের মন ভালরই দিকে ও অবহেলা করিয়া বা ভ্রম-বশতঃ তাহাদিগকে মন্দের দিকে চালিত করিতে পারেন। এরূপ ভাবে দেখিলে বুঝা যায় পিতামাতার ন্যায় শিক্ষকের প্রভাব আমাদের উপর বড় সামান্য নয়।

এইরূপ গুরুভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, দুঃখের বিষয় আমরা তাঁহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখি না। যাঁহারা ছেলেদের শিক্ষা দিবেন, তাঁহারা সে কার্য্যের যথার্থ উপযোগী কি না, শিক্ষা দিবার তাঁহাদের যথেষ্ট সামর্থ্য আছে কি না, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না।

আমাদের স্কুলে শিক্ষকের বেতন খুব সামান্য। অনেক কাব্যতীর্থ-কিম্বা আই. এ.-উপাধিধারী শিক্ষকের মাহিনা আমাদের দেশের সামান্য শ্রমজীবীর মাসিক উপার্জ্জনের অপেক্ষা অনেক সময় কম। আজকাল বিদ্যা অপেক্ষা অর্থের আদর অনেক বেশী। শুধু অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম করিব এই আশায় আজকাল আমাদের বিদ্যাশিক্ষা। জনসমাজে খাতিরও আজকাল অর্থের পরিমাণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। সে হিসাবে শিক্ষকের স্থান অনেক নীচে পড়ে। কলিকাতায় বড়লোকের বাড়ী বাজার সরকার মোসাহেব প্রভৃতি আসবাবের সহিত স্কুলমাষ্টার স্থান পাইয়া থাকেন। তাঁহারা যে কিরূপ মহৎ কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না।

তাহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে যাঁহারা জীবনে আর কোন-রকম জীবিকা অবলম্বন করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই প্রায়ই স্কুলমাষ্টার হন। তাঁহাদের হয় হোমিও-প্যাথির বাক্স লইয়া ডাক্তারী করিতে হইবে, না হয় স্কুলে মাষ্টারী করিতে হইবে। মাষ্টারীর মাহিনা এমন বেশী নয়, যে, সেটি একটি আকর্ষণস্বরূপ হইবে। সকলেরই দৃষ্টি কোম্পানির নোক্‌রী—মুন্সেফী, ডেপুটিগিরি ইত্যাদির প্রতি, সে-সব না হইলে তখন অগতির গতি মোক্তারী, ও ওকালতী। অনেক সময় দেখা যায়, যাঁহারা এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা নিজেদের কার্য্যের গুরুত্ব বোঝেন না। তা ছাড়া জীবনসংগ্রাম তাঁহাদের কাছে অনেক সময় অতি ভীষণ আকার ধারণ করে। বেতন এত অল্প, যে, অনেক সময় বাধ্য হইয়া অবসর সময়েও উপার্জ্জনের অন্য পন্থা দেখিতে হয়। অনেকে সকাল বিকাল ও রাত্রে টিউশনি করেন। এই অক্লান্ত পরিশ্রমের পর স্কুলের কয় ঘণ্টা অনেক সময় তাঁহাদের বিশ্রাম-স্বরূপ হইয়া থাকে। প্রকৃত শিক্ষা দানের জন্য যেরূপ মানসিক অবস্থা থাকা উচিত সেরূপ ধৈর্য্য ও সংযম প্রায়ই থাকে না। ছাত্রদিগের শিক্ষার উন্নতির বিষয় ভাবিবার জন্য অবসর পর্য্যন্ত পান না। এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের প্রতি তাঁহাদের যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ থাকা উচিত, তাহার কিছুই থাকে না। রুটীন্ (Routine) অনুযায়ী "দিনগত পাপক্ষয়" করিলেই তাঁহাদের দায়িত্বের অবসান হইয়া থাকে।

এই প্রণালীতে কার্য্য চলাতে, যে-সকল কুফল হইতেছে তা আমাদের কাহারও অজ্ঞাত নাই। যথার্থ জ্ঞানের উপর

আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা চলিয়া যাইতেছে। পড়াশুনা এখন কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য। প্রকৃত বিদ্যার আদর নাই। আমরা কেহই এ শিক্ষা-প্রণালীর উপর সন্তুষ্ট নই। এমন কি শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে আমাদের স্কুলের অবস্থা শোচনীয়। স্কুলগৃহে ছাত্রসংখ্যা বেশী হওয়ায় স্থানাভাব। অল্প বেতনে শিক্ষক মহাশয়েরা কেহই সন্তুষ্ট নহেন।

বিদ্যাদানের বিষয়ে আমাদিগকে এরূপ অমনোযোগী হইলে চলিবে না। ইহার উপর আমাদের জাতীয় জীবনের সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। যাহাতে শিক্ষকদিগের অর্থকষ্ট দূর হয় তাহার জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত; স্কুলের সংখ্যা যাহাতে আরও বৃদ্ধি পায়, শিক্ষা যাহাতে আরও বিশেষ করিয়া জনসাধারণের অনায়াসলভ্য হইয়া উঠে, তাহার জন্য চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য। পুরাকালে অধ্যাপকেরা যেরূপ অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতেন, এখনও যে তাঁহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন, তাহা আশা করা অন্যায়। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদের জীবন যাপনের প্রণালীরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেক নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগিতেছে। অভাবও বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং এখন আর সেরূপ অল্প টাকায় কাহারও চলিতে পারে না। শিক্ষকদিগের বেতন না বাড়াইলে আমরা যোগ্য শিক্ষকের আশা করিতে পারি না। নিজেদের অন্নচিন্তার জন্য যদি তাঁহাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে হয় তবে শিক্ষকেরা কিরূপে প্রশান্ত ভাবে শিক্ষা-কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন?

ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যে কার্য্যে তাঁহারা ব্যাপৃত আছেন তাহা অতি মহৎ কার্য্য। সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ তাঁহাদের উপর পরোক্ষভাবে নির্ভর করিতেছে। অর্থের দিক দিয়া সমাজে তাঁহাদের সম্মান কি আসন ঠিক করিলে চলিবে না। যে গুরুভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত সে দিকে আমাদিগের দৃষ্টি থাকা চাই। আমাদের বুঝিতে হইবে, যে, ইহার ন্যায় মহৎ কার্য্য আর নাই। যাঁহারা এই কার্য্যে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা সকলের পূজ্য ও শ্রদ্ধার পাত্র।

এই সম্পর্কে একটা কথার উল্লেখ করিতে হয়। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে অধ্যাপকবর্গের সমাজে যেরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, আজকালকার শিক্ষকবর্গের তাহার কিছুই নাই। এইরূপ শিক্ষকের সম্মান হ্রাস হওয়া যে দেশের দুরদৃষ্ট তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের সদাসর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে শিক্ষকের বৃত্তি কখনও বাণিজ্যাদি অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় লাভজনক হইতে পারে না; কাজেই যদি আমরা চাই যে বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান যুবকগণ অন্য বৃত্তি ত্যাগ করিয়া শিক্ষকবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে, সমাজ শিক্ষকের আর্থিক দৈন্য সম্মানের প্রাচুর্য্য দ্বারা ঢাকিয়া দিতে সম্মত আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, আমাদের স্কুলের দুরবস্থার প্রতি আমাদের গভর্মেন্টের নজর পড়িয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের উন্নতির জন্য তাঁহারাও মনোনিবেশ করিয়াছেন। তবে আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা এই, যে, অনেক সময়ই দেখা যায়, শিক্ষকের মাহিয়ানা কিম্বা সংখ্যা বৃদ্ধি করা অপেক্ষা ইন্সপেক্টরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেন বেশী কার্য্যকর বলিয়া গভর্মেন্ট মনে করেন। তাঁহাদের মতে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে আমাদের স্কুলগুলিতে আমাদের আশানুরূপ ফল ফলিতেছে না। বৎসরে একদিন কি দুই দিন স্কুলটি পরিদর্শন করিয়া আসিলে কিরূপ তত্ত্বাবধান হয় তাহা আমরা বুঝি না। তাহা ছাড়া ইন্সপেক্টরেরা যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তদনুযায়ী কাজ করা, আর বিধবার একাদশী করা দুই-ই সমান। করিলে লাভ নাই, না করিলে ক্ষতি যথেষ্ট। এইরূপ পরিদর্শনের প্রাচুর্য্যের ফলে হইয়াছে এই, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের নজর আজকাল কোনক্রমে বাহিরের ঠাট বজায় রাখিবার দিকে। ভিতরে যথার্থ কাজ কিরূপ হইতেছে তৎপ্রতি কেহ একবার চাহিয়াও দেখেন না। তবে বর্ত্তমান বড়-লাট মহোদয় শিক্ষাকল্পে যে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়াছেন, তাহার ৯ লক্ষ শুধু বাঙ্গালার প্রাথমিক ও ও উচ্চ ইংরেজি স্কুলের শিক্ষকের অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে। ইহা আমাদের পক্ষে একটা আশার কথা। আমাদের যথার্থ যাহা প্রয়োজন তাহা বুঝিয়া এই টাকাটা খরচ করিলে বাংলার যথেষ্ট লাভ হইবে।

জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতিবিধান, জনসাধারণের উপর বেশীর ভাগ নির্ভর করে। আমরা আমাদের জন্য যতটা করিতে পারি, অন্য কেহ কখনও ততদূর করিতে পারে না। আমাদের ধনী ও শিক্ষিত লোকদিগের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আমরা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তীর্থ পর্য্যটন ও অন্যান্য কার্য্যে অজস্র অর্থ অকাতরে ব্যয় করি। ধর্ম্মের নামে কত টাকা যে দেবালয় ও মঠে উৎসর্গীকৃত রহিয়াছে ও হইতেছে তাহার কে ইয়ত্তা করিবে। অথচ গ্রামের স্কুলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া অর্থ যোগাড় করা অত্যন্ত কঠিন। লোক-শিক্ষার সহায়তা যে ধর্ম্ম-সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ, তাহা সমাজের অনেকেই বুঝেন না।

আমাদের আর-এক দুর্দ্দশার কারণ এই যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই গ্রাম ছাড়া। যে পল্লীগ্রামে তাঁহারা লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন, যাহার নিকট তাঁহারা ঋণী, এখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ও অর্থান্বেষণের বাতিকে তাঁহারা কদাচিৎ সেই পল্লীগ্রামে পদার্পণ করেন। তাঁহারা একেবারে মায়া কাটাইয়াছেন বলিলেই চলে। ফলে যাঁহারা সচরাচর পল্লীগ্রামে থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রভাব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন, এরূপ লোক খুব অল্প। তাঁহাদের জীবনের সমস্ত উদ্যম স্কুল প্রভৃতি ভাল বিষয়ের দিকে ব্যয়িত না হইয়া, দলাদলি এবং নিরর্থক আমোদপ্রমোদেই ব্যয়িত হয়। স্কুলের প্রতি কাহারও যথেষ্ট সহানুভূতি নাই। ইহাও স্কুলের দুর্দ্দশার একটি অন্যতম কারণ। যে-সকল কৃতী সন্তান, পল্লীগ্রামে জন্ম-গ্রহণ করিয়া শিক্ষালাভ করিয়া উত্তরকালে যশস্বী ও ধনী হইয়াছেন, তাঁহাদের ছোট গ্রামের স্কুলের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। এ বিষয়ে তাঁহাদের সময় ও মনের উপর গ্রামের স্কুলের যথেষ্ট দাবী আছে। নিজ নিজ গ্রামের স্কুলের উন্নতির জন্য যদি তাঁহারা ভাবেন, তাহা হইলে সত্যসত্যই আমাদের কাজ যথেষ্ট সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে।

সুখের কথা এই যে, মনে হয়, যেন আজকাল একটু হাওয়া বদলাইয়াছে। শিক্ষিত-সম্প্রদায় জনসাধারণের যথার্থ হিতসাধনের জন্য ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দান-বীর "পালিত," ও মনস্বী "ঘোষের" কথা আজকাল কে না জানে? তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদের জলন্ত আদর্শ-স্বরূপ হওয়া উচিত।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছেলেদের প্রথমে পাঠশালে পাঠান হইত, উদ্দেশ্য এই যে তাহারা পড়িতে লিখিতে এবং অঙ্ক কষিতে (ইংরেজিতে যাহাকে the three Rs. বলে, অর্থাৎ reading, writing and arithmetic) শিখুক। অনেকে তখন পাঠশালের পড়া শেষ করিয়া পৈতৃক পেশা আরম্ভ করিত। এখন জনসাধারণের মতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। এখন প্রত্যেক পিতামাতা ইচ্ছা করেন যে তাঁহার ছেলে বেশী লেখা পড়া শিখুক। কারণ বেশী লেখা পড়া শিখিলে বেশী অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে এবং সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। এই জন্যই প্রবাদ আছে যে "লেখা পড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে।" এই অর্থকরী বিদ্যার মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ হইয়া অনেকে পুত্রদিগকে উচ্চশিক্ষা দিতে লালায়িত হন। সুতরাং উচ্চশিক্ষার যে-অংশটুকু অর্থ-উপার্জ্জনের সহায়তা করে কেবলমাত্র সেইটির উপরই লোকের দৃষ্টি থাকে। রাজকীয় উচ্চপদই বল, আর ডাক্তারী ওকালতীই বল, অর্থ উপার্জ্জনের প্রচলিত পথে চলিতে হইলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপযুক্ত ডিগ্রীরূপ টিকিট চাই। যাহার গাত্রে ঐ নির্দ্দিষ্ট ছাপ আছে তিনি অনায়াসে ঐ পথে অগ্রসর হইতে পারেন, যাঁহার নাই তিনি বিতাড়িত হইবেন। এই জন্যই ডিগ্রীর এত আদর। এই ডিগ্রীর প্রতি অত্যধিক আসক্তিই আজকাল যত অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য পাঠ্যপুস্তকের স্থলে নোট-বুক বা অর্থ-পুস্তকের বেশী আদর, শিক্ষকের নিকট Notes বা টীকা আদায় করিবার জন্য যত তাগাদা, আর পাঠ্যপুস্তক ছাড়িয়া দিয়া পুরাতন বৎসরের প্রশ্নপত্রের যথাযথ উত্তর মুখস্থ করিতে ব্যস্ততা দেখা যায়। প্রশ্নপত্র চুরিও এই অত্যধিক ডিগ্রী-ব্যাধির কুফল। এই শিক্ষার ফলে লোকে সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিয়াও মূর্খ হইয়া থাকে। যতদিন অর্থের উদ্দেশ্য বিদ্যাশিক্ষা, এই ভুল ধারণা আমাদের মন হইতে সম্যক-রূপে অপসারিত না হইবে, ততদিন প্রকৃত শিক্ষা জনসাধারণের নিকট পৌঁছিবে না। নৈতিক

ও মানসিক উন্নতিসাধনই যে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য এ-কথা ভুলিলে চলিবে না। অর্থ-উপার্জ্জনের ত বিবিধ পন্থা আছেই এবং উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে যে অর্থ উপার্জ্জনের সহায়তা হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া উচ্চশিক্ষাকেই অর্থোপার্জ্জনের একমাত্র উপায় স্থির করিলে চলিবে না। এ ভ্রম দূর করিতে হইবেই। না করিলে নিস্তার নাই। শত শত বালক পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে বলে—"my career is ruined"—আমার জীবনের গতি রুদ্ধ হইয়া গেল, যেন পাশ হইলেই তাহারা স্বর্গের চাঁদ হাতে পায়। এখানে career অর্থে অর্থ-উপার্জ্জনের সহজ উপায় বুঝাইতেছে। যদি অর্থ উপার্জ্জনই লক্ষ্য হয় তাহা হইলে এত অর্থ ব্যয় করিয়া অনর্থক শরীরপাত করিবার কি আবশ্যক? কই স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জে সি ব্যানার্জি, এবং হাজার হাজার মাড়োয়ারী তাঁরা ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পান নাই।

বাস্তবিক কথা বলিতে কি, আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আর তেমন অর্থকরী নহে। অর্থোপার্জ্জনের জন্য শিক্ষিত বাঙালী যুবকের পক্ষে ব্যবসাবাণিজ্য অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দূরদেশ হইতে মূর্খ মাড়োয়ারী ও গুজরাটীগণ আসিয়া আমাদের টাকা লুটিয়া লইয়া যাইতেছে আর আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি শিক্ষিত বাঙালী ব্যবসায়ে মন দেন তাহা হইলে এই টাকাটা ভদ্রলোকগণের বর্ত্তমান ভীষণ অন্নকষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিতে পারে।

অর্থের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি প্রকৃত শিক্ষার জন্যই বিদ্যালয়ে বালকদিগকে প্রেরণ করা হয় তাহা হইলেও আর-এক বিপদ উপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে সকল বালককেই স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া একই পথে চলিতে হইবে এবং একই পথ দিয়া বাহির হইতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট পথের একটু ওদিক্-ওদিক্ হইলেই হয় শিক্ষকের তাড়না না হয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা সতর্ক করিয়া দিবে। এই প্রণালীতে শিক্ষা দিলে বালকের প্রতিভা স্ফুরিত হইবার অবকাশ পায় না। যাহার মনের গতি যেদিকে, যদি বল-পূর্ব্বক সেই গতি রোধ করিয়া তাহাকে অন্যদিকে চালিত করিবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে সে-গতি যে দুর্গতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য অসৎ পথে প্রধাবিত হইলে যে তাহাকে বাধা দেওয়া উচিত নয় এ-কথা আমি বলি না। তবে সকলেই যে একই বিষয় ও একই কথা তোতাপাখীর মত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিবে এবং সময় উপস্থিত হইলে তাহা আবৃত্তি করিয়া প্রশংসা পাইবে, এমন ব্যবস্থার দ্বারা কি উপকার সাধিত হয় তাহা আমার বোধগম্য নহে।

যে-সকল বিষয়ে কিছু-কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, সেই-সকল বিষয় সকল বালকই কিছু-কিছু শিখুক। কিন্তু তাই বলিয়া যে বালকের অঙ্ক-শাস্ত্র আদৌ ভাল লাগে না তাহাকে যে বাধ্য হইয়া নীরস জ্যামিতিক বটিকা টীকা টিপ্পনীর অনুপানের সহিত মিলাইয়া সরস করিয়া শিক্ষকের তাড়নায় ও পরীক্ষায় অকৃত-কার্য্য হওয়ার ভয়ে গলাধঃকরণ করিতে হইবে এমন কি কথা আছে? হয়ত তাহার ইতিহাস পাঠে অধিক ইচ্ছা; কিন্তু গণিত-শিক্ষক যদি দেখেন যে, সে বালক তাহার দুর্ব্বোধ্য জ্যামিতির পুস্তক ফেলিয়া ইতিহাস পাঠ করিতেছে, তাহা হইলে তাহার হাতে ইতিহাস পরিহাসের বিষয় হইয়া উঠে। এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রতিভা স্বতঃ-প্রণোদিত পথে প্রধাবিত হইতে পারে না। ফলে তাহাকে অনেক বিষয় তিক্ত ঔষধের ন্যায় হজম করিতে হয়, এবং হয়ত দুর্ভাগ্যবশতঃ যে বিষয়ে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি নাই সে বিষয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া উচ্চতর শিক্ষার মন্দিরে প্রবেশ করিবার অনুমতি-পত্র পাওয়ায় বঞ্চিত হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সুরকীর কলের মত—আমা, ঝামা, হাজা, শুকা সকলরকম ইট পরীক্ষা-যন্ত্রে পেষণ করিয়া কেবল ১নং, ২নং, ৩নং সুরকী করিয়া ছাপ দিয়া দেয়।

এক-একটি শ্রেণীতে অনেক রকমের ছেলে লইয়া শিক্ষকগণের কারবার করিতে হয়। কেহবা অসাধারণ প্রতিভাশালী, কেহবা মধ্যমকল্পের, কেহবা হীনবুদ্ধি (Dull)। শিক্ষক ক্লাশে এক ঘণ্টায় (official তিন কোয়ার্টার) এই-সমস্ত ছাত্র লইয়া মাত্র একটি প্রশ্নের সমাধান, কি একটি প্যারার ব্যাখ্যা করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত প্রতিভাশালী ছাত্র সেই সময়ের মধ্যে তাহার দশগুণ পাঠ আয়ত্ত করিতে পারে। এইজন্য অনেক সময় দেখা যায় পাঠ্যপুস্তককে

নির্দ্ধারিত বিদ্যাশিক্ষা অনেকের পক্ষে প্রকৃত জ্ঞানলাভের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। তা ছাড়া আজকাল ভূগোল কি ইতিহাস একেবারে বাদ দিলেও পরীক্ষা পাশের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। আমি দুই বৎসর হইল "দেশে" গিয়া আমার বসিবার ঘরে ইউরোপের একখানি মানচিত্র টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলাম এবং কয়েকজন আই. এ. বি. এ. পরীক্ষার্থী ছেলেদের যুদ্ধক্ষেত্রের স্থান নির্দ্দেশ করিতে বলিলাম; তাহারা অন্ধের ন্যায় হাতড়াইতে লাগিল। এক-এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এই-সকল বিষয়ে এত অজ্ঞ যে দেখিলে দুঃখ হয়। যাহারা ভাল ভাল ইংরেজী সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহারা নানা বিষয়ে এত জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারেন যে, নির্দ্ধারিত পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া তাহা অসম্ভব। এইজন্য মহানুভব কব্‌ডেন একবার পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন যে এক-কপি টাইম্‌স্ পড়িলে এত বিষয় জানা যায় যে সমগ্র গ্রীক ইতিহাস পড়িলেও তাহা কোন কালেই হয় না। যদি কোন শিক্ষিত লোককে আমি জিজ্ঞাসা করি যে আজকাল যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ, আর তিনি যদি তাহা আমাকে বুঝাইতে অক্ষম হন, আমি বলিব তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা পণ্ড হইয়াছে।

সেইরূপ প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিজের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইতিহাস অর্থে কেবল কতকগুলি রাজার নাম ও কতকগুলি তারিখ নহে—দেশের সভ্যতা ও সামাজিক অবস্থার ধারাবাহিক বিবরণই প্রকৃত ইতিহাস নামের যোগ্য। এইরূপ ইতিহাস পাঠেই সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের মনে স্বদেশ-প্রেমের বীজ বপন হয়। তাহারা জানিতে পারে কত বড় উচ্চ-অঙ্গের আর্য্যসভ্যতার তাহারা উত্তরাধিকারী। আর আমাদের মত ম্যালেরিয়া-পীড়িত দেশের পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান যে কত প্রয়োজনীয় তাহা কি আর বুঝাইতে হইবে? যদি আমাদের দেশের লোক ম্যালেরিয়ার কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তাহা হইলে হয়ত তাহারা কোমর বাঁধিয়া ডোবা ও জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গ্রামগুলিকে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর করাল কবল হইতে মুক্ত করিতে পারে। আমি জানি পল্লীগ্রামের অনেক লোকের যথেষ্ট অবকাশ আছে। যদি তাহারা অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা নিজের হাতে কুড়াল ধরিয়া বাড়ীর চারিপার্শ্বের জঙ্গল সাফ করিয়া ফেলিত, নিজের হাতে কোদাল ধরিয়া ডোবার পঙ্কোদ্ধার করিত।

অনেক সময় দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ছাপ অজ্ঞতা ঢাকিবার আবরণ মাত্র। ফলতঃ নিজ চেষ্টায় যেটুকু শেখা যায় সেটুকুই আমাদের কাজে আসে। পাঠ্য-পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া "কেতাবী" হওয়া যায় বটে কিন্তু প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। আমাদের কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার বড় একটা ধারেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহাদিগকে আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে বাদ দিব? আল্‌ফিরি জ্যামিতির প্রথম ভাগের ৫ম প্রতিজ্ঞা অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারেন নাই, লর্ড বাইরনেরও জ্যামিতি দেখিলে আতঙ্ক উপস্থিত হইত। স্যর ওয়াল্টার স্কট সম্বন্ধে তাঁর এক শিক্ষক বলিয়াছিলেন—"Dunce he is, and dunce he will remain", ওটা নিরেট বোকা, নিরেট বোকাই চিরদিন থাকিবে!

তাই আমি শিক্ষকমণ্ডলীকে নিবেদন করি, তাঁহারা যেন কোন ছাত্রকে নির্দ্ধারিত কোন বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইতে না পারিলে, তাহাকে গাধা ও অকর্ম্মা বলিয়া নিরুৎসাহ না করেন। হয়ত তাহারা অন্য বিষয়ে প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিবে।

তাই বলিতেছি যে, নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের সহিত অন্যান্য বিবিধবিষয়ক পুস্তকও বালকদিগের হস্তে দেওয়া উচিত। যাহার যেরূপ রুচি সে সেইরূপ পুস্তক বাছিয়া লইবে। ইহাতে তাহার প্রতিভা বিকাশের সহায়তা করিবে। এ বিষয়ে মার্কিনদেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক এমার্সন যাহা বলিতেছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য :—

"I advise teachers to cherish mother-art. I assume that you will keep the grammar, reading, writing and arithmetic in order; it is easy and of course you will. But smuggle in a little contraband wit, fancy, imagination, thoughts. * * * They shall have no books but school-books in the room; but if one has brought in a Plutarch or Shakespeare or Don Quixote or Goldsmith or any other good book, and understands what he reads, put him at once at the head of the class * * *. If a child happens to show

that he knows any fact about astronomy or plants or rocks or history that interests him and you hush all the classes and encourage him to tell it that all may hear, then you have made your school-room like the world."

মোটকথা এই, যে ছেলে পাঠ্যতালিকাভুক্ত পুস্তকের বাহিরে যত খবর রাখিবে, আমি সেই ছেলেকে তত বাহবা দিব। অর্থাৎ যে শিক্ষা দ্বারা স্বাভাবিক প্রতিভার স্ফুরণ হয় ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে, ও মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমার নিজের জীবনস্মৃতির কথা বলিতে আমি বড়ই সঙ্কুচিত হই, কিন্তু একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হইতেছে। আমি যখন হেয়ার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতাম তখন একবার দুরন্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া এক বৎসর ভুগি। সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে প্রায় দুই বৎসর লাগিয়াছিল। এই দুই বৎসর বাধ্য হইয়া আমাকে বাড়ীতে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ঐ সময়ে লাটিন ফরাসী ইত্যাদি ভাষা আয়ত্ত করি। বঙ্গদর্শনে রামদাস সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে প্রত্নতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধ লিখিতেন আমি তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। সেই অল্প বয়সে আমার মনে ঐ যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার প্রতি আগ্রহ হইয়াছিল তাহা বহুকাল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় গুপ্ত থাকিয়া হিন্দুরসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস লিখিবার সময় পুনর্ব্বার প্রকাশিত হয়। বাল্যের সেই যে প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহাই উত্তর কালে কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্যকরী হইয়াছে।

প্রকৃত শিক্ষা কিরূপ সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমার এত কথা মনে আসিতেছে যে দুই এক কথার মধ্যে তাহা শেষ করা অসম্ভব। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষ তৈয়ারি করা, অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলি যথোচিতরূপে পরিস্ফুট করিয়া তোলা। কি উপায়ে তাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে তদ্বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীগণ মাথা ঘামাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের চিন্তাপ্রসূত যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি রহিয়াছে প্রত্যেক শিক্ষকের কর্ত্তব্য তাহা পাঠ করা।* শিক্ষকতা-কার্য্য অত্যন্ত কঠিন ও অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ,—এই কার্য্যের জন্যই বিশেষ ভাবে পাঠ ও চিন্তা না করিলে কেহ প্রকৃত-শিক্ষক-পদবাচ্য হইতে পারেন না।

প্রসঙ্গক্রমে এক্ষণে আমি শিক্ষাসংক্রান্ত দু-একটা কথার উল্লেখমাত্র করিতে চাই। আমাদের স্কুলে বালকগণের শারীরিক বৃত্তিগুলির অনুশীলনের কোনও ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়। যাহাতে ছেলেরা মাঝে-মাঝে দশবিশ মাইল হাঁটিতে পারে, দু-চার মাইল দৌড়িতে পারে, দুএক মাইল সাঁতার কাটিতে পারে, বা দশ-পনের মাইল দাঁড় বাহিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। শরীরকে সবল ও কষ্টসহ করা যে কত প্রয়োজনীয়, বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে তাহা প্রমাণ হইতেছে।

এক্ষণে সভ্যজাতিগণের সকল সুস্থ যুবককেই সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া দেশের সম্মান রক্ষা করিতে হইতেছে। আমাদের গবর্মেণ্ট বাঙালীকেও সৈনিক হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং আজকালকার দিনে সৈনিকোচিত সুপটু দেহ নির্ম্মাণ করা যে সকল যুবকেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

মানসিক শিক্ষাসম্বন্ধে কয়টি কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নৈতিক শিক্ষাসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা হইতেছে চরিত্র গঠন। উহা কয়েকখানি নীতিপুস্তক পাঠ বা কিছু উপদেশ প্রদান দ্বারা সম্পন্ন হইবার নহে। দিনের পর দিন ধরিয়া পরোপকার, চিত্তের পবিত্রতা রক্ষা ও ভগবচ্চিন্তা প্রভৃতি কয়েকটি সৎ অভ্যাস পালন করিয়া যাইলে কালক্রমে আদর্শ চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ছাত্রের উচিত প্রতিদিন কিছু-না-কিছু ভাল কাজ করা, যেমন কোনও স্বার্থত্যাগ করা, বা ক্রোধাদি কোনও রিপুর দমন করা, আর্ত্তত্রাণ হেতু বীর্য্য প্রদর্শন করা, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করা ইত্যাদি। শিক্ষক উপদেশ দ্বারা, বিশেষতঃ নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা, ছাত্রকে ধর্ম্মপথে চলিতে উৎসাহিত করিবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিতে চাই, নৈতিক শিক্ষাসম্বন্ধে আমাদের

---

* যে-সকল শিক্ষকের বহুসংখ্যক পুস্তক পাঠ করিবার সময়ের অভাব তাঁহারা যদি অন্ততঃ নিম্নলিখিত পুস্তক দুখানি পাঠ করেন তাহা হইলেও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন :—

(১) A Brief Course in the History of Education, by Paul Monroe (Published by Macmillan & Co.)

(২) The School, by J. I. Findlay (Home University Series)

ক্ষচর্য্য নামক প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী হইতে এখনও অনেক শিখিবার আছে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই, যাঁহারা এই মহান কার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা যেন সর্ব্বদাই মনে রাখেন, যে, দেশের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের প্রেরণায় কার্য্য করিতেছেন। পল্লীগ্রামের কুসংস্কার অন্ধ-বিশ্বাস দলাদলির মধ্যে, তাঁহাদের জীবনের উচ্চ আদর্শ, ছাত্রদিগকে যেন সতত মঙ্গলের দিকে চালিত করে। আমার বিশ্বাস, যে, আমাদের দেশ এখনও এত অধঃপতিত হয় নাই, যে, দেশের লোকে বিদ্যা ও বিদ্বানের আদর করিবে না।

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" প্রাচীন নীতিবিশারদের এই উক্তি, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের উপর একসময় প্রযুজ্য ছিল। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষকেরা সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে ও অন্তরালে, নীরবে যে কাজ করিতেছেন, তাহার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। এই কার্য্যে তাঁহাদের যথেষ্ট যশ কিংবা খ্যাতি হইতেছে না বলিয়া যেন তাঁহারা অবসাদ-সাগরে নিমজ্জিত না হন।

এই সময় আমার কর্ম্মবন্ধু পরলোকগত মহাত্মা গোখলের কথা মনে হইতেছে। তিনি বিশ বৎসর ধরিয়া মাত্র ৭৫৲ টাকা বেতনভুক্ শিক্ষক থাকিয়াও স্বদেশ-প্রেমিক ও রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী শিক্ষকদের মধ্যে যে-কেহ ইচ্ছা করিলে গোখলের মত উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন। যুক্তরাজ্যের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনও একজন শিক্ষক ছিলেন। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে প্রতিভাশালী ব্যক্তি শিক্ষক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও দেশপ্রসিদ্ধ হইতে পারেন, যদি তিনি নিজের প্রতিভার উপযুক্ত কার্য্যে আপনার সমস্ত শক্তি অক্লান্তভাবে নিয়োগ করিতে পারেন।

উপসংহারে আমার বলিবার কথা এই যে প্রত্যেক জেলাতেই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় বালকদিগের শিক্ষাকার্য্যে সহায়তা করিতেছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে আপন-আপন কার্য্য করিতেছেন। বৎসরান্তে একবার তাঁহারা একস্থানে মিলিত হইয়া পরস্পর আপন-আপন অভিজ্ঞতার বিষয় আলোচনা কিম্বা শিক্ষাসংক্রান্ত কোন জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা অথবা স্ব স্ব স্বাধীন চিন্তার আদান-প্রদান করিয়া উৎসাহিত হউন।

পরিশেষে, আমার দেশবাসী যে যেথায় আছেন, আজ আমি সকলের নিকট যুক্ত করে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের মাতৃভূমির অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া পুনরায় তাঁহাকে প্রাচীনকালের মত জগদ্বরেণ্যা করিবার জন্য প্রত্যেকে অকাতরে নিজ নিজ শক্তি নিয়োগ করুন। ধনবান, আপনি ধনের কোষ উন্মুক্ত করুন; বিদ্বান, আপনি অর্থলোভ ত্যাগ করিয়া শিক্ষকতা-বৃত্তি অবলম্বন করুন। আর আমার যে-সকল দেশভ্রাতা ধনসম্পদ বা বিদ্যাসম্পদ লাভে সৌভাগ্যবান হন নাই, তাঁহারা প্রত্যক্ষ-ভাবে না পারেন, পরোক্ষভাবে এই মহৎকার্য্যের সহায়তা করুন—সকলে মিলিয়া শিক্ষককে তাঁহার পদোচিত মর্য্যাদা দান করিতে থাকুন। তাহা হইলেই যোগ্য শিক্ষকের হাতে আমাদের ছেলেরা মানুষ হইয়া উঠিবে—আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

বাগেরহাটের সন্নিকট কাঁড়াপাড়া গ্রামে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ।

কৃষির অন্তরায়

(নৃত্যগোপাল প্রবাসী-পুরস্কার প্রাপ্ত)

(খ) অতিবৃষ্টি।

জলাভাব যেমন অনেক সময়ে চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়, জলাধিক্য আবার তেমনি চাষের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া থাকে। অধিক জল হইয়া ধান অথবা পাট-গাছ অনেক সময়ে ডুবিয়া গিয়া পচিয়া যায়, তাহা হইতে আর কিছুই লাভ করা যায় না। এখন অতিবৃষ্টি বড় অধিক দেখা যায় না; তবে বাঙ্গালায় এমন অনেক নীচু বা জলা জমি আছে যেখানে সাধারণ অবস্থায় বেশ ধান্য জন্মে, কিন্তু একটু বৃষ্টি হইলেই সে-সকল স্থানে এত অধিক জল জমে যে সে বৎসর সেখানে কোন ফসলই জন্মিতে পারে না। অতি

অল্পদিন হইল উভয়-বঙ্গে এইরূপ অতিবৃষ্টি জনিত জলপ্লাবন ঘটিয়াছিল।

জলনিঃসরণ পথ।

এই-প্রকার জলাধিক্যের মন্দ-ফল হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত জলনিঃসরণ-পথ প্রস্তুত রাখা আবশ্যক। কেবলমাত্র অতিরিক্ত বৃষ্টিজনিত জল নহে, বাঙ্গলায় অনেক খাল, বিল, প্রভৃতি স্থান আছে সেখানেও স্থায়ী জলনিঃসরণের খাল প্রস্তুত করিলে সেই-সকল স্থান চাষোপযোগী হইতে পারে। বাঙ্গলার ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণার্থে গবর্ণমেণ্ট এক কমিটি গঠন করিয়াছিলেন; এই কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে লোকালয়ের অতি নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ধান চাষ, এবং দেশের জলাজমির আবদ্ধ জলরাশি দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। লোকালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ধান চাষ বন্ধ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া কমিটি এ বিষয়ে কিছুই করা যাইবে না বলিয়াছেন; কিন্তু কমিটি দেশব্যাপী আবদ্ধ জল নিষ্কাশনের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। যে যে স্থানে জল আবদ্ধ থাকিয়া স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি করিতেছে সেইরূপ কএকটি প্রধান স্থান নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে সাধারণতঃ গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ ধানজমি, বিল, খাল প্রভৃতির আবদ্ধ জল স্বাস্থ্যের অত্যন্ত হানিকর। এই-সকল স্থানের বদ্ধ অথবা অতিবৃষ্টিজনিত অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের নিমিত্ত উপদেশ দিয়া কমিটি বলিয়াছেন "The difficulties are those of finance, and agency," এ-সকল কার্য্য অর্থ এবং লোকাভাবে ঘটিয়া ওঠা কঠিন।" এ সকল কার্য্যও (produtive public works) উৎপাদক পূর্ত্তকার্য্য নহে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে এত উদাসীন এবং খরচের দোহাই দিয়া অব্যবহৃতি পাইতে চাহেন। গবর্ণমেণ্ট কত অনুৎপাদক কার্য্যে কত অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা দেখান আমাদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত, এবং সে বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে কত মনীষী তাঁহাদের লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন; তবে আমাদের মনে হয় যে গবর্ণমেণ্টের এই 'উৎপাদক' ও 'অনুৎপাদক' নীতি সাধারণ লোকের কল্যাণের কারণ না হইয়া তাহাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রধান কারণ হইয়াছে।

বাঙ্গলাদেশে জল নির্গমন ও জলাজমি হাসিল করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট চারিটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। প্রথম, Howrah Drainage Works ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহা হাওড়া জেলার ৯০ বর্গ-মাইল জলাজমির জলনিঃসরণ করিয়া থাকে। দ্বিতীয়, Rajapur Drainage Works। ১৮৯৪ সালে, ইহাও হাওড়া জেলার ২১০ বর্গ মাইল জলাজমির উদ্ধার করিয়াছে। তৃতীয় Dankuni Drainage Works। হুগলি জেলায় অবস্থিত, ১৮৭৩ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। চতুর্থটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার Mograhat Drainage Scheme। ইহা জেলা ২৪-পরগণার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত এবং ২৯০ বর্গ মাইল জলাভূমির জল নিঃসারণ করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে Census of India 1911 vol. v Part I, সরকারি পুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় যে বিবরণ আছে তাহা এইরূপ—"The conditions which formerly existed in this tract may be realised from a description written 30 years ago. Fever was constantly present in every village; other diseases found a congenial home, the productiveness of the land was only a fraction of what it should be"। "৩০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত বর্ণনা হইতে এই অঞ্চলের তৎকালীন অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। প্রতি গ্রামে জ্বর সর্ব্বদাই হইত; অন্য অনেক রোগ তাহাদের বেশ মনোমত বাসস্থান পাইয়াছিল এবং উৎপাদিকা-শক্তি, উর্ব্বরতা যেমন হওয়া উচিত, তাহার এক সামান্য অংশমাত্র ছিল।" ১৯০৯ সালে, ঐ স্থানের নিকট ডায়মণ্ড-হারবারে, আরও একটি জলনির্গমন-পথ বা Sluice Gate নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে সেন্সস-রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে—Prior to this construction there were 100 sq. miles of swampy waste lands; now this area is covered with rice cultivation, the annual value of which is nearly 38½ lakhs of rupees, while the value to the tenantry of one year's crops only is estimated as approximtely twice the actual cost of the scheme. এইটি

নির্ম্মাণের পূর্ব্বে এখানে ১০০ বর্গমাইল-ব্যাপী পতিত জলা জমি ছিল। এক্ষণে এই স্থানে বাৎসরিক প্রায় সাড়ে আটত্রিশ লক্ষ টাকার ধান্য জন্মিতেছে এবং কৃষকের এক বৎসরের ফসলের মূল্য সমস্ত ব্যাপারটিতে যত টাকা খরচ হইয়াছে তাহার প্রায় দ্বিগুণ।" ৭৫ পৃষ্ঠা। খাস সরকারি পুস্তকে জলনির্গমন-ব্যাপারের ফলাফল সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত; অতএব বাঙ্গলাদেশব্যাপী কত সহস্র বর্গ-মাইল বিস্তৃত এইরূপ জলাভূমির কিছু অংশ হাসিল করিয়া কৃষির উপযোগী করিলে লোকসাধারণের যে কি প্রভূত উপকার সাধন হয় তাহা কি আর বলিয়া বুঝাইবার অপেক্ষা আছে? উপকারের অনুপাতে খরচের হিসাব কত অকিঞ্চিৎকর তাহা উল্লিখিত বিবরণ হইতেই জানা যায়।

খাল, বিল, প্রভৃতি জলা জমি উত্থিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কখন কখন আর একটি উপায় অবলম্বন করেন দেখিতে পাওয়া যায়। কোন একটি বিলকে তিন চারিটি বা ততোধিক নালা বা খালের দ্বারা জোয়ার ভাঁটা খেলে এমনি একটি নিকটস্থ নদী বা বৃহৎ খালের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয়। আষাঢ়-শ্রাবণ হইতে আশ্বিন-কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সাধারণতঃ এই জলাজমিগুলি এক বিস্তৃত জলখণ্ডের ন্যায় মনে হয়; ঐ সময়ে জোয়ারের সহিত নদী বা খাল হইতে কর্দ্দমাক্ত জল সেই নালাগুলির মধ্য দিয়া বিলের মধ্যে প্রবেশ করে, জোয়ারের কাদাগুলি থিতাইয়া একপুরু মাটি বিলের উপর পড়িয়া থাকে এবং ভাঁটার সহিত কর্দ্দমহীন পরিষ্কার জল নদীতে ফিরিয়া যায়। এই উপায়ে বৎসরের পর বৎসর এক-এক পুরু করিয়া মাটি পড়িতে থাকায় ৫।৬ বৎসরে জলার কোন কোন অংশ উচ্চ হইয়া পড়ে এবং সেখানে বেশ কৃষিকার্য্য চলিতে থাকে। এই উপায়ে নদীর আবিল জলের কাদা এবং চারিদিকের উচ্চ জমি হইতে প্রবাহিত জলের মাটি থিতাইয়া কএক বৎসরের মধ্যে জলা বা বিল জমি বেশ কৃষিযোগ্য হইয়া উঠে। অতি পুরাকালে ইটালীতে তথাকার অধিবাসীগণ এই উপায় অবলম্বন করিয়া অনেক পতিত জমি উদ্ধার করিয়াছিলেন।

পতিত খাল-জমি উদ্ধারের কার্য্যে বাঙ্গলার ধনী, রাজা মহারাজা ভূস্বামী ও জমিদারগণের বিশেষ চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। বহু বৃহৎ জমিদারির মধ্যে এরূপ অনেক জলা আছে। জমিদারগণ একাকী অথবা কোন প্রতিবেশী ভূস্বামীর সহিত মিলিত হইয়া, গবর্ণমেণ্টের অথবা কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্যে, অনেক জমি হাসিল করিতে পারেন; এ বিষয়ে দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্টের স্বতন্ত্র ও একত্র মিলিত চেষ্টা বাঞ্ছনীয়। হাওড়া জেলায় আমতার নিকটস্থ কোন এক বিলের উদ্ধার-কার্য্য লইয়া গবর্ণমেণ্ট ও জমিদার এবং প্রজাগণের সহিত কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। গবর্ণমেণ্ট বলেন আমরা বিল শুষ্ক ও কৃষিযোগ্য করিয়া দিতেছি, যদি জমিদার মহাশয় আমাদের যথার্থ খরচা নির্ব্বাহ করেন; তিনি Public Demands Recovery Actএর সাহায্যে প্রজাগণের নিকট হইতে আবশ্যক হইলে ঐ খরচা উসুল করিয়া লইতে পারেন; কিন্তু আবশ্যক হইবে না, কারণ প্রজাগণ সকলেই টাকাপিছু এক আনা অতিরিক্ত খাজনা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। জমিদার মহাশয় বলিলেন, আমি অত হাঙ্গামায় যাইতে ইচ্ছা করি না, কারণ ঐ বিল হইতে মৎস্য বিক্রয় করিয়া আমার যথেষ্ট আয় হইতেছে। উক্ত জমিদার মহাশয় আমাদের দেশের এক-জন শিক্ষিত গণ্য মান্য ব্যক্তি। তাঁহারা যতদিন এরূপ ঘোর ঔদাসীন্য দেখাইবেন ততদিন দেশের উন্নতি কোন-রূপেই সম্ভবপর নহে।

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

১। অনুসন্ধান সমিতি বা কর্ম্মচারীর দ্বারা দেশের মধ্যে কোথায় কত বিঘার বিল বা জলা জমি আছে তাহা স্থির করিয়া তাহার উদ্ধার করিবার উপযুক্ত উপায় সম্বন্ধে বিচার করিবেন, এবং যেখানে অসম্ভব নয় গবর্ণমেণ্ট সেখানে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

২। উক্ত কার্য্যের খরচা গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং অথবা জমিদারগণের সাহায্যে আইন-সঙ্গত উপায়ে আদায় করিবেন।

৩। উক্ত অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কৃষি- এবং পূর্ত্তবিভাগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করা আবশ্যক।

জমিদারগণের কর্ত্তব্য।

ভূস্বামীগণ যদি সম্ভব হয় স্বয়ং নচেৎ গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় যতদূর সম্ভব পতিত জমি উদ্ধার করিবেন।

(গ) ঝড় এবং বন্যা।

দেশের মধ্যে শস্যাভাবের আর-একটি কারণ ঝড় ও বন্যা। বাঙ্গালাদেশে প্রায় আশ্বিন কার্ত্তিক মাস হইতে সর্ব্বত্র হৈমন্তিক ধান্য পাকিতে আরম্ভ হয় এবং অগ্রহায়ণ মাসে প্রায় সমস্ত ধান্য কাটা হইয়া যায়। বাঙ্গলার কোন-না-কোন স্থানে প্রায় এই সময়ে ঝড় দেখা যায়। এই সময়ের ঝড়, প্রবল বৃষ্টি, ধান্যের সর্ব্বনাশ ঘটায়। সুপক্ক স্বর্ণাভ ধান্য তখন গাছের উপরে অতি আল্গা ভাবে লাগিয়া থাকে; সামান্য একটু আঘাত পাইলেই বৃন্তচ্যুত হয়। ধান্য মাটিতে পড়িলে সংগ্রহ করা অসম্ভব। অধিকক্ষণ স্থায়ী প্রবল ঝড় বহিলেই অথবা বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা বা শিলাঘাত লাগিলেই সমস্ত ধান্য মাটিতে পড়িয়া যায় এবং কৃষকের সর্ব্বনাশসাধন করে। প্রকৃতির এই বিপ্লবের হাত হইতে শস্য রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। ঝড়ের তীব্রতার অনুরূপ ক্ষতি হইবেই; এখানে মানুষের চেষ্টা যত্ন, উদ্যম সকলই ব্যর্থ, বিজ্ঞান পরাস্ত, কেবল মাত্র দেবতার দয়ার উপর নির্ভর। তবে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন, যে, দেশে বনভূমির সংরক্ষণ করিতে পারিলে ঝড়ের তীব্রতা কতকটা প্রশমিত হয় দেখা গিয়াছে।

বন্যাটা বর্ষাকালেই সাধারণতঃ হইয়া থাকে। তখন ধানগাছ সবেমাত্র রোপন করা হইয়াছে, নয়ত এক হাত দেড়হাত উচ্চ হইয়াছে। এমন সময়ে যদি বন্যা আসিয়া ধান-গাছের অথবা পাট-গাছের মাথার উপর দিয়া বহিয়া যায় এবং সেই অবস্থায় ৫।৬ বা ততোধিক দিবস থাকে, তাহা হইলে সমস্ত চারা হাজিয়া যায়; কেবল অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমির গাছ পরিত্রাণ পায়। আবার যদি বন্যার জল ফসলের কোন ক্ষতি না করে তবে বন্যার পরিত্যক্ত পলিমাটি সে বৎসর এবং তৎপরবর্ত্তী দুএক বৎসর সেই জমিতে অতি উত্তম ফসল জন্মায়। কারণ পলিমাটি অতি উত্তম সার। ধান্য খুব নীচু জমিতে জন্মায় বলিয়া বন্যা হইতে ইহার বিশেষ ভয়। বন্যা হইতে ধান-গাছের যত শীঘ্র ক্ষতি হয়, নীচু জমির পাটের তত শীঘ্র ক্ষতি হয় না, কারণ পাটের প্রাণ অপেক্ষাকৃত কঠিন, এবং বন্যার জলের গভীরতার সহিত ইহার বৃদ্ধিশক্তিও কতকপরিমাণে পাল্লা দিতে পারে। ডাঙ্গা জমির শস্য অথবা নদী হইতে দূরস্থ প্রদেশের শস্যের বন্যা হইতে তত ভয় নাই। বন্যা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় বাঁধ দেওয়া। বাঁধের দ্বারা বন্যারোধপ্রথা Central Provinces বা মধ্যপ্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী হইয়াছে। বাঁধ দেওয়ায় ক্ষেত্রের উপরিস্থ নূতন সতেজ মাটি ধুইয়া যাইতে পারে না, তদ্ব্যতীত বাঁধের দ্বারা আবদ্ধ জল অবশেষে জলপ্লাবনের বিশেষ সহায়তা করে। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে জলনিষ্কাশন-প্রণালীর কথা বলিয়াছি তাহা দ্বারাও কতকটা বন্যার জল বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বাঙ্গলার, বিশেষতঃ গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের ব দ্বীপের নিকটস্থ ভূমি, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এত কম উচ্চ যে তাহার উপর নির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালী অধিক পরিমাণে জল নিঃসরণ করিতে পারে না।

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

১। প্রতি বৎসর দেশের মধ্যে কোথায় কোথায় বন্যা হইল তাহার সংবাদ গ্রহণান্তর কৃষিবিভাগ ও পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারীগণের মতানুসারে গবর্ণমেণ্ট সেই সকল স্থানে বন্যা-রোধ করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন এবং গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং সেই নির্দ্ধারিত উপায় কার্য্যে পরিণত করিবেন।

২। পূর্ব্বকথিত উপায় অনুসারে গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় জমিদার বা প্রজাগণের নিকট হইতে তাঁহাদের ব্যয়ভার আদায় করিতে পারেন।

(ঘ) কীটাদি।

বহু কীট-পতঙ্গাদি প্রতি বৎসর বাঙ্গলার শস্যক্ষেত্রে অনেক শস্য নষ্ট করে। অতএব ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা কৃষির উন্নতির একটি উপায় বলিয়া মনে করা উচিত। গত ৩০ বৎসর হইতে বাঙ্গলার ধান্যের উফ্‌রা বা আফ্‌রা রোগ বলিয়া একপ্রকার রোগের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। কএক বৎসর হইল ইহার আক্রমণ অধিক বলিয়া অনুমান হইতেছে। নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলাতেই ইহার বিশেষ উপদ্রব। ১৯১০ সালে একমাত্র বেগমগঞ্জ থানায় দুই লক্ষ মণ ধান্য নষ্ট হইয়াছে। এই রোগের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে এবং কর্ত্তৃপক্ষগণ মনে করেন যে ক্ষতির পরিমাণ সাধারণের অনুমান অপেক্ষা অনেক অধিক।

কুমিল্লার বাবু অম্বিকাচরণ রায় এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথমে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯০৯ সালে

পুষার Imperial Mycologist, Dr. Butler, ডাক্তার বাট্‌লার কর্তৃক লিখিত অভিমত-সম্বলিত একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন। তদবধি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকায় ধান্যের উফ্‌রা রোগের এইরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

এই রোগ এমন কি আগষ্ট মাসেই ধান্যকে আক্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে। নীচু জমির এবং ছিটান ধান্যের অধিক রোগপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই রোগের তিনটি অবস্থা। প্রথম, পাতা উফ্রা,—ধান্যের শীষ নির্গমনের পূর্ব্বেই গাছের পাতাগুলি লালচে বা কালচে হইয়া যায়। দ্বিতীয়, থোড় উফ্রা,—শীষোদ্গমের পূর্ব্বে গাছের উপরিভাগ ফুলিয়া উঠে। তৃতীয়, পাকা উফ্রা,—এই অবস্থায় যদিও শীষ-নির্গমন ঘটে কিন্তু কোনের মধ্যে শস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কয় অবস্থাতেই গাছের উপরিভাগে গাটের কাছাকাছি স্থানে বর্ণের বিকৃতি ঘটে। একটি মাঠ সম্পূর্ণভাবে একরকমে আক্রান্ত হইতে পারে, অথবা একস্থানে আক্রমণ ঘটিয়া রোগ ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। যে মাঠে এক বৎসর আক্রমণ হইল পরবৎসর সে মাঠে আক্রমণ নাও হইতে পারে। ১৯১১ সালে নোয়াখালির কোন কোন থানায় জুন মাসেই আক্রমণ দেখা গিয়াছিল। যাহা হউক, উফ্রার বিশেষ পরিচয় দেওয়া ও স্বভাব বর্ণনা করা আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। পাঠকের এ বিষয়ে কৌতূহল হইলে তিনি ১৩২০ সালের প্রবাসীর ১৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৪৬৯ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের লিখিত প্রবন্ধ ও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের "Ufra disease of rice" নামক ১৯১২ সালের দুই নম্বর বুলেটিন (Bulletin) ও ১৯০৯ সালের গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত "Leaflet" পত্রিকা পাঠে এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে বাটলার অনুমান করেন যে কোন কীট বা জীবাণু দ্বারা এই রোগের আক্রমণ অনুষ্ঠিত হয় না; তিনি নির্ণয় করিয়াছেন এক প্রকার Eel worm বা বাইন জাতীয় আণুবীক্ষণিক পোকার আক্রমণই এই রোগের উৎপত্তির কারণ। তিনি আরও বলেন যে এ বিষয়ে স্থির করিয়া কিছু বলা যায় না এবং সঞ্চারণ-ক্রিয়ার দ্বারা (inoculation experiments) এ বিষয়ে পরীক্ষা বিশেষ প্রার্থনীয়।

বাটলার সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে চাষের পদ্ধতির উপর এই রোগের আক্রমণ নির্ভর করিতেছে। ছিটান আমন ধান্যের মত মন্দ অবস্থায় আর কোন ধান্যের চাষ হয় না। বহুদিন যাবৎ এ-সকল ক্ষেত্র গভীর জলে ডুবিয়া থাকে; ধান্য কাটা হইবার পর গোড়াগুলি মাটির সহিত সংলগ্ন থাকে। একবার ধান্য কাটা ও পরবর্ত্তী বপনের মধ্য সময়ে ক্ষেত্র উপেক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে; সেই সময়ে সামান্য অগভীর লাঙ্গল দেওয়াতে গোড়াগুলি পচা অবস্থায় মাটিতে চাপা পড়িয়া যায়। যে কারণেই উফ্রার উৎপত্তি হউক ইহা অপেক্ষা রোগবৃদ্ধি বা বিস্তারের অনুকূল অবস্থা আর কি হইতে পারে। বাটলার সাহেব উপদেশ দেন রোগাক্রান্ত ভূমিতে চাষের সময়, নিকটস্থ রোগশূন্য জেলার চাষের একাদিক্রমে সমগ্র পদ্ধতি অনুকরণ করা উচিত। প্রত্যেক ফসলের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ক্ষেত্রস্থিত মোটা মোটা গোড়াগুলি মাঠ হইতে দূর করার কি ফল তাহা দেখা কর্ত্তব্য। আপাততঃ মনে হয় উফ্রার আক্রমণ নিরস্ত করিবার জন্য ধান্যের গোড়াগুলি দূর করা, খুব ভাল করিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত। শীতকালে পতিতাবস্থায় জমিতে কয়েকবার উপর্য্যুপরি লাঙ্গল দেওয়া উচিত। প্রত্যেক শিক্ষিত অর্থবান ব্যক্তির চাষীদিগকে এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত।

গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় কুমিল্লার নিকটস্থ লালমাই পাহাড়ের নিকটে উফ্রা সংক্রান্ত পরীক্ষা-ক্ষেত্রে ঐ রোগ প্রতিকারের উপায় নিরূপণার্থ গত বৎসর পরীক্ষা-কার্য্য চলিতেছিল, কিন্তু ১৯১৪ সালে পরীক্ষা-ক্ষেত্রে জলাভাব-হেতু অজন্মা হওয়াতে পরীক্ষা বিফল হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে পুনরায় পরীক্ষা চলিতেছে। "নোয়াখালি, চৌমহানি ও বিক্রমপুরে গোড়া জ্বালাইয়া দিয়া এবং শস্য সংগ্রহের পর পুনরায় বপনের পূর্ব্বে উপর্য্যুপরি লাঙ্গল দিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। কিন্তু উফ্রার আক্রমণ অতি খামখেয়ালি রকমের। বিক্রমপুরে পরীক্ষাক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৎসর আর কোন আক্রমণ হয় নাই, কিন্তু চৌমহানিতে একটি ক্ষেত্র কীটদষ্ট হইয়াছিল। ইহা হইতে উক্ত উপায়ের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। আশা করা যায় যে ঐ-রোগ-

প্রবণতাহীন একপ্রকার ধান্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে।" * পুষার পরীক্ষা-ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে নাড়া জ্বালাইয়া দেওয়া রোগের প্রতিকার না ঘটাইয়া বরং তীব্রতার কারণ হইয়াছে। ঢাকাতে উফ্রা-রোগাক্রান্ত ভূমি কতখানি আছে, এবং কোন্‌দিকে কতখানি বাড়িতেছে তাহা জানিবার জন্য জরীপ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ১৯১০ সালের প্রকাশিত Agricultural Department বা কৃষিবিভাগের বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, ইদানিং এ বিষয়ে সরকার-বাহাদুরের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং উফ্রার সংক্রামকতা খর্ব্ব করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে এ বিষয়ে এখনও বিশেষ ফললাভ হয় নাই এবং উফ্রা নাশ করিবার কোন নিশ্চিত উপায় নির্দ্ধারিত হয় নাই। ধান্যের উফ্রা রোগ ছাড়া ভাপ্‌রোগ, "মাজরা" "টোঙ্গাপোকা" ইত্যাদি আরও অনেক প্রকৃতির ব্যাধি লক্ষিত হইতেছে। পাটেরও একপ্রকার রোগ দেখা গিয়াছে। এবং আর-এক প্রকার রোগ আলু ফসলের বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে। একবার সুপারিতে এক-প্রকার রোগ হইয়া বাঙ্গালার সমস্ত সুপারি-ফসলের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। এ-সকল বিষয়েই কর্তৃপক্ষগণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছেন এবং কৃষিপ্রদর্শনী ও ক্ষেত্রে পরীক্ষা দ্বারা কৃষকদিগকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

১। গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলায় একজন Agricultural Chemist কৃষি সম্বন্ধীয় রসায়নবিৎ, Entomologist কীট-বিদ্যাবিৎ ও Mycologist নিযুক্ত করিয়াছেন, ইঁহাদের সকলের দুএকজন করিয়া সহকারী কর্ম্মচারী আছেন, কিন্তু সমগ্র বাঙ্গলাদেশের পক্ষে এই কর্ম্মচারীর সংখ্যা অতিশয় অল্প। ইঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেই হইবে।

২। বর্ত্তমান প্রতি জেলাতে, অথবা কৃষিসংক্রান্ত ভিন্ন জেলা গঠন করিয়া প্রতি জেলাতে, কৃষিরসায়নবিদের অধীনে একটি করিয়া পরীক্ষাগার স্থাপন করিতে হইবে।

৩। বর্ত্তমান কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি আবশ্যক এবং প্রতি ক্ষেত্রে কিরূপে রোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, অথবা রোগ আরোগ্য করা যায় তাহার পরীক্ষা করণান্তর উপপত্তি দ্বারা কৃষকদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।

জমিদারগণের কর্ত্তব্য।

১। জমিদারগণও কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্র স্থাপন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবেন ও মন্ত্রণা দিবেন। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ও জমিদারগণের সাহচর্য্য একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র।

* Report of the Agricultural Department, Bengal, 1915, পৃ ৭, ৮।

ঢাকার ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩২২, মূল্য ২॥০ টাকা, পৃঃ ১—৫২০।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বিরচিত ঢাকার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ ঢাকা বিভাগের গেজেটিয়ার মাত্র, দ্বিতীয় ভাগে গ্রন্থকার প্রকৃত ইতিহাস রচনা আরম্ভ করিয়াছেন। অদ্যাবধি বঙ্গভাষায় যে কয়খানি প্রাদেশিক ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঐতিহাসিক রচনা হিসাবে রায় মহাশয়ের ঢাকার ইতিহাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঢাকার ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া রায় মহাশয় প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস এবং পরোক্ষ ভাবে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব বিভাগের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। রায় মহাশয় অতি অল্পদিন ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহার প্রথম গ্রন্থে যে অসাধারণ অধ্যবসায়, বিচারশক্তি, আত্মসংযম ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সমগ্র বাঙ্গালীজাতির আত্মশ্লাঘার বিষয়। এই পৌরাণিকতত্ত্বপ্রপীড়িত অলীক-আভিজাত্য-গৌরবলাভাকাঙ্ক্ষায় অধুনা-রচিত কুলশাস্ত্র-জর্জ্জরিত ঐতিহাসিক আলোচনার যুগে গ্রন্থকার যে আত্মসংযম ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। অদ্যাবধি বাঙ্গলার ইতিহাসে যে সমস্ত তমসাচ্ছন্ন যুগ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকটে অপূর্ণ সমস্যা রহিয়াছে, এই নবীন প্রত্নতাত্ত্বিক তৎসমুদায়ের আলোচনা-কালে অসাধারণ সত্য-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে প্রাচ্য উত্তরাপথের ভৌগোলিক পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মৎস্যপুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ, রঘুবংশ প্রভৃতি যে-সমস্ত সংস্কৃত-ভাষায় রচিত গ্রন্থে বঙ্গের উল্লেখ আছে, এরিয়ান, ডিওডোরস্‌, টলেমী প্রভৃতি যবন গ্রন্থকারগণের রচনায় যে-সকল স্থানে প্রাচ্য ভারতের উল্লেখ আছে, ইৎচিং, ফাহুয়ান প্রমুখ চীনদেশীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এবং পালি সাহিত্যে প্রাচীন বঙ্গের যে-সমস্ত ঐতিহাসিক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, প্রথম অধ্যায়ে তৎসমুদয় একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন উপবিভাগ-সমূহের অবস্থান অতি সুন্দর সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে ঐতিহাসিক রচনায় শব্দলালিত্যের বৈষম্য-দোষের একটি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার লালিত্যলোভ

সম্বরণ করিতে না পারিয়া শাক্যরাজপুত্র সিদ্ধার্থের নামের পরিবর্ত্তে অমিতাভের নাম ব্যবহার করিয়াছেন। শাক্য বুদ্ধের প্রকৃত নাম সিদ্ধার্থ অথবা গৌতম। হীনযানীয় বৌদ্ধধর্ম্মে বুদ্ধ দ্বিবিধ, ধ্যানী বুদ্ধ ও মানুষী বুদ্ধ। গৌতম মানুষী বুদ্ধ এবং অমিতাভ ধ্যানীবুদ্ধ। এই অধ্যায়ের প্রথমে আর-একটি ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়, দিল্লীতে অশোকের কোনও শিলাশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই। দিল্লী নগরের বহির্ভাগে ফিরোজ শাহের কোটলায় এবং সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি-স্তম্ভের নিকটে যে দুইটি শিলাস্তম্ভ আছে, তাহার একটি মিরাট হইতে ও অপরটি শিবালিক হইতে আনীত হইয়াছিল।

আওরঙ্গজেবের রাজ্যকালে ১০৮৪ হিজরায় অর্থাৎ ১০৮২ বঙ্গাব্দে শ্রীমতী গঙ্গা দাসী কর্ত্তৃক তাহার স্বামী গোপীনাথ দেবের স্বর্গ কামনার জন্য যে ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার দানপত্রে পরগণে সুলতান প্রতাপে ধম্মরাজিয়া গ্রামের উল্লেখ আছে। বিক্রমপুরে ধামরাই নামক একটি গ্রাম এখনও বিদ্যমান আছে। এই দুইটি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ধামরাই গ্রামে অশোকের একটি ধর্ম্মরাজিকা বা স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত শাকাসর গ্রামে একটি প্রাচীন স্তম্ভ আছে। শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন বলেন যে ইহা বিষ্ণুস্তম্ভ, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন ইহা গরুড়স্তম্ভ, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর বলেন ইহা বৌদ্ধযুগের অন্যতম কীর্ত্তি-নিদর্শন। গ্রন্থে এই স্তম্ভের যে চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া ইহা বৌদ্ধ কি হিন্দু, প্রাচীন কি আধুনিক তাহা নির্ণয় করা যায় না। ইহা স্থির যে শাকাসরের প্রস্তর-স্তম্ভ বিষ্ণুস্তম্ভ বা গরুড়স্তম্ভ নহে। সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন মন্দিরের স্তম্ভ মুসলমান-শাসন যুগে বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহারই ভগ্নাংশ মাধবরূপে পূজিত হইতেছে।

গ্রন্থকার ২৩শ পত্রের প্রথম পাদটীকায় বলিয়াছেন যে "তোসলির অবস্থান এখনও প্রকৃতরূপে নির্ণীত হয় নাই।" উড়িষ্যায় আবিষ্কৃত শিবরাজদেবের তাম্রশাসনে ও শুভাকর দেবের তাম্রশাসনে তোসলির উল্লেখ পাওয়া যায়, সুতরাং ইহা স্থির যে তোসলি উড়িষ্যায় অবস্থিত ছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মৌর্য্যসাম্রাজ্য ধ্বংসের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করিয়া গ্রন্থকার সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। গঙ্গে বন্দর আণ্ডিবল প্রভৃতি গ্রীক সাহিত্যলব্ধ প্রাচ্য উত্তরাপথের স্থানসমূহের অবস্থান নির্ণয় কালে গ্রন্থকার যে-সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা যথোপযুক্ত নহে।

মগধের গুপ্তরাজ-বংশের ইতিহাস আলোচনা কালে গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে গ্রন্থকার যে-সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ পূর্ব্বপ্রকাশিত। প্রাচীন গুপ্তাধিকার কালে গৌড়বঙ্গের ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে বিভিন্ন নহে। গ্রন্থকার এই যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর যে বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা বিশদতর হইলে সম্পূর্ণাবয়ব হইত। এই পরিচ্ছেদে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় কাহিনী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। গ্রন্থকার কেবল ডবাক প্রদেশের অবস্থান নির্ণয় করিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকার মিহিরৌলী স্তম্ভলিপি ও শুশুনিয়া পর্ব্বতলিপির চন্দ্র ও চন্দ্রবর্ম্মাকে এক ব্যক্তি স্বীকার করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। গ্রন্থকার মদ্রচিত পাষাণের কথায় লিপিবদ্ধ সম্রাট স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু ও যশোধর্ম্মদেবের যৌবনের কাহিনী ঢাকার ইতিহাসের ন্যায় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা-হানি হইয়াছে, কারণ "পাষাণের কথা" কথা-সাহিত্য, উহা ইতিহাসের ছায়াবলম্বনে রচিত ভারতীয় শিল্পের ক্রমবিকাশের আখ্যায়িকা মাত্র। সারনাথে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের ও বুধ-গুপ্তের রাজ্যকালের যে নূতন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং দিনাজ-পুরে বুধগুপ্ত, ভানুগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের যে তাম্রশাসন-পঞ্চক আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া প্রাচীন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিতে হইবে। গ্রন্থ রচনাকালে এই-সমস্ত নূতন প্রমাণাবলী প্রকাশিত হয় নাই, সেই জন্যই ঢাকার ইতিহাসে গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসের পূর্ব্বপ্রচলিত ইতিহাসই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে গ্রন্থকার শূরবংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতানুসারে শূরবংশের আদিপুরুষ আদিশূর গৌড়দেশে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ, বারেন্দ্র, রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কুলশাস্ত্রে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণগণ কোলাঞ্চ হইতে আসিয়াছিলেন কি কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারা যায় না, কোলা-ঞ্চের অবস্থান অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। তথাপি গ্রন্থকার অনুমান করেন যে পালবংশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে গৌড়ে ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন। তাহার মতে বল্লালসেনের রাজ্যকালের ৩৯০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৭২৯ খৃষ্টাব্দে আদিশূর বিদ্যমান ছিলেন। চতুর্ভুজের হরিচরিত কাব্য হইতে জানা যায় যে বরেন্দ্র-ভূমির করঞ্জ-গ্রামবাসী কাশ্যপ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ স্বর্ণরেখ, ধর্ম্মপালের নিকট হইতে একখানি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রন্থকারের মতে রাজেন্দ্র চোলের তীরুমলয় শিলা-লিপিতে যে ধর্ম্মপালের উল্লেখ আছে তিনিই স্বর্ণরেখকে গ্রাম দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তীরুমলয় শিলালিপিতে যে ধর্ম্মপালের নাম আছে তিনি দণ্ডভুক্তির রাজা এবং দণ্ডভুক্তি উড়িষ্যা ও দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং তিনি পালবংশীয় কি না এবং বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রামদান করিয়াছিলেন কি না তাহা এখনও অনিশ্চিত আছে।

আদিশূর ও জয়ন্তের একত্ব বিষয়ে রাজতরঙ্গিণী ও কুলশাস্ত্র অব-লম্বনে যে অপরূপ উপন্যাস ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রচারিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া এবং উক্ত কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণ করিয়া ঢাকার ঐতিহাস লেখক সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি-মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ঐতিহাসিক যুগে শূর রাজবংশের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ রামচরিতে রণশূরের উল্লেখ আছে এবং নবাবিষ্কৃত বিজয়সেনের তাম্রশাসনে বিজয়সেনের পত্নী বিলাস-দেবী শূরবংশের কন্যা বলিয়া পরিচিতা। সপ্তম অধ্যায়ে গ্রন্থকার পূর্ব্ব-বঙ্গের খড়্গ রাজবংশের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র অধ্যায়ের অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতের প্রতিবাদে পরিপূর্ণ। অধ্যায়ের শেষভাগে ঢাকার চিত্র-শালার প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের "কর্ম্মান্তপাল" শব্দের অদ্ভুত ব্যাখ্যার প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায় হইতে গৌড়বঙ্গের পাল রাজবংশের ইতিহাস আরব্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত পাল-রাজবংশের ইতিহাস রচনায় যে-সমস্ত উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে গ্রন্থকার তাহার অধিকাংশই সংগ্রহ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে গ্রন্থকার অসাবধানতাবশতঃ সুপ্রতিষ্ঠিত আধুনিক মতের পরিবর্ত্তে বহু পূর্ব্বে প্রচলিত অধুনা বিবর্জ্জিত মত গ্রহণ করিয়া গ্রন্থের মর্য্যাদা হানি করিয়াছেন। নালন্দায় গোপালদেবের নামাঙ্কিত যে দুইখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দ্বিতীয় গোপালদেবের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। নেপালে আবিষ্কৃত রামায়ণের একখানি পুঁথিতে গৌড়ধ্বজ উপাধিধারী গাঙ্গেয়দেব নামক জনৈক রাজার নাম আছে। এই পুঁথিখানি ১০৭৬ বিক্রম সম্বৎসরে অর্থাৎ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের মতানুসারে এই গাঙ্গেয়দেব চেদী-বংশীয় কর্ণদেবের

পিতা গাঙ্গেয়দেব হইতে পারেন না, কারণ "মগধ ও তেজাভুক্তি ডিঙ্গাইয়া চেদীরাজের পক্ষে মিথিলায় কল্যাণবিজয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে।" এইজন্য চন্দ মহাশয় ও ঢাকার ইতিহাস-লেখক অনুমান করেন যে "এই সোম-বংশীয় গাঙ্গেয়দেব হয়ত মিথিলার একজন সামন্ত নরপাল ছিলেন।" কর্ণদেবের পিতা চেদী-বংশীয় গাঙ্গেয়দেব যে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয়পাদে বিদ্যমান ছিলেন, কাশী তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল এবং কাশী হইতে মিথিলা জয় অতি সহজ, এই-সকল কথা বোধ হয় গৌড়রাজমালার এবং ঢাকার ইতিহাসের রচয়িতার স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই। গাঙ্গেয়দেব বোধ হয় গৌড়রাজকে পরাজিত করিয়া গৌড়রাজ্য অধিকার না করিয়াই গৌড়ধ্বজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বহুকাল যাবৎ ফরাশী দেশের অধিপতিগণ ইংলণ্ডের কণামাত্র ভূমির অধিকারী না হইয়াও ইংলণ্ডরাজ উপাধি ব্যবহার করিতেন। ঢাকার ইতিহাসে সপ্তম অধ্যায়ে পালরাজবংশের যে বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা এই-সকল সামান্য ত্রুটিসত্ত্বেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে বলিতে পারা যায়। গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে পূর্ব্ববঙ্গের চন্দ্র-রাজবংশের ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক প্রত্নলিপিতত্ত্বের অজ্ঞতাবশতঃ চন্দ্রবংশীয় রাজগণকে বর্ম্মবংশীয় রাজগণের পরবর্ত্তী বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। ঢাকার ইতিহাস রচয়িতা বাঙ্গালার সাহিত্যিক-গুণ্ডার ভয় উপেক্ষা করিয়া বসাক মহাশয়ের ভ্রান্তমত পরিত্যাগ করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে বর্ম্মবংশের ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে হরিবর্ম্মার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাধাগোবিন্দ বসাক ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মত পরিত্যাগ করিয়া, প্রবীণ সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতাবলম্বন করিয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় যে সত্যানুসন্ধিৎসার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা দেশে বিরল। গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে সেনরাজবংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ পাল-রাজবংশের ইতিহাসের ন্যায় দশম অধ্যায়ও সুলিখিত এবং তথ্যপূর্ণ। এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার বহুবার আমার নামোল্লেখ করিয়া এবং আমার মত গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সেন-রাজবংশের বিবরণের ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের ঐকান্তিক ইতিহাসানুরাগ, সত্যনিষ্ঠা, অসাধারণ অধ্যবসায় ও অসামান্য পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। একাদশ অধ্যায়ে পূর্ব্ববঙ্গের সেনরাজগণের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং সাভার, ধামরাই এবং ভাওয়ালের স্বাধীন ভূস্বামিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে গ্রন্থকার শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সমতট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রমাণাভাবে এই দুইটি বিষয়ের আলোচনা অত্যন্ত জটিল এবং বহু নূতন প্রমাণ আবিষ্কার ব্যতীত এই দুইটি বিষয়ের চরম মীমাংসা সম্ভব নহে। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম করিয়া এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে অদ্যাবধি যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা একত্র লিপিবদ্ধ করিয়া ঐতিহাসিক-মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গ্রন্থকার বিক্রমপুরের অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। নদীয়া জেলার বিক্রমপুর যে কোনকালে রাঢ় দেশে অবস্থিত ছিল না এবং উহা যে চন্দ্র, বর্ম্ম ও সেন বংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনসমূহে উল্লিখিত বিক্রমপুর হইতে পারে না তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি ভূমিষ্ঠ হইয়াই তনুত্যাগ করিয়াছে, অতএব ঢাকা জেলার বিক্রমপুর আলাদিনের দৈত্যের সাহায্যে এক রাত্রিতে নদীয়া জেলায় উঠাইয়া আনার প্রয়োজনও অন্তর্হিত হইয়াছে, সুতরাং এ বিষয়ের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রণীত ঢাকার ইতিহাস মাত্র ঢাকা বা পূর্ব্ববঙ্গের ইতিহাস নহে, ইহা সমগ্র গৌড়বঙ্গের সম্পূর্ণ ইতিহাস; ভরসা করি ইহা বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিরাজ করিয়া সতত সম্মান লাভ করিবে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্মৃতির সৌরভ

চারের পরিচ্ছেদ।

ক্যাটেরিনার ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মাসতিনেক পরে শরতের শেষে শেভারেল-প্রাসাদের চিমনীতে চিমনীতে আবার ধোঁয়া উঠিতে লাগিল। দুই বৎসর পরে কর্ত্তা ও গৃহিণী ফিরিয়া আসিবেন; ঝি-চাকরদের মহলে তাই মহা হুলস্থূল। মিঃ ওয়ারেনকে গাড়ীর ভিতর হইতে একটি কালোচোখী ছোট মেয়েকে নামাইতে দেখিয়া বাড়ীর ভাঁড়ারী বেলামীগিন্নি ত' বেজায় অবাক্। বেলামীগিন্নির ঘরে সেদিন সন্ধ্যায় আসর জমিয়া উঠিল, মিসেস শার্প আজ আপনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার গর্ব্বে ভরপুর। কত রং ফলাইয়া, হাজার-রকম মন্তব্য করিয়া সে দলের আর-সকলকে ক্যাটেরিনার ইতিহাস বলিতে বসিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের শীতে এই মনোরম ঘরখানায় সান্ধ্যসভা বসাইতে বোধহয় সকলেরই লোভ হয়। চিমনীর আগুনের কাছে একখানা টেবিল, তাহাকেই ঘিরিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সকলে বসিয়াছে। আগুনের মৃদু আলোকে তাহাদের পিছনে বেশ একটা আলো ও ছায়ার বিচিত্র নক্সা তৈরি হইয়াছে। ঘরে একখানা ওককাঠের লম্বা টেবিল আর অনেকগুলি আলমারী, তাহার ভিতর হরেক-রকমের আচার ও মোরব্বা। দুই-একখানা ছবিও পথ ভুলিয়া কেমন করিয়া উপর হইতে নীচে চলিয়া আসিয়াছে।

বাগানের মালী মিঃ বেট্‌স্‌ প্রায়ই বেলামীগিন্নির ঘরে সন্ধ্যায় আতিথ্যের ভিখারী হইয়া আসিত। ছোট দ্বীপের মাঝখানে তাহার যে ছোট খোড়ো ঘরটি ছিল, সেখানকার শূন্য চেয়ারখানায় বসিয়া একলা একলা সন্ধ্যাগুলি কাটাইতে এই প্রৌঢ় কুমারটির বেশী ভাল লাগিত না। তাহার চাইতে এই সজনতার আনন্দ গল্পগুজব খাওয়া-দাওয়া অনেক ভাল। সেই নির্জ্জন কুঁড়েখানায় এক দাঁড়কাকের

ডাক আর বুনো হাঁসের চীৎকার ছাড়া আর কোনো শব্দই পৌঁছায় না। শব্দগুলি কবিদের পক্ষে ভাল বটে, তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক নয়।

মিঃ বেট্‌সের চেহারাটা নেহাৎ সাধারণ মানুষের মতন নয়, বিশেষভাবে চোখে পড়িবারই মতন। লোকটি বেশ সবল, বয়স প্রায় চল্লিশ। প্রকৃতি-দেবী বোধ হয় তাহাকে রং করিবার সময় বড় ব্যস্ত ছিলেন। তাই রঙের ছোপ ঠিক-মতন দিতে ভুলিয়া গিয়া গলার উপর দিক থেকে মুখের সবটাই এক-রকম লাল রঙে রঙাইয়া দিয়াছিলেন। দূর থেকে তাহাকে দেখিবার সময় ঠোঁট জোড়াটা নাক থেকে চিবুকের মধ্যে যে-কোন জায়গাতেই কল্পনা করিয়া নেওয়া যায়। কাছে আসিলে দেখা যায় ঠোঁটের গড়নটা একটু নূতন ধরণের। তাহার ভাষার সঙ্গে বোধ হয় ঠোঁটের গড়নের কিছু সম্পর্ক আছে; সেটা প্রাদেশিক ভাষা নয়, একেবারে ব্যক্তিগত। সাধারণের সঙ্গে তাহার আর-একটা অমিল ছিল; সেটা চোখে। চোখ দুটো সারাক্ষণই মিট্‌মিট্ করে। মাথাটা সামনের দিকেই ঝুলিয়া থাকে, চলিবার সময় আবার ঘাড়টি বেশ দোলে। প্রায়ই দেখা যায় যে পেটুক লোকগুলোই প্রায় রোগা হয় আর মিতাচারী লোকেরা হয় লালমুখো। তাই মিঃ বেটসের মাতলামির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকিলেও মুখখানা ছিল লাল টকটকে।

শার্পগিন্নির গল্প শেষ হইলে মিঃ বেট্‌স বলিয়া উঠিল "ধুত্তোর! স্যর ক্রিষ্টফার কি ঠাকরুণ যে কোনোদিন এমন কাজ করবেন তা' আমি স্বপ্নেও ভাবিনি; একটা কোন্ বিদেশের মেয়েকে কিনা দেশে এনে তোলা! বেঁচে বর্ত্তে দেখ্‌তে পাব কি না জানি না, তবে এর ফল যে ভাল হবে না সে আমি লিখে দিতে পারি। এই বলি শোন, প্রথম আমি যেখানে কাজ কর্‌তাম, সে এক সেকেলে মঠ, তার মস্ত বড় বাগান, নাশপাতি কুল কত কিছুই আছে। অমন বাগান বোধ হয় কেউ কখনো দ্যাখেনি। সে বাড়ীতে একটা ফরাসী খানসামা ছিল, লোকটা যাতে হাত দিত তাই চুরি করত,—রেশমী মোজা, শার্ট, সোনার আংটি কিছু আর বাকি রাখেনি। শেষে একদিন গিন্নির গয়নার বাক্স নিয়ে পিট্‌টান। ও বিদেশী লোকগুলো বাপু সব এক-ছাঁচের। ওদের রক্তেই পাপ মেশান।"

শার্পগিন্নির ধরণটা আজ বেজায় উদারের মতন। তবে উদারতাটা সীমা ছাড়াইয়া যায় নাই। সে বলিল "এই বলি শোন, অবিশ্যি আমি ওদের ওকালতী কচ্ছি না। ওরা যে কি তা' আমি কারুর চাইতে কিছু কম জানি না। ওরা ধর্ম্মকর্ম্মের ধার ধারে না, সে কথা ত' একশ' বার বল্‌ছি; খাবার যা খায় দেখ্‌লে লোকের বমি ঠেলে আসে। তা' সে হাজারই হোক্ না কেন,—তার উপর আবার দেখা শোনা ধোয়া মোছার ভারও ত' সারাটা পথ আমারই উপর ছিল...তবু বাপু আমার ত' মনে হয় কত্তাগিন্নি যা করেছেন তা' ভাল বই মন্দ করেননি। আহা বেচারা নেহাৎ শিশু, এখনো ডান-হাত বাঁ-হাতও চেনে না; দেশে এনে ত' ভালই করেছেন; ভদ্রলোকের মতো কথা-বার্ত্তা শিখ্‌বে; ধর্ম্মের আব-হাওয়ায় মানুষ হবে। ও-দেশের গির্জ্জা নয়ত —পাপ-মন্দির। যে-সব মূর্ত্তির বাহার, গায়ে একখানা কাপড়ও নেই, ভেতরে ঢুকলেও পাপ হয়। স্যর ক্রিষ্টফার আবার ওই গির্জ্জা দেখেই পাগল?"

মালীকে ক্ষ্যাপাইতে মিঃ ওয়ারেন খুব ভালবাসিত, সে বলিয়া উঠিল, "ওহে, শোন, শোন, তোমাদের এখানে ত' আরো বিদেশী আস্‌ছে। বাড়ীতে কি সব বদ্‌লাবার জন্যে স্যর ক্রিষ্টফার ইটালীর কারিগর আনছেন।"

বেলামীগিন্নি চীৎকার করিয়া বলিল, "বদলাবার জন্যে? কিসের বদল?"

মিঃ ওয়ারেন বলিল, "কেন! যা দেখ্‌ছি তাতে ত' মনে হচ্ছে ক্রিষ্টফার বাড়ীখানাকে ভেতর বার একেবারে আগাগোড়া নূতন করে ফেলবেন। বাড়ীর জন্যে তাড়াতাড়া নক্‌সা আর ছবি আস্‌ছে। গথিক ধরণে পাথর দিয়ে সব তৈরি হবে। ওই গির্জ্জে-টির্জ্জের মতোই একটা কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে। আর বাড়ীর ছাদ যা হবে এদেশে কেউ অমন চোখেও দ্যাখেনি। ওই-সব চিন্তাতেই ত' কর্ত্তার দিন কাট্‌ছে।"

বেলামীগিন্নি বলিল, "আ কপাল, তাই নাকি! তবেই ত' গেছি; বাড়ী ঘর দোর সব চুন-বালিতে একাকার হবে; রাজ্যের মিস্ত্রী ছুতোর মিলে ঝি-ছুঁড়ীদের পেছনে লেগে অতিষ্ঠ করে তুলবে।"

মিঃ বেট্‌স বলিল, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক, বেলামী-

গিন্নি, ও হবেই। তবে গথিক ধরণটাকে সুন্দর না বলে উপায় নেই। মিস্ত্রীগুলো যে বাপু কি করে অমন পাথর খোদাই করে' আনারস গোলাপ সব ফুটিয়ে তোলে আমি ত' ভেবেই পাই না। যা দেখ্‌ছি, জমিদার মশায় বাড়ী-খানাকে খাসা বানিয়ে তুলবেন। এ বাড়ীর মতো বাড়ী বোধ হয় দেশে প্রায় কারুরই মিলবে না। যেমন বাগান তেমনি ময়দান, তেমনি ফলের গাছ; রাজা জজ্জও পেলে ধন্য হয়ে যান।"

মিসেস বেলামী বলিল, "গথিকই বল আর যাই বল বাপু, বাড়ীটা যা আছে তার চাইতে ভাল যে কি হতে পারে তা' ত বুঝি না। এই ত' চোদ্দ বছর হতে চল এ বাড়ীতে আচার মোরব্বা করে কাটাচ্ছি। তা যাক্‌, কর্ত্তা কি বলেন?"

মিঃ বেলামীর সমালোচনার এই ধরণটায় আপত্তি ছিল; সে বলিল, "গিন্নির ওটুকু বুদ্ধি আছে, তিনি স্যর ক্রিষ্টফারের সখে কি কাজে হাত দিতে যান না। কর্ত্তার যা ভাল লাগবে তা' তিনি করবেনই তা' জেনে রেখো। করবার কথাও বটে। ভদ্রলোকের ছেলে, হাতে পয়সা আছে, কেনই বা পেছ-পা হতে যাবেন। এস, এস, মিঃ বেটস, গেলাসটা ভরে নাও, কর্ত্তা গিন্নির মঙ্গল ইচ্ছা করে, তাঁদের সম্মানে পান করতে হবে। তারপর তুমি একটা গান গাইবে এখন। স্যর ক্রিষ্টফার ত' আর রোজ ইটালী থেকে বাড়ী ফেরেন না। আজকের দিনটা কিছু করতে হয়।"

গৃহস্বামীর বাড়ী আসা উপলক্ষে তাহাদের কর্ত্তব্যটা সকলেই স্বীকার করিল। মিঃ বেটসের গান করাটাও যে একটা দরকারী কাজ এমন কথা কেউ মনে করিল না; কাজেই সে রাজি হইল না। মিসেস শার্পের মতে মিঃ বেটসের মতো রং আর বুদ্ধি দেখলে যে-কোনো মেয়েমানুষ তাকে লুফে নেয়। তবে সে নিজে অবশ্য তাহাকে বিবাহ করিবার কোনো কল্পনাও করে নাই। আজ গান গাহিতে আপত্তি করায় শার্পগিন্নি মালীকে গাহিবার জন্য জেদাজেদি সুরু করিল। "এস, এস, মিঃ বেটস্‌, 'রায়-গিন্নির' সেই গানটা একবার কর। ইটালীর সব বাহারে গানের চাইতে আমাদের এই পুরোনো গানটি শুন্‌তে আমার হাজারগুণে ভাল লাগে।"

এত উপরোধ অনুরোধ আর খোসামোদে মিঃ বেটস ত বেজায় খুসী। বুকের উপর দিয়া হাত দুখানা আড়াআড়ি করিয়া বুড়ো আঙুল দুটা ওয়েষ্ট-কোটের হাতের মধ্যে পুরিয়া সে চেয়ারে ঠেস দিয়া মাথাটা হেলাইয়া চোখ দুটা আকাশ পানে তুলিয়া ভাল হইয়া বসিল। এইবার গানের পালা। প্রত্যেকটা সুরে ঝুঁকি দিয়া দিয়া গান সুরু হইল। গানের একটা পদই যে কতবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছিল তাহার ঠিকানা নাই; কিন্তু বর্ত্তমান শ্রোতাদের কাছে এইটাই গানের বিশেষগুণ; ইহাতেই তাহাদের ধুয়াটা জমাইয়া তুলিবার সুবিধা হইতেছিল। গানের নায়িকা যে তাহার স্বামীকে ঠকাইয়াছিল এইটুকুই তাহারা এতক্ষণে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল; কিন্তু ঠকানটা শাক-সবজি সম্বন্ধে কি আর কিছু জিনিস লইয়া তাহা না জানাতেও তাহাদের আনন্দের বিশেষ কিছু ব্যাঘাত হইতেছিল না। গানের প্রতি-পদের শেষে নায়িকার নামটাই বা কেন অত-বার করিয়া উল্লেখ করা হইতেছিল সে মধুর রহস্যটুকু ভেদ করারও তাহারা কোন দরকার বোধ করে নাই।

সেদিনকার সন্ধ্যার আড্ডাটা মিঃ বেট্‌সের গানেই সব-চেয়ে ভাল-রকম জমিয়াছিল। তাহার পর যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। বেলামীগিন্নি বোধ হয় স্বপ্নে দেখিতে লাগিল যে চূন সুরকিতে তাহার বাসন-কোসন সব ছারখার হইয়া গেল আর বাড়ীর যত ছুঁড়ী ঝিগুলা ঘরের ঝাঁটপাট ভুলিয়া গিয়া মিস্ত্রীদের প্রেমে পাগল হইয়া উঠিল। মিসেস শার্পের চিন্তাটা আর-এক ধরণের। সে বোধ হয় ভাবিতে-ছিল মিঃ বেট্‌সের ছোট কুঁড়েখানায় দুটিতে ঘর-সংসার পাতাইয়া ঘরণী গিন্নি সাজিয়া বসিলে দিব্যি হয়। সেখানে ঠাকরুণের ঘরের ঘণ্টা শুনিয়া ছুটিতেও হইবে না, ফল-পাকুড়ও অজস্র ভোগ করা যাইবে।

ক্যাটেরিনা নিজের গুণে শীঘ্রই তাহার বিদেশী রক্তের অসংখ্য দোষগুলিকে ভুলাইয়া দিল। অমন অসহায় শিশুর আধ-আধ বুলি শুনিলে কে না ভুলিয়া যায়! সংসারের ঝি-চাকর হইতে কর্ত্তা গিন্নি অবধি কাহারও কাছে তাহার আদরের আর সীমা নাই। ক্রিষ্টফারের প্রিয় ডালকুত্তা, মিসেস বেলামীর একজোড়া ক্যানারী পাখী, মিঃ বেট্‌সের মস্ত বড় মুরগীটা,—সব কটাকে পিছনে ঠেলিয়া ফেলিয়া টিনাই

আজ সর্ব্বেসর্ব্বা। ইহার ফলে গ্রীষ্মের একটি মাত্র দীর্ঘ দিনে তাহার হাজার-রকম নূতন অভিজ্ঞতা হইয়া গেল। মিসেস্ শার্পের মিঠে-কড়া শাসন, লেডি শেভারেলের জমকালো ঘরের শোভা দর্শন, স্যর ক্রিষ্টফারের পায়ে চড়িয়া ঘোড়া-ঘোড়া খেলা, তাঁহার সঙ্গে আসল ঘোড়ার আস্তাবলে ভ্রমণ, কোনটাই বাদ পড়িল না। এখানে শিকলে বাঁধা ডালকুত্তার ডাক শুনিয়া আজ টিনা প্রথম না কাঁদিয়া বারের মতন স্যর ক্রিষ্টফারের পা জড়াইয়া বলিতে সুরু করিল, "ওরা টিনাকে কাম্ড়াবে না।" মিসেস্ বেলামী বাগান হইতে পাতা-সুদ্ধ গোলাপ-ফুল তুলিয়া আনিবার সময় টিনার জামার আঁচলে এক গোছা দেওয়াতে তাহার গন্ধ আর আনন্দ আর ধরে না। মস্ত একখানা চাদরের উপর গোলাপ-ফুল শুকাইতে দেওয়া হইল, টিনা যখন তাহার উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল আর তাহার মাথার উপর দিয়া ঝরঝর করিয়া আরো ফুল ঢালা হইতে লাগিল তখন ত' সে আনন্দে দিশাহারা! মিঃ বেট্সের সঙ্গে সঙ্গে খুটখুট্ করিয়া খিড়কীর সব্জি-বাগানে আর কাচঘেরা সখের বাগানে বেড়ানো ছিল টিনার আর একটা আমোদ। থোকা থোকা সবুজ আর কালো আঙুর চালের উপর হইতে ঝুলিয়া থাকিত, টিনার ছোট হাতখানি বাড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সে যে তাহার নাগালের অনেক উপরে! ছোট হাতখানির আশা মিটাইবার জন্য শেষকালে একটি মিষ্ট ফল কি সুগন্ধি ফুল আসিয়া জুটিত। পাড়াগাঁয়ের সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর লোকজনদের দীর্ঘ অবসর। সারাদিনই একজন-না একজন টিনাকে লইয়া খেলিতে ব্যস্ত। এমনি করিয়া দক্ষিণ দেশীয়া ছোট পাখীটির উত্তর দেশের বাসাটি আদরে সোহাগে ভরিয়া উঠিল। স্নেহময় ও অভিমানী স্বভাবের শিশুরা যদি এত আদরে মানুষ হয় তবে সামান্য একটি আঁচড় সহ্য করাও তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে, তুচ্ছ ঘটনাও তাহাদের মনে বড় কঠিন হইয়া লাগে। কাহারও শাসন কি শিক্ষার ভিতর একটু কর্কশভাব কি স্নেহের অভাব দেখিলেই টিনা একেবারে ক্ষেপিয়া আগুন! তাহাকে তখন কথা শুনায় কাহার সাধ্য। সব বিষয়েই সে শিশুর মতন ছিল, কিন্তু তাহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিটা অতটুকু মেয়েকে মোটেই মানাইত না। সে যখন পাঁচ বৎসরের মেয়ে তখন একবার মিসেস্ শার্পের কি একটা আজ্ঞা তাহার পছন্দসই হয় নাই। সেই রাগের শোধ তুলিবার জন্য সে এক-দোয়াত কালি লইয়া ধাইমার সেলাইয়ের বাক্সে ঢালিয়া দেয়। আর একদিন সে আদর করিয়া নিজের পুতুলটার রং-করা মুখ চাটিতেছিল, লেডি শেভারেল দেখিতে পাইয়া পুতুলটা কাড়িয়া নেন; দুষ্টু মেয়ে অমনি চট করিয়া একটা চেয়ারে চড়িয়া দেয়ালের তাকের একটা ফুলদানি ছুড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। জীবনে বোধ হয় এই একটি দিন রাগের মাথায় সে লেডি শেভারেলের ভয়ও ভুলিয়া গিয়াছিল। ইঁহার দয়া চিরকালই দেবতার কৃপার মতন উপর হইতে ঝরিয়া পড়িত, কখনও মায়ের স্নেহের মতন আদরে সোহাগে নত হইয়া ধরা দিত না। তাঁহার মঙ্গল-ইচ্ছার অভাব কোন-দিন ঘটে নাই, কিন্তু প্রেমের মধুর মূর্ত্তিতে তাহার বিকাশও কোন দিন হয় নাই। তাই টিনা তাঁহাকে দূর হইতে দেবতার প্রাপ্য শ্রদ্ধা-ভক্তি দিয়াছে; আর-বেশী কিছু দিতেও পারে নাই, দানের বেশী কিছু লইতেও সাহস করে নাই।

শেভারেল-প্রাসাদের একঘেয়ে দিনগুলির সুখশান্তি শীঘ্রই ভাঙিয়া গেল। বাগানের রাস্তাগুলি দিয়া অহরহ পাথর বোঝাই গাড়ী চলিতে চলিতে রাস্তায় চাকার দাগে টানা লম্বা লম্বা গর্ত্ত হইয়া গেল। সবুজ উঠানের শ্রী চুনবালিতে একেবারেই লোপ পাইল, আর সেই নিস্তব্ধ শান্তিময় বাড়ীটিতে রাজমিস্ত্রী আর ছুতোর মিস্ত্রীর অবিশ্রাম ঠকঠকানি ধ্বনিত হইতে লাগিল। ইহার পর দশ বৎসর ধরিয়া স্যর ক্রিষ্টফার বাড়ীর চেহারা বদলান ব্যাপারেই ব্যস্ত হইয়া রহিলেন। পুরানো ধরন ভাঙিয়া-চুরিয়া গথিক ধরণে গড়িয়া তোলাই এখন তাঁহার কাজ হইয়া দাঁড়াইল। ওই এক ধ্যানেই তিনি মগ্ন। আশেপাশের শিকার-প্রিয় বড়-মানুষরা সম্ভ্রান্ত ইংরেজ-বংশের ছেলের এমন অপূর্ব্ব খেয়াল দেখিয়া কত যে নাক সিঁটকাইল তাহার ঠিক নাই। জমিদারের ছেলে কিনা শেষকালে মাত্র তিনটা ঘোড়া রাখিল, আর ভাঁড়ারের সিন্দুকে শক্ত চাবি লাগাইল। টাকা বাঁচাইয়া বাড়ীর রূপ ফেরানো হইবে; হায়রে কপাল! ইঁহাদের গৃহিণীরা ভাঁড়ার ও আস্তাবলের খবরে বিশেষ কিছু মন্দ দেখিতে পান নাই, তবে বেচারী লেডি শেভারেলকে যে

মাত্র তিনখানা ঘর লইয়া সারাদিন ঠক্‌ঠকানি আর রঙের গন্ধের মধ্যে থাকিতে হইবে এই বড় দুঃখ। শরীরটা যে একেবারে যাইবে! এ যেন ঠিক হেঁপোকেশো স্বামী লইয়া ঘর করা। স্যর ক্রিষ্টফার গিন্নির জন্য বাথে একখানা বাড়ী ভাড়া করিলেই ত পারিতেন। নেহাৎ যদি মজুর খাটাইবার জন্য দূরে যাইতে না পারেন কাছাকাছিও ত' একটা আলাদা বাড়ীর ব্যবস্থা করা যাইত? প্রতিবেশিনীদের এত দয়া একেবারেই অযাচিত দান। অজস্র করুণা চিরকালই আপনি আসিয়া পড়ে। স্বামীর এই-সকল স্থাপত্য-প্রীতির সঙ্গে যদিও লেডি শেভারেলের কোনো সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার মতামত খুব কড়া ছিল। স্যর ক্রিষ্টফারের প্রতি শ্রদ্ধাও তাঁহার এত প্রগাঢ় যে তাঁহার আনুগত্যকে তিনি কোনোদিন কষ্টকর মনে করেন নাই। আর জমিদার মহাশয় স্বয়ং ত' সমালোচনার ধারও ধারিতেন না। তাঁহার প্রতিবেশীরা বলিত, "বাবা, লোকটা যা হোক খেয়ালী আর একগুঁয়ে।" এত দীর্ঘকাল ধরিয়া একমনে শিল্পীর মতন একনিষ্ঠভাবে খাটিয়া তিনি যে এই স্থাপত্য-শিল্পটি রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাই প্রকাশ পায়। ঘরগুলির ভিতর ঘুরিলে তাহাদের শিল্প-সম্পদ ও আসবাবের দীনতা একসঙ্গেই চোখে পড়ে। তিনি যে আপনার আরাম ভুলিয়া হাতের সমস্ত অর্থ কিসে খরচ করিতেন তাহা সহজেই বোঝা যায়। এই বৃদ্ধ ইংরেজ জমিদারটির অন্তরে যে মহাপ্রাণের একটি অংশ ছিল তাহা দ্বারা তিনি প্রকৃত শিল্প ও বিলাসিতার প্রভেদ বুঝিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যকে তিনি ভক্ত উপাসকের মত পূজা করিতেন, সম্ভোগ করিতেন না।

শেভারেল-প্রাসাদের রূপহীন অঙ্গে শিল্পীর মোহন স্পর্শে দিনে দিনে রূপের মাধুরী ফুটিয়া উঠিতেছিল, সঙ্গে-সঙ্গে সেই খুকী টিনার ফ্যাকাশে রংও দিনে দিনে কৈশোরের লাবণ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষ কিছু সৌন্দর্য্য অবশ্য তাহার ছিল না, কেবল ছিল দেহে হাল্কা হাওয়ার মতন একটা সুন্দর মাধুর্য্য ও বড় বড় কালো চোখ দুটিতে একটা গভীর দৃষ্টি। আর ছিল তাহার ভুবনমোহন স্বর। সে করুণ কোমল স্বর যেন পাপিয়ার প্রেমগান। এই সৌন্দর্য্যেই তাহাকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাসাদের সৌন্দর্য্য যেমন কাহারও হাতের সযত্ন কারুকার্য্যে গড়িয়া উঠিতেছিল, টিনা কিন্তু তেমন ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। সে প্রিমরোজ ফুলের মতন আপনি ফুটিয়া উঠিতে-ছিল; বাগানের মধ্যে সেই ফুলটিকে দেখিয়া মালী দুঃখিত মোটেই হয় না, কিন্তু তাহার জন্য সে কোনো চেষ্টাও করে না। লেডি শেভারেল তাহাকে লিখিতে পড়িতে ও নীতি-মালা বলিতে শিখাইয়াছিলেন। মিঃ ওয়ারেন হিসাবে খুব পটু; গৃহিণীর আজ্ঞামত সে টিনাকে অঙ্ক শিখাইত। আর মিসেস শার্প শেলাইয়ের সকল রহস্যই তাহার কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত, টিনাকে ইহার বেশী কিছু শিক্ষা দিবার কথা কেহ ভাবে নাই। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বোধ হয় টিনা পৃথিবীটাকে স্থির জানিয়া গিয়াছে; চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারাগুলিই পৃথিবীর চারি-দিকে ঘোরে এই বোধ হয় তাহার ধারণা ছিল। তবে বলিতে কি, ইহাতে বোধ হয় বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। হেলেন, ডাইডো, ডেসডিমোনা, জুলিয়েট এঁদের সকলেরই বোধহয় ভূগোল জ্ঞান এমনি সুন্দর ছিল। এই সামান্য কারণে আপনারা নিশ্চয়ই টিনাকে নায়িকা হইবার অনুপযুক্ত মনে করিবেন না। মোট কথা, একটা বিষয় ছাড়িয়া দিলে বলিতে হয় যে টিনার এক ভালবাসিবার শক্তিটুকুই কেবল ছিল; এই ক্ষমতায় জ্যোতিষবিদ্যায় সকলের চেয়ে পণ্ডিতা রমণীও তাহাকে হারাইতে পারিতেন না। অনাথা আশ্রিতা বালিকা হইলেও তাহার এ শক্তি শেভারেল-প্রাসাদে খুব কাজে লাগিয়াছিল; ধনীর গৃহের অনেক খোকা খুকুর আত্মীয় কুটুম্বও থাকে, ধন দৌলতও থাকে, কিন্তু টিনার মতন এত অফুরন্ত ভালবাসার পাত্র কাহারো দেখা যায় না। খুকী টিনার ছোট হৃদয়খানির মধ্যে প্রথম স্থানটা বোধ হয় স্যর ক্রিষ্টফারই দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, কারণ ছোট মেয়েদের স্বভাবই এই-রকম যে হাতের কাছে সকলের চেয়ে সুন্দর যে ভদ্রলোককে পায় তাঁহাকেই প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া বসে। তাহার উপর ইনি আবার শাসন-টাসনের ধার ধারিতেন না। ডরকাস নামে একটি হাসিখুসী তরুণী টিনার ধাত্রীর কাজে সাহায্য করিত। তাহার গাল দুটি ছিল ঠিক দুটি ফুটন্ত গোলাপের মতন। ঔষধের সঙ্গে কিসমিসের মতন এই মেয়েটি টিনার কাছে মিসেস্ শার্পের

সঙ্গটাও খানিকটা মধুর করিয়া রাখিয়াছিল। টিনা ইহাকে প্রায় স্যর ক্রিষ্টফারের সমানই ভালবাসিত। মেয়েটি যেদিন কোচম্যানকে বিবাহ করিয়া মস্ত একজন ভারিক্কী লোকের মতন স্বামীর সঙ্গে দূরে এক কোলাহলময় সহরে গিন্নিবান্নি সাজিয়া চলিয়া গেল, সেদিন টিনার পক্ষে বড় ভীষণ দুর্দ্দিন। সেখান হইতে ডরকাস টিনাকে একটি চীনা-বাক্স পাঠাইয়া দিয়াছিল। এই স্মৃতিচিহ্নটির উপর লেখা ছিল, "তুমি আমার চোখের আড়ালে গিয়েছ বটে, কিন্তু তোমার মধুর স্মৃতিটি আমার মনে চির জাগরুক।" দশ বৎসর পরেও টিনার ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে এই ধনটি ছিল।

টিনার দ্বিতীয় ক্ষমতাটি যে কি তাহা বোধহয় সকলেই বুঝিয়াছেন। সেটি সুকণ্ঠের মাধুরী। টিনার আশ্চর্য্য সুরবোধ ও অতি সুন্দর গলার স্বর যেদিন ধরা পড়িল, সেদিন স্যর ক্রিষ্টফার ও তাঁহার গৃহিণী দু'জনেরই আনন্দ আর ধরে না। তাহার সঙ্গীত শিক্ষার দিকে তখনই তাঁহাদের নজর পড়িল। লেডি শেভারেল টিনার শিক্ষায় অনেক সময় দিতে লাগিলেন। টিনা এত তাড়াতাড়ি সব শিখিয়া ফেলিতে লাগিল যে অগত্যা কয়েক বৎসরের জন্য এক ইটালীয় শিক্ষককে তাহার গুরুর পদ দেওয়া হইল। তাহার এই প্রতিভার অপ্রত্যাশিত প্রকাশে টিনার সঙ্গে এ-বাড়ীর সম্পর্কটার যেন একটু বদল হইয়া গেল। মেয়েরা যতদিন খুব ছোট থাকে ততদিন বিড়ালছানা কুকুরছানার মতন আদরে আদরেই বাড়িতে থাকে; কিন্তু তাহার পর একটা সময় আসে, যখন তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ভাবনাই লোকের মনে আসে না; বিশেষত, টিনার মতন যদি রূপগুণ কি বুদ্ধির কোনো পরিচয়ই না পাওয়া যায় তাহা হইলে ত কথাই নাই। জীবনের এই অবস্থাটায় লোকে যদি তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু না ভাবে তবে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। টিনা যখন বড় হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন দেখা গেল সে কোনো বিশেষ কাজে লাগিবারই যোগ্য নয়। কাজেই মিসেস শার্পের খুঁটিনাটি কাজ করিয়াই সে দিন কাটাইত। কিন্তু তাহার এই শক্তিটি আবিষ্কৃত হইবামাত্র সে লেডি শেভারেলের প্রিয় হইয়া উঠিল, তিনি জগতে সঙ্গীতই সকলের চেয়ে ভালবাসিতেন। কাজেই টিনা এখন ড্রয়িংরুমের আমোদ-আহ্লাদের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িল। আস্তে আস্তে আপনা-আপনিই সে পরিবারের একজনের স্থান জুড়িয়া বসিল। ঝি-চাকরেরা দেখিল সাটি-চহিতা শেষে পূরাদস্তুর মহিলা হইয়াই দাঁড়াইবে।

মিঃ বেটস বলিল, "তা এ ত হওয়াই উচিত। ও-মেয়ের কি আর খেটে খাবার মত চেহারা। আহা, কেমন ফুলের মত নরম মোলায়েম শরীরখানি। মানুষ নয়ত যেন পাপিয়া পাখীটি, ছোট শরীরটুকু গানে গানেই ভরে আছে!"

জীবনের এই অবস্থাটায় পৌছিবার অনেক আগেই কিন্তু টিনার জীবনে আর-এক নূতন যুগের সুরু হইয়াছিল। এতদিন তাহার সঙ্গীরা সকলেই ছিল বুড়-বড়; এইবার একটি তরুণ সাথীর আবির্ভাব হইল। টিনার বয়স তখন সাত বৎসর। এই সময় হইতে স্যর ক্রিষ্টফারের পালিত মেনার্ড গিলফিল নামের একটি পনের বৎসরের ছেলে ছুটির সময়টা শেভারেল-প্রাসাদে কাটাইতে লাগিল। টিনাই হইল তাহার মনের মতন খেলার সাথী। মেনার্ড ছেলেটি খুব স্নেহময়। শাদা খরগোষ, পোষা কাঠবিড়ালী, গিনিপিগ প্রভৃতির উপর তাহার খুব টান। একটু বড় বয়স পর্য্যন্তই তাহার এ-সব খেয়াল ছিল। সে-বয়সে সচরাচর তরুণ ভদ্রলোকেরা এসব খেলা নেহাৎ ছেলেমানুষী বলিয়াই ঘৃণাভরে সরাইয়া রাখে। মাছধরা, ছুতোরের কাজ করা, এসব দিকেও তাহার খুব ঝোঁক ছিল। ছুতোরের কাজটা সে দরকার বোধে মোটেই করিত না; শিল্পীর আনন্দের মতন ইহাতে তাহার একটা আনন্দ ছিল। এই-সকল খেলায় টিনাকে সঙ্গী পাইলে সে বড়ই খুসী। আদর করিয়া সে তাহাকে কত নামই দিত, তাহার যত অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরও সে যোগাইত। তাহার পিছনে সারাদিনই টিনা খুটখুট করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। মেনার্ডের বোধ হয় এত আনন্দ আর কিছুতে ছিল না। ছুটির পরে যেদিন খেলা সাঙ্গ করিয়া ইস্কুলে পড়িতে যাইবার পালা আসিত, সেদিনকার বিদায়-দৃশ্য দেখিবার মতন। একটানে সবকটা কথা মেনার্ড বলিয়া যাইত—

"টিনা, আমি আবার ফিরে আসবার আগে আমায় ভুলে যাবে না ত? আমরা যতগুলো চাবুকের দড়ি তৈরি করেছিলাম, সব তোমাকে দিয়ে গেলাম। হ্যাঁ; দেখো গিনি

যেন মরে না যায়। তবে এস আমায় একটি চুমু দিয়ে যাও, আমায় ভুলোনা কিন্তু।"

কতদিন কাটিয়া গেল, মেনার্ড ইস্কুল ছাড়িয়া কলেজে ঢুকিল, সেই রোগা পাতলা ছেলেটি ক্রমে বলিষ্ঠ যুবক হইয়া উঠিল। ছুটির দিনের সেই দুটি পুরানো সাথীর ভাবটা অবশ্য এখন একটু বদলাইয়া আসিতে লাগিল; কিন্তু ভাইবোনের নিঃসঙ্কোচ সহজ ভাবটা ঘুচিল না। মেনার্ডের ছেলেবেলার সে ভালবাসা এখন গভীর প্রেমে পরিণত হইয়াছে। প্রণয়ের যে-সকল নমুনা মিলে তাহার মধ্যে ছেলেবেলার সাথীদের ভালবাসা হইতে যাহার বিকাশ হয় সেইটিই বোধহয় সকলের চেয়ে দৃঢ় ও সকলের চেয়ে স্থায়ী। বহুদিনের স্নেহের বাঁধন যখন প্রণয়ের যোগে আরো দৃঢ় হইয়া উঠে, তখনি প্রেমের নদীতে জোয়ার আসিয়া কানায়-কানায় হৃদয় ভরিয়া তুলে। মেনার্ডের ভালবাসার ধরণ ছিল যেন। জগতের শ্রেষ্ঠ যাদুকরের শ্রেষ্ঠ দানেও সে আনন্দ পাইত না যদি সে আনন্দের ভাগী টিনা না হইতে পারিত। কিন্তু টিনা যদি তাহাকে অসহ্য উৎপাতে অস্থির করিয়া তুলিত, তাহাতেও তাহার কত সুখ! জগতের নিয়মই এই-রকম; সেকালের শ্যামসন থেকে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যত দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ দেখা গিয়াছে, সকলেরি প্রায় এই ধরণ। মেনার্ড যে তাহার একান্ত অনুগত সে-কথা টিনা ত খুব উত্তমরূপেই জানিত। এ জগতে ঐ একটি লোক ছিল যাহার সঙ্গে যেমন খুশী তেমনি ব্যবহার করিতে সে পারিত। মেনার্ডের সম্বন্ধে টিনার মনে যে কোনো বিশেষ ভাবের উদয় হয় নাই তাহার নির্ভীক নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারই সে-কথা ভালভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে; কারণ রমণীর মনে গাঢ় অনুরাগের সঙ্গেই কিসের যেন একটা ভয় আসিয়া জুটে।

টিনার মন মেনার্ড খুব ভাল করিয়াই বুঝিত; কোনো মিথ্যা ধারণার সাহায্যে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা সে একদিনও করে নাই। তবে তাহার আশা ছিল হয়ত এমন কোনো দিন আসিতেও পারে যেদিন টিনা তাহার ভালবাসাটুকু গ্রহণ করিতেও অন্তরে রাজি হইবে। তাই সে শান্তভাবে সেইদিনের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, যেদিন সাহস করিয়া সে বলিতে পারিবে, "টিনা, আমি তোমায় ভালবাসি!" একদল লোক আছে, তাহারা জগতে আসিয়া সারাজীবনের মধ্যে একদিনও নিজেদের লইয়া গোলমাল বাধাইয়া তুলে না। গায়ের জামার কাট, তরকারির সুগন্ধ, কি চাকরের সেলামের পরিমাণ, এ জিনিষগুলোকে তাহারা কোনদিনই বিশেষ উঁচু স্থান দেয় না। মেনার্ড এই দলের লোক। অল্পেই সে তুষ্ট। যে-দিন সে পারিবারিক পুরোহিতের কাজ লইয়া শেভারেল-প্রাসাদে বাসা বাঁধিল, সেদিন তাহার চোখে সকলি সুলক্ষণ। বেচারা অন্ধ-প্রেমিক ভালই দেখিতে চায়, তাই ভালই দেখে। নিজের অবস্থা নজীর ভাবিয়া সে সেদিন একটি ভুল মীমাংসা করিয়া বসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল স্নেহ ও অভ্যাসই বুঝি প্রেমের প্রশস্ত পথ। মেনার্ডকে পুরোহিতের পদ দিয়া স্যর ক্রিষ্টফারের অনেকগুলি সাধই মিটিয়াছিল। সেকালের বনিয়াদী বংশের এই অনাবশ্যক লেজুড়টির মোহ তিনি কাটাইতে পারেন নাই। তাঁহার পালিত এই যুবকটির সঙ্গও তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। মেনার্ডের কিছু পৈতৃক সম্পত্তিও ছিল; কাজেই যতদিন না পাশের গ্রামের পুরোহিতের পদটা খালি হয়, ততদিন শিকারের জন্য একটা ঘোড়া রাখিয়া আর দুইচারিটা কাজ করিয়া এই গৃহেই ত' তাহার বেশ স্বচ্ছন্দে দিন কাটানো চলিতে পারে। তাহার পর পাশের গ্রামে ঘরসংসার গুছাইয়া বসিলেই চলিবে। স্যর ক্রিষ্টফারের মাথায় অল্পদিনের মধ্যেই আর একটি খেয়াল ঢুকিল, "টিনা হবে সেই সংসারের গিন্নি!" যে সত্যটা জমিদার মহাশয়ের অপ্রিয় কি তাঁহার চোখে অশোভন সেটাকে তিনি সহজে ধরিতে পারেন না; কিন্তু তাঁহার কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের যেখানে মিল থাকে সেটা তিনি চট্ করিয়াই ধরিয়া ফেলেন; মেনার্ডের মনের কথাটা তিনি প্রথমেই আন্দাজ করিয়াছিলেন, পরে খোঁজ করিয়া একেবারে খাঁটি কথা জানিলেন। জানিবামাত্রই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন, টিনার মনের কথাও ওই-রকম, আর এখন যদি নাও হয় ত আর-একটু বড় হইলেই হইবে। তবে পাকাপাকি কোনো কথা বলা কি কাজ করার দিন আসিতে তখনও বেশ দেরী ছিল অবশ্য।

এদিকে এমনভাবে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল,

যাহাতে স্যর ক্রিষ্টফারের কল্পনাজল্পনা কি মতলবে কোনো ঘা না লাগিলেও মিঃ গিলফিলের আশা ক্রমে উদ্বেগ হইয়া দাঁড়াইল। ক্যাটেরিনার হৃদয়ে ঠাঁই পাইবার আশা ত' তাঁহার ঘুচিয়াই গেল, এমন কি দ্বিতীয় আর একজন যে সেটা জুড়িয়া বসিয়াছে একথা তিনি পরিষ্কার বুঝিলেন।

টিনা যখন খুব ছোট, তখন এ বাড়ীতে আর একটি বালককে দুই-একবার দেখা গিয়াছিল, ছেলেটি মেনার্ডের চেয়ে বয়সে ছোট। বেশ সুন্দর তাহার চেহারা, একমাথা কোঁকড়া চুল, ঝকৃঝকে পোষাক, সবই ভাল। এই ছেলেটিকে টিনা আড়াল হইতে মুগ্ধ হইয়া দেখিত। তাহার নাম অ্যান্টনি উইব্রো, সার ক্রিষ্টফারের ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী; ছেলেটি তাঁহার ছোট বোনের ছেলে। তাঁহার পরিবারের চিরকালের নিয়ম অনুসারে বড় বোনের ছেলেরই সম্পত্তি পাইবার কথা, কিন্তু সার ক্রিষ্টফার অনেক টাকা খরচ করিয়া এমন কি নিজের স্থাপত্য-কীর্ত্তির আর্থিক ক্ষতি করিয়া এই ছেলেটিকে উত্তরাধিকারী ঠিক করিয়াছেন। এই কারণে বড়বোনের সঙ্গে তাঁহার খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছিল। স্যর ক্রিষ্টফার ক্ষমা কাহাকে বলে জানিতেন না, কাজেই সে ঝগড়া আর মিটিল না। অ্যান্টনির মা মারা যাইবার পর এই গৃহই তাহারও গৃহ হইল। সে তখন আর বালক নয়, সৈনিক বিভাগের কাপ্তেন। এই সুন্দর সুদীর্ঘ তরুণ কাপ্তেন ছুটি পাইলেই এখানে আসিয়া থাকিত। ক্যাটেরিনার বয়স তখন ষোল সতের। পরে যে কি হইল সে কথা বলিয়া বৃথা বকিয়া আর কি লাভ? জগতে যে জিনিষটা সকলের চেয়ে স্বাভাবিক তাহার ব্যাখ্যা করার কোন দরকার দেখি না।

শেভারেল প্রাসাদে সঙ্গীর খুবই অভাব। টিনা না থাকিলে কাপ্তেন উইব্রোর দিন কাটা ভার হইয়া উঠিত। টিনার দিকে একটু মন দিতে তাহার বেশ লাগিত। টিনার সঙ্গে যখন সে কথা বলিত, তখন তাহার মিষ্ট মধুর কথাগুলি শুনিয়া টিনার রক্তহীন গাল দুটি মুহূর্ত্তের জন্য রাঙা হইয়া উঠিত, টিনা যখন গান করিত তখন তাহার পিয়ানোর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাপ্তেন উইব্রো তাহার গানের প্রশংসা করিলে সলজ্জ কালো চোখ দুটি তুলিয়া সে একবারটি তাহার দিকে চাহিয়া লইত। উইব্রোর ইহাই ছিল আনন্দ! মোটা-মোটা-পা-ওয়ালা ওই পুরোহিতটির জায়গা দখল করিয়া লইয়া তাহাকে পিছনে ঠেলিয়া দেওয়াটাও তাহার একটা নেহাৎ কম মজা ছিল না। নিষ্কর্ম্মা পুরুষ যদি কোনো রমণীকে মুগ্ধ করিবার সুবিধা পায় এবং সঙ্গে-সঙ্গে স্বজাতির একজনকে হীন করিয়া ফেলিতে পারে তবে আর সে বেচারা কি করিয়া লোভ সামলায়? আর তাহার নিজের মনে যদি কোনো কু-অভিপ্রায় না-ই থাকে, দু'চার দিন পরে সবই যদি সে ঠিকঠিক যথাস্থানে ফিরিতে দিবে ধারণা করিয়া থাকে, তবে ত' কথাই নাই। দেড় বৎসর ধরিয়া কাপ্তেন উইব্রো প্রায়ই এই বাড়ীতে দিন কাটাইতে লাগিল; শেষে একদিন বুঝিল তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যাপারটা ক্রমে এতখানি জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে এখন উল্টামুখে চলা শক্ত। মিষ্ট কথা ক্রমে স্নেহার্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহার ফলে যে মধুর দৃষ্টির বিনিময় হইয়া গিয়াছে, তাহা কখনো সেইখানেই থামিয়া যাইতে পারে না; কাজেই ক্রমে সেটা বাড়িতে বাড়িতে প্রণয়-নিবেদনে দাঁড়াইল। অমন সুন্দর যাহার কালো কালো চোখ, অমন মধুর যাহার কণ্ঠ, অমন কমনীয় যাহার চেহারা, যাহাকে তুচ্ছ করিবার কোনোই কারণ নাই, সেই তরুণী যদি সমস্ত হৃদয় কাহাকেও ঢালিয়া দেয় তবে ত' তাহার মনে একটা মধুর ভাবের উদয় হইবেই। তখন তাহাকে সামান্য একটু প্রতিদান না দেওয়াটাই কর্ত্তব্যের ত্রুটি বলিয়া মনে হয়।

কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে টিনাকে বিবাহ করার স্বপ্নও যাহার কাছে একটা হাস্যকর কাণ্ড সে একটা নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল অসংযমী যুবক না হইলে কখনো অমন ভান করিয়া টিনার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত না। বাস্তবিক কিন্তু সে কথাটা ভুল। অ্যান্টনির হৃদয়বৃত্তিগুলি খুবই শান্ত; নিজের কাছেও যে-কাজের একটা মনগড়া কারণ না দেখানো যায় সে-কাজে সে কোনদিন সহজে জড়াইয়া পড়িত না। আর টিনার মতন ক্ষীণ দুর্ব্বল বালিকা ত' মানুষের কল্পনাকেই মাত্র ঘা দেয়, সেইসঙ্গে মনেও একটু স্নেহের উদ্রেক করে; ইন্দ্রিয়রাজ্যে তাহার মতন ছায়ার স্থান নয়। অ্যান্টনি সত্যসত্যই তাহার উপর খুব সদয় ছিল। জগতে কাহাকেও ভালবাসা যদি তাহার পক্ষে

সম্ভব হইত, তবে হয়ত সে তাহাকে ভালও বাসিত। কিন্তু প্রকৃতিদেবী তাহাকে এ শক্তিটা দিতে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে সুগঠিত দেহ দিয়াছিলেন, এমন শুভ্র দুখানি হাত দিয়াছিলেন যাহার তুলনা আর মিলে না, নাকটিও বোধ হয় সমস্ত মন দিয়া গড়িয়াছিলেন, আর দিয়াছিলেন হৃদয়ভরা আত্মতৃপ্তি। কিন্তু এমন ভুবনমোহন মূর্ত্তিখানি পাছে চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া যায়, তাই বোধহয় সকল আঘাতের হাত এড়াইবার জন্য কোনো বিষয়ে প্রবল আকর্ষণ কি আকাঙ্ক্ষাটুকু দিতে তাঁহার হাত উঠে নাই। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার সাক্ষ্য দিবার জন্য তাহার জীবনে কোনো কীর্ত্তির তালিকা ছিল না। স্যর ক্রিষ্টফার ও লেডি শেভারেলের মতে জগতে এমন ভাগিনেয় মেলা ভার, এমন উত্তরাধিকারী পাওয়া বহু ভাগ্যের ফল; ছেলে নয়ত সোনার চাঁদ, মামা-মামীকে কি ভক্তিটাই করে, আর সকল কাজে কর্ত্তব্য-বোধ একেবারে টন্‌টনে! কাপ্তেন উইব্রোর কর্ত্তব্যবুদ্ধি চিরকালই তাহাকে সকলের চেয়ে সোজা আর মনের মতন কাজটি করিতে বলিত। পোষাক-পরিচ্ছদে তাহার খরচের অন্ত ছিল না, কারণ বংশগৌরব মানাইয়া চলা ত' কর্ত্তব্য। স্যর ক্রিষ্টফারের ইচ্ছাকে টলায় কাহার সাধ্য। কাজেই সে তাঁহার কোনো কাজে বৃথা অমত করিয়া জ্বালায় পড়াটা অকর্ত্তব্যই ঠিক করিয়াছিল। শরীরটা তাহার একটু নরম ধাঁজেরই ছিল, কাজেই কর্ত্তব্য-বোধে স্বাস্থ্যবিধিটাও পালন করিত। এই স্বাস্থ্যটুকুই তাহার সম্বন্ধে আত্মীয়বন্ধুদের একমাত্র উদ্বেগের কারণ ছিল। এইজন্যই জমিদারমহাশয় ভাগিনেয়টিকে সকাল-সকাল সংসার পাতাইয়া দিতে এত ব্যস্ত; বিশেষতঃ তাঁহার মনের মতনই একটি কনে যখন মিলিতেছে তখন দেরী করিয়া কি লাভ। মিস্ আশারকে অ্যান্টনি দেখিয়াছে, তাহার মনেও ধরিয়াছে। মেয়েটি স্যর ক্রিষ্টফারের প্রথম প্রিয়ার একমাত্র কন্যা। মানুষ যাহাকে চায় তাহাকে পাওয়াটা জগতের নিয়ম বোধ হয় না। তাই স্যর ক্রিষ্টফারের প্রথম প্রেয়সীরও আর-এক জমিদারের সঙ্গেই বিবাহ হইয়াছিল। মিস্ আশার এখন পিতৃহীনা, মস্ত জমিদারীর অধিকারিণী। অ্যান্টনির রূপে-গুণে যদি এই কন্যার মন ভিজে, তবে স্যর ক্রিষ্টফারের সুখের আর সীমা থাকিবে না। এই বিবাহের ফলে শেভারেল-প্রাসাদটা পরের ভাগ্যে বর্ত্তাইবার আশঙ্কাটা দূর হইবে। পুরানো বন্ধুর ভাগিনেয় বলিয়া অ্যান্টনিকে লেডি আশার ইতিমধ্যেই খুব আদর যত্ন করিয়াছেন; সেইবা কেন "বাথে" তাঁহাদের কাছে গিয়া আলাপ পরিচয় জমাইয়া তুলিয়া একটি উচ্চ-বংশীয়া সুন্দরী ধনী বধূ বরণ করিয়া না আনে?

স্যর ক্রিষ্টফার ভাগিনেয়কে মনের কথা জানাইলেন, সেও তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্যবোধে রাজি হইয়া গেল। আজ তাহাদের দুজনের সম্মুখে যে কি মহান্ স্বার্থত্যাগের দাবী উপস্থিত হইয়াছে, টিনাকে অতি করুণ স্বরে সে-কথা জানাইতেও সে ভুলিল না। ইহার তিন দিন পরে, কাপ্তেন উইব্রোর বাথযাত্রার আগের দিন রাত্রে দালানে যে বিদায়-দুঃখের পালা হইয়াছিল, তাহা ত পাঠক আগেই দেখিয়াছেন।

(ক্রমশ)

শ্রীশান্তা দেবী।

জাতের উৎপত্তি

এক্ষণে আমরা এই গবেষণার জটিল অংশে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এইমাত্র যে-সকল মিলের কথা বলিলাম তাহার অধিকাংশই পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে, নির্দ্দেশিত হইয়াছে। উহা কতকগুলি উদাহরণ মাত্র, নিদর্শন মাত্র। উহার সংখ্যা সহজেই বাড়ান যায়। মুখ্য কথা হইতেছে—উহাদের নিগূঢ় অর্থটার গুরুত্ব ওজন করিয়া দেখা।

আমাদের সমস্ত গবেষণা, আবার সেই প্রাচীন পারিবারিক ব্যবস্থাপদ্ধতির উপাদানসমূহের মধ্যে আমাদিগকে আনিয়া ফেলিয়াছে; জাতের প্রকৃত নাম জাতি,—যাহার অর্থ "race"। আরও ঠিক্ করিয়া বলা আবশ্যক। যে-যুগে ভারতের আর্য্যেরা, স্বকীয় অদৃষ্টগতির অনুসরণ করিবার জন্য, স্বকীয় সামাজিক গঠনপদ্ধতির অনুসরণ করিবার জন্য, অন্য আর্য্যগণ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন পরিবার-তন্ত্র ছিল না। অপেক্ষাকৃত খড়-বড় দলের মধ্যেই পরিবার-তন্ত্র পরিপুষ্ট হইয়া উঠে,—যথা, গোত্র (clan), শাখাবংশ (tribe)। উহার

অস্তিত্বটা নিশ্চয়ই ছিল—যদিও কতকগুলি খুব-বাঁধাবাঁধি পারিভাষিক সংজ্ঞার মধ্যে তৎসম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তনশীল ও অস্পষ্ট তথ্যসকলের ভাল-রকম সমাবেশ হয় না।

কিরূপ পদ্ধতি-অনুসারে কতকগুলি মণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সেই বিভিন্ন মণ্ডলীর পরস্পর-সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, তাহার অনেক বিচার আলোচনা হইয়াছে বটে, কিন্তু বিশৃঙ্খলভাবে হইয়াছে। আর্য্যজগতে দেখা যায়, কাশীর কৌটার মত, বড়-বড় গণ্ডীর মধ্যে ছোট-ছোট গণ্ডীর সমাবেশ—এইরূপ কতকগুলি সমকেন্দ্রিক চক্র অবস্থিত; এই চক্রগুলি শুধু একই ছাঁচের হওয়া চাই এই মাত্র। দেশভেদে গোত্র ও শাখাবংশ যে নামেই পরিচিত হউক না কেন, এই গোত্র ও শাখাবংশ পরিবারেরই পরিবর্দ্ধিত আকার—এইরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। পারিবারিক গঠন-পদ্ধতিকেই বিস্তারিত করিয়া নকল করা হইয়াছে মাত্র।*

এক্ষেত্রে সংজ্ঞাগুলির মধ্যে বেশ একটা মিল আছে দেখিতে পাওয়া যায়:—যথা, রোম-নগরে "Gens" "Curie," "tribus"; গ্রীসদেশে, "phratric", "phyle"; ভারতবর্ষে, বংশ, গোত্র, জাত। এইস্থলে সাধারণভাবের একটা ঐক্য খুব চোখে পড়ে। এই ঐক্য হইতে আর-একটি শিক্ষা পাওয়া যায়:—গোড়ার উৎপত্তিসম্বন্ধে, নানাপ্রকার সাদৃশ্য দেখিয়া বিচার করিলে, জাত ও উপজাতের পার্থক্যের ন্যায় clan ও tribeএর মুখ্য পার্থক্য কিসে, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে, যথা:-যে-দল অপেক্ষাকৃত বেশী সংযত ও সংকীর্ণ সেই দলটি বহির্বিবাহমূলক, এবং যে-দলটি অপেক্ষাকৃত বেশী বিস্তৃত তাহা অন্তর্বিবাহমূলক। আরও পরবর্ত্তী যুগে, যে সময়কার প্রাচীন গ্রীশ-রোমের সহিত আমরা আর-একটু বেশী পরিচিত,—সেই যুগে, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাপদ্ধতি, কতকগুলি আচারব্যবহারকে বিচলিত করিয়াছে, কিংবা স্থানচ্যুত করিয়াছে, দেখা যায়; তাহার দৃষ্টান্ত যথা,—অন্তর্বিবাহ নিয়মের জন্য, একটি শাখাবংশের স্থানে, একটি সমগ্র নগরকে (city) স্থাপন করা হইয়াছে। অতি পুরাকালে জাতিগত শাখা-প্রশাখার মধ্যে যে-পার্থক্য ঘটিয়াছিল, সেই পার্থক্যের বর্ত্তমান নিদর্শনাদির মধ্যে কতকগুলি প্রবর্ত্তকহেতু এখনো যে সর্ব্বাংশে রহিয়া গিয়াছে,—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

রোম-গ্রীশের প্রাচীন বংশাদির (gentilice) যে-সব বিশেষ অধিকার ছিল, ঠিক্ সেই-সব অধিকার জাতের মধ্যেও যে আমরা দেখিতে পাই ইহা একটা আকস্মিক ঘটনা বা আধুনিক পুনরভ্যুত্থানের ব্যাপার নহে।

আদিম কালের মতামতের সহিত কতকগুলি অদ্ভুত আচারব্যবহারের মিল যে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই আদিমকালের ভাবটা এখনও পর্য্যন্ত যে চলিয়া আসিতেছে,—ইহাও একটা যদৃচ্ছাসম্ভূত ব্যাপার নহে। সমস্ত মিলিয়া পূর্ণাঙ্গ, সুসম্বদ্ধ, অতীতের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত, জীবনের সমস্ত কাজের নিয়ন্তা—এইরূপ একটা ব্যাপার আমরা দেখিতে পাই। অতএব প্রাণী-দেহের ন্যায় এই প্রতিষ্ঠানটি খুব গভীর উৎস হইতে স্বকীয় রস সংগ্রহ করে, বলিতে হইবে।

মধ্যযুগের Guild অর্থাৎ বণিক-সমাজ, বহুপ্রকার আচার ব্যবহারের দ্বারা, প্রাচীন গঠনপ্রণালীর কতকগুলি অবয়ব-রেখা মনে করাইয়া দেয়। কে সাহস করিয়া বলিবে যে, ঐ বণিক-সমাজ প্রাচীন বণিকসমাজের অব্যবহিত উত্তরাধিকারী? যে-সকল আচারব্যবহার, নূতন মতামতের আধিপত্যে ও সম্পূর্ণ নৈতিক বিপ্লবের প্রভাবাধীনে স্বকীয় তাৎপর্য্যার্থ ও বিশেষত্ব হারাইয়া এখনো পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে, তাহারা অবশ্য ন্যূনাধিক তিমিরাবৃত প্রচ্ছন্ন পথ দিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে; আমি বলিতে চাহি যে, কোন "Saint" বা সিদ্ধপুরুষের অভিভাবকতা, পুরাতন heroদিগের নাম হইতে দেশের নামকরণরূপ রীতিরই ছায়া; এবং যে-ভোজ, কোন বিশেষ উৎসবপার্ব্বণের উপলক্ষে, স্বশ্রেণীর লোকদিগকে একত্র সমবেত করিত, তাহা বংশ-ভোজেরই একটা স্মৃতিমাত্র; অবশ্য এক আদর্শ আর-এক আদর্শে ধারাবাহিকরূপে সংক্রামিত হয় নাই, অব্যবহিত-রূপে গৃহীত হয় নাই। Guildএর মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা ধারাবাহিক বা কৌলিক সমাজের দৃঢ়সংশ্লিষ্ট গঠনের অনুরূপ। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালিত হইলে ঐ-সকল Guild বা বণিক-সমাজ নবাগত ব্যক্তি মাত্রকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি করে

* Hearn, p. 136; Leist. Altar. Jus. Civ. p. 45. 8vo

না শুধু নহে, সমাজের সভ্যদিগের রাষ্ট্রীয় জীবন বা ব্যক্তিগত জীবনের উপর কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকও স্থাপন করে না। এই সাদৃশ্যগুলা একপ্রকার আকস্মিক ধরণের ও খণ্ডাংশিক বলিলেও হয়। ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, আজিকার দিনে আমাদের পল্লীগ্রামে, অন্ত্যেষ্টির পরে, যে-ভোজে মৃতব্যক্তির আত্মীয় বন্ধুরা একত্র সমবেত হয়, প্রাচীনকালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সহিত তাহার কিছু-না-কিছু যোগ আছে। দীর্ঘকালের যাত্রাপথে এই প্রথাটি যদি স্বকীয় তাৎপর্য্যার্থ হারাইয়া থাকে তাহাতে কি-আসিয়া-যায়।

প্রাচীন পারিবারিক পদ্ধতির সহিত বর্ণভেদপ্রথা যে-আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ তাহা ভিন্ন পর্য্যায়ের। উভয়ের মধ্যে একটা প্রকৃত ধারাবাহিকতা আছে, জীবন-উৎস হইতে একটা সাক্ষাৎ প্রবাহ আছে।

তবে কি বলিতে হইবে যে, ভারত শুধু আর্য্যসমাজ-পদ্ধতির আদিম আদর্শটাই বজায় রাখিয়াছে? নিশ্চয়ই আমার মত তাহা নহে। ভারতে বর্ণভেদপদ্ধতি যদি কতকগুলি সম-সাধারণ-হেতু হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে, প্রাচীন গ্রীশ-রোমে আবার সেই-সকল হেতু হইতেই সম্পূর্ণ পৃথক্ এক পদ্ধতি নিঃসৃত হইয়াছে। আর্য্যসমাজ-চিত্রের "পশ্চাৎ-ভূমি"-সংলগ্ন ধারণা বা মনোভাবগুলি জাতের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। যে অনন্যসাধারণ বিশেষ অবস্থায় ঐ-সকল ধারণা ভারতের ভূমিতে প্রতি-রোপিত হইয়াছিল, তাহা হইতে কি একটা মৌলিক ধরণের নূতন প্রতিষ্ঠান বিকসিত হইয়া উঠিবে না? মুখের চেহারা এতটা বদল হইয়া গিয়াছে যে, জাতের অন্তর্ভূত খুব-আদিমকালের ছাঁচগুলাকে চিনিতেই পারা যায় না; আসলে কিন্তু জাতটা উহাদেরই বৈধ উত্তরাধিকারী। এই-প্রকার রূপান্তর সাধনের মূলীভূত কলকৌশলটাকে যতক্ষণ না আমরা আয়ত্ত করিতে পারি, ততক্ষণ কিছুই হইল না বলিয়া মনে করিতে হইবে।

বহির্জীবন ও সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে বৈদিক সূক্তাদিতে কোন সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। ছন্দ এইটুকু আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্যলোকেরা শাখা-জাতি বা জনসমূহরূপে ("জন") ছড়াইয়া পড়ে; সেই-সকল শাখা বা "জন" কতকগুলি উচ্চবিভাগে ("বিশঃ") বিভক্ত হয়; সেই-সকল উচ্চবিভাগ আবার বংশ-রূপে খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়। এই সম্বন্ধে ঋগ্বেদের পরিভাষা কতকটা অস্পষ্ট; কিন্তু সাধারণ তথ্যটা সুস্পষ্ট (২)। "সজাত" অর্থাৎ "আত্মীয়" বা (race) "জাতির সহচর"।—এই শব্দটি অথর্ব্ববেদে (clan) "বিশ"-এর সহচর এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। "জন" শব্দ, যাহার অর্থ আরো বিস্তৃত, জেন্দাবেস্তায় ব্যবহৃত clanএর পর্য্যায়-শব্দ "জন্তু" বা "জাতি" শব্দকে (caste) মনে করাইয়া দেয়। একসারি পারিভাষিক সংজ্ঞা, যথা—"ব্রা", "বৃজন", "ব্রাজ", "ব্রাত"—মনে হয়, ইহারা হয় "বিশে"র নয় "জনে"রই পর্য্যায়-শব্দ বা উপবিভাগ। অতএব সূক্তাদিতে, যে-যুগে আর্য্যালোকদিগের উল্লেখ আছে, সেইযুগে আর্য্যালোকেরা এমন এক সমাজের অধীনে বাস করিত যে-সমাজ শাখা-জাতির ঐতিহ্যকে ও কতকগুলি নিকৃষ্ট ও সমতুল্য মণ্ডলী-সমূহের ঐতিহ্যকে পরিশাসিত করিত। এই সমাজটি যে ভাসা-ভাসা রকমের ছিল—যথেষ্ট জমাটভাবাপন্ন ছিল না, তাহা নামের বৈচিত্র্য হইতেই পরিসূচিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনা অনুসারে ঐ সমাজ বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল।

যে পথে চলিয়া এই সমাজ ক্রমশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সেই পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য যে-সব জিনিষ প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে সাহায্য করিয়াছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি কখন-কখন আমাদের নজরে পড়ে।

ভারত-আক্রমণকারীরা যে সময়ে ধীরে-ধীরে বিজয়-পথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন তাহারা দায়ে পড়িয়াই, ঠিক যাযাবর জাতির মতো জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ না করুক, খুব অস্থির ধরণে জীবনযাপন করিত। আমরা জনসমূহের স্থানচ্যুতির বৃত্তান্তই অনুসরণ করিতেছি। এই চলিষ্ণুতা রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ-গঠনের পক্ষে খুবই প্রতিকূল, কিন্তু পুরাতন প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষণের পক্ষে খুবই অনুকূল। তা-ছাড়া স্থানীয় সংগ্রামের জয়পরাজয় জনসমূহের অবস্থার উপর কিছু-না-কিছু প্রতিক্রিয়া করিতই করিত। অনেক স্থলেই উহারা খণ্ডবিখণ্ড ও বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িত। বংশানু-ক্রমিক প্রথাদির ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া, ভগ্নাংশগুলি স্থানিক

(২) Zimmer Altend. Leben, P. 158 দ্রষ্টব্য।

সুবিধা প্রভৃতি অভিনব স্বার্থের প্রয়োজন-বশে, আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিল। ইহার দরুন, বংশগত কঠোর রুদ্ধদ্বারিতা কতকটা আঘাত পাইল। বিভিন্ন নূতন দল-বন্ধনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল।

পাশ্চাত্যদেশে লোকসমূহের অবস্থান যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচ্যদেশে সেরূপ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অভাবটা প্রাচ্যদেশে পর্য্যায়-ক্রমে কারণ ও কার্য্য উভয়ই? আবহমান কাল পর্য্যন্ত ভারত এইরূপ চলিষ্ণুতা কতকটা রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বকালেই নগরগুলি ইহার ব্যতিক্রমস্থল। প্রাচীনযুগে ইহার কোন রেখাচিহ্ন যে আমরা ধরিতে পারি না, তাহা স্বাভাবিক। আরও পরবর্ত্তীকালে, যে-সকল বড়-বড় রাজ-ধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার মূল সুদৃঢ় ছিল না। প্রায়ই তাহাদের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী ছিল।

বৈদিক সূক্তির কাল হইতে আরম্ভ করিয়া, একাল পর্য্যন্ত গ্রামই হিন্দুজীবনের একমাত্র কাঠাম। সূক্তি-সমূহের মধ্যে যে-গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কৃষিপ্রধান অপেক্ষা গোচারণ-প্রধানই বেশী ছিল। "বৃজন" শব্দ যাহা গোচারণ-ভূমি "ব্রজ" হইতে পৃথক করা যায় না, সেই বৃজন-শব্দের ন্যায় কতকগুলি পর্য্যায়-শব্দ একই ছবি আমাদের মানসনেত্র-সমক্ষে আনয়ন করে। এইরূপ "গোত্র" শব্দ। ঋগ্বেদে,— গোষ্ঠ এই শাব্দিক অর্থেই "গোত্র" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পরে, এই শব্দটি প্রায় clan অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাই; এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার যে খুব প্রাচীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা হইতে একাধিকবার ইহাই সপ্রমাণ হয়—সূক্তিসমূহের নীরবতা হইতে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা ঘোরতর ভ্রান্তি। তাছাড়া একটা মধ্যবর্ত্তী ধাপের অবলম্বন ব্যতীত এই শব্দের প্রয়োগ সমর্থিত হয় না। "বৃজন" শব্দের গোড়ার অর্থ ধরিয়া ইহার খুব কাছাকাছি যে "গোত্র" শব্দ, এই শব্দও কতকটা একই-প্রকার ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, উহারও একটা পর্য্যায়-শব্দ—অন্তত উহার অনেকটা কাছাকাছি এক শব্দ বাহির হইয়াছে—সে শব্দটি—"গ্রাম"।

হিন্দুগ্রামের জীবননির্ব্বাহপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে স্ব-তন্ত্র-মূলক। অনেক প্রদেশেই, ইহা একটা দলবদ্ধ সমাজবিকাশ, এবং ইহার ভূমির স্বত্বাধিকার সর্ব্বসাধারণের: উহা এমন একটি গঠনপ্রণালী যাহা দেখিয়া "দাস-গ্রামমণ্ডলীর" সাদৃশ্য অনেকেরই মনে প্রতিভাত হয়। অনেকেরই মনে হয়, এই "গ্রাম", আদিমকালের গোত্রেরই (clan) সমতুল্য; ইহা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শোণিত-সাম্য, সম্পত্তি ও অধিকার-সাম্যকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিনা, ভারতের সর্ব্বত্রই এই গ্রাম-সমবায়গুলির উৎপত্তি খুব প্রাচীন কি না, উহারা বিশেষ-অবস্থার মধ্যে পড়িয়া দৈবক্রমে আদিমকালীন সমাজের ছাঁচে আপনা-দিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে কি না। অন্তত উহারা একটা দলবদ্ধ সমাজের শক্তিশালী ঐতিহ্যের পরিচয় দেয়। বহুল-বিস্তৃত প্রদেশে, ইহারই সমান একান্নভুক্ত পরিবার-পদ্ধতি বিরাজ করিতেছে। বংশানুক্রমে অবিভক্তভাবে এক পিতার শাসনাধীনে উহারা মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া আছে। পুরাতন প্রতিষ্ঠানাদি বরাবর রক্ষা করিতে হইবে ইহাই উহাদের ভিতরকার ভাব।

শুধু ইহাই নহে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, রুসীয় গ্রামগুলির স্বত্বাধিকার সাধারণের হওয়ায় এবং গ্রামগুলি একই জমির উপর কাছা-কাছি থাকায়, তাহার ফলে ব্যবসায়-সাম্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতেও এই একই ফল উৎপন্ন হয়। যখন কুমোরের গ্রাম, চামারের গ্রাম, কামারের গ্রাম,—বৌদ্ধসাহিত্যে যাহাদের উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়— এই সকল গ্রামের কথা মনে করা যায়, তখন আর সন্দেহ থাকে না। গোড়ায় যদি কোন-প্রকার শোণিতসম্বন্ধের সূত্রে গ্রাম-বিশেষের লোকেরা পরস্পর আবদ্ধ হইয়া থাকে তবে এই-প্রকার ব্যবসায়-সাম্য আরও বিস্তারলাভ করিবারই কথা। এ কথাটা ব্রাহ্মণ-গ্রামের সম্বন্ধেই প্রায় উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব, আত্মীয়তার সম্বন্ধই এই-সকল মণ্ডলীকে অন্তত অনেক স্থলেই পরিশাসিত করিত। কেন না, ইহা নিশ্চয়, ব্রাহ্মণের পক্ষে আত্মীয়তার সম্বন্ধই নিতান্ত আবশ্যক ছিল,—ব্যবসায়-সাম্য নহে; ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের দ্বারা যত না হউক—বেশীর ভাগ, কৃষি ও গোচারণের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তথাপি, ব্রাহ্মণদের দৃষ্টান্ত চতুষ্পার্শ্বস্থ অপেক্ষাকৃত

কম উন্নত ও কম সম্মানিত দলের মধ্যে ব্যবসায়-সমবায়-সংগঠনের অন্তরায় হয় নাই।

অতএব আগন্তু আর্য্যজাতীয় জনসমূহ, সমাজবদ্ধ গ্রামসমূহে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, সেই-সকল গ্রাম বাস্তব বা তথাকথিত আত্মীয়তার ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। সকল স্থলেই এইরূপে একটা দলবদ্ধ সমাজ গড়িয়া উঠিল; এবং সেই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত কাঠামের মধ্যে, clan বা গোত্রটা পরেও রহিয়া গেল। যতই এই সমাজ সাধারণধরণের হইয়া উঠিল, ততই ব্যবসায়-সমাজের উপর তাহার উপযুক্ত নিয়ম-পদ্ধতি স্থাপন করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। গোচারণের যুগে এই-সকল ব্যবসায়-সমাজ সংখ্যায় কম ছিল, এবং ব্যবসা-সমূহ ততটা বিশেষীকৃতও হয় নাই; কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নতি ও কৃষির উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে, ঐ-সকল সমাজ স্বকীয় অভি-বৃদ্ধি-সাধনে তৎপর হইল। যন্ত্রবিদ্যামূলক ব্যবসায়ের প্রতিনিধিরা, যদিও লোকের বিবিধ প্রয়োজনের তাকিদে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তবু তাহারা স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারে নাই; বৃহৎ সমাজের সাধারণ আদর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহারই মাঝে ধর্ম্ম আসিয়া হস্তক্ষেপ করিল।

ধর্ম্মসংক্রান্ত সংকোচের দরুণ, আর্য্য-গ্রামের লোকেরা কোন-কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে বিরত হইল এবং যাহারা ঐ-সব ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছে তাহাদিগকে আপনাদের দলের মধ্যে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইল। ঐ একই সংকোচের দরুন, ব্যবসায়সমূহের মধ্যে একটা অশুচিতার সোপান প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বেড়া-ব্যবধানের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতামত যতই সযত্নে পোষিত হইতে লাগিল, ততই তাহার দরুন ঐ-সকল ব্যবধান আরো দুর্লঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল। পুরোহিত ব্রাহ্মণদিগের অসাধারণ উদ্যম ও অধ্যবসায় এই বিষয়ে সফলতা লাভ করিয়াছিল। পুরোহিতবর্গ স্বকীয় অপরিসীম আধিপত্যের মূলসূত্র সর্ব্বপ্রথমে বিনা প্রতিবাদে স্থাপন করে নাই, একথা স্বীকার করিলেও ইহা নিশ্চয় যে, উহারা অতি প্রাক্‌কালেই ঐ আধিপত্যের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছিল। সাহিত্যের অতি প্রাচীন যুগ হইতেই, উহাদের দাবী-দাওয়া খুব উচ্চকণ্ঠে প্রতিপাদিত হয়।

শ্রেণীগত উচ্চনীচতার সোপানপদ্ধতি সর্ব্বশ্রেণীর মধ্য হইতে জাতের একটা শাসনপদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। অপেক্ষাকৃত স্বত-উৎপন্ন একটি অতি ক্ষুদ্র বিভাগ হইতেই জাতের পদ্ধতিটি উৎপন্ন হয়;—উচ্চনীচতার সোপানপদ্ধতি এই কার্য্যে সাহায্য করিতে পারিয়াছিল। শ্রেণীসমূহের অন্তর্ভূত এই উচ্চনীচতার পদ্ধতি, অপেক্ষাকৃত একটি বড় বিভাগকে স্বকীয় দৃষ্টান্ত ও নিত্যব্যবহার দেখাইয়াছিল সত্য কিন্তু এই বিভাগটিও কোন কোন বিষয়ে কম কড়াকড় ছিল না। বিশেষত এই শ্রেণীগত উচ্চনীচতার পদ্ধতি হইতে দুইটি গৌণ পরিণাম উৎপন্ন হয়; ব্রাহ্মণ-আধিপত্যের দাবী সমর্থন করিয়া উক্ত পদ্ধতি ধর্ম্মসংকোচের কঠোর দুর্লঙ্ঘনীয়তা রক্ষা করিল; এবং এই কঠোর দুর্লঙ্ঘ্যতা জাতের কঠোর নিয়মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল। উহা সেই উচ্চনীচত্ব-সোপানের পত্তনভূমি যাহা এই জাত-পদ্ধতিরই এক অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে; উহা সেই শুচিতা-সংক্রান্ত ধারণাসমূহে আশ্চর্য্যরকম বলবিধান করিল, যে ধারণাগুলি এক্ষণে সমাজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

বিজয়ী পুরোহিততন্ত্র জাতের পদ্ধতিকে প্রণালীবদ্ধ আকারে প্রতিষ্ঠিত করিলেও, পুরোহিততন্ত্র যে-সকল মূল-উপাদান হইতে নিঃসৃত হয়, সেই মূল-উপাদান হইতেই জাত সাক্ষাৎভাবে স্বকীয় প্রয়োজনীয়তা ও উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। এইরূপে জাতের সোপানপরম্পরা, ব্রাহ্মণদের দ্বারা গোড়ায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া,—অন্তত তাহাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিশোধিত হইয়াই প্রাচীন সোপান-পরম্পরার স্থান অধিকার করিল। যে শ্রেণীগত সমাজ-পদ্ধতি তেমন সুনির্দ্দিষ্ট ছিল না তাহা জাতের পদ্ধতির মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমদেশে, শ্রেণীসমূহ যে অনেক বিলম্বে পরস্পর মিশিয়া গিয়াছিল, তাহা একাধারে রাষ্ট্রিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বোধের উদ্দীপক ও পরিণাম-ফল। এই বোধটি শ্রেণীসমূহ হইতেই বাহির হইয়াছিল। ভারতে সমস্ত ক্রমবিকাশ পৌরোহিত-প্রভুত্বের পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছিল। তাই ভারত, একরাষ্ট্রবোধেও উঠিতে পারে নাই, দেশাত্ম-বোধ পর্য্যন্তও উঠিতে পারে নাই। কাঠামটা বিস্তার লাভ না করিয়া আরও সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাচীন গ্রীস ও রোমদেশের সাধারণশাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে, শ্রেণীর [illegible]

অপেক্ষাকৃত বড় city-র ধারণায় পরিণত হয়। ভারতে এই ধারণাটি হীনভাবাপন্ন হইয়া জাতের সংকীর্ণ প্রাচীরের মধ্যেই বদ্ধ হইয়া পড়িল। এ-কথাটি যেন আমরা ভুলিয়া না যাই যে, আর্য্য-আগন্তুক দল এক-একটা বিস্তৃত স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই অতিবিস্তৃত দলগুলি অগত্যা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায়, বিশেষ বিশেষ দলের অভিরুচি ও অভিলাষ, বলের পূর্ণতা সম্পাদন করে।

আমি একথা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, জাতটা ভারতের আদিম-নিবাসী জাতি হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা এই পদ্ধতিটাকে এতবেশী আগ্রহের সহিত অবলম্বন করিয়াছে, যে ও কথা মনে স্থান দেওয়া যায় না। এই পদ্ধতিকে উঁহারা ধর্ম্মের উচ্চ আসনে বসাইয়াছে। যে-সকল উপাদানে উহা গঠিত হইয়াছে,—আর্য্যজাতির অন্য শাখা উপশাখা কতকগুলি সুস্পষ্ট জাজ্বল্যমান সাদৃশ্য আনিয়া ঐ-সকল উপাদানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই-সকল সাদৃশ্য আরও স্থিরনিশ্চিত বলিয়া মনে হয়, কেন না, দেখিতে পাই, বাহ্য ব্যাপার অপেক্ষা যে-সকল মতামত কার্য্যের পরিচালক সেই-সব মতামতের সমতা হইতেই আত্মীয়তার ভাবটা আরো বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। যখন আমরা আদিমনিবাসী জাতিদিগকে ব্রাহ্মণিক কাঠামের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখি—(এবং তাহাদের তরল সমাজ-গঠন নূতন প্রয়োজনের তাগিদে অতি সহজেই উহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করে)—তখন দেখিতে পাই যাত্রাকালে অনেকটা বদল হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উহারা স্বকীয় উৎপত্তির চিহ্ন রক্ষা করিয়া থাকে। উহার ভিতর পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত একটা পরকীয় মূলধনের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় যাহা সমস্তটাকে—যেমন মনে করো সমস্ত clan-কে—একটু বেসুরো করিয়া তুলে। কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব,—যে-সকল বিজিত লোককে ব্রাহ্মণেরা ঘৃণিত বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে, সেই-সকল বিজিত লোকের নিকট হইতেই ব্রাহ্মণেরা আহার ও দেহ সম্বন্ধীয় শুচিতার জটিল নিয়মসকল গ্রহণ করিয়াছে। যে সামাজিক পদ্ধতি ব্রাহ্মণদিগের স্বকীয় ঐতিহ্য হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হয় নাই তাহা কি ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে?

কখন কখন খুব সহজেই এইরূপ স্বীকার করা হয় যে, এই সমস্ত পদ্ধতিটা আদিমবাসী লোকদিগেরই নিজস্ব ছিল। (১) গোড়ায় হয়ত উহার কতকগুলি অবয়ব-রেখামাত্র ছিল। যাই হোক, এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে—একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

তখনও পর্য্যন্ত যাহারা বর্ব্বর ছিল, ব্রাহ্মণ্যিক নিয়মাদির অনুকরণ, সেই-সব লোকের মধ্যে, ভিতরে ভিতরে রন্ধ্রপথ দিয়া প্রবেশ করে। ঐসব নিয়ম গ্রহণের দিকে উহাদের খুব একটা ঝোঁক ছিল বলিয়া মনে হয়। অপেক্ষাকৃত কম প্রাচীনতন্ত্রীয় প্রথাগুলি বজায় রাখিয়া তাহারা কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সহিত মিলিত হইবার জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সেই পুরোহিত তাহাদের সহিত সংসর্গ করায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে অবজ্ঞার পাত্র হইয়া পড়িয়াছিল; এবং স্বয়ং পুরোহিতও তাহার নূতন যজমানদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত; সে-সব সত্ত্বেও, তাহারা ব্রাহ্মণের আশ্রয় লাভ করা একটা গৌরবের বিষয় মনে করিত। যে-সকল শাখা-জাতি স্বকীয় ক্রিয়াকর্ম্মে ব্রাহ্মণদিগকে ডাকে না, সে-সকল শাখা-জাতির মধ্যেও বিবাহ-সংক্রান্ত ব্রাহ্মণ্যিক অনুষ্ঠান বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। (২) "রামোশি"দিগের মতো খুব নীচু জাত—যাহাদিগের বহির্বিবাহিক সীমা, জীবজন্তু-নামাঙ্কিত বংশের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে—তাহারাও ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে অনেক জিনিস ধার করিয়াছে—শুধু বংশ-কাহিনী নয়, বিধবাবিবাহের নিষেধ-নিয়মটাও গ্রহণ করিয়াছে। এই-সকল নিষেধ-নিয়মের প্রবর্ত্তকতা আদিম নিবাসীদিগের উপর আরোপ করিয়া যে-সকল কথা বলা হয় আসলে ঠিক তাহার উল্টা। সামাজিক সোপানের গোড়ার ধাপগুলিতে, সমাজগঠন ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে জাতিতে-জাতিতে একটা সাদৃশ্য সহজেই উপলব্ধি হয়; তখন সমাজ-যন্ত্রের কলকৌশলগুলির নিতান্ত অঙ্কুরাবস্থা হওয়ায়, বেশী বৈচিত্র্য থাকিতে পারে না। আবার, পরবর্ত্তীকালের খরিদ-করা মালকে কুলপরম্পরাগত কৌলিক ধন বলিয়া আমরা গ্রহণ না করি সে বিষয়েও আমাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

(১) Nesfield.
(২) Ibbetson.

তথাপি, সমস্ত হইতে আমরা এই আভাসটুকু পাই যে, আদিমবাসীদিগের সংমিশ্রণ ও পার্শ্ববর্ত্তিতা, বর্ণভেদপদ্ধতি স্থাপন সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু প্রভাব প্রকটিত করিয়াছে। এই প্রভাব সম্ভবত পরোক্ষভাবের, কিন্তু তবু শক্তিশালী। বর্ণ ও বর্ব্বরতার দরুন অবজ্ঞার পাত্র জনসমূহের সহিত আর্য্যদের সংঘাত ও সংঘর্ষে, আর্য্যদিগের জাতিগর্ব্বটা অগত্যা বর্দ্ধিত হইল, আদিমবাসীদের হীনতাজনক সংস্পর্শে আর্য্যদের স্বাভাবিক সংকোচগুলি আরও সুদৃঢ় হইল, অন্তর্বিবাহের নিয়মগুলি আরও কড়াকড় হইয়া উঠিল; এক কথায় যে-সকল ব্যবহার, প্রবৃত্তি, লোকদিগকে জাতের দিকে লইয়া যায়, সেই সমস্তকে তাহারা আদর করিতে লাগিল। আমি উহার ভিতর সেই পদমর্য্যাদা-সোপান-সুলভ রুদ্ধবারিতাকেও ধরিতেছি যাহা এই পদ্ধতির মুকুট-রূপে বিরাজিত এবং যাহা আসলে গার্হস্থ্য রাজ্য হইতে সরিয়া গিয়া, সামাজিক রাজ্যে বা অর্দ্ধ-রাজনৈতিক রাজ্যে উপনীত হইয়াছে।

ভারতভূমির প্রাচীন অধিকারীরা সংখ্যায় এত অধিক ছিল যে তাহারা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয় নাই;—তাহা না হইলেও, উহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন বিজেতার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু যে-স্থলে স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছিল,—সে স্থলেও তাহারা নিজের সমাজ-গঠনটি মোটামুটি বজায় রাখিয়াছিল। উহারা বিজেতার কেন্দ্রগত শক্তির সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছিল এরূপ না বলিয়া—বরং বিজেতার মতামতে দীক্ষিত হইয়াছিল এইরূপ বলাই অধিক সঙ্গত। তাই স্বকীয় সমাজের মধ্যে, তাহাদের যাহা বিশেষত্ব—সেই অস্থায়িত্ব ও ভাসন্তভাব রক্ষা করিতে তাহারা কতকটা সাহায্য করিয়াছিল। সমস্ত জনসমূহ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্দ্ধস্বশাসক জাতিরূপে ক্রমাগত পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করিয়া চলিতেছিল। এই আদিমনিবাসী লোকেরা, বিজেতার সুব্যবস্থিত রাষ্ট্রনৈতিক শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে এমন এক প্রকাণ্ড প্রতিবন্ধক স্থাপন করিয়াছিল যাহা কস্মিনকালেও লঙ্ঘিত হয় নাই। স্বকীয় দৃষ্টান্তের দ্বারা উহারা আদিম প্রতিষ্ঠানগুলির সংরক্ষণপক্ষে সাহায্য করিয়াছিল; অতএব, বিজেতারা প্রথমে যে শাসন-পদ্ধতির অধীনে আপনাদিগের বিস্তার সাধন করিয়াছিল,—আদিমনিবাসী লোকেরা সর্ব্বপ্রকারে তাহারই সংরক্ষণে আনুকূল্য করে।

আরও কিছুকাল পরে, এই দুই জাতির মিশ্রণ, একই ধারায় কাজ করিতে পারিল না। ঐ দুই জাতির চির-অভ্যাস ও কুলক্রমাগত স্বাভাবিক সংস্কারগুলি প্রভূত বললাভ করিল। "পিছিয়ে-পড়া" লোকদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম যে পরিমাণে স্বকীয় দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল, সেই পরিমাণে আদিমকালের কাঠামটা শিথিল হইয়া পড়িল—দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না।

কতকগুলি বিশেষ অবস্থার প্রভাবাধীনে শাখাজাতির সমাজপদ্ধতি, জাতের পদ্ধতিতে ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া একটা স্বাভাবিক মিলন-কেন্দ্রে পরিণত হইল; ঐ দুই পদ্ধতির প্রত্যেকটিই, স্বকীয় সভ্যতা, বিজেতা ও বিজিত উভয়কেই প্রদান করিল।

প্রাচীন যুগে আর্য্যেরা কোথাও "হাতের কাজে" কোন অনুরাগ ও অভিরুচির পরিচয় দেয় নাই। গ্রীক ও রোমকেরা ঐ-সব কাজ দাসদিগের হস্তে, অথবা কতকগুলি মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী—দাসত্বমুক্ত লোকদিগের হস্তে, গৃহ-ভৃত্যদের হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ভারতবর্ষের আর্য্যেরা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, গোচারণ-সংক্রান্ত গ্রাম্য-সুলভ ব্যবসায়ে অন্যদেশ অপেক্ষা কম আসক্তি প্রদর্শন করিল।

উহা আদিমবাসীদিগের হস্তে অথবা উহাদের সমান-পদবী সঙ্কর জাতীয় লোকদিগের হস্তেই রহিয়া গেল।

ব্যবসায়ী হইবার পর, উহারা স্বকীয় ঐতিহ্য সঙ্গে আনিল, এবং উচ্চতর আর্য্যজাতির সমাজপদ্ধতির সহিত স্বকীয় সমাজপদ্ধতি মিশাইবার জন্য ইচ্ছুক হইল। অশৌচ-গ্রস্ত হইবার ভয়ে, অনেকগুলি ব্যবসায়ের দ্বার আর্য্যদের নিকট রুদ্ধ ছিল; আগন্তু আর্য্যদিগের ও আর্য্য-পুরোহিত-দিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত, এই সঙ্কোচটাও ঐ নিকৃষ্ট জাতীয় লোকদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল। ব্যবসায়ের মধ্যে যে-গুলি অশুচি বলিয়া খ্যাত, সেই-সকল ব্যবসায়গত অশুচিতার তারতম্য-অনুসারে উহাদের মধ্যে উপবিভাগসকল গড়িয়া উঠিল। আজিকার দিনে এই ব্যাপার ত আমাদের চোখের সাম্‌নেই ঘটিতেছে। এইরূপে, আদিমবাসীদিগের সংখ্যাধিক্য-[illegible]

তাড়নার নিযুক্ত হইতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া নানাপ্রকার "হাতের কাজে" প্রবৃত্ত হইল, তাহারা স্বকীয় ঐতিহ্য অনুসারে, ও আর্য্য মতামতের প্রভাবে কতকগুলি নূতন মণ্ডলীরূপে গড়িয়া উঠিল; ব্যবসায়ই তাহাদের যোগ-সূত্র ছিল বলিয়া মনে হয়।

সম-সাধারণ মতামতের আধিপত্যসত্ত্বেও অবস্থার পার্থক্যবশতঃ স্বয়ং আর্য্যদের মধ্যেও উপরি-উক্ত আন্দোলনের ন্যায় একটা আন্দোলন চলিতেছিল। আদিম-বাসীদিগের উক্ত আন্দোলন আর্য্যদিগের আন্দোলনকে আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিল, সম্পূর্ণ করিয়া তুলিল। এই দুই পক্ষের কোন পক্ষের মধ্যেই ব্যবসায়-সাম্য, একত্র সম্মিলনের মূলসূত্র ছিল না।

সামাজিক বা ঐতিহাসিক কতকগুলা বাহ্য উপাদানের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বাহিরে,—কতকগুলি নৈতিক উদ্দেশ্য, কতকগুলি আদিম-যুগসুলভ প্রবৃত্তি ও কতকগুলি মুখ্য বিশ্বাস ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনা আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই-সকল সূক্ষ্ম ও অনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াশক্তিগুলিকে দিবালোকের মধ্যে আনা বড়ই কঠিন।

ইতিপূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে এই-সকল শক্তির কথা আমি ছুঁইয়া গিয়াছি। হিন্দুর অন্তঃকরণটা অতীব ধর্ম্মশীল ও অতীব দার্শনিক। ঐতিহ্যের অটল রক্ষক এই হিন্দুর অন্তঃকরণ, কর্ম্মজনিত আনন্দের প্রতি, বাহ্য উন্নতির আকাঙ্ক্ষার প্রতি আশ্চর্য্যরূপে হতচেতন। অতীব প্রাচীন উপাদানে গঠিত যে-সমাজ তাহার ভিত্তি অদৃষ্টের উপর প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্বাসে হিন্দুরা পুরোহিতের আধিপত্য নির্ব্বিবাদে মানিয়া চলিল—এবং পুরোহিতমণ্ডলী ঐ সমাজের অপরিবর্ত্তনীয়তা গুরুতর কর্ত্তব্যের ন্যায় পালনীয় এবং উহার উচ্চনীচতার সোপান স্বাভাবিক নিয়মের ন্যায় অকাট্য এইরূপ ঘোষণা করিল।

যে-সকল মতবিশ্বাস ভারতের ধর্ম্মজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী ও লোকপ্রিয় সেই পুনর্জ্জন্ম বা যোনিভ্রমণের মতটির সহিত এই জাতের পদ্ধতিটি যোগ-সূত্রে আবদ্ধ। প্রত্যেকের পার্থিব অবস্থা পূর্ব্বজন্মগত কর্ম্ম-ফলেরই পরিণাম,—এই যে মত, এই মতের দ্বারাই জাতের অপরিবর্ত্তনীয়তা সমর্থিত হয়, ব্যাখ্যা করাও হয়। প্রত্যেক মানবের অদৃষ্ট অতীতের দ্বারা স্থিরনির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। সুতরাং বর্ত্তমানেও এই অদৃষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় ও স্থিরনির্দ্দিষ্ট। পাপপুণ্যের অনন্ত সোপানেরই অনুরূপ এখানকার সামাজিক পদমর্য্যাদার সোপান।

হিন্দুধর্ম্ম হইতে বিনিঃসৃত প্রায় সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ই এই যোনিভ্রমণবাদকে অকাট্য নিশ্চিতসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। প্রায় সকল সম্প্রদায়ই বিনা বিদ্রোহে বর্ণভেদ-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম, ধর্ম্মব্যবসায়ের দৃষ্টিভূমি হইতে, জাত-সমূহের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে নাই। জাত-নির্ব্বিশেষে সকলকেই ভিক্ষুমণ্ডলীর মধ্যে অক্লেশে গ্রহণ করা যায়, মোক্ষের পথে সকলকেই আহ্বান করা হইয়া থাকে। কঠোর যুক্তির নিয়মানুসারে, এই-সকল তথ্য, বর্ণভেদের উচ্ছেদ-সাধনে পর্য্যবসিত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহার কিছুই হয় নাই। এই সম্বন্ধে স্পষ্ট বাদবিসম্বাদ কিছুকাল পরে সমুত্থিত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—যে গ্রন্থখানি শুধু এ-বিষয়ের বাদ-বিসম্বাদেই পূর্ণ সেই "বজ্রসূচী", ব্রাহ্মণশ্রেণীর উচ্চ অধিকারকে বিশেষভাবে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা দুই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভুত্ব লইয়া বিবাদ, ইহা রীতিমত জাতের প্রতিবাদ নহে। এই জাত-পদ্ধতির বাহিরে কোন সমাজের অস্তিত্ব থাকিতে পারে, বৌদ্ধেরাও তাহা মনে করিতে পারিত না।

বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ন্যায় অন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ও কার্য্যতঃ জাত উঠাইয়া দিয়াছে; উহাদের দলের মধ্যে অসঙ্কোচে সকল দীক্ষার্থীকেই গ্রহণ করা হয়। অনেকগুলি সম্প্রদায়ের মধ্যে, উপবীত ত্যাগের দ্বারা, এই সাম্য-তত্ত্বকে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা হইয়াছে। পারিবারিক সমস্ত বন্ধন ছেদন, সংসার-ত্যাগ—এই ব্যাপারটাকে কিরূপে ভাল করিয়া ব্যক্ত করা যাইতে পারে? জাত হইতে কাহাকে বহিষ্কৃত করিবার সময়, যে ক্রিয়াকলাপ অনুসৃত হইয়া থাকে, সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-কলাপের অনুরূপ ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই এই ব্যাপারটা সুচারুরূপে পরিব্যক্ত হয়। যে পদ্ধতিকে জাতীয় জীবনের ভিত্তি বলিলেও চলে, তাহা রহিত করিবার কোন অভিপ্রায় তখনকার সাধারণ হিন্দুসমাজে ছিল না; বরং ভিতরকার বিস্তীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এমন কতগুলা সাধুদিগের মণ্ডলী

গড়িয়া উঠিল—যাহারা সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। সাধারণ ভক্তদিগের মধ্যে জাতটা নির্ব্বিবাদে বিরাজ করিতেছে। কোন-কোন বিশেষ স্থলে, নূতন ধর্ম্মসমাজ কতকগুলি নূতন উপবিভাগ সৃজনে সাহায্য করে, এই মাত্র।

এখনকার কালে আমরা আর একথা বলিতে পারি না যে, জাত উঠাইয়া দিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বা জৈনধর্ম্ম সমাজ-সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। বরং আমরা দেখিতে পাই, সেই যুগে বর্ণভেদপ্রথাটা হিন্দুর অন্তঃকরণে এরূপ গভীররূপে বদ্ধমূল ছিল,(১) কর্ম্মফলবাদ, পুনর্জন্মবাদ, মোক্ষবাদ প্রভৃতি মতবাদের ন্যায় উহা এতটা ধর্ম্মবিশ্বাসের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও জৈনসম্প্রদায়ও উহা উত্তরাধিকারসূত্রে নির্বিবাদে গ্রহণ করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাদল-গান

প্রাবৃট্-মেঘের ধূসর কালোয়
ধূমলবরণ আকাশ সুনীল।
বাদল-দিনের খবর কি আজ
বিলায় ধরায় পাগল অনিল?

আকাশ জয়ের বিপুল আশায়
বাজায় কে ওই বিজয়-বিষাণ?
বাজায় কে ওই মেঘের মাদল,
ওড়ায় কে আজ মেঘের নিশান?

হঠাৎ কখন্ মেঘের মেলায়
মাতন জাগায় পবন গোঁয়ার!
মুহূর্ত্তেকেই আকাশ-সায়র
ভাসায় হেলায় মেঘের জোয়ার।

হাজার যোজন মেঘের বিথার!
—তপন তারার নিদেশ না পাই!
দখল বজায় রাখতে রে আজ
টহল যে দেয় মেঘের সিপাই।

অযুত সেনার হে বীর চালক,
সবার উপর তোমার আসন;
জগৎপালক! প্রবল রাজন্!
জলদ! তোমার কঠিন শাসন।

সকল দিকেই পাঠাও তোমার
পাঠাও হে দূত তড়িৎ-আলোর।
শ্রাবণ-ধারায় ধরার উপর
নামাও তোমার জলের ঝালর।

জাগাও প্লাবন জলের ধারায়,
ছড়াও হে মেঘ সুধার পরশ।
কঠিন মাটির কাঠিন্যটুক্
ঢাকুক সবুজ নবীন সরস।

ফুটুক বকুল, ফুটুক কদম,
হাওয়ায় ভাসুক কেয়ার পরাগ।
জাগুক নাচন পাতায় পাতায়
ফুটুক ধরায় অপূর্ব্ব রাগ।

ভাসাও দুকূল সকল নদীর
কানায় কানায় ভরুক হে জল।
খরস্রোতার কলস্বনেই
আনন্দগান উঠুক কেবল।

মন্দাকিনীর পুণ্য জলে
করুক সিনান ধরিত্রী এই,
পবিত্র হোক্ নিখিল জগৎ
সলিল-সুধার পরশ পেয়েই।

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়

বৈষ্ণব-কবিতা

বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ আমাদের দেশের কোন কোন সাহিত্যিক বৈষ্ণব কবিতার মধ্যেই বাংলার গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠরূপ ফুটিয়াছে এবং বৈষ্ণব কবিতার ভিতরকার তত্ত্বের মধ্যে অধ্যাত্ম তত্ত্বের চরম বিকাশ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করেন। তাঁদের বিবেচনায় "বাংলা কবিতার প্রাণ ও বাংলা সাহিত্যের আদর্শ" সমস্তই ঐ বৈষ্ণব কবিতার মধ্যেই মেলে, কোন কোন বৈষ্ণব কবিতার মত রসরচনা "কোন দেশের সাহিত্যেই আজও পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই" এবং "বাঙ্গলায় প্রতীচ্যের নব আগমনে, তাহার আলোকে, তাহার বুকের সলিতা শুখাইয়া গেল, বাঙ্গলার দীপ নিভিয়া গেল"। অর্থাৎ প্রতীচ্যের সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক কালে বাংলাদেশে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁদের মতে সেটা কিছুই নয়—"বাংলা কবিতার প্রাণ" তার মধ্যে আদপেই নাই।

বৈষ্ণব রসতত্ত্বের বিচার পরে হইবে, আগে সাহিত্য-হিসাবে বৈষ্ণব কবিতার আলোচনা করা যাক। কেননা, এটা সত্য যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিতার অধিকাংশই গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ভণিতার অনেক আগেই তৈরি। তার পর বৈষ্ণবতত্ত্ব বলিলে ত কোন একজন তত্ত্বকারের রচনা বুঝায় না—তার মধ্যেও নানা সম্প্রদায় ও শাখাসম্প্রদায় আছে। যথা, রামানুজী, বল্লভী, জীবগোস্বামী সম্প্রদায় এবং এঁদের আবার নানা শাখাসম্প্রদায়।—এই নানা দলের নানা জটিল মতামতের ঋজুকুটিল পন্থার ভিতর দিয়া গেলে তবে বৈষ্ণবতত্ত্বের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। তারপর বৈষ্ণব সাধনারও বিস্তর ভেদ বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দেখি ; সহজে সাধনাকে মহাজন সাধকেরা নিন্দাই করিয়া থাকেন। অথচ মহাজন সাধনার অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে সহজেরা দিব্য প্রাকৃত ও সহজ করিয়া লইবার চেষ্টায় আছে এবং এক্ষেত্রে অপ্রাকৃতের চেয়ে প্রাকৃতের পরেই প্রাকৃতজনের মনের টানটা যে বেশী তা সম্প্রদায়ের ভিতরকার খবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন। এসব তত্ত্ব ও সাধনার পর আবার এখনকার ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীদের হালফ্যাসানের বৈষ্ণবতত্ত্ব ও সাধনা আছে। পুরাণো সাধনা ও তত্ত্বের সঙ্গে তার মিল নাই, কারণ তাতে একালের শিক্ষিত লোকের দিল খোলে না। তাঁরা বৈষ্ণব রসসাধনাকে যতটা জীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়ান, জীবনের সঙ্গে বাস্তবিক সে সাধনা ততটা জড়িত নয়। কিন্তু এ সব তত্ত্ব সময়ক্রমে আলোচনা করা যাইবে ; উপস্থিতমত বৈষ্ণব কবিতাকে শুধু সাহিত্যহিসাবে আলোচনা করিলে কাহারও আপত্তির কোন কারণ দেখি না।

চণ্ডীদাস ত বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া অনেকেরই ধারণা ; চণ্ডীদাসের কবিতায় তাঁর নিজের তত্ত্ব যাই থাক, অন্য কারো তত্ত্বেরই তিনি ধার ধারেন নাই এটা ঠিক। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবির রচনাগুলা নাড়াচাড়া করিয়া দেখা যাক, সাহিত্যহিসাবে তাদের কতটুকু মূল্য যাচাই করিয়া পাওয়া যায়।

মূল্য যাচাই করিবার কথাটা যখন তোলা গেল, তখন বাংলার কবিতার দর যাচাই বাংলাসাহিত্যের গ্রাম্য হাটেই করা যাইতে পারে এ কথাটা ভোলা ভাল। কেননা, বিশ্বসাহিত্যের হাটে ছাড়া অর্থাৎ বিশ্বমহাজনদের মহাজনী যেখানে চলিতেছে সেখানে ছাড়া, বৈষ্ণব মহাজন-পদের দর যাচাই সম্ভবে না। তবে যাঁরা মনে করেন যে বাংলা-দেশটা বিশ্বের চেয়ে বড়, যা নাই ব্রহ্মাণ্ডে তা এই দেশের ভাণ্ডের মধ্যে খাতিরজমা হইয়া আছে, সুতরাং এখানে যে সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা না করিয়াই সে-সব সাহিত্যের চেয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কলরব করিলেই সে কলরবটা ক্রমশ জনরবে পরিণত হইয়া অকাট্য সত্য হইয়া বসিবে—তাঁদের সঙ্গে আমার কোন তর্ক নাই। তাঁরা বিশ্বকে ছাড়িয়া স্বস্ব দেশের বিবরের মধ্যে চোখ কান বন্ধ করিয়া পড়িয়া থাকুন, বিশ্বের কোন খবর সেথায় যেন না পৌঁছায়।

বৈষ্ণব কবিতা কিছু সখ্য এবং যথেষ্ট পরিমাণে বাৎসল্য ও মধুর রসের কবিতা। বাঙালীর জীবনে এই দুটা রসই প্রধান—সেইজন্য দেখিতে পাই যে বৈষ্ণব কবিতার বর্ণনীয় বৃন্দাবন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ হয় বালগোপাল নয় কিশোর গোপীবল্লভরূপেই বন্দনীয় হইয়াছেন। হরপার্বতীর

পিতৃমাতৃত্ব শ্রীকৃষ্ণরাধার নয়—তাঁরা চিরকিশোর ও চিরকিশোরী, চিরন্তন যুগল। নন্দযশোদার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে বাৎসল্যরস, শ্রীদামসুদামাদি রাখালদের সঙ্গে সম্পর্কে সখ্যরস, এবং শ্রীরাধিকা ও গোপীদের সঙ্গে সম্পর্কে মধুর রস ফুটিয়াছে। এই তিন রসই বাস্তবিক বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়। আমরা মানুষের প্রেমেও এই তিন রসেরই লীলা দেখি—মায়ের ছেলের প্রতি প্রেম এক ধরণের প্রেম, সখায় সখায় প্রেম আর-এক ধরণের প্রেম, এবং "রায় কহে কান্তভাব প্রেমসাধ্য-সার"—যুগলপ্রেম প্রেমের চরমরূপ।

অথচ বৈষ্ণবসাহিত্যের বাইরের আশপাশ অর্থাৎ ঐ গোচারণ, বাঁশীবাজানো, রাসমণ্ডলের নৃত্যগীতাদি, গোপীদের সহিত প্রেমাভিনয় প্রভৃতির সঙ্গে আর মধ্যযুগীয় ফরাসী ইতালীয় সাহিত্যের পাস্তোরাল কবিতার বিষয়ের সঙ্গে মোটামুটি একটা সাদৃশ্য আছে। বৈষ্ণব কাব্যের সেই pastoral দিক্‌টাই মাইকেলের কল্পনাকে আবিষ্ট করিয়াছিল এবং তারি ফলে তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা আসলে প্রেমের কবিতা, কাজেই তাকে idyllএর মত ব্যবহার করিলে তার ঠিক রসটি আদায় করা অসম্ভব।

তবু, রূপ ও বস্তুর দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বৈষ্ণব-সাহিত্য অন্যান্য দেশের লোকসাহিত্যেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত। মধ্যযুগীয় ট্রুবেদোর বা কেল্টিক বা গেলিক ফোক্-লোর ও পুরাণকথা, পাস্তোরাল ও আইডিল্ জাতীয় রচনার সঙ্গে ইহার রূপগত ও বস্তুগত সাদৃশ্য কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। তবে যুগলপ্রেম ইহার প্রধান বিষয় হইয়াছে বলিয়া ইহা সময় সময় ইহার স্থূল পুরাণগত রূপ ও বস্তুকে বহুদূরে ছাড়াইয়া যায়—ইহা চিরন্তন মানবের হৃদয়ের বাণী হইয়া উঠে। পৃথিবীর বড় বড় প্রেমের কবির কাব্যের বাণীর সঙ্গে সেই সেই বাণীর সারূপ্য আছে।

প্রথমে সখ্যরসই দেখা যাক।

সখ্যরসের কবিতা বৈষ্ণব কবিতায় নাই বলিলেই হয়, যাহা আছে তাহা এত অল্প যে তাহা পড়িয়া কোন তৃপ্তিই হয় না। বলরামদাসের কতক কতক কবিতায় একটুখানি সখ্যরসের আস্বাদন হয় মাত্র। যেমন :—

ভোজন সমাপি' সবহুঁ ব্রজবালক
বৈঠল নীপক ছায়।
কালিন্দী-নীর সমীর বহই মৃদু
শীতল করু সব গায়॥
সুন্দর শ্যাম-শরীর।
শ্রীদামক কোরে অলস তঁহি শুতল
সুবল-কোরে বলবীর॥

নব নব পল্লব লেই সখাগণ
বীজই দুহুঁজন-অঙ্গে। ইত্যাদি

কিম্বা শ্যামের—প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ।
দেখি সব সখাগণের মনে হৈল দুখ॥
আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে।
সকালে যাইতে মা কহিয়াছে-ভারে॥
মলিন হইল কানাই মুখানি তোমার।
দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সবাকার॥ ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণ সুদামের কোলে শুইয়া আছেন আর শ্রীদাম তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন অথবা শ্রীকৃষ্ণের মুখ রৌদ্রে শুখাইয়া গিয়াছে দেখিয়া শ্রীদামের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, এর চেয়ে বড় সখ্যরসের কল্পনা বৈষ্ণব কবির নাই।

সখ্যরসের কবিতা পড়িতে হইলে পারস্য কবিতা, বিশেষতঃ হাফেজের কবিতায় যাইতে হয়। আমি মূল পড়ি নাই, কিন্তু অনুবাদ পড়িয়াই যে রস আস্বাদন করিয়াছি তাহা বৈষ্ণব কবিতায় কোথাও পাই না। হাফেজের কবিতায় জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্বন্ধ দুই সখার সম্বন্ধ—পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ নয়। জড়জগতের ও অধ্যাত্ম জগতের সকল সৌন্দর্য্য সেই সখার মুখজ্যোতির ছটা।

"তাঁহার মদির আঁখির ইঙ্গিত প্রেমিকের প্রাণকে কখনও ভাবে উন্মত্ত করে কখনও বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে, কখনও মধুর আহ্বানে আশ্বস্ত করে।"

"সখার প্রসন্নতা লাভ করিয়া যে সময়ে তিনি (হাফেজ) সুখী, তখন তাঁর কাছে সমরকন্দ ও বোখারার সমগ্র সম্পৎ সখার একটি কৃষ্ণ তিলের সমান মূল্যবান নয়।"

"ওহে সুন্দর, সুন্দর চন্দ্রমার যে দীপ্তি তাহা তোমারি উজ্জ্বল মুখের দীপ্তি; জগতে যাহা কিছু সুন্দর, তোমার মুখ-শোভাই তাহার সৌন্দর্য্যের উৎস।"

"তোমার দর্শন-পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠ পর্য্যন্ত আগত হইয়াছে; সে কি দেহে ফিরিয়া যাইবে, না বাহির হইয়া আসিবে—তোমার আদেশ কি?"

* হাফেজের কবিতাতে যেমন তেমনি হুইটম্যানের কবিতা-

তেও মধুরস নিবিড় হইয়া জমিয়াছে। "Of the Terrible Doubt of Appearances" নামক একটি কবিতায় কবি বলিতেছেন যে বিশ্বের সমস্তই মায়া ও ছায়া কি না এক এক সময় যখন সেই সন্দেহ হয়, মনে যখন নানা প্রশ্নের উদয় হইতে থাকে, তখন কবির বন্ধুরাই সেই সব প্রশ্নের অদ্ভুত রকমে উত্তর দেন।

"When he whom I love travels with me
or sits a long while holding my hand,
When the subtle air, the impalpable, the sense that
words and reason hold not, surround us and pervade us,
Then I am charged with untold and untellable wisdom, I am silent, I require nothing further,
I cannot answer the question of appearances or that
of identity beyond the grave,
But I walk or sit indifferent, I am satisfied,
He a hold of my hand has completely satisfied me.'

"আমি যাঁকে ভালবাসি, তিনি যখন আমার সঙ্গে ভ্রমণ করেন বা আমার হাতখানি ধ'রে অনেকক্ষণ ব'সে থাকেন,

যখন সূক্ষ্ম অনন্তভবগম্য বায়ু, বাক্যযুক্তির অতীত একটি বোধ আমাদিগকে নিবিড়ভাবে ঘিরে থাকে,

তখন আমি অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানের বিদ্যুতে বিদ্যুন্ময় হ'য়ে যাই,

আমি স্তব্ধ হই, আমি আর কিছুই চাই না।

"মায়া"র প্রশ্নের উত্তর বা মৃত্যুর পরপারে আমার অস্তিত্বের প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না,

আমি নিশ্চিন্ত মনে কখনো চলি কখনো বসি—কারণ আমি তখন তুষ্ট।

যে বন্ধু আমার হাতটি ধ'রে আছেন তিনিই আমায় পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়েছেন।"

আর একটি চমৎকার কবিতা উদ্ধার করি :—

"When I heard at the close of the day how my name
had been received with plaudits in the capitol, still
it was not a happy night for me that follow'd,
And else when I carous'd, or when my plans were
accomplish'd, still I was not happy,
But the day when I rose at dawn from the bed of
perfect health, refresh'd, singing, inhaling the ripe
breath of autumn,
When I saw the full moon in the west grow pale and
disappear in the morning light,
When I wander'd alone over the beach, and undressing bathed, laughing with the cool waters,
and saw the sun rise,
And when I thought how my dear friend my lover
was on his way coming, then I was happy,
O then each breath tasted sweeter, and all that day
my food nourish'd me more, and the beautiful day
pass'd well,
And the next came with equal joy, and with the next
at evening came my friend,
And that night while all was still I heard the waters
roll slowly continually up the shores,
I heard the hissing rustle of liquid and sands as
directed to me whispering to congratulate me,
For the one I love most lay sleeping by me under
the same cover in the cool night,
In the stillness in the autumn moonbeams his face
was inclined toward me,
And his arm lay lightly around my breast—
and that night I was happy."

"দিনশেষে যখন শুনলুম যে কন্‌গ্রেস-ভবনে আমার নামে প্রশংসাধ্বনি উঠেচে, তবু সে রাত্রি আমার সুখের রাত্রি হ'ল না।

তারপর যখন পানভোজন করচি, আমার সব অভিপ্রায় যখন সুসিদ্ধ হচ্চে, তখনও আমি সুখী হইনি।

কিন্তু সেদিন প্রত্যূষে যখন সুস্থ শরীরে শয্যাত্যাগ ক'রে জাগলুম, গান গাইলুম, শরতের পাকাধানের নিশ্বাস প্রাণভরে নিলুম,

দেখলুম পূর্ণচন্দ্র পশ্চিমে ম্লান হয়ে প্রভাতালোকে মিলিয়ে গেল,

সমুদ্রতটে আমি একলা বেড়াতে লাগ্‌লুম, স্নান করলুম, শীতল জলের হাসির সঙ্গে হাসলুম, দেখলুম সূর্য্যোদয়,

তখন আমার মনে হ'ল আমার প্রিয়বন্ধু আমার প্রণয়ী আমার কাছে আসবে—তখনই সুখী হলুম।

আঃ তখন প্রত্যেক নিশ্বাস মিষ্টতর মনে হ'ল, সমস্ত দিন আমার খাদ্য আমাকে বেশি করে পুষ্টি দিলে, সেই সুন্দর দিনের অবসান হ'ল।

তার পরের দিনও তুল্য আনন্দ নিয়ে এল, এবং তার পরের দিন সন্ধ্যায় আমার বন্ধু এলেন।

সেই রাত্রি যখন সমস্ত নিস্তব্ধ, আমি শুনলুম সমুদ্রের

বারিরাশি ক্রমাগতই সৈকতে ধীরে-ধীরে গড়িয়ে-গড়িয়ে আসচে,

তাদের অস্ফুট কলধ্বনি আমার কানে এল যেন আমারি কানে-কানে তারা আমার আনন্দে আনন্দ জানিয়ে গেল,

কারণ, যে আমার প্রাণের প্রিয় সে আমার পাশে একই আচ্ছাদনের নীচে সেই শীতল রাত্রে ঘুমিয়েছিল।

সেই স্তব্ধতায় সেই শরতের চন্দ্রালোকে তার মুখটি আমার দিকে নুয়েছিল।

তার বাহুটি আমার বুকে জড়িয়েছিল—সেই রাত্রিই আমি সুখী হয়েছিলাম।"

কৃষ্ণকে পাখার বাতাস করা বা রোদে তাঁর মুখ মলিন দেখিয়া কষ্ট পাওয়ার সখ্যরসের বর্ণনার চেয়ে হাফেজ বা হুইটম্যানের সখ্যরসের বর্ণনা যে অনেক বেশি নিবিড় ও বাস্তব এবং আধ্যাত্মিকও বটে, এটা বোধ হয় নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

তারপর বাৎসল্যরস। এ-রসে অবশ্য বাঙালীর জিৎ তাহা মানিতেই হইবে। খৃষ্টানদেশের আর্টে ম্যাডোনা ও বালযিশুর ছবিতে, Vicarious Motherhoodএর সাধনায় বাৎসল্যরসের পরিচয় পাওয়া গেলেও, কোন দেশেই বাৎসল্য-রসের এমন একান্ত প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই না। সুতরাং বৈষ্ণবের বৃন্দাবনলীলার এই দিক্‌টা যথেষ্ট বিকাশ পাইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু রায় রামানন্দের সঙ্গে তত্ত্ব-বিষয়ে প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু বাৎসল্য-প্রেমকে সখ্যপ্রেমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেও, সাহিত্য বা শিল্পে সখ্য বা কান্তপ্রেমের মত বাৎসল্যপ্রেমের বিচিত্র প্রকাশ হয় না। বাৎসল্যপ্রেমের প্রকাশ সংকীর্ণতর। কেননা ইহার মধ্যে কোথাও কোন অস্পষ্টতা নাই; এ প্রেমে অভিব্যক্তির কোন ক্রমপরম্পরা নাই। ক্রমে-ক্রমে জানিতেছি, ক্রমে-ক্রমে পাইতেছি, এবং পাওয়ার মধ্যে না-পাওয়ার বেদনা এবং না-পাওয়ার মধ্যে প্রাপ্তির আনন্দ, ভোগে ত্যাগ, ত্যাগে ভোগ উপলব্ধি করিতেছি—এ-সব রহস্য-বিচিত্রতা যাহা সখ্য বা যুগলপ্রেমে আছে তাহা বাৎসল্য-প্রেমে নাই। বালক কৃষ্ণের বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখানো প্রভৃতি কতকগুলি রহস্যের অবতারণা বৈষ্ণব কবিতায় শেষাশেষি দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কেবলি ননীছানা চুরি এবং যশোদার তাতে প্রশ্রয় এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিচিত্রবেশে সাজানো ইত্যাদি ঘোরো বাল্যলীলার কথাই পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক সাধনায় ইহার যত বড় মূল্যই থাক, কাব্য হিসাবে ইহার মূল্য অত্যন্ত কম।

"অরুণ অধর উরে নবনী লাগিয়াছে রে
মরি মরি বাছনি কানাই,
হেরি যশোমতি প্রেমেতে পূরিত আঁখি
আয় কোলে বলিহারি যাই।"

কিম্বা

"কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে।
রাণী দিল পূরি কর, খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল রায়—"

ইত্যাদি বাৎসল্য-রসের ঘোরো বর্ণনা সাহিত্যহিসাবে খুবই উঁচুদরের, একথা কোনমতেই মানা যায় না। ছেলে এবং মায়ের সম্বন্ধ শুধু ননী-ছানা চাহিবার এবং খাওয়াই-বার সম্বন্ধ নয়—তার চেয়ে অনেক গভীর। Tennyson-এর Rizpah'য় কবি যে মাতৃত্বের ছবি আঁকিয়াছেন, মায়ের যে বুকচেরা আকুল ক্রন্দন সেই কাব্যে ফুটিয়াছে, তার বাৎসল্য-প্রেম ননীছানা খাওয়ানো বাৎসল্য-প্রেমের চেয়ে ঢের বড়। বৈষ্ণব কবিতার সখ্যপ্রেম যেমন, বাৎসল্য-প্রেমও তেমনি—জীবনের নিতান্ত বাইরের দিক্‌কার একটু-খানি অংশকে তাহা ছোঁয়। Pastoral কাব্যের মত এ-সকলের রস নিতান্তই বাইরের রস—ঐ একটু পাখার বাতাস করা, আহা উহু করা, বা ননীছানা-খাওয়ানো বা শিখিপুচ্ছ দিয়া চূড়াবাঁধা—বস্ ঐ পর্য্যন্ত, তার বেশি নয়। সামান্য কবি Coventry Patmoreএর "Toys" কবিতার মধ্যে বা George Macdonaldএর "The Baby" কবিতার মধ্যে বা William Blakeএর Songs of Innocenceএর মধ্যে অথবা R. L. Stevensonএর A Child's Garden of Versesএর মধ্যে যে বাৎসল্যরস পাওয়া যায় তাহা সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলী ঘাঁটিলেও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। Tennysonএর De Profundisএর মত শিশুজন্মের রহস্যকথা বৈষ্ণবকবিতায় আছে কি? রবীন্দ্রনাথের নাম করিবার জো নাই—কারণ তিনি প্রতীচ্য

কবিতার নকল করিয়া নাকি প্রতীচ্য দেশে যশস্বী হইয়াছেন, কেননা প্রতীচ্য দেশের লোকেরা তাহাদের কাব্যের নকলটা ধরিতে পারে নাই,—নহিলে বলিতাম যে "শিশু" কাব্যে যে বাৎসল্যরস আছে—শুধু একটি কবিতা 'জন্ম-কথা'য় শিশুর আবির্ভাবের অনির্ব্বচনীয় রহস্যের যে সংবাদ আছে—সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলীতে তাহা কোথাও নাই।

"ছিলি আমার পুতুল-খেলায়
ভোরে শিব-পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি!
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে
তারি পূজায় তোমার পূজা করেছি!
"যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে,
আমার তরুণ অঙ্গে-অঙ্গে
জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে!
"সব দেবতার আদরের ধন
নিত্য কালের তুই পুরাতন
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী—
তুই জগতের স্বপ্ন হ'তে
এসেছিস্ আনন্দ-স্রোতে
নূতন হ'য়ে আমার বুকে বিলসি'!"

আচ্ছা, এইবার মধুর-রসেই আসা যাক।

মধুর-রসের বৈষ্ণবকবিতা আলোচনার আগে একটা কথা বলা দরকার যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বেকার বৈষ্ণব কবিতা কেবলি মধুররসসর্ব্বস্ব—সখ্য বাৎসল্যাদি রসের কবিতা তখন নিতান্তই কম ছিল। সহজে সাধনীয় ঐ মধুর রসেরই বাড়াবাড়ি, অন্যরসের আলোচনা বড় নাই।

"দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাভী শ্যাম-অঙ্গ চাটে"

গোপালত্বের এ-সব সৌন্দর্য্য গৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পরের সৃষ্টি।

আমি অবশ্য পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, খণ্ডিতা, মান, বিরহ প্রভৃতি যে-সকল ভাগে বৈষ্ণব মধুররসের পদাবলী সাজানো হইয়া থাকে, বৈষ্ণব-সাধনা-হিসাবে তার কি সার্থকতা আছে, তাহা আলোচনা করিতে চাই না। তবে এটা ঠিক যে সেই-সব ভাগের ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার গোপন প্রণয়ের একটা কাহিনী ক্রমশঃ বেশ জমিয়া ওঠে বটে। কিন্তু সেই কৃষ্ণকাহিনীর বিবৃতির জন্য কবিদের আত্মকাহিনী একেবারেই চাপা পড়িয়া যায়। অন্যান্য কবির জীবনের বিকাশ যেমন তাঁদের কাব্যাবলী আলোচনা করিলেই ধরা পড়ে, তেমনিতর বৈষ্ণবপদ-কর্ত্তাদের পদাবলী আলোচনা করিলে তাঁদের জীবনের বিকাশ কিছুমাত্র টের পাওয়া যায় না। তার প্রধান কারণ রাধাকৃষ্ণপ্রেমের কাহিনীটাকে আশ্রয় করিয়া তাঁদের আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ, ঐ কত-গুলি কৃত্রিম কোটরে কোটরে তাঁদের পদগুলিকে গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে—সুতরাং তাঁদের ভাবের ক্রমবিকাশ নির্ণয় করিবে কে? তৃতীয় কারণ, লোকের মুখে মুখে পদকর্ত্তাদের রচনায় ভাষার এমনি বদল হইয়াছে যে, সে ভাষার ভিতর হইতে রচনার কালনির্ণয় একেবারেই দুঃসাধ্য। এইজন্য বৈষ্ণবকবিদের ব্যক্তিত্বের আভাস টুক্‌রা টুক্‌রা ভাবে পাওয়া যায় মাত্র; ব্যক্তিত্বের পুরা চেহারা দেখিবার কোন উপায় নাই। বৈষ্ণব-কবিতা ব্যক্তিত্বের কবিতা হয় নাই।

তারপর রাধাকৃষ্ণের গোপনপ্রণয়ের ঐ কাহিনীটা এমনি ঘোরতর যৌন-সম্বন্ধের কাহিনী, যে, তাহার বর্ণনায় কামশাস্ত্রের মালমসলা জোগানো ছাড়া উচ্চ মানব-প্রেমের বিশেষ কোন মালমসলা জোগানো যায় না। শ্রীযুক্ত বিনয়-কুমার সরকার তাঁর নবপ্রকাশিত "Love in Hindu Literature" নামক গ্রন্থে বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"The Padavali are the songs of delight in flesh"—পদাবলী কেবল ইন্দ্রিয়ভোগের আনন্দের গান। অন্ততঃ অধিকাংশ পদাবলী যে তাই, এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন নাই। চণ্ডীদাস ইন্দ্রিয়লালসার নিম্নগ্রাম ছাড়াইয়া প্রেমের উচ্চস্বরগ্রামে উঠিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় এবং স্থানে স্থানে তিনি উঠিয়াছেনও বটে, তবু তাঁর রচনার মধ্যেও ইন্দ্রিয়লালসার গান যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে নিম্নলিখিত পদটি উদ্ধার করা যাইতেছে। সর্ব্ব-সাধারণের পাঠ্য কাগজে সকল পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল না।

সখাহে ওধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা-গোরী নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥

শুনহে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কে ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপর পা॥
* * *
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলি আদেশে
শুনহে নাগরচন্দ্র।
সে যে বৃকভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥

এ-সব কবিতার সঙ্গে Songs of Solomon অথবা "শৃঙ্গার-শতক" অথবা কালিদাসের "ঋতুসংহার" প্রভৃতি লালসামূলক কবিতার তুলনা চলে। কিন্তু তাও ঠিক্ চলে না। কারণ ঐ-সব কবিতার মধ্যে কল্পনার দিক্‌টা বেশ আছে, তাছাড়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরস প্রচুর পরিমাণেই আছে। বৈষ্ণব কবিতায় তা নাই; এ শুধুই দৈহিক বিকারের বর্ণনা। এরূপ বর্ণনা সম্প্রতি সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" পুস্তক যেমন আছে, Havelock Ellisএর Sex-Psychology ছয় ভলুম বা "কাম-শাস্ত্র" পুস্তকেও তেমন পাওয়া যাইবে না।

বিদ্যাপতি তো এই কামের মধ্যে মজিয়া আছেন—কিশোরীর দেহের রূপ ভিন্ন আর কিছুরি কথা তাঁর মনে লাগে না। তাঁর কাব্যে কেবলি:—

"মধু ঋতু মধুকরপাঁতি
মধুর কুসুম মধু মাতি।
মধুর যুবতীজন-সঙ্গ
মধুর মধুর রসরঙ্গ।"

কেবলি—

"নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি।"

কিন্তু বিদ্যাপতি এইরূপ একান্ত ইন্দ্রিয়ভোগের কবি হইলেও তাঁর কবিতার মধ্যে খাঁটি সাহিত্য-রস আছে। জয়দেব ছাড়া এমন পদলালিত্য, ছন্দের এমন ঝঙ্কার, আর কোন বৈষ্ণব কবিরই নাই। অবশ্য সে ঝঙ্কার ও শব্দ-লালিত্যও কেবল কানেরই জিনিস—কানকেই সুখ দেয়,—প্রাণ পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। কীট্‌সের সঙ্গে কোথাও কোথাও ইন্দ্রিয়ভোগের বর্ণনায় বিদ্যাপতির মিল আছে।

আমি বিনয়বাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইয়া বলি যে বিদ্যাপতির এই-সব কবিতার মধ্যে কোন কালেই কোন রূপক ছিল না বা নাই—এ-সব কবিতা নিছক কামের কবিতা, আর কিছুই নয়। বিনয় বাবু ঠিকই লিখিয়াছেন, "Vidyapati is a professor of Kama-shastra"।

অবশ্য "জনম অবধি হম্ রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল" এই পংক্তি যে পদটিতে আছে বিদ্যাপতির সেই পদ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া কীর্ত্তিত। সেই পদটিতে আছে যে, জন্ম হইতেই রূপ দেখিলাম, অথচ রূপের সীমা পাইলাম না; লক্ষ লক্ষ যুগ প্রিয়জনকে হিয়ায় হিয়ায় রাখিলাম তবু হিয়া জুড়াইল না। বাস্তবিক প্রেমের এই যে অনন্ত ব্যাকুলতার কথা, ইহা বিদ্যাপতির আর কোন কবিতায় পাওয়া যায় না। Keatsএর Grecian Urnএর সঙ্গে এ কবিতার তুলনা চলে; সেই কবিতায় কীট্‌সও ক্ষণিক সৌন্দর্য্যকে অমর করিয়া দেখিয়াছেন। ব্রাউনিংএর Two in the Campagna'র সেই দুই ছত্র মনে পড়ে—"Infinite passion and the pain of finite hearts that yearn"। কীট্‌স্‌ও ইন্দ্রিয়সুখভোগের কবি, বিদ্যাপতিও তাই—কিন্তু কীট্‌স্ যেমন সেই সুখভোগের ভিতরেও হঠাৎ এক জায়গায় এক সময়ে একটা detachment, একটা ভোগ-বিরতির অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁর Grecian Urn কাব্যে সমস্ত চঞ্চলভোগ ও সৌন্দর্য্যের অনন্তত্ব অনুভব করিলেন, তেমনি বিদ্যাপতিও ঐ পদটি রচনার কালে ক্ষণকালের মত ভোগবিরতির অবস্থায় পৌঁছিয়া রূপের ও ভোগের অনন্তত্ব অনুভব করিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু বিদ্যাপতির সমস্ত কাব্যের মধ্যে এই একটিমাত্র কবিতা যদি দাঁড়ায়, তবে তাহাতে বৈষ্ণব কবিতা জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতা হয় না। বিদ্যাপতির বেলায় যেমন দেখিতেছি, চণ্ডীদাসের বেলায় এবং অন্যান্য কবিদের বেলাতেও তেমনি দেখিব যে তাঁদের পদাবলীর দৈহিক প্রবৃত্তি-মূলক পদগুলি ছাড়িয়া দিলে খাঁটি প্রেমের কবিতা অতি অল্পই দাঁড়ায়। বিদ্যাপতির যদি দাঁড়ায় একটা, চণ্ডীদাসের গুটি দশ কি বড় জোর পনেরোটা কবিতা উৎরাইতে পারে।

চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতি বা অন্য কোন বৈষ্ণব কবিরই সঙ্গে তুলনা করা যায় না—চণ্ডীদাসের মধ্যে কামের কবিতা যথেষ্ট থাকিলেও প্রেমের কবিতাও যথেষ্ট আছে। তার

কারণ চণ্ডীদাস সত্যসত্যই প্রেমিক কবি ছিলেন। দান্তের বিয়াত্রিচের মত, শেলির মেরি গড্‌উইন্ ও অন্যান্য প্রেমিকার মত, চণ্ডীদাসের "রামী" ছিল। এবং "চণ্ডীদাস সনে রজকিনী-প্রেম কামগন্ধ তাহে নাহি"—এটা তাঁরি খুব জোরের উক্তিও বটে। তবু সেই চণ্ডীদাসের হাত দিয়া Vita Nuova বা Epipsychidion বা One Word Moreএর মত কোন অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম প্রেমের কবিতা কি বাহির হইয়াছে? অবশ্য প্রেমের খুব নিবিড় (intense) প্রকাশ মধ্যে মধ্যে চণ্ডীদাসে পাই বটে। তারি দুটি একটি নমুনা নিম্নে উদ্ধার করিতেছি।

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে　　জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।
তোমার চরণে　　আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া　　এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হৈলাম দাসী।" ইত্যাদি

এর চেয়েও যেখানে তিনি রামীকে—"তুমি বেদবাদিনী" ইত্যাদি উচ্ছ্বসিত স্তবে বন্দনা করিতেছেন, সেই বন্দনাটি এক আশ্চর্য্য পদ।

কবি রসেটি তাঁর "House of Life"এ বলিয়াছেন যে, সকল বড় কবিতাই কবির জীবনের রূপান্তর মাত্র (transfigured life of the poet)। চণ্ডীদাস পড়িলে এই মতের যাথার্থ্য বুঝা যায়। দান্তের জীবনের রূপান্তর যেমন ভিটা-নুওভা, চণ্ডীদাসের জীবনের রূপান্তর তেমনি তাঁর অনেকগুলি পদ—যে-সকল পদে তিনি আর কৃষ্ণরাধার প্রেমের কথা বলেন নাই, তিনি তাঁর নিজের প্রেমের অপূর্ব্ব উপলব্ধির কথাই বলিয়াছেন।

কিন্তু কোথায় দান্তে আর কোথায় চণ্ডীদাস! "ভিটা নুওভাতে" দান্তে বলিয়াছেন যে তাঁর চিন্তা "Pilgrim Spirit" তীর্থযাত্রীর মত সমস্ত পাপবাসনা ও নীচতাকে পিছনে ফেলিয়া পুড়াইয়া দিয়া, যে অক্ষয় স্বর্গলোকে দেবী-প্রতিমার মত তাঁর সেই প্রাণপ্রতিমা নিত্যবিরাজিত, সেখানে ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হইতে লাগিল—সমস্ত ভিটা-নুওভা সেই ক্রমোত্থানের ইতিহাস্। চণ্ডীদাসের কোনো রচনায় প্রেমের দ্বারা সেই পরিপূর্ণ আত্মশোধনের ইতিহাস পাই না। চণ্ডীদাসের কোন রচনাতেই Epipsychidionএর "Love's rare universe" প্রেমের অপূর্ব্ব জগৎ, অথবা One Word Moreএর "novel silent silver lights and darks undream'd of" "নীরব রজতশুভ্র স্বপ্নসম ছায়া আর আলো"র খবরও পাই না। তবে প্রেম সম্বন্ধে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে মাঝে মাঝে অনেক চমৎকার বাক্য আছে, যথা:—

"পিরীতি নগরে　　বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর
পিরীতি দেখিয়া　　পড়শী করিব
তাবিনু সকলি পর॥"

কিম্বা

"পিরীতি অন্তরে　　পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল সে।
পিরীতি রতন　　লভিল সে জন
বড় ভাগ্যবান্ সে॥
পিরীতি লাগিয়া　　আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন　　করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি সাধন　　বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া　　এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ।"

উদ্ধৃত দ্বিতীয় কবিতার শেষ ছত্র পড়িলে শেলির এপিসাইকিডিয়নের একটি লাইন মনে পড়ে:—

"Ah me!
I am not thine, I am a part of thee!"

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কামের রাজ্য ছাড়াইয়া প্রেমের স্বাধীন রাজ্যে একমাত্র চণ্ডীদাসই যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন তার পরিচয় এই গুটিকতক মাত্র পদাবলীতে পাই। যদি কোন তুলনা করিতে হয়, তবে চণ্ডীদাসের এই প্রেমের ব্যাকুলতার সঙ্গে বরং রবার্ট বার্ন্সের কিংবা হাইনের অনেক গানের একটা ভাবগত সাদৃশ্য পাওয়া যাইতে পারে। কারণ বার্ন্সের মত চণ্ডীদাসের প্রেমের বিশেষত্বই হইতেছে, একটা সরল আবেগ-তন্ময়তা, একটা বেদনাময় নিবিড়তা (intensity)। নিম্নে উদ্ধৃত পদটি তাহার সুন্দর উদাহরণ:—

"কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥"

ইহা পড়িলে বার্ন্‌সের সেই পংক্তিগুলি কি মনে পড়ে না?—

When I sleep I dream
When I wauk I'm eerie,
Sleep I can get nane
For thinking on my dearie.

কিন্তু এরকমের যথেষ্ট পদ চণ্ডীদাসে নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বড় জোর দশটি কি পনেরটি পদ পাওয়া যাইতে পারে। তার বেশি নয়। বাকি সমস্তই কামোদ্দীপক পদাবলী; সাহিত্য-হিসাবে তার মূল্য কিছুই নয়।

রবি বাবু বহুপূর্ব্বে তাঁর "সমালোচনা" গ্রন্থে বিদ্যাপতির রাধিকা ও চণ্ডীদাসের রাধিকার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া চণ্ডীদাসের রাধিকাকে রসেটিরই মত চণ্ডীদাসেরই transfigured life বা রূপান্তরিত জীবন বলিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের রাধিকা যে চণ্ডীদাস নিজেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—অবশ্য যেখানে যেখানে চণ্ডীদাস আপনিই আপনার গভীরতর ব্যক্তিত্বের কথা বলিয়াছেন। চণ্ডীদাসের সেই রাধিকার প্রেম আবেগে অধীর, অথচ সুখদুঃখ জন্ম-মৃত্যুর দ্বন্দ্বাতীত। প্রেমের সেই আবেগের বেদনায় তিনি বলিতেছেন "দুই এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া পাঁজর ধসিয়া গেল" এবং "ধসিতে ধসিতে সকলি ধসিল নিৰ্ম্মল হইল দেহ।" কারণ চণ্ডীদাসের এ প্রেম অন্যান্য বৈষ্ণব কবির মত কাম নয়, কামকে ধ্বংস করিয়া তবে ইহার প্রতিষ্ঠা।

তিনি বলিতেছেন:—

"মনের সহিতে করিয়া পিরীতি
থাকিব স্বরূপ আশে
স্বরূপ হইতে ওরূপ পাইব
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে।"

চণ্ডীদাসের এ প্রেম নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া গেলেও সকল সম্বন্ধকে ছাড়াইয়া আছে। কারণ, এ প্রেমের প্রতিষ্ঠা কোন খণ্ডকালে নয়, সে একেবারে অনাদিকালে। তাই চণ্ডীদাস বলিতেছেন, "দিবস রজনী না ছিল যখন তখন গণেছি মাস।" এবং "মা বাপ জনম না ছিল যখন আমার জনম হ'ল" এবং "কহে চণ্ডীদাস কে আমি কে তুমি ইহা না বুঝয়ে কেহ।" অনাদিকাল হইতে এই 'কে আমি কে তুমি' এই দুজনের রহস্যে দুজনে মজিয়া আছে। বাস্তবিক চণ্ডীদাসের এ-সব কবিতা অতি বিস্ময়কর। অতএব, বৈষ্ণবকবিতার মধ্যে একা চণ্ডীদাসের কতক-কতক কবিতারই বিশ্বসাহিত্যে স্থান হইতে পারে এবং বিদ্যাপতির দু-একটা পদেরও হইতে পারে দেখা গেল। তারপর জ্ঞানদাস, বলরামদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর প্রভৃতি পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসেরই ছায়া। তবু তাঁদেরও দু-একটা পদ খুবই চমৎকার এবং চিরকাল আদরের যোগ্য। যেমন জ্ঞানদাসের "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর" পদটি। কিম্বা বলরামদাসের "তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি" পদটি—যাহাতে সেই চমৎকার পংক্তিটি আছে "হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।"

কিন্তু কথা এই যে, এই দুচারটে কবিতাই কি "বাংলা-কবিতার প্রাণ ও বাংলাসাহিত্যের আদর্শ" হইয়া গেল? বৈষ্ণবকবিতা যে-জায়গায় আছে তার চেয়ে বাংলাসাহিত্য যে অনেক বেশি অগ্রসর হইয়া গেছে! যদি বৈষ্ণবকবিতার মত রচনা "কোন দেশেরই সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই" ইহা সত্য হয়, তবে তো বিশ্বসাহিত্যের অত্যন্ত দুর্দ্দশা দেখিতেছি। অথচ পৃথিবীর মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবি, যেমন দান্তে বা শেলি বা ব্রাউনিং, তাঁদের কারো সঙ্গেই কোন বৈষ্ণব কবি কোন দিক্ দিয়াই তুলনীয় নন্। সমস্ত বৈষ্ণব কবিতা একদিকে করিলেও শেলির একখানা এপিসাইকিডিয়নের মূল্য উঠিবে না। আজ যদি বিশ্বসাহিত্যের সভায় বৈষ্ণব-কবিতাকে হাজির করিতে হয়, তবে তার পনেরো আনা লালসামূলক পদাবলী ঝাঁটাইয়া ফেলিলে বাকী এক আনা কি সিকি আনা যে পদগুলি অবশিষ্ট থাকিবে, তাও কি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতার সঙ্গে সমান আসন গ্রহণ করিতে পারিবে? কোন মতেই নয়। চণ্ডীদাস লিখিলেন যে "দিবস রজনী ছিল না যখন তখন গণেছি মাস" অর্থাৎ যুগল সম্বন্ধের আরম্ভ কোন্ অনাদি কালে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি যে এমন কথা চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে বা পরে এদেশে বা অন্যদেশে কেউ বলিতে পারেন নাই,

তবে সেটা কি ঠিক সত্যকথা হয়? রবিবাবুর "অনন্ত প্রেম" এর চেয়ে বড় জিনিষ। ব্রাউনিংএর "Evelyn Hope" বা "Christina" এর চেয়ে ঢের বড় জিনিষ। ক্রিষ্টিনার প্রণয়ী বলিতেছে—

"Ages past the soul existed
Here an age 'tis resting merely,
And hence fleets again for ages,
While the true end sole and single
It stops here for it, this love-way
With some other soul to mingle?"

অর্থাৎ, যুগযুগান্ত পূর্ব্বে আত্মা ছিল—এইযুগে এখানে সে কেবল বিশ্রাম করচে—আবার যুগযুগান্তের দিকে সে ধাবিত হবে। কিন্তু এই যে এখানে সে থাম্‌ল এর একটিমাত্র সত্য উদ্দেশ্য হচ্চে এই প্রেম, এই প্রেমের পথটি বের করা, এই এক আত্মা আর-এক আত্মার সঙ্গে সেই পথে মিল্‌বে ব'লে!

চণ্ডীদাসের প্রেম আবেগে নিবিড় বটে; কিন্তু সমস্ত জীবনের বিচিত্র সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া সে প্রেমের বিচিত্ররূপ ত ফোটে নাই। সেই জন্য তার সুর একতারার একটি তারের সুরের মত—তাতে নানা-তারের নানা সুরের হার্ম্মনি নাই। তারপর চণ্ডীদাসকে বাদ দিলে বৈষ্ণবকবিতায় ত আর কিছুই থাকে না। সুতরাং যাঁরা এই দুটো-চারটে কবিতার মহিমা-কীর্ত্তনে এত ব্যস্ত যে আধুনিক অন্য কোন কবিতার মহিমাই তাঁদের চোখে পড়ে না বা মনে ধরে না, তাঁদের এই অন্ধতা কিম্বা একদেশ-দর্শিতার কোন কারণই আমি খুঁজিয়া পাই না। বৈষ্ণব-কবিতায় যাহা পাওয়া যায় অমন আর কোথাও পাওয়া যায় না—একথা কি সব সাহিত্য নাড়িয়া চাড়িয়া তাঁরা বলেন, না এটা তাঁদের কাল্পনিক বিশ্বাস মাত্র?

অবশ্য প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব-সাহিত্যের স্থান সর্ব্বোচ্চে—কারণ শাক্তযুগের মঙ্গলকাব্যে শক্তির অন্ধ খেয়াল ও ভীষণরুদ্রতা মানুষের মনকে নিদারুণ পীড়া দিয়াছিল, সেই শক্তিকে মা বলিয়া কতকটা সান্ত্বনা আদায়ের চেষ্টা মানুষ করিয়াছিল। তারপর বৈষ্ণব ধর্ম্ম সেই রুদ্রশক্তিকে যখন প্রেম বলিয়া ঘোষণা করিল, তখন সেই প্রেমের অধিকার সেই প্রেমের স্বাধীনতার আনন্দে মানুষ যে গান গাহিল সে গান একেবারেই অপূর্ব্ব ও নূতন। তখন এক নূতন ভাষা হইল এবং নূতন নূতন ছন্দে মানুষ সেই প্রেমের আনন্দকে ভাষার লীলায়িত করিয়া তুলিল। বৈষ্ণব পদাবলীতে ভাষা ও ছন্দের অপূর্ব্বতার কারণই তাই। এ সাহিত্যের পিছনে একটা প্রকাণ্ড ভাব বিপ্লবের ইতিহাস রহিয়াছে, একথা সর্ব্বদাই মনে রাখা দরকার।

কিন্তু যিনি যাই বলুন, এটা ঠিক জানি যে, ভাবী বাংলা কবিতার ধারা আর রাধিকার নব নব "রূপান্তর" ঘটানোতে নিযুক্ত থাকিবে না। যিনিই যত দিব্য চক্ষে দেখুন না কেন, বৈষ্ণবকবিতার পুনরাবৃত্তির কাজে বা রূপান্তর সাধনে বাংলাকবিতা কোন কালেই লাগিবে না। কারণ বাংলা-কাব্যসাহিত্যের মধ্যে এখন বিশ্বসাহিত্যের হাওয়া বহিয়াছে। বাংলাকবিতা এখন আর সেই বৃন্দাবন পুরাণটাকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না। এখন তার বিষয়—মানুষের বিচিত্র জীবনলীলা, বৃন্দাবনলীলা নয়। তার বর্ণনীয় রাসমণ্ডল—সমস্ত বিশ্বের সমস্ত বিশ্বমানবের "বিবর্ত্ত-বিলাস"। তার যুগল প্রেম শুধু মধুর রসে আবদ্ধ নয়, শুধু নীপকুঞ্জে তার অভিসার নয়—জীবনের বিচিত্র ঋজুকুটিল পথে তার অভিসার, কত সংশয় দ্বন্দ্ব পাপের মধ্যে তার অভিসার; কত উত্থানপতন জয়পরাজয়ের ভিতর দিয়া তার অভিসার-যাত্রা! এ প্রেমের মধুর রস জীবনের বিচিত্র রসের মধ্য দিয়া তবে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইবে। এই বিচিত্রতাকে জোর করিয়া অস্বীকার করিবে—এত বড় জীবনটাকে দূরে রাখিয়া তবে রসের খেলা হইবে? যাঁহার চোখ আছে, তিনিই দেখিতে পান যে বৈষ্ণবকবিতার এই ধারাকেই পূর্ণতর করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমর কাব্য-গুলি রচিয়াছেন। বৈষ্ণবকবিতা যে জীবনবিমুখ, তাহা যে জীবনের কবিতা নয়, তাহা 'সোনার তরী'তেই কবি উপলব্ধি করিয়া তাহাকে জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। "বৈষ্ণব কবিতা" নামক কবিতায় তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন,—

"এ সঙ্গীতরসধারা নহে মিটাবার
দীনমর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা?"

কারণ, স্পষ্টই দেখিতেছি যে, বৈষ্ণবের সখ্য মানে এ নয় যে জীবনের নানা সখ্যসম্বন্ধের মধ্যে সেই পরম সখার সঙ্গে সখ্যরসের আদানপ্রদান করা। বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সখ্য হইয়াছিল, সেই পুরাণ-কথা শ্রবণ করিয়া যেটুকু সখ্যরস মনে উপজিত হয়—সেইটুকু পর্য্যন্ত তার দৌড়। বৈষ্ণবের বাৎসল্য মানে এ নয়, যে, আমাদের ঘরে ঘরে যে বৎস রহিয়াছে তারি মধ্যে ভগবানের বাৎসল্যরস উপলব্ধি করা। বালগোপাল কৃষ্ণের বিগ্রহকে বৎসরূপে সেবা করার দ্বারা যেটুকু বাৎসল্যরস মনে জাগে, সেইটুকু পর্য্যন্ত তার দৌড়। তার বেশি নয়। আর মধুর রস মানেও এ নয় যে সকল বাস্তব যুগলসম্বন্ধের মধ্যে সেই অনাদি-অনন্ত নিত্য যুগল সম্বন্ধকে উপলব্ধি করা। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণের অবতার বলিয়া তাঁর মধ্যে শ্রীরাধিকা-ভাব ফুটিয়াছিল মাত্র, আর কোন বৈষ্ণবের পক্ষে নিজেকে রাধিকা কল্পনা করাও heresy। আর বাস্তব যুগল সম্বন্ধের ভিতর দিয়া ঐ রসের কোন উপলব্ধির কথাই নাই; কারণ বৈষ্ণব সাধনায় বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই। "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান"। "স্বর্গ হইতে বিদায়ের" কবি সেই বৈষ্ণব রসধারাকে আমাদের মত "দীনমর্ত্ত্যবাসীদের" জীবনে জীবনে এবং জীবনের প্রতি-অভিজ্ঞতার মধ্যে অজস্র বহাইয়া দিয়াছেন, এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব বলিয়া আমার বিশ্বাস।

অতঃপর বৈষ্ণব তত্ত্বের কথা আর কোন একসময়ে হইবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

নূতন চরের চাষী

কূল থেকে ওই ধু ধু দেখায় নূতন-পড়া চর।
কেমন সুখে কাটায় তারা হোথায় যাদের ঘর?
চৌদিকেতে জলের মেলা—
পদ্মাবতীর প্রলয়-খেলা,
মাঝখানেতে সবুজ-ভেলা যাচ্ছে যেন ভাসি!
কেমন সুখে কাটায় সেথা নূতন চরের চাষী?

সকাল বেলা সূয্যি ওঠে নদীর জলে নেয়ে।
সোনার ঢেউয়ে পাল তুলে যায় জেলে-ডিঙি ধেয়ে।
সিক্ত বেলায় ঝাঁকে ঝাঁকে
চকা চকী যখন ডাকে,
হংস, মরাল, সারস, সরাল, করে হাসাহাসি—
কেমন সুখে জেগে ওঠে নূতন চরের চাষী?

দুপুর বেলা রৌদ্র লেগে মুচ্‌কে হাসে বালু।
বোরো ধানের লহর খেলে যেখানটাতে ঢালু।
শাদা শাদা কাশের ফুলে
লক্ষ হাজার চামর দুলে,
বুনো ঝাউয়ে বাতাস লেগে বেজে ওঠে বাঁশী;
তারি পাশে লাঙল চষে নূতন চরের চাষী!

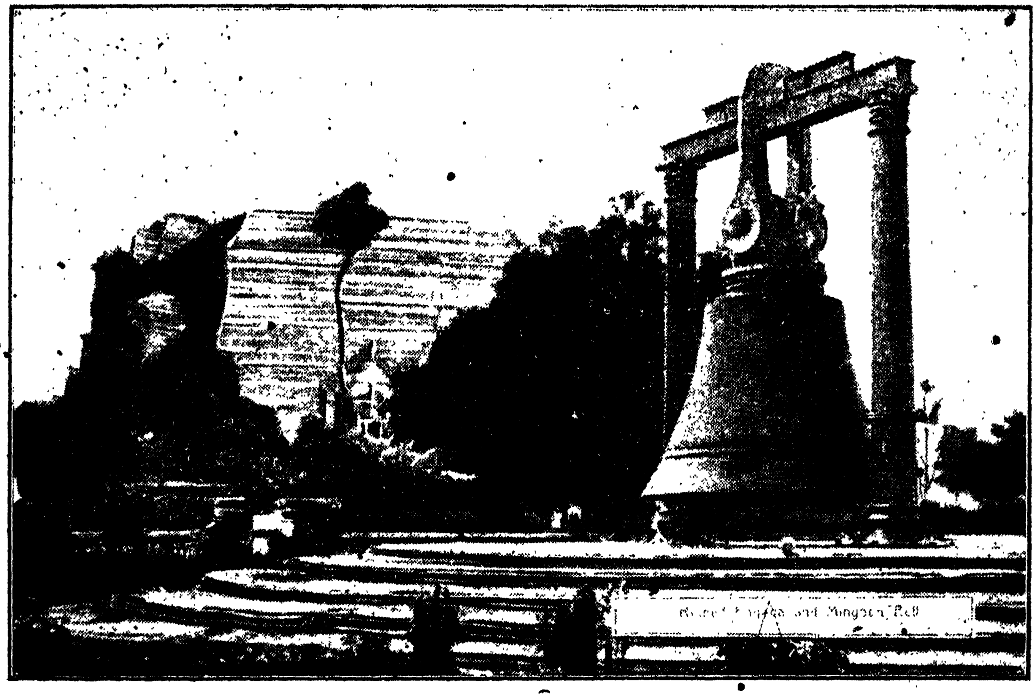
ওপারেতে ভাঙন-কূলে কালো গাছের সারি—
সেথায় নেমে সূয্যি যখন গোঁজে আপন বাড়ী,
চরের পারে শ্যামল তীরে
শেষ খেয়াটি তখন ভিড়ে,
হোগলা-বনে গুঞ্জে উঠে বাবুই রাশি রাশি,—
হাট বেসাতি নিয়ে নামে নূতন চরের চাষী।

সাঁঝের পরে কাজের খতম রাখলে লাঙল গরু,
আদর ক'রে ঘরে নে যায় আপন ছাওয়াল জরু,
ঠিক তখনি চক্রবাকে
চক্রবাকীর মিলন মাগে,
কণ্ঠে তাহার ঘুমপাড়ানি গীতের মোহন বাঁশী;—
তারি মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে নূতন চরের চাষী!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

মন্দালয়

মন্দালয় বা মণ্ডলে ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজধানী। রাজা মিন্দুন মিন ১৮৫৭ সালে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা রেঙ্গুন থেকে রেলপথে ৩৮৬ মাইল দূরে। এই রেল-লাইন ১৮৮৯ সালে খোলা হয়। সুতরাং রেল-ষ্টেসনটি পুরাতন, অথচ ব্রহ্মদেশের বিশেষত্ব স্থাপত্যের কারুকার্য্য ঐ বাড়ীটিকে



ব্রহ্মদেশের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্যাগোডা মন্দির ও মিঙ্গুন ঘণ্টা। এই ঘণ্টার বাহিরের ব্যাস ১৬ ফুট ৩ ইঞ্চি ; ভিতরের ফুকরের ব্যাস ১০ ফুট ; ভিতরের ফুকরের খাড়াই ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি, বাহিরের খাড়াই ১২ ফুট। ঘণ্টার ওজন ৮০ টন বা ২১৬০ মোন।

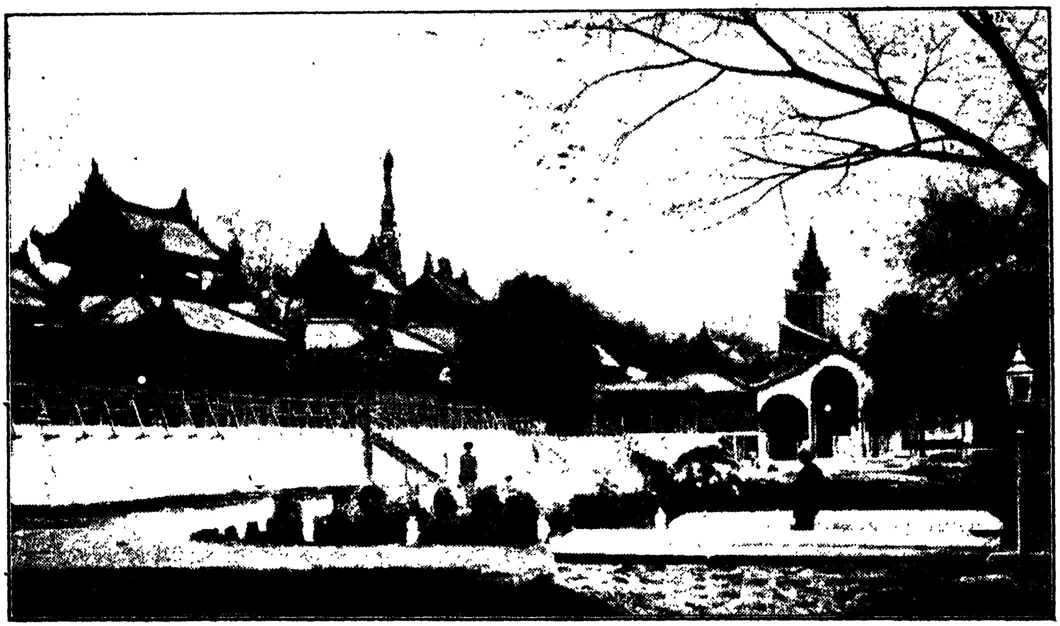
সুন্দর শোভন করেনি। ষ্টেশন হতে বাহির হলেই একটি গোল বাগান চোখে পড়ে। পথের বাঁ-ধারে ষ্টেসনের নিকটেই ডাক-বাংলা। তার কাছেই হাঁসপাতাল ; তার হাতায় সুন্দর বাগান।

শহরটির আয়তন রেঙ্গুনের চেয়ে বড়। পুরাতন শহর বা ডাফরিন-কেল্লা থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম দিকে নদীর ধার পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে শাঞ্জু ষ্টেসন পর্য্যন্ত শহরটি বিস্তৃত। শাঞ্জু ষ্টেসনটি মণ্ডলে বা মন্দালয় শহরের দক্ষিণ সীমায়। সেখানে প্রসিদ্ধ মহামুনি-মন্দির বা আরাকান-প্যাগোডা অবস্থিত। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মহামুনি বুদ্ধের প্রকাণ্ড মূর্ত্তিটি আরাকান দেশ থেকে ডাঙ্গা-পথে ১৭৮৪ সালে রাজা বোদও পায়া আনিয়েছিলেন ; তাই মন্দিরটির নামে সেই ঘটনার স্মৃতি জড়িয়ে গেছে। ডাফরিন-কেল্লার উত্তরে ও পূর্ব্বেও দক্ষিণের মতন শহরতলী আছে। সমস্ত শহরে ছাব্বিশটি জায়াৎ, কিয়ং, প্যাগোডা ও সমাধিমন্দির আছে। এইগুলির কারুকার্য্য ও শোভন আকৃতি শহরটিকে শ্রীসম্পন্ন করে রেখেছে।

শাঞ্জু ষ্টেসন থেকে বাহিরে এলেই অনেক আম-গাছ চোখে পড়ে। সেগুলি সুপ্রসিদ্ধ হেতে আমের বাগাত। এই আম সে-দেশে সবাই খুব তারিফ করে' আদর করে' খায়, অথচ ভারি সস্তায় বিকায়—দুটাকা চারটাকা শ। রেঙ্গুনে ভারতবর্ষের আম বিকায়, কিন্তু বড় মহার্ঘ্য, শুধু ধনী লোকেরাই কিনতে পারে।

মণ্ডলে শহরে তরকারি-পাতি খুব সস্তা। মণ্ডলে খাল খোঁড়ার পর থেকে ধান প্রভৃতি ফসলের চাষেরও খুব সুবিধা হয়েছে। মণ্ডলে থেকে চোদ্দ মাইল দূরের মদায়া নামক জায়গা থেকে নানাবিধ তরিতরকারি ফলমূল শাকসব্জী পানসুপারি নিত্য মণ্ডলেতে চালান আসে। ব্রহ্মদেশে মদায়ার চাল সুপ্রসিদ্ধ। মণ্ডলের মাঝ অঞ্চলে সদর বাজার ; সেখানে ব্রহ্মদেশের বিশেষত্ব-সূচক সুন্দর কারুকার্য্যকরা কাঠের বাক্স কৌটা, বেতের চেয়ার কৌচ, রেশমের আর সোলার ফুল, গালা-করা জিনিস প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। এই সমস্ত দোকানেই সুন্দরী যুবতীরা রেশমী পোষাকের রঙের বাহারে দোকান আলো করে' জিনিস বেচে।

শহরের মধ্যে কেবলমাত্র গভর্মেণ্ট-সংক্রান্ত খানকয়েক বাড়ী আর B ও C রাস্তার ধারের বড় বড় দোকানের সুন্দর সুন্দর ইমারতগুলি ছাড়া শহরের আর সকল বাড়ীই কাঠের, সেগুলি প্রচুর কারুকার্য্যখচিত স্থাপত্যসৌন্দর্য্যে গঠিত। বাড়ীগুলি সব ছড়ানো ছড়ানো; তাদের চারিদিকে তেঁতুল গাছের ঝোপ আর ঘাস-ছাওয়া জমির হাতা একটা পাড়াগেঁয়ে ভাব মনে জাগায়। ইস্কুলে ট্রেনিং স্কুলের বাড়ীটি দেখবার মতন—বড় সুদৃশ্য সুঠাম।

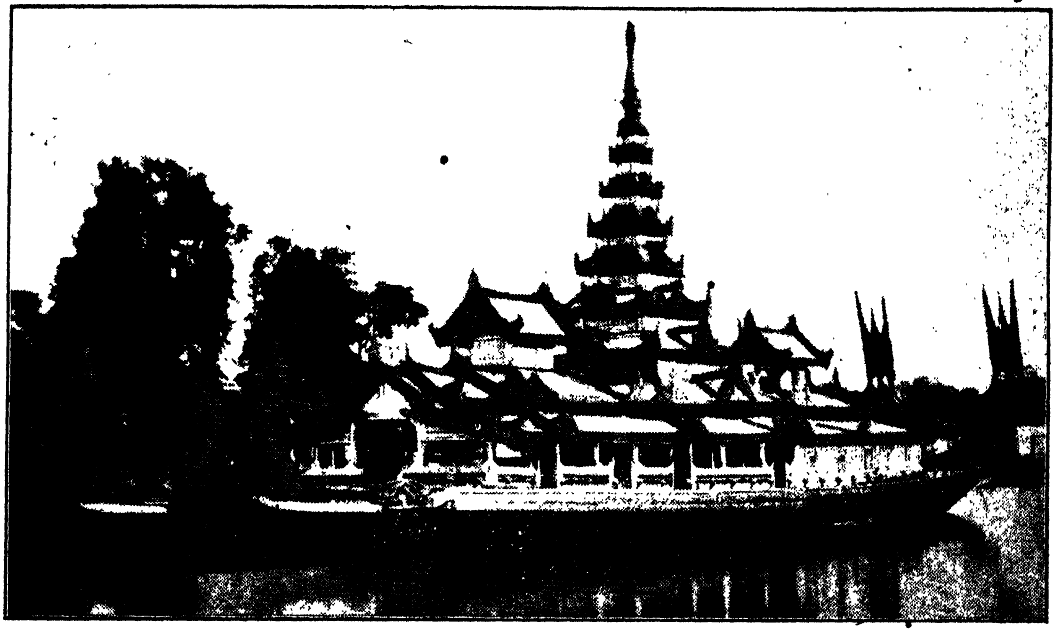


ব্রহ্মের মান্দালয়ের রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের ভিতরকার উঁচু স্তম্ভে (ছবির ডান-ধারে) উঠিয়া রাজা থিব শহর দেখিতেন, প্রাণনাশের ভয়ে রাজবাড়ীর হাতার বাহিরে যাইতে পারিতেন না।

ষ্টেসন থেকে কয়েক কদম গেলেই ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম পাওয়া যায়, এবং সরকারি আপিস আদালত প্রভৃতি কাজকারবারের জায়গায় যাওয়া যায়। ট্রামের রাস্তা ষ্টেসন থেকে কোর্ট হাউস পর্য্যন্ত পৌনে এক মাইল, জাগিয়ো বা বড়বাজার পর্য্যন্ত পৌনে এক মাইল, ষ্টিমারের ঘাট পর্য্যন্ত আড়াই মাইল, এবং আরাকান-প্যাগোডা পর্য্যন্ত তিন মাইল। ট্রাম ছাড়া নানাবিধ গাড়ী পাওয়া যায়। শহরটা বড় আর ছড়ানো বলে' রাস্তায় গাড়ীঘোড়া-লোক-জনের ভিড় কম। রাস্তাগুলির প্রায় সবই পাকা। শহরের সকল পাড়াতেই প্যাগোডা ও কিয়ং মন্দিরের চূড়া দেখতে পাওয়া যায়। আদালতের পিছন থেকে ইরাবতী-নদীর ওপারে ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের ঢেউ দেখতে বড় সুন্দর। লোকে বলে ব্রহ্মের খাস দেশী রাজাদের আমলে সন্ধ্যাবেলায় ঐ পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে মণিমাণিক সোনা জ্বলে' জ্বলে' উঠে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করত; দেশ পরাধীন হওয়ার পর নিঃস্ব হয়ে দেশের সেই আনন্দদীপ্তি নিভে গেছে।

শহরের প্রধান প্রধান সদর জায়গায় ক্লাব ও হোটেল আছে এবং অতিথিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বেশ সুবন্দোবস্ত আছে।

এখানকার হিন্দু বাসিন্দার সংখ্যা খুব বেড়ে চলেছে। মণিপুর ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক ব্রাহ্মণকে পুরোহিত আর দৈবজ্ঞের কাজ করবার জন্যে এদেশে আনা হয়েছিল; তাদের এদেশে পোন্না ব্রাহ্মণ বলে—পোন্না বোধ হয় পণ্ডিতের অপভ্রংশ। তারা ঐ-দেশী হয়ে সেখানেই বসবাস করছে। বড় বড় শহরে যেমন হয়ে থাকে, মণ্ডলের বাসিন্দারা প্রায় সর্ব্বদেশী। ১৮৮৬ সালে গড়ের মধ্যে ছয় হাজার আর গড়ের বাহিরে চব্বিশ হাজার ঘর লোকের



রাজা থিবর জল বিহারের বজরা।

বাস ছিল; এবং বাসিন্দার সংখ্যা রেঙ্গুনের চেয়ে ঢের বেশী ছিল। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে রেঙ্গুন বন্দর-হিসাবে প্রধান হয়ে উঠে ভারতসাম্রাজ্যের তৃতীয়স্থানীয় বন্দর হয়ে উঠেছে এবং এখন রেঙ্গুনের বাসিন্দার সংখ্যা ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩১৭, আর মণ্ডলেতে মাত্র ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৯৯ জন লোক বাস করছে।

রেল-ষ্টেসন থেকে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে আধ মাইল দূরে ফোর্ট ডাফরিন বা ডাফরিন-কেল্লা। এই কেল্লার চারিধারে গড়খাই কাটা। এই খালের জলে প্রচুর জলজ ফল-পাকুড় জন্মায় এবং সমস্ত জলটা গাছের পাতায় ছাওয়া। এই খালে যতন-নদী থেকে জল আসে, যতন-নদী মণ্ডলের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে; তার তীরে একটি রাজপ্রাসাদ আছে; রাজা সপরিবারে কেল্লার ভিতরকার খালে বজরায় চড়ে গড়খাই দিয়ে যতন-নদীতে গিয়ে জলবিহার করে বেড়াতেন। নদী থেকে গড় পর্য্যন্ত কাটা খালের ধারে-ধারে রাজার হুকুমে রাজপারিষদ ও আমীর ওমরাহেরা পতিত জমিগুলিকে বাগানে পরিণত করে তুলেছিল; এবং সেই-সব বাগানের ফল-পাকুড় সন্ন্যাসী যতী ফুঙ্গীদের দান করা হত। আগে কেল্লায় যাবার জন্যে খালের ওপর একটা ঝোলানো পুল ছিল; এখন সেখানে পাকা সাঁকো বেঁধে রাস্তা করা হয়েছে। কেল্লাটি উঁচু ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা, দেয়ালের পিঠে মাটির ঢিপি, যেন কামানের গোলা দেয়াল ফুঁড়ে প্রাসাদে গিয়ে না পড়ে। কেল্লার ফটকের কাছে দেয়ালের মাথায় একটা কুঁড়ে ঘর আছে, সেখানে পাহারাদার বসে ঘাটী-মোহড়া আগলাতো। গড়টির বেড় সওয়া মাইল। চারদিকে চারটি ফটক। গড়ের মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ, তার নাম বিশ্বকেন্দ্র। পূর্ব্বে এই প্রাসাদ তিন ফার্লং চৌকা প্রাচীর আর খুঁটির বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। ২০০ ফুট করে লম্বা গোল গোল কাঠের খুঁটির মাথায় প্রাসাদের ছাদ; দেয়ালের গায়ে আর প্রাসাদের কার্ণিশে চূড়ায় কাঠের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সোনায় খচিত হয়ে অতি সুন্দর দেখায়। প্রাসাদটি অনেকগুলি কক্ষে বিভক্ত—রাজারাণীদের ও তাঁদের দাসদাসীদের থাকবার ঘর ও দরবার-ঘর, খেলার ঘর ও পড়বার ঘর, বেড়াবার ও নাচবার দৌড়-ঘর বা হল। ঘরগুলির চৌকাঠ খুব উঁচু-উঁচু—ডেগ তুলে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলতে গিয়ে হোঁচট খেতে হয়। ঘরগুলি এখন খালি পড়ে আছে। রাজা থিব'র সিংহাসন এখন কলকাতার মিউজিয়ামে কৌতূহলী-দর্শকদের



মন্দালয়ে এক পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তি।

কৌতুকের সামগ্রী হয়ে আছে। সিংহাসন বসাবার ইটে-গাঁথা বেদীটি দরবার-ঘরে এখনো শূন্য পড়ে আছে। ঐ বেদীর পিছনে একটি দরজা আছে; রাজা অন্তঃপুর থেকে সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে দরবার-ঘরে সিংহাসনে বসতেন। দরবার-ঘরটি খুব বড়, শত শত লোক ধরে। সিংহাসন বেদীর সামনে দরবার-ঘরের অপর প্রান্তের দরজা দিয়ে দরবারীরা ঘরে ঢুকে রাজাকে শিকো অর্থাৎ হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে নমস্কার করত। প্রাসাদের

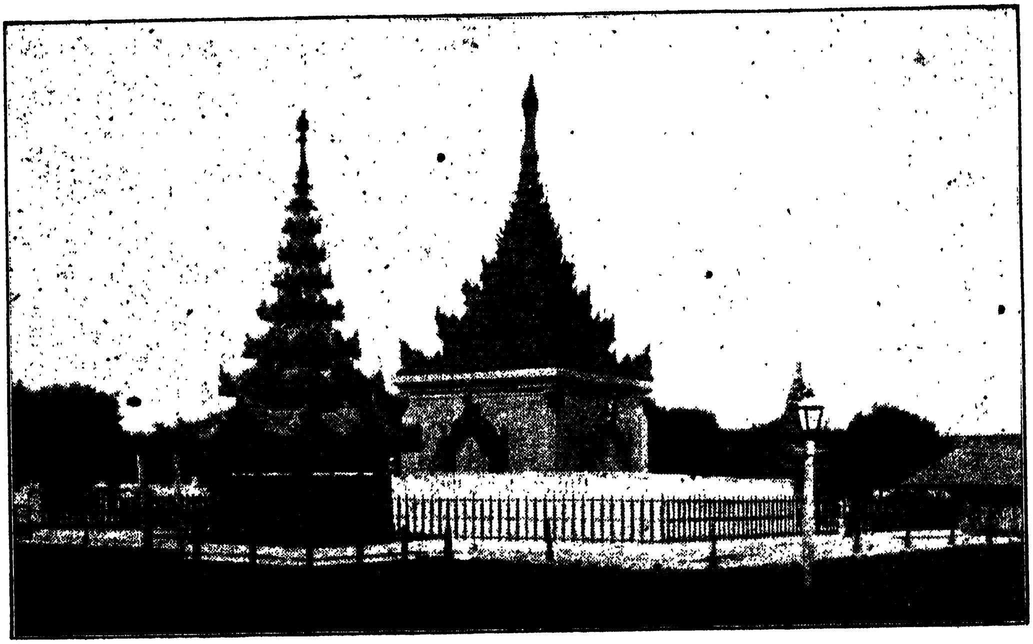


ব্রহ্মদেশের যতী সন্ন্যাসী।



ব্রহ্মদেশের প্রতিমা-কার।

চূড়াটি ভেঙে পড়েছে। মণ্ডলে বিভাগের পুরাতন মন্দির ও গৃহাদির মেরামতের জন্য বছরে হাজার পঁচিশ টাকা খরচ বরাদ্দ আছে। প্রাসাদের হাতায় এখানে-সেখানে এক-একটি ছোট ছোট ধনুকের আকৃতি খিলানো পুল এবং জলের চৌবাচ্চা নহর আছে; প্রাসাদ থেকে একটু তফাতে হাতার মধ্যেই একটা বড় দিঘি আছে তাতে পদ্মবন। প্রাসাদের হাতার মধ্যে এখন কমিশেরিয়েট



রাজা মিণ্ডন মিনের সমাধি-মন্দির, মন্দালয়।

আপিস ও জেলখানা হয়েছে; এবং সৈন্যবিভাগের কয়েক জন অফিসারের বাসা সেইখানে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

মণ্ডলে শহরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মিণ্ডন-মিনের সমাধি-মন্দিরটি দেখতে অতি সুন্দর; সমাধির উপর একটি সুন্দর চূড়ামুকুট শাদা থাম প্রতিষ্ঠিত আছে।

মিউজিয়ামে প্রাচীন কালের রাজা রাণী মন্ত্রী সেনাপতি পারিষদ প্রভৃতির অবিকল মূর্ত্তি রাজপরিচ্ছদে সজ্জিত করে অতীতের নিদর্শন-স্বরূপ রেখে দেওয়া হয়েছে।

ব।

বাংলার নূতন শিল্পী

শিল্পে বাংলা দেশের একটি বিশেষত্ব বহু প্রাচীন কাল হইতেই আছে দেখা যায়। শিল্প চর্চার অপ্রচলনে শিল্পের অবনতি হইলেও বাংলার বিশেষত্ব এখনো বহু শিল্পে বজায় আছে। ঢাকাই কাপড় শাঁখা ও সোনা-রূপার তারের কাজ, মুর্শিদাবাদের কাঁসার বাসন ও রেশমী বসন, নানান জেলার উৎকৃষ্ট বিশেষ মিষ্টান্ন এখনো সর্ব্বত্র সমাদর ও অনুকরণের যোগ্য বিবেচিত হয়। ললিত শিল্পকলাতেও বাংলার বিশেষত্ব ছিল ও এখনো আছে। বাংলার চিত্রশিল্প কালীঘাটের পটে গিয়া পৌঁছিলেও তাহার মধ্যে রেখা-বিন্যাসের পটুতা বিলক্ষণ স্পষ্ট; তাহার পর শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় বাংলার চিত্রশিল্পকে ভারতীয় চিত্রপদ্ধতিতে অনুপ্রাণিত করিয়া জগৎপ্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন; যামিনীপ্রকাশ বাংলার চিত্রপদ্ধতির সহিত য়ুরোপীয় চিত্রপদ্ধতির সমন্বয় ঘটাইয়া নব পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের সূচনা করিয়াছেন; গগনেন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন নিজস্ব চিত্রাঙ্কনপদ্ধতিতে বাংলার চিত্রশিল্পকে সমৃদ্ধ ও অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছেন। মূর্ত্তিশিল্পেও বাংলা দেশ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের অগ্রণী। পর্ব্বে পর্ব্বে নানান দেবদেবীর প্রতিমা গড়িয়া পূজা বাংলা দেশে যত হয় এত আর কোনো প্রদেশে হয় না; বাসন্তী অন্নপূর্ণা দুর্গা জগদ্ধাত্রী কালী কার্ত্তিক সরস্বতী লক্ষ্মী প্রভৃতির মূর্ত্তি পর্ব্ব উপলক্ষে নূতন গড়িয়া পূজা করিয়া বিসর্জ্জন দেওয়া হয়; বারোয়ারি উৎসবে ব্রহ্মা ইন্দ্র কুবের বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতির মূর্ত্তিরও পূজা হয়; বাংলা দেশের স্থায়ী স্থাপিত বিগ্রহের মধ্যে কালী ও কৃষ্ণরাধা প্রধান; রাধাকৃষ্ণের ঝুলন ও রাস উৎসবের সময় নানাবিধ পৌরাণিক ও লৌকিক ঘটনার ছবি মূর্ত্তি গড়িয়া

অতিপ্রাকৃত নয় অপর দিকে অতি প্রকৃত হইয়া পড়িয়া তেমন প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে নাই।

ভারতবর্ষে এক দাক্ষিণাত্যে দ্রবিড় স্থপতি ছাড়া আর কেহ মানুষের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের দিকে মন দেয় নাই; দ্রবিড় স্থপতির মনুষ্য-প্রতিমূর্ত্তিগুলিতে অতিপ্রাকৃতের ইঙ্গিতে



শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রকাশ করা হইয়া থাকে; এইসব কারণে বাংলা দেশে প্রতিমা গঠনের শিল্প, যথেষ্ট উন্নত না হইলেও, না মরিয়া বরাবর চলিয়া আসিতেছে। দাঁইহাট কাটোয়া ও বিষ্ণুপুরের ভাস্কর এককালে বাংলা দেশে প্রসিদ্ধ ছিল; কৃষ্ণনগরের কারিগরেরা এখনো প্রতিমা ও পুতুল নির্ম্মাণে দক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু গ্রীসের মূর্ত্তিশিল্প জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল মূর্ত্তির দেহসৌষ্ঠবের সঙ্গে ভাবের কমনীয়তা সংযোগের পরাকাষ্ঠা হইতে; প্রাচীন ভারতের সারনাথ সাঞ্চী বরহুত প্রভৃতি স্থানের মূর্ত্তির খ্যাতি তাহাদের আধ্যাত্মিক ভাব-ব্যঞ্জনায়। আর বাংলার প্রতিমা-শিল্প হয় একদিকে এক-একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে; যে মানুষের প্রতিকৃতি তাহার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে তাহার আকারে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয় নাই। প্রতিকৃতির আকারে সমগ্র ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটাইয়া তোলা হইতেছে য়ুরোপীয় মূর্ত্তি-শিল্পের সাধনা। সেই সাধনায় দীক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন কাশীনাথ গণপত ম্হাত্রে; মান্দ্রাজ বোম্বাইএ আরো দু-একজন নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিতেছেন। বাংলা দেশ এতদিন এই ক্ষেত্রে নিঃসম্বল ছিল; সম্প্রতি এখানেও দুজন ভাস্করের অভ্যুদয় হইয়াছে। একজন শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় চৌধুরী, অপর জন শ্রীযুক্ত নারায়ণ

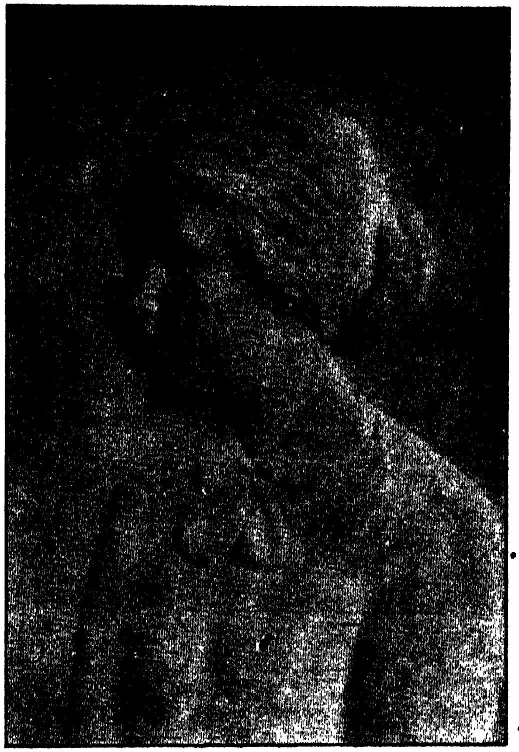
কাশীনাথ দেবল। ইহাঁরা উভয়েই ইংলণ্ড হইতে প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিতে শিখিয়া আসিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে দেবল কনিষ্ঠ ও ইংলণ্ড হইতে অল্পদিন প্রত্যাগত।

শ্রীযুক্ত দেবলের মধ্যে সার্ব্বভৌম সম্মিলন হইয়াছে। তাঁহার পিতা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মাতা ব্রহ্মদেশীয়া মহিলা, একজন হিন্দু অপরজন বৌদ্ধ। বাল্যকাল কাটিয়াছে চীনের



মহিলা মূর্ত্তি।

সীমান্তে ব্রহ্মের মিৎকিয়িনা শহরে পিতামাতার কাছে। দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে দিয়া যান; সেই অবধি আট বৎসর তিনি রবীন্দ্রনাথের ছাত্র শিষ্য ছিলেন। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ডে তখন তিনি দেবলকে সেখানে লইয়া যান ও লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়নে নিযুক্ত করিয়া দ্যান। দেবলের মধ্যে শিল্পপ্রবৃত্তি প্রবল থাকাতে তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে চেলসীর পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে গিয়া মাটির মূর্ত্তি প্রতিমা গঠন করিতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া দেবলের শিল্পানুরাগের পরিচয় পাইয়া তাহাকে সেই পথেই যাইতে উৎসাহ ও আদেশ দ্যান। দেবল কলেজ ছাড়িয়া কিংসওয়ের সেণ্ট্রাল আর্ট স্কুলে রিচার্ড গার্ব নামক শিল্পী ভাস্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সেই স্কুলে প্রস্তরমূর্ত্তি ও রঞ্জমূর্ত্তি গঠনের প্রণালী ও কৌশল শিক্ষা করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়াছেন।



মহিলা মূর্ত্তি।

দেবল এ পর্য্যন্ত অতি অল্পই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু যাহা করিয়াছেন তাহারই মধ্যে তাঁহার শক্তি-বিকাশের আভাস পাওয়া গিয়াছে। কঠিন উপাদানে মানুষের প্রকৃতির সূক্ষ্ম সদা-সচঞ্চল ভাবগুলি ধরিয়া স্থায়ীভাবে প্রকাশ করা বড় কঠিন সাধনার কাজ। সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের আভাস দেবলের হাতের কাজে পাওয়া যায়। দেবলের রচিত রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্তিতে কবির প্রতিভার প্রকাশ, বলিষ্ঠ মনের আভাস, প্রাণের প্রাচুর্য্যের আবেগ দেখিতে পাওয়া যায়। দুটি বালিকার মূর্ত্তিতে তাঁদের অন্তরগত সরলতা ও কমনীয়তা যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে; ছোট মূর্ত্তির গলার ভঙ্গিটি চমৎকার সুন্দর হইয়াছে। গৃহস্থালির অন্তরগত মধুর ভাবটি যে মূর্ত্তিতে আকার ধরিয়া উঠিয়াছে তাহার কল্পনা



গৃহ।

যেমন কবিত্বময় তাহার ব্যঞ্জনা তেমনি স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ; পিতা মাতা ও সন্তানের পরস্পর ঘনিষ্ঠ মিলনেই গৃহস্থালি; পিতা পালনক্ষম স্নেহশীল ও বলিষ্ঠ, মাতা মমতায় মৃদু ও কোমল, আনন্দপুত্তলী সন্তান পিতামাতার সম্মিলিত প্রেমধারার ত্রিবেণীসঙ্গম। ইহার দ্বারা দেবল সেই শক্তির পরিচয় দিয়াছেন যাহা কেবল মানুষের মূর্ত্তি গড়িয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না। এমন বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌম ভাবকে তিনি আকার দিবেন যাহা দেখিয়া মানব-সমাজ আত্মার প্রকাশের আনন্দে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে।

বাংলার মূর্ত্তিশিল্পের এই নবভাবে উদ্বোধনের সন্ধিক্ষণে উহার ভবিষ্যৎ পরিণতির বিষয় জানিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। আমাদের মনে হয়, বাংলার মূর্ত্তিশিল্পের এক শাখা (কৃষ্ণনগরের) স্বভাব ও প্রকৃতির বস্তুতন্ত্র হুবহু নকলের দিকে ঝোঁক দিলেও বাংলার প্রতিমাগুলি সবই ভাবপ্রধান; সুতরাং ভবিষ্যতের মূর্ত্তিশিল্প য়ুরোপের ইম্প্রেশানিষ্টদের রচনার মতন আকারহীন ও অসম্পূর্ণ হইবেও না, আবা[র] বস্তুতন্ত্রও হইবে না, উহা প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ প্রমাণের চে[য়ে] মনের অনুভবের উপরই বেশী নির্ভর করিবে। উ[হা] অতিপ্রাকৃত অপ্রাকৃত ভাবভঙ্গীর দ্বারাই সাধারণের উ[পযোগী হইয়া] উঠিবে, তাহার সেই অতি সাহসই লোকের মনকে মু[গ্ধ] করিবে, শিল্পী বস্তুর রূপের অন্তরগত ও রূপাতীত ভাবটিকে প্রধান করিয়া প্রকাশ করিবে—যেমন এখনও দেবপ্রতিমা অল্পস্বল্প হইয়া চলিয়াছে।

শ্রী—

অভয় হয়েছি

অভয়া তোর পরশ পেয়ে অভয় হয়েছি,
জীবন-মরণ বরণ করে গেয়ে চলেছি।
নাইক বাধা নাইক ব্যথা
আপদ বিপদ লাজের কথা,
আকাশ-জোড়া হাওয়ায় মাভৈঃ মন্ত্র শুনেছি।

সকাল হোলো ভোরের আলো চোখে পড়েছে,
কুলায়-ছাড়া পাখীর সাড়া পরাণ ভরেছে;
ভাঙলো আগল গণ্ডী হারা,
উথলে পড়ে সুধার ধারা,
লুকিয়ে রাখা লুকিয়ে থাকা চুকিয়ে ফেলেছি।

পিছনে যা রইল পড়ে অমি পড়ে থাক,
অকুল হতে আকুল-করা আসুক শুধু ডাক।
সমুখ-পথের ছন্দে গানে,
বাঁধন-হারা প্রাণের টানে,
আনন্দেরি মন্ত্রণাতে সকল ভুলেছি॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

গান

এমনি করেই যায় যদি দিন যাকনা,
মন উড়েছে, উড়ুক নারে মেলে দিয়ে গানের পাখনা।
আজকে আমার প্রাণ-ফোয়ারার সুর ছুটেছে,
দেহের বাঁধ টুটেছে,
মাথার পরে খুলে গেছে
আকাশের ঐ সুনীল ঢাকনা।

ধরণী আজ মেলেছে তার হৃদয়খানি,
সে যেন রে কাহার বাণী,
কঠিন মাটি মনকে আজি দেয় না বাধা,
সে কোন্ সুরে সাধা,
বিশ্ব বলে মনের কথা;
কাজ পড়ে আজ থাকে থাকনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

II { মগা -া জ্ঞা। গা -জ্ঞা। গা -পা পজ্ঞা -ধা পা। জ্ঞা -া।
এম্ ০ নি ক ০ রেই ০ যায় ০ য দি ০

গা ঋা I ঋগা -া সা। -া -া। -া -া I (সা ধপা।
দি ন্ যাক্ ০ না ০ ০ ০ ০ যাক্ না

-জ্ঞা -পা। -জ্ঞা -পা) } I মগা -পা পা। পা -জ্ঞা। ধপা -া I
০ ০ ০ ০ মন্ ০ উ ড়ে ০ ছে ০

I পজ্ঞা ধা -া। জ্ঞা -া। গা -া I গা জ্ঞা -া। পা -া। জ্ঞা -গা I
উ ড়ুক্ ০ না ০ রে ০ মে লে ০ দি ০ য়ে ০

গজ্ঞা গা -ঋা। ঋগা -া। সা -া I
গা নের ০ পাখ্ ০ না ০

I সা -না ধপা। -জ্ঞা -পা। -জ্ঞা -পা II
যাক্ ০ না ০ ০ ০ ০

II পা -জ্ঞপা গা। পা -জ্ঞা। ধা -পা I ধা -র্সা র্সা। র্সা -া। র্সা -া I
আজ ০ কে আ ০ মার ০ প্রাণ ০ ফো য়া ০ রার ০

I না -র্ঋা র্ঋা। র্ঋা -া। র্সা -া I -া -া -া। র্সনা -া। না -ধা I
সুর ০ ছু টে ০ ছে ০ ০ ০ ০ দে ০ হের ০

I ধনা -া ধা। না -া। ধা -জ্ঞা I -ধপা -া -া। -া -া। -া -া I
বাঁধ ০ টু টে ০ ছে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পনা না -া। ধা -া। পা -জ্ঞা I জ্ঞধা পা -া। জ্ঞা -া। গা -া I
মা থার ০ প ০ রে ০ খু লে ০ গে ০ ছে ০

I গা হ্মা -না। ধা -া। পা -া I হ্মা গা -ঋা। ঋগা -া।
আ কা ০ শের ০ ঐ ০ সু নীল ০ ঢাক্ ০

I সা -া I সা -না ধপা। -হ্মা -পা। -হ্মা -পা II
না ০ যাক ০ না ০ ০ ০ ০

II সা ঋ -া। ঋা -া। সা -পা I গা গা -ঋা। ঋা -া।
ধ র ০ ণী ০ আজ ০ যে লে ০ ছে ০

সা -া I সা ঋা -া। ঋ -া। সা -া I সা -পা পা।
তার ০ হৃ দয় ০ খা ০ নি ০ সে ০ যে

পা -পহ্মা -া I পহ্মা গা -ঋা। -া -া। গা -া I
ন ০ রে ০ কা হার ০ বা ০ ণী ০

গপা গা -া পা -হ্মা। ধা -পা I ধা -র্সা র্সা। র্সা -া।
ক ঠিন ০ ধা ০ টি ০ মন্ ০ কে আ ০

র্সা -া না -ঋ্বা ঋ্বা। ঋ্বা -া। র্সা -া -া -া -া।
জি ০ দেয় ০ না বা ০ ধা ০ ০ ০ ০

র্সনা -া। ধা -া I না না -ধা। ধনা -া। ধা -হ্মা I
সে ০ কোন্ ০ সু রে ০ সা ০ ধা ০

I -ধা -া -া। -া -া। -া -া I পা -না না। না -া। পা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বি ০ শ্ব ব ০ লে ০

I হ্মধা পা -া। হ্মা -া। গা -া। গা -না না। ধা -া। পা -া I হ্মা গা -ঋা।
ম নের ০ ক ০ থা ০ কাজ ০ প ড়ে ০ আজ ০ থা কে ০

ঋগা -া। সা -া I সা -না ধপা। -হ্মা -পা। -হ্মা -পা II II
থাক ০ না ০ যাক্ ০ না ০ ০ ০ ০

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রণ-সঙ্গীত *

মোরা মৃত্যু করি না ভয়!
জয় রাজাধিরাজের জয়!
জয় জন্মভূমির জয়!
জয় জন্মভূমির জয়! (কোরাস)

১। জীবন রক্ষা দেশের লাগি,
দেশ রক্ষায় মরণ মাগি,
লজ্জা-হরণ মরণ মাগি,
মৃত্যু অমর কীর্ত্তিময়—
রাজাধিরাজের জয়
জয় জন্মভূমির জয়
জয় জন্মভূমির জয়।

২। দারা ও পুত্র ভগিনী ভাই,
তোমরা রহিলে, আমরা যাই,
ফিরি কি না ফিরি, বেদনা নাই
যদি স্বদেশ মুক্ত রয়।

৩। হর্ষ-নিনাদে গগন ভরি
রক্তের বীজ বপন করি,
বৃথাই রক্ত ক্ষরণ নয়
মরণ-রক্ত ক্ষরণ নয়।
রাজাধিরাজের জয়
জয় জন্মভূমির জয়
জয় জন্মভূমির জয়।

[সা সা | র -া -পা রা রা গা | সা -া -া -া] সা রা
মো রা | মৃ ০ ত্যু ক রি না | ভ ০ ০ য় | জ য়

গা গা গা গা রা গ | পা -া -া া পা -া
রা জা ধি রা জে র | জ ০ ০ য় জ য়

ধা -া -ধা ধা পা ধা | না -া -া -া -পা ধা
জ ০ ন্ম ভূ মি র | জ ০ ০ য় জ য়

না -া -না না ধা না | র্সা া া া] া া
জ ০ ন্ম ভূ মি র | জ ০ ০ য়

পা ধা পা র্সা া র্সা | র্রা র্সা র্সা র্সা া র্সা |
১ জী ব ন র ০ ক্ষা | দে শে র লা ০ গি
৩ হ ০ র্ষ নি না দে | গ গ ন ভ ০ রি

(গ)

র্সা -া -র্গা র্রা া র্মা | র্গা র্গা র্রা সা া র্সা |
১ দে ০ শ র ০ ক্ষায় | ম র ণ মা ০ গি
৩ র ০ ক্তে র বী জ্ | ব প ন ক ০ রি

র্সা -া -র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা -া -র্সা |
১ ল ০ জ্জা হ র ণ | ম র ণ মা ০ গি
৩ বৃ থা ই র ০ ক্ত | ক্ষ র ণ ন ০ য়

* শ্রীমতী কামিনী রায় রচিত সিতিমা নাটিকা হইতে।

	না	-া	ধা	না	না	না	সা	না	ধা	পা	া	া
	মৃ	০	ত্যু	অ	ম	র	কী	০	র্ত্তি	ম	০	য়
	ম	র	ণ	র	০	ক্ত	ক্ষ	র	ণ	ন	০	য়
	সা	রা	গা	গা	রা	গা	পা	-া	-া	-া	পা	-া
	রা	জা	ধি	রা	জে	র	জ	০	০	য়	জ	য়
	না	-া	না	না	ধা	না	র্সা	া	া	া	পা	ধা
	জ	০	ন্ম	ভূ	মি	র	জ	০	০	য়	জ	য়
	না	-া	না	না	ধা	না	র্সা	-া	-া	-া	-া	-া
	জ	০	ন্ম	ভূ	মি	র	জ	০	০	য়	০	০
	সা	গা	রা	গা	া	গা	গা	মা	পা	মা	গা	া
২	দা	রা	ও	পু	০	ত্র	ভ	গি	নী	ভা	ই	০
	গা	মা	পা	পা	পা	মা	গা	মপা	রা	গা	া	া
২	তো	ম	রা	র	হি	লে	আ	ম	রা	যা	০	ই
	হ্মা	পা	হ্মা	পা	হ্ম	পা	গা	মা	পা	মা	গা	া
২	ফি	রি	কি	না	ফি	রি	বে	দ	না	না	০	ই
	রা	রা	রা	মা	া	গা	রা	া	না	সা	া	া
২	য	দি	স্ব	দে	০	শ	মৃ	০	র্ত্ত	র	০	য়

(এখান হইতে তৃতীয় কলি ধরিতে হইবে)

কষ্টিপাথর

সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য।

আর সব জিনিষের ন্যায় সাহিত্যও তখনই সজীব সচল, তখনই প্রাণে-প্রাণে ভরিয়া উঠে—যখন সে বন্ধনহীন, যখন সে যদৃচ্ছভাবে খেলিতে পারে, যখন স্বাধীনতার মুক্তির প্রেরণা তাহার মধ্যে তরঙ্গায়িত দূরপ্রসারিত। আপনাকে যথা-অভিরুচি ছড়াইয়া দিয়া যত দিক্ হইতে পারে, জীবনের খাদ্য আহরণ করে, তাহাকে পুষ্ট সমৃদ্ধ মহনীয় করিয়া তোলে, নানা ভাবের নানা ভঙ্গিমার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রতিভাকে বিকশিত করিতে থাকে। জীবনের লক্ষণ বৈচিত্র্য, তাই জীবন্ত সাহিত্যেরও প্রকাশ বহুভঙ্গিম সৃষ্টির মধ্য দিয়া। কিন্তু যখনই আমাদের প্রধান চেষ্টা হয়, বিধিনিষেধের দ্বারা সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে, কোন বিশেষ ধারা বিশেষ রীতির মধ্যেই তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে, তখনই আমরা সাহিত্যের মরণসজ্জা প্রস্তুত করিতে থাকি। এ কথা সত্য, সাহিত্যে চাই অকৃত্রিম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মহত্তম সৃষ্টি; আবর্জ্জনার বাহুল্য কাটিয়া ছাঁটিয়া, একটা সত্যধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই তাহাকে গড়িয়া তোলা। সে জন্য প্রয়োজন একপ্রকার আদর্শ, স্বেচ্ছাচারের পরিবর্ত্তে একটা সংযম, গ্রহণ-বর্জ্জনের একটা নিয়ম। কিন্তু সেই আদর্শকে সূত্র-নিবদ্ধ না করাই শ্রেয়। সৌন্দর্য্যের প্রতি—রসের প্রতি অনুষ্ঠিত অনুরাগ, উদার গুণগ্রাহিতা জাগাইয়া তোলা এবং প্রত্যেককে আপন-আপন অন্তরের কবি-অনুভূতির পথে মুক্তভাবে চলিতে দেওয়া, জীবন্ত স্থায়ী সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে ইহাই আবশ্যক। সাহিত্যের ধর্ম্মকে যখন সঙ্কুচিত করিয়া ফেলি, আদর্শের মধ্যে যখন এইরূপ এক উদার প্রসার পাই নাই, মানব-আত্মাকে কবি-প্রতিভাকে আপন বিসারের জন্য বহু ও বিচিত্র প্রণালী কাটিয়া লইতে দিই না, মহিষ্ঠ গরিষ্ঠ সত্যধর্ম্মসমন্বিত করিতে যাইয়া সাহিত্যকে যদি কোন অদ্বৈতভাবের মধ্যে ধরিয়া লইতে চাই, তবে দুই এক জন অমানুষী প্রতিভার মধ্যে সে কৈবল্যমুক্তির আবির্ভাব দেখিলেও দেখিতে পারি; কিন্তু নীচে সাধারণের মধ্যে সাহিত্যের জীবনমূলটি শুকাইয়া উঠিতেই দেখিব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভিক্তর হিউগো যখন ফরাসী সাহিত্যে

ভাবের ভঙ্গিমার বিপ্লব ঘটাইতেছিলেন, পুরাতনের সঙ্কীর্ণ আভিজাত্যটি ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্যের মুক্ত জীবনের স্রোত বহাইতে চাহিতেছিলেন, তখন পুরাতনের দল তারস্বরে বলিতেছিলেন, হিউগোর ভাষা ফরাসীভাষা নয়, তাঁহার কবিতায় ফরাসী কবিতার প্রাণধর্ম্ম নাই, তিনি ক্লাসিক নহেন। ইহাদের মুখপাত্র হইয়া ফরাসী কবিপ্রতিভার তথাকথিত কোটটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দাঁড়ান নিসার (Nisard)। এই নিসারকে লক্ষ্য করিয়া উদারদৃষ্টি সমালোচক সেন্তব্যভ বলিতেছেন, "প্রকৃতি বৈচিত্র্যে ভরা, সেখানে কত রকমারি ছাঁচ। প্রতিভারও অনন্ত রূপ। তবে সমালোচক, তুমি কেন এক মনিবেরই দাসত্ব করিতে থাকিবে?"

বাস্তবিক পক্ষে ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয়, সাহিত্য যেখানে উদার প্রতিষ্ঠা পায় নাই, যেখানেই সাহিত্যসৃষ্টির একটা বিশেষ মানদণ্ড আদর্শ স্থাপন করিয়াছি, একটি কৌলিন্য গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছি, সেখানে তদনুযায়ী এক মহনীয় মনুষ্যত্ব সৃষ্টি করিতে পারিলেও তাহারই মধ্যে আবার পতনের বীজ বপন করিয়াছি। ইংলণ্ডে মিল্‌টন; ফরাসীতে কর্ণেই, রাসীন; লাতিনে ভর্জ্জিল হোরাস এইরূপ আভিজাত্যাভিমানী কবি, এবং ইঁহাদের সহিত আমাদের কালিদাস-ভবভূতিরও নাম করা যাইতে পারে। ইঁহারা সকলেই ছিলেন রাজপরিষদের গুণিজনের কবি—বিদ্যাবান্, মার্জ্জিতবুদ্ধি, পরিশুদ্ধরুচি, শোভনকর্ম্মী শিল্পী। যাহা গড়িয়াছেন, তাহাকে ঘষিয়া মাজিয়া, সুন্দর করিয়া, ঐশ্বর্য্য ভরিয়া তবে গড়িয়াছেন। তাঁহারা রচিয়াছেন রাজজনোচিত হর্ম্ম্যাবলী, মর্ম্মরে বিন্যস্ত, মণিমাণিক্যখচিত—সাধারণের সেখানে যেন সসম্ভ্রমেই পদার্পণ করিতে হয়। ইঁহারা প্রথম পথপ্রদর্শক, যে আদর্শ ইঁহারা স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের প্রাণের অন্তরাত্মার বস্তু। তাঁহারা ছিলেন প্রতিভাবান্, তাই তাঁহাদের সৃষ্টি অনবদ্যাঙ্গ, জীবন্ত, মহনীয়—সকলের পূজার্হ। কিন্তু পরে যাঁহারা আসিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তিগণের আদর্শটি সম্মুখে রাখিয়াছেন; কিন্তু অন্তরে সেই একই জলন্ত অনুভূতি রাখিতে পারেন নাই, তাঁহাদের নিকট সে আদর্শ হইয়া পড়িয়াছে শাস্ত্রবিধান—কষ্টকল্পনামাত্র। সাহিত্যের ধারাটি—শিষ্টাচারটি অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া হারাইয়াছেন স্বাতন্ত্র্য, নিজের প্রাণের উপলব্ধি; হারাইয়াছেন সাহিত্যসৃজনের মূলমন্ত্রটি। তাই দেখি, মিলটনের পরেই পোপ, কর্ণেই'র পরেই বোয়ালো, ভর্জ্জিলের পরেই ওভিদ ষ্টাস, কালিদাসের পরেই ভট্টি বাণভট্ট।

লাতিন ও গ্রীক-সাহিত্যের তুলনা এই প্রসঙ্গে খুবই শিক্ষাপ্রদ। গ্রীকের সৌন্দর্য্যবোধ—রসবোধ ছিল উদার বিস্তৃত। তাহাদের দৃষ্টির মধ্যে ছিল একটা ব্যাপকতা, নমনীয়তা—উহা চলিত সুবলয়িত তরঙ্গভঙ্গে। তাহাদের কবিত্বপ্রতিভায় মুক্তির দূরপ্রসারিত অবকাশ, স্বচ্ছন্দগতির বিচিত্র ভঙ্গিমা। অন্যপক্ষে বীরকর্ম্মী বস্তুতান্ত্রিক লাতিন জাতির মধ্যে ভাবুকতার, কল্পনাপ্রিয়তার সে লীলায়িত রেখাপাতের নৈপুণ্য ছিল না। তাহারা জিনিষকে দেখিত ঋজুদৃষ্টিতে, জিনিষকে ধরিতে চাহিত জিনিষের যে স্পষ্ট স্ফুট সহজগ্রাহ্য অঙ্গ, তাহার সহায়ে। কাটিয়া ছাঁটিয়া ঘসিয়া মাজিয়া সব পদার্থকে একই ছাঁচে গড়িতে তাহাদের আনন্দ। বিজয়ী জাতি তাহারা—বহুজাতি, বহুদেশ, বহু ধর্ম্মকে পিষিয়া এক মহাজাতি, মহাদেশ, মহাধর্ম্মে পরিণত করিতে চাহিয়াছিল, সব অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিল এক নামে—রোম। সাহিত্যেও তেমনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল একটা আদর্শ—বীরের গম্ভীর আচার, বিজয়ীর দৃপ্ত তেজস্ ওজস, সেনানীর মুখে সে আদেশ-বাণীর অক্ষরকার্পণ্য, রাজানুশাসনের কঠোর স্পষ্টতা, বাগ্মিতার ধীর-প্রসারিত পূর্ণতা। প্রাকৃতজনের (plebs) হাবভাবে কথায় চিন্তায় যে সহজ-[illegible] স্বাভাবিকতাপ্রবাহ, যে সদা-চঞ্চল উচ্ছৃঙ্খলগতি, তাহাকে রোম অবহেলার চক্ষেই দেখিয়াছে। সে চাহিয়াছে আভিজাত্যের (Patricii) গুরুভার গাম্ভীর্য্য। আর রোমনগরী যে-আদেশ প্রচার করিয়াছে, যে-আদর্শ দেখাইয়াছে, সমস্ত রোমসাম্রাজ্য তাহাকে অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে—তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া কেহই রোমক নামের অমর্য্যাদা দেখাইতে সাহস পায় নাই। সাহিত্য হউক অথবা রাজনীতি সমাজনীতি যাহাই হউক, সকল ক্ষেত্রে একমাত্র গুরু রোমনগরী; গ্রীক কিন্তু তাহার প্রতিভাকে এইরূপ একই কেন্দ্রে সম্পুটিত করিয়া রাখে নাই। রোমনগরীর ন্যায় এথেন্স গ্রীক-সভ্যতার তেমনই সর্ব্বগ্রাসী কেন্দ্র হইয়া পড়ে নাই—যতটুকু হয়, তাহা বহু পরে। গ্রীসের প্রত্যেক প্রদেশই একটা স্বাতন্ত্র্য—একটা জাগ্রত বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ভাষাকে একই প্রকরণে ঢালে নাই, ভাবকেও কোন একটি ধারায় আবদ্ধ রাখে নাই। প্রত্যেকেরই আপন আপন প্রেরণা ও ভঙ্গিমার স্বতঃস্ফুরণে এমন বিচিত্র মহনীয় গ্রীক-সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। এই স্বাধীনতা, এই যদৃচ্ছ অঙ্গসঞ্চালনের অভাবে লাতিন সাহিত্য অল্পদিনেই পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রকৃত প্রতিভা দেখাইয়াছে দুই একটি বিষয়ে মাত্র। গ্রীস কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত দিকে, কত বিষয়ে, সাহিত্যের কত প্রকরণে আপনাকে বিকশিত করিয়া দিয়াছে।

সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দোষও যেমন আছে, ঠিক শুচিদোষও তেমনি আছে। সাহিত্যকে যাঁহারা রমণীয়, মহনীয়, পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে এক দলের এই শুচিব্যাধি খেলিয়াছে রূপ বা গড়নটি লইয়া। নামে তাঁহাদের লক্ষ্য classic manner, বস্তুতঃ কিন্তু তাঁহারা জড়াইয়া পড়েন আভিজাত্যের ঠাটটি লইয়া। সাহিত্যে আভিজাত্য চাই, কিন্তু প্রধানতঃ তাহা অন্তরাত্মার আভিজাত্য। classic soul যাঁহার, classic manner তাঁহারই সহজসিদ্ধি। মহিষ্ঠ গরিষ্ঠ বলিয়া বিশেষ একটি কোন ধারা নাই। কাব্যের আত্মপরিস্ফুরণ, বিশ্ব-কবির কবিত্বশক্তি বহুরূপী। তাহাকে দুই-এক জন কবির বা দুই-একটি কবিসম্প্রদায়ের ভঙ্গিমায় আবদ্ধ রাখা চলে না। বিষ্ণুর মত কবিত্বপ্রতিভাও "অনবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা।" আমাদের শাস্ত্রে ছত্রচামরাদি কয়েকটি বস্তু রাজার চিহ্নস্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। সাহিত্যরাজকেও যে সেইরূপ কোন বিশেষ পরিচ্ছদ বা চিহ্নে মণ্ডিত করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। যখন বলি, মহাকাব্যে এতগুলি সর্গ থাকিবে, নাটকে এতগুলি অঙ্ক থাকিবে, নায়কের এই এই গুণ থাকিবে, এই এই উপমা দিতে পারিবে, আরগুলি পারিবে না, অথবা আখ্যায়িকার আখ্যানবস্তুটির প্রথম হইতেই আরম্ভ করিবে, মাঝখান হইতে ("in medias ves") পারিবে না, তখন যে কিরূপ সাহিত্যসৃষ্টি হয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সাহিত্যে আর-এক শুচিব্যাধি আছে—ঐটি আধুনিক যুগেই দেখা দিয়াছে, তাহা হইতেছে সাহিত্যের উপর "নীতিকতা", ধার্ম্মিকতা, শ্লীলতার দাবী। সাহিত্যের মুক্ত বিকাশ যদি চাই, তবে এ বন্ধনটিও কাটিতে হইবে। জীবন্ত কি মৃত, কোন ভাষাতেই এ উদাহরণ পাই না যে, শ্লীলতা, সাধুতা, এমন কি, আধ্যাত্মিকতার পদতলে সাহিত্য আপনাকে নিগড়িত করিয়াছে। ফরাসীর কথা ছাড়িয়াই দিলাম, লাতিন সাহিত্য—যাহার আদর্শে এতখানি শোভনতা, বাক্‌শ্লীলতা, গুরুগম্ভীরতার স্থান, সেখানেও উদ্ভূত হইয়াছেন কাতুল্ল (Catullus) ওভিদ। আর সংস্কৃত লৌকিক সাহিত্যের ত কথাই নাই, বৈদিক ঋষিদিগের আধ্যাত্মিকতা ব্যাখ্যানের মধ্যেও এমন কথা পাই—আধুনিকগণ যাহাকে অশ্রাব্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিবেন।

সাহিত্যের আত্মার স্বাধীন উন্মুক্ত গতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ শেক্সপীয়র। শেক্সপীয়র আলঙ্কারিক হউন আর নৈতিক হউন, কোন শৃঙ্খলেই

আপনার প্রতিভাকে বাঁধিয়া রাখেন নাই। রাসিকের আত্মস্থ গাম্ভীর্য্য, রোমাণ্টিকের উচ্ছ্বসিত প্রগল্‌ভতা, জ্ঞানিগুণিজনসুলভ মার্জ্জিত বাক্যবিন্যাস ও ধীর চিন্তাশীলতা, প্রাকৃতজনের দোলাচলচিত্তবৃত্তি ও তদনুরূপ কথাভঙ্গি—সকলের মধ্য দিয়া তাঁহার সৃষ্টি সকল রসের আধার এক বিরাট মহাসাগর-তুল্য। শেক্সপীয়রের কবিপ্রেরণা প্রকৃতির মতনই অবাধে অজস্রগতিতে আপনাকে ছুটাইয়া দিয়াছে, তাই তাহাতে এত বৈচিত্র্য, তাই তাহা এত জীবন্ত। পিউরিটান কবি মিল্‌টনের উপরেও তাই শেক্সপীয়রের স্থান। শেক্সপীয়রের ন্যায় মোলিয়েরও কোন বিশেষ মতবাদ বা শাস্ত্রদায়িকতার মধ্যে আপনাকে ধরা দেন নাই। তাঁহার প্রতিভায় রুচির উদারপ্রসার লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। রাসীনের সে পরিপাটী আভিজাত্য, কর্ণেই'র সে গর্ব্বোন্নত মহীয়ত্ব, তাহাদের মধ্যে পাই কেমন একটা সঙ্কীর্ণতা। সেই জন্যই মোলিয়েরকে তাঁহাদেরও উপরে স্থান দিতে ইচ্ছা হয়।

কাব্যসৃষ্টির মূল কথা এইখানে, আখ্যানবস্তুর যে মূল্য থাকুক না, ভঙ্গিমার যে মর্য্যাদা থাকুক না, সকলের উপরে হইতেছে কবির সে নিগূঢ় অনির্ব্বচনীয়, শক্তি—আত্মার তপঃ-অভিব্যঞ্জনা। এই মূল শক্তিটির আধার যে কবি, তিনি সহজেই তাঁহার সকল ভাব, সকল ভঙ্গিমাই এক নৈসর্গিক আভিজাত্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। ফলতঃ আমরা মনে করি, কবিত্বের এই মৌলিক উৎসটি হইতে যখন আমরা দূরে চলিয়া যাইতেছি, যখন আত্মার সে স্বাধীন বিহার-প্রাঙ্গণ সঙ্কুচিত হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে, তখনি কবিত্বের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশেষ আদর্শ, বিধিনিষেধ স্থাপন করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি, তখনি কবিত্ব-শক্তিম একটা বিশেষ প্রকরণ স্থিরনির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। উদারতা প্রসারতা যখন হারাইতে বসিয়াছি, তখন একটি বিশেষ অঙ্গকেই অতিকায় করিয়া তুলিয়াছি। সাগরের অনন্ত বিস্তারের পরিবর্ত্তে চাহিয়াছি শৈলশিখরের উত্তুঙ্গ স্থৈর্য্য, মর্ম্মরের দৃপ্ত শোভনীয়তা। সেই জন্যই বোধ হয়, সফোক্লা হইতেও হোমর গরীয়ান্, কালিদাস হইতেও বাল্মীকি গরীয়ান্। কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাবে যাহাই হউক না, সমগ্র একটি জাতির সাহিত্য যদি এইরূপ একমুখী এক আদর্শানুযায়ী হয়, তবে সে সাহিত্য শুকাইয়াই উঠিবে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও ইহাই ঘটিয়াছে। যে দিন মানুষের আগে বসাইয়াছি শিল্পীকে, যে দিন কেবল অভিরূপভূয়িষ্ঠ পরিষদের জন্যই কাব্য সৃষ্টি করিয়াছি, সেই দিন হইতেই সংস্কৃত-সাহিত্য ক্রমে ক্রমে লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, অবশেষে পাণ্ডিত্যের তর্কের শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছে।

যথার্থ কাব্য, মহনীয় সাহিত্য, প্রকৃত আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে কোন বিশেষ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া নয়, কালিদাস, বাল্মীকি বা বৈদিক কবির পন্থাটি দেখাইয়া নয়; কিন্তু সমগ্র জাতির নিগূঢ় সারস্বত প্রতিভাকে জাগাইয়া তুলিয়া। প্রাচীন গ্রীসে আপামর এইরূপ গুণী ছিল, সকলেই মার্জ্জিতরুচি, উচ্চভাবের ভাবুক, সমস্ত জাতিটি—দেশটিই ছিল বাণীদেবীর জীবন্ত বিগ্রহ। সফোক্লার নাটক দেখিতে দলে দলে লোক—সাধারণ লোক সব—এথেন্সের রঙ্গালয়ে ছুটিত। বর্ত্তমান যুগে সুলভ অপেরা দেখিতে আবালবৃদ্ধ-বনিতার যেমন আগ্রহ, উৎসাহ, পরিতুষ্টি, আস্তিগোনা দেখিয়া গ্রীসের জনসঙ্ঘ তেমনি উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, তদপেক্ষা গভীরভাবেই নাট্যরসের আনন্দ উপভোগ করিত। গ্রীসের Intelligentsia গুণিসমাজ ছিল সমস্ত গ্রীকজাতি। গ্রীসের বহুবলয়িত সাহিত্যপ্রতিভার ইহাই মূল। প্রকৃত সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইলে, তাহার বিচিত্র বিপুল বিকাশ দেখিতে হইলে রাজনীতিও যেমন Peuple Roi, সাহিত্যও তেমনি গড়িয়া তুলিতে হইবে Peuple Intelligentsia। ইউরোপে রেনাসেন্সের যুগে আবার রোমাণ্টিকের যুগে এইরূপ একটা বিপুল Intelligentsia'র উদ্ভব হইয়াছিল। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি এই দুই স্রোতের মুখে।

(নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ) শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

চোখের আলো

(১)

হিন্দুর মেয়ে হয়েও চম্পা যে কেন নবাব-বাড়ীর দাসী হয়েছিল, তা সবাই বুঝতে পারত না। কিন্তু জিনিষটার ভিতর আসলে আশ্চর্য্য হবার কিছুই ছিল না। নবাব-বাড়ীর অনেক কালের পুরানো ঝি পান্না যেদিন ভাইয়ের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে শুন্‌লে যে পাশের বাড়ীর হরিমতী ভোররাত্রে মারা গিয়েছে আর তার ছোট মেয়েটিকে দেখবার কেউই নেই, তখন থেকেই চম্পার কপাল ফিরে গেল।

রোগা, কালো, মেয়েটাকে নিয়ে যখন পান্না মনিববাড়ী ফিরে এল, তখন দাসী-মহলে বেজায় হাসা-হাসির ঘটা লেগে গেল। মাগো, অমন মেয়ের ভার নাকি মানুষে সাধ করে ন্যায়? মেয়ে পাল্‌বার সাধ হয়েছে তা একটা না হয় সুন্দর দেখেই নে! কিন্তু চিরজন্ম নবাব-বাড়ীর বিলাসের হাওয়ায় কাটিয়েও পান্নার মনের ভিতরে যে একটি মা লুকিয়ে ছিল, সে ঐ রোগা মেয়ের ডাগর চোখের ব্যথিত দৃষ্টিতে জেগে উঠল। তাকে আর পান্না কিছুতেই ফেলতে পারলে না।

পান্না ছিল বড় বেগমের খাস দাসী। তার আদর বেশী আর কাজ কম। কাজেই চম্পার আদর-যত্নের কোনো কম্‌তি হল না। আর একটা তার লাভ হল এই যে প্রাচীনা বেগমের মহলে মানুষ হয়ে ওঠাতে নবাববাড়ীর কলুষের হাওয়া তাকে অকালে শুকিয়ে দিলে না। বুড়ী পান্না ক্রমেই অথর্ব্ব হয়ে পড়ছিল, তার সব কাজই এখন চম্পার হাতে। নবাবের বেগমও তাকে একটু স্নেহের চোখেই দেখতেন। জগতের যৌবনের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে ঐ তরুণী মেয়েটি তাঁর আশে-পাশে ঘুরে বেড়াত, আর সবই তাঁর আগেকার দিনের লোকজন। বেগমের বয়স যত বাড়ছিল, তাঁর মহলের স্তব্ধতাও সেই-সঙ্গে নিবিড় হয়ে

উঠেছিল। নবাবকে এখন কালেভদ্রে এদিকে দেখা যায়, তাঁর আসার দিনেই কেবল ঘরে-ঘরে আলো জ্বলে ওঠে, দরজার আড়াল থেকে রঙীন ওড়নার আভাস পাওয়া যায়, টুং টাং করে সেতারের ঝঙ্কারও কানে এসে বাজে। অন্য দিন সব চুপ্‌চাপ্‌।

প্রকৃতি-রাণীর মহলেও একদিকে চাঁদ ডুবে যায়, আর একদিকে পূবের আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য্য উঠে আসে। তেম্‌নি নবাববাড়ীর পুরানো মহলের আলো নিব্‌তে না নিব্‌তেই নবাবজাদার মহলে হাজার রঙীন বাতি জ্বলে উঠল। সেখানে আলো কোনোদিন নিবে আসে না, চির-বসন্ত নিজের ফুলের হাট নিয়ে সেখানে বাঁধা পড়েছে। গান বাজনা একদিনের তরেও থামে না।

নবাবজাদার মহলে দাসীর প্রয়োজন ক্রমেই বাড়ছিল। অন্য সব মহল খালি করে যত সুন্দরী পরিচারিকা ছিল সবই ঐ মহলেই গিয়ে জুটছিল। চম্পার সঙ্গিনী মরিয়ম আর গোলাপীও চলে গিয়েছে, সে-ই কেবল নিজের কুরূপের সৌভাগ্য নিয়ে এই নিরানন্দ পুরীতে থেকে গেল। সারা-দিনটা তার নানা কাজে যেত, অবসরের সময়ে বেগম তাকে জরির কাজ শেখাতেন। যৌবন চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে যখন তাঁর স্বামীর মনও তাঁর কাছ থেকে সরে গেল, তখন থেকে এইসব কাজেই বেগম সারাদিন নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন, অবসর জিনিষটা তাঁর কাছে বড় ভয়ের হয়ে উঠেছিল। তাঁর তরুণী পরিচারিকাকে নিজের কাজের অংশ দিতে তাঁর একটা আনন্দ ছিল, সেও যে তাঁরি মত অনাদৃতা।

কিন্তু সন্ধ্যার পর আর জরির কাজ চলে না। কালো মখমল তখন চোখের উপর মিলিয়ে আসে, জরির সোনালি রূপোলি ডোরা আর চেনা যায় না, আর মানুষের বিফল অনুকরণের চেষ্টা দেখে বিধাতার কৌতুক-হাসির মত আকাশের কালো মখমলের গায়ে তারার চুম্‌কি ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে। বেগম এই সময়টিতে নিজের ঘরের জানলার ধারে চুপ করে বসে থাকেন, ঘরের সামনের গোলাপ-বাগান এখন জঙ্গল হয়ে উঠেছে, সন্ধ্যার ম্লান আলোতে এই দুই উপেক্ষিতা নীরবে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে।

চম্পা বেগমের কাজ থেকে ছুটি পেয়েই বাইরের বারা-ণ্ডায় এসে দাঁড়াত। সেখান থেকে নবাবজাদার মহল পরিষ্কার দেখা যায়। ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে একদৃষ্টে সেই আনন্দ-নিকেতনের দিকে তাকিয়ে থাকত। ওখানের বাঁশীর সুর ফুলের গন্ধ আর রঙীন আলো তাকে কেবলি আকুল করে তুলত।

মরিয়ম আর গোলাপী কালেভদ্রে এক-আধবার পুরানো মনিব-বাড়ী বেড়াতে আসত। বেগমের কাছে একবার ঘুরে এসেই তারা চম্পাকে নিজেদের এতকালের সঞ্চিত কাহিনী বলতে বসে যেত। নবাবজাদা দেখতে কেমন, তাঁর বেগমরাই বা কেমন, কার কি নাম, কার উপরেই বা তাঁর টান সব-চেয়ে বেশী। আর তা ছাড়া নাচগানের আর আরও হাজার-রকমের বিলাস-বিভ্রমের কথা ত ছিলই। তাদের গল্পের ভিতর প্রত্যেকবারেই নূতনত্ব যে কিছু থাকত তা নয়, কিন্তু চম্পা সেই পুরানো কথাই মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যেত। এই কথাটাই কেবল তার মনে ঘুরে-ফিরে বাজতে থাকত, "নবাবজাদার মত রূপ কিন্তু আর কখনও চোখে দেখিনি ভাই, এ নবাব-বংশের যে এত রূপের জন্যে নাম-ডাক, কিন্তু এদের মধ্যেও এমনটি কখনও হয়নি; সব নবাবেরই ছবি ত দেখেছি!"

চম্পা আগেকার নবাবদের ছবি কখনও দেখেনি, কারণ চিত্রশালাটা এ মহলে ছিল না; আর নবাবজাদাকেও দেখেনি। কিন্তু নিজের মনের চিত্রশালায় একটি তরুণ সুকুমার ছবি সে কল্পনার রঙে এঁকে রেখেছিল, আর সে ছবি যে অন্য সব নবাবের ছবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে তার সন্দেহ মাত্র ছিল না।

হঠাৎ একদিন বড় বেগমের মহলে সকাল থেকে ধুমধাম বেধে গেল। সেদিন কি শুভলগ্ন ছিল জানি না, নবাব আর নবাবজাদা দুজনেই এ মহলে আসবেন। সমস্তদিন ধরে কেবল উৎসবের আয়োজন চলতে লাগল। কাজে আর সেদিন চম্পার মন যাচ্ছিল না, কিসের একটা আকুল আবেগ তার সমস্ত দেহ-মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল। আজ তার মনের ছবির সঙ্গে সত্য মানুষটির পরিচয় হবে। এই সন্ধ্যাটা তার জীবনে যে কি অপূর্ব্ব হয়ে উঠবে তারই পূর্ব্বা-ভাস সে যেন ভিতরে বাইরে অনুভব করছিল।

সন্ধ্যার ছায়া ঠিক সময়েই পৃথিবীর উপর ঘনিয়ে এল,

কিন্তু চম্পার মনে হচ্ছিল, রোদ পড়তে এত দেরী বুঝি তার জীবনে আর কখনও হয়নি। সে তার সব কাজ শেষ করে ফেলে বেগমের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। এ ঘরকে আজ আর চেন্‌বার জো নেই। চিরকালের অনাদরের মেয়ে যেন আজ বাসর-সজ্জায় সেজে দাঁড়িয়েছে। বেগমের মুখের হাসি আজ সারা বাড়ীর আঁধার দূর করে দিয়েছে। এ যেন ভাগ্যদেবীর প্রসন্ন আশীর্ব্বাদে তাঁর দশ বছরের আগের দিন ফিরে এসেছে। তখন স্বামী তাঁকে উপেক্ষা করতে পারতেন না, ছেলেরও তাঁকে একটু প্রয়োজন ছিল। চম্পার মনে কিন্তু আনন্দই একছত্র রাজত্ব করছিল না, একটা কিসের অজানা আশঙ্কা তার মনকে ক্ষণে ক্ষণে পীড়িত করে তুলছিল।

হটাৎ চম্পা সজাগ হয়ে উঠল। ঐ যে সেতার-এস্রাজের আনন্দ-ঝঙ্কার কোনো প্রিয় অতিথির আগমন জানিয়ে দিচ্ছে। চকিতে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ঘরের সামনে সকলে এসে পড়ল। নবাব আর বেগম একসঙ্গে ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু তাঁদের পিছনে কে ও? তার দিকে চাইবামাত্র চম্পার মনের সেই ছবি লজ্জায় ম্লান হয়ে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা গেল না যে সে তার মানস-প্রিয়ের পরাজয়ে বেদনা পেলে, না, এই নূতন অতিথির জয়লাভের আনন্দই তার বেশী।

নবাবজাদার ভুবনমোহন রূপে যা দুই-একটা খুঁৎ ছিল তা অন্যের চোখে ধরা পড়ল। তাঁর মুখে পুরুষোচিত বীর্য্যের অভাব সম্বন্ধে চম্পার পিছনের একজন দাসী কি একটা মন্তব্য প্রকাশ করলে। চম্পা অবাক দৃষ্টিতে তার বড় বড় চোখ মেলে সেই দাসীর দিকে তাকিয়ে রইল।

বেগমের ঘরের উৎসবে সেদিন চম্পার মন গেল না। সেই পুরানো বাগানের ঝরাফুলের মেলার মধ্যে একটা ভাঙা পাথরের বেদীর উপর সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বেগমের মহলের সেদিকে কোনো আলো ছিল না, কৃষ্ণপক্ষের রাতের সেখানে অবাধ রাজত্ব।

নবাবজাদার এ মহলে মনটা বিশেষ জমছিল না, তিনি এধার ওধার অস্থির ভাবে কেবলি ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছিলেন। নবাবের বেশী অস্থির হবার বয়স ছিল না, তিনি কৌচের উপর লম্বা হয়ে গড়গড়া টানছিলেন, সঙ্গীত-কারিণীদের এবং বাদিকাদের প্রয়াসগুলো সফল হচ্ছে কি না সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। বেগম ছেলের অস্থির ভাব লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু তাঁর মহলের অনেক জিনিষ বাস্তবিক দেখবার উপযুক্ত। তিনি ছেলেকে সে-সব দেখাবার জন্যে একজন লোক খুঁজছিলেন, নিজে তখন ঘর ছেড়ে যেতে পারছিলেন না। আর-সব দাসীরা তখন খাওয়ার আয়োজন করতে কি অন্য কাজে ব্যস্ত, কেবল চম্পার দেখা নেই। বেগম জানলা দিয়ে মুখ বার করে ডাকলেন "চম্পা, চম্পারে, একবার এদিকে আয়।"

আকাশের তারার দিক থেকে জোর করে চোখ ফিরিয়ে চম্পা বাগান থেকে ফিরে চলল। তার আঁচল আর খোলা চুলের রাশ থেকে সারা পথে ছড়িয়ে পড়ল শুক্‌নো পাতা আর ঝরা ফুলের পাপ্‌ড়ি।

বেগমের ঘরের সামনে আসবামাত্র তিনি বল্‌লেন, "একটা বাতি নিয়ে নবাবজাদাকে আমার উত্তর দিকের ঘরগুলো দেখিয়ে আন।" নবাবজাদা কৌতূহলী দৃষ্টিতে একবার চম্পার মুখের দিকে তাকিয়ে তখুনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

একটা ভারি আলো তুলে নিয়ে চম্পা এগিয়ে চল্‌ল। সে যে সকলের আগে আগে চলেছিল, তার মুখখানা যে কেউ দেখতে পাচ্ছিল না, এতে তার মনে একটা আরাম হচ্ছিল। নবাবজাদার সঙ্গে তাঁর এক ছোট ভাই আর দুতিনটি পুরমহিলাও ঘর দেখতে চললেন। কত ঘরেই যে তারা ঘুরলো তার ঠিক নেই। এখানে কত শ বছর আগের হাতির দাঁতের আসবাব, ওখানে কাশ্মীরী গালিচার অপূর্ব্ব কারুকার্য্য, কোথাও বা বিচিত্র গঠনের সোনা-রূপোর গৃহসজ্জা। সব ঘরের শেষে একটি ছোট ঘর, তাতে তালা চাবী বন্ধ। চম্পাও কোনোদিন সে ঘরের কপাট খুলতে দেখেনি। নবাবজাদা সে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "এটা বন্ধ যে? এর ভিতর আছে কি?" চম্পা কি বলবে ভাবচে, এমন সময় লাঠির উপর ভর দিয়ে বুড়ী পান্না সেইখানে এসে উপস্থিত হল। সেই প্রকাণ্ড দালানের মধ্যে চম্পার হাতে কেবল মাত্র একটি আলো, সেই আধ-আলো আধ-ছায়ার মধ্যে বুড়ী পান্নার লোলচর্ম্ম মুখ সেই

কতকাল-বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, পিছনে তার কালো অন্ধকার। নবাবজাদা চম্‌কে উঠলেন। তাঁর মনে হল, এই কতকালের পুরানো নবাববাড়ীর বিস্মৃত ইতিহাসের এক অংশ যেন তাঁর চোখের সামনে হঠাৎ মূর্ত্তি ধরে দাঁড়াল।

বুড়ী নিচু হয়ে সেলাম করে ভাঙা গলায় বল্‌তে লাগল "নবাবজাদা আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ? অনেককাল আগে তোমাকে কোলে করে মানুষ করেছিলাম। তখন চেহারা এমন ছিল না, সকল দাসীর চেয়ে আমার কোলই তোমার লাগত ভাল। তোমাকে সেই কোলের ছেলে দেখেছিলাম, তারপর আজ এই দেখ্‌ছি। এই ঘরের কথা বল্‌ছ? চম্পা কি করে জান্‌বে, ও ত তখন এ বাড়ীতে আসেওনি। যেদিন এ ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, তখন আমি এইখানে দাঁড়িয়ে; যাঁরা এ ঘরের ভিতর ছিলেন এখন তাঁরা কেউ বেঁচে নেই। এ ঘরের তালার চাবী তখনকার বড় বেগম, তোমার ঠাকুরমা, আমাকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। যে কাল রাতে এ ঘরের দরজা বন্ধ হল, তারপর এই পঞ্চাশ বছর আর এ ঘর কেউ খোলেনি। কি অবস্থায় তোমার ঠাকুর-দাদা মারা যান সবই ত জানো। তোমাকে দেখে আজ আমার পুরানো মনিব জাহান আলি খাঁর কথা মনে পড়ছে, একমাত্র তুমিই এ বংশে রূপে তাঁর কাছাকাছি এসেছ। তাঁর ছবি তোমাদের চিত্রশালায় নেই, কোথায় আছে তার খোঁজ কখনও নিয়েছ? দেখতে চাও ত দেখাতে পারি।"

নবাবজাদা শুধু ঘাড় নাড়লেন, তাঁর যেন কথা বলবার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

বুড়ী পান্না তালা খুলে দরজার কপাটে ধাক্কা দিলে। ঝন্ ঝন্ শব্দে দরজা খুলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে পান্না সেই ঘরের জমাট আঁধারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। নবাবজাদা একোবার কোনো লক্ষণ দেখালেন না, আলো হাতে চম্পাও পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের ভিতর থেকে পান্নার ডাক সকলের কানে এসে পৌঁছল। চম্পা আলো নিয়ে ঘরে ঢুকল, আর সকলেও পিছন পিছন এল। ঘরটির সজ্জা অপরূপ, তবে কালের অত্যাচারে তার মখমলের রং ম্লান হয়ে এসেছে, তার উপরের জরির আলোও নিভে আসছে। হাতীর দাঁতের কাজ করা প্রকাণ্ড পালঙ্কের চারধারে এখনও শুক্‌নো ফুলের মালা ঝুলছে, এক এক দিকে বা ছিঁড়ে গালিচার উপর লুটিয়ে পড়েছে। ঘরে ঢুকতেই সামনে ঝুলছে প্রকাণ্ড এক আয়না, কিসের এক প্রচণ্ড আঘাতে তার উপর থেকে নীচ অবধি একটা বিদারণ-রেখা চলে গিয়েছে। তার দুইধারে দুটো সোনার বাতিদান শূন্য বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নবাবজাদা ঘরে ঢুকতেই সামনের আয়নায় তাঁর ছায়া পড়ল। চম্পা হঠাৎ ভয়ানক চম্‌কে উঠল, নবাবজাদার পাশেই এ কার চেহারা? পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে, কেউ ত তাঁর পাশে নেই? কিন্তু নিজের চোখকে কি অবিশ্বাস করা যায়? ঐ যে দেখা যাচ্ছে তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে ঠিক তাঁরই যেন আর-একটি ছায়া। এ কে?

পান্নার গলা শোনা গেল, "ঐ দেখ নবাবজাদা, তোমার ঠাকুরদাদার ছবি, ঐ যে আয়নার পাশেই ঝুলছে। দেখে নাও আমার কথা ঠিক কি না। যে রাতে তিনি চলে যান, তার বেশী দিন আগের এ ছবি নয়, তখন তাঁর বয়স তোমার চেয়ে খুব বেশী ছিল না।" সকলে ছবির দিকে এগিয়ে গেল, চম্পা সবার আগে। নবাব জাহান আলি খাঁর ছবি একদৃষ্টে আগন্তুকদের দিকে চেয়ে রইল। ছবিখানা আঁকা নয়, গাঢ় নীল মখমলের গায়ে কার নিপুণ হাত জরির আর রেশমের সুতোয় তাঁর মূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলেছে। এ যেন নবাবজাদারই ছবি, কেবল মুখের ভাব বিষাদে মাখা।

নবাবজাদার সঙ্গিনীদের ভিতর একজন বলে উঠল "ওমা! কি আশ্চর্য্য সেলাই, মানুষে এমন করতে পারে তা ত জানতাম না! এটা কে করেছিল গা পান্না আয়ি?"

পান্না বল্‌লে, "যে করেছিল সে অনেক কাল চলে গিয়েছে। এই কাজ করতে-করতেই তার চোখ অন্ধ হয়ে গেল, তখনও নবাবের হাতের ফুল আর মাথার টুপীটা বাকি ছিল। তার ছেলে এদুটো করলে।"

তরুণী কলকণ্ঠে হেসে বলে উঠল, "চোখ কাণা করবার মতন চেহারা বটে বাপু! আমার করবার ক্ষমতা যদি থাকত তা হলে আমিও এমনি রূপবান একজনের ছবি তৈরী করবার জন্যে চোখ দিতে পারতাম।" নবাবজাদার দিকে তাকিয়ে তার হাসবার ভঙ্গীই সকলকে জানিয়ে দিলে যে সে "একজন" টি কে।

নবাবজাদা তীক্ষ্ণ সমালোচনার দৃষ্টিতে পিতামহের ছবি দেখছিলেন, তিনি একটু হেসে বললেন "শুধু রূপ সমান হলে হয় না আমিনা, কপাল-জোরও সমান চাই। এই দেখ না, তুমি যদি বা চোখের মায়া ত্যাগ করতে রাজী হলে, তা তোমার বিদ্যেটা নেই, আর যদি বিদ্যে-ওয়ালা কোনো লোক পাওয়া যেত তা হলে সে কখনই আমার ছবি বানাবার জন্যে চোখ খোয়াতে চাইত না।"

আমিনা আবার হাসির লহর তুলে বললে "যদি লোক জোটে তা হলে তাকে কি বকশিস্ দাও?"

নবাবজাদাও হেসেই বললেন "সব।"

সেদিন গভীর রাতে, উৎসবের দীপের মালা নিভে যাবার পর চম্পা নিজের ঘর ছেড়ে, সেই প্রকাণ্ড আঁধার দালান পার হয়ে বুড়ী পান্নার ঘরে চল্‌ল। সেদিন কি জানি কেন বুড়ী পান্নারও চোখে ঘুম ছিল না। হয়ত বা নবাববাড়ীর পুরানো তালাবন্ধ ঘর খুলবার সঙ্গে-সঙ্গে তারও মনের কোনো ভুলে-যাওয়া কুঠরীর দরজা খুলে গিয়েছিল। যে দিন সে নিজের নিটোল রূপ যৌবন নিয়ে এই বাড়ীতে ঢুকেছিল, সেই হারানো দিনগুলোর দিকেই মন তার জরার বন্ধন খসিয়ে ফেলে ছুটে যেতে চাইছিল।

চম্পাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বুড়ী জিজ্ঞাসা করলে "কি নাতনি, এত রাতে যে?"

চম্পা বল্‌লে, "আয়ি, নবাব জাহান আলি খাঁর ছবি যে বানিয়েছিল, তার ছেলে কোথায় গেল?"

বুড়ী অবাক হয়ে চম্পার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "তার খোঁজে তোর কি দরকার? তার কাছে সেলাই শিখ্‌বি নাকি? অমন কথা মনেও করিসনে ভাই, ও কাজ যে হাতে নেয় দু বছরের বেশী তার চোখ থাকে না। বেগম-সাহেবা তোকে যা শিখিয়েছেন তাই ঢের, অতখানিই বা কটা লোক জানে? বুড়োর ছেলে রহমত ত শেষে কাণা হবার ভয়ে ও-কাজ ছেড়ে দিলে, দিয়ে দোকানপাট বেচে আগ্রায় চলে গেল। কাশিমের মা বুড়ী, সে দিন আমায় বল্‌ছিল যে কাশিম ও-বছর আগ্রায় তাকে দেখে এসেছে।......ও কি নাতিন্ চল্‌লি নাকি?"

চম্পা বুড়ীকে একবার দু হাতে জড়িয়ে ধরে আবার তখুনি ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে "হ্যাঁ আয়ি, আসি তবে।"

সে দিন সন্ধ্যা থেকেই আকাশ মেঘে ছেয়ে ছিল, রাত্রে ঝড় বইতে আরম্ভ হল। নবাব-বাড়ীর পুরানো আগাছায়-ভরা বাগানে শুক্‌নো পাতার ঘূর্ণি নাচ সুরু হয়ে গেল, আর তাদেরই সহচরীর মত একটি মলিনা তরুণী-মূর্ত্তি ঝড়ের মুখে সেই বাগানের ঘাসে-ঢাকা পথের উপর দিয়ে দ্রুত পা ফেলে বেরিয়ে গেল। উড়ে-যাওয়া শুক্‌নো পাতারই মত তার আর কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না।

(২)

বুড়ো রহমতের মতে আগ্রায় এবার যেমন শীত পড়েছে, তার এই ষাট্ বছরের জীবনের অভিজ্ঞতায় সে আর এমনটি দেখেনি। সেই ষাট্ বছরের যে ক-বছর সে আগ্রায় কাটিয়েছে তার প্রত্যেক বারেই এই মতটা প্রকাশ করাতে তার মতের মূল্য তার নিজের কাছে ছাড়া আর-সবার কাছেই একটু কমে এসেছিল।

আজ সকালে তার উঠতে একটু বেলা হয়ে গিয়েছিল, অনেক-রকম আক্ষেপোক্তি করতে করতে বাতে পঙ্গু শরীরখানা দরজার কাছে টেনে এনে বাহিরের রোদের অবস্থাটাকে পরখ করে নিলে, তারপর নিজের জীর্ণ খাটিয়া-খানাকে টেনে বের করে আরামে তামাক সাজতে বসল।

তার আড্ডার লোকদের আজ আসতে বড় দেরি হচ্ছে, বুড়োর অম্বুরী তামাকের লোভে এখানে কোনোদিন লোকের অভাব হয় না। তামাক টান্‌তে টান্‌তে তাদের সঙ্গে নিজের পুরানো মনিব-বাড়ীর আমীরিয়ানার গল্প করাই ছিল বুড়ো রহমতের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির প্রথম কর্ম্ম।

আঙিনার মাঝখান অবধি রোদ এগিয়ে এল, এখনও যে কারো দেখা নেই। ঐ যে শিকলটা নড়ে উঠল, এবার তা হলে দলের লোকগুলো আসছে। বুড়ো খাটিয়ার উপর জমিয়ে বসে চোখ বুজে সেই সাবেককালের গড়গড়ার নলে দুটো টান লাগালে।

সদর-দরজাটা আস্তে-আস্তে খুলে গেল, আর একজন কে ভিতরে এসে দাঁড়াল। তার বন্ধুদের ভদ্রতার বালাই কোনোদিনই বেশী ছিল না, তাদের কাউকে এমন ধীর মন্থর গতিতে আসতে শুনে কিছু আশ্চর্য্য হয়ে বুড়ো ফিরে চাইলে। হঠাৎ তার কোটরে ঢোকা চোখ বিস্ময়ে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসবার জোগাড় হল। সাদা গোঁফ-দাড়ীতে একেবারে

আচ্ছন্ন, ময়লা-চাপকান-পরা বন্ধুমূর্ত্তির বদলে এ কে দাঁড়িয়ে? বুড়ো-বয়সে চোখের ভুল নাকি? আর-একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলে। না, ভুল কেন হবে, ঐ ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ফিরোজা রঙের ওড়নাতে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে ছিপ্‌ছিপে পাতলা একটি মেয়ে ডাগর চোখে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। একি বিশ পঁচিশ বছর আগেকার একটা দিন হাওয়ায় উড়ে এল নাকি? তখন ত এইরকম কত তরুণীমূর্ত্তি নবাববেগমের দূতী হয়ে তার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াত। কি আপদ! মেয়েটা যে নড়েও না, কথাও কয় না, ঠিক ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে! এমন অবস্থায় কি যে করা উচিত তা রহমতের তখনও ঘুমঘোরাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে কিছুতেই চট্ করে ঢুকছিল না। যা চোখে দেখছে সেটা বাস্তবিকই মানুষ কি না সে বিষয়ে তখনও তার সন্দেহ যায়নি।

হটাৎ তার কানে একটা কোমল গলার স্বর এসে পৌঁছল "এই কি রহমত আলির বাড়ী?"

যাক্, তা হলে এটা মানুষই বটে, কথা বল্‌ছে যখন। বুড়ো হাঁফ ছেড়ে বললে, "হ্যাঁ, আমিই রহমত। তুমি কে, কোথা থেকে আসছ?"

উত্তরে শুন্‌লে, "আমি চম্পা, নবাব-বাড়ী থেকে আসছি।"

আবার নবাববাড়ী! আজ দেখছি নেহাৎই তার মাথা খারাপ হয়েছে, তা না হলে হটাৎ এতকাল পরে নবাব-বাড়ী থেকে একটা মেয়ে এসে কখনও হাজির হয়? আচ্ছা দেখাই যাক না কতদূর গড়ায়। সে জিজ্ঞাসা করলে, "তা তুমি কি চাও, কে তোমায় পাঠিয়েছে?"

"কেউই পাঠায়নি, নিজেই এসেছি, তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

ওঃ, এতক্ষণে ব্যাপার বোঝা গেল, ছুঁড়ি ভিক্ষে চাইতে এসেছে! তা ছেলেমানুষ, তাড়াহুড়ো না দিয়ে ভাল কথায় বুঝিয়ে বিদায় করা যাক,—"তা দেখ বাছা, এমন বাড়ীতে কি কিছু মেলে? দেখছই ত বুড়ো মানুষ, তিনকুলে কেউ নেই, নিজেকেই চেয়ে চিন্তে খেতে হয়; এত যে বয়েস হয়েছে তবু একটা ঝি চাকর রাখি এমন ক্ষমতা নেই, অসুখের দিনে মুখে কেউ এক ফোঁটা জল দেবার নেই। ঐ রাস্তার ওধারে অনেক বড়লোকের বাড়ী, গেলে তারা নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু তোমায় দেবে।"

তরুণীর মুখে একটু হাসির আভাস ফুটে উঠল, সে বললে, "আমি টাকাকড়ি কিছুই তোমার কাছে চাইছি না, আমার সে-রকম অভাব কিছু নেই। আমি তোমার কাছে জরির ছবি তৈরীকরা শিখ্‌তে এতদূর এসেছি, এই আমার ভিক্ষা, আর কিছু না।"

মেয়েটা টাকা চায়না শুনেই বুড়োর মন খুসী হয়ে উঠেছিল, তার উপর জরির কাজ শেখানো। পৃথিবীর আর-সব জিনিষের চেয়ে সে নিজের ঐ কাজটিকে ভাল-বাস্‌ত। নেহাৎ চোখ যাবার ভয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু বিচ্ছেদের কষ্টটা তার কিছু কম হয়নি। তার প্রিয়তমার স্বর্ণময়ী কান্তি অহরহ তার মনকে টান্‌ত, এক এক সময় তার মনে হ'ত চোখের মায়া ছেড়ে দিয়ে আবার তার হাতেই ধরা দেয়। তারপর যত দিন যেতে লাগল, ততই পুরানো স্মৃতি মিলিয়ে আসতে লাগল, এখন সে দিব্যি পাড়ার ছোটলোকগুলোর সঙ্গে মিশে ছোটলোক হয়ে আছে। সে যে নবাব জাহান আলি খাঁর পেয়ারের কারিগর ছিল তা কি এখন তাকে দেখে কেউ বুঝতে পারে?

কিন্তু এতকাল পরে আবার কোথা থেকে তার হারানো যৌবনের দূতী এসে হাজির হয়েছে। একে ত ফেরাতে পারা যায় না! অম্বুরী তামাক উপেক্ষার অভিমানে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল, বুড়ো তখন চম্পাকে জরির ছবির কৌশল বোঝাতে ব্যস্ত।

কিন্তু ও-কাজ ত একদিনে শিখবার নয়, আগে অনেক রাস্তা পার হতে হবে তারপর তীর্থের সন্ধান মিল্‌বে। বুড়োর বাড়ীতে কেউ নেই, সেখানে থাকা চলে না। বুড়ী ফাতেমা রহমতের ঠিকা ঝি, তাকেই অনেক খোসামোদ করে টাকা-কড়ির লোভ দেখিয়ে চম্পা তার খোলার ঘরে একটুখানি জায়গা করে নিলে।

তারপর একটি-একটি করে দিন কেটে যেতে লাগল। চম্পার সারাদিনটা রহমতের বাড়ীতেই কাট্‌ত। নবাব-জাদার ছবি এখনও আরম্ভ হয়নি, রহমতের সব পরীক্ষায় এখনও সে জয়লাভ করেনি। মখমলের বুকে জরির সুতো দিয়ে লতা, পাতা, ফুল, পাখী আঁকতে আঁকতে, তার মনটা মাঝে মাঝে অবাধ্য হয়ে তার সেই চিরপরিচিত

বাড়ীতে গিয়ে হাজির হত—সেই অন্ধকার দালানের সামনের ঘর, আর নবাবজাদা সেই ছেঁড়া ফুলের মালার হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে, আর ঐ যে সামনে মৃত নবাবের ছবি ঝুলছে!

রহমতের কর্কশ কণ্ঠ তাকে আবার আগ্রায় ফিরিয়ে আন্‌ত, চম্‌কে উঠে সে আবার কাজে মন দিত।

এমনি করেই এক বছর কেটে গেল, তারপর চম্পার শুভদিন দেখা দিলে। তার তৈরী তাজমহলের ছবি বুড়োর ভারি পছন্দ হয়ে গেল। এই ত ঠিক কারিগরী হাত! এবার চম্পা নবাবজাদার ছবি বানাতে পারবে, এখন চোখ থাকলেই হয়।

চম্পার বুকের ভিতর কেঁপে উঠল। চোখ যে তার থাকতেই হবে যেমন করে হোক। রাত্রে কাজ করা সে ছেড়ে দিলে, দিনের বেলা যতক্ষণ আলো থাক্‌ত ততক্ষণ একমনে সে কাজ ক'রে যেত। যখন দিনের আলো নিভে আসত, তখন চুপ করে চোখ বন্ধ করে আঁধার ঘরের কোণে পড়ে থাকত। চোখের দৃষ্টির সবটুকুই সে এক-জায়গায় দান করে ফেলেছিল, পৃথিবীর আর কোনো জিনিষকে তার ভাগ দিতে সে পারত না।

দিন যত যেতে লাগল, চম্পার সম্বলও তত ফুরিয়ে আসতে লাগল, বুড়ী ফাতেমা এখন মাঝে মাঝে টাকা-কড়ি নিয়ে বচসা করে। যার খাওয়া-পরার সংস্থান নেই তার রোজ রোজ অত করে সাঁচ্চা জরি কেনা কেন? সেলাই ত ঝুঁটো জরিতেও করা যায়। চম্পা রাত্রের খাবারের পাট তুলে দিলে, জরি সাঁচ্চাই থেকে গেল। কিন্তু এত করেও বুঝি শেষ রক্ষা হয় না। অনাহারে অপটু দেহ তার ভেঙে পড়তে লাগল। সেলাইয়ে একদিন একটা ভুল করে ফেলাতে রহমত এমন ভাবে তার দিকে তাকালে যে চম্পার বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। রহমতের আশঙ্কা বুঝি এবার কাজে খেটে যায়। চম্পা ক্রমেই বুঝতে পারছিল যে তার চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে, কিন্তু সে এই ধারণাকে কিছুতেই আমল দিতে চাইত না। কিন্তু আর যে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, দিন দুপুরেও যে সোনালি জরির আগুনের ফিন্‌কির মত রং তার চোখে খোলা হয়ে ওঠে। এখনও যে ছবির অনেক বাকী।

চম্পা সন্ধ্যেবেলা প্রদীপ জ্বেলে আবার কাজ আরম্ভ করলে। কিন্তু ভিতরের আলো যার নিভে আসছে, তাকে প্রদীপে কতক্ষণ আলো জোগাবে?

সেদিন উত্তরের হাওয়া দরজায় দরজায় শীতের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করে বেড়াচ্ছিল। চম্পা ঘুম থেকে উঠে একবার বাইরে এসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে। আজ আর হাঁটবার ক্ষমতা নেই, রহমতের বাড়ী যাওয়া হবে না, বাড়ীতেই কাজ করতে হবে। যমুনার নীল ধারা তার চোখে পড়ল, চম্পার মনে হল, এই ক'দিনের অদেখাতেই পৃথিবী যেন তার কাছে অপরিচিত হয়ে পড়েছে, আর নতুন পরিচয় করবার সময়ও নেই।

ছবি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আজ আর কাজের তাড়া নেই, দুপুরে বসলেই হবে। তাই চম্পা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিজের অনেক-কালের উপেক্ষিত সাথীদের চোখের দেখা দেখে নিচ্ছিল। কারো যেন আজ হাসিমুখ নেই, সবাই তার উপর অভিমান করে মুখ বিষণ্ণ করে আছে। রাস্তার ধারের শিশুগাছের পাতা চোখের জলের মত অবিশ্রান্ত ঝরে পড়ছে, শীতের বাতাস তাদের উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। যমুনারও আজ মুখ আঁধার।

চম্পা দাঁড়িয়ে সেই রাতের কথা ভাবছিল, যখন সে ঝড়ের মুখে আজন্মের বাড়ী ছেড়ে চলে এল।

বুড়ী ফাতেমা এতক্ষণে হুঁকোটা ঘরের কোণে রেখে কাশ্‌তে কাশ্‌তে রহমতের বাড়ী কাজে চল্‌ল, চম্পাও ঘরে ঢুকল।

দুপুর বেলা বাড়ীতে একমনে কাজ করে যেতে লাগল। ছবি শেষ হয়ে গেলে আর আগ্রায় থাকবার কোনো দরকার নেই। যাবার আয়োজনও সে সব ঠিক করেই রেখেছিল।

আচ্ছা, আজকে সন্ধ্যেটা কি খুব শিগ্‌গির ঘনিয়ে আসছে, ঘরের ভিতরের আলো কমে এল যে! কিন্তু এইত ফাতেমা খেয়ে গেল। তবে বোধ হয় আকাশে মেঘ করেছে। দরজার কাছে এসে চম্পা একবার উপর দিকে তাকালে। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, যেন কার অশ্রুহীন নীল চোখ তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। তবে, তবে কি? এ কি তাই নাকি? এই শেষ? কিন্তু এখনও যে নবাবজাদার চোখে সেই মধুর হাসিটি ফুটে ওঠেনি

চম্পার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল, এই একটুক্ষণের জন্যে তার সারা জীবনের সাধনা বিফল হয়ে যাবে? তার অবসন্ন দেহ মেজের উপরে লুটিয়ে পড়ল।

জ্ঞান ফিরে আসতেই সে উঠে বসল। সামনেই ঐ যে তার প্রিয়তমের ছবি, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, কেবল চোখের দৃষ্টি এখনও শূন্য অর্থহীন। নিজের জীবন বলি দিয়েও কি শেষে এই হবে? চম্পা প্রাণপণ শক্তিতে উঠে বসল। ঘরের ভিতরের আঁধার ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। সে ছবি নিয়ে দরজার কাছে এসে বসে পড়ল। সোনালী জরির সুতো বিদ্যুতের মত কালো মখমলের গায়ে খেলে যেতে লাগল। যে হাসিভরা চোখের ছবি সে বুকে করে এত পথ বয়ে এনেছিল তাকে এই মখমলের বুকে যে রেখে যেতেই হবে! ঐ যে সেই মোহন হাসিটি নবাবজাদার মুখকে আলোয় ভরে দিয়েছে! চম্পা একবার ছবির দিকে তাকালে, মুহূর্ত্তের জন্যে তার চোখের সামনে সোনালী আলোর ঢেউ খেলে গেল, তারপর সব আঁধার!

(৩)

তখনও ভোর হতে দেরি আছে। পূবদিকের আকাশ সবে ধূসর হয়ে উঠ্‌ছে, তবে রাত্রির অন্ধকারের নিবিড়তা কমে গিয়ে তারার ম্লান আলো মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। একটা পাৎলা কুয়াসার আবরণ এখনও পৃথিবীর মুখে আধ-ঘোমটা দিয়ে রেখেছে।

মাঠের মাঝখানের সরুপথ ধরে দুটি মানুষ আস্তে-আস্তে এগিয়ে চলেছে। সেই কুয়াসা-ঘেরা মাঠে আর কেউ কোথাও নেই, একটা পাখীর ডাকও কানে আসে না। দুজনই স্ত্রীলোক, একজন বৃদ্ধা, আর একটি তরুণী কি বালিকা সহজে বোঝা যায় না। বুড়ী একহাতে একটা পোঁটলা নিয়ে আর একহাতে মেয়েটির হাত ধরে পথ চল্‌ছিল, তার মুখে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। তরুণীর মুখের উপর ঐ চারপাশের কুয়াসারই মত কিসের যেন এক আবরণ পড়ে গিয়েছে, তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। একহাতে সে সযত্নে নিজের বুকের কাছে কাপড়ে জড়ানো কি একটা জিনিষ ধরে রেখেছে।

বুড়ী হটাৎ ভাঙা গলায় বলে উঠ্‌ল "এখনও ত রাত ভোর হল না, আর ত পারা যায় না। আচ্ছা কাজ নিয়েছি যা হোক্! হ্যাঁ গা, এখন বোসোনা একটু, তোমার নবাব-দের বাড়ী ঐ ত দেখা যাচ্ছে, ঐ শাদা পাথরের চূড়াওলা বাড়ীখানা ত?"

যুবতী মাথা নেড়ে ইসারায় বল্‌লে—"হাঁ।"

"তবে আর কি। ও আর কতদূরই বা হবে। আধকোশ বড়জোর। রোদ্দুর উঠলে বাকীপথ হাঁটা যাবে এখন, তার আগে ত আর লোকজন উঠবে না এই শীতের দিনে। এখন একটু বোসো বাপু, হাতপাগুলো একটু জিরোক।"

এই মাঠের মাঝখানে নবাববংশের কে একজন অনেক কাল আগে সখ করে এক ফলের বাগান করেছিলেন। বাগানের আর সবই লোপ পেয়েছে, কেবল বাকী আছে গোটা-কয়েক বড়-বড় আমগাছ, আর মালীর ঘরের বিদীর্ণ অস্থিপঞ্জর। সেই গাছের তলায় বুড়ী তার সঙ্গিনীকে নিয়ে এসে হাজির করলে।

বুড়ী বসেই আবার মুখ ছোটাতে সুরু করে দিলে, "হ্যাঁগা বাছা, ফাতেমা বুড়ী যে আমায় আসবার আগে বলেছিল যে তোমার বেশ টাকা-কড়ি আছে, তুমি নবাব-বাড়ীর মেয়ে, তুমি তা হলে এত পথ হেঁটে আসছ কেন?"

অন্ধ চম্পা এতক্ষণ তার দৃষ্টিহীন চোখ দিয়ে যেন নিজের এই ফিরে-পাওয়া জন্মভূমিকে চিন্‌বার চেষ্টা করছিল। বুড়ীর কথায় সে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে "টাকা-কড়ি সবই ফুরিয়ে গেছে। আমি ত নবাববাড়ীর মেয়ে নয়, দাসী।"

"দাসী? তাই বলো, আমিও ত তাই ভাবি যে নবাব-বাড়ীর মেয়ের নাকি এমন ছিরি! তা হ্যাঁ গা, তোমার চোখ খোয়ালে কি করে?"

তরুণী একটু ক্ষীণহাসি হেসে বল্‌লে "চোখ আমার দেবতাকে দিয়েছি মা।" হাসি মিলোতে না মিলোতেই তার দৃষ্টিহারা চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল।

"আহা, তা কাঁদবেই ত, কাঁদবেই ত। এ বয়সে চোখ যাওয়া কি কম দুঃখের কথা? আমার পিসীটার সত্তর বছর বয়সে চোখ কাণা হয়েছিল, তাতেই সে সারাদিন মানুষকে গাল দিয়ে ভূতছাড়া করতো। তোমার ত এই

কাঁচা বয়েস। আহা, তাই বুঝি পুরোনো মনিববাড়ী ফিরে যাচ্ছ, যদি খেতে পরতে দ্যায় ?"

চম্পা বল্‌লে, "হাঁ মা, ঐখানেই আমার শেষ আশ্রয়।"

"আচ্ছা, তুমি সারাদিন ওটা কি বুকে করে নিয়ে থাক গা ? গয়না-পত্তর আছে বুঝি কিছু ?"

চম্পার মুখে একটা বেদনার আভাষ দেখা দিল, সে বললে, "না, মা, গয়নার চেয়ে এর দাম ঢের বেশী, সারা জীবন দিয়ে আমি এটা পেয়েছি।"

বুড়ী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তার তরুণী সঙ্গিনীর দিকে চাইলে, তারপর আপন মনে বিড়-বিড় করে বললে "হবেও বা, নবাববাড়ীর ঝি, সেখানে কত হীরে মুক্তো গড়াগড়ি যায়, দু একখানা সরিয়ে থাকবে হয়ত।"

অনেকখানি পথচলার ফলে চম্পা বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, বসে-বসে তার ঘুম আসতে লাগল। একটু পরেই গাছের গোড়ায় মাথা দিয়ে সে মাটির উপর শুয়ে পড়ল। কতক্ষণ যে অঘোরে ঘুমোলো তার ঠিক নেই।

বিকালবেলার পড়ন্ত রোদের সোনালী আভা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চম্পার মুখে এসে পড়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। সে উঠে বসতেই বুড়ী বলে উঠল "আচ্ছা ঘুম যাহোক তোমার বাছা! চল, বাকি পথটুকু পার হয়ে নি, আবার বেশী সন্ধ্যে হয়ে পড়লে পথ চলতে কষ্ট হবে।"

চম্পা দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে "আগে আমার সেই গোলাপী ওড়নাটা দাও মা, এটা পথের ধুলোয় বোধ হয় ময়লা হয়ে গেছে।"

নবাব-বাড়ীর সদর দরজায় তারা দুজন যখন এসে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, লোকজনের কোলাহলে সেই পাঁচ-মহলা বাড়ী মুখর হয়ে উঠেছে। সব কোলাহলের উপরে শোনা যাচ্ছে নবাবজাদার মহলের হাসির গর্‌রা আর গানের লহর।

চম্পা শাদা পাথরের বিশাল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুড়ীর কানে কানে বল্‌লে, "দরজায় যে শান্ত্রী আছে তার হাতে এই টাকাটা দিয়ে বল নবাবজাদার মহলে আমাদের নিয়ে যেতে।"

মার্ব্বেল পাথরের বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে খট্ খট্ শব্দ করে শান্ত্রী এগিয়ে চলল, চম্পা তার পিছনে। এখানে আর তাকে হাত ধরে নিয়ে যাবার দরকার নেই, তার অন্ধ চোখ এখানে তাকে বাধা দেয় না। তার সর্ব্বাঙ্গ যে এখানকে চেনে, চোখ নাইবা থাকল।

চম্পার মনে পড়ল সেই আগেকার দিনে সে কেমন করে সন্ধ্যাবেলা বেগমের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে এই দিকে চেয়ে থাকৃত। বেগম বোধ হয় এতক্ষণ সেই গোলাপ-বাগানের জানলার ধারে গিয়ে বসেছেন। আর বুড়ী পান্না ? সে কি এখনও বেঁচে আছে ? কে জানে ?

নবাবজাদার মহলের সিঁড়িতে পা দিয়েই চম্পার বুক কেঁপে উঠল। তার জীবনের নিবিড়তম মুহূর্ত এই যে এসে পড়ল। পা যে আর চল্‌তে চায় না, তার এতদিনের সঞ্চিত সাহস কোথায় হারিয়ে গেল ? কত কথা বল্‌বে বলে ঠিক করে এসেছিল, তার একটাও আর মনে পড়ে না কেন ?

নবাবজাদার ঘরের দ্বাররক্ষকের হাতে শান্ত্রী চম্পাকে সঁপে দিয়ে আবার খট্ খট্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

দ্বাররক্ষক চম্পার দিকে একবার তাকিয়ে বললে "এসো গো আমার সঙ্গে।"

পা আর ওঠে না, কিন্তু দেরি করবারও সময় নেই। ঐ যে তার পথপ্রদর্শক এগিয়ে চলেছে। দুই হাতে তার অমূল্য ধনটিকে বুকে চেপে চম্পাও তার পিছনে পিছনে চল্‌ল।

এইবার সে ঘরে এসে পৌঁছেচে, পায়ের তলার নরম গালিচা আর আতরের আর ফুলের মিশ্রিত সুগন্ধই তাকে তা জানিয়ে দিলে।

দারোয়ান কুর্নীশ করে বললে, "জাঁহাপনা, এক কাণা ভিখিরী মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

এইবার ঘরের সব লোকের চোখ তার উপর পড়েছে। কেউ কি তাকে চিন্‌বে ? কেউ না, সে ত এ মহলে কখনও আসেনি। নবাবজাদাও না, তিনি তাকে একদিন মাত্র রাত্তিরে দেখেছিলেন।

কে একজন এগিয়ে এল। এই ত! এ পায়ের শব্দ কি চম্পা চিন্‌বে না ? এই যে সেই গলার স্বর, "কি গো, কি চাও ?"

এতকথা বলবার ছিল, সব গেল কোথায় ? চম্পার চোখের দৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে যেন কথা কইবার শক্তিও চলে গিয়েছে। আবার প্রশ্ন হল "কি চাইতে এসেছ ?"

চম্পা প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করে অস্ফুটকণ্ঠে বললে, "কিছু চাইনা, দিতে এসেছি !"

ঘরে একটা বাক্যহীন বিস্ময়ের ঢেউ খেলে গেল, সেটা দৃষ্টিহীনা চম্পা যেন তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করলে। নবাবজাদা একটুখানি ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হেসে বল্‌লেন, "তাই নাকি ? আচ্ছা, কি দেবে দাও।"

নিজের ওড়নার ভিতর থেকে চম্পা তার সেই বহুযত্নে রক্ষিত মোড়কটি কম্পিত হাতে তুলে ধরলে। নবাবজাদা সেটা তার হাত থেকে তুলে নিলেন।

চম্পা আর দাঁড়াতে না পেরে বসে পড়ল। তার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। এই বুঝি মোড়কটার বাইরের আবরণ খসে পড়ল ! এইবার তার পাওনার সময়, তার নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়ে গেছে, এইবার দেবতার বরদানের পালা ! চম্পার অন্ধ চোখ আকুল আগ্রহে বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

ওকি, ওকি ! "হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ," সমস্ত ঘর ভরে একটা বিদ্রূপের হাসির রোল উঠল যে ! চম্পার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। এই তার প্রাপ্য ? তার সারা জীবনের মূল্য এই বিদ্রূপের হাসি ?

নবাবজাদার একজন অনুচর মোটা গলায় বলে উঠল "ছুঁড়ি ক্ষ্যাপা নাকি। নবাবজাদাকে কতগুলো ছেঁড়া ন্যাকড়া উপহার দিতে এসেছে।"

"ছেঁড়া ন্যাকড়া !"

ওগো এ কোন্ নিষ্ঠুর দানবের পরিহাস ?

কোন্ ডাকিনীর মন্ত্রে তার চিরজীবনের সাধনার ধন এত তুচ্ছ হয়ে গেল ?

চম্পা কাঁপতে কাঁপতে সেই গালিচার উপর লুটিয়ে পড়ল, ভিতর-বাইরের সব আলো তার আজ এক পলকে নিভে গেল।

নবাবজাদা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন "আঃ কি আপদ ! ওরে, কে আছিস, এটাকে এখান থেকে নিয়ে যা। এই খানেই মরে গেল নাকি !"

তাঁর এক মোসাহেব সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "সকালে এক বুড়ী ভিখিরীর কাছে অমন খাসা তসবীর মিলল, ভাবলাম সন্ধ্যেয় না জানি ছুঁড়ির কাছে কি মিলবে। সাধে কি লোকে বলে অতি-লোভে তাঁতি নষ্ট !"

নবাবজাদা তাঁর অনুচরদের নিয়ে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। চম্পার দেহ সেইখানেই পড়ে রইল। সে তার নিজের চোখের শেষ জ্যোতিকণা দিয়ে যে ছবির চোখের জ্যোতি ফুটিয়ে তুলেছিল, পাশের দেয়াল থেকে ছবির সেই হাসিভরা চোখ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

শ্রীসীতা দেবী।

আলোচনা

পাট-চাষ কত কালের ?

গত মাসে লিখিয়াছিলাম পাট-চাষ অধিক কাল পূর্ব্বে ছিল না। পাট-গাছ জানা ছিল। চরকে নালিকা নাম আছে। পাটের ডাঁটা নলের মতন ফাঁপা বলিয়া নাম না-লি-কা ; ক স্থানে চ হইয়া সংস্কৃত-প্রাকৃতে না-লি-চা, এবং চ স্থানে ত হইয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালায় না-লি-তা। সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে না-লি-চা সম্বন্ধে কিছু আসিয়া জুটিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বাঙ্গীর শিকার নিমিত্ত পাটের দোড়ী করিয়াছিলেন। যথা,

> নালিচা কাটিআঁ কাহ্নাঞি মাঝজলে থুইল।
> বার পহর হয়িলেঁ তাহাক তুলিল ॥
> সুখায়িআঁ বাছিআঁ পাট করিল সুসর।
> চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর ॥ (১৬৮ পৃঃ)

এই বর্ণনা হইতে বুঝিতেছি এই কীর্তন-রচনার সময় পাটগাছের আঁশের দোড়ী জানা ছিল। বহুপূর্বকালে নানাবিধ গাছের আঁশ হইতে দোড়ী করা হইত ; এখনও হয়। যেমন আকন্দ, মূর্বা। কিন্তু চাষ হইত না, এখনও হয় না। সে যাহা হউক, উক্ত কীর্তন-রচনার সময় নালিচার চাষ হইত না। হইলে, শ্রীকৃষ্ণ (১) নিজে আঁশ বাহির করিতেন না, (২) নালিচা দেড় দিন মাত্র জলে ভিজাইয়া এবং শুখাইয়া কাঠী বাছিয়া পাট 'সুসর' আদায় করিতেন না। বর্ণনাটি পড়িলেই মনে হয়, নালিচা বন্য জন্মিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ কোন-রকমে দোড়ী করিয়াছিলেন। জানা ও চাষের শণের দোড়ীর শিকা না করিয়া পাটের করিবার কারণ বোধ হয়, পাটের দোড়ী কোমল, শণের দোড়ী কড়া।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন পুথী নাকি ছয় শত বৎসরের পুরাতন। ইহার পরবর্ত্তী পুথীতেও পাট-চাষের উল্লেখ পাই নাই। রামাই পণ্ডিতের শূন্য-পুরাণে ধর্ম-ঠাকুর শিব হইয়া পার্বতীর অনুযোগে ভীমের সাহায্যে চাষ করিয়াছিলেন। তিনি পাটের চাষ করেন নাই। শণেরও করেন নাই। এই পুরাণে পাট শব্দ আছে। এক স্থানে ধর্ম-ঠাকুরের ঘোড়ার সাজনের মধ্যে আছে। সেখানে স্পষ্ট তুৎ-পাট মনে হইবে।

> আগুনির পাঅ (প্রায়) পরভুর একই পাটর টনা ॥
> মুক্তর হার লেগেছে রতনে পাকানা। (৬৮ পৃঃ)

আর-এক স্থানে 'আদি ভূপতি' ধর্ম-ঠাকুরের দেহারা নির্মাণ করিতেছেন।

এহি না ভাণ্ডার ঘরে দপ্পন শোভা করে
বেরাল পাটর বাছান ॥
তালর কাঁড়ি লাগে গুআর বাখারি
ছিটনি তথির উপর।
বেয়াল পাটর গোটী সভা করে
লাগিব যো থরে থর ॥ (৫৮ পৃঃ)

ইত্যাদি। বেরাল পাটের ('গোটী' ভুল) 'গাটী', গাঁইট শোভা করে। ধর্মের স্থানটি পাথরের গাঁথা, কিন্তু উপরে "মউর পুচ্ছর ছাউনি"। এই 'বেরাল পাট'ও তুৎ-পাট বোধ হয়। যে সাজ সজ্জা তাহাতে গাছ-পাট শোভিত না। বেরাল পাট, বোধ হয় বিড়াল-বর্ণ স্নিগ্ধ শ্বেত বা আপিঙ্গল রেশম। শূন্য-পুরাণের আদি পুথী সাত আট শত বৎসরের হইবে। অনুলিপি করিতে করিতে স্থানে স্থানে আধুনিক হইয়া পড়িয়াছিল।

কৃত্তিবাসে পাট শব্দ পাই নাই, 'পাটুয়া' নৌকা পাইয়াছি। এখানে হিন্দী ভাষার 'পাটুয়া', শণের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে মনে করি। কবিকঙ্কণেও, এমন কি সেদিনকার (২০০ বৎসরের) শিবায়ণেও পাটের চাষ নাই, অন্য চাষের কথা আছে। কৃত্তিবাস ব্যতীত অন্য চারি কবি পশ্চিম বঙ্গের। পশ্চিম বঙ্গে পাট-চাষ সেদিন আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ববঙ্গেরও দুই এক খানা পুরাতন পুথী দেখিয়াছি। গাছ-পাটের দোড়ীর নাম-গন্ধও নাই। প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বের বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে আছে,

বুনিয়া নালিতা খেতে যাব উষ্ণা ধান ॥ (৫৬৫ পৃঃ)

অতএব নালিতা শাগের চাষ হইত। পূর্ববঙ্গের কোনো পুথীতে পাটের দোড়ীর উল্লেখ আছে কি না, জানি না। কেহ দেখিয়া থাকিলে, জানাইলে সন্দেহ যায়।

ভ্রম-সংশোধন। 'বঙ্গের কৃষিব সামগ্রী' আলোচনায়, ওড়িয়ায় 'ঝোট' হইবে, 'ঝূট' হইবে না। ওড়িয়ার চড়কের নাম 'ঝাম-ঝাঁপ' নহে, 'ঝাম-জাত'।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

পঞ্চশস্য

আগ্নেয় গিরিকে দাসত্বে নিয়োগ।

মানুষ প্রকৃতির শক্তি-রহস্য খুঁজিয়া বেড়ায় নিজের কাজে লাগাইবার জন্য। একটির পর একটি করিয়া প্রকৃতির শক্তি-উৎস বাহির করিয়া সে আপনার কাজে লাগাইতেছে, আর প্রকৃতিদেবীও মানুষের বুদ্ধির কাছে বশ্যতা স্বীকার করিয়া বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত তাহার কাজ করিতেছেন।

পৃথিবীর ভিতরটা খুবই গরম। এই উত্তাপের শক্তি আমরা দেখিতে পাই ভূমিকম্পে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে। জল মাটির মধ্য দিয়া যখন খুব নীচে যাইয়া উপস্থিত হয়, তখন এই উত্তাপে উহা বাষ্পে পরিণত হইয়া আগ্নেয়গিরির মুখ ও উহার আশে-পাশে ফাটলের মধ্য দিয়া বাহির হয়। ইটালীর টাস্কানী-প্রদেশে এই বাষ্পে এঞ্জিন চালানো হইতেছে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স জিনোরী-কন্টি (Prince Ginori-Conti) ভূগর্ভস্থ অত্যুত্তপ্ত বাষ্প যন্ত্রচালনে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন। প্রথমে ছোট একটি ষ্টীম-এঞ্জিনে এই বাষ্প প্রয়োগ করিয়া তাহার সঙ্গে একটা তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র (Dynamo) জুড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাতে যে তড়িৎ উৎপন্ন হইত তাহাদ্বারা একটা কারখানার অংশবিশেষ আলোকিত করা হইত।

এই সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া প্রিন্স জিনোরী প্রায় ৪০ অশ্ব-শক্তির একটি এঞ্জিনে প্রাকৃতিক বাষ্প প্রয়োগ করিলেন। ভূপৃষ্ঠে ছিদ্র করিয়া ১২ হইতে ২০ ইঞ্চি মোটা লোহার নল দিয়া ৩০০ ফুট নিম্ন হইতে বাষ্প আনা হইতে লাগিল। কয়েক বৎসরেই দেখা গেল যে যান্ত্রিক শক্তি-হিসাবে এ বন্দোবস্তের কোনো খুঁত নাই। তবে ভূগর্ভ হইতে বাষ্পের সঙ্গে-সঙ্গে সোহাগা, গন্ধকাম্ল প্রভৃতি নানা পদার্থ উঠিয়া এঞ্জিনের লৌহনির্ম্মিত অংশগুলি খাইয়া দেয়। ফলে এঞ্জিন ঘন ঘন মেরামত করা দরকার হয়।

এই অসুবিধা দূর করার জন্য এখন আর ভূগর্ভের বাষ্প বরাবর এঞ্জিনে প্রয়োগ করা হয় না। সেই বাষ্পের উত্তাপে পরিষ্কার জল দিয়া বাষ্প প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এঞ্জিন চালানো হয়।

ব্যাপারটা আরও বৃহৎ আকারে চলে কি না তাহা দেখিবার জন্য প্রিন্স জিনোরী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ৩০০০ কিলোওয়াটের (kilo-watt) তিনটি এঞ্জিন তৈরি করেন। এই এঞ্জিনের বয়লারগুলির একটি বিশেষত্ব আছে। বয়লারের ভিতরে কুণ্ডলী পাকানো এল্যুমিনামের নল। ইহার ভিতর দিয়া প্রাকৃতিক বাষ্প চালাইয়া যে বাষ্প প্রস্তুত হয়, তাহাতেই এঞ্জিন চলে। এল্যুমিনামের নল দেওয়ার তাৎপর্য্য এই, যে, তাহাতে প্রাকৃতিক বাষ্পের উত্তাপ প্রায় সবটুকুই কাজে লাগান হয়, আর প্রাকৃতিক বাষ্পে লোহার চেয়ে এল্যুমিনমের ক্ষতি অনেক কম হয়।

এই শক্তিতে প্রায় ৩৬০০০ ভোল্ট তড়িৎ উৎপন্ন হইয়া ফ্লোরেন্স, লেগহর্ণ, ভলটিরা, ক্রোসেটো প্রভৃতি সহরে প্রেরিত হয়। ঐ তড়িৎশক্তি বর্ত্তমান সময়ে দিনে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুতের কাজে ও রাত্রে শহর আলোকিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

টাস্কানীতে কয়লা তত পাওয়া যায় না, আর যা পাওয়া যায় তার দাম খুবই চড়া, তাই আগ্নেয়গিরির শক্তি কাজে লাগানোতে ঐ প্রদেশের পরম উপকার হইয়াছে। ঐ স্থানে অনেক মাইল জুড়িয়া এই প্রাকৃতিক বাষ্প পাওয়া যায়, সুতরাং এই শক্তি এখনো অনেক গুণ বাড়ানো যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রেলগাড়ীতে স্বয়ংক্রিয় বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র।

এমন সময় ছিল যখন রাত্রে রেলগাড়ীতে তেলের ডিবি মিটমিট করিয়া জ্বলিয়া নামমাত্র আলোক দিত। সেই আলোকে অন্য কাজ করা দূরের কথা, বেঞ্চিতে হোঁচোট খাইয়া পা না ভাঙ্গিলেই যাত্রী ভাগ্য মনে করিতেন। তারপর গাড়ীতে গ্যাসের বন্দোবস্ত হইল, ক্রমে গ্যাসের আলোতে ম্যান্টল চড়িল, আর উচ্চ শ্রেণীতে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার বন্দোবস্ত হইল। আজকাল ৩য় শ্রেণীর গাড়ীতেও বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত।

গাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলোর প্রচলন খুব সহজে হইয়া উঠে নাই। প্রথমে গাড়ীর নীচে খুব বড়-বড় সঞ্চয়-তড়িৎকোষ (Storage battery) রাখা হইত। তাতে এত বিদ্যুৎ একেবারে পুরিয়া দিতে হইত যেন পরবর্ত্তী যে-ষ্টেশনে বিদ্যুতের কারখানা আছে সে-ষ্টেশন পর্য্যন্ত চলে। সেই ষ্টেশনে আবার বিদ্যুৎ ভরা হইত। ইহাতে গাড়ীর ভার তো বাড়িয়া যাইতই, আর তা ছাড়া প্রত্যেক বার বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের সময়ে অনাবশ্যকরূপে বিলম্ব হইত ও গাড়ীগুলি শক্তিকেন্দ্রের (Power house)

নিকটে লইয়া যাওয়া প্রভৃতি অনেক হাঙ্গামা করিতে হইত। সঞ্চয়-কোষগুলি রীতিমতভাবে পূর্ণ করিতে অনেক সময় লাগে; তত সময় গাড়ী থামাইয়া রাখা সম্ভব নয় কাজেই সেগুলি রীতিমত পূর্ণ করা হইত না। আবার কম সময়ে বেশী তড়িৎ পুরিতে যাওয়ায় কোষগুলিরও আয়ুক্ষয় হইত।

এই-সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য আর-এক ব্যবস্থা হইল। এই ব্যবস্থায় রেলগাড়ীর ইঞ্জিনে বিদ্যুৎ প্রস্তুত করিয়া তাঁরযোগে অন্যান্য গাড়ীতে পাঠান হইত। কিন্তু এতেও গাড়ীগুলি খুলিবার জুড়িবার সময়ে নানা অসুবিধা ঘটিত বলিয়া এই ব্যবস্থারও বেশী প্রচলন হয় নাই।

এর পরে যে ব্যবস্থা হইল তাহাতে প্রত্যেক গাড়ীর সঙ্গে-সঙ্গেই তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র (Dynamo) বসাইবার ব্যবস্থা হইল। বর্ত্তমানে ইহা প্রায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে বলিয়া ইহার খুব আদর। যন্ত্রগুলি গাড়ীর অক্ষদণ্ডের (car-axle) সহিত চামড়ার একটা দোয়াল দিয়া সংযুক্ত করিয়া ঘোরানো হয়। এই ব্যবস্থায়, চলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রত্যেকটি গাড়ীতে স্বতন্ত্রভাবে তড়িৎ উৎপন্ন হয়; একটি গাড়ীর যন্ত্র যদিই বা কোনো কারণে খারাপ হইয়া যায়, তবু অন্য সব গাড়ীর আলো জ্বলিতে থাকে। আলো জ্বালিবার সমস্যা লইয়া রেল কোম্পানীর মাথা ঘামাইতে হয় না। গাড়ীগুলির শিকল ও ব্রেকের নল জুড়িয়া দিলেই সব চুকিয়া যায়।

যন্ত্রটিতে এরূপ বন্দোবস্ত আছে যে যখন গাড়ী চলিতে থাকে তখন যন্ত্রটিও চলিতে আরম্ভ করে। যন্ত্রটি গাড়ীর আলো পাখা ও একটি ছোট সঞ্চয়-কোষের সহিত তার দিয়া এরূপভাবে সংযুক্ত থাকে যে আলো জ্বালিয়া ও পাখা চালাইয়া উৎপন্ন তড়িৎশক্তির যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেটুকু যাইয়া কোষে সঞ্চিত হয়। গাড়ী চলিবার সময় সঞ্চয়-কোষটি দিব্যি বসিয়া-বসিয়াই পুষ্টিলাভ করে; কিন্তু যখন গাড়ী থামে তখন তড়িৎ-যন্ত্রটি ও সঞ্চয়-কোষটি ভাগাভাগি করিয়া যাত্রীদের সেবা করে। ধীরে ধীরে তড়িৎপূর্ণ করা হয় বলিয়া কোষটি সহজে নষ্ট হয় না। মোটর গাড়ীতেও আজকাল এই ব্যবস্থায় আলো জ্বালানো হইতেছে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত।

পোলাণ্ডের প্রতিভাবান ভাস্কর।

য়ুরোপের যুদ্ধপীড়িত দেশ হইতে অনেক শিল্পী নিউ-ইয়র্কে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথম প্রথম যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে য়ুরোপীয় শিল্পের নবপন্থীর দল। পোলদেশীয় ভাস্কর এলী নাডেলম্যান কোনো বিশেষ শিল্পীদলের পর্য্যায়ভুক্ত নন, তবে তিনি তাঁর ভাস্কর্য্যের মধ্যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রোদাঁর প্রভাব অল্পবিস্তর জগতের সকল ভাস্করের উপর বর্ত্তিয়াছে। নাডেলম্যান সে-প্রভাবের হাত এড়াইয়া ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে স্বাধীনমত পোষণ করেন এবং নূতন ধরণে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারেন। ইহা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়।

নাডেলম্যানের মতে এ-যুগের শিল্পীগণের সবচেয়ে বড় ভুল হইতেছে, প্রকৃতি যে-ভাষায় কথা কয় সেই ভাষায় কথা বলিতে চেষ্টা করা। এরূপ করা নকল, সৃষ্টি নয়। আর্ট সৃষ্টি করিতে হইবে চিন্তা বা সমাধি দ্বারা; ভাবকে রূপদান করিতে পারিলে প্রকৃতির যথার্থ রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে। চিত্রাঙ্কন বা ভাস্কর্য্য উভয়েরই সর্ব্বপ্রধান গুণ—নমনীয়তা। নমনীয়তা বলিতে কি বুঝায় তা তিনি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"সকল বস্তুরই একটি স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, সেইটিই উহার প্রাণ। একখণ্ড পাথরকে আমাদের যেমন খুসি তেমনি ভাবে আমরা রাখিতে



এলি নাডেলম্যান, তাঁহার কারখানায়।

পারি না। উহা নিজ ইচ্ছানুসারে টলিয়া পড়িয়া সেই বিশেষ স্থান অধিকার করিবেই যা উহার আকৃতি ও আয়তনের উপযোগী।

"এই আশ্চর্য্য শক্তি, এই জীবনই নমনীয় শিল্পে নিজেকে প্রকাশ করে। এই অনুশীলনের ফলে শিল্পের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া জীবন এমন আশ্চর্য্য ভাবপ্রকাশক হইবে যে তাহাতে দর্শক মুগ্ধ হইয়া যাইবে।

"বস্তুর এই ইচ্ছাকে আকার দেওয়া হইলে তাহাকেই আমি নমনীয়তা বলি। এই শক্তি, এই ইচ্ছা কেবল বস্তুর মধ্যেই আবদ্ধ নয়। ইহা একটি স্বাভাবিক শক্তি, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মত। খুব উঁচু একটি স্তম্ভের দিকে যখন চাই তখন মনে মনে আমরা কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি। আমরা বোধ করি যে, বস্তুটার যেন উহা স্বাভাবিক অবস্থা নয়, যেন উহা কষ্টে-সৃষ্টে ঐরূপে খাড়া রহিয়াছে। সেইরূপ, অন্য কোনো পদার্থ, যেখানে বস্তুর প্রয়োজন ও স্বভাবকে অগ্রাহ্য করা হয় নাই, তা দেখিয়া আমরা তৃপ্তি অনুভব করি। ইহা হইতেই আমাদের মনের সঙ্গে নমনীয় শিল্প-রচনার যোগের উদ্ভব। সেইজন্যই মূর্ত্তির নমনীয়তা (Plasticity) আমাদের মনে ভাবের বন্যা আনে; সেই জন্য অতি তুচ্ছ জিনিসও আমাদের চোখে অভূতপূর্ব্ব সুন্দর ও মনোহর বলিয়া প্রতিভাত হয়, যদি উহার মূর্ত্তি নমনীয়তার আদর্শ বজায় রাখিয়া সৃষ্ট হইয়া থাকে। নমনীয়তা এই শ্রেণীর শিল্পের কাব্য। নমনীয়তাই উহার প্রাণ। অন্যত্র ইহার কাব্যের সন্ধান করিতে যাইলে ভুলপথে যাওয়া হইবে।"

নাডেলম্যানের নির্ম্মিত উজ্জ্বল শ্বেতমর্ম্মরের কয়েকটি মূর্ত্তিতে বঙ্কিমরেখার অদ্ভুত সামঞ্জস্য দ্যাখা যায়। এই রেখাগুলি পরস্পর



রহস্যময়ী !

এই মূর্ত্তিটিকে শিল্পী নিজে তাহার রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন (The flower of his achievement) মনে করেন। ইহা কোনো বিশেষ রমণীকে মডেল করিয়া নকল করা মূর্ত্তি নহে; ইহা রমণীর চিররহস্যময় কমনীয় শাশ্বত রূপের অনুভবের প্রকাশ। ইহা কোনো বিশেষ নারীর মূর্ত্তি নহে, ইহা শাশ্বত নারীর প্রতিকৃতি।

বিরোধী হইলেও সকলে মিলিয়া মিশিয়া একটি পরিপূর্ণ ছন্দের সৃষ্টি করে। বিখ্যাত ভাস্কর রোদাঁর নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে যে স্পন্দমান দেহ, কামনার আনন্দ, পুরুষ ও নারীর মিলনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রতিভাত, এই পোলদেশীয় শিল্পীর সৃষ্টিতে তাহা নাই। তাঁহার নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে বিষাদের ভাব সুস্পষ্ট, তবে তা যেন সঙ্গীতে ভরপুর। নাডেলম্যানের মানসী মূর্ত্তিগুলি পুরুষ বা নারী তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। সেগুলি আশ্চর্য্যরকম sexless বা ক্লীব।

ভাস্কর্য্যকে রোমাণ্টিক ভাব প্রকাশের কাজে লাগানো ঠিক নয়, ইহাই নাডেলম্যানের মত। নমনীয় ভাব মূর্ত্তিতে না ফুটাইয়া তাহাতে আমাদের বিচিত্র মনোভাব ফুটাইতে পারিলে যে খ্যাতি অর্জ্জন করা যায় নাডেলম্যান স্বেচ্ছায় তা পরিহার করিয়াছেন। কেন না ভাস্কর্য্য হওয়া উচিত স্ফটিকের মত,—ইহার সৃষ্টির মূলে থাকিবে প্রাকৃতিক নিয়ম; উহার মধ্যে যে-পরিমাণে আর্ট প্রকাশিত হবে আর্টিষ্টের ব্যক্তিত্ব সেই পরিমাণে চাপা পড়িবে। মূর্ত্তি গড়িবার আগে তিনি যে নক্সা করেন তার মধ্যে রেখাগুলি এমন অদ্ভুত রকমে পরস্পর কাটাকাটি করিয়া যায়, মনে হয় যেন কোনো ধাতু স্ফটিকে পরিণত হইয়াছে; উহা অনাগত মূর্ত্তির নমনীয় রূপের মাধুরী এবং মূর্ত্তিদেহের অভঙ্গতা সূচিত করে। এবং এই ছন্দময় রেখাসমষ্টি এবং সমতল ক্ষেত্র মর্ম্মর, কাঠ বা ধাতুর উপর স্থানান্তরিত হইয়া মূর্ত্তিকে একটি সুকোমল শান্তভাবে মণ্ডিত করে।

এই শিল্পী সম্বন্ধে এক সমালোচক বলেন—"নাডেলম্যান বস্তুর spirit বা অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট ভাবিয়াছেন। তিনি যেন ধাতু এবং মর্ম্মরের ভাষাতেই ভাবিয়া থাকেন। প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তাঁর খুব নির্দ্দিষ্ট ধারণা আছে। এবং শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর উদ্দেশ্য হইতেছে তাঁর নিজের ভাবের প্রাণশক্তির সঙ্গে মূর্ত্তি গড়িবার উপাদানের প্রাণশক্তির মিলন।



প্রশান্তি।

নাডেলম্যানের হাতের সমস্ত মূর্ত্তিই আবেগ ও উচ্ছ্বাসশূন্য হয়। এই মূর্ত্তিটি বিশেষভাবে অন্তরের নিরুদ্বেগ প্রশান্তি প্রকাশ করিতেছে।

"এই শিল্পী মনে করেন, যেখানে রহস্য নাই সেখানে মাধুরীও নাই"। ইঁহার নির্ম্মিত মর্ম্মরের মাথাগুলি দর্শকের দিকে ফিরিয়া যেন হেঁয়ালির হাসি হাসিতেছে। আমাদের হাত আপনা-আপনি মূর্ত্তিগুলি ছুঁইতে চায়, মর্ম্মরময় নারীদেহভঙ্গিমা স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিতে চায়। এ-সব নারী যেন গ্রীস দেখিয়াছে, যেন গ্রীসের সৌন্দর্য্য অঙ্গে মাখিয়াছে, তার পর যেন বিদ্রূপের ভাবে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। নাডেলম্যান রসিক;



রেখা-তরঙ্গের ছন্দোময়ী মূর্ত্তি।
নাডেলম্যানের এই মূর্ত্তিটি প্রথম দৃষ্টিতে আড়ষ্ট কৃত্রিমতাপূর্ণ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই ইহার অঙ্গে তরঙ্গিত রেখার সমন্বয়ে একটি সুঠাম ছন্দ চোখে ধরা পড়িবে।

তিনি বিদ্রূপের ভাব প্রকাশে দক্ষ। তিনি অতি মোলায়েম রহস্যের হাসি হাসিতে পারেন। তাঁহার রচিত ধাতুর বা উজ্জ্বল মর্ম্মরের কোনো মূর্ত্তিতেই ভাবের ঝোড়ো হাওয়ায় কিছুই উড়িয়া হারাইয়া যায় নাই।"

আর এক সমালোচক বলেন "তাঁর আর্টে কখনো কখনো অঙ্ক-শাস্ত্রের ব্যবস্থা উঁকি মারে, কখনো বা তাঁর রচনা একটি ক্ষুদ্র আকারের খাঁটি স্থাপত্যবিশেষ। তবুও তাঁর মত বয়সে রোদাঁর অদ্ভুত প্রভাব এড়াইয়া এরূপ বিশিষ্ট মত পোষণ করা কম প্রশংসার কথা নয়।"

এই প্রতিভাবান শিল্পীর জন্ম ১৮৮৫ সালে ওয়ারশ নগরে। সেখানেই তাঁর আর্টশিক্ষার হাতেখড়ি হয়, এবং শিক্ষা সমাপ্ত করেন পারীতে গিয়া। পারীতে তিনি বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেখানে তাঁর কোনো শিক্ষক ছিল না। তিনি স্বচেষ্টায় শিক্ষিত। জীবিত লোকদের চিত্ররচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর সকল রচনাই কমনীয় ও রহস্যময়।

সু।



বুস।
নাডেলম্যানের গঠিত সুনিপুণ শিল্প-নমুনা।

একচেটিয়া হীরকের ব্যবসায়।

প্রধানতঃ আমেরিকায় অত্যন্ত চাহিদা বলিয়াই ভাল হীরার দাম গত দশ বৎসরে অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাল হীরা যাহার দাম ছিল ৬০ পাউণ্ড তাহার দাম হইয়াছে ১০০ পাউণ্ড। পক্ষান্তরে একটু খারাপ দরের হীরা যাহার চাহিদা আমেরিকায় তেমন নাই তাহার দাম সমানই রহিয়াছে।

অল্প লোকেই জানেন যে, জগতের এই হীরক সরবরাহ ব্যাপার লণ্ডনের অর্দ্ধ ডজন ধনকুবের দোকানদারের হস্তেই রহিয়াছে। ইহারা দক্ষিণ আফ্রিকার খনির মালিকদের সঙ্গে বাৎসরিক বন্দোবস্ত করিয়া লন। বৎসরে এই London Diamond Syndicate কোম্পানীর হাত দিয়া প্রায় ৮,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের হীরক সরবরাহ হয়। এই সমবায়ের শ্রেষ্ঠ দোকান হইতেছে—Dunkelsbuhler & Co. এবং Joseph Brothers, Abraham Brothers প্রভৃতি।

হীরা খনি হইতে সমবায়ের হাতে আসিলেই বাছাই আরম্ভ হয়—শাদা উজ্জ্বল হীরক শ্রেষ্ঠ, তারপর ক্রমে গুণ অনুসারে অন্যান্য হীরক ফেলা হয়। ভাল আকৃতিতেও মূল্যের অনেক তারতম্য হয়। পূর্ব্বেই হীরকের সংখ্যা ও প্রকার দালালদের জানাইয়া প্রতি সপ্তাহে বিক্রী হয়। দাম সব হীরার সঙ্গেই লেখা থাকে। এ ব্যবসায়ের অলিখিত আইন এই যে এক প্রকার জিনিসের ক্রেতা অপর-প্রকার জিনিস দেখিতে পারিবেন না। এইভাবে সাধারণ নিলামের মত জিনিস বিক্রয় হইতেছে না—এই দেখানো হয়। এই সমবায় হইতে ১৯১১ খৃঃ ৬,৭৪০,০০০ টাকা মূল্যের হীরক বিক্রয় হইয়াছে—প্রতি বৎসরেই এইরূপ হয়।

জার্মেন শ্রমজীবীর নাট্য।

গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে জার্ম্মেনীতে যে সব নাট্য বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে উত্তর জার্ম্মেনীর একজন শ্রমজীবীর নাট্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। নাট্যের নাম "Die Last" "বোঝা"; আল্টোনা শিলার থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে; নাট্যকারের নাম পল টোডাক্স। টোডাক্স এ পর্য্যন্ত যদিও শ্রমজীবীর কার্য্যের কোন বিভাগেই হাত দিতে বাকি রাখেন নাই, কিন্তু কোন কিছুতেই তেমন কৃতকার্য্য হইতে

পারেন নাই। কয়েক বৎসর আগে ইনি "The Competitors" নামে একখানি নাট্য লেখেন। নাট্যখানি আশাপ্রদ বলিয়া স্লাভেন-হাগেন-সোসাইটী ইঁহার নাট্যসাধনার পথ উন্মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

নাট্যশালায় "বোঝা" অভিনীত হইয়া গেলে, সকলে নাট্যকারকে দেখিতে চাহিলে ইনি শ্রমজীবীর পরিচ্ছদে নাট্যশালায় দেখা দেন। জর্জ এঙ্গেলের খ্যাতনামা উপন্যাসের নামে এই উপন্যাসের নামকরণ হইয়াছে। ইহা জার্ম্মেনীর নীচ কৃষিজীবনের চিত্র লইয়া অঙ্কিত। "বোঝা"র এই দেখানো হইয়াছে যে, একজন চালাক দোষী তাহার বোকা ভ্রাতাকে তাহার স্থানে অভিযুক্ত করিয়া আইনের বিচারে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া গেল।

বৃহত্তম জাহাজ-কোম্পানীর জুবিলি উৎসব।

হারল্যাণ্ড ও উল্ফ জাহাজ-নির্ম্মাণ কোম্পানীর চেয়ারম্যান লর্ড পাইরির জুবিলি-উৎসব সেদিন হইয়া গেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পোনের বৎসরের বালক পাইরি শিক্ষানবীশরূপে এই কোম্পানীতে প্রবেশ করেন, বার বৎসর পরে ইনি একজন অংশীদার হন। আজ ইঁহারই উৎসাহে এবং বুদ্ধিকৌশলে এই কোম্পানী জগতের একটি শ্রেষ্ঠ কোম্পানী। লর্ড পাইরি ক্যানাডায় আইরিস পিতামাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার মৃত্যু হইলে খুব অল্প বয়সে ইনি বেলফাষ্টে আগমন করেন, স্কুল ছাড়িবার পরেই কোম্পানীর সহিত ইঁহার সম্বন্ধ আরম্ভ হয় ও দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। লর্ড পাইরির কর্ত্তৃত্বে কোম্পানী জগতের শ্রেষ্ঠ সাগরপোতসমূহ নির্ম্মাণ করিতেছে, 'ওলিম্পিক', নিমজ্জিত 'টাইটানিক' প্রভৃতি এই কোম্পানীরই জাহাজ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর

সপ্তদশ অধ্যায়।

সুন্দরীর আশ্রয়ে।

কুকুরগুলির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম, এমন সময়ে কুকুরদের বিকট চীৎকার শুনিয়া এক-জন রমণী তাঁবু হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিলেন। মুখ-খানি যথার্থই বড় সুন্দর। সেই বিজন দেশে এমন সুন্দরীর আবির্ভাব কি করিয়া সম্ভব হইল! আমাকে দেখিয়া রমণী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, তারপর তাঁবু হইতে বাহিরে আসিয়া কুকুরগুলিকে তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। তাঁর দর্শনমাত্র কুকুরগুলি যেন লজ্জিত হইয়া লেজ নীচু করিয়া পলায়ন করিল। আমি হাসিয়া সুন্দরীর নিকট এক রাত্রির জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিলাম। তিনি বলিলেন "আচ্ছা! আমার লামাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি"—এই বলিয়া তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে আবার আসিয়া সুন্দরী আমায় তাঁবুর ভিতর লইয়া গেলেন। তাঁর লামা অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি। আমার ভালই হইল, সেই দিনটা সেই লামা ও তাঁর সুন্দরী পত্নীর সহিত সদালাপ করিয়া সুখে কাটাইলাম। আরও দুদিন সেই তাঁবুতে বাস করিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিলাম। এই অবসরে অনেক পথের তথ্য সংগ্রহ করিলাম। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে প্রধান সংবাদটি এই যে অশ্বপৃষ্ঠে অর্দ্ধদিন যাত্রার পর "কায়ংচু" (পাগলা ঘোড়ার নদী) নামে ব্রহ্মপুত্রের এক উপনদী দেখিতে পাইব, তাহা বিশেষ অভিজ্ঞ লোক ছাড়া অপর কেহ পার হইতে পারে না। সেই নদী পার হইবার জন্য উপযুক্ত সঙ্গীর প্রত্যাশায় ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত আমি সেই তাঁবুতেই বাস করিলাম। ১২ই জুলাই রাত্রে লামা অন্যান্য তাঁবুর লোকদিগকে আমার ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য তাঁহার তাঁবুতে ডাকিয়া আনিলেন। প্রায় ৩০ জন পুরুষ নারী উপস্থিত হইলেন। আমার উপদেশ শুনিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়া যাত্রার পূর্ব্বে নানাবিধ উপহার দিলেন। শ্রোতাদিগের মধ্যে একজন বালিকা আমাকে তাহার কণ্ঠভূষণ উপহার দিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি তাহার হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া আবার তখনই ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম "কিছু মনে কোরো না, আমার ইঁহাতে কোন প্রয়োজন নাই।" বালিকাটি কিছুতেই ছাড়িবার পাত্রী নয়। অগত্যা সেই কণ্ঠভূষণ হইতে একটি রত্ন লইলাম। সেটি আজও সেই বালিকার স্মৃতিচিহ্ন-রূপে আমার কাছে আছে। পরদিন সেই সাদা তাঁবুর অধিকারী আমাদের লামার সহিত বাণিজ্যদ্রব্যের আদান-প্রদানের জন্য আসিলেন। তিনি বৌদ্ধ, আমার সহিত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক আলাপ হইল। তিনি বড়ই প্রীত হইয়া আমাকে তাঁহার সহিত আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি তাঁর তাঁবুতে গিয়া অনেক সুখাদ্য আহার করিলাম। সে ব্যক্তি লাদক হইতে ব্যবসার জন্য আসিয়াছেন। তৎপর-পরদিন তিনি যাত্রা করিবেন। এই ব্যক্তি আমায় "কায়ংচু" পার করিবার ভার লইলেন।

আমাদের "লামার" বিষয় শুনিলাম, তিনি যথার্থই বৌদ্ধপুরোহিত—চিরকৌমার্য্যব্রতচারী হইয়াও সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন জানি না;



বাঙালীর বাড়ীতে উদ্যান-সম্মিলন। বাঙালীটিকে বাহির করুন দেখি ?

(চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত।)

জানিতেও চাহি না। তিনি আমার মহোপকার করিয়াছেন, দুর্দ্দিনে আশ্রয় দিয়া আমার চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। লোকটি সম্পন্ন, ৬০টি চমরী, ২০০টি মেষ তাঁহার প্রধান সম্পত্তি, তদ্ভিন্ন এই রূপবতী ভার্য্যা। লামার পত্নীও পতির প্রতি অতিশয় অনুরাগিণী। লামার সুখসৌভাগ্য যথেষ্ট। ইহা অপেক্ষা লামার ঐহিক প্রার্থনীয় আর কি থাকিতে পারে? কিন্তু সেই দিনের এক ঘটনায় লামার সৌভাগ্য সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া তাঁবুর বাহির হইতে বিষম কোলাহল শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে ভিতরে দাম্পত্যকলহের অভিনয় পুরাদমে চলিয়াছে। ভিতরে ঢুকিয়া দেখি সুন্দরীর মুখশ্রী কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। হায় কোথায় বা সেই রূপ, কোথায় বা সে লাবণ্য—মুখ একেবারে অগ্নিবর্ণ, এবং ক্ষণে-ক্ষণে ভীষণ ভ্রূকুটি ও মুখ-ভঙ্গিতে তার রূপান্তর হইতেছে। আমি পূর্ব্বে কখন কোন রমণীর এমন প্রচণ্ড ক্রোধ দেখি নাই। সুন্দরী তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া স্বামীকে অকথ্য-কুকথা বচন শুনাইতেছে, লামা গম্ভীর শান্তভাবে সহ্য করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু যখন রমণী তাঁহাকে জন্তু জানোয়ার প্রভৃতি সুমিষ্ট সম্বোধনে সম্ভাষণ করিতে লাগিল তখন বোধহয় আমায় দেখিয়া পুরোহিত মহাশয় আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য পত্নীকে প্রহার করিতে গেলেন; সে যথার্থ প্রহার, না প্রহারের অভিনয়মাত্র বুঝিলাম না—যাহা হোক লামার পক্ষে এ-কার্য্য ঠিক হয় নাই। এখন কোথায় গেল তর্জ্জনগর্জ্জন, আর কোথায় গেল সেই ভৈরবী মূর্ত্তি। চীৎকার করিয়া স্বামীর পায়ের উপর পড়িয়া, সুন্দরী "আমায় মেরে ফেললে" "আমি গেলাম গেলাম" বলিয়া চক্ষু কর্ণ মুদ্রিত করিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। আমি অনেক কষ্টে শান্তিস্থাপন করিলাম। লামা সে রাত্রি অন্য তাঁবুতে আশ্রয় লইলে সুন্দরী শয্যা গ্রহণ করিল। যাহোক বৌদ্ধ পুরোহিতের কৌমার্য্য-ব্রত ভঙ্গের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার অসীম করুণার উদয় হইল। হাঁ, লামার সুখ-সৌভাগ্যের সীমা নাই বটে!

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নানা অবস্থায়।

আলচু লামার নিকট হইতে বিদায় লইয়া লাদকের ব্যবসায়ীর সঙ্গে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের সঙ্গে ছয়জন ভারবাহী লোক ও কতকগুলি ঘোড়া ছিল। পথে তখনও চারিদিকে কিছু কিছু বরফ আছে দেখিলাম—সবুজ সবুজ ঘাস সবেমাত্র গজাইয়া উঠিতেছে। অশ্বপৃষ্ঠে ১৪ মাইল গিয়া "কায়ংচু" নদীর পাড়ে উপস্থিত হইলাম; বিশ্রাম করিবার জন্য ধর্ম্মগ্রন্থ খুলিয়া বসিলাম। উত্তর পশ্চিমের শুভ্রতুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বত হইতে "কায়ংচু" নদী নামিয়া আসিতেছে। নদীটি ৪৫০ গজ চওড়া- সঙ্কীর্ণস্থানে ৬০ গজ হইবে- সেখানে দুই ধারের খাড়া পাহাড়ের ভিতর দিয়া গর্জ্জন করিতে-করিতে নামিতেছে। নদী পার হইবার পূর্ব্বেই আহারের উদ্যোগ হইল। বিদায়কালে লামা অতি সুন্দর চাউল দিয়াছিলেন। তিব্বতে চাউল বড় দুর্মূল্য—কতদিন অন্নগ্রহণ করি নাই। সেদিন সকলকে অন্ন বিতরণ করিলাম। সকলেই পরিতৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিল।

এখন নদীপার হওয়া। ঘোড়াগুলির উপর হইতে বোঝা নামাইয়া তাহাদের পার করা হইল। লোকেরা সমুদায় কাপড় খুলিয়া অল্পে-অল্পে জিনিষগুলি পার করিল, আমরাও কাপড় খুলিয়া পার হইলাম। জল বরফগলা, মাঝে-মাঝে বরফের চাঁই ভাসিয়া আসিতেছে; সেগুলির আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কোনমতে পার হইলাম। তখন রৌদ্র ছিল—রৌদ্রে বসিয়া আমরা শীতল জলে অবগাহনের ক্লেশ কিঞ্চিৎ লাঘব করিলাম। আবার যাত্রা আরম্ভ হইল। উত্তর-পশ্চিমে ১৫ মাইল গিয়া আবার যাযাবর তিব্বতীদের কয়েকটা তাঁবু দেখিতে পাইলাম। সেই তাঁবুগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় তাঁবুটিতে আশ্রয় লইলাম। তাঁবুর অধিকারীর নাম "কর্ম্ম"। আমি আলচু লামার নিকট হইতে আসিতেছি শুনিয়া আমায় পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত কর্ম্ম মহাশয়ের বয়স ৫০ বৎসর হইবে। যাহা তিব্বতে কখন দেখি নাই তাহা তাঁহার গৃহে দেখিলাম অর্থাৎ "কর্ম্ম" মহাশয়ের তিন স্ত্রী—প্রথমা

পত্নী অন্ধ. বয়স ৪৭, দ্বিতীয়ার বয়স ৩৫, কনিষ্ঠ ২৫ বৎসরের —তাঁহারই গর্ভজাত একটি মাত্র সন্তান। তিব্বতের নিয়ম ৪।৫ জন পুরুষের একমাত্র পত্নী। অত্যন্ত দরিদ্র হইলে ৪।৫ জন ভগ্নীর এক জনের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত কর্ম্ম তিব্বতী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় করিয়াছেন দেখিলাম। "কর্ম্মের" তাঁবুতে দুদিন বিশ্রাম করিলাম, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিলাম, নূতন পাদুকা কিনিলাম, তৎপরে আবার যাত্রা। "কর্ম্ম" মহাশয় দয়া করিয়া ভারবহনের জন্য আমায় একটি মেষ দিলেন। মেষটি কিছুদূর গিয়াই গৃহের দিকে ফিরিয়া চলিল! কোন মতেই আর এক পা অগ্রসর হইবে না। আমিও ছাড়িবার পাত্র নই, শেষে কি মেষের নিকট পরাজয় স্বীকার করিব! তা মেষেরই জয় হইল, সে আমাকে হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া কর্ম্মের তাঁবুতে হাজির করিল। এবার আমি দুইটি ভাল মেষ কিনিলাম, তাহাদের পৃষ্ঠে বোঝা চাপাইয়া সুখে যাত্রা করিলাম।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

তিব্বতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় নদী।

আবার যাত্রা করিয়া বেলা প্রায় ৩টার সময় একদল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দলের সর্দ্দার যিনি তিনি সেই অঞ্চলের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। ভদ্রলোকটি আমায় ডাকিলেন। তাঁর সহিত চারিচক্ষের মিলন হইবামাত্র বুঝিলাম লোকটি আমায় সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে। সমূহ বিপদ গণনা করিয়া মনে-মনে নানা ফন্দী আঁটিতে লাগিলাম। তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য সাধু গিলং রিনপোচির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। সাধুর নাম করিবামাত্র লোকটি জল হইয়া গেল। যখন তাঁহার নিকট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ ও তাঁর অনুগ্রহের বর্ণনা করিলাম, তখন সহসা আমার অদৃষ্ট খুলিয়া গেল। লোকটি আমাকে তার নিজের তাঁবুতে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিলেন, আমার সেবার জন্য ভৃত্য নিযুক্ত হইল। লোকটির নাম "ওয়াং-ডক।" ওয়াংডক আমায় একটি অশ্ব দিলেন। তাঁর একজন লোক আমার সঙ্গে ৬ মাইল গিয়া আমাকে বলিল, এখানে একরাত্রি বাস করিয়া কিছুদূর গেলেই আবার পথিকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। লোকটি বিদায় লইল। পরদিন যাত্রা করিয়া যথাসময়ে ৪টি তাঁবু দেখিতে পাইলাম। আবার কুকুরগুলি আমার অভ্যর্থনার জন্য ছুটিয়া আসিল। এমন অভ্যর্থনা তিব্বতে সর্ব্বত্র মিলিয়াছে। সেস্থান হইতে একদিনের পথ অতিক্রম করিয়া এক ভীষণ নদীর তীরে আসিলাম, নদীর নাম "তামচোক খানবাব"—এখানেই ব্রহ্মপুত্রের আরম্ভ। এ নদী পার হওয়া আমার সাধ্য নহে, অথচ প্রচুর পুরস্কার দিয়াও একজন সঙ্গী পাইলাম না। নিরাশ হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময় এক রুগ্না শীর্ণা বৃদ্ধা আমার নিকট আসিয়া বলিলেন "আমার বড় কঠিন পীড়া, বড় কষ্ট পাইতেছি, বলিতে পার কবে আমার মৃত্যু হইবে?" অনুরোধ মন্দ নয়। দেখিয়াই বুঝিলাম, বৃদ্ধার ক্ষয়রোগ হইয়াছে, বাঁচিবার আশা নাই, তবু বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত নানা উপদেশ দিলাম, একটু ঔষধও দিলাম। বৃদ্ধা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "তুমি আমার এত উপকার করিলে, তোমার মত সাধুর কি উপকার আমি করিতে পারি?" আমিও সুযোগ বুঝিয়া নদী পার করিবার লোক চাহিলাম। বৃদ্ধা সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নদীটি অত্যন্ত প্রশস্ত—জল বরফের মত। জল স্থানে-স্থানে ৭।৮ ইঞ্চি মাত্র, কিন্তু বালুকার ভিতর মাঝে-মাঝে কোমর পর্য্যন্ত বসিয়া যাইতে লাগিল। অনেক কষ্টে ঘোড়া মেষ মানুষ সবাই পার হইলাম। কঠিন মৃত্তিকার উপর চরণ রাখিয়া বাঁচিলাম। সঙ্গের লোকেরা উত্তর-পশ্চিম দিকে এক গভীর গিরিবর্ত্ম দেখাইয়া বলিল "ঐপথ পার হইয়া ১৫।১৬ দিন ক্রমাগত জনমানববিহীন পথে যাত্রা করিলে মানস সরোবরে পৌঁছিবে। পথে ক্রমাগত মন্ত্র জপ করিও; সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে।"

বিংশ অধ্যায়।

ঘোর বিপদে।

ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া প্রায় সিকি মাইল গিয়াই আবার এক বিস্তীর্ণ ঢেউ-খেলান দেশ দৃষ্টিগোচর হইল। উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা করিয়া হিমালয়ের বিরাট মূর্ত্তির সম্মুখীন হইলাম। এখানে মেষ দুটিকে চরিতে দিয়া বিশ্রামের জন্য বসিলাম। হিমালয়ের অভ্রভেদী শুভ্রশিখর দিগন্তব্যাপী পর্ব্বতমালা দেখিয়া চিত্ত প্রসন্ন হইল। আনন্দে আত্মহারা হইয়া কবিতা রচনা করিলাম। নেপাল কিম্বা দারজিলিং

হইতে হিমালয়ের যে তুষার-কিরীটের শোভা দেখিয়াছি আজিকার এই বিরাট সৌন্দর্য্যের নিকট তাহা কত তুচ্ছ হইয়া গেল। মহান্ হিমাচলের এমন মহান্ সৌন্দর্য্য কল্পনারও অতীত। আমি যে অসাধ্য সাধন করিয়াছি, মানবের অগম্য দেশে আমি যাত্রী, আমার এই স্বাভাবিক আনন্দের উচ্ছ্বাস, আজ আর রুদ্ধ হইবার নয়। বিশ্রামের পরে আবার যাত্রা করিলাম। এ রাজ্য কেবল হ্রদপূর্ণ—ছোট-বড় অসংখ্য জলাশয়। অপরাহ্ন ৪ টার সময় এক বৃহৎ জলাশয়ের পার্শ্বে পৌঁছিয়া সেখানেই রাত্রিবাস করিলাম। অগ্নি চাই—কিন্তু এ দেশে ইন্ধন কিছুই নাই, চমরীর করীষ পর্য্যন্ত নাই—ঘোড়ার শুষ্ক মল দিয়া একটু আগুন করিলাম। কি প্রচণ্ড শীত! নিদ্রা হইল না। পরদিন দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে ১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া এক বিরাট তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতশিখর দেখিলাম—বুঝিলাম তাহা পার হওয়া অসাধ্য ব্যাপার। ধ্যানস্থ হইয়া আমার গন্তব্যপথ নিরূপণ করিলাম। যেদিকে যাত্রা করিলাম দিক্ ঠিক বটে, কিন্তু পথ যে ভীষণ তাহা আর বলিবার নয়। ২৭ মাইল পথ অতিক্রম করিলাম, একবিন্দু জল কোথাও দেখিলাম না। জলাশয়পূর্ণ দেশ হইতে এ কোন্ বারিবিহীন দেশে আসিয়া পড়িলাম। সারাদিনের পথশ্রমের পর একবিন্দু জল পাইলাম না। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত! একটু সবুজ তৃণ নাই যে শ্রান্ত মেষ দুটি ভক্ষণ করে! না আহার! না পানীয়! চা পান করিতে পারিলাম না। মানুষের সহ্যশক্তি কি অসীম! এত কষ্ট সহ্য করিয়াও নিদ্রার ব্যাঘাত হইল না। পরদিন প্রভাতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে চারিদিকে চাহিয়া দেখি—অনুমান ৭ মাইল দূরে এক স্রোতস্বতী বহিয়া যাইতেছে। জলপান করিবার আশায় ছুটিলাম—গিয়া দেখি, শুষ্ক বালুকাময় কোন পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর গর্ভ। তখনকার কষ্ট অবর্ণনীয়। যেন কোন দেবতার অভিশাপে, নদীর জল আমার স্পর্শমাত্রে শুষ্ক হইয়া গেল! কি দৈবের নিগ্রহ! পিপাসায় প্রাণ ত যায়! কাতর হইয়া চারিদিকে তাকাইলাম—দূরে আর-একটি স্রোতস্বতী দৃষ্টিগোচর হইল। ছুটিয়া গিয়া দেখি—নদীর শুষ্ক গর্ভ, জলের চিহ্ন মাত্র নাই। একি আমার প্রতি দৈবের নিষ্ঠুর উপহাস!

শ্রীহেমলতা দেবী।

গুড়ের উদ্ভব

দেশের আখ-চাষ কমিয়া গিয়াছে। বিলাতী চীনির দর সস্তা হওয়াতে কমিয়া গিয়াছে। ইং ১৮৯২ সালে সরকারের নিযুক্ত এদেশের অর্থনিবেদী (Economic Reporter) ৱাট সাহেব লিখিয়াছিলেন (*Resources of India*), "গোড়াতে ব্রিটিশ রাজনীতি এদেশের শর্করার ব্যবসায়ের অনিষ্ট করিয়াছে।* কোম্পানীর আমলে কোম্পানী নিজে শর্করা ও রেশমের বাণিজ্য করিতেন। কেবল বঙ্গদেশ হইতেই শর্করা রপ্তানি করিতেন। কিন্তু ব্রিটিশ মন্ত্রীরা আমেরিকা হইতে প্রেরিত শর্করা অপেক্ষা বঙ্গ হইতে প্রেরিত শর্করার উপর অত্যধিক শুল্ক বসাইয়া তদ্দেশে আমদানি প্রতিরোধের চেষ্টা করিলেন। কোম্পানী দেখিলেন, রপ্তানিতে পোষায় না। কালক্রমে ইংলণ্ডের মতি পরিবর্তন হইল, ইংলণ্ড ও স্কটলাণ্ডে চীনির কারখানা খোলা হইল, বিদেশ হইতে সে দেশে গুড় রপ্তানি আরম্ভ হইল। তখন বঙ্গের স্থান মান্দ্রাজ অধিকার করিল। ইহাতেও দেশের ক্ষতি হইত না। ইংরেজী ১৮৪৫ সাল হইতে এ দেশের শর্করার রপ্তানি কমিয়া আসিতেছে। রপ্তানি দূরে থাক, এ দেশে বিদেশী শর্করা আমদানি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমদানিহেতু এ দেশের আখ-চাষ কমিত, এমন নহে। অপর দুই কারণ জুটিল। (১) ইয়ুরোপের বীটের চীনি ভারতবর্ষের রপ্তানি বন্ধ করিল, (২) এখো চীনি অসম্ভব সস্তা হইল, এ দেশেও প্রবেশ করিল। ইয়ুরোপের বীটের চীনি অন্য দেশে রপ্তানি হইতে লাগিল, এ দেশেও আসিল। বিদেশী এখো চীনি সস্তা ছিল, বীটের চীনি আরও সস্তা হইল। এখন এ দেশ হইতে গুড় যায়; কিন্তু তাহার চীনি ধরিলে যত চীনি যায়, তাহার সাত গুণ আসিতেছে। মন্দের ভাল একটা কথা এই যে, বিলাতী চীনি সস্তা হইলেও খাবার গুড় কমাইতে

* Had the repressive action of the British Government in imposing a very much higher import duty on East Indian (as the Bengal article was called) than on West Indian sugar not existed, it is probable Bengal would have taken a very high place in the world's production and supply of cane-sugar.

পারে নাই; যে গুড় হইতে চীনি হইত, সে গুড়ে এখন আর চীনি হইতেছে না; চীনির দর কমাইয়া চীনি খাওয়া বাড়াইয়াছে। এ দেশের লোক গুড় শীঘ্র পরিত্যাগ করিবে না; কিন্তু যদি গুড় অপেক্ষা চীনি সস্তা হয়, তাহা হইলে বাণিজ্যের গতি পরিবর্তিত হইবে। পূর্বে এদেশে মরীচ দ্বীপ হইতে বোম্বাইতে চীনি আসিত। এখন (ইং ১৮৯২) মরীচ দ্বীপ, জর্মানী, চীন, ব্রিটিশ দ্বীপ, মালয়, অষ্ট্রিয়া হইতে আসিতেছে। ইং ১৮৯২ সালে ২৬ কোটি টাকার বিদেশী চীনি আসিয়াছিল। ৮ কোটি টাকার গুড় ও বিদেশী চীনি পারস্য, আরব, এডেন ও তুরস্কে গিয়াছে।"

সরকারী কাগজে দেখা যায়, ইং ১৯১২ সালে দেশে ৮ কোটি মণ গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাতে কুলায় নাই; বিদেশ হইতে ২ কোটি মণ চীনি আসিয়াছিল। মরীচ দ্বীপ হইতে ১২৬ লক্ষ, জাবা দ্বীপ হইতে ৪১ লক্ষ, আর অষ্ট্রিয়া ও জর্মানী হইতে বীটের চীনি ১৫ লক্ষ মণ। ইহার দাম ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার উপর। ইং ১৯১৩ সালে ১৫ কোটি টাকার আসিয়াছিল। অতএব হারাহারি আমাদের জনে জনে আট আনার বিদেশী চীনি খাইয়াছে। এ দেশের আমদানির মধ্যে কাপড় ৬৬ কোটি টাকার, ধাতুদ্রব্য ২২ কোটি টাকার; পরেই চীনি ১৫ কোটি টাকার। ব্যাপারটা সামান্য নহে; কোটিতে হিসাব; হাজারে নহে, লাখেও নহে। কোনো একটা প্রদেশের সাধ্য নাই, আখ চাষ দ্বারা কোটি কোটি টাকার চীনি উৎপাদন করে। দেশে কত গুড় উৎপন্ন হইতেছে, তাহার সঠিক সংবাদ পাওয়া অসম্ভব। তথাপি উপরের দেশী ৮ কোটি মণ গুড় ও বিদেশী ২ কোটি মণ চীনি ধরিলে বুঝি, এখন আখ চাষ যত আছে, তাহার অন্ততঃ অর্দ্ধেক না বাড়িলে আমদানি বন্ধ হইবে না। কারণ ২ কোটি মণ চীনি পাইতে অন্ততঃ ৪ কোটি মণ গুড় চাই। অতএব এখন যেখানে ৪ বিঘার চাষ আছে, তখন ৬ বিঘার দরকার হইবে। কিন্তু যে চাষে লভ্য কম, সে চাষ এত বাড়িতে পারে না। আখের জাত ভাল হউক, গুড় করা ভাল হউক; তখন আখ-চাষ বাড়িতে পারিবে।

আমাদের গুড় ও চীনি খরচ এমন বেশী নহে। ব্রাট সাহেব জন-প্রতি ১৪ সের ধরিয়াছিলেন। গুড়ে ১৪ সের, চীনিতে ৪৷৷০ সের মাত্র। এ হিসাব আগের। এখন দেখা যাইতেছে দেশী ৪ কোটি ও বিদেশী ২ কোটি মণ, মোট ৬ কোটি মণ চীনি ৩০ কোটি লোক খাইয়াছে, ভাগে ৮ সের মাত্র। বস্তুতঃ আরও কম। কারণ গুড়ের অর্দ্ধেক চীনি ধরা হইয়াছে। অন্য দেশের তুলনায় বছরে ৮ সের কিছুই নয়। ইং ১৯১০ সালে আমেরিকার "যুক্তরাজ্যে" ও ইংলণ্ডে জনে জনে ১ মণ, অষ্ট্রেলিয়াতে ১ মণের উপর, জর্মানীতে ১৯ সের, ফ্রান্সে ১৭ সের, অষ্ট্রিয়া হঙ্গেরীতে ১২ সের খাইয়াছিল। আমাদের এই চিরকালের গুড়ের দেশে ৮।১০ সের খুব কম বলিতে হইবে।

কোন্ যুগ হইতে আমরা আখ-চাষ করিয়া আসিতেছি, কে জানে। অন্ততঃ তিন হাজার বছরের কম নয়। তারপর কতকাল গিয়াছে; চীন আখের আস্বাদ পাইয়াছে, মুসলমানের অনুগ্রহে ইয়ুরোপ গুড়ের মুখ দেখিয়াছে। মাত্র চারি শত বৎসর ইয়ুরোপ চীনি খাইতে শিখিয়াছে, আমাদেরই দেশের আখ দ্বীপদ্বীপান্তরে লইয়া গিয়া মানুষকে 'দাস' করিয়া আখচাষে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এখন চীনি করিতে এমন শিখিয়াছে যে আমাদেরই শর্করা 'শুগার' নামে আমাদিগকেই খাইতে দিতেছে! আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়ায় বিস্তীর্ণ আখবাড়ী করিয়াছে। ইয়ুরোপে যে দেশে আখ জন্মে না, সে দেশে বিশেষতঃ অষ্ট্রিয়া, রুশিয়া, ও জর্মানীতে বীট-পালং শাগের শিকড় হইতে চীনি বাহির করিতেছে। বীটের শিকড়ে মিষ্টরস অধিক ছিল না। শতভাগে চারি পাঁচ ভাগ মাত্র থাকিত। কিন্তু বুদ্ধিবলে ১৮ ভাগে তুলিয়াছে। আমাদের গুড়-বৃক্ষ আখে এত পাই না! জর্মানীতে বিঘায় ১৬৷৷০ মণ চীনি, গুড়ে অন্ততঃ ৩ মণ জন্মাইতেছে। আক্রা মুনিষ দিয়াও এক মণ চীনির পড়তা ৫৲ টাকা মাত্র করিয়াছে!

শুধু চাষে নয়; যে কর্মে বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষা লাগে, সে কর্মেই আমরা বহু বহু দূরে পড়িয়া আছি। যেখানে এসব কিছুই লাগে না, এককথায় যেখানে আমরা মানুষ না হইয়া মাটি পাথর বুনা জন্তু বুনা গাছ হইলেও চলিত সেখানে আমরা ঠিক দাঁড়াইয়া আছি। যদি আখ-গাছ বনে জন্মিত, আখের বড় বড় অরণ্য থাকিত, তাহা হইলে হয়ত গাছগুলা কাটিয়া গুড় করিয়া খাইতে পারিতাম। তাহাতেও সন্দেহ আছে। দেশে বস্তু খেজুর-গাছ কত আছে, কেহ গণিয়া

শেষ করিতে পারিবে না। বুনা খেজুর, যাহার ফল প্রায় অখাদ্য, সে গাছ বঙ্গ ও বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে গুজরাট, দক্ষিণে মান্দ্রাজ পর্যন্ত আপনি জন্মিতেছে। কিন্তু বঙ্গ ও মহীশূর ছাড়া অকারণ জন্মিতেছে। বঙ্গেরও সব জেলায় খেজুরা গুড় হয় না। যশোর, খুলনা, নদীয়া ও পাশের জেলায় হইতেছে। হুগলী জেলায় এমন পরগণা আছে যেখানে খেজুর-গাছের রস গ্রহণ পাপের মধ্যে গণ্য। গাছ আছে, বন্য, যেখানে-সেখানে জন্মিতেছে, কেহ বা কদাচিৎ কাটিয়া মেথি খাইতেছে, হাড়ী কদাচিৎ পাতায় চাটাই বুনিতেছে, লোকে কদাচিৎ পাতায় জ্বালন করিতেছে। ওড়িষ্যায় খেজুর-রস দূরে থাক, গাছ ছুঁইলে ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।* আরও বিচিত্র কথা এই যে, লোকে জানে খেজুর-গাছ সরকারের, নিজের জমি-বাড়ীতে জন্মিলেও কাটিবার হুকুম নাই। কারণ সরকারের হুকুমে রসে তাড়ী হইতেছে। এই মিথ্যা-প্রচার তাড়ী-করের কীর্ত্তি বটে; কিন্তু এটা ঠিক, বহু পূর্বকাল হইতে, অন্ততঃ বাইশ শত বৎসর হইতে, মান্দ্রাজে তালের রসে তাড়ী হইতেছে। পূর্বকালে তালের গুড় হইত না, তালী—তাড়ী হইত। আমরা তালী-মদ্য নাম খেজুরেও লাগাইয়া কাঁঠালের আমসত্ত্ব বলিতেছি।

খেজুর ও তালের রসে তাড়ী করিয়া দেশের ধনের অপযোগ করিতেছি। উত্তমকে অধমে বিনিয়োগ করিতেছি, কাঠ না জ্বালিয়া ঘি পোড়াইয়া আগুন করিতেছি। রসের শর্করার বিনিময়ে কোহল লইতেছি, কোহলই মাদক। কিন্তু কোহল অন্ন নহে, যাহা খাইলে জীবের জীবন ধারণ ও দেহপোষণ হইতে পারে; শর্করা অন্ন-বিশেষ। মদ্য-পানে পাপ হয়; সে কথা ছাড়িয়া দিলেও মদ্যপিপাসা নিবৃত্তির অন্য উপায় আছে। গুড় ও চীনি করিতে গেলে যে চিটা ও শোট জমে, যাহা মানুষের অখাদ্য, তাহাতে মদ্য করিলে গুড়-ব্যবসায়ের চিন্তার একটা কারণ সহজে দূরীভূত হয়। বস্তুতঃ গোরুকে খইল খাআইয়া তাহার গোবরে জমির সার-সঞ্চয় যেমন যুক্তি-যুক্ত, তেমন গুড়-রসের যে খল—গুড়ের পক্ষে যেটা অনাবশ্যক, তদ্দ্বারা কোহল করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কেবল মত্ততার তরে কোহল নহে, নানা কলায় কোহল লাগে, তাহারও উপায় চাই। তবে একথা স্বীকার্য, খেজুর-গাছ বৃথা রাখা অপেক্ষা দরিদ্রের তাড়ী করাও ভাল। কারণ কোন কোন লোক মদ্যপান করিবেই।

এখন খেজুর-রস দেখিবার কথা। কিন্তু এমন দেশে আছি, যে দেশে খেজুর-রসে কেবল তাড়ী হয়, একারণ খেজুর-রস ছুঁইলে জাতি হারাইতে হয়। গত ফাল্গুন মাসে বহু কষ্টে কিছু রস পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা বিকৃত হইতেছিল। তাড়ী-গন্ধ ছাড়িতেছিল, শাদা ও অম্ল হইয়া গিয়াছিল। তথাপি গুড় করিতে গিয়া বুঝিলাম আখের রস হইতে খেজুর রস ভিন্ন। আখের রসে যত গাদ, খেজুর-রসে তত নাই; আখের রসের গাদ কাল, খেজুর-রসের গাদ শাদা। যে গুড় হইল, তাহা কেলাসিত হইল না বটে, কিন্তু নৈর্ম্মল্যে ও বর্ণে আখের গুড় অপেক্ষা ভাল। খেজুরা গুড়ের গন্ধও প্রায় ছিল না। এই একটা পরীক্ষা হইতেই বুঝিলাম, বঙ্গদেশে যে খেজুরা-গুড় হয়, তাহা গুড় নয়, গুড়-পোড়া ও আঠা। আখের গুড় পুড়িলে প্রথমে লাল, পরে কাল হয়; কিন্তু আ-পোড়া গুড়ও প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু আ-পোড়া খেজুরা গুড় দুর্লভ হইয়া রহিয়াছে। কেন এমন হইয়াছে? কেন নির্মল সু-বর্ণ গুড় হয় না? কেন আখের গুড়ের সমান দরে খেজুরা গুড় বিক্রি হয় না? লোকে বলে খেজুরা গুড় বেশী দিন ভাল থাকে না, নূতন নূতন বিকাইতে না পারিলে ব্যাপারীর ক্ষতি হয়। একারণ সস্তায় বিক্রি হয়। ভাল না থাকারই কথা। কিন্তু কেন ভাল থাকে না?

আমার বিশ্বাস রস ধরার ও রাঁধার দোষে খেজুরা গুড়ের দুর্গতি হইতেছে। রসে জৈব খল অল্প; সুতরাং

* কথাটা অত্যুক্তি নহে। কয়েক বৎসর হইল একদিন এক আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁহার এক বিপদ বর্ণনা করিতেছিলেন। বিপদটা এই, তাঁহার বাড়ীতে (গৃহসংলগ্ন ঘেরা স্থানে) অকস্মাৎ একটা খেজুর চারা দেখা গিয়াছিল। কোন্ দুর্বৃত্ত খেজুর খাইয়া তাঁহার বাড়ীতে আঁঠি ফেলিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন না। চারা ত হইয়াছে; উপায়? দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে পয়সা দিয়া এক পান (এক অন্ত্যজ জাতি) আনাইয়া তাহার দ্বারা চারা উপড়াইয়া নিশ্চিন্ত হন। গোবর-জল অবশ্য ছড়ানা হইয়াছিল। যখন তিনি এই খর্জুর-উৎপাত বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার বিপদ বোঝা সাধ্য হয় নাই। বিপদ কোথায়? পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিবার পর বুঝিলাম খেজুরগাছ স্পর্শে পাতক হয়। অথচ বাড়ীর মধ্যে গাছ। কে জানে কখন দৈবাৎ কাহার গায়ে ঠেকিবে! তাঁহার শঙ্কা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না।

এ বিষয়ে মাড়া আখের রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। খেজুর রস ও খেজুরা গুড় পোড়াইয়া ভস্ম করিতে গিয়া বুঝিয়াছি, পার্থিব খণ্ডের ভাগে আখ- ও খেজুর-রস প্রায় সমান, কিন্তু আখের রসে 'পটাশ'-ক্ষার অল্প, খেজুর-রসে অধিক।* আখ, খেজুর-গাছ প্রভৃতির দেহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষে নির্মিত। কোষের ভিতরে রস থাকে। সে রসে শর্করা ব্যতীত লালীনাদি ও পার্থিব দ্রব্য থাকে। আখ পিষিলে মাড়িলে কোষগুলা ছেঁচিয়া ছিঁড়িয়া যায়, কোষস্থিত যাবতীয় দ্রব্য নির্গত হয়। কিন্তু খেজুর-গাছের কোষ ছেঁচা ছেঁড়া পড়ে না। গাছের মাথার নীচে হাতখানেক চাঁচিয়া এবং তাহাতে দুই এক স্থান কাটিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে কোষ কিছু কাটা পড়ে, শিরা কাটা পড়ে। সেই কাটা মুখ দিয়া রস নির্গত হয়। কোষের ভিতর দিয়া, এক কোষ হইতে আরটায়, সেটা হইতে আরটায়, এইরূপে কাটা মুখে রস আসে। ইহাতে কোষের মধ্যস্থিত লালীনাদি জৈব তত আসিতে পারে না। লালীনাদি দ্রব্যের ধর্মই এই, সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া সহজে গলে না। (পরে 'বিসরণ' দেখ।) কিন্তু শর্করা সেরূপ নহে, রসে দ্রবীভূত পার্থিবও সেরূপ নহে। এই কারণে খেজুর-রসের গাদ কম; কিন্তু গাদের তুলনায় পার্থিব বেশী। দেখা যাইতেছে, ধারালা দা' দিয়া গাছ চাঁচা কর্তব্য। নতুবা কোষ ছিঁড়িয়া যাইবে, ক্ষত স্থান পচিয়া যাইবে, রসও বিকৃত হইবে।

উদ্ভিদ-বিদ্যার সাহায্যে রস-স্রাব সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতে পারা যায়। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসেই রস-স্রাবের সময়। মাটিতে রস থাকিবে, বায়ু শীতল হইবে, কিন্তু মাটি গরম থাকিবে। শীতের প্রারম্ভেই এই-সব ঘটনা সম্ভব। বোধ হয়, বর্ষা থামিলেই "রস দেওয়া" আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই রূপে ছয় মাস রস পাওয়া যাইতে পারে। গ্রীষ্ম পড়িলে মাটির রস কমিতে থাকে, গাছের জীবন-

* "স্বদেশী"র দিনে কেহ কেহ বীটের চীনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্‌টা বীটের, কোন্‌টা আখের, তাহা শাদা চীনিতে বলা কঠিন। একটু লালচা হইলে কিংবা একটু রসিলে বীটের চীনিতে বীটগন্ধ ছাড়ে, বীট-চীনির ভস্মে 'পটাশ'-ক্ষার বেশী; এই হেতু এই চীনি আখের চীনির মতন পুড়িয়া শীঘ্র ভস্ম হয় না। খেজুরা গুড়েরও এই দুই লক্ষণ আছে। এক, গন্ধ; দুই, সহজে পুড়িয়া শাদা পাঁশ হয় না। বস্তুতঃ এই পাঁশের প্রায় অর্ধেক 'পটাশ'-ক্ষার। খেজুরা গুড়ের যে গন্ধ, তাহার অধিকাংশ পোড়াগুড়ের।

ধারণই দুষ্কর হইয়া উঠে। তখন গাছ প্রায় নির্জীব।* কোমল-পত্র গাছ গ্রীষ্মে ঝানরিয়া যায়, শীতে ডাঁট হয়। অতএব গ্রীষ্মকালে রসের লোভ করিলে গাছ মরিয়া যাইতে পারে। আরও দেখা যাইতেছে, দক্ষিণ-বঙ্গের ন্যায় রসা মাটিই খেজুর-রসের মাটি। পশ্চিমবঙ্গের আ-কাট শুখনা মাটিতে কিংবা বনের পাথর্যে মাটিতে খেজুরগাছ ভাল জন্মে না। বঙ্গের বাহিরে মধ্যভারতের খাণ্ডোয়াতে কয়েক বৎসর হইতে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় খেজুরা গুড় করাইতেছেন। সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম ইন্দোরেও অনেক গাছ আছে, এবং সেখানেও খেজুরা গুড় করিবার চেষ্টা হইতেছে। বোধ হয়, বাঙ্গালী খেজুরা গুড়ের আবিষ্কারক। তাহাকেই প্রদেশে প্রদেশে খেজুরা গুড় প্রচার করিতে হইবে।

সুখের বিষয় খেজুরা গুড়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইং ১৯১৩ সালে সরকারী কৃষিবিভাগের রাসায়নিক আনেট সাহেব যশোরে গিয়া খেজুরা গুড় ব্যবসায় অনুসন্ধান করিয়া অনেক তথ্য ও পরীক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।† ইহাতে দেখিতেছি বঙ্গদেশে ৩৪ লক্ষ মণ খেজুরা গুড় হয়। ইহা নাকি আখের গুড়ের ৵২ আনা। যশোরেই

* এ বিষয়ের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত আমার চোখে পড়িয়াছিল। প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল জ্যৈষ্ঠমাসে আমাদের গ্রামের পাশের এক গ্রামে একটা খেজুর গাছ দিবাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শুইয়া পড়িত, রাত্রিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইত। লোকে দেবতার ভর মনে করিত। গাছটির বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইবে। একটা ছোট ডোবার ঢালু পাড়ে জন্মিয়াছিল, ডোবার দিকে হেলিয়া পিঠ কুজা করিয়া মাথা উচা করিয়া জন্মিয়াছিল। পাড় সরু উচা, টান মাটির। জল নীচে। একদিকে গ্রীষ্ম, অন্যদিকে মাটিতে রসের ন্যূনতা। আমাদের দেহ হইতে যেমন সর্বদা ঘর্ম নির্গত হইতেছে, প্রায়ই বাষ্পাকারে নির্গত হইতেছে, গাছের দেহ হইতে বিশেষতঃ পাতা হইতে সেইরূপ। জলাভাবে গাছ ক্লান্ত হইয়া পড়িত, মাথায় পাতার বোঝা বহিতে পারিত না। রাত্রে বায়ু শীতল হইলে মাটির অল্প রসই যথেষ্ট হইত, শিকড় টান হইত, গাছ দাঁড়াইয়া উঠিত। কারণ দাঁড়ানাই গাছের স্বভাব। পরে আর উঠিতে পারিত না। শীঘ্র বৃষ্টি হইলে কি করিত বলিতে পারা যায় না। সেদিন সংবাদ-পত্রে পড়িয়াছি, ফরিদপুর জেলায় একটা খেজুর-গাছ রাত্রে উঠিত; দিনে পড়িত। ডাঃ স্যর জগদীশ বসু মহাশয় এই গাছের বৃত্তান্ত নাকি অবগত হইয়াছেন। আমি যে খেজুর-গাছ দেখিয়াছিলাম, তাহার বৃত্তান্ত 'খেজুর-গাছের নৃত্য' নামে 'সঞ্জীবনী' পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

† The Date Sugar Industry in Bengal. Memoirs of the Dept. of Agri. in India. By H. E. Annett, B. Sc. প্রথমে আমি এই পুস্তক দেখিতে পাই নাই। এখন যাহা লিখিতে যাইতেছি, সব এই পুস্তক হইতে লইলাম।

৫০ লক্ষ গাছ আছে। তারপর ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জে ১৪ লক্ষ, ঢাকায় ২॥০ লক্ষ গাছ আছে। সব গাছ হইতে সব মাসে সব রাত্রে সমান রস পাওয়া যায় না। বেশী হইলে ৭ সের পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মোটের উপর রসের কয়েক মাসে প্রতি গাছ হইতে হারাহারি ১ মণ ২৫ সের রস, এবং সে রস হইতে ১০ সের গুড় পাওয়া যায়। বিঘায় প্রায়ই ৮০টা গাছ করা হয়। অতএব বিঘায় ২২।২৩ মণ গুড় হয়। আনেট সাহেব আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব দিয়াছেন। বিঘায় ১১৬টা গাছ, ৩৩মণ গুড়, এবং ২॥০ টাকা মণ ধরিয়া উৎপন্ন ৮২৲ টাকা; জমির খাজনা গাছীর বেতন খোরাক-পোষাক প্রভৃতি সব খরচ ৫৯৲ টাকা; লভ্য ২৩৲ টাকা। প্রথম গাছ করিবার ছয় বছরের খরচ ৪৮৲ টাকা। ২৫ বছর রস পাওয়া যায়। এই ২৫ বছরে ৪৮৲ টাকা চারাইয়া দিলে লভ্য ২১৲ টাকা হয়, কিন্তু খেজুর-বাড়ীতে গাছের মাঝে মাঝে কলাই তিসী প্রভৃতি রবী ফসলও হয়। আখ-চাষে লভ্য এইরূপ; কিন্তু খরচ বেশী, ঝড়বৃষ্টি রোগ পোকা শিয়াল প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে লভ্য হয় না। অতএব যে-সে লোকের যেমন-তেমন আখ-চাষ অপেক্ষা খেজুর-চাষ ভাল।

কিন্তু আখ দুই পাঁচ কাঠাও করিতে পারা যায়; খেজুর করিতে গেলে পোষাইবে না। প্রত্যহ রস পাক, অল্প অল্প রস হইতে গুড় করা, কম অসুবিধা নহে। বোধ হয় খেজুরা গুড় অধম হইবার কারণ এই। বস্তুতঃ খেজুর-রস ও খেজুর গুড় তুলনা করিলে রস-সংগ্রহের ও গুড়-পাকের দোষ ব্যক্ত হইয়া পড়ে। খেজুর-রসে স্বভাবতঃ উনশর্করা প্রায় নাই। আরও চমৎকার এই যে, এই রস স্বভাবতঃ ক্ষার। কিন্তু কলশীর রসে রাত্রের মধ্যেই উন-শর্করা বৃদ্ধি হয়, এবং এক এক রসে বেলা ৭।৮টাকে ৪।৫ ভাগ পর্য্যন্ত হয়। অর্থাৎ রসের ইক্ষুশর্করা এইরূপে উনশর্করায় পরিবর্তিত হইতে দেওয়া হয়। সে রস হইতে যে গুড় হইবে, তাহাতে মাতের ভাগ বেশী হইয়া পড়িবে। গুড় করিবার সময় রস জ্বাল দিতে-দিতে মণকে হারাহারি প্রায় ৫ সের গুড় পুড়িয়া নষ্ট হয়। আখের রস জ্বাল দিবার সময় ইক্ষুশর্করা প্রায় এই পরিমাণে উন-শর্করায় পরিণত হয়। এক হিসাবে সেটা ক্ষতি, কিন্তু গুড় থাকে। কোথাও কোথাও আখের গুড়ও পুড়িয়া নষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেটা বঙ্গদেশে তত সাধারণ নয়। আমি মনে করিয়াছিলাম খেজুরা গুড় নামে আমরা আ-পোড়া গুড় খাই, আনেট সাহেব উৎপন্ন গুড়ের ভাগ নির্ণয় করিয়া তাহাই স্থির করিয়া'ছন।* তাঁহার পরীক্ষা হইতে জানিতেছি,

	উত্তম গুড়ে	মধ্যম গুড়ে	অধম গুড়ে
ইক্ষুশর্করা	৭৩—৮০	৫৫—৭০	৫৩—৬২
উন-শর্করা	৭—৪	১৩—১০	১৭—১৫

* তিনি শত শত, শত শত কেন হাজার হাজার, বিমান (determination) করিয়াছিলেন। কিন্তু এত বিমানের মধ্যে মূল প্রশ্নের খাই হারাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। মূলপ্রশ্ন দুইটি; (১) খেজুর-গাছে স্বভাবতঃ কত রস ও কেমন রস আছে, (২) আমরা কত রস ও কেমন রস পাই। প্রথম প্রশ্ন দুরূহ সন্দেহ নাই; কারণ আখ-গাছের মতন খেজুর-গাছ কাটিয়া ব্যাস (analysis) করিয়া জানিবার জো নাই। জীয়ন্ত গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া জানিতে হইবে। উত্তর প্রশ্নের নিমিত্ত গোটা দশেক গাছ ধরিলে, এবং কার্তিক হইতে ফাল্গুন পাঁচ মাস বিমান করিলে, বোধ হয় ব্যবসায়ের ভালমন্দ বুঝিতে পারা যাইত। ব্যবসায় কিছু নূতন নহে; শত শত লোকের জ্ঞান, নিরক্ষরের হইলেও, জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান মিথ্যা বলিতে পারে না। অবশ্য জানাও ভাল করিয়া জানা গেল। যথা, 'দোকাট' রস অপেক্ষা 'জিরান' রস ভাল ও বেশী; এইরূপ 'তেকাট' অপেক্ষা 'দোকাট'; প্রথমে ও শেষে রস কম, মাঝে বেশী; গরম পড়িলে রস কম; রস যত কম শর্করা তত বেশী; মোটা গাছে রস বেশী দেয়; এক-একটা গাছ মোটা না হইলেও বেশী দেয়; মেঘলা কিংবা কোয়াসা রাত্রে রস খারাপ হয়; ইত্যাদি। একটা কথা নূতন জানিতেছি; লোকে যত রস ও গুড় মনে করিত, বস্তুতঃ তত নয়। কিন্তু এখানে একটা বিতর্ক উঠে, কোন্ গাছকে প্রমাণ (standard) ধরা যাইবে? ব্যবসায়ী জানিতে চায়—রস স্রাব, বস্তুতঃ শর্করা-স্রাব, বাড়াইতে পারা যায় কি না; পাঁচ মাসের শর্করা দুই এক মাসের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে কি না। সে যাহা হউক, তাঁহার কৃত তিনটা খেজুর রসের বিমান হইতে একটা মোটামুটি ভাগ জানিতেছি। রসের বিবরণ দেওয়া নাই।

ইক্ষুশর্করা	১১'৬—৮'৪
উন শর্করা	০'৮—৩'৬
অম্ল জৈব	১'০—০'৭
পার্থিব	০'২৪—০'১৫
জল	৮৬ ৪—৮৭'১
ঘনতা	৫৬—৫২

খেজুর-রসে অম্ল দিলে 'কার্বন-দ্বিঅক্সিদ গেস' উঠে। ক্ষার হেতু উঠে। যে রসে উন-শর্করা ৩'৬ ভাগ ছিল, তাহা ক্ষার ছিল না। বোধ হয় অম্ল হইয়াছিল। আখের রস অপেক্ষা খেজুর-রস উন-শর্করায়, অম্ল জৈবের ও পার্থিবের ভাগে ভাল, কিন্তু জলের ভাগে ও পার্থিবের 'পটাশ'-ক্ষারের ভাগে মন্দ। খেজুর-রসের ভস্মে 'পটাস' (K_2O) ৫৫ ভাগ। আর-একটা কথা জানিতেছি। ইহাতে 'ক্লোরিন' ১৩ ভাগ। অতএব বোধ হয় লোনা মাটির গাছ, কিংবা লোনা মাটিতে গাছ ভাল জন্মে। যাহা হউক, পরীক্ষা কর্তব্য। বিশেষতঃ খেজুর-বাড়ী জল পাওয়াইয়া রস দেখা কর্তব্য।

এই-রকম থাকে। গুড়ের আর আর দ্রব্যের ভাগ দিলে অধম হইবার কারণ বুঝিতে পারা যাইত। কত পুড়িয়া নষ্ট হইয়া অধম হয় তাহাও সহজে ধরা পড়িত।* সে যাহা হউক, শুচির অভাবে, কিংবা এক কথায় জ্ঞানের অভাবে দেশের যে কত গুড় নষ্ট হইতেছে, তাহা কষিতে বসিলে বিপুল অঙ্কে দাঁড়াইবে। আমেরিকায় 'মেপল' নামে একটা গাছ আছে। তাহার 'রস দেওয়া' হয়, সে রস হইতে গুড় করা হয়। কিন্তু রসের শতকে মাত্র ৩ ভাগ শর্করা, এবং একটা গাছ হইতে মাত্র ১॥০ সের শর্করা পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা ফেলা যায় না। এক সুরভির জন্য 'মেপল' চীনি নাকি ॥৴০ আনা সের বিক্রি হয়; আর সুরভি থাকিতেও খেজুরা গুড় ৵০ আনা সের হয়! খেজুর-রসের কলশী, কিংবা পাক করিবার বাইন কখনও ধোআ মাজা হয় না। কলশীতে প্রত্যহ ধোঁআ দেওয়া হয়, কিন্তু না ধুইয়া মাজিয়া ধোঁআ দিলে হিতে বিপরীত হইবার কথা। খেজুর-রস ক্ষারী। সুতরাং লোহার কড়াতে পাক করা চলে। (রসে 'কষায়ীন' tannic acid থাকিলে চলিবে না।) তাওয়া আরও উত্তম। কিন্তু রস অম্ল হইলে লোহা আদৌ চলিবে না, গুড়ে লোহাস্বাদ হইবে। কলশীর বদলে ছোট ছোট ৫ সেরী টীন চলে কি না, দেখা কর্তব্য। বোধ হয় শিউলীদিগের হাত হইতে গুড় করা কর্ম অন্যে লইলে অনেক গুড়ের উপচয় হইবে। একটা উদমান থাকিলে রসে জল মিশাইয়াছে কি না, ধরা পড়িবে। যাহাই হউক, খেজুরা গুড়ে কর্মবিভাগ অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

খেজুরা গুড়ের পর কর্মবিভাগ হইয়াছে, গুড় হইতে চীনি হইতেছে। আনেট সাহেব চীনির কুঠীর ইতিহাস দিয়াছেন। ১৭ বছর আগে এক যশোরে ১১৭টা কুঠী ছিল। এখানে কুঠীকে 'আখড়া' বলে। অদ্যাপি বছরে নাকি ১৭ লক্ষ মণ চীনি হইতেছে। গুড়ের মাৎ ঝরাইয়া পরে শেঅলা চাপা দিয়া রোদে দিয়া পায়ে দলিয়া 'দলুয়া' হইতেছে। মাৎ ও শোঠ হইতে কিয়দংশ গুড় ও অবশিষ্ট চিটা হইতেছে। দলুয়া বিক্রি হইয়া যায়, কতক 'একবারা' ও 'দোবারা' চীনি হইতেছে। এই চীনি করিতে প্রথমে চূন-জল দিয়া দলুয়া গরম করিয়া গাদ তুলিয়া পরে দুধ-জলের প্রক্ষেপ দিয়া বাকি গাদ তোলা হয়। এক মণ দলুয়াতে এক পোয়া চূন, ও তিন মণ জল, ও আধ সের দুধ লাগে। পরে গুড় করিয়া মাৎ ঝরাইয়া শেঅলা চাপা দিয়া রোদে দিয়া যে চীনি হয়, তাহা 'দোবারা' অর্থাৎ দুইবার নির্মল করা। দোবারার গুড়ের মাৎ হইতে 'একবারা' চীনি করা হয়। (এখানে নাম হইতে উৎপত্তি বোঝা যায় না।*) এই-সকল দেশী চীনি জাবার চীনি অপেক্ষা দেড়া দরে বিক্রি হয়। কারণ পবিত্র। কিন্তু এমন ভাবে অধিক কাল যাইতে পারে না। চীনির কুঠীও ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। গুড় হইতে চীনি করিতে মণকে।৵০ আনার অধিক পড়ে না, তথাপি পারা যাইতেছে না। কারণ গোড়ায় যে গুড়, সে গুড় আক্রা। আখেও সেই কথা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

* আমি দুইটা অধম গুড় দেখিয়াছি। একটায় কেলাস কিছু ছিল, অন্যটায় প্রায় ছিল না। দুইটাই কাল, বোধ হয় যে গুড় ময়রা চীনি করিতে কেনে না, সে গুড় খাইবার তরে বেচা হয়।

	(১)	(২)
ইক্ষুশর্করা	৫৫'২	৫১'১
উনশর্করা	১৫'৯	২৩'৭
ভস্ম	২'৫	২'০
জল	১৫ ৫	৯'৫
অন্য	১০'৯	১৩'৭

এই "অন্য"টির ভাগ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, কি হইয়াছে। [illegible] জলে ফুটাইয়া গাদ তুলিতে গিয়া দেখি, গাদ প্রায় নাই, অথচ [illegible] ১০ ভাগ গুড় "অন্যে" গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা এক-রকম চট্টি [illegible] আটা।

* এখানে কয়েকটার ভাগ প্রদর্শিত হইল। আনেট সাহেব-কৃত বিমান,

	দোবারা	একবারা	দলুয়া	আখড়া
ইক্ষুশর্করা	৯৮'৪৮	৯৮'৩৭	৯৬ ৫—৯৫'২—৯২'৮	
উন-শর্করা	০'৮১	১'১৪	১'৬—১ ৯—২'২	
অন্য জৈব	০'৪৪	০'১০	০'৮—১ ৬—২'৯	
পার্থিব	০'০৫	০'০৯	০'২—০'৪—১'২	
জল	১'২২	০'৩০	০'৮—০'৯—১'০	

দেশের কথা

য়ুরোপের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে আমরা শুনিতেছি যে ইংরেজ-পক্ষ অপরের ন্যায্য স্বত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়িতেছেন, জার্ম্মানী লড়িতেছেন অপরের ন্যায্য স্বত্ব ও স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্য। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অধীন রাজ্য—Dependency। ভারতবর্ষ তাহার প্রভু-পক্ষের মুখে ঐ উদার আশার বাক্য শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহারও ন্যায্য স্বত্ব ও স্বতন্ত্রতা আর খর্ব্ব হইয়া থাকিবে না। সে চোখের সামনে দেখিতেছে—

রাজা মহলে টান ধরিয়াছে; এবং বোধ হইতেছে, বুঝিবা এই যুদ্ধের ফলে সমস্ত জগৎময় সার্ব্বজনীন স্বাধীনতা—তথা গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে। আজ দুনিয়ার তের কোটি নরনারীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, পৃথিবীর ভিতর সবচেয়ে ক্ষমতা-গর্ব্বিত রুশ সম্রাট তাঁহারই প্রজাবৃন্দের হস্তে বন্দী এবং তাহাদেরই নিকট একটু থাকিবার স্থানের প্রার্থী! আজ রুশ-সাম্রাজ্যের শ্রমজীবী ও সৈন্যগণ তথা রাজ্যের কুলী-মজুরেরাই সিংহাসনের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা! রুশের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই গ্রীসেও কম ওলট-পালটটা হইল না। গ্রীস-রাজ কনষ্টা-টাইন যুদ্ধের প্রথম হইতে এতদিন নানা খেলা খেলিয়া, এখন তিনি বন্দী, এবং তাঁহার মধ্যম পুত্র সিংহাসনের অধিপতি। আজ যদিও তাঁহার এই বিশ একুশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সিংহাসনে বসান হইয়াছে, কিন্তু পরে ইহাও যে বদলাইয়া যাইবে না এমন কথা কে বলিতে পারে?—মোহাম্মদী।

বহুদিনের পরাধীন পোলাণ্ডকে স্বাধীনতা দিবার কথা উঠিয়াছে; ফিনল্যাণ্ডকে স্বতন্ত্রতা দিবার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে; জার্ম্মানী অষ্ট্রীয়াতেও প্রজাবৃন্দ রাজশক্তি খর্ব্ব করিয়া স্বাধিকারের প্রসার দাবী করিতেছে। প্রাচ্য মহাদেশের চীনদেশের রাজশক্তি প্রজাশক্তির কাছে বার বার হার-মানিল। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অঙ্গ; ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মূল গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত, তাহা স্বতন্ত্র বহু রাজ্যের সমবায়। সুতরাং একমাত্র ভারতবর্ষ অধীন থাকিয়া সাম্রাজ্যের গৌরব খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে, সম্পূর্ণতার অঙ্গ-হানি করিতেছে; এই মনে করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের লোক ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বতন্ত্র দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতবর্ষ যেই শুনিয়াছেন যে ইংরেজ পরের ও দুর্ব্বলের ন্যায্য স্বত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়িতেছেন, অমনি সেই যুদ্ধজয়ের জন্য নিজের যথাশক্তি সাহায্য-উপকরণ জোগাইতেছেন; ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড হার্ডিং ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী, ভারত-সচিব প্রভৃতিও স্বীকার করিয়াছেন। এখন ভারতবর্ষ চাহিতেছেন ইংরেজের কথায় কাজে সামঞ্জস্য দেখিতে, ভারতবর্ষে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠায় তাঁহাদের সহানুভূতি সাহায্য সম্মতি পাইতে। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বতন্ত্রতা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করাতেই ভারতের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা বিরুদ্ধ হইয়া দমন-নীতি অবলম্বন করিতেছেন। ইহাতে সমস্ত দেশময় আগ্রহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। "বরিশাল-হিতৈষী" সত্যই বলিয়াছেন—

এতদিনে হোমরুল আন্দোলন পাকিয়া উঠিতে চলিল। যতদিন একপক্ষ কেবল ন্যায় দর্শন, তর্ক, রোদন করিতে থাকে অপর পক্ষ নীরবভাবে তাহাকে উপেক্ষা করে, ততদিন কোনও প্রার্থনা বা দাবী দৃঢ়মূল হইতে পারে না।

কংগ্রেসের হোমরুল কাগজপত্রের সামগ্রী, আজ ছয়মাস যাবত সে সম্বন্ধে বিশেষ তীব্রত্ব কেহ অনুভব করে নাই। কিন্তু সহসা যখন মাদ্রাজ-লাট তাহার বিরুদ্ধে নির্য্যাতন-দণ্ড ধারণ করিয়াছেন তখনই ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন বাঙ্গালা দেশে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে এমনি দৃঢ়তার সহিত আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল—সে আন্দোলন ছিল প্রাদেশিক—আজকার আন্দোলন ভারতীয়—আজ পঞ্চনদ হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত একই সুরে বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনি উঠিতেছে—আমরা হোমরুল চাই!

ইহাই এ মাসের দেশের কথা। সমস্ত কাগজে এই একই সুর বাজিতেছে—কোনোটা বা ক্ষীণ, ভয়ে অস্পষ্ট; আর কোনোটা বা স্পষ্ট।

কোনো জিনিস পাইতে হইলেই তাহার যোগ্যতা থাকা দরকার। আমি যদি অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ন্যায়বিচার ও প্রতিকার চাই আমাকে দেখাইতে হইবে আমি সমাজে পরিবারে গৃহে অবিচার অত্যাচার সাধ্যপক্ষে করি না। আমাদের দেশের জমিদারেরা সার্ব্বভৌম রাজার অধীন এক-একটি সামন্তরাজের তুল্য। তাঁহাদিগকে নিজেদের ব্যবহারের দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে যে তাঁহারাও তাঁহাদের অধীন সকলের ন্যায্য স্বত্ব স্বাধীনতা সম্মান করিয়া চলেন, অবিচার অত্যাচারের তাঁহারা বিরোধী। "মোহাম্মদী" তাই বলিতেছেন—

জগৎ স্বাধীনতার দিকে ছুটিতেছে। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণের উপর যাঁহারা পাথরের ন্যায় চাপিয়া বসিয়া

রহিয়াছেন তাঁহাদের চালচলন বদলান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহারাই লর্ড কর্ণওয়ালিসের সাধের সৃষ্ট বাংলার জমীদার-সম্প্রদায়—এরিষ্টক্রাটের দল। ইঁহাদের অধিকাংশের অন্যায়াচরণ ও অত্যাচারের ফলে এদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী যে, গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে পারিতেছে না, আত্মার স্ফূর্তি দেখাইতে পারিতেছে না, সে কথা না বলিয়া ত আর থাকা যায় না। এইরূপ চিন্তাশূন্য সুখ-বিলাসী জমীদার সৃষ্টির ফলে তাহা হইতে আগাছা কুগাছা সৃষ্ট হইয়া তাহারা একদিকে যেমন দেশটাকে উৎসন্নের পথে উঠাইয়া দিতেছে, অন্যদিকে তাহারা নিজেরাও অমানুষ অবস্থায় জীবনাতিবাহিত করিতেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমীদারীর আয় বান্ধা, কাজেই সংসার সম্বন্ধে জমীদাররা চিন্তাশূন্য। আমলা ম্যানেজাররা খাজনা আদায় করিয়া দিতেছে, আর জমীদার বাবুরা সেই সহজলব্ধ ধনের সাহায্যে বিলাসব্যসনে হাবুডুবু খাইতেছেন, অনেকে দুশ্চরিত্র দুরাচার হইয়া নিজেদের এবং নিজেদের ভবিষ্যবংশীয়গণের ইহকাল ও পরকালের মুণ্ডপাত করিতেছেন। অনেকে পাপের ফলে জমীদারী হারাইয়া পথের ভিখারী হইতেছে। এদিকে জমীদারদের দশা এই; ওদিকে তাহাদের আমলা, গোমস্তাদের অত্যাচারে দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ প্রজাসাধারণ ও কৃষককুল জর্জ্জরিত হইতেছে, অন্নহীন বস্ত্রহীন হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইতেছে; আত্মসম্মানজ্ঞান ত তাহারা অনেক দিন পূর্ব্বেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য জমিদারদের মধ্যে যে উদার দেশ-হিতকামী কেহ নাই এমন কথা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। যে দেশে এই চিরস্থায়ী বন্দবস্ত নাই সে-দেশের লোকেরা ব্যবসায়বাণিজ্যে লাগিয়া থাকে, কাজেই তাহারা এতটা অমানুষ হইবার সুযোগ পায় না। কিন্তু এখন অচিরাৎ এদেশের জমীদারদের চালচলন বদলান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা নিজেরা না বদলাইলেও, কাল তাঁহাদিগকে আপনিই বদলাইয়া দিবে। যে কাল একদিকে সসাগরা পৃথিবীর শক্তি-গর্ব্বিত সম্রাটকে প্রজাকুলের পদমূলে নিক্ষেপ করিতেছে তাহার তুলনায় এই নগণ্য জমিদার ত কোন্ ছার! তাই বলিতেছিলাম তোমরা নিজেরাই তালে তাল মিলাও।

জমিদারদের প্রজাহিতে রত হইতে উপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, ইহাও দেশের লোক উপলব্ধি করিয়া নিরক্ষর মূক প্রজাদের হিতের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ সংবাদ পাইয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।

বঙ্গীয় প্রজা-সমিতি।—গত ২৪শে জুন রবিবার ৫৩নং আপার সারকুলার রোডস্থিত "এসলাম হাউসে" বঙ্গীয় কৃষি কন্‌ফারেন্সের এক বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সমিতিতে কৃষক ও প্রজাসাধারণের দুরবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে এবং বঙ্গদেশের যে-সমস্ত স্থানে জমীদার কর্ত্তৃক প্রজারা উৎপীড়িত হইতেছে, এবং যাহারা তাহা সমিতির সেক্রেটারীর নিকট লিখিয়া জানাইয়াছে, সেক্রেটারী সেই-সকল অত্যাচার-কাহিনী-সমন্বিত চিঠিপত্র সভায় উপস্থিত করেন। পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, এই সমিতির তরফ হইতে একটি কমিশন-কমিটী নিযুক্ত হউক এবং সেই কমিটী অত্যাচরিত স্থানে গিয়া সবিশেষ তদন্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টকে লিখুন। এই কমিটী আপাততঃ বর্দ্ধমান জেলার লাইকুণ্ড—বামুনপাড়া প্রভৃতি গ্রামের প্রজাদের অবস্থা অবগত হইয়া গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন। খুলনা জেলার অন্তর্গত কয়েকটি স্থানের অত্যাচরিত প্রজা ও খাতকগণের অবস্থা তদন্ত করিতে যাওয়াও কমিটী কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এত দিন পরে প্রজা-সমিতি একটা কাজের মতন কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বলিতে কি ইহাই আসল দেশ-সেবা।—মোহাম্মদী।

রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সমস্ত ত্রুটি সংশোধনের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজেরও সংশোধন আবশ্যক। সেদিকেও চেষ্টা চলিতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। "চারুমিহির" সংবাদ দিয়াছেন—

হিন্দুসমাজের উন্নতিকল্পে একটি স্থায়ী সভা গঠনপূর্ব্বক নানাবিধ কার্য্য করিবার প্রস্তাব করিয়া কোনও কোনও সহৃদয় ব্যক্তি কয়েক সপ্তাহ যাবৎ চারুমিহিরে তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। অনেকে এ বিষয়ে নানা-প্রকার অনুসন্ধান করিতেছেন এবং মৌখিক প্রস্তাবাদিও করিতেছেন। লোকের উৎসাহ দেখিয়া মনে হয়, উদ্যোগ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর।

সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের অবস্থার উন্নতির জন্য এক ভদ্রলোক নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছেন।—

কএক সপ্তাহ হইতে "চারুমিহিরে" ময়মনসিংহ হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির হইতেছে তাহা পড়িয়া বোধ হয় যে ভগবানের কৃপা নিম্নশ্রেণী হিন্দুর উপর পতিত হইয়াছে। শিক্ষিত সমাজ এতদিন নিশ্চেষ্ট থাকিয়া যে পাপ করিয়াছেন তাহা ক্ষালন করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া সকলেই সুখী হইবেন সন্দেহ নাই। বিষয়টি খুব গুরুতর। সুতরাং খুব সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে।

ইহা সম্পূর্ণভাবে পরোপকারব্রতের বিধিবদ্ধ সমাজ (Purely charitable institution) রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কার্য্য করিবে। ইহাকে আইনানুসারে রেজিষ্ট্রি করিয়া লইতে হইবে যেন যে-কেহ যখন ইচ্ছা ইহার কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন। এই প্রতিষ্ঠিত সমাজের সহিত কোনও রাজনৈতিক সম্বন্ধ থাকিবে না। যাহাতে এই সমাজ গবর্ণমেণ্ট, খৃষ্টীয় মিশনরী ও মুসলমানসমাজের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে উদ্যোক্তাগণকে তাহা করিতে হইবে। মফঃস্বলে এমন অনেক মহানুভবপ্রকৃতি মুসলমান মহোদয় আছেন যাঁহারা এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়া দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। সুতরাং তাঁহাদের সহানুভূতি বিশেষ আবশ্যক। বরিশাল, বাঁকুড়া, ফরিদপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় দুর্ভিক্ষের সময় এবং বর্দ্ধমানে দামোদরবন্যার সময় হিন্দুগণ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সাহায্য করায় মুসলমানসমাজ যে উপকৃত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহারা নিম্নশ্রেণী হিন্দুগণকে বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। তাঁহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাঁহারা কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না। খৃষ্টীয় মিশনারীগণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণকে সমাজের নির্ম্মম অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের সাহায্যও ভিক্ষা করিতে হইবে। সদাশয় গভর্ণমেণ্টের নিম্নশ্রেণীর উপর কৃপা-দৃষ্টি সর্ব্বদাই আছে এবং এই বিষয়ের উদ্যোক্তাগণ চেষ্টা করিলে সে কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

ইহার কার্য্য কিরূপে আরম্ভ করা হইবে এখন তাহা চিন্তা করা দরকার। আমার বোধ হয়, নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলে ভাল হয়:—

১ম। একটি বিধিবদ্ধরূপ সমাজ গঠন করিয়া রেজিষ্ট্রী করা।

২য়। সদর থানার এলাকাস্থিত ৫১৬টি গ্রাম লইয়া কার্য্য করা। গ্রামের তালিকা করিয়া বর্ণানুক্রমিক নাম অনুসারে প্রত্যেক পরিবারের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা।

৩য়। সমাজের সভ্যগণমধ্যে কেহ কেহ মাঝে মাঝে সেইসব গ্রামে যাইয়া ঐসব হিন্দুদিগের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার তদন্ত করা এবং কাহাকে কি ভাবে সাহায্য করা আবশ্যক তাহা নির্দ্ধারণ করা।

৪র্থ। সেই-সব গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমান মহাশয়গণের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করা।

৫ম। যাহাতে ঐ হিন্দুদিগের (ক) বিবাহ অল্পব্যয়ে ও সহজে সম্পন্ন হয়, (খ) যাহাতে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে পারে এবং (গ) যাহাতে সহজে জমি চাষ করিতে পারে তাহার সুবিধা ও পরামর্শ করিয়া দেওয়া।

৬ষ্ঠ। স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার হইলে তাহার প্রতিবিধানের উপায় করা।

৭ম। এই শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উপায়।

আপাততঃ এই কয়েকটি কাজ লইয়া সমাজ আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ইহার কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার করিতে হইবে। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে পরে সদর মহকুমায় কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হইবে। পরে অন্যান্য মহকুমায়, শেষে থানায় থানায় এবং পঞ্চায়তী ইউনিয়নে ইহার কার্য্য চলিবে।

স্থানীয় জমিদার মহোদয়গণের নিকট বিনীত প্রার্থনা, যেন তাঁহারা এই অনুষ্ঠানের প্রতি করুণা-দৃষ্টি করেন। তাঁহাদের নায়েব ও আমলাবর্গ দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে এবং জমিদার মহোদয়গণ কৃপা করিয়া তাঁহাদের মফঃস্বলস্থ আমলাবর্গের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের আদেশ প্রদান করিলে অনেক উপকার হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য, উদ্যোক্তাগণ যেন নাম ও যশের প্রার্থী না হন। ইহা নিঃস্বার্থভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। পরোপকারের প্রবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ক্ষুধিত, মুর্খ, সমাজে লাঞ্ছিত, দরিদ্র হিন্দুদিগের কল্যাণ কামনা করিয়া তাহাদিগকে পঙ্ক হইতে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। নির্ম্মল ও সরল চিত্ত লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। কোনও রূপ কপটতা চলিবে না—নেতা হইবার বাসনা থাকিবে না। থাকিবে কেবল সেবার ভাব। অনেক বাধা বিঘ্ন, অনেক টিট্‌কারী, অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা আসিবে, কিন্তু তাহা দৃঢ় চিত্তে উপেক্ষা করিয়া নিজ গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। উদ্যোক্তাগণের শক্তি যেন এই আন্দোলনেই নিঃশেষিত না হয়, কার্য্যের জন্যও যেন থাকে। প্রেমই জীবন—প্রেমই মানুষকে ভগবানের সন্নিধানে লইয়া যায়। প্রার্থনা করি, ভগবানের আশীর্ব্বাদ উদ্যোক্তাগণের উপর বর্ষিত হইয়া সমাজ-নিপীড়িত দরিদ্র হিন্দুদিগের উপকারের জন্য তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রেমের বন্যা আনয়ন করুক।—চারুমিহির।

সমস্ত অত্যাচার অবিচারের প্রতিকারের উপায় হইতেছে শিক্ষা। প্রত্যেক জমিদারের কর্ত্তব্য নিজের জমিদারীতে একটি কলেজ, একটি শিল্পশিক্ষালয়, ইংরেজি বাংলা স্কুল পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যেক প্রজা পুরুষ স্ত্রী সকলকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা; কারণ প্রজার নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থে প্রজার জ্ঞানের অভাব, পথ্যের অভাব, পানীয় জলের অভাব দূর করিতে জমিদারেরা ধর্ম্মত বাধ্য। প্রজার অর্থ নিজের বিলাসে ব্যয় করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই, তাঁহারা প্রজার কর্ম্মচারীরূপে নিজের ও পরিবারের সচ্ছল ও ভদ্রভাবে ভরণপোষণের উপযুক্ত বেতন মাত্র লইতে পারেন। দেশের লোকের অভাব মোচনের জন্য যাঁহারা যতটুকুই চেষ্টা করেন তাঁহারা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদভাজন। আমরা সংবাদ পাইয়াছি—

সৎকার্য্য।—সাঁওতাল পরগণা জেলার পাথুরিয়া-নিবাসী ৺হরিশ্চন্দ্র দাসের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র দাস ও তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়গণ পরলোকগত দাস মহোদয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ তাঁহার পূর্ব্ব আদেশ-মত পাথুরিয়ার সাধারণের পানীয় জলের অসুবিধা দূরীকরণার্থ একটি পুষ্করিণী ও একটি সুগভীর কূপ খনন করাইয়া তাহা বাঁধাইয়া দিয়াছেন। মৃত আত্মীয় ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষার্থে আজকালকার দিনে জলাশয় প্রতিষ্ঠার কথা আর বড় শুনা যায় না।—বীরভূমবার্ত্তা।

বারাকপুরে নূতন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়।—বারাকপুরের সদর বাজারে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ৺দেবীপ্রসাদ আগরওয়ালা মহাশয় ৭৫ সহস্র মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন। এই অর্থের ব্যবহারের জন্য একটি কমিটী হইয়াছে। যে বাজারে বিদ্যালয় বসিবে, উহার তিন মাইল মধ্যেও উচ্চ স্কুল নাই। সুতরাং প্রস্তাবিত বিদ্যালয় দ্বারা স্থানীয় লোকের যে বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

সম্প্রতি (মেদিনীপুরের) পাটনাবাজারে একটি শ্রমজীবী-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টী কলেজে অবস্থিত শ্রমজীবী-বিদ্যালয়ের শাখা। কলেজের কেন্দ্র-বিদ্যালয়টি ২৩শে মে, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কলেজ-গৃহেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র বালক ও শ্রমজীবীদিগকে যথাসম্ভব শিক্ষা দেওয়া। ছাত্রদিগকে পাঠ্য পুস্তক, শ্লেট, কাগজ প্রভৃতি বিনামূল্যেই বিতরণ করা হয়। সাধারণের সাহায্যেই ইহা পরিচালিত। সম্প্রতি কেন্দ্র-বিদ্যালয় মিউনিসিপ্যালিটীর সাহায্য পাইয়াছে। শ্রমজীবীদিগের সারা দিবসের কঠিন পরিশ্রমের পর কলেজে পড়িতে যাওয়া অসম্ভব বিবেচনায় কেন্দ্র-বিদ্যালয়-সমিতি তিনটি শাখা খুলিয়াছেন। একটা পাটনাবাজারে, আর দুইটী কুইকোটায় ও তাঁতিগেড়েয়।—মেদিনীপুর-হিতৈষী। মেদিনী-বান্ধব।

বাংলাদেশের সমাজের দুটি বিশেষ দুর্ব্বলতা আছে—(১) মানুষকে অস্পৃশ্য বিবেচনায় ঘৃণা করা, এবং (২) কন্যাদের ভার বা তুচ্ছ মনে করা। "মেদিনী-বান্ধব" সংবাদ দিয়াছেন, উপরোক্ত নৈশবিদ্যালয়ে অস্পৃশ্য জাতিদের ভর্ত্তি করা হয় না। কেন? তাহারা কি মানুষ নয়, তাহাদের কি জ্ঞান লাভ করিয়া উন্নত হইবার দরকার নাই? যদি কারো দরকার কিছু থাকে ত উহাদেরই বেশী করিয়া আছে। নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন, অস্পৃশ্যকে সমাদর করিয়া জ্ঞান ও স্বাধিকার দান যেমন আবশ্যক ও কর্ত্তব্য কন্যাদের শিক্ষা দানও তেমনি আবশ্যক ও কর্ত্তব্য। কিন্তু

এদিকে কর্ম্মপ্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল দেখিতেছি। তাহার কারণ কন্যাদের সম্বন্ধে আমাদের উদাসীনতা ও অযহেলা।

আর কন্যারা আমাদের কাছে তুচ্ছ ও ভার বলিয়াই সমাজে কন্যা দায় হইয়া উঠে। এবং কন্যা যতদিন দায় থাকিবে ততদিন পুত্রের পিতার কশাই-বৃত্তি কমিবে না। বরের বাপের জুলুম হইতে পিতাকে অব্যাহতি দিবার জন্য স্নেহলতা কেরোসিন তেল জ্বালিয়া পুড়িয়া মরিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি খবর পাইয়াছি—

সেই স্নেহলতার (ভূতপূর্ব্ব কন্যাদায়গ্রস্ত) পিতা গত ১৬ই জৈষ্ঠ বুধবার তাঁহার পুত্র অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়া পাত্রীর পিতা বিক্রমপুর কনকসার-নিবাসী মুন্সেফ শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে নগদ তের শত টাকা পণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কথাটা সত্য কি? 'আক্কেলের' এতটা অভাব কাহারও থাকিতে পারে, ইহা সহসা আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।—হিতবাদী।

যদি একথা সত্য হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণীর" শঙ্করের মত আমরাও বলিব—"সহস্র মিথ্যার চেয়ে এই সত্যে ধিক্!" আর, স্নেহলতার সহোদর হইয়া যে বরপণলুব্ধ পিতাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই, সম্প্রদান-স্থলের দান-সজ্জা কি তাহার দিকে বিদ্রূপ ভরে চাহিয়া তাহার আত্মসম্মান বুদ্ধি ও মনুষ্যত্বকে আহত কি ব্যথিত করে নাই? —চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ।

সম্প্রতি আমরা একজন কন্যার পিতার বলিষ্ঠ-প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি—

বরের পিতা শ্রীযুক্ত * * * মহাশয় একজন শিক্ষিত লোক। বরের জননী নারায়ণগঞ্জ বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। কন্যার পিতার নাম শ্রীযুত অরুণোদয় দাস, নিবাস দাড়োড়া। কন্যার শুভ বিবাহের দিন বরযাত্রী মহাশয়েরা মুরাদনগর পর্য্যন্ত নৌকাযোগে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে জনে জনে একখানা পাল্কীর দাবী করিয়া বসেন। পাল্কী সংগ্রহ করা অসম্ভব বলিয়া কন্যাপক্ষ বলিয়া কহিয়া অল্পসংখ্যক পাল্কী দ্বারাই যাত্রী মহোদয়দিগকে স্বগ্রামে আনয়ন করেন। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য বলা যায় না যে কারণে হউক, বর-পক্ষ নানা অজুহাতে বেচারি কন্যাকর্ত্তার প্রতি অতিরিক্ত ও অন্যান্য নানা টাকার দাবী উপস্থিত করিতে থাকেন। কন্যাকর্ত্তার তাহা অসহনীয় হয় এবং তিনি এই-প্রকার "গ্রাহক" লোকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে একেবারেই নারাজ হন। ঘটনা ক্রমে গুরুতর হইয়া অবস্থা শেষে এইরূপ হইয়া উঠিয়াছিল যে, বরকর্ত্তাগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহাদের বাসাবাড়ীর বাহিরখণ্ড হইতে অন্দরখণ্ডে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। শেষ ফলে শুভ বিবাহটি হইতে পারে নাই। বর ও বরযাত্রীদিগকে ক্ষুণ্নমনে অস্তগমনে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছে।

বেচারি কন্যার পিতাকে বরপক্ষ কায়দায় পাইয়া জেরবার করা, আজকাল বৈবাহিক রীতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে কন্যার পিতা যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাতে অনেকের চক্ষু ফুটিবে। দেশে কন্যা-কর্ত্তাদিগের হর্ষ ও বরকর্ত্তাদিগের বিস্ময় যুগপৎ উদিত হইবে সন্দেহ নাই।—ত্রিপুরা-গেজেট।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্ব-বিদ্যা-সংগ্রহ

বর্ত্তমান যুগে সকল সভ্যজাতির সমবেত চেষ্টায় জ্ঞানের বিষয়-সকল ব্যাপ্তি, গভীরতা ও সূক্ষ্মতায় দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। এই জ্ঞান জনসাধারণের পক্ষে সুগম করিবার জন্য ইউরোপীয় ভাষায় অনেক সুব্যবস্থা আছে। প্রতি বিষয়ে নবতম তথ্যে পূর্ণ পণ্ডিতদের উপযোগী গ্রন্থ ছাড়া, সরলভাষায় সাধারণের বোধগম্য প্রণালীতে রচিত অথচ আধুনিক উচ্চজ্ঞানপ্রদ অনেক ছোট পুস্তক ও পর্য্যায়বদ্ধ গ্রন্থাবলী সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। তদুপরি পণ্ডিতেরা সাংসারিক লোক ও শ্রমজীবীদিগের অবসরকালীন শিক্ষার জন্য সরল ভাষায় বিশ্ব-বিদ্যা-প্রসারিণী-বক্তৃতা (University Extention Lectures) প্রদান করিয়া এই-সব নব জ্ঞান কলেজের বাহিরে বিতরণের উপায় করিয়া দিয়াছেন।

ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থাগুলির কোনটিই নাই। অথচ, ইউরোপীয় দেশগুলির অপেক্ষা ভারতবর্ষের পক্ষে এই নবোন্মেষশালী জ্ঞানের অধিকার অধিকতর আবশ্যক; কারণ ইহারই অভাবে ভারতের জনসাধারণ ইউরোপের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ভারতীয় দেশীয়ভাষার সাহিত্য অনেক স্থলে এখনও মধ্যযুগের ইউরোপকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ভারতকে বিশেষ চেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে দীর্ঘকালের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, নচেৎ বর্ত্তমান যুগের কঠোর জীবন-সংগ্রামে নব্যতম জ্ঞানের পথ্যে বঞ্চিত ভারতীয় জনসাধারণ মুমূর্ষুতা প্রাপ্ত হইবে। জ্ঞানই শক্তি। সেই শক্তি সরল মাতৃভাষায় রচিত সদ্‌গ্রন্থের দ্বারা ভারতময় সঞ্চারিত করিতে হইবে। জাতীয় মুক্তি এই পথে।

এইজন্য বাঙ্গলায় এবং পরে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় "বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ" নামে এক গ্রন্থাবলী প্রকাশের কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা Home University Library এবং Cambridge Manuals of Science and Literatureএর আদর্শে রচিত হইবে।

নিয়মাবলী

(১) প্রতি গ্রন্থ স্মলপাইকা অক্ষরে ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ২০০ হইতে ২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে।

(২) প্রতি গ্রন্থের শেষে দুই এক পৃষ্ঠা ছোট অক্ষরে শ্রেণী-বিভাগ করা প্রমাণপঞ্জী (bibliography) দিতে হইবে।

(৩) প্রতি গ্রন্থের মূল্য বারো আনা হইবে।

(৪) সকল বিষয়ের নবোদ্ভাবিত তথ্য সকল এই গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ হইবে। গ্রন্থগুলির ভাষা ও রচনাপ্রণালী সাধারণ বাঙ্গলা-শিক্ষিত লোকদিগের বোধগম্য হইবে। দীর্ঘ সমাস ও কঠিন সংস্কৃত মূলক শব্দ অথবা প্রাদেশিক ভাষা যথাসম্ভব বর্জ্জনীয়।

(৫) সম্ভব-মত বিদেশী শব্দের বঙ্গানুবাদ ব্যবহার করিতে হইবে, কিন্তু যে-সব বিদেশী শব্দ আমাদের নিকট অধিকতর সহজ হইয়াছে বা যে সকল ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বাঙ্গলাভাষায় গ্রহণ করাই শ্রেয়, এই গ্রন্থাবলীতে তাহাই বঙ্গাক্ষরে লিখিতে হইবে, তাহার দুর্বোধ সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হইবে না।

(৬) অধ্যক্ষসমিতি এই গ্রন্থাবলীর সর্ব্বস্বত্বাধিকারী হইবেন। তাঁহারা গ্রন্থকারকে দুইশত টাকা পারিশ্রমিক দিয়া প্রতি গ্রন্থের কপি রাইট কিনিয়া লইতে পারিবেন, এবং ভবিষ্যতে গ্রন্থে পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

(৭) প্রতি বিভাগের লেখকগণ সেই বিভাগের সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থ রচনা করিবেন, এবং প্রত্যেক গ্রন্থ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতে উক্ত সম্পাদকের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

(৮) "বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ" ছয় বিভাগে বিভক্ত হইবে, এবং স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান সম্পাদক, উপদেষ্টা ও কার্য্য নির্ব্বাহক রহিবেন।

বিভাগগুলি ও তাহাদের সম্পাদকগণ :—

(ক) দর্শন (সম্পাদক ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত)।

(খ) বিজ্ঞান (সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীস)।

(গ) ইতিহাস, ভূগোল ও অর্থনীতি (সম্পাদক শ্রীযদুনাথ সরকার)।

(ঘ) সাহিত্য, সাহিত্যের ইতিহাস, এবং ভাষা (সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী)।

(ঙ) কলা (সম্পাদক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী এবং শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

(চ) শিক্ষা বিজ্ঞান (অস্থায়ী সম্পাদক স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ইতিহাস বিভাগ—গ্রন্থাবলী

১। ভারতবর্ষের অভিব্যক্তি—যদুনাথ সরকার।
২। হিন্দুযুগের ইতিহাস—
৩। মুসলমান যুগের " —
৪। বৃটিশ " —রমেশচন্দ্র মজুমদার।
৫। বৈদিক সমাজ ও সভ্যতা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবং সুনীতি চট্টোপাধ্যায়।
৬। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ জগৎ—বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।
৭। দ্রাবিড় সভ্যতা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার।
৮। বাঙ্গলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯। মারাঠা " —সুরেন্দ্রনাথ সেন।
১০। শিখ " —
১১। সিপাহী-বিদ্রোহ—
১২। ভারতের বাণিজ্য, প্রাচীন ও নব্য ইউরোপীয়—
১৩। ভারতে ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাস—
১৪। ভারতীয় মুদ্রা—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। ভারতীয় অর্থনীতি—যদুনাথ সরকার।
১৬। অশোক—কালিদাস নাগ এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।
১৭। আকবর—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। আওরাংজীব—যদুনাথ সরকার।
১৯। চৈতন্য—সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।
২০। রামমোহন রায়—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।
২১। প্রাচীন মিশর—
২২। বাবিলন—
২৩। চীন—
২৪। জাপান—
২৫। গ্রীস—
২৬। আলেকজান্দার—
২৭। রোম (সীজরের মৃত্যু পর্য্যন্ত)—
২৮। রোমক সাম্রাজ্য (১৪৫৩ পর্য্যন্ত)—
২৯। ইংলণ্ড—১৬০৩ পর্য্যন্ত—
৩০। —১৬০৩—১৯১৭—
৩১। ফ্রান্স—
৩২। ইউরোপে নবযুগ (১৪৫৩—১৯১৭)—
৩৩। আধুনিক ইউরোপ (১৮৪৮ হইতে)—কিরণশঙ্কর রায়।
৩৪। আমেরিকা—
৩৫। নেপোলিয়ন—
৩৬। বৃটিশ উপনিবেশ—
৩৭। খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস—
৩৮। মুহম্মদ ও আব্বাসীয় খালিফাগণ—
৩৯। ইসলামীয় জগৎ—মিসর স্পেন ও তুর্কী—
৪০। পারস্য—
৪১। এসিয়ার গ্রীক সাম্রাজ্য—
৪২। গ্রীক সভ্যতা, আলেকজন্দারের পরবর্ত্তী—কালিদাস নাগ।
৪৩। ঐতিহাসিক প্রণালী—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪৪। ভারতের অবস্থা—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
৪৫। প্রাচীন ভূগোল—
৪৬। ইউরোপে আবিষ্কারের যুগ, ১৪০০—১৬০০—
৪৭। লিপিতত্ত্ব—সুনীতি চট্টোপাধ্যায়।
৪৮। ভারতের বাহিরের হিন্দু সভ্যতা—
৪৯। ইউরোপীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ—
৫০। শাসনতত্ত্ব Political Philosophy—
৫১। ভারতের প্রাচীন ভূগোল (অভিধান)—
৫২। ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯—১৭৯৬ কিরণশঙ্কর রায়।

যদুনাথ সরকার, সম্পাদক।
ঠিকানা—মোরাদপুর পোষ্ট,
পাটনা জেলা।

———

দুই তার

(৮)

দয়াদেবী বীরেনের বাড়ীর মধ্যে গিয়াই যেমন করিয়া মোমের পুতুল আগুন-আঁচে নুইয়া পড়িয়া গলিয়া যায় তেমনি আস্তে আস্তে বসিয়া মাটিতেই শুইয়া পড়িলেন এবং অচেতন হইয়া গেলেন। বীরেনের প্রতিবেশিনীরা চোখে মুখে জল দিতে লাগিল, হাওয়া করিতে লাগিল। পঞ্চানন ডাক্তারকে ও গুণময়-বাবুকে খবর পাঠাইল।

বীরেনের মা গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছেন এই খবর পাইয়াই গুণময় অত্যন্ত ভয় পাইয়া ছুটাছুটি তাঁহার মোটা শরীর লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিতেছিলেন। পথে তাঁহার কাছে খবর পৌঁছিল যে দয়াদেবীর মূর্চ্ছা হইয়াছে। গুণময় তাড়াতাড়ি চলিবার চেষ্টা করিয়া আরো হাঁপাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে কেবলি হইতেছিল—অ্যাঁ! শেষকালে আমা হতে এতগুলো স্ত্রীহত্যা হল!

গুণময়ের মনের মধ্যে ভয় জমিয়া উঠিতে লাগিল। দয়াদেবীকে বিবাহ করিয়া আনিয়া তিনি তাঁহার প্রথম স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছিলেন। বীরেনের মায়ের জমিজমার লোভে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। হয়ত বা দয়াদেবীরও মৃত্যুর কারণ তিনিই হইতেছেন। তাঁহার সমস্ত গা কেমন ছমছম করিতে লাগিল, মনের মধ্যে কেমন একটা শীত-শীত বোধ করিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল এইসব অপঘাত মৃত্যুর বিভীষিকা যেন চারিদিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার দম বন্ধ করিয়া তুলিতেছে।

গুণময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া পঞ্চাননকে দেখিয়াই তর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—পাঁচু-দা, এসব কী কাণ্ড ঘটালে দেখ-দেখি!

পঞ্চানন বুঝিল বাবুর মনটা সুস্থ নাই, সে তিরস্কার শুনিয়া নীরবে মাথা নত করিল।

গুণময় জিজ্ঞাসা করিলেন—বীরেন কই?

দশ বারো জনে বলিয়া উঠিল—বাড়ীর ভেতর।

গুণময় বাড়ীর ভিতরে গিয়াই আবেগ-ভরে বীরেনের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—বীরে, তোর মা এমন কেন করলে? আমি কি সত্যি তোদের পথে বার করতাম। তোরা জেদ করলি তাই ডিক্রিটে করিয়ে রাখলাম। তাতে আমার এমন কি দোষ বল্?

বীরেন তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়াও চাহিল না, দয়াদেবীর পায়ের উপর নত হইয়া বসিয়া রহিল, চোখ দিয়া তাহার টপটপ করিয়া জল ঝরিতেছে।

গুণময় ব্যগ্রভাবে বলিলেন—যা হয়ে গেছে তার ত আর চারা নেই। এখন আয়, মায়ের সৎকার করবি আয়।......তোর মায়ের এ ভারি অন্যায়, শেষকালে আমায় নিমিত্তের ভাগী করে রেখে গেল!

বীরেন অনুভব করিল তাহার মা মরিয়া জিতিয়াছেন, এই গর্ব্বিত অত্যাচারীকেও অবনত করিয়াছেন। বীরেন উঠিয়া মায়ের সৎকার করিতে গেল।

বীরেন যখন মায়ের সৎকার সারিয়া বাড়ী ফিরিল, তখন দয়াদেবীর জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার উঠিবার শক্তি নাই। কাচা-গলায় খালি পায়ে ম্লান মুখে দীন বেশে যখন বীরেন তাঁহার শয্যার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে একে পুরুষ তায় ছেলেমানুষ, ঘরকন্নার কিছুই জানে না; এখন যিনি তাহার মা তিনি শয্যাগত; বীরেন নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত ও অসহায় বোধ করিতে লাগিল। দয়াদেবীও বীরেনকে একটু কিছু খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পরের বাড়ীতে কোথায় কি আছে তাহা তিনি জানেন না, তাহার উপর আবার নিজে উত্থানশক্তিরহিত। তিনি কাহাকে অনুরোধ করিবেন দেখিবার জন্য একবার ঘরের চারিদিকে চাহিলেন, দেখিলেন গুণময় আসিতেছেন; অমনি তিনি চোখ বুজিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন।

গুণময় ঘরের দরজার কাছে আসিয়া ইঙ্গিতে বীরেনকে ডাকিয়া লইয়া একটু তফাতে গিয়া বলিলেন—গিন্নি এখন কেমন আছেন?

বীরেন অনিচ্ছায় বিরক্ত ভাবে জবাব দিল—জ্ঞান হয়েছে।

গুণময় একটু আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন—দ্যাখ্, এখন উনিই তোর মা। শুনলাম উনি তোকে ছেড়ে বাড়ী যাবেন না বলেছেন। এখন ওঁর যে-রকম শরীরের অবস্থা তাতে ওঁকে জোর করে ত কিছু বলা চলবে না, তুই যদি একটু বুঝিয়ে বলিস ত শুনতেও পারেন হয়ত।

বীরেন দৃপ্ত ভাবে বলিল—আচ্ছা আমি বলছি গিয়ে।

বীরেন চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া গুণময় তাড়াতাড়ি বলিলেন—তুই বলিস যে তুইও সঙ্গে যাবি……

বীরেন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি যেতে পারব না।

গুণময় অপ্রতিভ হইয়া বীরেনের হাত ধরিয়া বলিলেন—তা হলে কি তুই ওঁকে বাঁচতে দিবিনে? এখানে ওসুধ-পত্তি যত্ন-আত্তি হবে কি করে? উনি ত তোকে ছেড়ে যাবেন না।

বীরেন থমকিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

একটি ছোট মেয়ে আসিয়া ডাকিল—বীরেন-দা, তোমাকে দয়া-মাসী ডাকছে।

বীরেন একবার গুণময়ের দিকে চাহিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

দয়াদেবী বীরেনকে দেখিয়া বলিলেন—বাবা বীরেন, আজকে ত আর-কিছু খেতে নেই, একটু সরবৎ করে খা।……কোথায় কি আছে নিজে উঠে দেখে শুনে করে কর্ম্মে যে দেবো সে শক্তি তোর মায়ের নেই।

একজন প্রতিবেশিনী বলিল—তুমি ব্যস্ত হয়ো না দিদি, আমরা বীরেনকে খাওয়াচ্ছি। মিছরীর পানা আমরা এনে রেখেছি।

বীরেন সরবৎ পান করিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল—এ বাড়ীতে আমার থাকতে ইচ্ছে করছে না মা, তুমি আমাকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে চল।

দয়াদেবী উৎসুক দৃষ্টিতে একবার বীরেনের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি ভাবিলেন মায়ের স্মৃতিতে-ঘেরা এই বাড়ীতে থাকিতে তাহার বোধ হয় কষ্ট হইতেছে, মায়ের অপঘাত মৃত্যুর কথা মনে হইয়া বালকের মনে বোধ হয় ভয় হইতেছে; তাই তিনি বীরেনের প্রস্তাবে অন্যায় কিছু দেখিলেন না; বরং তিনি খুসী হইলেন যে নিজের ঘরকন্নার মধ্যে গিয়া পড়িলে তিনি সহজে ইচ্ছানুরূপ বীরেনের যত্ন করিতে পারিবেন। তিনি বলিলেন—তবে আমাকে ধরে নিয়ে চ।

বীরেন বলিল—গাড়ী এসেছে।

(৭)

বীরেন মনে করিয়াছিল দয়াদেবীকে তাঁহার নিজের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়াই সে চলিয়া আসিবে। কিন্তু বাড়ীতে গিয়াই দয়াদেবী আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং এবার তাঁহার চেতনা হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইল। তাঁহার চেতনা হইবা মাত্র তিনি চোখ খুলিয়াই চারিদিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—বীরেন কই?

বীরেন তাঁহার শিয়রের কাছে ছিল, আগাইয়া আসিয়া বলিল—এই যে মা আমি।

দয়াদেবী অত্যন্ত মিনতির স্বরে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—আমাকে ছেড়ে তুই চলে যাসনে বাবা।

বীরেনের মনের সঙ্কল্প তিনি বোধ হয় সন্দেহ করিয়াছিলেন।

সেই মিনতির পর বীরেন আর পলাইতে পারিল না। তখন সে মনে করিল দয়াদেবী একটু সুস্থ হইলে কলিকাতায় পড়িতে যাইবার নাম করিয়া এ-বাড়ী ও এ-গ্রাম হইতে চিরবিদায় লইবে। সে বলিল—না মা, আমি তোমায় ছেড়ে আর কোথায় যাব? কলেজ খুললে কলকাতা যাব।

মায়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, বীরেন-দা কি আমাদের বাড়ীতেই থাকবে?

দয়াদেবী উচ্ছ্বসিত অশ্রু দমন করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ।

মায়া উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—বেশ হবে আমি রোজ বীরেন-দার কাছে গল্প শুনব।

দয়াদেবী সেই যে শয্যা লইয়াছেন আর উঠিতে পারিলেন না। ডাক্তার বলিয়াছে দুর্ব্বল শরীরে অতি উত্তেজনায় হৃদয় পীড়িত হইয়াছে; অল্পেই হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে; মন খুব শান্ত থাকে এমন ব্যবস্থা করিতে পারিলে কিছুদিন বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।

বীরেন সেই শয্যাগত দয়াময়ীর সেবায় আপনাকে এমন করিয়া নিযুক্ত করিয়া দিল, যে, তাহার আর মায়ের জন্য শোক করিবার অবকাশ রহিল না। কিন্তু সে বড় বিষণ্ণ গম্ভীর স্বল্পবাক হইয়া উঠিল।

পঞ্চানন চাণক্যনীতি আওড়াইয়া গুণময়কে বলিল—ভায়া, ঋণের শেষ, আগুনের শেষ, ব্যাধির শেষ আর শত্রুর

শেষ রাখতে নেই; অল্প স্ফুলিঙ্গই শেষকালে খাণ্ডবদাহন করতে পারে!

গুণময় অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন—ও আর আমাদের কি বা করবে? গিন্নির মায়া পড়ে গেছে—নিজের ঘরে শোওয়ান; নিজের সামনে বসিয়ে খাওয়ান; ওষুধ খেতে চান না, বীরেন দিলে তবে খান। এখন ত ওকে সরানো চলবে না। গিন্নি সরলে কি একটু সারলে তখন যা হয় করলেই হবে।

বীরেন তাহাদের বাড়ীতে থাকিবে শুনিয়া মায়া খুব খুসী হইয়াছিল। কিন্তু দুদিনেই সে বুঝিতে পারিল যে এ তাহার সে বীরেনদাদা নহে; তাহার সেই আগেকার উল্লাস চঞ্চলতা নাই, মায়াকে দেখিলেই সে আগেকার মতন তাহাকে দুই-হাতে জড়াইয়া ধরিয়া হাসে না, সে একলা মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকে; আগে সে যাচিয়া গল্প শুনাইত, কত রঙ্গ করিয়া হাসাইত, এখন অনেক সাধ্যসাধনা না করিলে তাহাকে দিয়া গল্প বলানো যায় না; গল্প শুনিয়া মায়া হাসিয়া কুটিকুটি হইলেও, যে গল্প বলে তাহার মুখে হাসির একটি রেখাও ফুটে না, ইহাতে গল্প শোনার আনন্দ মায়ার মনে জমিতে পারে না। মায়া এখন মায়েরও যেন পর হইয়া পড়িতেছে;—মা সর্ব্বদা বিছানায় পড়িয়াই আছেন, মায়ার নাওয়া-খাওয়া তিনি আর আগের মতন নিজে দেখিতে পারেন না, যা করে তাহার ঝি মোহিনী। মাকে সে কখনো একলা পায় না; মা আজকাল বীরেনকে লইয়াই ব্যস্ত। এজন্য তাহার মনের মধ্যে বীরেনের উপর হিংসা ও বিরক্তি একটু-একটু করিয়া জমিয়া উঠিতেছিল। এই-সঙ্গীহীন বাড়ীতে বীরেনকে পাইয়া মায়া একদিকে যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাবার সঙ্গে গাড়ীতে করিয়া হাওয়া খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া মায়া মায়ের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল বীরেন তাহার মায়ের কোলের কাছে বসিয়া একখানা বই পড়িয়া শুনাইতেছে এবং মা বীরেনের পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিতেছেন। মায়া ক্ষুধিত ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বীরেনের কোল হইতে বইখানি ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং বীরেনের পিঠ ও মায়ের কোলের মাঝখানে ঠেলিয়া শুইয়া পড়িয়া মাকে আদেশ করিল—আমার বড় ঘুম পেয়েছে, আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দাও!

দয়াদেবী মেয়ের মনের ভাব বুঝিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে স্নেহ-সান্ত্বনার স্পর্শ বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন—সন্ধ্যে বেলা ঘুম পেয়েছে কি? খাবিনে?

মায়া ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল—না, আমি খেতে চাইনে! তুমি আমার গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও।

দয়াদেবী বলিলেন—বাবা বীরেন, মোহিনীকে বল ত, বামুন-ঠাকুরকে বলবে মায়ার লুচি ভেজে এই ঘরে দিয়ে যাবে।

বীরেন উঠিয়া বাহির হইয়া গেল—অমনি মায়াও তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়া বীরেনের হাত চাপিয়া ধরিয়া এক নিশ্বাসে বলিল—বীরেন-দা, আমার পড়বার ঘরে এস, আমায় গল্প বলতে হবে।

কাঁচপোকা যেমন করিয়া তেলাপোকাকে টানিয়া লইয়া যায়, মায়া তেমনি করিয়া বীরেনকে টানিয়া লইয়া গেল। বীরেনকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া, আর-একখানা চেয়ার তাহার সামনে টানিয়া আনিয়া তাহার কোল ঘেঁসিয়া নিজে বসিয়া মায়া হুকুম করিল—সেই রাক্কোস না খোক্কোসের গল্পটা বল।

দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মতন বীরেন একটানা বলিয়া যাইতে লাগিল—এক যে ছিল ব্রাহ্মণ, সে যাবে দেশ-ভ্রমণ করতে......

দয়াদেবী একাকী বিছানায় পড়িয়া-পড়িয়া ভাবিতে-ছিলেন বীরেন ও মায়ার কথা। মায়া বীরেনকে বেশ ভালো বাসিয়াছে, কিন্তু মায়ের ভালোবাসার এতটুকু ভাগ দেওয়া সে সহিতে পারে না, তখন তাহার মধ্যে তাহার বাপের হিংস্রতা ফুটিয়া উঠে। তাহার বাপ বীরেনকে মাতৃ-স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, ইহা যদি মায়া বুঝিতে পারিত তবে সে উহার উপর মায়ের মমতা দেখিয়া হিংসা করিতে পারিত না। তাহার বাপ বীরেনের যে বিষম ক্ষতি করিয়াছে তাহার সুদে-আসলে পূরণ করিতে হইবে তাহাদিগকে।

অমনি দয়াদেবীর মনে হইল মায়া তাঁহাদের একমাত্র সন্তান; সে-ই এই অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইবে; বহু অনাথ দরিদ্রের সর্ব্বনাশ করিয়া সঞ্চিত, অশ্রু-শ্বাসে কলঙ্কিত অভিশপ্ত এই সম্পত্তি দিয়াই তাহাকে তাহার পিতার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; অতএব তাহাকে এমন একটি সুপাত্রে সম্প্রদান করিতে হইবে, যে ব্যথিতের দরদ বুঝিবে, যে শ্বশুরের অত্যাচারে অর্জ্জিত সম্পত্তি প্রজাদের গচ্ছিত ন্যাস বলিয়া মান্য করিয়া প্রজাহিতেই তাহাকে নিযুক্ত করিবে, নিজের বিলাস চরিতার্থ করিবার সাধন করিয়া তুলিবে না। চারিদিক হইতে যে অবস্থা ঘনাইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বীরেন্দ্রের সঙ্গে মায়ার বিবাহ দিতে পারিলে সব দিক বজায় থাকে। এই কথা মনে হইতেই দয়াদেবীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াই আবার চিন্তাকুল হইয়া পড়িল। যদি মায়ার বাবা বীরেন্দ্রকে জামাই করিতে অস্বীকার করেন! দয়াদেবীর মনে হইল একবার স্বামীকে অনুরোধ করিয়া দেখিবেন। কিন্তু তিনি যদি এই প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া বীরেনের অপর কোনো অনিষ্ট করিয়া বসেন! দয়াদেবী ভাবিলেন, মরণ ত আমার বুকে বাসা বাঁধিয়াছে—যে-কোনো মুহূর্ত্তে সে আমার গলা টিপিয়া মারিতে পারে; এমন অবস্থাতেও কি স্বামী আমার একটা অনুরোধ রাখিবেন না? কিন্তু রাখিবেন যে তাহারই বা ভরসা কিসে? বড়রাণীর সন্তান হয় নাই বলিয়া যে স্বামী স্ত্রীর অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে যাইতে পারিয়াছিলেন এবং সতীনকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিতে হইবে বলিয়া দুঃখে ক্রোধে বড় রাণী আত্মহত্যা করিলে যে স্বামী খুসী হইয়া বলিয়াছিলেন—গেছে, বেশ গেছে, এয়োরাণী ভাগ্যিমানী শাঁখা সিঁদুর নিয়ে গেছে, এ ত তার পরম ভাগ্য! কিন্তু বিয়ের গোলমালটা চুকে যাওয়ার পর গেলেই ভালো হত!—সে স্বামী যে তাঁহার মৃত্যুর জন্য কিছুমাত্র ব্যথিত হইবেন এমন দুরাশা দয়াদেবী করিতে সাহস পাইতেছিলেন না। এই জন্য তিনি এতদিন শয্যাগত হইয়া পড়িয়া আছেন, স্বামী একবারও ত তাঁহাকে দেখিতে আসেন নাই, চাকর-দাসীকেও ত তিনি পত্নীর কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই! তবু দয়াদেবী স্থির করিলেন একবার মরণান্ত চেষ্টা তিনি করিয়া দেখিবেন।

বীরেনের আন্তরিকতা ও আগ্রহশূন্য গল্প শুনিতে মায়ার ভালো লাগিতেছিল না। বক্তাকে নোটীশ না দিয়াই শ্রোত্রী গল্পের মাঝখানে হঠাৎ উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং অভিমান ভরে মায়ের ঘরে ঢুকিয়া দয়াদেবীর চিন্তায় বাধা দিয়া বলিল—মা, আমার ঘুম বুঝি পায় না, খিদে বুঝি পায় না?

দয়াদেবী মেয়েকে কাছে বসাইয়া চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিলেন—দ্যাখ্ মায়া, বীরেনকে বিয়ে করবি?

মায়া মায়ের আদুরে মেয়ে; নূতন খেলনা দেওয়ার প্রস্তাবের মতন বিবাহের প্রস্তাবে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—করব মা! কিন্তু বীরেন দাকে তোমার কাছে শুতে দেবো না কিন্তু; আমি একলা তোমার কাছে শোব; বীরেন-দা পাশের ঘরে শোবে।

মা হাসিয়া বলিলেন—তাই হবে।

মায়া খুসী হইয়া এক ছুটে বাহির হইয়া গেল। বীরেনের গলা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—বীরেন-দা ভাই, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, মা বল্লে! আজ থেকে তুমি আর মায়ের ঘরে শুতে পাবে না, আমি একলা মায়ের কাছে শোবো।

(৮)

মায়া জনে জনে এই খবর এমন উৎসাহের সহিত শুনাইয়া বেড়াইল যে তাহা তাহার বাবার কানে উঠিতেও বিলম্ব হইল না। গুণময় কন্যাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ রে মায়া, বীরেনের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে কে বল্লে?

মায়া ভয়ে-ভয়ে তাহার উচ্ছ্বসিত সহস্র কথা দমন করিয়া শুধু বলিল—মা।

গুণময় শুধু একটা "হুঁ" করিয়া চিন্তার মধ্যে ডুব দিলেন। মায়া বাপকে যমের মতন ডরাইত; সে বাবাকে গম্ভীর হইতে দেখিয়া সেখান হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া-সরিয়া একটু আড়ালে গিয়াই দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

গুণময় ভাবিতে লাগিলেন—বীরেন ছেলেটা মন্দ নয়, মায়ার সহিত বিবাহ দিয়া দিলে বীরেন ঘর-জামাই হইয়াই থাকে, তাহা হইলে মেয়েটাকেও পরের ঘর করিতে যাইতে হয় না এবং বিষয়সম্পত্তিটাও দূরের কোনো লোকের হাতে গিয়া পড়ে না।

কিন্তু তখনি আবার তাঁহার মনে হইল দয়াদেবী ত শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি ত ঘরসংসার আর দেখিতে পারেন না, স্বামী সেবাও করিতে পারেন না; অতএব এ-সবের জন্য একজন লোকের আবশ্যক! মাইনে-করা লোকের দ্বারা তেমন কাজ পাওয়া যায় না, তাহারা দরদ দিয়া যত্ন করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাকে আর-একটি ডাগর মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ করিলে সেই স্ত্রীর যদি সন্তান হয় তবে ত বিষয়সম্পত্তি সব তাহার। তখন বীরেন মায়াকে লইয়া দাঁড়াইবে কোথায়? মায়াকে কোনো ধনীর এক পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিতে হইবে।

গুণময়ের চিন্তা জন্মিয়াই কাজে পরিণত হইতে চায়। তখনি পঞ্চাননকে ডাক পড়িল।

পঞ্চানন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভায়া আমায় তলব করেছ কেন?

গুণময় তাড়াতাড়ি গড়গড়ার নলটা রাখিয়া দিলেন—পঞ্চানন তাঁহার কর্ম্মচারী হইলেও হাজার হোক বয়সে বড় ও ব্রাহ্মণ ত! বলিলেন—মায়া ত বড় হয়ে উঠেছে, তার একটা বিয়ের চেষ্টা ত করতে হয়।

—হ্যাঁ তা হয় বৈ কি। ঘটকদের খবর দেবো।

—খবর দেবো নয়; এই অঘ্রাণ মাসেই বিয়ে দেওয়া চাই; গিন্নি ত এখন-তখন হয়ে আছেন, মেয়ের বিয়েটা দেখে যেতে পারলেও…

পঞ্চানন প্রভুর মুখের কথা নিজের মুখে লুফিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল -তবু সুখে মরতে পারবেন—সে কথা কি আর বলতে! আমি দশজন ঘটক লাগিয়ে এই মাসেই সমস্ত ঠিক করে ফেলব।

গুণময় একটু ইতস্তত করিয়া আমতা-আমতা করিতে করিতে বলিলেন—হ্যাঁ, তা…আর একটা কথা…কি ভালো বলব মনে করে ডেকেছিলাম…ভুলে যাচ্ছি…ওর নাম কি …হ্যাঁ গিন্নি ত এখন-তখন হয়ে রয়েছেন…বুঝলে কিনা

ধূর্ত্ত পঞ্চানন আঁচে গুণময়ের মনের কথা আন্দাজ করিয়া বলিয়া উঠিল—আমিও তোমাকে একটা কথা বলব-বলব কদিন থেকে মনে করছি। রাণী-বৌএর ত ঐ অবস্থা! রাজ-সংসারটা ত বজায় রাখতে হয়! এত বড় বিষয় সম্পত্তি ভোগ করবে কে? বাপপিতম'র পিণ্ডিই কি লোপ পাবে? এর একটা ত সত্বর ব্যবস্থা করা দরকার।

গুণময় মনে-মনে খুসী হইয়া গোঁপের তলায় উদ্ভাসিত হাসি চাপিয়া বলিলেন—তবে কি তুমি পুষ্যিপুত্তুর নিতে বল!

পঞ্চানন মহা-ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—আরে রাম রাম! পুষ্যিপুত্তুর আবার মানুষে নেয়? ঐ ত পাহাড়পুরের ধনেশ্বর চৌধুরীর রাণী পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছিল, তাতে কার ভালোটা হল? তোমার বয়েস কি? আর-একটা বিয়ে কর, সংসার বজায় হবে, ছেলে নেই ছেলে হবে—জমিদারী ভোগ করবার কি পিণ্ডি পাবার জন্যে পরের ছেলেকে ভাড়া করে আনতে হবে না। মায়ার জন্যে ঘটকেরা যেমন পাত্তর খুঁজবে অমনি সেইসঙ্গে একটি ডাগর সুন্দর পাত্রীরও তল্লাস নেবে! মায়ার বিয়ের পর তোমারও বিয়ে অঘ্রাণ মাসে হয়ে যাবে।

গুণময় আহ্লাদে গদগদ হইয়া বাঁধানো দাঁত দুপাটি বিকশিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—তা…তা…গিন্নির এই অবস্থায় বিয়ে করাটা কি ভালো দেখাবে? লোকে কি বলবে?

পঞ্চানন জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—লোকে! কার ধড়ের ওপর দুটো মাথা আছে যে তোমায় কিছু বলবে? আর রাণীবৌ? তাঁর এমন অবস্থা বলেই ত তোমার বিয়ে করা বেশী করে দরকার! বংশ রাখতে হবে না? পিতৃ-পুরুষ এক গণ্ডূষ জলের জন্যে হাহাকার করছেন যে—জরৎকারু মুনির গল্প ত জানো।

গুণময় গোঁপ টানিতে টানিতে খুব গম্ভীর হইয়া বলিলেন—হাঁ তা তো জানি, সেইজন্যেই ত বিয়ে করবার এত আকিঞ্চন—আমার নিজের জন্যে কি? পিতৃপুরুষের পিণ্ডির জন্যে! ঐ বীরেনটা ত আমারই ছেলে হতে পারত, ওর মায়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তাকে অমন অপঘাতে মরতেই বা হত কেন। শুভ কার্য্যে হস্তারক হলে তার কখনো ভালো হয় না। তা ঘটকদের একটি পাত্রীরও খোঁজ করতে তা হলে বলে দিয়ো, কিন্তু খুব গোপনে। গিন্নির একটা ভালো মন্দ হয়ে গেলেই কাজটা সেরে ফেলা যাবে। কিন্তু দেখো ঘুণাক্ষরেও এখনি যেন কথাটা না ফাঁস হয়।

পঞ্চানন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আরে রামঃ! সে কথা আমাকে বলতে হবে কেন? আমি রটিয়ে দেবো মায়ার পাত্র খুঁজতে ঘটক লাগিয়েছি; তা হলে আর কেউ আন্দাজও পাবে না।

পঞ্চানন চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া গুণময় এদিক ওদিক চাহিয়া চাপা গলায় বলিলেন—মেয়েটি সুন্দর যত হোক না হোক যেন বেশ ডাগর হয়···এসেই যেন ঘরসংসার বুঝে নিতে পারে...

পঞ্চানন গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া গেল—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক ভায়া, ডাগরও হবে সুন্দরও হবে।

দয়াদেবী যখন শুনিলেন যে বীরেনের সহিত মায়ার বিবাহ দেওয়ায় বাবুর মত নাই এবং মায়ার বর খুঁজিতে অনেক ঘটক লাগানো হইয়াছে, তখন আর-একটি অভিলাষ সফল না হওয়ার দুঃখ তাঁহার রোগজীর্ণ বক্ষে দারুণ হইয়া বাজিল। তাঁহার রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল।

(৯)

পূজার ছুটির পর বীরেনের কলেজ খুলিয়াছে, এবার সে বি-এল পরীক্ষা দিবে, তাহার কলিকাতা না গেলেই নয়। বীরেন চলিয়া গেলে দয়াদেবীর কাছে-কাছে থাকিয়া সেবাযত্ন করিবার একজন লোক দরকার। দয়াদেবী মোহিনীকে দিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন—হোবপুরের মাসীকে আনিয়ে নিলে হয় না? তিনি অনেক দিন থেকে একবার আসতে চাচ্ছেন।

গুণময় বলিলেন—ঝঞ্ঝাট বাড়াবার দরকার নেই। ঝি-চাকর ত রয়েছে।

মোহিনী ফিরিয়া আসিয়া আবার বলিল—মা বললেন, তিনি ত শয্যাগত হয়ে পড়ে আছেন, আপনার খাওয়া-দাওয়া কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে পারেন না, হোবপুরের দিদিমা এলে আপনার খাওয়া-দাওয়া দেখতে পারেন।

গুণময় গম্ভীর হইয়া বলিলেন—আমার জন্যে গিন্নির ভাবতে হবে না, আমার ব্যবস্থা আমি শিগগির করে নেবো।

দয়াদেবী মোহিনীর মুখে স্বামীর উক্তি শুনিয়া ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া বালিশের তলা হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—আমার কাছে আবার লোকে সাহায্য চায়!

মায়া চিঠিখানি কুড়াইয়া লইয়া আপনার খেলাঘরে এই নূতন সম্পত্তিটি রাখিতে চলিল।

গুণময় সেই সময় বাড়ীর ভিতর খাইতে আসিতেছিলেন। গম্ভীর হইয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মায়া, তোর হাতে কি?

মায়া ভয়ে-ভয়ে বলিল—চিটি।

—দেখি।

মায়া আস্তে আস্তে গিয়া চিঠিখানি বাবার হাতে দিল। খাম হইতে বাহির করিয়া গুণময় যেই চিঠির উপর চোখ রাখিয়াছেন সেই অবকাশে মায়া সেখান হইতে পলায়ন করিল।

গুণময় চিঠি পড়িয়া দেখিলেন দয়াদেবীর হোবপুরের মাসী বয়স্থা কন্যা রাজবালার বিবাহ এখনো দিতে না পারিয়া বিব্রত হইয়া ধনীর গৃহিণী বোনঝির সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। যদি বোনঝি ও জামাইএর অনুমতি পান তিনি মেয়েটিকে লইয়া তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া একটি সুপাত্রের সন্ধান করিতে পারেন।

গুণময় দুবার চিঠিখানি পড়িয়া ভাঁজিয়া খামে ভরিয়া পকেটে রাখিলেন।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তক-পরিচয়।

পুত্র—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত। প্রকাশক ইউ রায় এণ্ড সন্স্ ১০০ গড়পার রোড কলিকাতা। ৫৫ পৃষ্ঠা, সচিত্র। ছয় আনা।

কাব্য পুরাণ হইতে কয়েকজন আদর্শ পুত্রের আখ্যায়িকা ও তাঁহাদের চরিত্র হইতে শিক্ষণীয় উপদেশ এই পুস্তিকায় বড় বড় সমাসবদ্ধ পদের ঘনঘটাচ্ছন্ন বর্ণনায় প্রকাশ করা হইয়াছে। সেরূপ বর্ণনার বিপদ এই যে তাল ঠিক রাখিতে না পারিলেই ভরাডুবি হয়। লেখক সংস্কৃতের কসরৎ বাংলায় খেলাইতে গিয়া কাণ্ড করিয়া বসিয়াছেন মন্দ না। দুটি উদাহরণ দিতেছি—"আপনার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ রাজা দশরথ বহু আর্ত্তবিলাপ এবং বিস্তর রোষ ভৎসনায়ও কৈকেয়ীকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া" ইত্যাদি (৩৪ পৃষ্ঠা), "তাই তিনি কল্পনার হিরণ্ময়ী রথে চড়িয়া" ইত্যাদি (৪৮ পৃষ্ঠা)। স্থিরপ্রতিজ্ঞ কৈকেয়ীর বিশেষণ ও হিরণ্ময়ী কল্পনার পরে বসিলেও রথের বিশেষণ, সে খেয়াল লেখক রাখিতে পারেন নাই। কথাবার্ত্তার সাদা কথায় রচনা করিলে লেখককে এসব ঝলাই ত পোহাইতে হয়ই না, অধিকন্ত

পাঠকদেরও "সাশ্রুলোচনে বাত্যালোড়িত সোর্ম্মিসাগরের ন্যায় শোকোদ্বেলিত চিত্তে ম্রিয়মাণ" হইতে হয় না। লেখক আমাদের কথায় নিরুৎসাহিত হইবেন না, - টেকষ্ট বুক কমিটি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের কাছে এইরূপ উৎকট রচনারই সমাদর হইয়া থাকে, প্রাণের আবেগে উৎসারিত মুখের সহজ কথা সেখানে অচল।

মালা—শ্রীসত্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী প্রণীত। মূল্য চার আনা।

মালঞ্চ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত মহাশয় ভূমিকা লিখিয়া জানাইয়াছেন যে লেখক বাঙালী নহেন, বঙ্গবাসী হইয়া বাঙালী হইয়া উঠিয়াছেন এবং তিনি বয়সে তরুণ। একজন হিন্দুস্থানী যুবক বাংলায় কতকগুলি পদ্য রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই এই পুস্তকের বিশেষত্ব।

পরাগ—শ্রীরমেশচন্দ্র বর্ম্মন প্রণীত। প্রকাশক বর্ম্মন এণ্ড কোং, সাধনা-কুটীর, বগুড়া। ৬৪ পৃষ্ঠা। ছয় আনা।

পদ্যের বই।

বিশ্বপ্রেম—শ্রীতারিণীশঙ্কর সিংহ। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, কলিকাতা। চার আনা। সচিত্র।

"অবতার পুরুষদিগের মধ্য দিয়া বিশ্বপ্রেম কিভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই প্রতিপাদ্য" এই পুস্তিকার। কটমট পদ্য লিখিয়া অস্পষ্টভাবে এই সংবাদগুলি-মাত্র দেওয়া হইয়াছে যে রামচন্দ্র বানর ও চণ্ডালের সঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণ গোপদের সঙ্গে মিত্রতা করেন; শাক্যসিংহ অহিংসা মন্ত্রের দ্বারা ও শঙ্কর অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রের দ্বারা বিশ্বমৈত্রী ঘোষণা করেন, যিশু মহম্মদ ও শ্রীচৈতন্য বিশ্বদুর্গতি মোচনে কিরূপ আত্মদান করিয়াছিলেন। পুস্তিকার শেষার্দ্ধে লেখকের অন্তরে প্রেরণা হইতে লিখিত কয়েকটি পদ্য আছে, তাহার প্রতিপাদ্য পূর্ব্বার্দ্ধের ঠিক উল্টা—অর্থাৎ জগতের সমস্ত কু। তাই তিনি বলিতেছেন—

"আমি মিশিব না তোমাদের সাথে,
কহিব না কথা পরাণ থাকিতে
সব প্রবঞ্চক সব প্রতারক
তোরা সকলেই বিশ্বাসঘাতক।"

মক্তব প্রাইমার—প্রথম ভাগ। খান সাহেব মৌলবী আবিদ আলী খাঁ প্রণীত এবং মোসলেম ভাণ্ডার মালদহ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় পয়সা।

"মুসলমান বালকবালিকাগণের পাঠার্থ মুসলমানী বাঙ্গালায় লিখিত" বর্ণপরিচয়ের বই। বাঙালী মুসলমানেরা বাংলা ভাষার সঙ্গে অধিক ফার্সী ও উর্দ্দু শব্দ মিশাইয়া থাকেন। সেইজন্য যে শিশুদেরও মস্তিষ্কে দুরূহ ফার্সী উর্দ্দু শব্দের বোঝা চাপাইয়া দিতে হইবে এমন জেদ সুবিবেচনার পরিচয় দায় না। "নামাজ পড়" "এক বধনা পানি আন" "সালাম কর" মুসলমান শিশুরা বোঝে, তারা জন্ম অবধি শোনে, এসব তাদের বইএ থাকা উচিত, কিন্তু "মা বাপের খেদমত গুজারী করিবে" "যাহারা ওয়ালদয়নকে আরামে রাখে দুনিয়ায় মান আর আকবতে সুখ হাসিল করে। রওয়ায়েৎ আছে মা-বাপের কদমের নীচে বেহেশ্‌ত্ রহিয়াছে। এই কথাটি সকল মাজহাবে দেখিতে পাওয়া যায়।" প্রভৃতি বাক্য মৌলবী ও মুন্সির বাড়ীর শিশুরাও কি বোঝে? যে কথা শিশুরা সর্ব্বদা বলে ও শোনে সেইসব শব্দই তাদের প্রথম পড়ার বইএ থাকা উচিত। বড় হইয়া উর্দ্দু ফার্সী পড়িতে পারে, কিন্তু শৈশবে মাতৃভাষা অর্থাৎ মায়ের মুখের কথাবার্ত্তাই পড়ানো উচিত। এ বইখানি সংস্কৃত বাংলা ও ফার্সীর খিচুড়ি হইয়াছে। "রুপী" "ধবলাগিরি" প্রভৃতি অশুদ্ধ শব্দ, ও ছাপার ভুল আছে। প্রবাদবাক্য সংগ্রহের মধ্যে সবগুলিই সুরুচিসঙ্গত নয়। "পায়খানা" শব্দটি না দেওয়াই উচিত ছিল। 'ঞ' অক্ষরের উচ্চারণ ইঁয়, সুতরাং 'ঝিঞে' লিখিলে পড়িতে হয় 'ঝিয়েঁ'; ঝিঙে লেখা উচিত ছিল। মোটের উপর বইখানি আমাদের ভালো লাগিল না। বইখানির দামও অত্যন্ত বেশী। রামানন্দ-বাবুর প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় দু পয়সায় ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চার পয়সায় পাওয়া যায়।

পড়াশুনা—শ্রীসুখলতা রাও প্রণীত। প্রকাশক উ রায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ডঃ ফুঃ ৮ অং। সচিত্র। দাম চার আনা।

অসংযুক্ত বর্ণপরিচয়ের বই। অনেকটা কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে নূতন ধরণে রচিত। দুচারটি অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ গঠন ও অক্ষর লেখার কৌশল শিক্ষা দিতে দিতে পাঠ অগ্রসর হইয়াছে। উ পর্য্যন্ত শিখিয়াই শিশুকে শেখানো হইল উ আর ই এই দুটা অক্ষরের ধ্বনি জুড়িলে আমরা উই শব্দ পাই, ঐ পর্য্যন্ত শিখিয়া এ আর ই জুড়িয়া এই পাই, ইত্যাদি ক্রমে ক্রমশ চলিয়া সব বর্ণমালা আয়ত্ত করিতে শিশুর শ্রান্তি বিরক্তি না হইবারই কথা। এই বইখানি শিশুর বর্ণপরিচয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী সুন্দর ও সুলিখিত হইয়াছে। বইখানি আগাগোড়া কথা বলার সহজ সরল ভাষায় রচিত হওয়াতে শিশুরা অনায়াসে শিক্ষার রস ও আনন্দ এবং শিক্ষিতব্য বিষয় বুঝিবার সুবিধা পাইবে। অনেক ছবি আছে।

মুদ্রারাক্ষস।

উপনিষদের উপাখ্যান, **নচিকেতা**—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভূমিকা লিখিয়াছেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। প্রকাশক আদি ব্রাহ্মসমাজ, ৫৫, আপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা। ৮৮ পৃ, মূল্য বার আনা।

কঠোপনিষদের যম ও নচিকেতার সংবাদ সুপ্রসিদ্ধ। এই রমণীয় আখ্যায়িকাকেই অবলম্বন করিয়া সেখানে অতি সুন্দরভাবে আত্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই আখ্যায়িকা ও আত্মতত্ত্ব যতদূর পারিয়াছেন সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া নচিকেতা নামে বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন। প্রমাণ পাইয়াছি অল্পজ্ঞ স্ত্রীলোকেরাও পাঠ করিয়া ইহার রস আস্বাদন করিতে পারিবেন। উপাখ্যান হিসাবে আমাদিগের ইহা বেশ ভাল লাগিয়াছে। অন্যান্য উপনিষদেরও আখ্যায়িকাগুলি এইরূপে প্রকাশ করিবেন বলিয়া গ্রন্থকার আশা দিয়াছেন। মলাট, কাগজ ও ছাপা ভাল। যম ও নচিকেতার একখানি সুন্দর ছবি দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

তীর্থভ্রমণ—পরলোকগত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী রচিত তাঁহার ভ্রমণের রোজনামচা। টীকা টিপ্পনী ও সবিস্তার মুখবন্ধ সহ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি-সম্পাদিত। প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। মূল্য সাধারণের পক্ষে দেড়টাকা; শাখাসভার সদস্যের পক্ষে পাঁচ সিকা, পরিষদের সদস্যের পক্ষে এক টাকা। বইখানি ৬৪৭ পৃষ্ঠা, ভূমিকা ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা।

এই পুস্তকের গুরুত্বের কারণ তিনটি—(১) লেখক যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কর্ণধার মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পিতামহ; (২) সন ১২৫৯ সালের মাঘ মাস হইতে ১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তৎকালের দুর্গম পথে আর্য্যাবর্ত্তের যেসব তীর্থক্ষেত্র পর্য্যটন করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ তিনি [illegible]

খাতার রোজকার-রোজ নিয়মিত লিখিয়া রাখিতেন; সুতরাং ইহাই বোধ হয় বাঙালীর প্রথম রোজনামচা, প্রথম পর্য্যটনকাহিনী; (৩) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই রোজনামচার ভাষার পরিচয় দিয়াছেন এই বলিয়া—"তাঁহার বাঙ্গালা, তৎকালে বিষয়ী লোকদের মধ্যে যে বাঙ্গালা চলিত, খাঁটী সেই বাঙ্গালা। খৃষ্টীয় উনিশ শতকের আরম্ভে তিন-রকম বাঙ্গালা চলিত, (ক) ভট্টাচার্য্যদিগের বাঙ্গালা, (খ) আদালতের বাঙ্গালা, ও (গ) বিষয়ী লোকদের বাঙ্গালা।" প্রথমটি সংস্কৃত-শব্দবহুল; দ্বিতীয়টি আরবী-পারশী-শব্দবহুল; তৃতীয়টিতে সকল ভাষার শব্দই কিছু কিছু থাকিত, "কিন্তু কিছুই অধিক পরিমাণে থাকিত না, কোন কড়া শব্দ থাকিত না, যাহা দেশে প্রচলিত, যাহা সকলে বুঝিতে পারিত, সেই শব্দই থাকিত। যদুনাথের বাঙ্গালা খাঁটী এই বাঙ্গালা।" স্বয়ং প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব বলিতেছেন—"তীর্থভ্রমণের ভাষা প্রকৃত প্রাণের ভাষা—হৃদয়ের অভিব্যক্তি, ইহা খাস পোষাকী ভাষা নহে, মনে মনে তর্জ্জমা করিয়া অপরের ভাব প্রকাশের চেষ্টা নহে, ভাবিয়া-চিন্তিয়া মাজিয়া-ঘসিয়া শব্দাড়ম্বর করিবার প্রয়োজন হয় নাই।" শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই পুস্তকের সহজ ভাষার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"সহজ বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর নিজ ভাব-ভঙ্গীতে কিছু লেখা ক্রমে দেখিতেছি, একটা পাপের মধ্যে দাঁড়াইতেছে।" পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রও এই পুস্তকের সহজ বাংলার প্রশংসা করিয়াছেন।

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্! আধুনিক কোনো কোনো লেখক সহজ চলতি ভাষায় রচনা করেন বলিয়া যাঁহারা কতবিধ কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন তাঁহারাও বলিতেছেন—"এ ভাষা সকলেরই পছন্দ হওয়া উচিত।" ইহার তলায় পুস্তকের গুরুত্বের প্রথম কারণটি স্পষ্ট বিদ্যমান! যে কারণেই হোক সহজ বাংলা যে সমাদৃত হইয়া আদর্শ রচনার রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে আমরা আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইয়াছি। এই হিসাবেও অন্তত এই বইখানির প্রচার আবশ্যক ছিল এবং প্রচারের দ্বারা উপকার হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহারা এই পুস্তকের সহজ চলতি ভাষার মাহাত্ম্য বর্ণনায় লালায়িত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই কেহ কেহ ইহার পরে চলতি ভাষাকে উপহাস ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া প্রবন্ধ ছাপাইতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

এই গ্রন্থের ভাষা বাস্তবিকই সে সময়ের হিসাবে বেশ ভালোই বলিতে হইবে। রচনার পদ্ধতিও উৎকৃষ্ট—ছোট ছোট পদরচনায় বর্ণনা একেবারে অন্তরে গিয়া ছবি ফুটাইয়া তুলে। "এই গ্রন্থখানি কেবল তীর্থপরিচয় নহে, এই তীর্থভ্রমণে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুসমাজের চিত্র আছে; ৭০ বৎসর পূর্ব্বে যখন রেলপথ হয় নাই, যখন ইংরাজী-শিক্ষা এরূপ প্রসারিত হয় নাই, তৎকালে হিন্দুগণ কিরূপ ধর্ম্মপ্রাণ, দেব-দ্বিজভক্ত, সর্ব্বত্যাগী, কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, সৎসাহস ও সত্যপ্রিয় ছিলেন, এই তীর্থভ্রমণ হইতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।"—প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণবের এই উক্তি এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের উক্তি "যে-খোদকারিতে ভাষার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, সে খোদকারি এ গ্রন্থে নাই বলিলেই হয়। আছে গ্রন্থকারের পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টির পরিচয়।"—যথার্থ বটে। আর্য্যাবর্ত্তের ছোটবড় বহু তীর্থ ও গ্রাম নগরের বর্ণনা এই পুস্তকে আছে। তবে এই পুস্তক লইয়া যতবড় হৈচৈ করা হইয়াছে ততদূর করিবার মত ইহাতে বেশী কিছু নাই; হৈচৈ করার কারণ সেই এক, যে, গ্রন্থকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইসচ্যানসেলারের পিতামহ।

এই পুস্তকখানি তিন কারণে সমাদর লাভের যোগ্য—(১) ৯০ বৎসর আগেকার তীর্থপর্য্যটকের রোজনামচা সেকালের প্রায় [illegible] চলতি ভাষায় লেখা, (২) ইহাতে সেকালের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর ছবি ও আভাস আছে, এবং (৩) ইহা পাঠ করিলে আর্য্যাবর্ত্তের বহু দেশ নগর গ্রাম পথ ও তীর্থক্ষেত্রের বর্ণনায় তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ভূমিকায় গ্রন্থে-বর্ণিত স্থানের তালিকা দিয়া ও মাঝে মাঝে বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকা অনাবশ্যক-রকমে দীর্ঘ করিয়া তুলিয়াছেন। পরিশিষ্টে বহু বিষয়ের বিবরণ ও নামসূচী দেওয়াতে পুস্তকপাঠের সুবিধা হইয়াছে।

এই পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যয় বহন করিয়াছেন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্। কেন? তাহারও কারণ সেই এক,—ইহা ভাইস-চ্যানসেলারের পিতামহের রচনা। যাঁহার পৌত্রগণ প্রচুর ধনী ও কৃতী যশস্বী, তাঁহারা কেন পিতামহের রচনা প্রকাশের জন্য পরের দ্বারস্থ হইয়া সাধারণের অর্থ ব্যয়ের কারণ হইলেন বুঝিতে পারিতেছি না। ভূমিকার মধ্যে জানানো হইয়াছে যে সাহিত্য-পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি ও গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয়েরা খাতার মধ্যে অমন অমূল্য নিধি আবদ্ধ থাকিতে দেখিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহু অনুরোধে উহা প্রকাশের অধিকার লাভ করেন। ইহা কি তাঁহাদের দায়িত্ব-সঙ্গত কাজ হইয়াছে? সাহিত্য-পরিষদের টাকায় এই পুস্তক প্রকাশ না করিলে বঙ্গভাষা কি দীনা হইয়া থাকিত? ইহা নির্জ্জলা তেলা মাথায় তেল ঢালা, তার অপেক্ষা রূঢ় কথা না হয় নাই বলিলাম।

শ্রীবাস্তব শর্ম্মা।

নারীরত্ন—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত ও ২১৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, কালীমোহন বুকষ্টল হইতে কে, এম, সোম কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২০৮ পৃঃ। লাল টকটকে কাপড়ের বাঁধাই, রূপার জলে নাম লেখা, মূল্য দেড় টাকা।

বইখানিকে গ্রন্থকার নিজে "অভিনব সচিত্র সামাজিক উপন্যাস বা বঙ্গসমাজের আধুনিক চিত্র" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্বেও বইখানি আর যাই হোক উপন্যাস যে হয় নাই ইহা নিশ্চিত। তবে এ-কথা বেশ বোঝা যায় গ্রন্থকার সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন।

নর্ম্মদার পিতা কন্যাকে কলেজের উচ্চশিক্ষা দিয়াছেন। তিনি শিক্ষিত ধনী উদারমতাবলম্বী, ব্রাহ্মণকুলে তাঁর জন্ম। অপরেশ উচ্চ-শিক্ষিত, সুপুরুষ, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত। শৈশব হইতেই অপরেশ ও নর্ম্মদা পরিচিত এবং যৌবন-সমাগমে উভয়ে উভয়ের প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়িল। অপরেশের সঙ্গে কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মমতে দিতে কর্ত্তা ইচ্ছুক হইলেও গৃহিণী একেবারে নারাজ, কারণ অপরেশ কায়স্থ। অবশেষে অশিক্ষিতা গৃহিণীরই জয় হইল; এক ওকালতি-পাশ-করা কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে নর্ম্মদার বিবাহের সব ঠিকঠাক হইল, অবশ্য এম-এ-পাশ-করা নর্ম্মদার অমতে; এবং উপন্যাসের পরিসমাপ্তি হইল বিবাহের রাত্রে অহিফেন সেবনে নর্ম্মদার আত্মহত্যায়। ইহাই পুস্তকের অন্তর্গত মূল-কাহিনী।

আমাদের অধিকাংশ মেয়েকে আমরা যেরূপ অক্ষম ও অশিক্ষিত করিয়া রাখি তাহাতে অত্যাচারের হাত এড়াইবার জন্য তাহাদের বিষ ভক্ষণে, উদ্বন্ধনে বা কেরোসিনসিক্ত বসনে অগ্নিসংযোগে আত্মহত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অত্যাচার যে করে এবং অত্যাচার যে সহে উভয়েই পাপই করে। তবে অত্যাচারের হাত এড়াইবার জন্য মরিয়া যাওয়ার চেয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকাতে ঢের বেশী কৃতিত্ব; এবং উপায় থাকিলে সকলের তাহাই করা উচিত। নর্ম্মদা এম-এ, পাশ করিয়াছিল। সে স্বচ্ছন্দে এবং সম্মানের সহিত আপনার জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিত। সে

কেন অত্যাচারী পিতামাতার সকল সংশ্রব ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া তাহার প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইল না সে-কথা বোঝা গেল না। অবশ্য সে যে, যাহাকে ভালোবাসিয়াছিল তাহাকে ছাড়া আর কাহারও হাতে আপনাকে সমর্পণ করিল না এটা খুব বড় কথা। কিন্তু তাহার মরিবার কী প্রয়োজন ছিল?

তারপর গুণেন্দ্র ও শৈলবালার পরিণয়-কাহিনী অত্যন্ত উদ্ভট ও অসম্ভব রকমের হইয়াছে।

ভবিষ্যতে উপন্যাস-রচনার সময় গ্রন্থকারের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য বর্ণনাবাহুল্যে পুস্তকের পাতা ভরে বটে কিন্তু বক্তব্য মোটেই জমে না।

আলোচ্য পুস্তকের ছাপা কাগজ বাঁধাই ভালো। চারখানি ছবিও আছে, তবে সেগুলি না ছাপিলেই ভালো হইত, এমনি কদর্য্য।

ছিন্ন-হার—শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও ৭৮-২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা, অন্নদা বুকষ্টল হইতে শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কাপড়ের মলাট, ২১০ পৃষ্ঠা। ছাপা কাগজ মন্দ নয়।

এই পুস্তকে নয়টি গল্প আছে। ভাষা সংস্কৃত-ঘেঁসা হইলেও চলনসই। গল্পগুলিতে প্রশংসাযোগ্য কিছুই নাই। কয়েকটি গল্পের শেষ এইরূপ—"মাসখানেকের পরে গ্রামের লোক সেই নদীতটে স্নান করিতে আসিয়া দেখিল যে—একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভের গায়ে বড়-বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—'বিসর্জ্জন'।" গল্পের পরিসমাপ্তি এক-একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভে কেন হইল তাহার তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। তবে গ্রন্থকার পুস্তকের আরম্ভেই স্বীকার করিয়াছেন—"ভাল হউক বা মন্দ হউক গ্রন্থ প্রকাশ করা যাহাদের সখ, আমিও অবশ্য সেই শ্রেণীর মধ্যে।"

প্রতিবেশিনী

(H. Carey)

(১)

যতগুলি আমি কিশোরীরে জানি
তার মত কেবা সুন্দরী?
মোদেরি পাড়ায় বাস করে সে যে
আমারি পরাণ মন হরি'।
ধনীর প্রাসাদে এত যে রূপসী
তার মত বল কোন্ জনা?
বুকে নিশি দিন বাজাইয়া বীণ
ফিরিতেছে সে যে গুঞ্জরি।

(২)

পথে পথে ফেরি করি তার বাপ
পালে গুটি-পাঁচ সন্তানে,
কাপড় রঙায়ে বেচে তার মাতা
পাড়ার লোকের ধান ভানে,
তারা হেন মেয়ে কেমনে লভিল
বিশ্বেরে করি বঞ্চনা,
ঐ রূপসীরে কত ভালবাসি
শুধু তাহা মোর প্রাণ জানে।

(৩)

ভুলে যাই কাজ আশে-পাশে মোর
ঘুরে ফিরে যবে প্রাণ-মণি,
মনিব আসিয়া গালি দিয়া বলে
"দূর হয়ে যা রে এক্ষনি"।
দেয় দেবে মোরে দূর করে,
আর করুক যতই লাঞ্ছনা,
প্রিয়ারে আমার নারি ছাড়িবারে
এত দুখে নাহি দুখ গণি।

(৪)

মনিব আমারে পাঠালে বাজারে
প্রিয়া-পাশে যাই টুক করি,
ভিন গাঁয়ে মোরে পাঠাতে চাহিলে
ব্যারামের মত মুখ করি।
তামাক টানিতে টানিতে যদিবা
হ'ন তিনি কভু আনমনা,
প্রিয়ার গৃহের জানালায় গিয়ে
হেরি তারে আসি বুক ভরি।

(৫)

ধুতীর বদলে শাড়ী নিব আমি
ভেবেছি এবার আশ্বিনে,
যাহা কিছু পাই সকলি জমাই,
দিব তারে আমি দুল কিনে,
হাজার টাকাও পেলেও কোথাও
তার কাছ ছাড়া রাখব না,
জীবন-অধিক সে যে মোর প্রিয়া,—
কাহারো কথায় ভুলছিনে।

(৬)

দিনগুলো যেন লম্বা বেজায়
রাতগুলো আরো কই চলে?
এই ফাগুনের পরের ফা-গু-ন!
যুগ ভাবি আমি এক পলে।
পাড়ার লোকেরা করে উপহাস
মাঝে মাঝে দেয় গঞ্জনা,
তারা ত জানে না তারে সাথে পেলে
যেতে পারি বন জঙ্গলে।

শ্রীকালিদাস রায়।



মা।

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের [illegible]

U. RAY & SONS, CALCUTTA

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩২৪ | ৫ম সংখ্যা

পশ্চিমে ও পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের আদান প্রদান *

ব্রাহ্মসমাজের দিক্ হইতে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য এই যে আয়োজন হইয়াছে, ইহা যে কেবল অতীব সঙ্গত হইয়াছে এমন নহে, কিন্তু সার্থকও হইয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের যে সম্মিলন স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মসমাজ এদেশে আবির্ভূত হইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমযাত্রায় সেই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের পরস্পরের আদান-প্রদানের কার্য্য তাঁহার ভিতর দিয়া কি ভাবে সাধিত হইয়াছে, তাহা এই উপলক্ষ্যে আমরা দেখিবার সুযোগ পাইতেছি।

এইবারের পূর্ব্ববারে যখন রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে গিয়াছিলেন, তখন—তাঁহার ভাষাতেই বলি—তিনি "তীর্থযাত্রী"র মত গিয়াছিলেন এবং সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন "গীতাঞ্জলি" এবং গীতাঞ্জলি বলিতে যে বস্তু বুঝায়। ভগবানের সহিত আত্মার লীলার যে একটি দিক্ আছে, প্রকৃতিতে, জীবনে এবং সামাজিক নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া যে লীলার বিচিত্র প্রকাশ এবং যে লীলাতত্ত্ব ভারতবর্ষের অনেক কালের সাধনার ফল,—সেবারে সেই বস্তুটিকে তিনি "গীতাঞ্জলি"র ভিতর দিয়া পশ্চিমে লইয়া গেলেন। ইউরোপের সমস্যা-প্রপীড়িত, ব্যস্ততাসঙ্কুল ব্যক্তি জীবনে যে শান্তিরসের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, তিনি সেখানে তাহারি উৎস উৎসারিত করিয়া দিলেন। কিন্তু সেখান হইতে তিনি লইয়া আসিলেন কি? সেখান হইতে তিনি লইয়া আসিলেন একটা বড় অশান্তি, একটা ঝঞ্ঝাবাত, একটা storm and stress (strürm und drang), যাহা আজ প্রাচ্যে ব্যক্তিজীবনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। যে-সকল অর্থহীন সামাজিক নিগড় ব্যক্তিকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত করিয়া বিশ্বমানবের দিকে তাহার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করিতেছে, সতেজে সংগ্রাম করিয়া সে সমস্ত ভাঙিয়া-চুরিয়া ব্যক্তিকে মুক্তির পথে বাহির হইতে হইবে; সেই উন্মুক্ত মার্গের সন্দেশ তিনি সমুদ্র-পথে বহিয়া আনিয়াছেন। এ ভাব পূর্ব্বে তাঁহার রচনায় সৌন্দর্য্যানুভূতি ও রসানুভূতির দিক্ দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল বটে। কিন্তু সম্প্রতি, যে-ক্ষেত্রে ব্যক্তির সহিত সমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেই ক্ষেত্রে এই ভাবটিকে অবতরণ করাইয়া এবং তাহাকে রক্তমাংসে সজীব করিয়া, জীবনের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া, আমাদের সম্মুখে তিনি উপস্থিত করিয়াছেন। পূর্ব্বের সহিত বর্ত্তমানের এইখানে পার্থক্য।

তারপরে এবার যে তিনি জাপানে ও আমেরিকায় গেলেন, এবারেও তিনি, ভারতবর্ষ হইতে পশ্চিমের জন্য

* [illegible] ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের [illegible] রামমোহন রায় লাইব্রেরী হলে পঠিত।

একটা বড় message লইয়া গেলেন। পশ্চিম মহাদেশে সমাজের যত কিছু সমস্যা জমিয়া উঠিয়াছে, যথা Capital and Labour problem (ধন ও শ্রম সমস্যা), State and Individual problem (রাষ্ট্র ও ব্যক্তি সমস্যা), International problem (আন্তর্জাতিক সমস্যা), ইত্যাদি—সে-সমস্ত সমস্যা ঘনীভূত রূপ (concentrated form) লাভ করিয়াছে তাঁহার এবারকার বাণীটিতে।—যে-সকল প্রচণ্ড সমস্যার আঘাতে ইউরোপীয় সমাজ আজ একেবারে বিধ্বস্ত ও অশান্তিময় হইয়া পড়িয়াছে, ভারতবর্ষের সাধন, জীবন ও কাল্‌চারের আদর্শ হইতে তাহার জন্য তিনি শান্তিবাণী লইয়া গেলেন। Cult of Nationalism-প্রবন্ধে সর্ব্বাবরণমুক্ত মানবের যে vision বা আদর্শ তিনি ইউরোপের সম্মুখে ধরিয়াছেন, আমি তাহারই কথা বলিতেছি। অবশ্য ন্যাশন্যালিজ্‌মের যে একটা বড় দিক্ আছে, তাহা পূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তিনি তাঁহার বহু রচনায় সুন্দর রূপেই দেখাইয়াছিলেন। প্রতি নেশনের যে একটা বিশিষ্ট ছবি ও ছাঁদ আছে তাহা তিনি খুবই মানেন, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া ও ন্যাশন্যালিজ্‌মের নানা আধুনিক বিকৃতি দেখিয়া তিনি বোধ হয় ব্যক্তিত্বের দিকে বেশী ঝোঁক দিয়াছেন এবং ইহা একরূপ স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি বোধ হয় ন্যাশন্যালিজ্‌মের ন্যায্য স্থান ও অধিকার অস্বীকার করিবেন না—কেননা মানব-ইতিহাসের ধারা একটা বিরাট ভ্রম নহে। তবে ন্যাশন্যালিজ্‌মের যে দিক্‌টা commercialism (বণিকবৃত্তি), militarism (সৈনিক-বৃত্তি) প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তিকে মারিয়া বৃদ্ধি লাভ করিতেছে, সেই ন্যাশন্যালিজ্‌ম্-ব্যাধির ঔষধ কি তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। দুই দিক্ হইতে ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিবার উপায় তিনি বিবৃত করিয়াছেন:—(১) ব্যক্তির যে ব্যক্তি-হিসাবে একটা অসীম মূল্য আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে, (২) Nationalism যদি Internationalism বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইতে যায় তবে উহার বিশ্বমূল্য (cosmic value) নির্দ্ধারণ ও নিরূপণ করিতে হইবে।

সেবার "গীতাঞ্জলি"তে তিনি ওধারকার ব্যক্তিগত জীবনের unrest বা অশান্তি নিবারণার্থে এক শান্তিমন্ত্র লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি গাহিলেন ভগবানের সহিত আত্মার লীলাতেই সেই শান্তি। আর এবার ওধারকার সামাজিক জীবনের unrest বা অশান্তি নিবারণার্থে ভারতবর্ষের চিরসাধিত শান্তি ও মৈত্রীর রহস্য উদ্ঘাটিত করিলেন। সেবার ব্যক্তির নিত্য-সহচর ভগবানকে দেখাইলেন আর এবার সমাজ-জীবনের নিত্যসহচর The Eternal Individual বা চিরন্তন ব্যক্তির মহিমা ঘোষণা করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এবার কি লইয়া গেলেন তাহা দেখিলাম, কিন্তু তিনি লইয়া আসিলেন কি? পূর্ব্ব ও পশ্চিমের পরস্পরের এক আদানপ্রদান তাঁহার এই পশ্চিম-যাত্রাগুলির ভিতর দিয়া আমরা দেখিতেছি, সেইজন্য এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদয় হয়। এবার জাপান ও আমেরিকা এই দুইটা নূতন সভ্যতার সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন। সুতরাং এখনও পর্য্যন্ত তিনি কি লইয়া আসিয়াছেন তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি না বটে, কিন্তু তবু যাহা আশা করিতেছি তাহা বলিতে পারি। শিল্পরসিক জাপান হইতে তাহার সৌন্দর্য্য-বোধ, তাহার rhythm বা ছন্দের সূক্ষ্ম উপলব্ধি প্রভৃতির দ্বারা আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মধ্যে যে-সকল দৈন্য ও কুশ্রীতা আছে তাহাদিগকে কিরূপে সুষমাময় ও সৌষ্ঠব-পূর্ণ করা যায়, ইহা রবীন্দ্রনাথ নানা দিক্ হইতে এবারে দেখাইতে পারিবেন এইরূপ আশা করিতে পারি। কিরূপে জাপানের সেই সরল ও নিরলঙ্কার সৌন্দর্য্যের ভাব আকাশ-বাতাসের মত আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ব্যাপারে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকিবে, তাহাও তিনি দেখাইবেন এই আশা করিয়া রহিলাম।

তারপর আমাদের এই বহুকালের প্রাচীন সমাজের নানাপ্রকার জীর্ণ অবস্থার মধ্যে একটা নবযৌবন নবপ্রাণের সঞ্চার কি ভাবে হইতে পারে, নবীন আমেরিকা হইতে সেই বার্ত্তা তিনি আনিয়াছেন। প্রাণের বেগে ক্রমাগতই সম্মুখের দিকে চলা—আমেরিকার কবি হুইট্‌ম্যান যে Forward Marchএর গান গাহিয়াছেন—আমাদের এই প্রাচীন সমাজের মধ্যে সেই নূতন জীবনের বিজয়যাত্রার

আনন্দকে তিনি উদ্বোধিত করিয়া দিবেন, এইরূপ আশা করিতেছি।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমের পরস্পরের এই আদানপ্রদানের দ্বারা কি সাব্যস্ত হইতেছে? ইহাই সাব্যস্ত হইতেছে যে পশ্চিমের সামাজিক আদর্শের ভিতর যাহা উদার ও উন্নত তাহার সহিত পূর্ব্বদেশীয় হিন্দুর সামাজিক আদর্শের reconciliation বা সৌসামঞ্জস্যের স্থান আছে। Rituals (পদ্ধতি) symbols (প্রতীক) ceremonials (অনুষ্ঠান) myths (পুরাণ) প্রভৃতি ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে বরাবর একটা বিশাল মুক্তির ভাব আছে—হিন্দু সভ্যতার তাহা এক আশ্চর্য্য বিশেষত্ব। সেই মুক্তি তত্ত্বে ও মুক্তি সাধনায় সাম্য-বৈষম্য, সসীম অসীম, ভোগ ও ত্যাগের এক মহা-সম্মিলন, এক মহাশ্চর্য্য সমাধান দেখিতে পাই। হিন্দুধর্ম্ম কেবলি কর্ম্মকাণ্ড নহে, কেবলি rituals (পদ্ধতি) symbols (প্রতীক) প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন ও ভাবাক্রান্ত নহে। এই ভারতবর্ষে নানাজাতির ও ধর্ম্মমতের বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া এই এক বিশাল মুক্তির আদর্শ হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই আদর্শ বিশ্বজগৎকে দান করা সম্বন্ধে হিন্দুর গুরুতর দায়িত্ব আছে। যুগে-যুগে হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাসে এই আদর্শই নানাভাবে প্রচারিত হইয়াছে, এবং রাজা রামমোহন রায় তাহারি বার্ত্তা বহন করিয়া এই যুগে আসিয়াছিলেন। Symbols (প্রতীক) rituals (পদ্ধতি) প্রভৃতির বন্ধন হইতে সেই বিশাল মুক্তির তত্ত্বকে মুক্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে প্রদান করিতেছেন এবং ইউরোপের সর্ব্বোচ্চ মুক্তির আদর্শের সহিত তাহার সৌসামঞ্জস্য দেখাইতেছেন।

এই উভয় মুক্তির আদর্শের এক মহাসম্মিলন-ক্ষেত্র প্রস্তুত করা,—ইহাই তো ব্রাহ্মসমাজের চিরকালের কার্য্য। সেই মহাসম্মিলনের বার্ত্তা যিনি পশ্চিমে লইয়া গিয়াছেন, আজ যে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন, ইহা ব্রাহ্মসমাজেরই পক্ষে আনন্দ ও গৌরবের বিষয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

সাহিত্যের পুরাতন ও নূতন ধারা

পৃথিবীর সকল সাহিত্যেই আদিকাল হইতে বহু শতাব্দী ধরিয়া অভিজাত-সম্প্রদায়ের নায়ক-নায়িকা কাব্য-নাটক, কথা কাহিনীর কেন্দ্রস্থানীয় হইয়া আসিতেছেন; উচ্চবংশীয় ব্যক্তিদিগের বীরত্ব কাহিনী বা প্রেম কাহিনী, তাঁহাদের সুখদুঃখের কথা, উন্নতি অবনতির কথা, দশাবিপর্য্যয়ের কথা, সাহিত্যের উপজীব্য হইয়া আসিতেছে। প্রথমে, আমাদের প্রাচীন ভাষার (সংস্কৃতভাষার) সাহিত্যের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করি। দর্পণকার মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

> সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ।
> সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ॥
> একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা। ইত্যাদি।

রামায়ণ মহাভারতে (ইংরেজী মতে এগুলি Epic বা মহাকাব্য), এবং রঘুবংশ কুমারসম্ভব কিরাতার্জ্জুনীয় শিশুপালবধ নৈষধচরিতে (ইংরেজী মতে এগুলি Court Epic বা Artificial Epic)—নায়ক হয় সাক্ষাৎ দেবতা (যথা কুমারসম্ভবে), না হয় দেবাবতার (যথা শিশুপালবধে), না হয় ক্ষত্রিয় বীর বা রাজা (যথা কিরাতার্জ্জুনীয় ও নৈষধ-চরিতে), অথবা একটি রাজবংশের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত মহাকাব্যে বর্ণিত (যথা রঘুবংশে), রামায়ণ মহাভারতের বৃত্তান্তও কতকটা শেষোক্ত প্রকৃতির। পুরাণাদিতেও বহু রাজার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। নাটকের লক্ষণ-নির্দ্দেশে দর্পণকার বলিয়াছেন,—

> প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষি ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান।
> দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ॥

অভিজ্ঞান শকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, রত্নাবলী, রামচরিত, উত্তরচরিত প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। আবার কথা ও আখ্যায়িকার বেলায়ও দেখা যায়, রাজা বা রাজপুত্র এগুলির নায়ক, কাদম্বরী, বাসবদত্তা, হর্ষচরিত, দশকুমারচরিত ইহার দৃষ্টান্ত। বেতাল পঞ্চবিংশতি, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা রাজ-চক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য বা ভোজরাজকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত। এমন কি, পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশও রাজপুত্রদিগের নীতিশিক্ষার জন্য প্রণীত হইয়াছিল, গ্রন্থকার এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

পালি সাহিত্যের সংবাদ সবিশেষ রাখি না, কিন্তু সেখানেও জাতকগুলির কেন্দ্র ভগবান্ তথাগত বুদ্ধ। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও রাজা, রাজপুত্র, ধনী বণিক্ (যথা ধনপতি, শ্রীমন্ত, চাঁদসদাগর) প্রভৃতি মহাকাব্যের নায়ক। তবে রূপকথায় রাজার পুত্র, মন্ত্রীর পুত্র, সদাগরপুত্রের সঙ্গে সঙ্গে কোটালের পুত্রেরও দর্শন পাওয়া যায়। কোন কোন মহাকাব্যে নীচজাতীয় ব্যক্তি নায়ক বটে, কিন্তু সে লোক দেবতার কৃপায় উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছে; কবির উদ্দেশ্য দেব-মাহাত্ম্য-প্রকটন (যথা চণ্ডীতে কালকেতু ব্যাধ)। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাখাল-বালক ও গোপবালার সখ্য ও প্রেমের কথা আছে বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে প্যারী রাজার নন্দিনী ও শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজের (পালিত) পুত্র (এবং ভগবানের অবতার)।

ইংরেজী সাহিত্যে, এবং ইংরেজী সাহিত্যের মারফত আমরা ইউরোপীয় যে-সব প্রাচীন ও আধুনিক ভাষার সাহিত্যের সংবাদ পাই, সে-সকল সাহিত্যেও এই পুরাতন ধারাই দেখা যায়। ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস-ভবভূতি, ভারবি-মাঘ-শ্রীহর্ষ, দণ্ডি-সুবন্ধু-বাণভট্ট সম্বন্ধে যে-কথা, হোমার-ভার্জ্জিল, ইস্কিলস্-সফোক্লীস্-ইউরিপিডিস্, এরিয়স্টো-ট্যাসো-বোজার্ডো, ক্যাল্ডিরন-ক্যামইন্‌স্ প্রভৃতি গ্রীক, ল্যাটিন, ইতালীয়, স্প্যানিশ, পর্ত্তুগীজ ভাষার সাহিত্যের কবিগণ সম্বন্ধেও সেই কথা। দান্তের মহাকাব্য অন্যান্য মহাকাব্য হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত, কিন্তু উহাতেও বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অভিজাত-শ্রেণীর লোকের পাপ-পুণ্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রেষ্ঠ ইংরেজ-কবি শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকেও এই ধারা বজায় আছে। এই-সব নাটকে রাজা, রাজপুত্র, সেনাপতি এবং অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তি নায়কের স্থান অধিকার করিয়া আছেন। মিল্‌টন দেবাসুর-যুদ্ধের ও আদিম-মানবদম্পতীর অথবা ঈশ্বরাবতারের অথবা য়িহুদী বীর স্যাম্‌সনের বৃত্তান্ত-বর্ণনে ব্যাপৃত। স্পেন্‌সারের কাব্যের সর্গে সর্গে বর্ণিত বীরগণ (Knights) হয়ত অজ্ঞাতকুলশীল বা হীন-কুলোৎপন্ন, কিন্তু তাঁহারা নিজ শৌর্য্য ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণে অভিজাত-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই আমাদের কবির কথায় বলিতে পারেন, 'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষম্।'

ফলতঃ, উচ্চবংশীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের কীর্ত্তিকলাপ, কার্য্যাবলি, জীবনকাহিনী, সুখদুঃখ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, সকল দেশেই বহুকাল ধরিয়া কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। দরিদ্রের জীবন-কথা, সুখদুঃখের আশানৈরাশ্যের কাহিনী, অথবা তাহাদের মহত্ত্ব-দেবত্বের চিত্র, বহুকাল ধরিয়া কাব্যে স্থান পায় নাই; তাহারা যেন কাব্যজগতের বাহিরে, সাহিত্যক্ষেত্রের পতিত জমি। নায়কনায়িকার সহচর-সহচরী, বয়স্য বা সখী, ভৃত্য বা দাসী-ভাবে এই-সব প্রাকৃতজনের সামান্য একটু উল্লেখ থাকিতে পারে, প্রতিমার সম্পূর্ণতার জন্য প্রতিমার আশে-পাশে তাহাদের সামান্য একটু স্থান হইতে পারে, তাহারা অনুগত ভক্ত বিশ্বস্ত অনুজীবী বলিয়া কবির প্রশংসাভাজন হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের নিজের স্বতন্ত্র ইতিহাস, সুখ-দুঃখের কথা, আশা-নৈরাশ্যের কথা, বিরহ-মিলনের কথা, সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভের কথা, মহত্ত্ব-দেবত্বের কথা * কাব্যের বিষয়ীভূত নহে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—তাহারা কাব্যের উপেক্ষিত। তাহাদিগকে প্রাধান্য দিলে কাব্যে রসভঙ্গ হয়, কবিকল্পিত সুন্দর জগৎ কুৎসিত হইয়া পড়ে, কবিত্বের ইন্দ্রজাল টুটিয়া যায়,—পুরাতন ধারার কবি ও আলঙ্কারিকগণের যেন ইহাই ধারণা। রসজ্ঞমণ্ডলী হয়ত বলিবেন,—উচ্চবংশীয় নায়কনায়িকার বৃত্তান্তবর্ণনে চমৎকারিত্ব-মনোহারিত্ব আছে, ইহাতে রস যেরূপ ঘনীভূত হয়, হৃদয় যেরূপ দ্রবীভূত হয়, ভাব যেরূপ গভীর হইয়া মানসপটে মুদ্রিত হয়, সাধারণ লোকের বৃত্তান্তবর্ণনে সেরূপ হয় না।

বিখ্যাত বিলাতী সমালোচক ব্র্যাড্‌লি (Bradley) 'ট্র্যাজেডি'র স্বরূপবিচার-প্রসঙ্গে অনেকটা এই ধরণের কথাই বলিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, অভিজাত-শ্রেণীর নায়কের দশাবিপর্য্যয়ে শোককাব্য যেরূপ জমাট বাঁধে, পার্থিব বিভবের অনিত্যতা, অদৃষ্টের পরিহাস, নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ, ইত্যাদি দর্শনে হৃদয় যেরূপ আলোড়িত হয়, নিম্নশ্রেণীর লোকের দুঃখ-দৈন্য-নৈরাশ্যের কাহিনীতে সেরূপ হইতে পারে না। তিনি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শেক্‌স্‌পীয়ারের King Lear ও

* মৃচ্ছকটিকে শর্বিলকের বৃত্তান্তে একটু রকমফের দেখা যায়।

টুর্গেনিভের 'A King Lear of the Steppes' এতদুভয়ের তুলনা করিয়া কথাটা সমঝাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। উক্ত সমালোচক ইচ্ছা করিলে শেক্‌স্‌পীয়ারের 'King Lear'এর সঙ্গে ব্যালজ্যাকের 'Pere Goriot'র তুলনার কথাও তুলিতে পারিতেন। তাঁহার প্রদত্ত বৈদেশিক দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিয়া আমরা আমাদের দেশের সুবিদিত দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা পরিস্ফুট করিতে পারি। উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অদৃষ্ট-বিড়ম্বনায় অধোনীত হইলেন (ইংরেজ কবির ভাষায় 'fallen, fallen, fallen, fallen from his high estate'), রাজা হরিশ্চন্দ্র বা শ্রীবৎস বা নল বা যুধিষ্ঠির রাজ্যভ্রষ্ট ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইলেন, রাজার নন্দন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ জটাচীর ধারণ করিয়া বনবাসী হইলেন, রাজার নন্দিনী রাজার মহিষী দময়ন্তী বস্ত্রার্দ্ধে লজ্জানিবারণ করিয়া পলায়িত পতির জন্য বিলাপ করিতেছেন, রাজার নন্দিনী রাজবধূ সীতাদেবী বন্দীদশায় চেড়ী কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা হইতেছেন, রাজমহিষী শৈব্যা পুত্রশোক-কাতরা এবং পুত্রের শবদাহের জন্য যৎসামান্য অর্থ-সংগ্রহে অসমর্থা, এ-সকল নিদারুণ বৃত্তান্ত শ্রবণে শোকে দুঃখে করুণায় সমবেদনায় কাহার না হৃদয় বিগলিত হয়, কাহার না চক্ষুঃ অশ্রুজলে পূর্ণ হয় ?

কাব্যের দিক্ হইতে, রসসঞ্চারের দিক্ হইতে, কথাটা সমীচীন বটে। কিন্তু সাহিত্যের এই exclusiveness বা একপেশে পক্ষপাতিত্বের মূলে প্রকৃত-পক্ষে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কারণ বর্ত্তমান ছিল। সে কারণটি সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক্ হইতে লক্ষ্য করিতে হইবে।

মানুষের এমন একদিন ছিল যখন যুদ্ধই সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা ছিল; দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর (clan) অধিনায়ক, রক্ষক, নিয়ামক ছিলেন। তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াই সাধারণ লোকে কতকটা নিরুপদ্রবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। এই-সকল বীরকে শৌর্য্যের কার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য, তাঁহাদের ক্ষাত্র-তেজঃ অব্যাহত রাখিবার জন্য, তাঁহাদের পূর্ব্বকীর্ত্তির স্মৃতি উজ্জীবিত করিবার জন্য, তাঁহাদের মনস্তুষ্টিবিধানের জন্য, বন্দী ও চারণ-কর্ত্তৃক তাঁহাদের বীরত্বকাহিনী গীত হইত। ইহাই বোধ হয় কবিতার জন্মকথা। বীরগণ মুক্তহস্তে বন্দী ও চারণগণকে পুরস্কৃত করিতেন। এই আদান-প্রদানে কাব্যের, গানের, গল্পের, ছড়ার উদ্ভব ও উন্নতি হইয়াছিল। যখন নিয়ত-যুদ্ধের কাল অতীত হইল, সমাজ কতকটা সুশৃঙ্খল হইল, তখন এই যোদ্ধৃমণ্ডলী ধনে-মানে প্রভুত্ব-ক্ষমতায় উচ্চপদ অধিকার করিলেন, ক্ষমতার তারতম্যানুসারে কেহ রাজা, কেহ জায়গীরদার (Feudal baron) কেহ বা তাঁহাদিগের পারিষদ হইলেন। এই-সকল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের মনোরঞ্জনের জন্য, তাঁহাদিগের অবসর-বিনোদনের জন্য, এই শ্রেণীর সাহিত্যের আরও উন্নতি হইল এবং নূতন-নূতন শ্রেণীর সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। তন্মধ্যে প্রণয়কাহিনী প্রধান। গান, গল্প, ছড়া, কথা, কাহিনী, নাটক, রচিত, গীত, কথিত, ঘোষিত (recited), অভিনীত হইতে লাগিল। কেন না, যাহাদিগকে জীবিকার্জ্জনের জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতে হয় না, অবকাশভোগী এমন এক সম্প্রদায় (leisured class) সমজদার সমাজে না থাকিলে সাহিত্যের উন্নতি হয় না। অভিজাতবর্গের মনোরঞ্জনের জন্যই কবি, গায়ক, নট প্রভৃতির প্রযত্ন হওয়াতে অভিজাতবর্গের গুণগ্রাম, কীর্ত্তিকথা, সুখদুঃখের কাহিনী সাহিত্যস্রষ্টাদিগের একমাত্র বর্ণনীয় বিষয় হইল।

পক্ষান্তরে, সাধারণ লোকের সুখদুঃখের কাহিনী কাব্যের বিষয়ীভূত করিবার জন্য কবিগণের কিছুমাত্র স্পৃহা জন্মিল না। কেন না, সাধারণ লোকে সর্ব্বদা জীবিকার্জ্জনে ব্যাপৃত থাকিত, তাহাদিগের কাব্যরসাস্বাদনের অবসর হইত না, সে শক্তিও তাহাদিগের ছিল কি না সন্দেহ ; তাহারা অর্থশালী না হওয়াতে কবিগণকে পুরস্কৃত করিবার ক্ষমতাও তাহাদের ছিল না। বিশেষতঃ সমাজ ও রাষ্ট্রে সাধারণ লোকের স্থান তখন নিতান্ত নিম্নে ; তখন তাহারা মানুষ নহে—মেষ, ভারবাহী পশু (beasts of burden), মনিবের গোলাম (serfs), বেগারের মজুর (hewers of wood and drawers of water), এমন কি ক্রয়বিক্রয়ের সামগ্রী।

(২)

কিন্তু এখন বহু শতাব্দীর অভিব্যক্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সভ্যদেশসমূহে পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধবিগ্রহ না থাকাতে সমাজে শান্তি বিরাজ করিতেছে—

(অবশ্য বর্ত্তমান ইউরোপের কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বের সময়ের কথা বলিতেছি)। সুতরাং বীরত্বের বিবরণ আর তেমন কৌতূহলোদ্দীপক ও উন্মাদকর নহে, বীর যোদ্ধাও আর নাটকনভেলের নায়ক নির্ব্বাচিত হইতেছে না। সভ্যতার বিকাশ-বশতঃ এখন মানব-মন বহির্বিষয় অপেক্ষা অন্তর্বিষয়ের বর্ণনার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রভৃতির প্রসার হওয়াতে নূতন-নূতন ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, নানাভাবে সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, যে ক্ষেত্রে উন্নতি হয় নাই সে-ক্ষেত্রেও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও প্রবল চেষ্টা উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে, সভ্য স্বাধীন দেশে প্রজাশক্তির বিকাশ হইয়াছে, (এখন, মানুষ তাহারা, নহে ত মেষ), এমন কি কোন-কোন সুসভ্য স্বাধীন দেশে প্রজাশক্তি রাজশক্তির আসন অধিকার করিয়াছে, King Demos (গণ-পতি) সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছে। রাষ্ট্র ও সমাজেই এই democratic movement (গণ-প্রাধান্য) স্বীয় শক্তি নিঃশেষ করে নাই, ইহা সাহিত্যেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার ফলে, সাধারণ সামাজিক জীবনের দিকে এখন লেখক ও পাঠক উভয় সম্প্রদায়েরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, সাধারণ লোকের সুখদুঃখের, কার্য্যকলাপের, জীবন-যাত্রার কথা সাহিত্যে স্থান পাইবার দাবী করিতেছে। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে গ্রন্থ-প্রচারের সুবিধা ঘটায় এবং অনেক সভ্যদেশে সার্ব্বজনীন বিদ্যাশিক্ষার (mass-education) ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার হইয়াছে। এখন সাধারণ লোকের সৎসাহিত্য-পাঠের, কাব্যশাস্ত্র-বিনোদের, কাব্যামৃতরসাস্বাদের প্রবৃত্তি জাগিয়াছে, কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়াছে, রসবোধ জন্মিয়াছে। এখন আর সাহিত্য শুধু অবকাশভোগী ধনিসম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ নাই। অথবা, প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, এখন এই স্পৃহার ফলে, সভ্যদেশে নিতান্ত নিম্নস্তরের লোক পর্য্যন্ত কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যেও পুস্তকপাঠের জন্য কতকটা অবকাশ পায়, অথবা কতকটা অবকাশ করিয়া লয়। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত লেখক-সম্প্রদায়কে সচেষ্ট হইতে হইয়াছে। এখন লেখকের উৎসাহ-দাতা, অন্নদাতা, মুরুব্বি,—ধনিসম্প্রদায় নহে, বিক্রমাদিত্য বা Maecenas নহে; এখন লেখকের উৎসাহদাতা, অন্নদাতা, মুরুব্বি,—সর্ব্বসাধারণ, পাঠকসম্প্রদায়, ক্রেতৃমণ্ডলী। সুতরাং এখন লেখকসম্প্রদায়কে চাহিদার (demand) প্রকৃতি বুঝিয়া যোগানের (supply) প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত করিতে হইতেছে। তবে এই পরিবর্ত্তনের সবটাই ব্যবসাদারী হিসাবে নহে। কালমাহাত্ম্যে লেখক-সম্প্রদায়েরও রুচি-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা, একপেশে ভাব দূর হইয়াছে, তাঁহারাও নূতন চক্ষে সংসার ও মানবকে দেখিতে শিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশেও সাহিত্যের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিতেছেন।

ইহার ফলে, আধুনিক সাহিত্য হইতে পূর্ব্বোক্ত exclusiveness বা একপেশে পক্ষপাতিত্ব অপসারিত হইয়াছে; লেখক ও পাঠক উভয় সম্প্রদায়েরই এখন সুর ফিরিয়াছে, রুচি বদলাইয়াছে; সমাজ ও সাহিত্যে নূতন ভাবের বন্যা আসিয়াছে; সাহিত্যে, কাব্যে, নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। দরিদ্রের কাহিনী, ছোট প্রাণের ছোট ব্যথা, The short and simple annals of the poor, the pathos of everyday life, তথা ক্ষুদ্রের মহত্ত্ব, the majesty of humble hearts, সাহিত্যে, কাব্যে, স্থান পাইয়াছে এবং ক্রমেই এই নবীন সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিতেছে।

ইহা ছাড়া, আরও কতকগুলি সূক্ষ্ম কারণ এই পরিবর্ত্তনের মূলে বর্ত্তমান। বাস্তব-জীবন-বর্ণনার প্রয়াস (realism), সমাজের অতিমাত্র কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও স্বভাবানুযায়ী জীবনের দিকে ঝোঁক (naturalism), রোম্যান্টিক রীতির আবির্ভাব (the romantic movement), ব্যক্তিতন্ত্রতার (individualism) ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রতার (socialism) প্রসার, যীশুর মানবতার, মানবপ্রেমের, অনন্ত করুণার দিকে নূতন করিয়া খ্রীষ্টীয় সমাজের মনোনিবেশ, নরসেবাধর্ম্ম, সার্ব্বজনীন প্রীতি, বিশ্বহিতচেষ্টা (altruism, humanitarian movement) প্রভৃতি কারণ-সমবায়ে * হৃদয়ের প্রসার হইয়াছে, কল্পনার বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে, রুচি ও আদর্শের পুনঃসংস্কার হইয়াছে,

* অনেক সমালোচক Romantic Movement কথাটাকে ব্যাপকভাবে বুঝেন এবং এ সমস্ত ব্যাপারই উহার অন্তর্গত বলিয়া মতপ্রকাশ করেন।

কাব্যের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সমাজ ও সাহিত্যে একটা বিপ্লব, একটা ওলটপালট, একটা revolution ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ রোম্যান্টিক-রীতির আবির্ভাবে ভাবুকগণ জগতের সকল বস্তুতেই একটা বিস্ময়বোধ করেন ও একটা আনন্দলাভ করেন; তাঁহারা সাধারণ জীবনকে সাদাসিধে, একঘেয়ে ও কুৎসিত বলিয়া উড়াইয়া দেন না; পরন্তু তাহার ভিতরেও সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য এবং করুণরসের, প্রকৃত কবিত্বের, পুঞ্জীকৃত উপাদান দেখিতে পান। ফলতঃ, এই সাহিত্য-সংস্কারের মূলে, এই নব-ধারার নিম্নে, এই রুচি-পরিবর্ত্তনের পশ্চাতে, শুধু সাহিত্য-রীতি নহে, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, চারিত্রনীতি, ধর্ম্মনীতি, প্রভৃতি বহু ব্যাপারের কার্য্যকারিতা আছে। সাহিত্যের রীতিমত ইতিহাস লিখিতে বসি নাই, সে ক্ষমতাও নাই, সুতরাং তত্ত্বনিরূপণ-ব্যপদেশে, নিদাননির্ণয়কল্পে, naturalism, realism, individualism, socialism, romanticism, altruism, humanitarianism প্রভৃতি ismএর মালা গাঁথিয়া পাঠক-সম্প্রদায়কে আর উত্যক্ত করিব না।

উল্লিখিত নবীন সাহিত্যের মূলমন্ত্র ল্যাটিন কবির সেই পুরাতন কথা—Homo sum, humanae nihil a me alienum puto—আমি মানুষ, যাহা কিছু মানব-সংক্রান্ত, তাহা আমার পর নহে, আমার সমবেদনার, মৈত্রী ও করুণার অযোগ্য নহে, আমার হৃদয়ের গণ্ডীর বাহিরে নহে। যতই ক্ষুদ্র, যতই নীচ, যতই নগণ্য হউক, সকল মানবই আমার ভ্রাতা, আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ। বার্ণস্-এর ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়াছে—

> It's coming yet for a' that
> That man to man the world over
> Shall brithers be for a' that.
> 'Am I not a man and a brother?'

সমস্ত সংসারে মানুষ মানুষের ভাই হইয়া উঠিতেছে।। 'আমি কি মানুষ নই, সব মানুষের ভাই নই?'

ক্রীতদাসও এই দাবী করিতেছে। এই ভাবের ভাবুক হইয়া আধুনিক লেখকগণ বুঝিতেছেন যে, সাধারণ লোকের দুঃখদারিদ্র্য শোকতাপ আশানৈরাশ্য সাহিত্যিকের বর্ণনার যোগ্য, সামাজিকের সমবেদনার যোগ্য। এই ভাবের ভাবুক হইয়া তাঁহারা আরও বুঝিতেছেন যে, সাধারণ মানবের মধ্যে যে মানবতা আছে, যে সরলতা, কোমলতা, উদারতা, পবিত্রতা আছে, তাহা লক্ষণীয়; ইতরশ্রেণীর মধ্যেও যে মনুষ্যত্ব মহত্ত্ব সংযম আত্মত্যাগ আছে তাহা বর্ণনীয়; অবহেলিত পদদলিত ঘৃণিত 'নীচ' জাতির হৃদয়েও যে কমনীয় ও মহনীয় ভাব আছে, যে মনুষ্যত্ব দেবত্ব আছে, তাহা দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য নিদিধ্যাসিতব্য।* 'ছোট লোকে'র মধ্যে, 'পতিত' জাতির মধ্যে, 'দেবধর্ম্মী মানব' (কার্লাইলের peasant-saint) আছে, গোবরগাদায়ও পদ্মফুল ফোটে, কয়লার খনিতেও হীরা থাকে। এই মন্ত্রের প্রভাবে, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন সহৃদয় কবিগণ শুধু পতিত জাতির মধ্যে কেন, পতিতাদিগের হৃদয়েও দেবভাব দেখিয়াছেন, এবং সাহিত্যে সেই সুন্দর ও সত্যের বিকাশ করাইয়াছেন।

এইখানে রসজ্ঞমণ্ডলীর সেই পুরাতন কথাটার, বিখ্যাত বিলাতী সমালোচক ব্র্যাড্‌লির সেই উক্তিটার পুনর্ব্বিচার করিতে হইবে। ঐ মন্তব্য সমীচীন সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাই বোধ হয় কাব্যজগতে, রসের রাজ্যে, সমগ্র সত্য নহে। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে দ্বিতীয় রিচার্ডের সিংহাসন-চ্যুতি, রাজা লীয়ারের অকৃতজ্ঞ কন্যাদ্বয়ের হস্তে নিগ্রহ, সেনাপতি ওথেলোর হৃদয়ে পত্নীর চরিত্র-সম্বন্ধে সন্দেহের বৃশ্চিক-দংশন ও পরে নিরপরাধা পত্নীর প্রাণবধে মর্ম্মান্তিক অনুতাপ এবং অসহ্য যন্ত্রণায় আত্মহত্যা, রাজপুত্র হেমলেটের কঠোর সমস্যা ও গভীর বিতর্ক, উচ্চবংশোদ্ভব রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমের নিদারুণ পরিণাম, বণিক্‌রাজ (royal merchant) এণ্টোনিয়োর বা 'মৃচ্ছকটিকে' 'দ্বিজসার্থবাহ' চারুদত্তের দশাবিপর্য্যয়, এই সকল বৃত্তান্তে আমাদের হৃদয় গভীর দুঃখে ও সমবেদনায় আলোড়িত হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু জর্জ্জ এলিয়টের Mill on the Floss পুস্তকে নিজের একগুঁয়েমি ও জেদের ফলে মামলায় মামলায় সর্ব্বস্বান্ত ময়দার কলওয়ালা ইতর শ্রেণীর লোক মিষ্টার টালিভারের শোচনীয় দারিদ্র্য মনোভঙ্গ ও স্বাস্থ্যভঙ্গ, ম্যাগির প্রণয়ের ও জীবনের শোচনীয় পরিণাম, টেনিসনের কাব্যের নায়ক

* 'The true pathos and sublime of human life'—*Burns.* 'The majesty of simple feelings and humble hearts'—*Ruskin.*

জেলিয়া এনক্ আর্ডেনের দারিদ্র্যের শোচনীয় পরিণাম, টেনিসনের 'ডোরা'য় পিতার অবাধ্য পিতৃগৃহতাড়িত কৃষকপুত্র উইলিয়ামের দুঃখ-দুর্দ্দশা ও অকালমৃত্যু, এই সকল বৃত্তান্তেও কি আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয় না? জর্জ এলিয়টের আখ্যায়িকায় ইতর শ্রেণীর লোক এডাম বীডের মহত্ত্ব কি শেক্‌স্‌পীয়ারের আদর্শ রাজা পঞ্চম হেন্‌রীর মহত্ত্ব অপেক্ষা কম সুন্দর? দরিদ্রকন্যা কুটীরবাসিনী ডোরার নিঃস্বার্থ নীরব নির্ম্মল প্রেম কি ধনী য়িহুদির কন্যা রেবেকা বা নবাবনন্দিনী আয়েষার নিঃস্বার্থ প্রেম অপেক্ষা কম প্রাণস্পর্শী? অদৃষ্টবিড়ম্বিত শত্রুকর্ত্তৃক নিপীড়িত ভূপতিদিগের দুর্দ্দশাদর্শনে হৃদয় বিগলিত হয় সত্য; কিন্তু 'টম কাকার কুটিরে' ক্রীতদাসদিগের প্রতি ধনী প্রভুর অত্যাচারের বিবরণে হৃদয় ততোধিক বিগলিত হয় না কি?

জর্জ্জ এলিয়ট Mill on the Floss আখ্যায়িকার এক স্থলে বলিয়াছেন যে, মিঃ টালিভার রাজার মত উচ্চপদস্থ না হইলেও তাঁহার অদৃষ্টরহস্য গ্রীক্ ট্র্যাজেডিতে বর্ণিত রাজা (Œdipus) ইডিপাসের অদৃষ্ট-রহস্য অপেক্ষা কম জটিল নহে। এই আখ্যায়িকার প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, ময়দার কলওয়ালার কন্যা ম্যাগির পিতৃভক্তি গ্রীক রাজকন্যা এন্টিগোনে (Antigone) বা ইংরেজ রাজকন্যা (Cordelia) কর্ডেলিয়ার পিতৃভক্তি অপেক্ষা কম সুন্দর নহে, তাহার ভ্রাতৃস্নেহও গ্রীক রাজকন্যা এন্টিগোনে বা (Electra) ইলেক্‌ট্রার ভ্রাতৃস্নেহ অপেক্ষা কম সুন্দর নহে। পিতৃশত্রুর পুত্রের সহিত ম্যাগির প্রণয় ও হৃদয়-দমনের কঠোর প্রয়াস, দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী অভিজাত-বংশের যুবক-যুবতী রোমিও-জুলিয়েটের প্রণয় ও গুপ্তপরিণয় ও তাহার নিদারুণ পরিণাম অপেক্ষা কম করুণ-রসাভিষিক্ত নহে; ম্যাগির হৃদয়ে পিতার ও প্রেমাস্পদের প্রতি কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব জেসিকা (Jessica) বা (Desdemona) ডেস্‌ডিমোনার ঐ-প্রকারের কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব অপেক্ষা অধিকতর তীব্র ও মর্ম্মস্পর্শী, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর জর্জ্জ এলিয়টেরই দুইখানি আখ্যায়িকা পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, অভিজাতবংশীয়া রোমোলার হৃদয়ের দ্বন্দ্ব ও আত্মজয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ম্যাগির হৃদয়ের দ্বন্দ্ব ও আত্মজয়ের সহিত তুলনায় ম্লান হইয়া পড়ে।

অতএব প্রণিধান করিয়া দেখিলে এই প্রতীতি হয় যে, ব্র্যাড্‌লির মন্তব্য আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। বরং হালের আখ্যায়িকা-কার (George Moore) জর্জ মূরের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি সমীচীনতর—

'The meanest things, when viewed with the eyes of God, are raised to heights of tragic awe which conventionality would limit to the deaths of kings and patriots.'

আভিজাত্য-গর্ব্বিতা লেডি মেরী ওয়ার্টলী মণ্টাগু (Lady Mary Wortley Montagu) রিচার্ডসনের 'প্যামেলা' আখ্যায়িকা-প্রকাশের পর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—'The heroes and heroines of the age are cobblers and kitchen-wenches' আজ-কালকার নায়ক-নায়িকারা মুচি আর চাকরাণী; কিন্তু তিনিও রিচার্ডসনের 'ক্ল্যারিসা হার্লো' আখ্যায়িকা পড়িয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই, ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অথচ শেষোক্ত নায়িকা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, অভিজাত-বংশীয়া নহেন। অতএব বুঝা গেল, অভিজাত-বংশের নায়কনায়িকার সুখ-দুঃখ আমাদের হৃদয় যেরূপ স্পর্শ করে, সাধারণ শ্রেণীর নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখ সেরূপ করে না, এ মত সমীচীন নহে। একজন অভিজাত-বংশীয়া সহৃদয়া নারীই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন।

কয়েকজন খ্যাতনামা কবির মন্তব্যও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

কৃষাণকবি বার্ণসের (Burns) দুই ছত্র কবিতা সুবিদিত।

'The rank is but the guinea-stamp;
'The man's the gold for a' that.'

পদমর্য্যাদা মোহরের ছাপ, আর মানুষ সেই মোহরের সোনা।

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কবিতার একটি পংক্তি তাঁহার নিজের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

'Love had he found in huts where poor men lie.'
কুটীরেই তিনি প্রীতির সন্ধান পাইয়াছেন, যেখানে দরিদ্রের বসতি।

স্যার ওয়াল্টার স্কট্ বলিয়াছেন—

'I have heard higher sentiments from the lips of poor uneducated men and women, when exerting the spirit of severe, yet gentle heroism under difficulties and afflictions.

অশিক্ষিত নরনারী দুঃখবিপদের মধ্যে পড়িয়া কঠিন অথচ সহজ ধীর বীরত্ব প্রকাশের সময় উঁচুদরের কথা বলিয়াছে শুনিয়াছি।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও স্কটের সমসাময়িক কবি সাউদি বলিয়াছেন—'The good herdsman Eumaeus* is worth a thousand heroes.'

সাধু মেষপালক ইউমিয়াস সহস্র বীরের সমতুল্য।

এই-সকল উদ্ধৃত বাক্য হইতে বুঝা যায়, আধুনিক সহৃদয় কবিগণের মনে সাহিত্যের এই নূতন ধারা-সম্বন্ধে কি চিন্তার উদয় হইয়াছিল, কি ভাবের আদর্শ জাগিয়াছিল।

(৩)

ঠিক কোন্ সময়ে, কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে এই নবধারার প্রবর্ত্তন হইল, তাহা সন তারিখ ধরিয়া নির্দ্দেশ করা কঠিন। বস্তুতঃ এই পরিবর্ত্তন একদিনে হয় নাই, ক্রমশঃ সাহিত্যের গতি ফিরিয়াছে। ধরিতে গেলে, পুরাতন সাহিত্যে যে এ জিনিশটা একেবারে ছিল না, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। তবে পুরাতন সাহিত্যে এই ধারা যে নিতান্ত ক্ষীণ ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। মহাভারত-পুরাণাদিতে ধর্ম্ম-ব্যাধের উপাখ্যান প্রভৃতিতে ইতর লোকের মহত্ত্বের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এবং 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-সমন্বিতঃ' ইত্যাদি শিক্ষা প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র গুহক-চণ্ডালের সহিত মৈত্রীস্থাপন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কোন কোন নিকৃষ্ট শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যে (ভাণিকা, গোষ্ঠী, দুর্ম্মল্লিকা, প্রস্থান) প্রাকৃত লোক নায়ক হইত, অলঙ্কারশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে; তবে এই শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য প্রসিদ্ধি ও প্রসার লাভ করে নাই, বোধ হয় মনোহারিত্বের অভাবে অনাদরে লোপ পাইয়াছে। বেতাল-পঞ্চবিংশতি, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ প্রভৃতিতে তন্তুবায়, রথকার প্রভৃতি প্রাকৃত-জনের আখ্যান আছে। পালি সাহিত্যেও এই-প্রকার আখ্যানের অভাব নাই। ইউরোপীয় প্রাচীন সাহিত্যে Fabliaux, nouvelles প্রভৃতি গল্পগাছায় ইতর লোকের আখ্যান আছে। গ্রীক Pastoral কবিতায় সামান্য মেষপালকদিগের অনাড়ম্বর জীবনের সুখদুঃখের চিত্র আছে। পরে অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যে এই শ্রেণীর কাব্য কৃত্রিমতাদুষ্ট হইয়াছিল। (প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের বৈষ্ণব-পদাবলীর সহিত এই গ্রীক pastoral কিয়দংশে তুলনীয়।) কতকগুলি রূপকথায় (Folktales) দরিদ্র-সন্তান সাহস, উপস্থিত-বুদ্ধি, চাতুরী বা সহৃদয়তার প্রভাবে অথবা পরীর কৃপায় ধনমান উচ্চপদ লাভ করিয়াছে, এরূপ বৃত্তান্ত আছে (প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে দেবতার কৃপায় এরূপ ঘটিয়াছে)। কোন কোন ব্যালাড্-শ্রেণীর কবিতায় ইতর লোকের হাস্য, বীর, বা করুণরসাত্মক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ব্যঙ্গবিদ্রূপে সিদ্ধ-হস্ত সার্ভাণ্টিস (Cervantes) ও (Le Sage) লা সাজের (Don Quixote) ডন্ কুইক্‌সোট্ ও (Gil Blas) গিল ব্লা আখ্যায়িকায় ইতর লোকের চরিত্রচিত্রের অভাব নাই।

বিশেষ করিয়া ইংরেজী সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে দেখা যায় যে, শেক্‌স্‌পীয়ারের দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও চসারের কাব্যে হোটেলওয়ালা (Mine Host), ময়দার কলওয়ালা, রাঁধুনী, মাঝী প্রভৃতি ইতর লোকের উজ্জ্বল চিত্র নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। এই-সকল চিত্র হইতে ইহাও বেশ বুঝা যায় যে কবির ইতর শ্রেণীর লোকের সহিত হৃদয়ের যোগ ছিল। সেই আমলে যেমন একদিকে ধর্ম্ম-সংস্কারক (Wycliffe) উইক্লিফের প্রাণ দরিদ্রের জন্য, ইতর লোকের জন্য কাঁদিয়াছিল, তেমনি সমসাময়িক কবিরও প্রাণে তাহাদের জন্য সমবেদনা জাগিয়াছিল। শেক্‌স্‌পীয়ারের আমলের কয়েকখানি নাটকে (যথা Yorkshire Tragedy, Arden of Feversham) অভিজাত-শ্রেণী হইতে নায়কনায়িকা নির্ব্বাচিত না হইয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। তাঁহার সময়ের কতকগুলি আখ্যায়িকায়ও (novel) ইতর শ্রেণীর লোককে নায়ক করা হইয়াছে। কিন্তু এই-সকল নাটক ও আখ্যায়িকা তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। প্রবন্ধের প্রথম অংশে বলিয়াছি, শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে নায়ক-নায়িকা-নির্ব্বাচনে প্রাচীন রীতিই অনুসৃত হইয়াছে। তথাপি এগুলিতে ইতর লোকের চিত্রের অভাব নাই (যথা Autolycus, Dogberry, Verges, Bottom, Pistol, Nym, the grave-diggers &c.) এবং এই-সকল চিত্র অতি নিপুণ-ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রভুভক্ত পুরাতন ভৃত্য (As

* গ্রীক বীর ইউলিসিসের প্রভুভক্ত মেষপালক। বিশ বৎসর পরে ইউলিসিস্ ভিখারীর ছদ্মবেশে শত্রুবেষ্টিত গৃহে ফিরিলে ইউলিসিসের প্রভুভক্ত জরাজীর্ণ কুকুর ও এই বৃদ্ধ মেষপালক তাঁহাকে চিনিয়াছিল।

You Like It নাটকে Adam, ও Timon of Athens নাটকে Flavius) ও প্রভুর অনুরক্ত ভাঁড় (As You Like It নাটকে Touchstone, ও King Lear নাটকে Fool)—ইহাদিগের চরিত্রাঙ্কণে মহাকবি যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তবে প্রবন্ধের প্রথম অংশে বলিয়াছি যে, প্রাচীন সাহিত্যে রাজা, রাজকন্যা প্রভৃতি অভিজাত-শ্রেণীর নায়ক-নায়িকার অনুচর-সহচর, বয়স্য বা সখী, ভৃত্য বা দাসী হিসাবে পারিপার্শ্বিকভাবে এই-সকল চিত্রের সমাবেশ। শেক্‌স্‌পীয়ারের বেলায়ও সেই কথাই খাটে। অটোলাইকাস প্রভৃতি পাত্রগুলি বাস্তব-বর্ণনা (realism) হিসাবে কাব্যে স্থান পাইয়াছে এবং করুণরসের দিক্ হইতে না হইয়া হাস্যরসের দিক্ হইতে অঙ্কিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর একশ্রেণীর আখ্যায়িকায় ইহারই জের দেখা যায়, অর্থাৎ বাস্তব-বর্ণনা (realism) হিসাবে ইতর লোকের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর লোকের ক্ষুদ্রাশয়তা, শঠতা, পাপাসক্তি, মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, চাতুরী, জুয়াচুরি বা বোকামি প্রভৃতি লইয়া ব্যঙ্গ্য-বিদ্রূপের উদ্দেশ্যেই যে এই-সকল পাত্রপাত্রীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। (De Foe, Fielding, Smollett, Sterne ও Jane Austen) ডি ফো, ফিল্ডিং, স্মোলেট, ষ্টার্ন, ও জেন অষ্টেনের (এই লেখিকাও ধরিতে গেলে ঐ শতাব্দীর লোক) অঙ্কিত মধ্যশ্রেণীর পাত্রপাত্রীর নিখুঁত-চিত্রে বেশ মুন্সীয়ানা প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু গূঢ় ব্যঙ্গ্যের সুর স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই সময় হইতে বেশ একটু পরিবর্ত্তনের লক্ষণও ধরা পড়ে। ব্যঙ্গ্য-বিদ্রূপের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকের সাধুতা, সদাশয়তা, সহৃদয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণের চিত্রও কোন কোন স্থলে অঙ্কিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে স্মোলেটের কয়েকটি নাবিক-চরিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যখন ডি ফো রবিন্‌সন্ ক্রুসোর ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে এই শতাব্দীতে গ্রন্থের নায়ক করিলেন এবং রিচার্ডসন প্যামেলাকে দাসীশ্রেণী হইতে নায়িকার পদে উন্নীত করিলেন, তখনই এই পরিবর্ত্তনের সূচনা, এই নবপ্রণালীর সূত্রপাত হইল। গোল্ডস্মিথের বিখ্যাত Vicar of Wakefieldকেও এই নবপ্রণালীর উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার এই শতাব্দীর কবি (Burns, Crabbe, Cowper ও Goldsmith) বার্নস্, ক্র্যাব্, কাউপার ও গোল্ড-স্মিথের কবিতায়ও ইতর শ্রেণীর সহিত সমবেদনার সুর পরিস্ফুট। বিশেষতঃ বার্ন্‌স্, গোল্ডস্মিথ, ক্র্যাবের কবিতায় পল্লীবাসী দরিদ্রের সুখদুঃখ আশা-নৈরাশ্যের প্রাণস্পর্শী বিবরণ দৃষ্ট হয়।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে বলিয়াছি, এই পরিবর্ত্তনের মূলে বহু স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণ বর্ত্তমান। তবে প্রধানতঃ ইহা যে ফরাশী-বিপ্লবের এবং ফরাশী-বিপ্লবের মন্ত্রগুরু রূসোর রচনার প্রভাবে ঘটিয়াছিল, একথা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে এই পরিবর্ত্তন আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই শতাব্দীতে বায়রন-শেলী বিদ্রোহীর অগ্রগণ্য হইলেও তাঁহাদিগের অঙ্কিত চিত্রে এই পরিবর্ত্তনের লক্ষণ তেমন পাওয়া যায় না, কিন্তু স্থিতিশীল স্কট্ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের রচনায় ইহা সুস্পষ্ট। স্কট্ যদিও প্রাচীন প্রথার অনুসরণে অভিজাতশ্রেণী হইতে অধিকাংশ আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তথাপি তিনি সঙ্গে-সঙ্গে ইতর শ্রেণীর বহু নরনারীর উজ্জ্বল চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন। অনেক স্থলে এই-সকল চিত্রে ফিল্ডিং, স্মোলেটের প্রণালীতে (realism) বাস্তব-বর্ণনার ঝোঁক ও হাস্যরসই প্রকট বটে, কিন্তু আবার অনেক স্থলে করুণরসও বিলক্ষণ বিকাশলাভ করিয়াছে। Jeanie Deansএর চিত্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তথাপি বলিতে হইবে, কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থই এই নবপ্রণালীর লেখকদিগের অগ্রণী। তাঁহার Lucy, তাঁহার Highland Girl, তাঁহার Lucy Gray, তাঁহার Michael, তাঁহার Simon Lee, তাঁহার Alice Fell, তাঁহার Leech-gatherer, তাঁহার Old Cumberland Beggar প্রভৃতি বহু কবিতা সাহিত্যে এই নূতন ভাব সুস্পষ্টরূপে মুদ্রিত করিয়াছে। তাঁহার বন্ধু কোলরিজের কাব্যে বুড়া মাঝিকে (The Ancient Mariner) কাব্যের নায়ক-নির্ব্বাচনে, তদ্রূপ সামান্য ব্যক্তির হৃদয়ের ইতিহাস-সঙ্কলনে, এই নবরুচির, নবধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাহার পর, ঊনবিংশ শতাব্দী আরও অগ্রসর হইলে, একদিকে আখ্যায়িকায় ডিকেন্স্ ও জর্জ এলিয়টের রচনায়, অপরদিকে কবিতায় টেনিসন, হুড প্রভৃতির রচনায় এই নবপ্রণালীর আরও উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়। ডিকেন্স্ ও জর্জ এলিয়ট উভয়েরই হাস্যরসে কৃতিত্ব ছিল বটে, (এ হিসাবে তাঁহারা ফিল্ডিং স্মোলেটের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন), কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে করুণরসের অবতারণায় তাঁহাদের যথেষ্ট সহৃদয়তা ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক জীবিত লেখক টমাস হার্ডির আখ্যায়িকাগুলিতে এই ভাব আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। তাঁহার সমস্ত আখ্যায়িকাই সভ্যতার কেন্দ্র হইতে সুদূরে অবস্থিত পল্লী-বাসীর জীবনকাব্যের বিবৃতি। তিনি দেখাইয়াছেন যে, নিম্নশ্রেণীর নরনারীর হৃদয়েও (রোমিও-জুলিয়েট প্রভৃতি অভিজাত শ্রেণীর নায়ক-নায়িকার হৃদয়ের ন্যায়) মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডির উপকরণ সঞ্চিত আছে। হুডের The Song of the Shirt ও The Lay of the Labourer, কিংস্লের The Three Fishers, এলিজ্যাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংএর The Cry of the Children প্রভৃতি কবিতায় সহরবাসী বা পল্লীবাসী দরিদ্রের অরুন্তুদ কাহিনী অমর অক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই আমলের রাজকবি টেনিসন তাঁহার 'ডোরা'য় সামান্য কুটীরবাসিনী কৃষক-কন্যাকে নায়িকা নির্ব্বাচিত করিয়া, তাঁহার Enoch Ardenএ সামান্য জেলিয়াকে নায়ক নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাদের স্বার্থত্যাগের, নিঃস্বার্থ প্রেমের, আত্মজয়ের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। ফরাসী সাহিত্যে ভিক্টর হিউগোর Les Miserables প্রভৃতি আখ্যায়িকায় এবং রুষীয় সাহিত্যে টলষ্টয়ের আখ্যায়িকায় ও ছোট-গল্পে এই ভাব আরও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে এই ভাবের সম্পূর্ণ অভাব না থাকিলেও ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতেই এই নবধারার প্রকৃত প্রবর্ত্তন হইয়াছে। কেন বলিতেছি, তাহা একটু বুঝাইয়া বলি।

মহাকবি শেক্স্পীয়ার শাইলকের চিত্রাঙ্কণে য়িহুদি জাতির প্রতি কতকটা সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় বটে, কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে যে রবার্ট ব্রাউনিংএর In the Ghetto কবিতায় য়িহুদিচরিত্রের যেরূপ পূর্ণ বিকাশ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, শেক্সপীয়ারের নাটকে সেরূপ হয় নাই। এইরূপ শেক্স্পীয়ারের ফেরিওয়ালা অটোলাইকাসের সহিত জর্জ্জ এলিয়টের Mill on the Flossএ অঙ্কিত ফেরিওয়ালার (Bob Jakin) তুলনা করিলে দেখা যায়, শেক্স্পীয়ার শুধু বাস্তব-বর্ণনা করিয়া, হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াই ক্ষান্ত, কিন্তু জর্জ্জ এলিয়ট ফেরিওয়ালার ধাপ্পাবাজীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহৃদয়তার সমাবেশ করিয়া চিত্রটি পূর্ণতর, সুন্দরতর করিয়াছেন। উভয়ত্রই এই অসম্পূর্ণতা শেক্স্পীয়ারের অক্ষমতার পরিচায়ক নহে, তাঁহার সময়ের প্রভাব, কালমাহাত্ম্য, time-spirit, zeitgeist। সেই জন্যই বলিয়াছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে নিম্নশ্রেণীর পাত্রপাত্রীর প্রতি যে পরিপূর্ণ সমবেদনার সুর, যে গভীর করুণরস (pathos) বিকাশ পাইয়াছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে দুর্লভ। এই করুণরস তালশাঁসের ভিতর সঞ্চিত জলটুকুর মত স্নিগ্ধ ও মধুর। ইহা আধুনিক কালের জীবনসংগ্রামের কঠোরতা ও কুৎসিতত্বের মধ্যেও এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা কোমলতা ও শ্রীসম্পৎ আনিয়া দিয়াছে।

(৪)

আধুনিক অর্থাৎ ইংরেজের আমলের বাঙ্গালা সাহিত্য প্রধানতঃ ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণে ও অনুসরণে, তাহারই আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ঠিক ঐ ভাবের প্রভাবে নবধারার, নবরুচির সঞ্চার হইয়াছে। আবার পাশ্চাত্য সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির ভাবের বন্যাও আমাদের মরা গাঙ্গে ছুটিয়াছে, সুতরাং সে চিন্তার ফলে যেমন একদিকে রাষ্ট্রীয় অধিকার-লাভের চেষ্টা, পতিত জাতির উন্নয়নের চেষ্টা, অস্পৃশ্য জাতির প্রতি সুবিচারের চেষ্টা, আমাদের সমাজে দেখা দিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে সেই চিন্তার পরোক্ষ-ফলে সাহিত্যক্ষেত্রেও এই বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে।

প্রথমেই 'সাহিত্য-সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ তুলিব। তাঁহার আখ্যায়িকাবলিতে সাহিত্যের পুরাতন ধারাই প্রবাহিত। (এ বিষয়ে তিনি স্কটের সহিত তুলনীয়)। তিনিও সাহিত্য দর্পণের সূত্র ধরিয়াই চলিয়াছেন—

ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহী।
দক্ষোঽনুরক্তলোকস্তেজোবৈদগ্ধ্যশীলবান্ নেতা॥

উচ্চ জাতীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ রাজপুত বা শ্রেষ্ঠী তাঁহার গ্রন্থের নায়ক। (পুরন্দর শ্রেষ্ঠী প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ধনপতি সদাগর প্রভৃতির অনুবৃত্তি।) কোথাও মোগল-সেনাপতি মানসিংহের পুত্র ও নবাব কৎলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পাঠান-সেনাপতি যথাক্রমে আখ্যায়িকার নায়ক ও প্রতিনায়ক, কোথাও মগধরাজপুত্র মূল আখ্যানের এবং নবদ্বীপাধিপতির মহামাত্য অপ্রধান আখ্যানের নায়ক; রাজসিংহ, সীতারাম মুকুটধারী রাজা; মহেন্দ্র সিংহ জমিদার। 'রাজা' দেবেন্দ্রনারায়ণ ওরফে রুক্মিণীকুমার, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, * শচীন্দ্রনাথ, অমরনাথ, উ—বাবু, সকলেই ধনী বা ধনীর সন্তান; ব্রাহ্মণ নবকুমার ও ব্রজেশ্বরও ধনী বা ধনীর সন্তান। কেবল চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ, এই কয়জন ধনী নহেন। তবে চন্দ্রশেখর নিজে ধনী না হইলেও বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবের জ্যোতিষ-শিক্ষক; যদি এই আদর্শ-ব্রাহ্মণ ধনের আকাঙ্ক্ষা করিতেন তাহা হইলে তাহার অপ্রতুল হইত না। প্রতাপ লাঠির জোরে ক্রমে একটি ধনী জমিদারবংশের পত্তন করিতেছিলেন। জীবানন্দ প্রভৃতি ত্যাগী পুরুষ ব্যক্তিগতভাবে নির্দ্ধন হইলেও সন্তান-সম্প্রদায়ের প্রভূত গুপ্তধন ছিল। পরন্তু তাঁহারা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সুতরাং অভিজাত-শ্রেণীর।

প্রসাদপুরের বীভৎস কাণ্ডের পর গোবিন্দলালের দারিদ্র্য, অমরনাথ-কর্ত্তৃক রজনীর দাবী-উত্থাপনের পর শচীন্দ্রনাথের আসন্ন দারিদ্র্য, রাধারাণীর ও হিরণ্ময়ীর পিতৃবিয়োগের পর ঘোর দারিদ্র্য—পূর্ব্বোক্ত সমালোচক ব্র্যাড্‌লির মতানুসারে আমাদের হৃদয় বিগলিত করে বটে, কিন্তু যদি দরিদ্র অবস্থায়ই রাধারাণীকে 'রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ' পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেন, দরিদ্র অবস্থায়ই কাণা ফুলওয়ালী রজনীকে ধনিপুত্র শচীন্দ্রনাথ পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতাম, ইংরেজী ব্যালাড্ King Cophetua and the Beggar-maidএর পুনরভিনয় হইত; কিন্তু তাহা ত ঘটে নাই। তাই বলিতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে নবধারার সন্ধান পাওয়া যায় না।

তবে স্কটের আখ্যায়িকাবলিতে যেমন অভিজাতশ্রেণীর নায়ক-নায়িকার পারিপার্শ্বিক-ভাবে ইতরশ্রেণীর লোকের সহৃদয়তাপূর্ণ চরিত্র-চিত্রণ আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে সেরূপ দৃষ্টান্তের নিতান্ত অভাব নাই। ভিখারীর মেয়ে গিরিজায়া, দাসী হারাণী, বাঁদী কুসুম, বিশ্বস্ত ভৃত্য দিগ্‌বিজয় ও রামচরণ, ইহার উদাহরণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এরূপ পাত্র-পাত্রী প্রাচীন প্রথায় প্রতিমার পার্শ্বে সম্পূর্ণতার জন্য স্থানলাভ করে।

যতদূর বুঝি, তাহাতে মনে হয়, ইংরেজী সাহিত্যে যেমন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই নবধারা-সঞ্চারে অগ্রণী, তেমনি আমাদের সাহিত্যে 'এসিয়ার রাজকবি' রবীন্দ্রনাথ এই নবভাবের, নবরুচির, নবধারার, নব সাহিত্যকলার প্রবর্ত্তয়িতা। কবিতা ও ছোট-গল্পে তিনিই এই নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কবির খেয়াল-বর্ণনার সময় তিনি বলিয়াছেন বটে,—

'আকাশমাঝে জাল ফেলে
তারাধরা ব্যবসা,
কাজ কি আমার ভবের হাটে
মথুর কুণ্ডু শিবু সা।'

কিন্তু তিনি ইহাও জানেন যে 'মথুর কুণ্ডু' না হইলেও 'নফর কুণ্ডু' কবির কাব্যের অযোগ্য নহে, এই সামান্য (?) ব্যক্তির মহত্ত্ব আত্মত্যাগ 'রাজা মহারাজা'র গৌরব অপেক্ষা অনেক উচ্চ। তাই তিনি উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে গাহিয়াছেন,—

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে,—ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার—
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—

* * *

শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে, *

* কৃষ্ণকান্ত রায় বলিতেছেন, 'আমার আয়, দুই লক্ষ টাকা।' ইহারই অর্দ্ধেক গোবিন্দলালের প্রাপ্য। শেষ উইলে যখন গোবিন্দলালের ভাগে শূন্য পড়িল, তখনও তিনি শচীন্দ্রনাথের পিতা রামসদয় মিত্রের ন্যায় আসন্ন দারিদ্র্যের বিভীষিকা দেখিলেন না; 'নিজ নামে কিছু সম্পত্তি ছিল—তাহা গোপনে বিক্রয় করিয়া অর্থসঞ্চয় করিলেন। কাঞ্চন-হীরকাদি মূল্যবান্ বস্তু যাহা নিজের সম্পত্তি ছিল—তাহা বিক্রয় করিলেন। এইরূপে প্রায় লক্ষটাকা সংগ্রহ হইল।' এইরূপ ধনশালী নায়কই বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলীতে typical বলা যাইতে পারে।

* And much it grieved my heart to think
What man has made of man.—*Wordsworth.*

নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

[চিত্রা—এবার ফিরাও মোরে]

ইচ্ছা করে অবিরত　　আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে'—
ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা　　ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল;
সহস্র বিস্মৃতিরাশি　　প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি' দুচারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা　　ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।

[সোনার তরী—বর্ষাযাপন]

তিনি শুধু কবিজনসুলভ উচ্ছ্বাসের মুখে এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অনেকগুলি কবিতায় ও ছোট-গল্পে তিনি এই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, 'জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা'র কিছু কিছু আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, 'অজ্ঞাত জীবনগুলা'র ব্যথার কিছু কিছু অংশ আমাদিগকে দিয়াছেন। তাঁহার 'কাঙালিনী,' 'বধূ', 'পুরাতন ভৃত্য,' 'দুই বিঘা জমি' প্রভৃতি কবিতায় এবং 'কাবুলীওয়ালা,' 'খোকা বাবু,' 'পোষ্টমাষ্টার,' 'শাস্তি,' 'আপদ,' 'অতিথি' প্রভৃতি ছোট-গল্পে তিনি সাধারণ শ্রেণীর মানবমানবীর সুখ-দুঃখের চিত্র, মনুষ্যত্ব-দেবত্বের চিত্র আমাদের চোখের সামনে ধরিয়াছেন। কেষ্টা, রাইচরণ, কাবুলীওয়ালা, চন্দ্রা, রতন, দরিদ্র বালক নীলকান্ত ও তারাপদ, প্রভৃতি চিত্র যেমন উজ্জ্বল, এই-সব চিত্রের অন্তর্নিহিত করুণরসটুকুও তেমনি মধুর।

আহ্লাদের বিষয়, এই নূতন সুর, এই নূতন রস, এই নূতন ধারা, ক্রমে আমাদের সাহিত্যে শক্তিসঞ্চয় করিতেছে, স্থায়িত্বলাভ করিতেছে, এবং কালিদাস-কুমুদ-রঞ্জনের ন্যায় তরুণ কবিগণের 'কৃষকের ব্যথা,' 'কৃষাণীর ব্যথা,' 'কুড়ানী,' 'নোটন,' 'হাঘরে,' 'চণ্ডালী,' 'অখিল মাঝি,' 'রসিক বাগ্‌দি' প্রভৃতি কবিতায় এই সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে; ও বেদিয়া, ভুটিয়া, পাহাড়িয়া, দুলিয়া, জেলিয়া, 'খেজুরওয়ালা,' 'মাটীওয়ালী,' 'চুড়ীওয়ালা,' 'অর্জ্জুন ডোম,' 'গদা চাঁড়াল,' 'ভিকু বাগ্‌দী,' 'নিধিরাম খানসামা' প্রভৃতি 'ছোট লোক'কে কেন্দ্র করিয়া ছোট-গল্পে বিকাশ ও বিস্তার লাভ করিতেছে।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুনন্দা

মাধবপুর গ্রামের একেবারে শেষে নদীর ঠিক কোলের কাছে প্রকাণ্ড বাগানের মাঝখানে মাথা উঁচু করে যে লাল বাড়ীখানা দাঁড়িয়ে আছে, তারি চারি পাশের পাথরের নক্‌সাকাটা ঝোলানো বারান্দাগুলিতে প্রায়ই একটি মেয়েকে দেখা যেত। ভোর বেলা সে স্নান করে পূর্ব্বদিকের বারান্দায় তার পদ্মকুলির মত হাত দুখানির উপর মুখখানি রেখে প্রায়ই নদীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকৃত। ভোরের আলো তার অমন তুষারের মত শাদা মুখেও একটু রঙের ছোপ ধরিয়ে দিত। সেই গৌরী সুন্দরীটিকে শুধু তরুণী বল্লে ঠিক বোঝানো যায় না। বয়স তার কত বলা শক্ত। তার ভাসা-ভাসা ধূসর চোখ দুটির গভীর দৃষ্টিতে যেন শতাব্দীর দুঃখ মাখানো। গতি তার প্রৌঢ়ার মত মন্থর, কিন্তু অতিক্ষীণ তনুলতাখানি কিশোরীর সরল সতেজ দেহ-যষ্টির মত কমনীয়। সূর্য্যোদয়ের আগে প্রথম পাখীর ডাকের সঙ্গে-সঙ্গেই তন্বী সুনন্দা যখন স্নান করে নদীর ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে ভিজে কাপড়ে ভিজে চুলে পায়ে পায়ে জলের ছাপ ফেলে ঘাট থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত একটি জলের রেখা টেনে ধীরগতিতে কোনো দিকে না চেয়ে উঠে চলে যেত, তখন তাকে দেখে যদি কেউ কোনোদিন চিরযৌবনা জলদেবী বলে ভ্রম করত, তা হ'লে তাকে নেহাৎ দোষ দেওয়া যায় না। তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে জল ঝরে ঝরে পড়ত, আর চোখ দুটি দেখে মনে হত সমস্ত সাগরের জল তারি কোলে অশ্রু হয়ে টলটল করছে। মৃণালের মত তার সুগোল কোমল হাত দুখানিতে কালো চুলের রাশ শৈবালের মত জড়ানো। পাতলা ঠোঁট দুখানি রক্তের উচ্ছ্বাসে রাঙা নয়; ঝিনুকের বুকের মত স্বচ্ছ উজ্জ্বল গোলাপী। ভোরের হাল্‌কা হাওয়ায় তার গায়ের ধপধপে শাদা কাপড়-খানা সমুদ্রের বুকের শুভ্র ফেনার মত দুলে দুলে উঠ্‌ত। গতি কিন্তু তার ঢেউয়ের মত চঞ্চল নয়; গভীর জলের মত স্থির। গায়ের রং তার শাঁখের মত শাদা; রক্তের লেশ তাতে বড় দেখা যেত না। কোন্ গোপন গভীর দুঃখে এই জলদেবীটি তাঁর রহস্যময় জলরাজ্যের বুকের ভিতর থেকে উঠে এসে নিস্তব্ধ ধরণীর এই নিরালা কোণটিতে

একলা ভোরের বাতাসে তাঁর বেদনার ভার লঘু করে যেতেন তা' মানুষে দেখ্‌লে বুঝত কি না কে জানে?

পাথরের বারান্দা-ঘেরা সেই সেকেলে-ধরণের বাড়ীখানায় প্রায় সারাদিনই তার হাসি গান শোনা যেত। সুনন্দার শরীরখানি দেখ্‌লে মনে হয় অশ্রুসাগর মন্থন করে তোলা, কিন্তু সেই অশ্রু-সজল চোখের দৃষ্টি ছাপিয়ে তার মুখে হাসির অভাব ছিল না। তার সখী মন্দা আর মানসী তাকে অনেক সময়ই বল্‌ত—"হাঁ ভাই, তোর এত হাসি আসে কোত্থেকে?" সুনন্দা বর্ষা-সন্ধ্যার সূর্য্যকিরণের মত হাসিতে মুখ ভরে বল্‌ত, "আমার দুঃখ করবার কি আছে ভাই, যে হাসব না? ঘরও নেই সংসারও নেই, মরে দুঃখ দিতেও কেউ নেই, মান করে চোখের জল ফেলাতেও কেউ নেই; আছে ত শুধু পর, তা' পর ত কখন কাউকে কাঁদাতে পারে না; তাই আমি হাসি নিয়েই আছি।" এমনি করে যখন সে জগতের লোকের সবচেয়ে বড় দুঃখটাকেই তার হাসির খোরাক বলে পরিচয় দিত, তখন তার সৃষ্টিছাড়া পাষাণ-প্রাণের পরিচয় পেয়ে সখীরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে তার হাসিভরা মুখ আর জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌ত। মানসী হয়ত মুখ ফুটে বলেই ফেল্‌ত, "সই, তোর হৃদয়টা কি পাষাণ?" সই বল্‌ত, "না, টাট্‌কা রক্ত আর কোমল মাংসের।"

মানুষের চোখের আড়ালে এলেই সুনন্দার মুখের হাসিটুকু অস্ত যেত। হাসিটা ছিল তার পোষাকী অলঙ্কার। লোকসমাজে তার অমন অলঙ্কারখানি বাদ দিয়ে যাওয়া তার পক্ষে দুষ্কর; কিন্তু নিজের একলার রাজ্যে পৌছতে-না-পৌছতেই বাইরের সজ্জা আপনা থেকেই খসে পড়ত।

নদীর ঘাটের উপরেই ছিল শিবমন্দির। মন্দিরের চূড়া আলো করে ভোরের বেলা সূর্য্য উঠ্‌তে যেমন কোনো দিন ভুল হ'ত না, সন্ধ্যায় আমবাগানের পশ্চিমে আকাশ রাঙা করে সূর্য্য অস্ত যেতেও যেমন ভুল হত না, তেমনি প্রতি-সন্ধ্যায় মন্দিরের আরতির সময় চওড়া ঢালা জরিপাড়ের ধপধপে শাদা একখানা কাপড় পরে, জরির আঁচলখানা গলায় দিয়ে বিগ্রহের সাম্‌নে জোড় হাত করে দাঁড়াতেও সুনন্দার কখন ভুল হ'ত না। ঘিয়ের প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো তার রক্তহীন মুখের উপর পড়ে তাকে আরো রক্তহীন দেখাত। মনে হত কে যেন সযত্নে মোম দিয়ে একটি ভক্তিমতী পূজারিণীর প্রতিমা গড়ে রেখে গেছে। মন্দিরের যে দরজা দিয়ে শুক্লপক্ষের দিনে শ্বেত-পাথরের মেজের উপর জ্যোৎস্না এসে পড়ত, তারই উল্টো দিকের দরজার সামনে সেইদিকে মুখ করে সে প্রতিদিন ঠিক্ একটি জায়গাতেই এসে দাঁড়াত। আরতির শেষে জ্যোৎস্নার আলোর মধ্যে রূপোলি জরির আঁচল গলায় দিয়ে সে যখন বিগ্রহের আসনের তলে তার ক্ষীণ গৌর তনুখানি নত করে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করত, তখন মনে হত যেন একঝাড় রজনী-গন্ধা ফুল ডাল-সুদ্ধ তুষার-স্তূপের উপর নুয়ে পড়েছে। তখন তার সে সুভ্র নিষ্কলঙ্ক দেহে এক কণা ধূলা লাগলেও বোধ হয় লোকের চোখে সইত না। এই পৃথিবীর ধূলিতেই যে তার জন্ম, এই পৃথিবীর শ্মশানের কোলেই যে তার শেষ শয্যা, তা তখন কে বল্‌বে? দেবলোকের কোনো ঋষির গলার পারিজাতমালা যেন কোন্ ক্ষ্যাপা হাওয়ার টানে এই দেবমন্দিরে খসে পড়েছে।

ঝড় বৃষ্টি, বজ্রপাত, অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার, আরতির সময় সুনন্দার কাছে সবই সমান। সেই এক বেশে এক পথে রোজ এসে সেই একটি জায়গাতে সে দাঁড়াবেই। পূজার শেষে পূজার নির্ম্মাল্যেরই মত সে নিজেকে শুচি মনে করত। তখন আনন্দে তার ম্লান মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠত। চোখের জলও উপচে পড়তে চাইত, কিন্তু কাজল-কালো পক্ষ্মজালের মধ্যেই সে জল মিলিয়ে যেত। কোনো মানুষ বোধ হয় কখনও তার চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখে-নি। লোকের চোখে তার অশ্রুধারা হাসি হয়েই দেখা দিত। চোখের সমস্ত জল সিঞ্চন করে সে এই হাসির ফসল ফলিয়েছিল।

(২)

সুনন্দার শোবার ঘরে তার শিয়রের কাছে ছোট একটি শ্বেত-পাথরের বাক্সের মধ্যে কয়েকটি জিনিষ ছিল। সব কটিই ছোটখাট জিনিষ, একটি একটু বড় ছিল, সেটা একখানা চিঠি। চিঠিখানা কিন্তু সুনন্দার হাতেরই লেখা। সেই নিজের হাতের লিখনখানার উপরেই তার সবচেয়ে বেশী টান। সেখানা সে কাকে লিখেছিল বলা যায় না, কারণ লিপির মাথায় কোনো সম্বোধনই ছিল না। ভিতরেও

তার আসল লোকটির নামের খোঁজ মেলে না। তবে চিঠিখানা যে লিখেছিল তার খোঁজ যেটুকু মেলে সেটাও নেহাৎ ফেলে দেবার মত নয়।—

— মানুষের যেটা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধন, তার ভাগ সে প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারে না। দিতে গেলেই যে কমে যাবে। তাই আমার দুঃখিনীর ধন যে দুঃখ তার ভাগও আমি আর কাউকে দিতে চাই না। আর কিছু আঁকড়ে ধরবার মত, সারাজীবন যত্নে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবার মত ত আমার নেই; দুঃখও যদি না থাকত, আমি বাঁচতাম কার মুখ চেয়ে? কিন্তু যেদিন আমার শেষ হবে, মনে করেছিলাম, সেদিন তোমার হাতে আমার এ একলার ধন তুলে দিয়ে যাব। এ যে একান্ত আমারই। আর কাউকে কি আমি এর সন্ধান বলে দিতে পারি? এ ত বাইরে প্রকাশ করবার নয়। আমার দেবতা যে নিভৃতে এসে আমার বুকের মাঝখানটিতে এ অমূল্য নিধি রেখে গিয়েছেন। বাইরে ত তিনি তার কোনো চিহ্ন রেখে যান-নি। দেবতার উপর হাত চালিয়ে আমি কোন্ সাহসে জগতের কাছে তার সন্ধান বলে দেবো? কৃপণের ধন যেমন পৃথিবীর মাটির মাঝখানে কঠিন হয়ে লুকিয়ে থাকে কিন্তু উপরে তার চির-হরিৎ বসুন্ধরার ঘাসের আস্তরণ কোমল অঙ্গ মেলে থাকে, আমার এ বুকভরা কঠিন দুঃখের উপরেও তেমনি করেই আমার মুখভরা হাসি ফুটে আছে।

আমার মুখে তুমি চিরদিন হাসিই দেখে এসেছ, তাই ভয় হয় হয়ত এ কান্নার ইতিহাস তুমি বিশ্বাস করবে না।

শিশু যেদিন প্রথম পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে, সেদিন সে আনন্দের মাঝখানেই জেগে ওঠে। আমার সে প্রথম জাগরণের দিনেও কিন্তু কেউ আমাকে আনন্দে বরণ করে নেয়নি। যার কোলে আমি এসে পড়েছিলাম শুধু সেই আমায় কোল দিয়েছিল, কিন্তু তাও চোখের জলে ভেসে। সেই মায়ের কোলই ছিল আমার সমস্ত জগৎ। ওই একটি বন্ধনই আমায় সংসারের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। শিশুর বন্ধু জগতে অসংখ্য। রক্তের বাঁধন যাদের সঙ্গে তারা ত আছেই, আবার আনন্দের ভিতর দিয়েও বিশ্ব তার কাছে নানান রূপে ধরা দেয়। শিশু-সম্রাটের কাছে স্বেচ্ছায় দাস-খত লিখে দিতে সবাই পাগল। যাকে শিশু তার কচি আঙুলের কঠিন বাঁধনে না বাঁধে, তার দুঃখ রাখবার জায়গা থাকে না। কিন্তু সেই জন্মমুহূর্ত্ত থেকেই বিধাতা সেই শিশু আমির উপর বাম। রক্তের বাঁধন আমার কার সঙ্গে ছিল জানতাম না, তবে আনন্দে আমার কাছে কোনো মানুষ ধরা দেয়নি। বিশ্ব আমার কাছে নীরব প্রকৃতির বেশেই ছিল। মানুষের প্রাণের উচ্ছ্বাস তার মধ্যে এক কণাও ছিল না।

ছেলেবেলায় আপন বলে মেনেছিলাম এমন একটিমাত্র মুখ আমার মনে পড়ে, সে আমার মায়ের মুখ। তখনকার দিনে ঘটনা ত কিছু আমার জীবনে ঘটেনি, খেলার সাথীও কেউ ছিল না যে তার সঙ্গে কোনো স্মৃতি জড়িয়ে থাকবে। তাই সবই ছায়ার মত অস্পষ্ট।

প্রথম যে ঘটনার স্মৃতি আমার মনের মধ্যে পরিষ্কার করে আঁকা আছে, সে একটা কান্নার স্মৃতি। ছবির মত মনে পড়ে আমি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁধের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি আর মায়ের দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর করে অবিশ্রাম জল পড়ে যাচ্ছে। চোখের জলে ভেজা মায়ের সুন্দর মুখখানি শিশির-ভেজা পদ্মের মত আমার চোখের উপর এখনও ভাসছে। মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন একটি বৃদ্ধ। মাথার থোকা থোকা কোঁকড়া চুল তাঁর একেবারেই শাদা। সমুদ্রের ফেনার মত সেই চুলের রাশ তাঁর শান্ত করুণ মুখখানিকে ঘিরে আছে। মা তাঁকে বল্লেন, "দুঃখিনীর এই মেয়েটিকে আপনাকে দিতে এসেছি। এটুকু কাছে রাখবারও আমার উপায় নেই।" তিনি হাত বাড়িয়ে আমায় কোলে নিতে গেলেন; আমি মায়ের গলা আরো জোরে চেপে জড়িয়ে ধরলাম। মায়ের চোখের জল আমার মাথার উপর ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। জগৎ বলে আমি আমার মাকেই জানতাম। সেই আমার জগৎ, আমার বিশ্ব যে আমায় চোখের জলে বিদায় দিতে এসেছে, তা ওই তরুণ বয়সেই আমি বুঝেছিলাম। জন্মে অবধি যে অভাগিনী মা ছাড়া আর কারো কোলে যায়নি, আজ তাকে আদর করে কেউ বুকে তুলে নিতে এলে ত তার সংশয় হবেই। তার উপর আবার মায়ের চোখে জল। আমি সেই কান্না দেখেই কান্না সুরু করে দিলাম।

খুব যে কিছু বুঝেছিলাম, তা বল্‌তে পারি না। সেই অশ্রু-নাট্যের অভিনয় যে কতক্ষণ ধরে চলেছিল, তা আজ আর ভাল করে মনে পড়ে না, কিন্তু যখন সেই করুণ কোমল পুরুষ তাঁর নিষ্ঠুর হাতে আমাকে মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিলেন, তখন আকাশ অন্ধকার, পথে পথিকের চলাচলও বন্ধ। অশ্রুমুখী মা আমার তখনি ছুটে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, ভয় হয়েছিল বোধ হয়, পাছে আমার লোভ এড়াতে না পেরে আবার আমার ক্ষুদ্র বাহুর ডোরে বাঁধা পড়ে যেতে হয়। সেইখান থেকেই ঘাড় ফিরিয়ে আমায় কি একটা আশীর্ব্বাদ করে মা চিরবিদায় নিলেন। সেই আমার মাকে শেষ দেখা। তাঁর পরিচয় আমি জানি না, তাঁর শেষ আশীর্ব্বাদ-বাণীও আমার মনে নেই। মনে আছে কেবল তাঁর শেষ দান যা তাঁর আশীর্ব্বাদ-রূপে বিদায়ের দিনে আমার মাথার উপর শত ধারে ঝরে পড়েছিল। বিশ্বে আমার আপনার বলতে যে একজন ছিল, সেও আমায় দিয়ে গেল শুধু অশ্রুজল। তাই মাথা পেতে সেই দান নিয়েই আমি আমার জীবন-যাত্রা সুরু করলাম। সেইদিন থেকে অল্পে অল্পে আমার হৃদয়ের গোপন কক্ষটিতে আমার এই অমূল্য সম্পত্তি সঞ্চয় করে আসছি। মূলধন আমার মায়ের দান।

বুকভরা অভিমান নিয়ে আমি জন্মেছিলাম, কিন্তু অভিমান করবার লোক ত আমার কেউ ছিল না। যে ছিল সে ত শুকতারার মত ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই মিলিয়ে গেল। দীর্ঘ দিনটা পড়ে রইল শুধু আমার জন্যে। তাই আমি আমার ভাগ্যের উপর, দুঃখের উপর আর আমার ভাগ্যদেবতার উপরই অভিমান করলাম। ভগবান আমাকে কাঁদতেই সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর বিধানকেও উল্টে তবে ছাড়লাম। সেই যেদিন অচেনা সেই নিষ্ঠুর হিতৈষী আমাকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে এনে এই জগৎ-সংসারের মাঝখানে লোক-সমুদ্রে অসহায়ভাবে ফেলে দিলে, সেদিন থেকে আমি আর কাঁদিনি।

প্রথম কদিন সেই অজানা পুরীর একটি লোকের সঙ্গেও আমি কথা বলিনি। সেদিন রাত্রে আমার অভিভাবক আমায় যে খাটের উপর শুইয়ে রেখে গিয়েছিলেন, সেই খাট আঁকড়ে ধরেই আমি কেঁদে পড়ে রইলাম। নাইতে খেতেও আমি সহজে উঠতাম না। বৃদ্ধ আদর করে নিজের হাতে তুলে আমায় খাইয়ে দিতে এলেও আমি মুখ খুলতাম না। দাঁত দিয়ে ঠোঁট এমন জোরে চেপে ধরে থাক্‌তাম যে ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে আসত, তবু আমার জেদ ছাড়তাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃদ্ধ ভাতের থালা কোলে করে ম্লান মুখে বসেই আছেন। আমার জেদের জন্যে কত বেলা বোধ হয় তাঁর মুখেও দুটি অন্ন ওঠেনি। আমার মানভঞ্জনের জন্যে রাশি-রাশি খেলনা এসে বিছানায় জড়ো হতে লাগল; বাগানের ফুলের গাছে একটি কুঁড়ি অবধি বাকি রইল না—তাবই আমার ঘরে। তারপর ঘুসের লোভে পাড়ার যত খোকাখুকীও এসে জুটতে লাগল। চিরকাল ওদের সঙ্গ-থেকে বঞ্চিত বলে ওদের উপরেই আমার সবচেয়ে লোভ ছিল। এত সাধ্যসাধনাতেও বৃদ্ধ আমার মুখে যে হাসিটি ফোটাতে পারেননি, এই তরুণ মানবকদের সাহায্য নিতেই সে হাসি আপনা হতেই ফুটে উঠল। তারপর ক্রমে এই নূতন ঘরই আমার চিরপুরাতন হয়ে উঠল। শান্তমূর্ত্তি সেই অজানা বৃদ্ধকে আমি দাদামশায় বলে ডাক্‌তে সুরু করে দিলাম। নানান সম্পর্ক পাতিয়ে অতিদুঃখের মাঝখানেও একটু সুখের হাওয়া এনে ফেললাম। দাদামশায়ই আমার নাম রেখেছিলেন সুনন্দা। তার আগে কি নাম ছিল তা জানি না।

আরো দুচার বছর পরে দাদামশায়ের কাছে আমি পূজো করতে শিখলাম। ওতেই আমার ছিল সবচেয়ে আনন্দ। দাদামশায় বলেছিলেন, ঠাকুরের কাছে সব দুঃখ নিবেদন করা যায়, সব কান্না কাঁদা যায়, সব কিছু চাওয়া যায়। মানুষকে কিছু দিতে হ'লে এক তিনিই পারেন; অতিবড় দুঃখও তাঁর আশীর্ব্বাদে সয়ে যায়। কথাগুলো আমার খুব মনে ধরেছিল। রোজ সন্ধ্যায় ঠাকুরকে প্রণাম করতে গিয়ে আমি আমার মনের সকল কথা নিঃশেষে তাঁর চরণে অঞ্জলি দিয়ে আসতাম। মানুষের কাছে আমার মুখ ত অনেক দিনই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা সবাই ছিল আমার পর; তাই আমার বাইরের জিনিষ হাসিটুকুই শুধু তাদের জন্যে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার অন্তর জুড়ে

যে কান্না ছিল, সে ত পরের কাছে কাঁদা যায় না, তাই আমার যে আপনার সেই ঠাকুরের কাছেই আমি আমার হাসির ঘোমটা খুলে ফেলে নিজের আশল রূপে দেখা দিতাম। দাদামশায়ের ঘরে আমার আদরের অভাব ছিল না, কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার যে একটা বিশেষ প্রভেদ ছিল, সেটা আমি সেখানেও অনুক্ষণ পদে-পদে অনুভব করতাম। তিনি আমায় নিজের হাতে থাইয়ে দিয়েছেন, কিন্তু মাঘের রাত্রেও যদি কোনো দিন খাওয়ার কি পূজার আগে আমায় ছুঁতে হয়েছে, তা হ'লেই স্নান না করে নিস্তার নেই। আমি পাছে মনে একটুকু ব্যথা পাই, কি সামান্য কিছু সন্দেহ করি, তাই আমার সম্বন্ধে সমস্ত আচার-বিচারে দাদা-মশায় আমাকে খুব লুকিয়ে চল্‌তেন। কিন্তু আনন্দ যার চোখের পর্দা হয়ে আড়াল করে নেই, তার চোখ এড়াবে কার সাধ্য। দাদামশায় ধরা পড়ে গেলে মুখ তাঁর শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যেত, চোরের মত পালিয়ে বেড়াতেন পাছে আমি তাঁর এ ভীষণ অপরাধের কোনো কৈফিয়ৎ চেয়ে বসি। কিন্তু তিনি জানতেন না যে আমার ঠাকুর লোকের কাছে চাইবার কি বলবার জন্যে আমার আর কিছু রাখেন-নি। আমার যা কিছু নালিশ সব সেই একজনেরই চরণে। আসামী দাদামশায়কে আমিই এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে মুক্তি দিতাম। তাঁর কিন্তু আমার দিকে চোখ তুলে চাইতে অনেক দেরি হ'ত। পাড়ার লোকে অনেক সময় এসে দেখত আমি দাদামশায়ের তুষার-শুভ্র চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে কত রকম হাসি গল্প করছি। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কেউ কেউ জিগেষ করত, "ঠাকুর, উমা মা কি আপনার ঘরে এসে বাঁধা পড়ে গেছেন?" কথা শুনে দাদামশায়ের মুখ শাদা হয়ে যেত, তিনি আমার কি যে পরিচয় দেবেন ভেবে কূল পেতেন না। আমি হেসে বলতাম, "আমি দাদামশায়ের কুড়োনো নাতনী, উমাও না, রমাও না।" দাদামশায় ক্ষীণ হাসি হেসে ঘাড় নাড়তেন, মুখ দিয়ে কথা বেরোত না।

বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে দাদামশায়ের ক্ষীণ দেহ আরো ক্ষীণ হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। একদিন মাঘের শেষে শুন্‌লাম, এখানে থাকা আর আমাদের চল্‌বে না। শেষ বয়সে দাদা-মশায় মাধবপুরে দেশের মাটিতে মাথা রেখে বিশ্রাম নিতে চান। মাধবপুরের আমবাগানে বসন্তের দূত আম্রমঞ্জরীর আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে বাগানের মাঝখানের লালবাড়ী-খানাতে আমাদেরও উদিত হতে হ'ল। শ্মশানপুরীর মত শূন্য সেই নির্জ্জন বাড়ীর চারধারে লোকজনের চিহ্নও পাওয়া যায় না। শুনেছি এককালে ঐ বাড়ীতেই লোক ধরত না। উৎসবে আনন্দে সারা বছরের মধ্যে বাড়ীখানা একদিন বিশ্রাম পেত কি না সন্দেহ। অন্দর-মহল, বৈঠক-খানা, নাটমন্দির, দেবালয়, কিছুরই অভাব নেই; কিন্তু সবই এখন শূন্য। আছে কেবল দেবালয়ের নিত্য পূজার পাট। লক্ষ্মী যেদিন সামান্য কোন্ অছিলায় দাদামশায়ের প্রতি প্রথম বাম হন, সেদিন থেকে একে-একে সবাই তাঁর প্রতি বাম হ'তে সুরু করলে। শুনেছি ষষ্ঠীর কৃপা তাঁর উপর অফুরন্ত ছিল, কিন্তু শেষকালে একটি মাত্র পৌত্র না দৌহিত্রতে গিয়ে ঠেক্‌ল। তার মায়াও কাটাবেন বলেই তিনি দেশের ঘরবাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মরণ যখন ঘনিয়ে এল, তখন তাঁর বংশের শ্মশান তাঁকেও নিজের কোলে ডাক দিলে। দাদামশায় বাড়ী ফেরবার দিনে বল্লেন, "যে মাটিতে একে-একে বুকের সব ক'খানি হাড় বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি, এ ভাঙা পিঁজরাখানা আর তার কাছ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে কি সুখ পাব? যাই, তবু তাদের শ্মশানে মরেও যদি জুড়োতে পারি।" যে মরণের লোভে এখানে এসেছিলেন, সে মরণ ত আসতে ভোলেনি, কিন্তু হাড় তাঁর জুড়িয়েছে কি না কে জানে!

এই শ্মশানপুরীর সেই প্রদীপ তোমায় যেদিন প্রথম দেখি, সে অনেক দিনের কথা। তোমার কি মনে আছে? তোমাদের বাড়ীর ঘাট যখন বাঁধানো হয়েছিল, তখন বোধ হয় নদীর গতি অন্য-রকম ছিল। তার পর কতকাল গেছে, নদীর মুখ ফিরে গেছে, কিন্তু পাথরে-বাঁধা ঘাট সেই তার চির-পুরাতন কোণটিতেই অচল হয়ে আছে। জল সরে যাওয়াতে ঘাটের শেষ সিঁড়ির পরেও অনেকখানি পায়ে-হাঁটা পথ সাপের মত এঁকে-বেঁকে নদীর ভিতর গিয়ে পড়েছে। তার উপরে ত্রিভঙ্গ হয়ে একটা বড় বটগাছ নদীর উপর ঝুঁকে পড়ে কালো জলের বুকে কতকাল ধরে নিজের ছায়াই দেখে আসছে। নদী আদর করে তার

পা ধুইয়ে ধুইয়ে সমস্ত ধুলামাটি নিজের অঙ্গে তুলে নিয়ে শুধু অসংখ্য শিকড়ে বোনা হাড়-পাঁজরের মত কাঠামোখানা রেখেছে। আদরের ঘটা বেশী বাড়লে হয়ত তাকে একদিন সশরীরেই নদীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এই বট-গাছের তলায় দুখানা বড় পাথর জোড়া দিয়ে এখনকার ঘাট। সেদিন খুব ভোরে, নদীর জল তখনও উষার আলোয় রাঙা হয়ে ওঠেনি, ধূসর অঙ্গ মেলে দিয়ে তরুণ অরুণের প্রথম চুম্বনে সিঁদুর হয়ে ওঠবার অপেক্ষা করছে; আমবাগানে দোয়েল পাপিয়া সেই সবে সূর্য্যদেবকে ডাকা-ডাকি সুরু করেছে; এমন সময় আমি ঘর ছেড়ে নদীর ঘাটের সেই পাথরের উপর গিয়ে বসেছিলাম। ভাবছিলাম আমার ভাগ্যের কথা; ত্রিকুলে কেউ আছে কি না জানি না বলেই কপালগুণে যার ঘরে এসে পড়েছি, তারও ঘরে দুদিন পরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাবার লোক জুটবে কি না বলা ভার। হাত দিয়ে নদীর জল কাটতে কাটতে এমনি কত কি ভাবছিলাম, পায়ের শব্দে চোখ তুলে হঠাৎ চাইতেই দেখি তরুণ ব্রহ্মচারীর মত দীপ্তমূর্ত্তি তুমি সেই পায়ে-হাঁটা পথে নদীর দিকে এগিয়ে আসছ। উষার আলো চোখে পড়বার আগেই তোমার সঙ্গে সেই আমার প্রথম শুভদৃষ্টি। জানি না সে কি অশুভক্ষণে ঘটেছিল!

তার পর যখন জানলাম, এ বাড়ীতে নবীন আর প্রবীণ বলতে তুমি আর দাদামশায় এই দুটিমাত্র আমার পাবার মত সঙ্গী, তখন প্রবীণকে বাদ দিয়ে আমি তোমাকেই বেছে নিলাম, তুমিও আমাকেই বেছে নিলে। তোমার সঙ্গ পেয়ে আমার চিরদিনের বাইরের হাসি ক'দিনের জন্যে অন্তরের হয়ে উঠে আমার ভিতর-বাহির আলোয় আলো করে দিলে। সে কদিনের জন্যে আমার সব দুঃখ আমি বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম; মনের কোনো কোণে এতটুকু দুঃখও মুখ আঁধার করে ছিল না। ঘাটে, পথে, মাঠে দিনগুলো যে কেমন করে কেটে গেল, তা আমি একবার টেরও পেলাম না। এখন শুধু মনে হয়, কোন্ সুদূর অতীতে স্বপ্নের ঘোরে তারা দেখা দিয়েছিল, আবার চোখ না মেলতেই সোনার পাখা মেলে নিঃশব্দে কখন্ আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেছে। স্মৃতি হয়ে পড়ে আছে শুধু তাদের খসাখসা একটি পালক।

আমি চোখ বুজে আমার এতদিনের দুঃখের শোধ বোধ-হয় সেই কদিনেই তুলে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অত মূর্চ্ছনা সে সোনার তারে সইবে কেন? তার একদিন ছিঁড়ে গেল, আমার আনন্দ-গানও সেই থেকে থেমে গেছে।

আমাদের ছেলে-খেলার দিনগুলো হাসি আর গানে যখন ভরপূর হয়ে উঠেছে, তখন ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীটার এক কোণে দাদামশায় তাঁর শেষ শয্যায়। সারাদিনটাই নিজের আনন্দ নিয়ে কাটিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় আমি রোজ দুবার তাঁর ঘরে খোঁজ নিতে যেতাম। আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে দাদামশায়ের শান্ত দৃষ্টি কেমন যেন করুণ হয়ে আসত, তিনি তাঁর দুর্ব্বল হাতখানি তুলে আমার মুখে চোখে মাথায় এমন স্নেহভরে বুলিয়ে দিতেন, যেন আমার দেহের সমস্ত গ্লানি তাঁর হাতের স্পর্শে দূর হয়ে যাবে। আমি জানতাম, পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেবার দিনে পরপারের কথার চেয়ে তিনি তাঁর আশ্রিতা দুঃখিনীর কথাই বেশী ভাবেন। এই বয়সে দরিদ্রার এই অসহায় অনাথা মেয়েটিকে কার কাছে ফেলে যাবেন, সেই ভাবনাতেই তাঁর আয়ু যেন আরো শীঘ্র শেষ হয়ে আসছিল। আমি জানতাম, আমার নীচকুলে জন্ম, দাদামশায়ের মত উদার মহৎ পুরুষও যখন খাবার আগে আমায় ছুঁলে স্নান করতেন, তখন আর-কোনো ভদ্রলোক ত আমায় ঘরে ঠাঁইও দেবে না। কিন্তু তোমার সঙ্গে মিলনের সে কটা দিন আমার ওসব কথা ভাববারও অবসর ছিল না। দাদামশায় কত সময় আমাকে কাছে টেনে বসিয়ে কি যেন একটা কথা বলবার ব্যর্থ প্রয়াস করতেন, তাঁর চোখে সে কথা প্রায় ফুটে উঠত, আমার কাছে—তাঁর এই আশ্রিতার কাছেই তাঁর যেন কি একটা নিবেদন আছে মনে হ'ত, কিন্তু আমার তখন সে বৃদ্ধের চোখের কান্নার ভাষা পড়বার সময়ও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না; তোমার তরুণ চোখে যে নিত্য নূতন ভাষা শতদল-পদ্মের মত হাজার কথা ফুটিয়ে তুলত, আমার সমস্ত মন তখন সেই দিকে। হেসে দুটো কথা বলে, মাথার বালিশ কটা গুছিয়ে দিয়ে, বিছানার চাদরটা একটু ঝেড়ে দিয়ে, আমি যখন ক্ষিপ্রগতিতে কত ঘর বারান্দা পার হয়ে নিজের মনে চলে যেতাম, তখন আমার পিছনে যে কত দীর্ঘশ্বাস শূন্যে মিলিয়ে যেত, তার

ঠিকানা নেই। আজ চোখে না দেখেও সে সমস্তই আমার চোখে পরিষ্কার ভেসে উঠ্‌ছে, কিন্তু সেদিন চোখে আঙুল দিলেও চেয়ে দেখ্‌তাম না বোধ হয়।

সেই যে একদিন পদ্মবনের ধারে ঘাসের উপর বসে তোমাতে আমাতে প্রকাণ্ড পদ্মফুলের মালা গেঁথেছিলাম, সেদিনকার কথা তোমার মনে আছে কি? একই সুতোর দুই মুখ দিয়ে দুজনে ফুল পরিয়ে পরিয়ে মালাটা বড় করে তুল্‌ছিলাম; পাছে দুজনের ফুল মিশে যায় বলে মাঝখানে একটা বড় ফোটাফুল ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। দাদামশায় পদ্মফুল বড় ভালবাসতেন, তাই আমি মালাটা নিয়ে তাঁর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি মুখ ফিরিয়ে শুয়ে ছিলেন। আমি ডেকে বল্লাম, "দেখ দাদামশায়, কত বড় মালা, এই দেখ, পরলে আমার পা পর্য্যন্ত পড়ে।"

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "পদ্মের আড়ালে যে লুকিয়ে গেলিরে! একেবারে দেবী সরস্বতী! এত ফুল কে দিলে?"

"তোমার নাতি শঙ্করপ্রসাদ।"

মনে হ'ল দাদামশায়ের রক্তহীন মুখ যেন আরো একটু বিবর্ণ হয়ে গেল। তবু তিনি হেসে বল্লেন, "সুনন্দা দিদি, তোমরা যে হেসে খেলেই দিনগুলো শেষ করলে দেখছি। তা প্রতিদিনই সকাল সন্ধ্যে এত হাসি খেলা কি ভাল? এর পর, বড় হচ্ছ, আরো কত ভাবনা চিন্তা আছে, সুখ দুঃখ আছে, সেদিকেও ত চাইতে হবে? পৃথিবীটা ত শুধু হাসি দিয়ে গড়া নয়; কাঁদবার জিনিষেরও সেখানে অভাব নেই। হেসেই যদি দিন কাটে, তবে কান্নার দিনে দুঃখ বড় কঠিনরূপে দেখা দেবে। বেদনার সে আঘাত সইতে পারবে কি না বলা শক্ত। তা' দিদি তোমায় দেখে কথাগুলো মনে হ'ল তাই বল্লাম। ঠাকুর করুন, তোমার যেন দুঃখের দিন না আসে। তবু প্রস্তুত হওয়া ভাল।"

আমি ফুলের মালাটা দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে চলে এলাম। বুঝলাম আমাদের প্রতি-অঙ্গই তাঁর কাছে আমাদের আনন্দ-উৎসবের কথা জানিয়ে দিয়েছে। তাঁর কোণের ঘরটিতেও আমাদের হাসির ঢেউ বাতাসের সঙ্গে ভেসে গিয়েছে। কিন্তু সে হাসি আনন্দ তাঁকে সুখ দেয়নি, বেদনাই দিয়েছে। তাঁর হৃদয়ের কোনো গোপন দুঃখ আমাদের হাসির ঘায়ে আবার জেগে উঠেছে। আমিই কি সে দুঃখের কারণ?

সেদিন আর কারুর সঙ্গে কথা কইনি। নদীর ধারের পাথরের বারান্দায় একলাটি মুখ আঁধার করে বসে রইলাম। কেবলি মনে হচ্ছিল, কি একটা কঠিন দুঃখের অগ্রদূত আজ দেখা দিয়েছে। আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠ্‌ছিল। কি সে দুঃখ, যা আমার মাথার উপর উদ্যত হয়ে আছে? কিসের জন্যে প্রস্তুত হব? একবার মনে হ'ল তুমি বুঝি আমার নামে কোনো কথা দাদামশায়ের কাছে বলেছ। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লাম, আমি ত কখনো তোমার কাছে কোনো অপরাধ করিনি। তবে কি? দাদামশায়ের কাছেও ত কোনো দোষ হয়নি। তবে বুঝি আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে! সেই খবরটা আমাকে দেবার জন্যে দাদামশায় অত করে আমায় প্রস্তুত করছিলেন। সেই কোন্ শিশুকালে মাকে দেখেছি, মায়ের সেই অশ্রু-সজল মুখ মনে পড়ল, কিন্তু আজ ত সেই সে-দিনের মত দুই চোখ বেয়ে জল নেমে এল না। আমার আর আপনার বলতে কেউ নেই মনে করে দুঃখ হ'ল বটে, কিন্তু সেটা আগে ভেবে-চিন্তে দেখ্‌বার পর। যে-দিন চোখের জলে মাকে বিদায় দিয়েছিলাম, সে দিনকার কথা মনে পড়ল। মা ত আমাকে লোককে দিয়ে দিয়েছে, সে মায়ের জন্যে কাঁদতে যাব কেন? কেন, গরীবের ঘরে কি আমার এক মুঠো অন্নও জুটত না? যার যা খুসী হোক, আমি কিছুতেই কাঁদব না। শক্ত হয়ে বসে আমি দাদামশায়ের ভয়-দেখানো কথাগুলো মন থেকে দূর করে দিলাম।

তার পরদিন থেকেই আমাদের অজস্র আনন্দের স্রোতে মন্দা পড়ে গেল। আমিই সব-তাতে গা-ঢিলে দিতে সুরু করলাম। যেন এককোণে বসে আপন মনে কাজকর্ম্ম করাই আমার চিরদিনের অভ্যাস, এমনি ভাবে খুঁটিনাটি যা' তা' নিয়ে সারা দিন কাটিয়ে দিতাম। তুমি আমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে ফিরে যেতে; কখনো যদি বা কিছু বলতে, আমি এক মুখ হেসেই উত্তর দিতাম; কিন্তু আগের মত তেমন সহজ আনন্দের উচ্ছ্বাস আর রইল না।

কদিন ধরে আমার ব্যবহার লক্ষ্য করে যেদিন সকাল-বেলা তুমি গিয়ে সারা সকালটাই দাদামশায়ের ঘরে

কাটিয়ে এলে, সে-দিন তুমিই বা তাঁকে কি বলেছিলে আর তিনিই বা তোমাকে কি বলেছিলেন, তা' আমি জানি না; কিন্তু সারাদিন বাড়ীতে বই হাতে করে বসে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা যেই তুমি বেরিয়ে গেলে অমনি দাদামশায়ের ঘরে আমার ডাক পড়ল। দাদামশায় বল্লেন, "দিদি সুনন্দা, আমার ত দিন ফুরোলো। এখন যাবার আগে তোমার আর শঙ্করের কাছে আমার যা' বলবার আছে, তা' বলে যেতে হবে ত। তাই দিন থাক্‌তে আজই তোমায় ডাকলাম। তাকে যা বলবার আমি বলে নিয়েছি। আর সে পুরুষ মানুষ তার জন্যে আমার ভাবনা কি? বিয়ে করে ঘর সংসার পাতবে, যেমন করে হোক দিনগুলো কেটে যাবে। তোমার জন্যেই যা ভাবনা।" দাদামশায় আমার মুখের দিকে তাকালেন। তোমার বিয়ের কথা আগে কোনো দিন ভেবে দেখিনি, প্রথম কথাটা শুনে আমার মুখ শুকিয়ে গেল; আমি মুখটা নীচু করে পাশ ফিরে বস্‌লাম। দাদামশায়ের চোখের দিকে তাকাতে পারলাম না।

তিনি আবার বল্‌তে লাগলেন, "দেখ দিদি, তোমায় আমি যে কতখানি ভালবাসি তা' তুমি বুঝবে না। আমার শঙ্করের চেয়ে কম হবে না। যে-দিন এ ঘর দোর শ্মশান করে দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলাম, সেদিন মনে করেছিলাম যে-কটা দিন আছি ভাল আর কাউকে বাস্‌ছি না। ওর মত দুঃখ জগতে আর কিছুতে দেয় না। কিন্তু তোর মুখখানা দেখে আমার সব প্রতিজ্ঞা ভেসে গেল। ভগবান শূন্য মন ফেলে রাখেন না; কাউকে না কাউকে তার মাঝখানে আসন দেনই। তাই সেদিন থেকে আমার বুক জুড়ে তোর মুখখানা জেগে রইল। শঙ্কর মামাবাড়ী ছিল," তাকে আমি ইচ্ছে করেই কাছে নিইনি; কিন্তু ফাঁকি দিয়ে যাব কোথায়? তুই এসে তার ঠাঁই জুড়ে বস্‌লি। সেদিন থেকে প্রাণ দিয়ে কেমন করে তোকে হাতে করে গড়ে তুলেছি, কত দুঃখ পেয়েও তোকে ছাড়িনি, তা ত তুই জানিস্ দিদি। দুঃখের একটি আঁচড় তোর গায়ে লাগতে দিইনি, পাপের ধূলিকণাও পায়ে ঠেক্‌তে দিইনি। বুক দিয়ে সব থেকে তোকে আমি বাঁচিয়ে এনেছি। কিন্তু হলে কি হয় দিদি, আজ যাবার আগে অতি কঠিন আঘাত আমাকেই তোর প্রাণে দিতে হবে। নইলে যে উপায় নেই। আর কোনো পথ ভেবে পেলাম না। এতদিন যে বোঝা আমি বয়েছি, আজ তোর কোমল অঙ্গে তার ভার তুলে দিতে হবে।" দাদামশায়ের কথা শুনে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছিল। আমি একবারও না নড়ে নিঃঝুম হয়ে সেইখানেই বসে রইলাম।

তার পর যা শুন্‌লাম, সে বড় কঠিন কথা। শুন্‌লাম আমার অজানা পাপের ইতিহাস। পাপ কাকে বলে তা আমি জানতাম না; কিন্তু শুন্‌লাম আমার শরীরের প্রতি-বিন্দু রক্তেই পাপ। বুঝলাম, অন্নের অভাবে আমি এঘরে আসিনি, মায়ের সঙ্গের হাত থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্যেই মা আমাকে নিজের হাতে বিসর্জ্জন দিয়েছেন। দাদামশায়ের পুণ্যের জোরে যদি আমার পাপটা ধুয়ে যায় তাই তাঁর হাতে আমাকে সঁপে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাপ ত যায়নি। আমি যে জন্ম-দাগী, আমার দাগ মিলোবে কি করে? কয়লার কালী কি ধুলে যায়?

দাদামশায় বল্লেন, "দেখ্ দিদি, তোকে আমি বড় ভালবাসি। কিন্তু মানুষের মাটির শরীর কিনা; একটু ছোঁয়া লাগলেই কালী লেগে যায়। তাই তোকে ব্যথা দিয়েও আমি তোর ধরা-ছোঁওয়ার আচার-বিচার করেছি। তোর কাছে ধরা পড়বার ভয়ে আমি চোরের মত পালিয়ে বেড়িয়েছি। আজ যাবার সময় ঘনিয়ে এল, আজ আর আমার লুকিয়ে রাখা সাজে না; তাই সব বলে যাচ্ছি। যে বুড়ো মরণকাল অবধি তোকে আগলে এল, তার একটি অনুরোধ রাখিস্, দিদি। তোর নিজের চোখে এখনো যা ধরা পড়েনি, আমার চোখে অনেক দিনই তা' ধরা পড়েছে। আমার শঙ্কর যে দিনে দিনে তোকেই তার চোখের মণি করে তুলছে তা আমি দেখেছি, আজ সকালে তার প্রমাণও পেয়েছি। সুনন্দা, আমি জানি তোর মনে কোথাও একটু পাপ নেই, গঙ্গাজলের মত তুই নির্ম্মল। কিন্তু মানুষের সমাজে তাতে যে কিছু হয় না ভাই। মানুষ তার মাটির শরীর নিয়ে বড় ভয়ে ভয়ে বাঁচিয়ে চলে। তাই বলছি দিদি, আমার এই একমাথা পাকা চুল ছুঁয়ে তুই বল্, আমার আঁধার ঘরের শেষ রশ্মি শঙ্করকে তুই সমাজের চোখে সমাজের মানুষ হয়েই চলতে দিবি। তুই যদি কঠোর হোস্, তবে তার পুরুষের মন একদিন তোকে ভুলবেই ভুলবে।

"আমার এ ঘর বাড়ী কিছু আমি শঙ্করকে দিয়ে যাব না। সমস্ত তোরই নামে লিখে দিয়েছি। নইলে তুই দাঁড়াবি কোথায় ?"

ঘরবাড়ীর কথায় আমার গায়ে যেন কে বিছুটি দিয়ে গেল। তবু কথা কইলাম না; তাঁরই কথামত মাথায় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম। কিন্তু যখন করলাম তখন বুঝলাম কতখানি করেছি। আগে একদিনও বুঝিনি।

তিনি আরো বল্লেন, "দিদি, আশীর্ব্বাদ করছি আর-জন্মে তুমি সাবিত্রী হয়ে জন্মো। তোমার এজন্মের তপস্যায় জন্মজন্মান্তরের সমস্ত কালী ধুয়ে যাবে। এজন্মে দেবতা রইলেন তোমার স্বামী, পৃথিবীর পাপ তাঁকে স্পর্শ করে না। সতীলক্ষ্মী হয়ে তাঁর সেবা কোরো। তাঁর চরণপ্রসাদে জন্মান্তরে তুমি তোমার তপস্যার ফল পাবে।"

কঠিন প্রতিজ্ঞা করে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সেই দিন থেকে শঙ্করের জন্য আমার উমার তপস্যার সুরু। এতদিন ছিলাম বালিকা, সেদিন হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে নারীর প্রাণ জেগে উঠ্‌ল। বুঝলাম, না জেনে দিলেও তোমাকেই সব দিয়ে ফেলেছি। সকল-লজ্জা-নিবারণ যিনি তিনিই আমার মুখ রেখেছেন; তাই এ দানের কথা তুমিও জাননি, আমিও জানিনি। তোমায় ভাল বেসেছি বলেই আজ তোমায় ভুলতে হবে। কিন্তু মানুষের মন যেটা ভুলতে চায় সেইটেই যে তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসে। এতদিন যা ছিলে না, তোমার পথ মাড়াব না প্রতিজ্ঞা করতেই তুমি আমার তাও হয়ে বস্‌লে। সোজা পথে ত মানুষের মন চলে না, অসম্ভবের আশাই তাকে টেনে নিয়ে চলে।

তার পর অল্পে অল্পে আমি তোমার পথ থেকে সরতে সুরু করলাম। হঠাৎ সরলাম না, পাছে তুমি টের পাও। এমনি ভাবেই সরতে লাগলাম, যেন বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেখেলার সাধটা ফুরিয়ে যাচ্ছে। তোমার উপর যে আমার একটা টান ছিল, সেটা আমি নিজের কাছেও অস্বীকার করতে সুরু করে দিলাম; যেন খেলারই আনন্দে তোমায় শুধু সঙ্গী নিয়েছিলাম।

আগে তোমার সঙ্গে আমি কখনও বিয়ের কথা বলিনি, আজকাল অহরহ তোমায় বউয়ের কথা বলে ক্ষ্যাপাতে সুরু করে দিলাম। তুমি রাগ করতে, আমি আমার উপর তোমার রাগটা বাড়িয়ে তোলবার জন্যে আরো বলতে থাকতাম। ভাবতাম তুমি আমারই উপর রাগ করেছ! কিন্তু এখন বুঝেছি আমার উপর নয়। সেই পৌষ সংক্রান্তির দিনে তুমি বোধহয় আমায় কি বলবে বলে এসেছিলে। তোমার হাতে একছড়া ফুলের মালা ছিল। হাসিমুখে সেটা আমার হাতে তুলে দিয়ে তুমি কি বল্‌তে যাবে, অমনি আমি বলে উঠ্‌লাম, "আচ্ছা বোকা যাহোক তুমি, এখন থেকে পরের জন্যে বেগার খেটে মর কেন ? যখন একজন আসবে তখন ফুলের মালা জুগিও। বেনা বনে শুধু শুধু মুক্তো ছড়াও কেন ?"

তুমি নীরবে ব্যথাভরা চোখ তুলে আমার দিকে চাইলে। তোমার দৃষ্টি যেন বলে গেল, "সুনন্দা, তোমার মুখে এমন কথা!" আমি যেন কিছুই বুঝিনি এমনি ভাবে নেহাৎ খাপছাড়া-রকমের কি একটা পিঠের গল্প জুড়ে দিলাম। কিন্তু তোমায় ঘা দিতে আমার বুকে যে কত-খানি লাগত তা ত তুমি বুঝতে না। তুমি মনে করতে আমার পাষাণ-হৃদয়ে কোথাও এক ফোঁটা কোমলতা নেই। কিন্তু সেই পাষাণ ভেদ করেই আমার হৃদয়ে সহস্রধারা ঝরে পড়ত।

সেদিন তোমার কথা বলা হ'ল না। ম্লান মুখে তুমি চলে গেলে। আমি তোমায় শুনিয়ে শুনিয়ে খুব হাসির লহর তুলে ও-পাড়ার মন্দাকে রাজ্যের হাসির খবর দিতে বস্‌লাম। মন্দা শুনেছিল কি না জানি না, কিন্তু তুমি যে শুনেছিলে তা' জানি।

তোমায় ভাল বেসেছিলাম বলেই তোমাকে আমি অত করে ঘা দিতে চেষ্টা করতাম, আমায় নিষ্ঠুর বলে বুঝলেই যে তোমার মঙ্গল। তোমারি মঙ্গলের জন্যে আমি সাধ করে তোমার কাছে খোসনাম হারাতে চাইতাম—নইলে আমার কিসের গরজ।

যে অপমানের বোঝা নিয়ে আমি জন্মেছিলাম, সে অপমান ধ্রুব হ'য়ে আমায় ঘিরেই থাকুক; আর কাউকে সে বোঝা মাথায় নিয়ে মাথা হেঁট করতে আমি দেবো না। আর তোমায় ত আমি তার এককণা স্পর্শ করতেও দিতে পারব না। তাই এ অপমানিতার কাছ থেকে দূরে রাখবার জন্যই তোমায় আমি অত করে ঘা দিতাম। তোমার নিষ্কলঙ্ক কপালে কলঙ্কের ছাপ দিতে আমি প্রাণ থাকতে পারব না।

আমার ভয় হ'ত যদি একবার তোমার কাছে আমার মনের কথাটি ধরা পড়ে যায়, যদি তুমি জান্‌তে পার, তোমাকে আমি কতখানি দিয়ে ফেলেছি, তবে হয়ত শত অপমানের বোঝা মাথায় করেও তুমি আমায় তোমার চিরসঙ্গী করে নেবে। কিন্তু আমি তা হ'তে দেবো না। সকল ধর্ম্ম যাকে ছেড়ে দিয়েছে, যাকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়েছে, তোমার সহধর্ম্মিণী হবে সে কিসের স্পর্দ্ধায়?

একবার মনে করেছিলাম, তোমার কথাগুলো শুনে, আমারও যা বলবার আছে বলে নি। আমি যে কিসের দায়ে ঠেকে তোমাকেও বেদনা দিতে পেরেছি তা' জানিয়ে দি। কিন্তু মনে হ'ল আমি যদি তোমাকে এ দুঃখের ভার দি, তবে তোমার দুঃখই বাড়বে; দুঃখ ভোলবার পথ আর হবে না। তাই ভেবেছিলাম, আপনি বিরূপ হয়ে তোমাকেও বিরূপ করব। কিন্তু এখন দেখছি আমিই ভুল বুঝেছিলাম। এর চেয়ে সে দুঃখ ছিল ভাল।

পূজোর সময় সেবার যখন পদ্মবনের ধারে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'ল, তখনই তোমার চোখে আমাদের সেই পুরানো স্মৃতির কথা ভেসে উঠল। তুমি ভেবেছিলে আমিও তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই সে সব কথা বুঝে ফেলব। কিন্তু আমি একেবারে নূতন মানুষের মতন বল্লাম, "এখানে ত দেখি এবার খুব পদ্মফুল ফুটেছে!"

তুমি বল্লে, "কেন, সেই যেবার তুমি আর আমি একসঙ্গে একটা মালা গেঁথেছিলাম সেবার কি কিছু কম ফুটেছিল?"

আমি বল্লাম, "ওঃ সে কবে ছেলেবেলায় কি হয়েছিল, আমার মনেও পড়ে না।"

তুমি বল্লে, "সে কি, সুনন্দা, এখনো যে বছর ঘোরেনি, এর মধ্যে ভুলে গেলে?"

আমি একটু হেসে বল্লাম, "তা হবে হয়ত, আমার অত খুঁটিনাটি মনে থাকে না।"

তুমি দুঃখিত হয়ে বল্লে, "আমার ওর চেয়েও ঢের খুঁটিনাটি মনে আছে।"

আমি ভালমানুষ সেজে বল্লাম, "আমার ভাই, স্মৃতিশক্তিটা দিন-দিনই যেন কোথায় যাচ্ছে, এর পর তোমার কাছে মনে রাখা শিখতে হবে।"

আজ যদি সাক্ষ্য দিতে পারতাম, তবে কিন্তু দেখিয়ে দিতাম খুঁটিনাটি মনে রাখায় আমি তোমার কত উপরে। মুখে অমন অনেক কথা বল্লেও, বাইরে তোমায় একেবারে এড়িয়ে চল্লেও, তোমার সকল কাজ, সকল অভ্যাস, চলা ফেরা, কথা বলা, সব আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, আমার সমস্ত দেহমনে তার সাড়া বাজত। তোমাকে ভুল বোঝাবার জন্যে আমি তোমার চলাফেরা দেখেও দেখতাম না; কিন্তু তোমার সমস্ত কাজের সঙ্গে-সঙ্গে আমার কাজকর্ম্ম দিনে দিনে ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিত হয়ে উঠছিল। তোমার সমস্ত কাজের সুবিধা অসুবিধা দেখে আমি যে কেন তার সুব্যবস্থা এতকাল ধরে করে এলাম তা তুমি বুঝলে না। আমার না হয় ভয় ছিল তুমি পাছে ধরে ফেল, তা বলে তুমি কি এমনি অন্ধ হয়ে ছিলে যে এতদিনেও টের পেলে না?

তোমায় জানিয়ে তোমার কাজ করা, কথা শোনা, তোমায় দেখা, আমার যত কমে আসতে লাগল, আড়ালে সেটা ততই বেড়ে উঠল। কখন্ যে কিসের অবসর মিলবে সব আমার নখের আগায় গোনা ছিল। আমি জান্‌তাম, এতে আমার কোনো পাপ নেই, শুধু তৃপ্তি আছে। তোমার অনিষ্ট এতে এক বিন্দু হবে না। আর আমারই বা কেন হবে? তুমিই ত আমার দেবতা; গোপনে দেবতার পূজায় কি পাপ আছে?

মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করতে আমি রোজ ভোরেই যেতাম। তখন আমার সমস্ত সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনার কথা তাঁকে জানিয়ে আসতাম। আমি যে তোমারি জন্যে তোমার সঙ্গে ছলনা করেছি, নিজের সঙ্গেও করেছি, সে কথাও বলতে ভুলতাম না।

কিন্তু বল্লে কি হবে? তোমার জন্যে আমি সেই দেবতার সঙ্গেও ছলনা করেছি। আজ মাথা হেঁট করে সে অপরাধ স্বীকার করছি, চিরজাগ্রত ঠাকুর দুঃখিনী অবলাকে ক্ষমা করবেন। আরতির সময় হাত জোড় করে মাথা নীচু করে রোজ সন্ধ্যায় যখন আমি শিবমন্দিরে পাষাণ-প্রতিমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকতাম, তখন কি তার পূজা করতাম? আমি তখন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতাম, তোমার দৃষ্টির অভিষেক। তুমি যে তোমার

নির্মল [illegible] দৃষ্টি দিয়ে আমার এ পাপ দেহকে স্নান করিয়ে তিলে তিলে তার অণুপরমাণুকে পবিত্র করে তুলতে আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে তাই অনুভব করতাম। আর ভাবতাম তপস্যার শেষে সিদ্ধিলাভের দিন আমার এগিয়ে আসছে। এ জন্মে তোমার দৃষ্টির তলে নিষ্পাপ হয়ে উঠে পরজন্মে তোমাকেই লাভ করব। তখন দেবমন্দিরের আরতির শব্দ আমার কানে মিলিয়ে যেত। ঘিয়ের পঞ্চপ্রদীপের আলো কি ঘ্রাণ আমার কোনো ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করত না। শব্দ, গন্ধ, রূপ, রস, সব তখন তোমাতেই একাকার। আজও সে মন্দিরের হাওয়ায় প্রতি-সন্ধ্যায় আমি তোমাকেই অনুভব করে পুলকিত হয়ে ঘরে ফিরে আসি।

ঘরে এসে তার পর ভয় হ'ত, দেবতার সঙ্গে ছলনা করে আমি যদি তোমার অকল্যাণ করে থাকি? তবে তার বাড়া শাস্তি আর আমার কি হতে পারে? আরো মনে হ'ত পাষাণের ঠাকুরের উপর ত তোমার বিশ্বাস নেই, তবে তুমিও ছলনা করেছ? যদি করে থাক তবে সে আমারি জন্যে, সে পাপও আমারি। তখন আমি শিউরে উঠে তোমার মঙ্গলের জন্যে আমার দেহ মন সমস্ত মানত করতাম।

দাদামশায় বলেছিলেন, মানুষের পাপ দেবতাকে স্পর্শ করে না, তাই আমি ঠিক করলাম মন্দিরের সেবাতেই আমি আমায় উৎসর্গ করব। শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ মন্দিরের দরজা ধরেই এ বাড়ীতে পড়ে থাকব; তোমার ঘরবাড়ী আমি দাদামশায়ের হাজার কথাতেও নিতে পারিনি, সে তোমাকেই আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। মন্দিরের কাছে ছোট একখানি ঘর বেঁধে থাকবার আমার সাধ ছিল। ইচ্ছা ছিল ঐখান থেকে দেখব, তোমার ঘর আলো করে তোমার গৃহলক্ষ্মী তাঁর শুভস্পর্শে সোনার সংসার সাজিয়ে তুলছেন। কিন্তু সে সাধ আমার মিটবে কি না কে জানে? আমি জানি মিটবে না, কিন্তু প্রাণ ধবে ও-কথা বলতে কিছুতেই পারি না। এখনও সেই আশাতেই তোমার ঘর আগলে বসে আছি।

আজ কতদিন ধরে রোজ ভোরে স্নান করে মন্দিরের সিঁড়ি ধুয়ে, ফুল সাজিয়ে, আঙিনা ঝাঁট দিয়ে আসছি। আমি সকলের অধম হ'লেও একাজে আমায় বাধা দিতে কেউ নেই। রোজ সন্ধ্যায় নিজের চুলের গোছা দিয়ে আমি মন্দিরের ধুলো মুছে নিয়ে যাই। সেই যেমন তখনকার দিনে করতাম, আজও তেমনি করি। কিন্তু আজ সে পদধূলার এক কণাও মাথায় তুলে নেবার জন্যে পড়ে নেই।

এখন আমাদের মন্দিরে আর তেমন লোকের ভিড় নেই। কিন্তু তোমার মনে আছে ত তখন আরতির সময় মন্দিরে লোক আর ধরত না। মেয়ের ভিড় যত না হোক ছেলের ভিড় তার চেয়ে ঢের বেশী। গাঁ ভেঙে ছেলেরা রোজ মন্দিরে এসে জুটত। তাদের জ্বালায় আমার চলা-ফেরা ভার হয়েছিল।

আষাঢ় মাসের শেষাশেষি সেই যেদিন ঝড়ে আকাশ-পাতাল তোলপাড় হয়ে উঠেছিল, সেই অমাবস্যার দিনে ঘন মেঘের ঘটায় আরতির অনেক আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। আম-বাগানের কত গাছ যে সেদিন ভেঙেছিল, নদীতে কত নৌকো যে ডুবেছিল, নদীর পাড়ও যে কত জায়গায় ধসে পড়েছিল, তার ঠিকানা নেই। সেদিন প্রকৃতির প্রলয়কাণ্ড দেখে লোকের চোখের ঘুম কোথায় উড়ে গিয়েছিল। সারারাত ধরে কড়কড় করে বাজ পড়েছে, ঝুপঝুপ করে নদীর পাড় খসে খসে পড়েছে, সাঁ সাঁ করে ঝড় গাছপালা উপড়ে বন-বাদাড় ভেঙে ছুটেছে, আর ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি ত সারারাত্রির মধ্যে একবারও থামেনি।

জোরে ঝড় আরম্ভ হবার আগেই তাড়াতাড়ি করে আরতি হয়ে গেল। সকলে বেরিয়ে বাড়ী চলে গেল। আমি তখন বাড়ী গেলাম না, মনে হ'ল মন্দিরের কাজ শেষ করে গেলেই হবে, নইলে হয়ত আবার আসতে পারব না। তুমিও যে যাওনি, তা' আমি জানতাম না, কিন্তু আমি যে যাইনি তা তুমি জানতে। মন্দিরের দাসীর কাজ আমি কোনো দিন কারুর চোখের সামনে করিনি, এমন কি পূজোরী-ঠাকুরও আমায় কাজ করতে কখন দেখেনি। আমি ফুল দিয়ে যাই এইটুকুই সে জানত, আর কিছু কেউ জানত না। তাই বোধহয় তুমি আমায় থাকতে দেখে একটু অবাক হয়ে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যেই মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলে।

সবাই চলে যেতেই আমি এদিকের সিঁড়ি ধুয়ে মুছে,

প্রদীপ পরিষ্কার করে রেখে, তোমাদের দিকের সিঁড়ির কাছে গেলাম। হেঁট হয়ে খোলা চুল দিয়ে আমি যখন সিঁড়ির ধূলো মুছছিলাম, তখন প্রদীপের আলো আমার জরির আঁচলায় লেগে চক্‌চক্ করে উঠ্‌তেই বোধ হয় সে দিকে তোমার চোখ পড়েছিল। সেদিন আমি রূপোলি জরির পাড় আর আঁচলাদার একখানা কাপড় পরে ছিলাম। তুমি এগিয়ে এসে আমায় অমন ভাবে দেখে বললে, "সুনন্দা, এত রাত্রে পাষাণের ঠাকুরের সিঁড়িতে মাথা পেতে পড়ে আছ কিসেব টানে ?"

ইচ্ছা হচ্ছিল, সত্যি কথাটা বলি। কিন্তু আমি যে পণ করেছিলাম, যেদিন তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হবে, সেই দিনই আমার মনের কথা বলব ; তাব আগে বল্লে ত' চলবে না। তাই বল্লাম, "ঠাকুরের টানেই ঠাকুরের দরজায় পড়ে আছি।"

আমাব উত্তর না শুনেই তুমি হঠাৎ বলে উঠ্‌লে, "এ কি, তুমি চুলের গোছা দিয়ে সিঁড়ির ধূলো কুড়োচ্ছ ? কে এমন ভাগ্যবান যার পায়ের ধূলো তোমার মাথার চুল স্পর্শ করবার স্পর্দ্ধা রাখে ?"

আমি হেসে বল্লাম, "স্পর্দ্ধা কেউ রাখে না। তবে আমার যে প্রিয় তার পায়ের ধূলো আমি আপনি সগৌরবে মাথায় তুলে নি।"

অন্ধকাবে তোমার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। মনে হ'ল গলার স্বরটা যেন একটু ভারী-ভারী শোনাল। তুমি বল্লে, "সে তোমায় কি দিয়েছে, যে, তার এত মান ?"

"সে কি দিয়েছে সেই জানে, আমি যতখানি দিতে পারি দিয়েছি।"

"আর কারুর জন্যে বুঝি এক কণাও রাখনি।

আমি বেশ স্থির ভাবেই বল্লাম, "না।"

তুমি বল্লে, "সুনন্দা, তবে সত্যিই আমার সব আশা বৃথা।"

আমি বল্লাম, "ওমা, তোমার আবার আমার কাছে কিসের আশা ?"

তুমি কথা কইলে না ; চলে গেলে। আমিও উঠে বাড়ী গেলাম।

পরদিন ভোরে উঠে [illegible], এক রাত্রের মধ্যে মাধব-পুরের চেহারা বদলে গেছে। কোথাকার কি যে কোথায় গেছে, কত ঘর বাড়ী বাগান যে ধ্বংস হয়ে গেছে, তা গোনা যায় না। আমারও সব সেদিন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে কি না জানি না।

সেদিন থেকে তোমায় ত আর দেখিনি। পথ চেয়ে আজ কতদিন বসে আছি। যাবার দিনে তোমায় সব বলে যাব সেই আশাতেই যত্নে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। যদি না পারি তবে এই আমার লিপি রইল, যা বলবার তা' এতেই বলে গেলাম। তবে এক সাধ ছিল—তোমায় নিজে মুখে বলে যাব ; তোমার মুখে আনন্দের হাসি দেখে, আমিও আনন্দেই হেসে যাব, দুঃখের জোর-করা হাসি সেদিন আর হাসব না। যেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় হব, সেদিন আমার এই অশ্রুসাগরে ওই একটি দিনের স্মৃতি শ্বেতপদ্মের মত টলটল করবে। কিন্তু সে সুখ কি আমার হবে ?—

অভাগিনী সুনন্দা।

শ্রীশান্তা দেবী।

—

জমীর মালিক

"ভাগ্‌রা ধন্ রাজ্ হো !
ভূম্‌রা ধন্ মাঁজ্ হো !"

(মূলে এই গানটি রাজপুতানার অনার্য্য মীনাজাতির মধ্যে প্রচলিত। এই মীনারাই নিজের অঙ্গুষ্ঠের তপ্ত রক্তে রাণাদের রাজটীকা পরিয়ে দিয়ে থাকে।)

খাজ্‌না রাণা ! দিই তোমাকে
খাজ্‌না তোমার পাওনা,
তার বেশী আর চাও যদি তো
বল্‌ব সোজা—'যাও না।'
দেশের মাটি মোদের খাঁটি
জমীর মালিক আম্‌রা,
মোদের হাতেই পাথর ঝামা
হয় হে ফসল-ঝাম্‌রা।
ছ'ভাগেব ভাগ নাওনা তুমি,—
পাওনা যা' তাই নাওনা ;
খাজ্‌না রাজার, জমী প্রজার—
এই আমাদের গাওনা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।



সাহিত্যের পাকা শড়ক

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে।

U. RAY & SONS, CALCUTTA.

জাপানের সুকুমার শিল্প

প্রাচ্য ভূখণ্ডকে পর্য্যটকেরা প্রায়ই ধ্যাননিরত ও রং-বাহারী বলে' বর্ণনা করে' থাকেন। জাপানে রঙের বাহার যথেষ্ট আছে বটে কিন্তু তার মধ্যে ধ্যানীর চেয়ে শিল্পরসিকের রূপই পরিস্ফুট। কিছুকাল সচেতনভাবে মিকাদোর রাজ্যে বাস করলে এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে শিল্পই জাপানের প্রাণ। জাপানীর ওঠাবসায় চলাফেরায় পোশাকে-পরিচ্ছদে এবং গৃহের মধ্যে তার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় এমন একটি শোভন ও সুকুমার শ্রী বর্ত্তমান মনে হয় যেন দেশটি একখানি সুরচিত আলেখ্য!



ফুল ছড়ানো
বাকুসেন্ ৎসুচিদা অঙ্কিত।

রুশ-জাপান যুদ্ধে জয়লাভের পর জাপান সহসা একদিন বিশ্বের বিস্ফারিত চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করলে। বিশ্ব আর তাকে অবহেলা বা অস্বীকার করতে পারলে না। মাঞ্চুরিআর রণক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ জাপানীর অস্ত্রঝঞ্ঝনা এবং বজ্রমুখ কামানের নির্ঘোষ মারাত্মক রকমে জাপানীর অস্তিত্ব ঘোষণা করলে। কিন্তু আর-এক ক্ষেত্রে জাপানী যুগ যুগ ধরে' নীরব সাধনায় যে কমনীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেছে তার অস্তিত্ব আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে ঘোষণা করা না হলেও এ নিশ্চয় যে তার ধ্রুবজ্যোতি অনন্তকাল মানুষের চিত্তকে আনন্দ-রসধারায় নিমগ্ন করে' রাখবে।

জাপানের শিল্পসাধনার উদ্বোধন সুদূর অতীতে; এশিআ তখন জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারী। ইতিহাসে দেখতে পাই সেই যুগে ভারতবর্ষ, চীন ও কোরিআর শিল্পের প্রভাব জাপানী শিল্পকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছিল। ৫৫২ খৃষ্টাব্দে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র জাতির মধ্যে একটা জাগরণের সাড়া পড়ে' গেল। সেই সময় থেকে ৬৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপানী ইতিহাসে সম্রাজ্ঞী-সুইকো-যুগ নামে খ্যাত। ঐ যুগে দোঞ্চো ও হোজো নামে দুজন কোরীয় চিত্রকর জাপানে যান। এবং পূর্ব্বোক্ত চিত্রকর বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির হোর্য্যুজির দেয়াল-চিত্র রচনা করেন। আশিকাগা যুগে (১৩৩৪—১৫৭৪) সুং-এবং-মিং-রাজবংশের-সময়ে-প্রচলিত চীনা চিত্রাঙ্কণপ্রণালী জাপানী শিল্পের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। এক শ্রেণীর জাপানী শিল্পী কতকটা পাশ্চাত্য শিল্পের প্রভাবান্বিতও বটে। জাপানী শিল্পীরা মাত্র চল্লিশ বছর আগে পাশ্চাত্য শিল্পের সহিত পরিচয়সাধন করে। শোনা যায় পাশ্চাত্য চিত্রের মধ্যে "মেরি ও শিশুখৃষ্টের" ছবিই জাপানী শিল্পীর মনের ওপর প্রথম ছাপ রাখে।

আধুনিক ইতিহাস।

রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জাপানের সামাজিক জীবনে একটা মস্ত ভাঙাগড়া ওলটপালট আরম্ভ হল। এই গণ্ডগোলের মধ্যে কিছুকালের জন্যে জাপানী চিত্রকলাও চাপা পড়ে' গেল। নবাগত পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোয় লোকের চোখ ঝলসে গেল, যা-কিছু য়ুরোপের আমদানী তাই তারা সাগ্রহে গ্রহণ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো, ভালোমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা লোপ পেলে। পশ্চিমের হলেই ভালো, পূর্ব্বের হলেই খেলো; প্রায় সবার মনের ভাবই এই-রকম। বাংলা দেশেও এমনি এক যুগ এসেছিল, তখন নবীন বাঙালী গোমাংস ও মদ খাওয়াই সভ্যতার চরম বলে' ধরে' নিয়েছিল!

জাপানী শিল্পের তখন মহা দুর্দ্দিন। জাপানী ওস্তাদ চিত্রকরদেরও কেউ পোছে না। কোনোপ্রকারে খেয়ে-দেয়ে বেঁচে থাকাই তাদের পক্ষে দায় হয়ে উঠলো। উদাহরণস্বরূপ কানো হোগাই-র নাম করা যেতে পারে (মৃত্যু ১৮৮৮)। আধুনিক জাপানের এই একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর



আধুনিক ভাস্কর্য্য।



'উকিওে'-চিত্র
কাইসেৎসুদো অঙ্কিত।

পেটের দায়ে এক বিদেশী শিল্পসংগ্রাহকের কাছে মাসিক ৩১।০ বেতনে কাজ নিতে বাধ্য হন!

সৌভাগ্যক্রমে এ ভাব অধিক দিন স্থায়ী হয়নি। অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিএনায় এক বিশ্বপ্রদর্শনীতে কয়েকখানি জাপানী চিত্র প্রদর্শিত হয়। ছবিগুলি প্রশংসা লাভ করে। সেই প্রথম জাপানী গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি স্বদেশী শিল্পের ওপর আকৃষ্ট হল। তবুও তাঁরা আরো ছ'সাত বছর ধরে' তাঁদের প্রথম-প্রতিষ্ঠিত সুকুমার শিল্প-বিদ্যালয়ে উচ্চবেতনে অক্ষম বিদেশী শিক্ষক নিযুক্ত করে' রেখেছিলেন। সে যাই হোক, অবশেষে তাঁরা নিজেদের ভুল দেখতে পেয়ে একটি খাঁটি জাপানী সুকুমার-শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন এবং কয়েকজন ওস্তাদ জাপানী চিত্রকরকে সম্রাটের গৃহস্থালির শিল্প-সংগ্রাহকের কাজে নিযুক্ত করলেন। দুর্ভাগ্যবশত এই বিদ্যালয়ের কাজ বেশীদিন নিরুপদ্রবে চল্লো না। বাংলার শিল্প-রসিকদের সুপরিচিত স্বর্গীয় ওকাকুরা তখন বিদ্যালয়ের পরিচালক। বিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষের মতভেদ ঘটায় তিনি অন্যান্য কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে পদত্যাগ করে' একটি আদর্শ জাপানী চিত্রবিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এই বিদ্যালয় এখন আর নেই। তবে তার ফলে জাপানে এক নব্য চিত্রকর-সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। তাঁরা পাশ্চাত্যশিল্পের যা ভালো তা গ্রহণ করেন বটে কিন্তু স্বদেশী শিল্পের বিশেষত্ব নষ্ট করেন না।

বিভিন্ন চিত্রকর-সম্প্রদায়।

জাপানী চিত্রকর-সম্প্রদায়কে মোটামুটি তিনটি বড় শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে: প্রাচীন, ঘরোআ ও চীনা। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রচনা-পদ্ধতির মধ্যে যে কোনো সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান এমন নয়। 'প্রাচীন'-সম্প্রদায়ের ক্যানো, তোসা, কোসে, মারুআমা, শিজো প্রভৃতি অঙ্কন-



চন্দ্রগ্রহণ দেখা
শ্রীমতী উএমুরা অঙ্কিত।

প্রণালী কোনো জীবিত চিত্রকর অভ্যাস করেন না। এই-সব অঙ্কন-প্রণালীর নিদর্শন পুরানো ছবির মধ্যে পাওয়া যায়। জাপানী চিত্রকলায় 'প্রাচীন'-চিত্রের স্থান সর্ব্বাগ্রে। তারপর 'ঘরোআ' বা 'উকিওে'-চিত্র। এগুলি "নশ্বর জগতের ছবি।" অর্থাৎ ঘরবাড়ী লোকজন পশুপক্ষী; পথ ও পথিক; শস্যভরা ক্ষেত্র; নদী সরিৎ সাগর প্রভৃতি;—এককথায় আমাদের চারিদিকে যে বিচিত্র জীবনপ্রবাহ তারই বাস্তব চিত্র। কিছুকাল পূর্ব্বে জাপানীরা এই ছবিগুলিকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখ্‌তো। কারণ এগুলি যে বাস্তব! প্রাচ্যজনের মন যে কল্পলোকের চিন্তায় ভরপূর! সেখানে বাস্তবের স্থান কোথায়? যে-ধরিত্রীর বুকে জন্মগ্রহণ করে' যাঁর স্তন্যপান করে' মানুষ হলুম তিনি যে প্রাচ্যজনের কাছে তুচ্ছ মায়া ছাড়া কিছুই নয়; আর যা লোকাতীত, আমাদের অনধিগম্য, প্রাচ্যজনের কাছে তাই একমাত্র কাম্য পদার্থ! কিন্তু আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকদীপ্ত জাপানে জীবনের প্রতি সে রূঢ় অবজ্ঞা আর নেই, তাই এখন 'উকিওে'-চিত্রের আদর হয়েছে। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে সচিত্র দৈনিক মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজ ও পুস্তকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই-সব চিত্র-রচনার জন্যে 'ঘরোআ'-চিত্রকরের ডাক পড়েছে। সেই ডাকে অনেক 'প্রাচীন'-চিত্রকরও 'ঘরোআ'-ছবি এঁকে বেশ দুপয়সা রোজকার করছেন। 'ঘরোআ'-চিত্র রচনা করলে এখন আর তাঁদের মাথা হেঁট হয় না। 'উকিওে'-চিত্রকরদের মধ্যে হোকুসাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভাব-ব্যঞ্জনা ও রচনায় স্বাতন্ত্র্যই তাঁর বিশেষত্ব।

'চীনা'-ছবিগুলি কায়দাদুরস্ত, তবে তাতে খুঁটিনাটির বাহুল্য—প্রাণের অভাব; কেমন যেন আড়ষ্ট। সেগুলি প্রধানত আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহাসিক। আধ্যাত্মিক ছবিগুলিতে ভারতবর্ষের প্রভাব সুস্পষ্ট। 'চীনা'-চিত্রের এখন আর আদর নেই। তোকিও ও কিওতোর চিত্রকরদের অঙ্কণপ্রণালীতে পার্থক্য আছে। তোকিও-চিত্রকরেরা আধুনিক-মতাবলম্বী; তাদের রচনার মধ্যে সাহস ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিওতোর আব-হাওয়া অন্যপ্রকার, সেখানে এখনো আধুনিকতার প্রভাব তেমন পৌঁছেনি; জীবন সেখানে সঙ্কোচভরা ঘুমন্ত স্বপ্নাবিষ্ট! সেখানকার ছবিগুলিও তাই সূক্ষ্ম সুকোমল, তার মধ্যে তেমন তেজ নেই। এই প্রসঙ্গে বলে' রাখি যে দুই রাজধানীর মধ্যে এই যে তফাৎ, এ যে কেবল শিল্পেতে নয়; অন্যান্য প্রচেষ্টায়ও তা বর্ত্তমান।

কয়েকজন বিখ্যাত চিত্রকর।

'উকিওে'-সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিখ্যাত চিত্রকরের নাম—হোকুসাই, উতামারো, উতাগাওা তোয়োকুনি, ও কেইসাই এইসেন। উতাগাওা কুনিসাদাও চিত্ররচনা করে' যথেষ্ট যশস্বী হয়েছিলেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে পুরানো য়েদো (তোকিও) শহরের উপকণ্ঠে তাঁর জন্ম হয়। তিনি উতাগাওা তোয়োকুনির শিষ্য। গুরুর মৃত্যুর পর তাঁর নাম



ওনোএ মাৎসুস্কে, তোকুগাওয়া যুগের এক বিখ্যাত অভিনেতা
শারাকু অঙ্কিত।

গ্রহণ করেন। তুলির কয়েকটা টানে তিনি ছবি এঁকে ফেলতে পারতেন না। চারিদিকে যে-সব লোক দেখতেন তাদের চালচলন বিশেষত্ব প্রভৃতি তিনি গভীর মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করতেন। বিশেষ বিশেষ স্থানের বা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেকার স্বাতন্ত্র্য তিনি ছবিতে ফুটিয়ে তুলতেন। তাঁর সম্বন্ধে শোনা যায়--

"একদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত বাড়ী না ফেরায় তাঁর পত্নী চিন্তিত হয়ে উঠলেন। রাত যখন প্রায় বারোটা তখন একটা শব্দ শুনে তিনি ফিরে দেখেন ঘরের মধ্যে এক ভীষণাকার ডাকাত। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তিনি নির্ব্বাক হয়ে রইলেন, মুখ দিয়ে আর কথা বার হয়না। তাঁর অসহায় অবস্থা দেখে ডাকাত মুখ থেকে মুখোশ খুলে ফেলে বল্লে—ভয় নেই ভয় নেই। তখন তিনি দেখেন ডাকাত আর কেউ নয় তাঁরই স্বামী। স্বামীর এই রহস্যে তিনি বিস্মিত



বুনো হাঁস
মারুয়ামা ওকো অঙ্কিত।

ও ক্ষুব্ধ হয়ে কাঁদতে লাগলেন। চিত্রকর তাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বা তাঁকে শান্ত করবার কোনো চেষ্টা না করে' কাগজ পেন্সিল নিয়ে ছবি আঁকতে বসে' গেল। প্রভাতে, কুনিসাদার অঙ্কিত "ডাকাতের-ভয়ে-আড়ষ্ট স্ত্রীলোকের" ছবি দেখে সকলে তারিফ করতে লাগলো!"

কুনিসাদার চিত্রসম্বন্ধে এক জাপানী সমালোচকের মত—"কুনিসাদার অঙ্কিত মূর্ত্তিগুলি সেই যুগের প্রতিভূস্বরূপ। কিন্তু সেগুলি সেই যুগের লোক হলেও বাস্তব লোকের মত নয়; আদর্শ লোক। এ থেকে বোঝা যায় চিত্ররচয়িতা খাঁটি

আর্টিষ্ট। কারণ প্রকৃত আর্টিষ্ট প্রকৃতির অনুকরণ করেন; না; তাঁর মনের মাঝে সত্য ও সুন্দরের যে-আদর্শ বর্ত্তমান সেই আদর্শ অনুযায়ী প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে' তিনি চিত্র রচনা করেন।"

মারুআমা ওকো্যা (১৭৩৩-১৭৯৫), আর একজন বিখ্যাত চিত্রকর। জাপানের জাতীয় শিল্পইতিহাসে উল্লেখ আছে—দীর্ঘকাল ধরে' তাঁর যশ সাম্রাজ্যের চারিদিকে বিঘোষিত হয়েছিল। পুরানো শিল্পী-সম্প্রদায়ের বাঁধাধরা নিয়ম তিনি ভেঙে দিয়ে শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। জীবজন্তুর চলাফেরা অঙ্কণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। নিসর্গদৃশ্য অঙ্কনেও তিনি যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দ্যান। তবে মানুষের ছবি আঁকায় তিনি তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। ভুতের ছবি আঁকাতেও তাঁর খুব হাত ছিল।

একবার একটা লোক পিঠে একটা ভুতের ছবি আঁকাবার জন্যে তাঁর কাছে আসে। তার ইচ্ছে সেই ছবির ওপর উল্কি পরে। অনেক সাধ্যসাধনার পর ওকো্যা এই সর্ত্তে রাজি হলেন যে ঐ লোকটি নিজের পিঠের ছবি কখনো দেখবে না। কিন্তু উল্কিপরা শেষ হলে যে তার পিঠ দ্যাখে সে-ই যখন ভয়ে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠতে লাগলো তখন লোকটা ছবি দেখবার অদম্য কৌতুহল আর সামলাতে পারলে না। চিত্রকরের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তা ভুলে গিয়ে একদিন একখানা আর্শি আনিয়ে সে পিঠের ছবি দেখলে। সেই ছবি দেখে সে পাগলের মত হয়ে গেল। কিছুতেই তার শান্তি নেই। মনে হতে লাগলো সেই ভয়ানক মূর্ত্তিটা অনুক্ষণ তার অনুসরণ করছে। শেষকালে অনন্যোপায় হয়ে নিদারুণ কষ্টভোগ করে' সেই সমস্ত ছবিটা সে পুড়িয়ে গা থেকে তুলে ফেল্লে!



জিবো কানন, করুণা দেবী।
তোগাই কানো অঙ্কিত।

পরিশিষ্ট।

বিদেশী পর্য্যটক তোকিওর 'ইম্পিরিআল মিউজিআমে' জাপানী চিত্রের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখতে পান না। এর কারণ, খুব উৎকৃষ্ট ছবিগুলি কাঠের বাক্সে ভরে' অগ্নি-পরীক্ষিত ঘরের মধ্যে বন্ধ করে' রাখা হয়। কাউকে দেখাতে হলে মাঝে মাঝে বার করে' দেখানো হয়। তোকিও সুকুমার-শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মাসাকি বলেন—"জাপানের আবহাওয়া ছবির পক্ষে বড় খারাপ। বেশীদিন ছবি খোলা থাকলে খারাপ হয়ে যায়। জাপানী চিত্রের অমূল্য নিদর্শনগুলি বেশীক্ষণ আলো বা স্যাঁতা সহ্য করতে পারে না। তাই লোহা বা অন্য ধাতুনির্ম্মিত শিল্পদ্রব্য ছাড়া আর সবই

বন্ধ করে' রাখতে হয়। এবং সেইজন্যে 'ইম্পিরিআল মিউজিআমের' প্রদর্শনীর মধ্যে উৎকৃষ্ট শিল্পের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। খুব উঁচুদরের ছবিগুলি কয়েক ঘণ্টা মাত্র খোলা অবস্থায় থাকলেও নষ্ট হয়ে যায়।"

সুকুমার শিল্পের প্রতি জাপানীদের অনুরাগ সম্বন্ধে তিনি বলেন—"নিখুঁত শিল্প-রচনাকে আমরা প্রায় দেবতার মত ভক্তি করি। পবিত্র দেবমূর্ত্তির মত আমরা তার পরিচর্য্যা করি।

"সাধারণ কারুকার্য্য-খচিত একটি চায়ের পেয়ালা আমরা শেল্ফের ওপর বা কাঁচের আলমারির মধ্যে সাজিয়ে রাখি না। খুব সাবধানে একটুকরো কোমল বস্ত্রে সেটি মুড়ে ঐ মাপের একটি সুদর্শন কাঠের বাক্সের মধ্যে ভরে রাখি। উৎকৃষ্ট চীনামাটির বাসন প্রথমে তুলায় জড়িয়ে মূল্যবান কাঠের বাক্সে রাখা হয়। তারপর সেই বাক্সটি আবার উপযুক্ত বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করা থাকে। এত যত্নে আমরা সুকুমার শিল্পকে রক্ষা করি।"

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কল্কি-অবতারের ঐতিহাসিকত্ব

কল্কির অভ্যুদয়-কাল।

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল পুরাণসমূহে প্রদত্ত যুগ ও কালের পরিমাণ এবং ভবিষ্য-নৃপতিগণের বংশাবলী প্রভৃতি লইয়া অনুসন্ধানকালে পুরাণকারগণের বর্ণনার রীতি অবলোকন করিয়া আমার মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, পুরাণবর্ণিত কল্কি-অবতার একজন ঐতিহাসিক পুরুষ; তৎসময়ে Indian Antiquary নামক মাসিকপত্রে আমি এই মর্ম্মে একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তদনন্তর পুরাণলব্ধ ঐতিহাসিক তথ্য লইয়া আলোচনা করিতে করিতে এখন আমার স্থির প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, (১) কল্কির ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ করা যাইতে পারে এবং (২) কল্কি কোনও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাহাও সম্ভবতঃ প্রদর্শিত হইতে পারে।

পুরাণসমূহে রাজবংশানুকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে কলিকালের বহু নরপতিবর্গের রাজ্যকাল এবং ক্রিয়াকলাপ ভবিষৎকালে ঘটিবে এইরূপ উক্ত হইয়াছে এবং এই ভবিষ্য-নৃপতিগণের বর্ণনার মধ্যেই অজাতশত্রু, উদয়ী, চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, অশোক প্রভৃতি ইতিহাসপ্রথিত ব্যক্তিবর্গের জন্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি বর্ণিত রহিয়াছে। এবং এই প্রসঙ্গেই কল্কির কার্য্যকলাপও ভবিষ্যৎকালে ঘটিবে এইরূপ লিখিত আছে। এই ভবিষ্য রাজগণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে অন্ধ্রগণের রাজত্বকালের বিবরণ প্রদানানন্তর, ভারতবর্ষীয় বিভিন্নবংশীয় রাজগণের নামের সহিত পুরাণকারগণ প্রবল ও অত্যাচারপরায়ণ ম্লেচ্ছরাজগণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং শেষে বলিতেছেন যে, এই সমস্ত অধার্ম্মিক ম্লেচ্ছরাজগণকে কল্কি ধ্বংস করিবেন। যথা—

> কল্কিনোপহতাঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছা যাস্যন্তি সর্ব্বশঃ।
> অধার্ম্মিকাশ্চ তেঽত্যর্থং পাষণ্ডাশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥
> (বায়ু, ৩৭ অধ্যায়, ৩৯০ শ্লোক)

মৎস্যপুরাণ বলিতেছেন, যে, তাহারা কল্কিকর্ত্তৃক হত হইয়াছিল। যথা—

> কল্কিনাপহতাঃ সর্ব্বে আর্য্যা ম্লেচ্ছাশ্চ সর্ব্বতঃ।
> অধার্ম্মিকাশ্চ তেঽত্যর্থং পাষণ্ডাশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥
> (মৎস্যপুরাণ, ২৭২ অধ্যায়, ২৭ শ্লোক)

কল্কির পরে, আর কোনও ভবিষ্য রাজার বর্ণনা পুরাণে প্রদত্ত হয় নাই।

এতৎপ্রসঙ্গে পুরাণসমূহে রাজবংশাবলীর যে কাল-পরিমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ অথবা ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ কল্কির অভ্যুত্থানের কালরূপে পাওয়া যায়। নৃপতিগণের কালপরিমাণ সংক্ষেপে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

> মহাপদ্মাভিষেকাত্তু যাবজ্জন্ম পরীক্ষিতঃ।
> এবং বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্॥
> প্রমাণং বৈ তথা চোক্তং মহাপদ্মান্তরঞ্চ যৎ।
> অনন্তরং তচ্ছতান্যষ্টৌ ষট্‌ত্রিংশচ্চ সমাঃ স্মৃতাঃ॥
> এতৎকালান্তরং ভাব্যা অন্ধ্রান্তা যে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
> [অথবা 'অন্ধ্রান্তে অন্বয়াঃ স্মৃতাঃ']
> (বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য প্রভৃতি)

এই পুরাণপ্রোক্ত বচনানুসারে পরীক্ষিতের জন্মকাল মহাপদ্মের অভিষেকের ১০৫০ বৎসর পূর্ব্বে। মহাপদ্ম ৩৭৪ হইতে ৩৩৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শন করিয়াছি *। সুতরাং ৩৭৪ হইতে

---

* J. B. O. R. S., Vol I, pp. 111–116.

পশ্চাদ্দিকে গণনা করিয়া (৩৭৪+১০৫০) ১৪২৪ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে পরীক্ষিতের জন্ম হয় এইরূপ ধরিতে হইবে। মহাপদ্মের মৃত্যুকাল ৩৩৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে, সম্মুখদিকে ৮৩৬ বৎসর গণনা করিয়া (৮৩৬ — ৩৩৮) ৪৯৮ খ্রীষ্টাতীতাব্দ পাওয়া যাইতেছে। এই সময় পর্য্যন্ত "অন্ধ্রান্ত্যাঃ" অথবা "অন্ধ্রান্তে অন্বয়াঃ" অর্থাৎ অন্ধ্রদিগের পরবর্ত্তী আর্য্য ও ম্লেচ্ছ রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই অব্দের পরে আর কোনও রাজার পরিচয় পুরাণে প্রদত্ত হয় নাই, এই স্থানে আসিয়াই ভবিষ্যরাজগণের বংশানুকীর্ত্তন শেষ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ববর্ণিত অন্ধ্রদিগের পরবর্ত্তী ম্লেচ্ছ ও আর্য্যরাজগণকে "অন্ধ্রান্ত্যাঃ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই অন্ধ্রান্ত রাজগণের রাজত্ব ৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে। সুতরাং তাহার পরে অর্থাৎ ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দ কল্কির অভ্যুদয়-কাল সিদ্ধ হইতেছে।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, একই প্রসঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত, পুষ্যমিত্র প্রভৃতি অন্যান্য ইতিহাসবিদিত পুরুষগণের সহিত কল্কির কার্য্যকলাপও ভবিষ্যৎ কালে ঘটিবে বলিয়া উক্ত হওয়াতে কল্কির ঐতিহাসিকত্বের কোনও বাধা ঘটিতেছে না। রাজবংশানুকীর্ত্তনকালে অন্যান্য রাজগণের ন্যায় কল্কির কীর্ত্তিকলাপও উক্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রতি দেবত্ব আরোপিত হয় নাই, পরন্তু তিনি একজন সাধারণ ব্যক্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অধিকন্তু কল্কির ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করিতে কেবল সাধারণ ভবিষ্যৎকালে বর্ণনার উপরে নির্ভর করিতে হইতেছে না। পুরাণে, অনেকস্থলে কল্কিসম্বন্ধে সুস্পষ্ট অতীতকালের ক্রিয়াতেই বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন, যে, পরাশরবংশসম্ভূত বিষ্ণুযশাঃ নামে কল্কি ('কল্কির্বিষ্ণুযশা নাম পারাশর্য্যঃ প্রতাপবান্'- বায়ু, ৩৬, ১০৪) সাধারণ মানবরূপে ধীমান্ দেবতা বিষ্ণুর অংশে **জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন** ('মানবঃ স তু সংজজ্ঞে পারাশর্য্যঃ প্রতাপবান্'—বায়ু, ৩৬, ১১০) এবং তিনি কলিযুগ পূর্ণ হইলে সম্ভূত হইয়াছিলেন ('পূর্ণে কলিযুগেঽভবৎ'—বায়ু, ৩৬, ১১১)। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণও ঠিক এইরূপই বলিতেছেন যে, পরাশরবংশীয় বিষ্ণুযশাঃ-নামে কল্কি ('কল্কির্বিষ্ণুযশা নাম পারাশর্য্যঃ প্রতাপবান্'—ব্রহ্মাণ্ড, ৭৩, ১০৪) মানব হইয়া দেবসেনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ('মানবঃ স তু সংজজ্ঞে দেবসেনস্য ধীমতঃ'—ব্রহ্মাণ্ড, ৭৩, ১১০) এবং কলিযুগ পূর্ণ হইলে সম্ভূত হইয়াছিলেন ('পূর্ণে কলিযুগেঽভবৎ'—ব্রহ্মাণ্ড, ৭৩, ১১১)। মৎস্য-পুরাণ বলিতেছেন—'বুদ্ধ নবম অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন' ('বুদ্ধো নবমকো জজ্ঞে'—মৎস্য, ৪৭, ২৪৭) এবং 'কল্কী বিষ্ণুযশা (বিষ্ণুযশসঃ?) পরাশরবংশীয়গণের নেতা, দশম অবতার হইবেন' ('..... ভবিষ্যতি। কল্কী তু বিষ্ণুযশসঃ পারাশর্য্যপুরঃসরঃ॥ দশমঃ ইত্যাদি'—মৎস্য, ৪৭, ২৪৮); এবং ইহার পরে ছয়টি শ্লোকে কল্কির দিগ্‌বিজয়ের বর্ণনা প্রদান করিয়া বলিতেছেন, 'ততঃ কালে ব্যতীতে তু স দেবোঽন্তরধীয়ত'—'কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই দেব অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন' (মৎস্য, ৪৭, ২৫৫)।

এইরূপে ভবিষ্যৎ কালের সহিত অতীতকালের ক্রিয়া মিশ্রিত থাকাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পুরাণকারগণ কল্কির সম্বন্ধে ঘটনাবলী অতীতকালের ঘটনারূপেই জানিতেন, যদিও তাঁহারা পুরাণের সাধারণ নিয়মানুসারে ভবিষ্যৎকালের ঘটনারূপে ইহা বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কল্কির জন্মস্থান, বংশ প্রভৃতির পরিচয় এবং তৎকর্ত্তৃক দিগ্বিজয় প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, এতৎসমস্তই কেবল বিশুদ্ধ কল্পনাপ্রসূত এরূপ অনুমান কিছুতেই করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ পুরাণসমূহে কল্কিসম্বন্ধে স্থানে স্থানে অতীতকালের ক্রিয়াতে বর্ণনা থাকায় তাঁহার ঐতিহাসিকত্ব উক্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা যে সুদৃঢ়তর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

কল্কির কীর্ত্তিকলাপের বর্ণনা যে অভিনব এবং পরবর্ত্তী কালে যে উহা সংযোজিত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ আছে। ৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে যে-সকল পুরাণের শেষ সংস্করণ হইয়াছে তাহাতেই কল্কির বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। গার্গীসংহিতার অন্তর্ভুক্ত যুগপুরাণে যবন অর্থাৎ গ্রীকদিগের ধ্বংসকালের (আনুমানিক ১৮৮ খ্রীঃ-পূর্ব্বাব্দ) সহিত কলি শেষ হইয়া গেল এইরূপ বর্ণনা আছে; তাহাতে কলিযুগের বর্ণনায় কল্কির উল্লেখ নাই।

মনুসংহিতা (১ম অধ্যায়, শ্লোক ৬৯, ৭০), বিষ্ণুপুরাণ (৪র্থ অংশ, ২৪, ২৬) এবং ভাগবতপুরাণ (১২শ স্কন্ধ, ২, ২৯) অনুসারে কলিযুগ ১২-শতবর্ষ কালব্যাপী; যেদিন

শ্রীকৃষ্ণ দেহরক্ষা করেন সেই দিন হইতে (পুরাণানুসারে) কলিযুগের গণনা আরব্ধ হইয়াছিল; এই সময় ১৩৮৮ খ্রীঃ-পূর্ব্বাব্দ ইহা আমি প্রবন্ধান্তরে প্রমাণীকৃত করিয়াছি। সুতরাং মনুসংহিতা এবং পুরাণে প্রথমতঃ কলিযুগের যে পরিমাণ প্রদত্ত হইয়াছিল তদনুসারে ১৮৮ খ্রীঃ-পূর্ব্বাব্দে কলিযুগের শেষ হয়। সেই সময়ে শুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক যবনরাজগণের ধ্বংস এবং সনাতনধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখিয়া কলিযুগ শেষ হইল এইরূপ তদানীন্তন পুরাণকারগণের মনে হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহারা কলিযুগ শেষ হইল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন *। এবং যুগপুরাণের ন্যায় যে-যে পুরাণ অতঃপর আর সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হয় নাই, তাহাতে সেই বর্ণনাই রহিয়া গেল, তাহাতে কল্কির কোন কথাই আর সংযুক্ত হইল না। কিন্তু পরবর্ত্তী পৌরাণিকগণ যখন দেখিলেন যে, যবনধ্বংসের পরেও প্রজাগণ পূর্ব্ববৎ দুর্দ্দশাগ্রস্ত রহিয়াছে, তখন তাঁহারা কলিযুগের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে কল্কির অভ্যুদয়-কাল লইয়া গেলেন; কল্কি কর্ত্তৃক ম্লেচ্ছবংশের ধ্বংস সাধন হইলে কলিকাল পূর্ণ হইল, এবং সমুদয় দুঃখের অবসান হইল, এইরূপ আশা তাঁহাদিগের হৃদয়ে উত্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন যে, তাহা হইল না। যুগপুরাণে যবনধ্বংসকালে কলিশেষে প্রজাগণের যেরূপ দুর্দ্দশা বিবৃত হইয়াছে † ঠিক সেইরূপ ভাষাতেই কল্কিকর্ত্তৃক ম্লেচ্ছধ্বংসের পরেও প্রজাগণের শোচনীয় অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে :—"ততো ব্যতীতে কল্কৌ তু……পরস্পরহতাশ্চ নিরাক্রন্দা সুদুঃখিতাঃ" * ইত্যাদি ভাষায় পৌরাণিকগণ প্রজাদিগের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং কলিযুগের স্থিতিকাল এক অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। কলিযুগের স্থিতিকাল সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে পুরাণ এবং জ্যোতিষশাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

পূর্ব্বে যাহা বিবৃত হইল তাহা হইতে প্রমাণীকৃত হইল যে, পুরাণপ্রোক্ত কল্কি ঐতিহাসিক ব্যক্তি; এবং তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এখন, তিনি কে, তাহার পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর হইতেছি।

পুরাণোক্ত কল্কি কোন্ ঐতিহাসিক ব্যক্তি?

পুরাণসমূহে কল্কিসম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এই—

১। কল্কির পরিচিত নাম বিষ্ণুযশস্ (অথবা বিষ্ণুযশস) ['কল্কির্বিষ্ণুযশা নাম'—বায়ু, ৩৬, ১০৪ এবং ব্রহ্মাণ্ড ৭৩, ১০৪। 'কল্কি তু বিষ্ণুযশসঃ'—মৎস্য, ৪৭, ২৪৮]।

২। সম্ভল গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। (ভাগবত ১২ স্কন্দ, ২ অধ্যায়, ১৮ শ্লোক; বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, ২৪ অধ্যায়, ২৬।) এই সম্ভলগ্রাম রাজপুতনার অন্তর্গত শাকম্ভরী, ইহা শিলালিপি এবং পৃথ্বীরাজ-বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণীকৃত হইয়া গিয়াছে।

৩। তিনি সাধারণ মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং দেবসেন নামক পরাশর-গোত্রীয় অথবা যাজ্ঞবল্ক্যগোত্রীয় একজন ব্রাহ্মণ গ্রামমুখ্যের পুত্র ছিলেন।

৪। তিনি চন্দ্রসমকান্তিবিশিষ্ট সুপুরুষ ছিলেন ['গাত্রেণ বৈ চন্দ্রসমঃ'—বায়ু, ৩৬ অ, ১১১ শ্লোক]।

৫। তিনি একজন মহা বীর ছিলেন এবং দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন। [ভাগবত ১২ স্কন্দ, ২ অ, ১৯ এবং ভবিষ্য ৩ অংশ, ২৬ অ, ১ শ্লোক]।

৬। তিনি অনতিদীর্ঘকালমধ্যে চতুরঙ্গবল সমন্বিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। বায়ুপুরাণ

* ভবিষ্যন্তীহ যবনা ধর্মতঃ কামতোঽর্থতঃ।
ভোক্ষ্যন্তি কলিশেষে তু বসুধাম্॥ ইত্যাদি

† যুগপুরাণে যবনদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে :—
ভবিষ্যন্তীহ যবনা ধর্মতঃ কামতোঽর্থতঃ।
নৈব মূর্দ্ধাভিষিক্তাস্তে ভবিষ্যন্তি নরাধিপাঃ॥
যুগদোষ দুরাচারাঃ ভবিষ্যন্তি নৃপাস্তু তে।
স্ত্রীণাং বালবধেনৈব হত্বা চৈব পরস্পরম্॥
* * * *
ভোক্ষ্যন্তি কলিশেষে তু বহুধাম্।
* * * *
শূদ্রা কলিযুগস্যান্তে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
যবনা জ্ঞাপয়িষ্যন্তি ন শচেযং (?) চ পার্থিবাঃ॥
মধ্যদেশে ন স্থাস্যন্তি যবনা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
তেষামন্যোন্যসম্ভাবা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥
আত্মচক্রোত্থিতং ঘোরং যুদ্ধং পরমদারুণম্।

* বায়ু, ৩৭ অধ্যায়, ১১৭ প্রভৃতি। প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ড, ৭৩ অধ্যায় ১১৮।

(৩৬শ অধ্যায়ে) এইরূপে কল্কি কর্তৃক বিজিত বিভিন্ন জনপদসমূহের নাম প্রদান করিয়াছেন—

> "উদীচ্যান্ মধ্যদেশাংশ্চ তথা বিন্ধ্যাপরান্তিকান ॥১০৬॥
> তথৈব দাক্ষিণাত্যাংশ্চ দ্রবিডান্ সিংহলৈঃ সহ।
> গান্ধারান্ পারদাংশ্চৈব পহ্লবান যবনান শকান ॥১০৭॥
> তুষারান্ বর্বরাংশ্চৈব পুলিন্দান দরদান খসান।
> লম্পকান অন্ধ্রকান রুদ্রান কিরাতাংশ্চৈব স প্রভুঃ ॥১০৮॥
>
> প্রবৃত্তচক্রো বলবান ম্লেচ্ছানামন্তকৃদ বলী ।১০ ॥

ইহার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে রুদ্রগণের পরিবর্ত্তে পৌণ্ড্রগণ, বর্ব্বরগণের পরিবর্ত্তে শবরগণ, এইরূপ কয়েক স্থানে পাঠভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত দেশ জয় করিয়া কল্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

৭। এই দিগ্বিজয় রাজ্যবিজয়মাত্র নহে, পরন্তু ধর্ম্মবিজয়ও বটে। পুরাণসমূহে বর্ণিত আছে, কল্কি নামমাত্রধারী ম্লেচ্ছরাজগণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, তিনি ধর্ম্মদ্বেষী পাষণ্ডগণকে, গৃহীতায়ুধ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সংহার করিয়াছিলেন, প্রায়শঃ অধার্ম্মিক বৃষলগণকে উৎসন্ন করিয়াছিলেন এবং ম্লেচ্ছ ও দস্যুগণকে নিহত করিয়া নষ্টপ্রায় আর্য্যধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। *

৮। তাঁহার এই দিগ্বিজয় ক্রূরকর্ম্ম ('ক্রূরেণ কর্ম্মণা' বায়ু, ৩৬, ১১৪) হইলেও ধর্ম্মত্রাণজন্য এবং লোকহিতার্থ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ('ধর্ম্মত্রাণায়, লোকহিতার্থায়'।- বায়ু, ৩৬, ১০৩)।

৯। তিনি, স্বকার্য্য সম্পন্ন হইলে, গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে দেহত্যাগ করেন। যথা, বায়ুপুরাণ—৩৬শ অধ্যায়,

> "ততঃ স বৈ তদা কল্কিশ্চরিতার্থঃ সসৈনিকঃ।১১৫।
> *
> "গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে নিষ্ঠাং প্রাপ্স্যতি সানুগঃ।১১৭।'

১০। তাঁহার এই দিগ্বিজয়-কার্য্য সম্পাদন করিতে পঞ্চবিংশতি বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল। যথা, বায়ুপুরাণ, ৩৬শ অধ্যায়—

> "পঞ্চবিংশোত্থিতে কল্পে পঞ্চবিংশতি বৈ সমাঃ।
> বিনিঘ্নন্ সর্ব্বভূতানি মানুষানেব সর্ব্বশঃ ॥১১৩॥"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই স্বদেশরক্ষক, স্বধর্ম্মপালক ও লোকহিতৈষী মহাত্মা কে? পুরাণবর্ণিত যুগের শেষ অংশে কল্কির ন্যায় আর কেহই এতদূর যশস্বী হইতে পারেন নাই। সকলকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

তাঁহার সম্বন্ধে আমরা জানিতেছি যে, তাঁহার নাম বিষ্ণুযশস তাঁহার জন্মস্থান রাজপুতানা, তাঁহার জন্মকাল খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগ, এবং তাঁহার দিগ্বিজয় দক্ষিণে দ্রবিডদেশ হইতে উত্তরাপথ পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম-সমুদ্র হইতে খসদিগের দেশ আসাম পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল।

এই সমুদয় বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে সুধীবর্গের সমীপে এই সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিতেছি যে, এই পুরাণপ্রোক্ত বিষ্ণুযশাঃ এবং মালবাধিপতি বিষ্ণুবর্দ্ধন যশোধর্ম্মন একই ব্যক্তি।* 'বিষ্ণুবর্দ্ধন' এবং 'যশোধর্ম্মন' নামদ্বয়ের আদ্য অংশ বিষ্ণু এবং যশস্ সংযুক্ত করিয়া পুরাণকারগণ 'বিষ্ণুযশস্' নাম সৃষ্টি করিয়াছেন। বিষ্ণুবর্দ্ধনের 'বর্দ্ধন' শব্দ নাম নহে, সম্রাট্‌গণের বীরত্বজ্ঞাপক উপাধিমাত্র; যথা, অশোকের নাম অশোকবর্দ্ধন, এইরূপ হর্ষবর্দ্ধন ইত্যাদি। * সম্ভবতঃ দিগ্বিজয়ের পরে রাজাবিজয় এবং ধর্ম্মবিজয় এই দুই প্রকার কার্য্যের পরিচায়ক বিষ্ণুবর্দ্ধন এবং যশোধর্ম্মন্ এই দুই নাম গৃহীত হইয়াছিল।

বিষ্ণু যশোধর্ম্মন্ স্বকীয় শিলালিপিতে জানাইয়াছেন যে, তিনি সেই 'যুগের' নিন্দ্যাচার ও নৃপতিগণের হস্ত হইতে দেশ উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি লোকহিতার্থ দিগ্বিজয়-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন ('লোকোপকারব্রতঃ')। তিনি তাঁহার সমসাময়িক যুগের রাজগণের সহিত সংশ্রব রাখিতেন না, এবং তিনি মনু, ভরত, অলর্ক, মান্ধাতা প্রভৃতি নৃপতিগণের কাল আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতকাল-মধ্যেই তিনি অধর্ম্মধ্বংসকর্ত্তা, 'ধর্ম্মের নিকেতন' রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।† তাঁহার ব্রাহ্মণ প্রতিনিধিও রাজ্য-মধ্যে 'কৃতযুগ' আনয়ন করিয়াছেন বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন।‡ এই সমস্ত বিষয়ই পুরাণবর্ণিত বিষ্ণুযশার কার্য্যাবলীর সহিত

* মৎস্য, ৪৭, ২৪৯-৫০, বায়ু, ৩৬, ১০৫ ৬, ভাগবত, ১২ স্কন্ধ, ২ অ, ২৫ শ্লোক।

* কতিপয় মুদ্রায় 'বিষ্ণু' নাম খোদিত আছে। হর্ণলির মতে এগুলি যশোধর্ম্মা বিষ্ণুবর্দ্ধনের মুদ্রা। Hœrnle, J R A S, 1903, p 552, Ibid, pp 133 134

† Fleet, Gupta Inscriptions, pp. 146-147.

‡ Ibid, p. 154 'কৃতইব কৃতমেতদ্ যেন রাজ্যং নিরাধি'

মিলিয়া যাইতেছে। অধিকন্তু এই নৃপতির 'বিষ্ণু'-আখ্যা এবং তাঁহার অপরিমিত বীরকীর্ত্তি লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ পুরাণকারগণ তাঁহাকে ভগবান্ বিষ্ণুর অংশসম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বিষ্ণু যশোধর্ম্মন্ এবং বিষ্ণুযশস্ এই উভয়ের জন্মস্থান একই। মান্দাসোর গ্রামে যশোধর্ম্মদেবের জয়স্তম্ভ আবিষ্কৃত হওয়ায় এই দিগ্বিজয়ী নৃপতির বসতিস্থানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

উভয়কর্ত্তৃক বিজিত রাজ্যসমূহের বর্ণনারও বিশেষ ঐক্য রহিয়াছে। বিষ্ণু-যশোধর্ম্ম লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের উপকণ্ঠ হইতে মহেন্দ্রগিরির পাদদেশ পর্য্যন্ত এবং হিমালয় হইতে পশ্চিম-সাগর পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগ জয় করিয়াছিলেন। এই বর্ণনা বিষ্ণুযশাঃ কর্ত্তৃক বিজিত জনপদের বর্ণনার সহিত মিলিতেছে।

উভয়ের অভ্যুদয়কালেরও ঐক্য রহিয়াছে। বিষ্ণু-যশোধর্ম্মন্ হূণ-নরপতি মিহিরকুলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মিহিরকুলের পিতা তোরমাণের রাজ্যকাল বুধগুপ্তের স্বল্প পরবর্ত্তী। বুধগুপ্তের সময় ৪৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ *। মিহিরকুল যশোধর্ম্মকর্ত্তৃক কাশ্মীরদেশে পরাজিত হইয়াছিলেন; কাশ্মীর গমনের পূর্ব্বে মিহিরকুল অন্ততঃ পঞ্চদশবর্ষ ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ইহা গোয়ালিয়রের প্রস্তরলিপি হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে †। সুতরাং যশোধর্ম্ম কর্ত্তৃক মিহিরকুলের পরাজয় ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পরে এবং ৫৩৩-৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মান্দাসোর নগরে তৎকর্ত্তৃক জয়-স্তম্ভ স্থাপনের পূর্ব্বে সংসাধিত হইয়াছিল। ইহার সহিত পুরাণবর্ণিত কল্কির অভ্যুদয়কাল ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ঐক্য রহিয়াছে।

শিলালেখসমূহ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিষ্ণু-যশোধর্ম্মন্ কোনও সুবিখ্যাত রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং বিষ্ণুযশাও একজন সাধারণ ব্যক্তির পুত্ররূপে পুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন। উভয়েই বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এইরূপ সকলদিক্ হইতেই উভয়ের মধ্যে এত পরস্পর ঐক্য দেখা যাইতেছে যে, উভয়ে যে একই ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকিতেছে না।

এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যাহার দ্বারা কল্কির ঐতিহাসিকত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

(১) বঙ্গদেশীয় কবি চণ্ডীদাসের সময় (চতুর্দ্দশ শতাব্দী) পর্য্যন্ত এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে বুদ্ধ এবং অন্যান্য অবতারগণের ন্যায় কল্কিও অতীতকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যথা, "কল্কিরূপে তোহ্মে দলিলে দুষ্টজন" (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে রক্ষিত চণ্ডীদাসকৃত হস্তলিখিত 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন' গ্রন্থ *)। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে কল্কি যে ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবেন এই বিশ্বাস বহুদিনের প্রাচীন নহে।

(২) জয়দেবও (ত্রয়োদশ শতাব্দী) কল্কিকে অতীত-কালের পুরুষরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। যথা, "কেশবধৃত-কল্কিশরীর।"

(৩) বিহার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় আমাকে এ বিষয়ে কল্কিপুরাণ পাঠ করিতে বলেন। উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে কল্কির সমগ্র জীবনের ঘটনাই অতীতকালে বর্ণিত রহিয়াছে; যথা, কল্কির জন্মোপলক্ষে—

দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য মাধবে মাসি মাধবম্।
জাতং দদৃশতুঃ পুত্রং পিতরৌ হৃষ্টমানসৌ।
(কল্কিপুরাণ, ২ অ, ১৫ শ্লোক)
'ততঃ স ববৃধে তত্র সুমত্যা পরিপালিতঃ' (৩ অ, ৩০ শ্লোক)।

কল্কিপুরাণের সর্ব্বত্রই অতীতকালের ক্রিয়ায় বর্ণনা রহিয়াছে।

(৪) এই চতুর্থ প্রমাণটি দ্বারা কল্কির ঐতিহাসিকত্ব এবং তাঁহার আবির্ভাবকাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে স্থাপিত হইতেছে। জিনসেনকৃত জৈন হরিবংশ গ্রন্থ সংপ্রতি হিন্দীভাষায় অনূদিত হইয়া ভারতীয় 'জৈনসিদ্ধান্তপ্রকাশিনীসংস্থা' কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার জিনসেন, গ্রন্থরচনার কাল ৭০৫ শকাব্দ †

* Fleet, G. I., p. 159.
† Gwalior Stone Inscription., F. G. I., p. 161.

* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের হস্তলিপি বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই বিবরটি আমাকে জানাইয়াছেন।

† শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষু * * *

(=৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) দিয়াছেন। রাজগণের কালপরিমাণ সম্বন্ধে জিনসেনের উক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যন্ত মূল্যবান, সুতরাং মূল সংস্কৃতশ্লোকগুলি এস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

বীরনির্ব্বাণকালে চ পালকোঽত্রাভিষিচ্যতে।
লোকেঽবন্তিসুতো রাজা প্রজানাং প্রতিপালকঃ॥
ষষ্টিবর্ষাণি তদ্রাজ্যং ততো বিজয়ভূভুজাম্।
শতং চ পঞ্চ পঞ্চাশৎ বর্ষাণি তদুদীরিতম্॥
চত্বারিংশৎ মুরুণ্ডানাং ভূমণ্ডলমখণ্ডিতম্।
ত্রিংশত্তু পুষ্পমিত্রাণাং ষষ্টিবস্বগ্নিমিত্রয়োঃ॥
শতং রাসভরাজানাং নরবাহনমপ্যতঃ।
চত্বারিংশত্ততো দ্বাভ্যাং চত্বারিংশচ্ছতদ্বয়ম্॥
ভট্টবাণস্য তদ্রাজ্যং গুপ্তানাং চ শতদ্বয়ম্।
একত্রিংশচ্চ বর্ষাণি কালবিদ্ভিরুদাহৃতম্॥
দ্বিচত্বারিংশদেবাতঃ কল্কিরাজস্য রাজতা।
ততোঽজিতংজয়ো রাজা স্যাদিন্দ্রপুরসংস্থিতঃ॥ (৮৭-৯২)

অন্যস্থানে জিনসেন শকাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন—

বর্ষাণাং ষট্শতীং ত্যক্ত্বা পঞ্চাগ্রাং মাসপঞ্চকম্।
মুক্তিংগতে মহাবীরে শকরাজস্ততোঽভবৎ॥

এই সমস্ত শ্লোক হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, জিনসেন রাজগণের রাজত্বকালের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কল্কিরাজাকে গুপ্তরাজগণের অব্যবহিত চল্লিশ বৎসর পরে এবং মহাবীর-স্বামী হইতে ৯৯০ বৎসর পরে স্থাপন করিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহার গণনানুসারে কল্কির রাজত্ব ৩৮৫ শকে (=৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) আরম্ভ হয় (৬০ অধ্যায় ৪৮৮-৪৯৩ শ্লোক)। ইহাতে মৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে প্রমাণিত পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগই কল্কির অভ্যুদয়কালরূপে পাওয়া যাইতেছে, এবং এই সময়ের তিনশতবর্ষমাত্র পরবর্ত্তীকালের গ্রন্থকারের বর্ণনায় ইহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। গুপ্তসম্রাট্দিগের অব্যবহিত পরে কল্কিকে স্থাপন করায় বুঝা যাইতেছে যে, প্রায় ৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তসাম্রাজ্যের শেষ হইয়া গেলে তাঁহার অভ্যুদয় হয়। পুরাণের উক্তিসমূহের আমি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহার সহিত ইহা মিলিয়া যাইতেছে।

জিনসেন কল্কিকে জৈনদিগের প্রবল শত্রুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; কল্কিপুরাণেও এইরূপই লিখিত আছে। বিশ্বকোষরচয়িতা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই বিষয়টির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধে আমি দুইটি স্বতন্ত্র বিষয় প্রমাণিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। প্রথমতঃ পুরাণবর্ণিত কল্কি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ এই কল্কি সম্ভবতঃ বিষ্ণুবর্দ্ধন-যশোধর্ম্মন। দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু এই দ্বিতীয় বিষয় ছাড়িয়া দিলেও কল্কি যে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ সে সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই। আমার মনে হয় ভারতের ইতিহাসে কল্কির স্থান গৌরবে চন্দ্রগুপ্তের অপেক্ষা হীন নহে। ধর্ম্ম এবং সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলে কল্কির স্থান অত্যন্ত উচ্চ। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরে যখন নানাপ্রকার বিদেশীয় ম্লেচ্ছ রাজগণ আসিয়া ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম প্রায় উচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইল, সেই সময়ে কল্কি নষ্টপ্রায় জাতীয় সভ্যতার পুনরুদ্ধার-কল্পে উত্থিত হইলেন এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানের নৃপতিবৃন্দকে সমবেত একতাবন্ধনে বদ্ধ করিয়া (কল্কি-পুরাণ, ২য়, ৩য় অংশ) ধর্ম্মদ্রোহিগণের ধ্বংসসাধন করিলেন। তিনি একদিকে ম্যাজিনি এবং অপরদিকে নেপোলিয়ান। ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাস এতকাল যে অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল, তাহা কল্কির ইতিহাসের দ্বারা সম্ভবতঃ বহু পরিমাণে দূরীকৃত হইবে। কল্কির অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী কালের রাষ্ট্র, ধর্ম্ম এবং সমাজ কল্কির ইতিহাস দ্বারা অধিকতর সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

এই প্রবন্ধ প্রথম ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। পরে বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুত হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়ের সাহায্যে উহা বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত হইয়াছে। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

শ্রীকাশীপ্রসাদ জায়সবাল।

মিনতি

(ওমর খৈয়াম)

আজি এ মঙ্গলক্ষণে দাও দাও ভরি' দাও
হে আমার চির-প্রিয়তম!
অতীত-বেদনাহরা ভবিষ্যের ভয়হারী
জীবনের সুধাপাত্র মম।
কালিকার আশে মোরে ভুলায়ে রাখিতে চাও?
কে জানে গো কাল যদি হায়,
সহস্র-বরষ-ব্যাপী অনন্ত অতীত মাঝে
হারাইয়া ফেলি গো আমায়!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

গুড়ের উদ্ভব

এখন খেজুর ছাড়িয়া তালগাছ দেখি। বহুকাল হইতে মাদ্রাজে তালরসের তাড়ী ও গুড় হইতেছে। সেখানে ইং ১৯১০ সালে লোকে খাইয়া চীনির কুঠীয়ালকেও ৭লক্ষ মণ গুড় বিক্রি করিয়াছে। প্রায় ২৫লক্ষ তালগাছের রস দেওয়া' হইতেছে। বাট সাহেবের মতে গুড় ২০লক্ষ মণের কম হইবে না।

কিন্তু আমি তালের 'রস দেওয়া' দেখি নাই, রসও দেখি নাই। যে দুই এক কথা লিখিতে যাইতেছি, তাহা অন্যের। খেজুর গাছে ও তালের গাছে 'রস দেওয়া'য় প্রভেদ আছে। তালের গাছে ক্ষত করা হয় না, ইহার মঞ্জরীর মোটা বোঁটায় করা হয়। অতএব যখন চৈত্রমাসে মঞ্জরীর জন্ম, তখন হইতে রস সংগ্রহের সময়। বস্তুতঃ গাছ যে মধুর রস, পুষ্প ও ফল উৎপাদনের নিমিত্ত, দেহে সঞ্চয় করে, তাহ আমরা অপহরণ করি। আখের তাই, খেজুরেরও তাই, এমন কি গাইর দুধও তাই। যৌবন কালের পূর্বেই আখ কাটা হয়; এই সময়ই খেজুর রস সংগ্রহের ঠিক সময়। ফুল ধরিলে খেজুর-রসের ইক্ষুশর্করা নাকি উনশর্করায় পরিণত হয়। আখেরও যৌবন অতীতে উনশর্করা হয়। তালেরও যৌবনোদগমে শর্করা পাওয়া যায়, কিন্তু সে শর্করা ইক্ষুশর্করা, উনশর্করা প্রায় থাকে না। অথচ গ্রীষ্মকাল বলিয়া উনশর্করা উৎপন্ন হইতে বেশী সময় লাগে না। সন্ধান নিবারণ নিমিত্ত তালের রসের কলসীর ভিতরটা চূন মাখানো হয়। বোধ হয় ইহাতে রস ভাল থাকে। (খেজুর রসের কলসী চূন মাখাইয়া পরীক্ষা কর্তব্য)। বাঝা (পুং) গাছ অপেক্ষা ফলের (স্ত্রী) গাছ হইতে প্রায় দেড়া রস পাওয়া যায়। (খেজুর গাছে এইরূপ প্রভেদ দেখা যায় কি?)।

প্রত্যহ নাকি পাচসের, এবং এইরূপ চারিমাস নাকি রস পাওয়া যায়। কিন্তু তিন বৎসর অন্তর এক বৎসর গাছকে জিরান (বিশ্রাম) দেওয়া হয়। একজন লিখিয়াছেন, তিন সের রসে এক সের গুড় হয়, অপরে লিখিয়াছেন রসের শতকে ১২ভাগ শর্করা, অর্থাৎ খেজুর রসের তুল্য। বোধ হয় লেখকেরা অন্ধের হস্তীদর্শন ন্যায়ে গাছ, লিখিয়াছেন। তথাপি বোধ হয় তালগাছ হইতে চারি মাসে একমণ গুড় পাওয়া যাইতে পারে।

তালাদিবর্গের (order) কেবল তাল ও খেজুর নহে, নারিকেল গাছের রসে গুড় হয়, বোম্বাই প্রদেশে তাড়ী হয়। কিন্তু নারিকেল গাছ ফলেই মূল্যবান, বৎসরে ২৲ টাকা। নারিকেল-গাছের সদৃশ একটা গাছ আছে। ইহা আসামে 'চোরা', শ্রীহট্টে 'চাউর', ওড়িষ্যায় 'সলপ', (এবং ইংরেজীতে Indian Sago palm Caryota Urens) নামে খ্যাত। সুশ্রী বলিয়া কলিকাতায় বাগানে রোপিত হয়। কিন্তু গাছটা বন্য। গাছের ভিতরে এক রকম সাবু জন্মে। দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রে গাছ কাটিয়া সাবু বাহির করিয়া খায়। বোম্বাই ও সিংহলে ইহার রসে তাড়ী ও গুড় হয়। মঞ্জরীর বোঁটায় নহে, খোলকে ক্ষত করা হয়। ক্ষতের পাঁচ ছয় দিন পরে প্রত্যহ ৩।৪ সের, ক্রমে ৮।১০ সের পর্যন্ত রস পাওয়া যায়। কেহ লিখিয়াছেন, সুস্থ ও সবল গাছ হইতে আধ মণ রসও পাওয়া যায়। আসামেও তাড়ী হয়। নারিকেল গাছ সদৃশ সেখানকার আর এক গাছ (Arenga Saccharifera) হইতেও তাড়ী করা হয়। জাবা দ্বীপে ইহার মঞ্জরীর রস হইতে গুড় হয়। এই গাছেরও ভিতরে সাবু পাওয়া যায়। একজন লিখিয়াছেন, কলিকাতায় একটা গাছ কাটিয়া প্রায় দুই মণ সাবু পাইয়াছিলেন। অতএব বোধ হয় প্রত্যেক গাছ হইতে এক মণ গুড় পাওয়া অসম্ভব হইবে না। কারণ তালাদিবর্গের গাছ হইতে যে মিষ্ট রস পাওয়া যায়, তাহা প্রথমে কাণ্ডে সাবু রূপে সঞ্চিত হয়। অতএব তালাদিবর্গের মোটা গাছ দেখিলেই তাহা হইতে রস সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত। অন্ততঃ এ সব গাছের পরীক্ষা ও রসের বিমান কর্তব্য।

ধান্যাদিবর্গের মধ্যে অবশ্য ইক্ষুই প্রধান। কিন্তু অন্য গাছও আছে। তন্মধ্যে জোয়ার প্রধান। বঙ্গদেশে জোয়ার প্রসিদ্ধ নহে। ভারতের বহু স্থানে ধান ও খড়ের নিমিত্ত জোয়ারের চাষ হয়। বঙ্গদেশের দে-ধান জোয়ারের সদৃশ। জোয়ারের নানা জাত আছে। বাট সাহেব লিখিয়াছেন, বিকানীর ও আজমীরে বহুকাল হইতে এক মিষ্ট জোয়ারের চাষ আছে। তাহা হইতে গুড় হইত।

গুড়ের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু দেখা গিয়াছে মৃত্তিকা ও কৃষি প্রভেদে শর্করার ভাগের ন্যূনাধিক্য ঘটে। ইহার রসের শতকে ৮।৯ ভাগ ইক্ষুশর্করা পাওয়া যায়।

অন্য দেশে গুড়ের নিমিত্ত কত চেষ্টা কত যত্ন হইতেছে। আমাদের দেশে কত গাছ বন্য জন্মিতেছে; আমরা একটু চেষ্টা করিলে গুড় পাইতাম। উপরে আসামের দুইটা গাছের উল্লেখ করিয়াছি। এখানে একটা বন্য গুড়-ফুলের কথা বলিতে যাইতেছি। দুই বৎসর হইল রাঁচিতে দেখি, সেখানে সরকারী মদের ভাটিখানায় মহুআ-ফুলে সুরা হইতেছে। মহুআ-ফুল পূর্বেও দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তখন উহার গুড়-শক্যতা মনে হয় নাই। মহুআ গাছের সংস্কৃত নাম মধূক। ইহার অপর সংস্কৃত নাম মধুদ্রুম, গুড়-পুষ্প। মধু ফুল = মহুল, মউল। পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম হইতে সমুদয় মধ্য ভারতের নীরস পাথরো বনে মহুআর জন্ম। ইহার ফুলে মধু, বীজে তেল আছে। মহুআ তেল হুগলী জেলায় "কোচড়া" নামে খ্যাত। চৈত্রমাসে মউল (মহুআর ফুল) হয়। ফুল ঘটাকার, মাংসল, মধু-বর্ণ, মধুগন্ধ, মিষ্ট কিন্তু ঈষৎ তিক্তকষায়। বন নিবিড় না হইলে দরিদ্রেরা ঝরা ফুল কুড়াইয়া কিংবা সুবিধা হইলে ঝাঁটাইয়া আনে। কেশর ঝাড়িয়া ফেলিয়া মউল রাঁধিয়া খায়, চালের সঙ্গে বাটিয়া পিঠা করে। এক এক গাছ হইতে ৪।৫ মণ ফুল পাওয়া যায়। ফাঁকার গাছ বড় হইলে ৭।৮ মণ পর্যন্ত পাওয়া যায়। বাঁকুড়ায় লোকে মউল শুখাইয়া মরাই বাঁধিয়া রাখে।

মউলের দেশে মউলের সময় ৷৷৶০—৸০আনায় মউলের মণ। অন্য সময় ১৷০—১৸০ হয়। দূরে বহনি খরচ পড়ে, দাম ২৲—২৷৷০ পর্য্যন্ত উঠে। ঝরা ফুল ৮।১০ দিন ঘরে রাখিবার পর পাইয়াছি,

(২)

জল	২০—২৪
ইক্ষুশর্করা	১০—১২
উন-শর্করা	৪০—৪৫
অন্য জৈব	২০—২১
অংশু (জৈব)	৪—৫
ভস্ম	৩—৩.৫
	১০০

(১)

জল	২৪.৫
জলে দ্রবঘন	৬৭
জলে অদ্রব	৮৭
	১০০

ফুলে একটা তেল আছে, যে জন্য ফুলের গন্ধ। সে তেল পৃথক করা হয় নাই। গাছের তলা ঝাঁটাইয়া আনে বলিয়া ফুলে মাটি ও বালি থাকে। রোদে শুকাইলে

জল	১৮
শর্করা	৬২
অন্য জৈব	১০
অংশু	৫
ভস্ম ও বালি	৫
	১০০

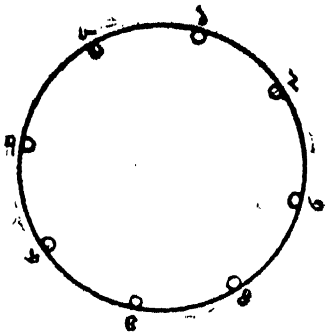
উপাদান হইতে দেখা যাইবে মউলের ইক্ষুশর্করা পৃথক করা অসম্ভব। কারণ ইহার প্রায় চারি গুণ উন-শর্করা। অতএব মউলের কেবল ফাণিত বা ঝোলা গুড় করিতে পারা যায়।* মউলের ফাণিত মধুবর্ণ, সুগন্ধ, মধুর; কিন্তু শেষে কষায় লাগে। পরীক্ষা দ্বারাও জানা যায়, ফুলে 'কসায়ীন' (tannin) আছে। হয়ত আরও কিছু আছে, সেজন্য নিম্নোদরের দোষ জন্মে (বস্তিদূষণ)। ফুল বেশী খাইলে মাথা ঘোরে, বমি হয়। বেশী মধু খাইলেও মাথা ঘোরে।

মউল বাটিয়া জলে সিঝাইয়া ছাঁকিয়া নিঙড়াইয়া শর্করা বাহির করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতে শর্করার সঙ্গে-সঙ্গে অনাবশ্যক বহু জৈবদ্রব্য চলিয়া আসে। যে ক্রমে ইদানী বীট হইতে শর্করা নিষ্কাসিত হইয়া থাকে, মউলের পক্ষে তাহা উত্তম। ক্রমের তত্ত্ব বোঝা কঠিন নহে। এক কথায় বলিতে গেলে, আবশ্যক অংশ পাতলা পাতলা (যেমন পয়সা-মোটা) করিয়া কাটিয়া কুচিগুলি জলস্রোতে ফেলা হয়, শর্করা ধোআ হইয়া বাহিরের জলে আসে। গঞ্জামে আসিকা চীনি-কুঠীতে আখ মাড়া হয় না, এইরূপে আখকুচি গরম জলে ধোআ হয়। পূর্বে বলা গিয়াছে, গাছের সর্বাঙ্গ কোষে নির্মিত। কোষের ভিতরে রস থাকে।* নেবুর একটা কোআ দেখিলে বিষয়টা সুবোধ্য হইবে। ইহাও

* সুশ্রুতেও মধূকের ফাণিতের উল্লেখ আছে। লিখিত আছে, মধূক পুষ্পের ফাণিত রুক্ষ, বাতপিত্ত-কারক, কফঘ্ন, পাকে মধুর, কষায় ও বস্তি-দূষণ।

একটা কোষ। বীট, আখ, খেজুর-গাছ, মউল প্রভৃতির কোষ এত লম্বা নহে। কিন্তু ছোট বড় আকারে কিছু আসে যায় না। উহার একটা পাতলা আবরণ আছে। সেটা ছিঁড়িয়া গেলে ভিতরের শাঁস বাহির হইয়া পড়ে। এই শাঁসে নানাবিধ দ্রব্য থাকে। তন্মধ্যে শর্করা একটি মাত্র। আমরা চাই মাত্র শর্করা, অন্য কিছু চাই না। জীবিত কোষ জলে ফেলিলে সে শর্করা কিংবা অন্য কিছু বাহিরে চলিয়া আসিতে পারে না। মরিলে আসিতে পারে। তখন ভিতরের রস কোষের গায়ের মৃত শাঁসের ভিতর দিয়া বি-সৃত অর্থাৎ নির্গত হয়। কোষের ভিতরে জল প্রবেশ করে, এবং ভিতরের গাঢ় রস বাহিরের জলে বিসৃত হয়। এ কারণ এই ক্রমের নাম বি-সরণ (diffusion)। যখন ভিতরের ও বাহিরের জল বা রস একই-প্রকার গাঢ় কিংবা তনু হয়, তখন বিসরণও থামে। জল পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন করিলে ভিতরে জল মাত্র থাকে, দ্রব আর কিছু থাকে না। অতএব বিসরণ দ্বারা আখ, বীট প্রভৃতির সমস্ত শর্করা পাওয়া যাইতে পারে। এমন কোনও নিষ্পীড়ন-যন্ত্র হইতে পারে না, যদ্দ্বারা সমস্ত শর্করা পাওয়া যাইতে পারে। বিশেষ গুণ এই যে, লালীনাদি দ্রব্য যাহা গাদ হয়, তাহার অল্পই বিসৃত হয়। দোষ এই, রসে জল বাড়ে, সে রস মারিতে জ্বালন-ব্যয় অধিক পড়ে। অতএব শর্করা-হেতু আয়, এবং জ্বালনহেতু ব্যয় খতাইয়া বিসরণ শেষ করিতে হয়, কিছু শর্করার লোভ ত্যাগ করিতে হয়। এমন উপায়ও আছে যাহাতে জল অধিক বৃদ্ধি করিতে হয় না। বিলাতে বড় বড় উপকরণ, কুচি করিবার ছুরীযন্ত্র, বিসরণের বড় বড় ধাতুপাত্র, উষ্ম জল-স্রোত, উষ্ম বাষ্প-স্রোত, প্রভৃতি আয়োজন করা হইয়া থাকে। সে সব আমাদের সাধ্য নহে। প্রথমে কুচিগুলা তপ্তজলে ফেলিয়া কোষের জীবন-নাশ করা হয়। তপ্তজলে বিসরণও দ্রুত ঘটে। দেখা গিয়াছে, ঊনশর্করা দ্রুত বিসৃত হয়, তারপর ইক্ষুশর্করা, তারপর পার্থিব দ্রব্যের কয়েকটা। লালীনাদি দ্রব্য অত্যল্প হয়।

যে উপায় আমরা করিতে পারি তাহা মউল লইয়া বলিতেছি। মনে কর ১, ২, ৩ ইত্যাদি ক্রমে চক্রাকারে ডাবা বসানো গিয়াছে। ডাবায় জল আছে। এক ঝোড়া



শুখনা মউল লইয়া ১ অঙ্কের ডাবার জলে ১৫ মিনিট ডুবাইয়া রাখা গেল। জল পাইয়া মউল ফুলিয়া উঠিবে, সঙ্গে-সঙ্গে ভিতরের শর্করা বিসৃত হইবে। সব হইবে না, অনেকটা হইবে। তখন সে ঝোড়া ২ অঙ্কের ডাবার জলে ১০ মিনিট ডুবানা গেল। শর্করা আবার কিছু বিসৃত হইল। এইরূপ, ৩, ৪, ৫, ৬ অঙ্কের ডাবার জলে ১০ মিনিট ডুবাইয়া তুলিবার পর মউলের শর্করার অধিকাংশ ক্রমশঃ অল্পে অল্পে বিসৃত হইবে। তখন তাহা গোরুর খাবার নিমিত্ত তুলিয়া রাখা হইবে। এখন আর-এক ঝোড়া মউল ১ অঙ্কের ডাবার জলে ডুবাইতে হইবে। এই জলে শর্করা ছিল বটে, কিন্তু মউলের রসের তুল্য গাঢ় নহে। সুতরাং এই জলে শর্করা বিসৃত হইবে। কিন্তু প্রথম ঝোড়ার অপেক্ষা কম। এইরূপ ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ অঙ্কের জলে ডুবানা ও তোলা হইবে। ৭ অঙ্কের ডাবায় শুধু জল ছিল। শেষ বিসরণ এইখানে। তখন মউল ফেলিয়া দেওয়া হইবে। আর-এক ঝোড়া ১ অঙ্কের ডাবার জলে ডুবাইয়া ক্রমে ক্রমে ৮ অঙ্কের ডাবায় আসিবার পর তুলিয়া ফেলা হইবে। দেখা যাইতেছে, ১ অঙ্কের ডাবার জলে তিনবার নূতন মউল ধোআ হইয়াছে; জল কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু গাঢ় হইয়াছে। এই জল এখন পাকের রস হইয়াছে। সে রস বাইনে তুলিয়া ডাবায় নূতন জল ঢালিতে হইবে। চতুর্থ ঝোড়া মউলের বিসরণ ২ অঙ্কের জলে আরম্ভ করিয়া ৮ অঙ্কের পর ১ অঙ্কে শেষ হইবে। ২ অঙ্কের জলে মউল চারিবার ধোআ হইল। সুতরাং সে জল রস হইয়াছে, ভাঁড়ারে গেল। এখন হইতে নূতন জল পড়িল। কথাটা একবার বুঝিলে বিসরণ কোথায় আরম্ভ, এবং কোথায় শেষ, তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে।

আমার পরীক্ষার ফল লিখিতেছি। অল্প ফুল লইয়া পরীক্ষা, ডাবার পরিবর্তে পাঁচটা বাটী, এবং ঝোড়ার পরিবর্তে হাতে করিয়া ফুল ফেলা ও তোলা হইয়াছিল।

(১) জলে শুখনা ফুল পড়িলে প্রায় দ্বিগুণ জল শোষিত হয়। এজন্য প্রথম বাটীতে ফুলের পাঁচ-গুণ জলে ২০ মিনিট রাখিয়াছিলাম। যে রস হইল, তাহাতে ফুলের শতকের ২৬ ভাগ বিসৃত হইয়াছিল। সে ফুল দ্বিতীয় বাটীতে ৩ গুণ জলে ২০ মিনিট রাখিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ বাটীতেও ৩গুণ জলে ৩০ মিনিট রাখিয়া দেখা গিয়াছিল এই তিন জলে প্রায় ২৬ ভাগ শর্করা বিসৃত হইয়াছিল। কিন্তু রসের পরিমাণ অধিক হইল। কিছু শর্করা ফুলেও রহিয়া গেল। এমনও হইয়াছে শর্করা কম হইয়াছে। সব ফুলে শর্করা সমান ভাগে থাকে না।

(২) সমস্ত ফুল পাঁচ ভাগ করিয়া চক্রাকারে শর্করা বিসৃত করা হইয়াছিল। জল কম হইল বটে, কিন্তু শর্করা ৫০ ভাগ মাত্র পাওয়া গেল। বোঝা গেল পাঁচটি পাত্রে চক্র করিলে চলিবে না, বেশী চাই।

(৩) শীতল জল ও তপ্ত জলে একই ফল, শর্করার ভাগ বাড়ে নাই। অতএব বোধ হইয়াছে, শুখনা মউলের কোষ মৃত। (বাজারের কিসমিসের কোষও এই-রূপ মৃত।)

(৪) শীতল জলে ও তপ্ত জলে (৬০ শতাংশের) রস হইতে গুড় করিলে দেখা যায়, শীতল জলের গুড় ঈষৎ কষায়, তপ্ত জলের গুড় তিক্ত ও কষায়, তালের গুড়ের মতন তিক্ত। অতএব গরম জলে শর্করা বাড়িলেও গুড়ে দোষ ঘটে। বিসরণের পূর্বে ফুলে জল দিয়া রাখিলে সময় কম লাগে, তাহা সহজেই বোঝা যায়।

(৫) কোন্ রসে কত শর্করা, তাহা উদমান দ্বারা ঘনতা নির্ণয় করিলে অক্লেশে বুঝিতে পারা যায়। অতএব রস হইয়াছে কি না, ফুলে শর্করা থাকিয়া গেল কি না, তাহা উদমান দ্বারা সহজে ধরা পড়ে।

এখন গুড়-পাক। লৌহপাত্র চলিবে না। কারণ রসের কষায়ীন লৌহস্পর্শে কাল হয়। জলে লৌহ থাকিলেও চলিবে না। পুষ্করিণী কিংবা নদীর জল প্রশস্ত। মাটির খাইনই ভাল। আধঘণ্টা হাত-সহা উষ্মায় রাখিলে রসের লালীনাদি জৈব থল ঘনীভূত হইয়া গাদের আকারে পৃথক হয়। রসে চূন যোগ চলিবে না। কারণ ক্ষারযোগে উনশর্করা কাল হয়। মৃদুতাপে গাদ উপরে তেমন ভাসে না, ভিতরে থাকে। অতএব রস কাপড়ে ছাঁকিয়া গাঢ় করিতে হইবে। ইক্ষুশর্করা কেলাসিত হইবে না। অতএব মধুর তুল্য গাঢ় হইলেই পাক শেষ। রাখিতে হইলে আরও গাঢ় করা ভাল। দেখিতেছি, দুই বৎসরের ফাণিত এখনও বেশ আছে। ফাণিত বোতলে রাখিয়া মুখে কাক দিয়া রাখা হইয়াছিল। সকাল বেলা ৪ ঘণ্টায় দুই জন মুনিষে ৪ মণ ফুল ধুইতে পারিবে, এবং ৪মণ ফুল হইতে অন্ততঃ ১।৷৹ মণ ঝোলা গুড় পাওয়া যাইবে। এই গুড় দরিদ্রে খাইতে পারে, মধু পরিবর্তে ইহাতে পাকা ফল রক্ষা করা যাইতে পারে, তামুক মাখাও চলে।

দেশের কোথায় গুড়ের কি কি উদ্ভব আছে, তাহার অনুসন্ধান কর্তব্য। কারণ পূর্বেই দেখা গিয়াছে, কেবল আখের ভরসায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তা ছাড়া, কোনও কিছুর অপচয়ও দেশের পক্ষে শুভ নহে। বীট-চাষ মনে হইতে পারে। কিন্তু চাষে, বিশেষতঃ অ-জানা চাষে, আমরা পারিব না। বীটে ইহার পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। সাহারাণপুরে এক সাহেব বীট চাষ করিয়া বিঘায় ৬ মণ গুড় পাইয়াছিলেন! প্রথম প্রথম কম হইবার কথা। কিন্তু বিলাতী ফসল দিয়া বিলাতের সঙ্গে পারা অসম্ভব মনে করি। দেশের ফসল দেখি। দেশে শাঁখ-আলুর চাষ হয়, শাঁখ-আলু মিষ্ট। আমি ভাল মিষ্ট শাঁখ-আলু পাই নাই। এখানে এই আলু অজ্ঞাত। একজনের বাগানে পাইয়াছিলাম, কিন্তু প্রায় বন্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে রস ৯৪·৮ ভাগ, খোআ (অংশু) ৫·২ ভাগ ছিল। কিন্তু মোট শর্করা ৩ ভাগ, তাহারও অধিকাংশ উনশর্করা। গত পৌষ মাসে কলিকাতা হইতে আনাইয়াছিলাম। ইহাতে মোট শর্করা ৭·৫ ৯ ভাগ, কিন্তু প্রায় অর্দ্ধেক উন-শর্করা। কিন্তু শাঁক-আলু ফেলা যায় না।* উহা হইতে গুড় করা যুক্তিযুক্ত নয়।

'শকর-কন্দ' আলুতেও শর্করা আছে। নামেই প্রকাশ,

* আমায় এক বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী বলিয়াছিলেন, গোয়ালন্দে শাঁখ-আলু হইতে গুড় করে। কিন্তু ঢাকার এক বন্ধু জানাইয়াছেন, না।

ইহা "শর্করা-খণ্ড"। কোথাও কোথাও ইহা "লাল আলু" ও "রাঙ্গা আলু" নামে খ্যাত। রাট সাহেব লিখিয়াছেন, ইহাতে .০২০ ভাগ শর্করা এবং ১৬ ভাগ পালো আছে। আমি ভাল আলু পাই নাই। যাহা পাইয়াছিলাম তাহা তেমন মিঠা নয়। ইহাতে ঘন ৫৩, জল ৪৭ ভাগ এবং ১০ভাগ মাত্র শর্করা, (তাহাও উন শর্করা) পাইয়াছি। অতএব গুড়ের পক্ষে অযোগ্য। মদ্যের পক্ষে যোগ্য বোধ হয়।

বস্তুতঃ এমন গাছ চাই যাহার রসে কেবল শর্করা নহে, ইক্ষুশর্করা আছে। শুনিয়াছিলাম, কাটোয়ার নিকটে জাজিগ্রামে এক নটিয়া শাগের চাষ হয়, তাহার ডাঁটা গুড়ের মতন মিঠা। কিন্তু ডাঁটা আনাইতে পারি নাই। হয়ত তাহাতে ইক্ষুশর্করা আছে, এবং কৃষিদ্বারা শর্করার পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায়।*

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, নামে গুড় হইলেও মিষ্টতায় হীন হইতেছে। কারণ কোন্ রসে কত গুড়, কিংবা কোন গাছে কত রস, তাহা না জানিয়াও দিন বেশ চলিতেছে। ধনীর চলিতেছে; নির্ধনীর চলিতেছে না, গুড়ের দর চড়িয়াছে, চীনি অগ্নিমূল্য হইয়াছে। ইয়ুরোপে শান্তি স্থাপিত হইলে গুড়-চিন্তা থাকিবে না। তবু যদি কাহারও চিন্তা হয়, তাঁহাদের চিন্তা লাঘবের সূচনা করিলাম। ইতি-পূর্বে মধ্যে মধ্যে নানাস্থানে সূচনা করিয়াছি। এখানে কয়েকটা আবার করিতেছি।

* কাটোয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার হিতেচ্ছায় তাহার বীজ পাঠাইয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলাম নিজে গাছ করিয়া গুড় শক্যতা পরীক্ষা করিব। কিন্তু এই দেশে এবং এখানকার বালিয়া মাটিতে গাছ ভাল বাড়িল না মিঠা হইল না। মাটির প্রভেদে গুড়ের এত প্রভেদ হয়। আখে জানা আছে খেজুর গাছেও নাকি জানা আছে। বালি মাটিতে রস মিঠা হয় না। কি মাটিতে অর্থাৎ মাটির কোন উপাদানে হয় তাহার পরীক্ষা কর্তব্য। এই একটা তত্ত্ব ধরিতে পারিলে বহু চেষ্টা হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। পরীক্ষা কঠিন নহে, ধৈর্য ও অধ্যবসায় মাত্র আবশ্যক। সে যাহা হউক যতীন্দ্র বাবু লিখিয়াছিলেন, এখন জাজিগ্রামে সে নটিয়া হয় না, কাটোয়া হইতে ৭ মাইল দূরে আনমপুরে হয়। কলিকাতার এক বীজ বিক্রেতার নিকট হইতেও 'কাটোয়ার নটিয়া বীজ" আনাইয়াছিলাম। তাহাও মিঠা হয় নাই। তাহা হইলে মাটিরই দোষ। কিন্তু পুনার এক বীজ বিক্রেতার নিকট হইতে অন্য শাগ বীজের সঙ্গে পালং শাগের বীজও আনাইয়াছিলাম। দেখি শিকড় মিষ্টি। বিমান করিয়া দেখি প্রায় ৩ ভাগ শর্করা, এবং সবই ইক্ষুশর্করা। ইহা বীট পালং নহে। জানি না, এই বীজ কাটোয়ার মাটিতে পড়িলে কত মিষ্টি হইত।

(১) লোকশিক্ষাই এক উপায়। কিন্তু শিক্ষা অর্থে বঙ্গ বিদ্যালয়, ইংরেজী ইস্কুল, কিংবা কলেজ খোলা নহে। বঙ্গে বিদ্যালয়ের অভাব যত না হউক, শিক্ষালয়ের অভাব আছে। এই শিক্ষা কি-রকমে হইতে পারে, তাহা এখানে ব্যাখ্যা করিবার স্থান হইবে না। (শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষ' দেখুন)। তবে, ভাল আখ, গুড়, ভিঁড়া, দলুয়া লইয়া হাটে হাটে দেখাইয়া বেড়াইতে পারিলে, লোকের চিত্ত উদবুদ্ধ হইবে। কি ক্রমে সে সব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া বলিলে লোকে হয়ত পরীক্ষা করিতে পারিবে। এখন সেকাল আর নাই, এখন গুড়ে জল ও গাদ রাখিলে দরে কম হয়। এখন দেশী চীনি বলিয়া গ্রাহক ভুলাইতে পারা কঠিন হইতেছে। এই সব কথা সোজা ভাষায় ছাপাইয়া হাটে হাটে বিতরণ করিলেও কিছু ফলের সম্ভাবনা। একস্থানে ভাল আছে, অন্য স্থানে নাই। সব স্থানে ভাল হইলে গুড় চিন্তা লঘু হইবে।

(২) গুড়ের ব্যবসায়ে শুচি যে কত আবশ্যক, তাহা খেজুরা গুড়ে পাওয়া যাইতেছে। খেজুরা গুড়ে লভ্য হয়, এ কথাও অনেকে জানে না। প্রতি গাছে ।০ আনা ধরিলেও কয়টা গাছে এক বিঘা জমির খাজনা পোষায় তাহা জানিলে পড়া বাগান পগার পাড় পড়িয়া থাকিবে না। কিন্তু ব্যবসায় করিতে গেলে কর্মবিভাগ আবশ্যক। রস সংগ্রহ ও পাক একজনের দ্বারা সুসম্পাদিত হইবে না।

(৩) কৃষিকর্মের মূলে, ক্ষেত্র ও বীজ, এই দুই। দেশের কৃষক ক্ষেত্রের গুণ যেমন বোঝে, বীজের গুণ তেমন বোঝে না। কারণ উত্তম বীজ উৎপাদন তাহার সাধ্য নয়। বিলাতে কেবল বীজ উৎপাদনের কৃষক আছে। এদেশে এই কর্মবিভাগ আবশ্যক হইয়াছে। এ সম্বন্ধে এত কথা আছে যে সেসব এখানে বলার স্থান হইবে না। শ্রেষ্ঠ বীজ চাই; ধানের বীজ, কলাইর বীজ কাপাসের বীজ প্রভৃতি হইতে ফুলের বীজও চাই। খেজুর-রসের জন্য শ্রেষ্ঠ খেজুর-বীজ চাই।

(৪) আখ ও খেজুর ছাড়াও কোথায় কি গাছ আছে তাহার পরীক্ষাও চাই। আসামের যে দুইটা গাছ বনে জন্মিতেছে, গ্রামে করিয়া রসে গুড় করিলে বহু মূল্য

হইবে। কেন না, তত রস খেজুর-গাছে মিলিবে না। সবই কি গভর্ণমেণ্ট করিবেন? এই যে সকল সমবায় উদ্ধার সমিতি (Co-operative Credit Society) হইয়াছে, তাহাতে নিশ্চয়ই উদ্‌যোগী পুরুষ আছেন। তাঁহারা যত্ন করিলে প্রজার কিনা হিত করিতে পারেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

একা

স্বজনের কোন্ ক্ষণে অনাদি যুগে
একেলা ভাসিনু মহাসাগর বুকে,
একেলা আপনা লয়ে আপনি খেলা,—
কিছু নাই, কেহ নাই, আকাশ মেলা।
একেলা মেলিয়ে আঁখি আপনা দেখি,—
বিকট অসীম খেলা ভীষণ একি।
নাই, নাই, কেহ নাই, তীরেতে উঠি,
হাসে, খেলে কত লোক দু'ধারে জুটি,
হাতে ধরে কেহ লয়, কেহ বা বুকে,
কত খেলা, মিশামিশি কত না সুখে।
সাগরের ডাক্ আসে দু'দিন পরে,
হেসে গিয়ে ভেসে যাই সে জানা ঘরে।
কত কূলে কতবার কত না ওঠা,
আঁখিজল, মধু হাসি কত না লোটা,
কেউ বলে থাকো, থাকো, যেও না ফিরে',
আমি বলি—দেখা হবে পুনঃ এ তীরে।
ভেসে যাই, ভেসে যাই, কেন কে জানে?—
অসীমে মায়ার ঘরে পরাণ টানে।
একা যাই, একা যাই, কেহ না থাকে,
কেহ না বাঁধিতে পারে মায়ার পাকে।
কূলে কূলে সবে বলে—তোমারে চাহি,
ভাসিয়ে ফিরিয়ে চাই, কেহ ত নাহি।
কালি যারে ঢেকেছিনু প্রণয় ভাবে,
আজি সে ফিরায়ে মুখ চিনিতে নারে,
বলে শুধু—দিব তোমা'—বলে গো শুধু,
একাকী ভাসিয়ে যাই, অসীম ধূধূ।
একা আমি, একা আমি—বিপুল সুখী,
ভালবাসা মিছা কথা, কেন বা দুখী?
একা যাই, একা এনু স্বজন প্রাতে,
সাগরের সাদা ঢেউ আমারি সাথে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

তিব্বত-রাজ্যে তিন বৎসর

(জাপানী শ্রমণ শ্রীযুক্ত একাই কাওয়াগুচির ভ্রমণ বৃত্তান্ত)

একবিংশ অধ্যায়।

জল ঝড়।

জলের প্রত্যাশায় দ্বিতীয়বার ছুটিয়াও যখন জল পাইলাম না, তখন আমার দেহমনের অবস্থা কি হইল তাহা অবর্ণনীয়। পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া গেল বলিলেও সে কষ্টের বর্ণনা হয় না। সে যে কি পিপাসা! রস বলিয়া যে জিনিষ তা যেন আমার অস্থি-মজ্জার ভিতর হইতেও শুখাইয়া গেল। এ পিপাসা দেহের সমুদায় অণুপরমাণুর পিপাসা! হায় রে জল! জল না জীবন! জগতে যার এত ছড়াছড়ি—আজ তার একবিন্দুর জন্য আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল! এই অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ত আমায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে দিল না—জল না পাইলে আমার নিশ্চিত মৃত্যু! জলের জন্য আবার ছুটিলাম। কিন্তু আশা করিবার সাহসটুকুও যেন আমার প্রাণে নাই। ঘুরিতে-ঘুরিতে প্রায় ১১ টার সময় এক উপত্যকা দৃষ্টিগোচর হইল। অন্তরে অনুভব করিলাম এবার জল একটু পাইব। বাস্তবিক জল পাইলাম বটে।—কিন্তু হায়রে সে কি জল! প্রভু বুদ্ধের জয়! সে বস্তু জল বটে। পাত্র হস্তে উন্মত্তের মত নীচে ছুটিলাম—পাত্রপূর্ণ করিয়া জল তুলিলাম, এ কি জল! বং সুরকি গোলার ন্যায়, ঘন, অসংখ্য পোকা তাহাতে কিলকিল করিতেছে! কত যুগ হইতে এ জল পচিতেছে! পিপাসায় আজ মরিতে বসিয়াছি, তবু তাহা মুখে তুলিতে পারি না। বৌদ্ধ শ্রমণ হইয়া আজ অসংখ্য জীব উদরস্থ করিব? তা ত পারি না। মোটা কাপড় বাহির করিয়া জল ছাঁকিলাম—দেখিলাম পোকা আর নাই বটে—রং রক্তবর্ণ। কি করি, আজ প্রাণ ভরিয়া সেই যুগযুগান্তের পচা জল পান করিলাম। সে জলের আস্বাদ আজ যেন স্বর্গের অমৃতের ন্যায় আমার বোধ হইল। কিন্তু দ্বিতীয় বার আর পান করিতে পারিলাম না। অগ্নি জ্বালিয়া সেই জলে চা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন প্রায় ১২টা বাজে—১২টার পর আহার করা আমার নিয়ম-বিরুদ্ধ—তাড়াতাড়ি ১২টার পূর্ব্বে আহার করিলাম। কি মিষ্ট সে

ভোজন-ব্যাপার—এমন তৃপ্তিপূর্ব্বক তিব্বতে আর এক-দিনও আহার করি নাই।

এই চিরস্মরণীয় ভোজন-ব্যাপারের পর, আবার সেই মরুদেশে যাত্রা করিলাম। প্রায় তিনটার সময় হঠাৎ ভীষণ মরুঝড় আরম্ভ হইল। জাপানে এমন ঝড় কেহ কখন দেখে নাই। যেমন অকূল সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠিলে উত্তাল তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে—আজ প্রমত্ত বাতাসে বালির ঢেউ উঠিয়া আছাড়ের উপর আছাড় দিতে লাগিল, এক স্থান হইতে বালুর রাশি তুলিয়া অন্যত্র বালুর পাহাড় করিয়া দিতেছে, আবার এক আছাড়ে তাহা ভাঙ্গিয়া উপাড়িয়া বালুরাশি লইয়া পাগলা বাতাস ছুটিয়াছে; এক পা অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই—স্থির হইয়া দাঁড়াইবার সাধ্য নাই—চক্ষু খুলিয়া দেখিবার সাধ্য নাই—যদি একবার দাঁড়াই তবে বালুকাসমাধি প্রাপ্ত হইব। একবার এদিকে ছুটি আর একবার ওদিকে ছুটি; কণ্টকের ন্যায়, তীরের ন্যায় বালুকা-কঙ্কর শরীরে বিদ্ধ হইতেছে, সমুদায় দেহ বালুময়, রন্ধ্রে রন্ধ্রে বালুকা প্রবেশ করিয়াছে। দেহ ঝাড়া দিতেছি, আর এদিক ওদিক ছুটিতেছি, মুখে আমার অবিরাম ইষ্টমন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে। সহসা প্রকৃতির তাণ্ডব-নৃত্যের অবসান হইল। যেমন আরম্ভ, তেমনি শেষ। বোধ হয় এই ঝড় একঘণ্টাকাল ছিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সব শান্ত হইয়া গেল। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আবার সম্মুখে যাত্রা করিলাম। প্রায় ৫টার সময় যে স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম, সেখানে অল্প-অল্প সবুজ ঘাস দেখিতে পাইলাম। একপ্রকার ঝোপ-ঝোপ কাঁটা-গাছ দেখিতে পাইলাম, তাহার পাতা সবুজ নয়, যেন পোড়া কালো—দুরন্ত শীতে কি এমন বর্ণ হইয়াছে জানি না। সেখানেই রাত্রিবাস করিলাম। অগ্নির জন্য কাষ্ঠের অভাব হইল না। 'চমৎকার' আগুন করিয়া পরম সুখে নিদ্রা গেলাম। কতদিন যে আমি ঘুমাই নাই—বড় সুখের সেদিনকার নিদ্রা!

পরদিন, এই কাঁটা-ঝোপের দেশ পার হইয়া এক খাড়া পাহাড়ের সম্মুখে আসিলাম। সেই পাহাড় অতিক্রম করা ছাড়া উপায় নাই। অর্দ্ধপথ আসিয়াছি, এমন সময় সম্মুখে এক পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী দেখিলাম—অপূর্ব্ব সে দৃশ্য! নদীটি কিছু দূরে গিয়াই এক হ্রদে পড়িয়াছে—আবার সে হ্রদ হইতে বাহির হইয়া অন্য হ্রদে গিয়া মিশিয়াছে। পরে শুনিলাম ইহা ব্রহ্মপুত্রের এক উপনদী। এ নদী পার হইতে হইবে, আবার তুষার-শীতল জলে অবগাহন—কিন্তু গত্যন্তর নাই। প্রায় ৯টার সময় সেই নদীর তীরে পৌঁছিলাম। দেখি কিনারায় বরফ পুরু হইয়া জমিয়া রহিয়াছে—বরফ গলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। এই অবসরে প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলাম। গাত্রে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করিয়া অবগাহনের উদ্যোগ করিলাম। মেষ দুটির স্কন্ধে বোঝা দিয়া তাহাদের পার করিব সংকল্প করিলাম। কিন্তু অবাধ্য জীব দুটি কিছুতেই আমার প্রস্তাবে রাজি হইল না। গলার দড়ি ধরিয়া টানাটানি করিয়া জলে নামাইবার কত চেষ্টা করিলাম, তাহারা কিছুতেই শুনিবে না। তখন ভাবিলাম, হয়ত অবোল জানোয়ারের কোনরূপ বোধশক্তি থাকিবে, জল হয়ত গভীর, ডুবিয়া মরিবার ভয়ে জলে নামিতেছে না। তখন তাহাদের বোঝা নামাইয়া দুইটার গলার দড়ি ধরিয়া জলে নামিলাম। জল বাস্তবিক গভীর—আকণ্ঠ হইল, তুষার-শীতল, স্রোত প্রবল, গলায় দড়ি না থাকিলে তাহারা কোথায় ভাসিয়া যাইত! যাহোক কোনমতে পার হইলাম। মেষ দুটিকে বাঁধিয়া, সমুদায় বস্ত্র খুলিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া উলঙ্গ অবস্থায় জিনিষগুলি আনিবার জন্য আবার জলে নামিলাম। পার হইয়া জিনিষগুলি দুটি পোঁটলা করিয়া মাথায় লইলাম। আবার তৃতীয় দফা পার হওয়া! এবার আমার হাত পা অসাড় হইয়া আসিল। মাঝ পথে গিয়া গভীর জলে পড়িয়া স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইতে লাগিলাম—তখন মাথার বোঝাও জলে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। একবার ভাবিলাম জিনিষ বাঁচাইবার চেষ্টা করিলে প্রাণ বাঁচাইতে পারিব না। অতএব জিনিষ যায় যাক, প্রাণ বাঁচাই। পরমুহূর্ত্তে স্মরণ হইল, জনমানব-বিহীন দেশে আরও ১০।১২ দিন আমায় যাত্রা করিতে হইবে। প্রাণ বাঁচাইব কি অনাহারে শীতে মরিব বলিয়া? তার চেয়ে ডুবিয়া মরা অনেক সুখের। মরি ত ঐ বোঝা ধরিয়া মরিব। তখন একহাতে গাঁটরি ধরিয়া একহাতে সাঁতার দিতে লাগিলাম। ক্রমে আমার দেহ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন মৃত্যু নিশ্চিত অনুভব করিয়া আমার

জীবনের শেষ প্রার্থনা বলিলাম। "দিকদশে যত বুদ্ধ আছ আজ তোমাদেব চরণে প্রণিপাত—মানব জাতিব শ্রেষ্ঠ গুরু ভগবান শাক্যমুনি বুদ্ধেব চবণে প্রণিপাত।—জীবনেব কাজ আমার অসমাপ্ত বহিল, পিতামাতা আত্মীয় স্বজনেব ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারিলাম না, প্রভু, আবাব যেন এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কবিয়া আমাব জীবনেব কাজ শেষ কবিয়া যাইতে পাবি।" এই প্রার্থনা কবিতে কবিতে হঠাৎ কঠিন প্রস্তবে চবণ ঠেকিল, প্রাণে সাহস আসিল, আমি দাঁড়াইয়া দেখি যে জল আমার বুক পর্য্যন্ত। চাহিয়া দেখি স্রোতেব মুখে ৪০ গজ চলিয়া আসিয়াছি। অতি কষ্টে তীবে আসিলাম। জিনিষ কিন্তু ছাড়ি নাই, অতিকষ্টে তাহাও টানিয়া তুলিলাম। শবীব অসাড় অবশ, গতিশক্তি নাই, হস্তেব অঙ্গুলিব কোন স্পর্শশক্তি নাই। সেই অসাড় হস্তেই নিজেব বুক ঘষিতে লাগিলাম। শবীবে বক্তেব স্বাভাবিক চলাচল হইতে প্রায় একঘণ্টা লাগিল। গাটবি হইতে মহৌষধি "হোটন" বাহিব কবিয়া সেবন কবিলাম। প্রাণপ্রদ "হোটন" সেবন কবিতেই ভীষণ কম্প আসিল—তিনঘণ্টা অবিশ্রান্ত কম্পভোগ কবিলাম। ৫টাব সময় যখন সূর্য্যাস্ত হইতেছে তখন কম্প থামিল। চাহিয়া দেখিলাম দূবে আমাব মেষদুটি নিশ্চিন্ত মনে চরিতেছে। অবোধ পশু জানে না তাহাব প্রভুব আজ কি দুর্গতি। অতি কষ্টে হামা দিয়া পৃষ্ঠের বোঝা লইয়া মেষদুটিব নিকট উপস্থিত হইলাম। সেদিন আব অগ্নি জ্বালিবাব সামর্থ্য হইল না, আধভিজা কাপড় কম্বল মুড়ি দিয়া কোনপ্রকাবে বাত্রি কাটাইলাম।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

২২৬৫০ ফুট উচ্চে।

পরদিন প্রাতে উজ্জ্বল দিন দেখা দিল। আমি আমাব বস্ত্র ও ধর্ম্মপুস্তকাদি শুকাইতে ব্যস্ত হইলাম। কাজকর্ম্ম সারিয়া বেলা ১টাব সময় আবাব যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তখনও আমাব শবীব অসুস্থ, বস্ত্রগুলি অর্দ্ধশুষ্ক। যাত্রা করা আমাব পক্ষে সমীচীন হয় নাই। কি কুক্ষণেই পা বাড়াইলাম। ভাবিলাম যতটুকু পাবি গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়াই ভাল। পৃষ্ঠেব বোঝা অসহ্য হইতে লাগিল। অতিকষ্টে ৫ মাইল পথ অতিক্রম করিলাম। তখন প্রচুর বর্ষণে তুষার-পাত আবম্ভ হইল। ক্ষুদ্র এক জলাশয়ের তীরে পৌঁছিয়া সেইখানেই বাত্রিযাপন করিব ভাবিলাম। আগুন জ্বালানো বা চা পান কবা একেবাবে অসম্ভব—এখনও দুর্যোগ। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝড় উঠিল। বজ্রেব কড়কড়ি, বিদ্যুতেব ঝকমাক, বাতাসেব হুহুঙ্কাব, প্রবলধারে তুষারপাত আবম্ভ হইল—এ যেন পঞ্চভূত তাল ঠুকিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ। পূর্ব্বদিন অত কষ্টে যাহা শুকাইয়া লইয়াছিলাম, সব ভিজিয়া গেল। পব দিন আবাব তাহা শুকাইতে চেষ্টা কবিলাম। সে চেষ্টা মাত্র—প্রকৃতি তখনও সম্পূর্ণ শান্ত হয় নাই। সে দিনও আগুন কবিতে পাবিলাম না, চা খাওয়া হইল না—কিছু শুষ্ক কিসমিস খাইয়া দ্বিপ্রহবে যাত্রা করিলাম। তখনও জানি না কি বিপদ আমাব জন্য অপেক্ষা কবিতেছে। উত্তব-পশ্চিমে যাত্রা কবিয়া কিয়ৎদূব গিয়া দেখি অভ্রভেদী এক হিমগিরি আমাব পথবোধ কবিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ পর্ব্বত অতিক্রম করা ছাড়া অন্য উপায় দেখিলাম না। সেই পর্ব্বত শিখবের নাম "কনগুইকাংচি", ২২৬৫০ ফুট উচ্চ। সেই তুষাবাচ্ছন্ন পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ কবিলাম। বৈকাল ৫টাব সময় ১০ মাইল আন্দাজ খাড়াই উঠিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ এক প্রবল তুষার ঝঞ্ঝা দেখা দিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া দ্রুত নামিতে আরম্ভ কবিলাম। তখন সূর্য্যও ডুবিয়া গেল। ঝড়ের প্রকোপও বৃদ্ধি পাইল। আমাব চেষ্টা পর্ব্বতে যাইলে যদি আশ্রয় পাই। কোথায়ও মাথা বাখিবাব স্থান নাই। অজস্র তুষারপাত হইতেছে—যেদিকে দেখি শুদ্ধ তুষার। দেখিতে দেখিতে ১২ ইঞ্চি গভীব তুষাবপাত হইল। তবু আমি প্রাণপণে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু কষ্টেব উপর কষ্ট, আমার মেষ দুটি আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহে না—অতি কষ্টে দড়ি ধবিয়া টানিয়া কিছুদূব লইয়া গেলাম, তখন তাহারা একেবাবে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল। আজ দুদিন তাহাবা অভুক্ত। পশুব প্রাণে কত সয়। ভয় হইল মেষ দুটি সেই বাত্রেই মাবা পড়িবে। আমি আজ নিতান্তই নিরুপায়,—যেদিকেই যাত্রা করি, কোথায়ও লোকালয় মিলিবে না। আশ্রয় কোথায়ও নাই। অদৃষ্টে যা থাকে থাক, সেখানেই রাত্রিবাস করিব, স্থির কবিলাম। কম্বল বাহির করিয়া গায়ে জড়াইলাম,—কম্বল পাতিয়া বরফের উপর বসিলাম।

মেষদুটি আমার দুই ধারে বরফের উপর শয়ন করিল। মনে করিলাম ধ্যানস্থ হইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিব। আমার হতভাগ্য মেষদুটির আজ কি শোচনীয় দশা! তাহারা ক্রমশঃ আমার গায়ে ঘেঁষিয়া বসিতেছে, আর মাঝে মাঝে করুণ স্বরে ডাকিয়া দুঃখ জানাইতেছে! আমি কখন পশুর এরূপ করুণ ডাক শুনি নাই। আমার প্রাণের অবস্থাও তদ্রূপ, এমন অসহায় এমন বিপন্ন আপনাকে কখন আর দেখি নাই! আমি বসিয়া বসিয়া লবঙ্গের তৈল গায়ে মাখিতে লাগিলাম—তাহাতে শরীরটা একটু গরম হইল। অর্দ্ধরাত্রের পর এমন ভীষণ শীত বোধ হইল, যেন আমার দেহের আর কোন সাড় নাই। ক্রমে যেন আমার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল—ঘোর তন্দ্রা আসিয়া আমায় আচ্ছন্ন করিল। এইটুকু আমার স্মরণ আছে, তখন মনে হইতেছিল আমি মৃত্যুর অন্ধকারময় রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

বরফের উপর রাত্রিবাস।

বরফে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আমি স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছি; কখন অনুতাপ কখন পুনর্জ্জন্মের আশা মনে উদিত হইতেছে। ক্রমে সকলই যেন অন্ধকারময় হইয়া গেল। আমি চৈতন্য হারাইলাম। তখন আমার আকৃতি নিশ্চয়ই মৃতের ন্যায় দেখাইতেছিল। হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, মনে হইল আমার পাশেই কি নড়িতেছে। চক্ষু খুলিয়া দেখি আমার মেষ দুটি দাঁড়াইয়া শরীর ঝাড়া দিয়া বরফ ঝাড়িয়া ফেলিতেছে। আমি যেন স্বপ্নই দেখিতেছি। ক্রমে তাহাদের বরফ ঝাড়া হইল। তখন আমি ভাবিলাম এ ত স্বপ্ন নয়, আমারও দেহ হইতে বরফ ঝাড়া দরকার। কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না। আমার সমুদায় দেহ যেন শক্ত কাঠ। আমি হাত পা নাড়িতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্রমে যেন আমার চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ভাল করিয়া আকাশের দিকে চাহিলাম। বড় দুর্যোগ। কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। সেই মেঘের ভিতর দিয়া এক-একবার সূর্য্য দেখা যাইতেছে। ঘড়ি খুলিয়া দেখি ১০৷৷-টা বেলা—কোন্ তারিখ স্মরণ করিতে পারিলাম না। একদিন না দুদিন বরফের উপর ঘুমাইয়াছি তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। কিছু আহার করা দরকার বুঝিলাম। বরফ মাখিয়া গমের রুটী গলাধঃকরণ করিলাম। মেষদুটিকে তাহার কিঞ্চিৎ অংশ খাইতে দিলাম। বুঝিলাম শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় পাহাড়ে উঠা আমার পক্ষে অসম্ভব। নামিতে আরম্ভ করিলাম। ভাবিলাম সেই পর্ব্বতের উপত্যকায় কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া সবল হইব। পাঁচ মাইল নামিয়া এক নদীর তীরে আসিলাম। আবার তুষারপাত আরম্ভ হইল। বরফের উপর রাত্রিযাপনের ভয়ে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় পাখীর ডাক কর্ণে প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখি ৭৷৮টি সারস-পাখী ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া নদীর জলে বেড়াইতেছে। যেন ছবির মত এ দৃশ্যটি দেখিলাম। নদীটি ১২০ গজ চওড়া। পার হইয়া গেলাম। উপত্যকায় নামিয়া দেখি দূরে একপাল চমরী চরিতেছে। প্রথমে সন্দেহ হইল বোধ হয় দৃষ্টির ভ্রম। দেখি তাহা নয়, সত্যই চমরীর দল। নিকটে গিয়া দেখি প্রায় ৬০টি চমরী একজন চরাইতেছে। লোকটি বলিল নিকটেই ৫টি তাঁবু পড়িয়াছে। আমি সেদিকে চলিলাম। তাঁবু দৃষ্টিগোচর হইতে-না-হইতে একপাল কুকুর তাড়া করিয়া আসিল। আমি তাঁবুর অধিবাসীর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিলাম। কিন্তু সে ব্যক্তি পরিষ্কার অসম্মতি জানাইল। হয়ত আমার আকৃতি দেখিয়া তাহার এরূপ ভাব হইল। আমি দুইমাস চুল কাটি নাই, অনাহারে পথের কষ্টে মূর্ত্তি ভয়ানক হইয়াছে। আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম। কিছুতেই সে ব্যক্তির হৃদয় গলিল না। বিষণ্ণ মনে দ্বিতীয় তাঁবুর দিকে গেলাম। এখানে অভ্যর্থনাটা চূড়ান্ত হইল। যত কাতরভাবে পথের কষ্ট, আমার শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করিতে লাগিলাম, লোকটির ব্যবহার ততই নির্ম্মম হইয়া উঠিল—আমায় কত কটু কথা শুনাইল—বলিয়া বসিল, "ডাকাতি করিতে আসিয়াছ, দূর হও!" আজ আমার একি লাঞ্ছনা! গভীর দুঃখে প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়! দুঃখে অপমানে আজ আমার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। মেষদুটিও যেন অবস্থা বুঝিয়া কাতরভাবে ডাকিতে লাগিল। তৃতীয় তাঁবু কাছেই ছিল, আশ্রয় ভিক্ষা করিতে সাহস হইল না। বরফের উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মেষদুটির কাতরভাব দেখিয়া, অতি কষ্টে চতুর্থ তাঁবুর দ্বারে আশ্রয় চাহিলাম। পরম সৌভাগ্যবলে চাহিবামাত্র আশ্রয়

পাইলাম। আমার দেহ অবসন্ন। সেদিন সন্ধ্যায় তাঁবুর ভিতর গিয়া যখন আগুনের পার্শ্বে বসিলাম, তখন মনে হইল যেন সশরীরে স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছি। পরদিন সেখানে বিশ্রাম করিয়া দ্বিতীয় দিন ভোর ৫টার সময় আমি সেই তাঁবুর অধিবাসীদের ধন্যবাদ করিয়া বিদায় লইলাম। আমি এবার উত্তর মুখে যাত্রা করিলাম। দশ মাইল বরফময় পথ অতিক্রম করিয়া তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে পদার্পণ করিলাম—সম্মুখে চাহিয়া দেখি মরুভূমি। মরুভূমি দেখিয়াই বালুর ঝড়ের কথা স্মরণ হইল। কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া মরুভূমি পার হইয়া গেলাম।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

"বন" দেবতা ও বন্য ঘোড়া।

পাঁচ মাইল মরুভূমি পার হইয়া আমি শ্যামল তৃণপূর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম। তাহা পার হইয়া সম্মুখে এক পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম সেই পর্ব্বতে তিব্বতবাসীদের আদিম দেবতা "বন" বাস করেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে এই "বন" দেবতাই পূজিত হইতেন। এখন তিব্বতে সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, "বন" দেবতার পূজা প্রায় কেহ করে না। এ দেবতার কোন মন্দির নাই, ইনি পর্ব্বতে হ্রদে বা ঝরণায় বাস করেন, লোকের এইরূপ বিশ্বাস। এই স্থানে কায়াং নামে এক-প্রকার বন্য ঘোড়া দেখিতে পাইলাম। ইহারা দেখিতে অনেকটা গর্দ্দভের ন্যায়, রং লালচে কটা, ঘাড়ের লোম কালো, উদরের বর্ণ সাদা, সাধারণ ঘোড়ার সহিত আকারগত কোন পার্থক্য নাই, কেবল লেজটি একটি গুচ্ছের ন্যায়। ইহারা অত্যন্ত দ্রুত ছুটিতে পারে, শরীরে শক্তি যথেষ্ট। ইহাদের প্রকৃতি বড় অদ্ভুত। কখন দল না বাঁধিয়া থাকে না,—দ্বিতীয়তঃ এক মাইল দেড় মাইল দূর হইতে মানুষ দেখিলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে তাহাদের কাছে যায় - আর পিছন ফিরিয়া ফিরিয়া আড়ে আড়ে দেখে। যেই কাছাকাছি হওয়া অমনি প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া পালায়। ইহাদের এই বৃত্তাকারে দৌড়ান বড় অদ্ভুত দৃশ্য। এখন এই কায়াংএর পাল্লায় পড়িয়া আমার যে দুর্গতি হইয়াছিল তাহাই বলি।—তিনটা কায়াং আমায় দেখিয়া ঘুরপাক খাইয়া ছুটিতে ছুটিতে আমার নিকট আসিল। আমার মেষ দুটি ঘোটকত্রয়ের এই অদ্ভুত দৌড়াদৌড়ি দেখিয়া ভয় পাইয়া হঠাৎ আমার হাতছাড়া হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। আমিও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রাণপণে ছুটিলাম। মেষদুটিকে ও আমাকে ছুটিতে দেখিয়া ঘোড়াগুলির যেন ভারি মজা হইল, তাহাদের নৃত্য দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। আমি দৌড়িতে দৌড়িতে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেলাম, তখন মেষদুটিও দাঁড়াইল, ঘোড়াগুলিও স্থির হইয়া দেখিতে লাগিল। আমি তখন নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া নিজেই হাসিয়া মরি। কিন্তু যখন দেখিলাম একটা মেষের পৃষ্ঠের বোঝা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, তখন প্রহসন ব্যাপারটি নিরবচ্ছিন্ন হাস্যরসপূর্ণ বোধ হইল না। বৃথা অন্বেষণ, অনেক দূর আসিয়াছি। সেই পুঁটলিতে আমার ৫০টি টাকা, ঘড়ি, কম্পাস এবং অন্যান্য জিনিষের মধ্যে পাশ্চাত্য সখের জিনিষই অধিক ছিল। মানুষের সঙ্গে ভাব করিবার উপায় বলিয়া সঙ্গে লইয়াছিলাম। এখন ভাবিতেছি সেগুলি হারাইয়া গিয়া ভালই হইয়াছে। বুদ্ধিমান লোকের চক্ষে সেসব পড়িলে আমার উপর সন্দেহের উদ্রেক করিত। ভগবান বুদ্ধ দয়া করিয়া আমায় বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রিয়া

(রাধিনাসের গ্রীক অনুবাদ হইতে)

তৃষিত হ'য়ে প্রিয়ারে যবে আনিতে বলি জল,
হাজির প্রিয়া তামাক সাজি, হস্তে দেন্ নল ;
ভোজনে বসি চাহিনু যদি একটুখানি নুন—
ব্যস্ত হয়ে আনেন প্রিয়া আঙুলে করি চুন ;
সুধাই তারে অসুখ হলে—"কেমন আছ, ধন ?"
বলেন হাসি—"জড়োয়া চুড়ি এবার নিতে মন।"
মোদের দোঁহে হইলে কথা পাড়ার প্রাণান্ত,
প্রেয়সী কন্—"গলাটি তব মেয়েলী নিতান্ত।"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বাঘগুহা

পথের কথা।

এবার আমায় গোয়ালিয়ার রাজসরকারের তরফ থেকে মার্চ মাসে বাঘ গিরিগুহায় প্রাচীন চিত্রাবলী পর্য্যবেক্ষণ করতে যেতে হয়েছিল। মধ্যভারতে এই বাঘগুহাগুলি ছাড়া ইন্দোরে পোলাডাঙ্গাড় (Poladungad), টঙ্করাজ্যে রামগাঁও আর হাতিগাঁও; এ ছাড়া ঝালওয়ারে আওয়ার ও বেনাইগা প্রভৃতি গুহাও আছে। এখনও মধ্যভারতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর অতি প্রাচীন হিন্দু রাজ্যের নিদর্শন উজ্জয়িনে, আর ভূপালে সাঞ্চি স্তূপ প্রভৃতিতে খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর বৌদ্ধ ইতিহাসের উপকরণ যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

বাঘে যাবার জন্যে আমায় ই আই রেলওয়ের বম্বেমেলে চড়তে হল। পরে খাণ্ডোয়ায় নেবে মাউয়ে যাবার জন্যে বি বি সি আই ছোট রেলে (Metre Gaugeএ) যেতে হয়েছিল। বম্বে-মেলে খাণ্ডোয়া যাবার পথে জব্বলপুরে মর্ম্মর-শৈল আর নর্ম্মদার বিখ্যাত জলপ্রপাতটি দেখবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। সন্ধ্যার সময় মেলট্রেন জব্বলপুরে এসে পৌছল। আমি কালবিলম্ব না করে ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে জিনিসপত্র-সমেত চাকরকে রেখে রাতারাতিই টঙ্গাগাড়ীতে চড়ে মর্ম্মর-শৈল দেখতে গেলুম। ষ্টেশনে সরকারী কোন বিশেষ বিভাগের বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর সঙ্গে পরিচয় হল। নানা কারণে তাঁকে সঙ্গে নেওয়া যুক্তি-সিদ্ধ বিবেচনা করলুম। ষ্টেশন থেকে মর্ম্মর-শৈলটি প্রায় ১৪ মাইল। সহর ছাড়িয়ে টঙ্গা জ্যোৎস্না রাত্রে পার্ব্বত্য পথ দিয়ে ছুটে চলল। নর্ম্মদা-নদীর জলপ্রপাতটি একটি নিভৃত পর্ব্বত-কন্দরে লুকানো আছে; তার আশেপাশে ঘন বন, শুনলুম বাঘ ভাল্লুকের নাকি অসদ্ভাব নেই। প্রপাতটির উপর মৃদু জ্যোৎস্নালোক পড়ায় উচ্ছ্বসিত ফেনিল জলকণাগুলি অসংখ্য সাদা সাদা ফুলের মত বিকীর্ণ হয়ে ভারি চমৎকার দেখাচ্ছিল। নির্জ্জনে জলপ্রপাতের বিচিত্র গম্ভীর শব্দ আর জ্যোৎস্নালোক ও পাহাড়ের গহ্বরের নিবিড় অন্ধকার এইসব মিলে যে কি সুন্দর স্বপ্নজাল বিস্তার করে তুলেছিল তা লিখে প্রকাশ করবার বিষয় নয়, অনুভব করবারই জিনিস। বিখ্যাত নর্ম্মদা নদীটি মধ্য-বিভাগের (C. P.র) তিন হাজার পাঁচশত ফুট উঁচু অমরকণ্টকের উপত্যকা থেকে নেবে এসে পার্ব্বত্য পথে প্রবাহিত হয়ে রেওয়া রাজ্য ছাড়িয়ে জব্বলপুরের কাছে ৩০ ফুট নীচু প্রপাতের পর ১২০ ফুট উঁচু মর্ম্মর-শৈলের প্রাচীরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মোট প্রায় ৮০১ মাইল ঘুরে ফিরে বম্বে প্রেসিডেন্সি বিভাগে সমুদ্র গর্ভে লীন হয়েচে। এই নদীটির প্রধান বৈচিত্র্য এই যে এটি বরাবরই পাহাড়ের কোলের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। বি বি সি আই রেলের ছোট ট্রেন মাউ যাবার পথে এই নদীটিকে অতিক্রম করেচে। সেখানে একেবারে নিবিড়ভাবে পাহাড়ে ঘেরা। জ্যোৎস্নায় মর্ম্মর-শৈলের মধ্য দিয়ে একটি ছোট্ট সাদা রঙের নৌকোতে যখন অল্প-পরিসর (পরিসর মাত্র ২০ ফুট) গভীর নদীটিতে এক মাইল জলের উপর ভেসে যেতে লাগলুম, তখন দু পাশের সাদা পাহাড় জ্যোৎস্নায় ঠিক যেন সাদা ঘোমটার মত নদীটির মুখটিকে ঢেকে আছে বলে মনে হল। পাথরের কর্কশতা এই জ্যোৎস্নালোকে মোটেই চোখে পড়ে না। প্রায় সমস্ত রাতটা সেখানে কাটিয়ে ভোরের বেলা ষ্টেশনে ফিরলুম। ফেরবার পথে পাহাড়ের উপর এক স্থানে একটি দেশী স্থাপত্যের রীতিতে গঠিত দেবমন্দির দেখলুম। সেটি শুনলুম কোন স্ত্রীলোক ময়দা পিষে অর্থ সংগ্রহ করে তৈরী করিয়েচে। এই ভাবেই আমাদের দেশী স্থপতিরা আমাদের দেশে এখনও বেঁচে আছে দেখা যায়। তারা রাজ-অনুগ্রহের আশাও রাখে না।

পরদিন বম্বে মেলে খাণ্ডোয়ায় ট্রেন বদল করে বি বি সি আই রেলের ছোট ট্রেনে ভোর রাত্রে চড়লুম। ছোট ট্রেনটি বিন্ধ্যের পার্ব্বত্য পথে ক্রমাগত উপরে উঠতে লাগল। এই পথে ট্রেন থেকে পাহাড়ে বন্য হরিণ ময়ূর প্রভৃতি দেখা যায়। এই পথের পার্ব্বত্য দৃশ্য ভারি মনোরম। এক জায়গায় লৌহবর্ত্মটি বারবার কাছা-কাছি কতকগুলি 'টানেল' অতিক্রম করে সর্পগতিতে এঁকে-বেঁকে ঘুরে ফিরে চলেচে আর তারই একপাশে মধ্য-ভারতের সমুন্নত উপত্যকার উপর থেকে একটি ঝরণা পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় ৩০০ ফুট নীচে রূপার তারের মত শত-ধারায় অজস্র তলে ঝরে পড়চে। ট্রেন পাহাড়ের টানেলের মধ্যে বারে বারে

প্রবেশ করে' আবার বেরিয়ে এসে ঝরণাটির সঙ্গে কিছুক্ষণ লুকোচুরি খেলে যথাকালে মাউ ষ্টেশনে এসে পৌছল। মাউ একটি বড় সহর। এখানে একটি ইংরেজ পল্টনের ছাউনি আছে। ডাক-টঙ্গা সেথান থেকে ধাড়ে যায় আর ধাড় থেকে পুনরায় আর-একটি টঙ্গা সরদারপুর পর্য্যন্ত যাওয়া-আসা করে। এই ডাক টঙ্গাতে চড়ে যাত্রীরাও যাতায়াত করে থাকে। মাউ থেকে ধাড় ৩৩ মাইল, ধাড় থেকে সরদারপুর ২৫ মাইল, সরদারপুর থেকে টাণ্ডা ১৬ মাইল আর টাণ্ডা থেকে বাঘ ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত। বাঘগুহায় যাবার পাকা রাস্তা এই মোট ৯৩ মাইল পাওয়া যায়। ডাক-টঙ্গায় কোন-গতিকে বসে থাকবার মত স্থান পাওয়া যায়। অসংখ্য ডাক-পার্শেলের শিল মোহর করা থলিগুলির আর নিজের আসবাবপত্রের মধ্যে সমস্ত রাত আড়ষ্ট হয়ে-বসে-বসে ৫৮ মাইল পথ অতিক্রম করে সকালে সরদারপুরে পৌছলুম। স্তব্ধরাত্রে পথে টঙ্গা-ওয়ালা ভেঁপু-বাঁশী বাজিয়ে পথিকদের সাবধান করতে লাগল—কেন না ডাক-টঙ্গায় আলো জ্বালাবার কোন ব্যবস্থাই নেই। মাউ থেকে সরদারপুর পর্য্যন্ত পথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মোটেই নয়নাভিরাম বলে মনে হয় না, একঘেয়ে ঢেউ-খেলান পার্ব্বত্য পথ, কোন-প্রকার বৈচিত্র্যই চোখে পড়ে না। এই প্রদেশটি অনুর্ব্বর বলে মনে হয়, কেন না রাস্তার ধারে সরকারী ২১টি ধড় গাছ ছাড়া অন্য গাছপালার চিহ্ন বড় একটা পাওয়া যায় না। বাঙ্গলা দেশের মত ফাল্গুনের কচি পাতার রঙিন খেলা মোটেই দেখা গেল না—সবই ধূসর মলিন বলে বোধ হল।

ধাড়ে টঙ্গা বদল করলুম। এটি ধাড় রাজ্যের রাজধানী। সরদারপুরটি গোয়ালিয়ার এলাকার আমঝেরা জেলার সদর। যখন আমি রাত্রে ধাড়ে পৌছলুম তখন দেখলুম ধাড়ের প্রকাণ্ড সহরটিতে একটি লোকও বাস করচে না—প্লেগের ভয়ে দরিদ্র তার কুটীর ত্যাগ করে, ধনী প্রাসাদ ত্যাগ করে পাতার বা দরমার কিম্বা অমনি একটা কিছুর ছাউনি করে সহরের বাইরে মাইলখানেক দূরে অতিকষ্টে সকলে বাস করচে। সহরটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমি পশ্চিমে কখনও বসবাস করিনি—প্লেগের বিভীষিকা এই প্রথম দেখলুম। শুনলুম ধাড়ে পূর্ব্বে বড় জলকষ্ট ছিল, তাই এখানকার সদাশয় মহারাজ একটি প্রকাণ্ড হ্রদ খনন করিয়ে জলকষ্ট নিবারণ করেছেন। হ্রদটি ভারি সুন্দর, কতকগুলি কৃত্রিম দ্বীপও তার মধ্যে আছে।

সরদারপুরের পথেই এই হ্রদটি পড়ে। সরদারপুর পর্য্যন্ত পথে আমার বড়ই একলা একলা ঠেকেছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে সেখানকার সুবাসাহেবের (ম্যাজিষ্ট্রেট) সঙ্গে পরিচিত হবার পর শুনলুম তিনি ও ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কোন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে টাণ্ডায় ও বাঘে যাবেন। তাই তাঁরাও আমার সাথী হলেন। সরদারপুর থেকে বাঘের পথে খুবই সুন্দর পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখা গেল আর এই পাহাড়গুলি বৃক্ষবিরল নয়। গিরি-গাত্রের উপর গাছপালা না থাকলে কেশহীনা সুন্দরীর মত সে প্রাকৃতিক দৃশ্যে কোনই শ্রী থাকে না।

আমরা পথে টাণ্ডায় ডাকবাঙ্গলায় বিশ্রাম করে পুনরায় বাঘে যাবার জন্যে রওনা হলুম। সরদারপুর থেকে যাবার জন্যে টঙ্গা পাওয়া যায় না। তবে, সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গলাভ করায় এ যাত্রায় গোরুর গাড়ীতে চড়তে হয়নি। অনেক উপত্যকা অধিত্যকা অতিক্রম করে আমরা বাঘ-গ্রামের ডাকবাঙ্গলায় এসে পৌছলুম। বাঘ ডাকবাঙ্গলার ঠিক পশ্চিমে একটি নাতিউচ্চ পাহাড়ের মাথায় ভাঙা দুর্গের প্রাচীর ও গড় দেখা গেল। আমরা যখন সেখানে পৌছলুম তখন সন্ধ্যার সূর্য্য সেই প্রাচীন বিগত-গৌরব গড়েরই ঠিক পশ্চাতে অস্ত গেলেন।

বাঘ-গ্রামটি সমতল ক্ষেত্রে, গোয়ালিয়ার রাজ্যে অবস্থিত। গ্রামটির কাছেই বাঘনদী আর তার চারিদিক পাহাড়ে আর গাছপালায় ঘেরা। এ স্থানটি অনুর্ব্বর বলে মনে হয় না। শুনলুম বাঘ-নদীতে বর্ষাকালে ৩।৪ মাস জল থাকে, বাকি সব সময় শুকনো। আমাদের ডাকবাঙ্গলা থেকে গুহা যাবার তিন মাইল কাঁচা পার্ব্বত্য রাস্তায় গোরুর গাড়ীতে এই নদীটিকে চারবার অতিক্রম করতে হয়েছিল। সরদারপুর থেকে বাঘগ্রাম পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে বটে কিন্তু বাঘগ্রাম থেকে গুহায় যাবার তিন মাইল পথ অতি জঘন্য। বাঘ-গ্রামটির কাছে পাহাড়ের ধারে বাগীশ্বরীর মন্দির। তারই কাছে আরো কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন গৃহের ভিত্তিচিহ্ন পাওয়া যায়। তা ছাড়া বাঘনদীর

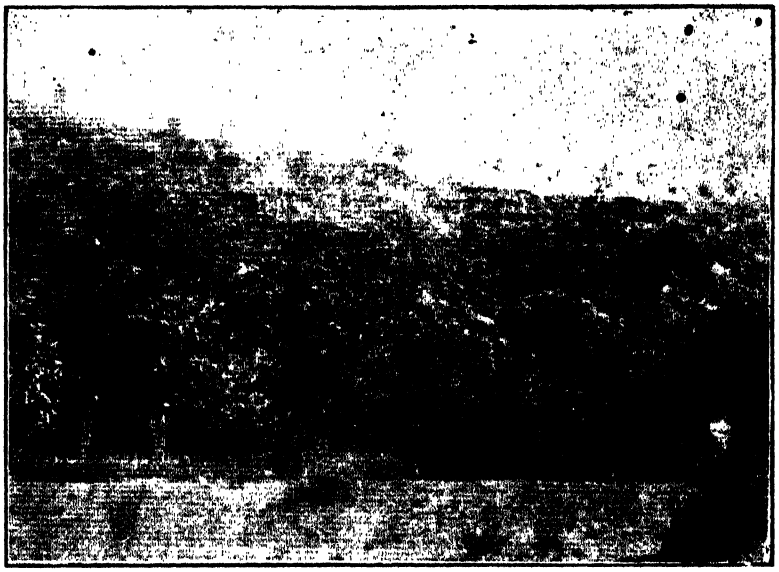
তীরে গঙ্গামহাদেও আর মহাকালেশ্বরের পাথরের মন্দির। নাতিবৃহৎ গঙ্গামহাদেওয়ের মন্দিরটির বিশেষত্ব এই যে এটির উপরের চূড়ার অংশটি ইট দিয়ে গাঁথা আর নীচের অংশ পাথরের। গঙ্গামহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি ছাড়া কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও প্রাচীন মূর্ত্তি মন্দিরের মধ্যে স্থান পেয়েচে। সেগুলির মধ্যে কতকগুলি খুব সুন্দর এবং প্রাচীন বলেই মনে হয়। গঙ্গামহাদেবের মন্দিরের কাছে একটি খাড়া প্রাচীরের মত পাহাড়ের গায়ে দৈবক্রমে আমরা কয়েকটি অনাবিষ্কৃত গুহা-গৃহের দ্বারের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলুম; কিন্তু সেটি এমনি ধসে পড়েচে যে তার মধ্যে মানুষে প্রবেশলাভ করতে পারে না। গুহাটির ছাদটি সম্পূর্ণ ধসে পড়ে ভিতরটা সমস্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেচে। সেটা যে পূর্ব্বে কি ছিল তা এখন বোঝাই যায় না। মহাকালেশ্বরের মন্দিরটি একটি অতিক্ষুদ্র পাথরের মন্দির। এটির গঠন ও কারুকার্য্য খুব সুন্দর ছিল—এখন একেবারে ভেঙে গেছে। এখানে একটি বিরাটকায় হনুমানজীর মূর্ত্তি আর একটি ছোট বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। স্থানটি চারিধারে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, ছোট উঁচু উপত্যকার মত। এখানে একটি স্বাভাবিক ঝরণা আছে। লোকে সেটিকে 'পাতাল-গঙ্গা' বলে অভিহিত করে থাকে। গ্রীষ্মের প্রকোপে ঝরণার জল কখনও একেবারে শুকিয়ে যায় না, তাই সাধারণের বিশ্বাস যে সমুদ্র শুকিয়ে গেলেও এখানকার জল কখনও শুকোবে না আর এই জলে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের পুণ্য সঞ্চয় হয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতে এখানে স্নান করতে বহুদূর থেকে লোক আসে। বাঘে যাবার পথে একটি ধান-ক্ষেতের ধারে কতকগুলি সুগঠিত দাঁড়ানো পাথরের মূর্ত্তি আছে; সেগুলির মধ্যে একটি মা ছেলে কোলে করে দাঁড়িয়ে। পাথরের এই মাতৃমূর্ত্তিটির ভাব ও ভঙ্গী ভারি সুন্দর ফুটেচে। সমস্ত মূর্ত্তিগুলিতেই কলাকৌশলের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনাবৃত স্থানে পড়ে থাকায় এগুলি ক্রমশই নষ্ট হয়ে যাচ্চে। মূর্ত্তিগুলি দেখে বেশ বোঝা যায় যে সেগুলি কোনো প্রাচীন মন্দিরের অংশ; তবে সেগুলি যে-পাথরে খোদাই করা হয়েচে সে-রকম শক্ত পাথর বাঘের পাহাড়ে নেই। বাঘ-গুহার সঙ্গে এগুলির কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না।

গুহাগৃহ।

আমাদের মনে হয় বাঘ-গ্রামের নিকটবর্ত্তী বাগীশ্বরী অর্থাৎ বাগ্‌দেবীর প্রাচীন মন্দিরটির নাম অনুযায়ী যদি বাঘ-নদী বাঘগ্রাম ও গুহাগৃহগুলির নামকরণ করা হয়ে থাকে তা হলে 'বাঘ' না বলে 'বাগ' নামে এগুলিকে অভিহিত করতে হয়। যাই হোক এ-সকল বিষয় বিশেষজ্ঞেরা বিবেচনা করবেন।

বাঘে মোট ৯টি গুহামন্দির দেখা যায়। তার মধ্যে ৬টি বড়, বাকি তিনটি ছোট ছোট। এই স্থানটি চারি ধারে পাহাড়ে ঘেরা আর মাঝখানে একটি বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি, তাতে অসভ্য ভীলেরা চাষবাস করে। বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যে সবচেয়ে অপকৃষ্ট নরম বালি-পাথরের পাহাড়ে এই গুহাগুলি খোদিত হয়েছিল। তাই এগুলি ভারতের অন্যান্য স্থানের গুহাগৃহের চেয়ে অধিক পরিমাণে ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রথম গুহাটি থেকে দ্বিতীয় গুহাটির ব্যবধান সাড়ে নয় শত ফুট। তার ঠিক মাঝখানের সমস্ত পাহাড়টাই প্রায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধসে পড়ে গেছে। পূর্ব্বে তার মধ্যে গুহা প্রভৃতি কিছু ছিল কি না কিছুই বলা যায় না। গুহাগুলি সব প্রায় উত্তর-পশ্চিম মুখী। এই নরম বালি-পাথরের গুহা-প্রাসাদগুলি উত্তর-পশ্চিম মুখে অবস্থিত হওয়ায় উত্তর-পশ্চিমের দুরন্ত ঝড়ে যে সমূহ অনিষ্টসাধন করেচে তা বেশ বোঝা যায়। বাঘ-গুহার বিশেষত্ব এই যে অজন্তা প্রভৃতির মত ভজন-পূজনের জন্যে স্বতন্ত্র চৈত্য-মন্দির আর বসবাসের জন্যে বিহার-গুহা নেই। এগুলিতে বিহারগুহার একেবারে ভিতরে যেখানে একটি স্বতন্ত্র ঘরে ধ্যানী বুদ্ধদেবের বিরাট প্রতিমূর্ত্তি থাকে সেইখানে তার পরিবর্ত্তে চৈত্যগুহার মত প্রকাণ্ড একটি স্তূপ বর্ত্তমান। সেই গুহাতেই আশে পাশে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে ভিক্ষুদের বাসের উপযোগী ঘর। এ ছাড়া ভিক্ষুদের বাসের জন্যে তৈরী একটি আলাদা গুহাও আছে। এই-সব গুহাগুলিকে স্থানীয় লোকে পঞ্চপাণ্ডবের গুম্ফা বলে, আর এই স্থানটিকে বিরাটপুরী বলে তাদের ধারণা। ১ম গুহাকে 'গৃহগুম্ফা', ২য়টিকে 'গোঁসাই-গুম্ফা' আর ৪র্থটিকে 'রঙমহল' নামে অভিহিত করে থাকে।

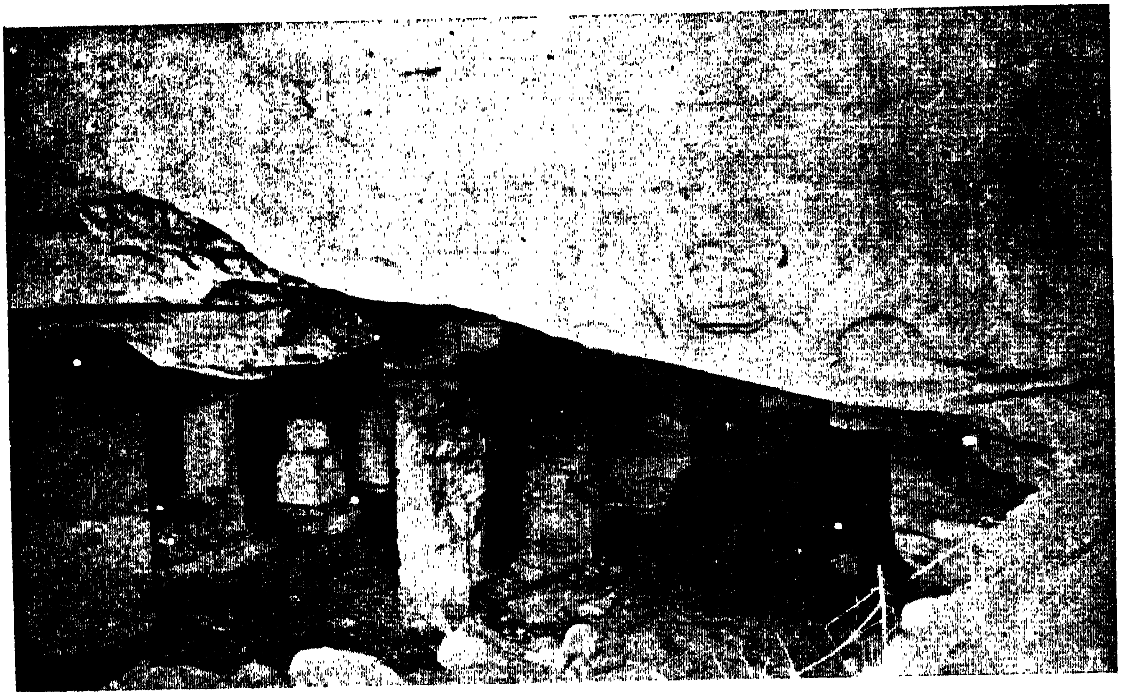
১ম গুহাটি একটি ছোট ২৩´×১৪´ ফুট গুহা, চারটি থামে সজ্জিত ছিল। থামগুলির নীচের দিকটা চতুষ্কোণ, উপরের



৮ ও ৯ গুহার বহির্দৃশ্য।
(বাঘ গুহা)

খানিকটা অষ্টকোণী আর মাথার উপরটা অল্প-স্বল্প কারুকাজ-করা। সব থামগুলিই এখন ধসে পড়ে গেছে। গুহার বাইরের দালানের চিহ্নমাত্র নেই। এই গুহাটির কিছু উপরে একস্থানে পাহাড়ের গায়ে গুহা খোদাইয়ের চিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় কিছুই বোঝা যায় না।

দ্বিতীয় গুহাটিতে কিছুকাল পূর্ব্বে একটি সাধু বাস করতেন। তাঁরই নামে এই গুহাটির নামকরণ করা হয়েছে—গোঁসাই-গুম্ফা। এই গুহাটিতে গোঁসাই ঠাকুরের সিঁড়ি তৈরী করা প্রভৃতি কতকগুলি মহৎ লীলা দেখা যায় বটে, কিন্তু তার চেয়ে উপকার করার ছলে তিনি গুহাগুলির বহু অনিষ্ট-সাধনই করে গেছেন। গুহাটিকে আগুনের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে যেখানে সেখানে তেল সিঁদুর মাখিয়ে লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছেন। গুহাটির সামনেই বাইরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট মন্দির তাঁর কীর্ত্তিধ্বজা উড়িয়ে পথ জুড়ে বসে আছে আর গুহার যেখানে যত পাথরের ভাঙা কারুকাজ-করা স্তূপ ছিল তার উপর গোবর-মাটি দিয়ে তাঁর আপন কীর্ত্তিতে প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি চাপা দিয়ে গেছেন। এমন কি গুহার বাইরের একটি প্রকোষ্ঠের বুদ্ধমূর্ত্তিকে গোবরমাটি ও তেল-সিঁদুর দিয়ে ঢেকে ফেলে তাতে হাতীর শুঁড় জুড়ে দিয়ে গণেশে পরিণত করে ফেলেছেন। এই নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করে যে তিনি নিরীহ তীর্থযাত্রীদের চোখে ধুলো দিয়ে কিছু রোজকার করতেন তা বেশ বোঝা যায়। এই গুহার অভ্যন্তরে বুদ্ধদেব ও তাঁর প্রধান প্রধান শিষ্যের কতকগুলি খোদিত মূর্ত্তি আছে, সেগুলি সংখ্যায় ৮টি হলেও লোকে সেগুলিকে পঞ্চপাণ্ডব বলতে ত্রুটি করে না। গুহার হলঘরটি ৮৬´×৮৬½´ ফুট। হলটিতে প্রথম সারে চারিধারে চৌকোভাবে মোট ২০টি থাম আছে। তার মাঝখানে ১০ ফুট ব্যবধানে পুনরায় চারটি থাম আছে। গুহার গভীরতম প্রদেশে যে চৈত্যপ্রকোষ্ঠে স্তূপ আছে তার সামনে একটি থাম-দেওয়া ঘরে ডানদিকে তিনটি বাঁদিকে তিনটি মূর্ত্তি খোদাই করা; আর দ্বারের দুপাশেও দুটি স্বতন্ত্র মূর্ত্তি আছে। তিনটি মূর্ত্তির মধ্যের মূর্ত্তিটি বুদ্ধদেব; দাঁড়িয়ে ধর্ম্মপ্রচার করছেন আর তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দুজন ভক্ত, একজনের হাতে পদ্ম, অপরের হাতে ফল, এইরূপ খোদিত আছে। বামদিকের মূর্ত্তিগুলিতে বুদ্ধদেবের মুখের ভাবটি আমাদের খুবই ভাবপূর্ণ বলে মনে হল। চৈত্যপ্রকোষ্ঠের প্রবেশদ্বারের দেয়ালে যে দুটি মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে সে দুটির মধ্যে একটি মূর্ত্তি রাজবেশে সজ্জিত অলঙ্কারকুণ্ডলে পরিশোভিত আর মাথার কিরীটের পাশে জ্যোতিশ্চক্র দেওয়া। এটি তখনকার কালের বুদ্ধদেবের কোন ভক্ত নৃপতির প্রতিমূর্ত্তি হতে পারে। অপর মূর্ত্তিটির মাথায় কিরীট আছে কিন্তু অলঙ্কারের বা আভরণের পারিপাট্য নেই; দক্ষিণ হাতে পদ্ম, বামহাতে মঙ্গলঘট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এটিকেও বুদ্ধের কোন প্রধান ভক্তের ছবি বলেই অনুমান হয়। দ্বিতীয় গুহাটি ভিন্ন অপর কোন গুহায় বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি বড় একটা দেখা যায় না। এ গুহাটিতে পূর্ব্বে কোন কোন স্থানে ছবি আঁকা হয়েছিল বলে মনে হয়,



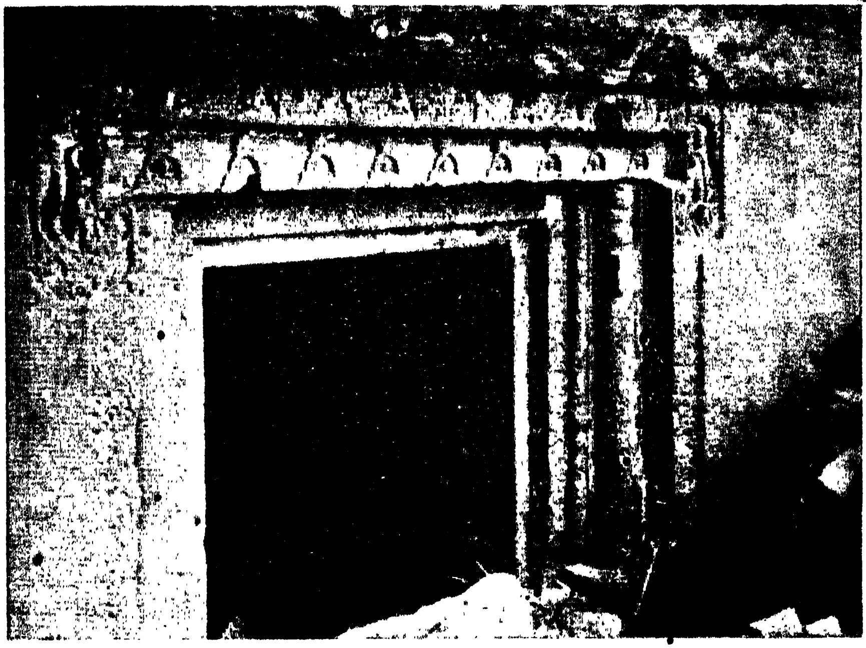
তিনের গুহার সামনে বাঘের মুখ।
(বাঘগুহা)

কেননা কোন কোন জায়গায় ছাদের উপর চিত্রকলার কারুকার্য্যের সামান্য চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়। তাছাড়া চিত্রপটের জন্যে মাটির তৈরী জমি কোন কোন স্থানে এখনও আছে।

তিনের গুহাটি যে ভিক্ষুদের বাসের জন্যে তৈরী হয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। এই গুহাটির সামনে কতকগুলি বাঘের মুখ খোদাই করা আছে। ছাদের নীচে পদ্ম হাঁস প্রভৃতির ছবি খণ্ড-খণ্ড ভাগে বিভক্ত করে আঁকা আছে। এগুলি অজন্তার ছাদের নীচের কারুকার্য্যের ছবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন কি ছাদের ঠিক মধ্যভাগে শালের চন্দ্রাতপের মত একটি পদ্ম আর চার পাশে নানা-রকম কারুকার্য্য অজন্তার মত এখানেও ছিল—স্থানে স্থানে তার চিহ্ন আছে। এই গুহাটির গভীরতম প্রদেশে কোন বুদ্ধমূর্ত্তি বা স্তূপ নেই বা তার জন্যে বিশেষ কোন প্রকোষ্ঠ নেই। একেবারে ভিতরে একটি হলঘর আটটি মোটা মোটা চারকোণা থামের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার আশে-পাশে কোন ছোট প্রকোষ্ঠ নেই। এই হলের বাইরে গুহা-প্রবেশের পথেই ৬টা থাম-দেওয়া একটি হলগৃহ। তারই আশে-পাশে বারান্দা আর ঘরের ভিতর ঘর খোদাই করা। এই-সব ছোট ছোট ঘরগুলির ছাদে ও দেয়ালে এখনও চিত্রকলার নিদর্শন অল্প অল্প দেখা যায়। একটি ঘরে হাতীর পিঠে সিংহ অতি অস্পষ্টভাবে আঁকা আছে। সেই ঘরেই দুপাশের দেয়ালে বড়-বড় দুটি বুদ্ধের মূর্ত্তির পায়ের অংশটুকু পদ্মের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চোখে পড়ে—বাকি উপরের দিকটা সব নষ্ট হয়ে গেছে। এই ধ্বংসাবশিষ্ট পায়ের ছবিটি থেকেই কলানৈপুণ্যের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কামরাগুলির বাইরে একটি ছোট প্রকোষ্ঠের প্রবেশদ্বারের একপাশে একজন মানুষের ছবি আঁকা, লম্বা জামা পরে যেন পথ থেকে কিছু কুড়িয়ে নিচ্চে।

এই-সব গুহা খুব অন্ধকার। অজন্তা বা বাঘের এইরূপ অন্ধকার গুহাগৃহের মধ্যে শিল্পীরা যে কি উপায়ে এমন সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে গিয়েছিল তা বলা শক্ত।

চতুর্থ গুহাটিকে লোকে সেখানে 'রঙমহল' কেন বলে জানি না। রঙিন ছবি এখন বেশী তাতেই দেখা যায় বলে



রঙমহলের দ্বার।
(বাঘগুহা)

হয়তো এই নামে অভিহিত করে থাকবে। তিনের গুহাটি থেকে এটি ২০০ ফুট দূরে অবস্থিত। এই গুহাটিতে পাথরের থামের কারুকার্য্য আর ছবি প্রচুর ও সবচেয়ে সুন্দর দেখা যায়। ৪, ৫ ও ৬এর গুহাগুলি সব পাশাপাশি। ৪এর আর ৫এর গুহা দুটি বাইরের দিক থেকে একটি প্রকাণ্ড ২২৪ ফুট লম্বা ১৪ ফুট উঁচু আর ১০ ফুট চওড়া বারান্দা দিয়ে জোড়া ছিল। এই দীর্ঘ বারান্দার পাথরের দেয়ালে ৫১ ফুট মাটিলেপা জমির উপর ছবি এখনও অবশিষ্ট আছে দেখা যায়। এই বড় বারান্দার একটি থামও না থাকায় সামনের অংশের পাহাড়ের খানিকটা উপর থেকে ধসে পড়েচে। কতকটা দেয়ালের ছবি এই পাথরের মধ্যেই চাপা পড়ে গেছে। এই অনাবৃত দেয়ালের মধ্যে ছবিগুলির অংশ এখনও এতকাল ধরে ঝড় বৃষ্টি ধূলোতে যে কি করে টিঁকে আছে এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই গুহাতে ভাস্কর্য্যের মধ্যে একটি দেয়ালে ধনকুবেরের ও অপর দেয়ালে নাগেশ ও নাগরাণীর মূর্ত্তি আছে। এইরূপ নাগেশের মূর্ত্তি অজন্তার ১৯ নম্বর গুহার বাইরে একস্থানে আছে, তবে অজন্তার মত বাঘের মূর্ত্তিতে নাগেশ ও নাগরাণীর মূর্ত্তির সঙ্গে সখার মূর্ত্তি খোদাই করা নেই *। এই মূর্ত্তিগুলি কালের করাল কবলে হতশ্রী হয়ে পড়েচে, এখন এসব অতিকষ্টে চিনে নিতে হয়। বাইরের দালানের গুহার প্রবেশ-দ্বারের উপর কতকগুলি লোক কথোপকথন করচে আঁকা আছে। লোকগুলির গায়ের রং কালো কিন্তু গঠন ভারি চমৎকার। এই ছবিগুলির আগের দেয়ালে কতকগুলি ছবি আছে কিন্তু সেগুলি এখন এত অস্পষ্ট হয়ে পড়েচে যে কিছুই নির্ণয় করা যায় না—কতক-গুলি হলুদ লাল কালো রঙের চিহ্ন মাত্র দেখা যায়। অপর-দিকের দেয়ালে একদল মেয়ে তাদের খোঁপায় কাপড়, ফুল প্রভৃতি জড়িয়ে সাদা নীল হলদে ডুরে কাপড় পরে নৃত্যগীত করচে। একজন পুরুষ তাদের মধ্যে গম্ভীরভাবে হাতের উপর হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে যেন কি ভাবচেন। তাঁর দৃষ্টি এই নর্ত্তকীদের ছাড়িয়ে যেন কোন্ সুদূরে আবদ্ধ! ছবিটির বিষয় যে কি হতে পারে বলা যায় না, তবে এই বৌদ্ধগুহায় সিদ্ধার্থের

* অজন্তা, শ্রীঅসিতকুমার হালদার-প্রণীত, ৬৩ পৃঃ দেখুন।



রাসমণ্ডলের রঙ্গিণী
(বাঘগুহা)

বুদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে রাজোদ্যানে সখীদের সঙ্গে নৃত্যগীত আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে বাসের একটি চিত্র হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। তার পাশেই আবার একজন অশ্বারোহী রাজপুত্রের লোক-লস্কর নিয়ে শোভাযাত্রার ছবি। এটিও সিদ্ধার্থের প্রথম উদ্যান প্রাঙ্গণ ত্যাগের পর সহর প্রদক্ষিণের ছবিও হতে পারে। এগুলির ঠিক ধারেই আরো কিছু কিছু ছবি আছে দেখা যায়, তবে সেগুলি ভাল বোঝা যায় না। এই ছবিগুলি অনাচ্ছাদিত অবস্থায় বহু যুগ থেকে পড়ে থাকায় ধুলোবালি জমে-জমে আর ঝড়-বৃষ্টিতে এমন মলিন ও নষ্ট হয়ে গেছে যে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে তবে অল্পকাল মাত্র অতি কষ্টে নজরে পড়ে; আবার জল শুকিয়ে গেলেই প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অনাচ্ছাদিত ছবিগুলি ভিন্ন বাঘ-গুহায় অপর উল্লেখযোগ্য ভাল কোন ছবির নিদর্শন এখন আর দেখা যায় না। দুঃখের বিষয় এই-সব ছবির উপর, কালের অত্যাচার ছাড়া, অজ্ঞ লোকেরা ছুরি দিয়ে নাম ধাম লিখে লিখে ক্রমশঃ ছবিগুলি আরো নষ্ট করে ফেলেচে। এই ছবিগুলি অজন্তার ধরণের হলেও এই মূর্ত্তিগুলির ভাবে ও ধরণে স্বতন্ত্র একটা বিশেষত্ব আছে বলে মনে হয়। অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির সঙ্গে এগুলির তুলনা হতে পারে। বর্ণবিন্যাসে রেখাঙ্কণে ও মূর্ত্তিগুলিকে যথাযথ স্থানে আরোপ করতে এই বাঘ-শিল্পীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন। রঙের মধ্যে লাল আর সাদা রঙটা এখনও পর্য্যন্ত বেশ আছে—নষ্ট হয়নি। বাঘের ও অজন্তার চিত্রকরেরা যে কি বর্ণ ব্যবহার করতেন বলা যায় না।

চারের গুহার হল ঘরটি ৯২ × ৯৩½ ফুট চতুষ্কোণ গুহা। এ হলের ডান দিকে ৫টি, বাঁদিকে ৮টি বাসোপযোগী প্রকোষ্ঠ। আর সবচেয়ে ভিতরের চৈত্য প্রকোষ্ঠের দুপাশে তিনটি করে ৬টি শয্যাপ্রকোষ্ঠ আছে। হলটি প্রথম সারে চৌকো ভাবে মোট ২৮টি থামের সারে, পরে চার পাশে ২টি



২য় গুহার বুদ্ধমূর্ত্তি।
(বাঘগুহা)



২য় গুহার রাজবেশধারী দ্বারীর মূর্ত্তি।
(বাঘগুহা)

করে ৮টি গোল আর একেবারে মাঝে পুনরায় ৪টি বড় বড় পাথরের থামে সজ্জিত ছিল। মাঝের চৌকো মোটা বড় চারটে থাম বড়-বড় পাথরের টুকরো দিয়ে গাঁথা। এই গুহার হলের থাম প্রায় সব ধসে পড়েছে। হলটির মাঝখানের উচ্চতা ১৫½ ফুট। হলের চারিপাশে দেয়ালে এখনও চিত্র অল্পবিস্তর আছে। অজন্তার মত হলঘরের ভিতরের দেয়ালে মূর্ত্তিচিত্র (figure drawing) বেশী নেই। হলের দেয়ালের নীচের দিকে প্রকোষ্ঠগুলির দ্বারের মাঝখানের অংশে একটি করে দাঁড়ান বুদ্ধমূর্ত্তি আর তার আশে-পাশে ও উপরের অংশগুলিতে লতাপাতা এঁকে ভরানো। তা-ছাড়া একটি সুন্দর আলঙ্কারিক লতাপাতার চিত্র বরাবর সমস্ত হলটির দেয়ালের মাথায় আঁকা আছে। এই লতার পরিকল্পনাটি অজন্তা থেকে স্বতন্ত্র বলেই মনে হয়। অজন্তাতে এরকম পাড়ের মত নক্সা কোথাও আঁকা নেই।

থামগুলিতে ও ছাদের নীচে আলঙ্কারিক চিত্রের নমুনা এখনও কোন কোন স্থানে দেখা যায়। গুহাটির বাইরের দিকের একটি প্রকোষ্ঠে ছোট ছোট আট সার বুদ্ধমূর্ত্তি আঁকা আছে। এগুলির রঙ প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলি ছাড়া আর ছবি বিশেষ কিছু দেখা যায় না। গুহাগুলি স্তূপাকারে ভেঙে পড়ায় অনেক জিনিসই হয় নষ্ট হয়ে গেছে, নয় অনাবিষ্কৃত অবস্থায় আছে। এখন এখানে শিল্পকলার চেয়ে বাদুড়-পেঁচারই নিদর্শন বেশী পাওয়া যায়। অন্ধকার গুহাগুলির পাথরের প্রকাণ্ড বড় বড় থাম আর ছাদের বিরাট অংশগুলি এ উহার ঘাড়ে এমন ভাবে পড়ে



করকমল
(বাঘগুহা)

আছে যে সহসা তার মধ্যে প্রবেশ করতেও ভয় হয়। স্বপ্নপ্রয়াণের ঋষি কবির পাতাল-পুরীর—

"অট্টালিকা মহাশয়
পার্শ্ব পড়িয়াছে ভাঙি
উচ্চশির মস্তক শিখায়,
ভাঙা জানালায়
বায়ু ফুসলায়
আছেন কাল-পেচক থামের আগায়"

প্রভৃতি কবিকল্পনাগুলি এখানে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে!

ষষ্ঠ গুহাটি একটি লম্বা ধরণের হলঘর; দুসারে মোট ১৬টি থামে সজ্জিত। হলটি ৯১½′×৪৩½′ ফুট। উচ্চতা ১৪ ফুট ৭ ইঞ্চি। ৫এর গুহাটি চতুষ্কোণ, একটি হলে দুসারে ৪টি থাম এবং ৫টি স্বতন্ত্র শয্যাপ্রকোষ্ঠ আছে।

এখানে একটি কামরা ব্যাঘ্রের ভুক্তাবশিষ্ট হাড়ে ভরা আছে দেখলুম?

সাতের গুহাটি ঠিক্ ছয়ের গুহাটির অনুরূপ ২০টি থামের সারে সজ্জিত চতুষ্কোণ, হলটি ৮৮×৮৬ ফুট। এই গুহাটিতে ভাস্কর্য্যের বিশেষ কিছু নিদর্শন নেই। তবে গুহাটিতে পূর্ব্বে ছবি ছিল বলে মনে হয়, কেননা দুই এক স্থানে মাটির ছবির জমির চিহ্ন আছে। এই গুহাটি এত বেশী ভেঙেচুরে পড়েছে যে এর ভিতর প্রবেশ করা যায় না। এখানে কোন কোন গুহার গভীরতম প্রদেশে এখনও বাঘ যে বাস করচে তা তার পায়ের চিহ্ন এবং অন্য নানা কারণে বেশ বোঝা যায়।

অষ্টম গুহাটিতে ২০টি-থাম-দেওয়া একটি চারকোণা দালান ছিল বলে মনে হয়। নয়ের গুহায় যে কি ছিল কিছুই এখন বলা যায় না, সমস্তটা পাথরে চাপা পড়ে আছে।

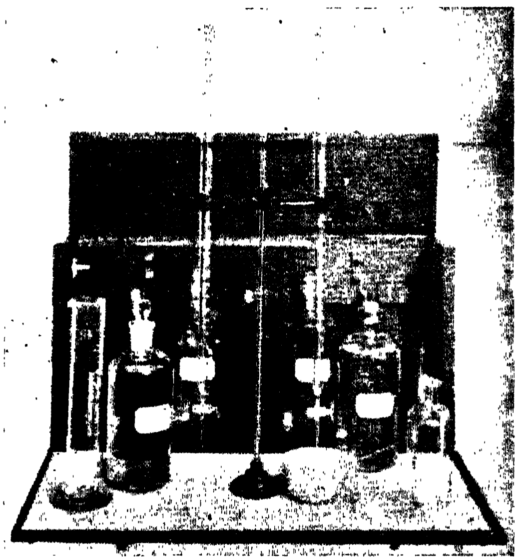
এই বাঘগুহা মাত্র এক শতাব্দীকাল আবিষ্কৃত হয়েচে। এই গুহার বিষয় মোগল আমলের কোন পুস্তকে উল্লেখ আছে বলে শোনা যায় না। দুঃখের বিষয় গুহাগুলির গায়ে বা চিত্রে কোন প্রাচীন লিপি পাওয়া যায় না।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

পঞ্চশস্য

পোশাকের ব্যাগের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার—

আমেরিকা অভিনব দেশ। সেখানে মানুষের কাজের সুবিধার জন্য নিত্য নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইতেছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে সম্প্রতি ধোবাদের সুবিধার জন্য ব্যাগের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার সৃষ্ট হইয়াছে। উহার সাহায্যে, কাপড় সাফ করিবার জন্য যে-সব জিনিস ব্যবহৃত হয়, সেগুলি বিশুদ্ধ কিনা তাহা ধোবারা নিজেরাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবে। পরীক্ষা করিবার প্রণালী এমন সহজভাবে লিখিয়া প্রত্যেক ব্যাগের সঙ্গে দেওয়া হয় যে তাহা দেখিয়া যে-কোনো ব্যক্তি কাপড়-ধোওয়া মালমশলা উপযুক্ত কিনা তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বুঝিতে পারিবে। ব্যাগের মধ্যে কাঁচের যন্ত্রাদি এমনভাবে সাজানো যে ব্যাগ বন্ধ করিয়া লইয়া যাইলে সেগুলি ভাঙিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। 'সুটকেশ' বা পোশাকের ব্যাগের যে-ধারে হাতল থাকে সেইটি উঠাও, একটি সাধারণ সুটকেশের যেটি ঢাকনা সেটি নামাইয়া দাও, তাহা হইলেই পরীক্ষাগার কাজের উপযোগী হইল। যে-ধারটি নামানো হইল তাহা পরীক্ষার টেবিলের কাজ করে। উহার মাঝে ধাতুর পাত বসানো থাকে। তার উপর একটি



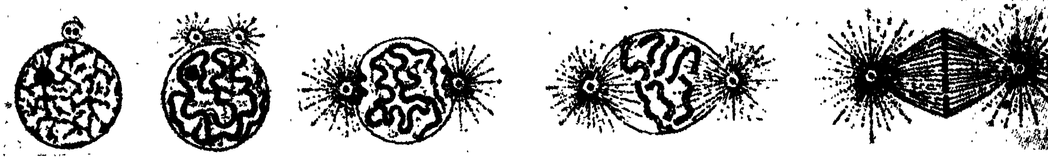
পোশাকের ব্যাগের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার।

ধাতুনির্ম্মিত দণ্ড বসানো এবং ঐ দণ্ডের গাত্রসংলগ্ন আংটায় লম্বা কাঁচের নল বা burette আটকানো থাকে। মাপিবার একটি আঁককাটা গেলাস; জলের মধ্যে ক্ষার ক্লোরিন এবং অ্যাসিড আছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য, চার বোতল standard solution; অন্য তিনটি ছোট বোতলে পোটাশিআম আওডাইড, ফেনোলথালীন, ও মেথিল অরেঞ্জ;—ইহাই সমস্ত সরঞ্জাম।

এই সহজলভ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে ধোবার কাজ অতি পরিপাটিরূপে চলিবে। কাপড় বেশী সাফ হইবে এবং কম ছিঁড়িবে। কারণ মসলার মধ্যে কাপড়ের পক্ষে ক্ষতিকর যদি কিছু থাকে তবে তা পরীক্ষা দ্বারা জানিয়া বাদ দেওয়া হইবে। আমাদের দেশে ধোবার কষ্ট কত তা সকলেই জানেন। এখানে সস্তায় কেহ এরূপ একটি 'পরীক্ষাগার' তৈরি করিয়া ধোবাদের মধ্যে চালাইলে একটা মস্ত অসুবিধা দূর হয়। সু।

ফলের উপর মানুষের প্রতিকৃতি—

পূজা পার্ব্বণ ও জন্মদিন বা নামকরণ এবং বিবাহ কিম্বা অন্য কোন উৎসব উপলক্ষে উপহার-দানের প্রথা বোধ হয় সকল দেশেই প্রচলিত আছে। এরূপ কোন অনুষ্ঠানে ব্যক্তি-বিশেষের আলোক-চিত্র বা ফটোগ্রাফ লইয়া তাঁহাকে সেই প্রতিকৃতি উপহার দিবার ব্যবস্থা সভ্যদেশের বহুস্থানে আজকাল সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ স্থলে যদি সেই প্রতিকৃতি কোন সুপক্ক ফলের উপর চিরস্থায়ীরূপে মুদ্রিত হইয়া উপহার প্রদত্ত হয় তাহা হইলে উহা যে একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা বলিয়া অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচ্যদেশের কোনও স্থানে এই প্রথা প্রচলিত নাই এবং সমগ্র প্রতীচ্য জগতের মধ্যে কেবলমাত্র ফরাসীদেশে কিঞ্চিৎপরিমাণে এবং জর্ম্মান রাজ্যে বহুল পরিমাণে উক্ত প্রথা দৃষ্ট হয়। উক্ত রাজ্যে বড়দিন কিম্বা ইষ্টার পর্ব্বের সময়ে অথবা জন্মদিন কিম্বা অন্য কোন শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মানবের-প্রতিকৃতি-সমন্বিত ফল উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে। আপেল ফলই



জীব কোষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ছবি।
প্রথম ছবি কোষের স্থির অবস্থা। তারপর ক্রমশঃ কোষাংশগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিয়া
অবশেষে শেষের ছবিতে কাজের জন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।



ফলের উপর মানুষের প্রতিকৃতি।

সচরাচর এই কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জর্ম্মান রাজ্যে কুল পেয়ারা এমন কি কুমড়া পর্য্যন্ত নিতান্ত অনুপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় না। ১৯০২ সালের মে মাসের ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিনে কি প্রণালীতে ফলের উপর মানুষের প্রতিকৃতি মুদ্রিত করা হয় তাহা লিখিত হইয়াছে। প্রণালীটি বিশেষ কঠিন নহে। আপেল ফলটি পরিপক্ক ও লাল আভায় রঞ্জিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রতিকৃতি-সম্বলিত ষ্টেনশিল পেপার দিয়া উহা দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া বা মুড়িয়া রাখা হয় পরে ফলটি সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত ও সুরঞ্জিত হইলে উক্ত প্রতিকৃতি তাহার উপর চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়। এখানে যে চিত্রখানি সন্নিবেশিত হইল তাহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে উহা একটি আপেল ফলের চিত্র এবং উহার অন্তর্গত প্রতিকৃতিটি আমাদের ভূতপূর্ব্ব ভারত-সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড মহোদয়ের। এই অপূর্ব্ব আপেল ফলটি ফরাসীদেশে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে উপহৃত হইয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক।

জীব-কোষের বুদ্ধি—

পরীক্ষার দ্বারা স্থির হইয়াছে কোষ (cell) বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন। ইহার বোধশক্তি আছে। ইহার স্মৃতি ইচ্ছা ও বিচারশক্তি আছে। আমরা যেমন অভিজ্ঞতার দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করি কোষও তাই করে। একটি বড় জীবদেহে যেমন নানাপ্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকে, কোষও তেমনি একটি সম্পূর্ণ জীব, অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা গঠিত। কোষেরও একটি মাথা আছে যেখান হইতে অন্যান্য কোষাংশের চালনা হইয়া থাকে। এই মাথা বা চালনা কক্ষটিকে সেণ্ট্রোসোম (centrosome) বলে। কোষদেহের মধ্যভাগে কয়েকটি সহকারী মাথা আছে। সেগুলির মধ্যে শক্তি জ্ঞান এবং বিভিন্ন রকম কাজ করিবার ক্ষমতা নিহিত আছে। সে সব কাজ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কোষকে করিতেই হয়। কোষের এই অংশটি যদি নষ্ট করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তার আর কাজ করিবার শক্তি থাকে না। সে আপনাকে খাওয়াইতে পারে না এবং আপনার অনুরূপ কোষ জন্মাইতেও পারে না।

সকল কোষ সমান নয়। কোন কোনটি বেশ সুনিয়ন্ত্রিত; আবার কোন কোনটির মধ্যে যে-সব অংশ বর্ত্তমান তাহাদের সকলের কাজ এখনো সম্পূর্ণ বোঝা যায় নাই। সকলের চেয়ে ছোট কোষ জীবাণু (bacteria), তারপর উদ্ভিদ-কোষ এবং ব্যাঙের ছাতা। সকলের চেয়ে বড়গুলি জীবদেহ তৈরি করে বা জলের মধ্যে পৃথকভাবে বাস করে। ইহারা উদ্ভিদ ও জীবগণের ন্যায় উপনিবেশ সৃষ্টি করে না।

সমস্ত জীবন্ত পদার্থকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যে-কোষগুলি পৃথকভাবে এবং একাকী বাস করে, যেমন জীবাণু প্রভৃতি; অথবা কোষ-সমষ্টির একটি উপনিবেশ, সংখ্যায় বহু কোটি; উদ্ভিদ ও জীব-জন্তুর ন্যায় উহারা সকলে একত্র খাটে, সমগ্রের উপকারের জন্য। গাছ বা জীব যতদিন বাঁচে ইহারাও ততদিন বাঁচিয়া থাকে। গাছ বা জীব মরে তখনই যখন তাহাদের মধ্যেকার কোষগুলির মৃত্যু হয়।

খুব শক্তিশালী অনুবীক্ষণদ্বারা দেখা গিয়াছে যে কোষগুলি আবার অন্যান্য ছোট ছোট কোষ দ্বারা নির্ম্মিত।

বিভিন্ন কোষের মন যখন একত্র মানুষের মাথার মধ্যে কাজ করিতে আরম্ভ করে তখন মানুষের মনও কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। এই কার্য্যে নিযুক্ত কোষসমষ্টিই মানুষের মস্তিষ্ক।

রোগের বীজাণু সকল সময়েই মানুষের শরীরে প্রবেশ করিবার সুবিধা খুঁজিতেছে। একটু সুযোগ পাইলেই তাহারা হুড়মুড় করিয়া মানুষের গলায় নাকে বা মুখে গিয়া বসে। সংখ্যায় বাড়িয়া রক্তের মধ্যে মিশিবার আগেই উহাদের বিনষ্ট হওয়া প্রয়োজন। শরীরের মধ্যে যে-কোষগুলি শাদা কোষ (white cells) নামে খ্যাত তাহাদের কোনো নির্দ্দিষ্ট কাজ নাই, যেমন পেশী ও স্নায়ুমধ্যস্থ কোষগুলির আছে। তবে ইহারা খুব একটা বড় কাজ করে। দেহ আক্রমণকারী রোগ-বীজাণুকে ইহারা ধ্বংস করে। এবং শরীরের ভগ্ন অংশ মেরামত করে। হয়ত তুমি আঙুল কাটিয়া ফেলিলে অমনি ইহারা দলে দলে সেই স্থানে ছুটিয়া গিয়া ক্ষতমুখ বন্ধ করিতে আরম্ভ করিবে। ঐ কাটা অংশ দিয়া যে-সব রোগ বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ধ্বংস করিতে ইহারা প্রাণপাত করিবে। এই কাজ

করিতে রীতিমত বুদ্ধি খরচ করিতে হয়, কোন্‌খান দিয়া কেমন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, কোনখানে কাহাকে বাধা দিতে হইবে বা কোন্ আততায়ীকে অগ্রে বধ করিতে হইবে এ সমস্তই ভাবিয়া স্থির করিতে হয়।

যে সূক্ষ্ম বীজাণুকে অণুবীক্ষণ-সাহায্যে দেখিতে হয় তাহারো ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিবার শক্তি আছে এ কথা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মানুষ আজকাল পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে দেহের সর্ব্বত্রই বুদ্ধিমত্তা বিদ্যমান। কেবল মস্তিষ্কের মধ্যেই যে আছে এমন নয়। গু।

তরমুজের কথা—

কবি লিখিয়াছেন

জীবন ধারণ কিম্বা আরাম-কারণ
যে যে বস্তু আমাদের হয় প্রয়োজন
সকলি সুলভ এতে অভাব ত নাই,
যখন যা প্রয়োজন সেই দ্রব্য পাই।

কথাগুলি অতীব সত্য হইলেও অনেক সময় উহা আমাদের স্মরণ থাকে না; কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে



তরমুজ।

কোন জিনিস আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন হইলে আমাদের পাইবার পক্ষে তাহার সম্যক্ আয়োজন এবং ব্যবস্থারও কোন অভাব হয় না। কোনপ্রকার শস্য অথবা বৃক্ষলতাদি জন্মে না বলিয়া চিরতুষারাচ্ছন্ন হিমমণ্ডলান্তর্গত মেরুপ্রদেশবাসীদিগের আহারের নিমিত্ত বরফ-স্তূপের নিম্নে সলিলাভ্যন্তরে সিন্ধুঘোটক ও শীল মৎস্যাদির বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। গো অশ্ব মহিষাদি বহু গৃহপালিত পশু মানব-সেবায় নিয়োজিত থাকিলেও মরুবাসীদিগের প্রয়োজনানুযায়ী উষ্ট্রই তাহাদের প্রধান অবলম্বন। আবার বহুক্রোশব্যাপী বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমির মধ্যে স্থানে স্থানে নদী কূপ বা নির্ঝরের শীতল জলধারা-সমন্বিত তৃণ-পাদপসঙ্কুল মরুদ্বীপের ব্যবস্থা করিয়া বিধাতা তাঁহার অপার করুণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শুনিয়াছি রাজপুতানায় কোন কোন স্থানে যেখানে জলের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে সেখানেও বহুল পরিমাণে তরমুজ জন্মে। বস্তুত প্রখর গ্রীষ্মের দিনে মানবের ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির জন্য পরম করুণাময় পরমেশ্বর যে কয়েকটি ফলের সৃষ্টি করিয়াছেন তরমুজ তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান ফল তাহাতে সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর নানাদেশে ও নানাস্থানে তরমুজ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের এই ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশেও বিস্তর তরমুজ জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত গোয়ালন্দের তরমুজ তাহার বৃহৎ আয়তন ও মিষ্টতার জন্য কলিকাতাবাসী অনেকেরই সুপরিচিত। এমন কি কলিকাতায় থাকিতে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে গোয়ালন্দের ন্যায় সুবৃহৎ তরমুজ অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। দিল্লী আসিয়া আমার সে ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে, কারণ দিল্লীতে যে তরমুজ পাওয়া যায় তাহা আয়তন এবং উৎকর্ষে গোয়ালন্দের তরমুজ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোলরেডো প্রদেশে রকি পর্ব্বতের অধিত্যকায় যে তরমুজ জন্মে তাহা ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। ১৮৯৯ সালের অক্টোবর মাসের ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশ যে এই কোলরেডো হইতে একটি তরমুজ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রেরিত হইয়াছিল। এই অশ্রুতপূর্ব্ব সুবৃহৎ তরমুজ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে কুলি-মহলে পর্য্যন্ত বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং তদবধি কোলরেডো



তরমুজের ফীডিং-বোতল।

প্রদেশ লণ্ডনের সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। তরমুজটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ হাত এবং উহার ওজন ৪ মণ ১৫ সের। এই বৃহত্তম তরমুজের একটি প্রতিকৃতি এখানে প্রদত্ত হইল; ইহা হইতে তরমুজটি যে কত বড় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। এদেশে উৎপন্ন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তরমুজের ওজন কত তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে কোন বন্ধুর নিকট অবগত হইয়াছি যে রাজপুতানা হইতে আনীত কোন তরমুজের ওজন দেড় মোন হইয়াছিল।

এক্ষণে কোলরেডোর আর একটি তরমুজের কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। উহা একটি ক্ষুদ্রজাতীয় তরমুজ এবং একটি বোতলের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। যখন উহার আকার একটি ক্ষুদ্র শসার ন্যায় তখন বৃন্তসহ উহাকে বৃক্ষচ্যুত করা হয় এবং বোঁটার মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহাতে কোন পলিতার (Lamp-wick) এক প্রান্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া অপর প্রান্ত চিনির জলে পূর্ণ বোতলে ডুবাইয়া রাখা হয়। এইরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে দেখা যায় যে

উহার ওজন ১২২ সের হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মাসিক পত্রের লেখক বলেন যে এ জাতীয় তরমুজের ওজন সাধারণত ৭।৮ সেরের অধিক হয় না কিন্তু বোতলের মধ্যে চিনির জলে বর্দ্ধিত হওয়ায় এই তরমুজটি একদিকে যেমন আয়তনে বৃহত্তর অপরদিকে আস্বাদেও তেমনি সুমিষ্টতর হইয়াছিল। এই তরমুজটিরও একটি চিত্র এখানে সন্নিবেশিত হইল।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক।

অনিদ্রা—

নিউ ইয়র্ক শহরের এক ডাক্তারের মতে অনিদ্রা-রোগের উৎপত্তি হয়, রোগী ঘুমাইতে পারিবে না মনে করে বলিয়া। অনিদ্রা রোগগ্রস্থ ব্যক্তি বিছানায় শুইয়াই ভাবিতে আরম্ভ করে, হয়ত তাহার ঘুম হইবে না; এবং এই ভয়ে সে কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না।

রাত্রির প্রথম ভাগে ঘুমের ব্যাঘাত অনেক সময় চা কফি বা মদ্য-পানের জন্য ঘটিয়া থাকে; ভোরের দিকে ঘুম হয়না অনেক সময় ক্ষুধার দরুণ।

অনিদ্রা রোগ সারাইতে হইলে রোগীর মন হইতে অনিদ্রা-ভীতি দূর করা আবশ্যক। "অনিদ্রা", এই ভয়ানক নামটি ব্যবহার না করাই ভালো। রোগীর অবস্থা বর্ণনা করিতে হইলে "জাগিয়া থাকা" বলাই বিধেয়। কোনো ব্যক্তি আট ঘণ্টা সময় বিছানায় শুইয়া থাকিলে ঘুম না হওয়ার দরুণ তার কোনো ক্ষতি হয়না। এমন অনেক লোক দ্যাখা যায় যাহারা হপ্তার পর হপ্তা এমন কি মাসের পর মাস ঘুমাইতে পারে নাই, অথবা ঘুমাইতে পারে নাই বলিয়া যাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের কোনোরূপ স্বাস্থ্যহানি ঘটে নাই। যে-সব লোকের ঘুম সহজে আসে না তাহাদের শান্তভাবে কিছু পড়া উচিত, শুইবার সময় তারা পাশে একখানি বই লইয়া শুইবে। যে ঘরে ভালোরকম বাতাস চলাচল করে সেই ঘরে শোওয়া উচিত। মনে মনে বিশ্বাস করা উচিত, কোনো ক্ষতি হইবে না, প্রকৃতি আপনার পাওনা ঠিক বুঝিয়া লইবে।

ঘুম একটা অভ্যাস। যার অনেক রাতে শোওয়া অভ্যাস সে যদি কোনো দিন সকাল-সকাল শোয় তবে তাহাকে অনিদ্রায় ভুগিতে হইবে। আবার যার সকাল-সকাল শোওয়া অভ্যাস সে যদি বেশি রাতে শোয় তবে তাঁর অবস্থাও হইবে ঐরূপ। ঘুম যে-সময় সাধারণত আসে তার আগে ঘুমাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কোনো লাভ নাই; তাহাতে কেবল অশান্তি বাড়ে।

ঘুম না হওয়ার জন্য ওষুধ খাওয়া বড় ভুল। তবে গরম জলে মিনিট দশেক পা ডুবাইয়া রাখা, গরম দুধের উপর ঘন করিয়া কালোজিরা ছড়াইয়া দিয়া সেই দুধ পান, পায়ে বোতলে করিয়া গরম জলের সেঁক এবং মাথার পেশীগুলি টিপিয়া দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

জেপেলিন—

জেপলিন ছাড়া আর সবরকম বেলুন বা আকাশযানে অনেক গ্যাস নষ্ট হয়। সামরিক বেলুন ও আকাশযান যে-হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়া ফোলানো হয় তাহা, বেলুন যত উচ্চে উঠে তত বিস্তার লাভ করে। সেইজন্য মধ্যে মধ্যে খানিকটা করিয়া গ্যাস বাহির করিয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়, নহিলে বেলুন গ্যাসের অত্যধিক চাপে ফাটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। বেলুন যখন নীচে নামিয়া আসে তখন অনেকখানি গ্যাস বাহির হইয়া গেছে, আবার তার মধ্যে গ্যাস ভরিলে তবে উপরে ওঠা সম্ভব হয়। অনেক উঁচুতে উঠিলে বন্ধ করা গ্যাশ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তার ফলে বাতাসে বেলুনে-ভাসিয়া থাকা সম্বন্ধে নানা গোলযোগ ঘটে। জেপেলিনে ব্যবস্থা অন্যরকম। জেপেলিনের গ্যাসের থলিগুলি সামান্যমাত্র ফোলানো থাকে। জেপেলিন যখন খুব উঁচুতে উঠে তখন গ্যাস বিস্তারলাভ করিয়া থলিগুলি পরিপূর্ণ করিয়া দ্যায়। গ্যাসের চাপ কমাইবার জন্য জেপেলিনে মোটেই গ্যাস নষ্ট করা হয়না।

তারপর জেপেলিনের বেগও অসাধারণ। জেপেলিনের আকৃতি বিপুল ভার তুলিবার পক্ষে উপযোগী। খুব উঁচুতে যখন জেপেলিন এলোমেলোভাবে ভাসিয়া চলে বা একই স্থানে স্থির হইয়া থাকে, এবং উহা ছাড়িবার বা নামাইবার সময়ই গ্যাস খরচ হয়। জেপেলিন ঘণ্টায় অন্তত ষাট মাইল চলে, সেইজন্য বেলুনের ভার হ্রাসবৃদ্ধিহেতু যে-সকল মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনা ইহাতে সেরূপ কিছুই নাই।

যুদ্ধের আগে ফ্রান্স জার্ম্মেনি ও ইংলণ্ড যে-সব চালনীয় আকাশযান নির্ম্মাণ করে তার মধ্যে একমাত্র জেপেলিনই কেবল আকাশে, যুদ্ধ-জাহাজ বা বড় বড় যাত্রীজাহাজের তুল্য, নিয়মিতরূপে আসা যাওয়া করিতে পারিয়াছে। অবশ্য বোমা ফেলায় জেপেলিন মোটেই কৃতিত্বের পরিচয় দ্যায় নাই। কিন্তু জেপেলিন-নির্ম্মাতা কাউণ্ট জেপেলিন বা জার্ম্মেনীর যুদ্ধবিশারদেরা কেহই বোমা ফেলিয়া শহর ধূলিসাৎ করিবেন এরূপ অদ্ভুত আশা হৃদয়ে পোষণ করেন নাই। জেপেলিনের প্রধান কাজ জার্ম্মেনীর নৌবাহিনীকে ইংরেজ নৌ-বাহিনীর অবস্থান ও চলা-ফেরা সম্বন্ধে খবর দেওয়া। জেপেলিনের সাহায্যেই জার্ম্মানেরা জাটলাণ্ডের জলযুদ্ধের ব্যবস্থা অমন ভালোরকম করিতে পারিয়াছিল। ইহা বড় কম কথা নয়।

———

মেঘের গান

যখনই আকাশ ও পৃথিবীকে ঘনঘটা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছে তখনই ভারতের সরস হৃদয় গান গাহিয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব কবির গভীরতম গান মেঘের গান। উত্তর-পশ্চিমের "কজলী" কাজল-বরণ মেঘেরই আনন্দ-গান। কিন্তু মেঘের গান এদেশে আরও বহু পুরাতন। ঋক্ ও অথর্ব বেদেও ঋষিহৃদয় মেঘের গহন ছায়ায় গাহিয়া উঠিয়াছে। মেঘের দিকে চাহিয়া তাঁহারা যে গান গাহিয়াছেন—তাহারই দুই চারটি গান আজিও সহৃদয়গণের বর্ষায়-নিবিড় সন্ধ্যাকে নিবিড়তর করিয়া তুলিতে পারে। ঋগ্বেদের ঋষি বর্ষার সন্ধ্যায় গাহিয়াছেন।—

দিবা চিৎ তমঃ কৃণ্বন্তি পর্জন্যেনোদবাহেন।
যৎ পৃথিবীং ব্যুন্দংতি। ঋগ্বেদ ১, ৩৮, ৯।
(ঋষি ঘোরপুত্র কণ্ব।)

সজল মেঘে দিবাকেও যে অন্ধকার করিয়া ফেলিতেছে, পৃথিবীকে সরস করিয়া দিতেছে।

পর্জন্যদেবকে আগত দেখিয়া তাঁহার স্তবগান করিয়াছেন—

অচ্ছা বদ তবসং গীর্ভিরাভিঃ
স্তুহি পর্জন্যং নমসা বিবাস।

কনিক্রদদ্ বৃষভো জীরদানু
রেতো দধাত্যোষধীষু গর্ভম্। ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল ৮৩ তম সূক্ত।

হে গায়ক, আজ এই গানের দ্বারা নিবিড় মেঘের স্তব কর। আজ এই নিবিড় মেঘের কাছে মাথা নত কর। মেঘ আজ কি গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে ওষধীর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিতেছে।

বি বৃক্ষান্ হংতি উত হংতি রক্ষসো
বিশ্বং বিভায় ভুবনং মহা বধাৎ।
উতানাগা ঈষতে বৃষ্ণ্যাবতো
যৎ পর্জ্জন্যঃ স্তনয়ন্ হংতি দুষ্কৃতঃ।
ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল ৮৩ তম সূক্ত।

পর্জ্জন্যদেব আজ বৃক্ষগণকে বিদলিত করিয়া বনবাসী রক্ষগণকে নিহত করিয়া চলিয়াছেন। জলপ্লাবী মেঘগণের ভয়ে আজ নিষ্পাপও ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে—পর্জ্জন্যদেব আজ বজ্রনির্ঘোষে দুষ্কৃত দগ্ধ করিতে উদ্যত।

রথীব কশয়াশ্বাঁ অভিক্ষিপন্
আবিদূতান্ কৃণুতে বর্ষ্যাঁ অহ।
দুরাৎ সিংহস্য স্তনথা উদীরতে
যৎ পর্জ্জন্যঃ কৃণুতে বর্ষ্যং নভঃ॥
ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল, ৮৩ তম সূক্ত।

রথীর ন্যায় অগ্নিময় কশায় মেঘ-অশ্বগণকে অভিক্ষিপ্ত করিয়া স্বীয় আগমন মরুৎ-দূতগণের কুলিশকণ্ঠে নির্ঘোষিত করিয়া পর্জ্জন্যদেব আজ বিশ্বপ্লাবী মেঘগণকে চালাইয়া চলিয়াছেন। পর্জ্জন্য আজ আকাশকে মেঘ-মুখর করিয়াছে, তাই দুর হইতে সিংহের গর্জ্জন উদিত হইতেছে।

প্রবাতা বান্তি পতয়ন্তি বিদ্যুত
উদোষধীর্জিহতে পিন্বতে স্বঃ।
ইরা বিশ্বস্মৈ ভুবনায় জায়তে
যৎ পর্জ্জন্যঃ পৃথিবীং রেতসাবতি॥
ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল, ৮৩ তম সূক্ত।

দিকে দিকে বায়ু ধাবিত হইতেছে, বিদ্যুৎসকল পড়িতেছে, ওষধী-সকলকে বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুর নির্গত হইতেছে, আকাশ জলধারায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, পৃথিবী আজ অন্নপূর্ণা হইয়া উঠিয়াছেন—পর্জ্জন্যদেব যে রসধারায় পৃথিবীকে রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যস্য ব্রতে পৃথিবী নংনমীতি
যস্য ব্রতে শফবজ্জর্ভুরীতি।
যস্য ব্রতে ওষধী বিশ্বরূপাঃ
স নঃ পর্জ্জন্য মহি শর্ম্ম যচ্ছ॥
ঋগ্বেদ, ৫ম মণ্ডল, ৮৩ তম সূক্ত।

(ঋষি ভৌম অত্রি।)

যাঁহার ব্রতে পৃথিবী একান্ত বিনত, যাঁহার ব্রতে গবাদি পশুগণ পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, যাঁহার ব্রতে রূপহীন ওষধী-সকল নানাবিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই পর্জ্জন্য আমাদিগকে মহৎ কল্যাণ দান করুন।

কেবল ঋগ্বেদে নহে। আথর্বণরা স্বভাবত প্রকৃতি-প্রিয়, তাঁহারা বৃষ্টির দিকে চাহিয়া সেই আদি বারিবিন্দুর ধ্যান-রসে ডুবিয়া গেলেন। দেখিলেন সেই আদি বিন্দু হইতে আদি-দর্ভ উৎপন্ন হইয়াছে। এই রহস্যের অতল রসে ডুবিয়া তাঁহারা উচ্চারণ করিলেন—

যৎ সমুদ্রো অভ্যক্রন্দৎ পর্জন্যো বিদ্যুতা সহ
ততো হিরণ্যয়ো বিন্দুস্ততো দর্ভো অজায়ত॥
অথর্ব্ব ১৯শ কাণ্ড ৩০ সূক্ত।

সমুদ্র যখন অভিক্রন্দন করিতেছিল, পর্জন্য বিদ্যুৎসহ অভিক্রন্দন করিতেছিল, তখন তাহা হইতে সোনার বরণ জলবিন্দু জন্মগ্রহণ করিল; তাহা হইতে তৃণ সঞ্জাত হইল।

তাহার পর প্রকৃতির নিবিড় লীলা দেখিয়া বর্ষার গান গাহিলেন—

সমুৎপতন্তু প্রদিশো নভস্বতীঃ সমভ্রাণি বাতজুতানি যন্তু
মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু॥
অথর্ব্ব ৪র্থ কাণ্ড, ১৫শ সূক্ত।

পবন-প্রযুক্ত দিক্‌সকল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকুক, উদকপূর্ণ মেঘসকল অনিলাহত হইয়া নিবিড় হইতে থাকুক। মহাঋষভের ন্যায় নিনাদকারী মেঘসমূহের গর্জ্জিত জলধারা পৃথিবীকে তৃপ্ত করুক।

সমীক্ষয়ন্তু তবিষাঃ সুদানবোপাং রসা ওষধীভিঃ সচন্তাম্
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং পৃথক্ জায়ন্তামোষধয়ো বিশ্বরূপাঃ॥
অথর্ব্ব ৪র্থ কাণ্ড, ১৫শ সূক্ত।

শোভন-দান-যুক্ত এবং অতিমহান্ মরুদ্‌গণ আবির্ভূত হউন, রসসকল ঔষধিগণের সহিত সমবেত হউক। বর্ষণের ধারাসমূহ পৃথিবীকে পূজা করুক। এবং বিচিত্র ঔষধীসকল নানাভাবে সঞ্জাত হউক।

সমীক্ষয়স্ব গায়তো নভাংস্যপাং বেগাসঃ পৃথক্ উদ্ বিজন্তাম্
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং পৃথগ্ জায়ন্তাং বীরুধো বিশ্বরূপাঃ॥
অথর্ব্ব ৪র্থ কাণ্ড, ১৫শ সূক্ত।

হে মরুদ্‌গণ, আমরা সঙ্গীতে প্রবৃত্ত। আমাদিগকে মেঘের সমূহ দর্শন করাও। জলের প্রবল বেগ-মুক্ত ধারা-সকল বিভিন্ন দিকে বিচিত্রগতিতে ছুটিয়া চলুক। বর্ষার ধারাসমূহ পৃথিবীর পূজায় প্রবৃত্ত হৌক। নিখিলরূপা বীরুধগণ বিচিত্রভাবে আবির্ভূত হউক।

গণাস্তোপ গায়ন্ত মারুতাঃ পর্জন্য ঘোষিণঃ পৃথক্‌।
সর্গা বর্ষস্য বর্ষতো বর্ষন্ত পৃথিবীমনু ॥
অথর্ব্ব ৪র্থ কাণ্ড, ১৫শ সূক্ত।

হে পর্জন্য, গর্জ্জনঘোষণাকারী মারুতগণ তোমার সঙ্গীত গাহিয়া চলুক। বর্ষার নিখিল ধারা গভীর বর্ষণে পৃথিবীকে অভিষিক্ত করুক।*

উদীরয়ত মরুতঃ সমুদ্রতস্ত্বেষো অর্কো নভ উৎপাতয়াথ।
মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু ॥
অথর্ব ৪র্থ কাণ্ড, ১৫শ সূক্ত।

হে মরুদ্‌গণ, সমুদ্র-মধ্য হইতে উঠিয়া আইস। আমাদের অর্চ্চন-সঙ্গীত দীপ্তিময়। হে মরুদ্‌গণ, মেঘসমূহকে উর্দ্ধে ঘনীভূত করিতে থাক। মহাঋষভের ন্যায় নিনাদকারী মেঘসমূহের গর্জ্জিত জলধারা পৃথিবীকে সংতৃপ্ত করুক।

অভিক্রন্দ স্তনয়ার্দয়োদধিং ভূমিং পর্জন্য পয়সা সমঙ্ধি।
ত্বয়া সৃষ্টং বহুলমৈতু বর্ষমাশারৈষী কৃশগুরেত্বস্তম্‌ ॥
অথর্ব ৪র্থ কাণ্ড, ১৫শ সূক্ত।

হে পর্জন্য, চতুর্দ্দিক ধ্বনিত করিয়া তোল। বজ্র-সঙ্গীতে গাহিয়া উঠ, জলধারায় সাগর ভাসাইয়া দাও! জলধারায় ভূমিকে নিষিক্ত করিয়া দাও, তোমার সৃষ্ট বহুল সান্দ্র বর্ষণকারী মেঘ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া ঘন হইয়া উঠুক, ক্ষীণরশ্মি সূর্য্য (মেঘের সমুদ্রে) ডুবিয়া যাউক।

সংবোবন্তু সুদানব উৎসা অজগরা উত।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্তু পৃথিবীমনু ॥
অথর্ব ৪র্থ কাণ্ড, ১৫শ সূক্ত।

শোভন-দান-যুক্ত মরুদ্‌গণ তোমাদিগকে সংতৃপ্ত করুন। জলধারা-সকল, স্থূল সর্পের ন্যায় (জীবন্ত হইয়া কুটিল ক্ষিপ্র গতিতে) চতুর্দ্দিকে ধাবিত হউক। পবনের দ্বারা প্রেরিত মেঘসমূহ পৃথিবীকে অভিষিক্ত করুক।

আশামাশাং বিদ্যোততাং বাতা বান্তু দিশোদিশঃ।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ সংযন্তু পৃথিবীমনু ॥ (ঐ ৪, ১৫, ৮)

দিকে দিকে বিদ্যুৎ জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠুক, দিকে দিকে পবন ধাবিত হইয়া হইয়া চলুক পবনবেগে প্রেরিত মেঘ-সকল সংহত হইয়া পৃথিবীর দিকে সংগত হউক।

অপামগ্নিস্তনূভিঃ সংবিদানো য ওষধীনামধিপা বভূব।
স নো বর্ষং বনুতাং জাতবেদাঃ প্রাণং প্রজাভ্যো অমৃতং দিবস্পরি ॥
অথর্ব ৪র্থ কাণ্ড, ১৫শ সূক্ত।

যেই বৈদ্যুত অগ্নি মেঘের সহিত এক হইয়া বিদ্যমান, যেই অগ্নি ওষধীসমূহের অধিপতি হইয়া আছেন; সেই জাতবেদা অগ্নি আমাদিগকে বর্ষণ দান করুন, প্রজাদিগকে প্রাণদান করুন, দ্যুলোক হইতে দোহন করিয়া অমৃত দান করুন।

অপো নিষিঞ্চন্নসুরঃ পিতা নঃ শ্বসন্তু গর্গরা অপাং বরুণাব নীচীরপঃ সৃজঃ।
বদন্তু পৃশ্নিবাহবো মণ্ডূকা ইরিণা অনু ॥
অথর্ব ৪র্থ কাণ্ড, ১৫ সূক্ত।

আমাদিগের প্রাণবর্ষী পিতা তির্য্যগ্‌ভাবে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতে থাকুন। গর্গর ধ্বনি করিয়া জলরাশির প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া চলুক। হে বরুণ, নিম্নগামী জলধারা তুমি ছুটাইয়া দাও। চিত্রবিচিত্র-বাহু যুক্ত মণ্ডূকগণ বালুকাময় ধারা-পথে উপবিষ্ট হইয়া কোলাহল করিতে থাকুক।

সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণাঃ ব্রতচারিণঃ।
বাচং পর্জন্য জিন্বিতাং প্র মণ্ডূকা অবাদিষুঃ ॥ *
অথর্ব ৪র্থ কাণ্ড, ১৫শ সূক্ত।

সংবৎসর পর্য্যন্ত মণ্ডূকগণ (পবন ও আলোক হইতে বিযুক্ত) শুদ্ধ ব্রতচারী ব্রাহ্মণের ন্যায় পড়িয়া ছিল! এখন পর্জন্যের দ্বারা প্রাপ্ত-প্রাণ হইয়া ইহারা পর্জন্যের নন্দনধ্বনি করিতেছে।

উপ প্রবদ মণ্ডূকি বর্ষমাবদ তাদুরি।
মধ্যে হ্রদস্য প্লবস্ব বিগৃহ্য চতুরঃ পদঃ ॥
অথর্ব্ব ৪ কাণ্ড, ১৫ সূক্ত।

হে মহামণ্ডূকি, তুমি পর্জন্যের স্তবগান করিতে থাক, হে ক্ষুদ্র মণ্ডূকি, তুমিও বর্ষণের আনন্দে কোলাহল কর। চরণ চারখানি প্রসারিত করিয়া হ্রদের মাঝখানে ভাসিতে থাক।

মহান্তং কোশ মুদচাভিষিঞ্চ
সং বিদ্যুতং ভবতু বাতু বাতঃ।
তন্বতাং যজ্ঞং বহুধা বিসৃষ্টা
আনন্দিনী রোষধয়ো ভবংতু ॥
অথর্ব, ৪র্থ কাণ্ড, ১৫ সূক্ত।
(ঋষি আথর্বণ।)

হে পর্জন্য, তোমার উদার ভাণ্ডার সমুদ্র হইতে পূর্ণ করিয়া পৃথিবীকে অভিষিক্ত কর। মেঘের সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুৎ চলুক, বায়ু বহুক। বহুধা বিসৃষ্টা জলধারা যজ্ঞকে উদার করুক। নিখিল ওষধী আনন্দিনী হউক।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

* এই অনুবাকটি ঋগ্বেদ ৭ম মণ্ডল, ১০৩ সূক্তে ৫ম অনুবাকরূপে আছে। ইহাতে উপবাসী বর্ষবিরত ক্রিয়াকাণ্ডীর নিরদ্যমভাবের প্রতি বেশ একটু কটাক্ষ আছে। এই-সব কশাঘাত এখনকার ন্যায় তখনও ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে সকাম যজ্ঞশীলগণকে তীব্র আঘাত করিয়া কুকুরের যজ্ঞ নামে একটি চমৎকার চিত্র আঁকা হইয়াছে।

দুই তার

(১০)

দয়াদেবী একদিন বীরেনকে বলিলেন—বাবা, তোর কি কলেজ খুলে গেছে?......তুই কবে কলকাতা যাবি?

বীরেন দয়াদেবীর পায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল—তোমায় একলা ফেলে আমি কেমন করে যাব মা?

—আমার জন্যে তোর ভাবনা? আমার ত শেষ হয়ে এসেছে বাবা; এই মড়া আগলে থেকে তুই নিজের পরকাল নষ্ট করিসনে।

—যদি তোমায় দেখবার কেউ থাকত, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু কেউ ত একটি বারও তোমায় দেখতে আসেন না।

সেই কেউটি যে কে তাহা দয়াদেবী বুঝিলেন; বীরেন যে তাঁহার জন্যই শুধু এ বাড়ীতে আবদ্ধ হইয়া আছে তাহা গুণময়ের উপর বীরেনের বিরাগ হইতেও তিনি বুঝিলেন; তাই দয়াদেবী ব্যথিত স্বরে বলিলেন—তিনি যে পুরুষমানুষ বাবা; তাঁদের ঢের কাজ; মেয়েমানুষের রোগে শোকে আহা-করবার তাঁদের সময় নেই। মোহিনী আছে আমায় দেখবে, তুই একটা ভালো দিন দেখে কলকাতা চলে যা।

এমন সময় ঘরে একজন বিধবা ও তাঁহার পশ্চাতে একজন যৌবনোন্মুখী কিশোরী আসিয়া প্রবেশ করিল।

দয়াদেবী বিধবাকে দেখিয়াই অভিমানের রুষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিলেন—মাসিমা, তুমি এলে কেন? তোমাকে ত আমি আসতে লিখিনি।

আগন্তুক বিধবাটি অভিমানে ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন—তুমি আমার তেমনি মেয়েই বটে বাছা! নিজে রাজরাণী হয়েছ, গরিব দুঃখী মা-মাসীদের কি আর মনে পড়ে। মেয়েটা ডাগর হয়ে উঠছে বলেই তোমায় জানিয়েছিলাম; তা এমন হেনস্তা, যে, চিঠিখানার জবাব পর্য্যন্ত দিলে না। জামাই আমার লক্ষেশ্বর হয়ে শতেক বচ্ছর পেরমাই পান, তাঁর যাই দয়ার শরীর, তাই তিনি আমার চিঠি কুড়িয়ে পেয়ে সব জানতে পেরে আমাদের আনতে লোক পাঠিয়েছিলেন। নইলে কি আমি তোমার বাড়ীতে মেয়ে নিয়ে অমনি যেচে এসেছি বাছা!

দয়াদেবী স্বামীর অকস্মাৎ দয়ার পরিচয়ে সন্দেহাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—রাজুও এসেছে বুঝি?

—জামাইএর আমার দয়ার শরীর! তিনি রাজুর বিয়ে দিয়ে দেবেন বলে আনিয়েছেন। রাজু, তোর দিদিকে পেন্নাম কর্।

মায়ের পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া গিয়া রাজবালা শয্যাশায়িনী দয়াদেবীর পায়ের ধুলা লইল।

দয়াদেবী হাত বাড়াইলেন, রাজবালা কাছে সরিয়া গেল। দয়াদেবী তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। তারপর মাসীকে বলিলেন—মাসী, আমার ত ওঠবার শক্তি নেই, পায়ের ধুলো দাও।

মাসী অভিমানের স্বরে বলিয়া উঠিলেন—থাক, বাছা, অমনিই আশীর্ব্বাদ করছি......

যতক্ষণ মাসী-বোনঝিতে আলাপ হইতেছিল ততক্ষণ বীরেন দয়াদেবীর শিয়রের কাছে খাটের দাণ্ডা ধরিয়া অবাক মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার চক্ষে পলক পড়িতেছিল না, তাহার হৃদয়ে সৌন্দর্য্য-দর্শনের আনন্দ ধরিতেছিল না, সে একদৃষ্টে দেখিতেছিল রাজবালাকে। কুসুম-লক্ষ্মীর যৌবনলীলার মতন অনুপম লাবণ্যময়ী এই যে কিশোরীর সর্ব্বাঙ্গে বসন্ত-দর্শনে আনন্দিত বনশ্রীর স্মিতহাস্যের ন্যায় একটি সলজ্জ হাসি জড়াইয়া আছে তাহা বীরেন্দ্রের মর্ম্মস্থলে গিয়া জ্যোৎস্না-প্রলেপের মতন লাগিতেছিল; বীরেন্দ্রের দুঃখাভিহত জীবন-বীণার মর্চেধরা তার আজ যেন সকল জীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া জন্মসার্থক-করা আনন্দ-রাগিণীতে বাজিয়া উঠিয়াছিল; তাহার অন্তরের যৌবন-মুকুল এই নবোদিত আলোক-রেখাটির স্পর্শ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল; তাহার সমস্ত প্রাণ মন হৃদয় যৌবন বলিয়া উঠিল—তোমারই অপেক্ষায় আমি ছিলাম!

বীরেনকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া রাজবালার মুখও সলজ্জ স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল; সে সঙ্কুচিত হইয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল। তাহাতে রাজবালার মায়ের নজর বীরেনের উপর পড়িল। সেই সুগৌর সুকুমার ছেলেটিকে মুগ্ধনেত্রে রাজবালার দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি দয়াদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—দয়া, এই ছেলেটি?

দয়াদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ওটি আমারই ছেলে মাসিমা। বীরু, তোর দিদিমাকে পেন্নাম কর্।

বীরেনের চমক ভাঙিল; সে অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি রাজবালার পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিল। রাজবালা দ্বিগুণ লজ্জায় লাল হইয়া পিছু হটিয়া গেল।

দয়াদেবী বলিলেন—বীরু, তোর দিদিমাদের বসতে দে।

বীরেন তাড়াতাড়ি শ্বেতপাথরের মেঝের উপর একখানা কার্পেট বিছাইয়া দিল।

রাজবালার মা তাহাতে বসিয়া ভাবিলেন—এই ছেলেটির সঙ্গে রাজুর বিয়ে দেবার জন্যেই জামাই রাজুকে আনিয়েছেন দেখছি। তা দিব্যি ছেলেটি! রাজুর শিবপুজো সার্থক হল এতদিনে!

বীরেনকে দয়াদেবী বলিলেন—বীরু, এইবার তুই কলকাতা যা; মাসিমা এসেছেন আর ভাবনা কি?

বীরেন বড় জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দয়াদেবীর মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—দয়া, তোর মেয়ে···

এমন সময় সকলকে অবাক করিয়া দিয়া গুণময় সেইঘরে প্রবেশ করিলেন।

রাজবালার মা তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা টানিয়া চাপা গলায় বলিলেন—ওমা! জামাই!······রাজু, তোর জামাই-দাদাকে পেন্নাম কর।

রাজবালা দেখিল একজন অতি কালো অতি বেঁটে অতি মোটা লোক! তাহার হাত-পাগুলি খাটো-খাটো, মাথাটি ছোটো, ভুঁড়িটি বিপুল! খুব বড় খোঁচা-খোঁচা গোঁপ; মাথায় টাক পড়িবার পরোয়ানা জারি হইয়াছে! এই নাকি তাহার দয়া-দিদির বর! তাহাকে দেখিয়া রাজবালার অত্যন্ত হাসি পাইতে লাগিল। রাজবালা চকিতে একবার সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া লইল, আর-সকলেও হাসিতেছে কি না। কিন্তু সে দেখিল ভয়ে বীরেনের মুখ শাদা হইয়া গিয়াছে; দয়াদেবী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতেছেন। আর গুণময়ের মুখে হাসি দেখা দিলেও তাহা ভয়ানক দেখাইতেছে, যেন জল্লাদের খাঁড়ার ধার! রাজবালা ভয়ে-ভয়ে দূর হইতে প্রণাম করিল।

গুণময় গদগদভাবে বলিয়া উঠিলেন—থাক্ থাক্! দিব্যি মেয়েটি ত!

গুণময় অগ্রসর হইয়া গিয়া রাজবালার চিবুক ধরিয়া নত মুখ তুলিয়া মুগ্ধ নেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন।

রাজবালার মা চাপা গলায় ঘোমটার মধ্য হইতে বলিলেন—এখন আমার জাত ধর্ম্ম সব তোমার হাতে এনে দিলাম বাবা। নিজের মেয়ের কথা নিজের মুখে বলতে নেই; তবে তুমি আপনার লোক, দেখতেই ত পাচ্ছ বাবা, রাজু আমার দেখতে শুনতে মন্দ নয়, ঘরকন্নার সব কাজকর্ম্ম জানে, হোবপুরে খিষ্টানদের মেয়েস্কুলে লেখাপড়া সেলাই গানবাজনা সবই শিখেছে, ঠাণ্ডা নম্র, তা যা হতে হয়! কিন্তু হলে কি হবে বাবা, আজকাল ত মেয়ে অমনি বিকোয় না; তুমি দয়া করে যখন ভার নিয়েছ, তখন আমি নিশ্চিন্তি হয়েছি। ঐ ছেলেটিকে পাত্তর ঠিক করেছ বুঝি? আহা! দিব্যি ছেলেটি!

রাজবালা চকিতে একবার চোখ তুলিয়া বীরেনের দিকে চাহিল; বীরেন তখন ব্যাধভীত হরিণের মতন দারুণ ত্রাসে বড় বড় চঞ্চল চোখে গুণময়ের দিকে চাহিতে-চাহিতে ঘর হইতে পলায়ন করিতেছে।

গুণময় গর্জ্জন করিয়া ডাকিলেন—হ্যাঁরে বীরে!

বীরেন্দ্র জল্লাদের খাঁড়ার নীচে পরমুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান দণ্ডিতের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আজ্ঞে?

—এখনো কলকাতা যাসনি যে বড়?

বীরেন শুষ্ককণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলিল—আজ্ঞে কাল যাব।

বীরেন পলায়ন করিলে গুণময় বলিলেন—রাজুর জন্যে আমি খুব ভালো পাত্তর ঠিক করে রেখেছি মাসিমা। রাজুকে একেবারে রাজরাণী করে দেবো! সে-সব কথা পরে হবে; এখন হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে জপটপ করে একটু জল খেয়ে ঠাণ্ডা হোন। এস রাজু, তোমার থাকবার ঘরটর সব দেখিয়ে দিগে।

রাজবালা চকিতে একবার মায়ের ও দয়াদেবীর দিকে চাহিয়া মাথা নত করিয়া বসিল। গুণময় তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আবার ডাকিলেন—এস।

রাজবালার মা মেয়ের গায়ে ঠেলা দিয়া চাপা গলায় বলিলেন—যা না।

রাজবালা নিতান্ত অনিচ্ছায় গুণময়ের সঙ্গে উঠিয়া গেল।

গুণময় রাজবালার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া আপনার প্রকাণ্ড অট্টালিকার সুসজ্জিত এক ঘর হইতে আর-এক ঘরে লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একএকটা ঘর দেখান আর রাজবালাকে জিজ্ঞাসা করেন—কেমন রাজু, তোমার পছন্দ হয়?

রাজবালা স্মিত মুখ নত করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে তাহার নিষ্কৃতি নাই, গুণময় পীড়াপীড়ি করেন—বল, জবাব দাও।

রাজবালা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেও গুণময়ের মনঃপূত হয় না, বলেন—আমার সঙ্গে কথা কও ভাই।

সমস্ত ঘর দেখাইয়া গুণময় বলিলেন—রাজু, এ সমস্ত ঘর, সমস্ত জিনিস, তোমার। আমি তোমায় বিয়ে করব, তুমি আমার রাণী হবে।

রাজবালা মনে করিল ভগ্নীপতি তাহার সহিত রসিকতা করিতেছে। সে মৃদু হাসিয়া লজ্জিত মুখ নত করিল।

ইহা দেখিয়া গুণময়ের মনে আগুন ধরিয়া উঠিল, তিনি গণেশের শুঁড়ের মতন দুখানি খাটো খাটো স্থূল বাহু বিস্তার করিয়া রাজবালাকে ধরিতে গেলেন। রাজবালা "বাবারে!" বলিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়া সেখান হইতে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

ঘর-বারান্দা-দালান-সিঁড়ির গোলকধাঁধা পার হইয়া সে যে কোথায় গিয়াছিল এবং কোন্ পথে ফিরিলে সে আবার আপনার মায়ের বা দয়া-দিদির কাছে পৌঁছিতে পারিবে তাহা সে ঠিক করিতে না পারিয়া আনায়-বদ্ধ হরিণীর মতন ফ্যালফ্যাল করিয়া চারিদিকে চাহিতে-চাহিতে এক ঘর হইতে অপর ঘরে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। এক একটা ঘরে দেয়ালসই আয়নায় নিজের ভয়চকিত মূর্ত্তি দেখিয়া সে চমকিয়া উঠে; কান্নায় তাহার বুক ফাটিয়া পড়িতে চাহে, কিন্তু কান্নার তাহার অবসর নাই। এত বড় বাড়ী—ঘরের অরণ্য—একটা লোক কিন্তু কোথাও নাই যাহার আশ্রয় সে লইতে পারে, যাহাকে সে পথ জিজ্ঞাসা করিতে পারে।

ঘুরিতে ঘুরিতে সে দেখিল সম্মুখের দালান দিয়া বীরেন যাইতেছে। রাজবালা ছুটিয়া গিয়া ব্যাকুল হইয়া বীরেনকে বলিল—তুমি আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চল না।

বীরেন একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল—এস।

রাজবালা যাইতে যাইতেও চকিত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল কোনো আড়াল হইতে গুণময়ের গোঁপের খোঁচা বাহির হইয়া আসিতেছে কি না।

(১১)

রাজবালাকে সঙ্গে লইয়া বীরেন্দ্র দয়াদেবীর ঘরে আসিল; সেখানে রাজবালার মা ছিলেন না, মায়া ছিল। বীরেনের সঙ্গে রাজবালাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই মায়া বলিয়া উঠিল—বীরেন-দা, ও কে?

বীরেন রাজবালার পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিয়া একবার রাজবালার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল; রাজবালাও মুচকি হাসিয়া মাথা নত করিল। দয়াদেবী বলিলেন—ও তোর মাঁসী হয়।

মায়া অবাক হইয়া রাজবালার দিকে চাহিয়া রহিল; সে বুঝিতে পারিতেছিল না এই মাসী আবার কোথা হইতে কখন্ আসিল, এবং আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে সে বীরেন-দাদার সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিল কেমন করিয়া।

বীরেন দয়াদেবীকে বলিল—মা, দিদিমা কোথায়, এ খুঁজছে।

—মাসিমা ঠাকুর-ঘরে জপ করতে গেছেন, নিয়ে যা।

রাজবালা লজ্জিত মুখ বীরেনের দিকে ঈষৎ তুলিয়া বলিল—আমি দিদির কাছেই থাকি।

দয়াদেবী বলিলেন—আয় বোস্। মায়া, মোহিনীকে বল্ তোর মাসীকে জলখেতে দেবে।

মায়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিয়া উঠিল—বীরেন-দা বলুক না, ওর সঙ্গে আগে থাকতে ভাব করা হয়েছে!

রাজবালা হাসিয়া অপাঙ্গে একবার বীরেনের দিকে, একবার মায়ার দিকে, একবার দয়াদেবীর দিকে চাহিল, তাহার টানা-টানা চোখ দুটি এক চমকে চারিদিকে শফরীর ন্যায় খেলিয়া গেল। তারপর সে ধীর মৃদু স্বরে বলিল—আমি এখন কিছু খাব না।

দয়াদেবী বলিলেন—তবে মায়ার সঙ্গে খাস। আয় এইখানে বোস্।

রাজবালা দয়াদেবীর পায়ের কাছে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

বীরেনও দয়াদেবীর পদসেবার উপলক্ষ করিয়া রাজবালার পাশে গিয়া বসিল; রাজবালা স্মিতমুখে অপাঙ্গে বীরেনের দিকে একবার চাহিয়া একটু তফাতে সরিয়া বসিল। পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বীরেনের আঙুল বার-বার রাজবালার হাতে ঠেকিতে লাগিল; একএকবার স্পর্শ লাগে আর রাজবালার মুখ লাল হইয়া উঠে, মাথা ঝুঁকিয়া পড়ে। রাজবালা বীরেনের হাতের গতির অভিমুখেই নিজের হাত চালাইতে চায়, কিন্তু বীরেন বারবার নিজের হাতের গতি বদলাইয়া রাজবালার হাতের বিপরীতগামী করিয়া লইতেছিল এবং মধ্যপথে রাজবালার হাতের কাছাকাছি আসিয়া বীরেনের একটা-দুটো আঙুল হঠাৎ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। এই তরুণ যুবকের এই খেলায় কিশোরীর মনে কম কৌতুক উদয় হইতেছিল না। তাহার সারা অন্তর হাসিতে খিলখিল-খিলখিল করিয়া বাজিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। ক্রমে সঙ্কোচ দূর করিয়া সাহস করিয়া রাজবালা থাকিয়া থাকিয়া বীরেনের অভিসারী আঙুলের উপর মৃদু টোকার তিরস্কার বর্ষণ করিতে লাগিল এবং এক-একবার উচ্ছ্বসিত হাসি চাপিতে-চাপিতেও মৃদু খিখি-খিখি শব্দ করিয়া উঠিতে লাগিল।

এই যে প্রীতির কৌতুকলীলা দয়াদেবীর পায়ের উপর দিয়া চলিতেছিল তাহা তাঁহার অবিদিত থাকিতেছিল না; তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বাবা বীরু, কালকেই তুই কলকাতা যাবি ত?

বীরেন্দ্র-হঠাৎ আহ্বানে চমকিয়া উঠিয়া বলিল—হুঁা মা, নইলে কি রক্ষে থাকবে?

বীরেন ব্যথিত দৃষ্টিতে রাজবালার মুখের দিকে চাহিল। রাজবালাও অর্দ্ধেক বুঝিয়া এবং অর্দ্ধেক না বুঝিয়া ভয় ও মমতায় দৃষ্টি ভরিয়া বীরেনের দিকে চাহিল; তারপর দুইজনের মিলিত দৃষ্টি পুষ্পাঞ্জলির মতন দয়াদেবীর চরণের উপর গিয়া পড়িল।

দয়াদেবী আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—একবার পাঁজিখানা দেখ ত।

বীরেন পাঁজি খুলিয়া ঢোক গিলিয়া মিথ্যা করিয়া বলিল—কাল তেরোস্পর্শ।

—তবে কাল কিছুতেই তোর যাওয়া হবে না। পরশু?

—অশ্লেষা!

—তবে ত পরশুও হবে না; তরশু মঘা, তরশুও হবে না। তারপর?

তারপর কি বলিলে তাহার যাত্রাটা সেদিনকার মতনও স্থগিত থাকে বীরেন্দ্র তাহাই খুঁজিতেছিল। দয়াদেবী বীরেনের উত্তর না পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—তার পরদিন কি?

বীরেন থতমত খাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল—শুক্কুরবার।

—শুক্কুরবার ত জানি। কোন্ তিথি দ্যাখ্ না।

—ত্রয়োদশী।

—সর্ব্বসিদ্ধি তেরোদশী। শুক্কুরবারই তুই যাস। এই কদিন তুই একটু লুকিয়ে থাকিস। উনি টের পাবেন না, আমার ঘরেই থাকিস; এঘরে ত তিনি কখনো আসেন না। দ্যাখ মায়া, তুই ওঁর কাছে যেন বলে ফেলিসনে যে তোর বীরেন-দা কলকাতা যায়নি।

মায়া গোঁজ হইয়া বসিয়া চোখ পাকাইয়া বীরেন ও রাজবালার কৌতুক-লীলা দেখিতেছিল, মায়ের কথায় হাঁ কি না কিছুই বলিল না।

পাঁজির উপর বীরেন্দ্রের অত্যন্ত রাগ হইল, এত তাড়াতাড়ি সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী না আসিলেই কি চলিত না! বীরেন নিজের উপরও খুব রাগ করিল—ত্র্যহস্পর্শ অশ্লেষা মঘা সে পাঁজিতে না দেখিয়াও বলিতে পারিল, এবং পাঁজি দেখিয়া বলিল কিনা ত্রয়োদশী এবং তাহা তাহার কপালগুণে হইয়া পড়িল সর্ব্বসিদ্ধি! বীরেনের অকারণে কেন অত্যন্ত কান্না আসিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাঁজি তুলিয়া রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মায়া এতক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রাগে ফুলিতেছিল। বীরেন ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবা মাত্রই সেও মায়ের খাট হইতে এক লাফে নামিয়া ছুটিয়া গিয়া বাঘিনীর মতন বীরেনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং দুই হাতে চড় কিল বর্ষণ করিতে করিতে কেবলি বলিতে লাগিল—কেন কেন তুমি কেন ওর সঙ্গে……

বীরেন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া মায়ার মার খাইতে লাগিল; তাহার মনের মধ্যেকার জমা অশ্রু এই একটা উপলক্ষ পাইয়া

মুক্তি পাইয়া বাঁচিল, তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এমন সময় মোহিনী-ঝি সেখানে আসিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল—ছি দাদাবাবু! ছেলেমানুষের মারে তুমি কাঁদছ!

মায়া চোখ তুলিয়া বীরেনের মুখের দিকে চাহিয়া যেই দেখিল বীরেনের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, অমনি সেও ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার কান্না দেখিয়া মোহিনী বিদ্রূপ করিল ও মায়া কাঁদিল বলিয়া বীরেন নিজের উপর, মোহিনীর উপর ও মায়ার উপর বিরক্ত হইয়া তাড়াতাড়ি নিজের চোখ মুছিয়া মোহিনীর দৃষ্টি হইতে পলায়ন করিয়া মায়াকে টানিতে-টানিতে লইয়া মায়ার খেলিবার ঘরে চলিয়া গেল। বীরেন মায়ার চোখ মুছাইয়া বলিল—চুপ করো লক্ষ্মীটি। এস গোলোকধাম খেলি।

মায়া রুষ্ট অভিমানের স্বরে বলিয়া উঠিল—তুমি যেমন দুষ্টু নরককুণ্ডে পড়ে পচে মর'ত বেশ হয়! হে হরি কিছুতেই যেন বীরেন-দার এক-চিত না হয়!......

বীরেন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—আমার একেবারে সাত চিতে গোলোকধাম গমন হবে।

মায়া জেদ করিয়া বলিল—কক্‌খনো না। আচ্ছা খেলো।

দুজনে ছক পাতিয়া খেলিতে বসিল।

খেলিতে আরম্ভ করিয়াই মায়া নরককুণ্ডে গেল এবং তাহাতে মায়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে ক্রমাগত কড়ির দান ফেলিতেছে কিন্তু একচিত আর হয় না; ওদিকে বীরেন টপ-টপ করিয়া উপরে উঠিয়া চলিয়াছে। এমন সময় বীরেন দেখিল রাজবালা সেই ঘরের সামনে দিয়া যাইতেছে। বীরেন তাড়াতাড়ি চুপিচুপি মায়াকে বলিল—মায়া, তোমার মাসীকে ডাকো, তিন জনে খেলি।

মায়া একবার ঘাড় ঘুরাইয়া রাজবালাকে দেখিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—না, ওর সঙ্গে খেলব না।

রাজবালা চলিয়া যায় দেখিয়া বীরেন তাড়াতাড়ি ডাকিল—তোমাকে মায়া গোলোকধাম খেলতে ডাকছে।

রাজবালা হাসিমুখে ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

বীরেন হাসিয়া বলিল—এস, গোড়া থেকে খেলি...

তাহার নিষেধ সত্ত্বেও বীরেন রাজবালাকে ডাকিল, রাজবালা আসিয়া তাহাকে নরককুণ্ডে পড়িয়া থাকিতে দেখিল বলিয়া; এবং তাহার সহিত খেলা অপেক্ষা রাজবালার সহিত খেলিতেই বীরেনের বেশী আগ্রহ, এতক্ষণ বীরেন মুখ বিষণ্ণ করিয়া খেলিতেছিল, এখন রাজবালাকে দেখিয়া তাহার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া, মায়া রাগে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল এবং "তোমরাই খেল, তোমরাই খেল" বলিতে বলিতে দানের কড়ি ছুড়িয়া ছুড়িয়া বীরেনকে সজোরে মারিল ও কাগজের ছকখানা কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া রাজবালার মুখের উপর ফেলিয়া দিয়া ঘর হইতে ছিটকাইয়া বাহির হইয়া গেল।

একটা কড়ি ছিটকাইয়া গিয়া বীরেনের চোখে লাগিয়াছিল। বীরেন কাপড় দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া রাজবালা তাড়াতাড়ি গিয়া বীরেনের হাত ধরিয়া বলিল—ছাড়ো ছাড়ো আমি দেখি, কাপড়ের ভাপ দিয়ে দি।

রাজবালা বীরেনের চোখ হইতে তাহার হাত সরাইয়া নিজের আঁচলের খুঁটের নুটি পাকাইয়া সুন্দর দুখানি গাল ফুলাইয়া ফুলাইয়া তাহার উপর ফুঁ দিয়া দিয়া চোখে ভাপ দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বীরেন চোখ খুলিতে পারিলে রাজবালা ব্যথিত স্বরে বলিয়া উঠিল—ওমা! চোখের শাদার ওপরে রক্ত জমে গেছে যে! ভাগ্যিস চোখের তারাতে লাগেনি! এখনো ব্যথা করছে কি?

বীরেন এমন মার মুহূর্তে মুহূর্তে খাইতে প্রস্তুত ছিল এমন ব্যথার ব্যথী দরদের মরমী যদি তাহার শুশ্রূষা করে। বীরেন হাসিয়া বলিল—অমন মুখের ফুঁ আরো পাবার জন্যে ব্যথা ত যেতে চাচ্ছে না!

রাজবালার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিল। বীরেন ব্যস্ত হইয়া রাজবালার হাত ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল—তুমি চলে যেয়ো না। আমি তোমায় একটু দেখবো বলে দেবতার মতন যে মা তাঁর কাছেও মিথ্যে কথা কয়েছি—ত্র্যহস্পর্শ মঘা অশ্লেষা পাঁজিতে নেই, আমার মনে আছে বলে এ তিনদিন আমার যাত্রা নিষেধ! মায়ার বাবা দেখতে পেলে আমায় আস্ত রাখবেন না। তবু ত আমি থেকে

পারছি না। তুমি আর দুদিন পরে আমি চলে গেলে এলে না কেন?

রাজবালার মনের মধ্যে বিচিত্র সুরে জলতরঙ্গ বাজিয়া উঠিল। এই সুশ্রী সুকুমার তরুণ যুবক তাহাকে একটু দেখিতে পাইবার জন্য কী কঠিন কাজ যে করিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল। রাজবালা অল্পক্ষণেই বুঝিতে পারিয়াছে যে দয়াদেবী কিরূপ মমতাময়ী সরলহৃদয়া। তাঁহাকে প্রতারণা করা বড় অন্যায় বলিয়াই বড় কঠিন। আবার গুণময় যে কিরূপ ভয়ানক তাহা রাজবালা নিজে ঠেকিয়া বুঝিয়াছে, গুণময়কে দেখিয়াই বীরেন্দ্র ভয়ে কিরূপ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল তাহাও সে দেখিয়াছে এবং বীরেন কালই কলিকাতায় চলিয়া না গেলে যে তাহার রক্ষা থাকিবে না তাহাও রাজবালা দয়াদেবীর কাছে বীরেনকে বলিতে শুনিয়াছে। রাজবালা আবার ইহাও শুনিয়াছে যে তাহার মা গুণময়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বীরেন্দ্রই কি রাজবালার নির্দ্দিষ্ট বর? এইসব ব্যাপার মিলিয়া মিশিয়া রাজবালার মনের মমতা ও প্রীতিকে বীরেন্দ্রেরই অভিমুখী করিয়া তুলিল; প্রীতির ফুলের পর প্রীতির ফুল দিয়া সে তাহার প্রণয়ের পুষ্পমাল্য গাঁথিয়া তুলিতে লাগিল, বীরেন্দ্রের গলায় বরমাল্য দান করিবে বলিয়া।

যখন মনোভব পুষ্পধনু লইয়া দুটি হৃদয়ে চাঁদমারি করিতে ব্যস্ত ছিলেন তখন হঠাৎ তাঁহার সকল খেলা ভুলাইয়া ভয় লাগাইয়া গুণময়ের চটিজুতা পটাস-পটাস করিয়া ডাকিয়া উঠিল। বীরেন ঐ শব্দটি বিলক্ষণ চিনিত। বীরেন্দ্র চকিত হইয়া "মায়ার বাবা!" বলিয়াই পিছনের দরজা দিয়া পলায়নের উপক্রম করিল। বীরেন্দ্র তাহাকে অসহায় ফেলিয়া পলায়ন করিতেছে দেখিয়া রাজবালাও তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ছুটিতে-ছুটিতে ভয়ে শুষ্ককণ্ঠে বলিল—আমাকে দয়া-দিদির ঘরে দিয়ে এস।

বীরেন বলিল—ঐ দিকেই ত ও যাচ্ছে। তোমার মা ঠাকুরঘরে আছেন, ঠাকুরঘরে চল।

ব্যাধ-তাড়িত হরিণ-হরিণীর মতন তাহারা এঘর সেঘর পার হইয়া ঠাকুরঘরে গিয়া পড়িল।

(১২)

গুণময় রাজবালাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি পীড়িতা স্ত্রীকে দেখিতে এতদিন একবারও তাঁহার ঘরের চৌকাঠ ডিঙান নাই; আজ রাজবালার সন্ধানে আবার তিনি দয়াদেবীর ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। ঢুকিয়াই দেখিলেন সে-ঘরে রাজবালা নাই; দয়াদেবী শুইয়া আছেন, পাশে মায়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে। গুণময় জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজু কোথায়?

দয়াদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার বুকে কান্নার তুফান ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছিল। মায়া চোখ পাকাইয়া বাবার দিকে তাকাইয়া রহিল, কিছু বলিল না। মায়া ভাবিতেছিল—এ এক কোথা হইতে আপদ আসিয়া উপস্থিত হইল,—বীরেনদাদা তাহাকেই চায়, তাহার বাবাও তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে!

কেহ কিছু কথা বলিল না দেখিয়াও গুণময়ের রাগ হইল না, কারণ কাহারও উত্তর শুনিবার অপেক্ষায় তিনি সে ঘরে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না, যেমন ঢোকা অমনি বাহির হইয়া চলিয়া যাওয়া। গুণময় সকল ঘরে উঁকি মারিতে-মারিতে ঠাকুরঘরেই গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরঘরের শুধু সামনেই দরজা ছিল, সুতরাং বীরেন্দ্র পলায়নের কোনো উপায় না দেখিয়া গুণময়ের ঘরে ঢুকিবার আগেই ফস্ করিয়া পাশ-কুঠুরীতে গিয়া তাহার দরজা ভেজাইয়া দিল; এই পাশ-কুঠুরীতে ঠাকুরের বাসন-কোষন থাকে, এখান হইতে বাহির হইবার পথ ঠাকুর-ঘরের ভিতর দিয়া ছাড়া অন্য দিকে নাই। বীরেনকে হঠাৎ পলায়ন করিতে দেখিয়া ভীত রাজবালা তাড়াতাড়ি গিয়া মায়ের কাছ-ঘেঁসিয়া বসিল।

গুণময় ঘরে ঢুকিয়াই দুপাটি বাঁধানো দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিলেন—এই যে রাজু, তুমি এখানে, আর আমি তোমাকে সারা বাড়ী গোরু-খোঁজা করে বেড়াচ্ছি!

শ্যালিকার প্রতি এই চাষাড়ে রসিকতা প্রয়োগ করিয়া গুণময় ভুঁড়ি কাঁপাইয়া-কাঁপাইয়া খুব হাসিতে লাগিলেন, সে হাসি আর থামিতে চায় না। সেই হাসি দেখিয়া ভয়ে রাজবালার মুখ কিন্তু শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল। তাহা লক্ষ্য না করিয়া গুণময় হাসি সামলাইয়া

বলিলেন—মাসিমা, আমার বাড়ীতে ত লোকজন কেউ নেই, ও ত পড়ে'। এ বাড়ী আপনারই, আপনি সব ঘর-সংসার দেখে শুনে নেন; খাবার-দাবার যা যখন দরকার হবে নিজে হাতে নিতে কিন্তু-বোধ করবেন না।

রাজবালার মা আধ-ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদু স্বরে বলিলেন—তা বাবা বলতে হবে কেন—এ ত আর আমার পাতানো সম্পর্ক নয়?

—আপনাকে আর বাড়ী ফিরে যেতে দেবো না মাসিমা, এই বাড়ীর গিন্নি হয়ে থাকতে হবে।

—আমার আর বাড়ী যাবার দরকার কি বাবা? একটি সুপাত্তরের সঙ্গে রাজুর দু-হাত এক হয়ে গেলে ও ত পরের ঘর করতে চলে যাবে, আমি বাড়ীতে আর কার জন্যে যাব?

—রাজুকেও আমি পরের ঘরে যেতে দেবো না মাসিমা; রাজুও এই বাড়ীতেই থাকবে তার ব্যবস্থা আমি ঠিক করেছি।

—সেই সুন্দর ছেলেটির সঙ্গে বুঝি......

পাশের কুঠরীতে বীরেন উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। গুণময় রাজবালার মায়ের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—না, না, সেটা একটা লক্ষীছাড়া ছেলে, সে কি রাজুর যুগ্যি? রাজুকে আমিই বিয়ে করব ঠিক করেছি।

রাজবালার মা মনে করিলেন জামাই বুঝি শালীর সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—রাজরাণী হবার ভাগ্যি কি রাজুর হবে! তোমার মতন সোয়ামীর গলায় মালা দেওয়া সাত জন্ম শিব-পূজো করলে তবে ঘটে!

গুণময় খুসী হইয়া বলিলেন—আপনার বোনঝির যে-রকম অবস্থা তাতে সে ত আর বেশীদিন বাঁচবে না। আমার একটি বিয়ে না করলে ত চলবে না।

—তা করবে বৈকি বাবা, তোমার আর বয়েস কি হয়েছে? তোমরা ত সেদিনকার দুধের ছেলে, ও বয়সে ত লোকের প্রথম বিয়ে হয়—তোমার ওপর মা-লক্ষীর কৃপা আছে, তুমি একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে করতে পার।

গুণময় চরম খুসী হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন—তাইতেই ত মাসিমা আপনাদের আনিয়েছি। এইসব বাড়ীঘর জিনিসপত্তর সব রাজুর—মায়া ত দুদিন পরে পরের বাড়ী চলে যাবে।

এই অভাবিত সম্ভাবনায় রাজবালার মায়ের মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি গদগদ ভাবে বলিলেন—জপের আসনে বসে প্রাতঃবাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি বাবা, তুমি আমায় যেমন নির্ভাবনা করে সুখী করলে এমনি নির্ভাবনা হয়ে তুমিও সুখী হবে; আমার মাথার যত চুল তত বছর তোমার পেরমাই হবে। রাজু আমার বড় লক্ষী মেয়ে, তুমি দুদিনেই তা বুঝতে পারবে।

তারপর তিনি আমতা-আমতা করিতে-করিতে বলিলেন—বিয়েটা তা হলে দয়ার একটা ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলেই ত হবে?

—সেজন্যে অপেক্ষা করে কি হবে মাসিমা? ও যখন মরবেই তখন বিয়েটা মুলতবি রাখা কেন? এই অগ্রাণ মাসেই বিয়েটা হয়ে যাক।

—তা যা ভালো বোঝো তাই কোরো বাবা, দয়া যেন মনে কষ্ট না পায়।—বলিতে বলিতে দয়াদেবীর মাসিমা অঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জন করিলেন।

—ওকে এখন বিয়ের কথা কিছু বলে কাজ নেই। এর মধ্যে মরে যায় ভালোই, নয়ত বিয়ের দিন বললেই হবে। কথাটা এখন গোপন রাখবেন।

—বেশ, তাই হবে বাবা।

রাজবালার মা এ বাড়ীতে আজ এই নূতন আসিয়াছেন; বীরেনকে পাশের ঘরে যাইতে তিনি দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি জানিতেন না যে সে সেখানেই বন্দী হইয়া থাকিয়া সকল কথা শুনিতেছে, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে বীরেন ঐ ঘরের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে। গুণময়ও আশঙ্কা করেন নাই যে কেহ পাশ-কুঠরীতে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহাদের ষড়যন্ত্র শুনিতেছে। কেবল রাজবালা দেখিতেছিল দরজার ঈষৎ ফাঁকে একএকবার একটা চোখ চকচক করিয়া উঠিতেছিল। গুণময়ের পীড়িতা স্ত্রীর প্রতি এই মমতাহীন নিষ্ঠুরতা রাজবালার ভয়কে দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল; সে ত মায়ের মুখেই গল্প শুনিয়াছিল যে গুণময় যখন দয়াদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়া ঘরে পড়িয়া ছিলেন! আবার এই স্ত্রী যখন মৃত্যুর দ্বারে উপনীত তখন তিনি তৃতীয় বিবাহের জন্য

ব্যস্ত! রাজবালার অন্তর ভয় ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল,—এই ভয়ানক লোককে সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না।

গুণময় কণ্ঠস্বরে আদর ঢালিয়া বলিলেন—রাজু, এস; বাগানে কত পাখী, খরগোশ, হরিণ, ফুল আছে দেখবে চল।

রাজবালা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া মায়ের আঁচল চাপিয়া ধরিল।

মা এক ঝটকায় আঁচল ছাড়াইয়া লইয়া চাপা তিরস্কার করিয়া বলিলেন যা না! তুই কি এখনো কচি খুকী আছিস রাজু! আজ বাদে কাল যে সোয়ামী হবে সে আদর করে ডাকছে, যা…

তিনি মেয়েকে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিলেন। রাজবালা মায়ের আঁচল দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার মা তাহার উপর বিরক্ত ও গুণময়ের নিকট অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—আজকে ওর লজ্জা করছে বাবা; কাল ওকে নিয়ে যেয়ো…

গুণময় হতাশ হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দয়াদেবীর ঘরের সামনে দিয়া তাঁহার চটিজুতা আবার চটাস-পটাস করিয়া ডাকিয়া চলিয়া গেল।

গুণময় চলিয়া যাইতেই রাজবালা মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মা, আমি ওকে বিয়ে করতে পারব না, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ো না!

তাহার মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—চুপ চুপ, অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনিসনে, হাতের লক্ষ্মী হেলায় পায়ে ঠেলিসনে। ভাগ্যি বলে মান যে তুই জামাইএর নজরে ধরেছিস!

বীরেন্দ্র তখনও বন্দী-শালা হইতে বাহির হইতে পারিতেছিল না। রাজবালার মা না নড়িলে সে পলাইবে কেমন করিয়া।

খানিকক্ষণ পরে তাহাকে মুক্তি দিয়া মোহিনী আসিয়া ডাকিল—দিদিমা, মাসিমাকে নিয়ে এস, জলখাবার দেওয়া হয়েছে।

(১২)

ঠাকুরঘরের পাশ-কুঠুরী হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়াই বীরেন্দ্রের মনে হইল সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা দয়াদেবীকে গিয়া এখনি বলিয়া দিবে। কিন্তু তখনি তাহার মনে হইল স্বামীর এই নিষ্ঠুরতার সংবাদ হয়ত তাঁহার মনে সাংঘাতিক বাজিবে; রাজবালার উপর তাঁহার মন বিরূপ হইয়া যাইবে। তাহার আশ্রয়দাত্রী মাতা দয়াদেবীকে কষ্ট দিবার ও অপমান করিবার ষড়যন্ত্র হইতেছে বলিয়া এবং প্রবল পরাক্রান্ত গুণময় এখানেও তাহার রাহুরূপে সকল সুখের আশাটুকুও গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া বীরেনের বুক যেন ভাঙিয়া যাইবার মতন হইল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে গুণময়কে তখন খুন করিতেও পারে। বীরেন মায়ার খেলিবার ঘরে গিয়া মেজেয় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

মায়া এতক্ষণ রাগ করিয়া মায়ের কাছে গিয়া বসিয়াছিল। রাজবালা ও তাহার মা সেই ঘরে গিয়া জল-খাইতে বসিল দেখিয়া মায়া বীরেনের সন্ধানে বাহির হইয়া আসিল।

মায়া আসিয়া দেখিল বীরেন তখনও কাঁদিতেছে। মায়া মনে করিল সে যে মারিয়া গিয়াছিল এ কান্না তাহারই জন্য। মায়া ঠোঁট ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল—নিজে দোষ করে আবার কান্না হচ্ছে!

মায়া তাহাতেও বীরেনের কোনো সাড়া না পাইয়া একটু নরম হইয়া নিজের ত্রুটি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া বলিল—মাসীকে খেলতে ডাকলে বলেই ত আমার রাগ হল।

তথাপি বীরেন তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল না বা কথা কহিল না দেখিয়া মায়ার অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। সে আরো নরম হইয়া বলিল—আমি আর কখনো মারব না।

বীরেন কান্না থামাইয়া মায়াকে সান্ত্বনা করিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু সে কিছুতেই কান্না রোধ করিতে পারিতেছিল না।

তখন মায়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—আমার ঘাট হয়েছে, দুটি পায়ে পড়ি।

বীরেন মুখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া মায়ার যেই হাত ধরিল অমনি মায়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বীরেনকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার গায়ে মুখ লুকাইল। বীরেন কান্নাভরা স্বরে বলিল—আমি তোমার মার খেয়ে কাঁদিনি মায়া। তুমি চুপ কর

বীরেনের এই কথা শুনিয়া মায়ার অত্যন্ত রাগ ও লজ্জা হইল এই ভাবিয়া যে, বীরেনের এ কান্না তাহার মার খাইয়া নহে! এবং সে তবে শুধু-শুধুই বীরেনের কাছে খাটো হইল! কিন্তু সে বুঝিতে পারিতেছিল না বীরেনের কান্নার অপর কি কারণ থাকিতে পারে? ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মায়া খুসী হইয়া বলিয়া উঠিল—মাসী ঝগড়া করে গেছে বুঝি! বেশ হয়েছে, তুমি যেমন তাকে খেলতে ডেকেছিলে! (ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্মৃতির সৌরভ

পাঁচের পরিচ্ছেদ।

আতঙ্কে মানুষের হৃৎপিণ্ডটা যেমন দপ্‌দপ্‌ করিয়া ঘা দিতে থাকে, ঘড়ির কাঁটা তেমনি টিক্‌টিক্‌ করিয়া বাজিয়া চলে, দয়ামায়া তাহার গতির কোনো পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। প্রকৃতির প্রকাণ্ড যন্ত্রটাও ঠিক এমনি করিয়াই চলে। 'ডেজি' ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়ে, তাহার পরে মাঠ ভরিয়া লাল্‌চে ঘাস মাথা দুলাইতে থাকে। ঘাসের ঢেউও আর বেশীদিন খেলিতে পায় না, তখন ঘন সবুজ ঝোপের আবির্ভাবে সমস্ত মাঠ মরকত-মণির মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে; সোনালি শস্যের ভারে ক্ষেতের চারার মাথা নীচু হইয়া যায়, কৃষকেরা তাহার মধ্যে হেঁট হইয়া শস্য কাটিতে থাকে; তখন নূতন বীজ বপনের আশায় মাটি চষার ধুম পড়ে; শস্যহীন পুরানো খড়ের গোড়াগুলি লাল মাটি মাখিয়া পড়িয়া থাকে। এই যে নানা রূপের খেলা একটির পর আর-একটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে, সুখী মানুষের কাছে তাহা মিষ্টসুরের প্রবাহের মতন আনন্দ বিলাইয়া যায়; কিন্তু কত মানুষের মনে এই রূপের খেলাই ভবিষ্যৎ বেদনার আগমনী গাহিয়া যায়; সে যেন কোন্‌ অদৃশ্য যাদুকরের রূপ ধরিয়া মুহূর্ত্তগুলিকে একে একে হরণ করিয়া ভয়ের ও আতঙ্কের ছায়াকে জীবন্ত-নিরাশার স্পষ্টমূর্ত্তিতে পরিণত করিতে থাকে।

১৭৮৮ অব্দের গ্রীষ্মটা টিনার সামনে দিয়া নিষ্ঠুরের মতন কি দ্রুত গতিতেই চলিয়া গেল। এবার নিশ্চয় গোলাপ তাহার বিদায়ের দিনের আগেই ঝরিয়া পড়িয়াছিল, পাহাড়ে অ্যাশ-গাছের ফলগুলো যেন রাঙা হইয়া উঠিবার জন্য বড় বেশী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, শরৎ-কালটাকে টানিয়া আনিতে পারিলেই যেন বাঁচে; তখনি ত এ দুঃখিনীর দুঃখের ভরা পূর্ণ হইবে; অ্যান্টনি তাহার চোখের সামনে মধুর হাসি, মিষ্ট কথা, মুগ্ধদৃষ্টি, সকলি আর-একজনকে সঁপিয়া দিবে।

জুলাই মাস শেষ হইবার আগেই কাপ্তেন উইব্রো খবর পাঠাইয়াছিলেন যে লেডি আশার ও তাঁহার কন্যা আর বেশী দিন বাথের গরম আর আমোদপ্রমোদের মধ্যে থাকিতে পারিতেছেন না, শীঘ্রই 'ফালে'তে তাঁহাদের নিভৃত নির্জ্জন ছায়ায়-ঢাকা পল্লীতে ফিরিয়া যাইবেন, তাহাকেও সঙ্গে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার চিঠি-পত্রের ভাবে মনে হয় যে দুইটি মহিলার সঙ্গেই তাঁহার বেশ সদ্ভাব, এবং কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর আশঙ্কাও নাই। তাই চিঠিগুলি পড়িয়া স্যর ক্রিষ্টফারের মনটা খুব বেশী-রকমই খুসী। আগষ্টের শেষে খবর আসিল, কাপ্তেন উইব্রো সফল হইয়াছেন। দুই পরিবারে দিন-কতক খুব চিঠিপত্র চলিল। তাহার পর বোঝা গেল যে আগামী সেপ্‌টেম্বর মাসে ভাবী কুটুম্বিনী ও তাঁহার কন্যা শেভারেল-প্রাসাদে বেড়াইতে আসিতেছেন; এই সুযোগে ভাবী বধূ তাঁহার ভাবী আত্মীয়দের সঙ্গে পরিচিত হইবেন এবং বিবাহ সম্বন্ধীয় সব-রকম কথাবার্ত্তাও পাকা হইবে। কাপ্তেন উইব্রো এখন সেখানেই থাকিবেন, পরে মহিলাদের সঙ্গেই আসিবেন।

নূতন কুটুম্বদের অভ্যর্থনার আয়োজনে সকলেই মহা ব্যস্ত। জমিদার মহাশয় সারাদিন নায়েব মোক্তারদের সঙ্গে পরামর্শই করিতেছেন। মাঝে মাঝে ফ্রানসেস্কোকে তাড়াতাড়ি ঘরখানা শেষ করিয়া ফেলিতে তাড়া দিতে-ছেন। মিস্ আশার এক মস্ত ঘোড়সোয়ার। কাজেই মিঃ গিলফিলের উপর ভার পড়িয়াছে মেয়েদের চড়ার যোগ্য একটি ঘোড়া খুঁজিয়া আনিবার। লেডি শেভারেল এখন যত রাজ্যের বাড়ীতে দেখা করিয়া আর নিমন্ত্রণ করিয়া-করিয়া ফিরিতেছেন। মিঃ বেট্‌সের ঘাসের ময়দান, ফুলের কেয়ারি, পাথর-বাঁধানো রাস্তা, সব আগে থাকিতেই

ঝরঝরে পরিষ্কার, তাহার আর বিশেষ কিছু করিবার নাই। সহকারী মালীটাকে মাঝে-মাঝে একটু ধমক্-ধামক্ করিতেই হয়, তা' সে বিষয়েও মিঃ বেট্‌সের কোনো খুঁৎ ধরিবার পথ নাই।

সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে টিনারও কাজের অভাব ঘটে নাই। নিরানন্দ দিনগুলো কাটাইতে ত হইবে! ড্রয়িংরুমের চেয়ারগুলির জন্য লেডি শেভারেল একবৎসর খাটিয়া একসেট কারুকার্য্য-করা গদি করিতেছিলেন; এই-গুলিই তাঁহার বাড়ীর একমাত্র দেখিবার মতন আসবাব। একটা গদি বাকি আছে, টিনাকে সেই কাজটুকু সারিয়া লইতে হইবে। এই সেলাই হাতে করিয়াই তাহার দিন কাটে। বেচারীর ঠোঁট দুখানি থাকিয়া থাকিয়া কন্‌কনে ঠাণ্ডা হইয়া উঠে, বুকের ভিতর সমস্তক্ষণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে; চোখে জলটা আসিতে-আসিতে থামিয়া যায়; ভিতরের বেদনার চেয়ে চোখের জলকেই তাহার ভয় বেশী; তাই সে কৃতজ্ঞহৃদয়ে বেদনাই বরণ করিয়া লইয়াছিল। রাত্রির অন্ধকারে চোখের জল তাহার দুঃখ বেদনা মুছাইতে আসিত। স্যর ক্রিষ্টফারকে কাছে আসিতে দেখিলেই তাহার সকলের চেয়ে ভয়। তাঁহার দৃষ্টি এখন যেন আরো কত উজ্জ্বল, হাঁটিতে চলিতে পায়ের জোর বাড়িয়া গিয়াছে; নেহাৎ জড়পিণ্ড মনমরা কি স্বার্থপর মানুষ ছাড়া আর কেহ যে এমন সুখের পৃথিবীতে স্ফূর্ত্তিহীনভাবে আনন্দ-উল্লাসকে দূরে সরাইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে ইহা তাঁহার ধারণারই অতীত। বুড়ো ভদ্রলোক জীবনটা নিজের ইচ্ছার জয়ের উল্লাসেই কাটাইয়াছেন; শেষ ইচ্ছাটিও ত পূর্ণ হইতে চলিল। আনন্দ হইবেই বা না কেন? দু দিন পরে সাধের নাতি আসিয়া এত সাধের বাড়ীখানি উজ্জ্বল করিবে। পরের হাতে আর তুলিয়া দিতে হইবে না। কপালে থাকিলে তাহার সুন্দর কিশোর-মূর্ত্তিও হয়ত দেখিয়া যাইতে পারেন। নাইবা দেখিবেন কেন? ষাট বৎসর কি আর একটা বয়স!

টিনাকে দেখিলেই স্যর ক্রিষ্টফার একটা কিছু হাসি ঠাট্টা না করিয়া পারেন না। হয়ত বলিতেন,

"কিরে বাঁদরী, গলা ভাল আছে ত? তুই হলি গিয়ে আমাদের বাড়ীর চারণী। দেখ্, একটা সুন্দর পোষাক আর নূতন রেশমী ফিতে জোগাড় করে রাখিস। গাইয়ে-পাখী বলে যেন পাট্‌কিলে রঙের পোষাকটাই পরে বসিস্ না।"

নয়ত বলিতেন,

"কি রে, এইবার ত তোর পালা। দেখিস্ বেশী মাথা উঁচিয়ে চলে যাস্‌নে। বেচারাকে একটু নাগাল দিস্। মেনার্ড বেচারাকে একটু সহজেই ছাড়া দেওয়া উচিত।"

টিনা তাঁহাকে বড় ভালবাসিত; তাই বৃদ্ধ জমিদার যখন আদর করিয়া তাহার গালে টোকা দিতেন কি একটু হাসিয়া তাহার দিকে চাহিতেন, তখন বেচারী অতিকষ্টেও মুখে একটু হাসি ফুটাইতে পারিত। কিন্তু এমনি সময়ে কান্না যেন ফাটিয়া পড়িতে চাহিত। সে যে কি কষ্টে উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা চাপিয়া রাখিত তাহা বলা যায় না। লেডি শেভারেল আসিলে কিংবা কথা বলিলে অত বিপদ হইত না। পরিবারের এই ঘটনায় তাঁহার সন্তোষ হইয়াছিল বটে। কিন্তু তিনি যে সব কাজেই চুপচাপ। তা'ছাড়া স্যর ক্রিষ্টফারের স্মৃতির মন্দিরে করুণ-নয়না সুন্দরী ষোড়শী মূর্ত্তিতে যিনি প্রতিষ্ঠিত, সেই লেডি আশারকে আবার দেখিবার আনন্দে যে তিনি পুলকিত, এটাতেও লেডি শেভারেলের মনে একটু ঈর্ষার উদয় হইয়াছিল। প্রথম যখন স্যর ক্রিষ্টফার ভ্রমণে বাহির হন, তখন এই সুন্দরীর সঙ্গে তিনি কেশ-বিনিময় করেন। লেডি শেভারেল অবশ্য মরিলেও এ ঈর্ষার কথা স্বীকার করিবেন না, তবে তাঁহার মনে-মনে আশা ছিল বর্ত্তমান লেডি আশারের মধ্যে তাঁহার স্বামী সে মানসী সুন্দরীকে আর দেখিতে পাইবেন না; যাঁহাকে তিনি ভুবনমোহিনী ভাবিতেন, এখন তাঁহার রূপ দেখিয়া তিনি নিজেই লজ্জা পাইবেন।

আজকাল টিনাকে দেখিয়া মিঃ গিল্‌ফিলের মনে এক-সঙ্গেই দুই-প্রকম ভাবের উদয় হয়। তাহার দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদে বটে, কিন্তু আনন্দেরও একটা কারণ আছে; যে ভালবাসার ফল কোনো দিন ভাল হইবে না, তাহার বৃথা আশাটুকুও যে কাটিয়া গেল, ইহা ত টিনারও মঙ্গল। তাই তিনি মনে-মনে না ভাবিয়া পারিতেন না—"হয়ত আর কিছুদিন পরে টিনা ওই পাষাণ লোকটার কথা ভুলে যাবে; তখন হয়ত..."

এতদিন ধরিয়া সকলেই যে-দিনটির অপেক্ষা করিতে-ছিল, একদিন সেদিনটি দেখা দিল। শরতের সোনার আলোয় লেবু-গাছের মাথাগুলি তখন ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল, সেদিন তখন পাঁচটা বাজে-বাজে। এমন সময় লেডি আশারের গাড়ী আসিয়া গাড়ী-বারান্দার তলায় ঢুকিল। ক্যাটেরিনা ঘরে বসিয়া কাজ করিতে-করিতে গাড়ীর চাকার শব্দ, দরজা খোলা, বন্ধ করা ও কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিল। ছ'টার সময় খাবার ঘণ্টা পড়িবে; লেডি শেভারেল বলিয়া দিয়াছেন, সে যেন একটু আগে থাকিতে ড্রয়িংরুমে যায়। টিনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড়-চোপড় পরিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ নিজের এতটা শক্তি ও সাহস দেখিয়া সে নিজেই বেশ খুসী হইয়া উঠিল। অ্যান্টনি বাড়ী আসিয়াছে, মিস আশারকে দেখিতেও কৌতূহল হইতেছে, নূতন লোকজনের সামনে নিতান্ত শাদামাটা চেহারা দেখাইবারও বিশেষ ইচ্ছা নাই, এই-সকল নানা উত্তেজনায় টিনার ঠোঁটে একটু রক্তের উচ্ছ্বাস দেখা দিল, লাজ-সজ্জাও একটু সহজ হইয়া আসিল। আজ যখন সন্ধ্যাবেলা সকলে তাহাকে গান করিতে বলিবে, তখন সে গানে সকলকে মাতাইয়া তুলিবে। মিস্ আশার যে তাহাকে নেহাৎ একটা যে-সে ভাবিবে তাহা টিনা কি করিয়া সহ্য করে! তাই সে নিজের এই শ্রেষ্ঠতাটুকুর আনন্দেই সযত্নে তাহার নূতন ধূসর রঙের পোষাকটি ও চেরি রঙের ফিতাটি লইয়া সাজ-সজ্জায় মন দিল। সে-ই যেন বাগ্‌দত্তা বধূ! মুক্তার দুল দুইটি পরিতেও সে ভুলিল না। টিনার কান দুটি অমন সুন্দর বলিয়া স্যর ক্রিষ্টফার গৃহিণীকে বলিয়া তাহাকে গোল মুক্তার এই দুল-জোড়া দেওয়াইয়াছিলেন।

অত তাড়াতাড়ি গিয়াও টিনা দেখিল ড্রয়িংরুমে স্যর ক্রিষ্টফার, লেডি শেভারেল ও মিঃ গিল্‌ফিলের গল্প চলিতেছে। কর্ত্তা ও গৃহিণী পুরোহিতকে ভাবী বধূর রূপ বর্ণনা শুনাই-তেছেন।—মেয়েটি খাসা দেখিতে, কিন্তু মায়ের মতন একেবারেই নয়, বাপের মতন বোধহয় আদল আসে।

টিনা ঘরে ঢুকিতেই তাহার দিকে ফিরিয়া স্যর্ ক্রিষ্টফার বলিলেন, "বাঃ, বাঃ, কিহে মেনার্ড, তোমার কি মনে হয়? টিনার এত রূপ কোনোদিন দেখেছিলে? গিন্নীর পোষাকের ছাঁট থেকে একটুকরো কাপড় নিয়েই ত দেখ্‌ছি টিনার ক্ষুদে পোষাকটি হয়েছে। ক্ষুদে বাঁদরীকে সাজাতে একখানা রুমালের বেশী কাপড়ের কোনো দরকার দেখিনা।"

লেডি আশারের দিকে একবারটি চাহিয়াই গৃহিণী বুঝিয়াছেন যে সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে ইনি হার মানাইতে পারেন না। আনন্দে তাই তাঁহার প্রশান্ত মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। টিনার রূপের তারিফ শুনিয়া তিনিও হাসিয়া সায় দিলেন। টিনার ধরণটা তখন অত্যন্ত ধীর উদাসীনের মতন। মনের মধ্যে তুমুল সংগ্রামের পর এমনি একটা ভাটাপড়ার মতন ভাব আসে। টিনা সরিয়া গিয়া পিয়ানোর কাছে বসিয়া গানের বইগুলা সাজাইতে লাগিল। সকলের প্রশংসমান দৃষ্টিতে অবশ্য তাহার বেশ একটা আনন্দই হইতেছিল, সঙ্গে-সঙ্গে মনে হইতেছিল, এইবার দরজাটা খুলিলেই ক্যাপ্টেন উইব্রো ঢুকিবে, তাহার সঙ্গে খুব প্রফুল্ল মুখে কথা বলিতে হইবে। কিন্তু পায়ের শব্দে ও গায়ের গোলাপের গন্ধে তাহার সাড়া পাইবামাত্রই টিনার বুকের ভিতর কি যেন ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল। অ্যান্টনি আসিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া পুরানো সুরে "কি ক্যাটেরিনা, ভাল আছ ত? বাঃ বেশ তাজা দেখাচ্ছে ত তোমায়," বলিবার পর যেন টিনার জ্ঞান হইল।

তাহাকে অমন দিব্যি উদাসীন ভাবে কথা বলিতে দেখিয়া রাগে টিনার গাল দুটি লাল হইয়া উঠিল। সে যে এখন আর-একজনের ভালবাসায় ডুবিয়া রহিয়াছে। টিনার জন্য তাহার মনে ঘা লাগিতে যাইবে কি দুঃখে! পর মুহূর্ত্তেই আবার টিনার মন বদলাইয়া গেল; "আঃ, আমি কি বোকা! বেচারা লোকের সামনে ত আর কিছু বল্‌তে কইতে পারে না।" বিপরীত মনোভাবের এই-রকম দ্বন্দ্বে মুহূর্ত্তগুলিই টিনার কাছে যুগ হইয়া দাঁড়াইতেছিল। দরজাটা তখনি আবার খুলিতেই তাহার চমক্‌ ভাঙিল। ঘরের সকলে চাহিয়া দেখিলেন দুইটি মহিলা ঢুকিতেছেন।

মেয়েটির চেহারাই বেশী করিয়া চোখে পড়ে, গোলগাল বেঁটেখাটো মা-টির ঠিক উল্টা। এক কালে ইনিও সুন্দরী বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। রংটা ছিল জ্বোলো গোলাপী, তখন চটক্‌ ছিল বটে, কিন্তু সে রং বেশীদিন থাকে না। নাক চোখ নেহাৎ চলনসই ছিল, তবে যৌবনের লাবণ্যে

গোলগাল পুতুলটির মতন বেশ দেখাইত। মিস্ আশার বেশ লম্বা, শরীরের গঠনে বেশ কমনীয়তা আছে, কিন্তু নেহাৎ পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে নয়। চলার মধ্যে কেমন একটা সুন্দর শ্রী আছে; সেই-সঙ্গে বেশ একটা আত্ম-তৃপ্তির ভাবও যেন ফুটিয়া উঠিতে চায়। চুলগুলির গাঢ় পিঙ্গল রং, তাহার পাউডারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই, মুখের চারি পাশে কতকগুলি চুল থোকা থোকা হইয়া ঘিরিয়া রহিয়াছে; পিছন দিকে একপিঠ ঘন কোঁকড়া চুল কোমর পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। ঠোঁট দুটি পাৎলা, কপাল খুব সংকীর্ণ, চোখ চলনসই রকমের, কিন্তু চোখা খাঁড়া নাক আর সুগোল গোলাপী গালে সমস্ত মুখখানা বেশ জনকাল হইয়া উঠিয়াছে। পোষাকটি গাঢ় কালো, শোকের পরিচ্ছদ, গহনা যা দুই একটি আছে তাহাও কালো পাথরের। ধপ্‌ধপে ফরসা হাত দুখানি ও মুখখানি কালোর মাঝখানে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেয়েটিকে প্রথম দেখিলে চোখ যেন ধাঁধিয়া যায়। লেডি শেভারেল টিনার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলে সে যখন সদয় হাসি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিল, টিনা যেন মরমে মরিয়া গেল। বেচারীর এতদিনের স্বপ্ন এক নিমেষেই ধূলিতে মিশাইয়া গেল।

লেডি আশার কাহার যেন নকল করিতেছেন, এমনি-ভাবে খুব আড়ম্বরের ভান করিয়া বলিলেন, "স্যর ক্রিষ্টফার, আপনার ঘরবাড়ী দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি। ফার্লে-টা আপনার ভাগ্যের না-জানি কি বিশ্রীই লেগেছে। কর্ত্তার ত আর বাড়ীঘর-মাঠ-ময়দানের দিকে নজর ছিল না। আমি কিছু বল্লেই বলতেন 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, রেখে দাও, যদ্দিন বন্ধু-বান্ধবকে ভাল করে ভোজ দিতে আর ভাল এক বোতল মদ জোগাতে পারব, তদ্দিন বাড়ীর ছাদ ধোঁয়ায় কালো হলেও কেউ কথাটি বল্‌বে না।' উনি যা অতিথির সেবাটা করতেন, সে আর কি বলব!"

মা পাছে কোনো দুঃখের কথা তুলিয়া বসেন, তাই মিস্ আশার তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সাঁকোটা পার হয়ে আসবার সময় দেখলাম, বাগান থেকে বাড়ীটা ভারি চমৎকার দেখায়। অ্যাণ্টনি ত আগে থাকতে একটা কথাও বলে রাখেনি, কাজেই প্রথম দেখায় আরো সুন্দর লেগেছে। ভুল ধারণা করিয়ে দিয়ে প্রথম দর্শনের সুখটা মাটি করতে ও একেবারেই নারাজ। অ্যাণ্টনির কাছে শুনেছি, এই বাড়ীর পিছনে আপনি কত সময় আর কত চিন্তা কল্পনাই না খরচ করেছেন। বাড়ীটা আগাগোড়া না দেখে আর এর সব নক্সার ইতিহাস না শুনে ত আমার মন স্থির হচ্ছে না।"

জমিদার মহাশয় বলিলেন, "দেখো, বুড়ো মানুষকে পুরোনো কথায় মাতিয়ে দিয়ে বিপদে পোড়ো না যেন। পুরোনো ছবি আর নক্সার পাতা উল্টোনোর চাইতে ভাল কাজ বোধ হয় তোমায় একটা দিতে পারব। আমাদের বন্ধুবর গিল্‌ফিল তোমার জন্যে একটা সুন্দর ঘোড়া জোগাড় করেছেন; সেটায় চড়ে সারা দেশটা ঘুরে আসতে পার। তুমি যে কেমন জাঁদরেল ঘোড়সোয়ার সে কথা অ্যাণ্টনি আগেই আমাদের জানিয়েছে।"

মিস্ আশার হাসিতে মুখখানা আলো করিয়া মিঃ গিলফিলের দিকে তাকাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিল; ধরণটা এমনি, যেন দয়া আর ধরে না, যাহার দিকে চাহিবেন সেই যেন মুগ্ধ না হইয়া পারিবে না।

মিঃ গিল্‌ফিল্ বলিলেন, "ঘোড়াটা দেখেশুনে না নিয়েই আমায় ধন্যবাদ দেবেন না। গত দু'বচ্ছর লেডি সারা লিণ্টর এই ঘোড়াটায় চড়েছিলেন। তবে সকল কাজেই যখন সব মহিলার মিল হয় না, তখন এক্ষেত্রেও ত না হ'তে পারে।"

এদিকে যখন নানারকম কথাবার্ত্তা চলিতেছে অ্যাণ্টনি তখন চিম্‌নীতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া। মিস্ আশার কথা বলিতে বলিতে তাহার দিকে তাকাইতেছিল, সেও একবার করিয়া তাহার অলস চোখদুটি তুলিয়া চাহনিতে সায় দিতেছিল। টিনা ভাবিতেছিল, "মেয়েটি ওকে কি ভালই বাসে!" অ্যাণ্টনি যে কেবল সায় দিয়াই ক্ষান্ত, নিজের তরফ থেকে বিশেষ কিছু দেখাইতেছে না, ইহাতেই কিন্তু টিনার মনে একটু শান্তিও আসিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, অ্যাণ্টনিকে যেন আগের চেয়েও ক্ষীণ ও রক্তহীন দেখাইতেছে। সে ভাবিল, "ও যদি এ মেয়েটিকে খুব বেশী ভাল না বাসে, যদি আগেকার কথা মনে পড়ে ওর একটুও দুঃখ হয়, তবে বোধ হয় আমি সবই সইতে পারি, এমন কি স্যর ক্রিষ্টফারের সুখ হবে মনে করে আনন্দেই সইতে পারি।"

আহারের সময়ের একটা ঘটনায় যেন টিনার মনের কথারই সাক্ষ্য পাওয়া গেল। টেবিলে তখন মিষ্টান্ন প্রভৃতি দেওয়া হইতেছে। কাপ্তেন উইব্রোর কাছেই একটা জেলির শিশি ছিল; নিজের একটু লইবার ইচ্ছা হওয়াতে সে প্রথমে মিস্ আশারের দিকে পাত্রটা আগাইয়া দিল। সুন্দরীর মুখখানা একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল; সে বেশ একটু চড়া গলায় বলিয়া উঠিল, "আমি যে কোনো-কালে জেলি খাই না, তা' কি তুমি এতদিনেও টের পাওনি।"

অ্যাণ্টনির ইন্দ্রিয়গুলিকে বিশেষ ধারাল বলা চলে না, কারণ মিস্ আশারের গলার স্বরের ঝাঁঝটা তাহার কানেই পৌঁছিল না; বেশ সহজভাবেই সে বলিল, "তাই নাকি? আমি ভাবতাম তুমি বুঝিবা ওর খুবই ভক্ত। ফার্লের খাবার টেবিলে না সব সময়ই খানিকটা সাজানো থাকৃত?"

"আমি কি ভাল বাসি না বাসি সে দিকে দেখি তোমার কোনো খোঁজই নেই।"

মধুর কণ্ঠে বিনীত উত্তর হইল, "তুমি যে আমায় ভালবাস, সেই ভাবনাতেই আমি ভরপুর।"

এক টিনা ছাড়া আর কেহই এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি লক্ষ্য করে নাই। স্যার ক্রিষ্টফার তখন একমনে লেডি আশারের রাঁধুনীর বর্ণনা শুনিতে ব্যস্ত—সে নাকি খাসা মাংসের ঝোল রাঁধিত, তাই স্যার জনের তাহাকে অত পছন্দ ছিল, তিনি কিনা ঝোল ভাল না হইলে খাইতে পারিতেন না; কাজেই লোকটা পিঠে করিতে না জানিলেও ছ'বৎসর কাজে বাহাল ছিল। লেডি শেভারেল ও মিঃ গিলফিল তখন রুপার্ট কুকুরটার রকম দেখিয়া হাসিতেছিলেন; সে জমিদার মহাশয়ের থালাটা শুঁকিয়া আসিয়া প্রভুর হাতের তলা দিয়া মাথাটা গলাইয়া দিয়া আর সকলের থালা দেখিতেছিল।

মেয়েরা ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া আসিলে লেডি আশার লেডি শেভারেলের সঙ্গে গল্প ফাঁদিলেন। মানুষ মরিলে পশমী কাপড় পরাইয়া গোর দেওয়াটা তাঁহার বিশেষ পছন্দ হয় না।

"অবিশ্যি নিয়ম যখন আছে তখন একটা পশমী পোষাক ত থাকবেই। তবে তা' বলে তলায় সুতী কাপড় পরাতে ত আর বারণ নেই। আমি ত চিরকালই বলতাম, 'আজ যদি স্যার জন মারা যান, তবে আমি কামিজ গায়ে দিয়ে তাঁকে গোর দেবো।' কাজের বেলাও তাই করে-ছিলাম। আপনাকেও বলে রাখ্ছি, স্যার ক্রিষ্টফায়ের বেলা এই রকম করবেন। আপনি বুঝি স্যার জনকে দেখেননি। উঃ মস্ত লম্বা লোক ছিলেন তিনি; নাকটা ঠিক বিয়ে-ট্রিসের মতো ছিল। পোষাকের দিকে তাঁর নজর ছিল ষোল আনা।"

মিস্ আশার অমায়িকভাবে একটুখানি হাসিয়া টিনার পাশে আসিয়া বসিল। হাসিটা যেন বলিতে চায়, "আমাকে তোমার গর্ব্বিতা ভাববার কথা বটে, তবে আমি একটুও গর্ব্বিতা নই।" সে বললে, "অ্যাণ্টনি বলে, আপনি চমৎকার গাইতে পারেন। আশা করি আজ সন্ধ্যায় একটা গান শোনাবেন।"

টিনা না হাসিয়া শান্তস্বরে বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমায় গাইতে বল্লেই আমি গাই।"

"আপনার অমন চমৎকার ক্ষমতা দেখে হিংসে হয়। বাস্তবিক, আমার একেবারে সুর-বোধই নেই। সামান্য একটা সুরও আমি গাইতে পারি না; কিন্তু গান জিনিষটা আমার ভারি ভাল লাগে। সত্যি, এ দুর্ভাগ্য বই আর কি। তবে যতদিন এখানে আছি, ততদিন আমার খুবই মজা। কাপ্তেন উইব্রো বলেছেন, আপনি আমাদের রোজই গান শোনাবেন।"

টিনা গম্ভীরভাবে বলিল, "আপনার সুর-বোধ নেই শুনে আমি ভেবেছিলাম, আপনি গান-টানের ধার দিয়েও যান না।" কথাটা সোজাসুজি হইলেও কেমন যেন বিদ্রূপের মতন শুনাই।

"সত্যি বল্ছি, আমি একেবারে গানের নামে পাগল। আর অ্যাণ্টনিও গানের খুব ভক্ত। আমি যদি গাইয়ে বাজিয়ে ওঁকে শোনাতে পারতাম তবে আমার কি আনন্দই না হ'ত। উনি অবিশ্যি বল্লেন যে আমি গান না গাইলেও ওঁর বেশী ভাল লাগে। আমার কথা ভাব্তে গেলে নাকি ওঁর গানের কথা মোটেই মনে হয় না। আচ্ছা, কি ধরনের সঙ্গীত আপনার ভাল লাগে?"

"কি জানি! আমার সব-রকমের সুন্দর সঙ্গীতই ভাল লাগে।"

"ঘোড়ায় চড়াটাও কি আপনার গানবাজনার মতন ভাল লাগে?"

"না; আমি কোনো দিন ঘোড়ায় চড়ি না। চড়তে গেলেই বোধ হয় ভয়ে আঁৎকে উঠতাম।"

"না, না; একটু অভ্যেস হয়ে গেলে কখনো ভয় পেতেন না। আমি জন্মে কখনো ভীতু ছিলাম না। নিজের জন্যে আমার যত না ভয়, অ্যান্টনির বোধ হয় তার চেয়ে অনেক বেশী। ওঁর সঙ্গে যেদিন থেকে বেড়াতে সুরু করেছি, সেদিন থেকে দায়ে পড়েই একটু সাবধান হতে হয়েছে, নইলে তিনি আমার ভাবনাতেই অস্থির হন।"

টিনা কোনো উত্তর দিল না; মনে মনে ভাবিল, "কি বক্‌ছে, বাবা, উঠে গেলে বাঁচি। ওর ইচ্ছেটা আমি কেবলি ওর মিষ্টি স্বভাবের প্রশংসা করি আর অ্যান্টনির গল্প করি।"

ঠিক সেই সময় মিস্ আশার ভাবিতেছিল, "মিস্ সার্টিটা একটা আস্ত বোকা। গাইয়ে লোকগুলো প্রায়ই এমনি হয়। তবে মেয়েটাকে যেমন মনে করেছিলাম তার চেয়ে সুন্দর দেখ্‌ছি। অ্যান্টনি বলেছিল দেখতে ভাল নয়।"

সুখের বিষয় এই সময় লেডি আশার কন্যাকে কারুকার্য্য-করা গদিগুলি দেখাইতে ডাকিলেন; মিস আশার সাম্‌নের সোফায় উঠিয়া গিয়া লেডি শেভারেলের সহিত সূচিশিল্প ও বুটিদার পরদা প্রভৃতির বিষয়ে কথা আরম্ভ করিল। মা দেখিলেন, এখানে তাঁহার বিশেষ স্থান নাই; তিনি আসিয়া টিনার পাশে বসিলেন।

কথা আরম্ভ হইল অবশ্য এই বলিয়াই, "শুন্‌লাম তুমি নাকি খুব ভাল গাইয়ে। ইটালীয়ানরা সবাই বেশ গায়। বিয়ের পরে স্বর জনের সঙ্গে আমি ইটালীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ভেনিসে গেলাম। ওই যে-দেশে গণ্ডোলা চড়ে লোকে ঘোরে ফেরে; জানো বোধ হয়। তুমি দেখি চুলে পাউডার দাও না। বিয়েট্রিসও দ্যায় না; যদিও অনেকে বলে যে ওর কোঁকড়া চুলে পাউডার দিলেই ভাল দ্যাখায়। ওর খুব চুল, সত্যি না? আমাদের আগের ঝিটা বেশ বেঁধে দিত, এটার চেয়ে ঢের ভাল। কিন্তু হ'লে কি হয়, সে কি করত জানো? ধোপার বাড়ী দেবার আগে বিয়েট্রিসের মোজাগুলো নিয়ে নিজে পরত। কাজেই আর তাকে রাখা চল্লনা। বল, চলে কি আর?"

টিনা প্রশ্নটাকে বাক্যের অলঙ্কারস্বরূপ ধরিয়া চুপ করিয়াই রহিল। লেডি আশার আবার বলিলেন, "কি বল, এখন কি আর চলে?" যেন টিনা 'হাঁ' কি 'না' না বলিলে আর তাঁহার শান্তি নাই। অগত্যা সে কোনো-রকমে আস্তে-আস্তে 'না' বলিল। তিনি আবার গল্পের ফোয়ারা খুলিলেন।

"ঝিগুলো মানুষকে বড় জ্বালায়। বিয়েট্রিস আবার এমন পিটপিটে যে কি বলব! আমি ত অহরহই বলছি, 'দেখ বাছা, অমন বামুনের গরু কপালে জোটে না।' ঐ যে মেয়ের ঘাঘরাটা দেখছ, এখন অবিশ্যি গায়ে বেশ মানিয়েছে, কিন্তু এই নিয়ে তিন চার বার ওকে খোলা আর সেলাই করা হয়েছে। মেয়ে আমার ঠিক ওঁর মতন। তাঁর নিজের সব কাজে অমনি পিটপিটানি ছিল! লেডি শেভারেলও কি পিটপিটে নাকি?"

"তা খানিকটা বটে। তবে মিসেস্ শার্প ওঁর কাছে এই কুড়ি বচ্ছর রয়েছে তাই সুবিধে।"

"আমাদের গ্রিফিনকে যদি কুড়ি বচ্ছর রাখা যেত ত হত ভাল। সে-সব আমার কপালে নেই, ওর যে শরীর ওকে ছাড়তেই হবে। মেয়েটা এমনি একগুঁয়ে কিছুতে যদি একটু তেতো খায়। তোমাকেও ত কেমন দুর্ব্বল দেখাচ্ছে। এক কাজ কোরো, উপোস করে সকালে 'ক্যামোমিলে'র চা খেয়ো। বিয়েট্রিস আমার যেমন শক্ত তেমনি সুস্থ; জন্মে কখনো ওষুধ খায় না। কিন্তু আমার যদি কুড়িটা মেয়েও থাকত আর সব কটার যদি শরীর খারাপ হত আমি বাপু সব কটাকে ধরে ক্যামোমিলের চা গেলাতাম। তুমি খাবে ত? কথা দাও।"

"ধন্যবাদ; আমার কোনো অসুখ-বিসুখ নেই, আমি চিরকাল অমনি রোগা আর ফ্যাকাশে।"

লেডি আশারের দৃঢ় বিশ্বাস "ক্যামোমিলের" চা'তে জগতের সব-কিছু অসম্ভব সম্ভব হইয়া যায়। "হয় কিনা হয় দেখই না বাছা," বলিয়া তিনি আবার অনর্গল বকিয়া চলিলেন। পুরুষেরা একটু শীঘ্র আসিয়া পড়াতে অগত্যা

গল্পের স্রোত বদলাইয়া গেল। এইবার স্যর ক্রিষ্টফারের পালা। ভদ্রলোক বোধ হয় ভাবিতেছিলেন, অন্ততঃ কবিত্বের খাতিরেও "বছর চল্লিশ" পরে প্রথম প্রেয়সীর দর্শনটা না মেলাই ভাল।

কাপ্তেন উইব্রো অবশ্য মামী ও মিস্ আশারের দলেই ভিড়িলেন। মিঃ গিলফিল দেখিলেন টিনা বেচারী দূরে এক কোণে চুপটি করিয়া বোবার মতন বসিয়া আছে। তাহাকে এই অশোভন অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি তাহার কাছে গিয়া তাঁহার কোন্ বন্ধু আজ সকালে বেড়া ডিঙাইতে গিয়া ঘোড়ার পেট ফুঁড়িয়া ও নিজের হাত ভাঙিয়া আসিয়াছে, সেই কথা বলিতে বসিলেন। টিনা যে তাঁহার কথায় একেবারেই মন না দিয়া ঘরের আর-এক-দিকে চাহিয়া ছিল, তাহা তিনি দেখিয়াও দেখিলেন না। ঈর্ষার হাতে মানুষ অনেক যন্ত্রণাভোগ করে; একটা বড় আশ্চর্য্য জিনিষ এই যে যেদিকে তাকাইলে চোখ যেন ফাটিয়া আসে, সেই দিক হইতেই চোখটা কিছুতেই ফেরানো যায় না।

খানিক পরে সকলেই গল্প করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল। স্যর ক্রিষ্টফার বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী। তাই তিনি ক্লান্তি দূর করিবার জন্য এই সুন্দর প্রস্তাবটি করিলেন।

"কি গো টিনা, আজ কি তাস খেলতে বসবার আগে আমাদের গান-টান কিছু শোনাবে না?"

হঠাৎ ভদ্রতার ত্রুটিটা মনে পড়াতে লেডি আশারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি নিশ্চয় তাস খেলে থাকেন?"

"হাঁ নিশ্চয়ই। আহা বেচারা স্যর জনের তাস খেলা না হ'লে একরাত চল্‌ত না!"

টিনা তখনই আসিয়া বাজনার সাম্‌নে বসিল। গান ধরিতেই দেখিল, অ্যাণ্টনি আস্তে-আস্তে সরিয়া আসিয়া বাজনার পাশে দাঁড়াইল। টিনার তাহাতে কতই না আনন্দ! সুখের স্পর্শে তাহার গলায় যেন নূতন শক্তি জাগিয়া উঠিল। মিস্ আশার যখন মহা আড়ম্বর করিয়া প্রভুসমানভাবে আসিয়া অ্যাণ্টনির কাছে দাঁড়াইল তখন টিনা বেশ বুঝিল যে এ ঘটাটা সত্যকার আনন্দের ভাবটা তাহার মনে ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে গানের শেষটাও বিশেষ কিছু মন্দ হইল না।

গান শেষ হইলে কাপ্তেন উইব্রো বলিল, "বাঃ টিনা, তোমার গলা যে দেখ্‌ছি আগের চেয়েও ভাল হয়ে উঠেছে। ফার্লেতে যে মিস্ হিবার্টের সরু বাঁশীর মতো গলার গান শুন্‌তাম, তাতে আর তোমার গানে আকাশ-পাতাল প্রভেদ; কি বল বিয়েট্রিস্, তাই না?"

"বাস্তবিক! মিস্ সার্টি, আপনাকে দেখলেই মানুষের হিংসে হয়। আচ্ছা, তোমাকে ক্যাটেরিনা বল্লে তোমার কিছু আপত্তি আছে কি? অ্যাণ্টনির কাছে তোমার গল্প এত শুনেছি যে মনে হয় আমিও যেন তোমাকে কতকাল থেকে চিনি। তুমি আমায় ক্যাটেরিনা বল্‌তে দেবে ত?"

"তা' আবার বল্‌তে? সকলেই ত' আমায় হয় ক্যাটেরিনা নয় টিনা বলে ডাকে।"

স্যর ক্রিষ্টফার ঘরের আর-এক কোণ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে বাঁদরী আয় আয়, আরো গান করতে হবে। এখনো যে অর্দ্ধেকও হয়নি।"

টিনা ত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে খুবই রাজি। গান করিবার সময় সেই ত হয় এ রাজ্যের রাণী। মিস্ আশার ত শুধু প্রশংসার ভান করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া থাকে। এই ছোট হৃদয়খানির ভিতর হিংসা যেন কি-একটা ঝড় তুলিয়া দিয়াছিল। টিনা এতদিন পাখীটির মতন আপন মনে গান গাহিয়াই কাটাইয়াছে। গায়ে পড়িয়া সে কাহারো কাছে যায় নাই। যে দু'খানি পাখা তাহাকে আদরে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, আনন্দে সে তাহারই আশ্রয়ে দিনগুলি কাটাইতেছিল। এতদিন প্রেমের মধুর তালেই তাহার হৃদয় নাচিয়াছে; কখনো বা সামান্য ভয়ে বুকটি দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে। আজ শান্তি আর নাই। আজ জয়গর্ব্ব ও বিদ্বেষের আঘাতে তাহার সমস্ত হৃদয় দোলা দিয়া উঠিয়াছে।

গানের শেষে স্যর ক্রিষ্টফার ও তাঁহার গৃহিণী, লেডি আশার ও মিঃ গিল্‌ফিলকে লইয়া তাস খেলিতে বসিলেন। টিনা খেলা দেখার ছলে জমিদার মহাশয়ের হাতের কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। নবীন প্রণয়ী দুইটি পাছে মনে করে যে সে

আশ্রয় লইল। প্রথমে জয়ের আনন্দেই তাহার মনটা খুসী হইয়াছিল। গর্ব্বের বেশ একটা শক্তিও আছে, সেই জোরেও তাহার খানিকটা লাভ। আগুনের ধারে মিস্ আশারের কাছ-ঘেঁসিয়া তাহার চেয়ারের পিছনে হাত দিয়া একটু হেলিয়া যেখানে অ্যান্টনি প্রেমিকের মতন বসিয়া ছিল, টিনার দৃষ্টি কিন্তু সেই দিকে। বুকের ভিতর কি যেন একটা ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার নিশ্বাস আটকাইয়া দিতেছিল। চোখটা এক-রকম না তুলিয়াই, সে দেখিতে পাইল, অ্যান্টনি মিস আশারের হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহার হাতের গহনা দেখিতেছিল। দু'জনের মাথা দু'জনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, বিয়েট্রিসের কোঁকড়া চুলগুলি উড়িয়া আসিয়া অ্যান্টনির গালে ঠেকিতেছিল, সে তাহার গহনাপরা হাতখানা ঠোঁটের কাছে তুলিয়া ধরিল। টিনার মুখচোখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল, সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া কি একটা খুঁজিবার ছলে একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়া শেষে চট্ করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিরে গিয়া একটা মোমবাতি লইয়া সে বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

ঘরে গিয়া তাহার কি কান্না! "হে ভগবান্, আমি যে আর সইতে পারি না!" আঙুলগুলা মুঠা করিয়া চাপিয়া ধরিয়া সে কপালে ঠুকিতে লাগিল, যেন এখনি ভাঙিয়া ফেলিবে।

তারপর সে খুব জোরে পায়চারি করিতে লাগিল।

"দিনের পর দিন এমনি চলতে থাক্‌বে, আর আমাকে তাই বসে-বসে দেখ্‌তে হবে, হা আমার কপাল!"

কিছু একটা আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য যেন তাহার সমস্ত শরীরটা কেমন করিয়া উঠিতেছিল। টেবিলের উপর একটা ছোট রুমাল ছিল। সেইটাকে তুলিয়া সে কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পাকাইয়া মুঠিতে শক্ত করিয়া ধরিল। আজ যেন তাহার ইটালীয় রক্তটা সজাগ হইয়া বিদ্রোহ সুরু করিয়া দিয়াছে।

সে ভাবিতেছিল, "শেষে কিনা অ্যান্টনি আমার মনের দিকে একবারটি না তাকিয়ে আমার চোখের সামনে এমনিতর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে চলেছে। ও দেখ্‌ছি সব ভুলতে পারে। আমাকে ও কতইনা ভালবাসার কথা শোনাত! বেড়াবার সময় ওইনা আমার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিত; ওইনা রোজ সন্ধ্যায় আমার চোখে চোখে তাকাবার জন্যে কাছে এসে দাঁড়াত!"

অতীতের এই-সব মধুর মুহূর্ত্তগুলি চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেই তাহার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতে লাগিল; "উঃ কি নিষ্ঠুর, কি নিষ্ঠুর!" বিছানায় পড়িয়া কতক্ষণ ধরিয়া সে কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইল।

ঘরে যে কতক্ষণ পড়িয়া ছিল, তাহা সে টেরই পায় নাই; মন্দিরের ঘণ্টা তাহার চেতনা ফিরাইয়া দিল। মনে হইল, লেডি শেভারেল হয়ত খোঁজ করিতে লোক পাঠাইবেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়িতে আরম্ভ করিল, আর যেন নীচে যাইতে না হয়। চুলটা খুলিয়া একটা আল্‌গা পোষাক পরিতে-না-পরিতেই শুনিল, দরজায় কে ঠক্‌ঠক্ করিতেছে; তখনি শার্পগিন্নির গলা—"টিনাদিদি, গিন্নিমা জিগেস কল্লেন, তোমার কি কিছু অসুখ-বিসুখ করেছে?"

টিনা দরজা খুলিয়া বলিল, "ধন্যবাদ, মিসেস শার্প; আমার বড় মাথা ধরেছে। গিন্নিমাকে বল গিয়ে গান করবার পর থেকেই মাথাটা কেমন ধরে উঠেছে।"

"ওমা গো! তবে ওখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁপছ যে? মারা পড়বে দেখ্‌ছি, এখনো শুয়ে পড়নি কেন? এস আমি চুলটা বেঁধে ঢেকে-ঢুকে গরম করে শুইয়ে দি।"

"না, না, ধন্যবাদ; সত্যি বল্‌ছি, আমি এখুনি শুয়ে পড়ব। শুভরাত্রি, শার্পিমণি; অত বোকোনা, আমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো এখুনি ঘুমিয়ে পড়ব।"

টিনা ধাইমাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। শার্পগিন্নি কিন্তু অত সহজে ভুলিবার পাত্রী নয়। তাহার পালিত খুকীটিকে বিছানায় না শোয়াইয়া সে কিছুতেই ছাড়িবে না, বেচারী টিনার আঁধার ঘরের সাথী বাতিটিকে সুদ্ধ সে তুলিয়া লইয়া গেল।

কিন্তু বুকের ভিতর যাহার কান্না গুমরাইয়া উঠিতেছে সে বিছানায় পড়িয়া থাকে কি করিয়া? সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। এই শীতের কন্‌কনে বাতাস আর

অসোয়াস্তিই আজ তাহার বন্ধু, শরীরের কষ্টে তাহার মনের যাতনা হয়ত ডুবিয়া যাইতে পারে। সেদিন ত্রয়োদশী কি চতুর্দ্দশী। চাঁদ তখন আকাশের মাঝখানে; ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের টুক্‌রোগুলি তাহার উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। টিনা চাঁদের আলোতেই ঘরের চারিদিক দেখিতে পাইতেছিল। সে উঠিয়া জানালার পরদাটা সরাইয়া দিয়া ঠাণ্ডা সার্সীর গায়ে কপালটা চাপিয়া প্রশস্ত মাঠ ও বাগানের দিকে চাহিয়া রহিল।

চাঁদের আলোটা কেমন যেন বিষাদ-মাখা। দুরন্ত শীতের বাতাস তাহার সকল মাধুর্য্য সকল আরাম উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। জ্যোৎস্নায় স্তব্ধ হইয়া ঘুমাইবার জন্য গাছগুলি উন্মুখ; নিষ্ঠুর বাতাস তাহাদের দোলা দিয়া দিয়া হয়রান করিয়া তুলিতেছে। ঘাসগুলিও থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দেখিয়া তাহারও যেন শীত ধরিয়া গেল। ডোবার ধারে উইলো-গাছগুলি অদৃশ্য বাতাসের নিষ্ঠুর পীড়নে শাদা হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা আজ তাহারই মতন অসহায়, আপনার দুঃখে আপনি ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির এই বিষণ্ণ মূর্ত্তিই আজ তাহার চোখে ভাল। ইহাতে যেন একটু করুণার আভাস পাওয়া যায়। প্রণয়ীদের নির্দ্দয় সুখের চেয়ে ভাল। সে সুখে সহানুভূতির লেশমাত্র নাই। তাহা দুঃখের কাছে একটু নতও হয় না, বুক ফুলাইয়া আপন আনন্দে বিভোর হইয়া চলিয়া যায়।

টিনা জানালার গায়ে মুখটা চাপিয়া ধরিল; চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। কাঁদিয়া সে যেন বাঁচিল; বুকের ভিতর আগুন পুরিয়া শুক্‌নো চোখে বসিয়া সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। লেডি শেভারেল থাকিতে যদি এই উন্মত্ত আবেগ তাহাকে পাইয়া বসে তবে ত আর সে আপনাকে সামলাইতে পারিবে না।

আর স্যর ক্রিষ্টফার? আহা তিনি যে টিনাকে বড় স্নেহ করেন; আজ অ্যান্টনির বিবাহের কথায় তাঁহার আনন্দ যেন ধরিতেছে না। আর টিনা কিনা সমস্তক্ষণ বসিয়া-বসিয়া মনটাকে বিষ করিয়া তুলিতেছে?

টিনা কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, "হে ভগবান, তুমি [illegible]"

শীতের বাতাসে জ্যোৎস্নার মধ্যে এই ভাবে টিনা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া রাত্রি-শেষে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা লইয়া আবার শুইয়া পড়িল; শ্রান্তিরূপে নিদ্রা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

এই ছোট ব্যথিত হৃদয়খানি যখন দুঃখের গুরুভারে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, প্রকৃতি তখনো চিরউদাসীনের মতন শান্তভাবে আপন ভীষণ অবিচলিত সৌন্দর্য্যে আপনি নিমগ্ন। আকাশের তারকারাজি তখনো সেই চিরপুরাতন পথে ছুটিয়া চলিয়াছে; নদীর জোয়ার তখনো কানায়-কানায় ভরিয়া উঠিয়া সুদূরের তৃষিত তৃণটিকেও ধন্য করিতেছিল। সূর্য্য তখনো ক্ষিপ্রগামিনী পৃথিবীর অপরদিকে কত অতি-ব্যস্ত জাতিদের দিনের আলো জোগাইতেছিল। মানুষের চিন্তা ও কাজের স্রোত দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিতেছিল। জ্যোতিষী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সেবায় নিমগ্ন। বড় বড় জাহাজ ঢেউয়ের মাথায় নাচিয়া চলিতেছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের কঠিন শ্রমে ও বিদ্রোহের ভীষণ তেজে কেবল তখন ক্ষণিকের জন্য ভাটা পড়িয়াছিল; কিন্তু নিদ্রাহীন রাজনৈতিক কাল সকালের ভাবী সঙ্কট স্মরণ করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিলেন। এই প্রবল স্রোত কি ভীষণ বেগে কত অজানা পথের উপর দিয়া কোন অজানা লোকের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। বালিকা টিনার সুখদুঃখ তাহার কাছে অতি সামান্য, অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ। সকলের ছোট পাখীটি সারাদিন খুঁজিয়া ছোট ঠোঁটে একটুখানি খাবার লইয়া গিয়া যখন দেখিতে পায় বাসাটি শূন্য, ছিন্নভিন্ন, তখন তাহার বুকের ভিতর লুকাইয়া যে হৃৎপিণ্ডটি ভয়ে উদ্বেগে কাঁপিতে থাকে, সে যেমন কাহারো চোখে পড়ে না, কাহারো দয়া পায় না, জগতের এই ভীষণ তাণ্ডব নৃত্যের কাছে টিনার দুঃখও তেমনি কাহারো চোখে পড়ে না, কাহারো করুণা পায় না। সে যে অতি ছোট অতি তুচ্ছ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশান্তা দেবী।

বড়'র বিপদ

বড়ই বিপদ দুঃখ চিরদিন সয়।
চাঁদেই গ্রাসয়ে রাহু, তারাদলে নয়॥

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায়।

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম

একটু বাদলার হাওয়া দিয়াছে কি, অমনি আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্য্যন্ত বন্যা বহিয়া যায়, পথিকের জুতা-জোড়াটা ছাতার মতই শিরোধার্য্য হইয়া ওঠে, এবং অন্তত এই গলি-চর জীবেরা উভচর জীবের চেয়ে জীবনযাত্রায় যোগ্যতর নয় শিশুকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে এইটে বছর বছর লক্ষ্য করিতে করিতে আমার চুল পাকিয়া গেল।

ইহার মধ্যে প্রায় ষাট বছর পার হইল। তখন বাষ্প ছিল কলীয় যুগের প্রধান বাহন, এখন বিদ্যুৎ তাহাকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে সুরু করিয়াছে; তখন পরমাণুতত্ত্ব পৌঁছিয়াছিল অদৃশ্যে, এখন তাহা অভাব্য হইয়া উঠিল; ওদিকে মরিবার কালের পিঁপড়ার মত মানুষ আকাশে পাখা মেলিয়াছে, একদিন এই আকাশেরও ভাগবখ্‌রা লইয়া সরিকদের মধ্যে মামলা চলিবে এটর্নি তার দিন গণিতেছেন; চীনের মানুষ একরাত্রে তাদের সনাতন টিকি কাটিয়া সাফ করিল, এবং জাপান কালসাগরে এমন-এক বিপর্য্যয় লাফ মারিল যে পঞ্চাশ বছরে পাঁচশো বছর পার হইয়া গেল। কিন্তু বর্ষার জলধারা সম্বন্ধে আমাদের রাস্তার আতিথেয়তা যেমন ছিল তেমনিই আছে। যখন কন্‌গ্রেসের ক-অক্ষরেরও পত্তন হয় নাই তখনো এই পথের পথিকবধূদের বর্ষার গান ছিল—

কতকাল পরে বল ভারতরে
দুখসাগর সাঁতরি পার হবে?

আর আজ যখন হোমরুলের পাকা ফলটা প্রায় আমাদের গোঁফের কাছে ঝুলিয়া পড়িল—আজও সেই একই গান—মেঘমল্লার-রাগেণ, যতিতালাভ্যাং।

ছেলেবেলা হইতেই কাণ্ডটা দেখিয়া আসিতেছি, সুতরাং ব্যাপারটা আমাদের কাছে অভাবনীয় নয়। যা অভাবনীয় নয় তা লইয়া কেহ ভাবনাই করে না। আমরাও ভাবনা করি নাই, সহ্যই করিয়াছি। কিন্তু চিঠিতে যে-কথাটা অমনিতে চোখ এড়াইয়া যায় সেটার নীচে লাইন কাটা দেখিলে যেমন বিশেষ করিয়া মনে লাগে, আমাদের রাস্তার জলাশয়তার নীচে তেমনি জোড়া লাইন কাটা দেখিয়া, শুধু মনটার মধ্যে নয় আমাদের গাড়ির চাকাতেও ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগিল। বর্ষাও নামিয়াছে, ট্রাম-লাইনের মেরামতও সুরু। যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে ন্যায়শাস্ত্রে এই কথা বলে, কিন্তু ট্রামওয়ালাদের অন্যায় শাস্ত্রে মেরামতের আর শেষ দেখি না। তাই এবার লাইন-কাটার সহযোগে যখন চিৎপুর রোডে জলস্রোতের সঙ্গে জনস্রোতের দ্বন্দ্ব দেখিয়া দেহমন আর্দ্র হইতে লাগিল তখন অনেক দিন পরে গভীরভাবে ভাবিতে লাগিলাম, সহ্য করি কেন?

সহ্য না করিলে যে চলে এবং না করিলেই যে ভালো চলে চৌরঙ্গী অঞ্চলে একবার পা বাড়াইলেই তা বোঝা যায়। একই সহর, একই ম্যুনিসিপালিটি; কেবল তফাৎটা এই,—আমাদের সয়, ওদের সয় না। যদি চৌরঙ্গী রাস্তার পনেরো আনার হিস্‌সা ট্রামেরই থাকিত, এবং রাস্তা উৎখাত করিয়া লাইন মেরামত এমন সুমধুর গজগমনে চলিত, আজ তবে ট্রাম কোম্পানির দিনে আহার রাত্রে নিদ্রা থাকিত না।

আমাদের নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন, "সে কি কথা! আমাদের একটু অসুবিধা হইবে বলিয়াই কি ট্রামের রাস্তা মেরামৎ হইবে না?"

"হইবে বই কি! কিন্তু এমন আশ্চর্য্য সুস্থ মেজাজে এবং দীর্ঘ মেয়াদে নয়।"

নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন—"সে কি সম্ভব?"

যা হইতেছে তার চেয়ে আরো ভালো হইতে পারে এই ভরসা ভালোমানুষদের নাই বলিয়াই অহরহ চক্ষের জলে তাদের বক্ষ ভাসে, এবং তাদের পথঘাটেরও প্রায় সেই দশা। এমনি করিয়া দুঃখকে আমরা সর্ব্বাঙ্গে মাখি এবং ভাঙা পিপের আলকাৎরার মত সেটাকে দেশের চারদিকে গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতে দিই।

কথাটা শুনিতে ছোটো, কিন্তু আসলে ছোটো নয়। কোথাও আমাদের কোন কর্তৃত্ব আছে এটা আমরা কিছুতেই পুরামাত্রায় বুঝিলাম না। বইয়ে পড়িয়াছি, মাছ ছিল কাঁচের টবের মধ্যে; সে অনেক মাথা খুঁড়িয়া অবশেষে বুঝিল যে কাঁচটা জল নয়। তার পরে সে বড় জলাশয়ে ছাড়া পাইল, তবু তার এটা বুঝিতে সাহস হইল না যে জলটা কাঁচ নয়; তাই সে একটুখানি জায়গাতেই ঘুরিতে লাগিল। ঐ মাথা-

ঢুকিবার ভয়টা আমাদেরও হাড়েমাসে জড়ানো, তাই যেখানে সাঁতার চলিতে পারে সেখানেও মন চলে না। অভিমন্যু মায়ের গর্ভেই ব্যূহে প্রবেশ করিবার বিদ্যা শিখিল, বাহির হইবার বিদ্যা শিখিল না, তাই সে সর্ব্বাঙ্গে সপ্তরথীর মারটা খাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই বাঁধা-পড়িবার বিদ্যাটাই শিখিলাম, গাঁঠ-খুলিবার বিদ্যাটা নয়; তারপর জন্মমাত্রই বুদ্ধিটা হইতে সুরু করিয়া চলা-ফেরাটা পর্য্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রথী আছে, এমন কি পদাতিক পর্য্যন্ত, সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে, পুঁথিকে, ইসারাকে, গণ্ডীকে বিনাবাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত, যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্ত্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সাম্‌নে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনোমতেই ঠাহর হয় না, এমন কি, বিলাতী চষমা পরিলেও না।

মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় কথাটাই এই যে, কর্ত্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে-দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এইজন্য যে-দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের পরে অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড় কারখানা খোলা হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন—"তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্ত্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না।"

আর যাই হোক, মনু-পরাশরের এই আওয়াজটা ইংরেজি গলায় ভারি বেসুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে-উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সহজ সুরের কথা। আমরা বলি ভুল করাটা তেমন সর্ব্বনাশ নয় স্বাধীনকর্ত্তৃত্ব না-পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁৎ নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে

আমাদের বলিবার আরো কথা আছে। কর্ত্তৃপক্ষদের এ-কথাও স্মরণ করাইতে পারি যে, আজ তোমরা আত্ম-কর্ত্তৃত্বের মোটর-গাড়ি চালাইতেছ, কিন্তু একদিন রাত্ত-থাকিতে যখন গোরুর গাড়িতে যাত্রা সুরু হইয়াছিল তখন খাল-খন্দর মধ্য দিয়া চাকা-দুটোর আর্ত্তনাদ ঠিক জয়ধ্বনির মত শোনাইত না। পার্লামেণ্ট বরাবরই ডাইনে বাঁয়ে প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া এক নজির হইতে আর-এক নজিরের লাইন কাটিতে কাটিতে আসিয়াছে, গোড়াগুড়িই ষ্টীমরোলার-টানা পাকা রাস্তা পায় নাই। কত ঘুষঘাষ, ঘুষাঘুষি, দলাদলি, অবিচার এবং অব্যবস্থার মধ্য দিয়া সে হেলিয়া হেলিয়া চলিয়াছে। কখনো রাজা, কখনো গির্জ্জা, কখনো জমিদার, কখনো বা মদওয়ালারও স্বার্থ বহিয়াছে। এমন-এক সময় ছিল সদস্যেরা যখন জরিমানা ও শাসনের ভয়েই পার্লামেণ্টে হাজির হইত। আর গলদের কথা যদি বল, কবেকার কালে সেই আয়র্লণ্ড-আমেরিকার সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আজকের দিনে বোয়ার-যুদ্ধ এবং ডার্ডানেলিস মেসোপোটেমিয়া পর্য্যন্ত গলদের লম্বা ফর্দ্দ দেওয়া যায়; ভারতবিভাগের ফর্দ্দটাও নেহাৎ ছোটো নয়—কিন্তু সেটার কথায় কাজ নাই। আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রে কুবের দেবতার চরগুলি যে-সকল কুকীর্ত্তি করে সেগুলো সামান্য নয়। ড্রেফুসের নির্য্যাতন উপলক্ষ্যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রতন্ত্রে সৈনিক-প্রাধান্যের যে অন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে রিপুর অন্ধশক্তিরই ত হাত দেখা যায়। এ-সকল সত্ত্বেও আজকের দিনে এ-কথায় কারো মনে সন্দেহ লেশ-মাত্র নাই যে, আত্মকর্ত্তৃত্বের চির-সচলতার বেগেই মানুষ ভুলের মধ্য দিয়াই ভুলকে কাটায়, অন্যায়ের গর্ত্তে ঘাড়-মোড় ভাঙিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে ওঠে। এইজন্য মানুষকে পিছমোড়া বাঁধিয়া তার মুখে পায়সান্ন তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে অন্ন উপার্জ্জনের চেষ্টায় উপবাসী হইতে দেওয়াও ভালো।

এর চেয়েও একটা বড় কথা আমাদের বলিবার আছে,—সে এই যে, রাষ্ট্রীয় আত্মকর্ত্তৃত্বে কেবল যে সুব্যবস্থা বা দায়িত্ববোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড় হয়। কেবল পল্লীসমাজে, বা ছোটোছোটো সামাজিক শ্রেণীবিভাগে

মানুষকে বড় পরিধির মধ্যে দেখিবার তারা সুযোগ পায়। এই সুযোগের অভাবে প্রত্যেক মানুষ মানুষ-হিসাবে ছোটো হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে যখন মনুষ্যত্বের বৃহৎ ভূমিকার উপরে আপন জীবনকে না ছড়াইয়া দেখে তখন তার চিন্তা তার শক্তি তার আশাভরসা সমস্তই ছোটো হইয়া যায়। মানুষের এই আত্মার খর্ব্বতা তার প্রাণনাশের চেয়ে ঢের বেশি বড় অমঙ্গল। অতএব ভুল-চুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব—দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিয়ো না।

এই জবাবই সত্য জবাব। যদি নাছোড়বান্দা হইয়া কোনো একগুঁয়ে মানুষ এই জবাব দিয়া কর্তৃপক্ষকে বেজার করিয়া তোলে, তবে সেদিক হইতে সে interned হইতে পারে কিন্তু এদিক হইতে বাহবা পায়। অথচ ঠিক এই জবাবটাই যদি আমাদের সমাজকর্ত্তাদের কাছে দাখিল করি, যদি বলি, "তোমরা বল, যুগটা কলি, আমাদের বুদ্ধিটা কম, স্বাধীন বিচারে আমাদের ভুল হয়, স্বাধীন ব্যবহারে আমরা অপরাধ করি, অতএব মগজটাকে অগ্রাহ্য করিয়া পুঁথিটাকে শিরোধার্য্য করিবার জন্যই আমাদের নতশিরটা তৈরি, কিন্তু এতবড় অপমানের কথা আমরা মানিব না," তবে চণ্ডীমণ্ডপের চক্ষু রাঙা হইয়া ওঠে এবং সমাজকর্ত্তা তখনি সামাজিক internment-এর হুকুম জারি করেন। যাঁরা পোলিটিকাল আকাশে উড়িবার জন্য পাখা ঝট্‌পট্ করেন তাঁরাই সামাজিক দাঁড়ের উপর পা-দুটোকে শক্ত শিকলে জড়াইয়া রাখেন।

আসল কথা, নৌকাটাকে ডাইনে চালাইবার জন্যও যে হাল, বাঁয়ে চালাইবার জন্যও সেই হাল। একটা মূলকথা আছে সেইটেকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই সমাজেও মানুষ সত্য হয়, রাষ্ট্রব্যাপারেও মানুষ সত্য হয়। সেই মূলকথাটার ধারণা লইয়াই চিৎপুরের সঙ্গে চৌরঙ্গীর তফাৎ। চিৎপুর একেবারেই ঠিক করিয়া আছে যে, সমস্তই উপরওয়ালার হাতে। তাই সে নিজের হাত খালি করিয়া চিৎ হইয়া রহিল। চৌরঙ্গী বলে, কিছুতে আমাদের হাত নাই এ যদি সত্যই হইত তবে আমাদের হাতদুটোই থাকিত না। উপরওয়ালার হাতের সঙ্গে আমাদের হাতের একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে চৌরঙ্গী এই কথা মানে বলিয়াই জগৎটাকে হাত করিয়াছে, আর চিৎপুর তাহা মানে না বলিয়াই জগৎটাকে হাতছাড়া করিয়া দুই চক্ষুর তারা উল্টাইয়া শিবনেত্র হইয়া রহিল।

আমাদের ঘর-গড়া কুণো নিয়মকেই সবচেয়ে বড় মনে করিতে হইলে চোখ বুজিতে হয়। চোখ চাহিলে দেখি, বিশ্বের আগাগোড়া একটা বৃহৎ নিয়ম আছে। নিজের চেষ্টায় সেই নিয়মকে দখল করাই শক্তিলাভ, সমৃদ্ধিলাভ, দুঃখ হইতে পরিত্রাণলাভ—এই নিশ্চিত বোধটাই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার পাকা ভিৎ। ব্যক্তি-বিশেষের সফলতা কোনো বিশেষ বিধানে নয়, বিশ্ববিধানে—এইটে শক্ত করিয়া জানাতেই শক্তির ক্ষেত্রে য়ুরোপের এতবড় মুক্তি।

আমরা কিন্তু দুই হাত উল্টাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছি—কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম। সেই কর্ত্তাটিকে,—ঘরের বাপদাদা, বা পুলিসের দারোগা, বা পাণ্ডা পুরোহিত, বা স্মৃতিরত্ন, বা শীতলা, মনসা, ওলাবিবি, দক্ষিণরায়, শনি, মঙ্গল, রাহু, কেতু, প্রভৃতি—হাজার-রকম নাম দিয়া নিজের শক্তিকে হাজার টুকরা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিই।

কালেজী পাঠক বলিবেন—আমরা ত এসব মানি না! আমরা ত বসন্তর টীকা লই; ওলাউঠো হইলে মুনের জলের পিচ্‌কিরি লইবার আয়োজন করি; এমন কি, মশা-বাহিনী ম্যালেরিয়াকে আজো আমরা দেবী বলিয়া খাড়া করি নাই, তাকে আমরা কীটস্য কীট বলিয়াই গণ্য করি;—এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে মন্ত্রভরা তাবিজটাকে পেট-ভরা পিলের উপর ঝুলাইয়া রাখি।

মুখে কোন্‌টাকে মানি বা নাই মানি তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু ঐ মানার বিষে আমাদের মনের ভিতরটা জর্জ্জরিত। এই মানসিক কাপুরুষতার ভিত্তি একটা চরাচরব্যাপী ভয়ের উপর। অখণ্ড বিশ্বনিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অখণ্ড বিশ্বশক্তিকে মানি না বলিয়াই হাজার-রকম ভয়ের কল্পনায় বুদ্ধিটাকে আগেভাগে বরখাস্ত করিয়া বসি। ভয় কেবলি বলে, কি জানি, কাজ কি! ভয় জিনিষটাই এইরকম। আমাদের রাজপুরুষদের

মধ্যেও দেখি, রাজ্যশাসনের কোনোএকটা ছিদ্র দিয়া ভয় ঢুকিলেই তারা পাশ্চাত্য স্বধর্ম্মকেই ভুলিয়া যায়,—যে ধ্রুব আইন তাদের শক্তির ধ্রুব নির্ভর তারই উপর চোখ বুজিয়া কুড়াল চালাইতে থাকে। তখন ন্যায়-রক্ষার উপর ভরসা চলিয়া যায়, প্রেষ্টিজ রক্ষাকে তার চেয়ে বড় মনে করে,—এবং বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া ভাবে চোখের জলটাকে গায়ের জোরে আণ্ডামানে পাঠাইতে পারিলেই লঙ্কার ধোঁয়াটাকে মনোরম করা যায়। এইটেই ত বিশ্ববিধানের প্রতি অবিশ্বাস, নিজের বিশেষ বিধানের প্রতি ভরসা। এর মূলে—ছোটো ভয়, কি ছোটো লোভ, কিম্বা কাজকে সোজা করিবার অতি ছোট চাতুরী। আমরাও অন্ধভয়ের তাড়ায় মনুষ্যধর্ম্মটাকে বিসর্জ্জন দিতে রাজি। ব্যতিব্যস্ত হইয়া, যেথানে যা-কিছু আছে এবং নাই, সমস্তকেই জোড়হাত করিয়া মানিতে লাগিয়াছি! তাই আমরা জীববিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞানই পড়ি আর রাষ্ট্র-তন্ত্রের ইতিহাসে পরীক্ষাই পাশ করি—"কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম" —এই বীজমন্ত্রটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না। তাই, যদিচ আমাদের একালের ভাগ্যে দেশে অনেকগুলি দশের কাজের পত্তন হইয়াছে তবু আমাদের সেকালের ভাগ্যে সেই দশের কাজ একের কাজ হইয়া উঠিবার জন্য কেবলি ঠেলা মারিতে থাকে। কোথা হইতে থামকা একটা-না-একটা কর্ত্তা ফুঁড়িয়া ওঠে। তার একমাত্র কারণ, যে-দশের কথা হইতেছে তারা ওঠে বসে, খায়-দায়, বিবাহ ও চিতারোহণ করে এবং পরকালে পিণ্ড লইতে হাত বাড়ায় কর্ত্তার ইচ্ছায়; কিসে পাপ কিসে পুণ্য, কে ঘরে ঢুকিলে হুঁকার জল ফেলিতে হইবে, ক'-হাত খেরের কুয়ার জলে স্নান করা যায়, ভোক্তার ধর্ম্মরক্ষার পক্ষে ময়রার হাতের লুচিরই বা কি গুণ রুটিরই বা কি, ম্লেচ্ছের তৈরি মদেরই বা কি আর ম্লেচ্ছের ছোঁয়া জলেরই বা কি, কর্ত্তার ইচ্ছার উপর বরাৎ দিয়া সে-বিচার তারা চিরকালের মত সারিয়া রাখিয়াছে। যদি বলি পানি-পাঁড়ে নোংরা ঘটি ডুবাইয়া যে-জল বাল্‌তিতে লইয়া ফিরিতেছে সেটা পানের অযোগ্য, আর পানি-মিঞা ফিল্‌টার হইতে যে-জল আনিল সেটাই শুচি ও স্বাস্থ্যকর, তবে উত্তর শুনিব, ওটা ত তুচ্ছ যুক্তির কথা, কিন্তু ওটা ত কর্ত্তার ইচ্ছা নয়। যদি বলি, নাই হইল কর্ত্তার ইচ্ছা, তবে নিমন্ত্রণ বন্ধ। শুধু অতিথিসৎকার নয়, অন্ত্যেষ্টিসৎকার পর্য্যন্ত অচল। এত নিষ্ঠুর জবরদস্তিদ্বারা যাদের অতি সামান্য খাওয়া-ছোঁয়ার অধিকার পর্য্যন্ত পদে পদে ঠেকানো হয়, এবং সেটাকে যারা কল্যাণ বলিয়াই মানে, তারা রাষ্ট্রব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবি করিবার বেলায় সঙ্কোচ বোধ করে না কেন?

যখন আপন শক্তির মূলধন লইয়া জনসাধারণের কারবার না চলে তখন সকল ব্যাপারেই মানুষ দৈবের কাছে, গ্রহের কাছে, পরের কাছে হাত পাতিয়া ভয়ে ভয়ে কাটায়। এই ভাবটার বর্ণনা যদি কোথাও খুব স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া থাকে তাহা বাংলার প্রাচীন মঙ্গল-কাব্যে। চাঁদ-সদাগরের মনের আদর্শ মহৎ, তাই যে-দেবতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া কিছুতে সে মানিতে চায় নাই বহুদুঃখে তারই শক্তির কাছে তাকে হার মানিতে হইল। এই যে শক্তি, এর সঙ্গে জ্ঞান বা ন্যায়-ধর্ম্মের যোগ নাই। মানিবার পাত্র যতই যথেচ্ছাচারী ততই সে ভয়ঙ্কর, ততই তার কাছে নতিস্তুতি। বিশ্বকর্ত্তৃত্বের এই ধারণার সঙ্গে তখন-কার রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্বের যোগ ছিল। কবিকঙ্কণের ভূমিকা-তেই তার খবর মেলে। আইন নাই, বিচার নাই, জোর যার মুলুক তার; প্রবলের অত্যাচারে বাধা দিবার কোনো বৈধ পথ নাই; দুর্ব্বলের একমাত্র উপায় স্তবস্তুতি, ঘুষঘাষ এবং অবশেষে পলায়ন। দেব-চরিত্র-কল্পনাতেও যেমন, সমাজেও তেমন, রাষ্ট্রতন্ত্রেও সেইরূপ।

অথচ একদিন উপনিষদে বিধাতার কথা বলা হইয়া-ছিল, যাথাতথ্যতোঽর্থান ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ তাঁর বিধান যথাতথ, তাহা এলোমেলো নয় এবং সে-বিধান শাশ্বত কালের। তাহা নিত্যকাল হইতে এবং নিত্যকালের জন্য বিহিত, তাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন খেয়াল নয়। সুতরাং সেই নিত্য বিধানকে আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া কর্ম্মের দ্বারা আপন করিয়া লইতে পারি। তাকে যতই পাইব ততই নূতন নূতন বাধা কাটাইয়া চলিব। কেননা, যে-বিধানে নিত্যতা আছে কোথাও সে একেবারে ঠেকিয়া যাইতে পারে না, বাধা সে অতিক্রম করিবেই। এই নিত্য এবং যথাতথ বিধানকে যথাতথরূপে

জানাই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের জোরে য়ুরোপের মনে এত বড় একটা ভরসা জন্মিয়াছে যে, সে বলিতেছে, ম্যালেরিয়াকে বিদায় করিবই, কোনো রোগকেই টঁকিতে দিব না, জ্ঞানের অভাব অন্নের অভাব লোকালয় হইতে দূর হইবেই, মানুষের ঘরে যে-কেহ জন্মিবে সকলেই দেহে মনে সুস্থ সবল হইবে এবং রাষ্ট্রতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত বিশ্বকল্যাণের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিয়াছিল, অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে; সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিত্রাণ। অসত্য কাকে বলে? নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া জানাই অসত্য। সর্ব্বভূতের সঙ্গে আত্মার মিল জানিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই সত্য জানা। এত বড় সত্যকে মনে আনিতে পারা যে কি পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার তা আজ আমরা বুঝিতেই পারিব না।

এদিকে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে য়ুরোপ যে-মুক্তির সাধনা করিতেছে তারও মূল কথাটা এই একই। এখানেও দেখা যায় অবিদ্যাই বন্ধন, সত্যকে পাওয়াতেই মুক্তি। সেই বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষের মনকে বিচ্ছিন্নতা হইতে বিশ্বব্যাপিকতায় লইয়া যাইতেছে এবং সেই পথে মানুষের বিশেষ শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহিত যোগযুক্ত করিতেছে।

ভারতে ক্রমে ঋষিদের যুগ, অর্থাৎ গৃহস্থ তাপসদের যুগ গেল; ক্রমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর যুগ আসিল। ভারতবর্ষ যে-মহাসত্য পাইয়াছিল তাহাকে জীবনের ব্যবহারের পথ হইতে তফাৎ করিয়া দিল। বলিল, সন্ন্যাসী হইলে তবেই মুক্তির সাধনা সম্ভবপর হয়। তার ফলে এদেশে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার একটা আপোস হইয়া গেছে; বিষয়বিভাগের মত উভয়ের মহল বিভাগ হইয়া মাঝখানে একটা দেয়াল উঠিল। সংসারে-তাই ধর্ম্মে কর্ম্মে আচারে বিচারে যত সঙ্কীর্ণতা, যত স্থূলতা, যত মূঢ়তাই থাক্, উচ্চতম সত্যের দিক হইতে তার প্রতিবাদ নাই, এমন কি, সমর্থন আছে। গাছতলায় বসিয়া জ্ঞানী বলিতেছে, "যে-মানুষ আপনাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে ও সর্ব্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে," অমনি সংসারী ভক্তিতে গলিয়া তার ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া দিল। ওদিকে সংসারী তার দরদালানে বসিয়া বলিতেছে, "যে-বেটা সর্ব্বভূতকে যতদূর সম্ভব তফাতে রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোবা নাপিত বন্ধ,"—আর জ্ঞানী আসিয়া তার মাথায় পায়ের ধূলা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল—"বাবা বাঁচিয়া থাক!" এইজন্যই এদেশে কর্ম্মসংসারে বিচ্ছিন্নতা জড়তা পদে পদে বাড়িয়া চলিল, কোথাও তাকে বাধা দিবার কিছু নাই। এইজন্যই শত শত বছর ধরিয়া কর্ম্মসংসারে আমাদের এত অপমান, এত হার!

য়ুরোপ ঠিক ইহার উল্টা। য়ুরোপের সত্যসাধনার ক্ষেত্র কেবল জ্ঞানে নহে ব্যবহারে। সেখানে রাজ্যে সমাজে যে-কোনো খুঁৎ দেখা যায় এই সত্যের আলোতে সকলে মিলিয়া তার বিচার, এই সত্যের সাহায্যে সকলে মিলিয়া তার সংশোধন। এইজন্য সেই সত্য যে শক্তি যে-মুক্তি দিতেছে, সমস্ত মানুষের তাহাতে অধিকার, তাহা সকল মানুষকে আশা দেয়, সাহস দেয়,—তাহার বিকাশ তন্ত্রমন্ত্রের কুয়াশায় ঢাকা নয়, মুক্ত আলোকে সকলের সামনে তাহা বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং সকলকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে।

এই যে কর্ম্মসংসারে শত শত বছর ধরিয়া অপমানটা সহিলাম সেটা আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার আকারে। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে, এইজন্যই যে-য়ুরোপীয় জাতি প্রভুত্ব পাইল তাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দিকেই আমাদের সমস্ত মন গেল। আমরা আর-সব কথা ভুলিয়া কেবলমাত্র এই কথাই বলিতেছি, যে, ভারতের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার যোগসাধন হোক্,—উপর হইতে যেমন-খুসি নিয়ম হানিবে আর আমরা বিনা খুসিতে সে নিয়ম মানিব এমনটা না হয়। কর্তৃত্বকে কাঁধে চাপাইলেই বোঝা হইয়া ওঠে, ওটাকে এমন-একটা চাকা-ওয়ালা ঠেলাগাড়ির উপর নামানো হোক যেটাকে আমরাও নিজের হাতে ঠেলিতে পারি।

আজকের দিনে এই প্রার্থনা পৃথিবীর সব দেশেই জাগিয়া উঠিয়াছে যে, বাহিরের কর্ত্তার সম্পূর্ণ একতরফা শাসন হইতে মানুষ ছুটি লইবে। এই প্রার্থনায় আমরা যে যোগ দিয়াছি তাহা কালের ধর্ম্মে,—না যদি দিতাম, যদি বলিতাম রাষ্ট্র-ব্যাপারে আমরা চিরকালই কর্ত্তাভজা, সেটা আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা হইত। অন্ততঃ একটা ফাটল দিয়াও সত্য আমাদের কাছে দেখা দিতেছে এটাও শুভলক্ষণ।

সত্য দেখা দিল বলিয়াই আজ এতটা জোর করিয়া বলিতেছি যে, দেশের যে-আত্মাভিমান আমাদের শক্তিকে সম্মুখের দিকে ঠেলা দিতেছে তাকে বলি সাধু, কিন্তু যে-আত্মাভিমান পিছনের দিকের অচল-খোঁটায় আমাদের বলির পাঁঠার মত বাঁধিতে চায় তাকে বলি ধিক্! এই আত্মাভিমানে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, "রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্ত্তৃত্বসভায় আমাদের আসন পাতা চাই," আবার সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি, "খবরদার, ধর্ম্মতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, এমন কি, ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্ত্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না,"—ইহাকেই বলি হিন্দুয়ানির পুনরুজ্জীবন। দেশাভিমানের তরফ হইতে আমাদের উপর হুকুম আসিল, আমাদের এক চোখ জাগিবে আর-এক চোখ ঘুমাইবে। এমন হুকুম তামিল করাই দায়।

বিধাতার শাস্তিতে আমাদের পিঠের উপর যখন বেত পড়িল তখন দেশাভিমান ধড়ফড়্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওপ্ড়াও ঐ বেত-বনটাকে!" ভুলিয়া গেছে বেত-বনটা গেলেও বাঁশ-বনটা আছে। অপরাধ বেতেও নাই, বাঁশেও নাই, আছে আপনার মধ্যেই। অপরাধটা এই যে, সত্যের জায়গায় আমরা কর্ত্তাকে মানি, চোখের চেয়ে চোখের ঠুলিকে শ্রদ্ধা করাই আমাদের চিরাভ্যাস। যতদিন এমনি চলিবে ততদিন কোনো-না-কোনো ঝোপে ঝাড়ে বেত-বন আমাদের জন্য অমর হইয়া থাকিবে।

সমাজের সকল বিভাগেই ধর্ম্মতন্ত্রের শাসন একসময় য়ুরোপেও প্রবল ছিল। তারই বেড়-জালটাকে কাটিয়া যখন বাহির হইল তখন হইতেই সেখানকার জনসাধারণ আত্মকর্ত্তৃত্বের পথে যথেষ্ট লম্বা করিয়া পা ফেলিতে পারিল। ইংরেজের দ্বৈপায়নতা ইংরেজের পক্ষে একটা বড় সুযোগ ছিল। কেননা য়ুরোপীয় ধর্ম্মতন্ত্রের প্রধান আসন রোমে। সেই রোমের পূর্ণপ্রভাব অস্বীকার করা বিচ্ছিন্ন ইংলণ্ডের পক্ষে কঠিন হয় নাই। ধর্ম্মতন্ত্র বলিতে যা বোঝায় ইংলণ্ডে আজো তার কোনো চিহ্ন নাই এমন কথা বলি না। কিন্তু বড়ঘরের গৃহিণী বিধবা হইলে যেমন হয় তার অবস্থা তেমনি। এক সময়ে যাদের কাছে সে নথ-নাড়া দিয়াছে, দায়ে অভাবে আজ তাদেরই মন জোগাইয়া চলে; পাশের ঘরে তার বাসের জায়গা, খোরপোষের জন্য সামান্য কিছু মাসহারা বরাদ্দ। হালের ছেলেরা পূর্ব্ব-দস্তুরমত বুড়িকে হপ্তায় হপ্তায় প্রণাম করে বটে কিন্তু মান্য করে না। এই গৃহিণীর দাব-রাব যদি পূর্ব্বের মত থাকিত তবে ছেলে-মেয়েদের কারো আজ টুঁ শব্দ করিবার জো থাকিত না।

ইংলণ্ড এই বুড়ির শাসন অনেকদিন হইল কাটাইয়াছে, কিন্তু স্পেন এখনো সম্পূর্ণ কাটায় নাই। একদিন স্পেনের পালে খুব জোর হাওয়া লাগিয়াছিল; সেদিন পৃথিবীর ঘাটে ঘাটায় সে আপনার জয়ধ্বজা উড়াইল। কিন্তু তার হালটার দিকে সেই বুড়ি বসিয়া ছিল, তাই আজ সে একেবারে পিছাইয়া পড়িয়াছে। প্রথম দমেই সে এতটা দৌড় দিল, তবু একটু পরেই সে যে আর দম রাখিতে পারিল না, তার কারণ কি? তার কারণ, বুড়িটা বরাবর ছিল তার কাঁধে চড়িয়া। অনেক দিন আগেই সেদিন স্পেনের হাঁপের লক্ষণ দেখা যায়, যেদিন ইংরেজের সঙ্গে স্পেনের রাজা ফিলিপের নৌযুদ্ধ বাধিল। সেদিন হঠাৎ ধরা পড়িল স্পেনের ধর্ম্মবিশ্বাসও যেমন সনাতন প্রথায় বাঁধা, তার নৌ-যুদ্ধবিদ্যাও তেমনি। ইংরেজের যুদ্ধজাহাজ চঞ্চল জল-হাওয়ার নিয়মকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল, কিন্তু স্পেনীয়দের যুদ্ধজাহাজ নিজের অচল বাঁধি নিয়মকে ছাড়িতে পারে নাই। যার নৈপুণ্য বেশি তার কৌলীন্য যেমনি থাক্ সে ইংরেজ যুদ্ধজাহাজের সর্দ্দার হইতে পারিত, কিন্তু কুলীন ছাড়া স্পেনীয় রণতরীর পতিপদে কারো অধিকার ছিল না।

আজ য়ুরোপের ছোটোবড় যে-কোনো দেশেই জনসাধারণ মাথা তুলিতে পারিয়াছে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মতন্ত্রের অন্ধ কর্ত্তৃত্ব আল্‌গা হইয়া মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। গণ-সমাজে যেখানে এই শ্রদ্ধা নাই—যেমন রাশিয়ায়—সেখানকার সমাজ বেওয়ারিশ ক্ষেত্রের মত নানা কর্ত্তার কাঁটাগাছের জঙ্গল হইয়া ওঠে। সেখানে একালের পেয়াদা হইতে সেকালের পুঁথি পর্য্যন্ত সকলেই মনুষ্যত্বের কান মলিয়া অন্যায় খাজনা আদায় করে।

মনে রাখা দরকার, ধর্ম্ম আর ধর্ম্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্ম্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লী করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধুধু করে।

তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।

ধর্ম্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারো কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দ্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁৎ করিয়া না মানো তবে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক্, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ-কর্ম্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম্ম বলে, সাগর গিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্ম্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খৎ দিতে হইবে। ধর্ম্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ, সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্ম্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড় অভাজনই হোক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্ম্মতন্ত্র।

আমি জানি একদিন একজন রাজা কলিকাতায় আর-এক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাঁর তিনি কালেজে পাশ-করা সুশিক্ষিত। অতিথি যখন দেখা সারিয়া গাড়িতে উঠিবেন এমন সময় বাড়ি যাঁর তিনি রাজার কাপড় ধরিয়া টানিলেন, বলিলেন—"আপনার মুখে পান!" গাড়ি যাঁর তিনি দায়ে পড়িয়া মুখের পান ফেলিলেন, কেননা সারথী মুসলমান। এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারই নাই, "সারথী যেই হোক্ মুখের পান ফেলা যায় কেন?" ধর্ম্মবুদ্ধিতে বা কর্ম্মবুদ্ধিতে কোথাও কিছুমাত্র আটক না খাইলেও গাড়িতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে পান খাইবার স্বাধীনতাটুকু যে-দেশের মানুষ অনায়াসে বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, সে-দেশের লোক স্বাধীনতার অন্ত্যেষ্টি-সৎকার করিয়াছে। অথচ দেখি যারা গোড়ায় কোপ দেয় তারাই আগায় জল ঢালিবার জন্য ব্যস্ত।

নিষ্ঠা পদার্থের একটা শোভা আছে। কোনো কোনো বিদেশী এদেশে আসিয়া সেই শোভায় ব্যাখ্যা করেন। এটাকে বাহির হইতে তাঁরা সেই-ভাবেই দেখেন একজন আর্টিষ্ট পুরানো ভাঙা বাড়ির চিত্রযোগ্যতা যেমন করিয়া দেখে,—তার বাসযোগ্যতার খবর লয় না! স্নানযাত্রার পরবে বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিতে গঙ্গাস্নানের যাত্রী দেখিয়াছি, তার বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক। ষ্টীমারের ঘাটে ঘাটে, রেলোয়ের ষ্টেশনে ষ্টেশনে তাদের কষ্টের অপমানের সীমা ছিল না। বাহিরের দিক হইতে এই ব্যাকুল সহিষ্ণুতার সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অন্তর্যামী এই অন্ধ নিষ্ঠার সৌন্দর্য্যকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি পুরস্কার দিলেন না, শাস্তিই দিলেন। দুঃখ বাড়িতেই চলিল। এই মেয়েরা মানৎ-স্বস্ত্যয়নের বেড়ার মধ্যে যে-সব ছেলে মানুষ করিয়াছে ইহকালের সমস্ত বস্তুর কাছেই তারা মাথা হেঁট করিল এবং পরকালের সমস্ত ছায়ার কাছেই তারা মাথা খুঁড়িতে লাগিল। নিজের কাজের বাধাকে রাস্তার বাঁকে-বাঁকে গাড়িয়া দেওয়াই এদের কাজ, এবং নিজের উন্নতির অন্তরায়কে আকাশ-পরিমাণ উঁচু করিয়া তোলাকেই এরা বলে উন্নতি। সত্যের জন্য মানুষ কষ্ট সহিবে এইটেই সুন্দর। কাণা-বুদ্ধি কিম্বা খোঁড়া-শক্তির হাত হইতে মানুষ লেশমাত্র কষ্ট যদি সয় তবে সেটা কুদৃশ্য। কারণ বিধাতা আমাদের সবচেয়ে বড় যে-সম্পদ দিয়াছেন—ত্যাগ স্বীকারের বীরত্ব—এই কষ্ট তারই বেহিসাবী বাজে খরচ। আজ তারই নিকাস আমাদের চলিতেছে—ইহার ঋণের ফর্দ্দটাই মোটা। চোখের সামনে দেখিয়াছি হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ পুণ্যের সন্ধানে যে-পথ দিয়া স্নানে চলিয়াছে ঠিক তারই ধারে মাটিতে পড়িয়া একটি বিদেশী রোগী মরিল, সে কোন্ জাতের মানুষ জানা ছিল না বলিয়া কেহ তাহাকে ছুঁইল না। এই ত ঋণদায়ে দেউলিয়ার লক্ষণ। এই কষ্টসহিষ্ণু পুণ্যকামীদের নিষ্ঠা দেখিতে সুন্দর কিন্তু ইহার লোকসান সর্ব্বনেশে। যে অন্ধতা মানুষকে পুণ্যের জন্য জলে স্নান করিতে ছোটায়, সেই অন্ধতাই তাকে অজানা মুমূর্ষুর সেবায় নিরস্ত করে। একলব্য পরম নিষ্ঠুর দ্রোণাচার্য্যকে তার বুড়া আঙুল কাটিয়া দিল, কিন্তু এই অন্ধ নিষ্ঠার দ্বারা সে নিজের চিরজীবনের তপস্যাফল হইতে তার সমস্ত আপন জনকে বঞ্চিত করিয়াছে। এই যে মূঢ় নিষ্ঠার নিরতিশয় নিষ্ফলতা, বিধাতা

ইহাকে সমাদর করেন না—কেননা ইহা তাঁর দানের অবমাননা। গয়াতীর্থে দেখা গেছে, যে-পাণ্ডার না আছে বিদ্যা না আছে চারিত্র, ধনী স্ত্রীলোক রাশি রাশি টাকা ঢালিয়া দিয়া তার পা পূজা করিয়াছে। সেই সময়ে তার ভক্তিবিহ্বলতা ভাবুকের চোখে সুন্দর, কিন্তু এই অবিচলিত নিষ্ঠা, এই অপরিমিত বদান্যতা কি সত্য দয়ার পথে এই স্ত্রীলোককে এক-পা অগ্রসর করিয়াছে? ইহার উত্তর এই যে, তবু ত সে টাকাটা খরচ করিতেছে; সে যদি পাণ্ডাকে পবিত্র বলিয়া না মানিত তবে টাকা খরচ করিতই না, কিম্বা নিজের জন্য করিত। সে কথা ঠিক,—কিন্তু তার একটা মস্ত লাভ হইত এই যে, সেই খরচ-না-করাটাকে কিম্বা নিজের জন্য খরচ-করাটাকে সে ধর্ম্ম বলিয়া নিজেকে ভোলাইত না,—এই মোহের দাসত্ব হইতে তার মন মুক্ত থাকিত। মনের এই মুক্তির অভাবেই দেশের শক্তি বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। কেননা যাকে চোখ বুজিয়া চালানো অভ্যাস করানো হইয়াছে, চোখ খুলিয়া চলিতে তার পা কাঁপে; অনুগত দাসের মত যে কেবল মনিবের জন্যই প্রাণ দিতে শিখিয়াছে, আপনি প্রভু হইয়া স্বেচ্ছায় ন্যায়ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য।

এই জন্যই আমাদের পাড়াগাঁয়ে অন্ন জল স্বাস্থ্য শিক্ষা আনন্দ সমস্ত আজ ভাঁটার মুখে। আত্মশক্তি না জাগাইতে পারিলে পল্লীবাসীর উদ্ধার নাই—এই কথা মনে করিয়া, নিজের কল্যাণ নিজে করিবার শক্তিকে একটা বিশেষ পাড়ায় জাগাইবার চেষ্টা করিলাম। একদিন পাড়ায় আগুন লাগিল; কাছে কোথাও এক ফোঁটা জল নাই; পাড়ার লোক দাঁড়াইয়া হায় হায় করিতেছে। আমি তাদের বলিলাম, "নিজের মজুরী দিয়া যদি তোমরা পাড়ায় একটা কুয়ো খুঁড়িয়া দাও আমি তার বাঁধাইবার খরচা দিব।" তারা ভাবিল, "পুণ্য হইবে ঐ সেয়ানা লোকটার, আর তার মজুরী জোগাইব আমরা, এটা ফাঁকি!" সে কুয়ো খোঁড়া হইল না, জলের কষ্ট রহিয়া গেল, আর আগুনের সেখানে বাঁধা নিমন্ত্রণ।

এই যে অদ্ভুত দুর্দশা, এর কারণ—গ্রামের যা-কিছু পূর্ত্তকার্য্য তা এ পর্য্যন্ত পুণ্যের প্রলোভনে ঘটিয়াছে। তাই মানুষের সকল অভাবই পূরণ করিবার বরাৎ হয় বিধাতার পরে নয় কোনো আগন্তুকের উপর। পুণ্যের উমেদার যদি উপস্থিত না থাকে তবে এরা জল না-খাইয়া মরিয়া গেলেও নিজের হাতে এক কোদাল মাটি কাটিবে না। কেননা এরা এখনো সেই বুড়ির কোল থেকে নামে নাই যে-বুড়ি এদের জাতিকুল ধর্ম্মকর্ম্ম ভালোমন্দ, শোওয়া-বসা সমস্তই বাহির হইতে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইহাদের দোষ দিতে পারি না, কেননা, বুড়ি এদের মনটাকেই আফিম খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন দেখি, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন কি, কালেজের তরুণ ছাত্রেরাও এই বুড়িতন্ত্রের গুণ গাহিতেছেন। ভারতবর্ষকে সনাতন ধাত্রীর কাঁখে চড়িতে দেখিয়া ইঁহাদের ভারি গর্ব্ব—বলেন, ওটা বড় উচ্চ জায়গা, ওখান হইতে পা মাটিতেই পড়ে না; বলেন, ঐ কাঁখে থাকিয়াই আত্মকর্ত্তৃত্বের রাজদণ্ড হাতে ধরিলে বড় শোভা হইবে।

অথচ স্পষ্ট দেখি, দুঃখের পর দুঃখ, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ; যমলোকের যতগুলি চর আছে সবগুলিই আমাদের ঘরে ঘরে বাসা লইল। বাঘে ডাকাতে তাড়া করিলেও যেমন আমাদের অস্ত্র তুলিবার হুকুম নাই তেমনি এই অমঙ্গল-গুলো লাফ দিয়া যখন ঘাড়ের উপর দাঁত বসাইতে আসে তখন দেখি সামাজিক বন্দুকের পাশ নাই। ইহাদিগকে খেদাইবার অস্ত্র জ্ঞানের অস্ত্র, বিচার-বুদ্ধির অস্ত্র। বুড়ির শাসনের প্রতি যাঁদের ভক্তি অটল তাঁরা বলেন, "ঐ অস্ত্রটা কি আমাদের একেবারে নাই? আমরাও সায়ান্স শিখিব এবং যতটা পারি খাটাইব।" অস্ত্র একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয়, কিন্তু অস্ত্র-পাসের আইনটা বিষম কড়া। অস্ত্র ব্যবহার করিতে দিয়াও যতটা না-দিতে পারা যায় তারই উপর ষোলআনা ঝোঁক। ব্যবহারের গণ্ডি এতই, তার একটু এদিক্-ওদিক্ হইলেই এত দুর্জ্জয় কানমলা; সমস্ত গুরু পুরোহিত, তাগাতাবিজ, সংস্কৃত শ্লোক ও মেয়েলি মন্ত্র এত ভয়ে ভয়ে সাবধানে বাঁচাইয়া চলিতে হয় যে, ডাকাত পড়িলে ডাকাতের চেয়ে অনভ্যাসের বন্দুকটা লইয়াই ফাঁপরে পড়িতে হয়।

যাই হোক্, "পায়ের বেড়িটা অক্ষয় হোক্" বলিয়াই যখন আশীর্ব্বাদ করা হইল তখন দয়ালু লোক এ-কথাও বলিতে বাধ্য যে, "মানুষদের কাঁধে করিয়া বেড়াইতে

প্রস্তুত হও!" যতরাজ্যের জাতের বেড়া, আচারের বেড়া মেরামত করিয়া পাকা করাই যদি পুনরুজ্জীবন হয়, যদি এমনি করিয়া জীবনের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত ও বুদ্ধির ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করাই আমাদের গৌরবের কথা হয়—তবে সেই-সঙ্গে এ-কথাও বলিতে হয়, এই অক্ষমদের দুই বেলা লালন করিবার জন্য দল বাঁধো। কিন্তু দুই বিপরীত কুলকে এক-সঙ্গে বাঁচাইবার সাধ্য কোনো শক্তিমানেরই নাই। তৃষার্ত্তের ঘড়া-ঘটি সমস্ত চুরমার করিবে, তার পরে চালুনি দিয়া জল আনিতে ঘন ঘন ঘাটে-ঘরে আনাগোনা, এ আবদার বিধাতার সহ্য হয় না!

অনেকে বলেন, এদেশে পদে পদে এত যে দুঃখ দারিদ্র্য তার মূল কারণ এখানকার সম্পূর্ণ শাসনভার পরজাতির উপর। কথাটাকে বিচার করিয়া দেখা দরকার।

ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির মূলতত্ত্বই, রাষ্ট্রতন্ত্রের সঙ্গে প্রজাদের শক্তির যোগ। এই রাষ্ট্রতন্ত্র চিরদিনই একতরফা আধিপত্যের বুকে শেল হানিয়াছে, এ-কথা আমাদের কাছেও কিছুমাত্র ঢাকা নাই। এই কথাই সরকারী বিদ্যালয়ে আমরা সদরে বসিয়া পড়ি, শিখি, এবং পড়িয়া এগ্‌জামিন পাশ করি। এ-কথাটাকে আমাদের কাছ হইতে ফিরাইয়া লইবার উপায় নাই।

কন্‌গ্রেস বল, লীগ্‌ বল, এ-সমস্তর মূলই এইখানে। যেমন য়ুরোপীয় সায়ান্সে আমাদের সকলেরই অধিকারটা সেই সায়ান্সেরই প্রকৃতিগত, তেমনি ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রে ভারতের প্রজার আপন অধিকার সেই রাষ্ট্রনীতিরই জীবন-ধর্ম্মের মধ্যেই। কোনো একজন বা দশজন বা পাঁচশো-জন ইংরেজ বলিতে পারে ভারতীয় ছাত্রকে সায়ান্স শিখিবার সুযোগটা না দেওয়াই ভাল, কিন্তু সায়ান্স সেই পাঁচশো ইংরেজের কণ্ঠকে লজ্জা দিয়া বজ্রস্বরে বলিবে, "এস তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হোক্‌, তোমাদের দেশ যেখানেই থাক্‌, আমাকে গ্রহণ করিয়া শক্তি লাভ কর।" তেমনি কোনো দশজন বা দশহাজার জন ইংরেজ রাজ-সভার মঞ্চে বা খবরের কাগজের স্তম্ভে চড়িয়া বলিতেও পারে, যে, ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার কর্তৃত্বকে নানাপ্রকারে প্রবেশে বাধা দেওয়াই ভালো, কিন্তু সেই দশহাজার ইংরেজের মন্ত্রণাকে তিরস্কার করিয়া ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি বজ্রস্বরে বলিতেছে, "এস তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হোক্‌ তোমাদের দেশ যেখানেই থাক্‌, ভারত-শাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার আপন অধিকার আছে, তাহা গ্রহণ কর!"

কিন্তু ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি আমাদের বেলায় খাটে না এমন একটা কড়া জবাব শুনিবার আশঙ্কা আছে। ভারত-বর্ষে ব্রাহ্মণ যেমন বলিয়াছিল, উচ্চতর জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে শূদ্রের অধিকার নাই, এও সেই-রকমের কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ এই অধিকারভেদের ব্যবস্থাটাকে আগাগোড়া পাকা করিয়া গাঁথিয়াছিল—যাহাকে বাহিরে পঙ্গু করিবে তার মনকেও পঙ্গু করিয়াছিল। জ্ঞানের দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কর্ম্মের দিকে ডালপালা আপুনি শুকাইয়া যায়। শূদ্রের সেই জ্ঞানের শিকড়টা কাটিতেই আর বেশী কিছু করিতে হয় নাই—তার পর হইতে তার মাথাটা আপনিই নুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজে আসিয়া ঠেকিয়া রহিল। ইংরেজ আমাদের জ্ঞানের দ্বার বন্ধ করে নাই,—অথচ সেইটেই মুক্তির সিংহদ্বার। রাজপুরুষেরা সেজন্য বোধ করি মনে মনে আপ্‌সোস্‌ করেন এবং আস্তে আস্তে বিদ্যালয়ের দুটো একটা জানলাদরজাও বন্ধ করিবার গতিক দেখি,—কিন্তু তবু একথা তাঁরা কোনোদিন একেবারে ভুলিতে পারিবেন না যে, সুবিধার খাতিরে নিজের মনুষ্যত্বকে আঘাত করিলে ফলে সেটা আত্মহত্যার মতই হয়।

ভারতশাসনে আমাদের ন্যায্য অধিকারটা ইংরেজের মনস্তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত—এই আশার কথাটাকে যদি আমাদের শক্তি দিয়া ধরিতে পারি তবে ইহার জন্য বিস্তর দুঃখ সহা, ত্যাগ করা, আমাদের পক্ষে সহজ হয়। যদি আমাদের দুর্ব্বল অভ্যাসে বলিয়া বসি, কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, ওর আর নড়চড় নাই, তবে যে সুগভীর নৈরাশ্য আসে, তার দুই-রকমের প্রকাশ দেখিতে পাই;—হয় গোপনে চক্রান্ত করিয়া আকস্মিক উপদ্রবের বিস্তার করিতে থাকি, নয় ঘরের কোণে বসিয়া পরস্পরের কানে-কানে বলি—অমুক লাটসাহেব ভালো কিম্বা মন্দ, অমুক ব্যক্তি মন্ত্রী-সভায় সচিব থাকিতে আমাদের কল্যাণ নাই, মর্লি সাহেব ভারতসচিব হইলে হয় ত আমাদের সুদিন হইবে নয় ত আমাদের ভাগ্যে এই বিড়াল বনে গিয়া বনবিড়াল হইয়া

উঠিবে। অর্থাৎ নৈরাশ্যে, হয় আমাদের মাটির তলার সুরঙ্গের মধ্যে ঠেলিয়া শক্তির বিকার ঘটায়, নয় গৃহকোণের বৈঠকে বসাইয়া শক্তির ব্যর্থতা সৃষ্টি করে; হয় উন্মাদ করিয়া তোলে, নয় হাবা করিয়া রাখে।

কিন্তু মনুষ্যত্বকে অবিশ্বাস করিব না,—এমন জোরের সঙ্গে চলিব, যেন ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কেবল শক্তিই সত্য নহে, নীতি তার চেয়ে বড় সত্য। প্রতিদিন তার বিরুদ্ধতা দেখিব; দেখিব স্বার্থপরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, লোভ, ক্রোধ, ভয় ও অহঙ্কার সমস্তরই লীলা চলিতেছে, কিন্তু মানুষের এই রিপুগুলো সেইখানেই আমাদের মারে, যেখানে আমাদের অন্তরেও রিপু আছে, যেখানে আমরাও ক্ষুদ্র ভয়ে ভীত, ক্ষুদ্র লোভে লুব্ধ, যেখানে আমাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ অবিশ্বাস। যেখানে আমরা বড়, আমরা বীর, আমরা ত্যাগী তপস্বী শ্রদ্ধাবান, সেখানে অন্যপক্ষে যাহা মহৎ তার সঙ্গে আমাদের সত্য যোগ হয়,—সেখানে অন্য পক্ষের রিপুর মার খাইয়াও তবু আমরা জয়ী হই, বাহিরে না হইলেও অন্তরে। আমরা যদি ভীতু হই, ছোটো হই, তবে ইংরেজ গবর্মেণ্টের নীতিকে খাটো করিয়া তার রিপুটাকেই প্রবল করিব। যেখানে দুইপক্ষ লইয়া কারবার সেখানে দুই পক্ষের শক্তির যোগেই শক্তির উৎকর্ষ, দুই পক্ষের দুর্ব্বলতার যোগে চরম দুর্ব্বলতা। অব্রাহ্মণ যখনি জোড়হাতে অধিকারহীনতা মানিয়া লইল, ব্রাহ্মণের অধঃপতনের গর্ত্তটা তখনি গভীর করিয়া খোঁড়া হইল। সবল দুর্ব্বলের পক্ষে যতবড় শত্রু, দুর্ব্বল সবলের পক্ষে তার চেয়ে কম বড় শত্রু নয়।

একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা প্রায়ই বল পুলিস তোমাদের পরে অত্যাচার করে, আমিও তা অবিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমরা ত তার প্রমাণ দাও না।" বলা বাহুল্য, পুলিসের সঙ্গে লাঠালাঠি মারামারি কর একথা তিনি বলেন না। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই ত গায়ের জোরে নয়, সে ত তেজের লড়াই, সে তেজ কর্ত্তব্যবুদ্ধির। দেশকে নিরন্তর পীড়ন হইতে বাঁচাইবার জন্য একদল লোকের ত বুকের পাটা থাকা চাই, অন্যায়কে তারা প্রাণপণে প্রমাণ করিবে, পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিবে। জানি, পুলিসের একজন চৌকিদারও একজন মানুষমাত্র নয়, সে একটা প্রকাণ্ড শক্তি। একটি পুলিসের পেয়াদাকে বাঁচাইবার জন্য মকদ্দমায় গবর্মেণ্টের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ আদালৎ-মহাসমুদ্র পার হইবার বেলায় পেয়াদার জন্য সরকারী ষ্টীমার, আর গরীব ফরিয়াদীকে তুফানে সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে, একখানা কলার ভেলাও নাই। এ যেন একরকম স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া, "বাপু, মার যদি খাও তবে নিঃশব্দে মরাটাই অতীব স্বাস্থ্যকর।" এর পরে আর হাত পা চলে না। প্রেষ্টিজ্! ওটা যে আমাদের অনেকদিনের চেনা লোক। ঐ ত কর্ত্তা, ঐ ত আমাদের কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ঐ ত বেহুলাকাব্যের মনসা, ন্যায় ধর্ম্ম সকলের উপরে ওকেই ত পূজা দিতে হইবে, নহিলে হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে! অতএব

> যা দেবী রাজ্যশাসনে
> প্রেষ্টিজ-রূপেণ সংস্থিতা
> নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
> নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

কিন্তু ইহাই ত অবিদ্যা, ইহাই ত মায়া। যেটা স্থূল-চোখে প্রতীয়মান হইতেছে তাই কি সত্য? আসল সত্য আমাকে লইয়াই গবর্মেণ্ট। এই সত্য সমস্ত রাজপুরুষের চেয়ে বড়। এই সত্যের উপরই ইংরেজ বলী—সেই বল আমারও বল। ইংরেজ গবর্মেণ্টও এই সত্যকে হারায়, যদি এই সত্যের বল আমার মধ্যেও না থাকে। আমি যদি ভীরু হই, ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রের নীতিতত্ত্বে আমার যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে পুলিস অত্যাচার করিবেই, ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে সুবিচার কঠিন হইবেই, প্রেষ্টিজ্-দেবতা নর-বলি দাবী করিতেই থাকিবে এবং ইংরেজের শাসন ইংরেজের চিরকালীন ঐতিহাসিক ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিবে।

এ কথার উত্তরে শুনিব "রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতিই শক্তির চেয়ে সত্য এই কথাটাকে পারমার্থিকভাবে মানা চলে কিন্তু ব্যবহারিকভাবে মানিতে গেলে বিপদ আছে, অতএব হয় গোপনে পরম-নিঃশব্দ গরম পন্থা—নয়ত প্রেস্ এক্টের মুখ-থাবার নীচে পরম-নিঃশব্দ নরম পন্থা!"

"হাঁ, বিপদ আছে বই কি, তবু জ্ঞানে যা সত্য, ব্যবহারেও তাকে সত্য করিব।"

"কিন্তু আমাদের দেশের লোকেই ভয়ে কিম্বা লোভে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না, বিরুদ্ধেই দিবে।"

"এ কথাও ঠিক। তবু সত্যকে মানিয়া চলিতে হইবে!"

"কিন্তু আমাদের দেশের লোকেই প্রশংসা কিম্বা পুরস্কারের লোভে ঝোপের মধ্য হইতে আমার মাথায় বাড়ি মারিবে।"

"একথাও ঠিক! তবুও সত্যকে মানিতে হইবে।"

"এতটা কি আশা করা যায়?"

হাঁ, এতটাই আশা করিতে হইবে, ইহার একটুকুও কম নয়! গবর্মেণ্টের কাছ হইতেও আমরা বড় দাবীই করিব, কিন্তু নিজেদের কাছ হইতে তার চেয়ে আরো বড় দাবী করিতে হইবে, নহিলে অন্য দাবী টিঁকিবে না। এ কথা মানি, সকল মানুষই বলিষ্ঠ হয় না এবং অনেক মানুষই দুর্ব্বল; কিন্তু সকল বড় দেশেই প্রত্যেক দিনই অনেকগুলি করিয়া মানুষ জন্মেন যাঁরা সকল মানুষের প্রতিনিধি—যাঁরা সকলের দুঃখকে আপনি বহেন, সকলের পথকে আপনি কাটেন, যাঁরা সমস্ত বিরুদ্ধতার মধ্যেও মনুষ্যত্বকে বিশ্বাস করেন এবং ব্যর্থতার গভীরতম অন্ধকারের পূর্ব্ব-প্রান্তে অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকেন। তাঁরা অবিশ্বাসীর সমস্ত পরিহাসকে উপেক্ষা করিয়া জোরের সঙ্গে বলেন—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে যদি স্বল্পমাত্রও ধর্ম্ম থাকে তবে পরিধির দিকে রাশি রাশি ভয়কেও ভয় করিবার দরকার নাই। রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতি যদি কোনোখানেও থাকে তবে তাহাকেই নমস্কার—ভীতিকে নয়, ভীতিকে নয়! ধর্ম্ম আছে, অতএব মরা পর্য্যন্ত মানিয়াও তাহাকে মানিতে হইবে।

মনে কর ছেলের শক্ত ব্যামো। সেজন্য দূর হইতে স্বয়ং ইংরেজ সিভিল সার্জ্জনকে আনিয়াছি। খরচ বড় কম করি নাই। যদি হঠাৎ দেখি তিনি মন্ত্র পড়িয়া মারিয়া-ধরিয়া ভূতের ওঝার মত বিষম ঝাড়াঝুড়ি সুরু করিলেন, রোগীর আত্মাপুরুষ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল, তবে ডাক্তারকে জোর করিয়াই বলিব,—"দোহাই সাহেব, ভূত ঝাড়াইবেন না, চিকিৎসা করুন।" তিনি চোখ রাঙাইয়া বলিতে পারেন, "তুমি কে হে! আমি ডাক্তার, যাই করিনা তাই ডাক্তারি!" ভয়ে যদি বুদ্ধি দমিয়া না যায় তবে তাকে আমার একথা বলিবার অধিকার আছে "যে ডাক্তারি তত্ত্ব লইয়া তুমি ডাক্তার আমি তাকে তোমার চেয়ে বড় বলিয়াই জানি, তার মূল্যেই তোমার মূল্য!"

এই যে অধিকার এর সকলের চেয়ে বড় জোর ঐ ডাক্তার সম্প্রদায়েরই ডাক্তারিশাস্ত্রে এবং ধর্ম্মনীতির মধ্যে। ডাক্তার যতই আস্ফালন করুক এই বিজ্ঞান এবং নীতির দোহাই মানিলে লজ্জা না পাইয়া সে থাকিতেই পারে না। এমন কি, রাগের মুখে সে আমাকে ঘুষিও মারিতে পারে—কিন্তু তবু আস্তে আস্তে আমার সেলাম এবং সেলামিটি পকেটে করিয়া গাড়ীতে বসার চেয়ে এই ঘুষির মূল্য বড়। এই ঘুষিতে সে আমাকে যত মারে, নিজেকে তার চেয়ে বেশি মারে। তাই বলিতেছি, যে-কথাটা ইংরেজের কথা নয়, কেবলমাত্র ইংরেজ আমলাদের কথা, সে-কথায় যদি আমরা সায় না দিই তবে আজ দুঃখ ঘটিতে পারে কিন্তু কাল দুঃখ কাটিবে।

দেড়শো বছর ভারতে ইংরেজ-শাসনের পর আজ এমন কথা শোনা গেল, মাদ্রাজ গবর্মেণ্ট ভালোমন্দ যাই করুক বাংলা দেশে তা লইয়া দীর্ঘনিশ্বাসটি ফেলিবার অধিকার বাঙালীর নাই। এতদিন এই জানিতাম, ইংরেজের অখণ্ড শাসনে মাদ্রাজ বাংলা পাঞ্জাব মারাঠা ভিতরে বাহিরে এক হইয়া উঠিতেছে, এই গৌরবই ইংরেজ সাম্রাজ্যের মুকুটের কোহিনুর মণি। বেল্‌জিয়ম ও ফ্রান্সের দুর্গতিকে আপন দুর্গতি মনে করিয়া ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে, সমুদ্রের পশ্চিম-পারে যখন এই বার্ত্তা, তখন সমুদ্রের পূর্ব্ব-পারে এমন নীতি কি একদিনো খাটিবে যে, মাদ্রাজের ভালোমন্দ সুখদুঃখে বাঙালীর কোনো মাথাব্যথা নাই? এমন হুকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব? একথা কি নিশ্চয় জানিনা যে, মুখে এই হুকুম যত জোরেই হাঁকা হউক, অন্তরে ইহার পিছনে একটা লজ্জা আছে? ইংরেজের সেই অন্যায়ের গোপন লজ্জা আর আমাদের মনুষ্যত্বের প্রকাশ্য সাহস—এই দুয়ের মধ্যে মিল করিতে হইবে। ইংরেজ ভারতের কাছে সত্যে বদ্ধ; ইংরেজ য়ুরোপীয় সভ্যতার দায়িত্ব বহিয়া এই পূর্ব্ব দেশে আসিয়াছে; সেই সভ্যতার বাণীই তাহার প্রতিশ্রুতি-বাণী।

সেই দলিলকেই আমরা সবচেয়ে বড় দলিল করিয়া চলিব ;— এ কথা তাকে কখনই বলিতে দিব না যে ভারতবর্ষকে আমরা টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া মাছকাটা করিবার জন্যই সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি।

যে-জাতি কোনো বড় সম্পদ পাইয়াছে সে তাহা দেশে-দেশে দিকে-দিকে দান করিবার জন্যই পাইয়াছে। যদি সে কৃপণতা করে তবে সে নিজেকেই বঞ্চিত করিবে। য়ুরোপের প্রধান সম্পদ বিজ্ঞান, এবং জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ। এই সম্পদ এই শক্তি ভারতকে দিবার মহৎ দায়িত্বই ভারতে ইংরেজশাসনের বিধিদত্ত রাজ-পরোয়ানা। এই কথা শাসনকর্তাদের স্মরণ করাইবার ভার আমাদের উপরেও আছে। কারণ, দুই-পক্ষের যোগ না হইলে বিস্মৃতি ও বিকার ঘটে।

ইংরেজ নিজের ইতিহাসের দোহাই দিয়া এমন কথা বলিতে পারে—"জনসাধারণের আত্মকর্তৃত্বটি যে একটি মস্ত জিনিস তা আমরা নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া তবে বুঝিয়াছি এবং নানা সাধনার মধ্য দিয়া তবে সেটাকে গড়িয়া তুলিয়াছি।" একথা মানি। জগতে এক-এক অগ্রগামী দল এক-এক বিশেষ সত্যকে আবিষ্কার করে। সেই আবিষ্কারের গোড়ায় অনেক ভুল, অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ আছে। কিন্তু তার ফল যারা পায় তাহাদিগকে সেই ভুল সেই দুঃখের সমস্ত লম্বা রাস্তাটা মাড়াইতে হয় না। দেখিলাম, বাঙালীর ছেলে আমেরিকায় গিয়া হাতে-কলমে এঞ্জিন গড়িল এবং তার তত্ত্বও শিখিয়া লইল, কিন্তু আগুনে কাৎলি চড়ানো হইতে সুরু করিয়া ষ্টীম-এঞ্জিনের সমস্ত ঐতিহাসিক পালা যদি তাকে সারিতে হইত তবে সত্যযুগের পরমায়ু নহিলে তার কুলাইত না। য়ুরোপে যাহা গজাইয়া উঠিতে বহুযুগের রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় বাতাস লাগিল, জাপানে তাহা শিকড়-সুদ্ধ পুঁতিবার বেলায় বেশি সময় লাগে নাই। আমাদের চরিত্রে ও অভ্যাসে যদি কর্তৃশক্তির বিশেষ অভাব ঘটিয়া থাকে তবে আমাদেরই বিশেষ দরকার কর্তৃত্বের চর্চ্চা। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে কিছু নাই এটা যদি গোড়া হইতেই ধরিয়া লও, তবে তার মধ্যে কিছু যে আছে সেই আবিষ্কার কোনো কালেই হইবে না। আত্মকর্তৃত্বের সুযোগ দিয়া আমাদের ভিতরকার নূতন নূতন শক্তি আবিষ্কারের পথ খুলিয়া দাও—সেটাকে রোধ করিয়া রাখিয়া যদি আমাদের অবজ্ঞা কর এবং বিশ্বের কাছে চিরদিন অবজ্ঞাভাজন করিয়া রাখ তবে তার চেয়ে পরম শত্রুতা আর-কিছু হইতেই পারে না। ডাইনে বাঁয়ে দু'পা বাড়াইলেই যার মাথা ঠক্‌ করিয়া দেয়ালে গিয়া ঠেকে তার মনে কখনো কি সেই বড় আশা টিঁকিতেই পারে যার জোরে মানুষ সকল বিভাগে আপন মহত্ত্বকে প্রাণ দিয়াও সপ্রমাণ করে?

দেখিয়াছি, ইতিহাসে যখন প্রভাত হয় সূর্য্য তখন পূর্ব্বদিকে ওঠে বটে কিন্তু সেই-সঙ্গেই উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমেও আলো ছড়াইয়া পড়ে। এক-এক ইঞ্চি করিয়া ধাপে ধাপে যদি জাতির উন্নতি হইত তবে মহাকালকেও হার মানিতে হইত। মানুষ আগে সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে তার পরে সুযোগ পাইবে এই কথাটাই যদি সত্য হয় তবে পৃথিবীতে কোনো জাতিই আজ স্বাধীনতার যোগ্য হয় নাই। ডিমক্রেসির দেমাক্‌ করিতেছ! কিন্তু য়ুরোপের জনসাধারণের মধ্যে আজও প্রচুর বীভৎসতা আছে—সে-সব কুৎসার কথা ঘাঁটিতে ইচ্ছা করে না! যদি কোনো কর্ণধার বলিত এই-সমস্ত যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ডিমক্রেসি তার কোনো অধিকার পাইবে না, তবে বীভৎসতা ত থাকিতই, আবার সেই পাপের স্বাভাবিক প্রতিকারের উপায়ও চলিয়া যাইত।

তেমনি আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায়, দুর্ব্বলতা যথেষ্ট আছে, সে কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এককোণের বাতিটা মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর-এককোণের বাতি জ্বালাইবার দাবী নাই, এ কাজের কথা নয়। যে-দিকের যে সল্‌তে দিয়াই হোক্‌ আলো জ্বালাই চাই। আজ মনুষ্যত্বের দেয়ালি মহোৎসবে কোনো দেশই তার সব বাতি পুরা জ্বালাইয়া উঠিতে পারে নাই—তবু উৎসব চলিতেছে। আমাদের ঘরের বাতিটা কিছুকাল হইতে নিবিয়া গেছে—তোমাদের শিখা হইতে যদি ওটাকে জ্বালাইয়া লইতে যাই তবে তা লইয়া রাগারাগি করা কল্যাণের নহে। কেননা, ইহাতে তোমাদের আলো কমিবে না, এবং উৎসবের আলো বাড়িয়া উঠিবে।

উৎসবের দেবতা আজ আমাদিগকে ভিতর হইতে ডাকিতেছেন। পাণ্ডা কি আমাদের নিষেধ করিয়া

ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে? সে যে কেবল ধনী যজমান্‌কেই দেখিলে গদগদ হইয়া ওঠে, ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়ার নামে সে ষ্টেশন পর্য্যন্ত ছুটিয়া যায়—আর গরীবের বেলায় তার ব্যবহার উল্টা—এটা ত সহিবে না, দেবতা যে দেখিতেছেন। ইহাতে স্বয়ং অন্তর্যামী যদি লজ্জারূপে অন্তরে দেখা না দেন, তবে ক্রোধরূপে বাহির হইতে দেখা দিবেন।

কিন্তু আশার কারণটা উহাদের মধ্যেও আছে, আমাদের মধ্যেও আছে। বাঙালীকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি জানি আমাদের যুবকদের যৌবনধর্ম্ম কখনই চিরদিন ধারকরা বার্দ্ধক্যের মুখস পরিয়া বিজ্ঞ সাজিবে না। আবার আমরা ইংরেজের মধ্যেও এমন মহাত্মা বিস্তর দেখিলাম যাঁরা স্বজাতির কাছে লাঞ্ছনা সহিয়াও ইংরেজ ইতিহাস বৃক্ষের অমৃত ফলটি ভারতবাসীর অধিকারে আনিবার জন্য উৎসুক। আমাদের তরফেও আমরা তেমনি মানুষের মত মানুষ চাই যাঁরা বাহির হইতে দুঃখ এবং স্বজনদের নিকট হইতে ধিক্কার সহিতে প্রস্তুত, যাঁরা বিফলতার আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়াও মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র।

ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যার অনন্ত অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধূলায় মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাতে, বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, আত্মানং বিদ্ধি! আপনাকে জান।

আজ আমরা সম্মুখে দেখিলাম বৃহৎ এই মানুষের পৃথিবী, মহৎ এই মানুষের ইতিহাস। মানুষের মধ্যে ভূমাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি; শক্তির রথে চড়িয়া তিনি মহাকালের রাজপথে চলিয়াছেন, রোগ তাপ বিপদ মৃত্যু কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না, বিশ্বপ্রকৃতি বরমাল্যে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল, জ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় তিলকে তাঁর উচ্চললাট মহোজ্জ্বল, অতিদূর ভবিষ্যতের শিখরচূড়া হইতে তাঁর জন্য আগমনীর প্রভাত-রাগিণী বাজিতেছে। সেই ভূমা আজ আমার মধ্যেও আপনার আসন খুঁজিতেছেন! ওরে অকাল-জরা-জর্জ্জরিত, আত্ম-অবিশ্বাসী ভীরু, অসত্যভারাবনত মূঢ়, আজ ঘরের লোকদের লইয়া ক্ষুদ্র ঈর্ষায় ক্ষুদ্র বিদ্বেষে কলহ করিবার দিন নয়, আজ তুচ্ছ আশা তুচ্ছ পদমানের জন্য কাঙালের মত কাড়াকাড়ি করিবার সময় গেছে, আজ সেই মিথ্যা অহঙ্কার দিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিব না, যে অহঙ্কার কেবল আপন গৃহকোণের অন্ধকারেই লালিত হইয়া স্পর্দ্ধা করে, বিরাট বিশ্বসভার সম্মুখে যাহা উপহসিত লজ্জিত। অন্যকে অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদলাভের চেষ্টা অক্ষমের চিত্তবিনোদন, আমাদের তাহাতে কাজ নাই। যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষু,—সেই বহু শতাব্দীর আবর্জ্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন। সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে; আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে; তাহার ধূলিপুঞ্জে শুষ্কপত্রে সে আজিকার নূতনযুগের প্রভাতসূর্য্যকে ম্লান করিল, নব-নব-অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবনধর্ম্মকে অভিভূত করিয়া দিল, আজ নির্ম্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে, তবেই নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব, সেই মনুষ্যত্ব যে মৃত্যুঞ্জয়ী, যে চিরজাগরূক, চির সন্ধানরত, যে বিশ্বকর্ম্মার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানজ্যোতিরালোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগযুগের নবনব তোরণদ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশেদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।

বাহিরের দুঃখ শ্রাবণের ধারার মত আমাদের মাথার উপর নিরন্তর বর্ষিত হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখভোগের যে তামসিক অশুচিতা, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখকে বরণ করিয়া। সেই দুঃখই পবিত্র হোমাগ্নি,—সেই আগুনে পাপ পুড়িবে, মূঢ়তা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, জড়তা ছাই হইয়া মাটিতে মিশাইবে। এস, প্রভু, তুমি দীনের প্রভু নও! আমাদের মধ্যে যে অদীন, যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর তুমি তাঁহারই প্রভু—ডাক আজ তাহাকে তোমার রাজসিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে! দীন লজ্জিত হউক, দাস লাঞ্ছিত হউক, মূঢ় তিরস্কৃত হইয়া চির-নির্ব্বাসন গ্রহণ করুক্!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী ;
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি ।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে ?
লউক বিশ্বকর্ম্মভার মিলি সবার সাথে ।
প্রেরণ কর, ভৈরব, তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান ।

বিঘ্নবিপদ দুঃখদহন তুচ্ছ করিল যারা
মৃত্যুগহন পার হইল টুটিল মোহকারা ।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
নিশ্চল নির্ব্বীর্য্যবাহু কর্ম্মকীর্ত্তিহীনে
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান ।

নূতন-যুগ-সূর্য্য উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী ।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
গত গৌরব, হৃত আসন, নতমস্তক লাজে,
গ্লানি তার মোচন কর, নরসমাজ-মাঝে
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান ।

জনগণপথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি ।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা,
কোটীমৌনকণ্ঠপূর্ণ বাণী কর দান হে
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান ।

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তরমাঝে,
বর্জ্জিল ভয় অর্জ্জিল জয় সার্থক হল কাজে ।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
আত্মঅবিশ্বাস তার নাশ কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান অশনিপাতে,
ছায়াভয়চকিত মূঢ়, করহ পরিত্রাণ হে—
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

সাংখ্যদর্শনের প্রথম পৈঁটা হইতে যাত্রারম্ভ

সাংখ্যের প্রকল্পিত প্রকৃতি-সোপানের প্রথম পৈঁটা হইতে পরপরবর্ত্তী পৈঁটায় পদনিক্ষেপ করিতে-যাইবার পূর্ব্বে—পঁইটা-গুলা কয়-শ্রেণীতে বিভক্ত, আর, এক-এক-শ্রেণীর পৈঁটার সহিত আর-আর শ্রেণীর পৈঁটার সম্বন্ধসূত্রই বা কিরূপ ; পুরুষ এবং প্রকৃতির মধ্যেই বা সম্বন্ধসূত্র কিরূপ ; এই কয়েকটি বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক-বোধে তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে ।

সাংখ্যের পরিভাষায়—

কার্য্য = বিকৃতি ; কারণ = প্রকৃতি ;

মূল কারণ = মূল প্রকৃতি = প্রধান ।

এমতে দাঁড়াইতেছে যে, প্রধান কাহারো কার্য্য নহে, আর, সেইজন্য—

প্রধান = প্রকৃতি-মাত্র = কারণ-মাত্র । পরন্তু বুদ্ধি এক-দিকে, যেমন, প্রকৃতির **কার্য্য**, আর-একদিকে, তেম্নি অহঙ্কারের **কারণ** ; অহঙ্কার একদিকে, যেমন, বুদ্ধির **কার্য্য**, আর-একদিকে, তেম্নি, মনঃপ্রধান একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রের **কারণ** ; পঞ্চতন্মাত্র একদিকে, যেমন, অহঙ্কারের **কার্য্য**, আর-একদিকে, তেম্নি, পঞ্চভূতের **কারণ**। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, প্রকৃতি-সোপানের মাঝের এই যে-তিনটি ধাপ—

(১) বুদ্ধি, (২) অহঙ্কার, (৩) তন্মাত্র, এ-তিনটি

ধাপ কারণও বটে—কার্য্যও বটে, প্রকৃতিও বটে—বিকৃতিও বটে; আর সেইজন্য, সাংখ্যের পরিভাষায়—

বুদ্ধি অহঙ্কার এবং তন্মাত্র = প্রকৃতি-বিকৃতি।

মনঃপ্রধান একাদশ ইন্দ্রিয় কিন্তু কাহারো **কারণ** নহে—পঞ্চভূতও কাহারো কারণ নহে। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, প্রকৃতি-সোপানের শেষের এই যে-দুটা ধাপ—

(১) মনঃপ্রধান একাদশ ইন্দ্রিয় এবং (২) পঞ্চভূত—দুইই বিকৃতি-মাত্র, দুইই কার্য্য মাত্র: একাদশ ইন্দ্রিয় = অহঙ্কারের কার্য্য; পঞ্চভূত = পঞ্চ-তন্মাত্রের কার্য্য। নিম্নে চাহিয়া দেখ :—

(১) প্রধান = অব্যাকৃত প্রকৃতি

(২) প্রধানের বিকার **বুদ্ধি** ১	৭ প্রকৃতি-বিকৃতি
(৩) বুদ্ধির বিকার **অহঙ্কার** ১	
(৪) অহঙ্কারের অ্যাকৃতর-বিকার **তন্মাত্র**	
(৪॥০) অহঙ্কারের আরএক-তর বিকার ইন্দ্রিয় ১১	১৬ বিকৃতি
(৫) তন্মাত্রের বিকার স্থূল ভূত ৫	

এমতে পাইতেছি :—

প্রধান = সমস্ত প্রাকৃত জগতের অন্তর্নিগূঢ় অব্যক্ত মূল কারণ; বুদ্ধি, অহঙ্কার, এবং পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি = সেই একমাত্র অদ্বিতীয় মূল কারণের শাখা-প্রশাখা; আর, মনঃপ্রধান একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত এই ষোড়শ বিকৃতি = সেই একমাত্র অদ্বিতীয় মূল কারণের ফলাভিব্যক্তি।

সাংখ্যমতে, আদি সূর্য্য হইতে পৃথিবী-উপপৃথিবী পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যতপ্রকার কার্য্য হইতেছে সমস্তই একমাত্র অদ্বিতীয় মূল কারণেরই কার্য্য—প্রধানেরই কার্য্য। মনুষ্য-দেহের মস্তিষ্কের অন্তর্নিগূঢ় অব্যক্ত চৈতস নাড়ী-কেন্দ্র (nerve-centre) হইতে বলের আগম না হইলে * হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন কেবলমাত্র নিজ-নিজ বলে কিছুই করিতে পারে না, তেম্নি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মস্তকস্থানীয় আদিসূর্য্যের ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি করিয়া অসীম আকাশের প্রত্যেক রোম-কূপ পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুপ্রবিষ্ট সেই যে, অব্যক্ত মূল কারণ কিনা মূল প্রকৃতি, সেই মূল-প্রকৃতি হইতে—এক কথায় **প্রধান হইতে**—বলের আগম না হইলে, বুদ্ধিই বা কি, অহঙ্কারই বা কি, ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোমই বা কি, কোনো প্রাকৃত বস্তুই কেবলমাত্র নিজ-বলে কিছুই করিতে পারে না। বিচিত্র বিশ্বভুবনের মহতী লীলার প্রবর্ত্তনাকার্য্যে **প্রধানই**—অব্যক্ত মূল কারণই—এক যা-কেবল **স্বতন্ত্র**, অর্থাৎ আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত, তদ্ব্যতীত অপরাপর বস্তু যেখানে যত-কিছু আছে সমস্তই ন্যূনাধিক পরিমাণে **পরতন্ত্র**। এ-সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকার দশম সূত্রের তত্ত্বকৌমুদী-ভাষ্যে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে এইরূপ :—

"পরতন্ত্রং বুদ্ধ্যাদি। বুদ্ধ্যা স্বকার্য্যে অহঙ্কারে জনয়িতব্যে প্রকৃত্যা পূরণং অপেক্ষ্যতে। অন্যথা—ক্ষীণা সতী—ন অলং অহঙ্কারং জনয়িতুং। এবং অহঙ্কারাদিভিরপি স্বকার্য্যজননে—ইতি সর্ব্বং স্বকার্য্যে প্রকৃত্যা পূরণং অপেক্ষতে। তেন, প্রকৃতিং পরাং অপেক্ষমাণং—কারণমপি স্বকার্য্যোপজননে পরতন্ত্রং ব্যক্তং।"

ইহার বাংলা অনুবাদ।

বুদ্ধি-প্রভৃতি প্রকৃতি-সম্ভূত পদার্থ-মাত্রই পরতন্ত্র। বুদ্ধি স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত-হওন-কালে প্রকৃতি-কর্তৃক বল-পূরণের অপেক্ষা করে, নচেৎ বুদ্ধি কেবলমাত্র নিজের ক্ষুদ্র শক্তিটুকুর বলে অহঙ্কারের উৎপাদনে সমর্থ হয় না। তেম্নি আবার, বুদ্ধির পুত্র অহঙ্কার যখন ইন্দ্রিয়াদির উৎপাদনকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন **সে-ও** তাহার জননীর ন্যায় প্রকৃতি-কর্তৃক বল-পূরণের **অপেক্ষা** করে। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, মূল কারণ হইতে (কিনা **প্রধান** হইতে) বলের আগম না হইলে বুদ্ধিপ্রভৃতিরা **কারণ হইয়াও** কার্য্য-উৎপাদনে **স্বয়ং** অসমর্থ॥ অনুবাদ সমাপ্ত॥

সাংখ্য মতে, এ যেমন দেখিলাম—যে, প্রকৃতিই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বে সর্ব্বা—এই সঙ্গে এটাও তেম্নি দেখা চাই যে, এক হাতে তালি বাজে না :—গানের মজলিষে শ্রোতার সমাগম না হইলে গায়কের কণ্ঠের কপাট উন্মুক্ত হয় না। প্রকৃতি-রঙ্গিণীর পরমাশ্চর্য্য-নাট্য-লীলার স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-

* নাড়ী = নালী = সরু নল। এই অর্থে—শিরা প্রভৃতির ন্যায়—nerve filamentও (চৈতস তন্তুও) নাড়ী-বিশেষ; তার সাক্ষী—ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না। প্রভেদ কেবল এই যে, শিরা-প্রভৃতিরা স্থূল নাড়ী—চৈতস তন্তু সূক্ষ্ম নাড়ী। আমি পারৎপক্ষে nerve অর্থে স্নায়ু শব্দ ব্যবহার করি না এইজন্য—যেহেতু আয়ুর্ব্বেদের পরিভাষায়—স্নায়ু = sinew। ভাষাতত্ত্বরসিক পাঠকগণ'কে "স্নায়ু" এবং "sinew" এই দুয়ের শব্দ-সাদৃশ্যের প্রতি মুহূর্ত্তেক ঠাহর করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ব্যাপী বিশাল রঙ্গশালা এই যে, অনাদি অনন্ত আকাশ, ইহার **যবনিকা-উত্তোলনই হইত না**—যদি দেখিবার লোক কেহই না থাকিত। **পুরুষ** যদি না থাকে, তবে প্রকৃতি **কাহাকে** অবিদ্যার মন্ত্রগুণে বন্ধন করিবে? **কাহাকে** ক্ষণিক সুখের কুহকে ভুলাইবে? **কাহাকে** দুষ্পূর কামনার গোলোক-ধাঁদায় ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া হয়রান করিবে? পুরুষ স্বভাবত যদিচ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত—কিন্তু প্রকৃতির ফাঁদে পা দিলে **আর-তাহার** নিস্তার নাই;—প্রকৃতির মন্ত্রপূত গণ্ডিতে পদ-ন্যাস করিবামাত্র পুরুষ শুদ্ধ হইয়াও মলিনতায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়—বুদ্ধ হইয়াও আত্মবিস্মৃতির হ্রদে নিমগ্ন হইয়া যায়—মুক্ত হইয়াও দুর্মোচ্য মায়া-বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া যায়। জল যেমন স্বভাবত শীতল হইলেও অগ্নি-সংযোগে উষ্ণ হইয়া ওঠে—পুরুষ তেমি স্বভাবত মুক্ত হইলেও প্রকৃতি-সংযোগে **মায়াপাশে জড়াইয়া** পড়ে। সাংখ্য-প্রবচনের ১ম অধ্যায়ের ১৯শ সূত্রে কি বলিতেছে শ্রবণ কর:—

"ন নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবস্য তদ্‌যোগস্ তদ্‌যোগাদ্ ঋতে।"

ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন—

"তস্মাৎ (তদ্‌যোগাদ্ ঋতে) প্রকৃতি-সংযোগং বিনা, ন পুরুষস্য (তদ্‌যোগো) বন্ধ-সম্পর্কোঽস্তি।"

ইহার বাংলা অনুবাদ।

প্রকৃতির সহিত সংযোগ ব্যতিরেকে পুরুষের বন্ধন সম্ভবে না॥ অনুবাদ সমাপ্ত॥

জিজ্ঞাসু॥ তা যেন বুঝিলাম—পরন্তু প্রকৃতি-সংযোগ **ব্যাপারটা** যে, কি, সেইটিই জিজ্ঞাস্য। আমি তো এইরূপ বুঝি যে, সাংখ্যমতে পুরুষও যেমন—প্রকৃতিও তেমি—উভয়েই নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী; কাজেই পুরুষ এবং প্রকৃতি নিরন্তর ওতপ্রোত-ভাবে বর্ত্তমান;—ইহারই নাম কি প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ? তাহা হইতে পারে না এই-জন্য—যেহেতু তাহা হইলে অগত্যা এইরূপ দাঁড়াইবে যে, প্রকৃতির সহিত সংযোগ পুরুষের বন্ধহেতু হওয়া দূরে থাকুক—তাহা মুক্ত পুরুষের পক্ষেও অপরিহার্য্য।

প্রবোধয়িতা॥ ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু কী বলিতেছেন শ্রবণ কর:—

"ন চ কালাদিবদ্ এব প্রকৃতি-সংযোগোঽপি মুক্তামুক্ত-পুরুষ-সাধারণ-তয়া কথংবন্ধহেতুরিতি বাচ্যং। জন্মাঽপরনামঃ স্ব স্ব বুদ্ধিভাবাপন্ন-প্রকৃতিসংযোগ বিশেষস্য এব অত্র সংযোগ-শব্দার্থত্বাৎ। ....। বুদ্ধি-বৃত্তি-উপাধিনা এব দুঃখসংযোগাচ্চ।"

ইহার বাংলা অনুবাদ।

যদি বলো যে, "কালাদির সহিত সংযোগের ন্যায়—প্রকৃতির সহিত সংযোগও যখন মুক্তামুক্ত-নির্ব্বিশেষে সকল পুরুষেরই পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, তখন প্রকৃতি-সংযোগ পুরুষের বন্ধ-হেতু হইবে কেমন করিয়া," তবে তাহা বলিতে পার না এইজন্য—যেহেতু প্রকৃতির সহিত **পুরুষের** সেই যে স্ব স্ব বুদ্ধি-ভাবাপন্ন সংযোগ বিশেষ যাহার আরএক নাম **জন্ম**—প্রকৃতি-সংযোগ বলিতে সেই-প্রকার সংযোগই বুঝায়; কেননা বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ উপাধির মধ্য দিয়াই পুরুষে দুঃখাদির সংযোগ হয়।

ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা।

তুমি বলিতে চাহিতেছ যে, কাল এবং আকাশের সহিত সংযোগ যেমন বস্তু-মাত্রেরই পক্ষে অবশ্যম্ভাবী—প্রকৃতি-সংযোগও যেহেতু তেমি মুক্তামুক্ত নির্ব্বিশেষে পুরুষ-মাত্রেরই পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, এই-হেতু তাহা পুরুষের বন্ধের কারণ হইতে পারে না:—এই না তোমার কথা? তোমার জানা উচিত যে, কালাদি-সংযোগের ন্যায়—প্রকৃতি-সংযোগকে সর্ব্বসাধারণ-সুলভ সংযোগের মতো করিয়া দেখা সূত্রকারের অভিপ্রেত নহে। এ সংযোগ (অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ) বিশেষ-একরকমের সংযোগ:—জীবের জন্মকালে তাহার বুদ্ধি-বৃত্তির উপরে অধিষ্ঠাতৃ চৈতন্যের ছাপ পড়ে (শাস্ত্রীয় ভাষায়—উপরাগ সংক্রান্ত হয়), আর সেইগতিকে পুরুষ বুদ্ধিরূপ উপাধিতে বাঁধা পড়িয়া যায়। এখন দেখিতে হইবে এই যে, সাংখ্য-দর্শনের এটা একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত যে, একটা পক্ষি-শাবক যেমন অণ্ড হইতে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে অণ্ডের মধ্যে অনভিব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকে—বুদ্ধি তেমি প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতির মধ্যে অনভিব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকে; আর সেইজন্য সাংখ্যমতে, অণ্ড এবং শাবকের মধ্যেও যেমন—প্রকৃতি এবং বুদ্ধির মধ্যেও তেমি—বস্তু-পক্ষে প্রভেদ নাই মোটে। প্রকৃতির সহিত বুদ্ধির এই-প্রকার বস্তুগত অভিন্নতার বলে (শাস্ত্রীয়

ভাষায়—তাদাত্ম্যের বলে) এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, জীবের জন্মকালে চৈতন্যের উপরাগ যাহা বুদ্ধির উপরে নিপতিত হয়, তাহা প্রকৃতিরই উপরে নিপতিত হয় ; কেন না, বুদ্ধি প্রকৃতিরই সত্ত্বগুণ-প্রধান অভিব্যক্তি ; আর সেই কারণে তাহারই নাম প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ। এইরূপে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ হইলে অথবা, যাহা একই কথা, বুদ্ধিতে অধিষ্ঠাতৃ চৈতন্যের উপরাগ সংক্রান্ত হইলে, তাহার ফল কী হয় ? তাহার ফল হয় এই যে, বুদ্ধিগত উপরাগ যখন যে-কোনো মূর্ত্তি ধারণ করুক্ না কেন, তাহার সমস্ত গুণাগুণ—দ্রষ্টা পুরুষ আপনার গায়ে মাখিয়া লয় :—বুদ্ধিগত উপরাগ সাত্ত্বিক মূর্ত্তি ধারণ করিলে দ্রষ্টা পুরুষ আনন্দে উৎফুল্ল হয়—রাজসিক মূর্ত্তি ধারণ করিলে দ্রষ্টা পুরুষ দুঃখ-যন্ত্রণায় অধীর হয়—তামসিক মূর্ত্তি ধারণ করিলে দ্রষ্টা পুরুষ বিষাদে ম্রিয়মাণ হয় :—ইহারই নাম বুদ্ধি-উপাধিতে বাঁধা পড়িয়া যাওয়া। অতএব এটা স্থির যে, বুদ্ধির সহিত সংযোগই—প্রকৃতি-সংযোগই—পুরুষের বন্ধ-হেতু ॥ অনুবাদাদি সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গক্রমে সহসা একটি কথা আমার মনে উদিত হইল ; তাহা পেটে না রাখিয়া বলিয়া ফ্যালাই শ্রেয় বোধ করিতেছি। সে কথা এই :—

বেদান্ত মতেও যেমন—সাংখ্য-মতেও তেম্নি—উভয়-মতেই পুরুষের বন্ধন ঔপাধিক বন্ধন বই সত্যিকে'র বন্ধন না। অন্ধকার যেমন সত্যিকের কোনো জিনিস্ না—মোহবন্ধও তেম্নি সত্যিকের কোনো জিনিস্ না। আবার, অন্ধকার সত্যিকের কোনো কিছু না-হইলেও তাহার মতো ভয়ঙ্কর বস্তু যেমন দ্বিতীয় আর-একটি সম্ভবে না—জীবের মোহবন্ধও তেম্নি সত্যিকের কোনো কিছু না হইলেও তাহার মতো ভয়ঙ্কর বস্তু দ্বিতীয় আরেকটি সম্ভবে না। পুনশ্চ, সূর্য্যোদয়ে যেমন সদাশুদ্ধ এবং সদামুক্ত নভোমণ্ডলের সংস্রব হইতে অন্ধকার ছাড়িয়া যায়, বিবেকের উদয়ে তেম্নি সদাশুদ্ধ এবং সদামুক্ত আত্মার সংস্রব হইতে মোহবন্ধ ছাড়িয়া যায় ; আর তাহা যখন হয় তখন দ্রষ্টা পুরুষ স্বরূপ-চৈতন্যের স্বপ্রকাশ বিমল জ্যোতিতে অনেক-কালের হারা-আত্মাকে আত্মাতে পাইয়া পরম আরোগ্য এবং পরমা শান্তি লাভ করে ; সেই ধন লাভ করে—যাহা যে-যখন হস্তে পায় সে আর-কোনো ধনেরই প্রার্থনা রাখে না—"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"

জিজ্ঞাসু ॥ তবে কি বেদান্ত এবং সাংখ্যের মধ্যে মূলেই কোনো-প্রকার মতভেদ নাই ?

প্রবোধয়িতা ॥ মতভেদ আছে অবশ্যই—কিন্তু তাহা মারাত্মক রকমের মতভেদ নহে। তাহা যে, কী-তর মত-ভেদ, তাহা বিবরিয়া বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, এইজন্য বর্ত্তমান স্থলে সে বিষয়টাকে না-ঘাঁটানোই সৎপরামর্শ মনে করিতেছি।

জিজ্ঞাসু ॥ আপনি বিজ্ঞানানন্দ—আমি বিজ্ঞান-ভিক্ষু। আপনার কার্য্যই হ'চ্চে আমাকে জ্ঞান-দান করা। আপনার অবকাশেরও অভাব নাই। আমার শুভাদৃষ্টক্রমে এমন ধারা একটা দুর্লভ মুহূর্ত্ত হাতের কাছে পাইয়া আপনার দ্বার হইতে শূন্যহস্তে ফিরিয়া যাইতে কিছুতেই আমার পা সরিতেছে না।

প্রবোধয়িতা ॥ তোমার যেমন পা সরিতেছে না—আমার প্রকৃত প্রস্তাব-লক্ষ্মীটিকে কাল-রাক্ষসপতির দুরভি-সন্ধিপূর্ণ কুদৃষ্টি-পথে অসহায় ফেলিয়া রাখিয়া সাংখ্যমত এবং বেদান্তমত এই দুই মতের দুই শাখা-প্রশাখা-সঙ্কুল-শৃঙ্গ-বিশিষ্ট মায়ামৃগের পশ্চাতে ধাবমান হইতে আমারও তেম্নি মন সরিতেছে না। তোমার জানা উচিত যে, পা না সরিলে মনের বলে পা'কে সরানো যত-না কঠিন—মন না সরিলে যুক্তির বলে মন'কে সরানো তাহা অপেক্ষা শতগুণ কঠিন। যাহাই হো'ক্ না কেন—তোমার মনস্তুষ্টির জন্য সাংখ্যমত এবং বেদান্তমতের ঐকানৈক্যের একটি আদর্শ-স্থানীয় দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি—তোমার কৌতূহলের ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে আপাততকা'র মতো তাহাই আমার বিবেচনায় যথেষ্ট।

সাংখ্যমত এবং বেদান্তমতের ঐক্যানৈক্যের দৃষ্টান্ত।

দুয়ের ঐক্যস্থান ॥ সাংখ্যে বেদান্তে ধরাধরি করিয়া উভয়ে মিলিয়া একবাক্যে বলিতেছে যে, বুদ্ধি-চৈতন্য সোপাধিক চৈতন্য ; আর, সে যে সোপাধিক চৈতন্য তাহা নিরুপাধিক চৈতন্যের প্রতিবিম্ব-মাত্র—আভাস-মাত্র—ছায়া-মাত্র।

দুয়ের ভেদস্থান ॥ বেদান্ত-দর্শনে বলে যে, আভাস-

চৈতন্যের বুদ্ধিরূপ উপাধি অবিদ্যা-মাত্র—ভ্রম-মাত্র; সাংখ্য-দর্শনে বলে যে, আভাস-চৈতন্যের বুদ্ধি-উপাধিও যেমন, আর, সেই উপাধিটির প্রকৃতি-জননীও তেম্নি, দুইই বাস্তবিক পদার্থ। সাংখ্যের অন্তঃকরণাদি উপাধিও অচেতন—বেদান্তের অন্তঃকরণাদি উপাধিও অচেতন; **প্রভেদ** দোঁহা-মাঝে এই যে, সাংখ্যের উপাধি প্রকৃতি-মূলক বাস্তবিক পদার্থ; বেদান্তের উপাধি অবিদ্যা-মূলক ভ্রমপদার্থ।

তপ্তলৌহের উপমা॥ সাংখ্য এবং বেদান্ত উভয় দর্শনেরই ভাষ্যকারেরা প্রায়শই তপ্ত লৌহের সহিত সোপাধিক চৈতন্যের উপমা দিয়া থাকেন। উভয় শ্রেণীরই আচার্য্যদিগের মতে নিরুপাধিক চৈতন্য অগ্নির সহিত উপমেয়; অন্তঃকরণাদিরূপ অচেতন-স্বভাব উপাধি—অনুষ্ণ-স্বভাব লৌহের সহিত উপমেয়; আর, সোপাধিক চৈতন্য—তপ্ত-লৌহগত অগ্নির সহিত উপমেয়। এই গেল বেদান্তবাদী এবং সাংখ্যবাদীর উভয়-সাধারণ মত। এতদ্ব্যতীত, সাংখ্যবাদীর বিশেষ মত এই যে, উপাধি এবং উপহিত চৈতন্য দুইই বাস্তবিক পদার্থ; বেদান্তের বিশেষ মত এই যে, উপহিত চৈতন্যই বাস্তবিক পদার্থ—উপাধি ভ্রম-পদার্থ॥ দৃষ্টান্ত সমাপ্ত॥

জিজ্ঞাসু॥ সাংখ্যাচার্য্যেরা কাহাকে বলেন প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ, তাহা আপনি আমাকে পাখী পড়ানোর মতো কষ্ট স্বীকার করিয়া যতদূর বুঝাইতে হয় তাহা বুঝাইলেন যদিচ—কিন্তু তবুও উঁহারা সংযোগ-শব্দের যেরূপ একটা কৃত্রিম অর্থ জো-শো করিয়া ঘটাইয়া দাঁড় করাইয়াছেন তাহাতে আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না।

প্রবোধয়িতা॥ সংযোগ বলিতে তুমি কী বোঝো?

জিজ্ঞাসু॥ সোজাসুজি সবাই যাহা বোঝে আমিও তাহাই বুঝি।

প্রবোধয়িতা॥ সংযোগ শব্দের অর্থ তুমি কিরূপ বোঝো তাহার একটা দৃষ্টান্ত আমাকে দেখাও।

জিজ্ঞাসু—হাত-জোড় করিয়া॥ এই দেখুন্—ইহাকেই আমি বলি দুই হস্তের সংযোগ॥

প্রবোধয়িতা॥ তুমি কি বলিতে চাও—কাছ ঘেঁসিয়া থাকা'র নামই সংযুক্ত থাকা?

জিজ্ঞাসু॥ আমার অ্যাকুলা'র কোনো অপরাধ নাই—দেশসুদ্ধ সকল লোকেই বলে তাই।

প্রবোধয়িতা॥ দুইটি আম্র-বৃক্ষ পরস্পরের কাছ ঘেঁসিয়া রহিয়াছে। দেখিলে তুমি কি বলো যে, বৃক্ষ দুটি'র একটি আর-একটির সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে? আমি তো তাহা বলি না।

জিজ্ঞাসু॥ আমার কথাটা'র ভাব আপনি যদি উল্টা বোঝেন, তবে আমি নাচার! আমি বলিতে চাই শুধু এই যে, একটা নীরন্ধ্র (অর্থাৎ নিরেট) বস্ত্রের অন্তর্নিহিত তন্তুজাল যেমনধারা-ভাবে পরস্পরের গা-ঘেঁসিয়া অবস্থিতি করে, তেম্নিধারা অব্যবহিত ভাবের (অর্থাৎ ব্যবধান-বর্জ্জিত ভাবের) সংশ্লেষের নামই সংযোগ।

প্রবোধয়িতা॥ এটা তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না যে, নীরোম ভল্লুকের ন্যায়—নীরন্ধ্র বস্ত্র নিতান্তই একটা সৃষ্টি-ছাড়া বস্তু; তাহা ন ভূতো—ন ভবিষ্যতি। এই আমরস-ছাঁকা কানি'টা যদি সত্যসত্যই নীরন্ধ্র হইত, তাহা হইলে ইহা দিয়া আমরস ছাঁকা অসম্ভব হইত। **এখন** হয় তো তুমি তোমার ভ্রম স্বীকার করিয়া বলিবে যে, "আমরস-ছাঁকা কানিটা রন্ধ্র-সংকুল (অর্থাৎ ঝাঁঝ্‌রা-পারা) বটে!" তাহা যদি বলো, তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ বস্তুটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমাকীর্ণ নহে? পৃথিবী রন্ধ্রসংকুল বলিয়া পৃথিবীর রোমে রোমে জল প্রবেশ করিতে পথ পায়; জল-রন্ধ্রসংকুল বলিয়া জলের রোমে রোমে বায়ু প্রবেশ করিতে পথ পায়, এবং জল-বায়ু-মৃত্তিকা প্রভৃতি সমস্ত তোল্য (ponderable) বস্তু রন্ধ্রময় বলিয়া ঈথর-সংজ্ঞক অতোল্য (imponderable) আকাশ-পদার্থ জগৎসুদ্ধ সমস্ত তোল্য-বস্তুর মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রবেশ করিতে পথ পায়।

জিজ্ঞাসু॥ কি সর্ব্বনাশ! কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়া পড়িল যে! আমার ঘাট্ হইয়াছে! সংযোগ বলিতে **আপনি** কী বোঝেন, সেইটি এখন পরিষ্কার করিয়া ভাঙিয়া বলিয়া দুর্নিবার সংশয়ের আবর্ত্ত হইতে আমাকে পথে টানিয়া তুলুন।

প্রবোধয়িতা॥ এটা যখন স্থির যে, দুই বস্তু পরস্পরের সহস্র গা ঘেঁসিয়া থাকিলেও শুধুই কেবল দোঁহার সেইরূপ গা-ঘেঁসা অবস্থাকে সংযোগাবস্থা বলা যাইতে পারে না, তখন কাজেই বলিতে হয় যে, সান্নিধ্য-মাত্র সংযোগের পরিচয়-

লক্ষণ নহে। কী তবে সংযোগের পরিচয়-লক্ষণ? সূর্য্য পৃথিবী হইতে শতকোটি যোজন দূরে অবস্থিতি করা সত্বেও এ কথা একটুও মিথ্যা নহে যে, পৃথিবী সূর্য্যের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। কী সূত্রে পৃথিবী সূর্য্যের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে? অবশ্য—আকর্ষণ-সূত্রে। ইহাতেই অ্যাক-ইঙ্গিতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, দুইবস্তুর মধ্যে আকর্ষণের বন্ধন-সূত্র বিদ্যমান থাকাই সংযোগের একমাত্র পরিচয়-লক্ষণ।

জিজ্ঞাসু॥ আমার এইরূপ ধারণা যে, মাধ্যাকর্ষণ, সন্নিকর্ষণ (attraction of cohesion), মিথুনাকর্ষণ (chemical attraction), চুম্বাকর্ষণ (জলাদি চুমিয়া লওয়া capillary attraction) প্রভৃতি রকম-ওয়ারি আকর্ষণ-প্রকর্ষণের কার্য্যকারিতা জড় রাজ্যের সুপরিচিহ্নিত সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। পরন্তু পুরুষ চেতন-পদার্থ; প্রকৃতি অচেতন-পদার্থ;—দুয়ের মধ্যে তেলে-জলের অ-বনিবনাও। এমতাবস্থায়, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ ঘটিবে যে, কী সূত্রে কেমন করিয়া, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রবোধয়িতা॥ আকর্ষণ বলিতে বোঝো তুমি কী?

জিজ্ঞাসু॥ আকর্ষণ বলিতে বুঝি আমি—আর কিছু না—**টান** মাত্র।

প্রবোধয়িতা॥ টানের একটা দৃষ্টান্ত দেখাও।

জিজ্ঞাসু॥ জলার্থী ব্যক্তি কণ্ঠে-রজ্জু-বাঁধা জলপূর্ণ ঘট কূপ-হইতে টানিয়া তুলিবার সময় রজ্জুগাছিতে যে-রকমের টান পড়ে—তাহাকে টানের বেশ্ একটা দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রবোধয়িতা॥ তুমিও বলো আমিও বলি যে, সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে:—পৃথিবী এবং সূর্য্যের মধ্যে টান-সহন ক্ষম বন্ধন-রজ্জু আছে কি?

জিজ্ঞাসু॥ কোনো-না-কোনো প্রকার বন্ধন-রজ্জু অবশ্যই আছে।

প্রবোধয়িতা॥ তাহা আধিভৌতিক বন্ধন-রজ্জু, না আধ্যাত্মিক বন্ধন-রজ্জু?

জিজ্ঞাসু॥ আপনার প্রশ্নটির ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মুখে বাক্য সরিতেছে না—আমি নিরুত্তর।

প্রবোধয়িতা॥ আমার ঐ প্রশ্নটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমিও নিরুত্তর:—শুধু তা' না—মাধ্যাকর্ষণের আদি গুরু নিউটন'কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও নিরুত্তর। তবে—টানের মাত্রা বেশী-মাত্রা-চড়াইয়া—সাহসে ভর করিয়া এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, মাধ্যাকর্ষণ—আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিকের মাঝামাঝি একপ্রকার চক্ষে-ধাঁদা-লাগানো-গোচের বন্ধনের টান; সাদা কথায়—এক প্রকার মন্ত্র-গুণ। যাহাই হোক না কেন—আপামর-সাধারণের এটা একটা দেখা কথা যে, টান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) বলের টান; (২) প্রাণের টান। দুই অচেতন বস্তু যখন পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তখন দোঁহার মধ্যবর্ত্তী তৈজস **বল-রজ্জুতে** টান পড়ে; আর, অচেতন পদার্থ যখন চেতন-পদার্থকে আকর্ষণ করে, তখন দোঁহার মধ্যবর্ত্তী প্রাণতন্তু-জড়ানো চৈতস অন্তঃকরণ-রজ্জুতে টান পড়ে। পূর্ব্বোক্ত-প্রকার টান'কে বলা যাইতে পারে **বলের টান**—শেষোক্ত-প্রকার টান'কে বলা হইয়া থাকে **প্রাণের টান**।

আপনার প্রতি আপনার টান চেতন-বস্তু মাত্রেরই স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। তাই, **প্রকৃতি** যখন দ্রষ্টা **পুরুষের** সম্মুখে **বুদ্ধি-দর্পণ** বাগাইয়া ধরে, তখন সেই বুদ্ধি-দর্পণে আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখা-কারণে দ্রষ্টা পুরুষ বুদ্ধির সহিত প্রাণের টানে বাঁধা পড়িয়া যায়। বুদ্ধির প্রতি এইরূপ প্রাণের টানই পুরুষের সহিত প্রকৃতি-সংযোগের গোড়া'র কথা, আর, তাহাই পুরুষের বন্ধ-হেতু।

জিজ্ঞাসু॥ স্বীয় বুদ্ধিগত প্রতিবিম্বের টানে পড়িয়া বুদ্ধির সহিত দ্রষ্টা পুরুষের সংযোগ ঘটে কিরূপ—এতক্ষণ ধরিয়া তাহাই আপনি বুঝাইলেন; পরন্তু, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ ঘটে কিরূপ—সেইটিই আমার জিজ্ঞাস্য; এক্ষণে, শেষোক্ত বিষয়টি আমাকে বুঝাইয়া দি'ন্।*

প্রবোধয়িতা॥ এটা তো তুমি মানো যে, কোনো একটি পক্ষী কাঁটাল-বৃক্ষ হইতে আম্র-বৃক্ষের শাখায় উড়িয়া বসিলে, তাহারই নাম আম্র-বৃক্ষে উড়িয়া বসা? এটাও তেম্নি তোমার

* সাংখ্য-মতে বুদ্ধি জড়-বস্তুগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান; তাহার নীচে অহঙ্কার; তাহার নীচে মন; তাহার নীচে দশেন্দ্রিয় এবং তন্মাত্র; সকলের নীচে পঞ্চভূত। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্যমতে বুদ্ধি হইতে পঞ্চভূত পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাকৃত বস্তুই জড়পদার্থ সুতরাং বিষয়-শ্রেণীভুক্ত—অন্তঃকরণও বিষয়-শ্রেণীভুক্ত।

জানা উচিত যে, বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত হওয়ার নামই প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হওয়া; কেননা, বুদ্ধি প্রকৃতির **পর** কেউ না—**বুদ্ধি** প্রকৃতি-বৃক্ষের প্রথমজা শাখা॥ ইতি প্রশ্নোত্তর সমাপ্তি॥

সাংখ্যমতে, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ—**ব্যাপারটা** যে, কি, এবং তাহাতে করিয়া অন্তঃকরণাদি উপাধিতে পুরুষের বন্ধন ঘটেই বা কিরূপে, তাহার তথ্য নিরূপণ যত পারি সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ-প্রকারে করিয়া চুকিলাম। অতঃপর প্রকৃতিপাশে পুরুষের বন্ধনগ্রস্ত অবস্থায় প্রকৃতি-পুরুষের মধ্যে দ্রষ্টৃদৃশ্য, কর্তৃকার্য্য এবং ভোক্তৃভোগ্য প্রভৃতি সম্বন্ধ ঘটিয়া দাঁড়ায় কিরূপ তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দাবীর চিঠি

রাজার উপর রাজা যিনি প্রণাম ক'রে তাঁর শ্রীপদে,—
দাবীর চিঠি পেশ করি আজ বিশ্বজনের পঞ্চায়তে।
কায়দা-কানুন্ জানিনে ভাই, বলছি সবার করে ধ'রে,
ও বিদেশী! গোরার জাতি! তোমরা শোনো বিশেষ ক'রে।
চক্রধরের চক্র যখন ঘুর্‌ছে বেগে মর্ত্ত্যলোকে,—
অধঃপাতের তলার মানুষ উঠ্‌ছে উর্দ্ধে সূর্য্যালোকে,—
পোল্যাণ্ড হচ্চে স্বয়ম্প্রভু,—পাচ্চে হবিন্ পাকা পাটা,
তখন যে হোমরুল চেয়েছে খুব বেশী কি তার চাওয়াটা?
রাজা সুখে বিরাজ করুন, আমরা তাঁরে মান্য করি,
কালা গোরা দুই প্রজা তাঁর দু'এ চালায় রাজ্যতরী;
একলা গোরা সব করেছে যে কয় সে কয় গল্প-কথা,
কালার গোরার স্বেদ-শোণিতে সাম্রাজ্যেরি বনেদ্ পোঁতা;
আমরা দিছি গাঁটের পয়সা, আমরা দিছি দেহের রক্ত,
কর্‌তে মোদের অভেদ রাজার সিংহাসনের ভিত্তি শক্ত;
এম্পায়ারের চার পায়া আজ চার মহাদেশ ব্যাপ্ত করে,
কালার গোরার বল যুগপৎ যুক্ত আছে তার ভিতরে।
সাক্ষী ক্লাইভ—কালা ফৌজ সাম্রাজ্যেরি পত্তনেতে
প্রথম যে-ইঁট বসিয়েছে তা নিজের বুকের পাঁজর পেতে;
মিউটিনিতে আমরা ছিলাম তোমাদেরি পক্ষপাতী
গোবার হয়ে অনেক গোলা নিইছি মোরা বক্ষ পাতি;
অনেক যুদ্ধ জয় করেছি চীন কাবুল ও আফ্রিকাতে,
ধুলায় সোনা ফলিয়ে দিছি সাগর পারের দ্বীপগুলাতে;
চৌকী দিছি শাংহায়ে আর মগের দেশে দিইছি মাথা;
তিব্বতেরও সন্ধি মুলুক্—যাক্ সে কথা তুলব না তা।
সেদিনও যেই ডাক দিয়েছ অম্‌নি গেছি বেল্‌জিয়মে,
বোগ্দাদে দাদ তুল্‌তে তোমার ভয় করিনি জ্যান্ত যমে,
ভয় করিনি উড়ো জাহাজ দুস্তর-ধোঁয়া হাউইটজারে,
গোরার সঙ্গে গুর্খা ও শিখ জান দেছে হাজার হাজারে।
যুদ্ধে যেমন দুঃসাহসী মন্ত্রণাতে তেম্‌নি সুধী,
শাসন কাজে সমান পটু, কোন্ দরোজা রাখ্‌বে রুধি?
বাগ্মী মোরা শিল্পী মোরা, কাব্যে মোরা বিশ্বজয়ী,
বিজ্ঞানেও নইক তুচ্ছ, কারো চেয়েই ক্ষুদ্র নহি।
রাজ্যতরীর দাঁড় টানি রোজ, তোমরা রোজই হালে থাক,
পশ্চিমে ঝড় উঠ্‌ছে, মাঝি, আমাদেরও শিখিয়ে রাখ,
আমাদেরও দাও অধিকার, নাও তোমাদের সমান ক'রে,
সময়-মত লাগ্‌ব কাজে, শেখাও যদি হাতে ধ'রে।
অযোগ্য নই একেবারেই বল্‌ছি মোরা জোর গলাতে,
যদিও কালা-আদ্‌মী তবু—ইয়াদ রেখো দিনে রাতে
মোদের ত্যাগে মোদের দানে পুষ্ট বিরাট-রাষ্ট্র-হৃদি
চার মহাদেশ চৌ-পায়া যার তোমার একার নয় সে নিধি।
ন্যায়ের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে কর্‌লে ওজন দেখ্‌তে পাবে
আমরা নেহাৎ কম যাব না, যদিও আছি পরের তাবে?
কালার গোরার সমান দাবী—মহারাণীর ভাষায় কহি,
রাজার উক্তি উড়িয়ে দেবে?—তোমরা হবে রাজদ্রোহী!

* * * *

যোগ্যতা নেই?...দেখ চেয়ে মানব-ইতিবৃত্তময়
কালার দানের অঙ্কগুলি গোরার চাইতে মলিন নয়।
কালা দেছে বাল্মীকি ব্যাস; গোরা দেছে?—মিল্টনে!
কালা দেছে বুদ্ধ অশোক; গোরা দেছে? কিং জনে?
কালার জনক যাজ্ঞবল্ক্য; গোরার?—আছেন—মার্টিনো।
কালার রঘু রাজেন্দ্র চোল; গোরার ক্লাইভ মার্লব্রো।
কালা দেছে আর্য্যভট্ট, গোরা দেছে নিউটনে,
কালা কৃতী জীবের সেবায়, গোরা vivisectionএ।

কালার ছিল বৌদ্ধ মিশন, গোরার মিশন খ্রীষ্টীয়,
সবাই জানে কালার দেখেই নকল ক'রে সৃষ্টি ও।
একদিকে ওই কনাদ কপিল, অন্য দিকে হিউম মিল্,
একদিকেতে অমৃতপ্রাশ, অন্যদিকে বীচাম্স্ পিল!
কালার ছিল চাণক্য; আর গোরার ছিল? ডিজ্রেলি।
তুলনা ছাই, যাক চুলোতে, মিছাই নামের ভিড় ঠেলি।
গোরার আছে ম্যাগ্না কার্টা, কালার না হয় নেইক তা,
Bill of Rights—নয় কথনো নয় জীবনের শেষ কথা।
তা' ব'লে নয় তুচ্ছ কালা, তার পলিটিক্স নয় আঁধার,
গোরার আছে পার্লামেন্ট্ আর কালার ছিল সন্তাগার।
কালার কীর্ত্তি মিশর দ্রাবিড় আরব চীনের সভ্যতা,
গোরার কীর্ত্তি? ডাইনামাইট—সভ্য করার দ্রব্য তা!
গোরা যারে ভব্যতা কয় তিন্শো বছর বয়স তার,
কালার যা' গৌরবের জিনিস—তার অন্তত তিন হাজার।
ব্রিটন দেছে ক্রমোয়েল, আর ভারত জামদগ্ন্য-রাম,
কার্ত্তবীর্য্য চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট;—কালায় গোরায় মিল তামাম।

* * * *

জাতির পাঁতির কল্মী-দামে আজকে না হয় বন্ধ হাতী,
তাই ব'লে কি ডুবতে দেবে তোম্রা না সব সভ্য জাতি?
জ্ঞানের বাতি আফ্রিকাতে জ্বালছ নাকি? শুন্তে পাই।
মানুষ বিক্রী উঠিয়ে দেছ নিত্যি শোনাও এই কথাই।
তবে মোদের সকল দাবী দাবিয়ে কেন রাখ্তে চাও?
দাবীর কথা পাড়তে গেলেই কুঁচকে ভুরু দাব্ড়ি দাও?
মানুষ হতে দাও আমাদের, ঘুচাও মনের এ আফ্শোষ,
ঘর-শাসনের দাও অধিকার, হোম্রুলে কি এতই দোষ?
বোয়ার পেলে চোয়াড় পেলে পেলে তাদের দোহারগণ,
মোদের ভাগ্যে খোঁয়াড় শুধু, বুঝ্তে নারি এ কেমন।
নিজের ঘরের বন্দেজে আর নিজের দেশের খিদ্মতে
ফিলিপিনোর চাইতে অধম ভাবছ মোদের কোন্মতে?
প্রাপ্য যা তাই চাইছি মোরা—যেটুক মোদের হক্ দাবী,
হাঙ্গামা এ নয়কো মোটেই, রুষ্ছ মিছে ভুল ভাবি।
সন্দেহে তো ঢের খাটালে এবার ছুটি দাও তারে,
সংশয়ে যে বিনাশ করে সাম্রাজ্যেরও আত্মারে;
বিশ্বাসেরে পরখ্ কর, দ্যাখ নয় বিশ্বাস ক'রে,
চিনুলে না লোক দেড়শো বছর একত্রে ভাই বাস্ ক'রে?
বুঝ্তে নারি খেলতে ব'সে খেঁড়ির সঙ্গে আড়াআড়ি,
শত্রুরই বুক্ বাড়ছে এতে, মিটিয়ে ফেল তাড়াতাড়ি;
তোমার হ'চ্চে ছক্কা পঞ্জা, খেঁড়ির কিছুই হচ্চে নাকো—
বল্লে তা' কেউ কলিকালে মান্বে এমন আশা রাখো?
দেড়শো বছর আমরা আছি পাশাপাশি বিশ্বকূলে,
গঙ্গা এবং যমুনা ধায় সঙ্গমে তরঙ্গ তুলে,
কালার গোরার এম্পায়ার এ, ঠেলবে কারে রাখবে বেছে,
কালার গোরার যুক্তবেণী হরিহরের মূর্ত্তি এযে!
জ্বল্ছে তেজে ন্যায়ের চক্ষু, ন্যায়ের কণ্ঠে হয় ঘোষণা,
আইন তোমার কয় হেঁকে ওই কেউ ছোটোনা কেউ ছোটোনা;
বল্ছে সত্য, বল্ছে ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব বলছে শোনো,
বল্ছে তোমার ঘরের লোকও, বল্ছে তোমার আপন জনও;
ব্রিটানিয়ার বিবেক-বুদ্ধি প্রবুদ্ধ আজ বেস্যান্ট রূপে,
ধন্য হবে ব্রিটন,—যদি তাঁর বাণী আজ লয় গো লুফে;
শক্তি হবে সংহত দুর্জ্জয় হবে গো বিশ্বেরি মাঝ
তিরিশ কোটির হৃদয় যদি লয় জিনে হোম্রুল দিয়ে আজ।
মানুষ-মনুষ্যত্বে যদি মান্তে পারে হৃদয় খুলে
চলবে তবে যুগে যুগে বাজিয়ে ভেরী নিশান তুলে;
অমর হবে মর্ত্ত্যে, সদাই সাম্নে পাবে পুষ্পিত পথ,
গরীব দেশের হক্দাবীতে কান দিলে নাম গাইবে জগৎ।
নইলে পরে লাভের ঘরে অমর হ'য়ে অযশ রবে,
হক দাবী যার তার কি ক্ষতি? পাওনা আদায় হবেই হবে।
বিশ্ববিধান বিধির বিধান, ন্যায়ের নিধান নিত্য কালে
হক দাবী যার বুক তাজা তার 'হার' লেখে না তার কপালে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ভারতের বর্ণভেদ-পদ্ধতি

Emile Senartএর ফরাসী হইতে।

(উপসংহার)

প্লেটো ও হেরোডোটাসের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া, অনেকদিন পর্য্যন্ত লোকের বিশ্বাস ছিল,—পুরাকালে ইজিপ্ট বর্ণভেদ-পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। এই মতটি আজকাল খুব বিশ্বস্ত বিচারকগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। তদ্দেশীয় পুরাতন স্মৃতি-সামগ্রীসমূহ স্পষ্টরূপে ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য

দেয়।' গ্রীকেরা—উচ্চপদ সংক্রান্ত বিশেষ-অধিকার ও ব্যবসায়-সাম্যের দ্বারা আবদ্ধ কুলক্রমাগত বৃহৎ সমাজ-গঠন-সমূহের সহিত পরিচিত ছিল না বলিয়া, ন্যূনাধিক পরিমাণে দৃঢ়বদ্ধ ঐরূপ কোন আদর্শ দেখিলেই উহার গুরুত্ব ও বিস্তার সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণিত। এখন পর্যান্ত, একমাত্র ভারতবর্ষই,—আমরা যেভাবে জাতের বর্ণনা করিয়াছি, সেই-রকমের একটা সার্ব্বভৌমিক জাতের-পদ্ধতি আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। অন্যত্র হদ্দ আমরা কতকগুলি আকস্মিক নিদর্শন, অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের অঙ্কুর মাত্র দেখিতে পাই; সে সমস্ত কোথাও পদ্ধতিরূপে পরিণত হয় নাই।

ল্যাসিডেসেনিয়া ও অন্যত্র প্রচলিত, অনেকগুলি কৌলিক কর্ম্ম ও ব্যবসায়ের সহিত গ্রীশ্ পরিচিত ছিল। অনিশ্চিততা ও অস্পষ্টতা সত্ত্বেও,—অ্যাটিক প্রদেশের চারি ইয়োনীয় শাখা-বংশ (phyle) যে নামে অভিহিত হইত, তাহা ব্যবসায়-ঘটিত নাম; যথা—সৈন্য, ছাগ-পালক, কারিগর (১)। এই সমস্ত নিশ্চয়ই "জাত" নহে। উক্ত উদাহরণে অন্তত ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অনুকূল অবস্থার আধিপত্যে, আর্য্য ঐতিহ্য জাতের দিকে ঝুঁকিতে পারে। এই কথাটা মনে রাখা ভাল।

একটা সামাজিক তথ্য,—কোন এক বিস্তীর্ণ দেশের উপর যাহার আধিপত্য, যাহা সেই দেশের সমস্ত অতীতের সহিত এক সূত্রে আবদ্ধ, সেই তথ্যটির অবশ্যই একাধিক কারণ আছে। খুব ঠিক্‌ঠাকভাবে, একটি মাত্র অনুমানের ভিতর ঐ তথ্যটিকে আবদ্ধ করিলে, নিশ্চয়ই পথ হারাইতে হইবে। বহুল শাখা-স্রোত মিলিত হইয়া, এই প্রবাহগুলির বেগকে এতটা প্রবল করিয়া তুলিয়াছে।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, প্রত্যেক শাখাটি, পর-পর কি করিয়া মূল-প্রবাহকে ফাঁপাইয়া তুলিল, তাহা পৃথক্‌রূপে ও সুপ্রণালীক্রমে আলোচনা করিলে তবেই উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। এরূপ আরও অনেক দেশ আছে যেখানে, এক আগন্তুক জাতি আসিয়া দেশের প্রকৃত অধিকারীদিগকে জয় ও বেদখল করিয়া তাহার পাশাপাশি আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—কিন্তু এই অবস্থা হইতে "জাত" ত উৎপন্ন হয় নাই। অন্যান্য দেশের অধিবাসী-দিগের মধ্যে প্রবল শ্রেণীভেদ থাকিলেও বর্ণভেদ তাহাদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিল। অন্য দেশের পুরোহিত-তন্ত্র অন্য কাঠামের আশ্রয় লইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষে, অনেকগুলি উপাদানের সম্মিলিত ক্রিয়া হইতে জাতের উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা প্রধান-প্রধান উপাদানগুলির উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি।

যাহাতে এই ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত কালটা এক নজরে আমাদের চোখে পড়ে আমরা তাহারই চেষ্টা করিব।

যে সময়ে আর্য্যেরা ভারতে প্রবেশ করে সেই সময়কার কথা ধরা যাক্। তখন তাহারা, আর্য্যজাতির সমস্ত শাখার মধ্যে যে-সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল, সেই সকল পুরাতন নিয়মের শাসনাধীনে বাস করিত। তাহারা জনসমূহে, গোষ্ঠীতে ও গোত্রে বিভক্ত ছিল; ন্যূনাধিক পরিমাণে বিস্তৃত মণ্ডলীগুলি সেই একই সমাজতন্ত্রের দ্বারা পরিশাসিত হইত যে-সমাজতন্ত্রের সাধারণ অবয়ব-রেখাগুলি সকলের পক্ষে একই রকমের এবং যে-সমাজতন্ত্র শোণিত-সম্পর্কের বন্ধনে ন্যূনাধিক পরিমাণে দৃঢ়আবদ্ধ। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, বংশে বংশে যে বিশুদ্ধ ও সহজ সাম্য ছিল, সেই সাম্য-যুগের কালটা সে সময়ে অতীত হইয়াছিল। তখন সামরিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মানসম্ভ্রম স্বকীয় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। কতকগুলি মণ্ডলী, শৌর্য্যবীর্য্যের যশঃপ্রভায় মণ্ডিত হইয়া, অপেক্ষাকৃত সমুজ্জ্বল বংশগৌরবে গর্ব্বিত হইয়া, বাহুবলের দ্বারা অন্য অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধিশালী হইয়া, এক অভিজাতশ্রেণীরূপে গড়িয়া উঠিল এবং আধিপত্যের দাবী করিতে লাগিল। ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এরূপ জটিল হইয়া উঠিয়াছিল, যে, তাহার অনুষ্ঠানের জন্য ও ছন্দরচনার জন্য, একটা বিশেষ রকমের নৈপুণ্য আবশ্যক হইল, একটা পরিভাষা গঠনের আয়োজন আবশ্যক হইল। এইরূপে এক পুরোহিত-শ্রেণী উৎপন্ন হইল। এই শ্রেণীর দাবী-দাওয়া, ন্যূনাধিক পরিমাণে পৌরাণিক বংশাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাদের শাখা-সমূহ প্রসিদ্ধ প্রাচীন মহাপুরুষদিগের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ এইরূপ তাহারা ঘোষণা করিল। অবশিষ্ট আর্য্যেরা সাধারণ-ভাবে এক বিশেষ-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইল; তাহারই ভিতরে থাকিয়া, বিভিন্ন মণ্ডলী স্বশাসনতন্ত্রের অধীনে,

(১) Schomanu, Griech. Alterth., ed 1861, I, p. 325.

নিজ-নিজ সামাজিক ব্যবস্থার অধীনে, বিচরণ করিতে লাগিল। গোড়া হইতেই ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশ্বাস ও সংস্কার তাহাদের জীবনের উপর আধিপত্য করিতেছিল। পূর্ব্ব হইতেই পুরোহিতমণ্ডলী শক্তিশালী ছিল, এক্ষণে ধর্ম্মসঙ্কোচের কঠোরিতা তাহাদের মানসম্ভ্রমকে আরও বাড়াইয়া তুলিল।

আর্য্যেরা তাহাদের নব-রাজ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যাইতে-যাইতে উহারা এক শ্যামবর্ণ জাতির সংস্পর্শে আসিল। বিদ্যাবুদ্ধিতে নিকৃষ্ট মনে করিরা, উহারা তাহাদিগকে দূরে হটাইয়া দিল। এই বিরোধ, নিরাপদ হইবার উপায় চিন্তা, বিজিতদিগের প্রতি অবজ্ঞা—এই-সমস্ত কারণে বিজেতাদিগের মধ্যে একটা স্বাভাবিক রুদ্ধদ্বারিতা জাগিয়া উঠিল; নিজ বিভাগসমূহের বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, সমস্ত ধর্ম্মবিশ্বাস, সমস্ত অন্ধসংস্কার আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইল। আদিম অধিবাসীগণ বিজেতার অধীনে আসিলেও তাহাদের অধীনতার বন্ধন খুবই শিথিল ছিল। আর্য্যেরা সেই আদিমবাসী জনসঙ্ঘকে পরিত্যাগ করে। বিজেতারা যে ধর্ম্মবিশ্বাস সঙ্গে আনিয়াছিল,—একটু আগেই হউক, বা একটু পরেই হউক,—সেই-সব ধর্ম্মবিশ্বাস ঐ আদিমবাসীরা প্রাপ্ত হইল—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহারা আর্য্যদিগের সমান ভূমিতে উঠিতে পারিল না। আর্য্যেরা স্বকীয় অধিকৃত বিস্তীর্ণ দেশে ক্রমশ ছড়াইয়া পড়িলী। সংগ্রামের সংঘর্ষে ও ঘটনাবিপর্য্যয়ে আর্য্যদিগের আদিম মণ্ডলীগুলি বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। যে কঠোর বংশ-ঘটিত নিয়ম উহাদিগকে একসূত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল :—ভৌগোলিক নৈকট্য ও অন্যান্য সুবিধা-অনুসারে, এই-সকল মণ্ডলী আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিল।

ক্রমশ অপেক্ষাকৃত কম গতিশীল জীবনের বিবিধ প্রয়োজন লোকের স্কন্ধে চাপিয়া বসিল। যে জীবন বেশী স্থিতিশীল হইয়া পড়িয়াছিল তাহা পশুচারণ ও কৃষিঘটিত শিল্পের গ্রামসমূহে আড্ডা গাড়িল। গোড়ায় এই গ্রামগুলি আত্মীয়তার পত্তনভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়; কারণ, বংশের নিয়ম ও গোষ্ঠীর নিয়ম স্বকীয় সর্ব্বপ্রধান প্রভুত্ব বজায় রাখিয়াছিল; ধর্ম্মানুমোদিত চিরাগত প্রথাসকল বরাবর পালিত হইয়া আসিতেছিল। অপেক্ষাকৃত বদ্ধমূল অভ্যাসাদি হইতে, ক্রমে পরিপক্ক সভ্যতা-সুলভ প্রয়োজন ও ব্যবসায়াদি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। গ্রাম-সমবায় হইতে ব্যবসায়-সাম্যই উৎপন্ন হউক, অথবা এক ব্যবসায়ের লোক কাছাকাছি স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া, অপরিহার্য্য প্রয়োজনের বশে, একই ছাঁচের সমাজ গড়িয়াই তুলুক—এইরূপে, কতকগুলি দলবদ্ধ ব্যবসায়সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল।

কালক্রমে দুইটি তথ্য বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল :—সর্ব্বত্র স্পষ্ট স্বীকার করা হউক বা না হউক, জাতিসমূহের মধ্যে একটা মিশ্রণ ঘটিয়াছিল; বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আর্য্যদিগের যে ধারণা ছিল, সেই-সকল ধারণা এই সঙ্কর জনসমূহের মধ্যে, এমন কি খাঁটি আদিমবাসীদিগের মধ্যেও প্রবেশলাভ করিল। উহা হইতেই দুই শ্রেণীর সঙ্কোচ উৎপন্ন হইল। এক, বংশের বিশুদ্ধতা-মূলক সঙ্কোচ; আর-এক, ব্যবসায়ের বিশুদ্ধতা-মূলক সঙ্কোচ। এই দুই-প্রকার বিশুদ্ধতার ন্যূনাধিক্য-অনুসারে কতকগুলি উপবিভাগ গড়িয়া উঠিল। বংশানুক্রমিক জীবনপ্রণালীর প্রাচীন মূলতত্ত্বগুলি সমভাবে চলিয়া আসিলেও এই-সব দলবদ্ধ মণ্ডলীগুলির উপাদানে বৈচিত্র্য ছিল, যথা,—কর্ম্ম, ধর্ম্ম, দেশ-নৈকট্য ইত্যাদি; এই তত্ত্বগুলি শোণিত-সম্বন্ধরূপ আদিম মূলতত্ত্বটির পাশে আসিয়া বসিয়াছিল, কখন কখন উহারা শোণিত-সম্বন্ধের মুখোস পরিয়াও দেখা দিত। এই-সকল ক্ষুদ্র-মণ্ডলীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। নিজের ঐতিহ্য ও আর্য্য-সভ্যতা হইতে ধার-করা মত ও বিশ্বাস—এই দুইয়ের প্রভাবাধীনে, আদিমবাসীরা যে পরিমাণে, বিচ্ছিন্ন ও বর্ব্বরধরণের জীবননির্ব্বাহপ্রণালী পরিত্যাগ করিতে লাগিল—সেই পরিমাণে এই নূতন উপবিভাগ গঠনের কাজ আরও দ্রুতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন হইতেই জাত বিদ্যমান। বেশ দেখা যায়, কেমন করিয়া নীচতার বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করিয়া "জা[illegible]" কৌলিক বংশপদ্ধতি অবলম্বন করিল।

সে সময়ে কোন রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি থাকিলে, এই-সমস্ত সমাজ-গঠনকে একটা রীতিমত পদ্ধতির নিয়মাধীনে আনিতে পারিত। কিন্তু ঐ-সকল সমাজ হইতে কোন-প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা বাহির হয় নাই; এমন কি, উহার

কল্পনা পর্য্যন্ত তখন জন্মায় নাই। ইহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? পৌরোহিতিক প্রভুত্ব ইহার অনুকূল হইতে পারে না, কেননা তাহা হইলে পৌরোহিতিক প্রভুত্বের হ্রাস হয়। পুরোহিতের প্রভুত্ব অতীব প্রবল ও দৃঢ়বদ্ধমূল ছিল; উহা অভিজাত যোদ্ধ্‌বর্গের প্রভুত্বকেও পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছিল। শক্ত ফলের-আঁটির মত দেশের মধ্যে কোন একটা সংহত কেন্দ্র ছিল না—যা কিছু ছিল, সমস্তই ভাসন্ত রকমের। গোচারণের জীবন-প্রণালী, অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বকীয় ঐতিহ্য-সুলভ শান্তভাবটিকে খুব আঁটাআঁটির সহিত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; কোন-প্রকার জীবন্ত কাজের ভাব আসিয়া উক্ত শান্ত ভাবের উচ্ছেদ করিতে পারে নাই। জনসমূহ বিজিত ও সংখ্যাবহুল; আর্য্যগণ যাহাদিগকে আত্মসাৎ না করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল সেই আদিমবাসীরা সহসা আর্য্যদের বিজয়ের বশীভূত হয় নাই, বরং তাহারা ধীরে ধীরে আর্য্য-পুরোহিত-প্রচারিত মত ও বিশ্বাসের দ্বারা আক্রান্ত ও বশীভূত হইয়াছিল। বিশেষতঃ উহারা যেখানে বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক স্থানে বাস করিত, সেখানে উহারা কেবল একটু আধটু রং বদলাইয়া নিজের পুরাতন সমাজগঠনই অনেকটা বজায় রাখিয়াছিল। উহাদের সংখ্যাধিক্য, উহাদের নিতান্ত অঙ্কুরাবস্থায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানাদির দৃষ্টান্ত, এবং যেরূপ সহজে ঐ-সকল প্রতিষ্ঠান আর্য্যসমাজ গঠনের সহিত মিশিয়া যাইতে পারিত—এই-সমস্ত একটা প্রকৃত রাষ্ট্রতন্ত্র স্থাপনের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। তাই তখন রাষ্ট্রের অঙ্কুর মাত্রও দৃষ্ট হয় না।

এই গোলযোগের মধ্যে, কেবল পুরোহিতবর্গই খণ্ডাংশে পরিণত হইলেও স্বকীয় দলের সুদৃঢ় একতার ভাব রক্ষা করিয়াছে; একমাত্র পুরোহিতবর্গই সমস্ত নৈতিকবলের অধিকারী, এবং সেই নৈতিক বলের কার্য্যকারিতাও বেশ প্রকটিত হইয়াছিল। তাহারা নিজ বিশেষ-অধিকারের দৃঢ়ীকরণ ও বিস্তারসাধনের জন্য, এবং তা ছাড়া নিজ আধিপত্যের অধীনে একটা শৃঙ্খলা, একটা সুদৃঢ় যোগবন্ধন স্থাপনের জন্য সেই বল নিয়োগ করে। তাহারা তথ্যের [illegible] তত্ত্বে পরিণত করিয়া, সংহিতাবদ্ধ করিয়া, একটা [illegible]ভূত পদ্ধতি রচনা করে এবং তাহাই বিধিব্যবস্থা বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করে। ইহাই জাতের ব্যবস্থাপদ্ধতি। তাহারা বর্ত্তমান অবস্থাকে, অতীতের চিরাগত ঐতিহ্যের সহিত, সেই প্রাচীন শ্রেণীভেদপদ্ধতির সহিত মিশাইয়া দিল যে-শ্রেণীভেদপদ্ধতি তাহাদের প্রভুত্বের প্রথম পত্তনভূমি স্থাপন করে এবং যাহা সেই অবধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

স্বেচ্ছাকৃত মনগড়া দাবীদাওয়া ও প্রামাণিক তথ্য—এই দুয়ের মিশ্রণ হইতে সমুদ্ভূত এই পদ্ধতিটিও আবার একটা শক্তি হইয়া দাঁড়াইল।

দেশের যে-সকল অংশ আর্য্যেরা একটু বিলম্বে আপনার করিয়া তুলিয়াছিল, শুধু যে সেইসকল অংশেই ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মমতের মতো এই পদ্ধতিটাকে লইয়া গিয়াছিল তাহা নহে; সর্ব্বত্রই, ব্রাহ্মণ-গুরুর উপর অপরিসীম ভক্তি থাকায়, ব্রাহ্মণের মতামত আবার লোকের আচরণের উপরেও একটা প্রতিক্রিয়া প্রকটিত করিল। তাত্ত্বিক ধরণের আদর্শটা কঠোর কর্ত্তব্যনিয়মের মত যেন লোকের মনে ক্রমশ চাপিয়া বসিল। কিন্তু মতবাদের সহিত তথ্য সম্পূর্ণরূপে কথনই মিশিয়া যায় নাই।

এই প্রতিষ্ঠানটি স্বাভাবিক ভাবে বাড়িতে-বাড়িতে কোন্ পথ অনুসরণ করিয়াছিল, এইটিই এখন আমি জানিবার জন্য উৎসুক। অতএব আমি এইখানেই থামিতে পারি।

আমার মতে, জাতটা প্রাচীন আর্য্য-প্রতিষ্ঠানসমূহেরই অনুবৃত্তি—একটা 'নেজুর' বলিলেও হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতের বিশেষ-অবস্থা ও পরিবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া 'জাতে'র ছাঁচে বাহির হইয়া আসিয়াছে। এই ঐতিহ্যের পত্তনভূমিকে বাদ দিলে জাতের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না। উহাতে যে খাদ মেশান হইয়াছে, যে-সব জিনিস উহাকে পাথরের মত কঠিন করিয়া তুলিয়াছে,—সে-সমস্ত বাদ দিলে উহাকে ঠিক্ বুঝা যাইবে না।

আমার কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। আমি শুধু এই কথা বলিতেছি যে, আজিকার দিনে আমরা জাতটাকে যেরূপ ভাবে দেখিতে পাই—উহার অসংখ্য উপবিভাগ, উহার প্রকৃতিগত ও উপাদানগত বৈচিত্র্য—এইসমস্ত দেখিয়া আমার মনে হয়, প্রকৃতির অকাট্য নিয়মানুসারে উহা আদিম আর্য্য উপাদানের নিছক্ জৈবিক ধরণের একটা পরিণতি ভিন্ন

আর কিছুই নয়। ভিন্ন জাতীয় দল, পরিবর্তনশীল সমাজ-গঠনপ্রণালী, সকল সময়েই জাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এবং এখনও তাহার সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে; সেই-সব আক্রমণকারীর দল যাহাদের পদাঙ্কচিহ্নে বিজয়-মার্গ পর-পর অঙ্কিত হইয়াছে; সেই-সব আদিমবাসী জাতি যাহারা স্বকীয় বিচ্ছিন্ন বর্ব্বর অবস্থা হইতে বিলম্বে বাহির হইয়াছে; যাহাকে প্রকৃতরূপে জাত বলা যায় সেই-সব জাতের আকস্মিক খণ্ডাংশসমূহ, অথবা মিলিয়া-মিশিয়া একীভূত কতকগুলি মণ্ডলী, এই সমস্তই উহার অন্তর্ভুক্ত। আরও কিছু বেশী :—এই-সকল মিশ্রণ, যাহা বহু-প্রকার যোগাযোগে আরও বর্দ্ধিত হইয়া, বর্তমানের জাতকে এমন একটি মুখশ্রী প্রদান করিয়াছে যাহা সহসা চিনিতে পারা যায় না—ঐ-সকল মিশ্রণ যে অতি প্রাক্‌কালেই ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। পরে সুপরিস্ফুট আকার ধারণ করিলেও, এই মিশ্রণের কাজটা জাত-গঠনের আরম্ভ হইতেই সুরু হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আবার বলিতেছি :—একটা সাধারণ সিদ্ধান্তকে একটা সংক্ষিপ্ত সূত্রের ভিতর জমাট করিয়া রাখিলে, উহার মূলতত্ত্বটি অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইবার আশঙ্কা থাকে; কোন একটা কথা ঠিক্‌ হইলেও, বেশী ঠিক্‌ঠাক্‌ করিয়া বলিতে গিয়া কিংবা নূতনত্বের প্রলোভনে বেশী বাড়াইয়া তুলিতে গিয়া,—মিথ্যা হইয়া পড়ে। আমি এইরূপ বাড়াবাড়ি করিতেছি বলিয়া কেহ যেন সন্দেহ না করেন। সে বিষয়ে আমি খুব সতর্ক।

আমার বিবেচনায়,—ভারতের আর্য্যেরা বহিঃপ্রভাবের যতই বশবর্ত্তী হউক না কেন, ঐতিহাসিক ঘটনাবিপর্য্যয়ে যতই বিচলিত হউক না কেন, জাতের প্রধান উপাদান-গুলিকে, তাহারা আপনাদের ভিতর হইতেই বাহির করিয়াছিল। ভারত যে-পদ্ধতি অনুসারে চলিয়াছে তাহা শুধু একটা ব্যবসায়-ঘটিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নহে, তাহা শাখাজাতি ও বিদেশীয় শত্রুজাতির একটা বর্ব্বর ধরণের গোলমেলে কাণ্ড নহে, তাহা শুধু শ্রেণীগত সোপান-পরম্পরার পদ্ধতিও নহে, পরন্তু উহা ঐ-সমস্তেরই মিশ্রণ,—কতকগুলি সমসাধারণ ধারণা ও সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গোড়ায় আর্য্যদিগের যে গার্হস্থ্য পদ্ধতি ছিল, তাহারই প্রভাব নবোত্থিত স্বাধীন মণ্ডলীসমূহের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়াছে। আর্য্যদিগের পারিবারিক ব্যবস্থাই পরবর্ত্তী সমস্ত পরিবর্ত্তনের কেন্দ্র-কীলক।

ভারতের আর্য্যেরা ও প্রাচীন রোম-গ্রীশের আর্য্যেরা একই সূত্র-স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিল, কিন্তু উভয়ের পরিণাম-ফল কত বিভিন্ন!

গোড়ায়, একই মণ্ডলীগুলি, একই মত ও বিশ্বাসের দ্বারা, একই আচার-ব্যবহারের দ্বারা পরিশাসিত। গ্রীশ ও ইটালি দেশে এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীগুলি একত্র সম্মিলিত হইয়াছে, প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। উহারা আপনাদের মধ্যে একটা সুব্যবস্থিত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রত্যেক মণ্ডলী স্ব-স্ব কার্য্যক্ষেত্র, সম্পূর্ণ স্ব-শাসনতন্ত্র বজায় রাখিয়াছিল; কিন্তু, যে উপরিতন সম্মিলিত-মণ্ডলী city রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই city সাধারণ স্বার্থের তত্ত্বাবধান করিত, সাধারণের কার্য্য নিয়মিত করিত। গ্রীক্‌দের হস্তে, বিশৃঙ্খল আকারহীন জিনিসগুলা একটা আকার প্রাপ্ত হইল। বিচ্ছিন্ন পদার্থসকল একটা বৃহত্তর ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইল। যে পরিমাণে ইহা সফলতা লাভ করিল, সেই পরিমাণে উহার ভিতরে যে নূতন তত্ত্বটি নিহিত ছিল সেই রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের একটা অস্ফুট রেখাচিত্র বাহির হইয়া পড়িল। জাতের মতো "সিটি"ও সাধারণ আদিম ব্যবস্থা-পদ্ধতি হইতে সমুৎপন্ন; একই-প্রকার ধর্ম্মসংক্রান্ত নিয়ম ও একই ঐতিহ্যের ছাঁচের মধ্য দিয়া, পরন্তু অভিনব প্রয়োজনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, এই 'সিটি' এক অভিনব সমাজপদ্ধতির তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিল; আত্ম-সম্প্রসারণের শক্তি ও নির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘনের সামর্থ্যও উহার মধ্যে প্রকাশ পাইল। আরও কিছুকাল পরে, ঐ শক্তি রূপান্তরিত হইয়া, আচার-ব্যবহার ও শাসনশক্তির বিপ্লব-জনিত নূতন-নূতন প্রয়োজন সাধনের পক্ষেও পর্য্যাপ্ত হইল।

ভারতে জাত প্রাচীন আচার ব্যবহারেরই অনুসরণ করিয়াছে, অনেক বিষয়ে উহা পরিপুষ্ট করিয়াও তুলিয়াছে; কিন্তু যে আবেগ হইতে আদিম মণ্ডলীগুলি সমুৎপন্ন হয় সেই আবেগ ভারত কতকটা হারাইয়াছিল, এবং সেই ভাবটা ভারতে আর নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে নাই। যে বংশ-তত্ত্বের বন্ধনে আদিম মণ্ডলীগুলি আবদ্ধ ছিল, তাহার সহিত

বিভিন্ন ধারণা ও সংস্কার আসিয়া মিশিল বা তাহার স্থান অধিকার করিল। কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও জাতে পরিণত হইয়া এইসকল ধারণা আপনাদের ভিতর হইতে একটা নিয়ামক তত্ত্ব বাহির করিতে পারিল না। এইসকল জাতের সংখ্যাবৃদ্ধি হইল,; প্রত্যেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া সতর্কভাবে স্ব-শাসনতন্ত্র অনুসরণ করিয়া চলিল। জাতের কাঠামটা বিশাল; উহার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই, একটা স্বাভাবিক জীবনীশক্তি নাই; একটা সাধারণ সমতলের উপর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র সমাজ যেন বিশৃঙ্খল জড়পিণ্ডের ন্যায় অবস্থিত।

অন্যান্য সমজাতীয় ভাষা হইতে, ভারতীয় প্রাচীন ভাষার একটা পার্থক্য আছে। সে পার্থক্যটা খুবই নজরে পড়ে। বাক্যের মধ্যে সমাপক ক্রিয়ার বড় একটা স্থান নাই; বক্তব্য কথাটা দীর্ঘ সমাজবদ্ধ হইয়া গড়াইয়া চলে; অনেক সময় পরস্পর সম্বন্ধটা অস্পষ্ট। যে বাক্যরচনার মধ্যে অভিপ্রায়টা সুস্পষ্ট, যাহার আনুসঙ্গিক অংশগুলি পৃথক ভাবে ব্যক্ত হইয়া পরিস্কারভাবে থামিয়া যায়, সেইরূপ বাক্যরচনার স্থলে, ভারতীয় প্রাচীন ভাষার বাক্যরচনা একটু থল্‌থলে 'ধরণের, বাক্যের অংশগুলা কেবল সমানভাবে পাশাপাশি বসানো,—কাহাকে বেশী স্পষ্ট করিয়া চোখের সাম্‌নে আনা হয় না। ভারতীয় ধর্ম্মগুলির ভিতর, সুনিশ্চিত-রকমের বড় একটা বাঁধা-মত নাই। অস্পষ্ট-আকার জগৎ-ব্রহ্মবাদের ভাসন্ত রেখাগুলির মধ্যে,—বিরোধ ও পার্থক্য যাহা কিছু থাকে, সমগ্র চলন্ত পিণ্ডের বেগে সে-সমস্ত যেন চূর্ণ হইয়া যায়। বিরোধগুলি শীঘ্রই সমন্বয়াত্মক সমষ্টির ভিতরে মিলাইয়া যায়,—এইরূপে সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের বড় একটা তেজ থাকে না। সমন্বয়কারী সনাতন ধর্ম্মমত, স্বকীয় বৃহৎ আচ্ছাদন-বস্ত্রের ভিতর সমস্ত মতভেদকে ঢাকিয়া রাখে। নির্দ্দিষ্ট মতের কোন অংশই একেবারে বদ্ধ নহে, একেবারে অলঙ্ঘনীয় নহে। সামাজিক বিভাগে, ইহারই অনুরূপ এক ব্যাপার আমরা জাতপদ্ধতির ভিতরে দেখিতে পাই। সর্ব্বত্রই সেই একটা শক্তিহীন থল্‌থলে ভাব।

বাহ্য ঐতিহাসিক অবস্থা হইতে যতই রস সংগ্রহ করুক না কেন, জাতটা হিন্দু-মনোভাবেরই পরিণামফল। হিন্দু কাব্যের সহিত গ্রীক্ ট্র্যাজেডির যে সম্বন্ধ, ভারতীয় সমাজ গঠনের সহিত, প্রাচীন গ্রীসের "সিটি" গঠনের সেই সম্বন্ধ। যেমন শিল্পকলায় তেমনি জীবনের ব্যবহারেও, হিন্দুপ্রতিভা সুপ্রণালীসঙ্গত সুব্যবস্থা স্থাপনে অর্থাৎ সুপরিমাণ ও সৌসামঞ্জস্য স্থাপনে কদাচিৎ সমর্থ হইয়াছে। জাতের সম্বন্ধে হিন্দুপ্রতিভা কতকগুলি রুদ্ধদ্বার মণ্ডলীগঠনে সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াছে—তাহাদের মধ্যে একটা সমসাধারণ কার্য্য প্রবাহিত নাই, পরস্পরের মধ্যে কোন ঘাত প্রতিঘাত নাই, পুরোহিত-বর্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী একদিক্-ঝোঁকা প্রভুত্বের কার্য্যপ্রবর্ত্তনী শক্তি ছাড়া আর কোন প্রবর্ত্তনী শক্তি নাই; সর্ব্বসাধারণের মনকে পূর্ণগ্রাস করিয়া পুরোহিতবর্গই তাহাকে যথেচ্ছা পরিচালিত করিতেছে। মহাকাব্যের অস্পষ্ট একতার মধ্যে যেমন বিভিন্ন খণ্ড-উপাখ্যানের পরস্পর সংঘর্ষ, সেইরূপ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সমতলক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের সচঞ্চল গতিবিধি পরিলক্ষিত হয়। একটা কৃত্রিম পদ্ধতি অনুসারে, বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে শাস্ত্রসিদ্ধান্তের দ্বারা ঢাকিতে পারিলেই যেন যথেষ্ট হইল।

ভাল করিয়া দেখিলে, জাতের ক্রমপরিণতি ভারত-মনস্তত্ত্বের একটা শিক্ষাপ্রদ পরিচ্ছেদ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমাপ্ত।

বাঙালী পল্টনের গান

এক হ'ল আজ অষ্ট বজ্র,—যুদ্ধ ভয়ঙ্কর!
শঙ্কাহারীর ডঙ্কা বাজে বক্ষে নিরন্তর!
মর্দ্দ যারা মর্‌তে জানে—নেই কিছু কেয়ার,
হাত আছে যার সেই ছুটেছে ধর্‌তে হাতিয়ার।
সাঁচ্চা পুরুষ-বাচ্চা যারা নাচ্‌ছে তাদের মন,
মরুক বাঁচুক কর্‌বে লড়াই—এই সে আকিঞ্চন।
এমন দিনে ঘরের কোণে কে পারে থাক্‌তে?
মন আমাদের যুদ্ধে গেছে কেহই না ডাক্‌তে।
শরীর শুধুই পিছিয়ে মোদের, এগিয়ে গেছে মন—
মানস-লোকে মার্চ্চ্ করে যায় বাঙালী পল্টন!

মন আমাদের খাকী পরে সেজেছে সোল্‌জার,
এমন সময় হুকুম এলো—পরোয়ানা রাজার !
পরোয়ানা এ প্রাণ-মাতানো—এমন দেখি নাই,
মন এতদিন যা চেয়েছে আজ পেয়েছি তাই ।
জোয়ান্ ! তোমার জোয়ানী আজ দেখ্‌বে জগতে
ঘরের পরের বাড়্‌বে আস্থা তোমার তাগতে ;
অস্ত্র ধর ! প্রাণের আদেশ কর্‌বে কে পালন ?
বেরিয়ে পড় ! বেরিয়ে পড় ! বাঙালী পল্‌টন্ !

অস্ত্র-দীক্ষা সমর-শিক্ষা নতুন তোমার নয়,
চারযুগই যে দিচ্ছে তোমার শৌর্য্য-পরিচয় ;
দিগ্‌বিজয়ী রঘুর সঙ্গে তোমরা যুঝেছ,
কীর্ত্তি রঘুর গঙ্গা-স্রোতে হেলায় মুছেছ ।
আঠারো দিন বিষম লড়াই কর্‌লে অহর্নিশ
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে বঙ্গ-প্রাগ্‌জ্যোতিষ্ ।
শৌর্য্যে তোমার গৌড়েতে রাজলক্ষ্মী আকৃষ্টা,
তোমার বাহু কর্‌লে কপিল্-বাস্তু প্রতিষ্ঠা,
তোমার সৃষ্টি সাতগাঁ এবং শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন,
কান্‌সোনা সে তৈরী তোমার বাঙালী পল্‌টন ।

শক্-হূণে আতঙ্ক মোদের কিসের ? তা ভাই বল্,
রাক্ষসেদের লঙ্কা কেড়ে বানিয়েছি সিংহল ।
গঙ্গার আ'লে বসত্ করি আমরা বাঙালী
যার নামে গ্রীক্ সৈন্য হঠাৎ সাহস-কাঙালী ।
কাশ্মীরেতে হুঃসাহসী নিশান উড়ালে,
রাজার ইষ্টদেবের মূর্ত্তি ক্রোধে গুঁড়ালে,—
কেশাগ্র কেউ নার্‌ল ছুঁতে—চক্ষে হুতাশন,
মেঘের মতন আওয়াজ গলার বাঙালী পল্‌টন ।

* * *

রাজ্য-হারা জয়াপীড়ের তোমরা হে সহায়,
আর্য্যাবর্ত্ত জয় ক'রে থোও পাল-রাজাদের পায়,
হাতীর হল্‌কা ছুট্‌লো তোমার দক্ষিণাপথে,
মগ-মোগলে রুখ্‌লে তুমি নৌকাতে রথে ।

নিমক্-হারাম হয়ে যেদিন মুলুক খোয়ালে
বৃদ্ধ রাজার [illegible] মাথা নোয়ালে
হু'দিন পরেই বাংলা ছেড়ে নিশান অগণন
উড়্‌ল তোমার কাংড়া-গড়ে ! বাঙালী পল্‌টন !

সিংহবাহুর তোমরা বাহু দৃপ্ত সুবিশাল,
চাঁদ-প্রতাপের কেদার রায়ের তোমরা খাঁড়া ঢাল !
শশাঙ্ক আর গণেশ রাজার সাঁজোয়া বজ্রসার
তোমরা বিজয়সিংহ দেবের পাথর যে কেল্লার !
ফ্রান্সে তোরা অস্ত্র ধরিস্ ভীষণ বিপ্লবে,
ব্রেজিলেতে সৈন্য চালাস্ অমর গৌরবে ;
নাম্‌জাদা লাল পলটনে, ভাই, তোরাই ছিলি, শোন,
এম্পায়ারের ভিৎ গেড়েছে বাঙালী পল্‌টন ।

আজ্‌কে আবার ডাক এসেছে যুদ্ধে যাবার ডাক
লাভ ক্ষতি কে খতিয়ে দ্যাখে ? হিসাব এখন থাক ।
বেরিয়ে পলাম স্পন্দনেতে বৃহৎ জীবনের
কুচ্-কাওয়াজের ছন্দে মেতে আনন্দে মনের !
অনেক লোকের সঙ্গে যাব, যাব অনেক দূর,
পর্‌ব খাকী, ধর্‌ব কিরীচ্, এই সুখে ভরপুর
বুকের বলে কর্‌ব মোরা অসাধ্য-সাধন
কাম্ দ্যাখালেই কম্যাণ্ড পাবে বাঙালী পলটন ।

পরোয়ানা ভাই পেইছি যখন কুছ্ পরোয়া নেই,
কাঁধে সঙীন্ উড়িয়ে মোরা চলব এগিয়েই ;
কি পাই, না পাই, আমরা তা ভাই মোটেই ধরিনে
মার্চ্চ করে যাই গোলার মুখে খেয়াল করিনে ।
কিছুই চাওয়ার ধার ধারিনে আজ মোরা বিলকুল
বীরের বরণ লাভ ক'রে মন ফূর্ত্তিতে মশ্‌গুল্ ।
যশের পথে জয়ের পথে চল্‌ছে ছুটে মন
উড়িয়ে নিশান গান গেয়ে চল্ বাঙালী পলটন ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

আত্মিক শক্তির প্রয়োগ।

আষাঢ়মাসের প্রবাসীতে বিবিধপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলাম, "আমাদিগকে স্বশাসনক্ষমতা না দিলে আর চলিতেছে না, এইরূপ অবস্থা না দাঁড়াইলে, অর্থাৎ ইংলণ্ডের উপর চাপ না পড়িলে, ইংলণ্ড আমাদিগকে হোমরূল বা স্বরাজ্য দিবে না, ইহা নিশ্চিত। সেরূপ অবস্থা দাঁড় করাইবার প্রথম উপায়, আমাদের নিজেদের এই বিশ্বাস দৃঢ় ও স্বাভাবিক হওয়া, যে, মুক্ত মানুষই মানুষ।" "দ্বিতীয় উপায়, যাহাতে "আত্মমর্য্যাদার হানি হয় এরূপ কোন কাজ করিতে বা এরূপ কোন অবস্থায় পড়িতে বা থাকিতে রাজী না হওয়া।" "উপরে ইংলণ্ডের উপর চাপ পড়ার উল্লেখ করিয়াছি। কোন-প্রকারের দৈহিক বা আত্মিক বল প্রয়োগ দ্বারা এই চাপ দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে; তাহাতে সিদ্ধিলাভ হইবে না। আমরা যে চাপের কথা বলিতেছি, তাহা মানসিক ও নৈতিক বলের উপর নির্ভর করে। যিনি নিজে কাহারও অনিষ্ট করিবেন না, কাহাকেও আঘাত করিবেন না, কিম্বা নিজের বা দেশের পক্ষে যাহা অনিষ্টকর বা অপমানজনক তাহাও মানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত ক্ষতি ও ক্লেশ এবং দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাধা সত্ত্বেও তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন, এবং সেই চেষ্টা করিতে গিয়া প্রয়োজন হইলে নিজে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সহ্য করিবেন,—এরূপ মানুষই এই-প্রকার মানসিক ও নৈতিক বল প্রয়োগ করিতে পারেন। সকল দেশের সকল মানুষের সকল অবস্থাতেই দুর্গতিমোচনের প্রকৃষ্ট উপায় কি, আমরা বিশেষ আলোচনা না করিয়া বলিতে পারি না। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই বলিলাম।"

আমরা এই-যে শক্তির প্রয়োগের কথা লিখিয়াছিলাম, তাহাকে ইংরেজীতে Passive Resistance (প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স) বলে। এই নামটি সুনির্ব্বাচিত নহে; কারণ যাহারা এইরূপ শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা সকল অবস্থাতে প্যাসিভ বা নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। ইহাকে বাংলায় আত্মিক শক্তির প্রয়োগ বলা যাইতে পারে। কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ কোন আইন বা নিয়ম করেন বা হুকুম দেন, যাহা ন্যায়সঙ্গত বা ধর্ম্মসঙ্গত নহে, বা যাহা দ্বারা মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও অধিকার লুপ্ত হয়, তখন সেই দেশের যে-কোন লোক, আত্মার বল থাকিলে বলিতে পারে, "আমি এই আইন, নিয়ম বা হুকুম মানিব না। যাহা করিতে নিষেধ করা হইতেছে, তাহা করিব; যাহা করিতে আদেশ করা হইতেছে, তাহা করিব না।" প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সের ইহাই মূলমন্ত্র।

ভারতবর্ষের যেসব লোক দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করেন, তাঁহাদের উপর অন্যায় নিয়ম জারি হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে শত শত লোক শ্রীযুক্ত মোহনদাস কর্মচাঁদ গান্ধি মহাশয়ের নেতৃত্বে নিয়ম অমান্য করিয়া বারবার জেলে গিয়াছিলেন, এবং নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ও ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন; কাহারও কাহারও মৃত্যু হইয়াছিল। তাহাতে আংশিকভাবে তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট প্রকাশ্য বক্তৃতায় তাঁহাদের এই আত্মিক বলপ্রয়োগ নীতির সমর্থন করিয়াছিলেন। কয়েকমাস পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধি বিহারে এইপ্রকারে মনের জোর দেখাইয়া নিজের জিদ বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। বিহারে ইংরেজ নীলকরদিগের দ্বারা রায়তদের উপর অত্যাচার হয়, ইহা বিহারের কোন কোন প্রধান লোকের নিকট শুনিয়া তিনি চম্পারন জেলায় স্বয়ং এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে যান। তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট্ জেলা ছাড়িয়া যাইতে হুকুম করেন। তিনি হুকুম অমান্য করায় তাঁহার বিচার হয়। তিনি আদালতে বলেন, যে, তিনি যে কর্ত্তব্য পালন করিতে চম্পারনে আসিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না; ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অমান্য করায় যদি জেলে যাইতে হয়, তাহাতে তিনি রাজি আছেন। বিচারক সেদিন রায় দেওয়া স্থগিত রাখেন। পরে গবর্ণমেণ্ট মোকর্দ্দমা তুলিয়া লন। তাহার পর বিহারে রায়তদের উপর অত্যাচার হয় কি না, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে; গান্ধি মহাশয় তাহার অন্যতম সভ্য।

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে কেহ কেহ এই প্রকার আত্মিক শক্তির প্রয়োগ করিবেন, বলিয়া বোধ হইতেছে। সকল ক্ষেত্রেই যে হাতে হাতে সিদ্ধিলাভ হইবে, তাহা নয়। কিন্তু হীনতা স্বীকার না করিয়া আত্মিক বল প্রয়োগ করাই যে ঠিক্, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং সকলে একযোগে এই নীতি অনুসারে কাজ করিতে পারিলে শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে যে সিদ্ধি লাভ হয়, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এক একজন মানুষ নিজের দায়িত্বে নিজে এই নীতি যখনই দরকার মনে করেন, অবলম্বন করিতে পারেন, কারণ যদি তজ্জন্য জেলে যাইতে বা নির্ব্বাসিত হইতে হয়, তাঁহাকেই যাইতে হইবে। কিন্তু যদি কোন দলের লোকদিগকে এই পন্থার অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে শান্ত ভাবে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে সেই দলের লোকদের মধ্যে পরস্পরের সহিত যোগ খুব দৃঢ় কি না। তদ্ভিন্ন, ইহাও স্থির করিতে হইবে, যে, কোন্ আইন বা হুকুম সকলেই অমান্য করিতে পারেন, বা কোন্ ট্যাক্স সবাই দিতে অস্বীকার করিতে পারেন। কংগ্রেস ও মস্‌লেম লীগের-কমিটি, এই নীতি অবলম্বন আবশ্যক ও সমীচীন কি না, বিবেচনা করিয়া অক্টোবরে শেষ সিদ্ধান্ত করিবেন। দলের পক্ষে কিছু বিলম্ব অনিবার্য্য,—কতটা বিলম্ব তাহা বলা যায় না। কিন্তু এক একজন মানুষের পক্ষে এতটা বিলম্ব আবশ্যক না হইতে পারে। মান্দ্রাজের সার্ সুব্রহ্মণ্য আইয়ার ত এখনই এই পথের পথিক হইতে প্রস্তুত, এবং অন্যকেও সেই পরামর্শ দিতেছেন।

আত্মিক বল প্রয়োগের সপক্ষে একটি কথা বলা যায়, যাহা বিদ্রোহের সপক্ষে বলা যায় না। যিনি আত্মিক বল প্রয়োগ নীতির অনুসরণ করিয়া কোন আইন, নিয়ম বা হুকুম অগ্রাহ্য করেন, তাঁহার বিবেচনার ভুল হইলে তাঁহাকেই ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, গবর্ণমেণ্টের বা কোন রাজকর্ম্মচারীর কোন ক্ষতি হয় না।

ভারতবর্ষে কেন এখন অনেকে এই নীতির অনুসরণ করা প্রয়োজন মনে করিতেছেন, তাহা সংবাদপত্র-পাঠকেরা অবগত আছেন।

প্রতিবাদের অধিকার।

নিজের উপর বা অন্যের উপর অত্যাচার হইতে দেখিলে সুস্থ প্রকৃতির মানুষ মাত্রেই মুখ ফুটিয়া মনের ভাব প্রকাশ করে, শিশুরা পর্য্যন্ত করে। কুকুর প্রভৃতি জন্তুরাও করে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তি ও অধিকার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও অধিকার। ইহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে দিয়াছেন, তবে আমরা পাইয়াছি কিম্বা ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া এই অধিকার আমাদের আছে, নতুবা থাকিত না, ইহা সত্য নহে। সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হুকুমের জোরে বা আইন করিয়া আমাদের এই স্বাভাবিক অধিকার লোপ করিতে পারেন, ইহাও সত্য নহে। আইন যেমনই হোক না, অতি-উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরাও যাহাই হুকুম করুন না, এই অধিকার আমাদের আছে ও থাকিবে। এই অধিকার রক্ষা করা মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কোন দেশেই বিনা ক্লেশে এই অধিকার রক্ষিত হয় নাই, ভারতবর্ষেও হইবে না।

নির্ব্বাসিত, অবরুদ্ধ বা নজরবন্দী শত শত বাঙালীর ন্যায়, বিনা বিচারে শ্রীমতী এনি বেসাণ্ট ও তাঁহার দুজন সহকারীর স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা জেলে অন্য কয়েদীদের সঙ্গে বা নির্জ্জন কক্ষে, আবদ্ধ হন নাই; বিশেষ কোন একটি শহরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের বক্তৃতা করিবার বা কিছু লিখিয়া প্রকাশ করিবার অধিকার লুপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের খবরের কাগজে ইহার প্রতিবাদ হইয়াছে ও হইতেছে; প্রকাশ্য সভায় ইহার প্রতিবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। বাংলা দেশেও দুচার জায়গায় এরূপ সভা হইয়াছে। কলিকাতাতেই ভারতসভাগৃহে কলিকাতার অনেক প্রধান লোক সম্মিলিত হইয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহার পর কথা হয়, যে, টাউন হলে এক সভায় প্রতিবাদ করা হইবে, এবং তথায় বঙ্গের সব জেলার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে মিঃ কামিং ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এই সভার কয়েকজন উদ্যোক্তাকে ডাকিয়া এই জানাইয়াছিলেন যে বাংলা গবর্ণমেণ্ট টাউন-হলে এই সভা হইতে দিবেন না; কেবল, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের একটি কাজের প্রতিবাদ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সভা হইতে দিতে

পারেন না; অন্য প্রদেশে যাহা হইতেছে, তাহার প্রতিবাদ বা আলোচনা বাংলাগবর্ণমেণ্ট বঙ্গে হইতে দিতে পারেন না; কেহ সভা করিয়া প্রতিবাদাদি করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করিবেন, ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন বাঙালী ঢাকায় গিয়া এ বিষয়ে বঙ্গের লাটের সহিত কথা কহার পর গবর্ণমেণ্টের হুকুম অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু কাগজে দেখিতেছি যে লাটসাহেব মনে করেন যে কখন কখন (যেমন আলোচ্য হুকুম জারি করিবার সময়) অন্য প্রদেশের সরকারী কাজের প্রতিবাদ করা অবৈধ ও গর্হিত, সুতরাং তাহা করিতে দেওয়া যায় না। অতএব বিচার করিয়া দেখা যাক যে এক প্রদেশের শাসকদের কাজের বিচার অন্য প্রদেশের লোকদের করিবার অধিকার আছে কি না।

এক দেশের লোক বা রাজা অন্য দেশের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলে তৃতীয় কোন দেশের লোক প্রতিকারের চেষ্টা করিতে পারেন, করেন, এবং তাহা করা কর্ত্তব্য। ইহার বিস্তর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধেও ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ইংরেজরা বলিতেছেন যে তাঁহারা বেলজিয়ম ও সার্বিয়ার স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছেন। এক দেশের রাজশক্তি বা রাজা বা কোন রাজপুরুষ ঐ দেশের লোকদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে অন্য দেশের লোকে যে তাহার প্রতিবাদ, সমালোচনা ও প্রতিকার চেষ্টা করিতে পারে, করেও এবং তাহা করা কর্ত্তব্য, তাহারও দৃষ্টান্ত ইতিহাসে রহিয়াছে। গ্ল্যাডষ্টোনের জীবিতকালে তুর্কেরা বুলগেরিয়ায় অত্যাচার করায় ইংরেজরা তাহার খুব প্রতিবাদ করিয়াছিল।

এইরূপ ব্যবহার খুব স্বাভাবিক। কেননা, পৃথিবীর সমুদয় মানুষ পরস্পরের প্রতিবেশী, এবং পরস্পরের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে বদ্ধ। এই বোধ যত বাড়িবে, ততই, একজন মানুষকে বা জাতিকে ঘা দিলে, আর-সকলের গায়ে ব্যথা লাগিবে।

ভিন্ন-ভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে যখন এরূপ সমবেদনার ভাব রহিয়াছে, তখন একই রাজশক্তির অধীন একই দেশের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিতে চাওয়ার মত অসঙ্গত ও ব্যর্থ চেষ্টা আর কি হইতে পারে? যদি মান্দ্রাজের গবর্ণরের একটা কাজের প্রতিবাদ করা কলিকাতার লোকদের পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা ও বেআইনী কাজ হয়, তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের সবপ্রদেশের লোকদিগকে এবং বঙ্গের লোকদিগকে, কলিকাতার লোকদিগকে, ইহা করিতে দেওয়া হইল কেন? সমস্ত দেশের কাগজে, কলিকাতার কাগজে, এখনও প্রতিকূল সমালোচনা ও প্রতিবাদ চলিতেছে কেন? যদি ইহা বে-আইনী হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গের যে সব লোক মুখে এবং যে সব সম্পাদক ছাপার অক্ষরে এই কাজ করিয়াছে, ও করিতেছে, তাহাদিগকে আইন অনুসারে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা কেন হয় নাই? ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এখনও যাহা চলিতেছে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে দিবেন না বলিয়াছিলেন, ইহার মানে কি? ইহার পর তাহা হইলে ত কোন্ দিন গবর্ণর এমন হুকুমও দিয়া ফেলিতে পারেন যে এক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ কোন গর্হিত কাজ করিলে অন্য জেলার লোকে কিছু বলিতে পারিবে না।

এক প্রদেশের সরকারী যে কাজ অন্যায় মনে হইয়াছে, অন্য সবপ্রদেশের লোকেরা তাহার প্রতিবাদ বরাবর করিয়াছে। বঙ্গবিভাগের এবং অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতির নির্ব্বাসনের প্রতিবাদ সমুদয় ভারতবর্ষে হয় নাই কি? সুতরাং বাংলার লাটের খেয়ালটি কখনই টিকিত না। যদিই বা আজকার বাঙালী এইরূপ হুকুম মানিয়া হীনতায় সন্তুষ্ট থাকিতে রাজী হইত, কল্যকার বাঙালী এই কলঙ্কের ক্ষালন নিশ্চয়ই করিত।

ভারতবর্ষ কেন স্বরাজ্য পাইতে পারে না, তাহার একটা কারণ ভারতপ্রবাসী অনেক ইংরেজ এবং কোন-কোন শাসনকর্ত্তা পর্য্যন্ত এইরূপ বলিয়াছেন, যে, "ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাষা ভিন্ন, তথায় ভিন্ন-ভিন্ন জাতির বাস, একজন মান্দ্রাজী, বাঙালী, বা মরাঠা, পঞ্জাবে একজন ইংরেজের চেয়ে কম বিদেশী নহে," ইত্যাদি। এবম্বিধ আপত্তি সরল অন্তঃকরণের আপত্তি হইলে ইহার মানে এই হয়, যে, ভারতবর্ষের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের ও জাতির মধ্যে একদেশ-বোধ ও একজাতিত্ব-বোধ বাড়িলে

সমস্ত দেশকে স্বায়ত্ত-শাসন-ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে, রাজকর্ম্মচারীরাই এই ঐক্যবোধ বৃদ্ধির বিরোধিতা করিতেছেন। বিপিনচন্দ্র পাল বঙ্গে বক্তৃতা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে দিল্লী, পঞ্জাব বা সিন্ধুদেশে বক্তৃতা করিতে যাইতে দেওয়া হইবে না। বালগঙ্গাধর টিলক মহারাষ্ট্রে বক্তৃতা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে দিল্লীতে বা পঞ্জাবে যাইতে দেওয়া হইবে না। শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট মান্দ্রাজে বক্তৃতা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে মধ্যপ্রদেশে বা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে যাইতে দেওয়া হইবে না। এই-সব তাঁহাদের হুকুমের নমুনা। মহারাষ্ট্রের দুজন দেশসেবককে পরে-পরে সম্প্রতি মান্দ্রাজ হইতে সরকারী হুকুমের বলে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।* তাহার পর বাংলার শাসনকর্ত্তা বলিলেন, মান্দ্রাজী জুলুমের প্রতিবাদ বাংলায় হইতে দিবেন না। সুতরাং আমাদের স্বরাজ-লাভের বিরুদ্ধে রাজকর্ম্মচারীদের আপত্তিটার মানে কার্য্যতঃ কি এই দাঁড়াইতেছে না, যে, ভারতবাসীরা এক নহে এবং আমরা পারতপক্ষে তাহাদিগকে এক হইতে দিব না? আমাদের বুঝিবার ভুল হইয়া থাকিলে, ভুলটা কোথায়, জানিতে চাই।

যুদ্ধের সময় স্বাধীন মিত্রদেশসমূহের একের অধিবাসীরা অন্যদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূল সমালোচনা করিতে পায় না; কারণ তাহাতে উভয় দেশে যুদ্ধের সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। যেমন আমরা এখন জাপান গবর্ণমেণ্টের কোন কাজের সমালোচনা করিতে পাই না। কিন্তু বাংলা আর মান্দ্রাজ ত আলাদা-আলাদা স্বাধীন মিত্র দেশ নয়।

সকল সভ্যদেশেই দেখা যায়, যে, কোন রাজকর্ম্মচারী একটা হুকুম দিলে, সরকারী কোন বিচারক একটা রায় দিলে, তাহা তখনই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হয় না। আমাদের দেশেও কোন কোন মোকদ্দমা মুন্সেফ হইতে সদরআলা, জেলা জজ, হাইকোর্টের জজ, প্রিভি কৌন্সিলের জজ পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে এবং পৌছে। মানুষ বিচারক-পদে আসীন হইলেও তাহার ভ্রম হইতে পারে বলিয়া সভ্যদেশে এইরূপ আপীলের ব্যবস্থা আছে। বিচারবিভাগে যেমন, শাসন-বিভাগেও, ততটা না হইলেও, কতকটা ভ্রমসংশোধনের ব্যবস্থা আছে। ম্যাজিষ্ট্রেট্, কমিশনার, লাট্, বড় লাট, ভারতসচিব, পার্লামেণ্ট, উপরে উপরে আছেন। কোন প্রদেশের কোন মোকদ্দমার প্রিভি কৌন্সিলের বিচারে ভ্রম হইয়াছে মনে হইলে তাহার সমালোচনা সব প্রদেশের বেসরকারী লোকেরা ও কাগজের সম্পাদকেরা করিতে পারে ও করে। মান্দ্রাজের সকৌন্সিল গবর্ণরকে বঙ্গের সকৌন্সিল গবর্ণর মানবজাতির মধ্যে অভ্রান্ত সুতরাং সমালোচনার অতীত মনে করিয়াছিলেন কি না, বুঝিতে পারা যায় না। বিষয়টি গুরুতর বলিয়া হাস্যের উদ্রেক করিতেছে না; নতুবা, বিধাতা যদি হাসেন, তাহা হইলে তাঁহার হাস্যের কারণ ইহাতে যথেষ্ট আছে।

সেই-সব আইনই টিকে, যাহা বিধাতার বিধানের, ধর্ম্মের, অনুযায়ী। শাসনকর্ত্তাদেরও সেই-সব হুকুমই টিকে, যাহা ঐরূপ ধর্ম্মানুমোদিত-আইনের অনুযায়ী। শাসনকর্ত্তারা নিজেদের ভ্রম, আপনাদের সুবিধা, বা ক্ষমতার নেশা বশতঃ কোন একটা আইন বা নিয়ম করিয়া তদনুযায়ী হুকুম করিলেই, তাহা বৈধ বা আইনসঙ্গত হইল, বা মানুষ তাহা মানিতে বাধ্য, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এ-রকম আইনও টিকে না, এ-রকম হুকুমও টিকে না। এরূপ হুকুম করিয়া, মানুষের অন্তর-নিহিত অন্যায়ের-প্রতিবাদ-প্রবৃত্তি, অবৈধ-হুকুম অমান্য করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলা শাসকদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সকল দেশের গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীদের মত সাক্ষাৎভাবে লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বটে, কিন্তু প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ সৈন্যবল বা তদ্রূপ কোন বলের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; দেশবাসীদের সম্মতি, অন্ততঃ পক্ষে অসম্মতির অভাব, প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের ভিত্তি। এমন শক্তিশালী গবর্ণ-

* ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত করণ্ডিকর শ্রীমতী এনী বসাণ্টের নিউ ইণ্ডিয়া কাগজে কাজ করিতেন। তিনি বোম্বাই ফিরিয়া আসার পর তাঁহার জায়গায় বোম্বাই হইতে দুইজন দেশসেবক মান্দ্রাজ গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য যে সভা হয়, তাহাতে তাঁহারা বলেন যে, যদি মান্দ্রাজ হইতে তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার সরকারী হুকুম হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সে হুকুম মানিবেন না, বরং জেলে যাইবেন। সভাপতি মিঃ হর্ণিম্যান বলেন, মান্দ্রাজ হইতে বিতাড়িত প্রত্যেক বোম্বাইপ্রদেশবাসীর জায়গায় বোম্বাই দুজন করিয়া লোক পাঠাইবেন, এবং তাঁহার নিজের স্বাধীনতা লোপের অর্থাৎ নজরবন্দী বা অবরোধের হুকুম হইলে তিনি তাহা মানিবেন না। শ্রীযুক্ত যমুনাদাস দ্বারকাদাসও তাহাই বলেন।

মেন্ট পৃথিবীতে কখন ছিল না, এখনও নাই, যাহা জোর করিয়া প্রত্যেক দেশবাসীর নিকট কর আদায় করিতে পারে, কিম্বা জোর করিয়া প্রত্যেক দেশবাসীকে আইন মানিতে বাধ্য করিতে পারে। অধিকাংশ লোক কর দিতে বা আইন মানিতে বা শাসকদের হুকুম তামিল করিতে আপত্তি করে না বলিয়াই গবর্ণমেণ্ট চলে। অবশ্য অনেক লোক অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভয়ে কর দেয় বা আইন ও হুকুম মানে। কিন্তু ভয়ও কখন কখন হঠাৎ ভাঙিয়া যায়। অসম্মতির ও অবাধ্যতার প্রবৃত্তি বাড়িতে কতক্ষণ? অতএব শাসনকর্ত্তাদের এরূপ হুকুম করা ভাল নয়, যাহা অমান্য করিতে লোকের মনে জিদ জন্মে।

সম্রাট্-শাসিত রুশিয়ার রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা।

সম্রাটশাসিত রুশিয়ার মত কড়া শাসন আধুনিক সময়ে কোথাও ছিল না। রুশরা যখন সম্রাটকে পদচ্যুত করিল, ও স্বাধীন হইল, তখন এপ্রিল মাসের গোড়ায় পঞ্চাশ হাজার স্লেজ নামক চাকাহীন গাড়ী তাড়াতাড়ি সাইবীরিয়া হইতে রাজনৈতিক বন্দী ও নির্ব্বাসিতদিগকে আনিবার জন্য বরফে-ঢাকা প্রান্তরের উপর দিয়া ছুটিল; তাড়াতাড়ি, কেননা, আর ১৪।১৫ দিনের মধ্যে, বরফ গলিলে, পথ দুর্গম হইবে। ৫০,০০০ গাড়ী গিয়াছিল; ইহাতেই বুঝুন, কত লোক রাজনৈতিক কারণে সাইবীরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। রুশিয়ার বিপ্লবের পাঁচ দিন পরে এক ইর্কটাস্ক্ শহরেই ৬,০০০ নির্ব্বাসিত লোক আসিয়া উপস্থিত হয়। এমন যে কড়া শাসন, তাহাও টিকিল না। স্বাধিকার-প্রিয়তা বা অন্যায়-অসহিষ্ণুতা সব জাতির সব মানুষের মধ্যেই আছে। উহা কোথাও পাংশুস্তরে আচ্ছন্ন অগ্নিকণার আকারে অবস্থিতি করে, কোথাও বা প্রজ্বলিত শিখার মত বা দাবাগ্নির মত দৃষ্ট হয়। কিন্তু পাংশুজালে আচ্ছন্ন অগ্নি-কণাও অগ্নি। উহাও সমস্ত দেশে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিতে পারে। এইজন্য, যাহা উদারনীতিসম্মত, মানুষের স্বাধীনতার অনুকূল, সকল দেশের শাসনকর্ত্তারা তদ্রূপ শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিলেই মঙ্গল হয়। "After me the deluge", "আমার আমলের পর প্রলয় আসে আসুক", এরূপ মনের ভাব লইয়া কাহারও কাজ করা ভাল নয়। যাহা ন্যায়ানুমোদিত, যাহা মানুষের অধিকার ও আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখে, এইরূপ পথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ নীতিই রাষ্ট্রের পাকা ভিত্তি।

আমেরিকা ও ভারতবর্ষ।

গণতন্ত্রবাদী আমেরিকার লোকদের ও তাহাদের দেশনায়ক ডাক্তার উইলসনের ইংলণ্ডের সহিত যোগ দিয়া জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করিবার একটা কারণ এই ছিল যে ইংলণ্ড যদিও পৃথিবীতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লড়িতেছেন বলিতেছেন, তথাপি আয়ার্লণ্ডকে স্বরাজ বা হোমরূল দিতে পারেন নাই। আমেরিকার লোকমত এইপ্রকারে ইংলণ্ডকে বাধ্য করায় এবং আয়ার্লণ্ডকে ঠাণ্ডা না করিলে ইংলণ্ড আরও ভাল করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া, ইংলণ্ড আয়ার্লণ্ডের সব দলের, এমন কি বিদ্রোহী শিন-ফেন দলের লোকদেরও, প্রতিনিধিদিগকে আয়ার্লণ্ডের স্বরাজবিধি প্রণয়ন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এই-সব প্রতিনিধিদের মন্ত্রণার কাজ চলিতেছে। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা আমেরিকার লোকেরা ভাল করিয়া জানে না; ভারতের স্বাধিকারের দাবী ইংলণ্ডবাসী জনসাধারণের এবং সভ্যজগতের কর্ণগোচর যাহাতে না হয়, তজ্জন্য এখানে কিরূপ নীতি অবলম্বিত হইতেছে, তাহা তাহারা অবগত নহে। কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে তাহারা সব কথা জানিয়া, ইংরেজদিগকে বলে, তোমরা তোমাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অনুকূল বাণীর অনুসরণ ভারতবর্ষেও কর, তখন ক্ষমতার নেশায়-পথভ্রষ্ট রাজকর্ম্মচারীদিগকে প্রকৃতিস্থ হইতে হইবে। ইহার সম্ভাবনা কম। কিন্তু যদি এরূপ ঘটে, তাহা হইলে তাহাতে এইসব রাজভৃত্যদের প্রতিপত্তি বাড়িবে না।

আমাদের কাজ।

কিন্তু এ সব হচ্ছে অপর পক্ষের কর্ত্তব্যের আলোচনা। ইহা আমাদের পক্ষে একেবারে অনাবশ্যক না হইলেও, অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; এবং ইহা হইতে আমাদের কর্ত্তব্য নির্ণয়ের কোন সাহায্য হয় না।

যাহাদের হাতে প্রভুত্ব আছে, ক্ষমতা আছে, তাহারা আপনাদের কর্ত্তব্য করুক বা না করুক, আমাদের কর্ত্তব্যের পথ সম্মুখে পরিষ্কার পড়িয়া রহিয়াছে। "আমাদের অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, দেশের সকল লোকের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের যাহা অনুকূল, আমরা তাহা করিব; তাহাতে কেহ বাধা দিলেও করিব। ইহাতে যদি কষ্ট পাইতে হয়, সহ্য করিব।" দেশের লোকদের মনের ভাব এইরূপ হওয়া চাই। তাহা হইলে প্রকৃত কাজের অনুষ্ঠানও হইবে।

রবিবাবু ও ষ্টেটস্‌ম্যান।

ভারতবাসীদের বিরোধী ইংরেজী কাগজ এদেশে যতগুলা আছে, তাহার মধ্যে ষ্টেটস্‌ম্যান একখানা প্রধান কাগজ। এই কাগজটাতে লেখা হইয়াছে,—

Sir Rabindranath Tagore, has received much generous admiration from the English people in India and at Home. In the *Atlantic* monthly he reciprocates this kindness by an article on "Nationalism in the West," in the course of which he writes as follows ;—"This abstract being, the nation, is ruling India. We have seen in our country some brand of tinned food advertised as entirely made and packed without being touched by hand. This description applies to the governing of India, which is as little touched by the human hand as possible. The governors need not know our language, need not come into personal touch with us except as officials ; they can aid or hinder our aspirations from a disdainful distance, they can lead us on a certain path of policy and then pull us back again with the manipulation of office red tape ; the newspapers of England, in whose columns London street accidents are recorded with some decency of pathos, need take but the scantiest notice of calamities happening in India over areas of land sometimes larger than the British Isles." Statements of this kind published for a constituency which has no means of judging their merits, make one wonder why Sir Rabindranath Tagore accepted a knighthood from a Government of which he thinks so poorly.

ষ্টেটস্‌ম্যানের তাহা হইলে কি ইহাই বলা অভিপ্রায় যে মানুষ যাহাতে নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য কথা না বলে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট উপাধিরূপ ঘুষ দিয়া থাকেন? অনেক ইংরেজ যে রবিবাবুর বহিগুলির আদর করিয়াছেন, তাহারও উদ্দেশ্য কি এই যে তিনি যেন ভবিষ্যতে ইংরেজ "নেশ্যন" বা গবর্ণমেণ্টের সত্য দোষত্রুটি না দেখান? নিখুঁত কোন জাতি বা গবর্ণমেণ্ট নাই। এরূপ পাগল বা ভণ্ড কি কেহ আছে যে বলিবে যে ব্রিটিশ জাতির বা গবর্ণমেণ্টের কোন দোষ নাই? ষ্টেটস্‌ম্যানেও ত গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা বাহির হয়? রবিবাবুও কি ব্রিটিশজাতির বা গবর্ণমেণ্টের কেবল নিন্দাই করিয়াছেন? তাহা ত নয়। আমরাও তাঁহার এই প্রবন্ধ পড়িয়াছি।

রবিবাবু ত উপাধি পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করেন নাই। ষ্টেটস্‌ম্যান যদি তাঁহার উপাধিটা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রত্যাহার করাইতে পারেন, তাহা হইলে কাহারও কোন দুঃখ হইবে না।

অন্যায়ের প্রতিবাদ ও ন্যায়ের অনুষ্ঠান।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করা একান্ত কর্ত্তব্য; কিন্তু কেবল তাহাতেই কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি হয় না, এবং দেশেরও উন্নতি হয় না। ন্যায়ের অনুষ্ঠানও করিতে হইবে; তাহাই প্রধান কাজ। ইহা ভুলিলে চলিবে না, যে, স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে জাতিধর্ম্মবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষকে মানুষ হইবার, মানুষের মত স্বাস্থ্য শক্তি জ্ঞান ধর্ম্ম ও আনন্দ লাভ করিবার, সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। আমরা এইজন্যই স্বরাজ চাই, যে স্বরাজ পাইলে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের উন্নতির সুবিধা হইবে।

স্বরাজের যোগ্যতা।

ভারতবাসীদের স্বরাজলাভের বিরোধীরা সচরাচর যে-সব আপত্তি করিয়া থাকেন, আমরা "টুআর্ড্‌স্ হোমরুল" নামক দুইভাগ পুস্তকে তাহা খণ্ডন করিয়াছি। বিরোধীরা ভারতবর্ষে যে-সব দোষত্রুটি আছে বলেন, আমরা দেখাইয়াছি যে সে-সব দোষত্রুটি স্বাধীন বা স্বশাসক অনেক দেশে এখনও আছে, কিম্বা এইরূপ দেশগুলি যখন স্বাধীন বা স্বশাসক হইয়াছিল, তখন তাহাদের এইরূপ দোষত্রুটি ছিল। এইরূপ যুক্তির অর্থ এরূপ বুঝিতে হইবে না, যে, এই-সব দোষত্রুটি ভাল। ইহার মানে এই যে এইসব দোষ সত্ত্বেও যেমন অন্য জাতিরা স্বাধীন হইয়াছে বা স্বশাসন-ক্ষমতা পাইয়াছে, এবং ক্রমশঃ আপনাদের দোষ শুধরাইয়া লইতেছে, আমরাও তেমনি শুধরাইব। আমাদের চরিত্র আরও ভাল করিতে হইবে, সামাজিক পবিত্রতা বৃদ্ধি ও রক্ষা করিতে হইবে, সামাজিক কুপ্রথাসকল উন্মুলিত করিতে হইবে, দেশমধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিতে হইবে, দেশের স্বাস্থ্য ভাল করিতে হইবে, ধর্ম্মের সাহিত্যের শিল্পের আনন্দে সকল গৃহস্থালি যাহাতে পূর্ণ হয় তাহা করিতে হইবে, এবং

স্ত্রীপুরুষ ও জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকলেই যাহাতে মানুষ হইবার ও নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী কাজ করিবার সুযোগ পায়, তাহা করিতে হইবে।

"স্বরাজের অভিমুখে।"

আমরা Towards Home Rule বা "স্বরাজের অভিমুখে" নাম দিয়া যে দুইখণ্ড পুস্তিকা লিখিয়াছিলাম, তাহার প্রথম খণ্ড ফেব্রুয়ারী মাসে বাহির হয়। এক্ষণে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বহিখানি ভারতবর্ষের কোন কোন ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়া অনেকে আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। আমরা অনুমতি দিয়াছি। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে কতকগুলি নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

আব্দুল রসুল।

আব্দুল রসুল মহোদয়ের অকালমৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষ একটি খাঁটি মানুষের সেবা হইতে বঞ্চিত হইল। তিনি অক্সফোর্ডের এম্-এ এবং ব্যারিষ্টার ছিলেন। আইন ব্যবসায়ে সত্যনিষ্ঠ ও স্বাধীনচিত্ত বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। তিনি দেশভক্ত ও সাহসী লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাব নম্র ও মধুর ছিল। তাঁহার চরিত্রে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ছিল না। এইজন্য মুসলমানসমাজের বাহিরেও তাঁহার অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা মুসলমানসমাজের সীমায় আবদ্ধ ছিল না। বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়ীর এক সান্ধ্যসম্মিলনে হিন্দু ও মুসলমানদের জলযোগের পৃথক বন্দোবস্ত ছিল; কিন্তু রসুল সাহেবকে হিন্দুরা তাঁহাদের সঙ্গে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের সময় তিনি বিভাগের বিরোধী ছিলেন বলিয়া তখন মুসলমান-সম্প্রদায়ের অনেকে ভুল বুঝিয়া তাঁহাকে বিধর্ম্মী পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি আপনার চরিত্রের প্রভাবে সধর্ম্মীদের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদিগের অন্যতম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি একটি ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তিনি স্বজাতীয়-বর্জ্জিত হন নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা কল্যাণীয়া নেজমার বিবাহের দুদিন পূর্ব্বে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। এই কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র আমাদের মত লোকদের জন্য বাংলায় লিখিত হইয়াছিল। অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের ন্যায় ইহারও বাম কোণে বক্রভাবে বড় অক্ষরে "শুভবিবাহ" ছাপা ছিল। উপরে আরবী অক্ষরে "ইয়ারব্" বা "হে পরমেশ্বর" মুদ্রিত ছিল।



আব্দুল রসুল।

চিঠিখানির কোন বিশেষত্বের জন্য আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম না। রসুল সাহেব বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস্‌করা ব্যারিষ্টার, একজন ইংরেজ মহিলা তাঁহার পত্নী; অথচ তিনি কন্যার বিবাহের সময় মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, আমরা এইজন্যই ইহার উল্লেখ করিলাম।

শিক্ষামন্ত্রণাসভায় বঙ্গের স্থান।

আগামী ৪ঠা ও ৫ই ভাদ্র (২০শে ও ২১শে আগষ্ট) ভারতবর্ষের ইংরেজী বিদ্যালয়-সকলে ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদান সম্বন্ধে সিমলায় একটি মন্ত্রণাসভা বসিবে। তাহাতে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশ হইতে চারিজন করিয়া, বাংলা, আগ্রা-অযোধ্যা ও পঞ্জাব হইতে তিনজন করিয়া, মধ্যপ্রদেশ

হইতে দুইজন এবং বিহার-ওড়িশা ও আসাম হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন। কেবল যে প্রতিনিধির সংখ্যাতেই বাংলাদেশ প্রথম শ্রেণীর প্রদেশ মধ্যে গণিত হয় নাই, তাহা নহে। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আগ্রা-অযোধ্যা, পঞ্জাব, বিহার-ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ হইতে বে-সরকারী প্রতিনিধি লওয়া হইয়াছে; আসামের প্রতিনিধি রায় ঘনশ্যাম বড়ুয়া বাহাদুর বি-এল্‌ও বোধ হয় সরকারী কর্ম্মচারী নহেন; কিন্তু বাংলাদেশ হইতে কোন বে-সরকারী প্রতিনিধি গ্রহণ করা গবর্ণমেণ্ট উচিত বা আবশ্যক বোধ করেন নাই। কি কারণে কোন প্রদেশ হইতে কম, কোন প্রদেশ হইতে বেশী, লওয়া হইল, বে-সরকারী প্রতিনিধিই বা কোন কোন প্রদেশ হইতে কেন লওয়া হইল না, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। স্কুল কলেজ হইতে যে-সব বাঙালী বাহির হইয়া নিজের নিজের বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে, এবং এমন কি শিক্ষাদানকার্য্যে নিযুক্ত বাঙালী ভদ্রলোকদের মধ্যে, শিক্ষাবিষয়ক নানা প্রশ্ন ও সমস্যা সম্বন্ধে যেরূপ ঔদাসীন্য দেখা যায়, তাহাতে আমাদের এরূপ অভিযোগ করা ভাল দেখাইবে না যে বাংলাকে মান্দ্রাজ বোম্বাইয়ের সমশ্রেণীস্থ না করায় বাংলার প্রতি অবিচার হইয়াছে। নতুবা ইংরেজীতে পণ্ডিত ও ইংরেজী শিখাইতে সুদক্ষ বিস্তর বাঙ্গালী আছেন; তাঁহাদের কাহারও সাহায্য লইতে পারিতেন। পাস্ করার জন্য যতটুকু অধ্যয়ন দরকার, এবং পাস্ করা হইয়া গেলে সময় কাটাইবার জন্য লঘু সাহিত্য পাঠ যতটুকু আবশ্যক, তাহা বাদ দিলে, আজকালকার বাঙালীরা বিদ্যা অনুশীলনে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জাতি ত নহেই; যে-সব প্রদেশের লোকেরা প্রথমস্থানীয়, বাঙালীরা তাহাদেরও অন্তর্গত নহে। আমাদের কথা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস বিভাগে খ্যাতিমান্ জনকতক বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় বাঙালীর নাম আওড়াইলে চলিবে না। এই থোড়-বড়ি-খাড়ায় আর কতদিন চলিবে? উঠ্‌তি বয়সের বাঙালীরা বিদ্যার নানা বিভাগের নূতন নূতন বহি কত ক্রয় করেন ও পড়েন, এবং অন্য প্রদেশের ঐ বয়সের লোকেরাই বা কত কিনেন পড়েন, তাহা জানিবার উপায় থাকিলে আমাদের কথার যথার্থতা প্রমাণিত হইত। যাহা হউক, আমাদের ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইলে, আমাদের চেয়ে বেশী আনন্দিত কেহ হইবে না।

সিমলার মন্ত্রণাসভার আলোচনার বিষয় ঠিক কিরূপ তাহা না জানায় এখন কিছু লিখিলাম না। সভার রিপোর্ট বাহির হইবার পর আবশ্যক হইলে কিছু লিখিব।

সার্ব্বজনিক কাজে ভারতনারী।

আমরা কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে সার্ব্বজনিক কাজে অর্থাৎ দেশহিতকর কাজে বাঙালী নারীরা অন্য কোন কোন প্রদেশের নারীদের চেয়ে পশ্চাৎপদ। ইহা একটা মত বা ধারণা মাত্র নহে। দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী বিপন্ন ভারতবর্ষীয়দের জন্য বাঙালী নারীরা কয়জনে মিলিয়া কটি সভা করিয়াছেন ও কত টাকা তুলিয়াছেন, ও ফিজিদ্বীপে চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেরণরূপ দাসত্ব বন্ধ করিবার জন্য বাঙালী নারীরা কি আন্দোলন করিয়াছেন, এবং এই এই উদ্দেশ্যে অন্য কোন কোন প্রদেশের নারীরা কি করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেই আমাদের কথা সত্য বলিয়া বুঝা যাইবে। ইহা না হয় দূর দেশের ব্যাপার। আমরা নিজে জানি, বাংলা দেশেরই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য বোম্বাইয়ের মহিলারা যত টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বাঙালীর মেয়েরা তাহার দশ ভাগের একভাগ টাকাও দেন নাই। পঞ্জাবের শিক্ষিতা কোন কোন মহিলা বালিকাদের শিক্ষার জন্য ভারতময় বক্তৃতা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। বঙ্গের কেহ সেরূপ করেন নাই। সমাজসেবার অন্য কোন কোন বিভাগেও এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এই প্রভেদের কারণ কি?

ইহা জাতিগত নহে। কারণ, সম্প্রতি ২।১ বৎসর বাঙালী পুরুষেরা সার্ব্বজনিক কাজে ঔদাসীন্য বা সাহসের অভাব দেখাইলেও, মোটের উপর তাহারা অন্য কোন প্রদেশের পুরুষদের চেয়ে কম অগ্রসর নয়।

শিক্ষার অভাব ইহার আংশিক কারণ হইতে পারে, কিন্তু একমাত্র কারণ নহে। প্রধান কয়েকটি প্রদেশে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা এইরূপ:—বঙ্গে হাজারকরা ১১ জন স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে পারে, বোম্বাইয়ে ১৪, মান্দ্রাজে ১৩, পঞ্জাবে ৬, আগ্রা-অযোধ্যায় ৫। নারীদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষায়

বিস্তার নিম্নলিখিতরূপ —বঙ্গে দশ হাজারের মধ্যে ৯ জন স্ত্রীলোক ইংরেজী জানেন, বোম্বাইয়ে ১৫, মান্দ্রাজে ১১, পঞ্জাবে ৬, আগ্রা-অযোধ্যায় ৫। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ও ইংরেজীশিক্ষার বিস্তার কম বলিয়া তাঁহারা বোম্বাই মান্দ্রাজের মেয়েদের চেয়ে সার্ব্বজনিক কাজে কিছু কম অগ্রসর হইতে পারেন, বাস্তবিক কিন্তু তাঁহারা "কিছু" কম অগ্রসর নহেন, খুব কম অগ্রসর। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তাঁহারা কোন কোন দিকে পঞ্জাব ও আগ্রা-অযোধ্যার মেয়েদের চেয়েও কম অগ্রসর, যদিও ঐ দুই প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার বাংলাদেশ অপেক্ষা কম। এরূপ হইবার কারণ কি?

একটা কারণ বাংলা দেশে নারীর অবরোধ প্রথার প্রাবল্য। ইহাতে নারীদের সম্বন্ধে বহু বাঙালী পুরুষের দৃষ্টিতে বিষ এবং মনে অশুচি কৌতূহলের সঞ্চার করিয়াছে। এইজন্য শিক্ষাপ্রাপ্তা হিন্দু মেয়েদের মধ্যে এবং যাঁহারা পর্দা মানেন না তাঁহাদেরও মধ্যে "পাছে-লোকে কিছু বলে"র ভয় অত্যন্ত বেশী। বাংলা দেশে শিক্ষিতা মহিলাদের কুৎসাকারী কাপুরুষদের সংখ্যা এবং প্রভাব অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বেশী। এমন কি শিক্ষিতার স্বামী, শিক্ষিতার ভ্রাতা, শিক্ষিতার পিতা যিনি, এমন কোন কোন লোক পর্য্যন্ত এই দেশশত্রুদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে ব্যগ্র। বাঙালীদের জঘন্য থিয়েটারগুলাও বাঙালী মহিলাদের কার্য্যশক্তি সম্যক্ বিকশিত না হইবার একটি কারণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, অধিকাংশ বাঙালী নারীরা পর্য্যন্ত বুঝেন না যে, যে থিয়েটারগুলা তাঁহাদের জাতির কতকগুলি অভাগিনীর চরিত্রভ্রংশ ব্যতীত চলে না, তথায় অভিনয় দর্শন করিতে যাওয়া অনুচিত, এবং কোন প্রকারে তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া অনুচিত।

সকল প্রদেশের নারীগণ কি কি সৎকার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র, পুস্তিকা, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা বঙ্গের নারীদিগকে তাহা জানাইলে কিছু কাজ হইতে পারে। কেবল নারীদেরই জন্য একটি সাপ্তাহিক খবরের কাগজ থাকিলে ভাল হয়। ইহাতে পৃথিবীর সব দেশের নারীদের সৎকার্য্য ও নারীশক্তিবিকাশক সকল [illegible] কথা এবং তদ্ভিন্ন নানাবিষয়ক প্রবন্ধ ও সংবাদ থাকা আবশ্যক। কোন নারীহিতৈষী ইহার জন্য একটি ফণ্ড স্থাপন করিয়া তাহার আয় হইতে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিলে ইহা স্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ আয়োজনের সফলতাও শিক্ষার বিস্তার এবং অবরোধপ্রথার লোপ সাপেক্ষ। এই দুইটিই প্রধান উপায়। যে-দেশে বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকল নারী নির্ভয়ে নিজের পায়ে পথে ঘাটে যাতায়াত করিতে পারে না, তথাকার পুরুষসমাজে ভীরুতা, চরিত্রহীনতা, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, প্রভৃতি কোন-না কোন দোষে দোষী লোকের সংখ্যা বোধ হয় কিছু বেশী। অবশ্য, অনেক সৎ, বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয় লোক নারীদেরই মঙ্গলের জন্য অবরোধ প্রথার সমর্থন করেন। কিন্তু, পাছে ছেলে চোর হয় বলিয়া তাহার হাত ভাঙিয়া দেওয়া, কিম্বা পাছে সে পড়িয়া গিয়া মাথা ফাটাইয়া ফেলে বলিয়া তাঁহাকে চলিতেই না দেওয়া, যে প্রকার বুদ্ধিমত্তা ও সাবধানতা, ইহাও সেই জাতীয়।

আমাদের মনে হয়, বাঙালী পুরুষেরাও যে আজকাল সার্ব্বজনিক কাজে ভারতের অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছেন, তাহার একটা কারণ এই, যে, তাঁহারা নারীদের উৎসাহ, নারীদের সহানুভূতি পাইতেছেন না; এবং ঔদাসীন্য ও কাপুরুষতার জন্য নারীদের গঞ্জনাও তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হইতেছে না। বরং হয়ত, কেহ একটু সাহস করিয়া পা বাড়াইতে চাহিলে, অন্তঃপুরিকাদিগের মধ্যে তাঁহাকে নিবৃত্ত ও নিরুৎসাহ করিবার লোকের অভাব হয় না।

সার প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

লাহোর চীফ্‌কোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সার্ প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু অকালে না হইলেও, এখনও তাঁহার কার্য্যশক্তি ছিল বলিয়া, দেশ তাঁহার মৃত্যুতে নিঃসন্দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি প্রথমে লাহোর চীফ্‌কোর্টে ওকালতী করিতেন, পরে জজের পদে উন্নীত হন। তিনি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন; উভয় কার্য্যেই যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছিলেন। পরে কিছু কাল একটি দেশীয়রাজ্যে মন্ত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। পঞ্জাবের নানা-প্রকার সার্ব্বজনিক কাজে তাঁহার এরূপ উৎসাহ ও যোগ ছিল যে তিনি বাঙালী হইলেও পঞ্জাবের লোকেরা তাঁহাকে

আপনাদের লোক ও অন্যতম নেতা মনে করিত। এক প্রদেশের লোক বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে অন্য প্রদেশে গিয়া দীর্ঘকাল বা স্থায়ীভাবে বাস করিলে তাঁহাদের সহিত এই-প্রকার সম্বন্ধই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। যে-সকল প্রদেশ শিক্ষায় পূর্ব্বে অগ্রসর ছিল না বলিয়া প্রবাসী বাঙালীরা তথায় রাজকার্য্যে বা অন্যবিধ কার্য্যে প্রাধান্য ও সামাজিক নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অতঃপর সেখানে বাঙালীদের আর তেমন প্রতিপত্তি না হইতে পারে। তাহা দুঃখের বিষয় নহে। কিন্তু নানা কারণে সকল সময়েই এক প্রদেশের মানুষ অন্য প্রদেশে গিয়া কাজ করিবেই। তাঁহারা বিখ্যাত হউন বা না হউন, প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত যে সব প্রবাসী বাঙালী খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তাঁহাদের পক্ষে অনুকরণীয়।

সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষা ও সংস্কৃত।

সিবিল সার্বিসে লোক নিয়োগের প্রণালী সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট করিবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার একটি প্রস্তাব ভারী চমৎকার। কমিটির মতে, সিবিলিয়ানপদ-প্রার্থীরা যে যে বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারে, সংস্কৃত তাহা হইতে বাদ দেওয়া উচিত। অতি সমীচীন পরামর্শ। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের শাস্ত্র সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণাদিতে বর্ণিত পুরুষ ও নারীর চরিত্রের প্রভাবে যুগে যুগে ভারতবর্ষের অগণ্য লোকের জীবন ও পারিবারিক আদর্শ গঠিত হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার মূলসূত্র সংস্কৃত সাহিত্যে নিহিত। সুতরাং যাহারা ভারতবর্ষ শাসন করিতে আসিবে, লাটিন, গ্রীক, কোন কোন আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা, প্রভৃতি তাহাদের জানা দরকার হইলেও সংস্কৃত জানা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, এবং বোধ হয় ভয়ানক অনিষ্টকর।

অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের পাটনা ত্যাগ।

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার বহু বৎসর পাটনা কলেজে খুব যোগ্যতার সহিত ইতিহাসের অধ্যাপকতা করিতে-ছিলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ইতিহাসের অধ্যাপক মনোনীত করায় তিনি বারাণসী যাইতেছেন। তদুপলক্ষে পাটনায় বিহারী বাঙালী হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য ভাবে বিদায় দিবার আয়োজন করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। তথায় বহু প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি তাঁহার পাণ্ডিত্য, অধ্যাপনদক্ষতা, ছাত্রদের প্রতি অনুরাগ ও তাহাদের হিতৈষণা, ঐতিহাসিক গবেষণায় অনুরাগ পরিশ্রম ও কৃতিত্ব, অনাড়ম্বর সরল ব্যবহার, নির্দ্দোষ চরিত্র, প্রভৃতির প্রশংসা করেন। এ সমস্ত পড়িয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সুখী হইয়াছি আর একটি খবর পড়িয়া। এক্সপ্রেস কাগজে দেখিলাম বাঁকীপুরের কাহার জাতীয় লোকেরা তাঁহার বিদায়সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিতেছে। কাহারেরা অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোক, লোকের বাড়ী চাকরী করে, ডুলি পাল্কী বহে, ও অন্যান্য দৈহিক শ্রমের কাজ করিয়া রোজগার করে। মদ্যপান তাহাদের মধ্যে প্রচলিত। যদুবাবু নানা-প্রকারে তাহাদের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। পশ্চিমে হোলী বা দোলের সময় অশ্লীল গান, জঘন্য গালাগালি, পরস্পরের গায়ে রং, গোবর, নর্দ্দমার জল ও কাদা নিক্ষেপ, মাতলামি, প্রভৃতি লক্ষিত হয়। যদুবাবু কাহারদের মধ্যে "শুদ্ধ হোলী" প্রচলিত করিবার ও মদ্যপান নিবারণের চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাতে কতকটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তজ্জন্য কাহারেরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে চায়। "নিম্ন" শ্রেণীর লোকের প্রতি এইরূপ প্রাণের টান দেশ-সেবকের চরিত্রের অলঙ্কার।

যদুবাবুর মত বিদ্বান্, বিচক্ষণ ও চরিত্রবান্ অধ্যাপককে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম শ্রেণীর কাজ দিতে পারিলেন না, অথচ শাদা চামড়ার জোরে কত টম্ ডিক্ হ্যারি এরূপ কাজ পাইতেছে। এইরূপ ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থার ফল শিক্ষিত ভারতবাসীদের হাড়ে হাড়ে বসিতেছে।

গোআর স্বরাজ লাভ।

ভারতবর্ষে গোআ প্রভৃতি ২।৩টি জায়গা পোর্টুগালের অধীন। বোম্বাইয়ের "মেসেঞ্জ" নামক দৈনিক কাগজে দেখিলাম, পোর্টুগাল-অধিকৃত স্থানগুলি সম্প্রতি স্বরাজ লাভ করিয়াছে; অর্থাৎ তথাকার অধিবাসীরা দেশের আভ্যন্তরীণ কাজের বন্দোবস্তে ও সম্পাদনে কর্তৃত্ব করিবার অধিকার পাইয়াছে।

সার্ব্বজনীন শিক্ষা।

কোল্হাপুরের রাজা স্থির করিয়াছেন যে তাঁহার রাজ্যের সমুদয় বালকবালিকাকে আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়া লেখা পড়া শিখিতে বাধ্য করিবেন, এবং তাহারা বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাইবে। কপূরতলা রাজ্যেও এইরূপ ব্যবস্থা করিবার আয়োজন হইতেছে।

বোম্বাই প্রদেশের বোম্বাই ছাড়া অন্য কোন মিউনিসিপ্যালিটি ইচ্ছা করিলে যাহাতে সকল বালকবালিকাকে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য করিতে পারেন, তাহার জন্য শ্রীযুক্ত ভী, জে, পাটেল নামক বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার একজন বেসরকারী সভ্য একটি আইনের খসড়া উক্ত সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন, কিন্তু আইনে এইরূপ একটি ধারা বসাইতে বাধ্য করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট কোন মিউনিসিপালিটিকে অবৈতনিক পাঠশালা চালাইবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিবেন না, ইচ্ছা করিলে সাহায্য করিবেন। তাহা হইলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে নূতন কর বসাইতে হইবে। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। ব্যয়ের অধিকাংশ গবর্ণমেণ্টেরই নির্ব্বাহ করা উচিত। যাহা হউক, এরূপ আইনও মন্দের ভাল। মান্দ্রাজ ও বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভাতেও এইরূপ আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইবে।

ভারতনারীর অন্যায়-অসহিষ্ণুতা।

আগ্রা-অযোধ্যা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, প্রভৃতি প্রদেশে (বঙ্গদেশে নহে) নানাস্থানে মহিলারা সভা করিয়া মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট ও তাঁহার সহকারী-দ্বয়ের স্বাধীনতা লোপের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বোম্বাইয়ে একটি মান্দ্রাজী মহিলা অন্যায়-অসহিষ্ণু হইয়া যেরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, অন্য কোথাও কোন নারী সেরূপ করেন নাই। ইহাঁর নাম শ্রীমতী শিবকামু আম্মল। ইনি চিকিৎসা-বিষয়ক পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করিয়া গবর্ণমেণ্টপ্রদত্ত বৃত্তি পাইয়া বোম্বাইয়ের [illegible] কলেজে পড়িতেন। ছাত্রেরা (ও ছাত্রীরা) কোন রাজনৈতিক সভায় শ্রোতারূপেও উপস্থিত থাকিতে পারিবে না, বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের এই হুকুম তাঁহার মতে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অনাবশ্যক, অনিষ্টকর ও অপমানজনক বোধ হওয়ায়, তিনি এই হুকুম মানিয়া মেডিক্যাল কলেজে আর অধ্যয়ন করিতে অনিচ্ছাবশতঃ কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি মান্দ্রাজ গিয়াছেন, এবং তথায় হোমরূল বা স্বরাজ লাভের চেষ্টায় যোগ দিবেন। শ্রীমতী শিবকামু যে কারণে কলেজ ছাড়িলেন, তাহার মধ্যে তেজস্বিতা ও দেশ-ভক্তি সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে।

মানবের স্বাধীনতার অনুকূল উক্তি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ জার্মেনীর নূতন প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার মাইকেলিসের প্রথম বক্তৃতার উত্তরে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলেন :—

"I don't want Germans to harbour delusions, that they are going to put us out of this fight till liberty has been re-established throughout the world."

"সমগ্র পৃথিবীতে স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে জার্মেনরা আমাদিগকে এই যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিতে পারিবে, এই ভ্রান্ত ধারণা তাহারা যেন হৃদয়ে পোষণ না করে।"

ভূগোলে ত লেখা আছে যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্তর্গত। এদেশে স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা কি ইংরেজ জাতির উদ্দেশ্য? এখানকার শাসনকর্ত্তাদের বক্তৃতায় ও হুকুমে ত তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

সম্প্রতি আর-একটি বক্তৃতায় লয়েড জর্জ বলিয়াছেন :—

Every British, American and Portuguese soldier knows that he is fighting side by side with others for international right and justice in the world, and it is that growing conviction more than the knowledge of our vast unexhausted resources, which gives them and us heart to go on fighting to the end knowing that the future of mankind is our trust to maintain and defend (loud cheers).

ব্রিটিশ, আমেরিকান ও পোর্টুগীজ সৈন্যেরা আন্তর্জাতিক অধিকার ও ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করিতেছে বলিয়া জানে, বক্তার এইরূপ বিশ্বাস। ভারতবর্ষে ন্যায় ও জাতীয় অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছে কি না, তাহার খবর রাখা মিঃ লয়েড জর্জের কর্ত্তব্য।

গ্লাসগো শহরে তিনি ২৯শে জুন যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলেন :—

But for our great efforts, a catastrophe would have overtaken the democracies of the world. The strength of Britain flung into the breach has once more saved Europe and human liberty.

"আমরা চেষ্টা না করিলে পৃথিবীর গণতন্ত্র দেশগুলির মহাবিপদ ঘটিত। ব্রিটেনের শক্তি দ্বারা আবার ইউরোপ এবং মানব-স্বাধীনতা রক্ষা পাইল।"

ইহার অন্য কথাগুলি সত্য হইতে পারে; কিন্তু মানব-স্বাধীনতা কিরূপে রক্ষা পাইল আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। "মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।" বেশীর ভাগ মানুষেরই ত স্বাধীনতা নাই। মানবজাতির অধিকাংশ কয়েকটি প্রবল জাতির পদানত হইয়াছে বা কার্য্যতঃ তাহাদের কথা শুনিতে বাধ্য হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং ব্রিটেন কেমন করিয়া মানব-স্বাধীনতার পরিত্রাতা হইলেন?

ঐ বক্তৃতায় প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন :—

Referring to the fate of the German colonies, the Premier said their peoples' desires and wishes must be the dominant factor. The untutored peoples would probably want gentler hands than German's to rule them. (Hear, hear).

যে-সব অসভ্য দেশে জার্মেনী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, সেগুলি ইংলণ্ডের হস্তগত হইয়াছে। লয়েড জর্জ বলিতেছেন, "তাহাদের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা প্রধানতঃ তাহাদের অধিবাসীদিগের ইচ্ছা অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে। এই-সব অশিক্ষিত লোকদিগকে শাসন করিবার জন্য জার্মেনদের চেয়ে নরম হাতের দরকার।" অশিক্ষিত লোকদের ভবিষ্যৎ প্রধানতঃ তাহাদের ইচ্ছা অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে; ভারতবর্ষের লোকদের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত তাহাদের অভিলাষে ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা বোধ হয় এইজন্যই কান দেন না; তাহারা জার্মেন উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের মত অশিক্ষিত হইলে কান দিতেন বোধ হয়। এই অনুমান ঠিক কি না জানিতে পারিলে, না হয় লেখাপড়ার চর্চ্চা ছাড়িয়াই দেওয়া যাইত। কিন্তু এ যুক্তিও বিস্তর ইংরেজ প্রয়োগ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত বলিয়াই তাহারা স্বরাজ পাইতে পারে না। অতএব উভয় সঙ্কট! লয়েড জর্জ মহোদয় জার্মেনীর ভূতপূর্ব্ব (অশিক্ষিত অসভ্য) প্রজাদের নরম শাসনের ব্যবস্থা দরকার বলিতেছেন: ভারতবর্ষের অনেক ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী বোধ হয় এইজন্যই সেইসব ভারতবাসীর প্রতি কড়া ভাব অবলম্বন করিতে অভ্যস্ত যাহারা আপনাদিগকে শিক্ষিত ও সভ্য বলিয়া মনে করে। তাহারা অশিক্ষিত ও অসভ্য হইলে প্রীতির পাত্র হইত কি?

লয়েড জর্জ আরও বলেন :—

The Austrian Premier has repudiated the principle that nations must control their own destinies but unless this principle is effected, not only will there be no peace, but if you had peace there would be no guarantee of its continuance.

"প্রত্যেক জাতি যে অবশ্যই তাহার নিজের ভাগ্যবিধাতা হইবার অধিকারী, অষ্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী এই নীতি অগ্রাহ্য করিয়াছেন; কিন্তু এই নীতি অনুসারে কাজ না হইলে শান্তি স্থাপিত হইবে না, এবং যদিই বা শান্তি স্থাপিত হয়, তাহা হইলেও ইহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা থাকিবে না।"

প্রত্যেক জাতি যে নিজের ভাগ্যবিধাতা হইবে, এই নীতি কি কেবল অষ্ট্রীয়ার প্রধান মন্ত্রীই অগ্রাহ্য করিয়াছেন? "যত দোষ নন্দ ঘোষ"! ইংলণ্ড হইতে যে-সব রাজকর্ম্মচারী ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহারাও কি কথায় ও কাজে এই নীতি অস্বীকার করিতেছেন না?

লয়েড জর্জ মহাশয়ের ঐ বক্তৃতা হইতে আরও কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

The Premier concluded: "Europe is again drenched in the blood of its bravest and best, but do not forget the great succession of hallowed causes. They are stations of the Cross on the road to the emancipation of mankind. I appeal to the people of this country and beyond, that they continue to fight for the great goal of international rights and international justice, so that never again shall brute force sit on the throne of justice nor barbaric strength wield the sceptre of liberty." (Loud cheers).

ইহাতেও তিনি বলিতেছেন যে ইউরোপ যে তাহার শ্রেষ্ঠ ও সাহসী লোকদের রক্তে প্লাবিত হইতেছে, তাহা মানবজাতির দাসত্ব মোচনের জন্য হইতেছে। ন্যায়ের সিংহাসনে আর কখনও যাহাতে পাশব শক্তি আসীন না হয়, তজ্জন্য তিনি স্বদেশের লোকদিগকে ও বিদেশী মিত্রজাতিসকলকে যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করিতেছেন। এইসব লম্বা-চৌড়া কথা কিয়ৎপরিমাণেও কাজে পরিণত হইলে ভাল হয়। অধিকাংশ প্রবল জাতি যদি নিজের অধীন জাতিসকলকে মানবের অধিকার না দিয়া কেবল শত্রুজাতিদের দাসদের শৃঙ্খল মোচনের ব্যবস্থা করিতে থাকেন, তাহা হইলে ভূলোকের দুর্দ্দশা মোচন না হইলেও অন্য-লোকের অধিবাসীদের আমোদ জন্মিবার সম্ভাবনা।

নিজের দোষের প্রতি অন্ধ থাকিয়া অন্যের দোষ সংশোধনের ব্যবস্থা করা রোগটা যে কেবল প্রবল জাতিদেরই আছে, তাহা নহে; আমাদেরও আছে। প্রভেদ এই যে আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকায়, আমরা প্রভুত্ব ফলাই অন্য-প্রকারে। আমরা, সমাজে যাহারা নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া গণিত, তাহাদিগকে মানুষের সব অধিকার দিতে নারাজ।

নিজে যা চাও, অপরকেও তা দাও।

লয়েড জর্জের আরও কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। যুদ্ধের চতুর্থ বৎসর আরম্ভ উপলক্ষে ৪ঠা আগষ্ট তিনি রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রীকে টেলিগ্রাফ করেন :—

I assure you of the resolution of the British people to continue the war until the liberties of Europe have been made secure. I am confident that Free Russia will surmount the difficulties confronting her, so that in association with the Allies she may secure for her children a peace safeguarding liberty and democracy in her own country and throughout the world.

এখানেও সমস্ত পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে নিরাপদ করার কথা রহিয়াছে।

৪ই আগষ্ট লণ্ডনের কুঈন্‌স্‌ হলে তিনি এক বক্তৃতা করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, "to express inflexible determination to continue the struggle for liberty and justice to victory," "জয় না হওয়া পর্য্যন্ত ন্যায় ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে অটল প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করা।"

He proceeded to say that we were fighting to defeat the most dangerous conspiracy ever plotted against the liberties of nations.

"সমস্ত জাতির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে জার্ম্মানরা যে চক্রান্ত করিয়াছিল, তাহার মত বিপজ্জনক চক্রান্ত আর কখন হয় নাই; আমরা তাহাই ব্যর্থ করিবার জন্য লড়িতেছি।" সুতরাং কোন জাতির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যদি কোন ইংরেজ কিছু করে, তাহা হইলে লয়েড জর্জ নিশ্চয়ই তাহাকে জার্ম্মেন মনে করিতে বাধ্য। অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকেও এরূপ ইংরেজ এদেশে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। জার্মেনদের সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

They talked glibly of peace, but stammered when it came to the word "restoration". Before we would enter a peace conference they would have to learn to utter that word to begin with (cheers). Our gallant fellows are gradually going to cure the Kaiser of his stutter. "Restoration" is the first letter.

"তাহারা খুব সহজেই শান্তির কথা আওড়ায় কিন্তু যখনই (তাহাদের দ্বারা অপহৃত অপর জাতির দেশ বা স্বাধীনতা) 'প্রত্যর্পণ' কথাটি উচ্চারণ করিতে হয়, তখনই জার্মেনরা তোত্‌লা হইয়া পড়ে। কোন শান্তি-সর্ত্ত-নির্দ্ধারণের সভায় আমরা ঢুকিবার আগে তাহাদিগকে 'প্রত্যর্পণ' কথাটি উচ্চারণ করিতে শিখিতে হইবে। আমাদের সাহসী যোদ্ধারা জার্মেন সম্রাটের তোত্‌লামিটা ক্রমশঃ আরোগ্য করিয়া দিবে। প্রথম উচ্চার্য্য কথা হচ্চে 'প্রত্যর্পণ'।"

বাস্তবিক নানাজাতির যে-সব দেশ, স্বাভাবিক-অধিকার ও স্বাধীনতা, প্রবল জাতিরা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে তাহা 'প্রত্যর্পণ' করা তাহাদের প্রথম কর্ত্তব্য। আন্তর্জাতিক কর্ত্তব্য-পালন-বিদ্যার হাতে-খড়ি করিতে গেলে ইহাই প্রথমে শিখিতে হইবে।

তিন বৎসর যুদ্ধের পর অনেকের মনে এরূপ ভাব আসিয়া থাকিবে, যে, এ-দফা বহুৎ লড়া গিয়াছে; এখন কোন-প্রকারে শান্তি হউক। ভবিষ্যতে আর-এক দফা লড়িয়া জার্মেনীকে পিষিয়া ফেলা যাইবে। লোকের মন হইতে এইরূপ ভাব দূর করিবার জন্য লয়েড জর্জ বলেন :—

"There must be no next time. Let us have done with it. Don't let us repeat this horror. (Cheers). Let us make victory so that national liberty, whether for small or great nations, can never be challenged."

"পরের বারে করা যাইবে, বলা কখনই চলিবে না। এবারেই কাজ শেষ করিয়া ফেলা যাক্‌। আমাদিগকে এমন জয় লাভ করিতে হইবে, যে, ছোট বড় কোন জাতিরই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কেহ আর কথা কহিতেও না পারে।"

ঠিক্‌ কথা; কিন্তু আগে ছোট বড় সব জাতিকে স্বাধীন করা হউক, তবে একথা উঠিতে পারিবে।

স্বাধীনতার পক্ষে সম্রাট্‌ পঞ্চম জর্জের উক্তি।

৪ঠা আগষ্ট সম্রাট পঞ্চম জর্জ শ্যাম দেশের রাজাকে যে টেলিগ্রাফ পাঠান, তাহাতে তিনি বলেন যে শ্যাম-নৃপতি ইংলণ্ড ও মিত্রদেশ-সকলের সহিত একমত হওয়ায় তাঁহারা, পৃথিবীর স্বাধীনতার বিঘ্ন নাশের জন্য জয়লাভ পর্য্যন্ত, যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন ("to continue their efforts till the crowning victory has removed the terrible menace which still threatens the world's liberties." সম্রাট জর্জ লণ্ডনের লর্ড মেয়রকে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন :—

Three years of war, with all they have meant to every home in the British Empire, have welded more closely than ever the bond of unity which steel the hearts of the whole nation in a firm resolve to secure the sacred principles of justice, freedom and humanity. For these we fight and by God's help we mean to triumph.

ইহাতেও তিনি বলিতেছেন, "আমরা ন্যায়, স্বাধীনতা ও মানবিকতার জন্য যুদ্ধ করিতেছি।"

মিঃ ব্যালফুরের উক্তি।

৩০শে জুলাই পার্লেমেণ্টে এক বক্তৃতায় অন্যতম মন্ত্রী মিঃ ব্যালফুর্‌ বলেন :—

What we desired in regard to Austria-Hungary was that the nations composing that empire should be allowed to develop along their own lines and carry out their own civilisation.

"অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সম্বন্ধে আমরা এই চাই, যে, ঐ সাম্রাজ্য যেসব দেশ ও জাতি লইয়া গঠিত তাহাদিগকে নিজের-নিজের পথে বিকাশ লাভ করিতে দেওয়া হউক, তাহারা নিজের-নিজের সভ্যতার প্রকৃতি অনুসারে চলুক।"

মিঃ ব্যালফুর স্বীকার করিবেন যে যে-নীতি অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যে খাটে তাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেও খাটে। তাহা হইলে তিনি মন্ত্রীসভা হইতে ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট এই আদেশ পাঠাইতে চেষ্টা করুন যে ভারতবর্ষের লোক-দিগকে তাহাদের নিজের অভীষ্ট পথে চলিতে দেওয়া হউক, এবং তাহাদের সভ্যতার প্রকৃতি অনুসারে যেরূপ বিকাশ ও পরিণতি বাঞ্ছনীয়, তাহাই যেন হইতে দেওয়া হয়।

মিঃ ব্যালফুর আরও বলেন :—

We want to diminish the future prospect of war by diminishing the number of reasons driving nations to war and we are all agreed by satisfying the legiti-

mate national aspirations you go a great way to carry out that idea.

"যে সব কারণে জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধ বাধে, সেই-সকল কারণের সংখ্যা কমাইয়া আমরা ভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাবনা কমাইতে চাই, এবং আমরা সকলেই একমত যে জাতিসকলের বৈধজাতীয় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি দ্বারা এই উদ্দেশ্য বহুপরিমাণে সাধিত হইতে পারে।"

তাহা হইলে ভারতবাসীদের বৈধ জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইতেছে না কেন?

কলিকাতার লর্ড বিশপের উক্তি।

খৃষ্টীয় জগতে নানা সম্প্রদায় আছে। ইংলণ্ডের রাজা যে-প্রকার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, উহা তথাকার রাজধর্ম্ম এবং উহার আচার্য্য ও পুরোহিতগণ সরকারী বেতনভোগী। কলিকাতার লর্ড বিশপ ভারতবর্ষে এই সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য ও পুরোহিত। তিনি গত ৪ঠা আগষ্ট যুদ্ধের চতুর্থ বৎসর আরম্ভ উপলক্ষে কলিকাতার সেণ্টপল্‌স্ গির্জ্জায় উপাসনান্তে যে উপদেশ দেন, তাহাতে ভারতবর্ষে ইংরেজজাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলেন:—

But it is not only against the German method of conducting war that we are fighting. We are fighting against the German principle that the strongest nation ought to subdue and enslave weaker ones. If this principle were accepted, there would be no end to wars, and the strongest nation might always plead the excuse of Germany that it was making these conquests with the object of spreading its own superior civilization. We stand for the right of nations to live and grow according to their own God-given nature, whether they be great or small. Here again we must keep our own consciences clear. We have become the paramount power in India by a series of conquests in which we have used Indian soldiers and had Indian allies. We have remained the paramount power in India because the Indian peoples needed our protection against foreign foes and against internal disorder. We must now look at our paramount position in the light of our own war-ideals. The British rule in India must aim at giving India opportunities of self-development according to the natural bent of its peoples. With this in view, the first object of its rulers must be to train Indians in self-government. If we turn away from any such application of our principles to this country, it is but hypocrisy to come before God with the plea that our cause is the cause of liberty.

তাৎপর্য্য—আমরা যে কেবল জার্ম্মেনীর যুদ্ধপ্রণালীর বিরুদ্ধেই লড়িতেছি, তাহা নয়; "দুর্ব্বলতর জাতিদিগকে প্রবলতম জাতির পরাজিত ও দাসত্বে পরিণত করা উচিত," এই যে জার্ম্মেন-নীতি ইহার বিরুদ্ধেও আমরা লড়িতেছি। এই নীতি ঠিক বলিয়া গৃহীত হইলে যুদ্ধের পর যুদ্ধ হইতেই থাকিবে; কারণ প্রবলতম জাতি সব সময়েই জার্ম্মেনীর মত বলিতে পারে, আমরা আমাদের অতি উৎকৃষ্ট সভ্যতা বিস্তারের জন্য অন্য জাতিদিগকে আমাদের অধীন করিতেছি। জাতি ছোট বা বড় হোক, তাহার বিধিদত্ত প্রকৃতি অনুসারে তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ও বাড়িবার অধিকার আছে, এই-যে জাতীয়-অধিকার, আমরা ইহার সমর্থক। এ-বিষয়ে আমাদের বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি অম্লান রাখিতে হইবে। ভারতীয় সৈন্যের ও মিত্র-রাজাদের সাহায্যে বার-বার যুদ্ধে জয়ী হইয়া আমরা ভারতবর্ষে প্রবলতম শক্তি হইয়াছি। বহিঃশত্রু ও আভ্যন্তরীণ অরাজকতা হইতে ভারতবাসীদের রক্ষার প্রয়োজন থাকায় আমরা এখানে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছি। আমরা যে আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করিতেছি, তাহার আলোকে আমাদের এই ক্ষমতার বিচার করিতে হইবে। ভারতবাসীদের প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি অনুসারে বিকাশ লাভের জন্য তাহাদিগকে সুযোগ প্রদান, আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া চাই। এই অভিপ্রায়ে, ভারতবাসীদিগকে নিজের রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা দেওয়া, নিশ্চয়ই শাসকদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমরা এই দেশে যদি আমাদেরই দ্বারা ঘোষিত যুদ্ধের মূল নীতির এইরূপ প্রয়োগ হইতে মুখ ফিরাইয়া লই, যদি আমরা ইহাতে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে, আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছি, এই বলিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হওয়া নিরবচ্ছিন্ন ভণ্ডামি হইবে।

লর্ড বিশপ এইরূপ স্পষ্ট কথা বলায় ভারতপ্রবাসী ইংরেজ মহলে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। তাহাদের প্রধান প্রধান খবরের কাগজে তাঁহাকে আক্রমণ করা হইতেছে। আমরা বিশপ মহাশয়ের কথাগুলির সমর্থন করি। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে যেমন সাঁতার দিতে-দিতেই মানুষ সাঁতার শিখে, যেমন চলিতে না দিলে শিশুরা চলিতে শিখে না, তেমনি দেশের কাজ চালাইতে না পাইলে কাজ-চালান শিখা যায় না। শিক্ষানবিসীও ত হইল বহুকাল। ফিলিপিনোরা ১৬ বৎসর শিক্ষানবিসীর পর পূর্ণ স্বরাজ পাইয়া, কিছুকাল পরে স্বাধীনতা প্রাপ্তির অঙ্গীকার পাইল; আর আমরা তাহার দশগুণ সময় পরেও মামুলী শিক্ষানবিসীর কথাই শুনিতেছি। এরূপ করিয়া আর কতকাল চলিবে? এখন আসল জিনিষটা চাই।

"স্বাধীনতায় বর্ণভেদ নাই।"

উপরে আমরা বলিয়াছি, যে, প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ বলিয়াছেন, জার্ম্মেন উপনিবেশগুলির ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী নির্দ্ধারণ প্রধানতঃ তথাকার (অসভ্য) অধিবাসীদের ইচ্ছা অনুসারেই হইবে। গ্লাসগো শহরের বক্তৃতায় যেদিন তিনি ইহা বলেন, তাহার পরের বুধবার একটি মন্ত্রণা-সভায় এই উপনিবেশগুলির ভবিষ্যৎ বিবেচিত হইবার কথা ছিল। ফল কি হইল, পরে জানা যাইবে। বিলাতের অন্যতম প্রধান কাগজ ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জেন বলেন—

The policy of the resolutions to be discussed is on the lines of Mr. Lloyd George's speech. The leading principle is that the wishes of the inhabitants must be the supreme consideration in the resettlement. In other words, the formula adopted by the Allies with regard to the disputed territories in Europe is to be applied equally in the tropical countries

The Conference will outline the machinery necessary for ascertaining the desires of the native populations. It will be suggested that commissions composed of men conversant with tribal law should be sent out to consult with the native chiefs and their councils. It will be suggested also that there shall be no ratification of sovereign rights until after an international congress has been held to go into the

whole question of the international arrangements guaranteeing to the natives full liberty to develop their national and industrial life. "There must be no colour bar to liberty" is the keynote of the discussions now going on on this important subject.

সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য। এই মন্ত্রণাসভায় বিবেচ্য প্রস্তাবগুলির আলোচনা লয়েড জর্জের বক্তৃতায় উল্লিখিত নীতি অনুসারে হইবে। ইউরোপের যে-সব দেশ লইয়া যুদ্ধ হইতেছে, তাহাদের ভবিষ্যৎ যেমন প্রধানতঃ তাহাদের অধিবাসীদের ইচ্ছানুরূপ হইবে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশসকলেও সেই নীতি সমভাবে অনুসৃত হইবে। জার্ম্মেন উপনিবেশগুলির আদিম নিবাসীদের ইচ্ছা জানিবার প্রণালী মন্ত্রণাসভায় নির্ণীত হইবে। এই বিষয়ে যে-সব আলোচনা চলিতেছে, তাহার সুর এই, যে, "স্বাধীনতার বর্ণভেদ নাই।"

তাহা হইলে ভারতবর্ষেও, আমাদের গায়ের রঙের বিচার না করিয়া, আমাদিগকে মানবের অধিকার দেওয়া হউক।

স্বাধীনতার অনুকূল উক্তি কেন উদ্ধৃত করি।

আমরা আজকাল প্রতিমাসেই বিলাতী ও অন্যান্য শ্বেতকায় রাজনীতিজ্ঞদের স্বাধীনতা-ও-গণতন্ত্রের সমর্থক উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা আমরা এ আশায় করিতেছি না, যে, এংলো-ইণ্ডিয়ান খবরের-কাগজ-ওয়ালারা বা তাহাদের সরকারী ও বেসরকারী গ্রাহকেরা কথায় ও কাজে গণতন্ত্র (democracy) ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া উঠিবে। যেমন "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী," তেমনি প্রভুত্ব ও ধনোপার্জ্জনের সুযোগ যাহাদের প্রায় একচেটিয়া, তাহারাও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে স্বভাবতই জ্বলিয়া উঠে। সুতরাং তাহাদের জন্য আমরা এ-সব বাণী উদ্ধৃত করিতেছি না। আমরা নিজের জন্য ও স্বদেশবাসীর জন্য ইহা করিতেছি। ইংলণ্ড, আমেরিকা, প্রভৃতি দেশের প্রকৃত স্বাধীনতাবাদী পুরুষদের মত আমরাও মুক্ত-মনুষ্যত্বে পূর্ণবিশ্বাসী হইয়া উঠি, ইহাই আমাদের হৃদগত আকাঙ্ক্ষা। আজ জগৎ জুড়িয়া মুক্ত-মনুষ্যত্বের যে সুর উঠিতেছে, তাহা আমাদের কানে দিন রাত বাজিতে থাকুক। তাহা হইলে সব বাজে শব্দ, বাজে কথা, বেসুরা শুনাইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, মুক্ত-মনুষ্যত্ব জাতিবর্ণধর্ম্মনির্বিশেষে স্ত্রীপুরুষ সকলের জন্য।

ফরাসীর আত্মপরীক্ষা।

"একো দ্য পারী" (Echo de Paris) নামক ফরাসী কাগজ গণতন্ত্রের জয় সম্বন্ধে ফরাসীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ইংরেজী অনুবাদ দিতেছি।

The French might perhaps have the right to prate of the triumph of democracy if all their Allies were really democratic. But the truth is, they are nothing of the sort. Neither Belgium nor England, nor Italy nor Roumania, are fundamentally democratic nations. So when we shout about the triumph of universal democracy being assured by our armies, we divide and weaken our own forces by mixing up political passions in a cause which should be, for every belligerent, purely national. Let us leave Rapublicanism and Democracy alone!

তাৎপর্য্য—গণতন্ত্রের জয় সম্বন্ধে বক্ বক্ করিতে ফরাসীদের হয়ত অধিকার থাকিত, যদি তাহাদের সব মিত্রজাতি বাস্তবিক গণতান্ত্রিক হইত। কিন্তু সত্য কথা এই, তাহারা সে-রকমের মোটেই নয়। বেলজিয়ম, ইংলণ্ড, ইটালী, রুমেনিয়া, ইহারা কেহই মূলতঃ গণতান্ত্রিক জাতি নহে। সুতরাং, আমাদের সৈন্যদলের দ্বারা বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের জয় হইবে বলিয়া যখন আমরা চীৎকার করি, তখন বাস্তবিক আমাদের শক্তি কম করিয়া ফেলি; প্রত্যেক জাতি নিজের জাতির জন্য লড়িতেছে, ইহাই ঠিক কথা। অতএব সাধারণতন্ত্র ও গণতন্ত্রের জয় বলিয়া চীৎকার বাদ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

ইংরেজরা নিজের দেশে গণতান্ত্রিক। স্বশাসক উপনিবেশগুলিতেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। ইংলণ্ড আয়র্লণ্ডকেও স্বরাজ দিতেছেন। এখন ভারতবর্ষ, মিশর, প্রভৃতি দেশকে স্বরাজ দিলেই ইংরেজরা পূরা গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতাভক্ত বলিয়া দাবী করিতে পারেন।

স্বরাজ না বড়-চাকরী?

আমাদের বিরোধীরা অনেক সময় বলেন, আমরা স্বরাজ চাই বলি, কিন্তু বাস্তবিক চাই নিজেদের জন্য বড় বড় চাকরীগুলি; কৃষক ও শ্রমজীবী প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর হিতের জন্য স্বরাজ চাই না। ইহা সত্য নহে। সম্প্রতি বিহার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনে সভাপতি খাঁ বাহাদুর সরফরাজ হুসেন খাঁ তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্বিসের সমস্ত কর্ম্মচারী যদি ভারতবর্ষের লোক হইত, তাহা হইলেও আমরা স্বরাজের দাবী ঠিক্ এখনকারই মত জিদ ও আগ্রহের সহিত করিতাম। কারণ, আমরা কর্ম্মচারীদের দ্বারা শাসিত হইতে চাই না; দেশী কর্ম্মচারীর শাসনও চাই না, বিদেশী কর্ম্মচারীর শাসনও চাই না।" Bureaucracy অর্থাৎ বাস্তবিক কর্ম্মচারীতন্ত্র বা দফ্‌তরতন্ত্র জিনিষটাই খারাপ; গণতন্ত্রই বাঞ্ছনীয়।

আয়র্লণ্ডে ভারতবাসী।

আজকাল আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডবলিন শহরে অনেক ভারতবর্ষীয় ছাত্র লেখাপড়া করে। তাহারা প্রধানতঃ আইন পড়ে। সম্প্রতি তাহাদের এক সভায় আয়র্লণ্ডের প্রধান বিচারপতি সভাপতি ছিলেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের তত্ত্বাবধান করা যাঁহাদের কাজ, তাঁহাদের মত এই যে, এই ছাত্রদের চেয়ে সদ্-আচরণশীল ছাত্র তাঁহারা দেখেন নাই। তাহাদের বিরুদ্ধে একটিও অভিযোগ প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের গোচর হয় নাই। যে-সব ছাত্র ব্যারিষ্টার হইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে তিনি বলেন, "আমি আশা করি তাঁহারা আইরিশদিগের সহিত সাহচর্য্য-বশতঃ আপনাদের দেশবাসীদিগকে বলিতে পারিবেন, স্বাধীনতা-বিষয়ে কিরূপ ভাব ও ধারণা ব্রিটিশ

শাসনবিধির অনুমোদিত।" স্বাধীনতাপ্রিয়তা ভারতবাসীর প্রাণেও আছে। আইরিশদের সাহচর্য্যে তাহা জাগিয়া উঠিলে ভালই হয়। দাঙ্গা হাঙ্গামা আমরা ভালবাসি না, কিন্তু জড়তা, অসাড়তা ও গোলামীও ভালবাসি না।

গরীব দেশে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা।

আমেরিকা ধনী দেশ; সেখানে স্কুলের শিক্ষা, এবং কোথাও কোথাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, অবৈতনিক; স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রভৃতির সংখ্যা আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশী। এই-সকল সুবিধা সত্ত্বেও তথাকার লোকে বুঝিয়াছে, যে, উচ্চশিক্ষার বিস্তারের জন্য শহরে শহরে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া উচিত। কারণ বাড়ীতে থাকিয়া ছেলেরা যত অল্প ব্যয়ে লেখা পড়া শিখিতে পারে, অন্য শহরে গিয়া লেখা পড়া করা তত অল্প খরচে হয় না; সুতরাং উচ্চ শিক্ষা গরীবের পক্ষে দুর্লভ হইয়া উঠে। তথাকার শিক্ষাবিভাগের রিপোর্টে দেখিলাম,—

"The development of State universities has been recognized as a fine forward sweep of democratic education, but the municipal university is making a strong appeal for support on the ground that it is still more democratic. It offers higher education to the youth of the city, who can live at home more economically than away." *U. S. A. Education Commissioner's Report for 1915.*

আমাদের দেশটা গরীব। গরীব ছাত্রদের বাড়ীতে থাকিয়া শিক্ষা পাইবার সুযোগ থাকা যে খুব দরকার, তাহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। এইজন্য বঙ্গের কোন্ কোন্ জেলায় এখনও একটিও কলেজ হয় নাই, একবার আমরা তাহার তালিকা দিয়াছিলাম। রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের ও স্থানীয় নেতৃবর্গের উদ্যোগে তথায় একটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার জন্য ছয় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ফরিদপুরেও কলেজ করিবার চেষ্টা হইতেছে। আর আর যে যে জেলায় কলেজ নাই, তথাকার অধিবাসীদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ আছে, তথায় বি এ পর্য্যন্ত পড়াইবার আয়োজন করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গের লবণ।

আমরা যে লবণ ব্যবহার করি, তাহার এক কণাও বঙ্গে প্রস্তুত হয় না, যদিও বাংলাদেশের সমুদ্রতট সুবিস্তৃত। বাংলাদেশে কেন লবণ প্রস্তুত হয় না, তাহার কারণ ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা উচিত। ভারতবর্ষের অবস্থাসম্বন্ধে যে রিপোর্ট পার্লেমেন্ট হইতে প্রতিবৎসর বাহির হয়, ১৯১৩-১৪ সালের সেই রিপোর্টে দেখিলাম, ভারতের লবণ-সরবরাহ গবর্ণমেন্টের একচেটিয়া নহে। সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী রাজপুতানা, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে লবণ প্রস্তুত হয়; আবার সমুদ্রোপকূলে স্থিত মান্দ্রাজ, বোম্বাই, সিন্ধু এবং বর্ম্মা প্রদেশে লবণ প্রস্তুত হয়। কারখানাগুলি কতক গবর্ণমেণ্টের, কতক বেসরকারী লোকদের। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ১৯১৩-১৪ সালে মান্দ্রাজ প্রদেশের ৬৫টা কারখানার মধ্যে ৪৫টা বেসরকারী এবং ২০টা গবর্ণমেণ্টের ছিল। বাংলাদেশে গবর্ণমেণ্ট লবণ প্রস্তুত করিতে দেন না, এইজন্য, যে, এখানে শুল্ক আদায় করিবার বন্দোবস্ত করা নাকি অসাধ্য।* এমন সুসভ্য প্রতাপান্বিত গবর্ণমেণ্ট একটা সমুদ্রতটস্থ প্রদেশে লবণের শুল্ক আদায় অসম্ভব মনে করিয়াছেন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, সিন্ধু, ব্রহ্ম দেশে যাহা সুসাধ্য, এখানে তাহা না হয় একটু আয়াসসাধ্য বা দুঃসাধ্যই হউক; অসাধ্য বলাটা ঠিক্ নয়। এখন পৃথিবীতে নূতন নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। আর একবার বঙ্গে লবণ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা গবর্ণমেণ্ট নিজে করুন, এবং বেসরকারী লোকদিগকেও করিতে অনুমতি প্রদান করুন। গবর্ণমেণ্ট ত আর নিজে নিজেকে শুল্ক ফাঁকি দিবেন না; নিজেই অন্ততঃ প্রথমে আরম্ভ করুন না। বাংলাদেশ যদি স্বশাসক বা স্বাধীন হইত, তাহা হইলে ইহার গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই অসাধ্যতার ওজর করিয়া এরূপ একটা আয়ের পথ ছাড়িয়া দিতেন না; অধিবাসীরাও নিত্যব্যবহার্য্য এরূপ একটি জিনিষের স্বদেশেই প্রস্তুত হইবার উপায় থাকিতে তজ্জন্য পরাধীন হইত না, এবং তাহার ক্রয়ার্থ দেশের টাকা দেশের বাহিরে যাইতে দিত না।

সভা করিবার সর্ত্তসাপেক্ষ অনুমতি।

কাগজে দেখা যাইতেছে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন বাঙালী ঢাকায় লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করার পর তিনি কলিকাতার টাউন-হলে শ্রীমতী বেসাণ্ট প্রভৃতির স্বাধীনতালোপের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত সভা করিতে অনুমতি দিয়াছেন; কিন্তু এই সর্ত্ত করিয়াছেন যে বক্তারা উদ্দীপক বা উত্তেজক কোন কথা বলিতে পারিবেন না। কারণ, লাটসাহেব বলেন, উক্ত উদ্দেশ্যে ১১ই জুলাই কলিকাতায় [ভারতসভা-গৃহে]

* "Some of the salt sources belong to, or are worked under the direct control of, the various local governments; others are owned or leased by private individuals. The salt supply of India is not, therefore, a Government monopoly, and the importation of salt is unrestricted. Manufacture is not allowed where the circumstances are such as to render proper collection of the duty impracticable, as, for instance, on the coast of Bengal.......The salt consumed in Bengal is imported from other parts of India. In the littoral districts salt production is prohibited owing to the difficulty of preventing illicit manufacture."—*Moral and Material Progress and Condition of India during the year 1913-14*, pp, 31-32.

যে সভা হয়, তাহাতে নাকি এমন কথা বলা হইয়াছিল, যদ্দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার, বা সাধারণের অনিষ্টকর ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা। এরূপ কি কথা কে বলিয়াছিল, জানি না, সুতরাং লাটসাহেবের ধারণা ঠিক্ কি না বলিতে পারি না। তবে "ফলেন পরিচীয়তে" যুক্তির অনুসরণ করিয়া দেখিতেছি, ১১ই জুলাইয়ের পর মাসাধিক কাল অতীত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত সেই দিনের কোন বক্তৃতার ফলে সাধারণের শান্তি ও নিরাপদ-অবস্থার কোন ব্যত্যয় হয় নাই। একটা বড় সভা হইলে এবং উত্তেজনার কারণ থাকিলে, কেহ কেহ খুব কড়া কথা সব দেশেই বলে; তজ্জন্য প্রকাশ্য সভা করিবার অধিকার লোপ বা হ্রাস করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আসল বিবেচনার বিষয় এই যে সভার প্রধান বক্তারা কি বলিয়াছিলেন, এবং কি কি প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছিল। নতুবা, ধরুন, যদি কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে কোন অবিবেচক বিকৃত-মস্তিষ্ক মানুষ, বা কোন পুলিশের চর, চট্ করিয়া ২।৪টা বে-আইনী কথা বলিয়া ফেলে (কারণ কে কি বলিবে, আগে হইতে ত জানা থাকে না, এবং প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত যে-কেহ কিছু বলিতে অধিকারী), তাহা হইলে কি কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ করিতে হইবে? যে বে-আইনী কথা বলে, তাহাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ কর, মানুষের প্রতিবাদ করিবার অধিকারে হাত দিও না। "সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বিচক্ষণ ধীরবুদ্ধি লোকেরা, শান্তিভঙ্গ হয় এরূপ উত্তেজক বে-আইনী কথা সভায় বলিবেন না, ইহা ত ঠিক্, তাহা হইলে এইরূপ অঙ্গীকার করিতে দোষ কি?" যদি কেহ এরূপ যুক্তির অবতারণা করেন, তাহা হইলে বলি, সুরেন্দ্রবাবু সভাস্থলে অশ্লীল গালাগালি কখন দেন নাই, দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যদি বলে, "আপনি বলুন যে অশ্লীল কথা বলিবেন না, তাহা হইলে আপনাকে সভা করিতে দিব," তাহা হইলে এরূপ অঙ্গীকার চাওয়াই কি তাঁহাকে অপমান করা নহে? হাজার হাজার লোক মিউজিয়ম বা জাদুঘর দেখিতে যায়, কোন জিনিষ ভাঙ্গে না বা চুরি করে না; কিন্তু যদি মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, আগে লিখিয়া দাও চুরি করিবে না, তবে ঢুকিতে পাইবে, তাহা হইলে আত্মসম্মানবিশিষ্ট কয়জন লোক যাইবে? রাজপথে মাঝে-মাঝে পকেট-মারা বা গাঁট-কাটা যায়। কিন্তু সেই ওজুহাতে যদি আইন হয় যে প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে "আমরা পকেট মারিব না বা গাঁট কাটিব না," নতুবা তাহাদিগকে রাজপথে চলিতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে আমাদের সম্মান বাড়িবে না। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কত প্রতিবাদসভা হইয়া গেল, দেশমান্য নেতার সভাপতিত্বে সভা করিতে কোথাও নিষেধ করা হইল না, বা উদ্যোক্তাদিগকে সর্ত্তে আবদ্ধ করা হইল না; এরূপ বিস্তর সভায় ছাত্রেরা উপস্থিত ছিল, কড়া কথাও বলা হইয়াছে; কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশ ও কলিকাতাকেই প্রথমে সভা করিতে নিষেধ করিয়া, পরে সর্ত্তে আবদ্ধ করা হইল। আমাদের বিবেচনায় সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া মিটিং করা ঠিক্ নয়।

কোন কোন এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ বলিতেছে, লাট-সাহেব অস্থিরমতিত্ব দেখাইয়াছেন, এবং তাঁহাকে নরম হইতে হইয়াছে; কেহ বা বলিতেছে, লাটসাহেব উদ্যোক্তাদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন এবং উঁহাদিগকে সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের অনিষ্ট করিবার ক্ষমতার হ্রাস করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, উভয় পক্ষকেই খাট হইতে হইয়াছে।

পূর্ণভাণ্ডী।

কাশীতে একরকম সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা মুষ্টি-ভিক্ষা লন না; যে তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্রটি পূর্ণ করিয়া দেয়, তাহার দানই গ্রহণ করেন। ইঁহাদিগকে পূর্ণভাণ্ডী বলে। ইঁহারা পাড়ায় পাড়ায় "রহী লেঙ্গে", "রহী লেঙ্গে" (অর্থাৎ যাহা চাই পূর্ণমাত্রায় উহাই লইব), বলিয়া বেড়ান; কেহ পাত্র ভরিয়া দিলে "রহী লিয়া", "উহাই লইয়াছি", বলিয়া চলিয়া যান।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের তরফের লোক আমাদের স্বরাজের দাবীর উত্তরে দু-একটা বড় চাকরী ও দু-একটা ফাঁকা তথাকথিত অধিকাররূপ মুষ্টিভিক্ষা দিয়া আমাদিগকে বিদায় দিবার চেষ্টায় আছেন। আমরা ভিক্ষুক হই বা না হই, আমরা পূর্ণভাণ্ডী। আমাদের ভাণ্ডটির আয়তন কংগ্রেস ও মস্‌লেম্ লীগ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহা পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। রহী লেঙ্গে, রহী লেঙ্গে, রহী লেঙ্গে। আমাদের ভাঁড়টি যে ভাঁড়মাত্র, কলসী বা জালা নহে, ইহাই যথেষ্ট রফা। তাহার কমে চলিবে না। মুষ্টিভিক্ষার কর্ম্ম নহে। রহী লেঙ্গে।

চিত্র-পরিচয়

"সাহিত্যের পাকা শড়ক" ছবিখানিতে চিত্রকর এই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে দেবী সরস্বতীর কমল-বন রোলার দিয়া দলিয়া সাহিত্যের পাকা শড়ক বানানো হইতেছে, নর্দ্দমায় কালী ছড়াছড়ি, আর দেবী বীণাপাণি কমলাসন ছাড়িয়া ভয়ে শেওড়া-গাছে চড়িয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

চারু।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৭শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩২৪

৬ষ্ঠ সংখ্যা

ইতিহাসের ধারা *

জগতের আধুনিক সুসভ্য অবস্থা মানব-সমাজের বহু সহস্র বৎসরের প্রযত্নের ফল। প্রাচীন কাল হইতে সকল দেশেই একটা অত্যুন্নত সত্য-যুগের কল্পনার কথা প্রচলিত আছে, কিন্তু ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এই সত্য-যুগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়। আধুনিক পণ্ডিতবর্গের মতে, মানবজাতি উদ্ভবকালে পশু অপেক্ষা উন্নত ছিল না, এবং আদিম অবস্থায় যাযাবর ও বর্ব্বর ছিল; কালক্রমে সভ্যতার উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিয়া আসিতেছে। রাজকাহিনী ও সন-তারিখের সমষ্টির আলোচনা হিসাবে প্রাচীন ইতিহাস মূল্যবান্ নহে,—মানব-সভ্যতার উৎপত্তি ও উন্নতির কথা জানাইয়া দেয় বলিয়া, এবং মানুষের মনের ক্রমিক উৎকর্ষের বিবরণ প্রকাশ করে বলিয়াই ইহার চর্চ্চার মূল্য। আধুনিক, প্রাচীনের উপর প্রতিষ্ঠিত; আধুনিককে বুঝিতে হইলে প্রাচীনের রহস্য জানা আবশ্যক।

* বেঙ্গল প্যাবলিশিং হোম্ (৫।১এ নূর মোহম্মদ সরকার লেন, কলিকাতা) বাঙ্গালার 'বর্ষপঞ্জী ও বিশ্ববার্ত্তা' প্রকাশ করিতেছেন—এই বই Whitaker's Almanac বা Statesman's Year-Book-এর অনুরূপ। এই প্রবন্ধ উক্ত পুস্তকের জন্য লিখিত, এবং প্রকাশকদিগের অনুমত্যনুসারে মুদ্রিত। বইখানি ছাপা হইতেছে, শীঘ্রই বাহির

ইতিহাসের উপাদান

কোনও দেশের প্রাচীন যুগের কথার বিষয় আলোচনা বা চর্চ্চা করিতে হইলে সকলের চেয়ে বেশী কার্য্যকরী ও উপযোগী উপাদান হইতেছে মানুষ নিজে যাহা বলিয়া গিয়াছে,—তাহা ইতিহাস রূপেই হউক, বা পুরাণ-কথার আকারেই হউক। কিন্তু এই উপাদান আমাদের খুব প্রাচীন যুগে লইয়া যায় না, যে কালের সংবাদ আমরা মানুষের লেখা কোনও বহি বা বিবরণ হইতে পাইতে পারি না, বা যে কালের সম্বন্ধে পুরাণ কিছু উল্লেখ করে না, তাহাকে 'প্রাগৈতিহাসিক যুগ' বলা যায়। মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া অতি প্রাচীন যুগের দুই একটা নর-কঙ্কাল, দুই একটা অমসৃণ পাথরের বা হাড়ের তৈয়ারী অস্ত্র, পুরাণ যুগের লোকের কবরের মধ্যে বা বাস-ভূমির আশ-পাশে প্রাপ্ত মাটীর পাত্র, বা হাড়ের উপর আঁচড় কাটিয়া আঁকা জন্তুজানোয়ারের ছবি—ইহাদের সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের তথ্য কিছু-কিছু জানা যায়। মানুষ লিখিতে শিখিয়াছে সভ্য হইবার বহু পরে, লিখিতে শিখিবার পূর্ব্ব হইতে সে নিজ জাতির প্রাচীন কথা অস্পষ্ট-ভাবে কিছু-কিছু যাহা মনে করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা এখন লিপি-বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল। এই 'শ্রুতি' ও 'স্মৃতি'র উপর ভিত্তি করিয়া সে অতীত যুগের জীবনের কথা বলিবার চেষ্টা করিল। এই চেষ্টাই হইতেছে ইতিহাস

লিখিবার প্রয়াস। কোথাও কোথাও প্রাচীন মানব যাহা বলিয়া গিয়াছে তাহা একেবারে লোপ পাইয়াছে; কোথাও বা তাহা বিকৃত, কোথাও বা অবিকৃত অবস্থায় পুস্তকের মধ্য দিয়া ধারাবাহিক-রূপে এখনও পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে—যেমন ভারতের বেদ, মহাভারত ও পুরাণ, চীনের শু-কিঙ্‌ ও শী-কিঙ্‌ গ্রন্থ, গ্রীসের হোমরের কাব্য ও হেরোদোতসের ইতিহাস, য়িহুদী জাতির প্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাস। আবার পুস্তকের আকারে নহে, পাথরে বা অন্য আধারে সেই যুগে লেখা কথায় ও আঁকা ছবি ইত্যাদিতে প্রাচীন কালের অনেক খবর জানা যায়; এই-সকল প্রাচীন ও লুপ্ত ভাষায় এবং অক্ষরে লেখা অনুশাসন, এবং প্রাচীন চিত্রাদির চর্চ্চাও অনেক কাল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজকাল আবার তাহাদের উদ্ধার আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহার ফলে প্রাচীন যুগের অনেক কথায় আমরা জানিতে পারিতেছি।

মানুষের হাতের পাঁজী-পাত (records) তিন প্রকারের:—[১] প্রাচীন কালের লোকের কথা বা চিন্তার আধার, এমন-সকল বই, যাহাদের চর্চ্চা একেবারে বন্ধ হয় নাই, ধারাবাহিক রূপে এখন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে; ইতিহাস, গান, কথা, ধর্ম্ম-শাস্ত্র, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি। [২] প্রাচীন কালের লোকের হাতের কাজ—অস্ত্র-শস্ত্র, তৈজস-পত্র, মুদ্রা, অনুশাসন ও লিপি, ঘর বাড়ী, চিত্র-শিল্প। [৩] লোক মুখে প্রচলিত কথা, ছড়া, গান, কিম্বদন্তী, জন-প্রবাদ, যে-গুলিকে অল্প দিনমাত্র লেখায় ধরা হইতেছে।

কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার বিষয়ে মুখ্যতঃ [১] শ্রেণীর উপকরণই ব্যবহারে আসিত। [৩] শ্রেণীর মাল-মসলার ব্যবহারের কথা কাহারও মনে আসে নাই, [২]-শ্রেণীর মাল-মসলার মধ্যে কেবল এক গ্রীক ও রোমান এবং চীনা জাতির হাতের কাজই লোকে চর্চ্চা করিতে পারিত। মিসরের চিত্র-লিপি, বাবিলন ও পারস্যের 'বাণমুখাকৃতি' লিপি, প্রাচীন ভারতের অনুশাসনগুলি কেহই পড়িতে পারিত না। য়িহুদী পুরাণের মতে পৃথিবীর বয়স ৬,০০০ বৎসর, ইউরোপের খ্রীষ্টান লোকে তাহাই বিশ্বাস করিত। কিন্তু নানা চেষ্টা করিয়া পণ্ডিতেরা যখন মিসরের ও বাবিলনের লিপি পড়িতে সক্ষম হইলেন, তখনই পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনার এক নূতন যুগ আরম্ভ হইল। ভূ-তত্ত্বের সাহায্যে এবং অতি পুরাতন কালের অস্ত্র-শস্ত্র ও জিনিস-পত্র ঘাঁটিয়া দেখা গেল যে মিসরের আদিম সভ্য অবস্থা প্রায় দশ হাজার বছরের, এবং লিপি ও অনুশাসন পড়িয়া জানা গেল যে মিসরের লোকেরা আট হাজার বছরের কথা বলিয়া গিয়াছে।

ইতিহাসের যুগ বিভাগ

মানব-ইতিহাসের মুখ্য ধারা বিচার করিয়া দেখিলে, মোটামুটি ইহাকে পাঁচটি যুগে ভাগ করিতে পারা যায়। এই যুগ বিভাগ যে সকল দেশের পক্ষেই খাটিবে এমন নহে, তবে এই যুগ বা সভ্যতার ক্রম নির্ণয় কার্য্যকর হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

[১] প্রাগৈতিহাসিক যুগ Prehistoric Age (ক) আদিম যাযাবর বর্ব্বর অবস্থা (খ) পুরাতন পাথরের অস্ত্রের যুগ (গ) নূতন পাথরের অস্ত্রের যুগ (ঘ) ধাতুর যুগের আভাস, মানব সভ্যতার উষাকাল (ঙ) তামা ও ব্রঞ্জের অস্ত্রের যুগ।

[২] প্রাচীন সভ্যতার প্রথম যুগ Ancient Age: ৩০০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে আনুমানিক ৬০০ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত।

খাল্‌দেয়া (বাবিলন)-দেশে আক্কাদীয় ও শেমীয় জাতি-দ্বয় কর্ত্তৃক সভ্যতার পত্তন; এবং মিসরে সভ্যতার উত্থান ও বিকাশ। 'হিত্তি' Hittite প্রভৃতি পশ্চিম-এশিয়ার জাতিগণের কাল; এজিয়ান সাগরের উপকূলে ও ক্রীটে সভ্যতার বিকাশ, আর্য্য জাতির প্রসার—(ক) ভারতে আগমন, ও দ্রাবিড়-জাতির সহিত মিলিত আর্য্য জাতি-কর্ত্তৃক আর্য্য দ্রাবিড় বা হিন্দু সভ্যতার পত্তন ও বিকাশ, (খ) পারস্যে ও পশ্চিম এশিয়ায় প্রসার, (গ) গ্রীসে নবাগত আর্য্য ও আদিম অনার্য্য এজিয়ান জাতির সভ্যতার মিশ্রণের ফলে পরবর্ত্তী যুগের গ্রীক সভ্যতার উত্থান ও বিকাশ। উত্তর-চীনে চীনা সভ্যতার উত্থান।

[৩] প্রাচীন সভ্যতার দ্বিতীয় যুগ—৬০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৬০০ খ্রীঃ অব্দ—সুসভ্য প্রাচীন যুগ Classical Age: এই যুগে হিন্দু (আর্য্য-দ্রাবিড়), গ্রীক (আর্য্য-এজিয়ান)

চীনা, লাটিন—এই কয় জাতির সভ্যতার কাঠামো দাঁড়াইয়া গিয়াছে; প্রাচীন মিসর, আসিরিয়া-বাবিলন, হিত্তী নিষ্প্রভ। এই যুগে দার্শনিক ও পণ্ডিতগণের উদ্ভব;—ভারতবর্ষে প্রাচীন ঋষিদের যুগের অবসান, এবং বুদ্ধ ও মহাবীরের উত্থান; পাণিনি, কপিল, কৌটিল্য, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি; পারস্যে জ়রথুস্ত্র Zarathustra; গ্রীসে পিথাগোরাস্ Pythagoras, আনাক্সিমান্দ্রস্ Anaximandros, সোক্রাতেস্ Sokrates, প্লাতোন্ Plato, আরিস্তোতল Aristotle প্রভৃতি; য়িহুদী জাতির মধ্যে য়েশায়াহ্ Isaiah প্রভৃতি তাত্ত্বিকগণের উত্থান; চীনে লাউ-ৎজে. Lau-Tsze ও খুঙ্-ফু-ৎজে. K'ung-Fu-tsze (বা Confucius) এবং মেঙ্-ৎজে. Meng Tsze ও চুআঙ্-ৎজে. Chwang-Tszeর উদ্ভব। প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য; গ্রীস ও পারস্যের সঙ্ঘাত; পেরিক্লেস Periklesএর যুগ; তৎপরে গ্রীকরাজ আলেক্সান্দর কর্ত্তৃক এশিয়ায় গ্রীক সভ্যতার প্রসার; ভারতে মৌর্য্য, অন্ধ্র, গুপ্ত বংশ (হর্ষদেবের সঙ্গে ভারতে এই যুগের অবসান বলা যায়);—ফিনীক্-জাতির বিস্তার, ও রোমের সহিত সংঘর্ষে ফিনীকজাতির নাশ; রোমক-সাম্রাজ্যের বিস্তার ও পতন পারস্যের সাস্সানী Sassanian যুগ; চীন-সাম্রাজ্যের পত্তন; এই যুগে গ্রীস-দেশে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ও চিন্তাপ্রণালীর বনিয়াদ প্রস্তুত হইল।

[৪] মধ্য-যুগ Middle Ages—৮০০—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ। নবীন জাতিগণের উদ্ভব—উত্তর-ইউরোপের জাতিদের বিকাশ; খ্রীষ্টানী ও মুসলমানী সভ্যতার উত্থান; মুসলমান-সাম্রাজ্যের প্রসার; দামাস্ক-নগরে এবং স্পেনে উমায়্য-বংশীয় খ.লীফ.াগণের, এবং বগ.দাদে 'অব্বাস-বংশীয় খ.লীফ.া-গণের যুগ; ভারতে রাজপুত-জাতির উত্থান ও শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ আচার্য্য-বৃন্দ; চীনে থাঙ্ T'ang ও সুঙ্ Sung বংশ; ইউরোপে নরমান রাজ-জাতির বিস্তার, এবং পশ্চিম-ইউরোপে যোদ্ধ-শ্রেণীর আভিজাত্য ও ভূমির অধিকার-মূলক শাসন-পদ্ধতির (Feudalismএর) প্রসার; পালেস্তীনে খ্রীষ্টান ও মুসলমান সভ্যতার সংঘর্ষ; খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম কর্ত্তৃক ইউরোপের স্বাধীন চিন্তার খর্ব্বতা। ইহার পরে প্রাচীন গ্রীক যুগের সাহিত্য-চর্চ্চার ফলে নূতন প্রাণের সাড়া (Renaissance)।

[৫] আধুনিক বা বৈজ্ঞানিক যুগ Modern Age—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে। এই যুগে ধর্ম্ম ও চিন্তার স্বাধীনতা; লুট্যার Luther প্রভৃতি সংস্কারকগণের উদয়; আমেরিকা আবিষ্কার; বিজ্ঞানের জয়; আধুনিক জাতিগুলির উদ্ভব ও তাহাদের বিশিষ্টতার পরিপুষ্টি; রুষ জাতির অভ্যুদয়; প্রাচ্যে উদ্বোধন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ

ভূ-তত্ত্ব-বিদেরা পৃথিবীর বুকের ভিতর হইতে তাহার জন্ম জীবন-রহস্য বাহির করিয়াছেন। পৃথিবীর বয়স কত শত লক্ষ বৎসর তাহা ভূ-তত্ত্বের বিচারের বিষয়। কোন্ যুগে মানবের উৎপত্তি সে সম্বন্ধে ভূ-তত্ত্ব যাহা বলে তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। জীব-তত্ত্ববিদ্ এবং ভূ-তত্ত্ববিদ্গণের মতে, মানব-জাতি জীবগণের মধ্যে সকলের শেষে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, এবং যে যুগে পূর্ণাঙ্গ মানবের উদ্ভব সে যুগের প্রাচীনত্ব এক লক্ষ বর্ষ অনুমান করা যাইতে পারে। মানব-জাতি উদ্ভবের পর কয়েক সহস্র বৎসর বর্ব্বর অবস্থায় বন্য পশুর মত যাযাবর জীবন ধারণ করিত, এবং পরে গাছের উপর বা পর্ব্বত-গুহায় বাস করিত। ভূ-গর্ভ হইতে প্রাপ্ত এই প্রাচীনতম যুগের মানুষের ব্যবহৃত পাথরের তৈয়ারী অস্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে এই সময়ের অবস্থার কথা কিছু-কিছু ধারণা করা যায়। মানুষ আগুন জ্বালিতে শিখিল, অপেক্ষাকৃত পরের যুগে মানব একটু সভ্য হইল, কুটীর প্রস্তুত করিতে লাগিল, দল-বদ্ধ হইয়া থাকার সুবিধা বুঝিল, পাথরের অস্ত্র ঘষিয়া-মাজিয়া চিক্কণ করিয়া শাণিত করিয়া লইতে লাগিল, এবং ক্রমে ধাতুর ব্যবহার শিখিল। সোনা রূপা প্রভৃতি সহজ-নম্য ধাতুর ব্যবহার আগে প্রচলিত হয়; পরে তামার সহিত অন্য ধাতু মিশাইয়া একপ্রকার কঠিন মিশ্র-ধাতু (bronze) মানুষ ব্যবহারে লাগাইল। ধাতব অস্ত্রের সাহায্যে মানব অল্পকাল মধ্যেই পার্থিব জীববর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল, তাহার এখন আর প্রাচীন যুগের অতিকায় হিংস্র-জন্তুর ভয় করিবার আবশ্যকতা রহিল না। মিশ্র ধাতুর যুগের পর লৌহের যুগ। যখন মানুষ লোহার ব্যবহার শিখিল, তখন সভ্যতার পথে সে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। সকল দেশেই যে মানুষের উৎকর্ষের গতি এক ভাবেই

চলিয়াছিল তাহা নহে; যে সময়ে এক স্থানে মানব অতি উন্নত হইয়াছে, দেখা যায় যে সে সময়েই অপর স্থানে সে অতি হীন বর্ব্বর অবস্থায় রহিয়াছে। ফ্রান্সে তিন হাজার বছর পূর্ব্বে লোকে পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করিত; বিগত শতাব্দীর মধ্য-ভাগ পর্য্যন্ত পাসিফিক দ্বীপ-পুঞ্জে কোথাও কোথাও ঐ অবস্থাই চলিত ছিল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের পক্ষে জীবন-ধারণ বাস্তবিকই জীবন-সংগ্রাম ছিল। যাযাবর অবস্থায় যখন মানুষ কৃষিকর্ম্ম জানিত না, তখন তাহাকে রোজই কঠিন শ্রম-সাপেক্ষ মৃগয়া দ্বারা রোজকার খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইত। কৃষিকর্ম্ম-শিক্ষার ফলে মানুষ এককালে অনেক দিনের উপযোগী খাদ্যের সংস্থান করিতে সক্ষম হইল। তখন সে জীবন ধারণের উপায় সহজ করিয়া জীবনকে সুখ ও স্বচ্ছন্দে যুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে সময় পাইল, নিজ অবস্থা উচ্চ করিবার অবকাশ পাই। এইজন্যই দেখা যায় যে বড় নদী থাকায় যেখানে ভূমি উর্ব্বরা এবং খাদ্যদ্রব্য সুলভ, যেখানে রাস্তা-ঘাটের সুবিধা আছে এবং অনেক লোক একত্র অনায়াসে থাকিতে পারে, আক্রমণকারী বিদেশীর হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষা যেখানে সহজ, এবং যেখানকার জলবায়ু ভাল, এরূপ স্থলেই উচ্চ-জাতীয় সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে; পাহাড়িয়া জাতির মধ্যে বা শীত-প্রধান দেশের লোকদের মধ্যে নহে। এই জন্যই দেখা যায় যে আদি-সভ্যতার উৎপত্তি-ভূমি নীল-নদের তীর-দেশ (মিসর), ইউফ্রাটীস ও তিগ্রীস্ নদীর মধ্য-ভূমি (খাল্‌দেয়া), সিন্ধু ও গঙ্গা এবং গোদাবরী কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর কূল (ভারতবর্ষ), এবং হোয়াঙ্-হো নদের কূল (চীন)।*

সুপ্রাচীন যুগ

সভ্যতার আদি কেন্দ্র হিসাবে মিসর বা বাবিলন অপেক্ষা ভারত অনেক অর্ব্বাচীন। সব প্রাচীন বইয়ের ভিতর দিয়া, ভারতের প্রাচীন কথা যাহা-কিছু পাওয়া যায়, মহারাজ অশোকের সময়ের (২৫০ খ্রীঃ পূঃ) পূর্ব্বের বিশেষ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই-সমস্ত বইয়ের কাল সম্বন্ধে খুবই মতভেদ দেখা যায়; সাধারণতঃ খ্রীঃ পূঃ ১৫০০।২০০০ বৎসরের ওদিকে কেহ যাইতে চাহেন না। কিন্তু মিসরে ও খাল্‌দেয়া বা বাবিলনে মানুষের হাতের যে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা খ্রীঃ পূঃ ৫০০০ বৎসরের বা তৎপূর্ব্বের বলিয়া সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

আদি সভ্যতার পত্তন মিসরে আগে কি মেসোপোটামিয়ায় আগে, তাহা জানা যায় না। মেসোপোটামিয়ায় ইউফ্রাটীস ও তিগ্রীস্ নদীর মোহনায়, পারস্য উপসাগরের তীরে আনুমানিক ৮০০০।৭০০০ খ্রীঃ পূঃতে 'খাল্‌দেয়া' Chaldea দেশের সভ্যতার সূত্রপাত। যে জাতি কর্ত্তৃক এই সভ্যতার পত্তন তাহা 'আক্কাদ' Akkad ও 'সুমের' Sumer এই দুই নামে পরিচিত। ভাষা ও আকৃতি-গত সাদৃশ্য বিচার করিয়া জানা যায় এই 'আক্কাদ-সুমের'

---

* আমেরিকায় কিন্তু ইহার একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়—অর্ব্বাচীন কালে আমেরিকা-খণ্ডে তিনটি বিশিষ্ট সভ্যতা গড়িয়া উঠে, এই তিনটির একটিও কিন্তু মিসিসিপি বা আমাজনের মত বড় বড় নদীর ধারে উদ্ভূত হয় নাই। আমেরিকার নদীমাতৃক অংশগুলি এখন পর্য্যন্ত আদি-যুগের অরণ্যানীতে সমাবৃত, এবং ইহাদের তীরভূমি শীত ও উষ্ণতার বাহুল্য-হেতু গঙ্গা বা নীল নদের তীরের মত সুখ-সেব্য হয় নাই। আমেরিকার নিজস্ব দেশ-জ সভ্যতা যেখানে গড়িয়া উঠে, সেখানকার জল-বায়ু ভাল, ভূমি উর্ব্বরা এবং পর্ব্বতাদির দ্বারা সুরক্ষিত। নদীর অভাব লোকে জানিতে পারে নাই। আমেরিকার সভ্যতাগুলি স্পেনীয়-দের সহিত সংঘর্ষে আসিয়া বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহার চিহ্নাবশেষ পুরাতন মন্দির ভাস্কর্য্য প্রভৃতি, ইহার গৌরবের ও উৎকর্ষের পরিচয় তেস্কুকো Tezcuco হ্রদের তীরে 'নাহুআ' Nahua জাতির সভ্যতা; ইহার ভোগ-কাল ৪৫০—১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ; নাহুআ-দের 'তোল্‌তেক্' Toltec শাখা কর্ত্তৃক ইহার পত্তন, এবং দুর্দ্ধর্ষ 'আস্তেক্' Aztecগণ কর্ত্তৃক ইহার প্রসার। [২] যুকাতান ও গুআতেমালা প্রদেশে এবং মধ্য আমেরিকায় 'মায়া' Maya জাতির সভ্যতা; ইহা নাহুআ-সভ্যতার সমসাময়িক; প্রতিবেশী নাহুআ-দের সঙ্গে মায়া-দের যোগ ছিল। (মায়াজাতি লিপিবিদ্যা জানিত; কিন্তু ইহাদের 'উপলাকৃতি' (calculiform) লিপি পাঠ করিবার উপায় নাই, এই লিপিতে লেখা অনুশাসন প্রহেলিকাময় হইয়া রহিয়াছে)। [৩] দক্ষিণ-আমেরিকায় পেরু-দেশের 'কিচুআ' Quichua ও 'আয়মারা' Aymara জাতিদ্বয়ের সৃষ্ট সভ্যতা; খ্রীষ্টীয় ১০০০ আন্দাজ আন্দেস্ Andes পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে তিতিকাকা-হ্রদের তীরে ইহার উদ্ভব, এবং কিচুআদের রাজা ইঙ্কা Incaদিগের কর্ত্তৃক আন্দেস্-পর্ব্বতের পশ্চিম সানু ধরিয়া ১৫৩০ খ্রীঃ অবধি ইহার প্রসার হয়। পেরুর সভ্যতার সহিত নাহুআ ও মায়া সভ্যতার সংস্পর্শ ঘটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই বিজেতা স্পেনীয়-দের গোঁড়ামি ও অত্যাচারের হাতে ইহাদের অস্তিত্ব লোপ পায়। আমেরিকার এই দেশীয় সভ্যতা জগৎকে কিছু দিয়া যাইতে পারে নাই, কিন্তু মানব-সভ্যতার ইতিবৃত্তে ইহাদের একটা স্থান আছে। লোহার ব্যবহার না জানা সত্ত্বেও নাহুআ, মায়া এবং কিচুআ জাতি স্বতন্ত্র-ভাবে যে উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা

জাতি, তুর্কী বা প্রাচীন যুগের তাতার-তুরানী জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল; এবং কেহ কেহ ইহাদিগকে ভারতের সুসভ্য প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির সহিত সম্পৃক্ত মনে করেন। আক্কাদ্-সুমের জাতির সভ্যতা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল; ইহারা কৃষি-কর্ম্মে বিশেষ পটু ছিল, এবং নক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ বিষয়ে ইহারা যাহা করিয়া গিয়াছে, তাহাই আধুনিক জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের ভিত্তি। যে সময়ে 'আক্কাদ-সুমের' জাতি খাল্‌দেয়া-দেশে বসবাস করিতেছিল, সেই যুগে আরব-দেশের মরুভূমিতে 'শেমী' Semite নামে একটি জাতি যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাস করিত। এই শেমী-জাতির অনেক শাখা; তাহার মধ্যে য়িহুদী ও আরব অন্যতম। শেমী-জাতির লোকেরা সুসভ্য আক্কাদ-জাতির সহিত সংঘর্ষে আসে; ইহার ফলে সুসভ্য কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল আক্কাদীয়গণ, এই পরাক্রান্ত বর্ব্বর জাতির সহিত মিশিয়া গিয়া আপনার স্বতন্ত্র জাতীয় অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। কিন্তু ইহাদের সভ্যতা, রীতি-নীতি, দেবতা-ধর্ম্ম, সমস্তই নবাগত শেমীয়েরা গ্রহণ করে; কেবল ইহাদের ভাষা লয় নাই। 'আক্কাদীয় নগর 'কা-দিঙ্গিরা' (অর্থাৎ 'দেব-দ্বার') শেমীয়-ভাষায় অনূদিত হইয়া 'বাব্-ইলু' বা বাবিলন নামে পরিচিত হইল। এই শেমীয়-প্রধান মিশ্র-জাতির দ্বারা পুরাতন আক্কাদ-সুমের জাতির সভ্যতা নূতন ভাষায় নূতন ভাবে, কতকটা পরিবর্ত্তিত আকারে 'বাবিলনের সভ্যতা' নামে পরিচিত। আক্কাদজাতি লিপি-বিদ্যার সহিত পরিচিত ছিল; শেমীয়েরা সেই লিপি-বিদ্যা গ্রহণ করিল, তাহাকে নূতন আকার দিল। আক্কাদের প্রাচীন কাহিনী ঐতিহ্য ও বিধিও ইহারা গ্রহণ করিল। এই নূতন বাবিলন হইতে উত্তরে 'আশুর' Ashur বা আসিরিয়া Assyria দেশে এই সভ্যতার এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া এই 'আসিরীয়-বাবিল' সভ্যতা প্রতীচ্য এশিয়ায় অটুট রহিল। এই-সকল ব্যাপার খ্রীঃ পূঃ ৫০০০-৩০০০ মধ্যে ঘটিয়াছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যে আক্কাদ-সুমের জাতির জ্ঞাতি 'এলাম' Elamiteগণ একটি রাজ্য স্থাপন করে; 'শুশান্' Shushan বা সুসা Susa নগরী এই রাজ্যের কেন্দ্র ছিল। এলামীয়গণ বহুকাল ধরিয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য ও ভাষা বজায় রাখে, কিন্তু পরে তাহারা আক্কাদীয়গণের ন্যায় শেমীয়দের মধ্যে এবং আর্য্যজাতীয় পারসীকদের মধ্যে মিশিয়া যায়।

মিসর দেশের আদিম অধিবাসীদের নিদর্শন ৮০০০ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ইহাদের পরবর্ত্তী যুগে নূতন এক জাতি মিসরীয় সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল; অনেকের মতে ইহারা এশিয়া হইতে আগত, এবং খুব সম্ভব শেমীয়-আক্কাদীয় মিশ্র-জাতির বংশধর। মিসরীয়-লিপি পাঠে জানা যায়, খ্রীঃ পূঃ ৫৫০০ বর্ষে রাজা 'মেনা' Mena (গ্রীকে Menes) কর্তৃক প্রথম মিসরীয় রাজবংশ স্থাপিত হয়; রাজা 'খুফু' Khufu (বা Cheops) ৪৭০০ খ্রীঃ পূঃতে বৃহৎ কবরস্তূপ ('পিরামিড') নির্ম্মাণ করান। ইহার পরে মিসরে এক সমৃদ্ধ যুগ আরম্ভ হয়; মিসরের বাণিজ্য ও প্রভাব চতুর্দ্দিকে প্রসার লাভ করে, এবং মিসরীর ধর্ম্ম ও নীতি এবং জাতীয়ত্ব সুদৃঢ় হয়। খ্রীঃ পূঃ ২৫০০-১৫০০ পর্য্যন্ত 'হিক্‌সস্' (Hequ- Shasu বা) Hyksos নামে এক পরাক্রান্ত শেমীয় যাযাবর জাতি মিসরে অনেক উৎপাত করে, পরে তাহারা বিতাড়িত হয়, এবং মিসরীয়েরা স্বাধীন হয়। সুপ্রাচীন কাল হইতে মিসর, দক্ষিণ আরব, বাবিলন ও পশ্চিম এশিয়ার জাতিবৃন্দ, এবং ভারতের দ্রাবিড়-জাতির মধ্যে বাণিজ্য ও ভাবের আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল।

খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-১৩০০ মিসরের অতি গৌরবের যুগ। এই সময়ে মিসরীয়েরা আপনাদের ক্ষমতা বিস্তার করিবার চেষ্টা করে। তৎকালে এসিয়া-মাইনরে 'হিত্তি' Hittite বলিয়া এক জাতি প্রসার লাভ করে; বাবিলনের সভ্যতার অংশ লাভ করিয়া ইহারা কিছুকাল পশ্চিম-এশিয়ায় প্রখ্যাত হয়। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে এজিয়ান-সাগরের উপকূলে ও ক্রীট্ প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে এবং গ্রীস দেশে আর-একটি জাতি এক বিশাল সভ্যতার সৃষ্টি করে; উত্তর-গ্রীস দিয়া আর্য্যেরা ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে অল্পাধিক পরিমাণে আসিতে আরম্ভ করিয়া এই জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, ও এই মিশ্রনের ফলে আর্য্য-ভাষী 'এজিয়ান-আর্য্য' বা 'গ্রীক' জাতি ও সভ্যতার উৎপত্তি।

আধুনিক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মত এই যে খাল্‌দেয়া ও মিসরের বহু পরে আর্য্য-জাতি প্রাচীন

ইতিহাসের রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণ হয়। ইহাঁদের মতে আদিম আর্য্যেরা মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব্ব ইউরোপের প্রান্তর-বাসী এক পরাক্রান্ত যাযাবর জাতি ছিল; ইহারা দীর্ঘ-কায়, গৌর-বর্ণ, সরল-নাসিক, দীর্ঘ-কপাল জাতি; সভ্যতায় আক্কাদীয়, শেমীয়, মিসরীয়, এজিয়ান বা ভারতের দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য্য জাতি অপেক্ষা আদিম আর্য্যেরা নিকৃষ্ট ছিল। ইহাদের গৌরবের বস্তু ছিল ইহাদের ভাষা। জগতে আর্য্যেরাই সর্ব্বপ্রথম ঘোড়াকে পোষ মানাইয়াছিল। এই হিসাবে আদিম আর্য্যেরা সভ্যতার উন্নতিতে যা কিছু যোগান দিয়াছিল। আর্য্যদের ভিন্ন ভিন্ন দল উত্তর দেশ হইতে ভারত, পারস্য, গ্রীস, ইটালী প্রভৃতি দক্ষিণের দেশে আসে, ও সেই সেই দেশের সুসভ্য অধিবাসীদের সহিত মিলিয়া যথাক্রমে ভারতীয় (হিন্দু), প্রাচীন মিতানীয় Mitanni ও পারসীক, গ্রীক, ইটালীয় প্রভৃতি সভ্যতার সৃষ্টি করে। পশ্চিম ও উত্তরেও আর্য্যেরা গমন করিয়াছিল (যেমন ফ্রান্স, গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লাণ্ডে 'কেল্‌টিক' Keltic শাখার আর্য্যেরা, জর্ম্মানী স্কাণ্ডিনেভিয়া ও ইংলণ্ডে 'টিউটন' Teuton আর্য্যেরা, ও পূর্ব্ব ইউরোপে 'স্লাভ' Slav বংশীয় আর্য্যেরা); তাহারা কিন্তু বহু-যুগ ধরিয়া আদিম অর্দ্ধ-সভ্য অবস্থায় ছিল, রোম ও গ্রীসের সভ্যতার সংস্পর্শ পরে মধ্যযুগে তাহাদের উন্নত করে।

দেখা যাইতেছে যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাচীন পাঁজী-পাত ও অনুশাসন প্রভৃতি যাহারা বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়াছেন, এমন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আর্য্যজাতিকে খুব উচ্চ আসন দিতে রাজী নহেন, এবং ভারতে ও অন্যত্র আর্য্য-আগমন মিসরের ও খালদেয়ার তুলনায় অর্ব্বাচীন ঘটনা বলিতে চাহেন। এ দিকে আমাদের দেশে বেদের যুগের আর্য্যদের প্রাচীনতা ও সভ্যতা সম্বন্ধে ধারণা সাধারণতঃ অতি উচ্চ। এ বিষয়ে যথার্থ তথ্য নির্ণয় অসম্ভব। তবে আর্য্যদের সম্বন্ধে ঠিক খবরটি এই দুই প্রতিকূল মতের মাঝামাঝি একটা কিছু ধরা যাইতে পারে। অর্থাৎ আদিম আর্য্যেরা একেবারে বর্ব্বর যাযাবর ছিল না,—তাহারা চাষ-বাস করিত, ধাতুর ব্যবহার জানিত, সমাজ-বদ্ধ হইয়া থাকিত, এবং সভ্যতার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল; সূর্য্য উষা বরুণ প্রভৃতি দেবতার কল্পনা, এবং পরবর্ত্তী যুগের ভারতীয় ঋগ্বেদের কবিতা ও উপনিষদের তত্ত্ব-কথার, তথা গ্রীস দেশের অপূর্ব্ব দেব-কাহিনীগুলির বিকাশ, বর্ব্বর বা অসভ্য জাতির বংশধর-দিগের মধ্যে সম্ভব নহে। শিল্প-কলা, বাস্তু-বিদ্যা, প্রভৃতি সভ্যতার অনেক অঙ্গ আর্য্যেরা দ্রাবিড়, বাবিলনীয়, এজিয়ান-সাগরতীর-বাসী বা মিসরীয়দের নিকট শিখিয়াছিল, এ কথা সত্য বটে। প্রাচীন আর্য্যদের কথা নানা আর্য্য ভাষায় লিখিত প্রাচীন বহি হইতে এবং আর্য্য ভাষাগুলির শব্দ অনুশীলন করিয়া জানিতে পারা যায়; সংস্কৃত ঋগ্বেদ ও মহাভারত প্রভৃতির প্রাচীন অংশগুলি হইতে, প্রাচীন পারসীক অবেস্তা Avesta গ্রন্থে, গ্রীক-ভাষায় লিখিত হোমর, হেসিওড প্রভৃতি কবির গ্রন্থ হইতে, প্রাচীন স্কাণ্ডিনেভিয়ান্ ভাষায় রচিত টিউটন-জাতির পুরাণ-কথা-গ্রন্থ 'এড্‌ডা' Edda এবং পুরান টিউটন-জাতির কাব্য হইতে, প্রাচীন আইরীশ-ভাষায় রচিত বীর-কাহিনী ও গদ্য-কাব্য হইতে, ও স্লাভ-জাতির প্রাচীন কথা হইতে এই সুপ্রাচীন যুগের আদিম আর্য্য জাতি সম্বন্ধে কিছু-কিছু কল্পনা করিতে পারা যায়।

বাবিলনের সভ্যতার প্রথম যুগে রাজা খাম্মুরাবি Khammurabi'র উদ্ভব (খ্রীঃ পূঃ ১৯৪৪-১৯০১); এই রাজা বাবিলনের এক আদি বিধি-প্রণেতা। খাম্মুরাবি'র পরে 'কাস্‌সি' Kassite নামে এক জাতি পূর্ব্ব হইতে আসিয়া বাবিলন আক্রমণ করিতে থাকে; মাঝে একবার পশ্চিম হইতে 'হিত্তা'-জাতি আসিয়া বাবিলন লুট করে। 'কাস্‌সি' জাতি বাবিলনে আধিপত্য বিস্তার করে, ও বহুকাল রাজত্ব করে; কেহ কেহ অনুমান করেন এই 'কাস্‌সি' জাতি আর্য্য-বংশীয়; ইহারা বাবিলনে ও পশ্চিম এশিয়ার প্রথম ঘোড়া আনে, বাবিলনের লোকেরা তাহার আগে ঘোড়ার সহিত পরিচিত ছিল না, তাহারা নূতন জানওয়ার দেখিয়া ঘোড়াকে 'পূব্-দেশের গাধা' নাম দেয়। 'কাস্‌সি' রাজগণ বহু-কাল স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাবিলনীয় জাতির সহিত মিশিয়া যায়। মিসরের 'তল্ল্-অল্-অমর্‌নহ' Tell-el-Amarnah নামক স্থান হইতে কতকগুলি প্রাচীন বাবিলনীয় পুথি পাওয়া গিয়াছে, (এই সকল পুথি আর কিছুই নহে, লোহার 'লেখন' সাহায্যে লেখা

কতকগুলি মাটীর টালি মাত্র)—তাহা হইতে জানা যায় যে এই যুগে (খ্রীঃ পূঃ ১৪০০) প্রাচীন মিসর ও বাবিলনের মধ্যে বিশেষ যোগ ছিল, রাজাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান চলিত। ইহার কিছু পরে বাবিলনের সহিত আসিরিয়া'র সংঘাত উপস্থিত হয়; আসিরীয়গণ বাবিলনীয়দের জ্ঞাতি, একই ধর্ম্ম ও ভাষা দুই জাতির মধ্যে চলিত ছিল। বাবিলনকে আসিরিয়া'র অধীন হইতে হয়; আসিরিয়া'র অধিকার পারস্য হইতে ভূমধ্য-সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু উত্তর হইতে শক-জাতির আক্রমণে শীঘ্রই আসিরিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যায় (৬৬৮ খ্রীঃ পূঃ)। তখন বাবিলন আবার মাথা তুলিবার চেষ্টা করে, কিন্তু শীঘ্রই আর্য্য বংশীয় 'পার্স' বা পারসীক Persian ও 'মদ' Mede জাতি দ্বয় মিলিত হইয়া রাজা কুরুষ্ (Kuros বা Cyrus)এর নেতৃত্বে বাবিলন জয় করে।

পারস্যে আর্য্য-ক্ষমতার উত্থানের আদ্য অবস্থায় ঋষি জরথুস্ত্র Zarathustra বা Zoroasterএর শিক্ষার প্রভাবে পারসীক জাতি নূতন উদ্দীপনা লাভ করে এবং রাজা কুরুষ্, কম্বুজিয় Kambyses, ও দারয়বুষ্ Dareiosএর অধীনে পারসীক জাতির ক্ষমতা ক্রমে বাবিলন, মিসর ও সমস্ত পশ্চিম এশিয়ায় বিস্তৃত হয়। এদিকে গ্রীসে গ্রীক-সভ্যতা বাড়িয়া উঠিয়াছে; গ্রীসে আত্ম-নির্ভর-শীল, স্বাধীনতা-প্রিয়, সুসভ্য, কলা-কুশল, প্রিয়-দর্শন এক জাতির উদ্ভব হইয়াছে। এই গ্রীক-জাতির সহিত পারসীকের সংঘর্ষ হইল; ফলে পারস্যের পরাজয়। গ্রীক-জাতি স্বাধীন চিন্তার অনুকূল ও লোকতন্ত্রের একান্ত অনুরক্ত প্রবর্ত্তক ছিল; শিক্ষায় সাহিত্যে দর্শনে রাজনীতিতে বাস্তুবিদ্যায় শিল্পে ভাস্কর্য্যে গ্রীক-জাতির প্রবর্ত্তিত পন্থাই আধুনিক সাহিত্য, চিন্তা ও সভ্যতার পন্থা, যদি গ্রীক-জাতি পারস্য-কর্ত্তৃক বিজিত হইত, তাহা হইলে হয়ত গ্রীক জ্ঞান ও সভ্যতা পারস্যের চাপে ধ্বস্ত ও বিনষ্ট হইত, গ্রীসের জ্ঞানের আলোকের পরিবর্ত্তে, চিন্তার জগতে ও বাহ্য জগতে স্বাধীনতার বিকাশের পরিবর্ত্তে, হয়ত পারস্যের রাজ-শক্তির অপ্রতিহত প্রাধান্য-মূলক শাসন-প্রণালীরই জয় হইত। এই হেতু মারাথোন্ Marathon-ক্ষেত্র জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়; কারণ এখানেই প্রথম পারস্য অভিযানের পরাভব, এবং তাহার ফলে চিন্তা-ও কর্ম্ম-জগতে গ্রীসের প্রভাব ও আধুনিক সভ্যতার বিকাশ। গ্রীসের উত্থানের সঙ্গে-সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন জাতিগণের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি।

সুসভ্য প্রাচীন যুগ

পারস্যের ভীতি হইতে উদ্ধার পাইয়া গ্রীস এক জাতি গৌরবের যুগে প্রবেশ করিল। এই সময়ে আথেন্স্-নগরীর সমৃদ্ধির অবস্থা। দেশ-নায়ক পেরিক্লেস্ Perikles, কবি পিন্দার Pindar, এস্কিলস্ Aischylos, সোফোক্লেস্ Sophokles, ইউরিপিদেস্ Euripides, এবং চিন্তা-শীল সোক্রাতেস্ Sokrates, প্লাতোন্ Plato, আরিস্তোতল্ Aristotle—ইঁহাদের উদ্ভব। আধুনিক সভ্য মানুষের মনের কাঠামো যেন চিরতরে এখানেই গড়িয়া উঠিল। গ্রীসের চিন্তার স্রোত গ্রীক-রাজ আলেক্সান্দরের দিগ্‌বিজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচ্যে ছড়াইয়া পড়িল; নানা জাতির চিন্তার সহিত গ্রীকের পরিচয় হইল, এক বৃহত্তর ভাব-রাজ্যের প্রসার হইল। কিন্তু এই ভাব-রাজ্য আর খাঁটী গ্রীক Hellenic রহিল না,—ইহা Hellenistic অর্থাৎ 'গ্রীক সম্পৃক্ত' বা 'গ্রীকভাবে অনুপ্রাণিত' বলিয়া প্রখ্যাত হইল। এশিয়া-মাইনরের বহু জাতি সম্পূর্ণরূপে এই সভ্যতা গ্রহণ করিল।

গ্রীক্-জাতির অভ্যুদয়ের যুগে এজিয়ান-উপকূলে এবং ভূমধ্য-সাগরের প্রায় সর্ব্বত্র বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তার বিষয়ে গ্রীকদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল 'ফোইনিক্' Phoinik বা ফিনিশিয়ান জাতি। ইহারা শেমীয়; সিরিয়া ও পালেস্তীনের উপকূলে 'তুর' বা টায়র Tyre এবং 'সিদন' Sidon নগরে ইহাদের বাস ছিল; য়িহুদী জাতির জ্ঞাতি ইহারা। খ্রীঃ পূঃ ৯০০ ৮০০ হইতে প্রতীচ্য খণ্ডে ইহারা সুদূর ব্রিটেন পর্য্যন্ত বেসাত করিতে যাইত। কাহারও কাহারও মতে মিসরের চিত্র-লিপির কতক-গুলি চিত্র ভাঙ্গিয়া ক্রীট দ্বীপের লিপির কতকগুলি বর্ণ লইয়া ইহারা ধ্বনি-নির্দ্দেশক একটি বর্ণমালা গঠন করে, তাহা গ্রীকেরা শিখে, এবং একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহা হইতে লাটিন বর্ণ-মালার উৎপত্তি হয়। জগৎকে এই বর্ণমালার দানই ফিনীক্ জাতির শ্রেষ্ঠদান। প্রাচীন ভারতের বর্ণমালা এই বর্ণমালা হইতে

জাত বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত। ফিনীকেরা উত্তর আফ্রিকায় 'কার্ত্-হাদা' বা 'নূতন শহর' বলিয়া এক নগর প্রতিষ্ঠা করে, এই নগর রোমানদের নিকট কার্থাগো Carthago বা কার্থাজ নামে পরিচিত হয়; কার্থাজের পোএনি Poeni বা পুনিক Punic (অর্থাৎ ফিনীক) লোকেরা সিসিলী, স্পেন ও অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপন করে, এবং এক প্রবল জাতি হইয়া দাঁড়ায়। পরে রোমানদের সঙ্গে বহুকাল যুদ্ধ করিয়া খৃঃ পূঃ ১৪৬ সালে ইহাদের ক্ষমতার নাশ হয়।

এদিকে ইটালী-দেশে আর্য্য-ভাষী লাটিন-জাতি সমস্ত দেশটি স্বায়ত্তে আনিয়াছে। টস্কানী-প্রদেশের সুসভ্য অনার্য্য 'এত্রুস্ক' Etruscan জাতির, ও দক্ষিণ ইটালীতে উপনিবিষ্ট গ্রীক-জাতির নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইহারা সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। এবং ক্ষমতা প্রসার বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী শেমীয় কার্থাজকে ধ্বংস করিয়াছে। ঘর ঠিক করিয়া রোমান জাতি দিগ্বিজয় আরম্ভ করিল, ও অচিরাৎ সমগ্র সুসভ্য ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়া দখল করিল। কিন্তু গ্রীসের সভ্যতার নিকট রোম পরাভব স্বীকার করিল; বিজেতা রোম সম্পূর্ণ-রূপে বিজিত গ্রীসের শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করিল। রোমের হাতে গ্রীসের এই অর্ব্বাচীন কালের Hellenistic সভ্যতা পরিপুষ্টি ও প্রচার লাভ করিল। জগৎকে দান করিবার রোমের নূতন কিছুই ছিল না; বিদ্যা, ধর্ম্ম চিন্তা, বাস্তু ও শিল্প-কলা, সাহিত্য—সকল বিষয়েই রোম গ্রীসের শিষ্য। রোমের তবে একটি জিনিস নিজস্ব ছিল—ব্যবহারিক বিধি-নিয়ম; এবং রোমের দ্বারা গ্রীসের সভ্যতার প্রচার হয়, এবং ইউরোপ-খণ্ড একই সভ্যতার বন্ধনে বদ্ধ হয়।

বাহিরের জগৎ অর্থাৎ প্রতীচ্যের সহিত সংস্পর্শ ভারত-বর্ষের কিছু কিছু থাকিলেও, চীন একেবারে অন্তরালে পড়িয়া ছিল; প্রাচীন যুগে ভারত, পারস্য বা গ্রীসের সঙ্গে চীনের বিশেষ যোগ ছিল না। মোঙ্গোল-বংশোদ্ভব চীনারা সম্পূর্ণ নিজ মতে এক সভ্যতা গড়িয়া তুলিতেছিল। উত্তর কালে চীন যখন ভারতের নিকট বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, দর্শন ও শিল্প পায়, তখন তাহার নিজের প্রাণ, নিজস্ব সভ্যতা বা কনফুশিয়সের প্রবর্ত্তিত সমাজ-ধর্ম্ম ও নীতি। এই ভাবে পর-জীবনের বা তত্ত্ব-কথার বিশেষ স্থান নাই। কনফুশিয়সের সমসাময়িক ঋষি তাত্ত্বিক লাউ-ৎজে. পরা-বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইহাঁর চিন্তার সহিত উপনিষদের ঋষিদের চিন্তার অনেক মিল দেখা যায়; কিন্তু চীন সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। খুঙ্-ফু-ৎজের শুষ্ক নীতি লইয়াই চীন তাহার সভ্যতা প্রস্তুত করিয়াছিল; রসের দিক ভাবের দিক লাউ-ৎজে. হইতে লয় নাই; পরে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম তাহা আনিয়া দেয়। চীনকে বাদ দিয়া জগতের সভ্যতার ইতিহাস লেখা চলে, কারণ জগতের প্রাচীন সভ্যতার মুখ্য ধারার সহিত ইহার যোগ ছিল না। ইহা বাহিরের বৌদ্ধ ধর্ম্ম লইয়াছিল, এবং নিজের দুই একটি মাত্র জিনিস দিয়াছিল, কিন্তু তাহা বহু পরে।

ভারতবর্ষের সহিত প্রাচীন জগতের অল্পাধিক ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। দ্রাবিড়-জাতির বাবিলনের সহিত বেসাত চলিত; এবং উত্তর ভারতে উপনিবিষ্ট ঋগ্বেদের যুগের আর্য্যদের সহিত, স্বজাতি ও সমভাষা ঈরানীয়দের, এবং শেমীয় আসিরিয় প্রভৃতির সংযোগ থাকা খুবই সম্ভবপর ছিল। ভারতবর্ষ জগৎকে বুদ্ধ দিয়াছে; গ্রীসের চিন্তায় ভারতের ছাপ আছে। দশমিক অঙ্ক গণনা,—যেটি জ্ঞান বিস্তারের একটি প্রধান বাহন, তাহা ভারতের উদ্ভাবিত। ঐহিক সভ্যতার ইতিহাসেও ভারতের স্থান উচ্চে—বহির্ভারতের অর্থাৎ Further India র নানা জাতির, যেমন মুণ্ডা (কোল) জাতির জ্ঞাতি মোন্ ও খ্মের্-দিগের, ও মোঙ্গোলবংশীয় বর্ম্মী এবং শ্যামী জাতির, এবং মালয় ও যবদ্বীপ প্রভৃতি ভারত-দ্বীপ-পুঞ্জের জাতিবর্গের সভ্যতা ভারতের সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

রোমের গৌরবের যুগে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের উদ্ভব। ঐহিক সভ্যতা ও বিলাসের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে নাস্তিকতা ও কদাচার গ্রীসে ও রোম-সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হইল; প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ধর্ম্মের অধঃপতন ঘটিল, পণ্ডিতলোকে উহাতে আস্থা হারাইল, জনসাধারণের নিকট উহা দুর্নীতির আকর হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে য়িহুদীদের ধর্ম্মের কতক-গুলি মূল সূত্র, গ্রীক ও অন্যান্য ধর্ম্মের দার্শনিক

মহাত্মা যিশু-খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র-মাধুর্য্য—ইহা লইয়া যে নূতন ধর্ম্ম সৃষ্ট হইল, তাহা অল্পে অল্পে ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িল। এই ধর্ম্ম পরলোক-সর্ব্বস্ব, প্রথম প্রথম ইহার প্রভাব-ক্রিয়া রোমান যুগের বিকার-গ্রস্ত গ্রীক সভ্যতার প্রতিকূল হইল। গ্রীক সভ্যতার গতি কয়েক শতাব্দীর জন্য এই ধর্ম্ম দ্বারা যেন রুদ্ধ হইয়া গেল। রোমানেরা খ্রীষ্টানদের উপর প্রথমতঃ অনেক উৎপীড়ন করে; কিন্তু ৪র্থ শতের মধ্য-ভাগে রোম-সম্রাট কন্‌স্তান্তীন খ্রীষ্টান হন। ৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সমগ্র সুসভ্য দক্ষিণ-ইউরোপ খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ও চিন্তা জগতে গ্রীক আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছিল, এদিকে বাহ্য জগতে উত্তর-ইউরোপের দুর্দ্ধর্ষ হূণ ও টিউটন জাতি তেমনি রোমান-সাম্রাজ্য ও গ্রীক-রোমান সভ্যতার ধ্বংস সাধন করিতেছিল। হূণ জাতি মধ্য এশিয়ার অধিবাসী, তাতার প্রভৃতি জাতির সহিত সম্পৃক্ত; ইহারা এই যুগে (গুপ্ত-বংশীয় রাজাদের কালে) উত্তর-পশ্চিম ভারতেও বিশেষ উপদ্রব করে। হূণ রাজা আত্তিলা (Attila) মিলিত রোমান ও টিউটন জাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হয় (৪৫১ খৃঃ)। হূণ-জাতি বিতাড়িত হওয়ায় রোমান সভ্যতা রক্ষা পাইল; নহিলে বর্ব্বর অনার্য্য হূণের হাতে বিনষ্ট হইয়া যাইত। হূণদের কতক অংশ ইউরোপ ত্যাগ করে, এবং কতক অংশ ইউরোপেই বাস করিতে থাকে, ও স্লাভ এবং টিউটন্‌দের সহিত মিশিয়া যায়। গথ, ভাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি টিউটন জাতির নানা শাখা ক্রমে শান্তভাব ধারণ করিল, খ্রীষ্টান হইল, খ্রীষ্টানী এবং রোমান সভ্যতার অংশ গ্রহণ করিল। এই যুগের শেষে ও পরবর্ত্তী মধ্য যুগের প্রারম্ভে আধুনিক ইউরোপের জাতিবর্গের উদ্ভবের সূচনা হইল। এই সকল বর্ব্বর জাতির হাতে পড়িয়া খ্রীষ্টানী রোমান সভ্যতা নূতন আকার ধারণ করিল; এবং চিন্তা-জগতে কিছুকাল গ্রীসের প্রভাব লুপ্ত হইয়া রহিল।

মধ্য-যুগ

ইংরেজ, জর্ম্মান, ডচ্ ও স্কাণ্ডিনেভীয়—এই টিউটনিক জাতিগুলি এখন ইউরোপের সভ্য জীবনের স্রোতে যোগ দিল; রোমানদের লাটিন ভাষা ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে এমন কেল্‌টিক ও অন্যান্য জাতির বংশধরগণ, ইটালীয়, ফরাসী, প্রভেন্সাল, স্পেনীয় (ও কাতালান), পোর্টুগীস, ও রুমানীয়, এই কয় জাতিতে পরিণত হইল; পূর্ব্ব-ইউরোপে অর্দ্ধ-সভ্য আর্য্য-ভাষী রুষ, বুলগার, পোল, চেখ্ প্রভৃতি স্লাভ জাতি খ্রীষ্টান হইল; হূণ-বংশীয় মাগ্যারগণ (magyar) হঙ্গেরীতে বাস স্থাপন করিল।

৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে জগতে আর একটি নূতন শক্তির উন্মেষ হইল; সেটি মুসমান-ধর্ম্ম। ইহার প্রভাবে উৎসাহী আরব জাতি জগৎময় ছড়াইয়া পড়িল; এশিয়া-মাইনর ও মিশরের গ্রীক সভ্যতা অচিরাৎ আরব ধর্ম্মোন্মত্তার হাতে পিষ্ট হইয়া গেল, এবং পারস্যের ও উত্তর ভারতের আর্য্য-সভ্যতা যথেষ্টরূপে বিপন্ন ও পরিবর্ত্তিত হইল। মোহম্মদের মৃত্যুর কিছু পরে ৬৭১ সালে নহাওন্দ্ ক্ষেত্রে পারস্যের 'সাস্সানী' রাজ-বংশ ধ্বংস হয়, ও পারস্য আরবের অধীন হয়। ভারতবর্ষ হইতে উত্তর ফ্রান্স পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে মুসলমান আরবদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়া পড়ে; কিন্তু এক স্পেন ও সিসিলী দ্বীপ ভিন্ন ইউরোপের অন্যত্র ইসলামী সভ্যতা বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই; ফ্রান্সে মুসলমান-বিজয়ের প্রথম যুগেই আরব অভিযান প্রতিহত হইয়া পড়ে, তুর্স্ (Tours)এর ক্ষেত্রে ফ্রান্সের নায়ক শার্ল্ মার্ত্তেল্ (Charles Martel)এর হাতে আরব-দের পরাজয় ঘটে (৭৩২ খ্রীঃ); তুর্সে বাধা না পাইলে হয় ত সমস্ত সভ্য ইউরোপ আরবের অধীন হইত, ফলে হয় ত সমগ্র জগতের সভ্যতা মুসলমানী ভাবে গঠিত হইয়া উঠিত। আরব-জাতির প্রথম ঝোঁক কাটিয়া গেলে বগ্‌দাদ-নগরে 'অব্বাস-বংশীয় খলীফাদের নেতৃত্বে, ও পরে সল্‌জুক্-জাতীয় তুর্কী রাজাদের সাহচর্য্যে (৭৫০—১২৫০) এক অভিনব ইস্‌লামী-সভ্যতার পত্তন ও প্রচার হইল; ইহার মূলে পারসীক সভ্যতা, গ্রীসের দর্শন, ও শেমীয় আরব জাতির ধর্ম্ম বিশ্বাস; ইহার বাহন আরবী ও ফার্সী ভাষা-দ্বয়। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকে উত্তর হইতে মোঙ্গোল ও তাতার-জাতীয় বর্ব্বরগণ, চিঙ্গীজ্ খাঁ ও পরে হুলাগু-খাঁ'র নেতৃত্বে খোরাসান, পারস্য ও মেসোপোটামিয়ায় নামিয়া আসে, এবং ১২৫৮ সালে বগ্‌দাদ্ নগরী ধ্বংস করিয়া আরব সভ্যতার একপ্রকার বিলোপ-সাধন করে; চিঙ্গীজ্

ও হুলাগু মুসলমান ছিল না; মুসলমান সভ্যতা ইহাদের হাতে বিধ্বস্ত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। ৭১২ সালে আরবেরা স্পেন জয় করে। স্পেনে আরব সভ্যতার আর এক কেন্দ্র স্থাপিত হয়, আরবেরা অতি গৌরবের সহিত প্রায় ৮০০ বৎসর রাজত্ব করে, সেভিল, কর্দোভা ও গ্রানাদা নগরী স্পেনে আরব জ্ঞান ও কলার লীলাভূমি ছিল। স্পেনের বহু নদনদী নগরাদির আরব নাম আরব অধিকারের সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু ১৫র শতের শেষ-ভাগে স্পেনীয়েরা আরবদিগকে বিতাড়িত করে। ইতিমধ্যে মধ্য-এশিয়া হইতে আগত সল্জুক্ ও অন্য বর্ব্বর তুর্কী-জাতি মুসলমান ধর্ম্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করে, এবং স্পেন হইতে মুসলমানদের বিদূরিত হইবার কিছু পূর্ব্বেই তুর্কীরা গ্রীসে ও দক্ষিণ-পশ্চিম-ইউরোপে মুসলমান ক্ষমতা বিস্তার করে। গ্রীসের খ্রীষ্টানী সভ্যতা (বাইজান্তীয় Byzantine সভ্যতা) এই নূতন মুসলমান ক্ষমতার নিকট হারি মানিল; এই সংঘর্ষের ফলে ইউরোপে এক নূতন জাগরণ হইল,—খ্রীষ্টানী চিন্তার প্রাধান্যের যুগের গাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গিল।

মধ্য-যুগে জগতের আধুনিক জাতিগুলি বিশিষ্টতা লাভ করিয়া উঠিল। পশ্চিম ইউরোপে ফরাসী, ইংরেজ, ইটালীয় জর্ম্মান, প্রভেন্সাল, স্পেনীয় ও পোর্টুগীস্ জাতি ও সাহিত্যের উত্থান হইল; যোদ্ধৃবর্গের আভিজাত্য ও ভূম্যধিকারিত্বের (Feudalism) প্রতিষ্ঠা হইল। এই মধ্য-যুগে ফরাসী সাহিত্যের জাগরণ; ফরাসী ও কেল্‌টিক্-ওয়েলশ্ জাতির গাথা লইয়া, ফরাসী জাতির রসভাব গ্রহণ করিয়া ফরাসীতে ও তদনুকরণে ইটালীয়, জর্ম্মান, ইংরেজী ভাষায় যে 'রোমান্স'কাহিনী রচিত হইল তাহা জগতের সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব বস্তু; বিগত শতাব্দীতে ইউরোপ তাহারই উদ্বোধন করিবার প্রয়াস করিয়াছিল। মধ্য-যুগে পশ্চিম ইউরোপের রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম্মের চরম পরিণতি; এই যুগে ইউরোপে কতকগুলি খ্রীষ্টান সাধকের ও পণ্ডিতের উদ্ভব। এই সময়ে রোমের ধর্ম্ম-গুরু পোপদিগের অব্যাহত প্রভাব ছিল। মধ্য-যুগে ধর্ম্মভূমি পালেস্তীন উদ্ধারে কৃত-সংকল্প ফ্রান্সের নর্‌মান ও অনান্য জাতীয় যোদ্ধগণের অভিযান, ও আরবজাতির সহিত সংস্পর্শ, তাহার ফলে ইউরোপের চিন্তা ও সভ্যতায় আরব ও এশিয়ার প্রভাব কিছু-কিছু আসিয়া পড়ে।

চিঙ্গীজ্-খাঁ এবং তৈমুর-লঙ্গের অধীনে তাতার ও তুর্ক-জাতি এই যুগে সমস্ত এশিয়ায় ও রুষে ছড়াইয়া পড়ে। এই মধ্য-যুগের প্রারম্ভে মিশর এশিয়া-মাইনর ও পশ্চিম-এশিয়ার প্রাচীন জাতিগণের বিলোপ, ও তাহাদের স্থানে মুসলমান আরবজাতির প্রসার, নবীন পারসিক-জাতির পুনরুত্থান ও তুর্কীজাতির অভ্যুদয়—এবং এই সময়েই আরবী ও ফারসী সাহিত্যের সৃষ্টি ও উন্নতি। উত্তর ভারতে এই যুগে আধুনিক পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, বিহারী, মরাঠা, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা সাহিত্য ও জাতির উদ্ভব; হিন্দু ও ইসলামী সভ্যতা ও ধর্ম্মের সংঘাত, এবং উহাদের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কবীর-পন্থী, দাদু-পন্থী, নানক-পন্থী, প্রভৃতি সন্ত্-মার্গের, ও নানা নবীন সম্প্রদায়ের প্রসার। মালয় উপদ্বীপে ও যবদ্বীপ প্রভৃতিতে ইসলাম ধর্ম্মের প্রচার; বহির্ভারতের আদিম অধিবাসী সভ্য মোন্ ও খ্মের জাতির সহিত উত্তর হইতে আগত মোঙ্গোল-বংশীয় বর্ম্মী ও শ্যামী-জাতির সংঘর্ষ, মোন-খ্মের জাতির পরাভব, এবং আধুনিক বর্ম্মী ও শ্যামীদের প্রসার। চীন বরাবরই অনেকটা স্বতন্ত্র; কিন্তু এই যুগে কোরিয়া ও জাপান চীনের সম্পূর্ণরূপে অনুকারী শিষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক যুগ

পশ্চিম ইউরোপে রোমান সভ্যতার উপর খ্রীষ্টানী ছাপ পড়িবার পর হইতে গ্রীক চিন্তা-প্রণালী ও গ্রীক সাহিত্যের সহিত পশ্চিম ইউরোপ সংস্রব ত্যাগ করিয়া ছিল; গ্রীক মনস্বি-গণের চিন্তা ও বাণী কিছুকালের জন্য পশ্চিম ইউরোপের জীবনে আর কার্য্যকরী হইতে পারে নাই, কারণ গ্রীক ভাষা ও গ্রীক সাহিত্যের চর্চ্চা রহিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৪৫৩ সালে যখন তুর্কীরা কনস্তান্তিনোপল জয় করিল, তখন গ্রীক পণ্ডিতেরা পুথিপত্র লইয়া পশ্চিম ইউরোপে আশ্রয়-সন্ধানে গমন করিলেন। তাঁহারা গ্রীক ভাষায় উপদেশ দিতে লাগিলেন; ফলে ইউরোপে গ্রীক সাহিত্যের চর্চ্চা নূতন করিয়া আরম্ভ হইল, প্রাচীন গ্রীক মনের সহিত পুনঃ পরিচয় ঘটিল, ইউরোপে চেতনার সাড়া পড়িয়া গেল—রেনেসাঁস্ Renaissance বা 'নব জীবনের যুগ' পড়িল। খ্রীষ্টানী যুগের চিন্তা (বা চিন্তার কণ্ঠরোধের) বিরুদ্ধে

প্রতিক্রিয়া চলিল; সকল দিকে সুসভ্য পরিপৃচ্ছা-শীল গ্রীসের মত আসিয়া পড়িল। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সংস্কার আরম্ভ হইল; আর রোমান-কাথলিক ধর্ম্মের ও রোমান-কাথলিক যাজকের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ রহিল না, নানা Protestant বা বিদ্রোহী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। নূতন জীবনের স্পর্শে ইউরোপের লোকে চিন্তা-রাজ্যে যেন দিগ্‌বিজয় করিতে সচেষ্ট হইল। ক্রমে স্বাধীন চিন্তার প্রসার বৃদ্ধি পাইল। নূতন জীবনের আবেশে ইউরোপ কোনও গণ্ডী না মানিয়া উদ্দাম গতিতে চলিতে চাহিল। কর্ম্মক্ষেত্রে বড় বড় কর্ম্মবীর উদ্ভূত হইলেন; এই যুগে কলম্বস্ (Columbus) নূতন ভূ-ভাগ আমেরিকা-খণ্ড আবিষ্কার করিলেন, ভাস্কো-দাগামা (Vasco-da-Gama) ভারতে আসিবার জল-পথ বাহির করিলেন, মাজেল্লান্ (Magellan) জগৎ পরিক্রম করিয়া আসিলেন।

বৈজ্ঞানিক যুগের আরম্ভ হইল। স্পিনোজা (Spinozaর) দর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধ ধর্ম্ম ও গোঁড়ামির বাঁধ ভাঙ্গিয়া চিন্তার স্রোতকে উন্মুক্ত করিয়া দিল। ১৫র শতের শেষভাগে ইউরোপে মুদ্রা-যন্ত্রের উদ্ভব ও প্রচার, জগতে জ্ঞান-বিস্তারের পথ পরিষ্কার করিয়া নূতন যুগ আনয়ন করিল। ইউরোপে এই যুগ বেকন্ (Bacon), নিউটন (Newton), গালিলেও (Galileo) ও কোপার্নিকস (Copernicus)এর যুগ; রাফাএল (Raphael), মিকেল আঞ্জেলো (Michel-Angelo, টিসিআন (Titian) প্রভৃতি শিল্পী, শেক্‌স্‌পিয়র্ (Shakespeare), মিলটন (Milton), তাস্‌সো (Tasso), আরিওস্তো (Ariosto), কামোএন্স্ (Camoens) প্রভৃতি কবির যুগ। এই যুগে আধুনিক ইউরোগ যে বেশে বাহির হইল সে বেশ এখনও ধারণ করিয়া আছে। ভারতে ও প্রাচ্য-খণ্ডে ইউরোপের প্রসারের সূত্রপাত এখন হইতে; আমেরিকায় নবীনতর ও মহত্তর ইউরোপের পত্তন এই যুগে; কিন্তু আমেরিকার এই নূতন ইউরোপের পত্তন ঐ দেশের আদিম জাতিকে উচ্ছেদ করিয়া তবে হইল। অসভ্য আমেরিকা-বাসীরা ত ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের সংঘর্ষে আসিয়া মারা পড়িল; এবং মেক্‌সিকো ও য়ুকাতান এবং মধ্য-আমেরিকার, তথা পেরুর প্রাচীন সভ্যতাকে রোমান-কাথলিক গোঁড়ামির নিকট বলি দেওয়া হইল।

এশিয়া-খণ্ডে ও পূর্ব্ব-ইউরোপে কিন্তু মধ্য-যুগের অবস্থা বহু-দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। সম্রাট অকবর অতি উদার-চেতা লোক ছিলেন, চীনের মাঞ্চু সম্রাট্‌গণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, রুষের রাজা পিটার পশ্চিম ইউরোপের সহিত রুষের যোগ সাধনে চেষ্টমান ছিলেন বটে, কিন্তু ভারতে চীনে বা রুষে নব জাগরণ তখনও আসে নাই।

১৮ শতের শেষে জগতের পক্ষে চির-স্মরণীয় আর একটি ঘটনা ঘটিল—ইহা ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী-দেশের দরিদ্র প্রজামণ্ডলী বহুকাল ধরিয়া ভূস্বামী অভিজাত-সমাজ দ্বারা নিপীড়িত হইয়া আসিতেছিল। মাঝে মাঝে মধ্য-যুগে প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া অভিজাত-বর্গকে আক্রমণ করিয়া অমানুষিক লুণ্ঠন ও অত্যাচারের দ্বারা প্রতিশোধ লইবার অন্ধ প্রয়াস পাইত। ১৮র শতে ভল্‌তেয়ার (Voltaire), রুসো (Rousseau) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের লেখার প্রচারে 'সকল মানুষই সমান' এই সাম্য-নীতি ফরাসী দেশে বিস্তৃত হইতেছিল। জন-সাধারণ অভিজাত-বর্গের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া রাজ্যে বিপ্লব ঘটাইল; রাজার শাসন দূর করিয়া প্রজা-তন্ত্র স্থাপিত করিল; পরে রাজাকেও বধ করিল ও রাজ্যে অভিজাতবর্গকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত করিল। নূতন মতের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া ফরাসীরা তাহাদের সাম্য-নীতি ও প্রজা-শক্তির প্রাধান্যের কথা জগতে ঘোষিত করিল। ইহার ফলে ফরাসী দেশের প্রজা-শক্তির সহিত ইউরোপের অন্যান্য দেশের রাজ-শক্তির সঙ্ঘর্ষ হইল। এই সঙ্ঘর্ষের মধ্যে নেপোলেওন (Napoleonএর) আবির্ভাব। সেনানী নেপোলেওন অসাধারণ রণ-নৈপুণ্য দেখাইয়া ফ্রান্সকে নিজের বশে আনেন; ফ্রান্সের গৌরব ইউরোপময় ছড়াইয়া পড়ে, ফ্রান্স সানন্দে তাঁহাকে সম্রাট্‌রূপে গ্রহণ করে। ইউরোপের একচ্ছত্র অধীশ্বরের ন্যায় রাজ্য করিবার পর ১৮১৫ সালে ওআটর্লু (Waterloo) ক্ষেত্রে তিনি পরাজিত হন। ফ্রান্সে পুনরায় ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের পূর্ব্বের মত রাজ-শাসন বিজেতা ইংরেজ ও জর্ম্মান কর্ত্তৃক আনীত হয়। কিন্তু পরে ফ্রান্সে ১৮৭২ সালে আবার প্রজা-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। ফ্রান্সের এই সাম্য-বাদ আধুনিক সভ্যতার একটি খুব বড় কথা; যদিও এই কথাটি সর্ব্বত্র সম্মানিত হয় না।

১৫০০র পরে ইউরোপের ইতিহাস বৈচিত্র্যময়, অল্প

কথায় আলোচনা করা সম্ভব নয়। ইউরোপে এখন যে ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার ফলে পৃথিবীর তাবৎ জাতির ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই ভয়ানক সমর ছাড়িয়া দিলে, ইউরোপের অর্ব্বাচীন ইতিহাসে এমন কোনও ঘটনা দেখা যায় না যাহাকে প্রাচীন যুগের বিরাট ব্যাপারগুলির সহিত তুলিত করা যায়। ইউরোপের বিশিষ্টতায় দাগ লাগিবার মত বিশেষ কিছু ঘটে নাই।

১৯ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। ১৯শ শতাব্দীতে ডার্‌বিন্ (Darwin) প্রমুখ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অভিব্যক্তি-বাদ (Theory of Evolution)এর বিষয়ে যে গবেষণা হয়, তাহা আধুনিক চিন্তার ধরণ একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে। বাষ্পের কার্য্যকারিতা লোকে এই শতাব্দীতে বুঝিতে পারে; ইহার ফলে রেল-গাড়ী ও ষ্টীমার এবং কল-কারখানা। কল-কারখানা এবং বাণিজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহরে বেশী লোকের আগমন, এবং গ্রামে চাষবাসের ও হাতে করিয়া শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের হ্রাস ঘটিয়াছে; জীবনের স্রোত একেবারে অন্য রকম হইয়া গিয়াছে—জীবন ব্যাপার বিশেষ রূপে জটিল হইয়া পড়িয়াছে, মানুষের জীবনে নানা অশান্তি আসিয়া পড়িয়াছে। অনেক লোক একসঙ্গে মজুরী করায় (Industrialism) অর্থাৎ কল কারখানার রোজ মজুরীর প্রাধান্যের উদ্ভব; ধনীলোকে কলকারখানা তুলিয়া জন খাটাইয়া অনেক বেশী করিয়া শিল্পজাত প্রস্তুত করাইয়া বেশী লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত; কিন্তু ইউরোপের মজুর লোকে লেখা পড়া শিখিতেছে, তাহাদের চোখ ফুটিয়াছে, তাহাদের বঞ্চিত করিয়া বা অন্যায্য মূল্য দিয়া তাহাদের পরিশ্রমের ধন যে অর্থশালী লোকের ভোগে আসিবে, ইহা সহিতে তাহারা নারাজ। ইহার ফলে অর্থ ও শ্রম (Capital ও Labour)-এর বিবাদ; ইউরোপের সমাজে এই ব্যাপারটি একটী গুরুতর জটিল বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার সমাধানের জন্য, সমাজের পুনরুজ্জীবনের জন্য ইউরোপের নানা দেশে সম্পত্তিসাম্য (Socialism) প্রভৃতি নানা পন্থা উদ্ভাবনের ও প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। আধুনিক সমাজে আর একটি বিষয়ে অন্তর্বিপ্লব চলিতেছে, সেটি স্ত্রীজাতির অধিকার লইয়া। এই অবস্থা আমাদের দেশে এখনও আসে নাই, কিন্তু ভাবার কারণ আমাদের দেশও সনাতন বা প্রাচীন পথ ছাড়িয়া আধুনিকতার পথে জাপান প্রভৃতির ন্যায় চলিতে উদ্যত। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষে বৈদ্যুতিক শক্তিকে ধরিয়া তাহাকে কাজে জুড়িয়া দিয়াছে, মানুষ মাছের ন্যায় জলের ভিতর ও পাখীর মত হাওয়ায় চলিতে পারিয়াছে। আরও কত কি ব্যাপার যাহা আগে কল্পনায়ও আনা যাইত না এখন সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইতেছে।

ইউরোপের জর্ম্মানী, ফরাসী প্রভৃতি জাতির মধ্যে পার্থক্য ও অন্তর্দাহ যথেষ্ট থাকিলেও ইহারা একই তরুর শাখা, একই সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বহির্জগতে এই সভ্যতার জয় অবশ্যম্ভাবী—কারণ বাহ্য বিষয়ে সর্ব্বত্রই এই সভ্যতার অনুকরণ চলিতেছে। যেখানেই রেলগাড়ী টেলিগ্রাফ্ কল-কারখানা আসিতেছে, সেইখানেই এই সভ্যতার জয়—অন্ততঃ বাহ্য বিষয়ে। চীন, ভারত, রুষ প্রভৃতি দেশের প্রাচীন জীবন-ধারণ প্রণালী এই সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বদলাইয়া যাইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় যে জগতের ভবিষ্যৎ বাহ্যসভ্যতা একই ছাঁচে ঢালা হইতে চলিল; সেটি ইউরোপের ছাঁচ। আধুনিক ধর্ম্ম ও চিন্তা জগতে এখন কোনও দেশ-বিশেষের বা কোনও বিশেষ ধর্ম্মের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ নাই; তবে দেখা যায়, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রতাপ ইউরোপে কমিয়া আসিতেছে। কোন্ ধর্ম্ম বা কোন্ দেশের চিন্তা ভবিষ্যৎ যুগের চিন্তা বা ধর্ম্মের মধ্যে উচ্চ আসন গ্রহণ করিবে তাহা বলা যায় না, কিন্তু অনেক চিন্তাশীল লোকের মত এই যে ভারতের চিন্তা ও ধর্ম্মজীবন এই নবীন সমন্বয়ে অনেকটা স্থান অধিকার করিবে।

দেখা যাইতেছে যে এখন জগতে আধুনিক অর্থাৎ ইউরোপীয় সভ্যতার জয়-জয়-কার। কিন্তু এই সভ্যতার তরু এক হইলেও ইহার শাখাগুলিতে নানা পার্থক্য আছে; সেই সকল পার্থক্যের কারণে অনেক সময়ে বিরোধ দেখা যায়। ইউরোপীয় সভ্যতা, সমষ্টি-হিসাবে এক, ব্যষ্টি-হিসাবে অনেক। এই সভ্যতার সূত্রগুলিও তেমনি অনেক। কতকগুলি সূত্র প্রাচীন জাতি হইতে প্রাপ্ত; কতকগুলি আধুনিক জাতি-কর্ত্তৃক আহৃত উপাদান। এই বিভিন্ন

বা জাতিভেদে ইউরোপীয় সভ্যতার বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের বিশেষত্ব কি তাহা দু'কথায় বলা কঠিন; তবে বৈচিত্র আছে, এবং তাহা উপলব্ধি করা যায়। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার শাখা এইগুলি—

ক। অ্যাঙ্গ্লো-স্যাক্সন বা ইংরেজী সভ্যতা—ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজ-জাতির ভাবসম্পদ ও চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহার মূলে আর্য্য টিউটন-জাতির জাতীয়তা; তাহার উপর ফরাসী ও ব্রিটিশ-কেল্‌টিক জাতির ছাপ পড়িয়াছে। এই সভ্যতা আমেরিকায় (কানাডা ও য়ুনাইটেড-ষ্টেট্‌স্-এ) নীত ও প্রসৃত হইয়াছে। আমেরিকায় নানা ভাবের নানা জাতির সংমিশ্রণ হেতু ইংরেজী সভ্যতা একটু স্বতন্ত্র ধরণের দাঁড়াইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এই সভ্যতাই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে; ইউরোপের সভ্যতার সহিত ভারতের পরিচয় এই ইংরেজী সভ্যতার ভিতর দিয়া, এবং শ্যাম, চীন ও জাপান অনেকটা ভারতের মত ইংরেজীরই ছাপ লইয়াছে।

খ। লাটিন বা রোমান্স্ সভ্যতা:—ফ্রান্স, স্পেন, পোর্টুগাল, ইটালী ও রুমানিয়ার লোকেরা লাটিন-ভাষী জাতির বংশধর; ইহাদের ভাষা লাটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন; এই কয় জাতির সাহিত্যের ও চিন্তার একটা আত্মিক যোগ আছে। এই সভ্যতার মূল হইতেছে আদি রোমান জাতি, ইটালীর নানা জাতি, ফ্রান্সের ও স্পেনের কেল্‌টিক জাতি, এবং কতকটা টিউটন জাতির জাতীয়তা ও ভাব। অ্যাংগ্লো-স্যাক্সন, টিউটনীয় ও স্লাভ-সভ্যতা অপেক্ষা ইহা একটু অন্তর্মুখী, একটু সূক্ষ্মদর্শী। এই সভ্যতার ছাপ সমগ্র ইউরোপের উপর পড়িয়াছে; আধুনিক যুগে রুষের উপর বিশেষরূপে ইহারই প্রভাব। কানাডা ও য়ুনাইটেড-ষ্টেটস্ বাদ দিলে এই সভ্যতা সমগ্র আমেরিকা-খণ্ডে স্পেনীয় ও পোর্টুগীস জাতি কর্ত্তৃক বিস্তৃত হইয়াছে; এইজন্য কানাডা ও য়ুনাইটেড-ষ্টেটস্ বাদ সমস্ত আমেরিকাকে 'লাটিন-আমেরিকা' বলে। আল্‌জিয়র, মোরোক্কো, ত্রিপোলী মিসর ও তুর্কীদেশে, এবং টঙ্‌কিঙ্, আনাম ও কাম্বোজে ফরাসী সভ্যতারই প্রভাব।

গ। টিউটনীয় সভ্যতা।—ইহা খাঁটী টিউটনীয় জিনিস, বাহিরের ভাবের ছাপ ইহার উপর কমই পড়িয়াছে। জর্ম্মানী, হলাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও আইস্‌ল্যাণ্ডের সভ্যতা ইহার প্রশাখা। যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীগণের উপর হলাণ্ডের প্রভাব পড়িতেছে। এই সভ্যতা মুখ্যতঃ জর্ম্মান ও ডচ্ জাতির চিন্তা ও সাহিত্য এবং শিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ঘ। স্লাভ সভ্যতা; ইহার দুই প্রশাখা—[১] পূর্ব্ব ভাগের—রুষ, সর্ব্বিয়ান ও বুলগার সভ্যতা [২] পশ্চিমের পোল্ ও চেখ্ বা বোহেমিয়ান সভ্যতা। রুষ সর্ব্বিয়ান ও বুলগার সভ্যতার মূল আর্য্য স্লাভ জাতি, ও অনেক অংশে তাতার-জাতি; তাহার উপর মধ্য-যুগের গ্রীসের ও আধুনিক ফ্রান্স ও জর্ম্মানীর প্রভাব। পোল্ ও চেখ্-জাতির মধ্যে তাতার উপাদানের অভাব, তাহার স্থানে ফ্রান্স, ইটালী ও জর্ম্মানীর প্রভাব। উত্তর এশিয়ার ও মধ্য এশিয়ার সমগ্র জাতি রুষ সভ্যতার প্রভাবগ্রস্ত। রুষ-দেশের লিথুআনীয় ও লেট্‌-জাতির সভ্যতাকে স্লাভ্-সম্পৃক্ত বলা যায়।

ঙ [১] হঙ্গেরীয় বা মাগ্যার, এবং ফিন্‌লাণ্ডের ফিন্-জাতির সভ্যতা মূলে তাতার জাতির সহিত সম্পৃক্ত হইলেও এখন সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয়ভাবে অনুপ্রাণিত। ফ্রান্স ও জর্ম্মানীর প্রভাব মাগ্যারদের উপর, এবং সুইডেনের প্রভাব ফিন্‌দের উপর পড়িয়াছে।

[২] আধুনিক গ্রীক সভ্যতা—ইহার মূল প্রাচীন গ্রীক, স্লাভ ও কতকটা আল্‌বানীয় ও তুর্কী জাতি; আজকাল পশ্চিম ইউরোপের প্রভাবে ইহা একেবারে নূতনরূপ ধারণ করিয়াছে।

উপরে লেখা কয় শাখার মধ্যে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী এবং জর্ম্মানী ও হলাণ্ডের সভ্যতার প্রভাবই আজকাল জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকর।

ইউরোপীয় সভ্যতা ভিন্ন জগতে সভ্যতার আর যে কয় ধারা বিদ্যমান আছে তাহা এই:—

[১] ইস্‌লামীয় সভ্যতা:—

ক। আরব সভ্যতা—মোরোক্কো হইতে পারস্য পর্য্যন্ত, ও দক্ষিণ এশিয়া-মাইনর হইতে সমগ্র আরব-দেশ ও মধ্য-আফ্রিকা পর্য্যন্ত। যেখানে মুসলমান ধর্ম্ম চলিত আছে সেখানেই ইহার প্রভাব; তবে শুনা যায় যে তুর্কীদেশে

নব্য-তুর্কেরা ইহাকে অনেকটা খর্ব্ব করিয়া ফেলিতেছে। মধ্য আফ্রিকার বন্যজাতির মধ্যে ইহার বিস্তার লাভ খুবই ঘটিয়া উঠিতেছে। এই সভ্যতার ছাপ পারস্যকে বদলাইয়া দিয়াছে, ইহা ভারতের উপর পড়িয়াছে, এবং মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপেও পঁহুছিয়াছে।

খ। পারস্য বা ঈরানী সভ্যতা। এই সভ্যতার প্রভাব আরবদের মধ্যেও কতক গিয়াছে, কিন্তু ভারতবাসী মুসলমান ও তুর্কীদের মধ্যে ইহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। 'সূফী' মতে পারসীক সভ্যতার বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই মতের সহিত ভারতের বেদান্তের মতের অনেক মিল আছে, এবং ভারতীয় মুসলমানের ও হিন্দুর চিত্তে এই মতের প্রভাব অল্প নহে।

গ। ভারতীয় মোস্‌লেম সভ্যতা। ইহার বাহন উর্দু-ভাষা। মুসলমানবহুল উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইহার প্রভাব।

ঘ। তুর্কী মোস্‌লেম সভ্যতা--[১] ওস্মান্‌লী তুর্কী—ইহা এক্ষণে বিশেষরূপে ফরাসী ও জর্ম্মান, অর্থাৎ ইউ-রোপীয় ভাবে ওতপ্রোত। [২] মধ্য এশিয়ার চাঘতাঈ তুর্কী।

[২] ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতা; ইহার মূল আর্য্য ও দ্রাবিড় জাতি, এবং উত্তর ভারতে অনেকটা মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী জাতিবর্গ। সংস্কৃত ও সংস্কৃত-মূলক ভাষা ও দ্রাবিড় ভাষায় ইহার সাহিত্য গ্রথিত। জাতীয় বিশিষ্টতা ধরিলে এই সভ্যতার মধ্যে এই কয় জাতি পড়ে—পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, (হিন্দুস্থানী, রাজস্থানী, মধ্যভারতীয়, বিহারী), বাঙ্গালী, গুজরাতী, মারাঠা, এবং তামিল, তেলুগু, কানাড়ী। সিংহলী সভ্যতাও ইহার অন্তর্গত। ভারতীয় সভ্যতার অধীনে বর্ম্মী, এবং প্রাচীন শ্যামী, ও মোন এবং খ্মের সভ্যতা, এবং মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপী, মাদুরা, বালির সভ্যতাকেও ধরা যাইতে পারে।

তিব্বতের সভ্যতা বর্ব্বর আদিম তিব্বতী, চীনা ও ভারতীয় সভ্যতার মিশ্রণে।

[৩] চীনা সভ্যতা। জগতের মুখ্য ধারার সহিত ইহার বড় ঘনিষ্ঠ যোগ কখনও হয় নাই। চীনা চিত্রলিপি এবং চীনা সাহিত্য ও দর্শন ইহার বাহন। জাপানে, কোরিয়ায় ও ইহার অব্যাহত প্রভাব। কিন্তু জাপানী জাতির বিশেষত্ব-টুকু চীনা প্রভাবে একেবারে ঢাকা পড়ে নাই।

এই ৪টি মুখ্য সভ্যতার ধারা এখন বহিতেছে—[১] ইউরোপীয় বা আধুনিক [২] ইস্‌লামীয় [৩] ভারতীয় [৪] চীনা। ইহার মধ্যে প্রথমটিতেই ভরা জোয়ার, আর সবগুলিতে যেন ভাটা পড়িতেছে; ইউরোপের বিজলীর বাতির কাছে ইস্‌লামী হিন্দু ও চীনার প্রদীপ যেন নিষ্প্রভ।

আধুনিক সভ্যতার ধারা এক খাদ দিয়া বহিয়া চলিতেছে—অনেক ধারা একে মিশিতে চায়। ভারত চীন রুষ জাপানের স্থিতিশীল সভ্যতার হ্রদ হইতে জল বাহির হইয়া এই ধারায় মিশিতেছে। মেসোপোটামিয়া ও মিসরের আদিম সভ্যতায় এই ধারার উৎপত্তি; গ্রীস ও রোমের সভ্যতায় ইহার পুষ্টি, এবং আধুনিক ইউরোপে ইহার বৃদ্ধি ও প্রসার। এই সভ্যতার প্রাসাদ গড়িয়া তুলিতে মেসোপোটামিয়া ও মিসর ভিত্তি-স্থাপনের জন্য মাটি কাটিয়াছে, গ্রীস ও রোম বনিয়াদ উঠাইয়াছে; ইটালী, ফ্রান্স, ইংলাণ্ড ও জর্ম্মানী সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ভারত, পারস্য, ইস্‌লামের যোগান দেওয়া কম হয় নাই। বাবিলন ও মিসর লিপি বিদ্যা, কলা, শিল্প, দর্শন, বিষয়ে পথ দেখাইয়াছে; গ্রীস সাধারণ-তন্ত্র, পরিপৃচ্ছা-শীলতা, ভাস্কর্য্য ও সাহিত্য কলা, স্বাধীনতা ও সর্ব্বোন্মুখিতা দিয়াছে; রোম প্রাচীন সভ্যতার সূত্র গুলি সন্নিহিত করিয়াছে, ও পশ্চিম ইউরোপকে এক করিয়াছে, বিধি-নিয়ম ও শাসন-তন্ত্র দিয়াছে; ফ্রান্স দিয়াছে নূতন সাহিত্য-রীতি, ও সাম্য-নীতি; ইংলাণ্ডের দান শাসন-তন্ত্র, জর্ম্মানীর-দান দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে কতকগুলি গভীর গবেষণা, এবং ভারতবর্ষ দিয়াছে কতকগুলি বিজ্ঞানের মূল সূত্র, ও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ-ভাবে দার্শনিক চিন্তা। মুসলমান ঈরান্ ও আরব নানা জাতির ভাব-সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছে। চীন ও তৎশিষ্য জাপানের প্রভাব এই সভ্যতার ধারায় কখনও আসে নাই; কিন্তু তাহা হইলেও চীনের এবং জাপানের চিন্তা ও শিল্প, জগতে এক উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা অতি গৌরবের বস্তু; এবং চীন ও জাপানের সুকুমার-শিল্প আধুনিক শিল্প ও কলায় কতকগুলি নূতন কথা

ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকারের পর হইতেই এই আধুনিক যুগের আরম্ভ। রাজা রামমোহন রায়কে ভারতে ইহার প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। মুসলমান-আক্রমণের কিছু পূর্ব্ব হইতে এবং মুসলমান-যুগের অবসান পর্য্যন্ত ভারতের পক্ষে মধ্যযুগ। তদ্রূপ এশিয়া-খণ্ডের সকল দেশেই এই মধ্য-যুগ ইউরোপীয় জাতির সহিত সংঘর্ষের কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। রুষ-দেশে মধ্য-যুগের অবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্তও বর্ত্তমান ছিল।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কজলী

ভূমিকা।

"কজলী" উৎসব মেঘের উৎসব। সমস্ত শ্রাবণ মাস ধরিয়া এই উৎসব চলিতে থাকে এবং ভাদ্রের কৃষ্ণাতৃতীয়াতে কজলী পুরা হয়। কজলীকে "কজরী"ও বলে। কোথাও কোথাও ভাদ্রের শুক্লতৃতীয়া পর্য্যন্ত এবং মীরজাপুরে ভাদ্র-শুক্ল-দ্বাদশী পর্য্যন্ত উৎসব চলে।

মেঘ যে কি প্রার্থিত বস্তু এবং কি সন্তাপহারী তাহা বাংলার মত সরস দেশে বুঝাই যায় না। পশ্চিমে চৈত্র হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত চারি মাস লোকে আগুনে দগ্ধ হইয়া যখন শ্রাবণের ঘনঘটা দেখে তখন গৃহে গৃহে উৎসব পড়িয়া যায়। নারীরা দলে দলে ধানীরঙের শাড়ী পরিয়া নীল মেঘরঙের ওড়না বা আকাশ-রঙের ওড়না গায় দিয়া নগরের উপকণ্ঠে সব উদ্যানে ও উপবনে গিয়া মিলিত হয়। সেখানে শাখায় শাখায় দোলনা দোলাইয়া যখন তরুণীরা গানের সঙ্গে দোলে, ও মেঘের ও নীল আকাশের গান গায় এবং নীচে হইতে অন্য তরুণীরা পৃথিবীর নবদুর্ব্বাদলের ও সবুজ ধানের গান গাহিয়া গান পুরা করিয়া দিতে থাকে তখনই মেঘের উৎসব জমিয়া ওঠে।

মেঘের এই উৎসব তো ভারতবর্ষে নূতন নহে। গত ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে ঋক্ ও অথর্ব হইতে কয়েকটি সুন্দর মেঘের গান দিয়া দেখান গিয়াছে যে মেঘের উৎসব এই দেশে বহু বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইহা এদেশের অস্থিমজ্জায় নিহিত।

ঋগ্বেদের ৫,৮৩ সূক্ত প্রভৃতিতে, যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ২,৪,৫ প্রভৃতিতে এই মেঘের উৎসব বর্ণিত। সেখানে মেঘের লীলা ও প্রকৃতির লীলাই চিত্রিত। ক্রমশঃ অথর্ববেদের ৪ কাণ্ড ১৫ সূক্তে দেখিতে পাই আকাশ ও প্রকৃতির লীলার সঙ্গে পশু প্রভৃতির আনন্দকেও যোগ করা হইয়াছে। মানবের সুখ-দুঃখকে গায়ক সেই গানের অঙ্গ করেন নাই। ব্রাহ্মণ-রচয়িতাগণ তো এই স্তবগুলিকে যজ্ঞেরই অঙ্গ করিয়া লইলেন।

তার পর দেখি রামায়ণে প্রস্রবণ-গিরির বর্ষা বর্ণন। সেখানে মহাকবি বাল্মীকি রামের দুঃখটুকু বর্ষার সুরে জুড়িয়া দিলেন। মানুষের হৃদয়টুকু বর্ষার ঘন ঘোর ধারার সঙ্গে আপন সুর মিলাইল; কিন্তু কবিরা তখনও নিজের হৃদয় বাহির করিলেন না। রামের কথার উপলক্ষ্যে বাল্মীকি আপন হৃদয় বুঝাইলেন। মৃচ্ছকটিকে এবং মেঘদূতেও বর্ষার গান আছে। সেখানে নায়কের হৃদয় দিয়াই কবি আপনার হৃদয় দেখাইয়াছেন। তার পরে বৈষ্ণব কবিতা—সে যে বর্ষার গানের অফুরন্ত উৎসব। সেখানেও রাধা ও কৃষ্ণের মধ্য দিয়াই মানবের হৃদয়ের বর্ষার সুর প্রকাশ পাইয়াছে।

একথা নিশ্চয় যে বেদের গানের পর যখন রামায়ণে, কাব্যে, নাটকে, বৈষ্ণবসঙ্গীতে কবিগণ তাঁহাদের অন্তরের এই বর্ষার ব্যথাটুকুকে ঘুরাইয়া প্রকাশ করিতেছিলেন তখন প্রাকৃতজন সোজাসুজি ভাবে মেঘের সঙ্গে গাহিয়া, নীলাঞ্জন-চয়-প্রেক্ষ পাদপের কোলে দোল খাইয়া সহজ ভাষায় তাহার সুখদুঃখ গাহিতেছিল। ইহাই কজরীর যথার্থ ইতিহাস। সে হিসাবে কজরী পুরাণ, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, শ্রুতি হইতেও প্রাচীন। ইহা মানবের হৃদয়ভাবের সহজ স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। কজরীতে বর্ষার সঙ্গে মানবের, কথায়, সুরে, সাজে, ছন্দে, সোজাসুজি আলাপ। কজরীতে আর ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা নাই। তাই যে সব কবির একটু ওজন-বোধ কম তাঁদের হাতে কজরী গান স্থূল ও অশ্লীল হইয়া গিয়াছে। এ গানের কোনো নায়ক বা দেবতার কৃত্রিম কোনো আবরণ নাই।—কিন্তু আশ্চর্য্য এই, ঋতুর এই আনন্দ পঞ্জাবে "লোড়ী" প্রভৃতি রূপে আছে, গুজরাটে "গরবা" প্রভৃতি রূপে আছে, হিন্দুস্থানী দেশে "কজরী"

রূপে আছে। ধানের বীজ বুনিয়া তাহার নূতন শীষ লইয়া উৎসব করাতেই বুঝা যায় যে এক সময় ইহা প্রাকৃত জনগণের মধ্যে নব ধান্য উদ্গমের সঙ্গে জড়িত ছিল। অথর্ব ৪র্থ কাণ্ড ১৫শ সূক্তে দেখা যায় যে মেঘ ওষধীকে "অভিক্রন্দন" করিয়া অন্তরের ব্যথা বলিতেছে—অঙ্কুরও তাহার উত্তর দিতেছে। এখনও কজরীতে দোলা হইতে "কারী কারী" (কালো কালো) বলিয়া মেঘের ভণিতা দেয় ও "হরী হরী" (হরিৎ হরিৎ) বলিয়া নীচের লোক হরিৎ শস্যাঙ্কুরের ভণিতা দেয়। এই দুই দলের গানে কজরী পূরা হইয়া ওঠে। যাহারা দোলায় থাকে তাহাদের গান, দোলা, নীলঘনবেশ, সুরও "কারী-কারী (কালো কালো) ভণিতাও "সাঁবলিয়া" (শ্যামল)—সমস্ত মেঘেরই উপযুক্ত। যাহারা মাটিতে দাঁড়াইয়া দোল দেয়—তাহাদের বেশ, ভূষা, সুর সবই নব অঙ্কুরের ন্যায় হরিদ্বর্ণ, তাহাদের ভণিতাও "হরী হরী" (হরিৎ হরিৎ)। বাংলা দেশ ছাড়া ভারতের সর্ব্বত্র এই উৎসব আছে। নাই কেবল এই সরস সজল বাংলায়।

আমাদের দেশেও সে ঘনঘটা হয়, কিন্তু তাহার কোনো উৎসব নাই। কাশী মির্জ্জাপুরের লোক ধনী নহে কিন্তু ঘনঘটার উৎসব না করিতে পারিলে ইহারা প্রাণে মরিয়া যায়—ইহাদের প্রাণ এমনি উৎসবময়। যখন আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, চারিদিকে বিদ্যুতের চমক, প্রকৃতির সবুজ বাহার, বায়ুর প্রবল বেগ—তারই সাথে সাথে দোলনার প্রবল দোলা—তরুণীর উচ্চ মল্লার প্রভৃতি সুর—ওড়নার উদায় নীল কেতু এবং ঢোলের বা পাখোয়াজের গম্ভীর বাজনা পুঞ্জ-নীল মেঘের মধ্যে চঞ্চল বিদ্যুতের ন্যায় দোলনার চঞ্চল পীত ডোর কজরীকে জীবন্ত করিয়া তোলে।

কাশী হইতে মীর্জাপুরে উৎসব আরও গভীর। অষ্টভুজার উপরের পর্ব্বত বর্ষাকালে অতি সুন্দর হয়। নীচে গঙ্গা, দূরদূরান্ত পর্য্যন্ত বিন্ধ্যমালা—মাঝে মাঝে ময়ূরে চিত্রিত অরণ্যাবৃত উপত্যকা—পর্ব্বতের উপর খালি বিস্তৃত অধিত্যকা—আকাশভরা মেঘের লীলায় মেঘের উৎসব-তীর্থই হয়। অষ্টভুজার একপাশে "বিরহী" নামে যে উপত্যকা

ইতিহাস।

পরলোকগত পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস, ভারতেন্দু কবি হরিশ্চন্দ্র, মাঢ়ার মহারাজা, বাবু বদরীনারায়ণ, পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ, ও মনোহরলাল প্রভৃতি লেখকগণ এই উৎসবের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। কেন যে মীর্জাপুর ইহার পীঠস্থান তাহাও খোঁজ করিয়াছেন। আমি ইতিহাসের দিকটা ইঁহাদের লেখাতেই দেখিয়াছি। এই উৎসবটি প্রকৃতিপুঞ্জের প্রাকৃত উৎসব। শাস্ত্রের উৎসব নহে। এই সব পণ্ডিতেরা কিন্তু ইহাকে ভবিষ্যপুরাণের "হরকালী" ব্রতের সঙ্গে এক করিয়া পুরাতন প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু প্রাকৃত উৎসবও কি খুব প্রাচীন হইতে পারে না?

ইহাঁদের মতে আচার্য্য দিবোদাসের সময়ও এই উৎসব ছিল। প্রাকৃত জনের মধ্যে যে "কজলীকথা" আছে তাহাতে বুঝা যায় যে রাজা পৃথ্বীরাজের সময়ও এই কজলী ছিল।

পৃথ্বীরাজের এক সেনাপতি ছিলেন তাঁর নাম ছিল পরমালিক। তিনি চংদেলা ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি বীর ছিলেন। কিন্তু অল্প বয়সে উদরীরোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর জন্য কাশীতে যাইতেছিলেন। পথে কালিঞ্জর নগরে তিনি রাজকন্যার সেবায় রোগমুক্ত হন ও রাজা মকরন্দের কন্যা সেবাকারিণী মল্হনা দেবীকে বিবাহ করেন। ব্রহ্মা ও চন্দ্রাবতী নামে পরমালিকের পুত্র ও কন্যা হয়—পরমালিকই পরে কালিঞ্জরের রাজা হন।

এদিকে পৃথ্বীরাজের জাসর নামে এক অতি বলবান সেনাপতি ছিলেন। একদিন রাজা বন্য মহিষের লড়াই দেখিতেছেন। বলিলেন, কে এই মহিষ দুটাকে ছাড়াইতে পারে। জাসর আসরে আসিবার আগেই দেউলা ও সহদেবা নামে দুই গোপজাতীয়া ব্রহ্মচারিণী পরম-সুন্দরী যুবতী মহিষ দুইটিকে ছাড়াইয়া দেন। রাজার আজ্ঞাক্রমে ক্ষত্রিয় জাসর ইহাঁদের বিবাহ করেন। দেউলার গর্ভে আল্হা ও উদল এবং সহদেবার গর্ভে মলখানা ও সুলখানা—জাসরের এই চারপুত্র হয়। জাসর নিজের ভ্রাতার হাতে কপট যুদ্ধে মারা যান। তখন জাসরের স্ত্রীপুত্র দেশ হইতে তাড়িত

হন। এই আল্‌হা পশ্চিমের বহু বীরকাহিনীর নায়ক; অনেকটা রীচার্ডের মত।

পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিল। এমন সময় কি কারণে আল্‌হা কালিঞ্জর হইতে বাহিরে গেলেন। বর্ষা আসিল— চন্দ্রাবতী "কজলী" খেলিতে চাহিলেন। রাজা বলিলেন, "চারিদিকে শত্রু, আল্‌হা নিকটে নাই, খেলিয়া কাজ নাই।" চন্দ্রাবতী বলিলেন, "তবে বাঁচিয়া লাভ কি?" কজলী আরম্ভ হইল। এমন সময় শত্রুসৈন্য আসিয়া পড়িল। চন্দ্রাবতী শত্রু-বেষ্টিত হইয়া অগ্নিকুণ্ডের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন, ধরিতে আসিলে ঝাঁপ দিবেন। আল্‌হা এমন সময় আসিয়া উদ্ধার করিলেন।

সে অবধি কালিঞ্জরে "কজলী" গাহিতেই হয়। না হইলে তাহাদের ভীরুতা ও পরাজয় সূচিত হয়। এই যুদ্ধে মলখানা প্রভৃতি বহু চংদেলা সেনাপতি নিহত হন। তাই চংদেলা-বংশে "কজরী" উৎসব হয় না।

মীর্জাপুরে এই কজরী আসিল কেন? এই মীর্জাপুরে বঘেল ও গহরবার ক্ষত্রিদের মধ্যে এই উৎসব বেশী। তাহার কারণ মুসলমান রাজত্বের সময় যুবতীদের এই খেলা সর্ব্বথা নিরাপদ ছিল না। কাশী তীর্থস্থান বলিয়া ও মীর্জাপুরের বিন্ধ্যগিরি সুরক্ষিত বলিয়া এখানেই কজলী রহিয়া গেল। আর সব স্থানে তেমন রহিল না।

আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া মহারাজ জয়চন্দ্রের রাজত্ব ছিল। কথায় আছে—

"কড়া কাংগড়া কালপী কাশ্মীর লো দেশ।
কাশিরাজ কনউজ ধনী শ্রী জয়চংদ নরেশ॥"

ইনি যখন মুসলমানের কাছে হত হইলেন তখন ইহাঁর অন্যতর পুত্র মাণিকচংদ মাণিকপুরে ও পরে কাশীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রসিদ্ধ কাশী-নরেশ রাজা "বন্দার" ইহাঁরই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কাশী হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ইনি শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া প্রাচীন উৎসবাদি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বৈরাম ইহাঁকে কৌশলে ধরিয়া জোর করিয়া রোহতাসগড়ে মুসলমান করিয়া ফেলেন, এবং সদরাজে কেরা মগড়োর ইত্যাদি পরগণা জায়গির দেন। সে-সব দেশে এখনও গহরবার কাশীরাজের অধীন। বংদারের ভাই গুদরদেব সিংহ মীর্জাপুরের নিকটস্থ কংতিথ ও খৈরাগড়ের রাজা রহিয়া গেলেন। ইহাঁর পুত্র উগ্রসেন গহরবার ক্ষত্রিয়ের শিরোমণি। তাঁহার বংশ মাঁড়া ও বিজয়পুর এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়।

যখন মুসলমানের রাজত্বে যুবতী কুমারীদের কজলী গাওয়া আর নিরাপদ রহিল না তখন এই ক্ষুদ্র সীমাটুকুর মধ্যে পুরুষানুক্রমে গহরবার ক্ষত্রিয়গণ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া এই "কজরী" উৎসবটি রক্ষা করিয়াছেন।

সুকুমার বস্তুর বিপদ এই যে কোমল ও সুন্দর বলিয়া সহজেই সে আঘাত পায়; তাহার প্রাণটুকু সামান্য আঘাতেই বড় ব্যথা পায়। তাই "কজরী"র মত সুকুমার অনুষ্ঠানগুলিকে আঘাত হইতে বাঁচাইয়া রক্ষা করা বড় সহজ নহে। এখনকার দিনে প্রবল শত্রুর অত্যাচার নাই বটে কিন্তু সমাজব্যাপী রুচির স্থূলতা অশ্লীলতা কদর্য্যকামনা এই মধুর উৎসবটিকে বিষ দিয়া মারিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার উপর এখনকার নকল শিক্ষার ফল সৌন্দর্য্যানুভূতির অভাব ও নীরসতা ইহাকে শুকাইয়া মারিবার চেষ্টায় আছে।

আচার।

শ্রাবণ শুক্লাতৃতীয়া মধুশ্রাবণী। তাহার পরে পঞ্চমী হইতে সপ্তমীর মধ্যে নারীরা গাহিয়া বাজাইয়া নদীতে যাইয়া স্নান করিয়া নদীর মাটি লইয়া আসেন। তাহা পাত্রে রাখিয়া সপ্তবিধ ব্রীহি দিয়া অঙ্কুর-উদ্‌গম পর্য্যন্ত ভিজা কাপড়ে ঢাকিয়া রাখেন। ভাদ্র কৃষ্ণতৃতীয়াতে পুনরায় গীতবাদ্যাদিসহ নদীস্নানে গিয়া ঐ শস্যের শীষ কতক নদীতে ভাসাইয়া দেন, কতক বন্ধু-বান্ধবদের কর্ণে পরাইয়া দেন। এবং "বহেরে রায়"এর প্রতিকৃতি করিয়া তার পূজা করেন। এই "বহেরে রায়" কোনোকালে মুসলমানদের আক্রমণ রোধ করিয়া কজরীর উৎসব যুবতীদের পক্ষে নিরাপদ রাখিয়াছিলেন।

কজরীর আচার প্রসঙ্গেই কজরীর বেশভূষাদির কিছু বলা দরকার। কয়েক দিন পূর্ব্বে এক চিত্র দেখিলাম যাহাতে কজরীগায়িকা তরুণীরা মাটিতে দাঁড়াইয়া আছে। মাটিতে যাহারা দাঁড়ায় তাহারা কজরীর "উত্তম সাধক"। কাজরীর আসলই হইল দোলায়। কবীরের সময়ও কজরীর

গীত হয়। তাঁহার হিন্দোলের সংখ্যা ১২টি (গ্রীয়ার্শন সাহেবের সময়ের হিসাব)। তাঁহার রচিত—"কোই প্রেমকে পেঙ্গ ঝূলাও রে" (কেহ প্রেমের দোলনা দোলাও) প্রভৃতি গান কজরীরই চিত্র। দোলায় যাহারা দুলিবে—তাহাদের বদ্ধ-কবরী থাকিবে না—হয় আলুলায়িত কুন্তল ("লট জৈসে জহরী"—লালা'র গান; "ঘুঘুরালে হৈ বার"—বর্মনের গান; 'জুল্‌ফে কারীনা" হাজারীলালের গান), নয় তো বড় জোর দোলায়িত বেণী। দোলা, মেঘের বর্ণ ঘন কালো গাছে হইবে। তাহার রজ্জু হইবে বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্ণ বা পীত বর্ণ। উৎসব-রতাদের নেপথ্য হইবে—ধানী (ধান্যের অঙ্কুরের ন্যায় হরিৎ) রঙের শাড়ী ও নীল মেঘের বা নীল আকাশের মত চাদর বা ওড়না ("পহিরী ধানী বাঁকো জানী ওঢ়ে চাদর অসমানী"—বটুকনাথের গান)। দোলায় উঠিয়া ঝড়ের মেঘের মত কালো কেশপাশ নীল ওড়না ও ধানী অঞ্চল উড়াইয়া ঝড়ের সুরে বা মল্লারে গাহিতে হইবে ("সব সখিয়া মিল ঝূলৈ হিংডোলা কর সোরহো সিংগার'—মানকী রাজগীরের গান)। নীচে হইতে সখীরা পাখোয়াজ বা ঢোল বাজাইয়া "হরী হরী" (হরিৎ হরিৎ) ভণিতা গাইয়া যোগ দেয় "ঝুল্‌না ঝূলৈ কুঁয়র কন্‌হৈয়া" এবং নীচে সখীগণ "তাল মৃদঙ্গ লে নাচে" (নবাতের গান)। দোলা হইতে গাহিতে হইবে—"কারী কারী" (কালো কালো) বা "সাঁবলিয়া" (শ্যামল) প্রভৃতি ভণিতায়। আমাদের দেশে এখনও ঝুঁলনযাত্রা উপলক্ষ্যে উৎসবাদি হয়। কিন্তু সে দোলায় দেবতাকেই দোলানো হয়। বোধ হয় প্রাকৃত যে বর্ষা-উৎসব ছিল তাহাতে দেবতাকেই বসাইয়া মানুষ একেবারে উৎসব হইতে ছুটি লইয়াছে, এখন সে পুণ্যার্থী হইয়া উৎসবের বদলে পুণ্যলাভাদির সুচতুর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে পণ্ডিতেরা কজরীর ব্রতকে হরকালী বা হরিতালিকা বলেন। বাংলা দেশেও হরিতালিকা ব্রত আছে। ভাদ্র-শুক্ল-তৃতীয়াতেই তাহা করিতে হয়। বাংলাদেশে এই ব্রতে তিনটি ঝুড়িতে মিষ্টান্ন বস্ত্র ও সপ্তধান্য রাখিয়া ভবানী-শঙ্করের পূজা করিতে হয়। উপবাসই বিধি। বাদ্যাদিসহ দেবতার গৃহে "নানা মঙ্গলগীতঞ্চ কর্ত্তব্যং মম সদ্মনি" ব্যবস্থা আছে। [illegible] গীতের [illegible] হয়। ফললাভ হয় সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল। এই ব্রতের বিধির অঙ্গ চন্দ্র-দর্শন-নিষেধ এবং গালাগালি। নষ্টচন্দ্রের এদেশে এইরূপই আচার। নৃত্যগীত ঐ গালাগালি পর্য্যন্তই।

ব্রতকথা।

ব্রতকথা সংস্কৃতে। কথা আছে মহাদেবের স্ত্রী শ্যামবর্ণা ছিলেন। "বর্ণেনাপি চ সা কৃষ্ণা নবনীলোৎপল-প্রভা" তিনি বর্ণে শ্যামবর্ণা নবনীলপদ্মের কান্তিবিশিষ্টা। তাঁহার বর্ণ "ভিন্ন-কৃষ্ণাঞ্জন-প্রভা" সদ্য-ভাঙা রসাঞ্জনের রঙের মতন। মহাদেব তাঁহার এই শ্যামলকান্তি বড় ভালবাসিতেন। বলিতেন—"অতিসৌন্দর্য্যং তব রূপ মম প্রিয়ম্"—তোমার এই অতি-সৌন্দর্য্য শ্যামলরূপ আমার বড় প্রিয়। কিন্তু মহাদেব তাঁহাকে "শ্যামল" বলিয়া সকলের সম্মুখে উল্লেখ করিলে তিনি লজ্জায় ক্রোধে ("ব্রীড়িতা ক্রোধমানসা") তাঁহার শ্যামশোভা প্রকৃতির মধ্যে দান করিয়া দেহত্যাগ করিলেন, হিমালয়ে গিয়া তিনি তুষারধবলা গৌরী হইলেন। সেই শ্যামলসুন্দরী যিনি প্রকৃতির মধ্যে লুকাইলেন—তাঁহাকেই নীলমেঘের মধ্যে হরিৎ অঙ্কুরের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া গাহিতে হইবে। কারণ মহাদেবের প্রিয়া শ্যামলাদেবী "মুমোচ হরিতচ্ছায়াং কান্তিং হরিত শাদ্বলে" (তিনি হরিৎবর্ণ তৃণক্ষেত্রে হরিৎ-ছায়া কান্তি ত্যাগ করিলেন)। তাই তিনি এখন প্রকৃতির মধ্যে "আর্দ্রধান্যে স্থিতা" ভিজা ধানের গাছের রঙে অবস্থিত। এবং এই উৎসবের অঙ্গস্বরূপ ধান্য-বীজ রোপণ করিয়া "ধান্যৈস্তু বৈ রূঢ়ৈঃ কৃত্বা হরিত শাদ্বলীম্" ধান্যের হরিত শাদ্বলবর্ণে সেই মনোহারিণীকে অন্বেষণ করিতে হয়। এবং এখনও কজলী গানে "শাঁবলিয়া" "কজলী" "হরী হরী" (হরিৎ হরিৎ) পদ—পংক্তির সঙ্গে-সঙ্গে গাহিতে হয়।

কজরীর গানগুলি মেঘের আনন্দে ভরপুর। কজলীর ভাষা সরল, সংস্কৃত ও পারসী শব্দ বর্জ্জিত, ছন্দ মধুর ও গতি লঘু হওয়া চাই। সুরে মেঘের ঘন ভাব চাই। পুরাতন কজরী খুবই চমৎকার। নূতন কজরীও আলোচনার অযোগ্য নহে। আমার বন্ধু কাশীর মহারাজার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন রায় অনেক বর্ত্তমান কবির গান সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন।

আমি আরও কিছু সংগ্রহ করিয়াছি। ফলে প্রায় ৬২ জন এখনকার কালের কবির গান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। এবং ইঁহাদের সকলেরই গান কাশী, মির্জ্জাপুর, বিহার প্রভৃতি স্থানের ছোট বড় ছাপাখানায় ছাপা, তাহার কতক বা টাইপে ছাপা ও কতক বা লিথো। তাহা হইতেই আমার এই কবিপরিচয় লেখা। এই কবিদের লেখার মধ্যে মেঘের বর্ণনা, প্রেম, বিরহ, প্রিয়তমের জন্য ব্যাকুলতা, তরুণ ও তরুণীর রূপ ও প্রীতি বর্ণনা প্রভৃতি আছে। আদিরসেরই কিছু বেশী ছড়াছড়ি। বর্ষার বর্ণনা—রাত্রির বর্ণনা—অন্ধকার বর্ণনা—ব্রজলীলা ইত্যাদিও কজরীর সাধারণ বিষয়। আদত কজরী সবই পুরাতন। এই প্রবন্ধে আমি একটিও পুরাতন লেখকের পরিচয় বা গান লিখি নাই। তাহা যদি আর কেহ করেন তবে বড় ভাল হয়। পুরাতন কজরী একেবারে রসভরপুর। আজ বর্ত্তমান কজরীরই পরিচয় দিব। এখন কবিদের সঙ্গীতের উৎসবে নামিয়া পড়া যাক।

গান ও কবি।

প্রথমেই মানকী রাজগীরের নাম করি। ইঁহার রচিত অনেকগুলি গান পাইয়াছি। অধিকাংশই খুব আদিরসে ভরপুর। কাশী-অঞ্চলে বেশ আদরের সহিত ইঁহার গান হয়। দুই এক পংক্তি দিতেছি।

(১) চঢ়ে ঘটা ঘন ঘোর গরজ রহে বদরা রে হরী॥
রিম্ ঝিম্ রিম ঝিম্ পানী বরসৈ রহী রহী
জিয়া ঘবরাবৈ রামা।
বঁহে নৈন সে নীর মইল ভয়ে কজরা রে হরী॥

(ঘন ঘোর ঘটা আকাশে উঠিয়াছে—বাদল গর্জ্জিতেছে। রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ বৃষ্টি ঝরিতেছে—থাকিয়া থাকিয়া প্রাণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। নয়ন বাহিয়া আজ অশ্রু বহিতেছে—কাজল আজ মলিন হইয়া গেল।)

(২) কইসে খেলৌ সখী কজরিয়া ঘেরী আবৈ
বদরিয়া না।
নীস ভাদোকী রৈন অঁধেরী ডরলাগৈ
সৈজরিয়া না॥

(কেমন করিয়া সখী আজ কজরী খেলিব? বাদল যে ঘিরিয়া আসিতেছে। ভাদ্রের নিশি ঘোর আঁধার, শয্যাতেও [illegible])

(৩) আইল্ সাবনকী বহার, ঝিংগুরা বোল রহে ঝনকার॥
মোর চকোর পপীহা বোলৈঁ,
চংপা চমেলী কবঁল মুহ খোলৈ,
সখীআ মীল ঝোলৈ হিংডোলা,
কর সোরহো সিংগার॥
বুলবুল বুব্ই কোইল ঠনকৈ
জুহী বেলা কেবড়া গমকৈ
হুলসকে নারী কজরী খেলৈ
গাবৈ রাগ মলার॥

(শ্রাবণের বাহার আসিল—ঝিঁঝি ঝিন্ ঝিন্ গান করিয়া চলিয়াছে। ময়ূর চকোর পাপিয়া ডাকিতেছে। চম্পা চামেলী কমল মুখ খুলিতেছে। সব সখী আসিয়া ষোলো সাজে সজ্জিত হইয়া দোলায় ঝুলিতেছে। বুলবুল বাবুই কোকিল ধ্বনি করিতেছে। জুই বেলা কেতকীর গন্ধ ছুটিয়াছে। উল্লাসে নারী কজরী খেলিতেছে আর মলার রাগ গাহিতেছে।)

(৪) উঠে গগনসেঁ মেঘবা ধায়ে চারী ওর।
ঘেরী ঘন ছাএ ঝম ঝুমকে বরসৈ
বদরবা ঘটা উঠীচহু ওর॥
কড়ক কড়ক কে বদরা কড়কৈ
সুন সুন কে জীঅরা মোর ধড়কৈ
চিলক চিলক কে চমকৈ বিজুলিয়া—
ভঙ্গ গগনমে সোর॥

(আকাশে মেঘ উঠিয়া চারিদিকে ছুটিয়াছে। আকাশ ঘেরিয়া ঘনঘটা ছাইল, বাদল রিমঝিম বরষিতেছে, চারিদিকে ঘনঘটা উঠিয়াছে। কড় কড় করিয়া মেঘ কড়কাইতেছে, শুনিয়া শুনিয়া আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিতেছে। ঝিকমিক করিয়া বিজলি চমকাইতেছে, আকাশে গর্জ্জন চলিয়াছে।)

কজরী-রচয়িতাদের আবার নানা সম্প্রদায় আছে। ইঁহারই সম্প্রদায়ে বাংগালী নামে একজন রচয়িতা আছেন। তিনিও নিরক্ষর—কিন্তু তাঁর সুর ও ছন্দে চমৎকার হাত আছে—তাঁর দুই একটি পংক্তি দিতেছি—

বদরিয়া ছায় রহী চহুঁ ওর
বিমঝিম রিমঝিম মেহা বরসৈ দামিন চমকৈ জোর
সুংদর শীতল গাঢ সুগন্ধি পবন চলৈ ঝকঝোর।
কোকিল কূক পপীহরা পীপী বোলত দাদুর মোর॥

(বাদল চারিদিকে ছাইতেছে। রিমঝিম রিমঝিম করিয়া মেঘ বরষিতেছে—বিদ্যুৎ তীব্র চমকাইতেছে। সুন্দর শীতল

গাঢ় সুগন্ধিত বায়ু সশব্দে চলিয়াছে। কোকিল ডাকিতেছে, পাপিয়া রব করিতেছে। দাদুর ও ময়ূর কলরব করিতেছে)।

এই সম্প্রদায়ে রফাতী ও জীতনের নাম সুবিখ্যাত—কিন্তু ইঁহাদের গানে এমন কিছু নাই যে প্রকাশ করা যায়। এই সম্প্রদায়ে হিঙ্গুর গান খুব লোকপ্রিয়। তাঁর

"ঘুংঘট পটে খোলো অরে সাঁবলিয়া"
(হে শ্যামল, আজ তোমার অবগুণ্ঠন খোল)

এই গানটি গাহিতে গাহিতে বহু তরুণীকে হিন্দোলায় দুলিতে দেখিয়াছি।

এখন যাঁর নাম করিতেছি—ইনি বোধ হয় কাশীতে এখন সবচেয়ে নামজাদা কজলী-রচয়িতা। ইঁহার বহু শিষ্য আছে, মন্ত্রশিষ্য নহে—রচনা-শিষ্য। ইঁহার নাম "ভৈরো"। ইনি সামান্য কলকব্জা মেরামত করেন, এমন কি ইঁহাকে সকলে "ঘড়ীসাজ" (ঘড়ী মেরামত করনে-ওয়ালা) বলে। প্রেমের বহু গান রচনা করিলেও ইঁহার অনেক গানে বৈরাগ্যের সুর আছে। ইঁহার—

"মুসাফির করো ফিকির চল্‌নেকী
আখির হুআ সুব্ সে শাম"

(হে যাত্রী, যাত্রার আয়োজন কর, প্রভাত হইতে এখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল) প্রভৃতি গান বহু ব্যথিতের মুখে শুনা যায়। ইঁহার অনেক গানে ইনি আত্মাকে দেহপিঞ্জরের পাখী বলিয়া গাহিয়াছেন। অবশ্য আদিরসেরও অভাব ইঁহার গানে নাই। ইনি অশিক্ষিত কবি।

ইঁহার শিষ্য রামকিশুনের দিবার মত কিছু নাই।

তার পরই উল্লেখযোগ্য কবি বটুকনাথ। ইঁহার রচিত গানে বহু সুন্দর ছন্দ পাওয়া যায়।

"কহৈঁ বটুকনাথ কংগন সোহৈ দুনো হাত
সাথ জাতী ভরতারকে অরে সাবঁলিয়া"

(বটুকনাথ বলেন, হে শ্যামল, আজ সতী স্বামীর সঙ্গে যাত্রা করিয়াছেন, দুই হাতে তাঁহার কঙ্কণ শোভা পাইতেছে)।

এই ছন্দটি খুব প্রচলিত।

মার্কণ্ড কবির গান বিস্তর, কিন্তু সবই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ও বিশেষত্ববর্জ্জিত।

এখন ভৈরোর সম্প্রদায় ছাড়িয়া একজন কবির নাম করিব—যিনি শিক্ষিত। ইঁহার নাম গুরুমুখ সিংহ। ইঁহার বাড়ী বালিয়া জেলায়। ইনি পণ্ডিত, তাই ইনি বাদলের গান রচনা অপেক্ষা বিধবা-বিবাহের নিন্দা ও আর্য্যসমাজ ও দয়ানন্দস্বামীর নিন্দা বেশী উৎসাহের সহিত করিয়াছেন। কোনো অশিক্ষিত কবি এসব বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই, তাঁহারা বাদলের গান লইয়াই মত্ত আছেন। ইঁহার রচনায় বেশ মুন্সীয়ানা আছে। বারমাস্যার রচনায় ইঁহার খুব নাম আছে।

ভাদোঁ এ সখী রৈন ভয়ারন দূজে অংধরিয়া রাত রে।
আজকী রৈন ভয়ারন লাগত প্রাণ হমারো জাতরে॥

(হে সখী, এই ভাদ্রমাসে রাত্রি বড় ভীষণ—আরও কি আঁধার রাত্রি! আজ রাত কি বিষম ভয়ঙ্কর! প্রাণ আমার যে যায়)।

বিধবা-বিবাহের ইনি বিরুদ্ধ বলিয়া আদিরসে ইঁহার উৎসাহ কম নহে। এমন কি সেগুলি উদ্ধৃত করা অসম্ভব।

আর একটি সম্প্রদায়ের গুরু "বেণী"। ইনি অশিক্ষিত। ইনি সমস্ত মিথ্যা আচারের বিরুদ্ধ। যে ধর্ম্ম বা শাস্ত্র বা সম্প্রদায় মানুষের হউক না—সত্য ছাড়া, ইঁহার মতে, তাহার নিস্তার নাই। ইনি ধর্ম্মসম্প্রদায়-ভেদ প্রভৃতি মানেনই না। ইঁহার মতে—

"জঁহা কপট হৈ তহাঁ খড়ী চৌরাসীরে॥
বোজু করো পাঁচো বেলা যা গংগামেঁ অস্নান করো।
চাহে কল্‌মা পঢ়া করো যাজী চাহে তুম ধ্যান করো।
পংচ অগিন যা তাপো যা অপনে কো কুরবান করো।
জিকর করো তস্‌বী লেকর যা জপকে মালা মান করো।
জব দিলা হোবৈ সাফ মিলৈ অবিনাসীরে সাবঁলিয়া॥"

(যেখানে কপট সেখানেই চৌরাশী নরক বিদ্যমান। চাই পাঁচবেলা নেমাজের জন্য ওজুই কর বা গঙ্গাতেই স্নান কর; চাই কল্‌মাই পড় বা ধ্যানই কর; চাই পঞ্চ অগ্নির মধ্যে বসিয়া নিজেকে তাপিত কর বা নিজেকে বলিই দেও; চাই তসবী লইয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা কর বা জপমালাই ঘুরাও; যখন হৃদয় সাফ হইবে তখনই অবিনাশী মিলিবেন।)

ইঁহার মতে—

"ইমান্ জিস্‌কা সাচ্চা উস্‌কো নুর্ নজরমে আবেগা।"

(সত্য যাহার ধর্ম্ম সে জ্যোতিকে দর্শন করিবে।)

ইঁহার রচিত বাদলা গানও খুব সুন্দর।

বেণীর অপেক্ষা তাঁহার শিষ্য "ধীসুব" বেশী নাম। ইনিও একেবারে নিরক্ষর। ইঁহার কজরীরও খুব আদর। ইঁহার প্রেমের গানও খুব গভীর।

"প্রেমকো পংথ অথাহ থাহ নহি"

(প্রেমের পথ অতি গভীর—কে সেখানে তল পায় ?)

গানখানি খুব লোকপ্রচলিত। এই প্রেমপথে যে চলে

"ধীসু কহৈঁ সবরশ লুট জাবৈ"

(ধীসু বলেন, সর্ব্বস্ব লুট হইয়া যায়।)

মদ গাঁজা প্রভৃতি নেশার বিরুদ্ধে ইনি সমস্ত জীবন লড়িয়াছেন। ইহাঁর নবনারী নামে নয়টি নারীর খেদ নেশার দুর্গতি জ্ঞাপন করিতেছে। সমাজের দুর্নীতি দূর করিতেও ইনি রচনা কম করেন নাই। সে দেশে কুলের খাতিরে বধূ বড় ও বর ছোট অনেক সময় হয়। ইঁহার

"ক্যা কহুঁ হাল মোরা ছোটা মিলল রে বালম"

(কি কহিব আমার কপাল, স্বামী মিলিয়াছে ছোট) গানটি খুব তীব্র।

রঘুনাথ নামে দুইজন রচয়িতা আছেন। একজন সামান্য দোকানদার, ইনি টুপী হিন্দুস্থানী জামা বস্ত্র প্রভৃতি কাশীর চৌক বাজারে বিক্রয় করেন। দামোদর নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ইনি অনেক গান রচনা করিয়াছেন। ইহাঁর রচিত—"দর্দনাক আয়া হৈ সমাচার দামোদর নদ কা বাঁধ টুট গয়া" ইত্যাদি গান সাধারণের মধ্যে সংবাদপত্রের কাজ করে। কজরী-রচয়িতারা কেহ কেহ চল্‌তি খবরও দেন। তবে এই কবির অন্যান্য গানে বেশ ভাবের গভীরতা আছে। ইহাঁর রচনায়ও দিব্য পটুত্ব আছে। ইঁহার রচিত

মুঝমেঁ হৈ দমমেঁ দম জবতক
তুমসে জুদা ন হোঁগে হম।
মরণে সে ডরতে নহী হরদম
জব ধর দিয়া কদম॥

(আমাতে যতক্ষণ নিঃশ্বাসে নিশ্বাস আছে (প্রাণ আছে) ততক্ষণ তোমা হইতে আমি বিচ্ছিন্ন নহি। পা যখন প্রেমের পথে রাখিলাম তখন প্রতি-নিশ্বাসে আর আমি মৃত্যুকে ডরাই না।)

এই গানটি খুব চল্‌তি। ইঁহার লেখার মধ্যে মহাত্মা কবীরের প্রভাব দেখা যায়। "বিশ্বতাঁত" এবং "নির্গুণ জোলহা" প্রভৃতি গানে ইনি বুঝাইতেছেন যে ভগবান নকাশী বসনের ন্যায় এই সৃষ্টি বুনিয়া চলিয়াছেন—কি জানি কার জন্য এই বস্ত্র। বস্ত্র আর মনঃপূতই হইল না! তাই নিত্যই পুরাতন নাশ করিয়া নিত্যই আবার নূতন সৃষ্টি হইতেছে, কিছুতেই "জোলহার" মনঃপূত হইতেছে না।

"মন, জোলহা তব লগা বীননে বূটী যার বলম্"

(মন, প্রেমময় বল্লভ "জোলহা" হইয়া তখন হইতে নকাশী বুনিতেছেন।)

যদি বল্লভের সহিত মিলিতে চাও তবে তুমিও তোমার-মত কিছু জীবনে নকাশী বুনিতে থাক—

"জো জোগ করম কো জানে
ঔ ঐসী তানী তানে"

(যে যোগকর্ম্ম জানে এবং এমন তাঁত বুনিতে পারে)

"সো আঠ পহর লৌলাবৈ
ঔর পূরা থান পুজাবৈ॥"

(সে অষ্টপ্রহর প্রেমের আগুনে জ্বলে এবং পরিপূর্ণ স্থানে পৌঁছায়।)

ইনি ধর্ম্ম-উপদেশ শাস্ত্র হইতে পান নাই, কোনো একটি সাধকের কাছে উপদেশ পান।

"প্রথম গয়া সৎসঙ্গত মেঁ তব সৎগুরুসে হিকমত পায়া"

(প্রথমে যখন সৎসঙ্গতে গেলাম তখন সৎগুরুর কাছে রহস্য জানিলাম।)

ধীসুর ন্যায় ইনিও সঙ্গীত রচনায় বেণীর শিষ্য। রস-সৃষ্টিতে ইনি বেণীর নাম বার বার করিয়াছেন।

"বে গুরুবালে মরম ন জানে
জানেঁগে কোই গুরুকে লাল।
কহা করৈ রঘুনাথ হমেশা
গুরু বেণী জো রহে দয়াল॥"

(গুরুবিহীন এই রসের মর্ম্ম জানে না—গুরুর পেয়ারের যদি কেহ থাকে তবে হয়তো সেই জানিতে পারে। রঘুনাথ সর্ব্বদাই বলেন—গুরু বেণী যদি আমার উপর দয়া রাখেন!)

যন্ত্রী নামে ইঁহাদেরই সম্প্রদায়ের একজন রচয়িতা আছেন ; উল্লেখযোগ্য গান তাঁর নাই।

ইহার পরই জলেশ্বর। ইনি পান-বিক্রেতা। কাশীর ফরিদপুর নামক স্থানে থাকেন। ইহার রচনায় কেবল ব্যক্তিগত কুৎসা। কাশীর নগরের যত বিষ সব ইঁহার রচনায় মেলে। ইনি বিষের প্রতিকারের জন্য লেখেন নাই, ঐসব ঘৃণিত প্রসঙ্গই ইঁহার রচনার সর্ব্বস্ব। এই জাতীয় লোকের ইনি খুব প্রিয়।

জলেসর আর-একজন কবিকে উৎসাহ দিয়া আসরে নামাইয়াছেন। ইনি হবীবনের শিষ্য শিবমূরত। লোকটি পণ্ডিত। ফারসীর প্রভাবই ইঁহার রচনায় অত্যন্ত বেশী লক্ষিত হয়। জলেসরের লোক হইলেও ইঁহার রচনা সেরূপ দূষিত নহে। তবে খুব মুন্সী বলিয়া ইঁহার লেখায় কজরীর সে হাল্কা চাল নাই। নিজ গুরুর পরিচয় দিয়াছেন—

"কহতে শিবমূরত পরসাদে
হবীবন থে মেরে ওস্তাদ"

শিবমূরত প্রসাদ বলেন হবীবন আমার গুরু ছিলেন।

ইনি জাতিতে লালা। নিজ রচনায় প্রায় "মুন্সী" ভণিতা দিয়াছেন। বোধ হয় ইঁহার ন্যায় এত রচনা কোনো "কজরী কবির" ছাপা হয় নাই। প্রতি দোকানেই ইঁহার রচনা ছাপা মেলে। ইনি "মুন্সী" বলিয়া বিদ্বৎসমাজে ইঁহার লেখা খুব আদর পায়। ইনি কৃষ্ণলীলাই অনেক লিখিয়াছেন। রামায়ণের গানে—

"সখিয়াঁ কহতী হম খুব দেখে এক সাঁবর
এক গোরে রে"

(সখীরা বলেন খুব দেখিলাম—একটি শ্যামল অপরটি গৌর) গান খুব প্রচলিত।

দেহতত্ত্ব ও প্রাণ-পাখীর গানও ইঁহার মামুলী-রকমের আছে। ইঁহার বারমাস্যাগুলি মন্দ নহে। ইঁহার—

"ভাদৌ রৈন ভয়াবন লাগে উঠে কলেজা পীর।"

(ভাদ্রের রাত্রি ভয়ঙ্কর বোধ হয়, হৃদয় ব্যথা করিয়া ওঠে)—প্রভৃতি ঋতুসঙ্গীত খুব লোকপ্রিয়।

ইনি মাঝে মাঝে [illegible]লা গান করিতে করিতে আত্মার

"বিছুড় শ্যাম মিলন কে নাহীঁ
অপনে পী কারণ বনবাসীয়ে,
ঢুঢ়ত পিয়া মিলা ঘটহী মেঁ
ভঈ জিউ মেঁ বেহদবাসী।"

(প্রিয়তমের জন্য বনবাসী হইলাম, কিন্তু হারানো শ্যাম তো আর মিলিবার নহে—খুঁজিতে খুঁজিতে এই জীবনের মধ্যেই তাঁহাকে পাইলাম, এই জীবনের অনন্তের মধ্যে ডুবিলাম)।

যখন ইনি সহজ প্রাকৃতে লেখেন তখন বেশ হয়। কিন্তু যখন "পাণ্ডিত্য" পাইয়া বসে তখনই বিষম ব্যাপার। ইঁহার

"সোখ্‌ত দরুণম্ আতশ ফুরকত
তাকত নস্ত সবুবী রামা।
মুন্সী গোয়দ বর্ম্মা তু জোয়দ
ক্যা তরহ্ হুম ফরমা রামা॥"

ইত্যাদি পাণ্ডিত্যের উৎকট রচনা। দুঃখের বিষয় পণ্ডিতমহলে এইসব নীরস কোলাহলেরই আদর বেশী।

রসিকবিহারী কৃষ্ণভক্ত কবি। লোকটি আদত কজরী-রচয়িতা। ইঁহার রচনায় শ্রাবণ, মেঘ ও অন্ধকারের বেশ জমাট সুর পাওয়া যায়।

"বদরা ঘেরি ঘেরি কে আৱৈ
রৈন অংধেরী কারী না।
দামিনি দমক দমক রহী
চপলা চমকত ন্যারী না॥

(বাদল ঘিরিয়া ঘিরিয়া আসিতেছে। রাত্রিকাল অন্ধকার, দামিনী কেবল কেবল চমকাইতেছে। দূরে দূরে চপলার প্রকাশ।)

এইসব গানের খুব আদর আছে। ইঁহার—

"মেঘৱা ঘুম ঘুম বরসাৱৈ ছাৱৈ বদরিয়া সাৱন মেঁ"

(শ্রাবণে বাদল ছাইতেছে। মেঘ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বর্ষিতেছে)—প্রভৃতি গান, খুব বৃষ্টির দিনে তরুণীরা মহা উৎসাহে হিন্দোলায় ঝুলিয়া গান করেন।

"নির্ম্মল" কবির গানও মাঝে মাঝে শুনা যায়। ইঁহার

"লহর ঝকোরে পুরৱা হৱা আঁধী হৈ বড়ী জোর রে।
আগে পগ্গ সুঝ না পড়ত পানী [illegible]র রে॥"

(তরঙ্গ ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে, পুরবা হাওয়া বহি-

য়াছে, অন্ধকার ঝড় বড় বেগে চলিয়াছে, সম্মুখে পথ দেখা যায় না—প্রবল শব্দে কেবল ধারা ঝরিতেছে) প্রভৃতি গান খুব লোকপ্রিয়।

কবি মনুরাম জাতিতে শুঁড়ী (কলুয়ার)। গাজীপুরের অন্তর্গত সৈদপুর নিবাসী। ইনি অশিক্ষিত কবি। তবে "পণ্ডিত"দের রচনায় যে শুচিতা মেলে না, এই শিক্ষাহীন "নিম্নশ্রেণীর" কবির মধ্যে তাহা আছে। ইঁহার দেওয়া সুর অতি চমৎকার—দুঃখের বিষয় তাহা তো লিখিয়া বুঝান যায় না। ইনি কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধেই বেশী লিখিয়াছেন—বর্ষার গানও চমৎকার। ইঁহার

"আয়া সাবন কা বাহার, পাণী বরসৈ বারবার"

(শ্রাবণের বাহার আসিল, বার বার বৃষ্টি ঝরিতেছে) প্রভৃতি গান সুরে ও কথায় জমাট।

কবি মুনীশ্বর ও অযোধ্যা নিতান্ত মামুলী রকমের রচয়িতা। অযোধ্যার গুরু "গজাধর"ও (গদাধর) খুব ওস্তাদ ছিলেন। তবে তাঁর সুরের বাহারই বেশী।

কবি "মগরু" অশিক্ষিত, কিন্তু তাঁর গানে বেশ গভীরতা আছে। একটি গান দিলাম।

"দিয়না বারোনা ভয়া অংজোর মোরী ননদী।
পৈঠল বা মহলিয়া মেঁ প্যার মোরী ননদী॥
সো রহী বেখবর নীদঁ মেঁ তনিক সুরুখ চুনরিয়া রে।
ন মালুম কেহি ভাঁতিসে আয়া খোলকে মেরী
কেবড়িয়া রে।
পরোসিন সব সুন সুন আবৈ হমারে দরবাজা।
দস দরবাজেকা বনা হৈ মংদির তঁহা য়ার বিরাজা॥"

(প্রদীপ আনিস না, ও ননদী, জোছনা হইয়া গিয়াছে। আমার এই মন্দিরে প্রিয়তম প্রবেশ করিয়াছেন, ও ননদী। বেখবর (অচৈতন্য) শুইয়াছিলাম—একটু যেন রঞ্জিত উত্তরীয় দেখিলাম। না জানি কোন্ উপায়ে এই রুদ্ধ মন্দিরের দ্বার খুলিলেন। প্রতিবেশিনীরা শুনিয়া শুনিয়া আমার দরজায় আসিলেন—কিন্তু প্রিয়তম যে দশদ্বারের এই হৃদয়-মন্দিরে গিয়া বিরাজ করিলেন।)

হকীম সূর্য্যপ্রসাদ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী পণ্ডিত লোক। কাশী হীরাপুরায় তাঁর বাড়ী। তিনি আর্য্য-সমাজের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন—

"জরা গৌর করো প্যারে হিন্দু
তুমতো আর্য্য কহাতে হো।
* *
নহি হিংদূ নহিঁ জমন
কহো ফির ক্যা কহলাতে হো॥"

(হে প্রিয় হিন্দু, একটু চিন্তা কর, তুমি তো আর্য্য বলিয়া পরিচিত ; হিন্দুও নও যবনও নও, বল তবে তুমি কি বলিয়া পরিচয় দিবে ?)

কিন্তু তাই বলিয়া ইনি যে শুচিতার পক্ষপাতী তাহা নহে। ইঁহার লেখা ভয়ঙ্কর অশ্লীল। ইঁহার রচিত—

"জনিয়া ছমক ছমক পগ ধরকে
নাজ নখরা দিখ্লাতী হৈ।"

প্রভৃতি গান উদ্ধৃত করা বা অনুবাদ করা অসম্ভব।

"ধন্না" একজন ওস্তাদ। ইঁহার দেওয়া বহু ছন্দ ও বহু সুর আছে। ইঁহার শিষ্যও বিস্তর। শিষ্যরা বলেন—

"ধন্য ধন্না নে জো ছন্দ লাখোঁহীকো গঢ় ডালে।"

(ধন্য ধন্না যিনি লাখো ছন্দ গড়িয়াছেন।)

শিবনাথ ধন্নার শিষ্য। ইনি রচনায় অত্যন্ত শুদ্ধ রুচির। "নির্গুণ" "সত্যধর্ম্ম" "অহিংসা" প্রভৃতি বিষয়ে ইঁহার রচনা। তবে রচনা নিতান্ত মামুলী—বিশেষত্ব নাই। মহেশ, হরিদাস, সিউদাস, সুধাকর, মোতি, হনুমান, নারায়ন, ছন্নু, বিহারী, কিসনচাঁদ প্রভৃতি কবিও ঐরূপ মামুলী। ইঁহাদের গান কাশীতে বেশ চলে, কিন্তু বাহিরে পরিচয় দিবার মত কিছু নহে। তবে বর্ষার রস সকলেই কিছু কিছু দিয়াছেন।

দেবীদাস নামে একটি কবি আছেন—ইনি কজরীর ছন্দে না লিখিলেই ভাল হইত। ইঁহার মধ্যে বর্ষার বা মেঘের কোনো রস নাই—ইনি বর্ষার গানের দুই একটি ব্যর্থপ্রয়াস করিয়াই বর্ষার কজরীর সুরে বসন্তের গান গাহিয়াছেন। ইঁহার "চৈতি ভাওরি"—বর্ষার সুরে চৈত্রের গান। অদ্ভুত! অসঙ্গতি ধরিবার মত কান ইঁহার নাই।

কবি মনোহরলাল—মির্জাপুরবাসী। ইনি "দিলদার" নামের ভনিতা দিয়া গান রচনা করেন। কজরীর একটি ইতিহাস ইনি বেশ লিখিয়াছেন। কিন্তু কজরী লেখায় পটুত্ব দেখাইতে পারেন নাই। লোকটি পণ্ডিত—কিন্তু কবি নন।

কবি সংতরামের রচনা খুব লোকপ্রিয়। লোকটি যথার্থ কজরীর রসিক। ইঁহার—

"শ্যাম ঘটা বহুদিসি চঢ়িআই নাচন লাগে মোর।
বকুলা উড়ত সুহাবন লাগে কড়কড় কড়কত ঘোর॥"

(শ্যাম ঘটা চারিদিকে উঠিল—ময়ূর নাচিতে লাগিল। বলাকার দল কি সুন্দর দেখাইতেছে। কড় কড় বজ্র কড়কাইতেছে।) প্রভৃতি গান অত্যন্ত লোকপ্রিয়। লোকটি শিক্ষিত নহেন, তবে বড় ভক্ত। লেখার মধ্যে গভীর কৃষ্ণানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। লোকটি শুচি-রকমের হইলেও বেশ রসিক—গলি দিয়া চুড়ীওয়ালা যায়, মধ্যাহ্নে তাহার ডাক শুনিয়া ইঁহার মন উদাস হইয়া যায়—

"চুরিয়াঁ বেচৈবে মনহারী গলিয়া বীচ পুকার পুকার।"

কবি হাজারীলালের বাড়ী ভাংডী, প্রতাপগড় জেলায়। ওস্তাদ বলিয়া তাঁহার নাম আছে। তাঁহার শিষ্য বরহল বাসী—হৃদয় রাম। গুরুশিষ্য নিজের দেশে সুপরিচিত হইলেও উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা করেন নাই।

কবি "মহেশ" ও "গঙ্গাধরের" রচনার বিশেষত্ব কিছু নাই। "গণেশের" রচনায় কজরীরস কিছু না থাকিলেও সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে অনেক খেদোক্তি আছে। "বিষ্ণু"র লেখা অত্যন্ত স্থূল কামনামূলক—এই যা বিশেষত্ব।

"কন্‌হৈয়া লাল" দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে কজরীর সুরে গাহিয়াছেন।

হরিরাম ছন্দের রাজা। তাঁর শিষ্য লালাজি বলেন—

"হরিরামনে ছন্দ করোবোঁ সাঁচে অংদর ঢাল দিয়ে।"

কিন্তু গানে বিশেষত্ব নাই। কবি হীরালালের রচনায়, পারস্য-প্রভাব খুব প্রবল। তিনি গোরক্ষপংথী ভক্ত পূরণ মলের দীর্ঘ কাহিনী কজরী ছন্দে লিখিয়াছেন। তাহাতে ভক্তদের উপকার হইলেও রসিকের কোনো লাভ হয় নাই। কারণ কজরী গানেরই সুর। কজরী সুর ছন্দ ও ভঙ্গী দীর্ঘ রচনায় অশোভন হইয়া উঠে।

[illegible] লছমন কাশী হীপীটোলাবাসী। ইনি পাতসাহের [illegible]ন বীর দয়ারামের বিবাদ কজরী ছন্দে গাহিয়াছেন। [illegible] পালোয়ানদের জয়গানও করিয়াছেন। তবে কবির

কবি "মিছরী লাল"। ইনি মুঙ্গেরে পুঁথীর দোকান করেন। 'মিছরী"কে পারসীতে বলে "নবাত"। ইনি "নবাত" ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছেন। ইনি কৃষ্ণলীলা, অর্দ্ধনারীশ্বর-রূপবর্ণনা প্রভৃতি লিখিয়াছেন। কোকেন প্রভৃতি নেশার বিরুদ্ধে এবং বৃদ্ধের দ্বিতীয়বার বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র রচনা করিয়াছেন। ইঁহার যে-সব গান সত্যকার কজরী, সেগুলি সাধারণ রকমের।

এক রঘুনাথের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এখন আর-একটি রঘুনাথের কথা লিখিতেছি। ইনি ব্রাহ্মণ, ইঁহার নাম পণ্ডিত রঘুনাথ শর্ম্মা। ইঁহার রচনায় কোনো বিশেষত্ব নাই।

ইঁহার শিষ্য লালা বাগেশ্বরী দয়াল। ইনি শ্রীবাস্তব শ্রেণীর কায়স্থ। ইনি অনেক সময় শুধু "লালা" নামের ভণিতা দিয়াছেন। ইনি বিদ্বান মানুষ। লালাসম্প্রদায়সুলভ পারসী শিক্ষা ইনি যথেষ্ট পাইয়াছেন। কাজেই ইঁহার লেখায় পারসীর প্রভাব খুব বেশী। নেশা প্রভৃতির বিরুদ্ধে ইনি লিখিয়াছেন। নীতি, আচার, দেবতায় ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ে লিখিয়া ইনি পণ্ডিতগণের প্রিয় হইয়াছেন। ইঁহার বিস্তর গান ছাপা হইয়াছে—তবে ইনি সাধারণের মধ্যে তেমন আসর পান নাই। কারণ ইঁহার লেখায় কজরীর ঘন ভাব ও হাল্কা চাল্‌টি নাই। ইনি রামায়ণ, কৃষ্ণচরিত প্রভৃতি দীর্ঘ কাহিনী কজরীর সুরে গাহিতে গিয়া আসর মাটি করিয়াছেন। ইঁহার ছোট গান—

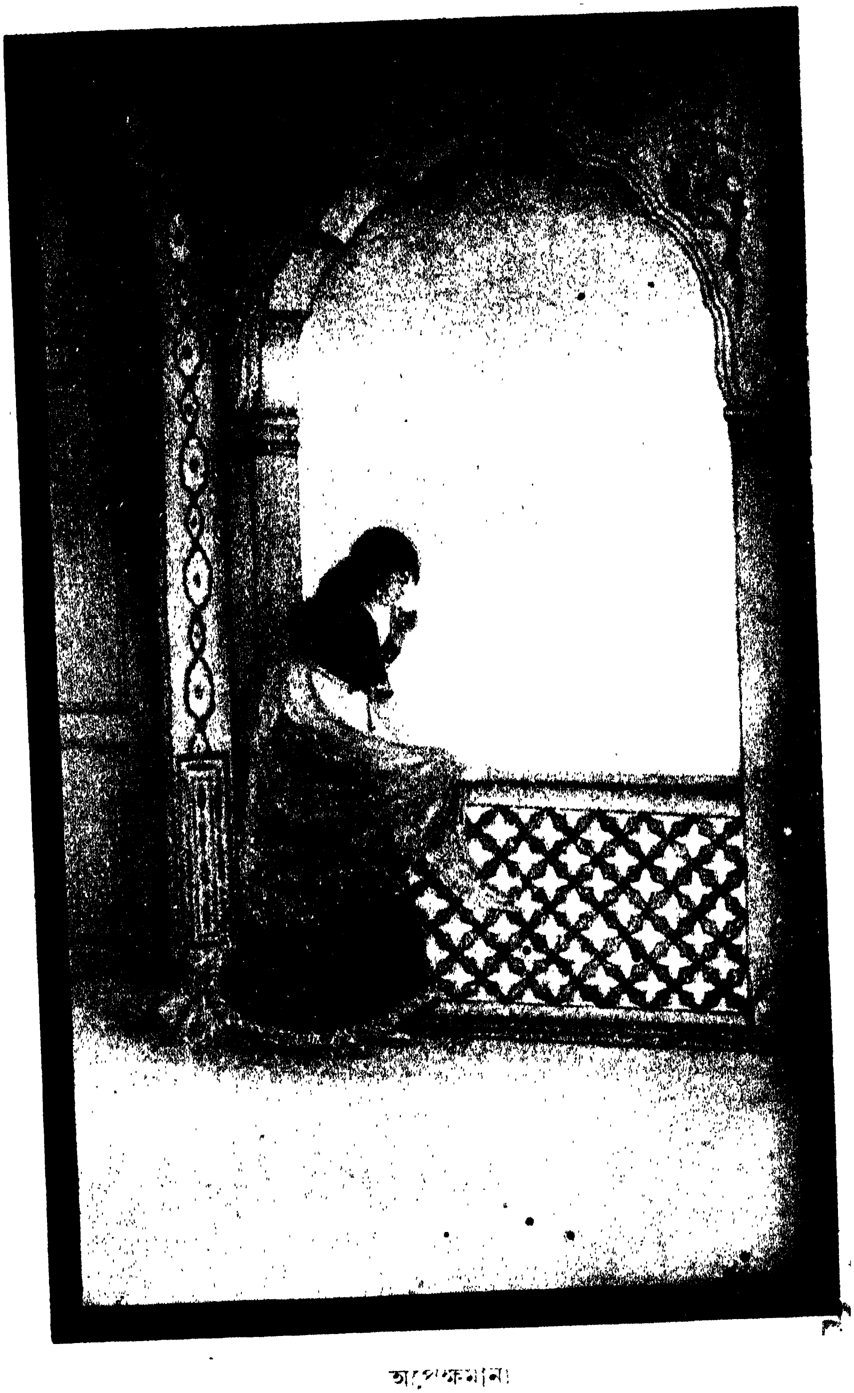
"সাঝ চঢে সোহাবন প্যারী
ছায়ে ঘটা ঘন ঘোর।"

(হে প্রিয়ে, কি সুন্দর সাঁঝ আজ আকাশ ছাইয়াছে—ঘন ঘোর ঘটা চড়িয়াছে) যেরূপ, সেরূপ বেশী গান গাইলে রসিকেরা তৃপ্ত হইতেন।

মুরলীধরের

"ছাই ঘটা ঘন ঘোর
দামিন দমক রহী চহু ওর।"

(ঘন ঘোর ঘটা ছাইল, চারিদিকে দামিনী চমকাইতে লাগিল) প্রভৃতি ছোট গান বেশ উপভোগ্য। লোকটি চমৎকার চলতী ভাষায় মধু সুরে ও হাল্কা চালে লেখেন।



অপেক্ষমানা

চিত্রকর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বসু মহাশয়ের সৌজন্যে

প্রভৃতির গান ঐসব দেশে চলিত থাকিলেও—বিশেষ কবিত্ব কিছু নাই। মাঝে মাঝে বেশ সুর ও ছন্দের জমাট বাহার আছে। দোলনায় ঝুলিয়া যখন তরুণীরা গান করেন তখন চমৎকার লাগে। কিন্তু লিখিতে বসিলে বিশেষ কিছু লিখিবার মত মেলে না।

কবি সুন্দর লাল। ইঁহার ছন্দ ও সুর অতি চমৎকার। এবং সেইজন্য ইঁহার গান খুব প্রচলিত। ইঁহার গানের মধ্যে দেশের দরিদ্র ও সমাজে নিগৃহীতদের দুঃখ খুব ফুটিয়াছে। ইনিও সমাজের নিম্নস্তরের লোক। ইঁহার রচনায় প্রকৃতির ও ঘনঘটার মাধুর্য্য যথেষ্ট আছে। একবার কে তাঁহাকে কজরী গাহিতে বলে—তখন আকাশ মেঘে ভরা ছিল না। তাই তিনি গাহিলেন—

"বিন বরসে হো বদরিয়া ন সোঁহায়ে কজরী"

(বাদল-বরষ-বিনা কজরীর শোভা নাই।)

ইঁহার ভক্তি-সঙ্গীত—

"প্রভুজি তুমি বিন জগ অঁধিয়ারা"

(হে প্রভু, তুমি বিনে জগৎ অন্ধকার) প্রভৃতি গান সকলেরই অতি প্রিয়।

ইনি কুণ্ডলিয়া কবিত্ত প্রভৃতি ছন্দেও গান রচনা করিয়াছেন—সেগুলিকে খাঁটি কজরী বলা যায় না। শুধু কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য একটি কবিত্ত ছন্দ দেওয়া গেল—

"লাগত বসন্ত কন্ত ছায়ো হৈ দিগন্ত অন্ত
তন্ত না হমার নেক চিত্ত মেঁ বিচার্য়ো হৈ।"

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

হরিতালিকা-ব্রত তিথি, ভাদ্র, ১৩২৪।

ভিন্নরুচির্হি লোকঃ

ফুল ফুটে,—অলি কয়,—'গন্ধটুকু তব
অন্তরে সঞ্চিয়া রাখ, আমি পিয়ে লব।'
বায়ু কয়,—'দাও গন্ধ, ভুবনে বিলাই।'
পাখী বলে,—'আমি তব গান গেয়ে যাই।'

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু।

ডাকপিয়ন

(গল্প)

ছেলেবেলাকার যে স্মৃতি এক-একবার মনের মধ্যে উঁকি মারে, তাহাদের একটি—ডাকপিয়ন।

এখন সহরের পথে পথে খাকি পায়জামা খাকি কোর্ত্তা আর নীল পাগড়িপরা অনেক ডাকহরকরা দেখিতে পাই। কলিকাতার বালাম চা'ল কলের জলের মত ইহারাও একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। চিঠিবিলির ব্যাপারে কল্পনার মোহ আর কিছুই নাই। স্পষ্ট দেখিতেছি, হাওড়া কিংবা শিয়ালদহ হইতে লাল রংএর মোটর কি ঘোড়ার গাড়ী বোঝাই হইয়া বড় বড় চটের থলে' বড় ডাকঘরে আসিতেছে। সেখান হইতে ছোট ছোট থলে' আবার গাড়ী করিয়া ছোট আফিসে পৌছিতেছে। তারপর টেবিলের উপর খটাখট্ মোহর মারিয়া নানান্ হরকরা হরেক রকম চিঠিপত্র প্যাকেট পুলিন্দা হাতে করিয়া সহরের নানান্ দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই যে দোবে চোবে তেওয়ারি চিঠিওয়ালা, পাগড়ি পায়জামার আড়ালে ইহাদের রীতি আর ঢাকা পড়ে না। কর্ম্মশেষে নিজের নিজের খোলার চালায় ফিরিয়া গিয়া ইহারা আবার কাদে পেঁক দিয়া লোটা মলিবে, যাঁতাভাঙ্গা আটার মোটা রুটি গিলিবে এবং খৈনি খাইয়া ঘরের কোণে বসিয়া ঢুলিবে। ইহারাও যে আমারই মতন সত্যিকার মানুষ, খোলসের জলুসে এ কথাটা আর ভুলি না।

কিন্তু শৈশবে ছিলাম পাড়াগাঁয়ে, তখনকার ধারা ছিল অন্য-রকম। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর তখন পত্তন হয় নাই, ছেলেদের যন্ত্রতন্ত্র জ্ঞান ছিল না, বলিলেই হয়। খেজুর গাছে তেঁতুল ফলে না, গোবর ছেনিয়া ঘুঁটে হয়, সন্দেশ খাইলে মিষ্ট লাগে, এ-সব তত্ত্ব তখন মোটেই আয়ত্ত হয় নাই। সেকালে ছেলেদের খাওয়ার লুচি ভাজিবার সময় গমের ক্ষেতে ভিয়েন করিবার কথা কেহ তুলিত না, আর কাপড় পরিবার আগে তাঁতির নাতির সঙ্গে শিশুর মিতালি করিবার কল্পনাও কোন মাথায় আসে নাই।

২

গয়ারাম আমাদের বাড়ীতে থাকিত না বটে, কিন্তু দুপর বেলার খাওয়াটা তার আমাদের বাড়ীতেই হইত।

সে খালি পায়ে শাদা শার্ট গায়ে গলায় চামড়ার ব্যাগ ঝুলাইয়া অনেক বেলায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া আসিত। চিঠিপত্র সমস্তই হাতে, অতবড় ব্যাগটার ভিতরে কিছু রাখিত বলিয়া মনে হইত না। যজ্ঞসূত্র যেমন ব্রাহ্মণের লক্ষণ-মাত্র,—আর কোন কাজে লাগে না, ভাবিতাম ব্যাগও বুঝি তেমনি পিয়নের নিদর্শন,—অদর্শনে ডাকহরকরা বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। গয়ারামের হাতে একগাদা খাম পোষ্টকার্ড আর বাদামি কাগজে মোড়া খবরের কাগজের একটা তাড়া থাকিত। আমার লোলুপদৃষ্টি ছিল কাগজ-গুলির উপর। প্রবল ইচ্ছা হইত, যদি দপ্তরটি হাতে পাই, একে একে কাগজগুলি খুলিয়া পড়িতে বসি। কিন্তু গয়ারাম তার পুঁজিপাটা তাকের উপর তুলিয়া রাখিত। সে এত উঁচু যে সাধ্য কি নাগাল পাই!

ময়রা সন্দেশ খায় না; অতগুলি ছাপান পুঁথি ও কাগজের মালিক হইলেও গয়ারামকে কোনদিন একখানি খুলিয়া পড়িতে দেখি নাই। ইহাতে আমার ভারী আশ্চর্য্য বোধ হইত। যদি কখনও সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করিতাম,—গয়ারাম-দা, ও-সব কাগজ একটিবারও পড় না যে?—সে হাসিয়া বলিত,—দূর্ পাগল, কাগজে কি পেট ভরে? হাঁ, তবে কাগজের উপর কালির আঁচড় কাটিয়া আর লেফাফায় পুরিয়া লোকে টাকা পাঠায়, সে-সবকাগজ চমৎকার—লোভ সামলানো শক্ত! হা-হা করিয়া হাসিয়া ঝুলানো ব্যাগের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সে বলিত,—ওর মধ্যে যে-সব জিনিষ আছে, আমার ভাল লাগে সেই-সব।

এক-একদিন পান চিবাইতে-চিবাইতে ব্যাগটা পাড়িয়া স্তূপাকার টাকা বাহির করিয়া গয়ারাম গণিতে বসিত। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর উপর টুং টাং শব্দে বাজাইয়া সে ক্ষিপ্রহস্তে থাকে থাকে টাকা আধুলী সিকি দুআনী সাজাইয়া যাইত। পরে লাল সূতায় ফোঁড়া গালামোহর করা চিঠি বাহির করিয়া উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিত, আবার সে-সব ব্যাগে তুলিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিত,—চিনির বলদ, দাদা, চিনির বলদ; ঘাড়ে করিয়া পরের পয়সা বিলি করি, নিজের ঘরে কাণাকড়ি আসে না!

নীতির আলোচনা করিতাম। টাকা ত পড়া যায় না, টাকায় রং বেরংএর ছবিও নাই! খাওয়া-দাওয়া খেলাধূলার অবসরে এমন কিছু চাই যাহাতে প্রাণে ফূর্ত্তি হয়। গোটা-কয়েক টাকা নাড়িয়া-চাড়িয়া কি সুখ! উপরের দিকে ছুড়িয়া হাতের মুঠা মেলিয়া টাকা ধরিলে আর চাকার মত গড়াইয়া দিলে একটু আমোদ হয় বটে, কিন্তু নেকড়ার বল কি লোহার চাকা লইয়া খেলায় যে আনন্দ, তেমনটি নয়! ইহার পরেই যেদিন গয়ারাম ধর্ম্মের ষাঁড়ের মতন বেওয়ারিশ নমুনা-সংখ্যা খবরের কাগজ একখানি আমাকে উপহার দিত, সেদিন মনে মনে টাকার বিপক্ষে রায় দিয়া মামলা একেবারে ডিস্‌মিস্ করিয়া ফেলিতাম!

শনি ও মঙ্গলবারে হাটের দিনে গয়ারাম চট্‌পট্ কাজ সারিয়া আমাদের বাড়ী ফিরিয়া আসিত। দূর গ্রামের বহু লোকে হাটে আসে, তাহাদিগকে আমমোক্তার ধরিয়া সে সংক্ষেপে কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ফেলিত। মাছ-তরকারি-পানের সঙ্গে ধামার মধ্যে দু'একখানা চিঠিও অনেকের ঘরে গিয়া উঠিত। সব চিঠিই যে যথাস্থানে পৌঁছিত এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু গয়ারামের ধারণা ছিল অন্য-রকম, অন্ততঃ মুখে সে তা-ই বলিত। একটা গাড়ী ঠেলিয়া দিলে সেটা নিজে নিজেই অনেক দূর যায়, আর যে চিঠি এতটা পথ আসিল সে মালিকের হাতে না গিয়া হাটের মধ্যে হারাইবে, এ কখনো হয়! ভাবিতাম, গাড়ীর সঙ্গে চিঠির খুব সাদৃশ্য ত!

কিন্তু আসল কথাটা এই যে হাটে বসিয়া গয়ারাম পরের ধনে পোদ্দারি করিত, তাই গ্রামে গ্রামে ফিরিয়া চিঠি বিলির ফুরসৎ তার থাকিত না। নিরক্ষর লোকের মনি-অর্ডার লিখিয়া দিয়া গয়ারাম মাশুল ও টাকা সমেত নিজের জন্য দুটি করিয়া পয়সা উসুল করিত। ডাকঘর অনেক দূরে, যাতায়াতে একবেলা কামাই না করিয়া চাষাভূষা হরকরার মারফৎ কাজ সারিয়া লইত। এই হাটে মনি-অর্ডার লিখিয়া গয়ারাম পরের হাটে মোহর মারা রসীদ বিলি করিত। ডাকমুন্সীটি পাঠশালার গুরু; তিনি ছেলেদের ধারাপাত শিখাইতেন,—পিয়নটির কাজের ধারায় তাঁর আপত্তি ছিল না।

৩

সেদিন বৃষ্টি হইতেছিল। গয়ারাম ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছে, এমন সময় মাথায় টুকরি নেংটিপরা একটি লোক বাহিরের দালানে আসিয়া বসিল। শুনিলাম তার নাম ইছু, চাষ আবাদ করে। কলিকাতায় পগেয়াপটির এক গদিতে ইছুর ভাই চাকরী করে। ভাই থাকে সহরে, তাই তার সখের বহর বেশি বেশি, নিজের রোজকারের মাপে কুলায় না। প্রমোদের ফল দেনার দায়ে প্রমাদ গণিয়া সে ভাইয়ের শরণাপন্ন হয়। ইছু পাট বেচিয়া কিছু লাভ করিয়াছিল, পঞ্চাশ টাকা ভাইকে মনি-অর্ডার করে, অর্থাৎ গয়ারামের হাতে দেয়। সে টাকা পৌঁছায় নাই, ভাই আবার জরুরি তাগিদ দিয়াছে। কিসে কি হইল পিয়নবাবুর মুখে শুনিবার জন্য ইছু তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া এখানে আসিয়াছে।

স্নানান্তে ফিরিলে গয়ারামকে ইছু তাহার বিবরণ শুনাইল। গয়ারাম যেন আকাশ হইতে পড়িল! সপ্তমে সুর চড়াইয়া বলিল,—কি-রকম! আমার পাঠানো টাকা কখনো মারা যায়? যখন খাই-দাই ঘুমাই তখন আমি গয়ারাম কুণ্ডু, কিন্তু যখন চিঠিপত্র টাকাকড়ির লেনদেন করি তখন ত আমি খোদ সরকার বাহাদুর! আমার হাতে টাকা,— সে ত আমার হাতে নয়,—কোম্পানির হাতে। রেল ষ্টিমার আইন আদালত কি ফেল্ হয়? কোম্পানির কল কখনো বিগড়ায়?

এ অকাট্য যুক্তির সারবত্তায় আমার কোন সন্দেহ ছিল না, কিন্তু দেখিলাম ইছু রসীদখানি পুনরায় ট্যাঁকে গুঁজিল এবং বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকিতে বকিতে শুনাইয়া গেল, সে তাদের মণ্ডল আব্বাস মিঞার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিবে।

কএকদিন পরে একজন পেটমোটা জমাদার ও দু'জন লাল-পাগড়ি পাহারাওয়ালা আসিয়া গয়ারামের অস্থায়ী আড্ডা বাহিরের ঘরখানি উলট্‌পালট করিয়া খুঁজিল। কোথাও কিছু না পাইয়া জমাদার সাহেব একবার উর্দ্ধে ও একবার নিম্নে বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন,—যেন ছাদ ফুঁড়িয়া অথবা মেঝে খুঁড়িয়া মাল আকাশে কি পাতালে অদৃশ্য হইয়াছে!

গয়ারাম আর আমাদের বাড়ী আসে নাই! সে নাকি ফেরার।

কিছুদিন হইল কার্য্যোপলক্ষে বক্সার জেলে গিয়াছিলাম। দেখিলাম আপিস-ঘরে একটা টেবিলের সামনে টুলের উপর বসিয়া চটের মত মোটা কাপড়ের জাঙ্গিয়া ও কোর্ত্তা-পরা একজন কয়েদী কি লিখিতেছে। তার গলায় লোহার হাঁসুলিতে নম্বরী কাঠের টুক্‌রা ঝুলিতেছে, কাঁচা পাকা দাড়ি বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

লোকটা খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। আমি সবিস্ময়ে কহিলাম,—কে, গয়ারাম, তুমি—এখানে? সে বলিল, তিন বৎসর পূরেছে, আর ছয় মাস আছে। পরে গলার আওয়াজ একটু নামাইয়া একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—এখানে খালি কাগজ নাড়াচাড়া করি।

জেলের বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ-কে চেনেন নাকি? আমি ঈষৎ হাসিয়া চুপিচুপি বলিলাম,—হাঁ, কোম্পানির কল হঠাৎ বিগ্‌ড়াইয়াছে, তাই সরকার বাহাদুর জেলে!

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

আলোচনা

আবার ঙ।

আষাঢ় মাসে শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় আমার কয়েকটা সংশয় দূর করিয়াছেন। কিন্তু ঙ সম্বন্ধে সংশয় দূর করিতে পারেন নাই। তাহাকে বলা অনাবশ্যক যে তাহার আলোচনা মন দিয়া পড়িয়াছি। সাড়ে চারিকোটি বাঙ্গালীর মধ্যে কে কোন্ শব্দ কি বানান করিলেন, তাহা জানিতে কাহারও বড় একটা আগ্রহ নাই। কিন্তু যিনি বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে চান, তিনি বানানের খুঁটি-নাটি এড়াইতে পারেন না। বিশেষতঃ পণ্ডিতের লেখা ~~—~~ প্রণিধান করিতেই হয়। ফলে, কে কি লিখিলেন, কে কি বানান করিলেন, তাহা চোখে আগে পড়িতেছে।* প্রবাসী-সম্পাদকের অনুগ্রহে এই পীড়া কিছু কমাইতে পারিতেছি। সকলে এ সংবাদ জানেন না, ভাষায় বি-রূপ দেখিলে সকলকে জিজ্ঞাসিতেও পারি না। শাস্ত্রীমহাশয় বিলক্ষণ জানেন। একারণ তাহাকে নির্ভয়ে প্রশ্ন করিতে পারি, তাহার সহিত তর্কও করিতে পারি। তবে তাহার বিপদ, আমার পড়া-বিদ্যা নাই, এক কাঁচা সহজ-বুদ্ধিযোগ ব্যতীত পুথীর প্রমাণের ভরসা নাই।

* শেষে মক্ষিকা-বৃত্তি সাঙ্গ হইল না কি! পণ্ডিতপ্রবর শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের লিখিত 'সাংখ্যের মোট সিদ্ধান্তের' টীকায় "পাণিনি প্রমাণে" দেখাইয়াছেন, প-ঙ্‌ক্তি হইতে পঁ-ই-টা। কিন্তু পঁ-ই-টা, না পা-ই-ঠা? প্র-তি-ষ্ঠা হইতে পা-ই-ঠা নহে কি?

তিনি বাঙ্গালা শব্দ- কানে ধরিয়াছেন. বে-ঙ্গ, বেং, শব্দের পরে বে-ঙ লেখা আছে। ইহা হইতে বুঝিয়াও থাকিবেন বে-ঙ বানান নির্ভয়ে করিতে পারি নাই। ঙ = ং কিনা এইরূপ সন্দেহ আছে। কিন্তু রা-ঙ্গা র-ঙ্গে র-ঙ্গি-ন শব্দে সে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রীমহাশয় রা-ঙা বানানের পক্ষে দুই যুক্তি দিয়াছেন। (১) রা-ঙা বানান ধ্বনির অনুরূপ, (২) প্রাচীন প্রয়োগে ঙ অক্ষরের ধ্বনি এইরূপ ছিল।

গত বৎসর প্রবাসীতে (কার্ত্তিক ও আষাঢ়ের) দুই যুক্তির খণ্ডন-প্রয়াস করিয়াছি। আবার কিঞ্চিৎ করিতেছি। তাঁহার প্রথম যুক্তির ভিতরে অপর একটা প্রচ্ছন্ন আছে। আমার স্ব-জন ও আমি যে শব্দ যেমন উচ্চারণ করি, সে শব্দ তেমন লিখিব। "রা-ঙ্গা ফুল না বলিয়া আমরা যে (পদ্যের ছন্দের জন্য ছাড়া) রা-ঙা বলি, ইহা কিরূপে অপলাপ করিব।"

কিন্তু ধ্বান-সংবাদী বানান কেবল ঙ্গ বেলায় কেন? আর যে হাজার হাজার শব্দ উচ্চারণ মতন বানান করেন না? যদি পুরাতন ঙ অক্ষর পুনরুদ্ধার কল্পনা করেন, তাহা হইলে ঞ অক্ষরকেও করেন না কেন? আমরা যদিও না-ই লিখি, বলি ও পড়ি না-ইঁ। না-ঞি লিখিলে সচ্ছন্দে সে ধ্বনি প্রকাশিত হয়। ধ্বনি-সংবাদী বানানে বিপদ এই, বঙ্গভাষা কেবল আমার নয়। আমি ত আত্মীয়তা করিতে চাই; কিন্তু অ-গ্যান বোঝে না, অন্তরে বাজ্ঝে গন্জনা দেয়, বলে নিজের কথাই বড়। পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ, দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ, বোধ হয় সমস্ত পূর্ববঙ্গ, রা-ঙা র-ঙ জানে না। নদীয়া ও তাহার পাশের কয়েক জেলায় রাঁ-আঁ মতন শুনিতে পাই। বহু বহু লোক কয়েকটা বর্ণ স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে না, কিংবা করে না। প-ড়ি-ল (পতনে) নদীয়া জেলায় বলে প-ই-ল, পঁ-ল।

অর্থাৎ শিক্ষা-ভেদে, সংসর্গ-ভেদে লোকের মুখে একই শব্দের ধ্বনিতে ভেদ হয়, এই ভেদ অ-স্থায়ী, কিংবা অস্পষ্ট। এই কারণে কেহ কেহ প্রা-িশিক রূপ বলেন। আমি যোজনান্তে ভা-খা, এই বাক্য ধরিয়া ভা-খা বলি। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ভাখার ভেদ হইবেই। তথাপি ভাখা-ভেদ যথা-সাধ্য হ্রাস করিতে না পারিলে, ভাখার অন্তর্গত ভাষা স্বীকার না করিলে, ভাষার প্রয়োজনই অসিদ্ধ হয়। মৌখিক ভাষায় যত ভেদ চলে, লৈখিক ভাষায় তত চলে না। মৌখিক ভাষা বহুপরিমাণে সহ-জ; লৈখিকভাষা শিক্ষাসাপেক্ষ, কাজেই বহুপরিমাণে কৃত্রিম। সংস্কৃত-মূলক শব্দের বানান যথাসাধ্য সংস্কৃতের মতন রাখা আধুনিক বাঙ্গালার রীতি হইয়াছে। ঙ সংযুক্ত সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালা রূপান্তরে অধঃস্থিত ব্যঞ্জনের লোপ দেখিতে পাই না। অঙ্ক—আঁক, শঙ্খ—শাঁখ, অঙ্গার—আঁগার, সঙ্ঘাত—গাঁতা। এইরূপে, রঙ্গ হইতে রাঁগা, রঁগিন; বঙ্গ হইতে বাঁগাল, বাঁগালা, বাঁগালী, ইত্যাদি পাই। ঙ্‌গ্‌ এবং ং (অনুস্বার) এর উচ্চারণ বাঙ্গালায় একই। র-ঙ্‌গ্‌ = রং, রাং; ব্যঙ্‌গ্‌ = বেং; এইরূপ, বা-ঙ্‌গ্‌-লা = বাং-লা লেখায় দোষ দেখিতে পাই না।

শাস্ত্রীমহাশয় রা-ঙ্গা বলেন না, রাঁ-গাও বলেন না; গ লোপ করিয়া বলেন। গ লোপ করিলে থাকে রাঁ-আ, কিংবা রাঁ-আঁ। (তু' ধূম—ধুঁ-আ, ধুঁ-আঁ। শব্দের দ্বিতীয় বর্ণ অনুনাসিক হইলে অনেকে প্রথম বর্ণও অনুনাসিক উচ্চারণ করেন। যথা, তি-নি—তিঁ-নি, তা-হাঁ-র—তাঁ-হাঁ-র, ক-ম্প—কঁ-ম্প।) এইরূপ, বা-ঙ্গা-লা—বাঁ-আঁ-লা দাঁড়ায়। শাস্ত্রীমহাশয় ঙ-অক্ষরের নাম উ-অঁ, ঞ অক্ষরের নাম ই-অঁ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, উ, ই কিছু নয়, অঁ এই ধ্বনি মূল। তাহা হইলে বা-ঙ্গা-লা স্থানে বা-ঙ-লা বা-আঁ-লা? জানি না, সংস্কৃত ভাষায় কেবল অঁ থাকিত, কি না। উভয় বর্ণে অঁ থাকিলে দুইটা বর্ণ দুইটা অক্ষর আবশ্যক হইত কি? ঙ ঞ-কারের উচ্চারণস্থান এক কি? এ বিষয়ে তিনিই প্রমাণ।

সংস্কৃতে যাহাই হউক, বাঙালায় ঙ ঞ অক্ষরের প্রয়োগ এবং নাম দেখিলে মনে হয়, অঁ নহে উঁ ইঁ ধ্বনি মূল। ঙ অক্ষর দ্বারা উঁ, প্রায়ই বুঁ, এবং ঞ অক্ষর দ্বারা ইঁ, প্রায়ই য়ঁ, ধ্বনি ব্যক্ত করা হইত। গত বৎসরের কার্ত্তিকের প্রবাসীতে বহু প্রমাণ দিয়াছি। এখানে অপর কয়েকটা দেখাই। সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে লইতেছি।

সতীশবাবুর মতন সাবধান সংস্কর্ত্তা কদাচিৎ দেখিতে পাই। তাঁহার পদকল্পতরুতে আছে,

মাগো কিয়ে ইহ জীদ্দ অপার।
কো অছু বীর ধীর মহাবল
প-ঙ-রি উতারব পার। (৪৩৯ পদ)

পদের রাগিণী ধানশী লেখা আছে। অতএব প-ঙ-রি—প-উঁ-অ-রি না পড়িলে ছন্দে মিলিবে না। সতীশবাবু দুই পুথী হইতে প-উঁ-রি পাঠান্তর তুলিয়াছেন। ইহা হইতেও বুঝিতেছি, ঙ অক্ষরে উ ধ্বনি আছে। (পদটির সতীশবাবু-কৃত অর্থ,—মাগো মা! একি অসীম জেদ্! কে বীর ধীর মহাবল আছেন, যিনি এই অপার জেদ্-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ইহাকে পারে উত্তারিত করিবেন!" জলে সন্তরণ অর্থে ওড়িয়াতেও প-হঁ-র ধাতু আছে। বোধ হয় সং প্র-ত-র হইতে।)

বৈষ্ণব পদাবলীতে ভ্রূ শব্দ ভা-ঙ রূপ ধরিয়াছিল, বিদ্যাপতির

অলখিতে রঙ্গিণি ভাঙ-ভুজঙ্গিনি
মরম হি দংশল মোর॥ (১৯২ পদ)

এখানেও ধানশী। ভা-ঙ-ভুজঙ্গিনি ছয় অক্ষর। অন্ততঃ সাত অক্ষরে না পড়িলে ছন্দ থাকে না। অতএব ভা-উঁ-অ কিংবা ভা-বুঁ পড়িতে হইবে। আরও দেখুন ভ্রূ = ভ্রউ = ভা-উ = ভা-ঙ, যেন উ নইলে ঙ হইত না। নিম্নে স্পষ্ট। ইহাও ধানশী।

নয়ন নলিনি দৌ অঞ্জনে রঞ্জন
ভা-ঙু বিভঙ্গি-বিলাস। (৫৯ পদ)

ভা-ঙু দ্রষ্টব্য। ঞ বর্ণও দ্রষ্টব্য। ইঁঅ পড়িয়া দীর্ঘ করিতে হইবে।

'চণ্ডীদাসের পদাবলী' সংস্করণে নীল রতন বাবু "বানানগুলিকে শুদ্ধ করিয়া" লিখিয়া ছাপাইয়াছেন। বোধ হয় অসভ্য, ঙ ঞ অক্ষর তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিপদ এই, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করিলে শ্রীরাধিকা ক হইতে ক্ষ পর্যন্ত "ছত্রিশ অক্ষরে করুণা" করিয়াছিলেন। কাজেই ঙ ঞ আসিয়া জুটিয়াছিল। ঙ অক্ষরে করুণায় প্রত্যেক

প-ঙ্‌ক্তি হইতে পাঁ-তি, পা-টি, পা-ই-ট ইত্যাদি। মূলার্থ আবলী (series)। উপরে উঠিতে যেখানে পাদ-প্রতিষ্ঠা হয়, সেখানটা প-ই-ঠা। সো-পা-ন শব্দের বাঙ্গালা প-ই-ঠা বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে সোপান-পঙ্‌ক্তি = পইঠা-পাটি। উ-প-রী-ত অপেক্ষা প-ব্রি-ত্র-ক হইতে প-ই-তা মনে হয়। আশা করি, ঠাকুর-মহাশয় এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।

কবির আদ্যে ঙ থাকিবার কথা। ছাপায় ঙ স্থানে উ আছে। বোধ হয় উ ছিল। যথা,

উ কিএ তোমার উনমত চিত। (৫৮০ পদ)

ইত্যাদি। (বহু পরিচিত কি-ঙে, কি-এ হইয়াছে।) তা হউক, ঙ = উঁ। ঞ অক্ষরে করুণায় ঞ আছে।

ঞ কি মথুরা ঞ কি চতুরা, (৫৮৫ পদ)

ঞ = ইঁ, পরে 'কি' দ্বারা স্পষ্ট হইয়াছে। একটি পদে ঙ সম্পাদকের চোখে ধুলা দিয়াছে।

যেন মেঘ-রস লাগিয়া চাতক
পিয়াসে পি-ঙ সে পি ঙ।
রস আলাপনে চাতক বাঁচল
এ রস না জানে কে-ঙ॥ (৫১৯ পদ)

মেঘ-রসের পিয়াসে চাতক পি-উঁ পি-উঁ করে। সে রস আর কে-উঁ জানে না।

এমন আরও পুরাতন বই দেখি। বসন্ত বাবুর শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন নাকি ছয় শত বৎসরের পুরাতন। পদাবলী অপেক্ষা পুরাতন, সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষায় চন্দ্রবিন্দুর ছড়া-ছড়ি। কিন্তু আশ্চর্য্য, গোসাঞি কানাঞি এবং বিকল্পে অপর দুই পাঁচটা শব্দে ছাড়া ঞ নাই, এবং মাত্র একস্থানে একটি শব্দ আ-পো-ঙ-ষ ছাড়া ঙ নাই। বসন্ত বাবু পুথীর বানান শুদ্ধ করেন নাই। এই পুথীতে অন্য দুই স্থানে আ-পো-ষ আছে। শুদ্ধ করিতে বসিলে হয়ত আ-পো-ঙ-ষ পাইতাম না। যথা,

সুণিআঁ বা কি বুলিবে ঘরের গোআল।
মোএ আ-পো-ঙ-ষ হৈবোঁ তোহ্ম জাইবে মার॥
(৩৩ পৃষ্ঠা।)

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "ঘরের গোআল যে স্বামী তিনি শুনিয়া কি বলিবেন! ফলের মধ্যে আমি আ-পো-ঙ-ষ হইব, আর তুমি মারি খাইবে।" (সে কালে 'মারি যাইব' বলিত ?) বসন্ত বাবু আ-পো-ঙ-ষ শব্দের অর্থ করিয়াছেন, দণ্ডিত, প্রহৃত। অন্য এক পুস্তক হইতেও শব্দটি আ-পো-স আকারে তুলিয়া ধান্য-কণ্ডন, অর্থ দেখাইয়াছেন, কিন্তু ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই। ঙ সহিত ব্যুৎপত্তির সম্বন্ধ আছে। আমার মনে হইয়াছে মূল শব্দটি অপ-তুষ। (দণ্ড-প্রহার দ্বারা) ধান্যের তুষ অপসারিত করিলে ধান্য অপ-তুষ হয়। ইহা হইতে অপ-তুঁষ, এবং কীর্ত্তনের গায়কের আদ্যে আ-অনুরাগে আপ-তুঁষ, ত লোপে আপ-উঁষ, পরে উ থাকাতে উচ্চারণে আ-পো-উঁ-ষ = আ-পো-ঙ-ষ। (অর্থাৎ রাধিকার অঙ্গ অপ-তুষ করিবে; এখন যেমন বলে, ঠেঙ্গাইয়া গায়ের ছাল ছাড়াইয়া দিবে।)

যদি বলেন, কেবল রাঢ়ে ঙ-তে উঁ, ঞ-তে ইঁ উচ্চারিত হইত, তাহার উত্তর সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত রঘুনাথের শতাধিক বৎসরের পুরাতন সত্যনারায়ণের পুথীর চৌত্রিশ অক্ষরী স্তোত্রে পাওয়া যাইবে। সেখানে ঙ-অক্ষরে উ, এবং ঞ-অক্ষরে নি আদ্যবর্ণ শব্দ আছে। (তু° রাঁ-ঞী—রা-ণী)।

বোধ হয় এতদূর পর্য্যন্ত ঠিক আসিয়াছি। ঙ = উঁঅ, ঞ = ইঁঅ। কিন্তু শা-ঙ-ন ধারা, ধবলী শা-ঙ-লী, সো-ঙ-র-ণ, কু-ঙ-র, গো-ঙা-র, গো-ঙা-র-সু, পি-ঙ-ল প্রভৃতির ঙ অক্ষরের মূল কি, উচ্চারণ কি? আমার বোধ হয়, সেই ৱঁ। মিলাইয়া দেখা যাউক। এবার কাব্যবিশারদের বিদ্যাপতি খুলি। তিনি অনেক বৈষ্ণব পদাবলী দেখিয়া বিদ্যাপতির সংস্করণ ছাপাইয়াছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় ঙ = ৱঁ ধরিয়াও ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্র-বা-ল (যদিও প্রায়ই প্র-বা-ল লেখা হয়) = প-ৱা-ল, (বৈষ্ণব পদে ল স্থানে প্রায়ই র হয়) = প-ৱা-র। অনেক স্থানে অনুনাসিকও হয়। যেমন ভ্র হইতে ভা-ঙ। এইরূপ, প-ৱাঁ-র = প-ঙা-র। যথা,

(১) রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ প-ঙা-র।
(২) অধর সুরঙ্গ জনু নীরস প-ঙা-র।

এইরূপ, শ্রা-ব-ণ হইতে শা-ৱ-ন—শা-ঙ-ন। এখানে পরে (ন) অনুনাসিক থাকাতে শা-ঙ-ন শব্দে ঙ সহজে আসিয়া থাকিবে।

কতকগুলি শব্দের ম ৱঁ-রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া ৱঁ স্থানে ঙ আসিয়াছিল। সং কু-মা-র, প্রাকৃতে কু-ম-র; ইহা হইতে কু-ৱঁ-র = কু-ঙ-র। হিন্দীতে অদ্যাপি কুঁ-ব-র, কুঁ-বা-রী আছে। ভ্র-ম-র হিন্দীতে ভোঁ-রা; অর্থাৎ ভ্র-ম-র = ভ-ৱঁ-র। বাঙ্গালাতেও কৃত্তিবাসে (?) চাক-ভ-ঙ-রি পড়িয়াছি। মরাঠীতে ভোঁ-ৱ-রা, ভোঁ-ৱ-রী (ভ্র-মি)। বাঙ্গালাতে ৱ অক্ষর থাকিলে ঙ পাইতাম কি না, সন্দেহ। হিন্দী মরাঠিতে ৱ আছে বলিয়া ঙ পাই না। ওড়িয়াতেও ঙ পাই না; কারণ চন্দ্রবিন্দু ও স্বরবর্ণ দ্বারা এভাব অক্লেশে পূরণ হয়। ওড়িয়াতে কু-আঁ-র, ভ-অঁ-র, ভ-উঁ-রী।

শব্দের লালিত্য-বৃদ্ধির নিমিত্ত ম স্থানে ঙ হইত। কিন্তু প্রথমে ৱঁ হইয়া পরে ঙ। বিদ্যাপতিতে চ-ম-কি আছে, চৌ-ঙ-কি পদও আছে। যথা,

চৌ-ঙ-কি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।

চ-ম-কি = চ-ৱঁ-কি। এই ধ্বনি স্পষ্ট করিতে গিয়া চৌ-ঙ-কি। এইরূপ, স্ম-র-ণ = স-ম-র-ণ = স-ৱঁ-র-ন = সো-ঙ-র-ন। যথা, বিদ্যাপতি

অনুখণ মাধব মাধব সো-ঙ-রি-তে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।

অন্যত্র,

সো-ঙ-রি সো-ঙ-রি লেহ ক্ষীণ ভেল মধু দেহ
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ।

সো-ঙ-রি পদের ঙ পরে ই (রি) থাকাতে—ঙ-ধ্বনিতে উঁ বা ওঁ আসিয়া পড়ে। যথা, হ-রি উচ্চারণে হো-রি। এই সাদৃশ্যে কেহ কেহ ভাষা শুদ্ধ করিতে গিয়া চা-সু-নী, চা-কু-রি লেখেন। বিদ্যাপতির

চন্দন ভরমে শি-ঙ-লি আলিঙ্গনু
শেল রহল হি কাঁটে॥
পশুক মাঝে যো জনম গো-ঙা-র-ল
সো কিয়ে জান রতিরঙ্গ।
মধু যামিনী আজু বিফলে গো-ঙা-র-নু
গোপ গোঙা-র-ক সঙ্গ॥

এখানে তিনটা শব্দে ঙ পাইতেছি। শি-মু-লি—শি-ৱুঁ-লি—শি-ঙ-লি। (শি-মু-লি = শি-মু-লি মনে হইয়া থাকিবে।) স-গ-মি-ত হইতে

গো-ঙা ধাতু। গ-মি-তা-ইমু—গ-ম-তা-ইমু—গ-ৱঁ-তা-ইমু—গ-ৱাঁ-ইমু—গো-ঙা-ইমু। গ পরে উ (ৱ) থাকাতে গো। পরে ই থাকিলে যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী অ ঈষৎ ও-কার উচ্চারিত হয় উ থাকিলেও তেমন হয়। যথা, ম-ধু—মো-ধু; কিন্তু ম-দ। এইরূপ, গ্রা-ম-আর—গা-ম-আর—গা-বঁ-আর—গা-ঙা-র। তু° গ্রা-ম—গা-ৱঁ বা গাঁ-ও। বোধ হয়, গো-ঙা-র শব্দ হিন্দী হইতে পাইয়াছি। হিন্দীতে গাঁ-ৱা-র, যদিও আমাদের কানে প্রায় গোঁ-ৱা-র বোধ হয়। ম স্থানে ৱঁ হইয়া শ্যা-ম-ল—শা-ৱঁ-ল—শা-ঙ-ল। বৈষ্ণবপদাবলীতে ল-কার র হইয়া শা-ঙ-র। শা-ঙ-ল, শা-ঙ-র, দুই রূপই পাওয়া যায়। পদকর্ত্তার ইচ্ছা বা গীতের ছন্দ অনুসারে, কিংবা পদের লালিত্য-বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে ৱ ম স্থানে ঙ হইত। একারণ সাধারণ সূত্র কল্পনা কঠিন। তা ছাড়া, আমরা পদকর্ত্তার মুখে শব্দগুলি শুনিতে পাইতেছি না, লিপিকরের কলমের মুখে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাই আমাদের পুঁজি। শিক্ষা ও সংসর্গভেদে একালের মতন সেকালেও উচ্চারণ-ভেদ ঘটিত। বানানেরও ভেদ ঘটিত। পদকল্পতরুতে শা-ঙ-ন; যথা,—

রজনী শা-ঙ-ন ঘন ঘন দেয়া-গরজন
রিমি-ঝিমি শবদে বরিষে।

নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে

শ্রবণ নয়ন করে অনুক্ষণ,
যেনক শা-য়-ন ধারা। (৭০৬ পদ)

এখানে শা-য়-ন। বোধ হয় য় (ইঅ) উচ্চারণ হইবে। (কিন্তু শ্রবণে শায়ন-ধারা কিরূপ? ধারার শব্দ?) এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের লিপিকর আ-ম-ল-ক বুঝাইতে আঁ-ও-লা লিখিয়াছেন; কিন্তু কু-মা-রী স্থলে কোঁ-অ-রী, কোঁ-য়-রী, এবং কো-ম-ল স্থলে কোঁ-অঁ-ল, [illegible]-ল, দুই রূপই লিখিয়াছেন। এই লিপিকরের বানানে বহু অসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় যাবতীয় পুথীর বানানে এইরূপ অসঙ্গতি আছে। তথাপি বলিতে পারা যায়, ঙ উচ্চারণে উঁঅ, ঞ উচ্চারণে ইঁঅ। কেহ কেহ অনুনাসিক ধ্বনি হ্রাস করিত। তখন ঞ অক্ষরের মাথায় চন্দ্রবিন্দু যোগ আবশ্যক হইত। যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কা-না-ঞিঁ, তো-ঞঁ, মো-ঞঁ, ইত্যাদি। ঙ-আদি পঞ্চ অনুনাসিক বর্ণের পূর্ণ ও অপূর্ণ দ্বিবিধ সানুস্বার ধ্বনি অদ্যাপি আছে। কেহ না-ই বলে, কেহ নাঁ-ই, না ইঁ বলে; কেহ মা বলে, কেহ মাঁ বলে। কোন কোন শব্দের অনুনাসিক অক্ষরে চন্দ্রবিন্দু যোগ না করিলে অর্থান্তর ঘটে না। যেমন না-দ (ধ্বনি), নাঁ-দ (নন্দক—ডাবা), মর্দ্দন—মা-ড়া, মণ্ড—মাঁ-ড়, ইত্যাদি। তথাপি ঙ—ৱঁ, ঞ—য়ঁ, ইহাই সাধারণ মনে হয়। পা-ঞা—পা-য়াঁ—পা-ই-আঁ। বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকর পা-ঞা পড়িত পা-য়াঁ, একারণ পা-ঞাঁ বানান করিয়া অনুনাসিকত্ব দেখাইয়াছে।

শাস্ত্রীমহাশয় শি-ঙা, শি-ঙা-র, পি-ঙ-ল শব্দ দেখাইয়া বলিতে চান, ঙ্গ স্থানে ঙ হইত। বিদ্যাপতিতেও দেখিতেছি

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈলে বাদ।
আঁচুরে ভা-ঙল ঘিনি অপরাধ॥

এই-সকল শব্দের ঙ্গ স্থানে ঙ হইয়াছে, সত্য। কিন্তু কি করিয়া হইয়াছে, তাহা চিন্তা না করিলে রহস্য জানা যাইবে না। আমরা ঙ্গ যেমন উচ্চারণ করি, বিদ্যাপতি ও অপর পদকর্ত্তাগণ কি তেমন করিতেন? যখন হাঁ না বলিতে পারি না, তখন ঙ অক্ষরের যে ধ্বনি পাইয়াছি, তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। ভা-ঙ্গ-ল যেন ভা-উঁ-গ-ল মনে করুন। অর্থাৎ ঙ ধ্বনিতে উঁ-অ আনিয়া ভা-ঙ্-গল বলা হইত। ঙ উচ্চারণে উঁ, ভা-ঙ শব্দে স্পষ্ট দেখিয়াছি। এইরূপ, শি-ঙ্গা যেন শি-উঁ-গা, শি-ঙ্গা-র যেন শি-উঁ-গা-র। তখন গ লোপ করিলে শি-ৱাঁ-র তুল্য হইবে। ছন্দও লক্ষ্য করুন,

নিত্যানন্দ প্রেমে মা-তো-য়া-র।
নিরখই পঙ্ক সরস শি-ঙা-র॥
=শি-উঁ-আর॥
=শি-ৱাঁ-র॥

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পি-ঙ-ল বসন বোধ হয় পি-য়-ল বসন হইবে। সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় (সন ১৩২৩) বাঙ্গালা শব্দকোষ সমালোচনায় সতীশ বাবু

পি-য়-ল বরণ বসন খানিতে
মুখানি আমার মুছে।

তুলিয়া লিখিয়াছেন, "নীলরতন বাবুর সংস্করণে 'পিয়ল' শব্দের স্থলে অশুদ্ধ ও অপ্রামাণিক 'পিঙ্গল' পাঠ গৃহীত হইয়াছে।" আমারও বোধ হয় সংস্কর্ত্তা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, নীলমাধব পীত-বসনধারী ছিলেন। নীলদেহে পীতবসনই মানায়। পিঙ্গলবর্ণে যে রক্তের আভা আছে। (পানের পি-ক পি-ঙ্গ-ল)। সং পী-ত-ল—পী-অ-ল—পি-য়-ল। পীতল, অর্থে পীত বর্ণ। তথাপি যদি পি-ঙ-ল পাঠ ধরি, তাহাতে এমন বুঝায় না ঙ=অঁ স্বীকৃত হইয়াছে। উঁঅ মনে করুন; পি-ৱঁ-ল পড়ুন; বোধ হয় কোথাও ঠেকিবে না। সতীশ বাবু বৈষ্ণব পদাবলীর প্রামাণিক পাঠক। তিনি গীতজ্ঞও বটেন। আমার অনুমান ঠিক কি না, তিনি সহজে ধরিতে পারিবেন।

আমি সিন্ধীভাষা জানি না। সে ভাষায় ঙ কিরূপ উচ্চারিত হয়, এবং সে উচ্চারণ সি-ঙু, অ-ঙ-সু, অ-ঙ-রু শব্দের বানানে আছে কি না, জানা চাই। তবে দেখিতেছি, তিনটি শব্দেই ঙ পরে উ আছে।

গত কার্ত্তিক মাসের আলোচনায় দেখাইয়াছি, ঙ আর উঁ, এই দুই অক্ষরের আকারে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। উভয়ের ত্রিভঙ্গ রূপ বা অধোগত কুণ্ডলী স্পষ্ট; উ অক্ষরের শিখা চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ঙ অক্ষরের মাথার পাগ। ঙ আর ং, এই দুই অক্ষরের সাদৃশ্য পাগে মাত্র। বলা বাহুল্য হসন্ত চিহ্ন ত্রিভঙ্গ নহে, আবশ্যকও নহে।

স্বীকার করি, আধুনিক বাঙ্গালায় হসন্ত ঙ উচ্চারণে, ং তুল্য। হয়ত পূর্বকালেও কাহারও কাহারও মুখে দুই অভিন্ন ছিল। অঙ্ক, অংক; সঙ্খ্যা, সংখ্যা; দ্বিরূপ পাইয়াছি। একালে অং-ক নাই বটে, কিন্তু সং-খ্যা সং-গ্রাম প্রচুর। অতএব বাং-লা পরিবর্ত্তে বা-ঙ্-লা লেখা চলে। কিন্তু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? শত শত শব্দ আছে, যাহার য জ, স শ ষ, ণ ন, ন ঞ পরিবর্ত্তন করিলে চলিতে পারে বটে, কিন্তু দ্বি-রূপ কোষ বাঞ্ছনীয় কি? পুরাতনে চলিলে এবং লাভ কিছু না দেখিলে নূতন কল্পনা দ্বারা ভাষায় অনর্থক জঞ্জাল বৃদ্ধি কেন? স্বরান্ত অনুস্বার আছে কি? অথচ বা-ঙা-লা, বা-ঙা-লী বানানও হাজির হইয়াছে, যেন বা-ং-লা, বা-ং-লী লেখা চলে! ঙ স্বরান্ত করিয়া লিখিতে হইলে চির-কালের প্রয়োগ-রক্ষা কর্ত্তব্য নহে কি? স-ঙ্গে হইতে স-ঙে হয় নাই, হইয়াছিল স-ঞে, এবং স-নে। তদনুসারে র-ঞে,

র-ক্রি-ন হইতে পারে। (প্রায়ই শ্ৰী-ন বানান দেখি। ঐ কি ধ্বনি-সংবাদী বানানের যুক্তিতে ?)

যদি বলেন, ঙ ঞ অক্ষরের দেশী উচ্চারণ মানিব না; পূর্বে ঙি ঙে ঙৃ ঙ্যা ঙু প্রভৃতি আবশ্যক হয় নাই, এখন হইয়াছে; ইহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, বাস্তবিক আবশ্যক হইয়াছে কি ? বাঙ্গালা ভাষার শব্দে এমন কোন ধ্বনি পাইয়াছেন কি, যাহা বাঙ্গালা অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না ? এমন ধ্বনি নাই, এমন নহে; দেশ-ভেদে শিক্ষা-ভেদে ধ্বনির প্রভেদ হয়, ইহা প্রথমেই স্বীকার করিয়াছি। সেদিন বর্দ্ধমান কাটোয়া অঞ্চলের এক শিক্ষিত বন্ধু (নদীর) পা-ড় এমন করিয়া বলিতেছিলেন যে, পা-র, না পা-ড় বুঝিতে সময় লাগিয়াছিল। পা-র নহে, পা-ড় ও নহে, যেন পা-আ র (তু° পা-হা-ড়)। কিন্তু লিখিতে হইলে তিনি পা-ড় লিখিতেন, সন্দেহ নাই। পূর্ববঙ্গের গ্রাম্যজন ভা-ত নহে, বা-ত ও নহে, এমন এক ধ্বনি করে। সে ধ্বনি জানাইবার অক্ষর নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে রাঙ্গা যদি রা-গাঁ নয়, রা-আঁ ও নয়, তাহা হইলে জানাইবার অক্ষর নাই। অন্য কেহ হইলে বলিতাম, "আপনি ধরিতে পারেন নাই, হয়ত গ এর লেশ আছে, কিংবা নাই। যে রা-ঙা বানান শেখে নাই, তাহাকে ধ্বনিটা শোনাইবেন, কি বানান করে, দেখিবেন।" বোধ হয় সে ঠিক বানান করিতে পারিবে। আমরা এক এক সময় নূতন কিছু পাইলে মনে করি, যাহা খুজিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি।

একথা সত্য, যাবতীয় লোকের কণ্ঠস্বর লিখিয়া দেখাইবার অক্ষর-রূপ সঙ্কেত নাই। যদি রা-গাঁ নয়, রা-আঁ নয়, রাঁ-গাঁ নয়, রাঁ-আঁ নয়, অথচ এই-রকম কিছু ধ্বনি জানাইতে হয়, তাহা হইলে একটা নূতন অক্ষর করাইলে সব গোল চুকিয়া যায়। কেহ কেহ এ্যা, অ্যা, য়্যা, প্রভৃতির মায়া কাটাইতে পারেন না কেন, বুঝি না। বঙ্গদেশে বিজ্ঞ শিল্পীর অভাব নাই; আর, একটা অক্ষর করাইতে দুই পাঁচ শত টাকাও লাগে না। কিন্তু যদি রা-গাঁ র-গেঁ অনুনাসিকের অক্ষর আটকাইয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল তাঁহার এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনের কথা মানিব না। প্রবাসীর পাঠক বঙ্গের সর্ব্বত্র আছেন। তাঁহারা কোন্ জেলায় গ-এর লেশও উচ্চারণ করেন না, এক-এক পোষ্টকার্ড দ্বারা জানাইলে সত্য মিথ্যা ধরা পড়িবে। ইহার পর দেখা যাইবে, সে ধ্বনি ঙ দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারা যায় কি না। প্রশ্নটা এই, রা-ঙ্গা, রাঁ-গাঁ, রা-গাঁ, রাঁ-গা, রাঁ-আঁ, রা-আঁ, না রাঁ-আঁ ? ইহার পর তৃতীয় প্রশ্ন উঠিবে, কোন্ কোন্ শব্দের ঙ্গ স্থানে এই অজানা নূতন ধ্বনির দ্যোতক লিখিতে হইবে। এই প্রশ্ন পূর্বেও (গত চৈত্রের প্রবাসীতে) করিয়াছিলাম, কেহ উত্তর দিয়া অনুগৃহীত করেন নাই। (দেখিতেছি, দুর্বৃত্ত মুদ্রাকর এই খানে দৌরাত্ম্য করিয়াছে! আমি লিখিয়াছিলাম, "যেখানে ভাষায় ঙ্গ পাইব সেখানেই ঙ লিখিব" কি ? মুদ্রাকর ঙ্গটি কাটিয়া ঙ ছাপিয়াছে! ইহাকেই বলে, যেখানে সাপের ভয় সেইখানে সন্ধ্যা হয়।) আমি রেঢ়ো; আমি ঙ্গ স্পষ্ট শুনিতে পাই। শাস্ত্রীমহাশয় গৌড়ীয়; গৌড় দেশেও কি ঙ পরগাছা প্রবল হইয়াছে, আ-ঙি-না ডি-ঙা-ই-য়া ভা-ঙি-য়া ঙ্গ-বেচারার রস নি-ঙ-ড়া-ই-য়া খাইয়া ফেলিয়াছে ? শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় অথর্ববেদ ধরিয়া ব্রাত্যের স্তুতি করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, ঋষিই ব্রাত্যকে বড় করিয়াছিলেন। ঙ ব্রাত্যের ঋষি কে, জানি না। তিনি যিনিই হউন, তিনিই নমস্য, ব্রাত্য নহে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

[শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন আমি বলিয়াছি ঝা-ড়-ন, কা-ম-ড়া-না, আঁ-ক-ড়া-না শব্দের সং মূল নাই। তাঁহার পড়িতে ভুল হইয়াছে। কারণ, কোষে লিখিয়াছি সং ঝা-ট মার্জনে (মেঃ) হইতে ঝা-ড়-ন; সং ক-র-ল হইতে কা-ম-ড়, খা-ব-ল; সং আ-ক্রো-ড় কিংবা অ-ঙ্কী-কৃ-ত হইতে আঁ-কা-ড়া। আঁ-কা-ড়ে আকর্ষণ নহে, কোলে গ্রহণ ও ধারণ অর্থ স্পষ্ট।]

ডায়েরী

(গল্প)

৬ই চৈত্র। মিনিকে বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে গিয়ে ছেলেবেলাকার একটি বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। পূর্ণিয়ায় আমরা একসঙ্গে ইস্কুলে পড়েছি। ক্লাসের ছেলেরা তাকে টাট্টু, ক্যাপ্‌টেন প্রভৃতি অজস্র নাম ধরে ডাকত; ভালো নামটা আমার মনে পড়ল না। রবিবারে তাকে আস্‌তে বলে দিয়েছি।

৭ই চৈত্র। হাজার হোক্ মিনি আমার চেয়ে বছর সাতেকের ছোট, মায়ার কথা নিয়ে যখন-তখন যা তা মাকে গিয়ে বলা কি তার উচিত ? কিন্তু তার সঙ্গে আমি ত পেরে উঠব না! কাকেও সে বড় একটা ছেড়ে কথা কয় না, এক মাকে ছাড়া। আমি চোখ পাকালে হেসে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে, বলে "দোহাই তোমার, ঐটি কোরোনা; একেবারে মানায় না তোমাকে।"

বেশী আদর দিয়ে দিয়েই আমি তাকে নষ্ট করেছি।

৮ই চৈত্র। মায়ারা তবে সত্যিসত্যিই এতদিনে কলকাতায় ফিরে এসেচে। ধুবড়ি থেকে এই কয় দিন সে ক্রমাগত একথা আমায় লিখেছে। তারা আসবে শুনে মিনির এই ক'টা দিন যে কেমন ভাবে কেটেছে সে কেবল এক আমিই কিছু কিছু জানি! মায়ার সঙ্গে তার কিন্তু মোটেই ভাব নেই, তার ব্যস্ততা সবটুকুই সুবর্ণের জন্যে; ওকথা বল্লে কিন্তু সে রেগে অনর্থ বাধাবে।

এই সুবর্ণ মেয়েটিকে মায়ার মা শিশুকাল থেকে পুষেছেন। বাবা বেঁচে থাকতে তার সঙ্গে আমার একবার বিয়ের কথা হয়েছিল। মিনি সেই থেকে তাকে ভালোবেসে বসে আছে!

৯ই চৈত্র। মায়া সুবর্ণ এরা আজ এসেছিল। যাওয়ার

সময় মায়া আমায় ধরে পড়ে বল্লে, "জিনিষপত্র সব স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে, কিছু গুছিয়ে উঠ্‌তে পারিনি। আমি মাকে কিছুতেই হাত দিতে দেব না, সুবর্ণকেও না...তাহলে সব মাটি হবে। তুমি যদি গিয়ে আমায় সাহায্য কর তবেই আর কথা থাকে না। কালকেই একবার সময় করে যেয়ো।...মিনিকে নিয়ো না কিন্তু, তাহলে আড্ডা হবে, কাজ হবে না।"

কিন্তু যাই কি করে তাই ভাবচি। কাল রবিবার, টাটু যদি আমায় বাসায় না পেয়ে ফিরে যায় তবে বড় লজ্জার কথা হবে, এদিকে মিনি ঝগড়া বাধিয়ে বসে আছে। সে বলছে "আমায় সঙ্গে নিলে আড্ডা হবে, মায়া-দি অমন কথা বলতে গেল কেন? তাদের বাড়ী গেলেই আমি কি তার ছায়াখানি স্বেচ্ছায় মাড়াই?"—এই সব!

১০ই চৈত্র। টাটুর জন্যে বসে থেকে থেকে বিকেলটা কাবার করে সন্ধ্যার মুখে মায়াদের বাড়ী গিয়ে দেখি, সে বেশ নিশ্চিন্ত-মনে বসে মায়ার সঙ্গে ক্যারম্ খেলচে। আমাকে দেখেই সুবর্ণ সে-ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল; মায়া থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে, চেয়ারের একটা হাতা বাঁ-হাতে মুঠো করে চেপে ধরে আরেকটা হাতার ওপর বসে পড়ল। টাটু একটা ঘুঁটিকে বেশ করে লক্ষ্য করতে করতে বল্লে "চুপ সতীশ, কথা কোয়ো না; আমাদের এখন marginal contest; আগে খেলা শেষ হোক, তারপর তোমার কাছে মাপ চাইব।"

আমি তাকে-সুদ্ধ তার চেয়ারটাকে টেনে মায়ার কাছ-থেকে কয়েক হাত সরিয়ে নিয়ে এসে গল্প জুড়ে দিলুম। জিনিষপত্র গোছাতে মায়ার মোটেই আগ্রহ দেখা গেল না। টাটুর সঙ্গে গল্পগুজবে কিছুটা রাত কাটিয়ে আমি বিদায় নিয়ে উঠতেই মায়ার মা বল্লেন, "অনেকটা রাত হলো, এখানেই চারটি খেয়ে যাওনা সতীশ!" আমি বল্লুম "আমায় এখনি উঠতে হবে, তা ছাড়া—" এই 'তাছাড়া'টার মানে বাড়ী ফিরবার পথে নিজেই মনে মনে বুঝ্‌তে চেষ্টা করেছি। কি আজগুবি মানুষের এই মনটা!

১৪ই চৈত্র। ধুবড়ি থেকে ফিরেই মায়াও যেন একটু কেমন কেমন হয়ে পড়েছে। ওকে এমন বিমর্ষও কোনো-দিন দেখিনি! কী একটা কথা যেন পাথরের মতো তার মনটাকে চেপে বসে আছে; কোন্ দুটো বিরুদ্ধ জিনিষকে সে যেন ঠিক্-ঠিক্ মিলিয়ে দিতে পারচে না। আমি তাকে নিভৃতে ডেকে জিজ্ঞেস করলুম "তোমার মনটাতে একটা কিছু তুমি লুকোচ্চ; আমায় তা জানতে দেবে না মায়া?"

হাতখানি দিয়ে চোখদুটিকে আড়াল করে সে বল্লে, "আমায় কিছু জিজ্ঞেস কোরো না, কিচ্ছু না। এমনি লুকোচুরি করে আর কটা দিন আমার কাটুক।...কিন্তু ভেবোনা আমার কোনো অপরাধকে আমি লুকিয়ে বেড়াচ্ছি, অপরাধ যদি হোত তাহলে লুকোতেই হোত না, অপরাধ নয় বলেই লুকোই; ভয় হয়, অবিচার যার সইবে না, তাকে নিয়েই লোকে পাছে অবিচার করে!"

১৬ই চৈত্র। আজ নিজ থেকেই সে আমায় বল্লে, "আমি মাঝে মাঝে অবাক্ হয়ে ভাবি, পৃথিবীতে এক আমিই এমন সৃষ্টিছাড়া হয়ে জন্মালুম কেন?"

আমি কৌতূহলী হয়ে বল্লুম, "কি রকম?" সে বল্লে, "বাঁধা পথে আমি কিছুতেই চল্‌তে পারিনে।" আমি বল্লুম, "ওতে আমি কিছু দোষ দেখতে পাইনে। বরং বাঁধা-বাঁধিটাই কল্যাণের নয়। ওতে করে বর্ত্তমানের নাগপাশ দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎকে আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধি।"

সে উৎফুল্ল হয়ে উঠে বল্লে "ঠিক কথা। আমাদের মনের প্রেরণা আমাদের যে-পথে চলতে বলে, সেই পথে না চলে বাঁধাবাঁধির পথে আমরা যদি চল্‌তে যাই, তাহলে পৃথিবীকে আমরা হয়ত ফাঁকি দিতে পারব, ভগবান্‌কে পারব না।"

আমি বল্লুম "আমাদের পাপপুণ্যের একটা খতিয়ান্ তৈরি করে ত আর স্বর্গে নিয়ে যাওয়া চল্‌বে না; সেখানে কিছু যদি নেওয়া চলে তবে তা এই মনটা। যিনি বিচার করবেন, এইটেকেই তিনি দেখবেন।"

১৭ই চৈত্র। অনেকদিন থেকেই আমি লক্ষ্য করেছি, আমার সঙ্গে মায়ার আন্তরিকতাটা এক জায়গায় এসে বাধে। আজ কথায় কথায় সে বল্লে "ভালোবাসায় যখন উচ্ছ্বাস আসে তখন বুঝ্‌তে হবে মাদকতা এসে ঢুকেচে। এবং মদ জিনিসটা সব অবস্থাতেই ভয়ঙ্কর।" আমি বল্লুম "গতি যেখানে আছে, আবিলতা সেখানে থাকবেই!"

একথা নিয়ে আমার সঙ্গে সে ঝগড়া করলে। বাগানের পথে আমায় যখন সে বিদায় দিতে এল, হঠাৎ তার হাত-

দুটিকে চেপে ধরে আমি বল্লুম "আমরা মর্ত্তের মানুষ, অন্ততঃ এই হিসাবে আবিলতাটুকুকে এড়াতে যাওয়া আমাদের সহজ হয় না।"

সে বল্লে "পৃথিবীতে থাকতে হলে কেবল সহজকে নিয়ে কারবার চলে না।"

আমি তর্ক উঠিয়ে বল্লুম "তা যেন চলে না; কিন্তু আমাদের ভেতর স্বভাবতঃই rationality'র আবরণটা যেখানে ফাঁক পড়ে গেছে, সেখান থেকে কেন আমরা আমাদের চোখের দৃষ্টিকে—"

আমার হাতের মুঠো থেকে তার হাতখানিকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলে উঠল "তুমি এমন করে আমায় সর্ব্বনাশের পথে ডেকে এনোনা; তুমি জানো না, কতবড় বিরোধের মধ্যে দিয়ে আমার দিন কাটছে।"

এইসব হেঁয়ালি আমি মোটেই পছন্দ করিনে। এ রহস্য যেন আমারও জীবনের উৎসটার গলা টিপে ধরছে। এর অশুভ প্রভাবটা আমার স্নায়ুগুলোর ওপর আমি দিনের পর দিন পরিষ্কার অনুভব করতে পারছি।

১৯শে চৈত্র। মানুষকে যতই দোষ দেওয়া যাক্, এটা হয়ত ঠিক যে কেবল সুন্দর মুখ দেখেই সে ভোলে না; তার চিত্তের একটি নিভৃত কোণে কল্পনা, সুন্দর সুন্দর মুখশ্রীর পশ্চাতে, সেই অনুপাতে সুন্দর একখানি মনের আভাসকেই সৃষ্টি করে তোলে। মায়াকে প্রথম যে দিন দেখি সে দিন এমনি একটা রূপ নিয়ে সে আমার চোকে ধরা দিয়েছিল। কিন্তু কৌতূহলের স্বভাবই এই যে তার ত্বর্ সয় না। কী তার পাওয়ার গোড়ায় সেটা সে জানে না বলেই কোথাও স্থির হয়ে থাকা তার পুষিয়ে ওঠে না, সংশয় থেকে সংশয়ে না-হক্ খুঁজেপেতে বেড়ায়। তাই প্রথম পরিচয়ের দিনে তার যে রহস্যরূপ আমার মনের দৃষ্টিকে একাগ্র উৎসুক করে তুলেছিল, সেইটেই এত দিন ধরে জমে একটা কুয়াসার প্রাচীরের মত মাঝখানে এসে পড়ে আমাদের মিলনের পথখানিকে আজ একেবারে আড়াল করে বসেছে।

২৫শে চৈত্র। এই কদিন মায়াদের ওদিকে একেবারেই যাইনি। মিনি ইস্কুলের ফেরতা সুবর্ণকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। তার কাছ থেকে রবিবাবুর গান দুএকটা শিখে বিকালটা একরকম করে কাটে। কাল সুবর্ণ বাড়ী চলে গেলে মার বিছানার পাশটিতে চুপ করে এসে বসলুম। একথা-সেকথার পর মা বল্লেন "এই সুবর্ণ মেয়েটি যেখানেই যাক্, একটা আশীর্ব্বাদকে সে মাথায় করে নিয়ে যাবে।"

মিনি দূরে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে একটা সেলাইয়ের নমুনাকে তন্ন তন্ন করে দেখছিল, সুবর্ণের কথা উঠে পড়তেই আস্তে আস্তে আমার পাশটিতে ঘেঁসে বস্‌ল।

আমি বল্লুম "ও বুঝি কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে, নয় মা?"

মা ব্যথিত হয়ে উঠে বল্লেন "ছিঃ সতু, মানুষ কি কুড়িয়ে পাওয়ার জিনিষ? তাহলে তোদের যে আমি পেটে ধরেছি, তোদেরও কুড়িয়েই পেয়েছি ছাড়া আর কি?"

আমি বল্লুম "কুড়িয়ে পেলুম বলেই কি জিনিষটা তুচ্ছ হয়ে গেল মা? তাহলে সোনা কেউ কুড়িয়ে পেত না।"

একটুখানি হেসে, অত্যন্ত মৃদুস্বরে মা বল্লেন "সুবর্ণ সোনাই বটে।"

তার পর তাঁর আর সাড়া পেলুম না। তাঁর তন্দ্রাটুকুর ফাঁকে আমি নীচে নেমে এলুম। মায়ার যে কটি তুচ্ছ নিদর্শন এতদিন ধরে আমার ড্রয়ারটাতে জমে উঠেছিল, একটি একটি করে সেগুলোকে ধ্বংস করে একটা নিষ্ঠুর জয়ের গরিমা নিয়ে বাইরের মুক্ত আলোয় এসে দাঁড়ালুম।

চৈত্রসংক্রান্তি। সুবর্ণের সম্বন্ধে কোন কথা হলেই মিনি কান পেতে এসে শোনে। ওর মতো যাদের কেউ নেই, তারা সংসারে কী নিয়ে থাকে; একটু স্নেহের জন্যে সোহাগের জন্যে তাদের মনটা কেঁদে কেঁদে ওঠে কিনা এইসব প্রশ্ন দিয়ে মাকে নাকি সে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে!

কাল বায়োস্কোপে নিয়ে গিয়ে তার কানে কানে বল্লুম "সুবর্ণ তোমার বৌদি হলে তুমি খুব খুসী হও, না মিনি?"

তার কাছে জবাব পেলুম না। আমার ডান হাতখানিকে দুটি হাতে চেপে ধরে সে বসে রইল আমার মুখের দিকে আড় চোখে চেয়ে! বাড়ী এসে না খেয়ে, আলো না নিবিয়েই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম।...আজ মনে এত ব্যথা কেন?

হঠাৎ জেগে মাথা তুলে দেখি মিনি কখন্ এসে আমার

বুকের কাছটিতে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়েছে। চাঁদের আলো তার চোখের কোণের একফোঁটা অশ্রুর উপর পড়ে সেটাকে মুক্তোর মতো জল্‌জলে করে তুলেছে।

১লা বৈশাখ। এর পরও কেন আমি ভাব্‌ব আমার ভালোবাস্‌তে, আমার ভাব্‌তে কেউ নেই? আমি তো দরিদ্র হয়ে সংসারে আসিনি; কতজনের ভালোবাসাকে জন্মস্বত্বে আমি পেয়ে এসেচি, তারা আমার দোষত্রুটি-গুলোকে সুদ্ধ আমায় ভালোবেসেছে। আমার গৌরব, এত-জনের মনের মধ্যে আমি স্থান পেয়েছি, এতজন আমায় ভাবচে।—কতবড় এ অধিকার! এ অধিকারকে আমি অবজ্ঞা কর্‌ব না।

মাকে সুখী করা, মিনিকে সুখী করার কাছে সুবর্ণকে গ্রহণ করার মতো আত্মত্যাগ কত তুচ্ছ কথা! আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিনে এই শুভসংকল্প নিয়ে, সমস্ত দ্বিধা দুর্ব্বলতাকে আমি নিঃশেষ করে চুকিয়ে দি।

৫ই বৈশাখ। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুবর্ণকে একটা কিছু বলা খুব কঠিন হোত, এমনি লাজুক সে। কিন্তু আমি জানি আমাকে সে ভালোবাসে, তার চোখের দৃষ্টি থেকে তার মনের এই পরিচয় আমি গ্রহণ করেছি। তাই অনেক ভেবে মিনিকে দিয়ে আজ তাকে একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়েছি। লিখেছি:—"তুমি নাহলে মিনির চল্‌বে না, তোমার সহায়তা পেলে মার শেষজীবনে তাঁকে আমি সুখী কর্‌তে পার্‌ব। আমি জানি এখনি আমায় কিছু বল্‌তে তোমার বাধ্‌বে, কিন্তু একদিন তুমি আমায় বোলো। তোমার কাছ থেকে কী আমি আশা কর্‌ব, কতটুকু আশা কর্‌ব, তুমিই সেকথা একদিন আমায় জান্‌তে দিও। সে অবধি আমি অপেক্ষা কর্‌ব।"

মিনি চিঠিখানি নিয়ে নিঃশব্দে ইস্কুলে চলে গেল। তার মুখে একটুও হাসি দেখা গেল না যে! অদ্ভুত মেয়ে,—ওকে বুঝে ওঠা দায়!

২৯শে জ্যৈষ্ঠ। দুটি মাস ত কাটে! ডাকের চিঠিগুলোকে রোজ ব্যগ্রভাবে হাৎড়ে দেখি; সুবর্ণের কাছ থেকে আজও কোনো জবাব এল না তো! একটা মনগড়া আশ্বাসে ভুলিয়ে দিনগুলোকে ঠেলে ঠেলে এসেছি, এইবার তারা

আমার যেন একটু একটু করে হুঁস হচ্ছে! সুবর্ণ তো আর-সবারই মতো একজন মানুষ? সে তেমনি ধারা একটা জিনিষ নয়, নিজের দরকারে লাগাতে পার্‌লেই যাকে সব চেয়ে সার্থক করে দেওয়া হয়। তাকে পেতে হলেও দর কসাকষির হয়তো বা প্রয়োজন আছে। মুখের কথাটাই সেপক্ষে যথেষ্ট নাও হতে পারে।

এমন বলা নেই কওয়া নেই তাকে এমন ধরণের একটা চিঠি লিখে বসা কিছুতেই ঠিক হয়নি। সেই চিঠি পেয়ে সে নিজেই হয়তো মনে মনে হেসেছে, হয়ত আমাকে একটা অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া জীব বলে মনে করেছে।—নাঃ, আমি ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাব দেখ্‌চি। কী যে করি, তার আর ঠিক নেই!

৩১শে জ্যৈষ্ঠ। কাল সমস্ত রাত ভাবনাগুলো মাথায় নিয়ে লোফালুফি করেছি।—কেন আমি অধীর হচ্ছি? সুবর্ণের পক্ষে চুপ করে থাকাটাই ত স্বাভাবিক, আমায় চট্‌পট্ কিছু বল্‌তে আসাটাই তার পক্ষে অশোভন হোত!

৩রা আষাঢ়। মার বার্দ্ধক্যের প্রসঙ্গ তুলে আজ তাঁর কাছে সুবর্ণের কথা পাড়লুম। তিনি মুখটিকে কালো করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। মিনিও কয়েকটা দিন ধরে স্তব্ধ হয়েই আছে। এরা সকলে জুটে আমায় ক্ষেপিয়ে দিতে যুক্তি এঁটেছে।

আমি হয়ত একটা মস্ত বড় ভুল করেছি এমনি একটা আবছায়া গোছের ভয় আমাকে পেয়ে বসেছে। মা আর মিনির মধ্যেকার এই দুটো বিরুদ্ধ জিনিষের কোথাও কি সমাধান নেই? তাঁদের সুখী কর্‌তেই না আমি সুবর্ণকে গ্রহণ কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছিলুম? আজ তাকে একেবারে নিজের করে পাওয়ার প্রলোভন তাঁদের একটুও টলাতে পার্‌ছে না কেন?

৬ই আষাঢ়। যাক্, মাকে আজ তবু কতকটা বোঝা গেল। আমায় তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে তিনি বলেছেন "সুবর্ণের মতো মেয়ে পাওয়া খুব ভাগ্যের কথা, এমন মেয়ে হয় না; কিন্তু আমরা নিজের দিক্‌টাই দেখব, ভালো মেয়েটিই দেব কেবল এ হলে ত চলে না,—আরেকটা জিনিষ যে খুব বেশী করেই দেখবার আছে। মিনির শক্ত দোষ

ত্রুটি থাকলেই তুই কি তাকে ফেলতে পারিস্? মায়াকেও যে সেই হিসাবেই আমরা পর করে দিতে পারিনে সতু!"

মোদ্দা, মার কথায় এটা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছে তিনি আমার কথাটাই কেবল ভেবেছেন, আর কারোটা নয়।—মা যে!

৭ই আষাঢ়। আজ মনে দুঃসহ ব্যথা। জীবনের সমস্যা আজ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেচে—যেখানে ভুলে থাকা ছাড়া তাকে এড়াবার আর অন্য উপায় নেই।

এ দ্বন্দ্বের থেকে কি মুক্তি নেই, এই ভালোবাসার সঙ্গে অভিমানের দ্বন্দ্ব থেকে, এই হৃদয়ের সঙ্গে আত্মতৃপ্তির দ্বন্দ্ব থেকে? কোথায় সেই দেশ যেথানে কোনো দ্বিধা নেই কোনো সংশয় নেই, যেখানে মায়াও নেই সুবর্ণও নেই,—কোথায়?

মনটাকে এতদিন ধরে কেবলি ফাঁকি দিয়ে আমি ভুলিয়ে এসেছি। মায়ার সঙ্গে একটা দুস্তর ব্যবধানকে সৃষ্টি করেও এই ক'দিন কম্পাসের কাঁটার মতো তারি চারিদিকে আমি ঘুরে মরেছি। এড়িয়ে চলে মনে করেছি জয় করলুম, কিন্তু এড়িয়ে চলার সম্পর্ক যে মস্ত সম্পর্ক! তার সামনে বুক ফুলিয়ে গিয়ে যে দাঁড়াতে পারিনি, এতে করেই তো তার প্রভাবকে মেনে নেওয়া হয়েছে। আজ বুঝতে পারছি, ভুলব মনে করে মনের সেই গভীরতার জায়গাটিতে তাকে রেখে দিয়েছি, যেথানে আমার নিজের দৃষ্টিটিও সহজে গিয়ে পৌঁছায় না।

৮ই আষাঢ়। মায়া, আমার মায়া! আগুনের শিখার মতো দীপ্ত তার রূপখানির ওপর ছোট কোঁকড়া চুলের গোছাগুলি ধোঁয়ার মতো কালো। সে যখন চলে জয়-পতাকার মতো সেগুলো দুলে দুলে ওঠে। এত অল্পেতেই সে আপন হতে পারে আবার এত অল্পেতেই সে নিজেকে পর করে দেয়। যার মতো আপন ত্রিসংসারে কেউ ছিল না, আজ সে পর।—এত পর, যে, তাকে ভাববার অধিকার-টুকু পর্য্যন্ত আমার আজ নেই! কিন্তু দোষ তো আমারই! কোন্ অপরাধে মায়ার এ শাস্তি? কী সে করেছে যার জন্যে আমি তাঁর সকল স্নেহের দাবীকে তুচ্ছ করে তাঁরই সিংহাসনে আরেক জনকে জোর্ করে এনে বসিয়ে দিয়েছি?

১১ই আষাঢ়। মায়াদের বাড়ীতে কাল আমাদের সকলকার নিমন্ত্রণ ছিল। বিকেলে চারটার কাছাকাছি মা মিনিকে সঙ্গে করে চলে গেলেন, আমি অসুখের অছিলা করে বাড়ীতে রইলুম। ঘরে আলো নেই, অন্ধকারে হাতড়ে পড়তে পড়তে টেলিফোঁতে এসে বসলুম, তারপর সেন্ট্রাল ডেকে মায়াদের নম্বর বলে বসে বসে ঘামতে লাগলুম! খট্ করে শব্দ হোল, ঐ তার আওয়াজ "আমি মায়া কথা কইচি, মায়া মিত্র। কে আপনি......কে আপনি......কে আপনি?"

আমার হাত থেকে কাঁপতে কাঁপতে রিসিভারটা খসে পড়ে গেল। মনে হোল ইহলোকে পরলোকে যতখানি ব্যবধান, মায়াতে আমাতে ব্যবধান আজ যেন ততখানিই। ততখানি দূর থেকেই তার অশরীরী আওয়াজটুকু যেন আমার কানে এসে বাজছে!

১২ই আষাঢ়। মিনি ভোরে উঠেই ইসারা করে আমায় ছাতে ডেকে নিয়ে গেল, বল্লে "কাল মায়া-দির সঙ্গে অনেক-ক্ষণ কথা হোল। সে তোমাকে একটুও ভুলতে পারেনি, পারবেও না।...তুমি এখন কি করবে?"

আমি বিব্রত হয়ে চুপ করে রইলুম। আবার সে বল্লে "মায়াদির ওপর এ তুমি কিসের শোধ তুলছ দাদা?"

শোধ! মায়ার ওপর শোধ! কিন্তু একথা তো-অস্বীকার করবারও উপায় নেই। বল্লুম "সুবর্ণকে না হলে তোর যে চলবেনা মিনি, তাকে যে ভালোবাসিস তুই!"

শক্ত করে হাতের মুঠো বেঁধে মিনি বল্লে "তাকে ভালো-বাসি বলেই তার সুখটা আমার খুব বেশী করে ভাববার। তাকে কিছুতেই আমাদের বৌদি করা হবে না।"

আমি অবাক্ হয়ে বল্লুম্ "আমি যে তাকে কথা দিয়ে ফেলেছি, বলেছি আজীবন তার জন্যে অপেক্ষা করব?"

সে বল্লে "এ সত্ত্বেও তাকে ত্যাগ করার চেয়ে তাকে গ্রহণ করাটাই ঢের বেশী অন্যায় হয় বলে আমি মনে করি। নিজে তার কাছ থেকে যা পাবে আশী করে তাকে কথা দিয়েছ তার প্রতিদানে তাকে কতটুকু দিতে তুমি প্রস্তুত হয়েছ শুনি?"

গ্রামোফোনের মতো অসাড় গলায় আমি বল্লুম "তবু—"

সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল "তুমি সেই চিঠির কথা

ভাব্‌চ? সে চিঠি তার হাতে পড়তে পায়নি। এখনো আমার হাতবাক্সে সেটা বন্ধ করা রয়েছে।" তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে যেন নিজের মনেই সে বলে যেতে লাগল "আজন্ম যে ভালোবাসা কাকে বলে জান্‌লে না, সুখের আস্বাদ পেলে না, তার জীবনটাকে এমন ভাবে তুমি ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছিলে! তুমি কখনো সত্য করে তাকে ভালোবাসনি, কক্‌খনো না। আমাদের সুখী কর্‌বার জন্যে তুমি তাকে গ্রহণ কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছিলে, তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পায় তার অমন অমূল্য জীবনটাকে তুমি বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলে, মনে করেছিলে নিজেদের তৃপ্তির জন্যে তার সমস্ত জীবনের সুখকে আমরা তুচ্ছ কর্‌ব; আশ্চর্য্য বিবেচনা তোমার!"

আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা কইলুম না। মনের বিক্ষোভটা একটু কাটলে আস্তে আস্তে তার কাঁধে হাত রেখে ডাকলুম "মিনি!" কিন্তু সে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। অলক্ষ্যের মধ্যে স্থির নিবদ্ধ তার দৃষ্টিখানির ওপর একটা অস্পষ্ট অশ্রুর আভাস, আর কি একটা গভীর বেদনার ছায়া তারই মধ্যে স্ফুটতর হয়ে ফুটে উঠেছে!

দুষ্টু মিনি, সৃষ্টিছাড়া মিনি!

১৩ই আষাঢ়। আজ যেদিকে চোখ যায় কেবলি অশ্রু। আমার অশ্রু, মিনির অশ্রু, মায়ার অশ্রু, সুবর্ণের অশ্রু। এতদিনকার রুদ্ধ অশ্রু আজ হঠাৎ পথ পেয়ে অসংযত হয়ে উঠেছে, সমস্ত পৃথিবী তাতে ডুবেছে, আছে কেবল কান্না আর কান্না!

১৫ই আষাঢ়। কাল মায়ার কাছে গিয়ে তার দুটি হাত ধরে মাপ চাইব মনে করেছি। আমার কাছে যার যা পাওনার তা সুদসুদ্ধ মিটিয়ে দিয়ে আমি খালাস। কে হাসলে, কে কাঁদলে, সে খোঁজে আমার কাজ কি?

২০শে আষাঢ়। মিনি কাল সমস্ত দিন মায়াদের ওখানে ছিল। সকালে মাও ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে একবার গিয়েছিলেন। এই আষাঢ় মাসেই মায়াকে বিয়ে করে আমি হয়ত নূতন করে সংসার পাতব। মায়ার আগ্রহে তাড়াতাড়ি হচ্ছে। সব কাজেই সে ঐ-রকম ব্যস্তবাগীশ।

কিন্তু এই তাড়াতাড়িটা আমার কেমন যেন ভালো লাগছে না। একটা জিনিষকে একবারে নিজের করে পেলেই বুকে যেন সে জোর আর পাওয়া যায় না। যেখানে বিরোধ সেই খানেই ত মাধুর্য্য! সবার সঙ্গে বনিবনাও করে ভিক্ষালব্ধ অন্ন আহার কর্‌বার চেয়ে, লুটেপুটে রোজকার করে খাওয়াটাই যে বেশী আরামের!

২২শে আষাঢ়। সকলে হয়ত মনে কর্‌ছে তাড়াতাড়িটা আমারই জন্যে হচ্ছে। ধুব্‌ড়ি থেকে বিয়ের খবর পেয়ে কাল মায়ার দিদি এসেছেন। আজ আমায় ডেকে তিনি বল্লেন "তোমাকে আর মায়াকে একসঙ্গে দেখ্‌ব এর চেয়ে আকাঙ্ক্ষার আমাদের কিছু নেই। কিন্তু তোমাদের দুজনের মধ্যে একটা কোথাও অমিল্‌ একটুখানি আছেই। খোলাখুলি ভাবে তোমরা মিশ্‌তে পারনি, লোকে এটাও লক্ষ্য করেছে। এ অবস্থায় আরও কিছুদিন সময় নিয়ে তোমাদের মাঝখান্‌কার জটিলতাটুকু, দুর্বোধ্যতাটুকু মিটিয়ে নেওয়া কি তোমার ভালো বলে মনে হয় না?"

মায়াকে ঐ কথা বল্‌তে সে মিনতি করে বল্লে "দিদির কথা তুমি একটুও কানে নিয়ো না। একটা কিছু দায়িত্বের মাঝে পড়লেই, এই-রকম দোল খাওয়া তাঁর স্বভাব। চারিদিকে মনগড়া সংশয় দেখে, বিভীষিকা দেখে অকারণে তিনি ভয়ে আঁৎকে ওঠেন।"

২৩শে আষাঢ়। বিকেলের দিকে মিনিকে সঙ্গে করে মায়া এসে উপস্থিত। একেবারে আমার পড়বার ঘরে এসে সে বল্লে "আমি জান্‌তে এলুম, দিদির কথায় তুমি কিছু মনে করেছ কি না...এখন যদি না হয়, তবে হয়ত আর হয়েই উঠবে না। বল, তুমি দেরী কর্‌বে না; যে ব্যবধানকে এত চেষ্টায় আমরা ভেঙে দিতে পেরেছি আবার নিজ হাতে তাকে গড়ে তুল্‌বে না তুমি?"

আমি বল্লুম "আমায় এ অনুরোধ কর্‌বার প্রয়োজন আছে মনে করেছিলে, তাই বলে তুমি নিজে কেন এলে মায়া?"

লজ্জায় মুখটিকে নীচু করে সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে গেল।

২৫শে আষাঢ়। মা মায়াকে আজ আশীর্ব্বাদ করে এসেছেন। আটাশে আমাদের বিয়ে। এত শীগ্‌গির!

২৭শে আষাঢ়। এই বেশ হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে... উঃ আর কোনো দিন কি বাইরের মুক্ত আলোয় সবার

মাঝখানে...সকলে আমার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কানাকানি করছে, আমার লজ্জা লুকোবার ঠাঁই কোথায় ?

আর এ কী রহস্যের আবর্ত্ত ? কিন্তু এ ত নূতন নয়...এ রহস্যের সঙ্গে আমার পরিচয় তো বহু দিনকার...তবু কেন আমি তাকে পুরোপুরি বুঝতে চাইনি, তার মিনতিটাই আমার কাছে বড় হলো কেন, তাকে ভালো করে না বুঝে-শুনেই কেন আমি—

১লা শ্রাবণ। এমনি এক বাদল দিনে তার সঙ্গে আমার প্রথম জানাশোনা। মা আর মিনিকে এগ্‌জিবিশন দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলুম। হঠাৎ ঝর্ ঝর্ করে বৃষ্টি নামল। বারান্দা থেকে ছুটোছুটি করে আমরা যে-ঘরে ছিলুম সেই ঘরে তারা এসে ঢুকল। মা মিনিকে চোখ টিপে চাপা গলায় বলে উঠলেন "সুবর্ণ!"। আমি মায়াকে দেখলুম, মনে করলুম সে-ই বুঝি সুবর্ণ। তার পর পরিচয় হলো, এ সত্ত্বেও আমার সুবর্ণ হয়ে রইল সে-ই।

৩রা শ্রাবণ। মায়ার মা আজ এসেছিলেন। মা ক্ষোভে লজ্জায় তাঁর সঙ্গে কথা বন্ধ করেছেন। আমায় এসে তিনি বল্লেন "তোমরা বিশ্বাস করো আমাকে, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানিনে সতীশ। ধুব্‌ড়ী থেকে আমার বড় মেয়ে এসেছিল, হঠাৎ তাকেও কিছু না বলে-কয়ে তার সঙ্গে সে ধুব্‌ড়ি চলে গেছে। কী মনে করে গেছে, কিছু জানিনে। বড় মেয়েই বা তার এই পাগলামোকে প্রশ্রয় দিলে কেন, তাও জানিনে।"

লোকে ত আমার কাছেই জান্‌তে চাইবে, জানাটা ত আমারই দরকার ছিল!

৫ই শ্রাবণ। মায়া আজ ধুব্‌ড়ি থেকে চিঠি লিখেছে। লিখেছে :—আমি তোমার কতদূর লজ্জা এবং ক্ষোভের কারণ হয়েছি, তা মনে করে আমার অনুতাপের সীমা নেই। কিন্তু সব কথা শুন্‌লে তুমি নিশ্চয় আমায় ক্ষমা করবে এই ভরসায় তোমায় এই চিঠিখানা লিখছি।

প্রথমেই আমার বলা উচিত হচ্ছে, সব দোষ আমারই, আমার এ পাগলামোতে দিদির কিছু হাত ছিল না ; কেবল তাঁর মনটা খুব কাঁচা বলে আমার ব্যথার পরিমাণটা তাঁকে স্পর্শ করেছিল।

আমি এর আগে যেবার এখানে আসি, সেইবার দিদিই টাটুর সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিয়েছিলেন। তারই কিছুদিন পরে একদিন হঠাৎ আমার মনে হলো জীবনের এক অশুভ মুহূর্ত্ত থেকে তোমাদের দুজনকেই একসঙ্গে এক সমানভাবে আমি ভালোবাস্‌ছি। প্রথমটা খুব ভয় হলো; ভাবলুম আমার পাপের বুঝি তুলনা নেই। কিন্তু আমার মন সে কথা মান্‌লে না। সে তর্ক উঠিয়ে বল্লে, "এ দুটো ভালোবাসাই তো নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক ; আলাদা করে দেখলে তাদের মধ্যে কোনো খুঁৎই তো চোখে পড়ে না, এ অবস্থায়ও একত্র হলেই বুঝি তাদের যত দোষ ?" কিন্তু এ-সব কথা আমি ভালো বুঝিনে বলেই তোমাদের মধ্যে একজনকে ভুলতে উঠে-পড়ে লাগলুম। ভাবতে চেষ্টা করলুম তুমি যেন আমায় জয় করে নিয়ে যেতে এসেছ, তোমাকে অমান্য করার শক্তি যেন আমার নেই। দুহাতে সব বাধাবিঘ্ন সরিয়ে স্বপ্নাহতের মতো অগ্রসর হতে লাগ্‌লুম —এরই মধ্যে দিদি এসে উপস্থিত হলেন, আমার সমস্ত মনটাকে কেবল তিনিই ছবিটির মতো স্পষ্ট দেখতে পেলেন। প্রথমটা তাঁরও বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করলুম, শেষে হঠাৎ একটি মুহূর্ত্তে সার্থকতার কাছাকাছি এসে আমার এতদিনকার সাধনার ইমারত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধূলার ওপর ধ্বসে পড়ল! বুঝলুম—টাটুকে আমি ভুলতে পারিনি।

আমার এ পাপকে তুমি ক্ষমা কোরো না, কিন্তু বুঝতে চেষ্টা কোরো, কত অসহায় হয়ে, কত নিরুপায় হয়ে তোমায় মনে আমি কষ্ট দিয়ে চলে এসেছি ; লোকের চোখে তোমায় হাস্যাস্পদ করে রেখে এসেছি! যা করে ফেলেছি তার তো আর চারা নেই ? এ অবস্থায়ও আসল কথা লুকিয়ে তোমাকে যদি আমি বিয়ে করতুম তবে আমার সে কপটতা তুমি সইতে, না ধর্ম্মে সইত ?

আর একটি কথা। আমায় ভালোবাসিতে বলেই লিখছি, আমার মুখের দিকে চেয়ে আমার স্মৃতিটাকে তোমার মন থেকে তুমি দূর করে দিয়ো। যদি দেখি আমারই জন্যে তোমার জীবনটা ব্যর্থ হচ্ছে, তবে আমি হয়তো—

থাক, সে-কথা বলে লাভ নেই। আমি জানি তুমি আমার ওপর নিষ্ঠুর হবে না। এই বিদায় আমাদের চির-বিদায় হোক্।—মায়া।

৭ই শ্রাবণ। বিদায়, চিরবিদায়! তার প্রতি আমি নিষ্ঠুর হব না, তাকে মনে করে রাখব না, আজ থেকে এই

আমার সঙ্কল্প হোক্, ব্রত হোক্; তার এই শেষ অনুরোধটুকু!

একবার মনে করেছিলুম লিখব "আমাকে যা দেওয়ার দিয়েও অন্যকে যদি কিছু দিতে পার, তাতে আমার তো কিছু ক্ষতি নেই। তুমি এসো, পরিপূর্ণ ভাবেই তোমায় আমি গ্রহণ করব, তোমার সঙ্গে কোনো বিরোধ রাখব না।"

কিন্তু তার ওপর কেবল ত আমার একলার অধিকার নয়; তাই আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমার আর কিছু ভাব্‌বার নেই।

১২ই আশ্বিন। আমার পরিবর্ত্তনের একটা জোয়ার এসেছে। পুরোণো খোলস্‌টা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একটা নূতন জীবনের সূচনা করেছি।

কোনো ক্ষোভ আছে কি না? না, আমার কোনো ক্ষোভ নেই। যাদের হারিয়েছি, তাদের কাছে আমি অপরাধী হইনি এই আমার সান্ত্বনা। সংসারের সুখদুঃখের ঢেউ, তার ভালোমন্দের হাওয়া আমার এই নিস্তব্ধ ঘরটিতে এসে আজ আর লাগে না। কেবল যখন মনটা উদাস হয়ে ওঠে, ডায়েরীটার একটা পুরোণো পাতা খুলে মন্ত্রের মতো জপ করি—

'কতজনের ভালোবাসাকে জন্মস্বত্বে আমি পেয়ে এসেছি, কত বড় এ অধিকার—! এ অধিকারকে আমি অবজ্ঞা কর্‌ব না...অবজ্ঞা করব না...অবজ্ঞা কর্‌ব না।'

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

কাব্যে বস্তুবিচার

যে-সকল কাব্য-রসিকেরা কাব্যের রস ও আনন্দকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া কাব্যের মধ্যে লাভের বস্তুর সন্ধান করেন, গত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীর এক ছবিতে তাহাদিগকে সুন্দর ভাবে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। Di-electricকে Electroscope বা বিদ্যুৎমান হইতে পৃথক করিলে তাহাতে যেমন বিদ্যুৎ-প্রবাহের লক্ষণ পাওয়া যায় না, কাব্যের প্রত্যেক অংশকে পৃথক করিয়া দেখিলেও তেমনি রসের উপলব্ধি হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন—শৈশবে মরা মানুষ দেখিয়া তাঁহার চিত্তবিকার হইত না। কিন্তু সমগ্র দেহ হইতে বিযুক্ত একখানা হাত দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। কাব্যের সজীব আশ্রয় হইতে পৃথক করিয়া কোন জিনিসের মূল্য নিরূপণ, একটা কাটা হাতের শারীরবিদ্যাগত বিশ্লেষণের ন্যায়। কবিতার ঐ ভাবে মূল্য সন্ধান করিতে গেলে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কথায় তাহার হত্যা সাধন করা হয়—"We murder to dissect"; রস-সাহিত্যের বাস্তব মূল্য বিচার "Botanisation over mother's grave." যাহা mechanical mixture তাহারি উপাদান পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে মিশ্রণটি বুঝার অসুবিধা হয় না—কিন্তু যাহা chemical compound তাহার উপাদানগুলিকে পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে মিশ্রণটিকে বুঝা হয় না—কারণ এই-প্রকার মিশ্র পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের শক্তি-সমষ্টি হইতে সম্পূর্ণ একটি পৃথক শক্তি ও ধর্ম্ম ধারণ করে, তাহা শুধু সমষ্টিতেই বর্ত্তমান থাকে। কবিতারও তাই— যাহা-কিছু সৌন্দর্য্য তাহা উহার শব্দ এবং শব্দচিত্রাবলীর সমবায়েই। বিশ্লেষণ করিয়া সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে যে যাইবে সে হতভাগ্য সেই রসোপভোগে বঞ্চিত হইবে।

যাঁহারা কবিতার রসসৃষ্টির মধ্যে নীতি ও বাস্তবলাভ প্রত্যাশা করেন অথবা Paradise Lost গ্রন্থ কোন্ বিষয় প্রতিপাদন করিতেছে জানিতে উদ্‌গ্রীব, তাঁহাদিগকে টেনিসনের কয়েক পংক্তি কবিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি—"

So Lady Flora, take my lay,
    And if you find no moral there,
Go look in any glass and say
    What moral is in being fair.
Oh, to what uses shall we put
    The wild weed flower that simply blows ?
And is there any moral shut
    Within the bosom of the rose ?
But any man that walks the mead
    In bud or blade or bloom, may find
According as his humours lead
    A meaning suited to his mind.
And liberal applications lie
    In Art, like Nature, dearest friend ;
So 't were to cramp its use, if I
    Should hook it to some useful end.

সুন্দরী কুসুমরাণী, মম গীতি লহ,
খুঁজে নাহি পাও যদি উদ্দেশ্য তাহায়,
দাঁড়ায়ে দর্পণ পাশে কহ দেবি কহ
কোন্ নীতিবস্তু আছে রূপের প্রভায়!

নামহীন বনফুল কোন্ প্রয়োজনে
লাগিবে, যাহারা শুধু আত্মানন্দে ফুটে,
কোন্ সে নৈতিক লক্ষ্য রয়েছে গোপনে
অবরুদ্ধ গোলাপের মর্ম্মকোষপুটে!
ভ্রমি নদীতটে মাঠে কাননে যখন
হেরি মোরা পুষ্প শষ্প তরু গুল্ম লতা,
অনুসরি মতিগতি আপন আপন
ভিন্ন ভিন্ন তাহাদের বুঝি সার্থকতা।
বড়ই উদার সখি রসের বিচার
নিসর্গ সৌন্দর্য্যে, শিল্পে—একই তার রীতি,
করিনিক খর্ব্ব আমি লক্ষ্য কবিতার
জুড়ে দিয়ে কোনো এক কার্য্যকরী নীতি।

ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্য্য উপভোগ সম্বন্ধে ইংরেজ কবিগণ যাহা বলিয়াছেন কাব্যের রসবোধ সম্বন্ধে সেই কথাই বলা যায়। ইন্দ্রধনু দর্শনে ক্যাম্বেল বলিয়াছেন—

* * *

* A mid-way station given
For happy spirits to alight
Betwixt the earth and heaven.
Can all that optics teach, unfold
Thy form to please me so
As when I dreamt of gems and gold
Hid in thy radiant bow?

(ভাবানুবাদ)

* * স্বর্গে মর্ত্তে রঙীন সেতু,
ধরণীর পরে দেবতাগণের
রচিত গমনাগমন-হেতু।
তোমার মাঝারে হেম রতনের
স্বপন হেরি যে উন্মাদনা
জগতের শত দৃগ্‌বিজ্ঞানে
দিতে পারে তার একটি কণা!

এই চির মনোহর ইন্দ্রধনু যে আনন্দ দান করে তাহা দর্শনে ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিম্নলিখিত পংক্তিনিচয়ে বলিয়াছেন—

"My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky.
So was it when my life began,
So it is now I am a man,
So be it when I shall grow old,
Or let me die."

(ভাবানুবাদ)

হৃদয় আমার নেচে উঠে, যবে
শোভে রামধনু গগনে উদি',
তা'র উপাদান বিচারের তরে
ভাবিনিক কভু নেত্র রুধি।
কিবা শিশু যুবা কিবা এ প্রবীণ
একই ভাব আমি পুষি চিরদিন,
এ ভাবের মোর অভাব ঘটিলে
তার আগে যেন নয়ন মুদি।

এই রমণীয় সৌন্দর্য্যানুভূতিকেই কবি জীবনের সার কাম্য মনে করিতেন, তাই বলিয়াছিলেন ইহার অভাব হইলে যেন আর বাঁচিয়া থাকিতে হয় না। এই রমণীয় সৌন্দর্য্য-রাশিকে যাঁহারা যথেষ্ট লাভ মনে না করিয়া ইহার মধ্যে বস্তুনিচয়ের সন্ধান করেন তাঁহাদের কাণ্ড দেখিয়া কবি কীট্‌স্ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

"Newton had destroyed all the property of the rainbow by reducing it to prismatic colours."

আর বলিয়াছেন—

"Do not all charms fly
At the mere touch of cold philosophy?
There was an awful rainbow once in heaven.
We know her woof, her texture; she is given
In the dull catalogue of common things.
Philosophy will clip an angel's wings,
Conquer all mysteries by rule and line,
Empty the haunted air, and gnomed mine,
Unweave a rainbow."

(ভাবানুবাদ)

নিষ্ঠুর বিজ্ঞানতত্ত্ব-পরশন লভি
মিলাইছে একে একে বিশ্ব হ'তে মাধুরীর ছবি।
গগনে আছিল রামধনু
জানিতাম কি মোহন উপাদানে গড়া তা'র তনু।
আজি তাহা রাজে
অবজ্ঞাত সাধারণ-বস্তুপুঞ্জ-তালিকার মাঝে।
বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ কাঁচিখানি
ছেঁটে দিবে পাখাগুলি দেবদূতগণে টেনে আনি।
বিজ্ঞানের বিধান নিদেশ
সকল রহস্য স্বপ্নে করিছে নিঃশেষ।
ধরণীর কোষাগার খুলি
রত্নবেদী ভগ্ন করি মণিমুক্তা করি চূর্ণ ধূলি
নিখিল জীবনময় বায়ু ব্যোমে শূন্য করে' তুলি
বিশ্লেষিছে হায়
আখণ্ডল-ধনুখানি খণ্ড খণ্ড তুচ্ছ ক্ষুদ্রতায়।

কবিতাকে যাঁহারা এই ভাবে বিচার করেন চতুরাননের নিকট "ইতর তাপ-শতানি"র বিনিময়েও তাঁহাদের হস্ত হইতে নিস্তার প্রার্থনা করি।

শ্রীকালিদাস রায়।

দোরোখা একাদশী

(শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত আষাঢ়ের প্রবাসীর মুখপাত দেখিয়া)

উড়িয়ে লুচি আড়াই দিস্তে দেড় কুড়ি আম সহ
একাদশীর বিধানদাতা করেন একাদশী,
মুখরোচক এঁর উপবাস,—দমেও ভারি,—অহো!—
পুণ্য ততই বাড়ে যতই এলান্ ভুঁড়ির কশি।
ওদিকে ওই ক্ষীণ মেয়েটি নিত্য একাহারী
একাদশীর বিধান পালন করছে প্রাণে ম'রে,
কণ্ঠাতে প্রাণ ধুঁক্‌ছে, চোখে সর্ষে-ফুলের সারি
তৃষ্ণাতে জিভ্ অসাড়, মালা জপ্‌ছে ঠাকুর-ঘরে।
অবাক চোখে বিশ্ব দ্যাখে হায় গো বিশ্বনাথ,
দোরোখা এই বিধান পরে হয় না বজ্রপাত?

নিষ্ঠাবানের সধবাও করেন একাদশী
পতির পাতে প্রচুরভাবে 'আট্‌কে' বেঁধে রেখে,
আওটা-দুধে চুমুক লাগান্ পিছন ফিরে বসি
পাঁতিদাতা পতিগুরু পাছে ফেলেন দেখে।
বিড়াল চাটে দুধের বাটি বাড়িয়ে দিয়ে গলা
পিঁপ্‌ড়ে মাছি আমের খোলায় উল্লাসে ভিড় করে,
শাস্ত্র যাদের ভয় দেখিয়ে করিয়েছে নির্জ্জলা
তারাই শুধু হাতের চেটো মেল্‌ছে মেঝের পরে।
তৃষ্ণাতে জিভ্ টান্‌ছে পেটে, এম্‌নি রোদের তাত্,
খস্‌খসে দুই চোখের পাতা হয়না অশ্রুপাত।

ফোঁটায় ফোঁটায় শিবের মাথায় ঝারায় যে জল ঝরে
সতৃষ্ণ চোখ সারা বেলা দেখ্‌ছে শুধু তাই,
কাকটা কখন গুটিগুটি ঢুকে ঠাকুর-ঘরে
অর্ঘ্যপাত্রে মুখ দে' গেল,—একটুও হুঁশ নাই!
চক্ষু দিয়ে প্রাণ-পাখী হায় মেল্‌ছে বুঝি পাখা,
ভির্মি গেছে—ভির্মি গেছে—জল কে দেবে মুখে?
কারো সাড়া নেইকো কোথাও মিথ্যে হাঁকাডাকা
একাদশীর বিধান-দাতার গর্জ্জে নাসা সুখে।
অধোমুখে বিশ্ব দ্যাখে, হায় গো বিশ্বনাথ,
পাষাণ পরে অশ্রু ঝরে' পড়ে দিবসরাত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

স্মৃতির সৌরভ

ছয়ের পরিচ্ছেদ।

পরদিন সকালে যখন মার্থা গরম জলের পাত্র হাতে করিয়া আসিয়া টিনার গাঢ় ঘুম ভাঙাইয়া দিল, তখন রোদে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে, বাতাসের বেগও অনেক কম। তাহার চোখদুটি তখনো ব্যথা করিতেছিল, শরীরও শ্রান্ত, কিন্তু তবু যেন গতরাত্রের সমস্ত বেদনা কেমন মিথ্যা স্বপ্নের মতন মনে হইতেছিল। সে উঠিয়া পড়িয়া কেমন যেন হতবুদ্ধির মতন কোনো-প্রকারে কাপড়চোপড় পরিতে আরম্ভ করিল। তাহার মনে হইতেছিল আর যেন কোনো কষ্টই তাহাকে কাঁদাইতে পারিবে না। এমন কি নীচে লোকজনের মাঝখানেও তাহার ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। মানুষের সংস্পর্শে তাহার এই জড়তাটা তাহা হইলে হয়ত কাটিয়া যাইতে পারে।

রাত্রিতে আমরা যে-সকল অপরাধ করি, যত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিই, ভোরের বেলার স্বর্গীয় আলো চোখে পড়িতেই রাত্রের সে-সব কাজ আমাদের লজ্জায় লাল করিয়া তোলে; সূর্য্যকিরণ সোনার পাখা মেলিয়া দেবদূতের মতন আমাদের পিছনের আত্মন্তরিতার নিরানন্দ পথ ছাড়াইয়া নূতন পথে লইয়া আসে। টিনা কাহারো নীতি-সূত্র কি ধর্ম্মমত কিছুই যদিও জানিত না, তবু কি-জানি কেন সকালে উঠিয়া তাহার মনটা খারাপ হইয়া গেল; মনে হইতেছিল কাল যেন সে বড় বোকামি করিয়াছে, কি একটা অপরাধও করিয়াছে। আজ সে ভাল হইতে চেষ্টা করিবে; আজ সকালে প্রার্থনা করিতে বসিয়া সে সেই দশবৎসর বয়স হইতে যে প্রার্থনা করিতে শিখিয়াছে, তাহাই করিল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে এইটুকু জুড়িয়া দিল, "হে ভগবান্, এ বেদনা সহ্য করতে তুমিই আমার সহায় হোয়ো।"

সে দিন সে প্রার্থনার ফলও যেন পাইল! খাইবার সময় তাহার চেহারা সম্বন্ধে দুই-একটা কথা শুনিবার পর বাকি সকালটা বেশ ধীরভাবেই কাটিয়াছিল। কাপ্তেন উইব্রো ও মিস্ আশার ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে গিয়া

ছিলেন। সন্ধ্যায় সে দিন ভোজ ; টিনা দুই-একটা গান করিবার পরেই, লেডি শেভারেল শরীর ভাল নয় বলিয়া, তাহাকে ঘুমাইতে পাঠাইয়া দিলেন। সেদিন ঘুমটাও, হইল বেশ। আনন্দ কি বেদনা যাহাই ভাগ্যে থাকুক, ভোগ করিবার জন্য শরীর মনে শক্তিটা তাজা করিয়া তোলা দরকার।

পরদিন সকাল হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ, সবাই আজ বাড়ী থাকিবে। তাই স্যর ক্রিষ্টফার বলিলেন, আজ সারা বাড়ী ঘুরিয়া অতিথিদের বাড়ীর নূতন নক্সার গল্প, পারিবারিক পুরানো ছবি ও স্মৃতিচিহ্নগুলির ইতিহাস বলা হইবে। যখন প্রস্তাব করা হইল, তখন ড্রয়িংরুমে মিঃ গিল্‌ফিল্‌ ছাড়া আর সকলেই ছিলেন। মিস্ আশার যাইবার জন্য উঠিয়া কাপ্তেন উইব্রোর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ইচ্ছায় তাহার দিকে তাকাইলেন। আশা ছিল দেখিলেই তিনিও উঠিবেন। তিনি কিন্তু একখানা খবরের কাগজ হাতে করিয়া তাহার দিকে চোখ নামাইয়া আগুনের ধারে চুপটি করিয়া বসিয়া রহিলেন।

মিস্ আশারের উৎসুকদৃষ্টি দেখিয়া লেডি শেভারেল বলিলেন, "অ্যান্টনি, তুমি আসছ না?"

উঠিয়া দরজাটা খুলিয়া দিয়া অ্যান্টনি বলিল, "আমায় যদি মাপ কর, তবে আজ আর যাব না, সকাল বেলাই কেমন একটু সর্দ্দি-সর্দ্দি লাগ্‌ছে, ঘরগুলো সঁ্যাৎস্যেতে, হাওয়াটাও ঠাণ্ডা, কেমন ভয় করছে যেতে।"

মিস্ আশারের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল ; কিন্তু তিনি মুখে কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। লেডি আশারও বাহির হইয়া পড়িলেন।

টিনা তখন সেলাই হাতে জানালার ধারে বসিয়া। এই প্রথম তাহারা দুজনে নির্জ্জনে একত্র হইল ; টিনা ভাবিত অ্যান্টনি বুঝি তাহাকে এড়াইয়া চলে। কিন্তু এখন যে সে তাহাকেই কিছু বলিতে চায়, সে ত স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। নিশ্চয়ই আজ সে মমতা দেখাইয়া দুটো সমবেদনার কথা বলিবে। অ্যান্টনি উঠিয়া আসিয়া তাহার পাশে একটা আসনে বসিল,

"হ্যাঁ, টিনা, এতদিন ছিলে কেমন?" কথাগুলাও যেমন, গলার স্বরও তেমনি। কথা শুনিয়াই টিনার অপমান বোধ হইতেছিল। গলার স্বরের সঙ্গে আগেকার স্বরের আকাশ-পাতাল প্রভেদ ; কথাগুলি কেমন যেন ভাসা-ভাসা, তাহার ত কোনো অর্থই হয় না। সে একটু ঝাঁঝাল সুরে উত্তর দিল,

"তা' তুমি না জিগেস কল্লেও চল্‌ত বোধ হয়। তাতে ত আর তোমার কিছু যায় আসে না।"

"এতদিন ধরে এই মিষ্টি কথাটি বুঝি আমার জন্যে জমিয়ে রেখেছিলে?"

"আমার কাছে তোমার মিষ্টি কথা শোনবার বিশেষ দরকার আছে বলে ত বোধ হচ্ছে না।"

কাপ্তেন উইব্রো চুপ। অতীতের কথার জের তুলিবার তাহার মোটেই ইচ্ছা নাই, বর্ত্তমান সম্বন্ধেও কোনো মন্তব্যকে তাহার বিশেষ ভয়। অথচ তাহার ইচ্ছাটা যে টিনার সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহারই করে। তাহাকে একটু আদর দেখাইতে, কিছু উপহার দিতে ও নিজের সম্বন্ধে তাহার মনটাকে খুসী করিয়া তুলিতেই তাহার ইচ্ছা। কিন্তু মেয়ে জাতটাই কেমন যেন একরোখা! তাহাদের কোনো জিনিষ বিচার করিয়া বুঝাইয়া দেখায় কাহার সাধ্য! খানিক পরে অ্যান্টনি বলিল, "টিনা, আমি মনে করেছিলাম, আমার ব্যবহারে তুমি বরং আমায় ভালই বল্‌বে, তা না তুমি এই-রকম রেগে চটে বসে আছ। আমি আশা করেছিলাম তুমি বুঝবে যে সকলের ভাল ভেবে দেখ্‌তে গেলে এই-রকম করাটাই মঙ্গল। তোমার সুখের পক্ষেও এটা মঙ্গলজনক।"

টিনা বলিল, "দোহাই তোমার, আমার সুখের জন্য মিস আশারকে অত ভালবাসা দেখিও না।"

সেই মুহূর্ত্তেই ঘরের দরজাটা খুলিয়া মিস্ আশার আসিয়া ঢুকিলেন। বাজনার উপর তাঁহার ছোট থলিটা ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন লইয়া যাইতে হইবে। তিনি টিনার আরক্ত মুখের দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া কাপ্তেন উইব্রোকে ঠাট্টার সুরে, এই বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, "আশ্চর্য্য বটে ; ঠাণ্ডা লেগেছে বলে জানলার ধারে এসে বসেছ।"

অ্যান্টনিকে বিশেষ অপ্রস্তুত হইতে দেখা গেল না। সেই খানেই আরো কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া সে উঠিয়া

টিনার কাছে একটা টুল টানিয়া লইয়া বসিল। তাহার পর টিনার হাত ধরিয়া বলিল, "টিনা, আমার দিকে একটু সদয়দৃষ্টি দাও; এস বন্ধুর মতো ঝগড়া-ঝাঁটি সব মিটিয়ে ফেলি। আমি চিরকালই তোমার বন্ধু থাকব।"

টিনা হাতখানা টানিয়া লইয়া বলিল, "ধন্যবাদ! তোমার অসীম দয়া; কিন্তু এখন দয়া করে এখান থেকে সরে যাও। মিস্ আশার হয়ত আবার এখুনি আস্‌বেন।"

টিনার কাছে বসিয়া অ্যাণ্টনির পুরানো মোহটা যেন ফিরিয়া আসিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, "মিস্ আশার চুলোয় যাক্ গিয়ে।" সে হাত দিয়া টিনার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া মুখ নীচু করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু টিনা এক ঝট্‌কা দিয়া তাহার বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া ঘরের বাহিরে ছুটিয়া চলিয়া গেল। তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, চোখে জল টল্ টল্ করিয়া উঠিতেছিল।

সাতের পরিচ্ছেদ।

কয়লার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হইয়া আসিলে লোকে যেমন মৃত্যুর ভয়ে অর্দ্ধ অচেতন অবস্থাতেই প্রবল চেষ্টায় নিজেকে টানিয়া আনিয়া মুক্ত বাতাসের মধ্যে ফেলে, টিনা তেমনি করিয়া অ্যাণ্টনির নিকট হইতে আপনাকে টানিয়া আনিয়াছিল। সে যখন ঘরে পৌঁছিল তখনও পুনরুজ্জীবিত পুরানো প্রণয়ের নেশা তাহার কাটে নাই; তাহার প্রেমাস্পদের এই আকস্মিক প্রেমাভিনয়ে সে এত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল যে আনন্দ ও বেদনার দ্বন্দ্বে কে জয়ী হইয়াছে তাহা সে বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেছিল না। কি একটা যাদুস্পর্শে যেন তাহার মনোরাজ্যটা তোলপাড় করিয়া দিয়াছে—ভবিষ্যৎটা কেমন যেন ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে, শীতকালের প্রখর রুদ্র আলোকে যেমন বেদনাময় সত্যের মূর্ত্তি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া থাকে, তাহা আর নাই, এ যেন ভোরের বেলার কুয়াসার আলো, কেবল সম্ভাবনার মৃদু আভাস দিতেছে।

নিজেকে বেশ নাড়া দিয়া জাগাইয়া তুলিবার জন্য তাহার শরীরটাকে চঞ্চল করিয়া তোলা দরকার। বৃষ্টি বিষয় এই, যে, আকাশের ঘন মেঘের পর্দ্দাটা এক জায়গায় যেন ফাঁক হইয়া আসিতেছিল, সম্ভবতঃ দুপুরের মধ্যে পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে। টিনা মনে মনে ভাবিল, "মিঃ বেটসের জন্যে যে গলাবন্ধটা করেছি সেইটা নিয়ে মস্‌ল্যাণ্ডে যাওয়া যাক, তাহ'লে আর বাহিরে যাওয়াটা লেডি শেভারেলের চোখে ঠেকবে না।" হলঘরের দরজার কাছে মাদুরের উপর রিউপার্ট ডালকুত্তাটা বসিয়া ভাবিতেছিল—আজ যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি প্রথম ঘরের বাহির হইবে তাহাকেই সে উৎসাহ দিয়া ও সঙ্গদান করিয়া ধন্য করিবে। টিনাকে দেখিয়াই তাহার হাতের তলায় কালো-হল্‌দে-মেশানো মস্ত মাথাটা গুঁজিয়া, মহা উৎসাহে লেজ নাড়িয়া সে অস্থির। শেষে আনন্দের আতিশয্যে একলাফ দিয়া টিনার মুখ চাটিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল; টিনার মুখ চাটিতে অবশ্য খুব বেশী উঁচু হওয়ার দরকার হয় না। কুকুরটার বন্ধুত্বে তাহার মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতেছিল। পশুদের বন্ধুত্বে শুধুই আনন্দ, তাহারা কোনো প্রশ্নও করে না, সমালোচনাও করে না।

"মস্‌ল্যাণ্ডস্" ময়দানের এক টেরে; ডোবা হইতে ছোট একটা জলধারা বাহির হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল; এমন বাদ্‌লার দিনে বেড়াইবার পক্ষে এর চেয়ে খারাপ জায়গা বোধ হয় আর জুটিত না; বৃষ্টি তখনি কমিয়া আসিতেছিল এবং একটু পরেই থামিয়া গেল বটে, কিন্তু প্রায় সমস্ত পথটার দুই ধারেই গাছের সারি দুই-দিক হইতে ডাল মেলিয়া পথের উপর জল বর্ষণ করিতেছিল। এই ভিজে রাস্তার উপর দিয়া ছাতা হাতে করিয়া অতি কষ্টে চলিতে চলিতে যদিও টিনার হাতপা ব্যথা হইয়া উঠিল, তবু যে পাগল-করা উত্তেজনার হাত হইতে সে মুক্তি চাহিতেছিল, এই শারীরিক পরিশ্রম ও কষ্টই তাহা জুটাইয়া দিল। মিঃ গিলফিলকে মাঝে মাঝে যখন বিষাদ ও হিংসায় পাইয়া বসিত তখন তিনি সারাদিন শিকার করিয়া শ্রান্ত হইয়া তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন; টিনার ক্ষুদ্র শরীরের পক্ষে এইটুকু পরিশ্রমই তাঁহার শিকারের সমান। প্রকৃতির নির্দ্দোষ আফিং শ্রান্তিতেই

"মস্ল্যাণ্ডসে" যাইতে হইলে জলচর ছাড়া সকল জীবকেই একটি ছোট্ট সুন্দর খিলান-করা কাঠের সাঁকো পার হইতে হইত। টিনা যখন সেখানে পৌছিল, সূর্য্য তখন মেঘের উপর জয়লাভ করিয়া মালীর কুঁড়ের চারি-ধারের লম্বা এল্ম্-গাছগুলির ডালের ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্র ছড়াইতে ব্যস্ত; আলোর স্পর্শে জলবিন্দুগুলি হীরা হইয়া হাসিতেছিল; দেওয়াল ও ছাদের গায়ের লতার ভিতর দিয়া আলোর ডাকে আগুন-বরণ ফুলগুলি আবার মাথা তুলিতেছিল। দাঁড়কাকগুলা নানারকম গলায় একঘেয়ে সুরে কা কা জুড়িয়া দিয়াছিল; তাহারাও যেন সে দিন মানুষের বুদ্ধির একটু ধার পাইয়াছিল, তাই বোধ হয় ঋতু পরিবর্ত্তনের বিষয়ে কথা বলিবার সুযোগটা ছাড়িতে পারিল না। চারিধারে শ্যাওলা ও তাহার মাঝে-মাঝে জোলো আগাছা দেখিয়াই বোঝা যায় যে মিঃ বেট্সের নিভৃত বাসাটি খুব শুক্নো দিনেও বেশ স্যাঁৎসোতে থাকে। তবে তাহার মতে শরীরের ভিতরটা গরম রাখিবার ঔষধ জানিলে বাহিরের সামান্য একটু ঠাণ্ডায় কিছু বিশেষ ক্ষতি হয় না।

এই কুটীরটি টিনার বড় প্রিয়। কাকদের ভেঙাইয়া কচিগলায় কা কা করিতে-করিতে ভিজা ঘাসের মধ্যে ব্যাঙের লাফানি দেখিয়া ছোট হাত দুখানিতে তালি দিতে-দিতে টিনা যখন মিঃ বেট্সের কোলে চড়িয়া আসিয়া মালীর হাঁসমুরগীগুলোর ডাক শুনিয়া বিস্ময়ে বড় বড় চোখ দুটি মেলিয়া থাকিত, সেই সময় হইতেই এখানকার প্রতি-শব্দ প্রতি-দ্রব্য তাহার পরিচিত। আজ তাহার চোখে ইহারা যেমন সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে তেমন আর কোনো দিন হয় নাই। মিস্ আশারের এলাকার বাহিরে এ জায়গাটি। তাঁহার ভুবনমোহন রূপ, সভ্য-ভব্য মতামত কিছুরই প্রভাব এখানে নাই। টিনা মনে করিয়াছিল মিঃ বেট্স্ এখনই খাইতে আসিবে না, তাহার অপেক্ষায় সে ততক্ষণ বসিয়া থাকিবে।

টিনার ধারণাটা কিন্তু ঠিক হয় নাই। আরাম-কুর্সিটার মধ্যে মুখে একখানা রুমাল চাপা দিয়া মিঃ বেট্স্ পড়িয়া ছিল; ঝড়বৃষ্টির দিনে মানুষের বাহিরে যাইবার উপায় থাকে না, কাজেই সকাল সন্ধ্যার খাওয়ার মাঝখানের অতটা বাজে সময় কাটাইবার এইটাই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া তাহার বোধ হইয়াছিল। শিকলে বাঁধা কুকুরটার ভীষণ চীৎকারে জাগিয়া উঠিয়া সে দেখিল, তাহার স্নেহপুত্তলি টিনা আসিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া নীচু কুঁড়ের চালে প্রায় মাথা ঠুকিয়াই সে দরজার কাছে অভ্যর্থনা করিতে ছুটিয়া আসিল। কুকুরটা তখন রিউপার্টের সঙ্গে ভাব করিতে ব্যস্ত।

মিঃ বেট্সের চুলে এখন পাক ধরিয়াছে, কিন্তু শরীরটা এখনো বেশ শক্ত আছে। গলায় জড়ানো রুমালের পাশে লাল মুখখানা আরো লাল দেখাইতেছিল, কোমরে একখানা নীল কাপড় জড়ানো থাকাতে চেহারায় বেশ একটা রঙের বাহার খুলিয়াছিল।

মিঃ বেট্স্ চীৎকার করিয়া বলিল, "ও হরি! এ যে টিনি-মণি, এমন দিনে তুমি কোথেকে? কাদার ভেতর হাঁসের মতো ছপ্ ছপ্ করতে করতে বেশ ভিজছ! তা' যা'হোক তোমায় দেখে যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে তা' আর কি বলব। ওরে ও হেস্টার, টিনার ছাতাটা নিয়ে মেলে দিয়ে আয়।" বুড়ী কুঁজো ঝি আসিয়া ছাতাটা লইয়া গেল। মিঃ বেট্স্ আবার বলিল, "এস, এস, টিনিমণি, ঘরে এসে আগুনের ধারে বসে পা-টাগুলো গরম করে নাও, শেষে আবার ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে, একটু গরম কিছু খাও।"

মিঃ বেট্স্ পথ দেখাইয়া দরজাগুলার কাছে মাথা হেঁট করিয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। বসিবার ঘরের আরাম-কুর্সির উপরের নানা রঙের তালি জোড়া গদিটা ঝাড়া দিয়া কুর্সিটা সুদ্ধ জ্বলন্ত আগুনের কাছে সরাইয়া দিল। সেখানে বসিলে বেশ মানুষ পোড়া হওয়া যায়।

টিনা বলিল, "ধন্যবাদ বেট্স্ কাকা; আগুনের অত কাছে চেয়ারটা দিও না, হেঁটে-হেঁটেই বেশ গরম হয়ে উঠেছি।" টিনা ছেলেবেলার কাকা জ্যাঠা ডাক এখনো ছাড়ে নাই।

বেট্স্ বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তা' তো হয়েছে, কিন্তু জুতো জোড়া যে ভিজে তপ্ তপ্ করছে, পা দুখানা এগিয়ে দাও খাসা মস্ত মস্ত পা যা হো'ক তোমার, না? যেন এক জোড়া চামচে। তুমি যে ওই পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াও কি করে তাই আমি ভেবে পাই না। হ্যাঁ, এখন শরীরটা গরম করবার জন্যে কি খাবে বলো ত।"

"না, না, তোমায় অনেক ধন্যবাদ, আমার কিছু চাই না। এই ত খেয়ে এলাম।" এই বলিয়া টিনা পকেটের ভিতর হইতে গলাবন্ধটা টানিয়া বাহির করিল। তখনকার দিনে পকেটগুলো খুব মস্ত-মস্তই হইত। "এই দেখ, বেট্‌স্ কাকা, তোমাকে এইটা দিতে এসেছি। তোমার জন্যই বিশেষ করে এটা করেছি। তুমি শীতকালে এইটা পরবে কিন্তু ঠিক ; লালটা ব্রুক্‌স বুড়োকে দিয়ে দিও।"

"বাঃ বাঃ, টিনিমণি, এ যে রূপের ফোয়ারা একেবারে। তুমি কি না আমার মতো একটা বুড়োর জন্যে তোমার ছোট্ট ছোট্ট আঙুলগুলি দিয়ে এত করে এটা কল্লে। টিনি মায়ের আমার কত দয়া! পরব বৈ কি, আমি নিশ্চয় পরব। বুক ফুলিয়ে পরে বেড়াব। শাদা আর নীল ডোরাগুলি দিয়ে এর যা' রূপ খুলেছে ; চমৎকার!"

"হ্যাঁ, তোমার রঙে লালটার চেয়ে এটা ঢের বেশী মানাবে। নূতনটা পরলে মিসেস্ শার্প একেবারে তোমায় দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে, আমি ঠিক জানি।"

"দূর বাঁদর মেয়ে ; আমার আবার রং। ঠাট্টা কচ্ছ বুঝি? হ্যাঁ, রং যদি বলতে হয় ত ওই কনের রং বটে! গাল দুটি যেন গোলাপ-ফুল। ঘোড়ার পিঠে ওকে যা দেখায়! তীরের মতো খাড়া হয়ে বসে যেন ছাঁচে ঢালা মূর্ত্তি! মিসেস্ শার্প বলেছে, বাড়ীর মেয়েরা যখন খেতে নামবে তখন আমাকে দরজার আড়ালে লুকিয়ে রাখবে, তা' হ'লেই কনের সাজগোজ রূপ সব দেখ্‌তে পাব। সে বলছিল, গিন্নি বয়সকালে যেমন ছিলেন, এ বউ বোধ হয় তার চেয়েও সুন্দর হবে। গাঁয়ের কাছাকাছি কোনো মেয়েই ওর কাছে লাগে না।"

সকলের উপরেই মিস্ আশারের যে একটা ছাপ পড়িয়াছে তাহা দেখিয়া টিনার আবার নিজেকে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে লাগিল ; সে ক্ষীণ স্বরে বলিল, "হ্যাঁ, মিস্ আশার সত্যি খুব সুন্দর দেখতে।"

"মেয়েও বোধ হয় বেশ ভাল হ'বে। কর্ত্তাগিন্নির মনের মতন উপযুক্ত বউই হবে। কনের ঝি বলছিল মেয়ে বড় রাগী আর কাপড়-চোপড়ের একটু কিছু দোষ হলেই খিট্‌খিট করে। তা' ছেলেমানুষ ; ছেলেমানুষ ত' অমন করেই থাকে। বড় হ'লে স্বামীপুত্তুর হ'লে তাদের ভাবনা নিয়ে যখন থাকবে, তখন ওটুকু সেরে যাবে। স্যর ক্রিষ্টফার ত বেশ খুসীই হয়েছেন দেখি। সেদিন সকালে আমায় বলছিলেন, 'কি বেট্‌স্, তোমাদের যে নূতন গিন্নি হচ্ছেন, তাঁকে কেমন লাগছে।' আমি বল্লাম, 'আজ্ঞে, মহারাজ, অমন চমৎকার মেয়ে আমি জন্মে দেখিনি। কাপ্তেন সাহেব সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার করুন। আপনি বেঁচে থাকুন, দেখে কত আনন্দ পাবেন।' মিঃ ওয়ারেন বলছিল, কর্ত্তা শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিয়েটা সেরে ফেল্‌তে চান ; শরৎকালটা কাটবার আগেই বোধ হয় হ'য়ে যাবে।"

মিঃ বেট্‌স্ যখন এই রকম বক্‌বক্ করিয়া চলিয়াছিল, টিনার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা তখন কেমন-যেন যন্ত্রণায় সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয় হয়ে যাবে। স্যর ক্রিষ্টফার বড় ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। যাক, আমি তবে আজ আসি, বেট্‌স্ কাকা ; এতক্ষণ হয়ত লেডি শেভারেল আমায় খুঁজছেন ; তোমারও ত খাবার সময় হয়ে এল।"

"না, না, আমার খাবার সময়ের জন্যে কোনো ভাবনা নেই, তবে গিন্নিমার যদি দরকার থাকে তবে আর তোমায় কি করে ধরে রাখি। গলাবন্ধটার জন্যে তোমায় যতখানি ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, তার অর্দ্ধেক'ও ত দেওয়া হয়নি। সত্যি, এটা ভারি চমৎকার হয়েছে। কিন্তু টিনি, আজ তোমায় অমন ফ্যাকাশে মনমরা মতন দেখাচ্ছে কেন বলো ত? তোমার শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই। ভিজে ভিজে এমন করে বেড়ানো ত তোমার শরীরের পক্ষে ভাল নয়।"

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া রান্নাঘরের মেজের উপর হইতে ছাতাটা তুলিয়া লইয়া টিনা বলিল, "না, ভালই হয়েছে। এইবার সত্যি যাই ; বিদায়।"

টিনা কুকুরটাকে ডাকিয়া লইয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল। মালী তাহার দিকে চাহিয়া দুই পকেটে হাত দিয়া বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল,

"আজকাল যেন মেয়েটা আরো কেমন শুকিয়ে উঠ্‌ছে। আমার বাগানের "সাইক্লামেন" ফুলের মতোই হয়ত ও ঝরে যাবে। একে দেখলেই ফুলগুলির কথা কেমন যেন আপনা-আপনিই মনে জেগে ওঠে। শাদা-শাদা

কোমল ফুলগুলি ছোট্ট সরু বোঁটার আগায় ঝুলে আছে, ঠিক টিনারই মতো।”

বেচারী টিনা আবার আপন পথে ফিরিয়া চলিল; অন্তরের উত্তেজনা ডুবাইবার জন্য বাহিরের ঠাণ্ডা জোলো বাতাসের প্রতি আর তাহার টান নাই। তাহার আড়ষ্ট শীতার্ত্ত হৃদয় বাহিরের বাতাসে আরো ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। ভিজে-ডালপালার ভিতর দিয়া সোনালি রৌদ্র তখন দেবতার প্রসন্ন মূর্ত্তির মতন হাসিতেছিল; পাখীগুলি মধুরকণ্ঠে শরতের আগমনী গাহিতেছিল; যেন পাখীর গলা, আকাশ, বাতাস সকলি বর্ষার বারিধারায় ধুইয়া মুছিয়া সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। এই আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের খেলার ভিতর দিয়া টিনা আপনার বেদনাই বহিয়া লইয়া যাইতেছিল। আহত শশক-শাবক যেমন কোমল তৃণ-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া কোনো-প্রকারে আপনার ছোট দেহখানি টানিয়া লইয়া যায়, সুস্বাদু তৃণের স্বাদ তাহার পক্ষে যেমন বৃথা, টিনার পক্ষে এ মাধুর্য্যও তেমনি বৃথা। মিঃ বেট্‌স্, স্যর ক্রিষ্টফারের আনন্দ, মিস আশারের সৌন্দর্য্য, ও তাহার বিবাহের কথা বলিয়া, টিনার তন্দ্রা ঘুচাইয়া দিয়াছে; নিষ্ঠুর আঘাতে তাহাকে জাগাইয়া অতিপরিচিত বাস্তবের কঠোর মূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। ভাবুক হৃদয়ের দশাই এই; হৃদয় যখন যে ভাবে ভরিয়া উঠে চিন্তাও তাহার অনুসরণ করে; মানুষের কথাই তাহাদের কাছে সত্য ঘটনা হইয়া উঠে; মিথ্যা হইলেও সে কথা তাহাদের ইচ্ছামত হাসায়, ইচ্ছামত কাঁদায়। টিনা আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল; যে হতাশা ও বেদনা লইয়া গিয়াছিল, তাহা ঘুচাইতে পারে নাই; নূতন একটা কষ্টই বরং বাড়াইয়া আনিয়াছে। অ্যাণ্টনি তাহাকে আজ আরো দুঃখ দিয়াছে। আজ সকালে সে টিনার সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করিয়াছে, তাহাকে অপমান ছাড়া কি বলা যায়। যখন সে অনুতাপের কথা, দুঃখের কথা শুনিতে চাহিয়াছিল, যখন সে সহানুভূতির আশায় ছিল, তখন অমন হাল্কাভাবে আদর দেখাইতে আসিয়া ত সে তাহাকে তাচ্ছিল্যই করিয়াছে। টিনার কোনো মর্য্যাদাই ত সে রাখে নাই।

আটের পরিচ্ছেদ।

সেদিন সন্ধ্যায় মিস্ আশারের ধরণধারণে গর্ব্ব যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। টিনাকে নেহাৎ উপেক্ষা করিয়াই চলিতেছিল। আজ একটা ঝড়-রকমের প্রলয়কাণ্ড না হইয়া যায় না। কাপ্তেন উইব্রো যেন কিছু দেখিয়াও দেখে নাই, ব্যাপারটাকে একেবারেই আমল না দিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য সে টিনার দিকে একটু অতিরিক্ত-রকম মনোযোগ দিতে লাগিল। মিঃ গিল্‌ফিল বলিয়া কহিয়া টিনাকে তাঁহার সঙ্গে খেলাইতে রাজি করিয়াছিলেন। লেডি আশার ও স্যর ক্রিষ্টফারও তাসখেলায় ব্যস্ত; মিস্ আশার আজ লেডি শেভারেলকে লইয়া গল্প জমাইতে বদ্ধপরিকর। অ্যাণ্টনিই কেবল একলা পড়িয়া। সে আস্তে-আস্তে টিনার কাছে গিয়া তাহার পিছনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া খেলা দেখিতে লাগিল। সকাল বেলার কথা তখনো টিনার মনটা জুড়িয়া বসিয়া; তাহার মুখখানা আগুন হইয়া উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে বলিয়া উঠিল, “তুমি এখান থেকে চলে যাও।”

সমস্ত ঘটনাটাই মিস্ আশারের চোখের উপর ঘটিল, টিনার আরক্ত মুখখানা সে দেখিতেই পাইতেছিল, পরে দেখিল টিনা অধীরভাবে কি একটা বলিয়া উঠিতেই অ্যাণ্টনি সরিয়া গেল। আর-একটি লোক এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি খুব মন দিয়া দেখিতেছিলেন। মিস্ আশারের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণও তাঁহার চোখ এড়াইতে পারে নাই। এই লোকটি মিঃ গিল্‌ফিল; এই ঘটনাটির ফলে যে কতখানি দুঃখের সৃষ্টি হইবে তাহা মনে করিয়া টিনার ভাবনায় তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

পরদিন সকালে ঝড়বৃষ্টির কোনো উৎপাতই ছিল না, আকাশটি বেশ ঝরঝরে পরিষ্কার; কিন্তু মিস্ আশারের সেদিন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে মন সরিল না। লেডি শেভারেল বুঝিলেন, প্রণয়ীযুগলের মধ্যে কিছু ঝগড়াঝাঁটি হইয়াছে। অগত্যা দুইজনকে কোনো ফিকিরে দুইজনকে নির্জ্জনে আনিয়া ফেলিয়া বিদায় লইলেন। মিস্ আশার আগুনের কাছে সোফায় বসিয়া কি-একটা সেলাই করিতে ব্যস্ত; আজ যেন তাঁহার সেলাইটা শেষ করিয়া না ফেলিলে

কিছুতেই চলিবে না। কাপ্তেন উইব্রো সামনেই বসিয়া, হাতে একখানা খবরের কাগজ। আপন মনে নিতান্ত সহজভাবে একটু একটু পড়িতেছেন; মিস্ আশার যে অবজ্ঞাভরে চুপ করিয়া আপনার পুঁথির কাজ লইয়া ব্যস্ত, তাহাতে তাঁহার খেয়ালই নাই। ইচ্ছা করিয়াই কাপ্তেন উইব্রো আজ উদাসীন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাগজখানা হাতে করিয়া রাখিয়া যখন আর সেখানা শেষ না হওয়ার ভান করা চলে না তখন বাধ্য হইয়াই সেখানা রাখিতে হইল। সেই সময় মিস আশার বলিয়া উঠিলেন,

"তোমার সঙ্গে মিস্ সার্টির বড় বেশী-রকম ভাব দেখা যাচ্ছে।"

"টিনার সঙ্গে? ও হাঁা, তা বটে। জানোই বোধ হয় ও চিরকালই বাড়ীর সকলের আদুরে। আমরা ত ঠিক ভাই বোনের মতোই মানুষ।"

"সাধারণতঃ ভাইরা কাছে এলে বোনদের মুখ লাল হয়ে ওঠে বলে ত শুনিনি।"

"লাল হয় নাকি? আমি ত কোনো দিন লক্ষ্য করিনি। কিন্তু ও বড় ভীরু মেয়ে।"

"কাপ্তেন উইব্রো, আপনি আর ভণ্ডামি না করলেই বোধ হয় ভাল হয়। আমি ঠিক জানি তোমাদের মধ্যে কিছু একটা আছে। মিস্ সার্টি কাল যে-রকম চটে-মটে তোমায় কথা শোনালে, তুমি কোনো বিশেষ অধিকার না দিলে কখন ওর অবস্থার মেয়ে তা সাহসই করত না।"

"আহা বিয়েট্রিস, একটু বুঝে-সুজে কথা বলো; আচ্ছা ভেবেই দেখ না, কি এমন কারণ থাকতে পারে যার জন্যে আমি বেচারী টিনার সঙ্গে অমন কিছু করতে যাব। ওর মধ্যে কি মানুষকে অমন ভাবে আকর্ষণ করবার মতন কিছু আছে? স্ত্রীলোক না বলে ওকে শিশু বল্লেই ত চলে। ছোট্ট মেয়েটির মতো একটু নিয়ে খেলা করা আদর দেওয়া ছাড়া ওর সম্বন্ধে ত লোক আর কিছু ভাবতেই পারে না।"

"অনুগ্রহ করে একটি কথা বলবেন কি? কাল যখন আমি হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়তেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল, হাত দুটো ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে উঠল, তখন আপনাদের

"কাল সকালে?—ও, মনে পড়েছে বটে। জান না আমি যে ওকে যখন-তখন গিলফিলের নাম করে ক্ষ্যাপাই; সে যে টিনা ছাড়া চোখে আর কিছু দেখেই না। টিনা বোধ হয় ওকে খুব পছন্দ করে, তাই ও-রকম জ্বালাতন করলেই চটে যায়। আমি এখানে আসবার অনেক বছর আগে থাকতেই ওরা দুটি খেলার সাথী ছিল; আর স্যর ক্রিষ্টফার তো ওদের বিয়ে দিতে স্থিরসঙ্কল্প।"

"কাপ্তেন উইব্রো, তুমি মোটেই খাঁটিলোক নও। কাল রাত্রে তুমি টিনার চেয়ারে ঠেস দেওয়াতে সে যখন লাল হয়ে উঠল তার সঙ্গে ত এর কোনো সম্পর্ক নেই। তোমার নিজের মন যদি ঠিক না হয়ে থাকে, তবে দয়া করে নিজের উপর অত্যাচার কোরো না। মিস সার্টির আকর্ষণের শ্রেষ্ঠতার কাছে আমি হার মানতে রাজি আছি। আমার দিক থেকে আমি তোমায় সম্পূর্ণ মুক্তি দিচ্ছি। যে লোক প্রতারণা করতে পারে তার উপর আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, তার ভালবাসার সামান্য ভাগও আমি চাই না।"

এই বলিয়া মিস আশার উঠিয়া দাঁড়াইল। গর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই কাপ্তেন উইব্রো তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাতখানা ধরিয়া ফেলিল।

"বিয়েট্রিস লক্ষীটি, একটু ধীর হও। অমন রাগের মাথায় আমার বিচার কোরো না। আর একবারটি বোসো, মণি।" এই বলিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া অ্যান্টনি তাহার দুইহাত চাপিয়া ধরিয়া সোফায় বসাইল। নিজেও তাহার পাশে বসিল। হাতে ধরিয়া ফিরানোতে কি কোনো নিবেদন শুনানোতে মিস্ আশারের মনে মনে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না; কিন্তু তাঁহার সেই উদ্ধত উদাসীন মূর্ত্তি অচল অটল। অ্যান্টনি বলিল,

"বিয়েট্রিস, তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো না? অনেক কথা হয়ত এমন আছে, যার ঠিক কৈফিয়ৎ আমি দিতে পারি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও কি তুমি আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারো না।"

"যার কৈফিয়ৎ দিতে পারো না, এমন জিনিস থাকবেই বা কেন?' কোনো ভদ্রলোকের এমন অবস্থায় পড়াই ঠিক নয়, যার কৈফিয়ৎ সে তার ভাবী স্ত্রীর কাছে দিতে

পারে না। নিজের ব্যবহারটা ভদ্রোচিত বলে সে তার ভাবী স্ত্রীকে কখনই মেনে নিতে বল্‌বে না; তাকে জানতে দেবে সত্যই সেটা তাই। মহাশয়, আমায় এখন অনুগ্রহ করে যেতে দিন।"

সে উঠিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু অ্যান্টনি তাহাকে একহাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া আট্‌কাইয়া রাখিল। অত্যন্ত করুণস্বরে সে বলিল, "আচ্ছা, বিয়েট্রিস্, তুমি কি এটুকুও বোঝনা যে এমন অনেক জিনিস থাকতে পারে যার সম্বন্ধে মানুষের কিছু বলা শক্ত?—সেগুলো নিজের জন্যে না হ'লেও অন্যের খাতিরে গোপন রাখতে সে বাধ্য। আমার সম্বন্ধে সব কথাই তুমি আমায় জিগেষ করতে পার, কিন্তু অন্যের গোপন কথা বলাতে জোর কোরো না। আমার কথাটা বুঝ্‌লে না?"

মিস্ আশার নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "হ্যাঁ নিশ্চয়, বুঝেছি বৈকি। তুমি যখন কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেমালাপ কর, তখন সেটা হয় তার গোপন কথা, কাজেই তার জন্যে তোমার সেটা গোপন রাখাই উচিত। কাপ্তেন উইব্রো, এ-রকম মিথ্যা বাক্যব্যয় করা কিন্তু বৃথা। তোমার আর মিস্ সার্টির সম্বন্ধটা যে সাধারণ বন্ধুত্বের চেয়ে বেশী সে ত পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সেটা যে কি তা যখন তুমি বোঝাতে পারছ না, তখন আর তোমার সঙ্গে কথা বলার আমি কোনো দরকার দেখছি না।"

"আঃ কি আপদ! বিয়েট্রিস তুমি দেখ্‌ছি আমায় পাগল করে ছাড়বে। কোনো মেয়ে যদি কাউকে ভাল-বাসে, তাহ'লে সে বেচারা কি করতে পারে বল্লে ত? এমন ঘটনা ত অহরহই ঘটে থাকে; কিন্তু লোকে তো আর তার কথা বলে বেড়ায় না। কোনো ভিত্তির লেশ মাত্র না থাকলেও অমন মোহ মানুষের মনে জাগে, বিশেষতঃ যে মেয়ে পুরুষমানুষ প্রায় দেখতেই পায় না, সে যাকে পায় তাকেই ভালবেসে বসে। কোনো-রকম নাই না পেলে ওটা আপনি আবার সেরে যায়। তোমার যদি আমায় ভাল লাগ্‌তে পারে, তা হ'লে অন্য কারুরও লাগ্‌লে তোমার অতটা আশ্চর্য্য হওয়া ঠিক নয়। তার জন্যে বরং তোমার তাদের ভাল বলাই উচিত।"

"ও, তোমার বক্তব্যটা তা হ'লে এই যে তুমি কিছু মাত্র নজর না দেওয়াতেও ও-ই তোমায় ভাল বেসে ফেলেছে।"

"লক্ষীটি, আমায় ওসব বলাতে জোর কোরো না। আমি যে তোমায় ভালবাসি, তোমার একান্ত অনুগত, এইটুকু জানাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। ওগো দুষ্টু রাণী, জানোই ত তোমার রাজ্য জয় করে নেবার আর কারুর সাধ্য নেই। নিজের ক্ষমতা দেখাবার জন্যে কেন বৃথা আমায় যন্ত্রণা দাও! অত নিষ্ঠুর হোয়ো না; জানোই ত লোকে বলে, প্রেমরোগ ছাড়া আমার আর-একটা হৃদ্‌রোগ আছে, এমন দুটো চারটে ব্যাপার ঘট্‌লে সে রোগটা আরো বেড়ে যায়।"

মিস্ আশার একটু নরম হইয়া বলিল, "কিন্তু একটা কথার উত্তর তোমায় দিতে হবে। অতীতে কি বর্ত্তমানে তুমি কখনো মিস্ সার্টিকে ভালবেসেছ কি না? তার কথা শোন্‌বার আমার কোনো দরকার নেই, কিন্তু তোমার কথা জানবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

"টিনাকে আমার খুব ভাল লাগে; অমন সোজা ক্ষুদে মেয়েটিকে কার না ভাল লাগে? তাকে আমি অপছন্দ করি এটা বোধ হয় তুমি চাও না। কিন্তু ভালবাসা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। টিনার মতন মেয়েকে লোকে ভাইঝির মতো স্নেহ করতে পারে, কিন্তু ভালবাস্‌তে পারে যাদের তারা হ'ল আর-এক-রকম মেয়ে।"

শেষ কথাটা বলিয়া অ্যান্টনি মিস্ আশারের মুখের দিকে স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল ও তাহার যে হাতখানি এতক্ষণ ধরিয়া রাখিয়াছিল তাহাতে একটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল। কাজেই কথাটার অর্থ বেশ পরিষ্কারই বোঝা গেল। মিস্ আশারের পরাজয় হইল। সত্যই তো অ্যান্টনির পক্ষে টিনার মতন নগণ্য তুচ্ছ বিবর্ণ মেয়েকে ভালবাসা যে স্বপ্নেও সম্ভব নয়—মিস্ আশারের মতন সুন্দরীকে পূজা করাই তো তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব। তাহার এই সুন্দর উপাসকটির জন্য যে অন্যান্য তরুণীরা নিরাশায় ম্লান হইতে থাকিবে সে তো আরো আনন্দেরই কথা। বাস্তবিক, সে যে ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। আহা বেচারী মিস্ সার্টি! কি আর হইবে, সময়ে মোহ কাটিয়া যাইবে।

কাপ্তেন উইব্রো এইবার সুযোগ বুঝিয়া বলিল, "আর

অপ্রীতিকর কথার আলোচনায় কাজ নেই, অনি। তুমি টিনার কথাটি কাউকে বোলো না; তার সঙ্গে একটু সদয় ব্যবহার কোরো—আমার খাতিরেই এইটুকু করবে বলো; কেমন? ও হো, এখন যে তোমার ঘোড়ায় চড়বার সময়। দেখ আজ কি চমৎকার দিন; ঠিক বেড়াবার উপযুক্ত। যাই ঘোড়া আন্‌তে বলি গিয়ে। হাওয়া খাবার জন্যে আমার মন ছট্‌ফট্ করছে। আমায় ক্ষমার চিহ্ন-স্বরূপ একটি চুম্বন দাও, আর বেড়াতে যাবে বলো।"

মিস আশার দুইটি অনুরোধই রক্ষা করিয়া সাজ-সজ্জার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। অ্যাণ্টনি ঘোড়ার সন্ধানে আস্তাবলে চলিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশান্তা দেবী।

শরচ্ছবি

(১)
অঞ্জন-
গঞ্জন
অম্বর-গাত্রে
অভ্রের
আল্‌পন্
অঙ্কন রাত্রে।

(২)
রৌপ্যের
রংচোর
জ্যোছ্‌নায় মগ্ন
বিশ্বের
দুঃখের
সৌষ্ঠব—নগ্ন॥

(৩)
শিউলির
সৌরভ
সন্তোষপূর্ণ;
নন্দনে
মন্দার-
গৌরব চূর্ণ॥

(৪)
মুক্তার
কুণ্ডল
পত্রের কর্ণে।
স্বর্ণের
সন্ধার
রৌদ্রের বর্ণে॥

(৫)
দুর দুর
ভরপূর
ধান্যের ক্ষেত্র।
কর্ষক-
হর্ষক
উৎসুক-নেত্র॥

(৬)
ঝিল বিল্‌
ঝিল্‌মিল্,
পদ্মের সঙ্গে
হংসের
বংশের
কৌতুক রঙ্গে!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর

(জাপানী শ্রমণ একাই কাওাগুচির ভ্রমণবৃত্তান্ত)

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের শক্তি।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পরে আবার উত্তর-পশ্চিমে ৬ মাইল যাত্রা করিয়া এক পথে আসিয়া পড়িলাম। এ পথে লোকের গতিবিধি আছে বুঝিতে পারিলাম। পথের সন্ধান আমার যতদূর জানা আছে তাহা হইতে অনুমান করিলাম, তিব্বত হইতে মানস-সরোবরের দিকে যে পথ গিয়াছে—এ সেই পথ। এইবার তীর্থযাত্রী পথিকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে ভাবিয়া উৎফুল্ল হইলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই এক নদীর তীরে এক কৃষ্ণবর্ণ তাঁবু দৃষ্টি-গোচর হইল। তিব্বতীরা এই নদীকে গঙ্গা বলে। সেই তাঁবুতে একরাত্রি আশ্রয় লইলাম। তাঁবুতে তিনটি পুরুষ, দুইটি নারী। পুরুষ তিনটি সহোদর ভাই। নারী দুজনের মধ্যে একজন উহাদের একজনের স্ত্রী; দ্বিতীয়টি—এক জনের কন্যা। তাঁবুতে নারী-দুটিকে দেখিয়া আমার হৃদয় আশ্বস্ত হইল, কারণ আমি শুনিয়াছি তিব্বতেও যে দলের ভিতর নারী থাকে তাহারা খুনী ডাকাত হয় না। কিন্তু যখন শুনিলাম ইহারা "ডামরাই সোঁ" হইতে আসিতেছে, তখন আর বড় ভরসা পাইলাম না; কারণ "খামের" মত এদেশের লোকও খুনী ডাকাত বলিয়া খ্যাত। আমি শুনিয়াছিলাম সে-দেশে এরূপ প্রবাদ আছে "খুন করলে অন্ন জোটে, তীর্থ করলেই পাপ ছোটে"—তীর্থদর্শন কর, আর মানুষ খুন করিয়া দিনগুজরান কর, কোন ভাবনাই নাই। সে দেশের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত মাছের মত অনায়াসে মানুষ কাটিয়া বসে। সেই দেশের লোকের পাল্লায় পড়িয়াছি ভাবিয়া মনটা দমিয়া গেল। প্রাণটি হাতে করিয়া রাত কাটাইলাম। পরদিন অর্থাৎ ৩রা আগষ্ট এই নদীর তীর বাহিয়া আমরা উত্তরপশ্চিম মুখে যাত্রা করিলাম। আমার সঙ্গীরা বলিল উত্তর-পশ্চিম দিকে যে তুষারগিরি দৃষ্টি-গোচর হইতেছিল, সেই পর্ব্বতেই এই নদীর জন্মহইয়াছে—নদীটি বেশ গভীর এবং প্রায় ২৫০ গজ চওড়া হইবে, এই নদীটি মানসসরোবরে গিয়া পড়িয়াছে। প্রায় ৪ মাইল

এইভাবে গিয়া, খানিকটা পাহাড়ে উঠিয়া স্বচ্ছ নির্ম্মল ঝরণা দেখিতে পাইলাম। এই নির্ঝর হইতেই নাকি পুণ্যতোয়া গঙ্গার জন্ম। আমরা ইহার জল প্রাণ ভরিয়া পান করিলাম। উত্তর দিকে যাত্রা করিয়া আরও কিছুদূর উঠিয়া আর-এক সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম। একখানি প্রশস্ত শ্বেত পাথরের নিম্ন হইতে একটি উৎস অপূর্ব্ব শোভায় উৎসরিত হইয়া পড়িতেছে। সেইখানকার লোকেরা এই ঝরণাটিকে আনন্দের নির্ঝর বলে। বাস্তবিকই ইহা আনন্দের নির্ঝর। এই দুইটি নির্ঝর হইতেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর জন্ম; কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ সকলের নিকট ইহারা পবিত্র তীর্থ। এই প্রস্রবণ দুটি পার হইয়া আবার উত্তর-পশ্চিমে চলিলাম। তখনও এই গঙ্গানদীর তীর বাহিয়া চলিতে লাগিলাম। এবং সেই দিনকার মত এই নদীর তীরেই রাত্রিবাস করা গেল। গঙ্গানদীর তীর হইতে অদূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে শুভ্র তুষারাবৃত কৈলাসশিখর দৃষ্টিগোচর হইল। তিব্বতে কৈলাস পর্ব্বতের নাম "থানরিন-পোচি।" এতদিনের পর আজ আমার চিরবাঞ্ছিত পবিত্র কৈলাসগিরি নেত্রগোচর হইল। হিমাচলের শুভ্র শিখর অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু নিঃসন্দেহ বলিতে পারি—শুভ্র কৈলাসগিরি সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। কৈলাস পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার হৃদয় আনন্দ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় উথলিয়া উঠিল। আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলাম, ভগবান বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বগণ ঐ পবিত্র শিখরে বিহার করিতেছেন। কৈলাস পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া, জীবন ধন্য ও সার্থক হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিলাম। ভূমিতে মস্তক লুণ্ঠন করিয়া একশত আটবার কৈলাস গিরিকে প্রণিপাত করিলাম। যথার্থই সেইদিন মানব-জাতির মধ্যে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবান বলিয়া অনুভব করিলাম। আমার এই ভাবাবেশ ও কৈলাস পর্ব্বতের উদ্দেশে ভূলুণ্ঠন ব্যাপার দেখিয়া আমার সঙ্গীগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া ছিল। কেন যে আমি অবিরাম মুখে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি, কেন যে আমি ভক্তি-বিগলিত চিত্তে বার বার প্রণাম করিতেছি—তাহার অর্থ তাহারা বুঝিতে পারিল না। আমি তাহাদের আমার কার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলিলাম। তাহারা শুনিয়া মুগ্ধ হইল। "চীনে লামা এত ধার্ম্মিক তা ত জানা ছিল না।" আমার মুখ হইতে ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য সকলে ব্যগ্র হইল। আমি সেই দিন রাত্রে অতি সহজ ভাষায় তাহাদের নিকট ধর্ম্মের কথা বলিলাম। শুনিতে শুনিতে আনন্দে ও ভক্তিতে তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইল। সেই দিন হইতে তাহারা আমায় ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল। এবং বলিল তোমার মত সাধুর সেবা করা পরম সৌভাগ্য, যতদিন মানস সরোবরে থাকিবে আমরা তোমার সেবা করিব। সেই দিন হইতে আমি নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইলাম। প্রভু বুদ্ধের জয়! আমার ধর্ম্মের জয়। নরহন্তা ডাকাতদিগের হৃদয়ে আজ একি পরিবর্ত্তন! আমার মুখে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শুনিয়া যখন তাহারা চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইত, আমিও সেই দৃশ্য দেখিয়া না কাঁদিয়া পারিতাম না।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

পবিত্র মানস-সরোবর।

আজ আগষ্ট মাসের ৪ তারিখ। সেই তুষারের দেশে ১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ২৫০০০ ফুট উচ্চ "মনরী" নামক চিরতুষারাবৃত পর্ব্বত-শিখর দেখিলাম। চারিদিকের তুষার-শিখরের মধ্য হইতে "মনরী" যেন সগর্ব্বে অভ্রভেদী মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আজ মনরীর অপরূপ শোভা ও বিরাট গাম্ভীর্য্য দেখিয়া আমার হৃদয় ভাব-সাগরে নিমগ্ন হইল। কিন্তু এই অপূর্ব্ব সম্ভোগে বিঘ্ন জন্মাইয়া অকস্মাৎ প্রকৃতির এক তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হইল। সহসা বিদ্যুৎ চমকিত হইল। অমনি কড়কড়রবে ভীষণ বজ্রধ্বনি, আবার ঝলকে ঝলকে দামিনীর জ্বালা! গুরু গম্ভীর বজ্র-নির্ঘোষ। সেই-সঙ্গে চড় চড় করিয়া ভীষণ শিলা-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমুদায় সৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বাতাসের দাপটে মনে হইতে লাগিল হিমালয়-শিখর কাঁপিতেছে। কিছুই আর দেখা যায় না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের আলোকে শুভ্র শিখর আরও উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। আমরা ভীত স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। প্রকৃতির এই ভৈরব ভাব এক ঘণ্টা মাত্র স্থায়ী হইল। যেমন আরম্ভ তেমনি শেষ। মুহূর্ত্তের মধ্যে চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গেল। আবার নীল

আকাশ দেখা দিল, আবার সূর্য্য-কিরণে চারিদিক হাসিতে লাগিল। ঝড়ের বিন্দুমাত্র নাই। আমরা সেদিন আর বেশী দূর অগ্রসর হইলাম না, একটি জলাশয়ের পার্শ্বে রাত্রি-বাস করিলাম। এখন আমার কিসের ভাবনা? সঙ্গীদিগের সেবায় পরম সুখে আমার দিন কাটিতে লাগিল। ৬ই আগষ্ট আমরা এক উচ্চ পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গীগণ আমার জন্য একটি চমরী আনিল। আমি চমরীতে চড়িয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। ১৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সহসা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম তাহা আর এ জীবনে ভুলিব না। আজন্মের স্বপ্ন আজ আমার প্রত্যক্ষ-গোচর হইল। আজ আমার সম্মুখে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মানস-সরোবর! অষ্টকোণ-বিশিষ্ট এক বিপুল জলাশয়! বারিরাশি স্বচ্ছ শুভ্র স্থির। উত্তর-পশ্চিম দিকে শুভ্র কৈলাস-শিখর মানস-সরোবরের স্বচ্ছ জলে ছায়াপাত করিয়া প্রশান্ত মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে! এমন মহান অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এ জীবনে আর দেখি নাই। চারিদিকে কি শান্ত সুগম্ভীর পবিত্র ভাব। স্বচ্ছ বারিরাশি কি স্থির! পার্থিব ধূলা মলিনতা এ রাজ্যে কোথায়ও নাই। এই সেই দেবতা-বাঞ্ছিত কৈলাস পর্ব্বত! এই সেই দেবতার বিহার ভূমি পবিত্র মানস-সরোবর! নিমেষের মধ্যে পথের সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। এতদিন অনাহারে অনিদ্রায় বিপদ-সঙ্কুল ভীষণ দেশ কি ভাবে অতিক্রম করিয়াছি সব ভুলিয়া গেলাম। আজ আমার প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। এ বিপুল সুখের তুলনায় পথের কষ্ট কি ছার। আজ যাহা দেখিলাম, জন্ম সার্থক হইল। এ পৃথিবীতে মানস-সরোবরের ন্যায় নির্ম্মল-জলপূর্ণ হ্রদ আর নাই। ইহা ১৫৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত! এই কৈলাস-শিখরে হিন্দুদিগের চির আরাধ্য দেবতা মহেশ্বর বাস করেন। বৌদ্ধদিগের নিকট ইহা পবিত্র তীর্থ। এই হ্রদ হইতে নাকি চারিটি নদী চারিদিকে নির্গত হইয়াছে। এই ৪টি নদীই ভারতভূমিতে প্রবাহিত হইয়াছে। লোকে বলে দক্ষিণের নদীতে রৌপ্য-রেণু ভাসিয়া যায়, পশ্চিমের নদীতে স্বর্ণ-রেণু, উত্তরে হীরক-রেণু আর পূর্ব্বের নদীতে পান্না। মানস-সরোবরকে সুদূর পর্ব্বত-শিখর হইতে দেখিলে একটি অতি বিস্তীর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মফুল বলিয়া মনে হয়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

তিব্বতে বেচাকেনা।

এই যে মানস-সরোবর হইতে ৪টি নদীর উৎপত্তির কথা বলিলাম, বাস্তবিক ইহা গল্প-কথা। আমি দেখিলাম মানস-সরোবর হইতে একটি নদীও নির্গত হয় নাই। নিকটের পাহাড় হইতেই ঐ ৪টি নদীর জন্ম হইয়াছে। যে নদীটি পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে তাহাই ভারতে ব্রহ্মপুত্র নদ নামে অবতীর্ণ। দক্ষিণের নদীটি গঙ্গা, পশ্চিম-বাহিনী নদীই শতদ্রু, আর উত্তরের নদীটি সিন্ধুনদ—এখানে ইহার নাম "সীতা"। ইউরোপীয় কেহ নিশ্চয়ই মানস-সরোবর দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু ভূচিত্রে ইহার যেরূপ আকৃতি দেখিয়াছি বাস্তবিক ইহা সেরূপ নয়। তাহা অপেক্ষা অনেক বড়, ইহার পরিধি প্রায় ২০০ মাইল হইবে। সেই রাত্রে মানস-সরোবরের তীরে এক বৌদ্ধমন্দিরে আশ্রয় লইলাম। সেই মন্দিরের প্রধান লামা আমাকে একটি গল্প বলিলেন, তাহা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। এই লামাটি যতদূর সম্ভব অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত, তবু ইঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করিতে পারি না। নানারূপ কথা-প্রসঙ্গে ইনি বলিলেন যে, "তোমাদের লামারা কেমন লোক হয় জানিনা, আমাদের এদিকে লামাদিগের ভিতর ব্যভিচার অত্যন্ত প্রবল। এই ত এখানকার আলচু লামা, যিনি এই মানস-সরোবরের তীরে বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন, এক নারীর রূপের ফাঁদে পড়িয়া তাঁর কি [illegible]তন না হইল। সেই স্ত্রীলোকের জন্য সেই লামা দেবোত্তর সম্পত্তি পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করিয়া দিল, সেই সুন্দরীর পিতাকে মন্দিরের সম্পত্তি দান করিয়া অবশেষে মন্দিরের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া সেই রমণীর সঙ্গে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি শুনিতে পাইতেছি সেই পাপাত্মা লামা সেই স্ত্রীর সহিত [illegible]তোষ নামক স্থানে বাস করিতেছে। পথে আসিবার সময় তুমি কি এই পাপিষ্ঠকে দেখিয়াছ?" আমি বুঝিলাম পথে আসিবার সময় যে সুন্দরী এবং তাঁহার লামা আমায় আতিথ্যে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই দম্পতি। হায়! সংসারে মানুষের হৃদয় চেনে সাধ্য কার? পরদিন আমি মানস-সরোবরের তীরে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। যেদিকে তাকাই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যায়। চক্ষু

ফিরাইতে আর ইচ্ছা হয় না। পথে কতকগুলি ভারতবর্ষীয় এবং নেপালী হিন্দু তীর্থযাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল; তাহারা মানস-সরোবরে অবগাহন করিয়া পূজা অর্চ্চনায় ব্যাপৃত ছিল। তখন বেলা প্রায় ১০টা হইবে। তাহারা আমায় দেখিয়া বৌদ্ধ সাধু ভাবিয়া নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য উপহার দিল। দ্বিতীয় দিন রাত্রেও আমি সেই মন্দিরে বাস করিলাম। মানস-সরোবরের উত্তর-পশ্চিমদিকে এক বিরাট পর্ব্বত উঠিয়াছে। আমি সেই পর্ব্বতে ১০ মাইল পথ উঠিয়া আর-এক প্রকাণ্ড হ্রদ দেখিলাম। ইহার নাম "রাক্ষসতাল"। ইহা মানস-সরোবরের ন্যায় প্রকাণ্ড নহে। সেখান হইতে আরও ৭৷৷০ মাইল উঠিয়া সমুদায় হ্রদটি ছবির মত চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম মানস-সরোবর আর এই হ্রদের মধ্যে আড়াই মাইল বিস্তৃত এক পর্ব্বত প্রাকারের ন্যায় রহিয়াছে। মানস-সরোবর হইতে "রাক্ষসতাল" কিছু উচ্চে। ইহাদের ভিতর কোনোরূপ যোগ নাই—কিন্তু ১০।১৫ বৎসর পর অস্বাভাবিক বর্ষা হইলে বা অন্য কোন কারণে রাক্ষসতালের জল উপচিয়া কোনও ধারায় মানস সরোবরে গিয়া পড়ে। এদেশের লোকেরা বলে "রাক্ষসতাল পতি, মানস-সরোবর পত্নীর সহিত ১৫ বৎসর অন্তর সাক্ষাৎ করে।" রাক্ষসতাল হইতে ১৩ মাইল নামিয়া আমি এক উপত্যকায় পড়িলাম। সেখানে ৬০ ফুট চওড়া এক নদী বহিয়া যাইতেছে, ইহা গঙ্গার এক উপনদী। ভারতবর্ষ ও তিব্বতের মধ্যে হিমাচলের উপরে "পুরাং" নামে যে সহর আছে এই নদী তাহার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া "হলদাহল" নাম্নী গঙ্গার আর-এক উপনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর তীরে আমরা সেই রাত্রি বাস করিলাম। সেখানে পুরাং হইতে আরও কয়েকজন ব্যবসায়ীর তাঁবুও পড়িয়াছিল। সচরাচর এই সময় এখানে বিলক্ষণ বেচা কেনা চলিয়া থাকে। তিব্বতে ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা বড়ই অদ্ভুত। এ রাজ্যে টাকা-কড়ির বড় চলন নাই। তিব্বত হইতে ব্যবসায়ীরা মাথম, লবণ, পশম, ভেড়া, ছাগল, চামর প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ লইয়া আসে। বিনিময়ে ভারতবর্ষীয় ব্যবসায়ীর নিকট হইতে শস্য, তুলা, কাপড় প্রভৃতি ক্রয় করে। এই-সকল ব্যবসায়ীরা পাঁচে দুইএ কত হয় তাহা মুখে মুখে যোগ করিয়া বলিতে পারে না, ৫টি টিলের পাশে ২টি ঢিল রাখিয়া তবে গণিয়া বলিতে পারে যে সাত হইল। ইহাদের বাণিজ্য-ব্যাপার দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছি। শাদা পাথর, কাল পাথর, ছোট ছোট লাঠি খুঁটি প্রভৃতি লইয়া ইহারা হিসাব করিত। এক-একটি জিনিষ এক-একটি সাদা পাথর দিয়া গণনা করিত, ১০টি সাদা পাথর হইলে তাহার বদলে একটি কাল পাথর রাখিত। ১০টি কাল পাথর হইলে একটি কাঠি, ১০টি কাঠি হইলে একটি শামুক। এই-প্রকারে হিসাব করিয়া ব্যবসা চালাইত। অঙ্ক-শাস্ত্রের গুণ-ভাগের রহস্য ইহাদের নিকট যথার্থই রহস্য। মানস-সরোবরের তীরে ৩।৪ দিন আমি এইভাবে কেনা বেচা সর্ব্বত্রই চলিতেছে দেখিয়াছিলাম। আমাদের দেশে যাহা আধ ঘণ্টায় হয় এ দেশে তাহা সমাধা করিতে তিন দিন সময় লাগিত। আর-এক কারণে মানস-সরোবরের তীরে যে কয়দিন বাস করিয়াছিলাম তাহার কথা কখন ভুলিব না। তীর্থযাত্রীদিগের ভিতর আমার যশ এরূপ প্রচারিত হইয়াছিল যে তীর্থযাত্রী এক বালিকা আমায় পতিরূপে বরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইল।

অষ্টবিংশ অধ্যায়।

হিমাচল-শিখরে প্রেমের ফাঁদ।

আমি তখনও তীর্থযাত্রীদিগের সঙ্গ ত্যাগ করি নাই। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও আমার প্রতি অগাধ ভক্তির উদয় হইয়াছিল। বিশেষতঃ একটি বালিকার। বালিকা বলি কেন যুবতীর। আমি স্পষ্টই তাহার ব্যবহারে তাহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিলাম। তখন আমার প্রাণে এই চিন্তার উদয় হইল—"এ বয়সে এ ভাব কিছু অস্বাভাবিক নয়, সকলের মুখে আমার সুখ্যাতি শুনে বেচারা আমায় পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।" আমি তখনই তার মন হইতে এ ভাব দূর করিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইলাম। মনে করিলাম, ধর্ম্মভাব প্রাণে জাগ্রত করিয়া এ ভাব ডুবাইয়া দিব। আমি সদাসর্ব্বদা তার মনে বৌদ্ধধর্ম্মের মহান্ আদর্শ মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতাম। বৌদ্ধ শ্রমণের বিবাদ করা, সংসারে ভোগসুখে নিমগ্ন হওয়া কতদূর হীন কাজ বর্ণনা করিতাম। ভোগে মুক্তি নাই,

ত্যাগে মুক্তি বলিলাম, স্বর্গের অতুল সুখ ও নরকের ভীষণ অবস্থার বর্ণনা করিলাম—কিন্তু হায় বালুকায় রেখার ন্যায় তার মনে আমার উপদেশ কোন স্থায়ীভাব মুদ্রিত করিতে পারিল না। যৌবনের উদ্দাম চিত্তবৃত্তিকে সংযত করা কি সহজ কথা! বেচারার উপর আমার করুণার উদয় হইল। আমার শিক্ষাদীক্ষা বয়স অভিজ্ঞতার সহিত তাহার প্রভেদ কত! বয়স উনিশ বৎসর মাত্র, চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিবার শিক্ষা কোন দিনই হয় নাই। আমি এখনও বৃদ্ধ হইয়াছি সত্য, কিন্তু একদিন ত তরুণ যুবা ছিলাম, তখনকার অভিজ্ঞতা কি ভুলিয়াছি—কত কষ্টে চিত্তবৃত্তিকে সংযত ও প্রলোভন পার হইতে হইয়াছে তা কি জানি না? তবে কি করিয়া এই যুবতীর উপর রুষ্ট হইব? বালিকা সুন্দরী না হইলেও কুৎসিত নয়, এবং দেহে যৌবন-শ্রীর অভাব নাই। আমার তাহার প্রতি সহানুভূতি ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদয় হইল না। কে এমন আছে যে জীবনের এ রহস্যের সন্ধান পায় নাই?

এখন আমরা যে দেশ অতিক্রম করিতেছিলাম "লাদক" এবং "থুন্দু" তাহার অন্তর্গত। আমি যে "পুরাং" সহরের কথা বলিয়াছি, তাহা এ রাজ্যের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র—কেবল ব্যবসাকেন্দ্র কেন, বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান তীর্থ। আমার আগমনের ছয়মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপাণি ও মঞ্জুশ্রীর তিনটি উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি এই "পুরাং" সহরে ছিল। সেই সময় আগুন লাগিয়া দুইটি ভস্মসাৎ হইয়াছে, এখন কেবল মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি আছে। এরূপ কথিত আছে সিংহল হইতে এই-সকল মূর্ত্তি আনীত হইয়াছিল। যা হোক, ধরা পড়িবার ভয়ে এই "পুরাং" সহরে যাইতে আমার ভয় হইতে লাগিল। এখানে তিব্বত রাজ্যে প্রবেশের এক দ্বার, সকলকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়া হয়। আমি সহযাত্রীদিগের সহিত সহরে প্রবেশ করিলাম না, তাহারা আমায় রাখিয়া গেল। তাহারা ফিরিয়া আসিলে আমি আবার মানসসরোবরের তীর দিয়া উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা করিলাম। কিছুদূর গিয়া হ্রদের মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখিলাম। অবশেষে ১৯০০ সালের ১৭ই আগষ্ট আর-এক বাণিজ্যকেন্দ্রে উপস্থিত হইলাম। এ স্থানের নাম "গয়ানিমা"। ১৫ই জুলাই হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এখানে ক্রয় বিক্রয় চলে। তিব্বত ও ভারতবর্ষ হইতে ব্যবসার জন্য লোকে এখানে আসিয়া থাকে। আমি দেখিলাম এখানে কেনা বেচা খুব চলিতেছে, প্রায় ১৫০ তাঁবু পড়িয়াছে। ৫০০।৬০০ লোক ক্রয়বিক্রয়ের জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। আমিও এই হাটে কিছু কিছু জিনিষ কিনিলাম। "গয়ানিমা" হইতে "গয়াকার্কোতে" ফিরিয়া আসিলাম। ইহাও এক বাণিজ্যের কেন্দ্র। তিব্বতরাজ্যে "গয়ানিমাই" পশ্চিমতম প্রান্ত। এতদিন আমি লাসা হইতে ক্রমাগত পশ্চিমের দিকে গিয়াছি, এখন হইতে আমি এক এক পা করিয়া ক্রমাগত লাসার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। "গয়াকার্কো"তেও প্রায় ১৫০ তাঁবু দেখিলাম। এখানে ৩।৪ দিন বাস করিলাম। "গয়াকার্কো" পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের লোকেরা তিব্বতবাসীদিগের সহিত ব্যবসাবাণিজ্য করিতে আসে। ইহার পর তিব্বতরাজ্যে প্রবেশ নিষেধ। এখানে আমি ভারতবর্ষের অনেক ব্যবসায়ী দেখিলাম। তন্মধ্যে "মিলাম" নামে একজন ইংরেজি বলিতে পারে। তাহার সহিত আলাপ হওয়াতে সে আমাকে নিমন্ত্রণ করিল। সে আমাকে ইংরেজের গুপ্তচর বলিয়া ভাবিয়াছিল। তাহার তাঁবুতে পদার্পণ করিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল, "তুমি যাঁহার কাজে এসেছ, আমি তাঁহারই প্রজা।" আমার ত একথা শুনিয়া চক্ষুস্থির। অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলাম আমি ইংরেজের চর নই—চীনদেশ হইতে আসিয়াছি। চীনে শুনিয়াই ত সে একজন চীনে ভাষাজ্ঞকে লইয়া উপস্থিত। মনে মনে বড় ভয় হইল এইবারে সব ফাঁস হইয়া যাইবে। যাহোক আমি সহজে ঘাবড়াইবার পাত্র নই, বেশ সহজ সপ্রতিভ ভাবে কথা বলিতে লাগিলাম। দেখিলাম লোকটি চীনেভাষা বড় জানে না, দুই একটা অক্ষর লিখিয়া দেখাইলাম, তাহাও পড়িতে পারিল না; তখন সে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল "হার মানিয়াছি—আমি চীনেভাষা জানি না।" আমি যে যথার্থই চীনে সে কথা সকলে বিশ্বাস করিল, এমন কি চীনদেশে ব্যবসার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য মিলাম অনুরোধ করিয়া বসিল। আমি এই ব্যক্তির হাতে বন্ধু শরৎচন্দ্র দাস, এবং হিগো, ইতো বন্ধুদ্বয়কে পত্র দিলাম। পত্র ডাকে দিতে বলিলাম এবং পুরস্কারস্বরূপ কিছু অর্থও দিলাম। লোকটি

বিশ্বাসী বটে, দেশে গিয়া শুনিলাম পত্রগুলি যথাস্থানে পৌঁছিয়াছিল।

আবার আমার প্রণয়িনীর কথা বলি,—গয়াকার্কোতে আসিয়া দেখি—শ্রীমতী দাবার—সেই যুবতীর নাম দাবা—আমার প্রতি ভালবাসা কিছু মাত্র মন্দীভূত হয় নাই। আমার এত চেষ্টা, এত উপদেশ সব ব্যর্থ হইয়াছে দেখিলাম। শ্রীমতী দাবা চিত্তবিনোদন-কার্য্যে বড় নিপুণ, আমাকে অধিকার করিবার জন্য তাহার ভঙ্গিতে কেবল ঐ ভাব ফুটিয়া উঠিত। দাবা আমার কাছ ছাড়া কখনও হইত না, আর ক্রমাগত বলিত, "আমার মার বড় মায়ার শরীর, মা বড় ভাল, তাঁর শরীর বড় দুর্ব্বল, তাই তিনি তীর্থ করিতে আসেন নাই, আসিবার সময় মা কত কাঁদিয়াছিলেন, আমি বাপ-মায়ের এক মেয়ে, বাবার অবস্থা খুব ভাল, আমাদের ১৬০টি চমরী, ৪০০০ ভেড়া আছে—তুমি আমায় বিবাহ করিলে পরম সুখে দিন কাটাইবে। আমাদের দেশে লামাকে বিবাহ করে, এতে কোন দোষ নাই। তুমি কেন বল আমার বিয়ে করা পাপ। এটা তোমার বুদ্ধির দোষ," ইত্যাদি কত কি। তার কথার আর শেষ নাই। আমি যত বলি, যত বুঝাই তাহাতে সে আমার উপর বিরক্ত হইয়া উঠে। এক দিন আমি তাহাকে বলিলাম "আহা তুমি যে মার কথা বল, আজ এক বৎসর তার সংবাদ পাও নাই, তিনি যে বেঁচে আছেন তা কি জান? তুমি কেবল নিজের সুখের কথাই ভাব, মা বেঁচে আছেন কি মারা গেছেন তার চিন্তা নাই?" বেচারা বড় অপ্রতিভ হইল—শুধু অপ্রতিভ নয়, মাতৃ-বিচ্ছেদের ভয়ে কাতর হইল। লজ্জিত হইয়া বলিল "সত্য আমার মার যে কি হইয়াছে জানি না।" তখন আমি জোর করিয়া বলিলাম, "এখন কি তোমার বিয়ের কথা ভাবা উচিত।" কিন্তু নারী জাতির কি আশ্চর্য্য মনোমোহিনী শক্তি। অশিক্ষিতা অজ্ঞ দাবা তারও এত শক্তি! তার মুখের কথায় যত না প্রকাশ পাইত তার চোখ-মুখের ভাবে তার চেয়ে অনেক অধিক প্রকাশ পাইত। আমি ভীত হইয়া ভাবিতাম, "একেই বলে মার, একেই বলে প্রলোভন।" ভগবান শাক্যমুনি বুদ্ধের নিকটও এই মার দেখা দিয়াছিল। অনেক চেষ্টায় আত্মজয় করিয়াছি। আমি দাবার প্রণয় প্রত্যাহার করিলাম। দাবার চিত্ত ফিরিল না। একদিন দাবার বাপভাই সব বাহিরে গিয়াছে। তাঁবুতে আমরা দুজন ছাড়া আর কেহ নাই। দাবা সেদিন যে ভাবে আমার কাছে আসিল আমি বড় কঠিন পরীক্ষায় পড়িলাম। আমি ত নরদেহধারী মানুষ, দেবতা নই। মুক্তিভিখারী, মুক্ত নই! স্মরণ করিলাম, সর্ব্বসাক্ষী ভগবান বুদ্ধ, আমার আশ্রয়, সহায় হইয়া সঙ্গে আছেন। প্রভুর কৃপায় আত্মজয় করিলাম, হৃদয় জয় করিলাম, বিনীতভাবে বালিকাকে বলিলাম, "তোমার পিতৃগৃহে সকল সুখের আয়োজন আছে, তুমি আমায় পার্থিব ভোগ সুখ দেবে তাও জানি। কিন্তু কুমারী আমায় মাপ কর, ও-পথ আমার জন্য নয়, আমি কিছুতেই তোমায় বিবাহ করিতে পারিব না।" আমি উত্তেজিত ভাবে অনেক উপদেশ দিলাম, ধর্ম্মের কথা বলিলাম, ক্রমে দেখি দাবার হৃদয়ে আমার প্রতি ভালবাসার পরিবর্ত্তে এক ভক্তি-মিশ্রিত ভয়ের উদয় হইতেছে। আমি অনেক কষ্টে কঠিন পরীক্ষায় পার হইলাম। দাবা আমায় ভয় করিতে শিখিল। গয়াকার্কোতে কয়েক দিন যাপন করিয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলাম। পথে আসিতে আসিতে গয়ানিমা ও গয়াকার্কো হইতে প্রত্যাগত অনেক যাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

যেখানে রাত্রিবাস করিলাম সেখানে আরও অনেক তাঁবু পড়িয়াছে দেখিলাম। ভগবান বুদ্ধের নির্দ্দেশ অনুসারে সেদিন আমার মুষ্টিভিক্ষা-ব্রত পালনের দিন। আমি প্রত্যেক তাঁবুর দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষা চাহিলাম, এবং রাত্রিকালে সকলকে একত্র করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিলাম। এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিবার আর-এক গূঢ় কারণ ছিল; কারণ ধর্ম্মপ্রসঙ্গে মানুষের হৃদয় যেমন গলে এমন আর কিছুতেই নয়। আমার উপদেশ শুনিলে হয়ত আমায় হত্যা করিবার প্রবৃত্তি আর থাকিবে না। সম্প্রতি এদেশে আমার প্রাণের ভয় তত ছিল না। এযে তীর্থ! ঘোর নারকীও তীর্থস্থানে নরহত্যায় বিরত থাকে।

২৮এ তারিখ আমরা যে পার্ব্বত্য দেশে ২০ মাইল পথ অতিক্রম করিলাম—সে দেশে একবিন্দু জল পাইলাম না। সঙ্গীরা পিপাসায় কাতর হইল, কিন্তু পূর্ব্বে তৃষ্ণায় যে বিষম ক্লেশ ভোগ করিয়াছি তার তুলনায় আজিকার কষ্ট অনেক লঘু। যাহোক সন্ধ্যার সময় এক নদীর তীরে আসিয়া

উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম ইহা শতদ্রু নদী। শতদ্রু এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া সিন্ধুনদে গিয়া পড়িয়াছে। সঙ্গীরা বলিল মানস-সরোবরে ইহার জন্ম হইয়াছে। আমি বলিলাম তাহা সম্ভব নয়, মানস-সরোবরের নিকটস্থ পর্ব্বতে ইহার জন্ম। শতদ্রুতীরে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন সে অঞ্চলের প্রসিদ্ধ তীর্থ দেখিতে গেলাম, তাহার নাম "প্রেতভূমি"। তিব্বতীরা উচ্চারণ করে "রেতভূমি"। প্রেতভূমি দেখার পর দাবা, দাবার বাবা, আর একটি স্ত্রীলোক ও আমি আবার যাত্রা করিলাম। পথে অনেক নদী দেখিলাম তাহাতে বরফের চাঁই ভাসিয়া আসিতেছে। সেই-সব নদীর কোন কোনটা আমাদের পার হইতে হইল। আবার সেই বরফ-জলে অবগাহন। আমার সঙ্গীরা অনায়াসে পার হইয়া গেল। তিব্বতীর শরীরে আর আমার শরীরে অনেক প্রভেদ। তাহাদের তুলনায় দৈহিক শক্তিসামর্থ্যে আমি অত্যন্ত হীন। নদী পার হইয়া আমার দেহ অবশ হইয়া গেল। সঙ্গীদের বলিলাম "তোমরা যাও, আমি আর সহজে চলিতে পারিব না।" একঘণ্টা দেহের পরিচর্য্যার পর যাত্রা করিয়া ৫ মাইল গিয়া অদূরে এক অতি সুন্দর মন্দির দেখিলাম। সোপানশ্রেণী দূর হইতে একসার রেলের গাড়ীর মত দেখাইতেছে। এ দেশে এক-রকম পাখী আছে, রেলগাড়ীর মত শিস দেয়, চীৎকার করে। আজ তাই আবার হঠাৎ সভ্যদেশ ও তাহার রেলগাড়ীর কথা আমার মনে পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমলতা দেবী।

ঋতুসংহার

গ্রীষ্ম

ভারী রোদ, 'কড়্-কড়্',
ভাঙা ডাল, 'মড়্-মড়্';
গাছ ভরা আম-জাম,
হাত পাখা, খুব ঘাম;
ভোর বেলা 'নাম্তা',
বউ-ঝির আম্তা।

বর্ষা

আকাশ-জোড়া মেঘ,
ভূতল-ভরা জল;
কদমফুল-বাস,
ব্যাঙের কোলাহল।
কেমন-যেন মন,
আপন যেন পর;
কিসের-যেন দুখ,
আঁখির ঝর্-ঝর্!

শরৎ

খাল বিল ভরপূর,
প্রাণমন সুর্‌সুর্;
দশদিক সুন্দর,
ফিট্‌ফাট্ অন্দর;
বাপ-মার বউ-ঝির
অন্তর অস্থির!

হেমন্ত

শিউলি-ঝরণ, মধুর তপন,
সবুজ শোভা, সুনীল গগন;
রাতে শিশির, দিনে গরম,
জ্যোৎস্না-নিশির বেজায়-সরম!

শীত

পাকা ধানের গন্ধ মিঠে,
নামান্ বাড়ী নানা পিঠে;
সোনায় ভরা উঠান-খোলা,
ভোরে পাতায় শিশির-গোলা;
শুক্‌নো তরু, শুক্‌নো পাতা,
বুড়ো-বুড়ীর ঢাকা মাথা।

বসন্ত

মুহুর্মুহু 'কুহু-কুহু',
পরাণ-চাওয়া 'উহু-উহু';
নানান্ ফুল, টাট্‌কা মন,
মিঠে হাওয়া, মিঠে ভুবন।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

দুই তার

(১৩)

বীরেন. ছলনা করিয়া চারদিন কলিকাতা যাওয়া স্থগিত রাখিয়াছিল যে আশায়, তাহা তাহার ভাগ্যে পূর্ণ হইবার কোনো সম্ভাবনাই রহিল না। গুণময় আগে একবারও অন্দরমহলে আসিতেন না; কাল রাজবালার আসা হইতে তিনি দিনে রাত্রে যখন-তখন অন্দরে আসিতেছেন এবং রাজবালার কাছে-কাছে থাকিতেছেন। ইহাতে বীরেন রাজবালার কাছে ঘেঁসিতে ত পাইতেছিলই না, অধিকন্তু শিকারীর ভয়ে হরিণের মত বেচারাকে সর্ব্বদা যেন কান খাড়া করিয়া রাখিয়া এ-ঘর হইতে সে-ঘর ও সে-ঘর হইতে ও-ঘর পলাইয়া পলাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতে হইতেছিল।

দয়াদেবী শয্যাগত হইয়া পড়া অবধি রাজবালার আসার আগে পর্য্যন্ত গুণময় একদিনও একটিবারও মুমূর্ষু স্ত্রীর ঘরের চৌকাঠ ডিঙান নাই, বা কাহাকেও তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করেন নাই। বীরেনই এতদিন নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে তাঁহার ঔষধ পথ্য দেওয়া ও সেবাশুশ্রূষার ভার লইয়া ছিল। এখন সে তাহার সেই পূজার মন্দিরেও স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছিল না। তাহাকে সন্ত্রস্ত ও চকিত দেখিয়া দয়াদেবী আশ্বাস দিয়া বলিতেছিলেন—এ ঘরে তোর ভয় কি বীরেন—উনি ত আমার ঘরে কখনো আসেন না!

এমন সময় বাহিরে গুণময়ের চটির শব্দ শোনা গেল। বীরেন্দ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে পাশের দরজা দিয়া দৌড় দিল—আর রাজবালার পিছনে পিছনে গুণময় আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন

রাজবালাও গুণময়ের নিরন্তর প্রণয়-নিবেদনের জ্বালায় বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে একলা পাইলেই তিনি তাঁহার ভাবী স্ত্রীর নিকট হইতে দাম্পত্য-প্রণয়ের বায়না আদায় করিবার জন্য এমন ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন ও রাজবালাকে পীড়াপীড়ি করিতেন যে রাজবালা ভয়ে লজ্জায় অভিভূত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিত। গুণময়ের সাড়া পাইলেই সে এখন কোনো একজন লোকের কাছে গিয়া আশ্রয় লয়। কিন্তু সে দেখিল মায়ার কাছে থাকিলে গুণময় আসিয়াই কন্যাকে সেখান থেকে চলিয়া যাইতে বলেন, সেও ভয়ে-ভয়ে সরিয়া পড়ে এবং রাজবালা যাইবার উপক্রম করিলেই তিনি পথ আগলাইয়া, হাত ধরিয়া কণ্ঠস্বরে আদর গলাইয়া বলেন—'রাজু, তুমি যেয়ো না প্রাণেশ্বরী!' শুনিয়া রাজবালা লজ্জায় মরিয়া যায়। সে মোহিনীর কাছে আশ্রয় লইয়া দেখিল, মোহিনী বাবুকে আসিতে দেখিয়া নিজেই সরিয়া পড়ে, তাহাকে যাইতে বলিতেও হয় না। রাজবালা মায়ের নিকট গেলে গুণময়কে আসিতে দেখিয়াই হয় তিনি উঠিয়া যান, রাজবালা সঙ্গ লইলে তিনি তিরস্কার করেন; নয় ত তিনি রাজবালাকে চাপা তিরস্কার করিতে-করিতে ক্রমাগত ঠেলিয়া চিমটি কাটিয়া গুণময়ের কাছে যাইতে বলেন। বারেনের কাছে রাজবালার থাকিতে খুব ইচ্ছা হইলেও সে আর তাহাকে বড় একটা দেখিতেও পায় না; সে বুঝিতে পারিতেছিল যে বীরেনও গুণময়েরই ভয়ে পলাইয়া পলাইয়া লুকাইয়া ফিরিতেছে, সুতরাং তাহার কাছে আশ্রয় পাওয়ার তাহার আশা নাই। সে এই দুদিন লক্ষ্য করিতেছিল গুণময় দয়াদেবীর মহলের দিকে যান না; তাহাকে বিবাহ করিবার মতলব দয়াদেবীর নিকটে গোপন রাখিবার পরামর্শও সে শুনিয়াছে; অতএব দয়াদেবীর ঘরে আশ্রয় লইলে সে নিরুপদ্রব হইতে পারিবে বলিয়া তাহার আশা হইতে লাগিল—যদি বা গুণময় সেখানেও তাহাকে অনুসরণ করেন তবু দয়াদেবীর সাক্ষাতে তাহার সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করিতে তিনি পারিবেন না। কিন্তু দয়াদেবীর কাছে যাইতে তাহার কেমন সঙ্কোচ লজ্জা ও ভয় হইতেছিল—তাঁহার বিরুদ্ধে যে হৃদয়হীন কঠোর ষড়যন্ত্র তাঁহার স্বামী ও মাসীতে মিলিয়া করিয়াছেন তাহার প্রধান উপলক্ষ্য ত সেই। সে কোন্ মুখে তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিতে যাইবে? সে চারিদিকে নিরুপায় দেখিয়া মায়ের কাছে কাঁদিয়া জেদ করিয়া বলিল—মা, তুমি বাড়ী চল, আমি এখানে থাকব না।

তাহার মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তুই এমন হুড়কো হচ্ছিস্ কেন বল্ ত রাজু? কত জন্ম তপিস্যে করে লোকে তবে রাজরাণী হতে পায়! লক্ষ্মী এসে তোকে সাধছেন, তুই ছেলেমানুষী করে হেলায় হারাতে বসেছিস! এমন করলে জামাইএর টান কদিন থাকবে?

রাজবালা ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল—মা, আমি ওকে বিয়ে করতে পারব না, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ো না।

তাহার মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—ফের এমন কথা মুখে আনবি ত তোকে এইখানে একলা ফেলে রেখে আমি বাড়ী চলে যাব; না হয় হলই এ কার্ত্তিক মাস, কালই তোর বিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তি হব।

এমন সময় আবার গুণময় প্রলয়কালের জলধরের ন্যায় দূরে উদিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই রাজবালা সেখান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিল। তাহাকে পলাইতে দেখিয়া গুণময়ও দ্রুত চলিবার চেষ্টায় হাতীর মতন থপথপ করিতে-করিতে তাহার পিছনে-পিছনে এ-ঘর সে-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন আর হাঁপাইতে-হাঁপাইতে ডাকিতে লাগিলেন—রাজু ও রাজু! একবার ধরা দাও প্রাণেশ্বরী!

রাজবালা পরিত্রাণের কোনো উপায় না দেখিয়া দয়াদেবীর ঘরে গিয়া ঢুকিল; বীরেন পলায়ন করিল; গুণময়ও আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন; দয়াদেবী একবার স্বামীর শ্রমকাতর গলদঘর্ম্ম মূর্ত্তির দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। রাজবালা তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহার দুই পা কোলে করিয়া বসিল; গুণময়ও খাটের একধারে রাজবালার একেবারে গা ঘেঁসিয়া বসিয়া হাপরের মতন হাঁপাইতে লাগিলেন।

একটু দম লইয়া গুণময় রাজবালার পিঠে থাবা রাখিয়া চাপা গলায় খুব আস্তে আদর করিয়া ডাকিলেন—এখান থেকে চলে এস রাজু!

রাজবালা পিঠ মুড়িয়া সরিয়া বসিয়া পিঠ হইতে গুণময়ের হাত সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; গুণময় মরণাপন্ন স্ত্রীর পায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রাজবালাকে ক্রমাগত টানিতে লাগিলেন।

মাত্র গতকল্য এই পদসেবার উপলক্ষে রাজবালা বীরেন্দ্রের সহিত যে প্রীতির খেলা খেলিয়াছে তাহা টের পাইয়া দয়াদেবী দুঃখিত হইয়াছিলেন, বিরক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল যে বীরেন্দ্রের সহিত মায়ার বিবাহ দিবেন; স্বামী অমত করিয়া মায়ার পাত্র খুঁজিতে ঘটক লাগাইয়াছেন বটে, কিন্তু মুমূর্ষু স্ত্রীর এই শেষ অনুরোধ তিনি ঠেলিতে পারিবেন না বলিয়া দয়াদেবীর বিশ্বাস ছিল; মায়া একটু জেদী হিংসুটে হইলেও সে বীরেন্দ্রকে ভালো যে বাসিত তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল; বীরেন্দ্রও মায়াকে স্নেহ করে, কিন্তু তাহার প্রণয়ে ব্যাকুলতার পরিচয় সে দ্যায় নাই, মায়ার সে বয়স হয় নাই বলিয়াই; সুতরাং ইহাদের বিবাহ উভয়েরই সুখের হইবারই সম্ভাবনা ছিল। তাই যখন তিনি অনুভব করিলেন যে রাজবালাকে দেখিয়াই বীরেন্দ্রের মন রাজবালার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে কলিকাতা যাওয়া স্থগিত রাখিবার জন্য তাঁহার কাছে মিথ্যা ছলনা পর্য্যন্ত করিয়াছে, তখন তিনি বীরেন্দ্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত হইবে না মনে স্থির করিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ আবার সেই রাজবালা তাঁহার স্বামীকে প্রলুব্ধ করিতেছে অনুমান করিয়া তিনি রাজবালার উপর ত বিরক্ত হইলেনই, স্বামীর আচরণ দেখিয়াও আশ্চর্য্য ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন—ইহারা এমন বেহায়া নির্লজ্জ যে মরণকেও সম্মান করিতে ইহারা জানে না!

দয়াদেবী অশুচি স্পর্শের ন্যায় রাজবালার স্পর্শ পরিহার করিয়া আপনার পা সরাইয়া লইলেন। রাজবালা অমনি আরো সরিয়া দয়াদেবীর কোলের কাছে গিয়া বসিল। গুণময় স্ত্রীর গায়ের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া রাজবালাকে ধরিতে যাইতেছিলেন, রাজবালা হঠাৎ সরিয়া যাওয়াতে হুমড়ি খাইয়া দয়াদেবীর গায়ের উপর পড়িয়া গেলেন। দয়াদেবী অমনি মুখ ফিরাইয়া স্বামীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন; সে দৃষ্টির কাছে গুণময় সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া আসিলেন। এমন সময় সেই ঘরে মায়াকে মোহিনী আসিয়া গুণময়কে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। গুণময় রাগে গসগস করিতে-করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

(১৫)

গুণময় চলিয়া গেলে রাজবালা সরিয়া আসিয়া আবার দয়াদেবীর পায়ের দিকে বসিল; তথাপি দয়াদেবী পা ছড়াইলেন না। রাজবালা তাঁহার পায়ে হাত দিতেই তিনি পা আরো সরাইয়া লইলেন। রাজবালা বলিল—"দিদি, পা

ছড়াও।” দয়াদেবী তবু পা ছড়াইলেন না, কোনো কথাও বলিলেন না।

মোহিনী বলিল—মাসিমা, মায়ের ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, ওষুধটা ঢেলে দাও না। আর একটু বেদানার রস দাও।

দয়াদেবী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—দ্যাখ্ মোহিনী, যাকে-তাকে আমার ওষুধ কি খাবার জিনিস ছুঁতে দিসনে বলছি! আমাকে কি তোরা বাঁচতে দিবিনে মনে করেছিস! তোরা দিতে না পারিস আমার ওষুধ পত্তির দরকার নেই!

মোহিনী আশ্চর্য্য হইয়া রাজবালার দিকে চাহিল। রাজবালা লজ্জায় দুঃখে লাল হইয়া উঠিয়া ভাবিতেছিল—দিদি নিশ্চয় সমস্ত টের পেয়েছেন—বীরেন বলে দিয়েছে। সে ত জানে, এ বিয়ে করতে তার ইচ্ছে নেই, তবে সে-কথাটুকু সে দিদিকে বলেনি কেন? দিদি কি সে-কথা জেনেও আমার উপর রাগ করছেন?

রাজবালার ইচ্ছা হইতেছিল দিদির পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলে, কিন্তু তাহার লজ্জায় বাধিতেছিল। সে এমন অবস্থায় অপরাধিনীর মতো কুণ্ঠিত হইয়া সেখানে বসিয়াও থাকিতে পারিতেছিল না, আবার ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাইবার ও গুণময়ের কবলে পড়িবার ভয়ে উঠিয়াও যাইতে পারিতেছিল না।

বীরেন্দ্র পাশের ঘরে লুকাইয়া থাকিয়া সমস্ত দেখিয়াছিল শুনিয়াছিল। সে দয়াদেবীর কথা শুনিয়াই তাড়াতাড়ি ঘরে আসিল এবং মা যেমন করিয়া শিশুকে যত্ন করে তেমনি ভাবে দয়াদেবীকে ওষধ ও পথ্য দিল। দয়াদেবী স্নেহের অনুযোগ করিয়া বলিলেন—তুই কোথায় থাকিস বীরু, যে-সে আসে আমার ওষুধ পত্তি দিতে!

বীরেনের মনে হইল বলে—ও ত তোমারই বোন্ মা।—কিন্তু সে দেখিল রাজবালার চোখ ছলছল করিতেছে; তাহার কথা বলিলে পাছে দয়াদেবী বিরক্ত হইয়া আরো কিছু বলিয়া নিরপরাধ রাজবালার মনে ব্যথা দ্যান সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বলিল—ঐ পাশের ঘরেই ছিলাম মা, এই এলাম তোমায় ওষুধ দিতে।......মায়া আয় মার কাছে বোস।

বীরেন-দা আজ মাসিমার সঙ্গে কথা কহিতেছে না, মাসিমাকে মা বকিয়াছে, বীরেন-দা তাহাকে ডাকিল, ইহাতে খুব খুসী হইয়া মায়া তাড়াতাড়ি বীরেনের গা ঘেঁসিয়া মায়ের কাছে বসিয়া আড়ে আড়ে রাজবালাকে দেখিতে লাগিল।

বীরেন মায়াকে দয়াদেবীর কাছে বসাইয়া রাজবালাকে তাহার সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। একটু ইতস্তত করিয়া রাজবালা একবার মায়ার দিকে চাহিল, দেখিল মায়া কটমট করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে; একবার দয়াদেবীর দিকে চাহিল, দয়াদেবী চোখ বুজিয়া আছেন। উঠিতে ইচ্ছা হইলেও সে উঠিতে পারিতেছিল না।

ক্ষণেক পরে দয়াদেবী বলিয়া উঠিলেন—মায়া, আমি পা ছড়াব, ওকে সরে যেতে বল্।

মায়া ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার দায় পড়েছে!

অপমানের আঘাতে ব্যথিত ও লজ্জায় লাল হইয়া রাজবালা আস্তে আস্তে পায়ের মল উঁচুতে গুঁজিয়া খাট হইতে নামিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(১৫)

বাহিরে বীরেন্দ্র অপেক্ষা করিতেছিল। রাজবালা বাহিরে আসিতেই বীরেন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া তেতলার ছাদে সিঁড়ির ঘরে গেল। বীরেন মনে করিয়াছিল সেখানে গুণময় কিছুতেই তাহাদের সন্ধান পাইবে না।

বীরেন রাজবালার হাত ধরিয়া মিনতির সহিত বলিল—আজ ভোরে আমি চলে যাব। আর বোধহয় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। যাবার আগে তোমারি কাছে আমার কিছু প্রার্থনা জানাবার আছে।......

রাজবালার শুভ্র রঙে লজ্জার আভা লাগিয়া দুধে-আলতার রং হইল, গোলাপের পাপড়ির মতন পাতলা ঠোঁট দুখানিতে রক্তের ছোপ গভীর হইল, শুক্তির কৌটার ন্যায় মসৃণ ও উজ্জ্বল গাল দুটিতে নীল নীল শিরাগুলিতে রক্তের নদী চঞ্চল হইয়া উঠিতে দেখা গেল।

বীরেন্দ্র বলিতে লাগিল—আমি চলে যাচ্ছি; মাকে দেখবার কেউ থাকল না, মায়ের সেবার ভার তোমাকে

নিতে হবে; মা তোমাকে বুঝতে না পেরে যে কটু কথা বলছেন, রূঢ় ব্যবহার করছেন তা তোমাকে সহ্য করে থাকতে হবে।...আর একটা কথা বলব?

রাজবালা টানা-টানা সুন্দর চোখ দুটি তুলিয়া বীরেনের দিকে চাহিল। বীরেন আবার জিজ্ঞাসা করিল—বলব?

রাজবালা লজ্জিত দৃষ্টি নত করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—বলো।

বীরেন বলিতে লাগিল—এখনও তোমার অমত আছে জেনেই বলতে সাহস করছি, নইলে বলতে পারতাম না হয়ত। হাতীকান্দার রায়-বাবুর স্ত্রী হওয়ার প্রলোভন বড় বেশী; এখন গুণময় লোকটিকে তোমার খারাপ লাগছে বলে তুমি তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছ না, কিন্তু এই অগাধ ঐশ্বর্য্যের আর বিপুল সম্মানের লোভ লোকটার ওপর বিরাগ একেবারে চাপা দিয়ে ফেলতে পারে। আমার অনুরোধ, তুমি আমার মায়ের, তোমার দিদির, দয়াদেবীর সতিন হয়ো না; তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না, তাঁর মৃত্যুর পর তোমার ইচ্ছা হয় তুমি গুণময়কে বিয়ে কোরো। ঐ গুণময় তোমার দিদিকে বধ করছে—যেদিন ওঁকে বিয়ে করে নিয়ে বাড়ীতে ঢুকল সেই দিনই বড়-রাণী গলায় ক্ষুর দিয়ে মরলেন, সেই দেখে তাঁর যে বুকে ব্যথা লাগল সে ব্যথা আর সারল না; তার পর আমার মাকে গলায় দড়ি দিয়ে গুণময় যখন মারলে তখন তাঁকে দেখে দয়াদেবী যে শয্যা নিয়েছেন এ থেকে আর উঠবেন না; তাঁর মরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে গুণময় এখন চেষ্টা করছে তোমাকে বিয়ে করে মুমূর্ষু স্ত্রীকে চট্ করে মেরে ফেলতে!......

রাজবালা অবাক হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বীরেনের কথা শুনিতেছিল এবং সমস্ত ঘটনা বুঝিতে না পারিলেও গুণময়ের নিষ্ঠুরতার জন্য তাহার উপর ঘৃণা ও ভয় তাহার অন্তর ভরিয়া তুলিতেছিল। রাজবালা জিজ্ঞাসা করিল—তোমার মা কেন গলায় দড়ি দিয়েছিলেন?

—সে ঐ গুণময়ের জন্যে।—বলিয়া বীরেন আপনাদের দুঃখের কাহিনী ও দয়াদেবীর মহত্ত্ব বর্ণনা করিতে লাগিল। বলিতে বলিতে বীরেনের চোখ দিয়া প্রবল ধারায় জল পড়িতে লাগিল, রাজবালাও সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া বীরেনের চেয়েও ফুলিয়া-ফুলিয়া চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতেছিল। বীরেন মায়ের মৃত্যুর পর একদিনও কাঁদিতে পায় নাই; সে কাঁদিলেই দয়াদেবীর পীড়া বৃদ্ধি হইবে বলিয়া সে দয়াদেবীর সামনে কাঁদিতে পারে নাই, দয়াদেবী সর্ব্বদা তাহাকে কাছে-কাছে রাখিতেন বলিয়া সে নির্জ্জনে কাঁদিবারও অবকাশ পাইত না; আজ সে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া বাঁচিতেছে, আর-একজন তাহার জন্য মমতায় তাহার সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদিতেছে এই আনন্দে এই সান্ত্বনায় আজ আর তাহার অশ্রুধারা নিরোধ মানিতে চাহিতেছিল না।

রাজবালা যখন দয়াদেবীর ঘর হইতে বীরেনের আহ্বানে উঠিয়া আসে তখন হিংসায় জ্বলিতে জ্বলিতে মায়াও উঠিয়া আসিয়া লুকাইয়া থাকিয়া দেখিল উহারা কোথায় গেল। তারপর আস্তে আস্তে পা টিপিয়া-টিপিয়া সিঁড়ি বাহিয়া ছাদে উঠিয়া আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া বীরেন ও রাজবালাকে দেখিতে লাগিল। বীরেন ও রাজবালা কাঁদিতেছে দেখিয়া মায়া আবার পা টিপিয়া টিপিয়া নামিয়া গেল।

গুণময় দয়াদেবীর ঘর হইতে রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াও রাগ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, আবার রাজবালার সঙ্গলাভের লোভে দয়াদেবীর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। দয়াদেবী একবার উৎসুক নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিলেন। গুণময় তাঁহার দিকে না তাকাইয়াই মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মোহিনী, এরা...রাজুরা কোথায়?

দয়াদেবী ঘৃণায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। মোহিনী থতমত খাইয়া বলিতে যাইতেছিল—দাদা...... মে,

দয়াদেবী পা দিয়া মোহিনীর গা টিপিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিলেন, মোহিনী সামলাইয়া লইয়া বলিল—দিদিমণি আর মাসিমা ত ঐদিকে গেল।

গুণময় রাজবালার সন্ধানে বাহির হইয়া রাজবালার মায়ের কাছে গেলেন।

রাজবালার মা তখন আঁচল পাতিয়া একটু গড়াইতেছিলেন—এখানে আসিয়া অবধি তাঁহার কাজ হইয়াছে খাওয়া গড়ানো আর রাজবালাকে জপানো। জামাইএর

জুতার শব্দ পাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিলেন।

গুণময় জিজ্ঞাসা করিলেন—মাসিমা, রাজু কৈ ?

—তোমার সঙ্গে-সঙ্গেই ত দয়ার ঘরের দিকে গেল বাবা।

—সেখান থেকে চলে এসেছে।

—ভালো এক ছুড়কো পালানে মেয়ে হয়েছে! তুমি বাবা নবদ্বীপের পণ্ডিতদের কিছু বেশী করে দক্ষিণে দিয়ে কার্ত্তিকমাসে বিয়ের বিধেন নিয়ে শিগ্‌গির দুহাত এক করে ফেলো।......

এমন সময়ে ছাদের সিঁড়ি হইতে নামিয়া মায়া বাবাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া গুণময় জিজ্ঞাসা করিলেন—মায়া, রাজু কোথায় রে ?

মায়া ঢোক গিলিয়া বলিল—মা মাসীকে বকেছে, তাই বীরেন-দার কাছে কাঁদছে।

গুণময় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—বীরেন!

মায়া চোখ পাকাইয়া একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—হ্যাঁ বাবা, তুমি বীরেন-দাকে কলকাতা যেতে বলেছিলে, ও যায়নি, লুকিয়ে আছে।

গুণময় ক্রুদ্ধ হইয়া গণ্ডারের ন্যায় চোখ দুটা ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—যায়নি! কোথায় সে হতভাগা!

মায়া একবার পিছনে সিঁড়ির দিকে তাকাইয়া চুপিচুপি বলিল—ওপরে চিলের ঘরে!

রাজবালার মা অমনি বলিয়া উঠিলেন—তাইতে পোড়া-কপালী এমন করে ফরকে ফরকে মরছে! আমি তাইত ভাবি, আমার অমন সোনার রাজু মন্দ লোকের কুপরামর্শ না পেলে কি অমনি বিগড়োয়!

গুণময় ক্রোধে অধীর হইয়া চটিজুতার চটপটানিতে বাড়ী কাঁপাইয়া বীরেনকে শাস্তি দিতে ছুটিতেছিলেন। মায়া তাড়াতাড়ি বলিল—চুপিচুপি চল বাবা, সাড়া পেলে বার-বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে নেবে পালাবে।

গুণময় চটিজুতা খুলিয়া খালি পায়ে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন; সেই মোটা মোটা থামের মতন পায়ের দাপে মেদিনী কম্পমান। বীরেন ও রাজবালা কাঁদিতেছিল বলিয়া সে পায়ের শব্দ লক্ষ্য করিল না।

গুণময় পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া একেবারে বীরেনের কান বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—পাজি হতভাগা, যার খাবি তারই সর্ব্বনাশ করবি! বেরো আমার বাড়ী থেকে।

বীরেন অকস্মাৎ আক্রমণে বিমূঢ় হইয়া চোখ হইতে হাত সরাইয়া যেমন মুখ তুলিল অমনি গুণময় তাহার গালে বিরাশি সিক্কার ওজনের এক চড় মারিয়া কান ধরিয়া ক্রমাগত নাড়া দিতে দিতে দুপাটি বাঁধানো দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ঠকঠক শব্দ করিতে করিতে গর্জ্জিতে লাগিলেন—ঠাকুরের ভোগে কুকুরের দৃষ্টি! ঠাকুরের ভোগে কুকুরের দৃষ্টি!

মায়া বীরেনকে অত্যন্ত ভালবাসিয়াছিল; সেই বীরেন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া অপরকে বেশী ভালবাসিতেছে বলিয়া মায়া হিংসার তাড়নায় বাপের কাছে গিয়া বীরেনের নামে নালিশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারই চোখের সামনে বীরেনকে লাঞ্ছিত পীড়িত অপমানিত দেখিয়া মায়া কাঁদিতে-কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার বাবার হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে বলিতে লাগিল—ও বাবা বীরেন-দাকে মেরো না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি বীরেন-দাকে মেরো না।

বীরেন মাথার এক ঝটকায় গুণময়ের হাত হইতে কান ছাড়াইয়া লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার গায়ে হাত তোলাতে, এই মেয়ে-দুটির সামনে তাকে অভদ্র অপমান করাতে, তাহার মাতৃবধের সদ্য-বর্ণনায় উদ্দীপ্ত শোক দারুণ প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠিল; তাহার উন্মত্ত রক্তধারায় খুনের গাজন নাচিয়া উঠিল। তাহার সুন্দর কমনীয় কৃশতনু ঋজু হইয়া উঠিল, গৌর বর্ণ আরক্ত হইল, নিটোল ললাটে ও মসৃণ কণ্ঠে শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, তাহার ভাসা-ভাসা উজ্জ্বল চোখ দুটি ধারালো ছুরীর ধারের মতন তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে শান্ত হইয়া দৃষ্টি নত করিল—তাহার মনে পড়িয়া গেল গুণময় তাহার মাতা দয়াদেবীর স্বামী, তাঁহার গায়ে হাত তুলিলে দয়াদেবীর মনে বাজিবে। বীরেন সেখান হইতে একছুটে দয়াদেবীর ঘরে গিয়া তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে যাইবার সময় শুনিতে পাইল রাজবালার মা চেঁচাইতেছেন—বামন হয়ে চাঁদ ধরবার সাধ! আগে সাত জন্ম তপিস্যে কর্, তবে ত রাজুর মতন বৌ ভাগ্যে জুটবে।

এই দুদিন আগে রাজবালার মায়ের কাছে বীরেন দিব্যি সুপাত্র ছেলেটি ছিল, আজ খুনী ডাকাত গুণময়ের তুলনায় সে অপাত্র হইয়া পড়িয়াছে।

বীরেন চলিয়া গেলে গুণময় আদর করিয়া রাজবালাকে বলিলেন—রাজু, তুমি আজ বাদে কাল রাজরাণী হবে, ঐসব ছোটলোকদের সঙ্গে এত মাথামাথি কি তোমার সাজে ! এস তুমি আমার সঙ্গে। চল, চার ঘোড়ার গাড়ী করে বেড়াতে যাবে ?

গুণময়ের প্রতি বিরাগ রাজবালার চরমে উঠিয়াছিল। বীরেনের উপর কি নৃশংস অত্যাচার এই গুণময় করিয়া আসিতেছে তাহা সে এইমাত্র বীরেনের মুখ হইতে শুনিয়াছে ; এখন তাহার চোখের সামনে বীরেন যে লাঞ্ছনা ভোগ করিল তাহা তাহারই জন্য—ভয়ের কারণ সত্ত্বেও বীরেন যে কলিকাতা না গিয়া এই বাড়ীতে লুকাইয়া ছিল সে ত তাহাকেই দেখিবার লোভে। অতবড় ছেলে বীরেনকে যে-লোক মারিতে দ্বিধা বোধ করিল না সেই অমানুষ আসিয়াছে তাহাকে প্রণয় দেখাইতে ! সেই প্রণয়-পাগল ভয়ানক লোকটা তাহার স্ত্রীকে যে কত ভালবাসে কেমন যত্ন করে তাহাও ত সে বীরেনের কাছে এই মাত্র শুনিল, স্বচক্ষেও ত দেখিতেছে। তাহাকে স্বামী বলিয়া বরণ করিবে কিসের লোভে ? ঐশ্বর্য্য ? ধিক্ ! এই অট্টালিকায় বিলাস-আড়ম্বরের ভিতর নিষ্ঠুর জমিদারের শত বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে একটা হইয়া থাকার চেয়ে নিরাশ্রয় বীরেন্দ্রের হাত ধরিয়া পথে দাঁড়ানো ঢের গৌরবের ঢের আনন্দের ঢের কল্যাণের।

রাজবালা লঘুক্ষিপ্র পদে গুণময়কে এড়াইয়া নীচে নামিয়া গিয়া একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া দরজায় খিল লাগাইয়া মেঝেতে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল—তাহার পরিত্রাণের উপায় কি, তাহার গতিই বা কি হইবে ?

(১৬)

চিলের ছাদের ঘর হইতে সবাই চলিয়া আসিল ; মায়া কিন্তু নড়িতে পারিতেছিল না। একলাটি সেই প্রকাণ্ড ছাদে ভূতের ঘরে থাকিতে মায়ার অত্যন্ত ভয় হইতেছিল, কিন্তু সে নীচে নামিতেও পারিতেছিল না—সে যে অন্যায় অপকর্ম্ম করিয়াছে, ইহার পর সে বীরেনের সম্মুখে যাইবে কেমন করিয়া। মায়ার অত্যন্ত রাগ হইতেছিল রাজবালার উপর—এতদিন ত সে তাহার বীরেন-দাদাকে লইয়া দিব্য নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে ছিল, কোথা হইতে রাজবালা আসিয়াই তাহার বীরেন-দাদাকে বে-দখল করিয়া বসিল, ইহা তাহার অসহ্য। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া-থাকিয়া ভয়ে-ভয়ে চারিদিকে চাহিতে-চাহিতে মায়া একটু-একটু করিয়া সরিতে-সরিতে সিঁড়ির কাছে গেল ; তারপর 'বাবাগো' বলিয়া চীৎকার করিয়া সিঁড়ি দিয়া এক ছুটে নীচে নামিয়া গেল। নীচে নামিয়া সে কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইল না। তাহার মনে হইতে লাগিল নিশ্চয় বীরেন-দা আবার মাসিমার সঙ্গে কোনো ঘরে লুকাইয়া গল্প করিতেছে ! মায়ার অত্যন্ত কান্না পাইতে লাগিল। সে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিবার জন্য একেবারে প্রস্তুত হইয়াই ছুটিয়া মায়ের কাছে গেল।

মায়ের ঘরে ঢুকিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার আর কাঁদা হইল না। সে দেখিল বীরেন তাহার মায়ের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতেছে আর তাহার মা তাঁহার দুর্ব্বল ক্ষীণ হাতখানি বাড়াইয়া মমতাভরা স্বরে তাহাকে ডাকিতেছেন—বীরু, বাবা, তোর মুখে পা লাগছে, আমার হাতের কাছে সরে আয়...

মায়া আস্তে আস্তে সরিয়া সরিয়া গিয়া বীরেনের কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ভয়ে-ভয়ে মৃদু স্বরে ডাকিল—বীরেন-দা !

বীরেন কোনো সাড়া দিল না। মায়া ঠোঁট ফুলাইতে-ফুলাইতে বলিল—আমি আর কক্‌খনো করব না ভাই, আমার ঘাট হয়েছে......

বীরেন কান্না থামাইয়া মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু পারিল না। বীরেনের তিথনো কোনো সাড়া না পাইয়া মায়া বলিল—তোমার দুটি পায়ে পড়ি বীরুদা ......তুমি না হয় আমায় খুব ক'ষে মারো, আমি কাঁদব না......

বলিয়াই মায়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বীরেন মুখ না তুলিয়াই হাত দিয়া মায়াকে বেষ্টন করিয়া আপনার গায়ের সঙ্গে চাপিয়া ধরিল।

দয়াদেবী বলিলেন—কি হয়েছে রে মায়া ? তুই দাদাকে মেরেছিস বুঝি ?

মায়া কান্নার মধ্যে হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল—বারে ! আমি কেন ? আমি বাবাকে বলে দিলাম যে বীরেন-দা

মাসিমার সঙ্গে কাঁদছে, তাইতে বাবা গিয়ে মেরেছে! তা বীরেন-দা আমায় মারুক না, শোধবোধ যাবে......

দয়াদেবী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—উনি এত করেও তৃপ্ত হননি, শেষকালে গায়ে হাত তুললেন!

দয়াদেবীর চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মায়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহাকে কিন্তু কেহই তখন লক্ষ্য করিল না, কেহ একটি সান্ত্বনার কথাও বলিল না।

বীরেন মাথা তুলিয়া দয়াদেবীর দিকে চাহিয়া বলিল—মা, আমি কাল ভোরে কলকাতা যাব। তোমাকে আর আমি দেখতে পাব না এই আমার চরম শাস্তি!

দয়াদেবী চোখের জল মুছিতে-মুছিতে বলিলেন—আর আমি এ বাড়ীতে তোকে থাকতে বলতে পারিনে, তুই যা। আমারও দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমার আশীর্ব্বাদে তোর কোনো অমঙ্গল হবে না। বড় আশা করেছিলাম বাবা, মায়ার সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো—সে সাধ আমার পূরল না।

মায়া কান্নার মধ্যে বলিয়া উঠিল—আমি আর কক্‌খনো এমন কাজ করব না বীরেন-দা, তুমি আমাকে বিয়ে কোরো।

মায়ার এই কথায় দয়াদেবী ও বীরেনের কান্না যেন উথলিয়া উঠিল। বীরেন দুইহাতে মায়াকে জড়াইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল।

দয়াদেবী অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া একটু শান্ত হইয়া বলিলেন—বীরেন, আমার লোহার সিন্দুকে এক-বাক্স গহনা আছে, সে তোর বৌকে দেবো বলে মানত করে তুলে রেখেছি, তুই সেই বাক্সটা নিয়ে আয়, কলকাতার ব্যাঙ্কে সেফ-ডিপজিট করে রেখে দিস......

—মা, আমি বিয়ে করব না। বিয়ের আশা আমার ঘুচে গেছে। ও গহনা আমি মায়াকে দিলাম।

মায়া উৎফুল্ল হইয়া বীরেনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমি তোমার বৌ বীরেন-দা, তাইতে আমাকে দিলে?

বীরেন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—না ভাই, তুমি আমার বোন বলে তোমাকে দিলাম।

দয়াদেবী জেদ করিয়া বলিলেন—না বাবা, সে কি কথা! ওকালতি পাশ করে তুই রোজগার করবি, সংসারী হবি। তোর যে-সংসার আমরা ভেঙেছি সেই সংসারের লক্ষ্মীকে আমার গায়ের গয়না দিয়ে সাজাব এই যে আমার মানত ছিল!

বীরেনও জোরের সঙ্গে বলিল—ওকালতি এবার পাশ করবই মা, কিন্তু রোজগার করে সংসারী হবার জন্যে নয়। নিজে ভুগে দেখেছি, গরিব দুঃখী—যার ওপর প্রবলের অত্যাচার হচ্ছে—তার হয়ে লড়বার লোক উকিলদের মধ্যে নেই, তারা সবাই শুধু চেনে টাকা। আমি যেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ব্রত নিতে পারি—এই আশীর্ব্বাদ আমায় করো মা, আমায় স্বার্থপর হতে বোলো না।

বীরেন দয়াদেবীর পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। দয়াদেবী হাত বাড়াইলেন, বীরেন নিকটে সরিয়া গেল, দয়াদেবী তাহার মাথায় হাত রাখিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। তারপর বলিলেন—তবে আর-একটা কথা তোকে রাখতে হবে বাবা। আমি কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছি, তা তোকে নিতে হবে।

বীরেন একটু ভাবিয়া বলিল—আচ্ছা দাও মা, আমার চেয়েও গরিবদের সেবায় লাগবে।

(১৭)

রাত থাকিতে উঠিয়া বীরেন দয়াদেবীর কাছে বিদায় লইয়া চোখের জল মুছিতে-মুছিতে ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল অন্ধকারে রাজবালা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া বীরেন জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এখানে কি করছ?

রাজবালা অতি মৃদু স্বরে বলিল—তুমি যে যাচ্ছ।

বীরেনের সমস্ত অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে আর কোনো কথা বলিতে পারিল না।

রাজবালা আবার বলিল—কবে ফিরবে?

রাজবালার স্বর বড় কম্পিত, বড় আর্দ্র।

বীরেন আবেগ সম্বরণ করিয়া কঠিন হইয়া বলিল—এই আমার অগস্ত্যযাত্রা, তোমার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না।

রাজবালা ইতস্তত করিতে-করিতে বলিল—আমায় বলে যাও আমি কি করব?

—আমার মা রইলেন, তাঁর সেবা কোরো; আর পারো ত তাঁর সতীন হয়ো না। আমার কথা ভুলে যেয়ো।

বীরেন তাহাকে ভুলিতে অনুরোধ করিয়াই ভুলিতে বারণ করিল। রাজবালা আঁচল দিয়া চোখ ঢাকিল। বীরেনও চোখের জল মুছিতে-মুছিতে চলিয়া গেল।

রাজবালা সেই ভোরে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া তীর্থ-স্নাতা তপস্বিনী যে ভাবে দেবতার মন্দিরে যায় সেই ভাবে দয়াদেবীর ঘরে গেল। দয়াদেবী তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন—এ যেন মূর্ত্তিমতী ব্যথা।

রাজবালা জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, এখন কি মুখ ধোবে?

আজ আর দয়াদেবী বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তিনি শুধু বলিলেন—মোহিনী আসুক।

—মোহিনী এখনো ঘুমুচ্ছে।—বলিয়া রাজবালা উঁচু টুল আনিয়া খাটের পাশে রাখিল এবং তাহার উপর রূপার একখানি ছোট রেকাবিতে করিয়া মাজন, রূপার জিভ-ছোলা, রূপার ডাবর ও এক ঘটী জল সাজাইয়া রাখিল; তারপর দয়াদেবীকে ধরিয়া ধীরে ধীরে তুলিয়া বসাইয়া তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল।

দয়াদেবীকে মুখ ধোয়াইয়া ঔষধ খাওয়াইল। তারপর ষ্টোভ জ্বালিয়া মেলিন্স্ ফুড তৈরি করিবার জন্য জল গরম করিতে দিয়া মোহিনীকে দুধ জ্বাল দিয়া আনিতে বলিতে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই রাজবালা ফিরিয়া আসিল, তাহার পিছনে-পিছনে আসিলেন গুণময়। গুণময় বলিলেন—তুমি এখানে কি করবে রাজু, তুমি আমার সঙ্গে ছাতে একটু বেড়াবে এস!

রাজবালা ভয়ে অভিভূত হইয়া খাটের ওপারে দয়াদেবীর কোল ঘেঁসিয়া গিয়া বসিল। গুণময় দমিবার পাত্র নন, তিনিও খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া ঝুঁকিয়া রাজবালার হাত ধরিয়া বলিলেন—রাজু, তোমার হাতখানি কি নরম!

রাজবালা হাত ছাড়াইয়া লইয়া পিছন ফিরিয়া বসিল। গুণময় তাহার দীর্ঘ ঘন চুলের গোছা হাতে তুলিয়া বলিলেন—এই সকাল বেলা তুমি চান করেছ রাজু! কী সুন্দর চুল তোমার! তোমার সব ভালো রাজু!

রাজবালা উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গুণময়ও পিছু-পিছু চলিলেন। রাজবালা ক্ষিপ্র পদে এঘর সেঘর ঘুরিয়া গুণময়কে সাত পাক খাওয়াইয়া নাকাল করিয়া দিয়া লুকাইয়া আবার দয়াদেবীর ঘরে চলিয়া আসিল। তাহার মুখ কৌতুকের হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

রাজবালার সেই হাসি প্রণয়লীলার দীপ্তি বলিয়া ভুল বুঝিয়া দয়াদেবী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—বাড়ীতে ঘরের ত অভাব নেই রাজু, তুমি আমার এই ঘরটিতে এসো না; আমি তোমার হাতে ধরে ভিক্ষে চাচ্ছি, আমায় একটু নিরুপদ্রবে মরতে দাও। এ ঘরও খালি হতে আর বেশী দেরী হবে না।

রাজবালা বিস্ময়ে ভয়ে দুঃখে অভিভূত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে দেখিয়া দয়াদেবীর কোমল মন ভিজিয়া উঠিল, তিনি নরম স্বরে বলিয়া উঠিলেন—রাজু, তুই কাঁদছিস কেন?

এই মমতার স্পর্শ পাইয়া রাজবালার চোখ দিয়া অশ্রু-ধারা বেগে বহিতে লাগিল, সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—দিদি, তুমি আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও......

—তোর অঘ্রাণ মাসে বিয়ে হবে শুনছি, এখন বাড়ী যাবি কি?

—তোমার দুটি পায়ে পড়ি দিদি, তুমি আমাকে বাঁচাও, আমি জামাই-দাদাকে বিয়ে করতে পারব না।

দয়াদেবী অতিমাত্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—জামাই-দাদাকে বিয়ে করবি কে বলছে?

রাজবালা আবেগের ঝোঁকে তাহার মা ও ভগ্নীপতির গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁশ করিয়া ফেলিয়া কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া চুপ করিয়া গেল।

দয়াদেবী উৎসুক হইয়া বলিলেন—বল্ রাজু, ও কথা কে বললে?

রাজবালা মাকে বাঁচাইবার জন্য ঘুরাইয়া বলিল—জামাই-দাদা মাকে বলছিলেন।

—মাসিমারও মত হয়েছে?

রাজবালা চুপ করিয়া রহিল।

দয়াদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আমার মরারও সবুর সইছে না!......রাজু, আমার কাছে আয়।

রাজবালা কাছে গিয়া দাঁড়াইলে দয়াদেবী তাহার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন—রাজু, তুই আমার ছোট বোন, তোর হাতে ধরে ভিক্ষে চাইছি আমি যে ক'টা দিন আছি আমার সোয়ামীকে আমারই থাকতে দিস।

রাজবালা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—আমি ওকে ককৃখনো বিয়ে করব না, ককৃখনো বিয়ে করব না।

হাঁপাইতে-হাঁপাইতে গুণময় আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। রাজবালার দিকে চাহিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলেন—রাজু, এই ত খুঁজে বার করেছি! এইবার তুমি আঁধি—তুমি খুঁজবে, আমি লুকোবো, এসো......

দয়াদেবী দৃষ্টি নত করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন—তোমার কাছে আমার একটা ভিক্ষে আছে।

চমকিয়া উঠিয়া গুণময় গম্ভীর হইয়া বলিলেন—আঁা! আমায় বলচ?

—হাঁা। আমার মরতে আর বিলম্ব নেই—আমার কোনো কথা কখনো তুমি শোনোনি, এই শেষ অনুরোধটি তোমায় রাখতে হবে।

—কি?

—আমি মরার আগে তুমি বিয়ে কোরো না।

গুণময় ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিলেন—আমি বিয়ে করব তোমায় কে বললে? রাজু বুঝি? বলেছে ভালোই করেছে। তুমি ত মরতে বসেছ, বিয়ে না করলে আমার সংসার-ধম্ম বজায় থাকে কেমন করে?

দয়াদেবী ব্যথিত হইয়া বলিলেন—বিয়ে কোরো। কিন্তু আমি যে কটা দিন বেঁচে আছি......

গুণময় বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—তোমার মরবার ত কোনো গা দেখছিনে। তুমি যদি এখন কিছুকাল না মরো!

দয়াদেবীর চোখে জল আসিতেছিল, তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া কঠিন হইয়া রহিলেন।

স্ত্রীর কাছে গোপনতার যেটুকু সঙ্কোচ ছিল সেটুকুও ঘুচিয়া যাওয়াতে গুণময় স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন—রাজু, এসো আমরা খেলা করিগে, রুগী আগলে বসে থাকা কি তোমার সাজে!

রাজবালার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, তাহার মনে হইল, এ লোকটা মানুষ না দানব!

মোহিনী দুধ জাল দিয়া আনিল। রাজবালা দয়াদেবীর খাবার তৈরি করিতে বসিল, গুণময়ের দিকে লক্ষ্যও করিল না।

চতুর খানসামা আসিয়া খবর দিল বিলাসপুরের জমিদার রসময় বাবু বিবাহের জন্য স্বয়ং মায়াকে দেখিতে আসিয়াছেন।

গুণময় বলিলেন—মোহিনী, মায়াকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে বৈঠকখানায় নিয়ে আয়।

গুণময় চলিয়া গেলেন।

মায়া ঘুম হইতে জাগিয়া বাবার ভয়ে চোখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়া ছিল, গুণময় বাহির হইয়া যাইতেই মায়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—মা, আমি বীরেন-দাদাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।

দয়াদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মুছিলেন। (ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভালো

ভালো ওগো ভালো আমার
সকল কথার শেষ,
আঁখি দুটি আলোয় ভরে'
দেখাও উজল দেশ—
যে দেশেতে ভালোর সঙ্গে
ভালোয় কথা কয়,
যে দেশেতে আলোর মাঝে
ঘটায় পরিচয়,
যে দেশেতে সবার পরাণ
সহজ স্বাধীন সুখে,
নিত্য ভরে, নিত্য হরে
বক্র কুটিল দুখে,
যে দেশেতে বিড়ম্বনা
নাইকো কোনো কাজে
সফলতার তূর্য্য যেথা
আকাশ জুড়ি বাজে,
যে দেশেতে যাবার লাগি
যাত্রা সবার সুরু,
যে দেশেতে আছেন বসে
প্রাণের পরম গুরু;
সেই দেশে আজ আলোর মাঝে
নব ভালোর দীক্ষা
এরই লাগি সবার প্রাণে
সদাই প্রতীক্ষা।

শ্রীহেমলতা দেবী।

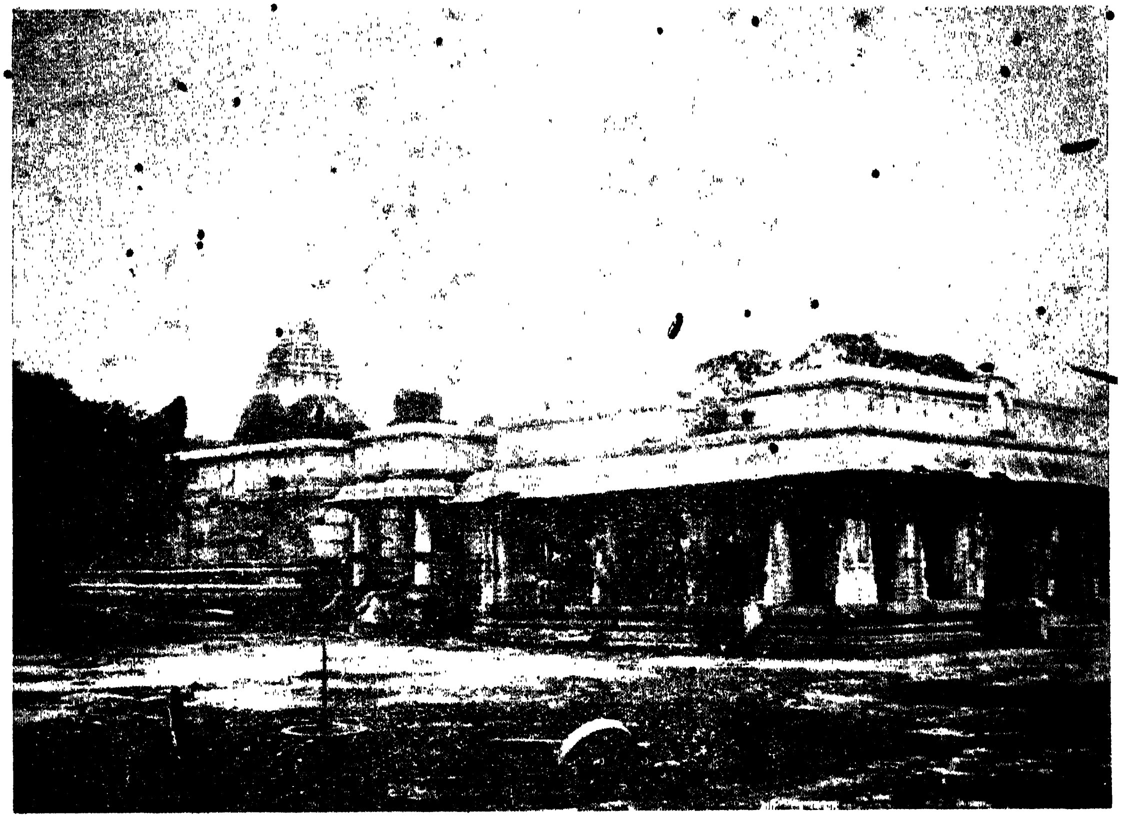
বিজয়নগর

দাক্ষিণাত্যে বেলারীর অনতিদূরে হিন্দুরাজধানী বিজয়গনরের ধ্বংসাবশেষ এখনও সুদূর অতীতের করুণস্মৃতি বক্ষে বহিয়া অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া কালের বিচিত্রলীলা দেখিতেছে। তাহার সৌভাগ্যদীপ্ত উজ্জ্বল দিনগুলি মহাকালের ফুৎকারে ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু জানি না তাহার যৌবনের কল-রাগিণীর মধুর স্মৃতি এখনো তাহাকে পীড়ন করিতেছে কি না। একদিন সে এক প্রবল প্রতাপান্বিত বিশাল হিন্দু-রাজত্বের গৌরবময় স্বাধীনতার ধ্বজা বক্ষে বহিয়াছিল—আজ তাহার সেই স্বাধীনতার কথা, তার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কথা, সেই হিন্দুরাজত্বের কথা মনে পড়ে কি না কে জানে?

শুধু কিম্বদন্তীর উপর ভিত্তি করিয়া তাহার গৌরব-কাহিনী প্রচারিত হয় নাই—বিভিন্ন ইউরোপীয় ও পারসী পর্য্যটকগণের ভ্রমণকাহিনীতেও বিজয়নগরের বিস্তৃত বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশী পর্য্যটকগণ মুক্তকণ্ঠে এই বিরাট হিন্দুরাজত্বের প্রবল শক্তি সামর্থ্যের কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পায়স্, নুনিজ, প্রভৃতি ইউ-রোপীয় ও আবদর রস্সাক নামক পারস্যদেশীয় পর্য্যটকের ভ্রমণকাহিনী উল্লেখযোগ্য। আবদর রস্সাক পারস্যদেশীয় দূত ছিলেন। তিনি বলেন চক্ষু কখনও এরূপ স্থান দেখে নাই, কান এরূপ সৌন্দর্য্যশালী নগরের কথা কোনও দিন শুনে নাই।" আর-একজন পর্য্যটক বলিতেছেন—"এই নগরের রাস্তাগুলি ও বেড়াইবার চত্বরগুলি বেশ প্রশস্ত—সর্ব্বদাই নানান দেশের নানাজাতীয় লোকে পূর্ণ। এই লোকগুলি শুধুশুধুই উন্মাদের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় না—তাহাদের সকলেই কাজের জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। ইহা হইতেই নগরের বাণিজ্যসমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।" পায়স্ নামক পর্য্যটক জাতিতে পর্ত্তুগীজ। তিনি ১৫২৯ খ্রীঃ বিজয়নগরে আসেন—সেই সময় বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণদেব প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসনে তৎপর ও বিজয়নগরের খ্যাতি চারিদিকে পরি-ব্যাপ্ত। তিনি বলিয়াছেন, "এই বিশাল সাম্রাজ্যের রাজ-ধানী বিজয়নগর রোমের ন্যায় বিস্তৃত ও সৌন্দর্য্যে তাহা অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে। স্থানে স্থানে রমণীয় বিটপীকুঞ্জ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রণালী ও ঝিল ও প্রাসাদসন্নিহিত তাল ও অন্যান্য বিটপীবিতানগুলি নগরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। এই নগরে এত অধিকসংখ্যক লোক আছে যে লিখিলে অনেকে নেহাৎ গল্প মনে করিবেন।"

রাজার জাঁকজমক-প্রিয়তার কথা শুনিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। বিদেশী পর্য্যটকগণ যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে মোটামুটি অত্যুক্তি বাদ দিয়া যাহা বুঝা যায় তাহাই আমরা ধরিয়া লইব। তাঁহারা বলিতেছেন, "ভারতবর্ষের সকল রাজার চেয়ে বিজয়নগরাধিপতি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতা-শালী। তাঁহার দ্বাদশসহস্র পত্নী। এই দ্বাদশসহস্রের মধ্যে চারিহাজার তিনি যেখানেই যান সেই খানেই পায়ে হাঁটিয়া তাঁহার অনুগমন করেন। ইঁহারা রান্নাঘরের পাচিকা ও পরিচারিকা। আরও চারিসহস্র বিচিত্রবর্ণের বেশ পরিধান করিয়া অশ্বারোহণে রাজানুগমন করেন। বাকী চারি-হাজার পাল্কীতে চড়িয়া যান। ইহার মধ্য হইতে দুই তিন হাজারকে সহধর্ম্মিণী করিয়া লওয়া হয়। তাঁহাদিগকে এই সর্ত্তে সহধর্ম্মিণী হইতে হয় যে, সহধর্ম্মিণীর প্রধান কর্ত্তব্য তাঁহারা পালন করিবেন—সহমরণে তাঁহারা যাইবেন। সৈন্যসংখ্যা—দশলক্ষ পদাতিক, ও এক সহস্র হস্তী। এই হস্তীগুলি পর্ব্বতের মত বিশালকায় ও দৈত্যের মত ভীষণ। রাজা যখন যুদ্ধে যান তখন নানাবিধ বর্ম্মে তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত থাকে। অশ্বের জীন স্বুবর্ণনির্ম্মিত, দেহের বর্ম্মের চারিদিক মুক্তা ও পোখরাজে সুশোভিত ও ক্রমশঃ সরু উষ্ণীষে একটি প্রকাণ্ড হীরকখণ্ড দীপ্তি পায়। সুবর্ণের ঢাল ও সুবর্ণমণ্ডিত তিনখানি অসি তাঁহার অস্ত্র।"

২৫০ বৎসরের বিপুল চেষ্টা সত্ত্বও পঙ্গপালের মত মুসলমানগণ দাক্ষিণাত্য ছাইয়া ফেলিতে পারেন নাই তাহার কারণ এই হিন্দুরাজত্ব বিজয়নগর। যখনই মুসলমানগণ বিপুল বিক্রমে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছেন তখনই দাক্ষিণাত্যের চোল পাণ্ড্য ও হয়শাল বংশীয় হিন্দু-রাজগণ সমবেত হইয়া বিজয়নগরের নেতৃত্বে তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে। ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনটি হিন্দু রাজ্য—ওয়ারাঙ্গাল, দ্বারসমুদ্র ও আমেগুণ্ডি—মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় বিজয়নগর-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া পড়িল। রাজ্যলিপ্সু মুসলমানগণের "আল্লা দীন"রব "হর



রাগনাথের মন্দির।

হর মহাদেও"এর মধ্যে ডুবিয়া গেল। কিন্তু হিন্দুদিগের এই বিজয়-উল্লাস বেশী দিন টিকিল না—কালনেমি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগরের স্বাধীনতারবি অস্তমিত হইয়া গেল; যে স্বাধীনতাসূর্য্য এতদিন ধরিয়া কিরণ বিকীর্ণ করিতেছিল তাহাকে কালরাহু গ্রাস করিয়া ফেলিল। হিন্দুদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। রামরাজার লক্ষ পদাতি ও দুই সহস্র হস্তীর বিক্রম তুচ্ছ করিয়া মুসলমান জয়ী হইলেন। সমবেত মুসলমানগণ কামানের মধ্যে তামার টাকা ভরিয়া দাগিতেছিলেন—তামার টাকার আঘাতে বহু হিন্দু পঞ্চত্ব পাইতে লাগিলেন ও একটি উন্মত্ত হস্তী রাজপাল্কীর নিকট দিয়া যাইতেছে দেখিয়া বাহকগণ রাজাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। রাজা বন্দী হইলেন। নৃশংস শত্রুরা তাঁহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিয়া ফেলিল। রাজার তিন ভাইএর মধ্যে একজন বাঁচিয়া গেলেন। এই ভ্রাতার নাম তিরুমাল। তিনি পাঁচশত হাতীতে ১৫০ কোটি টাকা মূল্যের ধনরত্ন লইয়া পলায়ন করিলেন। পরদিন বিজয়ী মুসলমানগণ লুঠতরাজ আরম্ভ করিলেন—লুঠতরাজ পাঁচ মাস ধরিয়া চলিল। যেস্থান একদিন সমৃদ্ধির উচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছিল, বিভিন্ন জনসমূদের কোলাহলে মুখরিত ছিল, তাহা পাঁচ মাস পরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। "বোধ হয় বিশ্ব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এইরূপ সুন্দর নগরের এরূপ সহসা ধ্বংসের খবর পাওয়া যায় না। কাল যে সহর ধন ও বাণিজ্য-গৌরবে ঝলমল করিতেছিল, আজ তাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত! এইরূপ পাশবিক বর্ব্বরতার সহিত বোধ হয় কোনও নগর ধ্বংস করা হয় নাই। যেরূপ বর্ব্বরতার পরিচয় এখানে দেওয়া হইয়াছিল তাহা লিখিবার ভাষা এখনও সৃষ্ট হয় নাই।"

বিজয়নগরের সহরতলীতে অনন্তশয়নগদী মন্দিরটি এককালে খুব বিখ্যাত ছিল। এই মন্দিরটির গর্ভগৃহটি



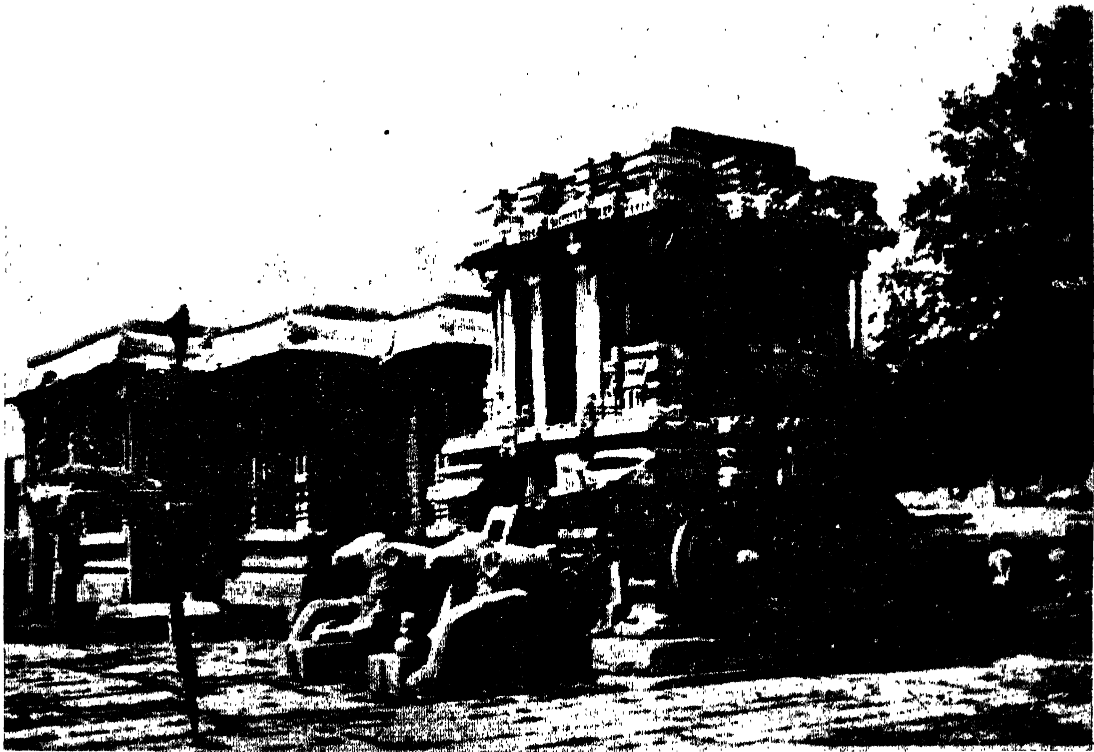
পাম্পাপতি মন্দির।

অদ্ভুত ধরণের—তাহার প্রত্যেক দিকে একটি করিয়া চত্বর; দেখিতে মন্দিরটি বিচিত্র। এ মন্দিরে কোনও দিন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। বিজয়নগরের জনৈক রাজা মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া অনন্তসেনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবেন এইরূপ মনস্থ করেন। জনৈক লোককে বিগ্রহ আনিতে পাঠানো হইল। মূর্ত্তি এই সর্ত্তে আসিতে স্বীকার করিলেন যে, মানুষটি আগে আগে যাইবে তিনি পেছনে পেছনে যাইবেন—যতক্ষণ না বিগ্রহ মন্দিরে পৌছান ততক্ষণ লোকটি পেছনে তাকাইতে পারিবে না। কিন্তু মানুষটি তাহার কৌতূহল দমন করিতে পারিল না—সে পেছন ফিরিয়া তাকাইল, দেবতাটি তখনই সেখানে দাঁড়াইলেন আর নড়িলেন চড়িলেন না। সেই হইতে তিনি হলুলুতেই থাকিয়া গেলেন। এই গল্পটি অনেকটা রাবণ কর্ত্তৃক শিব আনয়নের মত ও শিবের বৈদ্যনাথধামে অবস্থানের মত।



ভগ্ন তোরণ।

রাজপ্রাসাদটি যে বিশালকায় ও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। হাতীশালা, মন্ত্রণাগার, কাছারী-বাড়ী প্রভৃতি এখনও অবিকৃত অবস্থায় আছে। এই-সকল দেখিলে রাজপ্রাসাদের পূর্ব্বসমৃদ্ধির পরিচয় কথঞ্চিৎ পাওয়া



পাথরের রথ।

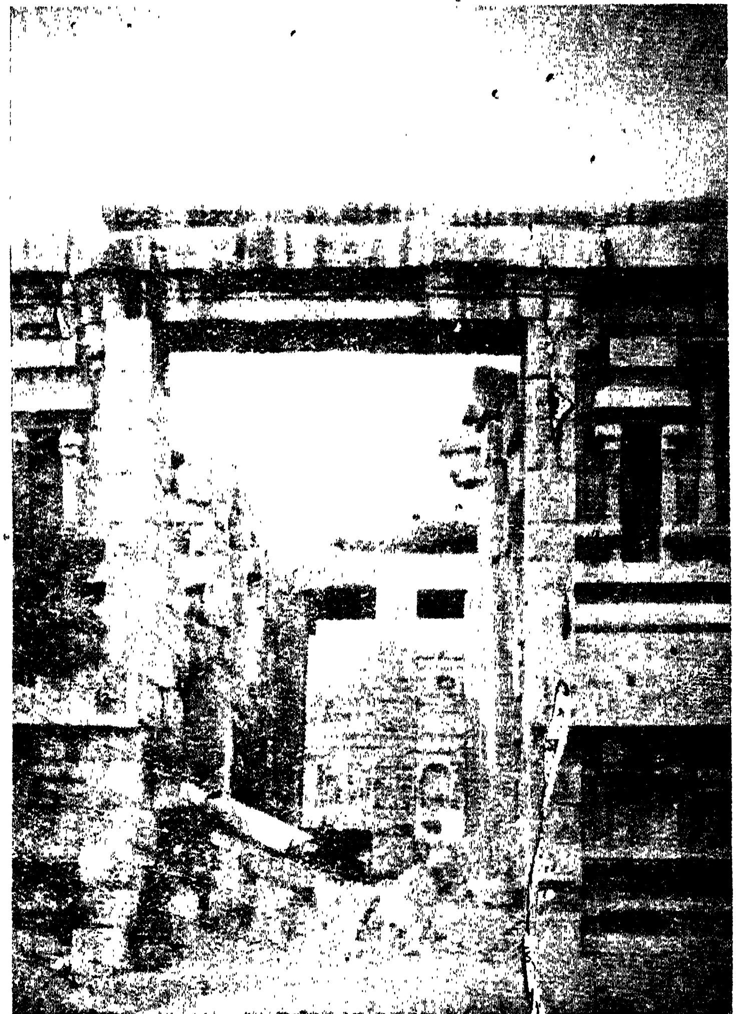
যায়। পাহারা দিবার জন্য কতকগুলি উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল— এই-সকল মঞ্চ হইতে অনেক দূর দেখা যাইত।

দশ'রা দিব্ব বা মহানবমী নামটি নয়দিনব্যাপী উৎসব হইতে হইয়াছে। এই চত্বরটিতে নয়দিন ধরিয়া উৎসব চলিত ও রাজা উপর হইতে দেখিতেন। চত্বরের চারিদিকের উৎকীর্ণ চিত্রগুলি বেশ সুন্দর। নানাপ্রকারের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কোথায়ও সুনিপুণ শিকারী বালহাঁস শিকারে ব্যস্ত, কোথায়ও চঞ্চল লঘুগতিতে নর্ত্তকীরা নৃত্য করিতেছে, কোথায়ও হস্তীযূথ ও অন্যান্য পশু বিচরণ করিতেছে। একজায়গায় একটি শিকারের চিত্র—চিত্রে একটি ক্রসের ছবি! এই ক্রসের ছবি নিশ্চয়ই পরে কেহ উৎকীর্ণ করিয়াছে। পর্ত্তুগীজেরা রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহারই ফলে এই ক্রসের চিত্র লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে হাজারা রামস্বামীর মন্দির। মন্দিরের প্রস্তরশিল্প অতি সুন্দর; রামায়ণের বিভিন্ন দৃশ্যের চিত্র ইহাতে উৎকীর্ণ হইয়াছে আর শিল্পীরা তাহাদের হৃদয়ের রক্ত দিয়া যেন এই-সকল চিত্র লিখিয়াছে। এই সকল চিত্রলেখার মধ্যে তাহাদের প্রাণপাত পরিশ্রম ও অনুপম চাতুর্য্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তো গেল তাহার পূর্ব্ব গৌরবের কথা। এইবার তাহার উপর অত্যাচারের করুণ কাহিনী স্মরণ করা যাউক।

বিজেতাদের বর্ব্বরতার পরিচয় পদে পদে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিট্‌ঠল-স্বামীর মন্দিরে ইহা যেমন সুপরিস্ফুট, আর কোথায়ও সেরূপ নহে। এই মন্দিরের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য-গরিমা এরূপ ছিল যে বিঠোবা দেবতা সেখানে তুচ্ছ হইয়া পড়িবার ভয়ে মন্দিরে যান নাই, শূন্য মন্দির পড়িয়া ছিল। যাঁহারা দেবতার নামে নিজের ঐশ্বর্য্যের পূজা করেন

তাঁহাদের বেশ শিক্ষা হইয়াছিল। সমস্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে ইহার মত একটিও মন্দির ছিল না, এবং ইহা রাজ্যের একটি অলঙ্কারস্বরূপ বিবেচিত হইত। এখন এই মন্দিরের উৎকীর্ণ শিল্পকার্য্যের মধ্যে একটিও অবিকৃত পাওয়া যায় না। সবগুলিতেই বর্ব্বরতার স্পর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত রথ আছে, সকলে তাহা অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করে। শতশত পুণ্যলোলুপ নরনারী ইহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করে। রথটি একটি আস্ত পাহাড় খুদিয়া তৈরী করা হইয়াছে এইরূপ কথিত হয়।

এই-সকল মন্দিরের একটির নিকটে "সতী"-পাথর আর একটি দর্শনীয় দ্রব্য। সহমরণের পুণ্যস্মৃতি এখনও ইহার সঙ্গে জড়িত আছে। মনে হয় কত সতী এখানে লেলিহান অগ্নিশিখাতে আহুতি ভস্ম হইয়া গিয়াছেন, তবুও তাঁহারা ঊষার ললাটে স্থির সনাতন সাবিত্রীর মত মহিমায় গরীয়ান, সতীর আশিসে সাবিত্রীর বরে তাঁহাদের পূত শুভ্রভালের সিন্দুর-বিন্দু মুছে নাই।



অনন্তশয়নগরী মন্দির।

পর্য্যটকগণ এই স্তম্ভরাশির মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে যখন চারিদিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন কালের গতির কথা মনে পড়ে—ইতিহাসের শিক্ষা সম্মুখে জাগিয়া উঠে। কেমন করিয়া জাতি আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে তাহা মনে হয়। মিলিতশক্তি কিরূপ ক্রিয়াকরী হয় তাহা মনে হয়। আর অর্থগৌরবের যখন দুর্ব্ব্যবহার আরম্ভ হয়, জাতি যখন বিলাসপঙ্কে নিমগ্ন হয়, গৃহশত্রুর সৃষ্টি হয়, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়, তখন কিরূপ অবস্থা হয় তাহাও মনে পড়িয়া যায়।

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী।

পঞ্চশস্য

জীবে দয়া—

পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের উন্নতিতে মানুষের যেমন হিত হইতেছে, ইতর জীবদেরও দুঃখ কষ্ট লাঘব তেমনি হইতেছে। পশু চিকিৎসায় পশুদের দেহে অস্ত্র করিতে হইলে আগে তাহাদের অজ্ঞান করিবার জন্য ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করা হইত। এখন ডাক্তার জর্জ লিটিল্ নির্ব্বেদনায় অস্ত্র করিবার একটি উন্নত উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। পপুলার সায়ান্স মান্থলী পত্রিকায় সেই যন্ত্রটির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এইরূপ—

দুটি চোঙ্, তার একটিতে থাকে নাইট্রাস্ অক্সাইড্, অপরটায় থাকে খাঁটি অক্সিজেন। চোঙ্ দুটির সঙ্গে নল দিয়া দুটি থলি সংযুক্ত থাকে। থলি দুটিরও একটিতে নাইট্রাস্ অক্সাইড্ ও অপরটিতে অক্সিজেন ভরা থাকে। দুটি থলির মুখ হইতে দুটি নল একটি মোটা নলে গিয়া মিশিয়াছে এবং সেই মোটা নলের অপর প্রান্তে একটা ফনেল



পশুদেহে অস্ত্রচিকিৎসার জন্য অজ্ঞান করিবার যন্ত্র।

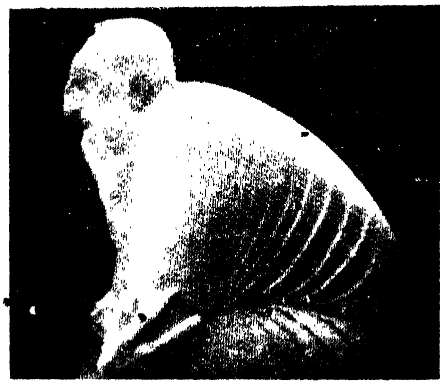
বা মুখ নল লাগানো থাকে। ভেলোমের আকৃতির কলকজা চিকিৎসক পশুর মুখ ও নাক ঢাকিয়া চাপিয়া ধরা হয়। তার পর থলির নলের মাথের [illegible] খুলিয়া নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই পশুটি অচৈতন্য হইয়া পড়ে; তখন তাহার হৃদয়ের ক্রিয়া যাহাতে বন্ধ না হইয়া যায় এজন্য তাহাকে মধ্যে মধ্যে একটু একটু করিয়া অক্সিজেন জোগানো হয়। এইরূপে অক্সিজেন জোগাইয়া পশুকে কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান করিয়া রাখা যায়। তাহাতে সে অস্ত্রাঘাতের কোনো বেদনাই অনুভব করে না, এবং অজ্ঞান হইয়া থাকার দরুণ কোনো ক্লেশও আদৌ অনুভব করে না।

কাগজের পা—

দিনামার ডাক্তার পিট পদহীন খঞ্জদের জন্য কাগজের মণ্ড জমাইয়া এক-রকম খুব হাল্কা সস্তা অথচ কাজচলা মজবুত কৃত্রিম পা তৈয়ার করিতেছেন। প্রথমে তারের একটা কাঠামো গড়িয়া তাহার মধ্যে কাগজের মণ্ড জমাইয়া কৃত্রিম পা তৈয়ারা হয়। পদহীন সৈনিকেরা এই পা খুব পছন্দ করিতেছে।

ফরাশী ভাস্কর রোদ্যাঁ—

ফরাশী ভাস্কর রোদ্যাঁ মানুষের মূর্ত্তিতে কেবল মাত্র তাহার বিশেষ ভাবটুকু ফুটাইবার জন্য তাহার আকারকে অনেক সময় বিকৃত অসমঞ্জস করেন বা গঠন অসম্পূর্ণ রাখেন। এইজন্য তাঁহার দেশে তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়। Beaux Arts (বোজ্ আর্) ও Salon (সালঁ) নামক সুকুমার-শিল্প পরিষৎ তাঁহার গঠিত মূর্ত্তি বারম্বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, প্রদর্শনীতে গ্রহণ করে নাই। তিনি বলেন "আমি যেমন যাকে দেখি তাকে তেমনি করিয়া গড়ি; আমার পরীক্ষকদের ইহা মনঃপূত হয় না, তারা মনে করে প্রকৃতির উপরও কলম চালানো চলে, প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতে পারা যায়।" যে সব ভাস্কর লোকের রুচি মানিয়া চলে তাহারা মনে করে প্রত্যেক মূর্ত্তির নাক বেশ উঁচালো, চোখ বেশ টানা হওয়া দরকার; রোদ্যাঁ সেই বাঁধা নিয়ম মানেন না, তিনি যাহা স্বাভাবিক তাহারই প্রকাশের পক্ষপাতী। তাঁর কাছে কেউ শিক্ষার্থী হইয়া গেলে শিষ্যকে তিনি শুধু একটি মাত্র মন্ত্র দান করিতেন, স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিতে শিখো। তাঁর মতে চাষার পকাণ্ড চাকাতে পা, বাবুদের জুতায় বন্দী অস্বাভাবিক আকারের পায়ের চেয়ে শিল্পীর কাছে ঢের বেশী আদরের। প্রচলিত মতের সঙ্গে প্রতিকূল মতের বিরোধ হওয়াতে তাঁকে লোকে বড়ো অভদ্র ([illegible]) আখ্যা দিল। কিন্তু তিনি নিজের মতে আবার পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া দারিদ্র্যের কষ্ট উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি চাষার ঘরের ছেলে, তাঁর শিল্পরচনায় উপার্জ্জন হইত না বলিয়া তাঁহাকে মাঝে মাঝে উদরান্নের জন্য সামান্য কারিকরের কাজ করিতে হইত। তিনি চাষার ঘরের একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহার স্ত্রী স্বামীর কদর বুঝিতে পারেন নাই। পরে যখন রোদ্যাঁর ভাস্কর্য্যের প্রতিভা লোকে বুঝিতে লাগিল, তখন বড় বড় সম্রাট, বড় বড় ওস্তাদ শিল্পী ও নামজাদা সাহিত্যিক তাঁহার স্টুডিওতে যাতায়াত করিতেন। রোদ্যাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী তখন এইজন্য খুসী হইলেন যে, স্বামীর এ বয়সে অর্থকষ্ট অনেকটা ঘুচিল, কিন্তু স্বামীর যে কি অসামান্য সম্মান ও খ্যাতি হইয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। এক বৎসর হইল রোদ্যাঁর স্ত্রীর প্রাণ ত্যাগ হইয়াছে।



ফরাসী ভাস্কর রোদ্যাঁ।

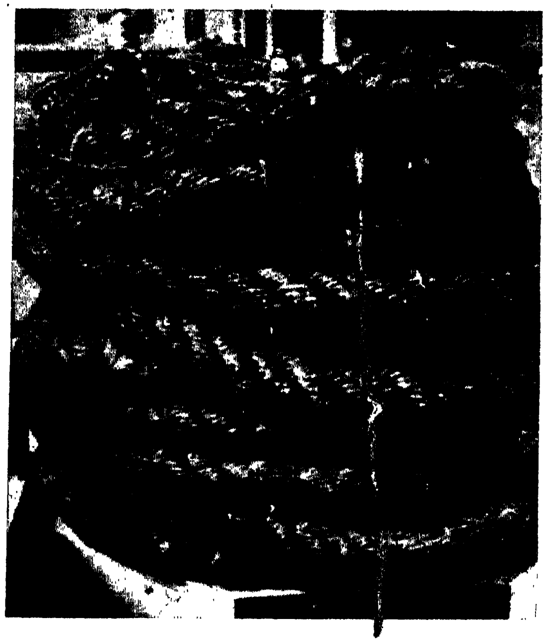
১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে রোদ্যাঁ ৭৬ বৎসর বয়সে পুনরায় একটি যুবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার নাম রোজ বেয়ার্। তিন হপ্তা পরে রোদ্যাঁ আবার বিপত্নীক হন। এখন য়ুরোপের সকল বড় ভাস্করই রোদ্যাঁর ভাবে ভাবিত শিষ্য। রোদ্যাঁ এখন ফ্রান্সের পরম গৌরব। তিনি বিকৃত আকৃতি গড়িয়া ভাব ফুটাইবার পথ দেখান। মেষ্ট্রোভিক নামক একজন ভাস্কর রোদ্যাঁর বিকৃত আকৃতি গড়িয়া শোধ তুলিয়াছেন। কিন্তু রোদ্যাঁ সেই মূর্ত্তি দেখিয়া খুব প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—উহা আকৃতি ও আর্ট দুই হিসাবেই নিখুঁত সুন্দর হইয়াছে।

নানা দেশের ধর্ম্মসংস্কার—

মানুষ বিষম-রকম ধর্ম্মসংস্কারে বদ্ধ। আধুনিক কালের পাঁচ দশ জন কালাপাহাড় ছাড়া প্রায় সকল মানুষই কোনো-না-কোনো রকমের



[illegible]



[illegible]



অনুতপ্তদের ধর্ম্মচক্রে শাস্তি ভোগ।

ধর্ম্মসংস্কারে বদ্ধ। এই-সমস্ত সংস্কার এমন বিচিত্র ও অদ্ভুত যে অপর সম্প্রদায়ের লোকের কাছে তাহা নিতান্ত নিরর্থক ও হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। মেকসিকো দেশে স্মরণাতীত কাল হইতে এক সম্প্রদায় আছে, তাহাদের নাম অনুতপ্ত। তাহারা নিজেদের গোপন চক্রে মণ্ডলীবদ্ধ হয়; অদীক্ষিত কেহ সেই চক্রের ক্রিয়া-কলাপ দেখিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে তাহারা খুন করিয়া ফেলে। সেই চক্রে সমাগত সাধকেরা আপনাদিগকে নির্দ্দয় ভাবে চাবকাইয়া শাস্তি দিয়া থাকে। ইহারা আমেরিকায় প্রথম যাত্রী Pilgrim Fathers নামক ধর্ম্মপ্রাণ লোকদের ধারা এখনো বজায় রাখিয়াছে। একজন লোক একটা ক্রুশের সঙ্গে বাঁধা থাকে বলিয়া সেই সম্প্রদায়ের একখানি ফটোগ্রাফ ছাপা হইয়াছিল; কিন্তু লোকটার বাঁচিবার আশা কম। থাকিলে তাহাকে [illegible] হয় নাই।

জাপানের টোকিও শহরের একটা মন্দিরে একগাছা চুলের কাছি আছে, সেটা পাঁচশ' হাত। লক্ষ লক্ষ জাপানী মেয়ে মানত দেওয়া চুল পাকাইয়া এই কাছি তৈরী হইয়াছে, এবং মন্দির নির্ম্মাণের সময় ঐ কাছি দিয়া ভারী বোঝা টানা হইয়াছিল। চুল আর ধর্ম্মসংস্কারের সঙ্গে যোগ সকল দেশেই আবহমান কাল হইতেই থাকিতে দেখা যায়। চুলের মানত করিয়া বড় চুল রাখা ও পরে সেই চুল দেবতাকে দান করা, অথবা চুল বা দাড়ি দেবতার প্রিয় মনে করিয়া বা ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ মনে করিয়া রক্ষা করা সভ্য অসভ্য সকল প্রকার মানুষের ধর্ম্মসংস্কারে দেখা যায়।

সাইবেরিয়ার ওঝা শামান ভূত প্রেত শীত বাতাস রোগ ব্যাধি ঝাড়-ফুঁক করিয়া দূর করিতে পারে বলিয়া সেখানকার যজমানদের বিশ্বাস। কাহারও অসুখ হইলে তাহার ভূত ঝাড়াইবার জন্য ওঝা মহাশয় লোহা-লক্কড় পিতল-কাঁসা-গাঁথা খোলস পরিয়া একটা জগঝম্প বাজাইয়া ঘটা দেড়েক ঘুরপাক খাইয়া তাণ্ডব নৃত্য করাকেই প্রধান উপায় মনে করেন।

ভারতবর্ষে সাধারণ লোকে সেইসব লোককেই পরম যোগী ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ মনে করে যাহারা সার্কাসের কসরৎ দেখাইতে পারে। যে লোক খালিপায়ে আগুনের উপর দিয়া হাঁটে, বা কাঁটক-শয্যায় আরামে বসিয়া থাকে, বা মাথা নীচু ও পা আকাশ পানে করিয়া থাকিতে পারে সে সাধারণের শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে দক্ষিণাটাও প্রচুর পায়। কাশীতে গঙ্গার ধারের উঁচু মন্দিরের চূড়ার উপর হইতে জলে ঝাঁপ খাওয়া পুণ্য সঞ্চয়ের একটা উপায় বলিয়া অনেকে মনে করে।

আমেরিকার আয়োয়া শহরে জন ওয়েসলী ফুল্টন নামে একজন চাষী আছে, তার মন এমন ধর্ম্মপ্রবণ যে তার কথায় বার্ত্তায় সাইনবোর্ডে শাস্ত্রের উক্তি যেখানে-সেখানে উঁকি মারে। তার চেক্-খাতায় লেখা থাকে—Jesus watches you. তার মোটর-গাড়ীর সামনে লেখা থাকে Heaven or Hell Awaits you !



ধর্ম্মবাতিকগ্রস্তের মোটর গাড়ী।

আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি—

"ইন্টারন্যাশনাল হারভেষ্টার কোম্পানী"র এককালের মজুর ও এখনকার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ম্যাকেরেল অসাধারণ লোক। সেই কারখানায় দুই লক্ষ সত্তর হাজার লোক কাজ করে। তাদের অধিকাংশকেই তিনি স্বয়ং চেনেন ও হাজার হাজার মজুরের নাম পর্য্যন্ত জানেন, কখনো ভোলেন না। দিনে হাজার হাজার লোকের সঙ্গে তাকে দেখা করিতে হয়, চিঠিপত্র লিখিতে হয়, তবু তিনি কারখানার উৎপন্ন ও বিক্রয় বিভাগের সমস্ত খুঁটিনাটি নিজে জানিয়া মনে করিয়া রাখেন। কারখানার নামে একবার নালিশ করিলে ম্যাকেরেল ক্রমাগত দশদিন সাক্ষীর কাঠগড়ায় বসিয়া খাতা পত্র হিসাব কিছু পর্য্যন্ত কিছু না দেখিয়া স্মৃতি হইতে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়াছিলেন—একবারও বলেন নাই যে আমি জানি না বা আমার মনে নাই। তার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখিয়া জজেরা অবাক হইয়া গিয়াছিলেন।

ম্যাকেরেল বলেন - স্মৃতিশক্তি বাড়াইতে হইলে প্রথমে খুব চেষ্টা—রীতিমত কষ্টকর চেষ্টা করা দরকার। পরে ক্রমশ স্মরণ রাখা সোজা হইয়া যায়—যেন সহজ, যেন স্বভাব। মনটিকে সকল বিষয়ের পল্লবিত বাজলের দিক হইতে গুটাইয়া তাহার কেন্দ্রস্থানে আবদ্ধ রাখিবার (concentrate) চেষ্টা করা দরকার। যে টুকু দরকার সেইটুকু লইয়া অবান্তর ঘটনা বাদ না দিলে মনের বোঝা ভারী ও বিপুল হইয়া উঠে, তখন আবর্জ্জনার স্তূপ হইতে দরকারী বিষয়ও খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। এবং স্মৃতিটাকে রোজ মাজিয়া ঘসিয়া ঝকঝকে রাখিতে হইবে; ঘরের আবর্জ্জনার মতন স্মৃতির সকল আবর্জ্জনা নিত্য নিয়মিত ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দরকারী জিনিস শৃঙ্খলা করিয়া গুছাইয়া হাতের কাছে কাছে রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই 'কার্য্যকাল সমুৎপন্ন' হইলে কিছুরই জন্য হাতড়াইয়া ফিরিতে হইবে না।



সাইবেরিয়ার [illegible] পোষাক।

পছন্দসই স্ত্রী—

কে কি রকম স্ত্রী পাইতে চাহেন কারো তাহা নিজেদের জন্য আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশজন গ্র্যাজুয়েটকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তাহার ফলে এইরূপ রকমারি উত্তর পাওয়া গিয়াছিল—

সে সুস্থ, শোভন (graceful) ও প্রিয়দর্শন হবে; সুন্দরী না হইলেও ক্ষতি নাই।

সে শোভন সুরুচিসঙ্গত ভাবে পোষাক পরিতে পারিবে, সে-কোনো লোককে এমন ভাবে অভ্যর্থনা ও বিনোদন (entertain) করিতে পারিবে যাহাতে সে লোক কিছুমাত্র অস্বস্তি না বোধ করে।

সে খুব ভালো রাঁধুনী হইবে—শাক চচ্চড়ি থেকে আরম্ভ করিয়া পাক-প্রণালীর বর্ণমালাটি যেন তাহার আয়ত্ত থাকে।

সে নাচগান আর খেলাধূলার জন্য অনুরাগিণী ও সমঝদার হইবে।

সে উদার চিত্ত, দরদী, কৌতুকী, নিঃস্বার্থ, সহৃদয়, প্রফুল্ল ও সাদা মনের লোক হইবে।

সে সমাজে বেশ নামজাদা ও উঁচু ঘরানা হইবে, ধর্ম্মে মতিগতি থাকিবে এবং এতটা পণ্ডিতা হইবে না যে ভগবানের কাছেও নত হইয়া প্রার্থনা করিতে তাহার কুণ্ঠা বোধ হয়।

মিশৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে। সেখানকার সমাজতত্ত্ব (sociology) শ্রেণীর ছাত্রদেরও এইরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল। সেখানকার যুবকেরা তাহাদের গৃহিণীর ধর্ম্মে মতিগতি বা সঙ্গীত বুদ্ধি বা রন্ধনবিদ্যা উল্লেখ করেন নাই বোধ হয় রমণীর ওসব গুণ থাকিবেই ধরিয়া লইয়াছিল। তাহারা চাহিয়াছিল—সৎচরিত্র, তীক্ষ্ণ ধী, [illegible] আনন্দচিত্ত, [illegible] সৎবংশ [illegible]। আর মেয়েরা চাহিয়াছিল তাহাদের ভাবী স্বামীদের যে সব গুণ, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়াছিল চরিত্রের [illegible]। তার পর [illegible] চাহিয়াছিল দৈহিক সৌন্দর্য্য। তার পর [illegible] চাহিয়াছিল [illegible], সংস্কৃত ও মিশুক অন্তরঙ্গতা [illegible]।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটেরা অধিকাংশই বিবাহিত। তবু তাহাদের আদর্শটা জানিতে পারিলে মন্দ হয় না। কর্ত্তারা একবার সন্ধান লইয়া দেখুন না।

প্রাচীন কালের গুড় ও আখ

দেশের গুড় ব্যবসায় বুঝিতে হইলে প্রাচীন কালের ব্যবসায়ও জানা উচিত। অন্য প্রদেশের সহিত যোগ রাখিতে হইলেও সংস্কৃত ভাষার গুড় বুঝিতে হইবে। বিষয়টা সোজা নয়। কারণ প্রাচীন কালের উক্তি ব্যতীত অন্য প্রমাণ নাই।

প্রথমে দেখি, এখন বঙ্গ ও ওড়িশায় যাহাকে গুড় বলে, বিহার হইতে পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রদেশে যে যে স্থানে সংস্কৃত-মূলক ভাষা প্রচলিত আছে, সে সে স্থানে তাহাকে গুড় বলে না। বঙ্গের গুড় দ্রবান্বিত ঘন,—সে-সব প্রদেশের গুড় বাঙ্গালায় ভিঁড়া। কোন্ প্রয়োগ ঠিক?

কিন্তু ঠিক অ-ঠিক নির্ণয় করিতে হইলে একটা প্রমাণ অঙ্গীকার আবশ্যক। প্রমাণে (standard) তক উঠিলে ঠিক অ-ঠিকেও তক উঠিবে। সুবিধা এই, গুড় শব্দ সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে, এবং সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদে গুড়ের লক্ষণ ও গুণ বর্ণিত আছে। আয়ুর্ব্বেদ আমাদের মান্য; অতএব সংস্কৃত ভাষার প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইতেছে।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ভাব-প্রকাশ গুড়াদির লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন। যথা, (১) ইক্ষুরস পক্ক হইলে যে কিঞ্চিৎ গাঢ় (somewhat thick) কিন্তু বহু দ্রব (mostly liquid) দ্রব্য হয়, তাহা "ফাণিত"। [ইক্ষোঃ রসস্তু যঃ পক্বঃ কিঞ্চিদ্গাঢ়ো বহুদ্রবঃ।] (২) ইক্ষুরস সম্যক্ পক্ক হইলে যে কিঞ্চিৎ দ্রবান্বিত ঘন (solid mixed with a small amount of liquid) পাওয়া যায়, তাহা "মৎস্যণ্ডী"। ইহা হইতে মল মন্দ মন্দ ঝরিতে পারে বলিয়া নাম মৎস্যণ্ডী হইয়াছে। [ইক্ষো রসো যঃ সম্পক্বো ঘনঃ

কিঞ্চিদ্ দ্রবান্বিতঃ। মন্দং যৎ স্যন্দতে তস্মাৎ তন্মৎস্যণ্ডী নিগদ্যতে॥] (৩) ইক্ষুরস সম্যক্ পক্ব হইয়া লোষ্ট্রবৎ দৃঢ় (a solid lump) হইয়া গেলে "গুড"। কিন্তু গৌড-দেশে মৎস্যণ্ডীকে গুড় বলে। [ইক্ষোরসো যঃ সম্পক্বো জায়তে লোষ্ট্রবদ্ দৃঢ়ঃ। স গুডো গৌড়দেশে তু মৎস্যণ্ড্যেব গুডো মতঃ॥] (৪) "খণ্ড"। (৫) শ্বেতবর্ণ বালুকার তুল্য খণ্ডকে "শর্করা" বলে। ইহার নাম "সিতা"। [খণ্ডন্তু সিকতারূপং সুশ্বেতং শর্করা সিতা।] এই পাঁচ ব্যতীত "পুষ্পসিতা" ও "সিতোপলা" এই দুই নাম আছে।

ভাবপ্রকাশ তাঁহার সময়ের চলিত নামও দিয়া গিয়াছেন। যথা, ফাণিত—ছোরা, মৎস্যণ্ডী—খণ্ড-রাব, গুড - গুড, খণ্ড —খাঁড়, পুষ্পসিতা—গুড়-শর্করা, সিতোপলা—মিশ্রী। প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা গিয়াছে, অদ্যাপি পশ্চিম প্রদেশে মৎস্যণ্ডীকে রাব বলে। কিন্তু ইহার ঠিক নাম খণ্ড-রাব—অর্থাৎ খণ্ড সহিত দ্রব—খাঁড়-যুৎ। একটা উক্তি প্রণিধান-যোগ্য। ভাবপ্রকাশ লিখিয়াছেন, "কিন্তু গৌড়দেশে মৎস্যণ্ডীকে গুড় বলে।" বস্তুতঃ ইহা পড়িয়াই বঙ্গের ও বাহিরের গুড় নামের দ্রব্য যে এক নহে, তাহা বুঝিতে পারি।

বঙ্গদেশের অনেকে মৎস্যণ্ডীকে মিছরী মনে করিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুমে এবং অন্ততঃ চারিখানি কবিরাজী পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদে এই ভুল করা হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় আমায় জানাইয়াছেন, "মৎস্যণ্ডী" শব্দ পালিভাষায় "মচ্ছণ্ডী" হইয়াছিল। মচ্ছণ্ডী—মচ্ছড়ী—মিছরী শব্দ না হইতে পারে এমন নয়। পালিভাষার ম-চ্ছ-ণ্ডী না জানিলেও ম-ৎ-স্য-ণ্ডী হইতে মি-ছ-রী, হঠাৎ মনে হয়। শব্দ-সাদৃশ্য ভ্রমের কারণ হইয়াছে। আরও এক কারণ থাকিতে পারে। মিছরী করিতে গেলে মাৎ ঝরাইয়া ফেলিতে হয়। এমন কি মিছরী ও ভাল গুড় প্রায় এক। উভয়ের বর্ণ এক; কেলাস (crystal) এক, প্রভেদ কেবল বড় ও ছোট। তথাপি মৎস্যণ্ডী মিছরী নহে। ইহা বাং 'গুড়', হিং 'রাব' বা 'রাব'। কারণ শাস্ত্রে আছে, মৎস্যণ্ডী দ্রবান্বিত, এবং তাহা হইতে মাৎ ঝরিতে পারে। মিছরী দ্রবান্বিত নহে, শুষ্ক ঘন; তাহা হইতে মাৎ ঝরিতে পারে না।* ভাবপ্রকাশে 'ফাণিত' অর্থাৎ ঝোলা গুড়ের পরেই 'মৎস্যণ্ডী' আসিয়াছে। এই পর্যায় (order) হইতেও বুঝিতেছি, মৎস্যণ্ডী অর্থে মিছরী হইতে পারে না।

আচ্ছা, মৎস্যণ্ডী বাঙ্গালার গুড় হইতে পারে কি? পূর্বে ইহার প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে, সংস্কৃতে যাহাকে মৎস্যণ্ডী বলিত আমরা তাহাকে 'গুড়' বলি। অতএব এখন প্রশ্ন, সংস্কৃতের গুড় কি দ্রব্য? ইহার উত্তর দিবার পূর্বে একটা সংজ্ঞা করিলে ভাল হয়। বারবার, 'সংস্কৃতের গুড়', 'বাঙ্গালার গুড়' না বলিয়া সংস্কৃতের গুড়কে গু-ড, এবং বাঙ্গালার গুড়কে গুড় বলা যাইবে।

গু-ড আর কিছু নহে, ভিঁড়া বা ভেলী। ভাবপ্রকাশে গু-ডের যে লক্ষণ আছে, তাহা ভিঁড়াতে পাই। গু-ড লোষ্ট্রবৎ দৃঢ়—মাটির ঢেলার মতন তাল (like a hard lump of clay)। ঢেলায় যেমন কেলাস থাকে না, কিংবা অস্পষ্ট থাকে, ভিঁড়াতেও তাই। অমরকোষে গু-ড অর্থে গোল। মরাঠীতে গু-ডকে 'গুল' বলে। যেমন 'তাল' হইতে তালী-তাড়া, তেমন গু-ড যাহা, গুলও তাহা। প্রাচীন কালে গু-ড তালের মতন হইত। অদ্যাপি পশ্চিমাঞ্চলে একমণ ওজনেরও বড় বড় স্থূল হয়। সে-সব 'গুড়' নামে খ্যাত। আসাম, বঙ্গ ও ওড়িষ্যা ছাড়া ভারতের অন্যত্র সংস্কৃত গু-ড শব্দের অর্থান্তর হয় নাই, অর্থ সংস্কৃতের তুল্য আছে। পশ্চিমের গুড়ই গু-ড স্বীকার করিলে গু-ডের আয়ুর্বেদোক্ত লক্ষণ, গুণ, বিশেষতঃ পুরাতন গু-ডের গুণ, গৌ-ড়ী মদ্য, এবং মধু অভাবে গু-ড দিবার বিধি, বুঝিতে পারা যায়। ভাবপ্রকাশ হইতে জানিতেছি, অন্ততঃ চারি শত বৎসর হইতে বঙ্গে গু-ড শব্দে মৎস্যণ্ডী বুঝাইতেছে।

ভাব-প্রকাশের লিখিত অপর দ্রব্য বুঝিতে কষ্ট নাই। প্রথমে 'ফাণিত'। ইহার অপর নাম 'ফাণি'। ধাত্বর্থ, সঞ্চলন, অর্থাৎ 'ফাণিত'=দ্রব (liquid)। ইক্ষুরস পাকে গাঢ় হইলে 'ফাণিত'। তাহাতে কেলাস থাকে না, থাকিলেও অল্প। কিন্তু অন্য এক উপায়েও দ্রবগুড় পাওয়া

* অমরকোষের রঘুনাথ চক্রবর্তীর টীকায় আছে, "ইক্ষু বিশেষত রসপাকে খণ্ডযোগ্য সারভূতে যা গুড়িকা জায়তে সা মৎস্যণ্ডী। মন্দং স্যন্দতে।" তিনি বাঙ্গালী হইয়াও ঠিক লিখিয়াছেন, যাহা হইতে খাঁড় হইতে পারে, যাহা হইতে 'মদং'—মধুবৎ দ্রব ঝরিতে পারে, তাহা মৎস্যণ্ডী। মৎস্যণ্ডীতে অবশ্য গুড়িকা—ছোট ছোট কেলাস থাকে।

যায়। গুড়ের মাৎও, দ্রবগুড়। অমরকোষের এক টীকাকার বলেন, আধ-আওটানা ইক্ষুরস, ফাণি। ইহাই ভাবপ্রকাশের মত। অমরকোষের আর-এক টীকাকার বলেন, 'খণ্ড' অর্থাৎ খাঁড় ঝরাইলে যে কল্ক অর্থাৎ মাৎ পাওয়া যায়, তাঁহাও ফাণি। এই অর্থে হিন্দী ছোৱা বা ছোবা, বাস্তবিক চোআ, নাম আসিয়াছে। *

'খণ্ড' শব্দ হইতে 'খাঁড়' শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু খাঁড় পৃথকভাবে করা হইত। ইহাকে গুড়ের মিছরী বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ভাল গুড়ের মাৎ ঝরাইয়া ফেলিলে খণ্ড, এবং 'খণ্ড' ভাঙ্গিয়া শুখাইয়া 'শর্করা'। 'শর্করা' আজিকালির দলুয়া। 'শক্কর' নামে ইহা পশ্চিমে খ্যাত। 'শর্করা' লালচা হইত। আর-একটু নির্মল ও বি-বর্ণ হইলে ভাব-প্রকাশের 'পুষ্প-সিতা'। 'পুষ্প' নামেই প্রকাশ উহা ঈষৎ লাল, বরং ঈষৎ পীত। ইহার অপর নাম 'গুড়-শর্করা'। অর্থাৎ গুড় তুল্য আপীত ও সূক্ষ্ম শর্করা। এই নাম চরকেও আছে। চৈতন্য-চরিতামৃতে বোধ হয় ইহাই 'পদ্মচিনি', এবং আজিকালির ভুরা। ভাবপ্রকাশে মিছরীর নাম 'সিতোপলা'—শ্বেতবর্ণ উপল তুল্য। ইহাকে তৎকালের দেশভাষায় 'মিশ্রী' বলিত, আমরাও মিসরী বা মিছরী বলি। ঈজিপ্ত দেশের আর্বী নাম মিসর। মিসর দেশজাত, মিসরী। (যেমন 'সলাব মিসরী'—মিসর দেশের সলাব—একরকম কন্দ)। অতএব ভাবপ্রকাশের বিভাগ এইরূপ,—

দ্রব ... ... ফাণিত
দ্রবান্বিত ঘন ... মৎস্যণ্ডী
ঘন | অশর্করিল ... গুড়
| শর্করিল | বালুকাতুল্য...শর্করা—পুষ্পসিতা
| উপলতুল্য...খণ্ড—সিতোপলা

এখন সুশ্রুত দেখি। ইঁহার পর্যায় এই,—(১) ফাণিত, (২) গুড়, (৩) মৎস্যণ্ডী, (৪) খণ্ড, (৫) শর্করা। এই পাঁচের মধ্যে ফাণিত ও গুড় পৃথক পৃথক বলিয়া মৎস্যণ্ডী-খণ্ড-শর্করা এই তিনের গুণ একত্র বলা হইয়াছে। গুড় দ্বিবিধ,—সক্ষার ও শুদ্ধ। "শুদ্ধ গুড় পুরাণ হইলে অধিকগুণ ও পথ্যতম হয়। শর্করা সুবিমলা ও নিঃক্ষারা হইলে গুণবতী হয়।"

দেখা যাইতেছে, ভাবপ্রকাশে ফাণিত পরে মৎস্যণ্ডী, সুশ্রুতে ফাণিত পরে গুড়। আরও দেখা যায়, মৎস্যণ্ডী খণ্ড ও শর্করা এই তিনের সাদৃশ্য আছে। ফাণিত রস-যুক্ত, গুড় রসহীন। অর্থাৎ ইক্ষুরস শুখাইয়া ফেলিলে গুড়। কিন্তু মৎস্যণ্ডী খণ্ড শর্করা, এই তিন এত সহজে পাওয়া যায় না। মৎস্যণ্ডী কেলাসিত। ইহা হইতে খণ্ড, খণ্ড হইতে শর্করা। অতএব পর্যায় ঠিক হইয়াছে।

কিন্তু স-ক্ষার গুড় কি, এবং নিঃক্ষার শর্করাই বা কি? শুদ্ধ গুড়, যে গুড়ে মল নাই। কিন্তু তাহা হইলে স-ক্ষার না বলিয়া স-মল বলিলে ঠিক হইত। তা ছাড়া ক্ষার=মল মনে করিলে শর্করা 'বি-মল' ও 'নিঃক্ষার' দুই বলিবার হেতু থাকে না। তবে কি স্বাদে ক্ষারী এবং ক্ষারহীন বুঝিতে হইবে? অর্থাৎ যাহাতে ভস্ম বা পার্থিব দ্রব্য অধিক তাহা সক্ষার; যাহাতে অল্প তাহা নিঃক্ষার? প্রথমে এই ক্ষার শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি নাই। পরে দেখি, চাণক্য তাঁহার "অর্থশাস্ত্রে" সুশ্রুতের পর্যায়ে পাঁচ নাম করিয়া শেষে "ক্ষারবর্গ" বলিয়াছেন। পর্যায় থাক; মিষ্টদ্রব্যকে 'ক্ষার' বলিতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়াছিলাম। পরে সংস্কৃত 'ক্ষর' ধাতুর অর্থ স্মরণ করাতে দেখি বর্গীকরণে দোষ হয় নাই। যাহা ক্ষরে—ঝরে, যাহার মোচন হয়, তাহা ক্ষার। অতএব মৃত্তিকা-বিশেষে কিংবা কাষ্ঠ-ভস্মে জল দিয়া যে তীব্র রস ঝরে, তাহা ক্ষার। * এমন কি, বালুকা ও তীব্র ক্ষার যোগে যে সত্ত্ব মুক্ত হয়, পৃথক হয়, তাহাও ক্ষার। এই ক্ষার, কাচনামে খ্যাত। এইরূপ, ইক্ষু পীড়িত হইলে জল ব্যতীত যে দ্রব্য ক্ষরিত হয়, এবং সে রস হইতে যে দ্রব্য (শর্করা) ক্ষরিত বা মুক্ত হয়, তাহাও ক্ষার। কাষ্ঠভস্মের জল হইতে যেমন কেলাস (দানা) পৃথক হয়, ইক্ষুরস হইতেও তেমন শর্করা হয়। যে দিক দিয়াই দেখি চাণক্য গুড় ও চীনিকে ক্ষার বলিয়া এমন কিছু অসম্ভব কথা বলেন নাই।

ইক্ষুরস হইতে যে গাদ উঠে, সুশ্রুত তাহাকে ক্ষার

---

* ফাণি শব্দের আর-এক ধাত্বর্থ বিস্তার। এই ফাণি হইতে ফেণি বাতাসা—বাতাসে স্ফীত মিষ্টক। সাপের ফণাও বিস্তৃত।

* বলা বাহুল্য ইংরেজী 'আল্-কালি' (al-kali) শব্দের 'আল্' আর্বী, এবং সংস্কৃত 'ক্ষার' শব্দের আর্বী রূপান্তরে 'কালি'।

বলিয়াছেন। অতএব গুড় দ্বিবিধ; যাহার গাদ তুলিয়া ফেলা হয় নাই, তাহা 'সক্ষার', যাহার গাদ তুলিয়া ফেলা হইয়াছে তাহা 'শুদ্ধ'। এইরূপ যে শর্করা হইতে সমস্ত গাদ তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, যাহা হইতে গাদ আর উঠে না, তাহা নিঃক্ষার'। কিন্তু 'নিঃক্ষার' হইলেও বি-মল, সু-বিমল না হইতে পারে। কি উপায়ে সু-বিমল করা হইত, তাহা না জানিলে 'মল' শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে না। যাহাই হউক, মল দূরীভূত হইলে শর্করা শ্বেতবর্ণ হইবে। অর্থাৎ বর্ণদ্বারা শর্করার বৈমল্য নির্ণয় করিতে হইবে। ইহা সেকালে যেমন একালেও তেমন বিধি আছে।

চাণক্য চব্বিশ শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। সুশ্রুত সেই সময়ের কিংবা পরের হইবেন। চরক আরও আগের। তিনি ইক্ষুবর্গে 'ফাণিত' স্থানে 'ক্ষুদ্র গুড়' (of minor importance) লিখিয়াছেন। কিন্তু অন্যত্র ফাণিত নামও আছে। তিনি লিখিয়াছেন, "ইক্ষু- রসের চতুর্ভাগ, ত্রিভাগ, কিংবা অর্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিলে, 'ক্ষুদ্র গুড়'। আর গুড় ধৌত ও অল্পমল। [ক্ষুদ্রো গুড়শ্চতুর্ভাগত্রিভাগা- র্ধাবশোষিতঃ। রসো গুরুর্যথা পূর্বং ধৌতস্বল্পমলো গুড়ঃ ॥] গুড়ের পর মৎস্যণ্ডী, খণ্ড ও শর্করা বিমল।"

এখানে দুইটি লক্ষ্য আছে। ইহার পর্যায় আর সুশ্রুতের পর্যায় এক; আর, রস শুখাইয়া গুড়। চারি পণ, পাঁচ পণ, কিংবা আট পণ রস থাকিলে 'ক্ষুদ্র গুড়' বা 'ফাণিত'। রস কিছুই না থাকিলে—গুড়। 'ফাণিত' ক্ষুদ্র গুড়; আমরা যেমন বলি 'ঝোলা-গুড়'; এই রকম 'ক্ষুদ্র-গুড়'। গুড় সামান্য নাম; তাহাকে 'ক্ষুদ্র' দ্বারা বিশেষিত করিয়া অন্যবিধ দ্রব্য বুঝিতে বলা হইয়াছে। বোধ হয়, চরকের এই 'ক্ষুদ্র- গুড়', এবং ইহার পরেই গুড় দেখিয়া বাঙ্গালী কবিরাজ মহাশয়েরা ভ্রমে পড়িয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে গুড়ের পরেই মৎস্যণ্ডী (যাহা মিছরী মনে করা হয়) আসে কেন? মিছরীর পাক গুড়ের পাকের তুল্য সোজা নয়। চরক, সুশ্রুতের সক্ষার গুড় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। গুড় ধৌত অর্থাৎ শাদা বা পাণ্ডুবর্ণ হইবে, কিন্তু মল-শূন্য নহে। বোধ হয় সেকালের ভাল গুড় এই-প্রকার হইত। বস্তুতঃ উত্তম ভিঁড়া থড়বর্ণ, এবং তাহা জল দিয়া ফুটাইলে গাদ উঠে না। চরকেও 'গুড়-শর্করা' নাম আছে, শেষে আছে। অতএব ইহা সেকালের শ্রেষ্ঠ শর্করা ছিল। হয় ঈষৎ পাণ্ডু- বর্ণ, গুড়-বর্ণ বলিয়া নাম গুড়-শর্করা, কিংবা উত্তম গুড় হইতে করা হইত বলিয়া এই নাম। অন্যত্র 'সিতোপলা' শাদা মিছরীর নামও আছে। এক স্থানে চাণক্য 'মৎস্যণ্ডীবর্ণ' ও 'গুড়-বর্ণ' উপমান করিয়াছেন। মৎস্যণ্ডী = গুড়, এবং গুড় = ভিঁড়া মনে করিলে দুই বর্ণের প্রভেদ বুঝিতে পারা যাইবে।

অতএব চাণক্য, সুশ্রুত ও চরক গুড়াদির বিধান অনুসারে ভাগ করিয়াছেন। যথা,

ইক্ষুরস শুষ্ক করিলে...... গুড

দ্রব রাখিলে | অ-শর্করিত ... ফাণিত (বা ক্ষুদ্র-গুড)
| শর্করিত ... মৎস্যণ্ডী (গুড়)

|
খণ্ড (খাঁড়)
|
শর্করা (দলুয়া)
|
গুড়-শর্করা (ভুরা)
|
সিতোপলা (শাদা মিছরী)

আর বাগ্‌বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। ঠাকুরের নৈবেদ্যে যে নবাৎ দেওয়া বিধি, তাহা গুড়। গুড় বলিয়াই নৈবেদ্য হইয়াছে। বস্তুতঃ 'নৈবেদ্য' শব্দের অপভ্রংশে 'নবাৎ'। নবাৎ চক্রাকার; কিন্তু এই আকারহেতু নৈবেদ্য হয় নাই; যে-হেতু মধু অভাবে গুড়, সেহেতু নবাৎ নৈবেদ্য। ওড়িয়াতে নবাৎ বলিলে গুড় বুঝিতে হয়, যদিও সে গুড় যে কি দ্রব্য লোকে তাহা জানে না, এবং তৎপরিবর্তে খণ্ড গ্রহণ করে। এই কারণে, পূজায়, একাদশীর পালনে, 'নবাৎ' অর্থাৎ গুড় এবং না জানিয়া কিংবা না পাইয়া 'খণ্ড' ভোগ্য হইয়া থাকে, গুড় কদাপি হয় না। বঙ্গদেশের নবাৎ ওড়িষ্যায় অজ্ঞাত। সে যাহা হউক, চীনি ও মিছরী নৈবেদ্য নহে; সন্দেশ ও রসগোল্লার ত কথাই নাই। নৈবেদ্য, হয় মধু, নয় গুড়। সত্যপীরের নিকট সীর্ণি; কিন্তু ঠাকুরের নিকট চীনি দেওয়া চলে কি? জানি না, প্রাচীন পুথীতে শর্করা অর্পণের বিধি আছে কি না। বোধ হয়, নাই। কারণ, বহুপূর্বে, যেমন

বেদের সময়ে, মিষ্টকের মধ্যে মাত্র মধু দেখিতে পাওয়া যায়। মধু স্বভাবতঃ পাওয়া যায়। তার পর যখন ইক্ষুরস আবিষ্কৃত হইল, তখন তাহা শুখাইয়া পিণ্ডাকারে গুড়ের আকারে করাই সহজ। মৎস্যণ্ডী, খণ্ড, শর্করা করা প্রথম জ্ঞানে সম্ভব নহে। ইক্ষুরস পাক করিয়া ফাণিত অপেক্ষা গাঢ় করিলে মৎস্যণ্ডী (গুড়) হয়; কিন্তু, পূর্বে দেখা গিয়াছে, দক্ষ বাড়ই ব্যতীত ভাল গুড় বাঁধা সোজা নয়। খণ্ড করিতে আরও দক্ষতা চাই, শর্করা করিতে শর্করার প্রয়োজন-বোধ চাই। এই কারণে মনে হয়, অতি পূর্বকালে ফাণিত ও গুড় এই দুই প্রচলিত ছিল। বোধ হয় প্রথমে ফাণিতও তত প্রচলিত ছিল না। যদি কেহ একটা সুখাদ্য রস আবিষ্কার করে, আর দেখে যে সে রস অবিকৃত রাখিতে পারা যায় না, তখন সে তাহা শুখাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ যে শুষ্কীকৃত ইক্ষুরস, তাহাই গুড়। গুড়ই আনা-নেআর পক্ষে সুবিধাজনক। অতএব অনুমান হয়, প্রথমে মধু, তার পর গুড়; কাজেই মধু অভাবে গুড় না হইয়া চীনি মিছরী হইতে পারে নাই। আশ্চর্য এই, উপাদানের ভাগেও ভিঁড়া বা ভেলী অনেকটা মধু'র সদৃশ। প্রথম পরিচ্ছেদে যে-সব ভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে সে-সব মিলাইলেও সত্য-মিথ্যা বুঝিতে পারা যাইবে। মধু'র মিষ্টতার কারণ ঊন-শর্করা। সাধারণ ভিঁড়া বা ভেলীতে ঊনশর্করা প্রায়ই গুড়ের দ্বিগুণ।

বঙ্গের কবিরাজ মহাশয়েরা যাহাকে পুরাতন গুড় বলেন, এখন তাহার ভাগ দেখা যাউক। দুঃখের বিষয় বঙ্গের গুড় পাই নাই, এবং একই গুড় নূতন ও পুরাতনে দেখিতে পাই নাই। কটকের এক দোকানে আড়াই বছরের গুড় দেখিয়াছিলাম। ইহা বালুকা-কর্দমবৎ কোমল, কৃষ্ণবর্ণ, ও অম্ল। ইহাতে কুটা, আখের খোআ, ও বালি মাটি ছিল। বোধ হয় ওড়িষ্যার গুড় পড়িয়া থাকিয়া আরও কুৎসিত হইয়াছিল। ইহার শতকে পাইয়াছি

ইক্ষুশর্করা	৫৫
ঊনশর্করা	১৫
ভস্ম	৭
জল	৬

সূক্ষ্ম বিমান করা হয় নাই। কাটিবার যোগ্য মনে করি নাই। বালি মাটি প্রভৃতি হেতু ভস্ম অধিক। কিন্তু জলের ভাগ অধিক নয়; অথচ শর্করা কোথায় গেল? অন্য জৈবদ্রব্য নূতনে ছিল বটে, কিন্তু ১৭ ভাগ ছিল না। অম্লাস্বাদ হইতে বোঝা যাইতেছে কি ঘটিয়াছে। আঠাও হইয়াছিল।

আরও পুরানা গুড় দেখিয়াছি। পুরীতে 'এমা'র মঠ যেমন বিত্তশালী তেমন প্রসিদ্ধ। এখানে বৎসর বৎসর গুড় রাখা হয়, পুরানা করা হয়, তার বৈদ্য ও রোগীকে দেওয়া হয়। পুরীর এক প্রসিদ্ধ কবিরাজ মঠ হইতে পুরাতন গুড় কিছু পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গত বৎসর আষাঢ় মাসে। সে গুড় কৃষ্ণপিঙ্গল, কু-কেলাসী, বালুকাকর্দমবৎ কোমল, তিক্ত ও ঈষৎ অম্ল। গুড়ের উপরে ফুট উঠিতেছিল, একস্থানে ভুলা-ছাতা ধরিয়াছিল। একে বর্ষাকাল, তাহার উপর গুড় সমল। কিণ্বানক্রিয়ার ও ছাতা ধরিবার যোগ্য কাল ও পাত্র বটে। সে গুড়ে

ইক্ষুশর্করা	৫৮
ঊনশকরা	১৮
অন্য জৈব	৩
ভস্ম	৪
জল	১৩

কবিরাজী পুরানা গুড় এই-রকম। কিন্তু সুশ্রুতে পুরানা গুড় যে "পথ্যতম"! সে গুড় কি বাঙ্গালা ওড়িষ্যার গুড়, না পশ্চিমের গুড়? বাঙ্গালার গুড়ে জল থাকে, মল থাকে। তাহাকে পুরাতন করিয়া, ছত্রাক ও অণুজীবের জন্মভূমি করিয়া, অম্ল ও তিক্ত করিয়া, "পথ্যতম" (most wholesome) করিতে হইবে কি?

এই বিস্ময়োক্তি শুনিয়া বঙ্গের এক কবিরাজ বলিলেন, "কে জানে অণুজীবের ক্রিয়াহেতু গুড় পথ্যতম নহে? কে জানে পুরাতন গুড়ে ঈষৎ মদ্য, ও ঈষৎ তিক্ত ও অম্ল রস হয় বলিয়া পথ্যতম হয় না?" তিনি আরও বলিলেন, "আয়ুর্বেদে একটা শ্রুতি-পরম্পরা আছে। আমরা সেই শ্রুতি মানিয়া চলিতেছি। তা ছাড়া বঙ্গদেশীয় কেহ কেহ পশ্চিমে গিয়া আয়ুর্বেদ শিখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারাও

তু বাঙ্গালা গুড় ত্যাগ করেন নাই।" আমি কবি-পণ্ডিত হইলে হয়ত প্রত্যুত্তর করিতাম। তথাপি, শব্দ, লক্ষণ, বিভাগ, পর্যায় বিচার করিলে মনে হয় বঙ্গদেশীয় কবিরাজ অন্ধ-পরম্পরান্যায়ে মৎস্যণ্ডীকে গুড় মনে করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গদেশে গুড় দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে শ্রুতি-পরম্পরার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। রুচিকর না হইলেও "পথ্যতম" হইতে পারে কি না, তাহাও বিচার্য। পুরাতন গুড় রোগীর পথ্য, অন্যের নহে, এমন আদেশ ত নাই।

সে যাহা হউক, পুরাতন ভিঁড়া পাইলে তাহার ভাগ-বিমান দ্বারা হয়ত কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইত। মনে রাখিতে হইবে, "শুদ্ধ গুড়" পুরাতন করিয়া দেখিতে হইত। এখানে গয়া জেলা হইতে ভেলী আসে। এক দোকান হইতে এক বৎসরের পুরানা ভেলী লইয়া দেখিয়াছি। তাহাতে

ইক্ষু-শর্করা	৬৫·
উন-শর্করা	২৪·
অন্য জৈব	১·
ভস্ম	২·২
বালি	০·৩
জল	৭·৫
	১০০·০

পাইয়াছি। নূতন বেলায় ভেলীটা যে ভাল ছিল, তাহা 'অন্য জৈব' ও 'ভস্ম' হইতে বোঝা যাইতেছে। তথাপি বাঙ্গালা গুড়ের তিনগুণ উনশর্করা ছিল। উপরে পুরীর মঠের গুড়েও উনশর্করার ভাগ অধিক দেখা গিয়াছে। গুড় পুরানা হইলে তাহার পরিবর্তন হয়; কি পরিবর্তন হয়, তাহা জানি না। কিন্তু দেখিতেছি, উনশর্করা বৃদ্ধি হয়।

এইরূপ পরিবর্তন কেবল গুড়ে নহে, শর্করাতেও হয়। সকলে জানেন, খেজুরা গুড় কত শীঘ্র বিকৃত হয়। আনেট সাহেব খেজুরা গুড়ের দোবারা, একবারা, ও দলুয়াতে উন-শর্করা বৃদ্ধি দেখিয়াছেন। তিনি চীনিগুলির ভাগ বিমান করিয়া শিশিতে কাচের কাক দিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসরের মধ্যে উনশর্করার ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছিল। অবশ্য ইক্ষু-শর্করার ভাগ হ্রাস হইয়াছিল। দেড়মাসের মধ্যেও এইরূপ পরিবর্তন মানযোগ্য হইয়াছিল।* অণুজীব যে একটা কারণ হইয়াছিল, তাহা সচ্ছন্দে বলিতে পারা যায়। ভিঁড়াতে অর্থাৎ গুড়ে এইরূপ পরিবর্তন অধিক হইবার কথা। সে-সব পরিবর্তন কি, তাহা বলা দুষ্কর হইবে। ভিঁড়াতে ইক্ষুশর্করাও প্রচুর থাকে; কিন্তু কে জানে তাহা চীনির তুল্য, কি উনশর্করার পূর্ব অবস্থা। একথা সর্বদা স্মরণ কর্তব্য যে রাসায়নিক পরীক্ষা, স্থূল উপাদানের পরীক্ষা, স্থির দ্রব্যের পরীক্ষা। অ-স্থিরের বর্ণন ও বিমান বিজ্ঞানের অসাধ্য। জীব-দেহের বিচিত্র ব্যাপার, যাহা নিরন্তর নূতন, চির-অস্থির, তাহা বিমান রসায়ন-বিজ্ঞানের অ-শক্য। রাসায়নিক পরীক্ষা অপেক্ষা জীবদেহদ্বারা পরীক্ষা বহুগুণে সূক্ষ্ম। বস্তুতঃ স্থূলের বিমান দ্বারা সূক্ষ্মের ইয়ত্তা হইতে পারে না।† "শুদ্ধ" গুড়

---

* এখানে কয়েকটা উদ্ধৃত করিতেছি। (Date Sugar Industry in Bengal. By H. E. Annett)

	১৯১১। জুন		১৯১২। এপ্রিল।	
	ইক্ষুশর্করা	উনশর্করা	ইক্ষুশর্করা	উনশর্করা
দোবারা	৯৮·৫	০·৮	৯৭·১	২·৬
একবারা	৯৮·৪	১·১	৯৬·৬	২·৮
দলুয়া	৯৪·১	২·১	৮৯·৯	৪·৯

(হারাহারি)

সাহেব আর-একটু পরিশ্রম করিয়া জলের ভাগ নির্ণয় করিলে বোধ হয় দেখা যাইত যে যাহাতে জল অধিক ছিল, তাহাতে পরিবর্তনও অধিক হইয়াছিল। চীনির, বিশেষতঃ খেজুরা চীনির গন্ধ পরিবর্তন হইতেই বোঝা যায়, কিছু ঘটিয়াছে। কি করিলে ঘটে না, ইহাই জিজ্ঞাস্য।

† ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। নূতন ও পুরাতন ধান্য, নূতন ও পুরাতন ঘৃত, নূতন ও পুরানা গুড়, এমন কি তপ্ত ও শীতল অন্ন, প্রভৃতির গুণান্তর রাসায়নিক পরীক্ষার অ-গম্য। এখন অ-গম্য; পরে রসায়ন-বিজ্ঞান বৃদ্ধি হইলে যে গম্য হইবে, তাহাও নহে। কারণ দশ পাঁচটা সূত্র (formula) রচনা করিতে পারিলেই দ্রব্যের ধর্ম ব্যাখ্যাত হয় না। জীব-দেহ ছাড়িয়া দিলেও পার্থিব দ্রব্যের বেলাও সেই কথা। জগতে স্থির বলিয়া বস্তু নাই; অথচ স্থির কল্পনা না করিলে বিজ্ঞানের ধরিবার ছুঁইবার কিছুই থাকে না। এই দুই বিরোধের সমন্বয় কল্পনারও অতীত। আরও দেখুন, বিজ্ঞান যে বস্তুই পরীক্ষা করুক, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে হইবে, পরিমেয় হইতে হইবে। অথচ সূক্ষ্মত্ব হেতু তাহা ইন্দ্রিয়ের অ-গ্রাহ্য, সুতরাং অ-পরিমেয় হইতে

করিয়া এক বৎসর (?) রাখিয়া খাইয়া দেখিলে বিতর্কের শেষ হইতে পারে। উনশর্করার বৃদ্ধি হইতে বুঝিতেছি গুড়ে কি একটা ঘটে। কিন্তু এই পর্যন্ত।

এমনও হইতে পারে, উন-শর্করা নিষ্পাদনই অভিপ্রেত। সেকালে হয়ত উনশর্করা করিবার অন্য উপায় জানা ছিল

পারে। বস্তু এরূপ হইলে ক্রিয়াহীন হইবে তাহা ত কল্পনাও করিতে পারি না। তা ছাড়া, কেবল উপাদান ধরিয়া দ্রব্যের গুণ নহে। জড়ের ভাব বা অবস্থা বলিয়া পদার্থ আছে। শীতগ্রীষ্ম, স্থূলসূক্ষ্মাদি ভেদে দ্রব্যের ক্রিয়ান্তর হয়। পতঞ্জলি মুনি, ভূতের ধর্ম লক্ষণ অবস্থা, এই ত্রিবিধ পরিণাম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তত্ত্ববিদ্যা অবহেলা দ্বারা সময়ে সময়ে অনর্থক বিবাদ হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের দৌড়ের যে সীমা আছে, সীমা থাকিবেই, তাহা ভুলিয়া গেলে মিথ্যা মায়া-জালে বদ্ধ হইতে হইবে। একটা দৃষ্টান্ত দি-ই। কয়েক বৎসর পূর্বে 'মকর-ধ্বজ' লইয়া বিলক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল। উপাদান ব্যাস করিয়া "স্বর্ণঘটিত" মকরধ্বজে সোনা পাওয়া যায় নাই। এই সত্য হইতে নানা কূটসিদ্ধান্ত কল্পিত হইয়াছিল, উহ (guess) দ্বারা অ-প্রকটকে প্রকট করিবার কামনা জন্মিয়াছিল। "স্বর্ণ-ঘটিত মকরধ্বজ"—অতএব মকরধ্বজে সোনা থাকিতেই হইবে এই অদ্ভুত ভাষাজ্ঞান ও যুক্তির উৎপত্তি এক কামনা ব্যতীত আর কিছু মনে হয় না। কারণ "স্বর্ণ-ঘটিত"—এই বিশেষণের সোজা বাঙ্গালা, 'সোনা দিয়া করা হইয়াছিল,' 'মকরধ্বজ করিবার সময় সোনা লাগিয়াছিল।' উৎপন্ন মকরধ্বজে সে সোনার সবটা কিংবা কিছু থাকিতে পারে, নাও পারে। কত ঘটনা হইলে ভাত হয়, হাঁড়ী কাঠ আগুন জল ইত্যাদি। ভাতে এই-সব ঘটনার কোনটার কিছু থাকে, কোনটার কিছুই থাকে না। 'চূর্ণ-ঘটিত গুড়' বলিলে বুঝি চূর্ণ দিয়া নিষ্পন্ন গুড়। এইরূপ, 'স্বর্ণ-ঘটিত মকরধ্বজ'—স্বর্ণ যোগে নিষ্পন্ন মকরধ্বজ। ইহাতে অনুমান হয়, সোনা না দিয়াও মকরধ্বজ হইতে পারে। তবে, সে মকরধ্বজ দ্বারা রোগ শান্ত হইবে কি না, তাহা ভিন্ন কথা। বস্তুতঃ মকরধ্বজের ক্রিয়ার পরীক্ষাই পরীক্ষা: নরদেহে পরীক্ষাই ঔষধের পরীক্ষা। স্বর্ণঘটিত, আর অ-স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজের একই শক্তি দেখিলে বলা যাইবে মকরধ্বজ করিবার সময় সোনা দেওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু সেটা অন্য কথা। আমি বুঝিতেছি রাসায়নিক পাঠক এই বিচারে তুষ্ট হইবেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, নিষ্পন্ন মকরধ্বজে সোনা থাকে কি না দেখিব না? ইহার উত্তর, স্বচ্ছন্দে দেখুন না। সোনা পান, ভাল; না পান, তাহাও ভাল। কিন্তু সোনা পান নাই, অতএব সোনা দিয়া নিষ্পন্ন নহে,—একথা বলিতে পারিবেন না। তা ছাড়া, সোনা পান নাই বলিলেও কবিরাজ মহাশয়েরা ছাড়িবেন না। কতখানি থাকিলে পাইতেন, আগে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন। আপনার যন্ত্র মান না পাইলেও দেহযন্ত্র পাইতে পারে না কি?

না, কিংবা রাখিয়া দিয়া উনশর্করার উৎপাদন সহজ বিবেচিত হইত। শুধু সহজ নহে, ইহাতে ইক্ষু-শর্করা উন-শর্করামুখী হইয়া উঠিতে পারে। স্থূলভাবে দেখি। সুশ্রুত লিখিয়াছেন, "গুড়-সংযুক্ত দধি, গুড় সহিত মদ্য (সে কালের 'মদই'), গুণশালী।" এখানে লক্ষ্য এই; মৎস্যণ্ডী-খণ্ড-শর্করার কথা নাই। মদ্য ছাড়িয়া দই ধরা যাউক। কিন্তু গুড় দিয়া দই বসাইতে হইবে, কি গুড় মিশাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দই খাইতে হইবে, কি মিশাইবামাত্র খাইতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। যদি মিশাইবামাত্র গলাধঃ করিতে না হয়, তাহা হইলে গুড়ের উনশর্করা ও "ক্ষার" দইকে সুসন্ধিত ও গুণশালী করিতে পারে। জল-যুক্ত উন-শর্করা ও ইক্ষুরসের পার্থিব (অম্ল) পাইলে দধির অণুজীবের যথেষ্ট ভোজ্য হইতে পারে। বিলাতের পণ্ডিতেরা যাঁহারা দধিভোজনে রত হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন দইতে চীনি (তাহাদের দেশে অবশ্য ধব্‌ধবা চীনি) মিশাইয়া ঘণ্টা খানেক পরে খাওয়া ভাল। অর্থাৎ চীনি যোগে দধি গুণশালী হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা চীনি-পাতা দই অপেক্ষা গুড় পাতা দই গুণশালী বলিয়াছেন। কোন্‌টা অধিক গুণশালী, তাহা কবিরাজ মহাশয়েরা নির্ণয় করিবেন।

গুড় হইতে যে মদ্য হয়, তাহার নাম 'শীধু'। ইহা গৌড়ী নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। পক্ক ইক্ষুরস-জাত ও শর্করা-জাত মদ্যও শীধু নাম পাইত। কিন্তু গৌড়ী নাম প্রসিদ্ধি-হেতু মনে হয়, গুড় সুলভ ছিল, কিংবা গুড় হইতে মদ্য সহজে হইত। বোধ হয় দুই কারণেই গৌড়ী নাম হইয়াছিল। শর্করা অপেক্ষা গুড় হইতে মদ্য করা সোজা। গুড়ের উন-শর্করা ও 'ক্ষার', ইহার কারণ। আয়ুর্বেদে লিখিত আছে, "নূতন মদ্য গুরু, জীর্ণ মদ্য লঘু।" বোধ হয়, নূতন মদ্যে ইক্ষুশর্করা থাকে বলিয়া গুরু, পুরাতন হইলে সে শর্করা উনশর্করায় পরিণত হইয়া লঘু হয়। এ বিষয় পরে দেখা যাইতেছে! (মদ্য অর্থে চোআনা সুরা (spirit) নহে।)

ভাবপ্রকাশ নবীন গুড় "কফ-শ্বাস-কাস-ক্রিমি-কর", কিন্তু "অগ্নি-কৃৎ" বলিয়া পরে লিখিয়াছেন, "আদা যোগে কফ, হরীতকী যোগে পিত্ত, এবং শুঁঠ যোগে গুড় সেবন করিলে অশেষ বাত-রোগ বিনষ্ট হয়। অতএব যে গুড়ে

ত্রিদোষ ক্ষয় হয়, তাঁহাকে নমস্কার।" কবিরাজ মহাশয়েরা ইহার সত্যমিথ্যা বলিতে পারেন। কিন্তু সে গুড় বঙ্গের আধুনিক গুড় নহে। কারণ ভাবপ্রকাশ ইহাকে গুড় বলেন নাই।

আয়ুর্বেদে গুড়াদির গুণ বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে দুইটি গুণ, মধুর ও গুরু, আমরা সবাই বুঝিতে পারি। সুশ্রুত বলেন, "ফাণিত গুরু ও মধুর, সামান্য গুড় সক্ষার ও মধুর, শুদ্ধ গুড় মধুর, শুদ্ধ গুড় পুরাণ হইলে পথ্যতম; মৎস্যণ্ডী, খণ্ড ও শর্করা উত্তরোত্তর বিমল গুরু ও মধুর।"

প্রথমে দেখিতেছি, যেটা যত বিমল অর্থাৎ যেটায় যত ইক্ষু-শর্করা, সেটা তত মধুর। ঠিক কথা। কেহ কেহ মনে করেন শাদা ধব্-ধবা চীনি কিংবা চীনির বড় বড় কেলাস মিষ্ট নহে। কিন্তু গুঁড়া করিয়া চাখিলে ভ্রম দূর হইবে। এমন কি, চাখিয়া গুড়, ভিঁড়া, চীনি প্রভৃতির ভালমন্দ বলিতে পারা যায়।* উনশর্করা অপেক্ষা ইক্ষুশর্করা মধুর।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, যেটাতে যত ইক্ষুশর্করা সেটা তত গুরু, জীর্ণ হইতে তত সময় যায়। ভোজনমাত্র ইক্ষু-শর্করা রক্তে মিশ্রিত হয় না। পাচক-রসে অন্ত্রে (আমাশয়ে নহে) পরিপাক অপেক্ষা করে। কিন্তু পাকা ফলের মধুর রস, যাহা প্রায়ই উনশর্করা, তাহা পরিপাক অপেক্ষা করে না, গুরুও হয় না। আয়ুর্বেদের গুড় গুরু নহে, লঘুও নহে।

অন্ততঃ বিশেষ করা হয় নাই। অতএব সে গুড়ে উন-শর্করা অধিক থাকিত। দেখা যায়, সাধারণ ভিঁড়া বা ভেলীতে উন-শর্করা ১৫-২৫ ভাগ থাকে। নূতন বেলায় এত থাকে না।

দেশে বাতাসা পাইলে লোকে বাতাসা খাইয়া জল খায়, কাঁচা গুড় খাইয়া জল খায় না। এইরূপ, দুধে গুড় না দিয়া বাতাসা দিয়া মিষ্ট করে। আমি গুড়ের বাতাসা পাই নাই। কিন্তু বুঝিতেছি তাহাতে উনশর্করা অনেক থাকে, নতুবা কেলাসিত দেখা যাইত। শাদা চীনির বাতাসায় (রাঢ়ের) প্রায় ৩ ভাগ উনশর্করা পাইয়াছি। বলা বাহুল্য, শাদা চীনিতে উন-শর্করা এত থাকে না। নৈবেদ্যে বাতাসা দিতে পারা যায়, গুড় পারা যায় না। গুড়ে গাদ থাকে বলিয়া, নয়। গুড়ের গাদ তুলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোটাইয়া জল শুখাইতে হয়। তাহাতেই ইক্ষুশর্করার পরিবর্তন হয়। সে পরিবর্তনের যৎকিঞ্চিৎ আভাস উনশর্করার ভাগ দ্বারা বুঝিতে পারা যায়।

সুশ্রুতাদি আয়ুর্বেদে ইক্ষুশর্করা ব্যতীত অপর দুই শর্করার উল্লেখ আছে। একটা "মধু-শর্করা"। উত্তম মধু কিছুদিন রাখিয়া দিলে ইহার কিয়দংশ কেলাসিত হয়। এই কেলাসের নাম "মধু-শর্করা" (dextrose)। মধু-শর্করা নাম সংস্কৃত। মধুমেহ রোগে মধু-শর্করা ক্ষরিত হয়। উন-শর্করার অর্ধভাগ মধু-শর্করা, অপর অর্ধ ফলশর্করা (levulose)। পাকা মিষ্ট ফলে এই দুই শর্করা থাকে; কোন কোন ফলে কিছু ইক্ষু-শর্করাও থাকে। ফল-শর্করা ইক্ষুশর্করার তুল্য মধুর, কিন্তু মধুশর্করা তদপেক্ষা উন। মধু, এবং মিষ্টফল যত মধুরই হউক, চীনির তুল্য মধুর নহে।

চরক ও সুশ্রুতে 'যবাস-শর্করা' নামে আর এক শর্করার উল্লেখ আছে। লিখিত আছে, 'ইহা কষায় মধুর ও তিক্ত।' আমি যবাস গাছ দেখি নাই, ইহার শর্করাও জানি না।* সুশ্রুত মধুক পুষ্পের (মহুআ ফুলের) ফাণিত বর্ণনা করিয়াছেন। এ বিষয় পূর্ব প্রবন্ধে বলা গিয়াছে।

---

* এক পোয়া জলে এক ছটাক শাদা চীনির পানা করা গিয়াছিল। এইরূপ, সাদা মিছরী, তালের মিছরী, দেশের লাল মিছরী, রাঢ়ের গুড়, কটকের কন্দ, গঙ্গামের ভেলীর পানা করিয়া তিন ভদ্রলোককে চাখিতে দেওয়া হইয়াছিল। সকলের স্বাদে চারি শ্রেণী পাওয়া গিয়াছিল। যথা,

শাদা চীনি, শাদা মিছরী	...	১ (মিষ্টতম)
তালের মিছরী, লাল মিছরী	...	২
রাঢ়ের গুড়, কটকের কন্দ	...	৩
গঞ্জামের ভেলী	...	৪ (মিষ্টতায় হীন)

এই-সকলের দামেও এইরূপ ন্যূনাধিক্য ছিল। কেবল কন্দের প্রতি ওড়িয়্যার লোকের শ্রদ্ধা বলিয়া চড়া দরে বিক্রি হইয়া থাকে। যথা, গত বৎসর বৈশাখ মাসে যখন পানা-পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তখন কটকে শাদা চীনির (বাজার) সের ।৶১০, মিছরীর ।৵০, কন্দের ।৶০, ভেলীর ৶১০। ১০৫ তোলায় সের।

* 'যবাস' গাছের এক নাম 'দুরালভা' আছে। কিন্তু নাম পাইলেই দ্রব্য নির্ণীত হয় না। ইহার হিন্দী নাম 'যবাস'। ডাঃ

দেখা যাইতেছে, সে কালে তাল কিংবা খেজুর-রস হইতে গুড় হইত না। সুশ্রুত ও চরক তালী বা তাড়ী মদ্যও লেখেন নাই। চাণক্য সুরা-ব্যবসায় লিখিয়াছেন; কিন্তু তাড়ী উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দে) গ্রীক ঐতিহাসিক, তিসিঅস্ (Ktesias) তামিল দেশের তাড়ী খাইয়াছিলেন। বোধ হয়, সে কালে উত্তর ভারতে (তালেরই হউক, খেজুরেরই হউক) তাড়ী ও গুড় জানা ছিল না। দক্ষিণ দেশে গুড় হইত কি না, তাহাও জানা যাইতেছে না। রস সংগ্রহ হইলে গুড় করিতে শেখা কঠিন নয়। রসসংগ্রহের বুদ্ধিই প্রধান। সে বুদ্ধির উৎপত্তি কি? কোন কোন গাছে ক্ষত করিলে রস-স্রাব হয়। কিন্তু সে এক কথা, আর বিধি-পূর্বক রস-সংগ্রহ অন্য কথা। সে যাহা হউক, বঙ্গদেশের তাড়ী কিংবা খেজুরা গুড় অধিক কালের বোধ হয় না। পুরানা বাঙ্গালা বহিতে তাড়ী নাম পাই নাই।

আখের গুড়ই এদেশের গুড়। কতকাল হইতে আখের চাষ ও গুড় হইয়া আসিতেছে, কে জানে। মেক্‌ডোনাল সাহেব লিখিয়াছেন অথর্ববেদে, এবং পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় জানাইয়াছেন বেদের সংহিতাভাগেও ইক্ষু শব্দ আছে। তাহা হইলে, ইক্ষুর কৃষিও ছিল। কারণ আখ-গাছ কোথাও বন্য দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ইহার আদিনিবাস অদ্যাপি অজ্ঞাত। কোন কোন উদ্ভিদবেত্তা অনুমান করেন, কোচীন শ্যাম হইতে বঙ্গদেশ হইবে। যেখানেই হউক, হিমালয় নয়, পঞ্জাব নয়। অতএব বেদের আর্যদিগকে ইক্ষু-কৃষি শিখিতে হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদে ইক্ষ্বাকু বংশের নাম আছে। হয়ত এই বংশ প্রথমে ইক্ষু-বাটিকা (আখবাড়ী) করিয়া ইক্ষ্বাকু নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। এই বংশের নিবাস কোথায় ছিল, কেহ অনুসন্ধান করিলে উহটার সত্যমিথ্যা বুঝিতে পারা যাইত। কিন্তু তখনও গুড় হইত কি না, সন্দেহ। কারণ বেদে গুড় শব্দ নাই, মিষ্টকের মধ্যে এক মধু আছে। প্রথা প্রথম আখ ছাড়াইয়া চিবাইয়া খাইবার কথা। পরে ছেঁচিয়া নিঙ্গাড়াইয়া রস বাহির করিবার কথা। বহু পরে নিষ্পীড়ন-যন্ত্র উদ্‌ভাবিত হইয়া থাকিবে।* তখন গুড়ও হইয়াছে। কারণ রস অবিকৃত রাখিতে পারা যায় না, শুকাইয়া রাখিতে পারা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় জানাইয়াছেন, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দে ইক্ষুর কৃষি ও গুড় প্রচলিত ছিল। কারণ "সূত্র" গ্রন্থে (বৌধায়ন ধর্মসূত্রে ১৫।১৪০,১৪২) আছে, পাণিনিও (৪।৪।১০০) ধরিয়াছেন। অতএব অন্ততঃ তিন হাজার বছর আমাদের দেশে আখ-চাষ ও গুড় হইয়া আসিতেছে।

তিন হাজার বছর! তিন শ বছরে বিলাতের লোকেরা আখ-চাষে কত উন্নতি করিয়া ফেলিয়াছে, তিন হাজার বছরে আমরা তাহা পারি নাই! কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহারা এদেশের অর্জিত জ্ঞান পাইয়াছিল, আর গত ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে (একপুরুষকালে) আমাদের চেয়ে গুড় সস্তা বেচিতে পারিয়াছে। তথাপি, দেশের গ্লানি স্বীকার করিতে হইতেছে।

অধুনা আখের নানা জাত (variety) হইয়াছে। এ দেশের কোন কোন জাত বিদেশে গিয়াছে, কোন কোনটা বিদেশ হইতে আসিয়াছে। এই দেশের আখও এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গিয়া জল-বায়ু-মৃত্তিকা-গুণে গুণান্তর পাইয়াছে। নাম পরিবর্তিত বা অপভ্রষ্ট হইয়াছে। তথাপি কয়েকটা প্রাচীন সংস্কৃত নাম দেশভাষায় রহিয়া গিয়াছে। চরকে আখের দুই জাতের নাম আছে, সুশ্রুতে বার জাতের

উদয়চাঁদ ইহার ইয়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক নাম Alhagi maurorum লিখিয়াছেন। অমরকোষে যবাসের যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত এই গাছ মিলিতেছে। যথা, "ইহা মরুস্থানে [শুষ্ক অনুর্বর বালুকাময় ভূমিতে] জন্মে ('ধন্বয়াস'); এক স্থানে অনেক জন্মে ('যাস,' 'যবাস'); মূল দীর্ঘ ('অনন্তা') [নিম্নদিকে দীর্ঘ]; বহুকণ্টকী ('দুস্পর্শা,' 'কচ্ছুরা'); একারণ দুর্লভ ('দুরালভা'); পশ্চিম সমুদ্রের নিকটবর্তী প্রদেশে [বোম্বাই প্রদেশে] জন্মে ('সমুদ্রান্তা'); গাছ হইতে নির্যাস নির্গত হয় ('রোদনী')। রকস্‌বরা সাহেব লিখিয়াছেন "কান্দাহার ও মিরাট অঞ্চলে এই গাছ হইতে একপ্রকার নির্যাস-শর্করা (manna) সংগৃহীত হয় বলিয়া শুনিয়াছি।" বঙ্গদেশে যবাস গাছ নাই। গয়ায় নাকি আছে। বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও কোঙ্কণ প্রদেশে প্রচুর আছে। ইহার কাঁটায় ফুল ধরে, ফুল আরক্তবর্ণ।

* প্রাচীন নিষ্পীড়ন কেমন ছিল? রঙ্গপুরে ঘণাগাছে আখ-কুচি ফেলিয়া তিল মাড়িবার মতন আখের রস বাহির করা হইত। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রঙ্গপুরের গ্রাম্য শব্দের তালিকা দেখুন। কিন্তু ঘণা-গাছ-নির্মাণেও যে বুদ্ধির উৎকর্ষ।

আছে।* চরকের দুই জাত, পৌণ্ড্রক ও বংশক, সুশ্রুতেও আছে। পৌণ্ড্রক নামই পৌণ্ডিয়া, পৌণ্ডা, পুণ্ড্রী, পুঁড়ী রূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। যদিও সেকালের জাত আর নাই, নামটি মাত্র আছে। পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, প্রভৃতি প্রায় সকল প্রদেশে পৌণ্ডিয়া এক শ্রেষ্ঠ জাত। দাঁতে ছাড়াইয়া খাইতে যেমন, রস বাহির করিয়া গুড় করিতেও তেমন প্রসিদ্ধ। বোধ হয়, 'পৌণ্ড্রক' এই নামের মধ্যে অনেক ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। আমি সব ইতিহাস জানি না। দুই একটার উল্লেখ করিতেছি। অমরকোষে পৌণ্ড্রক ইক্ষুনাম আছে। খ্রীঃ একাদশ শতাব্দের টীকাকার ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন, পুণ্ড্রদেশে জাত বলিয়া পৌণ্ড্রক, পৌণ্ড্র নাম। তাঁহার নিবাস মধ্যভারতে ছিল। এইরূপ, অন্য টীকাকারও পুণ্ড্র-দেশজাত, এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ দিকে, উত্তর বঙ্গের প্রাচীন নাম পুণ্ড্র ছিল। অতএব বর্ত্তমান পৌণ্ডিয়া আখের আদি নিবাস উত্তরবঙ্গ। পৌণ্ডিয়া যেমন-তেমন আখ নহে, বোধ হয় ভারতবর্ষের আখের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মনুসংহিতায়, পৌণ্ড্রক, এক মানুষজাতের নাম আছে। পুণ্ড্র দেশের লোক পৌণ্ড্রক। আপ্তে তাঁহার সংস্কৃত-কোষে লিখিয়াছেন, পৌণ্ড্রক ইক্ষুভেদ, এবং গুড়কার সঙ্করজাতিবিশেষ। যদি গুড়কার বলিয়া কোথাও বর্ণিত থাকে, তাহা হইলে কোনও সন্দেহ থাকিবে না।* আশ্চর্য, পৌণ্ড্রবর্ধন নামে জনপদও ছিল, যেখানে পুণ্ড্রজাতির কিংবা পুণ্ড্র ইক্ষুর বৃদ্ধি হইয়াছিল। আরও আশ্চর্য, পূর্বকালে পুণ্ড্রবর্ধনের নামান্তর গৌড হইয়াছিল। গড় হইতে গৌড়ীমদ্য নামও হইয়াছিল। গুড় হইতে গৌড় নগরের নামও হইতে পারে।* অদ্যাপি উত্তর বঙ্গে গুড় হয়। ইক্ষুজাত গুড়ে বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রসিদ্ধ আছে। কামরূপে মোটা মোটা আখ জন্মে। সম্প্রতি কামরূপের ইক্ষুশক্তি সরকারী কৃষিক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্জাব ও উত্তর-

* ইহা হইতে দুই অনুমান হয়। (১) চরকের দেশ আখের ছিল না, (২) চরকের বহুকাল পরে সুশ্রুত, এতকাল পরে যে সে সময়ে আখের দশটা নূতন জাত জন্মিয়াছে। বোধ হয়, দুই-ই ঠিক। উভয়ের মধ্যে দেশ ও কালের বহু ব্যবধান ছিল। চরক যে প্রাচীন, তাহা উভয়ের ইক্ষুবর্গ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। চরকে দুই-একটা, সুশ্রুতে অনেক গুণ বর্ণিত হইয়াছে, নূতন ও পুরাতন গুড়ের গুণান্তর লক্ষ্য হইয়া শাস্ত্রে উঠিয়াছে। আমি কোনটাই পড়ি নাই, কয়েকটা পাতা মাত্র উলটাইয়াছি। কয়েকটা গাছ লক্ষ্য করিয়া মনে হইয়াছে চরকের উৎপত্তি পঞ্জাবের দিকে, সুশ্রুতের পূর্বদিকে যেন বিহারে। কিন্তু এ বিষয় এখানে অবান্তর।

* মনু কিন্তু গুড়কার বলেন নাই। তাঁহার মতে পৌণ্ড্রক ক্ষত্রিয় জাতি, কর্মদোষে শূদ্র। বৈশ্য ব্যতীত যে শূদ্রেরা পশুপালন ও কৃষিবার্তা করিত তাহা চাণক্য লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পুণ্ড্র, এই নাম কেন হইয়াছিল? এখানে সংস্কৃত ভাষার বৈয়াকরণদিগের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অর্থাৎ আখের নামে দেশের নাম, না দেশের নামে আখের নাম? দেশের নামে দ্রব্যের নাম হইয়া থাকে। তথাপি, অমরকোষের এক টীকাকার লিখিয়াছেন, পুণ্ডাতে খণ্ডাতে পুডি খণ্ডনে। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হইত বলিয়া পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক নাম। তা যেন হইল। অমরকোষে মাধবীলতার এক নাম পুণ্ড্রক আছে। এখানে ক্ষীরস্বামী বলেন, পুণ্ড্র দেশের গাছ বলিয়া এই নাম। ইহার প্রায় শতবর্ষ পরে বাঙ্গালী টীকাকার সর্বানন্দ বলেন, মডি ভূষায়াম্, যাহা দ্বারা দেশ শোভিত হয়। কিন্তু লিখিয়াছেন, কেহ-কেহ পুডি ধাতু বলেন। অন্য টীকাকার ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, মাধবীফুল ভ্রমর বা পুষ্প-গ্রাহক দ্বারা মর্দিত হয় বলিয়া পুণ্ড্রক নাম। ইচ্ছা করিলে সংস্কৃত ব্যাকরণ কি না ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু এই সব টীকাকার আমাদের অভিসন্ধি জানিতেন না। আমরা বলিতে পারি, যে দেশ ইক্ষুদ্বারা শোভিত হইত, যে ইক্ষু কাটা হইত মাড়া হইত, সে দেশ ও দেশের ইক্ষু, পুণ্ড্রক নামে খ্যাত হইয়াছিল। সে দেশের লোক যে গুড়-কার হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

* ৱাট (Watt) সাহেব গুড় হইতে গৌড় নামের উৎপত্তি অসম্ভব মনে করিয়াছেন। তিনি বলেন, "বঙ্গদেশে আর্যনিবাস হইবার পুর্কের সংস্কৃতগ্রন্থে যখন গুড় শব্দ আছে, তখন বঙ্গদেশ গুড়ের আদি হইতে পারে না।" এই তর্ক ঠিক বোধ হয় না। কারণ বঙ্গনিবাসী না হইয়াও আর্যেরা গুড় নাম রচনা করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ শর্করা শব্দের প্রাচীন অর্থ বালি, গুড় শব্দের অর্থ গোলপিণ্ড। নূতন অর্থে প্রয়োগ হইতে বোঝা যায়, আর্যদিগের নিকট শর্করা ও গুড় নূতন দ্রব্য হইয়াছিল। সাদৃশ্যে শব্দের নূতন অর্থ হয়। তা ছাড়া, কবে আর্যেরা বঙ্গ (উত্তর বঙ্গ) দেখিয়াছিলেন, এবং কবে গুড় নাম রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জানা নাই। মেকডোনাল সাহেব লিখিয়াছেন, ঐতরেয় আরণ্যক নামক প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে বঙ্গ ও মগধ নাম আছে। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, অথর্ববেদে অঙ্গ ও মগধদেশের, এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র জাতির নাম আছে। এ-সব যে বহুকালের কথা।

পশ্চিমাঞ্চলের ইক্ষু অতি অধম।* সে প্রদেশে গুড় হয়, বঙ্গে গুড় প্রায় অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে। কারণ বঙ্গ আদিম গুড়ের উপরে উঠিয়াছে; মৎস্যণ্ডী করে যাহা হইতে খণ্ড ও শর্করা হইতে পারে। অতএব যে দিক দিয়াই দেখি, বোধ হয় বঙ্গই ইক্ষুকৃষির আদিভূমি, বঙ্গের পুণ্ড্রক-ইক্ষু এখনও প্রসিদ্ধ, এবং বঙ্গের ইক্ষু ও গুড় এখনও উত্তম। ৺ নিত্যগোপাল মুখার্জী লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গদেশে শ্যামসাড়া ও খড়ী আখ শ্রেষ্ঠ।" এক-এক গুণে এক-এক জাত শ্রেষ্ঠ। তথাপি বোধ হয় ভারতবর্ষের মধ্যে পুঁড়িয়া, শ্যামসাড়া, ও খড়ী শ্রেষ্ঠ। যে আখে ভাল ও অধিক গুড় হয়, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতেছে। বঙ্গের এই যে বিশেষ, তাহা কি আধুনিক ও আকস্মিক? বহুকালের ভূয়োদর্শন না থাকিলে, জলবায়ু অনুকূল না হইলে ভাল ভাল আখের চাষ হইতে পারিত না।*

সরকারের ইক্ষুপ্রাজ্ঞ বারবার সাহেব লিখিয়াছেন, দক্ষিণ-ভারতে মোটা মোটা রসাল আখ জন্মে। কারণ সে দেশ গ্রীষ্ম। উত্তর-ভারতের আখ ছোট ছোট সরু; কারণ সে দেশ শীত। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে জলের, উত্তর-ভারতে গ্রীষ্মের টানাটানি। সরকারী পুস্তকে দেখিতেছি, ইং ১৯১৩ সালে, সমস্ত দেশে ৭৫ লক্ষ বিঘায় আখ চাষ হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৪২ লক্ষ বিঘা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, ১২ লক্ষ পঞ্জাবে। অর্থাৎ যে দেশ আখের নয়, সে দেশে চাষ হইতেছে; যে দেশ আখের সে দেশে চাষ হইতেছে না! জাবার চীনি আসিয়া বঙ্গ বোম্বাই ও অন্য প্রদেশের আখচাষ কমাইয়া ফেলিয়াছে। আখের (আখের কেন, যাবতীয়

---

* ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই ও বঙ্গের ইক্ষু ও কৃষি উৎকৃষ্ট। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি সর্বাধিক। সে প্রদেশ গ্রীষ্মবর্ষার উত্তরে, ইক্ষুর উপযোগী নহে। ফলে, আখ সরু সরু, ছোট ছোট। পঞ্জাবেও তাই। 'In Dr. Barber's opinion the varieties in the great sugar-cane areas of the north of India are among the poorest in the world."—*Agri. in India.* I. Mackenna. ডাঃ বারবার সরকারের ইক্ষু-প্রাজ্ঞ।

* উত্তর ও পূর্ববঙ্গের আখ সম্বন্ধে কোন পুস্তক পাইলাম না, আমার জ্ঞানও নাই। এই কারণে পশ্চিম বঙ্গ (বৰ্দ্ধমানের) আখের নাম করিতে হইল। পুঁড়িয়া ও শ্যামসাড়া দাঁতে ছাড়াইয়া খাইতে পারা যায়, কাজলী পুরী ও খড়ী পারা যায় না। মুখার্জী চাটিগাঁয়ের পাটনাই আখেরও প্রশংসা করিয়াছেন। এই পাটনাই পুঁড়িয়ার জাত হইতে পারে। খাইবার পক্ষে ঢাকার ধলসুন্দরও ভাল। শ্যামসাড়া আখ শ্যাম দেশ হইতে আনা, না শ্যাম পীতহরিৎ সার ত্বক বলিয়া শ্যামসার —শ্যামসাড়া? রোদ্র পাইলে শ্যামসাড়া পীতবর্ণ হয়। বোধ হয়, ইহা দেশী আখ, পূর্বকালের পৌণ্ড্রক হইতে জাত। পৌণ্ড্রিয়ার সহিত শ্যামসাড়ার অনেক সাদৃশ্য আছে। আকারে নহে, রসে ও রসের শর্করায় আছে। সুশ্রুতের বারজাতের নাম,—পৌণ্ড্রক, ভীরুক, বংশক, শতপোরক, কান্তার, তাপস, কাষ্ঠ, সূচিপত্রক, নৈপাল, দীর্ঘপত্রক, নীলপোর, কোশকৃৎ। এই বার জাতের মধ্যে চরক পৌণ্ড্রক ও ও বংশক, এই দুই নাম করিয়াছেন। নাম সাদৃশ্যে দ্রব্যনির্ণয় ঠিক নহে। কিন্তু এ ছাড়া উপায় নাই। দুই হাজার আড়াই হাজার বছর পূর্বের নাম লোকমুখে বিকৃত হইবার কথা। তথাপি কয়েকটা দশা পড়িতেছে। পৌণ্ড্রক হইতে মান্দ্রাজী লাহোরী সাহারনপুরী ও পুনাই পৌণ্ডা বা পুঁড়িয়া, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সরকারী কৃষিবিভাগের উপাধ্যক্ষ সৈয়দ হাদী সাহেব পৌণ্ডাকে বিদেশী মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। (অন্য দিকে চীনা আখকে দেশী বলিয়াছেন!) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পক্ষে পৌণ্ডা বিদেশী হইতে পারে, কারণ ইহার আদি স্থান বঙ্গদেশ। সে প্রদেশে মান্দ্রাজী পৌণ্ডা ও পুনাই পৌণ্ডার চাষও হয়। এই-সব বিশেষণ হইতে হাদীসাহেব ভ্রমে পড়িয়া থাকিবেন। দেশভেদে একই আখ কিছু কিছু রূপান্তরিত না হইয়া যায় না। পৌণ্ডা আখ লম্বা মোটা, রসাল। ত্বক কঠিন, কিন্তু দাঁতে ছাড়াইতে পারা যায়। (See Watts' *Com. Prod. India.*)। শ্যামসাড়া আখও এই প্রকার। চরক ও সুশ্রুতের 'বংশক' হইতে মরাঠা দেশে 'বাংশী'। সুশ্রুতের 'ভীরুক' হইতে সুরাটে 'ভুরী' (ডুমরাণে 'ভুরলী'?); 'কান্তার' হইতে ওড়িষ্যায় 'কান্তারী', ঢাকায় ও পশ্চিমে 'গাণ্ডারী'; 'কাষ্ঠ' হইতে লাহোরে 'কাঠা', বৰ্দ্ধমান ও ও ওড়িষ্যায় 'খড়ী'; 'কোশকৃৎ', 'কোশকর', 'কোশকার' হইতে ঢাকায় 'কুশইর' ও মালদহে 'কুশিআর' নাম, এবং লক্ষ্ণৌ প্রদেশে 'কশরার'। 'পোর' 'পোরক' শব্দ বোধ হয় সং পর্ব শব্দের অপভ্রংশ। পর্ব শব্দের অর্থ সন্ধি, গাঁইট। কিন্তু বাঙ্গালায় 'পাব' বুঝায়। সে যাহা হউক, শতপোরক বলিলে বুঝি যাহার শত—বহু গ্রন্থি, অতএব পাব আছে। অর্থাৎ পাব ছোট ছোট। 'পুরী' আখের পাব ছোট ছোট। 'নীলপোর' হয়ত কাজলী আখ। অমরকোষে 'রসাল' একটা ইক্ষুভেদ। পুণাতে প্রায় এই নামের এক জাত আছে। বিভিন্ন প্রদেশের সমুদয় জাতের নাম ও স্থূল লক্ষণ একত্র করিলে বোধ হয় সে সব কয়েকজাতের অন্তর্গত হইবে। বিশ বৎসর হইল ডাঃ লীথার ও মলিসন সাহেব অনেক আখের জাতের লক্ষণ নির্ণয়ে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের মুখের কিংবা ধান্যভেদের লক্ষণ-লেখা যেমন অ-সাধ্য, ইক্ষুভেদেরও তেমন। ক্ষেত্রভেদে জাতান্তর হইবেই। তথাপি

কৃষি-বৃক্ষের) দোষ এই, এক স্থানে বহুকাল ভাল থাকে না, হীনবীর্য হয়, রোগাক্রান্ত হয়। জাবাদ্বীপেও এই বিপত্তি ঘটিয়াছিল। কিন্তু আখের ফুল হয়, বীজ হয়। তখন পুংস্ত্রী নির্বাচন দ্বারা কষ্টসহ অথচ গুণশালী বংশের উৎপত্তি করা যাইতে পারে। কোইম্বাটুরে আখের ফুল হয়। সেখানে ইক্ষুপ্রাজ্ঞ বীজ নির্বাচনে মন দিয়াছেন। কিন্তু আরও এক উপায় আছে। এই দেশেরই ভাল ভাল আখ সর্বত্র প্রচলিত করিতে পারিলে স্থান পরিবর্তনে আখের কাম্যগুণ বাড়িতে পারে, দেশের গুড়ও অধিক হইতে পারে। যখন বঙ্গে আখের ফুল হয় না, তখন ডগাদ্বারাই ভাল জাতের উৎপত্তি করিতে হইবে। বঙ্গে আমের কত জাত হইয়াছে, সবই কলি- (bud)-জাত (variety)। আখেও 'চোখ' হইতে নূতন জাতের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। এই উপায় অল্পসাধ্য, এবং শীঘ্র অবলম্বনের যোগ্য। আখের দেশে আখের চাষ বাড়াইতে মনোযোগী হইলে দেশের অধিক হিত হইবে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল গমের দেশ, সেখানে গমে মন দিলেই ভাল হয়।

এসব বিষয় কৃষিবিভাগের কর্তারা নিশ্চয়ই চিন্তা করিয়াছেন। এখানে এই প্রবন্ধ হইতে দেখা যাইবে, ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে ইক্ষুকৃষি হইতেছে, কতকাল হইতে যে, কেহ বলিতে পারে না, তন্মধ্যে বঙ্গদেশ এক সময়ে উত্তম স্থান অধিকার করিয়াছিল। সে সময়ে যদি করিয়াছিল, এ সময়ে করিবে না কেন? বস্তুতঃ ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে প্রদেশ গ্রীষ্ম ও বর্ষার বলিয়া প্রসিদ্ধ, সে সে প্রদেশে ধান্য যেমন সুলভ, ইক্ষুও তেমন সুলভ হইতে পারে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

স্থূল ও স্থায়ী লক্ষণ ধরিলে কতকটা জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু কার সময় আছে, বা উৎসাহ আছে? যদি কাহারও থাকে, তাহা সরকারের কর্মচারীর থাকিবার কথা। এই জাতবিভাগ দ্বারা একটা ফল হইতে পারিত। এদেশের আখের স্থির ও অস্থির ধর্ম (character) জানা যাইত, বৃক্ষ-বর্ধন (plant-breeding) ক্রমে ইক্ষুর উন্নতির সম্ভাবনা হইত।

সুশ্রুত তাহাঁর লিখিত বার জাতের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এইরূপ শ্রেণী করিয়াছেন, "পৌণ্ড্রক ও ভীরুকে (ইক্ষু-) শর্করা অধিক; বংশক এইরূপ, কিন্তু স-ক্ষার (অর্থাৎ রসে গাদ বেশী); বংশকের পর শতপোর, কান্তার, তাপস, ও কাষ্ঠ। সূচিপত্র, নীলপোর, নৈপাল, দীর্ঘপত্রক, ঈষৎ কষায় (? কষায়ীন tannin আছে? কাজলী পরীক্ষা করিলে মন্দ হয় না)। কোশকারেও ইক্ষু-শর্করা অধিক। আখের গোড়ার দিক অতিমধুর, মাঝে মধুর, আগায় ও চোখে (গাঁইঠে) লবণ রস।" কটকের কাজলা আখের পাবের ও গাঁইঠের রসে শর্করায় প্রভেদ ৮:৭, লবণে (ভস্মে) ৩:৪। অর্থাৎ গুড়ের পক্ষে গাঁইঠ অধম। তাহা খাইলেও বুঝিতে পারা যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শক্ত মানুষ চাই।

পৃথিবীর বহুসংখ্যক বিখ্যাত লোকের জীবনচরিত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে অনেকেরই খ্যাতি গড়ে ৫০ বা তদূর্দ্ধ বয়সে উচ্চতম সীমায় পৌছিয়াছিল। অভিজ্ঞতায় সাহায্যে বুদ্ধি বিবেচনা পাকিতে সময় লাগে। মোটামুটি ধরিয়া লইতে পারা যায় যে গড়ে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে মানুষের মানসিক শক্তি পরিপক্ব হয়। ইহার মানে এ নয় যে তাহার আগে মানুষ নাবালক থাকে, বা পঞ্চাশের পর মানুষ আরও অধিক বিজ্ঞ বা বিবেচক হয় না, কিম্বা সব মানুষের পক্ষেই এইরূপ একটা বয়সের রেখা টানা যায়। বিধাতার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের বিদ্যালয়ে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রবেশিকা পরীক্ষার কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সের সীমা নাই। আমরা কেবল মোটামুটি একটা বয়সের কথা বলিতেছি।

পাশ্চাত্য বহুদেশে মানুষ পঞ্চাশের পরও অনেক বৎসর বাঁচিয়া থাকে; শুধু বাঁচিয়া থাকে না, পূর্ণমাত্রায় কার্য্যক্ষম থাকে। তাহারা যুদ্ধে সেনাপতির কাজ করে, রাজকার্য্যে মন্ত্রীর কাজ করে, বড়-বড় ব্যবসা চালায়, কঠিন-কঠিন বিষয়ে পুস্তক লেখে, কঠিন-কঠিন বিষয়ে কলেজে অধ্যাপনা করে, এবং আরও অনেক শ্রমসাধ্য কাজ করে। সত্তর বৎসর বয়সের পরেও অনেকে এইরূপ নানা কাজ করে। আমাদের দেশে প্রতিভাশালী বিখ্যাত একজন লোকও যে ৭০এর পর বাঁচিয়া থাকেন নাই, বা এখনও জীবিত নাই, তাহা নহে; কিন্তু এই বয়সের পরও যাঁহাদের দেহের ও মনের সামর্থ্য, এবং কর্ম্মিষ্ঠতা অটুট ছিল, বা আছে, আমরা

এমন কয় জন লোকের নাম করিতে পারি? আমাদের অনেক বিখ্যাত লোক ৫০এর আগেই দেহত্যাগ করিয়াছেন; ৬০এর আগে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে। ৫০।৬০এর পরও যাঁহাদের বুদ্ধি বিবেচনা অভিজ্ঞতা কর্ম্মিষ্ঠতা দ্বারা দেশ উপকৃত হইয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় খুব কম।

ইংরেজরা আমাদের দেশের বড়-বড় সরকারী কাজগুলি একচেটিয়া করিয়া আছেন। তাঁহারা ৫০।৬০ বৎসর বয়সে এই দেশ হইতে সঞ্চিত অর্থ ও অভিজ্ঞতা লইয়া স্বদেশে চলিয়া যান; সে-সব আর আমাদের কোন কাজে লাগে না, তাঁহাদের দেশের কাজে লাগে। আমাদের দেশী কর্ম্মীরাও যদি ইহ লোকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবিবেচনা লইয়া ৫০।৬০ বৎসর বয়সে বা তার আগেই পরলোক যাত্রা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই পুঁজি পরলোকবাসীদের কোন কাজে লাগে কি না জানি না, আমাদের ত কোন কাজেই লাগে না।

এই জন্য আমরা সুস্থ শক্ত মানুষ চাই, এমন মানুষ চাই যাঁহারা ৫০এর পরও অন্ততঃ ২০।২৫ বৎসর ধরিয়া নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য অনুসারে কাজ করিতে পারিবেন।

আর-এক কারণে আর-এক রকমের শক্ত মানুষ চাই। যাহা বিধাতার বিধান নয়, মানুষের বিধি, তাহা লঙ্ঘন করিয়া অনেক দেশসেবককে জেল খাটিতে হইয়াছে, কাহাকেও বা নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছে। এমন অনেক লোক কারারুদ্ধ, নির্ব্বাসিত বা নজরবন্দী হইয়াছেন, যাঁহাদের বিরুদ্ধে ঠিক্ অভিযোগটা যে কি, তাহা পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। আমাদের বিশ্বাস এবং দেশের বিস্তর লোকের বিশ্বাস, শত শত এরূপ লোকের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে যাহারা বিধাতার বা মানুষের কোন আইন ভঙ্গ করে নাই। যে-সব আইনের বলে রাজপুরুষেরা এমন নিরপরাধ লোকদিগকেও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন, সে-সব আইন সহজে রদ হইবে না। যাহারা এখন প্রভু আছে, তাহারা প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য সুযোগ ও আবশ্যকমত ভবিষ্যতে আরও অনেকের স্বাধীনতা লুপ্ত করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। ইহার জন্য দেশের লোককে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

পাশ্চাত্য নানা দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক লোক রাজনৈতিক কারণে বার বার জেলে গিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক বার খালাস পাইয়া আবার নিজের জীবনের ব্রতপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা পাগল হয় নাই, আত্মহত্যা করে নাই, অসমর্থ হয় নাই বা দমিয়া যায় নাই। অধুনা রাজনৈতিক বা অন্যবিধ কয়েদীদিগকে পাশ্চাত্য সভ্য দেশসকলে কোনপ্রকার অমানুষিক যন্ত্রণা দেওয়া হয় না। আগে আগে কিন্তু অনেককে মাটীর নীচের অন্ধকার ভিজে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইত; কেহ কেহ সেইরূপ ঘরে লোহার খাঁচায় থাকিতে বাধ্য হইত, কাহাকেও কাহাকেও সেইরূপ ঘরে পায়ে বেড়ি ও শিকল দিয়া থামে বাঁধিয়া রাখা হইত। অনেকে এ অবস্থাতেও বাঁচিয়া থাকিয়া আবার যখন মুক্তি পাইয়া সূর্য্যের মুখ দেখিয়াছে, অমনি নিজের নিজের বিধিনির্দ্দিষ্ট কার্জে লাগিয়া গিয়াছে। ইহারা সব শক্ত মানুষ, ক্ষীণজীবী নয়।

আমাদের দেশে একবার জেলখাটিয়া নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিয়া, বা নজরবন্দী হইয়াও, স্বাধীনতা লাভের পর আবার পূর্ব্ববৎ নিজের কাজ করিতে পারিয়াছে, এরূপ লোক বেশী নাই;—যদিও একজনও নাই এমন কথা বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ নির্ব্বাসন-সময়ে কিম্বা অবরুদ্ধ বা নজরবন্দী অবস্থায় পাগল হইয়াছেন, কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াছেন, কাহারও কাহারও স্বাস্থ্য এত খারাপ হইয়াছে কিম্বা মন এমন আতঙ্কে পূর্ণ হইয়াছে, যে, তাঁহাদের পক্ষে নিগৃহীত হইবার পূর্ব্বের মত জনহিতসাধন-চেষ্টা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডেও যখন দেখিতেছি এখনও বিনা বিচারে মানুষের স্বাধীনতা লুপ্ত হইতেছে, তখন আমাদের দেশে যে এইরূপ অবস্থা আরও অনেক দিন চলিবে না, এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু এরূপ অবস্থাসত্ত্বেও এদেশের কর্ম্মীদিগকে বিধিনির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে হইবে; দুই একবার নিগৃহীত হইলেই ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলিবে না। শক্ত মানুষের দরকার। সহ্য করিলে লাভ হয়; কিন্তু দুর্ব্বলের মত সহিলে লাভ হয় না, সবলের মত সহিলে প্রাণ পাওয়া যায়, মহাপ্রাণ হওয়া যায়।

আমাদের দেশে যাঁহারা অল্প বা অধিক কাল দেশের সেবা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সম্মানের পাত্র ও কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহারা আরও সেবা করিতে পারেন

নাই বলিয়া তাঁহাদের নিন্দা করা বা তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান, আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল এই বলিতে চাই, যে, জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভের পথ সহজ নয়; মিঃ মণ্টেগু কিম্বা সমগ্র ব্রিটিশ জাতি ইহা আমাদের জন্য সহজ করিয়া দিতে পারেন না। এখন যেমন আমাদিগকে বিদেশী রাজকর্ম্মচারীদের প্রভুত্ব ক্রমশঃ লুপ্ত করিয়া আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইতেছে, ভবিষ্যতে তেমনি আমাদের স্বদেশী যে-সব শ্রেণীর লোকের হাতে ক্ষমতা আসিবে, কর্তৃত্ব যাহাতে তাহাদের একচেটিয়া না হয়, সকল শ্রেণীর লোকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে, তাহার জন্যও লড়িতে হইবে। স্বাধীন ইংলণ্ডেও শ্রমজীবীদিগকে এবং নারীগণকে এই জন্য লড়িতে হইয়াছে, এবং এখনও এই সংগ্রাম করিতে হইবে। এই সংগ্রাম শান্তির সংগ্রাম হইলেও ইহার জন্য সাহসী, অধ্যবসায়ী, কষ্টসহিষ্ণু লোক চাই।

আমরা বিলাসিতায় অভ্যস্ত, আরামে অভ্যস্ত, ঠুনকো আমাদের স্বাস্থ্য, দুর্ব্বল আমাদের মন, ক্ষীণজীবী আমরা; আমাদের দ্বারা সোজা কাজ হইতে পারে। কিন্তু ঝড়ের আগে বুক পাতিয়া দিতে পারেন, এমন লোকের দরকার আছে। বিদ্রোহ বা বিপ্লবের কল্পনা আমরা করিতেছি না বটে; কিন্তু শান্তির সময়েও ত ঝড় বয়।

শুধু সাহস দেখাইবার জন্য হঠকারিতা করিয়া, একটা কিছু আইন ভঙ্গ করিয়া, ট্যাক্স না দিয়া বা সরকারী হুকুম না মানিয়া জেলে যাইতেই হইবে, এমন পরামর্শ কোন বিবেচক ব্যক্তি দিবেন না। কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্য, মনুষ্যত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্ববিধ দুঃখ সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে, ইহাই সুপরামর্শ।

জেলের খাদ্য, জেলের পরিচ্ছদ, জেলের শয্যা, জেলের ঘরও যাঁহার জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট, তাঁহার দ্বারাই সকল অবস্থায় রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় সাধিত হইতে পারে;—বিশেষতঃ যে-সব দেশে এখনও জাতীয় আত্ম-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আরামপ্রিয়তা ও বিলাসিতা বর্জ্জন জনহিতৈষীর প্রথম কর্ত্তব্য। নির্জ্জন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে অনেকে পাগল হইয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশেও কারারক্ষকদের অভিজ্ঞতা এইরূপ। যাঁহারা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মী হইতে চান, তাহাদিগকে নিঃসঙ্গ মৌনী অবস্থায় কালযাপনে অভ্যস্ত এবং মনের সুস্থতা ও আনন্দের জন্য আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। আমাদের দেশে অগণ্য সাধক এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন। ইহা মানুষের অসাধ্য নয়, দুঃসাধ্যও নহে।

একটি নূতন আইন অনুসারে ইংলণ্ডের ষাটলক্ষ স্ত্রীলোক পার্লেমেণ্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পাইয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে, শত শত নারী এই অধিকার লাভের জন্য নানাপ্রকার উৎপীড়ন ও যাতনা সহ্য করিয়াছিলেন; তাহার ফল এতদিনে ফলিল। অনেকে ইচ্ছা করিয়া আইন না মানিয়া জেলে যাইতেন, এবং সেখানে উপবাসী থাকিতেন। অনেককে জোর করিয়া নাকের ভিতর দিয়া নল চালাইয়া খাওয়ান হইত; তাহাতে তাঁহাদের খুব যন্ত্রণা হইত। কিন্তু কয়েকদিন পরেই এই উপবাসব্রতীদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইত।

ইংলণ্ডের মেয়েরা ভারতবর্ষের পুরুষদের চেয়ে শক্ত। এই প্রভেদটা কিন্তু স্বাভাবিক নয়; আমরাও শক্ত হইতে পারি।

এপর্য্যন্ত আমরা যত নেতা পাইয়াছি, তাঁহারা সকলেই "উচ্চ"শ্রেণীর লোক; সুতরাং তাঁহাদের অধিকাংশই বিলাসে, অন্ততঃ আরামে, অভ্যস্ত। সেই জন্য অনেকে ঝড়ের সময়ে মানুষের মত কাজ করিতে পারেন নাই। এইজন্য হয় "উচ্চ"শ্রেণীর নেতাদিগকে বা নেতৃত্বাভিলাষী-দিগকে বিলাসিতা ও আরাম বর্জ্জন করিতে হইবে, নতুবা ভগবান "নিম্ন"শ্রেণীর কষ্টসহিষ্ণু নেতা নিশ্চয়ই পাঠাইবেন। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং অন্যান্য উপায়ে সমস্ত দেশকে ভগবান এইজন্য জাগাইতেছেন।

"আপনি অবশ হলি, তবে
বল দিবি তুই কারে!
উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস না রে!
করিস নে লাজ, করিস নে ভয়,
আপনাকে তুই করে নে জয়,
সবাই তখন সাড়া দেবে,
ডাক দিবি যারে!
বাহির যদি হলি পথে,
ফিরিস্‌নে আর কোন মতে,
থেকে থেকে পিছন পানে
চাস্‌নে বারে বারে!

নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোর নিজের মনে,
অভয় চরণ শরণ করে,
বাহির হয়ে যা রে!"

মুসলমানী আমল সম্বন্ধে বহি।

আমরা ছেলেবেলা যে-সব ভারতবর্ষের বা বাংলা-দেশের ইতিহাস পড়িতাম, তাহা হইতে সাধারণতঃ এইরূপ ধারণা জন্মিত যে মুসলমানেরা এদেশে কেবল অত্যাচারই করিয়াছে, মাঝে মাঝে ২।১ জন মাত্র নবাব বাদশাহ ভাল কাজ করিয়াছেন। আজকালকার বিদ্যালয়পাঠ্য ইতিহাসগুলি হয়ত এবিষয়ে কিছু ভাল। কিন্তু আরও উন্নতির প্রয়োজন আছে। ভিন্ন ভিন্ন নবাব ও বাদশাহ্‌-বংশের আমলে এবং মোটের উপর মুসলমানী আমলে কোন্ কোন্ বিষয়ে দেশের কি কি উন্নতি হইয়াছিল তাহা পরিষ্কার ভাষায় প্রত্যেক ইতিহাসে লিখিত থাকা উচিত।

ঐতিহাসিক মনের মধ্যে যে ভাব লইয়া ইতিহাস লিখিতে বসেন, তাহা লেখার ভিতর দিয়া বাহির হইবেই। মনটাকে সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ- ও পক্ষপাতিতা-শূন্য করিয়া তবে ইতিহাস লিখিতে হইবে। ইহা শক্ত কাজ; যিনি এ চেষ্টা অন্তরের সহিত করিতে নারাজ, তাঁহার ঐতিহাসিক হইবার সখ না হওয়াই ভাল।

হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী এভাব লইয়া ইতিহাস রচনা করা অকর্ত্তব্য। উভয় সম্প্রদায় এখন একই দেশের বাসিন্দা ও প্রতিবেশী। এমন কোন্ দেশ আছে, যাহা কখনও কাহারও দ্বারা বিজিত হয় নাই? ইংলণ্ড, সাক্সন, ডেন, নর্ম্মান, প্রভৃতিদের দ্বারা বিজিত হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের ইতিহাসে সে-সব পুরাতন কথা লিখিত হইলেও পুরাতন ঝগড়াটা জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয় না। স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ডে কত ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এখন আর সে তীব্র শত্রুতার ভাব উভয় দেশের লোকদের মধ্যে নাই। ইহার একটা কারণ এই যে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে বহু শতাব্দীর বিজিত ও বিজেতাদের মধ্যে সামাজিক মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানে মিশিয়া এক হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উভয় শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রীতি ও মিল অসম্ভব নহে। অধিকাংশ স্থলে এরূপ মিল আছে।

হিন্দু ঐতিহাসিকদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে হিন্দুরাজাদের মধ্যেও খুব অত্যাচারী লোক ছিল; মুসলমান ঐতিহাসিকদের মনে রাখা উচিত যে মুসলমান রাজাদের মধ্যেও খুব অত্যাচারী লোক ছিল। অন্যদিকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, সকল ধর্ম্মাবলম্বী রাজাদের মধ্যেই সুশাসক দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি কিছুদিন হইতে হিন্দু ও মুসলমান রাজনৈতিক-সংস্কারপ্রার্থীদের মধ্যে বুঝাপড়া ও মিল হইয়া যাওয়ায় সম্ভাব দেখা যাইতেছে। তার আগে অনেক কাগজে প্রকারান্তরে এই কথাই বলা হইত যেন শুধু মুসলমানেরাই দেশের রাজনৈতিক উন্নতির একটা গুপ্ত অন্তরায়। অথচ বরাবরই দেখা গিয়াছে যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই অজ্ঞ, উদাসীন, ভীরু, স্বার্থপর, চাটুকারিতায় অভ্যস্ত, "জো হুকুম" বিস্তর লোক আছে।

অনেক গল্পের বহিতেও খুব অনিষ্ট করিয়াছে। এখনও অনেক গল্পলেখক স্বদেশপ্রেমের উদ্রেক করিতে হইলে কোন অতীত কালের একটা সত্য বা মিথ্যা ঘটনা অবলম্বন করিয়া ভিন্নধর্ম্মী লোকদিগের অপকৃষ্ট চিত্র আঁকিয়া থাকেন। আগে ত একাজ খুবই হইয়াছে। এটা ভাল পথ নয়।

বঙ্গে আত্মহত্যা।

বাংলাদেশের ১৯১৬ সালের যে স্বাস্থ্য-রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, ঐ বৎসর ১৩০৩ জন পুরুষ এবং ২০০৭ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছিল। বাংলাদেশে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিছু কম; প্রতি এক-হাজার পুরুষে ৯৪৫ জন করিয়া স্ত্রীলোক বঙ্গে আছে। আত্মঘাতিনী স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিন্তু আত্মঘাতী পুরুষের সংখ্যার দেড়গুণেরও অধিক। যে-সব পুরুষ ও স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতজন কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বা জাতির লোক, কিম্বা আত্মঘাতিনী স্ত্রীলোকদের মধ্যে কতগুলি বিধবা, কতজন সধবা ও কতজন কুমারী, রিপোর্টে তাহার উল্লেখ নাই; সুতরাং তাহা জানিবার উপায় নাই।

বঙ্গের সমুদয় শহরের লোকসংখ্যা ২৯,০৭,২৫১। তাহার মধ্যে ৮৭ জন পুরুষ ও ১২৫ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা

করিয়াছিল। একা কলিকাতার ৮,৯৬,০৬৭ জন অধিবাসীর মধ্যে ১৯ জন পুরুষ ও ৪৪ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছিল; অর্থাৎ এখানে স্ত্রীলোকদের আত্মহত্যার সংখ্যা পুরুষদের দ্বিগুণেরও অধিক। অথচ কলিকাতার বাসিন্দাদের মধ্যে পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক কম। এখানে প্রতি একহাজার পুরুষে ৪৭৫ জন মাত্র স্ত্রীলোক আছে। সুতরাং কলিকাতায় স্ত্রীলোকদের আত্মহত্যার হার পুরুষদের চারি গুণেরও অধিক। ইহার কারণ কি? শহরগুলি বাদ দিয়া সমগ্র বঙ্গের লোকসংখ্যা ৪ কোটি ২৪ লক্ষ ২১ হাজার ৯৯৬। তাহার মধ্যে ১২১৬ জন পুরুষ ও ১৮৮২ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে।

বঙ্গের মোট অধিবাসী ৪,৫৩,২৯,২৪৭ জনের মধ্যে ১৯১৬ সালে ৩৩১০ জন আত্মহত্যা করিয়াছিল। অর্থাৎ প্রতি নিযুতে বা দশলক্ষে ৭৩ জন আত্মহত্যা করিয়াছিল। এখন বঙ্গের এই আত্মহত্যার অনুপাতের সঙ্গে উহার নিকটবর্ত্তী দুটি প্রদেশের অনুপাতের তুলনা করিয়া দেখা যাক্।

বিহার-ওড়িষার মোট লোকসংখ্যা ৩,৪৪,৮৯,৮৪৬। ইহার মধ্যে ১৯১৬ সালে ৫৭১ জন পুরুষ ও ১১২১ জন স্ত্রীলোক, মোট ১৬৯২ জন, আত্মহত্যা করিয়াছিল। অর্থাৎ প্রতি দশ-লক্ষে ৪৯ জন আত্মঘাতী হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে বাংলা দেশ অপেক্ষা বিহার-ওড়িষায় আত্মহত্যার হার কম। কিন্তু বঙ্গে পুরুষদের চেয়ে দেড়গুণ বেশী স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে, বিহার-ওড়িষায় পুরুষদের চেয়ে দ্বিগুণ বেশী স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে। যাহাই হউক, মোটের উপর ১৯১৬ সালে বিহার-ওড়িষা অপেক্ষা বঙ্গের পুরুষ ও নারীদের মধ্যে আত্মহত্যা বেশী পরিমাণে হইয়াছিল। বঙ্গে আত্মহত্যা-প্রবৃত্তির অধিকতর প্রবলতার কারণ কি?

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে ১৯১৬ সালে মোট অধিবাসী ৪,৬৮,২০,৫৫৬ জনের মধ্যে ৫৯৩ জন পুরুষ ও ১৬২৬ জন স্ত্রীলোক, মোট ২২১৯ জন, আত্মহত্যা করিয়াছিল; অর্থাৎ প্রতি দশ-লক্ষে ৪৭ জন আত্মহত্যা করিয়াছিল। এই হার বাংলা এবং বিহার-ওড়িষা অপেক্ষা কম। কিন্তু আগ্রা-অযোধ্যায়, উক্ত দুই প্রদেশ অপেক্ষাই, পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীলোকেরা ঢের বেশী পরিমাণে আত্মহত্যা করিয়াছে। কারণ বঙ্গে স্ত্রীলোকদের আত্মহত্যার হার পুরুষদের দেড় গুণ, বিহার-ওড়িষায় দ্বিগুণ, কিন্তু আগরা-অযোধ্যায় প্রায় তিন গুণ।

যাহা হউক, দেখা গেল, এই তিনটি প্রদেশের মধ্যে বঙ্গে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি প্রবলতম, এবং প্রত্যেক প্রদেশেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক বেশী আত্মহত্যা করে। এখন শুধু স্ত্রীলোকদের বিষয়েই আলোচনা করা যাক্। বাংলায় ২২১ লক্ষ স্ত্রীলোকের মধ্যে ২০০৭, বিহার-ওড়িষার ১৭৬ লক্ষ স্ত্রীলোকের মধ্যে ১১২১, এবং আগ্রা-অযোধ্যার ২২৫ লক্ষ স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৬২৬ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। অর্থাৎ প্রতি দশ-লক্ষ স্ত্রীলোকের মধ্যে বঙ্গে ৯০, বিহার-ওড়িষায় ৬৩, এবং আগ্রা-অযোধ্যায় ৭২ জন আত্মহত্যা করিয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, বাঙালীর মেয়েদের মধ্যেই আত্মহত্যাপ্রবৃত্তি এই তিন প্রদেশের মধ্যে প্রবলতম। ইহার কারণ কি?

অবশ্য কেবল এক একটি প্রদেশের পুরুষ ও নারীদের আত্মহত্যার সংখ্যা ধরিলে দেখা যায় যে সর্ব্বত্রই নারীরা বেশী আত্মহত্যা করে; সুতরাং নারীর দুর্দ্দশা সর্ব্বত্রই পুরুষদের দুর্দ্দশা অপেক্ষা বেশী। বঙ্গের পুরুষদের চেয়ে বঙ্গের নারীরা দেড় গুণ বেশী আত্মহত্যা করে, বিহার-ওড়িষার পুরুষদের চেয়ে তথাকার নারীরা দ্বিগুণ বেশী আত্মহত্যা করে, আগ্রা-অযোধ্যার পুরুষদের চেয়ে তথাকার নারীরা প্রায় তিন গুণ বেশী আত্মহত্যা করে। ইহা হইতে অনুমান হয়, বঙ্গের পুরুষদের চেয়ে নারীরা যত দুঃখী, বিহার-ওড়িষার পুরুষদের চেয়ে তথাকার নারীরা তার চেয়ে বেশী দুঃখী, এবং আগ্রা-অযোধ্যার পুরুষদের চেয়ে তথাকার নারীরা আরও বেশী দুঃখী।

কিন্তু এক একটি প্রদেশের পুরুষনারীর তুলনায় উভয় জাতির দুঃখ দুর্দ্দশা যাহাই হউক, আমরা দেখিতেছি প্রতি দশ-লক্ষ স্ত্রীলোকের মধ্যে আত্মহত্যা করে

বঙ্গে	৯০ জন,
আগ্রা-অযোধ্যায়	৭২ জন,
বিহার-ওড়িষায়	৬৩ জন।

সুতরাং এই-সব প্রদেশের সমুদয় নারীর মধ্যে বাঙালী নারীদেরই দুঃখ সকলের চেয়ে বেশী এবং মনের স্বাস্থ্য; বল

ও সহিষ্ণুতা সকলের চেয়ে কম বলিয়া অনুমান হয়। আমরা গত বৎসরও এই বিষয়টির আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহারও ফলে উক্তরূপ অনুমানের কারণ দেখা গিয়াছিল। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের খবর আমরা পরে দিতে চেষ্টা করিব। যে কয়টির খবর দিলাম, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে স্ত্রীলোকদের অবস্থা খারাপ, বিশেষ করিয়া বাঙালী স্ত্রীলোকদের। কেহ-কেহ বলেন, বাঙালীর মেয়েরা বেশী গল্প পড়ে বলিয়া বেশী আত্মহত্যা করে। কিন্তু কেবল লেখাপড়া-জানা মেয়েরাই যে আত্মহত্যা করে, বা তাহারাই অধিকাংশ স্থলে আত্মহত্যা করে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আমাদের দেশে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা খুব বেশী, এবং স্ত্রীলোকদের চেয়ে অনেক বেশী পুরুষ উপন্যাস পড়ে। কিন্তু তাহারা ত তজ্জন্য বেশী আত্মহত্যা করে না! আমাদের দেশের চেয়ে পাশ্চাত্য দেশসকলে লেখাপড়া-জানা মেয়ে খুব বেশী, এবং তাহারা উপন্যাস পড়ে অত্যধিক মাত্রায়; কিন্তু তাহারা ত আমাদের দেশের মেয়েদের মত এত বেশী আত্মহত্যা করে না? সুতরাং স্ত্রীলোকদের আত্মহত্যার অন্য কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

স্ত্রীলোকদের চেয়ে পুরুষদের অবস্থা খারাপ বলিয়া অনুমান করিবার যদি কারণ থাকিত, তাহা হইলে তাহাও সন্তোষের বিষয় হইত না। আত্মহত্যা পুরুষে করিলেও দুঃখের বিষয়, স্ত্রীলোকে করিলেও দুঃখের বিষয়। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরাই বেশী আত্মহত্যা করিতেছে দেখিয়া সেই দিকে বেশী দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক। কেননা, তাহাদের শিক্ষা ও ক্ষমতা কম, এবং অত্যাচরিত হইবার সম্ভাবনা বেশী। পুরুষদের চেয়ে তাহাদের মনে নৈরাশ্য আসিবার অধিকতর সম্ভাবনা আমাদের দেশের সামাজিক ও পারিবারিক কতকগুলি ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশসকলে আত্মহত্যা সম্বন্ধে অধ্যাপক লিট্‌ল্‌জন * বলেন :—

"বৎসরের পর বৎসর পুরুষ ও নারীদের আত্মহত্যার অনুপাত মোটের উপর সমান থাকে,—যেখানে একজন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে, তথায় ৩ বা ৪ জন পুরুষ আত্মহত্যা করে।"

সকল দেশেই নারীদের চেয়ে পুরুষদিগকে বাহিরের ঝঞ্ঝাট বেশী সহ্য করিতে হয়। সুতরাং পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় নারীদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যে বেশী আত্মহত্যা অস্বাভাবিক নয়;—যদিও আত্মহত্যা মাত্রেই শোচনীয়।

নজরবন্দীর আত্মহত্যা।

বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে দুজন নজরবন্দী আত্মহত্যা করিয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে তাহারা সত্য-সত্যই আত্মহত্যা করিয়াছে, কেহ তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে নাই, এবং তাহাদের উপর কোন অত্যাচারবশতঃ তাহারা আত্মহত্যা করে নাই। এসব কথা অবিশ্বাস করিবার মত কোন খবর আমরা পাই নাই; কিন্তু তথাপি ইহা জানা দরকার যে এই দুটি লোক কেন আত্মহত্যা করিল। তাহাদের স্বাধীনতা-লোপ এবং তজ্জনিত অবিধ কোন-না-কোন অসুবিধা ও মনস্তাপ যে ইহার কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

গত বৎসর বঙ্গের সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে প্রতি দশ-লক্ষে ৭৩ জন আত্মহত্যা করিয়াছিল। বঙ্গে নজর-বন্দীদের সংখ্যা হাজারের বেশী হইবে না। হাজারে দুজন মানে দশ-লক্ষে দু হাজার। এরূপ তুলনা অবশ্য স্বাভাবিক নয়; কারণ নজরবন্দীরা স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। কিন্তু এই অস্বাভাবিকতার মাত্রা ৭৩ এবং ২০০০এর মধ্যে যে প্রভেদ তদ্দারা বুঝা যাইবে।

অনুসন্ধান-সমিতি।

হরিচরণ দাস মালদহের একটি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁহাকে ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে রাজসাহী জেলার একটি গ্রামে আবদ্ধ করা হয়। তথায় তিনি আত্ম-হত্যা করেন। ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়ের এক প্রশ্নের সরকারী উত্তর হইতে জানা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট এই লোকটির স্বাধীনতা লোপ করিয়া-

* Henry Harvey Littlejohn, M.A., F. R. C. S. (Edin.), Professor of Forensic Medicine and Dean of the Faculty of Medicine in the University of Edinburgh.

"Statistics have demonstrated that the proportion of male to female suicides is practically the same from year to year, viz, 3 or 4 males to 1 female."

ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনধারণের জন্য কোন বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করেন নাই, আবদ্ধ অবস্থায় তিনি যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন পুলিশের কাছ হইতে টাকা ধার করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য তিনি কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রেরিত হইবার জন্য পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে দরখাস্ত করেন। এবম্বিধ বিষয়ে তাঁহার চারিটি দরখাস্ত তাঁহার মৃত্যুর পর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট পৌঁছে; যদিও দরখাস্তগুলি যে-যে তারিখে লিখিত ও প্রেরিত হয়, তাহাতে তাহার অনেক আগেই পৌঁছা উচিত ছিল। এই চিঠি চারিটি কাহার দোষে ঠিক্ সময়ে জেলার পুলিশের কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছে নাই? কে এগুলি আটক করিয়া রাখিয়াছিল? যে এপ্রকারে চিঠি আটক করিয়া রাখিতে পারে, সে যে হরিচরণ দাসের গুরুতর অভিযোগপূর্ণ অন্যান্য চিঠি লুকাইয়া রাখে নাই বা নষ্ট করিয়া ফেলে নাই, তাহার প্রমাণ কি? হয়ত এপ্রকার কোন চিঠি প্রকাশিত হইলে তাঁহার আত্মহত্যার ঠিক্ কারণ জানা যাইত। গবর্ণমেণ্টের এইসব বিষয়ে খুব ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা উচিত।

বাড়ীর কর্ত্তা আবদ্ধ হওয়ায় পরিবারের অন্নকষ্ট হইয়াছে, তাহাদের জমীদারীর আয় আছে, অথচ তাহার তত্ত্বাবধান ও খাজনা আদায় না হওয়ায় বাড়ীর ছেলেদের বিদ্যালয়ের বেতন ও আহারাদির ব্যয় দেওয়া হইতেছে না, এরূপ ঘটনার কথা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি। ব্যবস্থাপক সভায় সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে নজরবন্দী কাহারও হাতে হাতকড়া দেওয়া হয় না। আমরা কিন্তু বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য এক ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি স্বয়ং বর্দ্ধমান ষ্টেশনে ফরিদপুরনিবাসী একজন নজরবন্দীর হাতে হাতকড়া দেখিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষি থানার এলাকাভুক্ত এক গ্রামে আবদ্ধ আছে।

খবরের কাগজে এবং লোকমুখে পুলিশের অত্যাচার এবং দুর্বৃত্ত লোকদের দ্বারা অত্যাচারের অনেক কথাও শুনা যায়। এ-সব বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন করিলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর মুখ হইতে বাহির হইলেও, উত্তরটা বাস্তবিক অনেক সময় আসে এমন সব লোকদের কাছ হইতে, ঠিক্ খবর না দেওয়াটাই যাহাদের স্বার্থরক্ষা ও স্বার্থসিদ্ধির উপায়। তা ছাড়া, এসব স্থলে এক হিসাবে গবর্ণমেণ্টই অভিযুক্ত; কারণ সর্ব্ববিধ অত্যাচার নিবারণ করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, কোন্ অত্যাচার হইলে গবর্ণমেণ্টের ত্রুটি, অবহেলা বা অক্ষমতা প্রকাশ পায়। অভিযুক্তের নিকট সম্পূর্ণ সত্য নির্দ্ধারণ ও প্রকাশ আশা করা যায় না। সুতরাং কোন-প্রকার নিগ্রহ, লাঞ্ছনা, অত্যাচার, প্রভৃতির সংবাদ প্রকাশিত হইলে, স্থলবিশেষে আবশ্যকমত অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি বেসরকারী অনুসন্ধানসমিতি থাকা আবশ্যক। স্বদেশী আন্দোলনের সময় মৈমনসিংহ জেলার জামালপুরে যে-সব অত্যাচার হয়, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য দেশবাসীদের পক্ষ হইতে যেমন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি গিয়াছিলেন। খুব প্রতিষ্ঠাবান্ লোকদিগকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হওয়া উচিত। কলিকাতায় সমিতির কেন্দ্র করিয়া জেলায় জেলায় প্রধান প্রধান লোকদিগকে লইয়া শাখা স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

এরূপ সমিতির কেবলমাত্র অস্তিত্বেই স্থলবিশেষে অত্যাচার নিবারিত হইতে পারে; এবং ইহার অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হইলে কোন-কোন স্থলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও সত্য-নির্দ্ধারণের সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু যদি আর কোন ফল না-ও হয়, তাহা হইলেও আমরা যদি আমাদের স্বদেশী লোকদের উপর অত্যাচার হইলে তাহাতে বেদনা পাই, এবং তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করি, তাহার দ্বারা দেশের সর্ব্বত্র যে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হইবে, তাহা অমূল্য। এরূপ চেষ্টা কর্ম্মী এবং অপর সমুদয় দেশবাসীর চরিত্রে নিশ্চয়ই শক্তির স্ফুরণে সাহায্য করিবে।

জেলে স্ত্রী কয়েদী।

বাংলা দেশের জেলসমূহের ১৯১৬ সালের রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ বৎসর বিচারের পর ৮০৮ জন স্ত্রীলোক আদালত হইতে জেলে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার আগের বৎসর ৭০২ জন জেলে গিয়াছিল। ১৯১৬তে ১০৬ জন বেশী স্ত্রীলোক কেন দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত বা আনুমানিক কারণ রিপোর্টে নাই। ঐ বৎসর

মোট ২৪,৮৩৪ জন পুরুষ ও নারী জেলে প্রেরিত হইয়াছিল। দেশে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পুরুষদের চেয়ে অনেক কমসংখ্যক স্ত্রীলোক আইন ভঙ্গ করিয়াছিল। ইহা স্বাভাবিক।

৮০৮ জন দণ্ডিত নারীর মধ্যে ৩৭৫ জন হিন্দু, ১৮২ জন মুসলমান, ৪ বৌদ্ধ, ১৪১ খৃষ্টিয়ান, এবং ১০৬ জন অন্যান্য শ্রেণীর। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫২.৩ জন মুসলমান এবং ৪৫.২ জন হিন্দু। বাংলা দেশের বাসিন্দা ২,২৫,০২,০৪৯ জন স্ত্রীলোকের মধ্যেও মুসলমান নারীর সংখ্যা হিন্দু নারীর সংখ্যা অপেক্ষা বেশী। হিন্দু স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১ কোটি ৯৭ হাজার ১৬২; মুসলমান স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৩০ হাজার ১৩। হিন্দু স্ত্রী কয়েদীদের সংখ্যা কিন্তু মুসলমান স্ত্রী কয়েদীদের দ্বিগুণেরও অধিক। হিন্দুদের মধ্যে এত বেশী সংখ্যক স্ত্রীলোক কেন আইন ভঙ্গ করিয়া জেলে গিয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহা বলিলে চলিবে না যে হিন্দুরা স্বভাবতঃ মুসলমানদের চেয়ে অপরাধপ্রবণ। কারণ, দেখা যাইতেছে, ১৯১৬ সালে দণ্ডিত কয়েদীদের মধ্যে শতকরা ৫৫.৬১ জন মুসলমান ও ৪৩.৭০ হিন্দু, কিন্তু বঙ্গের মোট অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫২.৩ জন মুসলমান ও ৪৫.২ জন হিন্দু। অতএব ১৯১৬ সালে বঙ্গে হিন্দুদের চেয়ে বরং মুসলমানেরাই অধিক অপরাধপ্রবণতা দেখাইয়াছিল, ইহাই বলিতে হয়। অথচ দেখিতেছি ঐ বৎসর মুসলমান নারীদের দ্বিগুণসংখ্যক হিন্দুনারী আইন ভঙ্গ করিয়াছে। ইহার কারণ কি?

সর্ব্বশ্রেণীর এই ৮০৮ জন অপরাধিনীদের মধ্যে ১২ জন ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্ক, ৬৪১ জনের বয়স ১৬ হইতে ৪০, ১৩৪ জনের বয়স ৪০ হইতে ৬০ এবং ২১ জনের বয়স ষাটের উপর।

অপরাধিনীদের মধ্যে ২৯৩ জন বিবাহিতা, ২৫৬ জন বিধবা এবং ২৪৭ জন বেশ্যা। বাকী বার জনের সম্বন্ধে রিপোর্টে কিছু বলা হয় নাই। বেশ্যাদের মধ্যে যে আইন-ভঙ্গ অপরাধ এত বেশী জনে করিয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই।

বাংলাদেশে সকল সম্প্রদায়ের যত স্ত্রীলোক বাস করে, তাহার মধ্যে বিবাহিতা অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা অনেক কম; হিন্দুদের মধ্যেও কম, মুসলমানদের মধ্যেও কম। যথা—

বঙ্গে স্ত্রীলোকের সংখ্যা।

	মোট।	হিন্দু।	মুসলমান।
অবিবাহিতা	৭৫,৬০,৮২৫	২৯,[illegible]১,২৪০	৪৩,৬২,১২৩
বিবাহিতা	১,০৪,২৪,৩১১	৪৫,[illegible]৪,৭১৮	৫৬,৬৪,৭০৯
বিধবা	৪৫,১৬,৯০২	২৫,[illegible]	১৮,৩৭,২৮১

মোটের উপর বিধবাদের সংখ্যা বিবাহিতাদের অর্দ্ধেকেরও কম। কিন্তু স্ত্রী কয়েদীদের মধ্যে বিবাহিতা ২৯৩ জন, বিধবা ২৫৬ জন,—প্রায় সমান সমান। বিধবাদের মধ্যে আইনভঙ্গ অপরাধ এত বেশী কেন, তাহার কারণ নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। পুরুষ বা স্ত্রীলোক কেহ সখ্ করিয়া জেলে যায় না। মানুষ অভাবে পড়িয়া, দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া, কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, লোভে পড়িয়া, কিম্বা লজ্জা ঢাকিবার নিমিত্ত, আইনবিরুদ্ধ কাজ করে। আমাদের দেশে বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণ, তাহাদিগকে সুশিক্ষা-প্রদান, প্রভৃতির যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত নাই; অন্য মানুষদের মত বিধবা-দেরও যে রক্তমাংসের শরীর, সামাজিক ও পারিবারিক বিধানে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকৃত হয় না। এইসব কথা মনে রাখিলে বিধবাদের মধ্যে অপরাধের আধিক্যের কারণ অনুমান করা যাইতে পারে।

সধবা ও বিধবা কয়েদীদের মধ্যে কতগুলি কোন্ ধর্ম্মা-বলম্বী রিপোর্টে তাহার উল্লেখ নাই।

বঙ্গের বাসিন্দা স্ত্রীলোকদের মধ্যে মোটামুটি ১ কোটি ৯১ হাজার হিন্দু, ১ কোটি ১৮ লক্ষ মুসলমান, এবং ৫৯৪৮৬ জন খৃষ্টিয়ান। কিন্তু স্ত্রী কয়েদীদের মধ্যে ৩৭৫ জন হিন্দু, ১৮২ জন মুসলমান, এবং ১৪১ জন খৃষ্টিয়ান। সুতরাং দেখা যাইতেছে, খৃষ্টিয়ান নারীদের মধ্যে অপরাধিনীর সংখ্যা তাহাদের মোট সংখ্যার অনুপাতে ভয়ানক বেশী। ইহার কারণ কি? মোট অপরাধিনীদের মধ্যে ৬৬৭ জন নিরক্ষর, ১৪১ জন লিখিতে পড়িতে পারে। খৃষ্টিয়ান অপরাধিনীর সংখ্যাও ১৪১। এই দুটি সংখ্যার একত্ব আকস্মিক হইতে পারে, কিম্বা এমনও হইতে পারে যে, যে ১৪১ জন স্ত্রী কয়েদী লিখিতে পড়িতে পারে, তাহারা খৃষ্টিয়ান।

বঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের অবস্থা।

আগে কখনও কখনও বলা হইত, বাঙালীরা আর-সব বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনেই লাগিয়া আছে। কিছুদিন হইতে সে বদনামও ঘুচিয়াছে। বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলনও সম্প্রতি কয়েক বৎসর বঙ্গে হইতেছে না বলিলেই হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে গত দুই বৎসরের মধ্যে কয়েকটি রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে; তা ছাড়া শিক্ষা-বিষয়ক একটি কন্‌ফারেন্স্‌ও হইয়া গিয়াছে। সংপ্রতি একটি বিশেষ প্রাদেশিক কংগ্রেসেরও অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গে এ-রকম কিছুই হয় নাই। অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে, বাঙালীর কি হইয়াছে যে এখন বাংলা দেশ এরূপ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে? তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতেছেন, বাঙালীরা, বহুসংখ্যক লোক জেলে আবদ্ধ বা অন্যত্র নজরবন্দী হওয়ায়, ভীত হইয়াছে। একজন মান্দ্রাজী নেতা ত সেদিন দুঃখ করিয়া আমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, "Bengal has been terrorised by the internments."

কারণ যাহাই হউক, বঙ্গের অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়াছে। মিসেস্ বেসাণ্ট ও তাঁহার দুজন সঙ্গী নজরবন্দী হওয়ায় অন্যান্য অনেক প্রদেশে, বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করিবার এই চেষ্টার যত প্রতিবাদ নানা শহরে বহুসংখ্যক সভা হইতে হইয়াছে, বঙ্গে তাহার মত কিছুই হয় নাই। অথচ ভারত-রক্ষা আইনের যে ধারার অপপ্রয়োগ করিয়া রাজকর্ম্মচারীরা এইরূপে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করিতেছেন, তাহার অপব্যবহার বঙ্গে যে পরিমাণে হইয়াছে, অন্য কোথাও ততটা হয় নাই; সুতরাং বাংলাদেশেই প্রতিবাদটা খুব জোরের সহিত হওয়া উচিত ছিল। ইহাতে কোন বিপদও ছিল না। কারণ, এরূপ প্রতিবাদসভার উদ্যোক্তারা ভারতের কোথাও বিপন্ন হন নাই। আমরা জানি বিপদকে অগ্রাহ্য না করিলে দেশের রাজনৈতিক উন্নতি-সাধন চেষ্টা পুরামাত্রায় করা যায় না। তথাপি যে বলিতেছি, "ইহাতে কোন বিপদও ছিল না," তাহার কারণ এ নয় যে আমরা বিপদের সম্ভাবনা এড়াইবার পরামর্শ দিতেছি; আমাদের ইহাই বলা অভিপ্রায় যে যেখানে বিপদের সম্ভাবনা নাই বা খুব কম, সেখানেও বাঙালী নেতারা অগ্রসর হন নাই।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহপ্রণালীতে কিরূপ পরিবর্ত্তন করা দরকার, ভারত গবর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্য বিলাতে ভারতসচিবের নিকট অনেক দিন হইল পাঠাইয়াছেন, এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা যে দেশের শিক্ষিত নেতাদের আশানুরূপ নহে, তাহাও অনেক দিন হইল জানা গিয়াছে। তাহার পর নূতন ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেব এই বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সকলের সহিত পরামর্শ করিতে আসিতেছেন, এবং দেশবাসীর প্রতিনিধি সভাসমিতি ও নেতাদের মন্তব্যও তিনি শুনিবেন, ইহাও সরকারী গেজেটে প্রকাশিত এবং তাহার পর সমুদয় খবরের কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং এখন দেশের সর্ব্বত্র প্রকাশ্য সভা করিয়া দেশের লোকদের বলা উচিত যে তাঁহারা কি কি অধিকার চান। আমরা শুনিয়াছি, গত আগষ্ট মাসে বোম্বাইয়ে সমগ্রভারতের কংগ্রেসকমিটি এবং সমগ্রভারতের মস্লেম লীগের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতেও এইরূপ স্থির হয় যে প্রত্যেক প্রদেশে এক-একটি বিশেষ প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন করিয়া দেশের লোকদের দাবী জানাইতে হইবে। ইহা ঠিক্ খবর কি না জানি না, কিন্তু এরূপ করা যে দরকার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং দেশের দাবী যে কি, তাহাও স্থির করিবার জন্য নূতন করিয়া মাথা ঘামাইতে হইবে না। কংগ্রেস্ ও মস্লেম লীগ একযোগে যে প্রস্তাব স্থির করিয়াছেন, তাহাতে বেশী কিছু চাওয়া হয় নাই, এবং স্বরাজের প্রথম ধাপ বা আরম্ভের পক্ষে তাহা মন্দও নয়। প্রাদেশিক কংগ্রেস্‌গুলিতে এই দাবীর সমর্থন করা আবশ্যক ও যুক্তিসঙ্গত। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, আগ্রা অযোধ্যা এবং বিহার-ওড়িষায় এইপ্রকার প্রাদেশিক কংগ্রেস্ হইয়া গিয়াছে। যে-সব প্রদেশ রাজনৈতিক আন্দোলনে বঙ্গের খুব বেশী পশ্চাতে ছিল, তাহারা একে একে সকলেই আমাদিগকে ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

এখনও উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, পঞ্জাব ও আসামে বিশেষ প্রাদেশিক কংগ্রেস হয় নাই। সুতরাং বঙ্গের রাজনৈতিক নেতারা এখনও পারদর্শিতা অনুসারে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। সে গৌরব লাভের সম্ভাবনা এখনও রহিয়াছে। অতএব নিরাশার কারণ নাই!

আমরা কেবল যে বাঙালী কংগ্রেসওয়ালা নেতাদিগকেই দোষ দিতেছি, তাহা নয়; এ প্রদেশের হোমরূল লীগও বেশী কিছু কর্ম্মিষ্ঠতা দেখায় নাই। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা অবান্তর কথা বলিতে চাই। কংগ্রেস ও হোমরূল লীগে কোথাও কোন বিরোধের কারণ নাই; কেন না, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আগ্রা-অযোধ্যা, প্রভৃতি যে-সব প্রদেশের হোমরূল লীগগুলির প্রাণ আছে, তথায় তাহারা কংগ্রেস ও মস্লেম লীগের অনুমোদিত রাজনৈতিক দাবী অনুযায়ী আন্দোলনই করিতেছে। অবশ্য ব্যক্তিগত হিংসাদ্বেষাদি কারণে কোথাও কোথাও মনোমালিন্য ও বিরোধ হইতে পারে বা হইয়াছে। তাহাকে কংগ্রেস ও হোমরূলের ঝগড়া বলা যায় না; একই দলের সুরেন্দ্র বাবুর ও ভূপেন্দ্রবাবুর অনুচরদের মধ্যেও ত বেঙ্গলী-অফিসে মছ্‌লী-বাজার বসিয়াছিল। এখন কলিকাতার হোমরূল লীগের কথা বলি: ইহা সমগ্র বঙ্গের লোকদিগকে আহ্বান করিয়া ত স্থাপন করা হয়ই নাই; কলিকাতাতেও কোন প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দিয়া সর্ব্বসাধারণের কোন সভায় ইহা স্থাপিত হয় নাই। জনকতক লোক মিলিয়া পরস্পর পরস্পরকে সভাপতি আদি নির্ব্বাচন করিয়া ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার স্থাপন-পদ্ধতির দোষ না হয় ছাড়িয়া দিলাম। এই লীগ কাজও অতি সামান্য করিয়াছেন। কাজের মধ্যে গোলদিঘীর পাড়ে গোটাকতক বক্তৃতা ইহার সভ্যেরা করিয়াছেন। বঙ্গের কোথাও ইহার শাখা স্থাপিত হয় নাই; সেরূপ চেষ্টা পর্য্যন্ত হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। এই লীগ একখানা চটি বহি পর্য্যন্ত ছাপাইয়া লোকদের রাজনৈতিক শিক্ষার চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং কংগ্রেসওয়ালা নেতাদের চেয়ে কলিকাতার হোমরূল লীগের কর্ত্তারা যে খুব বেশী কর্ম্মিষ্ঠ বা জনহিতৈষণায় পরম উৎসাহী, তাহা বলা যায় না।

বাংলা দেশ ছাড়িয়া দিলে, অন্যান্য যে-সব প্রদেশে হোমরূল লীগ (অর্থাৎ স্বরাজ-লিপ্সু মণ্ডলী) স্থাপিত হইয়াছে, তথায় সভ্যেরা অধিকতর উৎসাহ ও কর্ম্মিষ্ঠতা দেখাইয়াছেন। নানা শহরে শাখা স্থাপন, নানাস্থানে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা, নানাবিধ পুস্তক ও পুস্তিকা রচনা, প্রকাশ ও বিক্রয়, এইরূপ অনেক কাজ কয়েকটি প্রদেশে হইয়াছে। বিহার বাংলা অপেক্ষা রাজনৈতিক আন্দোলনে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া ছিল। তথায় এক মাসের মধ্যে প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে এবং বিশেষ প্রাদেশিক কংগ্রেসে স্পষ্ট ভাষায় জোরের সহিত হোমরূল দাবী করা হইয়াছে। প্রথম সভার সভাপতি ছিলেন খাঁ বাহাদুর সরফরাজ হুসেন খাঁ। তিনি চিরকাল রাজকর্ম্মচারীদের সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি হোমরূল-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং তাহার কারণেরও উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় সভার সভাপতি ছিলেন ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ সৈয়দ হাসান ইমাম। ইঁহার অভিভাষণেও নির্ভীক ও স্পষ্টভাবে হোমরূলের দাবী করা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের বিশেষ প্রাদেশিক কংগ্রেসেও স্বরাজের দাবী করা হইয়াছে। আমরা নাম লইয়া কোন-প্রকার ঝগড়ার কারণ দেখিতেছি না; স্বরাজ, স্বায়ত্তশাসন, হোমরূল, জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব,—যাহার যে নাম ভাল লাগে ব্যবহার করুন; দাবীটা ঠিক্ থাকিলেই হইল। দাবী এই যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহে, অর্থাৎ আইন প্রণয়ন, করস্থাপন, সংগৃহীত রাজস্ব কিরূপ কাজে কি পরিমাণে ব্যয়িত হইবে তাহা নির্দ্ধারণ, শিক্ষা স্বাস্থ্য শান্তিরক্ষা আদির ব্যবস্থা করণ, ইত্যাদি ব্যাপারে ভারতবর্ষের লোকেরই কর্তৃত্ব থাকিবে।

দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের কোন কোন অনগ্রসর প্রদেশ হইতেও দেশের লোকেরা প্রাদেশিক কংগ্রেস করিয়া এই দাবীর সমর্থন করিল, কিন্তু শিক্ষাভিমানী আত্মম্ভরী বাঙালী কিছুই করিল না। সব দেশেই রাজনৈতিক বা অন্যবিধ আন্দোলন চালাইবার জন্য একটা কেন্দ্রীয় সমিতি থাকে। এই কল চালাইয়া আন্দোলন করিতে হয়। বাংলাদেশে, এই কলের নাম ভারতসভা বলুন, বা প্রাদেশিক কংগ্রেস্ কমিটিই বলুন,—কলটি অনেক দিন হইতে আছে

সুরেন্দ্রবাবুর ও তাঁহার দলের লোকদের হাতে। তাঁহারা অনেকদিন হইতে এই কলটির কোন ব্যবহার করিতেছেন না, অথচ কল চালাইতে আপনাদের অসামর্থ্য জানাইয়া রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসরও গ্রহণ করিতেছেন না। সম্প্রতি ত কলটিতে মরিচা ধরিয়াছে, ও উহা বেমেরামত অবস্থায় পড়িয়া আছে বলিলেও হয়। আপনাদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য রক্ষার দরকার হইলে হয়ত দলের লোকেরা কখন কখন কলটি টিপিয়া থাকেন। কিন্তু উহা এখন এমন অকেজো হইয়া পড়িয়াছে যে ইহার দ্বারা হামবড়াদের মুরুব্বিয়ানা রক্ষাও আর হইতেছে না।

অথচ ইহা বলা যায় না যে দলের নেতা সুরেন্দ্রবাবু জরাগ্রস্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। আগামী নবেম্বর মাসে তাঁহার ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবে। এই বয়সে তিনি বঙ্গের জেলায় জেলায় শহরে শহরে বাঙালী সিপাহী সংগ্রহ করিবার জন্য বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি যে তাঁহার দলের দ্বারা একটা প্রাদেশিক কংগ্রেস্ আহ্বান করাইয়া কংগ্রেস্‌মস্লেমলীগের সম্মিলিত দাবী বঙ্গদেশের তরফ হইতে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতে পারেন না, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে এ চেষ্টা হইতেছে না কেন?

এই দাবী প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক জেলা হইতে করা চাই। যে বিহারকে বাঙালীরা কতই না অনুন্নত মনে করেন, তথায় ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ হাসান ইমামের মত লোক মফঃস্বলে গিয়া হোমরুল প্রচার করিতেছেন, এবং এক-একটি জেলার পক্ষ হইতে সমগ্র ভারতের দাবী সমর্থনার্থ আহূত সভায় বক্তৃতা করিতেছেন। আজ (২৮ ভাদ্র) গয়ায় এইরূপ এক সভার বৃত্তান্ত পড়িয়া উৎসাহিত হইলাম। বাংলা দেশ কি ঘুমাইতেছে? আমরা জানি বঙ্গের কোন কোন জেলায় খুব উৎসাহী লোক আছেন। তাঁহারা কলিকাতার মুখ অপেক্ষা না করিয়া, স্বয়ং নিজ নিজ জেলায় সভা আহ্বান করিয়া এই দাবী করুন। বাংলা দেশ ডুবিতেছে, তাঁহারা রক্ষা করুন। আমরা জানি অন্য কোন কোন প্রদেশে মফঃস্বলের লোকেরা রাজধানীর মুরুব্বিদের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন না। যখন যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় তাঁহারা করেন। বাংলা দেশেও সেই রীতি প্রবর্ত্তিত হউক।

বঙ্গের দৈনিক ইংরেজী কাগজ।

যাহারা বাহিরের খবর রাখে না, কূপমণ্ডুকের মত তাহাদের আত্মশ্লাঘা খুব বাড়িতে থাকে। বাঙালীর দশা অনেকটা সেইরূপ হইয়াছে। বাংলা দেশের বাহিরে ভারতবর্ষের লোকেরা জীবনের কোন্ বিভাগে কত উন্নতি করিতেছে, বঙ্গের বিস্তর শিক্ষিত লোকে তাহার কোনই খবর রাখেন না। সুতরাং তাঁহারা মনে করেন, ২০।২৫ বৎসর, এমন কি ১০ বৎসর পূর্ব্বেও বাংলা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা যেরূপ অগ্রসর ছিল, এখনও বুঝি তাই আছে। ইহা মহা ভ্রম। রাজনৈতিক আন্দোলন, সমাজসংস্কারার্থ আন্দোলন, সমাজসেবা, ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা এখন আর অগ্রবর্ত্তী প্রদেশগুলির সমকক্ষ নহে। এমন কি, ভারতবর্ষে বাংলা ছাড়া আর কোথাও সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মত লেখক এবং বিজ্ঞানক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের সমকক্ষ বৈজ্ঞানিক না থাকিলেও, নানা প্রদেশে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং এসব বিষয়েও বঙ্গের প্রাধান্য বেশী দিন থাকিবে না। ইহা সুখেরই বিষয় হইবে। কিন্তু বাঙালী যদি অন্য সব প্রদেশের সমকক্ষও না থাকে, পিছাইয়া যায়, তাহা হইলে সাতিশয় দুঃখের বিষয় হইবে।

আমরা বার বার এই-প্রকার কথা লিখিয়া হয় ত অনেকের বিরক্তি উৎপাদন করিতেছি। কিন্তু উপায় নাই। একাজ আমাদিগকে করিতেই হইবে।

বাংলার রাজধানী কলিকাতা হইতে যে দুটি প্রধান দৈনিক ইংরেজী কাগজ বাহির হয়, তাহার প্রত্যেকটির কাজ আছে। তাহাদের দ্বারা এই কাজ হইতেছে। তাহাদের মতের সঙ্গে আমাদের মত সব সময় মিলে না বলিয়া আমরা দুঃখিত নই। এমন কাগজ হইতে পারে না, যাহার লেখা সর্ব্ববাদীসম্মত হইবে। আমরা এখন যাহা বলিতে চাই, তাহা এই, যে, তাহাদের কোনটি হইতেই ভারতবর্ষের সব প্রদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক উন্নতির চেষ্টা, পুস্তকাদি রচনা ও প্রচার ও অন্য নানাপ্রকার সার্ব্বজনিক কাজের খবর পাওয়া যায় না। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কয়েক বৎসর হইতে বাঙালী অপেক্ষা

অন্য প্রদেশের প্রতিনিধিরা কিরূপ ভাল কাজ করিতেছেন, তাহা বঙ্গের কাগজ পড়িয়া সম্যক্ বুঝা যায় না। বঙ্গের বাহিরের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধিরা কিরূপ কাজ করেন, বঙ্গের কাগজ পড়িয়া তাহা ভাল করিয়া জানা যায় না। অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, প্রভৃতির উন্নতি কিরূপ হইতেছে, বঙ্গের দৈনিক কাগজে তাহার কোন খবর থাকে না। অন্যান্য প্রদেশের প্রধান দেশী দৈনিকগুলি যে পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের খবর ছাপে, বাংলার দৈনিক কাগজে তত ছাপা হয় না। এই জন্য কেবল কলিকাতার দেশী দৈনিকগুলি পড়িয়া বাঙালী জাতি নিজের ওজন স্থির করিতে পারে না। নিজের ওজন বুঝিতে হইলে অপরের সহিত তুলনা করা দরকার। কিন্তু কলিকাতার দেশী কাগজগুলিতে এই তুলনা করিবার মত যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যায় না।

আমাদের ওজন যদি আমরা ঠিক্ বুঝিতে চাই, তাহা হইলে শুধু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের নয়, জগতের সভ্য দেশ-সকলেরও খবর রাখা দরকার। এইসব দেশে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, শৈক্ষিক, শৈল্পিক, অধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, প্রভৃতি কত দিকে কত উন্নতি হইতেছে, কত চেষ্টা ও পরীক্ষা হইতেছে, কত নূতন কল নির্ম্মিত ও শিল্প প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার খবর আমরা পাই না। কলিকাতা হইতে যদি এমন একখানি কাগজ বাহির হয় যাহাতে ভারতবর্ষের এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্য দেশ-সকলের সকল-রকম প্রচেষ্টার বিবরণ থাকে, তাহা হইলে খুব সুফল হয়। এই কাগজের সম্পাদকীয় মত যাহাই হউক, তাহাও বরং আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি, যদি আমাদের ঈপ্সিত সব খবর ইহাতে থাকে। কিন্তু কে এমন কাগজ বাহির করিবে? প্রেস-আইন থাকায় এখন মাসিক সর্ব্বাঙ্গীন কাগজ বাহির করাও দুঃসাধ্য, দৈনিক কাগজ ত দূরের কথা। প্রেস-আইন না থাকিলে কোন কোন গরীব লোকও হয়ত সামান্য ভাবে একখানা ছোট কাগজ বাহির করিয়া ক্রমশঃ তাহা বড় করিতে চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন ধনীর সাহায্য ভিন্ন এ কাজ করা দুঃসাধ্য, সুতরাং ইহা গরীবের সাধ্যাতীত।

আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী দৈনিক খবরের কাগজ কলিকাতা হইতে বাহির হইবার সম্ভাবনা কম। বর্ত্তমান দৈনিকগুলির স্বত্বাধিকারীদের কানে যে আমাদের কথা পৌঁছিবে, পৌঁছিলেও যে তাঁহারা ইহা বিবেচনা করিয়া কাগজগুলির উন্নতির চেষ্টা দেখিবেন, তাহার সম্ভাবনা কম। এইজন্য আমরা বলি, যাহাদের সঙ্গতি আছে, তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীর একটি করিয়া দেশী দৈনিক কাগজের গ্রাহক হউন। আমাদের ভাল সাধারণ পাঠাগারগুলিতেও এইসব কাগজ রাখা হউক। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ, লাহোর, বাঁকিপুর, এই সব জায়গারই এক-একখানি দৈনিক যাঁহারা লইতে না পারিবেন, তাঁহারা প্রথমোক্ত চারিটি শহরের অন্ততঃ কোন একটির একখানি ভাল দেশী দৈনিক লউন। তাহা হইলে বাঙালীর, শুধু বাঙালী না থাকিয়া, ভারতীয় হইবার পক্ষে সুবিধা হইবে। বঙ্গের জড়তাও ক্রমে ক্রমে কতকটা দূর হইবে।

সারদাচরণ মিত্র।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বাল্যে ও যৌবনে একজন ধীমান্ ছাত্র ছিলেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ; তাহা তিনি পাইয়াছিলেন। হাইকোর্টে ওকালতীতে কৃতিত্ব লাভ করিবার পর তিনি জজ নিযুক্ত হন। জজিয়তীতে তিনি বিচারপটুতা ও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। বঙ্গ বিভাগের পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় কোন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁহার সুবিচার ও স্বাধীনচিত্ততায় কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারীর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। তিনি "স্বরাজ" কথাটির যে-রূপ সুব্যাখ্যা তাঁহার একটি রায়ে করেন, তাহাও বৈধ আন্দোলনকারীদের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছিল।

তিনি কেবল ওকালতী ও জজিয়তী করেন নাই; দেশের অন্য অনেক কাজেও হাত দিয়াছিলেন,—যদিও অনেকগুলিতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সহযোগিতায় তিনি প্রাচীন কাব্য-

সংগ্রহ প্রকাশ করেন। বিদ্যাপতির পদাবলী এই গ্রন্থে নিবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার রচিত "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" প্রবাসীতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি অনেক বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের এবং সাহিত্যসভার সভাপতি ছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে সমুদয় দেশভাষায় দেবনাগরী লিপি যাহাতে ব্যবহৃত হয়, এইজন্য একলিপিবিস্তার-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই পরিষৎ হইতে "দেবনাগর" নামক একটি সাময়িক পত্র কিছুদিন বাহির হইয়াছিল। তাহাতে বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, মরাঠী, গুজরাতী, তামিল, তেলুগু, প্রভৃতি ভাষায় রচিত প্রবন্ধ নাগরী অক্ষরে ছাপা হইত।

তিনি বাঙালা কায়স্থদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিজের পরিবারে রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ শ্রেণীর মধ্যে এইরূপ বিবাহ দিয়া এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি শুধু বাঙালা কায়স্থদের মধ্যে এইপ্রকার একতা সম্পাদনের চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; বিহার, আগ্রা-অযোধ্যা, প্রভৃতির কায়স্থদের সঙ্গেও এইরূপ মিলনের পক্ষপাতী এবং তজ্জন্য যত্নবান্ ছিলেন। বরপণ রহিত করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য নিজের পরিবারে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, যে, কায়স্থরা ক্ষত্রিয়। তাঁহার সম্পাদিত "কায়স্থ-পত্রিকায়" এই মত প্রচারিত হইত, এবং কায়স্থ সভা দ্বারা কায়স্থদের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

তিনি কিছুদিন বেথুনকলেজ কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তিনি হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন, কিন্তু মহাকালী পাঠশালার মত বালিকাদিগকে প্রধানতঃ স্তোত্রপাঠ, নৈবেদ্য সাজান ও শিবপূজা শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। বালিকারা যাহাতে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, এবং গৃহস্থালির কাজ ভাল করিয়া করিতে পারে, প্রধানতঃ এইরূপ শিক্ষারই সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তিনি শিক্ষিত লোকদের কৃষিবৃত্তি অবলম্বনের পক্ষে ছিলেন, এবং নিজেও কিছু-কিছু চাষ করিয়াছিলেন। চিনির কারখানা প্রভৃতিতেও তিনি মন দিয়াছিলেন।

তাঁহার জন্মস্থান পানিসেয়ালা গ্রাম তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। তিনি সেখানে প্রায়ই যাইতেন, এবং তথাকার রাস্তা ঘাট পুষ্করিণী নর্দ্দামা প্রভৃতির উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ গ্রামের ম্যালেরিয়া নিবারণের চেষ্টা অনেকটা সফল হইয়াছিল।

গুজরাটে স্বরাজের জন্য আবেদন।

শিক্ষিত ভারতবাসীরা যে স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ, জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব, বা হোমরুল চায়, ভারতসচিবের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য গুজরাট হইতে একটি আবেদন তাঁহার নিকট পেশ্ করা হইবে। গুজরাট-সভা উহার সভাপতি শ্রীযুক্ত মোহনদাস কর্মচাঁদ গান্ধি মহাশয়ের নেতৃত্বে এই আবেদন শিক্ষিত গুজরাটীদের দ্বারা স্বাক্ষর করাইতেছেন। আবেদনে স্পষ্ট লিখিত আছে যে ইহার প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী কংগ্রেস্ মস্লেম্‌লীগ কর্তৃক অনুমোদিত রাজনৈতিক অধিকারের সমুদয় দাবী বুঝিয়াছেন ও তাহার সমর্থন করেন। আবেদনে ভারতসচিবকে ইহাও জানান হইয়াছে যে দাবী অনুযায়ী রাজনৈতিক সংস্কার না হইলে ভারতে সন্তোষের নবযুগের আবির্ভাব হইবে না। যে-সব স্বেচ্ছাসেবক স্বাক্ষর সংগ্রহ করিবেন, তাঁহারা কেবল কংগ্রেস্‌মস্লেমলীগের দাবীর কথাই বলিবেন, এবং যাঁহারা আবেদনটি ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন, কেবল এইরূপ লোকদেরই স্বাক্ষর লইবেন।

আমরা মডার্ন্ রিভিউর গত সংখ্যায় এইরূপ আবেদন পেশ্ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। গুজরাটের লোকদেরও মত এইরূপ জানিয়া সুখী হইলাম। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে এইরূপ আবেদন যাওয়া উচিত।

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী।

১৯১৬ সালে বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী নানাপ্রকার কাজ করিয়াছেন। ৯টি গ্রামে আগুন লাগায় অনেকগুলি পরিবার বিপন্ন হয়। এইরূপ ১৩৬টি পরিবারকে নগদ টাকা এবং চাষ আদির সরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করা হয়। বর্দ্ধমান, বীরভূম ও কাছাড় জেলায় বন্যায় বিপন্ন ৩৬২টি গ্রামের লোককে সাহায্য করা হয়। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ৪৪৩১ জন লোককে মণ্ডলী নিয়মিতরূপে চাউল

দান করেন, এবং অন্য আরও লোককে অর্থাদি সাহায্য করেন। দুইটি পুকুর এবং ৩৩টি পাকা কূয়া খনন ও নির্ম্মাণ করাইয়া মণ্ডলী কয়েকটি গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। ১১টি জেলায় ইহার ২৯টি শাখা স্থাপিত হয়। ৯টি জেলায় মণ্ডলী ৪৩টি বিদ্যালয় চালাইয়াছিলেন। বাকুড়া জেলার মালিয়াড়া গ্রামে একটি যৌথ ঋণদানসমিতি ও ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়, এবং কলিকাতায় আর-একটি রেজিষ্টরী করা হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে পত্রী ও পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণ এবং বক্তৃতা দ্বারা মণ্ডলী অনেক গ্রামে স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান বিস্তার করেন। কলিকাতার গরীবলোকদের একটি পাড়ায় শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যের উন্নতি, প্রভৃতি নানাবিধ সমাজসেবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রামে গ্রামের উন্নতির কাজ আরব্ধ হয়।

কলিকাতায় ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ভবনে বঙ্গীয় হিত সাধনমণ্ডলীর আফিসের নীচের তলায় একটি কারিগরী শিক্ষার বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। তাহাতে নিপুণ শিক্ষকের সাহায্যে দরজির কাজ শিখান হয়। সকল-প্রকার পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার ফরমাস্‌ও লওয়া হয়।

বঙ্গে গৃহবিবাদ।

আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন কলিকাতায় হইবার কথা। উহার সভাপতি নির্ব্বাচন উপলক্ষে এখানে যে দলাদলি হইতেছে, তাহা অতীব দুঃখের বিষয়। আমরা ভারত সভার সভ্য নহি, বঙ্গের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য নহি, কলিকাতার হোমরুল লীগের সভ্য নহি, আগামী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-কমিটিরও সভ্য নহি। অভ্যর্থনা-কমিটির যে দুই অধিবেশনের কার্য্য ও কার্য্যপ্রণালীকে উপলক্ষ করিয়া দলাদলি হইতেছে, সেই দুই অধিবেশনের সময় আমরা কলিকাতায় ছিলাম না। থাকিলেও, আমরা কমিটির সভ্য নহি বলিয়া সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া স্বয়ং সাক্ষাৎ ভাবে সমস্ত বিষয় জানিবার সুযোগ পাইতাম না; ঝগড়ার বিষয় সম্বন্ধে অল্প যাহা জানি, তাহা খবরের কাগজ হইতে জানিয়াছি। উভয় পক্ষের অনেক লম্বা লম্বা চিঠি আমরা পড়িতে পারি নাই। এই-সব কারণে আমরা এই গৃহবিবাদ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অনিচ্ছুক। এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরো বেশী হইলেও মাসিক কাগজে চলতি ঘটনা সম্বন্ধে লিখিবার স্থান অল্প বলিয়াও বেশী কিছু লিখিতে পারিতাম না। তদ্ভিন্ন দেখিতেছি, ব্যাপারটির এখনও চরম পরিণতি হইতে বিলম্ব আছে। প্রায় প্রত্যহ নূতন কিছু না-কিছু ঘটিতেছে। এ অবস্থায়, যে কাগজে আরো এক মাসের আগে আর কিছু লিখিতে পারা যাইবে না, তাহাতে বিষয়টির কোন-প্রকার আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়ও নহে।

আমাদের হৃদগত ইচ্ছা এই যে যদি এখনও ঝগড়াটি মিটিয়া যায় তাহা হইলে খুব ভাল হয়। ঝগড়া না মিটিলে বাংলাদেশ যে কংগ্রেসকে এবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহা পণ্ড হইবে, এবং কংগ্রেসের অধিবেশন অন্য কোন প্রদেশে হইলে তাহা বাংলা দেশের পক্ষে লজ্জার বিষয় হইবে। গুরুতর কুফলও ফলিতে পারে। ইতিমধ্যেই বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত এন্ এম্ সমর্থ সমগ্রভারতের কংগ্রেস কমিটিতে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য উহার সেক্রেটারীদিগকে চিঠি দিয়াছেন, যে, বঙ্গে দলাদলি হওয়ায় স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া এবার মান্দ্রাজ বা বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হউক, এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বা সার্ নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকর তাহার সভাপতি হউন।

উভয় দলের কোন কোন লোক ভিন্নপক্ষীয় লোক-দিগকে গালাগালি দিতেছেন। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। কোনও দলের সমস্ত লোকই মিথ্যাবাদী হইতে পারে না; সকলেরই অভিপ্রায় মন্দ হইতে পারে না। কোনও দলের সব লোকেরই অভিপ্রায় ভাল, তাহাও বলা কঠিন। আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তাহার বিপরীত কথা কেহ বলিলেই সে যে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী, এমন কথা বলা যায় না। কারণ সব জিনিষ সকলের ইন্দ্রিয়গোচর হয় না, সকলে সব জিনিষ একই ভাবে দেখে না বা শুনে না। আমরা উভয় দলের কার্য্যের মধ্যেই চাতুরী, এবং ভাল ও মন্দ দুই দেখিতেছি।

কংগ্রেসের সভাপতিত্ব।

বাংলাদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য সব প্রদেশের, কংগ্রেস কমিটিগুলি মিসেস বেসাণ্টকে আগামী কংগ্রেসের

সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে ইচ্ছুক। কংগ্রেস সমস্ত ভারতবর্ষের ব্যাপার। সুতরাং মিসেস্ বেসান্টের সহিত অন্য কাহারও যোগ্যতার তুলনা না করিয়াও এরূপ বলা যাইতে পারে যে তাঁহাকেই এবার সভাপতি করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নয় যে যাঁহার কোন কারণে মিসেস্ বেসান্টকে সভাপতি করিতে আপত্তি আছে, তাঁহাকেও তাঁহার নির্ব্বাচনে সায় দিতে হইবে। ভারতবর্ষের সাড়ে-একত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে ৩১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৯৯ জনের মত যদি একদিকে হয় এবং বাকী একজন মাত্র লোকের মত অন্যপ্রকার হয়, তাহা হইলে এই একজন লোকেরও মত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও নিরুপদ্রবে প্রকাশ করিবার অধিকার ও সুযোগ থাকা উচিত। গণতন্ত্রের ভাল জিনিষই গ্রহণীয়। তাহার আনুষঙ্গিক যে-সব গুণ্ডামি, চীৎকার, উত্তেজনা, বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য দেশে লক্ষিত হয়, তৎসমুদয় বর্জ্জনীয়।

মিসেস্ বেসান্টকে বিশেষ কোন একটা জায়গায় আটক করিয়া রাখিয়া এবং তাঁহার বক্তৃতা করিবার ও রাজনৈতিক কিছু লিখিয়া প্রকাশ করিবার অধিকার লোপ করিয়া গবর্ণমেন্ট প্রজাদিগের বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার অধিকারে হাত দেওয়ায়, তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া গবর্ণমেন্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছায় অনেক নির্ব্বাচক তাঁহার দিকে ভোট দিয়া থাকিবেন। স্বরাজের সপক্ষে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা তেজের সহিত আন্দোলন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার দিকে ভোট দিয়া বোধ হয় অনেকে গবর্ণমেন্টকে জানাইতে চান যে ভারতবাসীরা স্বরাজ চায়। এই-সব কারণে, ও মিসেস্ বেসান্টের স্বাধীনতা বহুপরিমাণে লুপ্ত হওয়ায় তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি-বশতঃ, এবং নিগৃহীতের কোন দোষ ত্রুটির উল্লেখ করিতে অনিচ্ছা-প্রযুক্ত, তাঁহার সপক্ষে যত কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার বিপক্ষে যাহা বলিবার আছে তাহা তেমন করিয়া কোন প্রদেশেই বলা হয় নাই। বিশেষতঃ এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলা যাঁহাকে আক্রমণ করে, দেশী কাগজে তাঁহার প্রকৃত দোষত্রুটিরও উল্লেখ স্বভাবতই কম হয়।

মিসেস্ বেসান্টের বিরুদ্ধে কোন কথা এখন বলা যখন আমরা ভাল মনে করিতেছি না, তখন তাঁহার যোগ্যতার বিষয়েও কিছু বলিব না। মোটের উপর এই বলি, যে, আমরা যদি অভ্যর্থনা-কমিটির সভ্য হইতাম, তাহা হইলে তাঁহারই পক্ষে ভোট দিতাম। তাঁহার বিরুদ্ধে কি বলিবার আছে, তাহা আমরা ভাল করিয়াই জানি, এবং মডার্ণ-রিভিউএ অনেকবার তাহা লেখাও হইয়াছে। তথাপি তাঁহার সপক্ষে ভোট দিতাম। যোগ্যতার পরিমাণ বুঝিয়া অতীত দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করিতে হয়। সভাপতি করিবার জন্য অপর যাঁহাদের নাম করা হইয়াছে, সভ্য জগতে তাঁহাদের কেহই মিসেস্ বেসান্টের মত পরিচিত নহেন, এবং সর্ব্বত্র তাঁহার অভিভাষণের গুরুত্ব যেরূপ অনুভূত হইবে, আর কাহারও ততটা হইবে না। এসব কথাও বিবেচ্য।

তাঁহার সভাপতি হওয়ার বিরুদ্ধে এমন কোন কোন আপত্তি হইয়াছে, যাহার সহিত তাঁহার যোগ্যতা অযোগ্যতার সম্পর্ক নাই। সেইরূপ দুটি আপত্তি সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব। (১)। তিনি বিদেশী। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য স্বায়ত্তশাসন লাভ। বিদেশীকে ইহার নেতা করিলে প্রমাণ হইবে যে আমরা নিজেদের কাজ নিজেরা চালাইতে পারি না, বিদেশীর সাহায্য লইতে বাধ্য হই; অতএব আমরা স্বরাজের অযোগ্য। সুতরাং তাঁহাকে সভাপতি করা উচিত নয়। আমাদের বক্তব্য এই যে যাঁহারা ইয়ুল, ব্রাড্‌লা, কটন, ওয়েব, ওয়েডারবর্ণকে সভাপতি করিয়াছিলেন, এবং রামজে ম্যাকডন্যাল্ডকে করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের এরূপ আপত্তি করা উচিত নহে। আমরা বরং এ আপত্তি করিতে পারিতাম। কারণ, রামজে ম্যাকডন্যাল্ডের নাম যখন প্রস্তাব করা হয় তখন বাংলাদেশে (এবং, যতদূর জানি, সমগ্র ভারতবর্ষে) একমাত্র আমরাই এই আপত্তি করিয়াছিলাম। আগ্রা-অযোধ্যায় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে যে-বার মিসেস্ বেসান্ট সভাপতি হন, তখনও আমরা এইরূপ আপত্তি করিয়াছিলাম। দুইবারের কোন বারই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের কোন দলের একখানা কাগজেও আমাদের কথার কেহ সমর্থন বা উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া দেখি নাই বা শুনি নাই। কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য যে ঔপনিবেশিক ছাঁচের স্বায়ত্ত-

শাসন লাভ, সে-কথাও এ বৎসর নূতন করিয়া উঠিতেছে না। ১৯০৫ সালে মহামতি গোখলে কাশীর কংগ্রেসে বলেন, ১৯০৬ সালে মহাত্মা দাদাভাই নওরোজী স্বরাজের দাবীর সম্পূর্ণ বিবৃতি করেন। ১৯০৫এর আগে একথা উঠিয়া থাকিবে, কিন্তু সে-বিষয়ে ঠিক্ কিছু এখন মনে পড়িতেছে না। যে-সব বিদেশী এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে এবং র‍্যামজে ম্যাকডনাল্ডের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি যেরূপ খাটে, মিসেস্ বেসাণ্টের বিরুদ্ধে তদ্রূপ খাটে না। কারণ, তিনি ভারতবর্ষকে নিজের বাসভূমি করিয়াছেন, ভারতবাসীদের পক্ষ সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করিয়া রাজশক্তি দ্বারা দণ্ডিত হইয়াছেন, এবং ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হইত ও এখানে বিদেশীকে দেশী-করণের আইন থাকিত যাহাকে naturalisation laws বলে, তাহা হইলে তিনি দেশীকৃত ভারতীয় অর্থাৎ naturalised Indian হইতেন, যেমন আমেরিকায় সুধীন্দ্র বসু, অক্ষয় মজুমদার, সখারাম গণেশ পণ্ডিত, তারকনাথ দাস প্রভৃতি দেশীকৃত মার্কিন হইয়াছেন। বিদেশীকে স্বদেশী করিবার রীতি ও নিয়ম সব জীবন্ত জাতির মধ্যে আছে। আমাদের মধ্যেও পরে নিশ্চয় হইবে। স্বাধীন দেশ-সকলে দেশজাত ও দেশীকৃত মানুষদের দায়িত্ব ও অধিকার সমান। আমাদের দেশেও তাহাই হওয়া উচিত। (২)। মিসেস্ বেসাণ্টকে সভাপতি করার বিরুদ্ধে আর-একটা আপত্তি এই হইয়াছে, যে, তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নজরবন্দী হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে সভাপতি করিলে ঠিক্ যেন শক্তিপরীক্ষার জন্য সরকার বাহাদুরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা হইবে। আমাদের তাহা মনে হয় না। তাঁহার দণ্ড উপলক্ষ্যে ভারতের সর্ব্বত্র এত প্রতিবাদ-সভা যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান না হয়, তাহা হইলে তাঁহার নির্ব্বাচনটাই আমাদের একটা অমার্জ্জনীয় আস্পর্দ্ধা বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে। ইংরেজ জাতি এরূপ ব্যাপারে অভ্যস্ত। রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত একাধিক ব্যক্তি পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাহা নির্ব্বাচকদের একটা অপরাধ বলিয়া গণিত হয় নাই। এই সেদিনও আইরিশ ন্যাশন্যালিষ্টরা আপনাদের চেয়েও উৎকট স্বাধীনতাপ্রয়াসী দুজন সদ্য-কয়েদ-খালাসী শিন-ফেন্ দলের বিদ্রোহীকে পার্লেমেণ্টে আপনাদের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছে। তাহাদের নাম মিষ্টার ম্যাকগীনেস্ (Mr. Macgüinnes) এবং মিষ্টার ডি ভেলেরা (Mr. de Velera)। যে বাংলা দেশে বিনা বিচারে এত লোকের স্বাধীনতা গিয়াছে, তথায় সেই-রকমে নিগৃহীত এক-জনের কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার একটা যথাযোগ্যতা আছে।

আমাদের গৃহবিবাদ ও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের উল্লাস।

বঙ্গে দলাদলি হওয়ায় এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলার বড় সুখ হইয়াছে। তাহারা মডারেটদিগকে খুব ভাল ছেলে বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়া তাহাদিগকে অন্যদলের লোকদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছাড়িয়া দিতে ও স্বতন্ত্র কংগ্রেস্ করিতে উৎসাহিত করিতেছে। আমরা কিন্তু আশা ছাড়িতে পারিতেছি না, যে, এখনও সব দলের সম্মিলিত কংগ্রেস্ হইবে, যদিও তাহার সম্ভাবনা দিন দিন খুব কম হইয়া যাইতেছে।

এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলা বলিতেছে, তোমরা যে এত দলাদলি চীৎকার বচসা ঝগড়া করিতেছ, শান্তশিষ্ট ভাবে সভার কাজ করিতে পারিতেছ না, ইহার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে তোমরা স্বরাজের বা জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের অযোগ্য। এরূপ কথা শুনিলে আমাদের হাসি পায়। পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশসমূহে রাজনৈতিক আন্দোলন, আলোচনা ও তর্কবিতর্কের নামে যে-সব বর্ব্বরতা, অসভ্যতা ও গুণ্ডামি হয়, তাহা কি আমরা জানি না? তাহাতে ত তাহাদের স্বাধীনতার অযোগ্যতা প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া কোন পাশ্চাত্য জাতি স্বীকার করে না?

আমরা এমন হাস্যকর কথাও অবশ্য বলি না যে আমাদিগকে গণতন্ত্র বা জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে গুণ্ডামির ব্রিটিশ আদর্শ বা মান (British standard of rowdyism) সম্মুখে রাখিয়া তদনুসারে চরিত্র গঠন করিতে হইবে। শান্তশিষ্ট ভাবে গাম্ভীর্য্য ও ভব্যতা রক্ষা করিয়াই সব সার্ব্বজনিক কাজ করা উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে-সব লোক পাশ্চাত্যদেশের অপকৃষ্ট নমুনা, তাহারা এরূপ উপদেশ দিতে পারে না।

"গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।"

ভারতসচিব মণ্টেগু ভারতবর্ষে আসিতেছেন বলিয়া কেহ যেন খুব বেশী আশ্বস্ত হইয়া না পড়েন। তিনি ভারতসচিব হইবার অল্পদিন আগেই পার্লেমেণ্টে মেসোপটেমিয়া কমিশনের রিপোর্ট উপলক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে, ভারতবর্ষের লোকদের কাছে ভারত গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করা উচিত, বলিয়াছিলেন এবং ভারতবাসীদিগকে অনেকটা স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়াছিলেন বটে; কিন্তু এরূপ বক্তৃতা হইতেও বেশী কিছু আশা করিবেন না। তিনি ত একজন একচ্ছত্র স্বয়ংকর্ত্তা সম্রাট্ নহেন, যে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টসকল, তাঁহার নিজের মন্ত্রণা-সভা, পার্লেমেণ্ট, প্রভৃতি দ্বারা অনেক বাধা পড়িবে। তা ছাড়া, তিনি ভারতসচিব হইবার আগে যাহা বলিয়াছেন, পদ পাইবার পরে তাহা যে করিতে চেষ্টাও করিবেন, নিশ্চয় করিয়া এমন বলা যায় না। তাঁহা অপেক্ষা খ্যাতিমান ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞও তাহা করেন নাই বা পারেন নাই। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, ওকালতী বা ব্যারিষ্টারী করিবার সময় কেহ কোন মক্কেলের সপক্ষে যে-সব কথা বলেন, বা অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যাহা বলেন, বিচারকের আসনে বসিলেও রায়ে ঠিক সেইরূপ কথা বলিবেন, ইহা ত কোন বুদ্ধিমান লোক মনে করে না।

দেশের লোক, দেশের নেতা, দেশের সম্পাদকগণ নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। স্বরাজের কথা খুব বুঝুন বুঝান, আলোচনা আন্দোলন করিতে থাকুন।

ভারতবর্ষে এখন রাজভৃত্যতন্ত্র বা আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। রাজভৃত্য বা আমলারা নিজেদের ক্ষমতা সহজে ছাড়িবেন কেন? শুনিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আমলাদের নিকট হইতে প্রদেশে প্রদেশে জেলায় জেলায় গোপনে উপদেশ ও আদেশ আসিয়াছে যে তাঁহারা যেন, প্রকাশ্য নিগ্রহ ছাড়া আর-সবপ্রকার উপায়ে, লোকদিগকে স্বরাজের দাবী হইতে নিরস্ত করেন। হোমরুল সম্বন্ধে একটা সার্কুলার যে সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট আসিয়াছে, তাহা ত বড়লাটের কৌন্সিলে স্বীকৃতই হইয়াছে। তাহাতে কি আছে, তাহা অবশ্য ব্যক্ত হয় নাই। সকলেই জানেন এক এক প্রদেশের ও জেলার কর্ত্তাদের হাতে ভয় ও লোভ দেখাইবার কত উপায় আছে। দেশহিতৈষীরা জাগুন, বুকের পাটা বড় করুন, বৈধ উপায়ে স্বরাজ লাভের চেষ্টা করুন।

মণ্টেগু যখন ভারতবর্ষের লোকদের প্রতিনিধিসমিতিসমূহের এবং প্রধান প্রধান লোকদের কথা শুনিতে চাহিবেন, তখন তাঁহার নিকট নিঃস্বার্থ স্বাধীনচেতা লোকদের মত যাহাতে না পৌঁছে, তদ্বিষয়ে বিধিমত চেষ্টা হইবে। প্রতিনিধিসমিতিসমূহের সভ্যদের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের কৃপাকটাক্ষভিখারী অনেক লোক আছে। তাহারা আমাদের দাবীটাকে খুব কমাইবার চেষ্টা করিবে। এখন হইতে সতর্ক থাকিয়া ইহা বন্ধ করিতে হইবে। দেশভক্ত সভ্যদিগকে ইহা করিতে হইবে। প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টের ধামাধরা অনুগ্রহভিখারী সেলামবাজ লোকদিগকেই দেশের প্রধান লোক বলিয়া মণ্টেগুর কাছে হাজির করিবার খুব চেষ্টা হইবে। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মণ্টেগু সাহেবের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে নানাস্থানে লইয়া যাইবেন। মানুষ হাজার ভাল হইলেও অনেক সময় নিজের গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং ভূপেন্দ্র বাবু যদি রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহারা বিপক্ষদলের লোকদিগকে যথাসাধ্য বাদ দিতে চেষ্টা করেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না; যদিও এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে যে তিনি তাহা করিবেন না।

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন অন্যত্র করিবার চেষ্টা।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বঙ্গে দলাদলি দেখিয়া কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন মান্দ্রাজ বা বোম্বাইয়ে করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টা বঙ্গের কোন কোন নেতার প্ররোচনায় বা তাঁহাদের জ্ঞাতসারে হইতেছে কি না জানি না; কিন্তু সন্দেহের কারণ আছে। কারণ এখানে কেহ-কেহ মিসেস্ বেসাণ্ট যাহাতে সভাপতি নির্ব্বাচিত না হন, তজ্জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন। মান্দ্রাজে বা বোম্বাইয়ে কংগ্রেস করিলে তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হয়। যিনি যে প্রদেশের

বন্দিনী তিনি তথাকার অধিবেশনের সভাপতি হইতে পারেন না। মিসেস্ বেসান্ট মান্দ্রাজের অধিবাসী; সুতরাং তিনি সেখানে সভাপতি হইতে পারিবেন না। বোম্বাই-গবর্ণমেণ্টের হুকুম আছে যে তিনি ঐ প্রদেশে পদার্পণ করিতে পারিবেন না; সুতরাং নজরবন্দী-দশা হইতে মুক্তি পাইলেও তিনি বোম্বাইয়ে সভাপতি হইতে পারিবেন না। অথচ তাঁহার এই বৎসর সভাপতি হওয়ার একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে বলিয়া কংগ্রেস কলিকাতায় রাখা একান্ত আবশ্যক। যদি উহা স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে, তাহা হইলে এমন কোন স্থানে হওয়া উচিত, যেখানে, মুক্তি পাইলে, মিসেস্ বেসান্ট যাইতে পারেন; এবং সেখানে কংগ্রেস করিবার ব্যয়ের আবশ্যকমত অংশ নির্ব্বাহ করিতে মিসেস্ বেসান্টের সভাপতিত্ব-প্রার্থী বাঙালী-দের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। সমগ্র ভারতের কংগ্রেস-কমিটির আগামী অধিবেশনেই এই প্রতিজ্ঞার কথা বলিতে হইবে।

বিনা বিচারে শাস্তি।

বিনা বিচারে মিসেস্ বেসান্ট ও তাঁহার দুজন সঙ্গীর স্বাধীনতা কতক পরিমাণে লুপ্ত হওয়ায় সব প্রদেশেই বেশী কম প্রতিবাদ হইয়াছে ও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বলা হইয়াছে। ভালই হইয়াছে; আরও বেশী প্রতিবাদ হইলে আরও ভাল হইত। সম্প্রতি খবরের কাগজে বলা হইতেছে যে "কমরেড্" কাগজের সম্পাদক মোহামেদ আলী ও তাঁহার ভ্রাতা শৌকৎ আলীকেও ছাড়িয়া দেওয়া হউক। এইসব লোকদের সম্বন্ধে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নও হইয়াছে। ঠিক হইয়াছে।

কিন্তু বঙ্গে যে বিনা বিচারে হাজার লোক নির্ব্বাসিত, জেলে বন্দী বা জেলের বাহিরে কোন-না-কোন গ্রামে নজর-বন্দী হইয়াছে, দেশের কোথাও কোন প্রতিবাদসভায় তাহাদের স্বাধীনতা-লোপের কোন প্রতিবাদ হইল না, তাহাদের মুক্তির বা প্রকাশ্য বিচারের দাবী হইল না, তাহাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া একটা প্রস্তাব পর্য্যন্ত ধার্য্য হইল না! যাহাদের নামডাক নাই, যাহারা গোপনে দেশের হিতচেষ্টা করিয়াছে, গরীবকে শিক্ষা দিয়াছে, গরীব রোগীর সেবা করিয়াছে, কিম্বা যাহারা ধরুন সমাজের কোন সেবাই করে নাই, তাহাদের স্বাধীনতার কি কোন মূল্য নাই? গণতন্ত্র কি এইপ্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইবে? শ্বেতকায় মনুষ্যের ও তাহার সহচরের স্বাধীনতারই কি মূল্য আছে? অশ্বেতকায়দের স্বাধীনতার মূল্য কি অতি সামান্য, না একেবারেই নাই? গণতন্ত্রের ভিত্তিই এই, যে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রেরও স্বাধীনতার মূল্য আছে, তাহারও অধিকার আছে। দুঃখের বিষয়, যে বাংলা দেশে শত শত ব্যক্তির স্বাধীনতা হৃত হইয়াছে এবং যাহারা মিসেস্ বেসান্ট অপেক্ষা অনেক বেশী কষ্টে দিন কাটাইতেছে এবং তজ্জন্য কেহ কেহ পাগল হইয়াছে বা আত্মহত্যা করিয়াছে, সেখানেও বিনা বিচারে নিগৃহীত এইসব লোকদের জন্য কোথাও কোন প্রতিবাদসভা হইল না।

ভারতসচিবের জ্ঞাপনপত্র।

ভারতসচিব একটি জ্ঞাপন-পত্রে জানাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে দেশবাসীর নিকট দায়ী গবর্ণমেণ্ট স্থাপন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য। ক্রমে ক্রমে এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এবিষয়ে ভারত-গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তিনি আসিতে-ছেন। প্রসঙ্গতঃ ইহাও বলা হইয়াছে, যে, দেশের সভাসমিতি এবং অন্যদের মতও জানা হইবে।

সম্পূর্ণ স্বরাজ এক মিনিটে দেওয়া যায় না বটে; কিন্তু ১৫০ বৎসরব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের পরও "ক্রমে ক্রমে" কথাটা এমন ভাবে বলা হইতেছে, যেন স্বরাজ পাইতে আমাদের আরও কত যুগই লাগা উচিত! জাপান যেদিন নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী অনুসারে শাসিত হইতে আরম্ভ করিল, তাহার পর শক্তিতে ইউরোপের প্রধান জাতিদের সমকক্ষ হইতে তাহার কত বৎসর লাগিয়াছে? ভারতে ব্রিটিশশাসনকাল অপেক্ষা অনেক কম। ফিলিপিনোরা আমেরিকানদের দ্বারা বিজিত হইবার পর ১৭ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বরাজ পাইয়াছে। তাহারা আমাদের চেয়ে কিসে বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছে? বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানে যে-যে সর্ত্তে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে, তাহার আলোচনা অনেক ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ করিয়াছেন। তাহার একটা সর্ত্ত এই, যে, পোল্যাণ্ডকে

একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করিতে হইবে, কিম্বা অন্ততঃপক্ষে পোলদিগকে সম্পূর্ণ জাতীয়-আত্মকর্তৃত্ব দিতে হইবে। পোলরা রুশিয়া, জার্মেনী ও অষ্ট্রিয়ার অধীনে ভারতবাসীদের ইংরেজাধীনতা অপেক্ষা দীর্ঘকাল বাস করিয়া আসিতেছে। ইংরেজরা বলেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসন পোল্যাণ্ডে রুশীয়, জার্মেন ও অষ্ট্রীয় শাসন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। নিকৃষ্ট শাসনের অধীন থাকিয়া পোলরা যদি একেবারে একলাফে স্বাধীনতার কিম্বা সম্পূর্ণ জাতীয়-আত্মকর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করিবার উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাহা হইলে আমাদের বেলায় এত "সোপান-পরম্পরা", এত যুগযুগব্যাপী "ক্রমে-ক্রমে"র ধুম পড়িয়া যায় কেন?

আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি, শুনিতেছি, আমাদের ছেলেরা শৈশব হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, কঠিনতম কাজ (শিখিবার সুযোগ পাইলেই) শিখে; আমাদের দেশী রাজকর্ম্মচারীরা যে-কোন রাজকার্য্যে কেবলমাত্র ১০।১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক হইয়া উঠে। রাষ্ট্রীয় কাজ ত এই-রকমেরই কাজ। সেটা শিখিতে আমাদের অনেক যুগ, অনেক শতাব্দী, বা অনেক পুরুষ লাগিবে কেন? ভারতবর্ষের শূদ্রদিগকে বলা হইত, তাহারা বহু জন্মের তপস্যায় তবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু এ বাজে কথা এখন তাহাদেরও মধ্যে বিস্তর লোক মানে না। আমরা এমন বোকা নই, যে, শ্বেতব্রাহ্মণ আমলাদের কথাটা মানিয়া লইব, যে, রাষ্ট্রীয় কার্য্য চালাইতে শিখিতে ১০।১৫ কিম্বা জোর ২০।২৫ বৎসরের বেশী লাগে।

ভারতসচিব বলিতেছেন, আমাদিগকে অনেকগুলা ধাপ ক্রমে ক্রমে পার হইতে হইবে, এবং প্রত্যেক ধাপের পর শ্বেত আমলারা বিচার করিবেন, যে, আমরা পরের ধাপটায় উঠিবার জন্য পা বাড়াইবার যোগ্য হইয়াছি কি না। চমৎকার ব্যবস্থা! আমরা স্বরাজ পাইলে যাহাদের প্রভুত্ব ও চাকরী যাইবে, তাহারাই হইবে আমাদের যোগ্যতার বিচারক! এমন ব্যবস্থা আমরা চাই না। যদি অঙ্গীকার করা হয় যে জোর ২০।২৫ বৎসর পরে আমরা সম্পূর্ণ স্বরাজ পাইব, তাহা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি। ভারত-সচিব অবশ্য নাম করিয়া আমলাদিগকেই যোগ্যতার বিচারক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই; তিনি বলিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট। কিন্তু আমাদের পক্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মানে ভারতসচিব ও তাঁহার মন্ত্রণা-সভার সভ্যেরা এবং ভারত-গবর্ণমেণ্ট মানে প্রধানতঃ বড় বড় সিবিলিয়ান-গণ অর্থাৎ বড় বড় শ্বেত আমলারা।

ভারতসচিবের জ্ঞাপনপত্রে আছে :—

"The British Government and the Government of India on whom the responsibility lies for the welfare and the advancement of the Indian peoples must be the judges of the time and the measure of each advance,......" ইত্যাদি।

"ভারতবর্ষের লোকদের কল্যাণ ও উন্নতির দায়িত্ব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত-গবর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত আছে," এই কথাগুলির মধ্যে কান্নার কারণ যথেষ্ট না থাকিলে আমরা হাসিতে পারিতাম। দেশের লোকদের কল্যাণের ও উন্নতির ভার আর যে-কোন লোকের হাতে থাকিতে পারে, এবং কি যে-সব ব্রিটিশ উপনিবেশের লোকেরা কুলি ভিন্ন অন্য ভারতবাসীদিগকে নিজেদের দেশে এযাবত ঢুকিতে দিতে চায় নাই, এবং যাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষের কুলিও চায় না, তাহারা পর্য্যন্ত এখন আমাদের মঙ্গলসাধনের বোঝা বহিতে ভয়ঙ্কর আগ্রহ দেখাইতেছে। জগতের অন্য জাতিদের স্বনিযুক্ত হিতৈষীগণ যদি মনে রাখেন যে প্রত্যেক দেশের লোকেরাই নিজেদের হিত সাধনের ভার লইবার যোগ্যতম ব্যক্তি, তাহা হইলে মানবজাতির কল্যাণ হয়। অন্য পরকে কেনই বা ঐকথা বলি, কেনই বা দোষ দি? আমরা বৃহত্তর ও বৃহত্তম লোকসমষ্টির কথা ভুলিয়া কেবল নিজে নিজের বা নিজ নিজ পরিবারের বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীর সুবিধা দেখিতে যে পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়াছি, সেই পরিমাণে পরের মুরুব্বিয়ানা, পরের প্রভুত্ব, পরের "কল্যাণ-সাধন" ব্যা-দেশ আমাদিগকে সহ্য করিতে হইতেছে। যাহাকে ব্যপদেশ বলিতেছি, তাহা আন্তরিক হিতৈষণা হইলেও যে আমাদের সম্পূর্ণ হিত হইবে না। যে শিশুকে তাহার বাপ-মা চাকরেরা সর্ব্বদা হাত ধরিয়া হাঁটায় ও আগলাইয়া বেড়ায় সে কি কখনও মানুষ হয়? শৈশবে ইহা দরকার বটে; কিন্তু ক্রমশই এই প্রয়োজন কমিতে থাকে, এবং পূর্ণ বয়সে ইহা লোপ পায়। ১৫।২০ বৎসরের বেশী সময় লাগে না। আমরা ১৫০ বৎসর শাসিত হইবার পরও কি শিশুই আছি

আফ্রিকায় জার্ম্মেনীর কতকগুলি উপনিবেশ ইংরেজদের হস্তগত হইয়াছে। গ্লাসগো নগরে বিশেষ সম্মানলাভ উপলক্ষ্যে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে, এই উপনিবেশগুলির ভবিষ্যৎ শাসনবিধি কিরূপে প্রণীত হইবে, তৎসম্বন্ধে বলেন :—"Their peoples' desires and wishes must be the dominant factor." "প্রধানতঃ তাহাদের নিজেদের ইচ্ছার উপরই তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে।" আমাদের বেলায় কিন্তু বিলাতের এবং এখানকার কর্ত্তারাই আমাদের ললাটলিপি লিখিবার ভার লইয়াছেন; তবে আমাদের মধ্যে সরকারের "চেনা" লোকেরা যদি কিছু বলিতে চান ত সেটা তাঁহারা "শুনিবেন"। আফ্রিকার জার্ম্যান উপনিবেশসমূহের অসভ্য লোকেরা নিজেদের ভালমন্দ এতটা বুঝে যে প্রধানতঃ তাহাদের কথা অনুসারেই কাজ হইবে, কিন্তু আমাদের মঙ্গলটা অপরেই করিবে। তবে কি না যদি সে মঙ্গলটা আমাদের গায়ে লাগে, তাহা হইলে আমরা কিছু বলিতে বা কাঁদিতে পারি। সে ক্রন্দন বা ভাষণের ফল কিছু হইবে কি না, জানা নাই।

বিলাতের ও এখানকার কর্ত্তারা পরামর্শ করিয়া যে-সব প্রস্তাব করিবেন, তাহা পার্লেমেণ্টে পেশ করা হইবে, এবং তাহা আলোচনা করিবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হইবে, বলিয়া ভারতসচিবের জ্ঞাপন-পত্রে অঙ্গীকার করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টে কোন বিতর্ক উঠিলে তাহা টিফিন খাইবার ছুটির ঘণ্টার মত সভাগৃহকে প্রায় লোকশূন্য করিয়া ফেলে; ২০।২৫ জন সভ্য হয়ত থাকে, ঊর্দ্ধসংখ্যা বোধ হয় ৫০।৬০; তাহাদেরও সকলে ভারতবন্ধু নহে। এ অবস্থায় পার্লেমেণ্টে আলোচনায় বেশী কিছু লাভের আশা নাই।

পুস্তক-পরিচয়

বিরূপবজ্র—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্রাবলী। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য দেড় টাকা। মোট তেরখানি ছবির বই।

এক সময় ছিল, যখন সাহিত্য, কলা প্রভৃতি গুণীসভার আদরের জিনিস ছিল, তখন গণ-সভায় তাদের ডাক পড়ে নাই। অর্থাৎ সে সময়টায় জর্ণালিজ্‌ম্ যে সাহিত্যের জায়গা জুড়িয়া বসিবে এবং কমলালয়া কমলবন ছাড়িয়া সমালোচনার বেত্রবনটাতেই অধিষ্ঠিতা হইবেন, এমনতর দুঃস্বপ্ন কেউ দেখে নাই।

জর্ণালিজ্‌ম্ যেমন গুণী'র আমলের সাহিত্য নয়, গণ'র আমলের সাহিত্য; কার্টুন-কলা তেম্নি গুণী'র কালের কলা নয়, গণ'র যুগের কলা।

অথচ, গুণীর আমলে কার্টুন-কলা যে ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। ইউরোপীয় আর্টে শোনা যায় যে, স্বয়ং র‍্যাফেল কার্টুন আঁকিয়াছেন। আমাদের দেশে, অতি প্রাচীন কালের অজন্তা গুহাচিত্রে গায়কদের মদিরাসক্তির চমৎকার ব্যঙ্গচিত্রের নমুনা দেখা গেছে। মোগল শিল্পে "মোল্লা দোপেয়াজা"র পোর্ট্রেটগুলিতে ব্যঙ্গরস যথেষ্টই আছে। লাহোর মিউজিয়মে ভণ্ড তপস্বীদের এবং বৈষ্ণব সাধুদের দুএকটা অতি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গচিত্র আছে।

কিন্তু গণ-যুগের কার্টুন-কলা স্বতন্ত্র। র‍্যাফেলের কার্টুন কেমন দেখি নাই, লাহোর মিউজিয়মের কার্টুন দেখিয়াছি। এগুলি পূর্ব্বে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউএ প্রকাশিত হইয়াছিল। এ কালের ইংরেজ-ফরাসী 'পাঞ্চ'-জাতীয় রঙ্গদার কাগজের কার্টুনের সঙ্গে সে সকল কার্টুনের তফাৎ এই যে, সেগুলো শুধুই ব্যঙ্গ নয়, উৎকৃষ্ট কলারও অঙ্গ বটে। তাদের লীলা সাময়িক নয় বলিয়া তাদের পরমায়ুও দুদিনের নয়। মলেয়ারের হাস্যরসপূর্ণ নাটক, আর এ কালের থিয়েটারের নিত্য খোরাক, ঠুনকো প্রহসনগুলার মধ্যে যে তফাৎ—সেইসব বিশুদ্ধ ব্যঙ্গচিত্র এবং একালের সাময়িক কার্টুন-চিত্রের মধ্যে সেই তফাৎ।

গগনেন্দ্র বাবুর এই ব্যঙ্গচিত্রাবলীর মধ্যে "দেবতার ফুল" সেই পুরাণো কালের কার্টুনের মত ব্যঙ্গও বটে, উৎকৃষ্ট কলার অঙ্গও বটে। এই শ্রেণীর আরও অনেক ছবি তিনি আঁকিয়াছেন।

অবশ্য রূপের মত বিরূপও চিত্রীর আঁকিবার বড় বিষয়। শ্যামও যেমন শিল্পের আদর্শ, শঙ্করও তেমনি। যে আর্টিষ্ট তার আর্টে বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির বিরূপতাকে যে পরিমাণে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছে, সেই পরিমাণেই সে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির যথার্থ রূপকেও ফুটাইতে পারে নাই। কেননা, যথার্থ রূপ মানেই সকল খণ্ডতা, সকল রূপবিকার ও অসম্পূর্ণতার সুসমঞ্জসীভূত রূপ, অন্তরতর রূপ। এইজন্য যে আর্টে কেবলি স্নিগ্ধতা ও মনোহারিতা, যে আর্টে রুদ্রতা ও প্রচণ্ডতা নাই, সে আর্ট কখনই সম্পূর্ণ আর্ট নয়।

এ কালের কার্টুন জিনিসটা ঠিক সেই বড় রূপের আদর্শের অন্তর্গত বিরূপের চিত্র নয়—ওটা জর্ণালিজ্‌মেরই আরেক শাখা। কার্টুনের একটা সাময়িক প্রয়োজন আছে। একথা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, আমাদের আধুনিক সমাজে এত রকমের বিকার ও অসামঞ্জস্য আছে যে, তারা কাব্য-কার্টুনিষ্ট ও চিত্র-কার্টুনিষ্ট দুজনকেই ব্যঙ্গের যথেষ্ট খোরাক জোগায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সেই কাব্য-কার্টুনিষ্ট ছিলেন—তাঁর 'হাসির গান', তাঁর 'ত্র্যহস্পর্শ' প্রভৃতি গানে ও কবিতায় সমাজকে তিনি বিদ্রূপের কষাঘাত করিয়াছেন কম নয়। গগনেন্দ্র চিত্র-কার্টুনিষ্ট হইয়া সমাজের যে-সকল অদ্ভুত বিকৃতির হাস্যকরতা উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতেছেন, তাহাতে যে তিনি যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছেন তার প্রমাণই এই যে, তাঁর সামাজিক কার্টুনগুলো দেখিয়া লোকে বিষম চটিয়াছে। অতঃপর কার্টুন জিনিসটা এদেশে চলিবে আশা করা যায়। কিন্তু গগনবাবুর মত প্রতিভাশালী আর্টিষ্ট এই ধরণের সাময়িক কার্টুন-রচনায় ব্যাপৃত থাকিবেন, এটা মনে করিতে ভাল লাগে না।

আমার মনে হয় তাঁর এই কার্টুন-রচনা বৃহত্তর আর্ট-সৃষ্টির ভূমিকা

মাত্র। আমার মনে হয়, যথার্থ রূপের অন্তর্ভূক্ত "বিরূপ"-আর্ট আঁকিবার পূর্ব্বে, তিনি সমাজের 'বাস্তব'-বিরূপতার মধ্যে একবার ডুব দিয়া দেখিতেছেন মাত্র। বাস্তব বিরূপ আর্টের বিরূপ নয়; কেননা আর্ট বাস্তবের প্রতিচ্ছবি নয়। কিন্তু এই বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলি মনের মধ্যে জমিতে জমিতে, এই 'বিরূপবজ্রে'র অট্টহাস্য মনের আকাশকে সচকিত করিতে করিতে, তারপর একদিন যে নূতন বিরূপবজ্র শিল্পীর পরিপূর্ণ ভাববর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিবে, তার শক্তি এর চেয়ে অনেক বেশী হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তাহা প্রলয়রূপে দেশের ভাবাকাশে দেখা দিলেও, ভাবী সোনার ফসল ফলাইয়া তুলিবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

রবিদাদা—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি-এস সি প্রণীত উপন্যাস। ডিমাই ষোড়শাংশিত ১০৬ পৃষ্ঠা। অন্নদা বুকষ্টল হইতে প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই চলনসই।

গ্রন্থের প্লটটি এইরূপ :—

পিতৃমাতৃহীন অনাথ রবি মোটরকারের ধাক্কা খাইয়া মোটরারোহী ধনীর কৃপাদৃষ্টিতে পড়িয়া তাঁহার গৃহে আশ্রয় লাভ করিল ও ধনী-দুহিতা লীলার 'রবিদাদা' হইল। ক্রমে যেমন স্বাভাবিক, ভুবন ভরিয়া পাতা প্রেমের ফাঁদে রবি ধরা পড়িল। "লীলা কাছ ছাড়া হইলে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিত।" কিন্তু কিছু দিন পরে রবির বন্ধু অতুল আসিয়া এই প্রেমের ক্ষেত্রে 'নৌকাডুবি'র অক্ষয়ের মত প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। তখন রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ছাড়া রবির আর অন্য কোন বুদ্ধি আসিল না। কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করিয়া পত্রলীন পুষ্পের গন্ধের মত মহৎ কার্য্যের সৌরভ দ্বারা অবশেষে প্রেমের এই ফেরারী আসামী ধরা পড়িল। এখন অতুলের পলাইবার পালা, সুতরাং সে পলাইল। তার পর রীতিমত নভেলি কায়দায় 'রবিদাদা' লীলার স্বামিত্বের সিংহাসনে বসিলেন। রেনল্ড্‌স্ প্রণীত 'কেনেথ' উপন্যাসের 'কেনেথ' ও 'ইভালিনা'র সহিত—অবশ্য ক্ষুদ্র পরিসরে—এই 'রবিদাদা' ও 'লীলা'র আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। ইহা কাঁচা হাতের মামুলী প্রেমের গল্প।

শুভদৃষ্টি—শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত। অন্নদা বুকষ্টল হইতে প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ। পুস্তকখানিতে আটটি ছোট গল্প আছে। গ্রন্থকারের অন্য দুই একখানি পুস্তক আমাদের মোটের উপর ভালই লাগিয়াছিল কিন্তু এই ছোট গল্পগুলি পড়িয়া আমরা একেবারেই সুখী হইতে পারিলাম না। প্রথম গল্প 'শুভদৃষ্টি'তে লতিকার সহিত প্রভাতের, 'নিদয়া'য় চঞ্চলার সহিত কুমারীশের, 'পিয়াসা'য় চারুর সহিত অমিয়ার যে প্রেমলীলার ছবি গ্রন্থকার আঁকিয়াছেন তাহা নিতান্ত morbid এবং অত্যন্ত জঘন্য রুচির পরিচায়ক। "জয়মাল্যে" স্কুলের শিক্ষকের যে চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাও তদ্রূপ। 'নিদয়া' গল্পে সৃষ্টিধরের চরিত্র যতদূর সম্ভব অস্বাভাবিক হইতে পারে ততদূর। 'মাঠ হইতে খাটিয়া-খুটিয়া যে আসে,' সে, কলেজ-পাঠী আধুনিক কাব্যপড়া ছোক্‌রার ভাষায় অমন করিয়া প্রেমের চর্চ্চা করিতে পারে না। গ্রন্থকার যদি লিখিতেন যে সৃষ্টিধর সিটি কলেজে আই-এসসি পড়িয়া সাবোর কৃষি কলেজে দু'বছর পড়িয়াছিল তবেই তাহার মুখে এত কাব্যগন্ধী প্রেমালাপ মানাইত। তারপর গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি বারনারীকে না টানিলে কি গল্পের রূপ বাড়ে না?

গ্রন্থের ছাপা, কাগজ বাঁধাই চলনসই।

অরুন্ধতী।

ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান (Practical Psychology)—হুগলী ট্রেনিং স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী) এম-এ, বি-টি, প্রণীত। পৃঃ ৫০৩; মূল্য ৩৲। প্রকাশক—J C Mukherjee of Mukherjee Bose & Co., Cornwallis Building, Cornwallis Street, Calcutta.

ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান বঙ্গ ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। বিষয়টি অতি কঠিন, তাহার উপর বঙ্গভাষায় দার্শনিক শব্দের বিশেষ অভাব। এ অবস্থায় যে পুস্তকখানা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট। এই গ্রন্থের জন্য আমরা গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ দিতেছি।

মনোবিজ্ঞানের সহিত শিক্ষা-প্রণালীর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্ববিষয়ে সকলেই অভিজ্ঞ হইবেন, ইহা কখনই আশা করা যায় না; কিন্তু ইহার স্থূল স্থূল তত্ত্ব অবগত হওয়া প্রত্যেক শিক্ষকেরই কর্ত্তব্য। বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক নূতন তত্ত্ব লাভ করিতে পারিবেন, যাঁহারা ইংরেজী জানেন তাঁহারাও ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। ইংরেজী ভাষাতেও এইপ্রকার পুস্তকের বিশেষ অভাব আছে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আবশ্যক।

ধর্ম্মজীবন—ডাক্তার শ্রীধর্ম্মদাস বসু (Lt. Col., I. M. S., retired) প্রণীত। পৃঃ ৩৯৮+৩৪ মূল্য ১॥; কাপড়ে বাঁধান ১৸০।

মানবজীবন, ধর্ম্মজীবন, ধর্ম্ম, ধর্ম্মের অবশ্যকতা ও স্থায়িত্ব, ধর্ম্মের উপকারিতা ও প্রাধান্য, বিশ্বাস, ধর্ম্মবিশ্বাস, ঈশ্বর অস্তিত্বে বিশ্বাসের হেতু, ঈশ্বরের স্বরূপ, উপাসনা, প্রার্থনা, আধ্যাত্মিক ক্ষুধামান্দ্য, মৃত্যু, আত্মার অমরত্ব ও পরজন্ম, হিন্দুশাস্ত্রের মত, কোরানের মত, ব্রাহ্মসমাজের মত ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে; আমরা ইহা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। আশা করি পাঠকগণও প্রীত হইবেন।

ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী প্রণীত। পৃঃ ৮+৭৭+৩৯২; মূল্য ২॥০।

এই গ্রন্থে দেবনাগর অক্ষরে পালি মূল, বঙ্গানুবাদ, বিস্তীর্ণ টীকা দেওয়া হইয়াছে। টীকায় ব্যাখ্যাত শব্দসমূহের সূচী, শিক্ষাপদসমূহের নাম, শিক্ষাপদসমূহ কোথায় ও কাহাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে—এই সমুদয় দেওয়া হইয়াছে পরিশিষ্টে।

গ্রন্থের প্রথমেই 'প্রবেশক' নামক এক অংশ আছে। ইহাতে এই-সমুদয় বিষয় বিবৃত হইয়াছে—বিনয় ও বিনয়পিটক; প্রাতিমোক্ষের প্রতিপাদ্য ও বিনয়পিটকে ইহার স্থান; বেদপন্থীর ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই তিন আশ্রমের অনুকরণে বৌদ্ধধর্ম্মে ভিক্ষুধর্ম্মের নিয়ম বিধান; বেদপন্থী ও বুদ্ধপন্থী উভয়েরই ধর্ম্ম আচারবহুল, আচারের আবশ্যকতা; বৌদ্ধধর্ম্মে অঙ্গবিকল ব্যক্তিদিগের উদ্ধারের স্থান নাই; বেদপন্থী ও বুদ্ধপন্থীর মধ্যে ভিক্ষুণী বা সন্ন্যাসিনীর সৃষ্টি, ইহার পৌর্ব্বাপর্য্য; ভিক্ষুণী-সঙ্ঘের সৃষ্টি ও ইহার পরিণাম; উপোসথ; প্রাতিমোক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তি; প্রাতিমোক্ষের বিহিত নিয়মাবলী।

গ্রন্থের 'প্রবেশক' অংশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। দুই একটি বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া স্ত্রীলোক কুপথে গমন করিয়াছে ইহা সত্য; কিন্তু পুরুষও কি সন্ন্যাসী হইয়া বিপথে গমন করে নাই? সন্ন্যাস-ধর্ম্মেরই এই বিপদ; স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই কুপথগামী হইতে পারে। ইউরোপের মধ্যযুগেও ইহাই ঘটিয়াছিল।

গ্রন্থে বিস্তীর্ণ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা দেওয়া হইয়াছে। পাঠকগণ এই অংশ হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

গ্রন্থের অনুবাদ সরল ও মূলের অনুগত হইয়াছে।

পুস্তকের ছাপা ও কাগজ উভয়ই সুন্দর।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত ও পালি উভয় শাস্ত্রে পারদর্শী এবং এই পুস্তক তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে। তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আমাদিগের অশেষ উপকার করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

আশা করি তিনি ক্রমশঃ 'সুত্তনিপাত' 'ইতিবুত্তক' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিবেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

বেগম সমরু—গুরুদাস লাইব্রেরীর আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার সপ্তদশ গ্রন্থ, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত, শ্রাবণ ১৩২৪, পৃঃ /০—/১০, ১—১২২।

প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা-গ্রন্থ-প্রকাশক মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালা প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার পাঠকপাঠিকাগণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই, ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোনও গ্রন্থপ্রকাশকই এত অল্প মূল্যে এমন সুন্দর-বাঁধান পরিষ্কার-ছাপা গ্রন্থমালা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই গ্রন্থমালার প্রথম হইতে ষোড়শ গ্রন্থ হয় উপন্যাস না-হয় গল্পসমষ্টি, কিন্তু সপ্তদশ গ্রন্থ 'বেগম সমরু' একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালায় যে ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে ইহা বোধ হয় কেহই প্রত্যাশা করেন নাই। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এই গ্রন্থমালায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, ভরসা করি বাঙ্গালার পাঠকপাঠিকাগণ তাহার সমুচিত আদর করিবেন।

বেগম সমরু অধঃপতিত মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের রাজত্বকালের একজন প্রধান ব্যক্তি। বাদশাহ শাহ আলম এই স্ত্রীজাতীয়া সেনানীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং বহুবার তাঁহার জন্য পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। সমরু অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিল্লীর ইতিহাসে একজন প্রধান নায়িকা, তাঁহার জীবনকাহিনী রহস্যময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। গ্রন্থকার সরল শুদ্ধ ভাষায় সমরুর জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে ভাষার বৈষম্য দেখা যায়, বেগম সমরুর প্রণয়কাহিনীর বর্ণনকালে গ্রন্থকার যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা অধিকতর সংযত হওয়া উচিত ছিল, কারণ প্রতিপাদ্য বিষয় ইতিহাস, উপন্যাস নহে। গ্রন্থে আটখানি চিত্র আছে, ইহার পূর্ব্বে এত-চিত্র-সম্বলিত কোনও গ্রন্থ আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালায় প্রকাশ হয় নাই।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাতালে—শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি এ প্রণীত। কলিকাতা, ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী। মূল্য ১।০।

গ্রন্থকার জুল্ ভার্নের যে-সমস্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সমালোচ্য পুস্তকখানি তৃতীয় পুস্তক। আজকাল নভেল-প্লাবিত বঙ্গসাহিত্যে যে-সকল উপন্যাসের বহুল প্রচার হইতেছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার অধিকাংশই উদ্দীপনাপূর্ণ ঘটনাবলীর সমাবেশে অথবা প্রেমের আখ্যানে পরিপূর্ণ। সেই-সমস্ত উপন্যাস বালকবালিকাদিগের মধ্যে বহু অনর্থের সৃষ্টি করিতে পারে। কৌতূহলোদ্দীপক সুরুচিসম্পন্ন গল্পাবলী সাহিত্যে অতিশয় বাঞ্ছনীয় ও উপাদেয় সন্দেহ নাই। ঐরূপ গল্প-লেখকদের মধ্যে বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থকার জুল্ ভার্ন অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত পুস্তকসমূহ বিশেষরূপে সুকুমারমতি পাঠকগণের চিত্তাকর্ষক হওয়ায় ইয়ুরোপের প্রায় সমস্ত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার পুস্তকগুলি বিচিত্র ঘটনার সহিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদির সমাবেশে এতই মনোরম হইয়াছে যে একবার পাঠ করিতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। লেখকের রচনাচাতুর্য্য পাঠকবৃন্দের হৃদয়ে একটি গুপ্ত শক্তি জাগ্রত করিয়া তাহাদিগকে নানাবিধ সাহসিক কার্য্য সম্পাদনে উৎসাহিত করে, প্রকৃতির নিভৃত কক্ষ হইতে নব নব জ্ঞান আহরণ করিবার নিমিত্ত আগ্রহ জন্মাইয়া দেয়।

আমাদের যুবকবৃন্দের অবসরকাল অসার গল্পগুজবে ব্যয়িত না হইয়া যাহাতে আমোদের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের অন্তর্নিহিত সদ্বৃত্তিগুলির বিকাশলাভে নিয়োজিত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থকার জুল্ ভার্নের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই সাধু উদ্যমকে প্রশংসা করিতেছি। তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাহা অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না, ইহা গ্রন্থকারের পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে। বঙ্গভাষা দীনা হইলেও বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দগুলির অনুবাদে লেখক বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অনাবশ্যক বিষয়গুলিকে সংক্ষেপ করিয়া এবং স্থানে স্থানে বক্তব্য ও বর্ণনীয় জিনিসগুলিকে ফুটাইয়া তুলিয়া গ্রন্থকার অনুবাদটিকে বেশ মনোরম ও উপভোগ্য করিয়াছেন। ভাষার উপর লেখকের অসামান্য দখল আছে। তাঁহার রচনা ওজস্বী, রুচি মার্জ্জিত, শব্দনির্ব্বাচন নিপুণ, বর্ণনাশক্তি চিত্তাকর্ষক।

গ্রন্থকার এইরূপ অনুবাদকার্য্যে ব্রতী হইয়া বঙ্গসাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব মোচন করিয়াছেন। অনুবাদ দ্বারা ইংরেজী, ফরাসী ও জর্মান সাহিত্য প্রভৃতি সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে। কার্লাইলের মত প্রতিভাশালী পুরুষ ও হ্যারিয়েট মার্টিনোর মত বিদুষী রমণী অনুবাদে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াও গৌরবান্বিত হইয়াছেন। অধুনা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সুসভ্য ও উন্নত জাতিসমূহের মধ্যে অনুবাদের সাহায্যে পরস্পরের ভাববিনিময়দ্বারা যে একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে, বিশ্বমানবের পক্ষে তাহা অমূল্য," এবং সাহিত্যের ঈদৃশ উদারতা জাতীয় জীবনকে যেরূপ পুষ্ট ও নব নব শক্তিশালী করিয়া তোলে, আমাদের প্রাদেশিকতা-দুষ্ট সাহিত্যের পক্ষে তাহা কল্পনারও অতীত।

এই কারণে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্যবিষয়ক শ্রেষ্ঠ পুস্তকসমূহের অনুবাদ ও প্রচার আমাদের জাতীয় উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে স্বদেশপ্রেমিক কৃতী লেখকগণ এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়া মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে স্বীয় শক্তি নিয়োগ করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থ-নির্ব্বাচন-সমিতির কর্তৃপক্ষ তাঁহার এই শ্রেণীর পূর্ব্বপ্রকাশিত অপর দুইখানি পুস্তক যুবকদিগের হস্তে পুরস্কার দেওয়ার যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

সমালোচ্য পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট, ও বাঁধাইও সুন্দর। মূল্যও যথাসম্ভব সুলভ হওয়ায় আশা করা যায় ইহার বহুল প্রচার হইবে।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রী[illegible] সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।